কেয়াপাতার নৌকো

প্রফুল্ল রায়

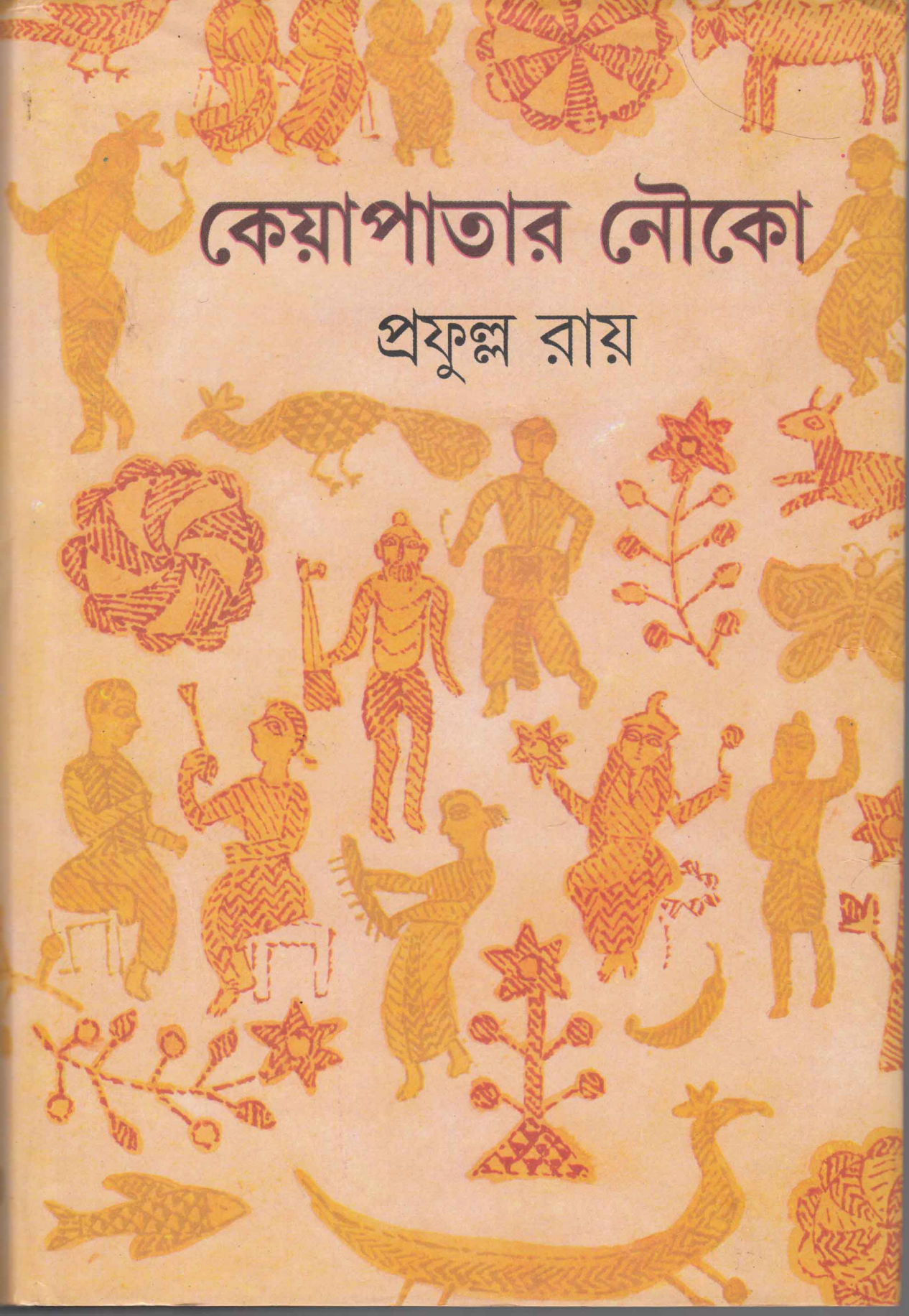

ভাল করে সকাল হয় নি এখনও। স্টিমারের গতি হঠাৎ মন্থর হয়ে এল।

উনিশ শ' চল্লিশের অক্টোবর। বার বছরের বিনু বাংলা মাস আর সালও জানে। আশ্বিন, তের শ' সাতচল্লিশ।

এত ভোরে রোদ ওঠে নি। উত্তর-দক্ষিণ-পশ্চিম, তিন দিক আবছা অন্ধকারে মলিন। তার ওপর পাতলা নরম সিল্কের মতো কুয়াশা। শুধু পুব দিকটায় আলো আলো একটু আভা ফুটেছে। বাতাস বইছে উত্তর থেকে দক্ষিণে, কখনও পুবে-পশ্চিমে আড়াআড়ি। শরতের বাতাস—এলোমেলো, ঝিরঝিরে, সুখদায়ক। তার গায়ে হিমের আমেজ মাখানো।

মস্ত জলপোকার মতো স্টিমারটা এতক্ষণ যেন হাত-পা ছুড়ে এলোপাতাড়ি সাঁতার কাটছিল, এখন গা ভাসিয়ে দিয়েছে।

গতি কমে এসেছিল, ইঞ্জিনের ধকধকানিও ক্রমশ স্তিমিত হয়ে যাচ্ছে। দু'ধারের বড় বড় চাকা দু'টো আগের মতো গর্জন করে জল কাটছে না, আলতোভাবে নদীকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে ঘুরে যাচ্ছে।

এই ভোরবেলাতেই ঝাঁকে ঝাঁকে শঙ্খচিল বেরিয়ে পড়েছে। গলায় সাদা বর্ডার-দেওয়া খয়েরি রঙের পাখিগুলো স্টিমারটাকে ঘিরে সমানে চক্কর দিচ্ছে। তাদের চোখ কিন্তু জলের দিকে। মাছের রুপোলি শরীর দেখতে পেলেই হয়, সঙ্গে সঙ্গে ছোঁ দিয়ে পড়ছে। মুহূর্তে বাঁকানো ঠোঁটে শিকার বিঁধিয়ে উঠে আসছে। আর বকেরা? তাদেরও ধ্যান-জ্ঞান মাছেরই দিকে।

জলের ধার ঘেঁষে ডেকের রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে ছিল বিনু। একপাশে তার বাবা অবনীমোহন, আরেক পাশে দুই দিদি—সুধা আর সুনীতি। মা আসেন নি, এত ভোরে ওঠা তাঁর বারণ। চিরদিনই মা অসুস্থ, রুগ্‌ণ। ভোরের ঠাণ্ডা জোলো হাওয়া লাগালে শরীর আরও খারাপ হবে, তাই কেবিনে শুয়ে আছেন।

অবনীমোহনের বয়স পঞ্চাশের মতো। বেশ লম্বা, সুপুরুষ। মোটা ফ্রেমের চশমার ভেতর বড় বড় দূরমনস্ক চোখ। এই বয়সেও গায়ের রং উজ্জ্বল। চামড়া টান টান, একটি ভাঁজও তার ওপর পড়ে নি। চুল উস্কখুস্ক, সাদা-কালোয় মেশানো। সাদার ভাগটা কম, তবু ওই রংটা তাঁর চেহারায় নতুন মহিমা এনে দিয়েছে।

সুনীতির বয়স একুশ, সুধার আঠার। দু'জনের চেহারার ছাঁচ একরকম। ভুরু এত সুন্দর আর সরু, মনে হয়, খুব যত্ন করে তুলি দিয়ে আঁকা। সুনীতি ফর্সা, সুধা শ্যামাঙ্গী। কচিপাতার কোমল আভার মতো কী যেন তার গায়ে মাখানো। সুধার রং টকটকে, তার দিকে তাকিয়ে পাকা ধানের কথা মনে পড়ে যায়। দু'জনেরই হাত-পা-আঙুল, সবেতেই দীঘল টান। পানপাতার মতো মুখ, থাক থাক কোঁচকানো চুল, ছোট্ট কপাল আর সরু চিবুকে মনোরম একটি ভাঁজ। দু'জনের চোখই টানা টানা, আয়ত। সুনীতির কুচকুচে কালো মণিদু'টো যেন ছায়াচ্ছন্ন সরোবর। সুধার চোখের মণি কালো নয়, নীলচে।

সুনীতির দিকে তাকালেই টের পাওয়া যায়, সে বয়স-সচেতন। এর মধ্যেই চেহারায় গম্ভীর ভাব এনে ফেলেছে। সুধা কিন্তু একেবারে উলটো—নিয়ত ছটফটে, চঞ্চল। গাম্ভীর্য বলে কোনও শব্দ তার হাজার মাইলের ভেতরে নেই। অকারণ ছটফটানি আর ছেলেমানুষি সবসময় তাকে ঘিরে আছে।

দু'চোখে অপার বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে আছে বিনু। স্টিমার এখন যেখানে, সেখান থেকে নদীর তীর খুব কাছে, আধ মাইলের মধ্যে। গাছপালা, সবুজ বনানী, ফাঁকে ফাঁকে দু'একটা বাড়িঘর চোখে পড়ছে। অন্য পাড়টা অনেক দূরে, ধুধু, দুর্বল রেখায় আঁকা জলছবির মতো অস্পষ্ট।

নদীর ঠিক মাঝখানটায় ঝাপসা কুয়াশার ভেতর অসংখ্য কালো কালো বিন্দু বিচিত্র সংকেতের মতো ছড়িয়ে আছে। মা বলেছেন ওগুলো জেলেডিঙি, সারারাত নদীময় ঘুরে ঘুরে নাকি ইলিশ মাছ ধরে। দূর-দূরান্তের ডিঙিগুলোই না, ছইওলা অনেক নৌকো লক্ষ্যহীনের মতো কাছাকাছি ঘোরাঘুরি করছে। স্টিমার যত আস্তেই চলুক, নদী তোলপাড় করে উঁচু-উঁচু পাহাড়প্রমাণ ঢেউ উঠছে আর নৌকোগুলো মাতালের মতো অনবরত টলছে।

নদী জুড়ে আরেকটা দৃশ্য চোখে পড়ছিল। চাপ চাপ, ঝাঁক ঝাঁক কচুরিপানা বেগুনি ফুলের বাহার ফুটিয়ে ভেসে যাচ্ছে।

বিনুরাই শুধু নয়, প্রায় সব যাত্রীই রেলিঙের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। ফলে স্টিমারের এদিকটা অনেকখানি কাত হয়ে গেছে।

যাত্রীরা সবাই প্রায় কথা বলছিল। কে যেন গলা চড়িয়ে কাকে ডাকল, কেউ কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে সরু করে শিস দিচ্ছে, হঠাৎ উচ্ছ্বাসে কেউ এক কলি গেয়ে উঠল। টুকরো টুকরো কথা, শিসের আওয়াজ—মিলে মিশে একাকার হয়ে মৃদু গুঞ্জনের মতো অনেকক্ষণ ধরে বিনুর কানে বেজে চলেছে। বাবা আর দিদিরাও কী যেন বলাবলি করছে, বিনু বুঝতে পারছিল না। সে শুধু তাকিয়ে আছে। অসীম বিস্ময় ছাড়া তার আশেপাশে আর কিছুই নেই এখন।

নদী বলতে বিনুর অভিজ্ঞতায় কলকাতার বড় গঙ্গাই শেষ কথা। হাওড়া পুলের ওপর দাঁড়িয়ে যতবার গেরুয়া রঙের প্রবাহটি দেখেছে ততবারই সে অবাক হয়েছে। কিন্তু এখানে এই পারাপারহীন জলরাশির দৃশ্য তাকে যেন বিহ্বল করে ফেলেছে।

একসময় অবনীমোহনের ডাক শোনা গেল, 'বিনু—'

বিনু সাড়া দিল না। দু'চোখ মেলে যেমন দেখছিল, দেখতে লাগল।

অবনীমোহন আবার ডাকলেন।

নদীর দিকে চোখ রেখে অন্যমনস্কের মতো সাড়া দিল বিনু, 'কী বলছ?'

'আমরা এসে গেছি। ওই যে দেখতে পাচ্ছিস, মনে হচ্ছে ওটাই রাজদিয়ার স্টিমারঘাট। ওখানে আমাদের নামতে হবে।' অবনীমোহন সামনের দিকে আঙুল বাড়িয়ে দিলেন।

অবনীমোহনের আঙুল যেদিকে, বিনুর চোখ এবার সেদিকে ঘুরে গেল। এখনও বেশ খানিকটা দূরে, তবু নিশ্চল জেটি, দু'তিনটে গাধাবোট, লোকজনের চলাফেরায় বড়সড় একটা গঞ্জের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। বিনুর ছোট্ট বুকের ভেতর সিরসিরিয়ে আনন্দের ঢেউ খেলতে লাগল। শেষ পর্যন্ত রাজদিয়ায় আসা হল তা হলে। কতকাল ধরে মায়ের মুখে ওই জায়গাটার কথা শুনে আসছে সে। রাজদিয়ায় আসার ইচ্ছা তার অনেক দিনের।

ওধার থেকে বড়দি সুনীতি বলল, 'এক্ষুনি স্টিমার জেটিঘাটে ভিড়বে। চল বাবা, কেবিনে গিয়ে মালপত্তর গুছিয়ে নিই।'

অবনীমোহন বললেন, 'তাড়া কি, রাজদিয়াই তো লাস্ট স্টেশন। ওখানে গিয়ে স্টিমারটা নিশ্চয়ই বেশ কয়েক ঘন্টা পড়ে থাকবে। ধীরেসুস্থে লটবহর গুছোলেও চলবে।'

ছোটদি সুধা ব্যস্ত গলায় বলল, 'দাদু আমাদের নিতে স্টিমারঘাটে আসবেন তো?'

অবনীমোহন বললেন, 'নিশ্চয়ই আসবেন।'

'তোমার চিঠি দাদু পেয়েছেন?'

'পাওয়া উচিত। আজ কী বার?'

মনে মনে হিসেব করে সুধা বলল, 'বুধবার।'

অবনীমোহন বললেন, 'গেল বুধবারে জি.পি.ও'তে গিয়ে ডাকে দিয়েছি। সাতদিনে চিঠিটা কি আর আড়াই শ', তিন শ' মাইল রাস্তা পেরুতে পারে নি?'

সুধা বলল, 'আরেকটা কথা ভেবে দেখেছ?'

'কী রে?'

'আমাদের তো কাল পৌঁছবার কথা ছিল। স্টিমার চড়ায় আটকে গিয়েছিল বলে আজ এলাম। তোমার চিঠি যদি পেয়েও থাকেন দাদু, কাল এসে ঘুরে গেছেন। জেটিঘাটে আজ আর কি আসবেন?'

'আসবেন রে, আসবেন।'

সুধাটা চিরদিনের ভীতু। তার খুঁতখুঁতুনি কাটল না, 'দাদু না এলে কী যে হবে! তুমি তো আবার কখনও এখানে আসো নি। রাজদিয়ার রাস্তাঘাট কিছুই চেন না।'

অবনীমোহন হেসে ফেললেন, 'তোকে অতশত ভাবতে হবে না। দাদু আসবেনই, দেখে নিস। আর যদি না-ই আসেন, ঠিকানা তো জানি। খুঁজে ঠিক বার করে ফেলব। তা ছাড়া আমি না চিনি, তোর মা চেনে। বারকয়েক সে এখানে এসেছে।'

সুধা আর কিছু বলল না। মুখ দেখে মনে হল না, খুব একটা ভরসা পেয়েছে।

এদিকে স্টিমারটা জেটিঘাটের দিকে যত এগিয়ে চলেছে, যাত্রীদের ব্যস্ততা, ছোটাছুটি শুরু হয়ে গেছে। আগের সেই মৃদু অস্পষ্ট গুঞ্জনটা হইচই, হট্টগোলের রূপ নিয়েছে। ধুপধাপ শব্দ, বাক্স-প্যাঁটরা টানাটানির আওয়াজ, চেঁচামেচি, চিৎকার। নিমেষে চারদিক চকিত হয়ে উঠল।

বিনু ভাবছিল পরশু দিন এই সময়টা তারা ছিল কলকাতায়, ভবানীপুরের বাড়িতে। দুপুর থেকে মালপত্র বাঁধাছাঁদা, গোছগাছ আরম্ভ হয়েছিল। তারপর সন্ধেবেলা শিয়ালদা গিয়ে ঢাকা মেল ধরেছে। কাল সকালে এসেছিল গোয়ালন্দ। সেখানে থেকে এই স্টিমারটায় পাড়ি জমিয়েছে। কাল রাত্তিরেই তাদের রাজদিয়া পৌঁছে যাবার কথা। কিন্তু বিপদ বাধিয়েছিল নদীর একটা চড়া। আট দশ ঘন্টার মতো স্টিমারটাকে আটকে রেখেছিল।

সে কি আজকের কথা! খুব ছেলেবেলায়, যেটাকে বলা যায় চেতনার প্রত্যুষ, সেই তখন থেকে রাজদিয়ার নাম শুনে আসছে বিনু।

বিনুর জন্ম কলকাতায়। পুবে বেলেঘাটা, পশ্চিমে বড় গঙ্গা, উত্তরে বাগবাজার, দক্ষিণে টালিগঞ্জ— কলকাতার চার সীমার ভেতর এত মজা, এত চমক, এত ঘটনার মেলা সাজানো যে যুগযুগান্ত কাটিয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু অবনীমোহন মানুষটা স্বভাব-যাযাবর, কোথাও যদি দু'টো দিন পা পেতে বসেন! হাতে ক'টা দিন ফালতু এসে গেল তো সংসার তুলে নিয়ে পাড়ি দিলেন রাজপুতানায় কি সৌরাষ্ট্রে, মগধে অথবা কোশলে। বার বছরের ছোট্ট জীবনে অনেক দেশ দেখেছে বিনু। ছোটনাগপুরের বনভূমি, দার্জিলিং-পাহাড়, কাশীর গঙ্গার ঘাট, প্রয়াগে কুম্ভমেলা, অজন্তার গুহায় গুহায় চমৎকার চমৎকার সব শিল্প এবং আরও কত কী। কিন্তু এত কাছের রাজদিয়াটাই শুধু দেখা হয় নি। অথচ কত আগেই না তারা এখানে আসতে পারত!

পুজোর সময়টা প্রতি বছর কলকাতায় দাদুর চিঠি যায়, তাঁর ইচ্ছা একবার অন্তত বিনুরা রাজদিয়ায় বেড়াতে আসুক। চিঠি এলেই মা বলতেন, 'চল না, এবার ওখানে ঘুরে আসি। ফি বছর যেতে লিখছেন।' বাবা বলতেন, 'এ বছরটা থাক। গিরিডিতে একটা বাড়ি ঠিক করে ফেলেছি। আসছে বার না হয় রাজদিয়া যাওয়া যাবে।' মায়ের ইচ্ছা-অনিচ্ছা এত ক্ষীণ যে বাবার ওপর দাগ কাটতে পারত না। দ্বিতীয় বার তিনি আর এ ব্যাপারে অনুরোধ করতেন না।

প্রতি বছর মায়ের রাজদিয়ামুখি মনটাকে অবনীমোহন একরকম জোর করে অমরকন্টকে, নৈনিতালে কিংবা মধুপুরের দিকে ফিরিয়ে দিতেন। এবার কী খেয়াল হয়েছে, টিকিট কেটে ঘর-সংসার তুলে নিয়ে ঢাকা মেলে গিয়ে উঠেছেন। বাবা হয়তো ভেবে থাকবেন, বৃদ্ধ মানুষটি বার বার অনুরোধ করেছেন অথচ একবারও যাওয়া হচ্ছে না, এটা উচিত নয়। অনুচিত তো বটেই, অন্যায়ও।

বিনু শুনেছে, দাদুর সঙ্গে সম্পর্কটা খুব কাছের নয়। মায়ের কিরকম মামা হন। কিন্তু কে বলবে তিনি আপনজন নন।

বার বছরের বিনু ক্লাস সেভেনে পড়ে। অনেক কিছু বুঝতে পারে সে। তার অনুভবের সীমা বহুদূর বিস্তৃত। দাদুর চিঠি সে পড়েছে। সেগুলোতে যে আন্তরিকতা, যে স্নেহপূর্ণ মাধুর্যের সুরটি থাকে, বিনুকে তা অভিভূত করেছে। কোনও দিন দাদুকে দেখে নি বিনু, তবু মনে হয়েছে তাঁর মতো মমতাময়, মধুর মানুষ জগতে খুব বেশি নেই। রাজদিয়া বার বার তাকে গোপনে হাতছানি দিয়ে গেছে।

দেখতে দেখতে রোদ উঠে গেল। সূর্যটা কোথায় লুকিয়ে ছিল, জলের তলার কোনও অজানা

রহস্যময় দেশ থেকে যেন হঠাৎ লাফ দিয়ে বেরিয়ে এসেছে। নরম সাদা রেশমের মতো যে কুয়াশার চাদরটা আকাশ এবং নদীকে আবছাভাবে ঢেকে রেখেছিল, এখন আর তা নেই। নদী জুড়ে কত যে ঢেউ! সোনার টোপর মাথায় দিয়ে তারা টলমল করে চলেছে। আকাশটা এতক্ষণে স্পষ্ট হয়েছে। আশ্বিনের অগাধ, অসীম নীলাকাশ।

নীলাকাশ কি আগে আর দেখে নি বিনু? কলকাতার আকাশ অবশ্য বার মাস ধুলোয় ঢাকা, ধোঁয়ায় মাখা। কিন্তু বাবার সঙ্গে যখন বাইরে বেড়াতে গেছে, নির্মল আকাশ কতবার তার চোখে পড়েছে। শিলং পাহাড়ের মাথায় যে আকাশ, লছমনঝোলায় যে আকাশ কিংবা চিরিমিরিতে যে আকাশ, সবই তো মনোরম। কিন্তু এখানকার মতোটি আগে আর কখনও দেখে নি বিনু। আকাশ যে এত উজ্জ্বল, এত ঝকঝকে, নীলকান্ত মণির মতো এমন দীপ্তিময় হতে পারে, কে জানত! তার গায়ে থোকা থোকা ভারহীন সাদা মেঘ জমে আছে। শরৎকালটা যেন তার সবটুকু বিস্ময় নিয়ে বিনুর সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

বিশাল রাজহাঁসের মতো দুলতে দুলতে গম্ভীর বাঁশি বাজিয়ে স্টিমারটা একসময় জেটিঘাটে গিয়ে ভিড়ল। সঙ্গে সঙ্গে নোয়াখালি জেলার মাল্লারা বিচিত্র সুর করে মোটা মোটা কাছি ছুড়ে দিতে থাকে। জেটিতে আরেক দল মাল্লা তৈরিই ছিল, কাছি লুফে মুহূর্তে লোহার থামে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে আষ্টে-পৃষ্ঠে বেঁধে ফেলল। বাঁধাছাঁদা হলে খালাসিরা কাঠের ভারী গ্যাংওয়ে ফেলে জেটির সঙ্গে স্টিমারটাকে জুড়ে দিল।

জেটিঘাটে অনেক মানুষ। গাদাগাদি করে উদ্‌গ্রীব দাঁড়িয়ে আছে। সবার চোখ এদিকে। এই স্টিমারে যারা এল, খুব সম্ভব তাদের নিতে এসেছে ওরা।

স্টিমারটা জেটিতে ভিড়বার আগে থেকেই চাঞ্চল্য শুরু হয়েছিল। এখন সেটা তুমুল হয়ে উঠেছে। রেলিঙের কাছে যে ভিড়টা ছিল, দ্রুত পাতলা হয়ে ডেকে, কেবিনে আর বাঙ্কে ছড়িয়ে পড়েছে। ওদিকে জেটি থেকে একদল হিন্দুস্থানী কুলি বর্গীর মতো হানা দিয়েছে। একটু পর কুলিদের মাথায় মালপত্র চাপিয়ে যাত্রীমিছিল গ্যাংওয়ে বেয়ে জেটির দিকে নামতে লাগল।

বিনুরা কিন্তু এখনও রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে আছে। কাছাকাছি আসতে পাড়টা পরিষ্কার দেখা গেল। জেটিঘাটের ডান দিকে নৌকোঘাট। ছইওলা প্রকান্ড প্রকান্ড কত যে নৌকো লগি পুঁতে সারি সারি দাঁড়িয়ে রয়েছে! এক সঙ্গে এত নৌকো আর এত বড় বড় নৌকো আগে কখনও দেখে নি বিনু। ওপরে উঁচু বাঁধের মতো রাস্তায় চেরা বাঁশের বেড়া আর টিনের চালের অগুনতি দোকান। কিসের দোকান বোঝা যাচ্ছে না। লোকজন, কদাচিৎ দু'একটা সাইকেল চোখে পড়ছে।

সুধা অস্থির হয়ে উঠল, 'সবাই নেমে গেল। বাবা, আমরা স্টিমারে পড়ে থাকব নাকি?'

'চাইলেও থাকতে দেবে না রে।' অবনীমোহন হাসলেন, 'একটু দাঁড়া, হুড়োহুড়িটা কমুক। তারপর নামব।'

স্টিমার ফাঁকা হয়ে এলে বিনুদের নিয়ে কেবিনে ফিরলেন অবনীমোহন। সুরমা নিজের বিছানায় বসে আছেন। চোখ দু'টি জানালার বাইরে ফেরানো। কখন তাঁর ঘুম ভেঙেছে, টের পাওয়া যায় নি।

সুরমা সুধা, সুনীতি আর বিনুর মা। বয়স চল্লিশ বেয়াল্লিশ, এক-আধ বছর বেশিও হতে পারে। তিনি যে সুধা সুনীতির মা, বলে দিতে হয় না। পানপাতার মতো অবিকল সেই মুখ, সেই রকম টানা টানা চোখ, থাক থাক কোঁচকানো চুল, সরু চিবুকে তেমনি ভাঁজ। নিজের চেহারার নিজের সুষমার সবটুকুই অকাতরে তিনি মেয়েদের দিয়ে দিয়েছেন, আলাদা করে কিছুই রাখেন নি। একটা জিনিসই শুধু তাঁর নেই যা সুধা সুনীতির আছে, সেটা স্বাস্থ্য।

জ্ঞান হবার পর থেকে মা'কে কোনও দিন সম্পূর্ণ সুস্থ দেখে নি বিনু। সারাদিনই প্রায় শুয়ে থাকেন। হাঁটাহাঁটি, সংসারের কাজকর্ম, সব বারণ। কথা বলতে কষ্ট হয়। একটু-আধটু যাও বলেন তা ফিসফিসিয়ে, আধফোটা গলায়। গায়ে মাংস নেই, হাত-পা আর কণ্ঠার হাড় বেরিয়ে পড়েছে। রোগা দুর্বল শরীরে রেখাময়, শিথিল চামড়া। গায়ের রং একসময় ছিল পাকা সোনা, এখন মোমের মতো ফ্যাকাসে। চোখের কোলে রক্তের লেশ নেই, কাগজের মতো তা সাদা। দৃষ্টি কেমন যেন

ক্লান্ত, দীপ্তিহীন। তাকিয়ে থাকতেও তাঁর বুঝি কষ্ট হয়। সুরমাকে ঘিরে জীবনের এতটুকু লাবণ্যও আর ঝলমল করে না, তার সব আলো সব আভা নিবে গেছে।

বিনু শুনেছে, তার জন্মের এক বছর পর একটা ভাই হয়েছিল। দু'মাসের বেশি সে বাঁচে নি। নিজেও মরেছে, মা'কেও মেরে রেখে গেছে। অনেক দিন ভুগবার জন্যই বোধ হয় মায়ের ওপর গাঢ় মলিন ছায়া অনড়।

স্ত্রীকে ভাল করে দেখে নিয়ে অবনীমোহন বললেন, 'এ কী!'

'কী বলছ!' জানালার বাইরে থেকে চোখ দু'টি ভেতরে নিয়ে এলেন সুরমা।

'মুখটুখ ধুয়েছ দেখছি, জল পেলে কোথায়?'

কেবিনে জলের ব্যবস্থা নেই। তার জন্য অনেকটা ঘুরে ইঞ্জিন-ঘরের কাছে যেতে হয়। সুরমা জানালেন, সেখান থেকেই হাতমুখ ধুয়ে এসেছেন।

বকুনির সুরে অবনীমোহন বললেন, 'একা একা অতটা রাস্তা তোমার যাওয়া উচিত হয় নি। দুর্বল শরীর, পড়ে টড়ে গেলে এক কান্ডই হত।'

সুরমা বললেন, 'আজ আমার শরীর খুব ভাল লাগছে। জানো, এতখানি গেছি এতখানি এসেছি, কিন্তু একটুও হাঁপাই নি।'

অর্ধেক আনন্দের সঙ্গে অর্ধেক বিস্ময় মিশিয়ে অবনীমোহন বললেন, 'সত্যি বলছ!'

'হ্যাঁ, সত্যি।'

'যাক, পা দিতে না দিতেই রাজদিয়া টনিকের কাজ শুরু করে দিয়েছে। তোমার স্বাস্থ্য ফেরাবার জন্যে কত জায়গায় নিয়ে গেছি, কিছুই হয় নি। রাজদিয়া যদি তোমাকে আগের মতো সুস্থ করে দেয়, বুঝব এমন জায়গা পৃথিবীতে নেই।'

সুরমা বোধ হয় অবনীমোহনের কথা শুনতে পেলেন না। আপন মনে বললেন, 'কত কাল পর এখানে এলাম। কী ভাল যে লাগছে!' তাঁর ছায়াচ্ছন্ন, ক্লান্ত চোখে একটুখানি আলো যেন ফুটিফুটি করছে।

ধীরে সুস্থে জিনিসপত্র গুছিয়ে দু'টো কুলি ঠিক করলেন অবনীমোহন, তাদের জিম্মায় সেসব দিয়ে স্ত্রীর দিকে ফিরলেন, 'অনেকখানি যেতে হবে, তোমার হাত ধরে নিয়ে যাই?'

সুরমা বললেন, 'হাত ধরতে হবে না, আমি এমনিই যেতে পারব।'

'ঠিক পারবে তো?'

'হ্যাঁ গো, হ্যাঁ।'

আগে আগে সুরমা চললেন, তারপর সুধা সুনীতি, একেবারে শেষে অবনীমোহন আর বিনু।

একটু পর গ্যাংওয়ে পেরিয়ে সবাই জেটিতে এসে পড়ল। জেটিঘাটের ভিড় এখন হালকা হয়ে গেছে। দু'চারটি উৎসুক মুখ শুধু এদিকে সেদিকে ছড়ানো। বিনু চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চারপাশ দেখতে লাগল। যে অল্প ক'টি লোক এখনও রয়েছে তার ভেতর কোন্ মানুষটি দাদু, বুঝতে পারা যাচ্ছে না। আদৌ তিনি এসেছেন কিনা, কে জানে।

বেশি দূর যেতে হল না। জেটিঘাটের মাঝামাঝি আসতে চোখে পড়ল, একজন বৃদ্ধ উন্মুখ হয়ে প্রতিটি যাত্রীকে লক্ষ করছেন। তাঁর পাশে আট ন' বছরের ছোট একটি মেয়ে।

বুড়ো মানুষটির গায়ের রং কালো। মাঝারি চেহারা, মাথাটা বকের পাখার মতো ধবধবে, মুখময় তিন চারদিনের জমানো দাড়ি। এত বয়সেও মেরুদণ্ড একেবারে সোজা। দু'চোখ স্নেহের রসে যেন ভাসো ভাসো, এখন অবশ্য কিছুটা উৎকণ্ঠিত। চুলের রং বদল, শরীরে কিছু ভার নামানো আর চামড়ায় এলোমেলো আঁচড় কাটা ছাড়া সময় তেমন কিছুই করে উঠতে পারে নি। এত বয়সেও শরীর বেশ শক্তই আছে। স্বাস্থ্যের ভিত রীতিমতো মজবুত। বৃদ্ধকে ঘিরে এমন এক সরলতা মাখানো যাতে মনে হয়, তাঁর বয়স্ক দেহের ভেতর চিরকালের এক শিশুর বাস। পরনে খাটো ধুতি, খদ্দরের ফতুয়া, পায়ে লাল ক্যাম্বিসের জুতো।

ছোট মেয়েটির চুল কোঁকড়া কোঁকড়া। নাকটি একটু বোঁচাই হবে। ফুলো ফুলো নরম লালচে গাল। রুপোর কাজললতার মতো চোখের কালো মণি দু'টো টলটল করছে। একটু নাড়া দিলেই

pathagar.net

টুপ করে ঝরে পড়বে। নীল ফ্রক লাল জুতোয়, মনে হয়, মোমের পুতুলটি।

সুরমা খুব আস্তে আস্তে পা ফেলছিলেন। চলতে চলতে বৃদ্ধটির কাছে এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। একটুক্ষণ তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে ঝুঁকে তাঁর পা ছুঁলেন।

বৃদ্ধের চোখ আলো হয়ে উঠল। তাড়াতাড়ি সুরমাকে তুলে চিবুকে হাত রেখে বললেন, 'আমার রমু না?'

'হ্যাঁ, মামা।' সুরমা মাথা নাড়লেন।

বিনু এই প্রথম জানতে পারল, একটা আদরের নাম আছে মায়ের—রমু।

বৃদ্ধ বললেন, 'আসতে পারলি তবে! কত বছর ধরে চিঠি লিখছি!' তাঁর স্বরে স্নেহের সঙ্গে অনুযোগ মেশানো।

'কী করব বল—' সুরমা বললেন, 'কত রকম ঝামেলা—'

'ঝামেলা তো হিল্লিদিল্লি যাস কী করে? এখানে আসতেই যত কষ্ট!'

অস্ফুট গলায় সুরমা কী একটা উত্তর দিলেন, কেউ শুনতে পেল না।

বৃদ্ধ বললেন, 'কতকাল পর তোকে দেখলাম। সেই বিয়ের সময় শেষ দেখা। তখন তুই একেবারে ছেলেমানুষ। ক'বছর বয়েসে যেন বিয়ে হয়েছিল তোর?'

লাজুক সুরে সুরমা বললেন, 'সতের।'

বৃদ্ধ বললেন, 'সে কি আজকের কথা! তুই নিজে এসে না বললে চিনতেই পারতাম না। মুখের আদল টাদল, চেহারা, কত বদলে গেছে!'

সুরমা হাসলেন।

বৃদ্ধ আবার বললেন, 'স্টিমার থেকে কত লোক নেমে গেল কিন্তু কেউ আমার কাছে দাঁড়াচ্ছে না। এত লোকের ভিড়ে কে যে আমার রমু বুঝতে পারছি না। একবার তো ভাবলাম, তোরা এবারও এলি না।' বলতে বলতে হঠাৎ সচেতন হয়ে উঠলেন যেন, 'তোর চেহারার এ কী হাল হয়েছে!'

সুরমা মলিন হাসলেন, 'ক'বছর ধরে সমানে ভুগছি। ছোট ছেলেটা হবার পর থেকে শরীর একেবারে ভেঙে গেছে। নিজেও সে বাঁচল না, আমাকেও জন্মের মতো পঙ্গু করে রেখে গেল।'

'ইস, কী স্বাস্থ্য ছিল আর কী দাঁড়িয়েছে! ক'খানা শুকনো হাড় ছাড়া কিছুই তো নেই। তা বাপু এই যে এলে, শরীর টরীর সারিয়ে নাও। তারপর যাবার কথা মুখে আনবে।'

সুরমা কিছু বললেন না। মৃদু একটু হাসি তাঁর মুখে আবছাভাবে লেগে রইল।

বিনু বুঝে ফেলেছে, এই বুড়ো মানুষটিই তার দাদু। চিঠি পড়ে দাদুর নামটা সে জেনেছে—হেমনাথ মিত্র।

হেমনাথ হঠাৎ অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, 'ওই দেখ, কী ভুলো মন আমার! মেয়েকে নিয়েই মেতে আছি। অবনীমোহন কোথায়? আমার দাদা আর দিদিভাইরা?'

অবনীমোহন সামনে এগিয়ে এসে প্রণাম করলেন। হেমনাথ বললেন, 'বেঁচে থাকো বাবা, শতায়ু হও।'

অবনীমোহন বললেন, 'আপনার শরীর কেমন আছে মামাবাবু?'

'খুব ভাল। অসুখ বিসুখ আমার কাছে বড় একটা ঘেঁষে না। লাস্ট টেন ইয়ারসে দু'বার মোটে জ্বর হয়েছিল। তার আগে কিছু হয়েছিল কিনা, মনে নেই। সে যাক, তোমরা কেমন আছ বল।'

'আমরা খুব খারাপ নেই, তবে আপনার ভাগনীকে নিয়ে বিপদে পড়েছি।'

'তা তো দেখতেই পাচ্ছি।'

অবনীমোহন কিছু বললেন না।

হেমনাথ বললেন, 'রাস্তায় আসতে কষ্ট-টষ্ট হয় নি তো?'

'ট্রেনে ভালই এসেছিলাম। তবে স্টিমার চড়ায় ঠেকে যাওয়ায় ঘন্টাকয়েক আটকে থাকতে হয়েছিল।'

হেমনাথ বললেন, 'কাল একবার স্টিমারঘাটে এসেছিলাম, চড়ায় আটকাবার কথা শুনে গেছি। সুজনগঞ্জের ভাটিতে ক'বছর ধরে মস্ত চর পড়ছে। প্রায়ই স্টিমার ওখানে আটকে যায়।'

একটু কী ভেবে অবনীমোহন বললেন, 'মামীমা কেমন আছেন?'

সুরমা এতক্ষণ চুপ করে ছিলেন। তাঁর স্বভাবের রং মৃদু। খুব আস্তে আস্তে আধফোটা, আধবোজা গলায় কথা বলেন। নিজের দুর্বল শরীর, ক্ষীণ জীবনীশক্তি, সব ভুলে গিয়ে এখন প্রায় চেঁচামেচিই শুরু করলেন, 'তাই তো, মামীমাকে দেখতে পাচ্ছি না। স্টিমারঘাটে এল না যে! শরীর খারাপ হয় নি তো?'

'না, ভালই আছে।' হেমনাথ বললেন, 'তোরা আসবি, তাই ভোরবেলা উঠেই রান্নবান্না নিয়ে মেতেছে।' বলতে বলতে হঠাৎ কী লক্ষ করে বললেন, 'এ কি অবনী!'

হেমনাথের স্বরে বিস্ময় ছিল। অবাক হয়ে অবনীমোহন বললেন, 'আজ্ঞে—'

'তোমার চুল এর ভেতরেই পাকতে শুরু করেছে দেখছি। এটা কিরকম হল!'

'আজ্ঞে, পঞ্চাশ বছর প্রায় পেরুতে চললাম—'

'উঁহু উঁহু, যত বয়েসই হোক, বাপ-খুড়ো মামা-জেঠা, গুরুজনরা বেঁচে থাকতে ছেলেমেয়েদের চুল পাকতে নেই।'

অবনীমোহন নিঃশব্দে হাসলেন। অন্যরাও হেসে উঠল।

হেমনাথ কী বলতে যাচ্ছিলেন, তার আগেই সুরমা বলে উঠলেন, 'মামা, তুমি কিন্তু মেয়ে-জামাই পেয়ে সব ভুলে গেছ। তোমার দাদা আর দিদিভাইরা—'

হেমনাথ ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, 'আরে তাই তো। কোথায় ওরা?'

সুধা আর সুনীতি এগিয়ে এসে প্রায় একই সঙ্গে প্রণাম করল।

পায়ের কাছ থেকে উঠে দাঁড়াতেই আঙুলের ডগায় দু'জনের মুখ তুলে ধরে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কিছুক্ষণ দেখলেন হেমনাথ। তারপর মুগ্ধ গলায় বললেন, 'বাঃ বাঃ! তুমি নিশ্চয়ই সুধাদিদি আর তুমি সুনীতিদিদি।'

হেমনাথ ঠিক ঠিক চিনতে পেরেছেন। বাইশ চব্বিশ বছর দেখাসাক্ষাৎ ছিল না, তবে চিঠিপত্রে ভাগনীর সঙ্গে যোগাযোগ ছিল। নিজের সন্তানদের কে কিরকম দেখতে হয়েছে, কার স্বভাব কেমন, পড়াশোনায় কে ভাল কে মন্দ, সব কথা মামাকে জানানো চাই সুরমার।

সুধা বলল, 'হ্যাঁ, আমি সুধাই।'

সুনীতি বলল, 'আমি সুনীতি। কিন্তু চিনলেন কেমন করে?'

হেমনাথ বললেন, 'সে একটা মন্তর আছে, তাই দিয়ে চিনে ফেলেছি।' আঙুলের প্রান্তে চিবুক ধরাই ছিল। হঠাৎ চোখে মুখে দুর্ভাবনার রেখা ফুটিয়ে হেমনাথ বললেন,'তোমরা এসেছ, এর চাইতে আনন্দের আর কিছু নেই। কিন্তু দিদিভাইরা, একটা মুশকিলে ফেলে দিলে যে।'

'কী মুশকিল দাদু?' সুনীতিকে ঈষৎ উদ্বিগ্ন দেখাল।

'তোমার হলে দু'জন, আর ঘরে আছেন একজন। এই তিনজনের ভেতর এখন কাকে যে পাটরানী করি! শেষ পর্যন্ত একটা গৃহযুদ্ধ না বেধে যায়।'

সুনীতি কিছু বলল না। মুখ টিপে হাসতে লাগল।

সুধা কিন্তু ঝঙ্কার দিয়ে উঠল, 'বুড়ো থত্থুড়ে। আব্দার কত! আপনার পাটরানী হতে আমার বয়েই গেছে।'

আমুদে গলায় হেমনাথ বললেন, 'বুড়ো বলে দাগা দিলে ভাই।'

কলকল করে সুধা কী বলতে যাচ্ছিল, সেই সময় ভিড় ঠেলে বিনু হেমনাথের পা ছুঁল। চকিত হেমনাথ বললেন, 'কে রে? কে রে?' পরক্ষণেই চওড়া বিশাল একখানা বুকের ভেতর ধরা পড়ে গেল বিনু।

সুরমা বললেন, 'ও তোমার দাদাভাই মামা। সবার সঙ্গে কথা বলছ, গল্প করছ, ওর দিকে একবারও তাকাচ্ছ না। এ কি সহ্য হয়? তাই নিজেই আলাপ টালাপ করে নিতে এগিয়ে এসেছে। হিংসের একখানা পুঁটুলি।'

'ভারি অন্যায় হয়ে গেছে। সবার আগে দাদাভাইয়ের সঙ্গে আলাপ করা উচিত ছিল।' বুকের ভেতর থেকে বার করে এনে বিনুকে দু'হাতে ওপরে তুলে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগলেন হেমনাথ।

pathagar.net

যেভাবে হেমনাথ ঘোরাচ্ছেন ফেরাচ্ছেন তাতে বিনুর মনে হল, এই বয়সেও মানুষটি যুবকের মতো শক্তিমান।

হেমনাথ বললেন, 'দাদাভাইয়ের নামটা যেন কী?'

সুরমা বললেন, 'বিনু।'

বিনু গম্ভীর গলায় বলল, 'বিনয়কুমার বসু।'

'ঠিক ঠিক। হেলাফেলা করে ন্যাড়া বোঁচা একটা নাম বললেই হল? তার সঙ্গে গয়না-টয়নাগুলো জুড়ে দিতে হবে না?' বলে বিনুর দিকে তাকালেন হেমনাথ। কৌতুকে তাঁর চোখ ঝকমক করছে। বললেন, 'আমার ইচ্ছে, নামটা একেবারে জেনারেলিসিমো বিনয়কুমার বসু হোক। কি, পছন্দ তো?'

জেনারেলিসিমো শব্দটা বিনুর অজানা। তবু মনে হল, ওটার মধ্যে ঠাট্টা আছে। সে লজ্জা পেয়ে গেল।

হেমনাথ আবার বললেন, 'দাদাভাইকে তো বীরপুরুষের মতো দেখতে, বাঘ মারতে পার?'

বিনু উত্তর দিতে যাচ্ছিল, সুধা হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, 'বাঘ! জানো দাদু, সেবার ছোটনাগপুরে খরগোশ দেখে ও অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল।'

ছোটদিটা চিরকালের বিভীষণ। ঠিক সময়টিতে শত্রুতা করবার জন্য সে যেন ওত পেতেই আছে। বিনুর ইচ্ছা হল, সুধার বেণী ধরে কষে টান লাগিয়ে দেয়। কিন্তু সব দিক বিবেচনা করে সদিচ্ছাটাকে এই মুহূর্তে কাজে লাগানো গেল না। পারলে অবশ্য সুধাকে ভস্মই করে ফেলত। কটমট করে একবার তাকিয়ে আপাতত বিনুকে নীরব থাকতে হল।

হেমনাথ জিজ্ঞেস করলেন, 'কোন ক্লাসে পড়?'

বিনু বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই মনে হল, প্যান্ট ধরে কে টানছে। টানটা অনেকক্ষণ ধরেই অবশ্য টের পাওয়া যাচ্ছিল, বিনু খেয়াল করে নি। তলার দিকে তাকাতেই দেখতে পাওয়া গেল। সেই মেয়েটা—কোঁকড়া কোঁকড়া যার চুল, লালচে ফুলো ফুলো গাল, রুপোর কাজললতার মতো চোখ—ছোট মুঠিতে শরীরের সবটুকু শক্তি দিয়ে তার প্যান্টের নিচের দিকটা ধরে আছে।

চোখাচোখি হতেই মেয়েটা আরও জোরে টান লাগাল। ফিসফিসিয়ে বলল, 'নামো, নামো বলছি।'

হেমনাথ বোধ হয় লক্ষ করেছিলেন। গলার স্বরে লম্বা টান দিয়ে বললেন, 'ওরে হিংসুটে, দাদাকে নামতে বলা হচ্ছে!'

আগের মতো সুর করে মেয়েটা এবার হেমনাথকে বলল, 'ওকে নামিয়ে দাও, শিগগির নামিয়ে দাও—'

হেমনাথ বললেন, 'কেন, নামাব কেন?'

বিনুর প্যান্ট ধরে মেয়েটা টানছিলই। বলল, 'আমি তোমার কোলে উঠব।'

'দুষ্টু বদমাশ মেয়ে, আমার কোলটা একেবারে মৌরুসিপাট্টা করে নিয়েছ!'

মেয়েটা কী বুঝল, সে-ই জানে। জোরে জোরে চুল ঝাঁকিয়ে সমানে বলতে লাগল, 'নামিয়ে দাও, নামিয়ে দাও—'

সুধা-সুনীতি-সুরমা-অবনীমোহন, সবাই সকৌতুকে দেখছিলেন। সুরমা বললেন, 'মেয়েটা কে গো মামা? এতক্ষণ খেয়াল করি নি—একেবারে জাপানি পুতুল। আর কেমন পুটুর পুটুর কথা বলছে।'

'ওর নাম ঝিনুক।' হেমনাথ বললেন, 'ভবতোষকে তোর মনে আছে?'

'কোন ভবতোষ?'

'লাহিড়ীবাড়ির ভবতোষ। রাজেন লাহিড়ীর ছেলে।'

চোখ কুঁচকে ভাবতে চেষ্টা করলেন সুরমা। স্মৃতির ঝাঁপি খুলতে পারলেন কিনা, বোঝা গেল না। অনিশ্চিতভাবে বললেন, 'নামটা চেনা চেনা লাগছে, মুখটা মনে করতে পারছি না। কতকাল আগে রাজদিয়াতে এসেছিলাম, সে কি আজকের কথা!'

হেমনাথ বললেন, 'ঝিনুক ভবতোষের মেয়ে।'

সুরমা কোমল গলায় ডাকলেন, 'এস ঝিনুক, আমার কাছে এস।'

'তোমার কাছে যাব না।' জেদী স্বরে বায়না জুড়ে দিল ঝিনুক, 'আমি দাদুর কোলে উঠব, দাদুর

কোলে উঠব।'

এই মনোরম ছেলেমানুষির খেলাটা আরও কিছুক্ষণ হয়তো চলত। কিন্তু তার আগেই হিন্দুস্থানী কুলিরা চেঁচিয়ে উঠল, 'চলিয়ে বাবুজি, বহুত দের হো যাতা—' সুরমারা হেমনাথকে দেখে দাঁড়িয়ে গেছে কুলিরাও দাঁড়িয়ে পড়েছিল। এখন তারা অস্থির হয়ে উঠেছে।

হেমনাথ যেন এতক্ষণে স্থান-কাল সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠলেন, 'ওই দেখ, জেটিঘাটে দাঁড়িয়েই লম্ফ জুড়ে দিয়েছি। চল চল—'আস্তে আস্তে তিনি বিনুকে নামিয়ে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে কাণ্ডটা ঘটল, লম্ফ দিয়ে ঝিনুক তাঁর কোলটি দখল করে বসল। তারপর বিজয়িনীর মতো সগর্বে একবার বিনুর দিকে তাকাল।

বিনুর ইচ্ছা হল, পা ধরে টেনে মেয়েটাকে নামিয়ে দেয়। অস্পষ্টভাবে মনে হল, দাদুকে খুব সহজে দখল করা যাবে না।

ঝিনুককে কোলে নিয়েই চলতে শুরু করলেন হেমনাথ। বিরক্ত গলায় বললেন, 'তোকে নিয়ে পারি না ঝিনুক—' হেমনাথের বিরক্তি যে স্নেহেরই আরেক নাম তা বলে দিতে হয় না।

হেমনাথ আগে আগে চলেছেন। সুরমারা তাঁর পিছু পিছু এগুতে লাগলেন।

যেতে যেতে হেমনাথ পেছন ফিরলেন। আলতো গলায় ডাকলেন, 'রমু—'

'কী বলছ মামা?' সুরমা উৎসুক চোখে তাকালেন।

'এই ঝিনুকটা, বুঝলি—' গাঢ়, বিষাদময় স্বরে হেমনাথ বললেন, 'বড় দুঃখী রে, বড় দুঃখী—'

সুরমার চোখেমুখে উৎকণ্ঠা ফুটল। বললেন, 'দুঃখী! কেন?'

খুব আস্তে আস্তে হেমনাথ বললেন, 'পরে বলব। এসেছিস যখন সব জানতে পারবি।'

সুরমা আর কিছু জিজ্ঞেস করলেন না।

বার বছরের বিনু 'দুঃখী' শব্দটা জানে। চকিতে সে একবার ঝিনুককে দেখে নিল।

স্টিমারঘাটের বাইরে আসতেই বিনুরা দেখতে পেল, উঁচু রাস্তার ওপর পর পর দু'খানা ফিটন দাঁড়িয়ে। একটা গাড়ি বেশ নতুন, ঝকঝকে। যে ঘোড়াটা তাকে টানে সেটা চমৎকার। স্বাস্থ্যে আর লাবণ্যে ঝলমল করছে। ঘাড়ের কাছে কেশরগুলো সগর্বে ফুলে আছে। সারা গা বাদামি রঙের চকচকে চিকন লোমে ঢাকা, দেহ মসৃণ। মনে হয়, তেল গড়িয়ে পড়বে। ঘোড়াটা এত চঞ্চল আর সজীব যে এক মুহূর্ত স্থির হয়ে নেই। সমানে পা ঠুকে যাচ্ছে।

অন্য গাড়িটা অনেক দিনের পুরনো। ছাদ, কোচোয়ানের বসবার জায়গা, রেকাব প্রায় সবই ভেঙেচুরে গেছে। গাড়ির মতো তার বাহনটিরও দশা খুবই করুণ। কোমর নেই বললেই হয়। লোম উঠে উঠে কত জায়গায় যে চামড়া বেরিয়ে পড়েছে! পাঁজরার হাড় একটা একটা করে গুনে নেওয়া যায়। ঘোড়াটা এত বয়স্ক, নির্জীব আর অবসন্ন যে দাঁড়িয়ে থাকতেও তার বড়ই কষ্ট।

দু'খানা গাড়িরই চালকের সিটে লোক বসে আছে। নতুন গাড়ির কোচোয়ানটি যুবক। ছিমছাম চেহারা, চুলের ছাঁট এবং লুঙ্গির নকশা বেশ বাহারি। দ্বিতীয় গাড়িটার জীর্ণতার সঙ্গে মিলিয়ে তার কোচোয়ান বেশ বুড়ো, রুগ্‌ণ। পরনে নোংরা লুঙ্গি, চিটচিটে গেঞ্জি, কাঁধে ময়লা গামছা।

হেমনাথ বললেন, 'মালপত্তর সব গাড়িতে তুলে দে।'

কুলিরা সিটের ওপরেই দুমদাম বাক্স-প্যাঁটরা ফেলে ভাড়া মিটিয়ে নিয়ে জেটিঘাটের দিকে ছুটল।

হেমনাথ বললেন, 'ব্যাটারা কেমন ছড়িয়ে রেখে গেল দেখ। লোকে বসে কোথায়?' বলে কোল থেকে ঝিনুককে নামিয়ে টানাটানি করে মালপত্র গোছগাছ করতে লাগলেন। অবনীমোহনও তাঁর সঙ্গে হাত লাগালেন।

বাক্স টাক্স সাজিয়ে রাখতে রাখতে হেমনাথ বললেন, 'হিরণটাকে স্টিমারঘাটে আসতে বলেছিলাম।

সে এলে এসব তার ঘাড়েই চাপানো যেত। বাবু বোধহয় আসার কথা ভুলেই গেছে।'

সুরমা বললেন, 'হিরণ কে গো মামা?'

'দত্তবাড়ির দ্বারিক দত্ত'র নাতি।'

সুরমা আর কিছু জিজ্ঞেস করলেন না। দ্বারিক দত্তর নাতিকে চিনতে পারেলেন কিনা বোঝা গেল না।

লটবহর সাজানো হলে হেমনাথ বললেন, 'উঠে পড় সব, উঠে পড়—'

নতুন গাড়িটা বেশ বড়সড়। ভেতরে অনেক জায়গা। সুরমা বিনু অবনীমোহন ঝিনুক আর হেমনাথ সেটায় উঠলেন। সুধা সুনীতি অন্যটায়।

গাড়িতে উঠবার পর ঝিনুক হেমনাথের কোলে বসল। তাকে নামাতে চেষ্টা করেও পারলেন না হেমনাথ। তাঁর ভাগ খুব সহজে, বিনা যুদ্ধে আর কাউকে ঝিনুক দেবে, এমন মনে হয় না। ফিটন চলতে শুরু করেছিল। জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে হেমনাথ চেঁচিয়ে বললেন, 'বাজারের কাছে গাড়িটা একটু থামাস রসুল—'

ওপর থেকে পূর্ববঙ্গীয় টানে কোচোয়ানের গলা ভেসে এল, 'আইচ্ছা বড়কত্তা—'

স্টিমার থেকে বিনুর চোখে পড়েছিল, নদীর ধারটা বাঁধের মতো উঁচু। তার ওপর দিয়ে খোয়া-বিছানো রাস্তা সোজা উত্তরে চলে গেছে। ফিটন দু'টো সেই রাস্তা ধরে এখন ছুটছে।

খানিক যাবার পর সুরমার গলা শোনা গেল। আস্তে করে তিনি ডাকলেন, 'মামা—'

হেমনাথ তক্ষুনি সাড়া দিলেন, 'কী বলছিস রমু?'

'বিয়ের আগে আমি যখন রাজদিয়া এসেছিলাম তখন তো তোমার ফিটন ছিল না।'

'না।'

'কবে কিনেছ?'

'পা দু'টো থাকতে ফিটন কিনতে যাব কোন দুঃখে?' হেমনাথ বলতে লাগলেন, 'তোর নিশ্চয়ই মনে আছে, আমি চিরকালের পদাতিক। এখনও দিনে পাঁচ সাত মাইল না হাঁটলে পেটের ভাত হজম হয় না।'

সুরমা বললেন, 'মনে থাকবে না? খুব আছে। গাড়িঘোড়া চড়া তোমার ধাতেই নেই। যদ্দুর জানি, রাজদিয়াতে ভাড়ার গাড়ি পাওয়া যায় না। এই ফিটন দু'টো তবে—'

সুরমার কথার মধ্যে অনুচ্চারিত একটা প্রশ্ন ছিল। হেমনাথ বুঝলেন। বললেন, 'এ দু'টো আমার না। একটা ঝিনুকদের, আরেকটা লালমোহনের। তোরা আসবি বলে ওদের কাছ থেকে চেয়ে এনেছি।'

'লালমোহন!'

'হ্যাঁ রে—'

'কোন লালমোহন বল তো?' হেমনাথের দিকে অনেকখানি ঝুঁকলেন সুরমা। তাঁর চোখেমুখে, কণ্ঠস্বরে কৌতূহল।

'তুই কি চিনবি? ওর আসল নাম তো লালমোহন সা—ডেভিড লারমোর। এ দেশের লোক লারমোর উচ্চারণ করতে পারে না, বলে লালমোহন। ও আমার অনেক কালের বন্ধু।'

'চিনব না, বল কী! কী চমৎকার মানুষ লালমোহন মামা! বিয়ের আগে তোমার কাছে এসে কিছুদিন থেকে গেছি, তখন আলাপ হয়েছিল। একবার আলাপ হলে ওঁকে কি কেউ ভুলতে পারে! সব সময় হাসিমুখ। কথা থেকে চাউনি থেকে, স্নেহ যেন ঝরে পড়ছে।' সুরমা বললেন, 'উনি রাজদিয়াতে আছেন?'

হেমনাথ বললেন, 'আছে বৈকি। পঁচিশ বছর বয়েসে আয়ার্ল্যান্ড থেকে এসেছিল, এখন ওর বয়েস পঁয়ষট্টি। চল্লিশ বছর ও ইস্টবেঙ্গলে কাটিয়ে দিল। এর ভেতর একবারও দেশে যায় নি।'

অবনীমোহন এতক্ষণ চুপ করে ছিলেন। হঠাৎ বললেন, 'এ দেশকেই বোধ হয় নিজের দেশ করে নিয়েছেন।'

হেমনাথ বললেন, 'ঠিক বলেছ। জন্মভূমির কথা ও একরকম ভুলেই গেছে। সেখানে আত্মীয়স্বজন কেউ আছে কিনা, লারমোর বলতে পারবে না। যৌবনে ক্রিশ্চানিটি প্রিচ করতে বাংলাদেশের এই

pathagar.net

প্রান্তে এসেছিল। কর্মভূমিই এখন ওর স্বদেশ। আয়ার্ল্যান্ডের চাইতেও ইস্টবেঙ্গল ওর কাছে অনেক বেশি আপন।'

সুরমা বললেন, 'আমার কথা কি লালমোহন মামার মনে আছে?'

'খুব আছে।' হেমনাথ বলতে লাগলেন, 'তোর কথা কত বলে। আসবি শুনে তো নেচে উঠেছিল।'

'স্টিমারঘাটে উনি এলেন না তো?'

'সুজনগঞ্জে আজ হাট আছে। ভোরবেলা উঠে সেখানে চলে গেছে। দেখিস, রাত্তিরে ফিরেই ছুটে আসবে।'

সুরমা কী বলতে যাচ্ছিলেন, ফিটনটা হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। ওপর থেকে রসুল বলল, 'বাজার আইস্যা গ্যাছে বড়কত্তা।'

হেমনাথ বললেন, ' তোরা একটু ব'স, এক্ষুনি আসছি।' গাড়ির দরজা খুলে তিনি নেমে গেলেন। বিনুক সঙ্গ ছাড়ে নি। কোলে ঝুলতে ঝুলতে সেও গেল। জানালা দিয়ে বিনু দেখতে পেল, চেরা বাঁশ আর হোগলায় ছাওয়া সেই দোকানগুলো সারি সারি দাঁড়িয়ে আছে। স্টিমার থেকে বোঝা যায় নি, কাছে আসতে টের পাওয়া গেল, ওগুলো মিষ্টির দোকান। কাচের আলমারির ভেতর বড় বড় গামলাভর্তি রসগোল্লা আর প্রকাণ্ড পেতলের থালায় মাখা সন্দেশ স্তূপাকার হয়ে আছে। কয়েকটা দোকানে হলুদ রঙের অসংখ্য কলার ছড়া ঝুলছে।

একটু পর মস্ত মাটির হাঁড়ি আর কলার ছড়া হাতে ঝুলিয়ে হেমনাথ ফিরে এলেন। হাঁড়িটার মুখ কলাপাতা দিয়ে বাঁধা। নিজের জায়গায় বসতে বসতে বললেন, 'আমাদের রাজদিয়া রসগোল্লার জন্যে ফেমাস। দাদাভাই আর দিদিভাইদের জন্যে নিয়ে এলাম।'

অবনীমোহন হঠাৎ বললেন, 'কিরকম দর?'

'ছ'আনা সের।'

'মোটে!'

'বছরখানেক আগেও তিন আনা, চোদ্দ পয়সা ছিল। এখন তো দাম বেড়ে গেছে।'

'ছ'আনা রসগোল্লার সের! এখানে না এলে এত শস্তা কল্পনাও করতে পারতাম না।'

হেমনাথ হাসলেন, 'একেই শস্তা বলছ! ফার্স্ট গ্রেট ওয়ারের আগে এই রাজদিয়ার বাজারে তিন পয়সা সের রসগোল্লা কিনেছি। দেখতে দেখতে ক'বছরে তার দাম ছ'আনায় উঠেছে। আরেকটা লড়াই ভাল করে বাধলে দাম যে কোথায় চড়বে, কে জানে।' বলতে বলতে হঠাৎ কী মনে পড়ে গেল, 'হ্যাঁ, ভাল কথা—'

অবনীমোহন জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালেন।

হেমনাথ বললেন, 'ইউরোপে যুদ্ধ বেধেছে। কাগজে তার খবর পড়ছি। এদেশেও নাকি ছড়িয়ে পড়তে পারে।'

অবনীমোহন কিছু বললেন না।

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে উৎসুক সুরে হেমনাথ ডাকলেন, 'আচ্ছা অবনী—'

'আজ্ঞে—' অবনীমোহন উন্মুখ হলেন।

'আমরা তো পৃথিবীর শেষ মাথায় পড়ে আছি। বাইরের কোনও খবর এখানে এসে পৌঁছতে বছর কেটে যায়। তোমরা খাস কলকাতায় থাকো। ওখানে যুদ্ধের হাওয়া টাওয়া কিরকম দেখে এলে?'

'এখনও তেমন কিছু না।'

'তবু?'

'হিটলার ওয়ার ডিক্লেয়ার করেছে। গোলমাল চলছে। সে সব ইউরোপে। আমার মনে হয়, এটা সাময়িক। টেনশন খুব একটা দীর্ঘস্থায়ী হবে না।'

এটা উনিশ শ' চল্লিশের অক্টোবর। এক বছর আগেই যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। ইউরোপের বাতাসে এখন বারুদের গন্ধ। ট্যাঙ্ক আর অ্যান্টি-এয়ারক্র্যাফটের শব্দে আকাশ চৌচির হয়ে যাচ্ছে। সময়ে-উত্তেজনায়-মত্ততায় সুদূর সেই মহাদেশ ঢেউয়ের দোলায় দুলছে।

আর উনিশ শ' চল্লিশের বাংলাদেশ এত স্নিগ্ধ, এত নিরুদ্বেগ যে মনেই হয় না, ইউরোপ মাত্র

pathagar.net

কয়েক হাজার মাইল দূরে আর সেটিকে ঘিরে একখানা আগুনের চাকা ঘুরে চলেছে। ইউরোপ বুঝি এই গ্রহের অংশ নয়। সৌরলোকের বাইরে কোনও অজানা, অনাবিষ্কৃত দেশ। বাংলাদেশের অগাধ শান্তি আর নিশ্চিন্ত জীবন যুদ্ধের আঁচে ঝলসে যাবে, এমন সম্ভাবনা এখনও দেখা যাচ্ছে না।

অন্যমনস্কের মতো হেমনাথ বললেন, 'আমার কিন্তু তা মনে হয় না অবনী—'

'কী মনে হয়?' অবনীমোহন শুধোলেন।

'এ লড়াই বহুদিন চলবে, অনেক লোক মরবে, নানা দেশ তছনছ হয়ে যাবে।'

অবনীমোহন কিছু বললেন না, তাকিয়ে রইলেন।

হেমনাথ বললেন, 'তুমি হয়তো ভাবতে পার, আমার এরকম ধারণা কেন হল?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'কেন জানো? ওই জার্মান জাতটার জন্যে। এমন আত্মাভিমানী জাত দুনিয়ায় আর আছে কিনা সন্দেহ। মর্যাদাবোধ তার অত্যন্ত প্রখর। ফার্স্ট গ্রেট ওয়ারের গ্লানি সে ভোলে নি। প্রতিহিংসা না মেটা পর্যন্ত জার্মানরা থামবে বলে মনে হয় না।'

অবনীমোহন চুপ করে রইলেন। মুখ দেখে মনে হল, হেমনাথের ব্যাখ্যা তাঁর খুব মনঃপূত হয় নি।

এই সময় কলার ছড়াটার দিকে আঙুল বাড়িয়ে সুরমা হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন, 'ভারি চমৎকার তো। সেবার যখন তোমার কাছে এসেছিলাম, রোজ এই কলা কিনে আনতে না মামা?'

'তোর মনে আছে?' হেমনাথ হাসলেন, 'আমি কিন্তু ভুলে গেছি রে—'

'বা রে, মনে থাকবে না! আমার স্মৃতিশক্তি খুব খারাপ নাকি?' সুরমাও হাসলেন, 'এই কলাগুলোর কী যেন নাম?'

'অমৃতসাগর।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, অমৃতসাগর।'

অবনীমোহন মুগ্ধ স্বরে বললেন, 'সুন্দর নাম তো।'

হেমনাথ বললেন, 'নামেই শুধু নয়, গুণেও সুন্দর। যেমন মিষ্টি তেমনি স্বাদ। আর দামও বাড়ে নি। দশ বিশ বছর ধরে তিন পয়সা হালি।'

বিনু জানালার বাইরে তাকিয়ে ছিল। গাড়িতে উঠবার পর থেকে দাদু-মা-বাবা অনবরত কথা বলছেন। হিটলার-জার্মানি-লারমোর-ইউরোপ-অমৃতসাগর, টুকরো টুকরো অনেক শব্দ অসংলগ্ন ভাবে কানে আসছিল। হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে সে বলল, 'দাদু, 'হালি' কাকে বলে?' কথাটা তার কাছে অদ্ভুত লেগেছে।

'এক গন্ডা জিনিসকে আমরা এখানে 'হালি' বলি।'

'ও।' বিনু আবার জানালার বাইরে তাকাল।

ফিটন চলেছে তো চলেছেই। দেখতে দেখতে হোগলা-ছাওয়া সেই দোকান ঘরগুলো চোখের সামনে থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

pathagar.net

রাস্তার একধারে ছিল সারি সারি দোকান, আরেক ধারে নদী। নদীটা এখনও সঙ্গে সঙ্গে চলেছে। বিনু দেখতে পেল, দূরে জেটিঘাটে বিশাল রাজহাঁসের মতো তাদের সেই স্টিমারটা নিশ্চল দাঁড়িয়ে আছে। উঁচু মাস্তুলটার মাথায় একটা শঙ্খচিল, চুপচাপ বসে। তাকে ঘিরে ছাইরঙের অচেনা ক'টা পাখি চক্কর দিচ্ছে। বিনুরা যত এগুচ্ছে, স্টিমারটা ততই পেছন দিকে সরে সরে যাচ্ছে।

এদিকে পুব আকাশের খাড়া পাড় বেয়ে সূর্যটা অনেকখানি ওপরে উঠে এসেছে। আশ্বিনের রোদ এখন বেশ ধারাল। আকাশের নীল এত ঝমঝকে যে সেদিকে চোখ পেতে রাখা যায় না। স্টিমারে থাকতে যে পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘগুলোকে এদিকে ওদিকে জমে থাকতে দেখা গিয়েছিল, শরতের এলোমেলো বাতাস পেঁজা তুলোর মতো তাদের দিগ্বিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিচ্ছে। নিচে নদীটা সারা গায়ে সোনালি রোদের আদর মেখে টলমল করে চলেছে।

মুগ্ধ চোখে বিনু দেখছিল। জীবনে যত দৃশ্য সে দেখেছে, মনে মনে সেগুলোর সঙ্গে এই আকাশ আর দূরের ভারহীন মেঘদলের তুলনা করে নিচ্ছিল, কোনটা বেশি সুন্দর?

এক জায়গায় এসে দেখা গেল, সিধে চলতে চলতে রাস্তা হঠাৎ বাঁ দিকে ঘুরেছে। বাঁক ঘুরে ফিটনও সেদিকে চলতে লাগল। খানিক যাবার পর সঙ্গের সেই নদীটা আর নেই, গাছগাছালির ওধারে কোথায় যেন অদৃশ্য হয়ে গেছে।

বাঁকের মুখ পর্যন্ত রাস্তাটা ছিল খোয়ায় ঢাকা। এখন খোয়া টোয়া নেই। কৌলীন্য হারিয়ে সোজা মাটিতে নেমে গেছে।

ঘোড়ার গলায় বোধ হয় ঘুন্টি বাঁধা আছে। চলার তালে তালে ঠুনঠুন শব্দ হচ্ছে।

নদী নেই। মাটির রাস্তায় খানিক যাবার পর দু'ধারে খাল পড়ল। বিনুদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সে দু'টো যেন ছুটছে। মধ্যঋতু এই শরতে খালগুলো কানায় কানায় ভরা। তবে স্রোত নেই। নিস্তরঙ্গ স্থির জলে কোথাও কচুরিপানা, কোথাও নলখাগড়ার বন মাথা তুলে আছে। আর আছে ছোট ছোট নৌকো। মাঝে মাঝে এক-আধটা বাঁশের সাঁকো, মাছরাঙা আর বক চোখে পড়ছে। ফুলভর্তি হিজল গাছে শালিক বসে আছে অনেক।

খালের ওপারে, দূরে দূরে কিছু কিছু বাড়িঘর দেখা যায়। বেশির ভাগই টিনের চালের। কদাচিৎ দু'চারখানা পাকা বাড়ি। এই রাজদিয়াতে লোকালয়ের রূপ ঘনবদ্ধ নয়, দ্বীপের মতো ছড়ানো।

চারদিকে এত জল দেখতে দেখতে অনেক দিন আগে পড়া একটা শহরের কথা মনে পড়ে গেল বিনুর। সেখানে রাস্তার বদলে শুধু খাল। গাড়িঘোড়া নেই সেই মজার শহরটায়। এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যেতে হলে নৌকোই ভরসা। এই মুহূর্তে স্মৃতি তোলপাড় করেও শহরটার নাম কিছুতেই মনে করতে পারল না বিনু।

কখন যে ফিটন দু'টো একটা বড় কাঠের পুলের ওপর এসে উঠেছে, খেয়াল নেই। হঠাৎ কে যেন জোরে চেঁচিয়ে উঠল, 'গাড়ি থামা রসুল, গাড়ি থামা—'

গতি কমতে কমতে গাড়িটা পুলের মাঝামাঝি এসে থামল।

এদিকে বিনু চমকে উঠেছিল। তাড়াতাড়ি জানালা দিয়ে মুখ বাড়াতেই দেখতে পেল, কে একজন বড় বড় পা ফেলে তাদের ফিটনটার দিকে এগিয়ে আসছে। খুব সম্ভব সে-ই গাড়ি থামাতে বলেছে।

একটু পরেই ফিটনের জানালায় একটি মুখ দেখা গেল।

পাকা ভুরু কুঁচকে হেমনাথ বললেন, 'হিরণবাবু মনে হচ্ছে—'

বিনুর মনে পড়ল, কিছুক্ষণ আগে জেটিঘাটে দাদুর মুখে 'হিরণ' নামটা শুনেছে। এই তবে হিরণ। কাছাকাছি আসতে তাকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। বয়স তেইশ চব্বিশের মধ্যেই। এক কথায় পরিপূর্ণ যুবক। সিঁথি নেই। মাথার চুল এলোমেলোভাবে পেছনে উলটে দেওয়া। গায়ের রং কালোর দিকে, এটা খুঁত নয়। বরং কালো রঙে হিরণের ব্যক্তিত্ব আরো বেশি করে ফুটেছে। চোখদু'টি ভাষাময়, উজ্জ্বল। পাতলা ঠোঁটের ওপর সূক্ষ্ম গোঁফের রেখা। পায়ে নকশা-করা স্যাণ্ডেল। পরনে পাটভাঙা ধবধবে পাজামা, আর দোমড়ানো মোচড়ানো হাফ শার্ট। পোশাকের ব্যাপারে তো বটেই, নিজের সম্বন্ধেই হয়তো সে উদাসীন। তবু সব মিলিয়ে হিরণ বেশ সুপুরুষ। তার মধ্যে কোথায় যেন একটা আকর্ষণ আছে। প্রথম দেখায় অবশ্য স্পষ্ট করে সেটা বোঝা যায় না, তবে হালকাভাবে অনুভব করা যায়।

হেমনাথ এবার বললেন, 'এতক্ষণে আসার সময় হল?'

চোখ নামিয়ে, ঘাড় চুলকোতে চুলকোতে হিরণ বলল, 'একটু দেরি হয়ে গেল।'

'কোন দিন ঠিক সময়ে ঠিক জায়গাটিতে হাজিরা দাও শুনি? চিরকালের তুমি লেট লতিফ।'

'না, মানে—'

'মানেটা আবার কী হে—'

'কাল সন্ধেবেলা জারি গান শুনতে গিয়েছিলাম। মাঝরাত্তিরে ফিরে এসে এমন ঘুমিয়েছি যে ভোরবেলায় উঠতে পারি নি।'

হেমনাথ বললেন, 'কাল না হয় মাঝরাত্তিরে শুয়েছ। যেদিন সন্ধে রাত্তিরে শোও সেদিনও কি ভোরবেলায় ওঠ? তেইশ চব্বিশ বছর তো বয়েস হল। সূর্যোদয়ের আগে ক'দিন উঠেছ বল তো?'

সমানে ঘাড় চুলকেই যাচ্ছিল হিরণ। ভয়ে ভয়ে একবার চোখ তুলে ফিসফিসিয়ে বলল, 'একদিনও

না। সূর্যোদয়ের আগে ঘুম থেকে ওঠা আমার কোষ্ঠীতে নেই।'

হেমনাথ উচ্ছ্বসিত গলায় বলে উঠলেন, 'এই—এতদিনে একটা সত্যি কথা বলেছিস হিরণ।'

অবনীমোহন বিনু সুরমা, সবাই সকৌতুকে তাকিয়ে ছিলেন। হিরণ আর হেমনাথের ভেতর যে মজার ব্যাপারটা চলছে, বেশ উপভোগই করছিলেন বলা যায়। এবার তাঁরা হেসে উঠলেন।

হাসি থামতে অবনীমোহনদের দেখিয়ে হিরণ বলল, 'ওঁদেরই তো আসবার কথা ছিল?'

হেমনাথ মাথা নাড়লেন, 'হ্যাঁ। আয়, তোদের আলাপ-টালাপ করিয়ে দিই।'

সুরমা বিনু আর অবনীমোহনের পরিচয় দিলেন হেমনাথ। হিরণ শুধলো, 'আপনাদের কী বলে ডাকব?'

সস্নেহে সুরমা বললেন, 'তোমার যা ইচ্ছে।'

'আমার ইচ্ছে মাসিমা আর মেসোমশাই বলি।'

'বেশ তো।'

হিরণ বলল, 'ফিটনে যা মালপত্র, ওঠাই মুশকিল। বাড়ি গিয়ে আপনাদের প্রণাম করব।'

হাসিমুখে সুরমা বললেন, 'তাই কোরো, প্রণামটা পাওনা রইল।'

হেমনাথ এবার সুরমার চোখে চোখ রেখে বললেন, 'এবার শ্রীমানের পরিচয় দিই।'

সুরমা বললেন, 'ওর কথা তো তুমি আগেই বলেছ।'

'কতটুকু আর বলেছি! আমার বন্ধু দ্বারিক দত্তর নাতি তো?'

'হ্যাঁ।'

'ও তো সামান্য পরিচয়। হিরণ গেল বার ইকনমিকস অনার্সে ফার্স্ট ক্লাস সেকেণ্ড হয়েছে। এবছর এম. এ ফিফথ ইয়ার।' হেমনাথের বলার ভঙ্গিতে গর্ব যেন মাখানো।

সুরমা আর অবনীমোহন সস্নেহে তাকিয়ে ছিলেন। এবার তাঁদের দৃষ্টিতে স্নেহের সঙ্গে আর কিছু মিশল। সুরমা বললেন, 'বাঃ বাঃ, এ তো গৌরবের কথা।'

প্রশংসার কথায় মুখ লাল হয়ে উঠেছিল হিরণের। চোখ নামিয়ে লাজুক সুরে সে বলল, 'গৌরব-টৌরব আবার কী।'

হেমনাথ বললেন, 'হিরণচন্দরের সব চাইতে বড় পরিচয় যেটা তা হল ও আমার ফ্রেণ্ড, ফিলজফার অ্যাণ্ড মিসগাইড।'

হিরণ চেঁচামেচি করে উঠল, 'আমি তোমার মিসগাইড দাদু! এভাবে আমার দুর্নাম রটিয়ে বেড়াচ্ছ!'

'আরও কত কি রটিয়ে বেড়াই একবার দ্যাখ না।'

হিরণ কী বলতে যাচ্ছিল, হাতের ইঙ্গিতে তাকে থামালেন হেমনাথ। হাসতে হাসতে বললেন, 'ঝগড়াঝাঁটি পরে হবে। দু'দিন দু'রাত জার্নি করে ওরা এসেছে, খুব ক্লান্ত। এখন বাড়ি যাওয়া দরকার।'

হিরণ ব্যস্ত হয়ে পড়ল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, সে তো ঠিকই।'

হেমনাথ শুধালেন, 'তুই কি এখন বাড়ি ফিরবি হিরণ?'

'হ্যাঁ।'

ফিটনের ভেতরটা ভাল করে দেখে নিয়ে হেমনাথ বললেন, 'তাই তো, একটুও জায়গা নেই। তোকে কোথায় বসাই?'

'আমি হেঁটে যাচ্ছি, তোমরা চলে যাও।'

'এখান থেকে বাড়ি পাক্কা এক মাইল রাস্তা। হেঁটে যাবি?'

এই সময় অবনীমোহন বলে উঠলেন, 'পেছনের ফিটনটায় শুধু সুধা সুনীতি রয়েছে, ওখানে একজনের জায়গা হতে পারে।'

হেমনাথ বললেন, 'তা হলে আমি ঝিনুককে নিয়ে সুধাদের কাছে চলে যাই, হিরণ বরং এখানে বসে যাক।'

হেমনাথ হয়তো ভেবেছেন, দু'টি তরুণীর সঙ্গে এক ফিটনে অনাত্মীয়, অপরিচিত একজন যুবককে তুলে দেওয়া ঠিক হবে না।

অবনীমোহন তাড়াতাড়ি বললেন, 'আপনি কেন যাবেন? হিরণই ওই ফিটনে যাক। আমি ওকে

দিয়ে আসছি।' বলে দরজা খুলে নেমে পড়লেন।

অবনীমোহন মানুষটি চিরদিনই উদার, সংস্কারমুক্ত। ছেলেমেয়েদের তিনি নিজের ছাঁচে গড়ে তুলতে চেয়েছেন। নিজের নিজের সম্মান আর মর্যাদা বাঁচিয়ে তারা মানুষের সঙ্গে মিশুক, এটাই তাঁর কাম্য। চারদিকের দরজা জানালা খুলে দিয়ে বাইরের আলো বাতাস যতখানি পারে ভেতরে নিয়ে আসুক, অবনীমোহন তা-ই চান।

সুধাদের ফিটনটা পেছনে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। অবনীমোহন হিরণকে সেখানে বসিয়ে একটু পর ফিরে এলেন। আবার ফিটন চলতে শুরু করল।

কিছুক্ষণ পর অবনীমোহন বললেন 'বেশ ছেলে।'

হেমনাথ বললেন, 'কার কথা বলছ? হিরণের?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'বেশ বললে যথেষ্ট বলা হয় না। এমন ছেলে আমাদের রাজদিয়াতে আর একটিও নেই।'

রাস্তা যেখানে এসে ফুরিয়ে গেছে, রাজদিয়া শহরের সেটাই বোধ হয় শেষ বাড়ি। তারপর থেকে শুরু হয়েছে মাঠ। এই আশ্বিনে মাঠ না বলে তাকে সমুদ্র বলাই উচিত। অনেক, অনেক দূরে আকাশ যেখানে ধনুরেখায় দিগন্তে নেমে গেছে ততদূর পর্যন্ত গাছপালা, ঘরবাড়ি, মানুষের বসতি, এমন কি এক টুকরো মাটির চিহ্নও নেই। শুধু জল আর জল। অথৈ, অগাধ জল। তার ওপর মেঘের মতো ধানবন মাথা তুলে আছে।

বাড়িটা অনেকখানি জায়গা জুড়ে, প্রায় সাত আট বিঘের মতো হবে। চারদিক ঘিরে পাঁচিল অবশ্য নেই। সামনের দিকে এক ধারে প্রকাণ্ড বাগান। সেখানে সবই চেনাজানা গাছের ভিড়। আম জাম লিচু জামরুল কাঁঠাল। আর রয়েছে দেশি ফুলেরা—সন্ধ্যামালতী টগর গন্ধরাজ কাঁঠালি চাঁপা। বাগানটা ঘন ছায়ায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে।

একদিকে বাগান, আরেক দিকে দীঘির মতো বিশাল পুকুর। পুকুরটার আলাদা কোনও অস্তিত্ব এই মুহূর্তে নেই। মাঠের জলের সঙ্গে সেটা এখন একাকার।

রাস্তা পেছনে ফেলে ফিটন বাগানে ঢুকল। একধারে দু'টি অল্পবয়সী কামলা স্তূপীকৃত পচা পাট থেকে শোলা আর আঁশ বার করে করে রাখছিল। পচা পাটের দুর্গন্ধে চারদিকের বাতাস আড়ষ্ট হয়ে রয়েছে।

ফিটন দেখে কামলা দু'টো বিদ্যুৎগতিতে উঠে দাঁড়াল। গলা ফাটিয়ে চেঁচাল, 'আইস্যা গ্যাছে, আইস্যা গ্যাছে—' বলেই ঊর্ধ্বশ্বাসে ভেতরের দিকে ছুটল।

বাগান পেরিয়ে মস্ত উঠোন। কামলারা ভেতরে পৌঁছবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ফিটন উঠোনে এসে থামল।

উঠোনের একধারে রাসমঞ্চ, দোলমঞ্চ, তুলসীমঞ্চ। আরেক ধারে পর পর অনেকগুলো খড়ের পালা সাজানো। তিন দিক ঘিরে সারি সারি ঘর। পুরোপুরি পাকা বাড়ি নয়। মেঝে সিমেন্টের, ওপরে নকশা-করা টিনের চাল, কাঠের দেওয়ালে বড় বড় জানালা ফোটানো।

ফিটন দু'টো থেমেছে কি থামে নি, সারা বাড়িতে হইচই শুরু হয়ে গেল। সেই কামলা দু'টো তো চেঁচাচ্ছিলই, ভেতর থেকে আরও কয়েকজন প্রায় ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে এল। সবাই মহিলা আর শিশু। বয়স্ক পুরুষ কিংবা যুবক তাদের ভেতর নেই।

একবারে সামনে যিনি তাঁর বয়স পঞ্চাশোর্ধ্বে। শ্যামাঙ্গীই বলা যায়। নাক মুখ তেমন ধারাল নয়, তবে চুল অজস্র। এর মধ্যেই স্নান সেরে নিয়েছেন, পিঠময় কাঁচাপাকা ভিজে চুল ছড়ানো, প্রান্তে একটি গিঁট বাঁধা। কপালে তামার পয়সার আকারে সিঁদুরের মস্ত টিপ, সিঁথিও ডগডগে। পরনে লাল নকশা-পাড় শাড়ি আর সাদা জামা। ঠোঁট দু'টি টিয়াপাখির ঠোঁটের মতো পানের রসে টুকটুকে।

আলাদা আলাদা করে দেখলে হাত-পা-নাক-চোখ তেমন কিছু নয়। তবে সব মিলিয়ে মহিলাকে ঘিরে কোথায় যেন অলৌকিকের ছোঁয়া আছে।

বর্ষীয়সী সধবা মহিলাটির গা ঘেঁষে একজন বিধবা দাঁড়িয়ে, দু'জনে সমবয়সিনীই হবেন। বিধবাটির চুল ছোট ছোট করে ছাঁটা, পরনে ধবধবে সাদা থান আর সেমিজ। চেহারায় হেমনাথের পুরো আদলটি

বসানো। খুব সম্ভব তাঁর বোন টোন।

সধবা আর বিধবা এই দুই সমবয়সিনীর পেছনে যারা ভিড় করে দাঁড়িয়ে, এক পলক তাকিয়েই অনুমান করা যায়, তারা এ বাড়ির আশ্রিত। হয়তো হেমনাথের সংসারে কাজকর্ম করে তাদের দিন চলে।

ফিটন থামতে প্রথমেই ঝিনুককে নিয়ে হেমনাথ নামলেন। মহিলা দু'টির দিকে ফিরে উচ্ছ্বসিত সুরে বললেন, 'দেখ, কাদের এনেছি।'

মহিলারা আরেকটু এগিয়ে এলেন। ততক্ষণে অবনীমোহন বিনু আর সুরমা নেমে পড়েছেন। সুরমা তাড়াতাড়ি ঝুঁকে মহিলা দু'টিকে প্রণাম করলেন। বললেন, 'কেমন আছ মামী? কেমন আছ মাসি?' কপালে সিঁদুর, পরনে লালপাড়-শাড়ি মহিলাটি হেমনাথের স্ত্রী স্নেহলতা। বিধবা মহিলাটি তাঁর বোন। নাম—শিবানী।

শিবানী আর স্নেহলতা দু'জনে চিবুক ছুঁয়ে সুরমাকে চুমু খেলেন। হেমনাথ যা বলেছিলেন এরাও তাই বললেন, 'আমরা তো ভালই আছি। কিন্তু তোর শরীরের একি হাল হয়েছে মা!'

সুরমা হাসলেন, 'শরীরের কথা থাক। সব সময় ওই এক কথা শুনছি।'

সুরমার পর অবনীমোহন আর বিনু গিয়ে প্রণাম করল। হেমনাথ তাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন।

স্নেহলতা স্বামীর দিকে এক পলক তাকিয়ে আস্তে করে ঝঙ্কার দিলেন, 'থাক, আর বলে দিতে হবে না। আমার জামাই, আমার নাতিকে যেন চিনতে পারি নি?'

বিনুদের ফিটনের ঠিক পেছনেই সুধাদের ফিটনটা থেমেছিল। সুরমা গলা তুলে ডাকলেন, 'কি রে সুধা সুনীতি, তোরা দেখি গাড়িতেই বসে রইলি!'

ডাকাডাকিতে সুধারা নামল। দেখা গেল, সুধা আর হিরণ খুব কথা বলছে। আর সুনীতি মুখ টিপে টিপে হাসছে। তিনজনের ভেতর হয়তো কোনও মজার আলোচনা চলছে।

হেমনাথ ভাবছিলেন, কাঠের পুলটা থেকে এ বাড়ি এক মাইলের মতো। ফিটন ছুটিয়ে আসতে কতক্ষণ আর লেগেছে! খুব বেশি হলে মিনিট দশ বার। কিন্তু এর ভেতরেই সুধা আর হিরণ কেমন আলাপ জমিয়ে নিয়েছে।

হেমনাথ সুধাকে বললেন, 'পড়েছিস তো হিরণের পাল্লায়। কী কথাটাই না বলতে পারে! সবসময় বকবকায়মান।'

সুরমা বললেন, 'হিরণের দোষ দিচ্ছ মামা! তোমার ছোট নাতনীকে তো এখনও চেন নি। দিনরাত খালি কথা আর কথা। একটা কিছু পেল তো একেবারে কলের গান চলল, থামে আর না। ওর বকবকানিতে কানের পোকা নড়ে যায়।'

হেমনাথ বললেন, 'ভালই হল। দু'টোর মিলবে বেশ।'

কিছু না ভেবেই শেষ কথাগুলো বলেছেন হেমনাথ, তবু চকিতে হিরণ আর সুধা পরস্পরের দিকে একবার তাকাল, তারপর মুখ ফিরিয়ে নিঃশব্দে হাসল।

সুরমা বললেন, 'যাও, দিদাদের প্রণাম কর।'

সুধা সুনীতি এগিয়ে গিয়ে স্নেহলতা আর শিবানীকে প্রণাম করল। তারা উঠে দাঁড়ালে সকৌতুক দৃষ্টিতে স্ত্রীকে বিদ্ধ করে হেমনাথ সহাস্যে বললেন, 'কিরকম দেখলে গিন্নী?'

স্নেহলতা বুঝতে পারেন নি। বললেন, 'কী?'

'সুধা সুনীতিকে—'

'দু'জনেই সুধা।'

'তোমার কপাল কিন্তু পুড়ল।'

ইঙ্গিতটা এবার বুঝতে পারলেন স্নেহলতা। হাসিমুখে বললেন, 'ভয় দেখাচ্ছ?'

'তুমিই বিবেচনা কর।' হেমনাথ বললেন, 'ভাবছি তোমাকে বিদেয় করে এবার এই দু'জনকে রাজমহিষী করে নেব।'

'বিদেয় করবে কি? তার আগে আমিই পালিয়ে যাব।' বলে বিনুর চোখে চোখ রাখলেন স্নেহলতা, 'কি দাদা, সুভদ্রাহরণ করতে পারবে তো?'

pathagar.net

ঠিক এই সময় হিরণ চেঁচিয়ে উঠল, 'অ্যাইও—'

'কী হল রে?' চমকে স্নেহলতা তাকালেন।

'আমার সঙ্গে পালাবার প্ল্যান করেছিলে না সেদিন? আবার এর ভেতরে বিনুকে জুটিয়ে ফেললে?'

সবাই হেসে উঠল।

হাসি থামলে শিবানী বললেন, 'আর উঠোনে না, ঘরে চল সব।'

স্নেহলতা সস্নেহে ডাকলেন, 'এস ধনেরা, এস —'

'ধন' বলে সম্বোধন করতে আগে আর কারোকে শোনে নি বিনু। ফিক করে হেসে ফেলল সে।

হেমনাথ সেই কামলা দু'টোকে বললেন, 'যুগল করিম, গাড়ি থেকে মালপত্র নামিয়ে আন—'

কামলা দু'জনের নাম জানা গেল। তবে কে যুগল আর কে করিম, বুঝতে পারল না বিনু।

স্নেহলতা সবাইকে নিয়ে ভেতর-বাড়ির দিকে যাচ্ছিলেন। দু'চার পা এগিয়েছিলেন, দু'টো লোক প্রায় ছুটতে ছুটতে উঠোনে এসে পড়ল। হাঁপাতে হাঁপাতে ডাকল, 'বড়কত্তা—'

সবাই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। যে লোক দু'টি ছুটে এসেছে তারা মধ্যবয়সী চাষী কি মাঝি শ্রেণীর মানুষ। মুসলমান।

হেমনাথ বললেন, 'কী ব্যাপার রে?'

দু'জনেই প্রায় একসঙ্গে বলল, 'মজিদ ভাই অহনই আপনেরে যাইতে কইছে। আমরা নাও লইয়া আইছি। চলেন—'

'কেন, কিছু জানিস?'

'চরবেউলা থিকা নবু গাজী আইছে যে।'

হেমনাথ অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, যাব। এখনই যেতে হবে। নৌকো কোথায় রেখেছিস?'

'আপনের পুকৈর ঘাটে।'

পুকুরটা এখান থেকে বেশ খানিকটা দূরে, বাগানের ওধারে, তবু পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। ভিড়ের ভেতর থেকে মুখ বাড়িয়ে টুক করে একবার দেখে নিল বিনু। সত্যিই একটা ছইওলা নৌকো সেখানে বাঁধা আছে, হাওয়ায় অল্প অল্প দুলছে।

হেমনাথ এবার এদিকে ফিরে বললেন, 'রমু অবনী, আমাকে একবার বেরুতে হচ্ছে। তোমরা বিশ্রাম করে খাওয়াদাওয়া সেরে নিও, আমার জন্যে বসে থেকো না।' হিরণকে বললেন, 'তুই এখন আর বাড়ি যাস না, আমাদের এখানেই খাবি। কিছু দরকার টরকার হলে—বুঝলি না, আমি তো বাড়িতে থাকব না—'

হিরণ বলল, 'বুঝেছি। গৃহস্বামীর অনুপস্থিতিতে তাঁর দায়িত্বগুলো আমার ঘাড়ে চাপল, এই তো?'

'ঠিক।'

অবনীমোহন বললেন, 'এখন কোথায় যাবেন মামাবাবু?'

হেমনাথ জানালেন, 'কেতুগঞ্জে।'

অবনীমোহন আর কোনও প্রশ্ন করলেন না। মুখচোখ দেখে মনে হল, হেমনাথের কেতুগঞ্জে যাবার ব্যাপারে তাঁর কৌতূহল আছে, হয়তো কিছু প্রশ্নও।

অবনীমোহনের মনের কথা বুঝিবা পড়তে পারলেন হেমনাথ। বললেন, 'কেতুগঞ্জের মজিদ মিঞা আমার ছোট ভাইয়ের মতো। এক কানি জমি নিয়ে ওর সঙ্গে চরবেহুলার নবু গাজীর দাঙ্গা হয়ে গেছে। দু'পক্ষে আট দশজন জখম হয়ে সদর হাসপাতালে পড়ে আছে। নবু গাজীর সঙ্গে যাতে মজিদের একটা মীমাংসা হয়, সে জন্যে আমি চেষ্টা করছিলাম। আচ্ছা, পরে এসে তোমাকে সব বলব।'

হেমনাথ সেই মুসলমান মাঝি দু'টির সঙ্গে চলে গেলেন।

অবনীমোহন বললেন, 'মামাবাবু তো বেশ ঝঞ্ঝাট পোয়াতে পারেন!'

ওধার থেকে স্নেহলতা বললেন, 'এই একটা ঝঞ্ঝাট নাকি? সবে এসেছ। ক'দিন থাকলেই দেখতে পাবে কত ঝামেলা মাথায় নিয়ে বসে আছে তোমার মামাবাবু। রাত নেই, দিন নেই, এ আসছে

pathagar.net

ডাকতে, ও আসছে। এক দণ্ড যদি ঘরে স্থির হয়ে বসে!'

বিনু কিছুই বোধহয় শুনতে পাচ্ছিল না। একদৃষ্টে পুকুরঘাটের দিকে তাকিয়ে ছিল। এতক্ষণে নৌকোটা ছেড়ে দিয়েছে। দেখতে দেখতে পুকুর পেরিয়ে ধানবনের কাছাকাছি চলে গেল সেটা।

বিনুর খুব ইচ্ছে হচ্ছিল, ভাসতে ভাসতে দাদুর সঙ্গে কেতুগঞ্জে যায়, আগে আর কখনও নৌকোয় চড়ে নি সে।

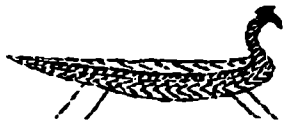

হেমনাথের নৌকো ধানবনের ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেলে স্নেহলতা বললেন, 'ঘরে এস মানিকেরা—' বলে পা বাড়িয়ে দিলেন।

স্নেহলতার পিছু পিছু সবাই সামনের পুবদুয়ারী বড় ঘরখানায় এল। ঘাড় ফিরিয়ে বিনু একবার দেখে নিল, হিরণ যুগল আর করিম ফিটন থেকে মালপত্র নামিয়ে ওদিকের একটা ঘরে নিয়ে রাখছে।

স্নেহলতার গলা আবার শোনা গেল; 'এখন আর কোনও কথা না, উঠোনে বালতিতে জল রাখা আছে। হাত-পা ধুয়ে আগে কিছু খেয়ে নাও। ধনেদের মুখ খিদেয় একবারে শুকিয়ে গেছে।'

খানিক আগে আরেক বার 'ধন' বলেছিলেন স্নেহলতা, এবারও বললেন। কথায় কথায় ওই শব্দটা বলা বোধহয় তাঁর অভ্যাস। ফিক করে এবারও বিনু হেসে ফেলল।

হাসিটা কানে গিয়েছিল। স্নেহলতা শুধোলেন, 'হাসলি যে দাদা?'

বিনু লজ্জা পেয়ে চোখ সরিয়ে নিল।

সুরমা ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছিলেন। হাসতে হাসতে বললেন, 'তুমি 'ধন' বলেছ মামী, সেই জন্যে।'

স্নেহলতা সস্নেহে হাসলেন। বললেন, 'শুধু ধন নাকি, আরও কত কি বলি দেখ না। তখন কত হাসতে পার, দেখব।'

একটু পর হাত মুখ ধুয়ে এসে সবাই খেতে বসল। অবনীমোহন সুধা সুনীতি বিনু এবং সেই পুতুল পুতুল মেয়েটা—ঝিনুক। ফিটন থেকে বাক্স-টাক্স নামানো হয়ে গিয়েছিল। হিরণকে ডেকে এনে বসিয়ে দিলেন স্নেহলতা। সুরমা অবশ্য বসলেন না।

অবনীমোহন স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'সকাল থেকে কিছুই তো খাওনি, তুমিও বসে পড়।'

কলকাতায় স্বামী এবং ছেলেমেয়েদের সঙ্গে খেতে বসে যান সুরমা। খাবার দাবার মাঝখানে সাজানো থাকে। দরকারমতো সবাই চামচে করে তুলে নেয়। কলকাতার রীতি আলাদা। কিন্তু এখানে কেউ কিছু ভাবতে পারে। কলকাতা থেকে অনেক দূরে এই ছোট্ট রক্ষণশীল জগতে স্বামীর সঙ্গে খেতে বসা নিন্দনীয়।

অবনীমোহন যে এভাবে ডেকে বসবেন, সুরমার পক্ষে তা ছিল অভাবনীয়। তিনি লজ্জা পেয়ে গেলেন।

স্নেহলতাও বললেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, তুই বসে পড়।'

মৃদু স্বরে সুরমা বললেন, 'আমি পরে খাব'খন।'

অবনীমোহন ব্যস্ত হয়ে পড়লেন, 'পরে টরে না। অসুস্থ শরীর, ডাক্তার না তোমায় বলে দিয়েছে সকালবেলা সাতটার ভেতর খেয়ে নিতে। অনিয়ম করলে—'

বিব্রত সুরমা চাপা গলায় ধমক দিলেন, 'আমার জন্যে ভাবতে হবে না। তুমি খেয়ে নাও তো।'

অবনীমোহন আর কিছু বললেন না।

স্নেহলতা এবং শিবানী ফুল-কাটা কাঁসার থালায় পাতলা চিঁড়ে কদমা মুছি গুড় আর পাতক্ষীর সাজিয়ে সবাইকে দিতে লাগলেন। বড় বড় জামবাটি ভর্তি করে ঘন আঠালো দুধও দিলেন।

খেতে খেতে হঠাৎ হিরণ বলল, 'কি ঠাকুমা, ঠকাবার মতলব নাকি?'

জিজ্ঞাসু চোখে তাকালেন স্নেহলতা, 'ঠকাব!'

'হুঁ—' হিরণ ঘাড় কাত করল, 'গাড়ি থেকে রসগোল্লার হাঁড়ি আর কলার কাঁদি নামিয়ে তোমার হাতে দিলাম না? সে সব কোথায়?'

'তাই তো—' তাড়াতাড়ি জিভ কেটে স্নেহলতা উঠে পড়লেন। ছুটে গিয়ে ওধারের কোনও একটা ঘর থেকে রসগোল্লা আর কলা নিয়ে এসে সবার পাতে পাতে দিতে লাগলেন।

বড়দের চারটে করে রসগোল্লা আর দু'টো করে কলা দিয়েছেন স্নেহলতা। বিনুকে দিয়েছেন দু'টো রসগোল্লা আর একটা কলা, ঝিনুকের ভাগে পড়েছে আরও কম—কলা আধখানা, রসগোল্লা একটা।

বিনুর ঠিক পাশেই ঝিনুক খেতে বসেছিল। আড়ে আড়ে একবার বিনুর পাতের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ হাত-পা ছুঁড়তে শুরু করল সে, 'আমি আধখানা কলা খাব না, একটা রসগোল্লা খাব না।'

স্নেহলতা শুধোলেন, 'ক'টা খাবি?'

'গোটা কলা খাব, দু'টো রসগোল্লা খাব—'

'তোর পেট ভাল না ঝিনুক, সহ্য করতে পারবি না। নিজেও কষ্ট পাবি, আমাকেও জ্বালিয়ে মারবি।'

হাত-পা ছোঁড়া থামায় নি ঝিনুক। মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে সে বলতে লাগল, 'ওকে কেন দিলে তা হলে? কেন দিলে ওকে?'

স্নেহলতা অবাক, 'কাকে রে, কাকে?'

আঙুল দিয়ে বিনুকে দেখিয়ে দিল ঝিনুক, 'ওকে।'

'পেট ভর্তি তোমার বিষ, ছেলেটা বাড়ি ঢুকতে না ঢুকতেই হিংসে আরম্ভ করে দিয়েছ!'

সুরমা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন। হাসতে হাসতে বললেন, 'দাও মামী, ঝিনুক যা চাইছে দাও—'

স্নেহলতা বললেন, 'তুই কি ওকে মেরে ফেলতে বলিস রমু?'

'তার মানে!'

'পরশু দিন ওর বাপ এখানে দিয়ে গেছে। আসা থেকে খালি খাচ্ছেই, খাচ্ছেই। কাল সারারাত পেটের ব্যথায় ঘুমোতে পারে নি, আমাদেরও ঘুমোতে দেয় নি। খাওয়ায় একটু টান না দিলে—বুঝলি না, পরের দায়িত্ব—'

স্নেহের সুরে সুরমা বললেন, 'ছেলেমানুষ, বায়না করছে। এখন তো দাও, পরে না হয় দিও না।'

কী আর করা, ঝিনুকের দাবি অনুযায়ী রসগোল্লা আর কলা তার পাতে তুলে দিতে হল।

একটু নীরবতা।

হঠাৎ কিছু মনে পড়ে যেতে সুরমা বললেন, 'আচ্ছা মামী—'

'কী বলছিস?' মুখ ফিরিয়ে স্নেহলতা সাড়া দিলেন।

'ঝিনুকের বাবা ওকে তোমার কাছে দিয়ে গেছে, বললে না?'

'হ্যাঁ।'

'কেন?'

'ওর মা'কে নিয়ে ওর বাপ ঢাকায় গেছে।'

'ঢাকায় কী?'

'ঝিনুকের মামাবাড়ি।'

সুরমা অবাক। বিস্ময়ের সুরে বললেন, 'মামাবাড়িতে গেল, মেয়েটাকে নিয়ে গেল না?'

ধীরে ধীরে মাথা নাড়লেন স্নেহলতা। বিষণ্ণ সুরে বললেন, 'না।'

'কেন?'

কী যেন ভর করে বসল স্নেহলতার ওপর। নিজের অজ্ঞাতসারেই বুঝিবা ফিসফিসিয়ে বললেন, 'ওর বাপ চিরকালের মতো ওর মাকে রেখে আসতে গেছে।'

'সে কী!'

'হ্যাঁ, বড় অশান্তি হচ্ছিল বাড়িতে। তার চাইতে এই ভাল হয়েছে—'

pathagar.net

অবনীমোহন সুধা সুনীতি সবাই চকিত হয়ে ঝিনুকের দিকে তাকাল। যে মেয়ে খাওয়া নিয়ে এত বায়না করছিল, এখন আর সে খাচ্ছে না। ঝিনুকের চোখের তারা স্থির, টসটস করছে। পলকহীন সে স্নেহলতার দিকে তাকিয়ে আছে। লাল টুকটুকে পাতলা ঠোঁট দু'টো থরথর করছে তার।

সুরমা বললেন, 'তোমার কাছে তো রেখে গেছে। ওদের বাড়িতে আর কেউ নেই?'

'না। কাকা জ্যাঠা ঠাকুমা ঠাকুরদা, কেউ না। থাকার ভেতর বাপ-মা আর ওই একটা মাত্র মেয়ে। তাও—'

এই সময় হিরণ ডেকে উঠল, 'ঠাকুমা—'

হিরণের স্বরে এমন কিছু ছিল, স্নেহলতা চমকে উঠলেন।

খুব চাপা গলায় হিরণ আবার বলল, 'ঝিনুকের সামনে এসব কথা বল কেন? বুঝবার মতো বয়েস ওর হয়েছে। মুখচোখের চেহারা দেখছ মেয়েটার?'

চকিতে একবার ঝিনুককে দেখে নিয়ে স্নেহলতা বললেন, 'আমারই অন্যায় হয়ে গেছে। থাক, ওসব কথা থাক—'

সবার চোখ ঝিনুকের দিকে। বিনুও তাকে দেখছিল। দেখতে দেখতে দাদুর কথাগুলো মনে পড়েছিল। স্টিমারঘাটে দাদু বলেছিলেন, ঝিনুক খুব দুঃখী।

এরপর আর কোনও কথা হল না। একসময় নিঃশব্দে খাওয়ার পালা চুকল।

পুবদুয়ারী সেই প্রকান্ড ঘরখানার একধারে তক্তপোশ পাতা। ইতস্তত দু'চারখানা চেয়ারও ছড়িয়ে আছে। খাওয়াদাওয়ার পর অবনীমোহন সুধা আর হিরণ এখানেই আসর বসালেন। সুনীতি আর সুরমা স্নেহলতা শিবানীর সঙ্গে ভেতর দিকে রান্নাঘরে চলে গেলেন। ঝিনুকও তাঁদের সঙ্গে গেল। সুরমা এখনও খান নি। রান্নাঘরে মামী আর মাসির সঙ্গে কথা বলতে বলতে খাবেন। বিনু হিরণদের কাছেই থেকে গেল।

অবনীমোহন সুধা আর হিরণ গল্প জুড়ে দিল। নিমেষে মশগুলও হয়ে গেল। অবনীমোহন আর সুধা পূর্ব বাংলার এই ভূখণ্ডটি সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন করছে। বিপুল উৎসাহে উত্তর দিয়ে যাচ্ছে হিরণ।

কিছুক্ষণ বসে বসে তাদের কথা শুনল বিনু, তারপর দূরমনস্কের মতো জানালার বাইরে তাকাল। এখান থেকে আদিগন্ত সেই ধানবন চোখে পড়ছে, আর দেখা যাচ্ছে আশ্বিনের টলোমলো, অথৈ, অগাধ জল। আকাশের একটা টুকরোও দৃষ্টিতে ধরা দিয়েছে। সারা বর্ষা বৃষ্টিতে ধুয়ে ধুয়ে আকাশ এখন আশ্চর্য নীল। সেখানে কেউ ভারহীন সাদা মেঘের ভেলা ভাসিয়ে রেখেছে। দূর আকাশ, অফুরন্ত জল আর শরতের মেঘদল যেন অবিরাম হাতছানি দিয়ে যাচ্ছে।

আড়ে আড়ে একবার হিরণদের আসরটা দেখে নিল বিনু, সবাই বিভোর হয়ে আছে। সুযোগটা হাতছাড়া করা সমীচীন নয়। পায়ে পায়ে সুধাদের অলক্ষ্যে বেরিয়ে পড়ল সে।

শালিকের মতো চঞ্চল পায়ে কিছুক্ষণ উঠোনে ঘুরল বিনু। দোলমঞ্চ দেখল, রাসমঞ্চ দেখল, পালা-সাজানো খড়ের স্তূপ দেখল। আর দেখল সারি সারি ধানের ডোল (গোলা)। ফিটন দু'টো এখন আর নেই, তারা বোধহয় চলে গেছে। একটু পর কিসের একটা স্রোত তাকে একটানে বাইরের বাগানটার দিকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল।

খানিক আগে এখান দিয়েই এসেছিল বিনু। জায়গাটা তার চেনা। চারদিকে আমগাছ জামগাছ লিচুগাছ কামরাঙা গাছ—সব এক পায়ে দাঁড়িয়ে। বাগানটা ছায়াচ্ছন্ন। মাটি নরম, ভিজে ভিজে। গাছগাছালির ফাঁকে ফাঁকে পাখিদের চেঁচামেচি আর ডানা ঝাপটানোর শব্দ। ভিজে মাটির গন্ধ, দূর ধানখেতের গন্ধ, ফুলের গন্ধ—সমস্ত একাকার হয়ে যেন ঘুম ঘনিয়ে আনে।

গাছপালার পাশ দিয়ে, লতাপাতার ধার দিয়ে, ঝোপঝাড়ের ফাঁক দিয়ে নেশাগ্রস্তের মতো ঘুরে বেড়াতে লাগল বিনু। কতক্ষণ ঘুরেছিল, মনে নেই। একসময় কার ডাক কানে ভেসে এল।

চমকে সামনের দিকে তাকাল বিনু, কাউকে দেখতে পেল না।

আবার ডাকটা শোনা গেল, 'ছুটোবাবু—ছুটোবাবু—'

এদিকে সেদিকে তাকাতে তাকাতে এবার বিনুর চোখে পড়ল। পচা পাটের স্তূপের ভেতর সেই

লোকটা বসে আছে। লোক না বলে তাকে ছোকরা বলাই উচিত।

ফিটনে করে আসার সময় ওইখানেই দু'জনকে কী করতে দেখেছিল বিনু, পরে টানাটানি করে তাদের মালপত্র নামাতে দেখেছে, নামও জেনেছে। একজনের নাম যুগল, অন্য জনের নাম করিম। তবে কে যুগল কে করিম, জানা যায় নি।

যুগল হোক করিম হোক, এখন একজনই বসে বসে পচা পাটের গা থেকে আঁশ ছাড়াচ্ছে। আরেকজনকে দেখা গেল না।

চোখাচোখি হতেই সে হাতছানি দিল। পায়ে পায়ে বিনু কাছে এগিয়ে এল। বলল, 'ডাকছ কেন?'

ছোকরার বয়স কুড়ি একুশের মধ্যে। চওড়া হাড়, মোটা মোটা আঙুল, প্রকাণ্ড বুক, সরু কোমর—সবই তার বলশালিতার প্রতীক। গায়ের রং রোদে পুড়ে পুড়ে তামাটে। চুলগুলো খাড়া খাড়া, দুর্বিনীত। তেলে-জলে অথবা চিরুনিতে কোনও দিন তাদের বশ মানানো যাবে, তা যেন নেহাতই দুরাশা। পরনে ভিজে সপসপে এক টুকরো টেনি, কোমরের কাছটায় কোনও রকমে জড়ানো। এছাড়া আর কিছুই নেই। বড় বড় ড্যাবড্যাবে দু'টো চোখ সরলতায় মাখা।

দু'পাটির সবগুলো দাঁত মেলে দিয়ে হাসল ছোকরা। বলল, 'আপনেরা কইলকাতা থনে (থেকে) আইলেন?'

স্টিমারে আসতে আসতে বাংলাদেশের এ প্রান্তের আঞ্চলিক ভাষা শুনেছে বিনু, বিচিত্র উচ্চারণগুলি লক্ষ করেছে। যা শুনেছে তার সিকিও বোঝে নি। তবে সব মিলিয়ে তার খুব মজা লেগেছে, ভালও লেগেছে। সেটা খুব সম্ভব নতুনত্বের জন্য, বৈচিত্রের জন্য।

ছোকরা যা বলল, প্রথমটা বুঝতে পারল না বিনু। অনেকটা অনুমানের ওপর ভরসা করে বলল, 'কলকাতার কথা বলছ?'

'হ।' ছোকরা মাথা নাড়ল, 'কইলকাতা মেলা (অনেক) দূরে, না?'

এবার বুঝতে পারল বিনু। বলল, 'হ্যাঁ।'

'কয়দিন লাগে যাইতে?'

মনে মনে হিসেব করে বিনু বলল, 'দেড় দিনের মতো।'

'যাইতে হইলে ইস্টিমারে চড়ন লাগে?'

'হ্যাঁ।'

'রেলগাড়িতে?'

'হ্যাঁ।'

ছোকরার চোখ চকচক করতে লাগল, 'জানেন আমি কুনোদিন রেলগাড়ি দেখি নাই।'

করুণাই হল বিনুর। বলল, 'রেলগাড়ি দেখ নি! কেন, তোমাদের এখানে রেলগাড়ি নেই?'

'না। আছে হেই ঢাকার শহরে। আমি কুনোদিন ঢাকায় যাই নাই।'

একটু চুপচাপ। তারপর ছোকরা আবার শুরু করল, 'আইচ্ছা ছুটোবাবু—'

'কী বলছ?'

'কইলকাতা তো পেল্লায় শহর, না?'

এবারও আন্দাজে বুঝে নিল বিনু। বলল, 'হ্যাঁ।'

'কত বড় ক'ন দেখি।' ছোকরা সাগ্রহে শুধলো, 'আমাগো রাইজদা আপনে দেখছেন?'

'রাইজদা' অর্থাৎ রাজদিয়া। বিনু বলল, 'সবটা দেখি নি। আসতে আসতে যেটুকু চোখে পড়েছে, দেখেছি।'

ছোকরা বলল, 'এই ধারে আর কতটুক! উইধারে এইর ডাবল, তিন ডাবল। আইচ্ছা, কয়খান রাইজদা একলগে করলে একখান কইলকাতা হয়?'

নাক কুঁচকে তাচ্ছিল্যের সুরে বিনু বলল, 'হাজার হাজার।'

চোখ দু'টো গোল হয়ে গেল ছোকরার। অবাক বিস্ময়ে বলল, 'ক'ন কী!'

ছোকরা 'আপনি' 'আপনি' করছে। এত মর্যাদা দিয়ে আগে আর কেউ তার সঙ্গে কথা বলে নি। মনে মনে নিজেকে রীতিমতো বিশিষ্ট আর সম্মানিত মনে হচ্ছে। বিনু বলল, 'একবার গিয়ে

করল, 'এটা কী?'

যুগল বলল, ' 'চাই'।'

'কী হয় এটা দিয়ে?'

'ভিতরে তাকাইয়া দ্যাখেন ছুটোবাবু।'

প্রথমটা লক্ষ করে নি বিনু। যুগলের কথামতো তাকাতেই খুশিতে তার চোখ চকচকিয়ে উঠল। 'চাই'-য়ের ভেতরটা মাছে বোঝাই, রোদ লেগে রুপোলি আঁশগুলো ঝলকে উঠছে।

বিনু প্রায় লাফ দিয়েই উঠল, 'ইস, কত মাছ!'

'এই মাছ দেইখ্যাই ক'ন কত মাছ! আইতেন বষ্যাকালে, দেখতেন মাছ কারে কয়!' বলতে বলতে কী এক কৌশলে 'চাই'-য়ের পেছন দিকটা খুলে ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে মাছগুলো ঝুপ ঝুপ করে মাটিতে পড়ে লাফাতে লাগল। নানা রকমের মাছ। বেশির ভাগই বিনুর চেনা। রুই, কালবোস, বড় বড় সরপুঁটি, গোলসা ট্যাংরা আর বেলে—এগুলো চিনতে পারল সে। বাদ বাকি অচেনা।

মাছ বার করা হয়ে গিয়েছিল। যুগল বলল, 'ছুটোবাবু আপনে ইট্টু (একটু) মাছগুলার কাছে খাড়ন, দেইখেন চিলে আর কাউয়ায় (কাকে) আবার তুইলা নিয়া না যায়।'

বিনু জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কোথায় যাবে?'

'ধানখ্যাতে, 'চাই'টা আবার পাইতা রাইখা আসি।' মাছ-ধরা ফাঁদের পেছন দিকটা তাড়াতাড়ি আটকে দিয়ে জলে গিয়ে নামল যুগল। নিমেষে ধানবনে সেটা রেখে ফিরে এল। তারপর যেখানে পচা পাট স্তূপাকার হয়ে আছে সেখান থেকে একটা বড় গামছা এনে মাছগুলো বেঁধে উঠে দাঁড়াল। বলল, 'চলেন ছুটোবাবু—'

'কোথায়?

'মাছগুলা ভিতরে দিয়া আসি।'

দু'জনে বাড়ির দিকে চলতে লাগল।

বিনু মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল। মাছ ধরা, সাঁতার কাটা, ইত্যাদি কর্মকুশলতায় যুগল তাকে জয় করে নিয়েছে।

পাশ থেকে যুগলকে একবার দেখে নিয়ে বিনু বলল, 'তুমি তো খুব সাঁতার কাটতে পার!'

'হ—' মাথাটা অনেকখানি হেলিয়ে যুগল বলল, 'তা পারি। আমারে পুকৈর পার হইতে দ্যাখলেন তো?'

'হ্যাঁ।'

'এইরকম তিনটা পুকৈর আমি এক ডুবে পার হইয়া যাইতে পারি। ইস্টিমারে কইরা যে গাং দিয়া আইলেন—'

'হ্যাঁ—'

'সাতইরা (সাঁতরে) উই গাংটা যে কতবার এপার-ওপার করছি, হিসাব নাই ছুটোবাবু।'

আগে মুগ্ধ হয়েছিল, এবার একেবারে ভক্তই হয়ে পড়ল বিনু। তোষামোদের সুরে বলল, 'আমাকে একটু সাঁতার শিখিয়ে দেবে?'

চলতে চলতে হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াল যুগল। বিস্ময়ে তার চোখ গোলকার হয়ে গেছে। সাঁতার জানে না, এমন মানুষ জীবনে এই বোধহয় প্রথম দেখল সে। বলল, 'আপনে সাতর জানেন না ছুটোবাবু!'

চোখ নামিয়ে বিনু খুব আস্তে করে বলল, 'না।' লজ্জায় মাথা তুলতে পারছিল না সে।

কলকাতায় থাকে বলে বিনুর খুব গর্ব। তার ধারণা, পৃথিবীর সব কিছু জেনে বসে আছে। কিন্তু একটি গেঁয়ো যুবকের কাছে যে পরাজয় মানতে হবে তা কে জানতো?

আবার হাঁটতে শুরু করল যুগল। 'আমাগো এইহানে কুলের (কোলের) পুলাটাও (ছেলেটাও) সাতর দিতে পারে। ডর নাই, দুই চাইর দিনের ভিতর সাতর শিখাইয়া, মাছ ধরা শিখাইয়া আপনেরে চালাক কইরা দিমু।'

বিনু গম্ভীর হয়ে গেল। যুগলের কাছ থেকে চালাক হবার পাঠ নিতে হবে, এতখানি মেনে নিতে সে রাজি না। বলল, 'আমি বোকা না।'

যুগল বলল, 'হে তো জানিই ছুটোবাবু—'

একটু পর তারা ভেতর-বাড়িতে এসে পড়ল। যুগল ডাকল, 'ঠাউরমা, ইট্টু বাইরে আসেন দেখি—'

রান্নাঘর থেকে স্নেহলতা বেরিয়ে এলেন। তাঁর পিছু পিছু শিবানী সুরমা সুনীতি আর ঝিনুকও এল।

ততক্ষণে গামছা খুলে মাছগুলো ঢেলে ফেলেছে যুগল। সুনীতি সবিস্ময়ে বলল, 'এত মাছ কোথায় পেলে!'

সবগুলো দাঁত বার করে হাসল যুগল, 'ধরলাম।'

বিপুল উৎসাহে হাত-পা নেড়ে যুগলের মাছ ধরার পদ্ধতি বর্ণনা করতে লাগল বিনু।

স্নেহলতা সস্নেহ ভর্ৎসনার সুরে বললেন, 'একেবারে মেছো রাশি। দিনরাত খালি মাছই ধরছে। আর ধরতেও পারে! মাছ যেন ওর গায়ে লেগে উঠে আসে।'

মাছ দেখে সুরমা খুব খুশি। বললেন, 'ছেলেটা কে গো মামী?'

স্নেহলতা সংক্ষেপে পরিচয় দিলেন। এখান থেকে মাইল বিশেক দূরে ভাটি অঞ্চলে পাকসি বলে ভুঁইমালীদের একটা গ্রাম আছে। যুগলদের বাড়ি সেইখানে। তবে বাড়ির সঙ্গে, বাপ-মা ভাই-বোনের সঙ্গে সম্পর্ক নেই বললেই হয়। দশ বছর বয়সে হেমনাথ তাকে নিজের কাছে নিয়ে এসেছিলেন। সেই থেকে যুগল এ বাড়িরই ছেলে, ক্বচিৎ কখনও নিজেদের বাড়ি যায়। আজ যায় তো, কাল ফিরে আসে। এখানে থেকে থেকে বাপ-মা'র কাছে গিয়ে ওর মনই বসে না।

উঠোনে মাছগুলো লাফালাফি করছে। ওঘর থেকে সুধা দেখতে পেয়েছিল, ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে এল। চোখ বড় করে বলল, 'কত মাছ রে!'

একটু পর অবনীমোহন আর হিরণও এল। মাছ দেখে সবাই বেজায় খুশি। জল-বাংলার রুপোলি ফসল সকলকে উচ্ছ্বসিত করে তুলেছে।

স্নেহলতা যুগলের দিকে ফিরে বললেন, 'দিনরাত তো মাছরাঙার মতো মাছের পেছনে লেগে রয়েছ। পাট তোলা হয়েছে?'

যুগল একগাল হেসে ঘাড় চুলকোতে চুলকোতে বলল, 'না।'

'উনি কেতুগঞ্জ থেকে এসে যদি দেখেন পাটের মনে পাট পড়ে আছে, মাছ খাওয়াবে'খন।'

'ঠাউরদা আহনের (আসার) আগেই পাট তুইলা ফেলামু।' বলেই দৌড় লাগাল যুগল। উঠোনের আধাআধি গিয়ে হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে বিনুকে ডাকল, 'আইবেন নিকি ছুটোবাবু?'

যুগলের সঙ্গ মোটামুটি ভালই লাগছিল। বিনু এগিয়ে গেল।

অবনীমোহন বললেন, 'দু'জনের বেশ ভাব হয়ে গেছে দেখছি।'

সুরমা হাসলেন, 'তাই তো মনে হচ্ছে। মাছ ধরার কায়দা দেখিয়ে যুগল বিনুকে একেবারে তাক লাগিয়ে দিয়েছে।'

বার-বাড়ির সেই বাগানে এসে পচা পাটের স্তূপের ভেতর বসে পড়ল যুগল। একটু দূরে একটা গাছের মোটা শিকড়ের ওপর বসল বিনু।

হাতের কৌশলে অতি দ্রুত পচা পাট থেকে আঁশ আর শোলা বার করে দু'ধারে রাখতে লাগল যুগল। সেই সঙ্গে চলল গল্প।

জাদুকর যেমন ঝাঁপির ভেতর থেকে একের পর এক অচেনা বিস্ময় তুলে এনে চমকে দেয়, তেমনি কথায় কথায় নিজের তাবৎ গুণ জাহির করতে লাগল যুগল। বিনা পালে শুধু একখানা বৈঠার ভরসায় নৌকো নিয়ে বর্ষার নদী পেরিয়ে যেতে পারে, রাতের পর রাত কৃষ্ণলীলা আর রয়ানির আসরে গান গেয়েও তার গলা ভাঙে না। ইত্যাদি।

যত শুনছিল ততই অবাক হয়ে যাচ্ছিল বিনু। গানের কথায় বিস্ময়টা তার শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছুল। বলল, 'তুমি গাইতেও পার!'

'না পারি কী? হগলই পারি।' যুগল বলতে লাগল, 'আমার গীত শুনলে মাইনষে মোহিত্ হইয়া যায়।'

pathagar.net

'তাই নাকি?'

আশ্বাসের সুরে যুগল বলল, 'শুনামু ছুটোবাবু, আপনেরে একদিন আ...র গীত শুনাইয়া দিমু। তহন বুঝবেন, যুগইলা মিছা কয় নাই।'

শরতের বাতাস এলোমেলো বয়ে চলেছে। কখনও ঝড়ের মতো সাঁই সাঁই ঘোড়া ছুটিয়ে যাচ্ছে, কখনও ঝিরঝিরে সুখস্পর্শে ঘুম এসে যায়। স্টিমারে আসতে আসতে মনে হয়েছিল, আকাশময় কে এক অদৃশ্য ধুনুরি পেঁজা তুলো ছড়িয়ে রেখেছে। কখন যে রং বদলে মেঘগুলো কালো হয়ে গেছে, বিনুরা লক্ষ কর নি। ধীরে ধীরে বাতি নিবে এলে যেমন হয় সেইরকম রোদটা কখন যেন দীপ্তি হারিয়ে, উজ্জ্বলতা হারিয়ে, মলিন হয়ে গেছে।

গল্প করতে করতে পুকুরের ওপারে তাকাল বিনু। ধানবনে ঢেউ তুলে বাতাস বয়ে যাচ্ছে। দু'চারটে নৌকোও চোখে পড়ছে। ধানখেত সিঁথির মতো চিরে তারা কোথায় পাড়ি জমিয়েছে, কে জানে।

হঠাৎ বিনু বলল, 'আচ্ছা, ওই দিকটায় ধানখেত আর জল ছাড়া কি কিছুই নেই?'

যুগল বলল, 'আছে তো।'

'কী?'

যুগল এবার যা বলল তা এইরকম। ধুধু এই জলরাশি আর ধানের অরণ্যের ভেতর দ্বীপের মতো অনেকগুলো কৃষাণ গ্রাম মাথা তুলে আছে। আরও জানালো, সেই আষাঢ় মাস থেকে কার্তিকের শেষাশেষি পর্যন্ত গ্রামগুলো একখানা সমুদ্রের ওপর যেন ভাসতে থাকে। তারপর মাঠের জল সরে গেলে কয়েকটা মাস নিশ্চিন্ত।

বিনু শুধলো, 'ওই জল কি নেমে যাবে?'

'যাইব বৈকি। এইর মদ্যেই টান ধরছে—' যুগল বলতে লাগল, 'আশ্বিনের শ্যাষাশেষি দেখবেন, জল কত বইমা গ্যাছে। অঘ্রাণ মাসে চাইর দিক শুকনা খটখইটা (খটখটে) হইয়া যাইব।'

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে যেতে বিনু তাড়াতাড়ি জিজ্ঞেস করল, 'চারদিক তো জলে ডুবে আছে। ওখানে লোক যায় কী করে?'

'নওয়ে কইরা।' যুগল বলতে লাগল, 'দুই চাইর দিন থাকেন, বুজতে পারবেন নাওই এইহানকার মাইনষের হাত-পাও। নাও ছাড়া এই জলের দ্যাশে কুনোহানে যাওনের উপায় নাই।'

একটু ভেবে বিনু বলল, 'ওই সব গ্রাম ছাড়া ওধারে আর কী আছে?'

'বড় বড় গুঞ্জ (গঞ্জ)।'

'গুঞ্জ কী?'

'বাজার আর কি, যেইহানে মাল বিকিকিনি হয়। কী একেকখান গুঞ্জ ছুটোবাবু—দিনরাইত মাইনষের চিল্লাচিল্লিতে গমগম করে। দেলভোগ মোহনগুঞ্জ মীরপুর সুজনগুঞ্জ—যেহানেই যান, এক অবোস্তা।'

সুজনগঞ্জ নামটা বিনুর চেনা চেনা লাগল। কিন্তু কোথায় কার কাছে শুনেছে, এই মুহূর্তে কিছুতেই মনে করতে পারল না।

যুগল থামে নি, 'পূজা আইতে আছে ছুটোবাবু। সুজনগুঞ্জে মীরপুরে দেলভোগে রাইতের পর রাইত যাত্রাগান হইব। অ্যামনেই মাইনষের ভিড়ে পাও ফেলান যায় না, তহন পুরা রাজ্যি এক্কেবারে ভাইঙ্গা পড়ব।'

বিনু বলল, 'জানো, আমি কখনও যাত্রা দেখি নি।'

বরদানের ভঙ্গিতে যুগল বলল, 'তার লেইগা কি, আমি আপনেরে দেখাইয়া আনুম। কয়টা আর দিন, পূজা তো আইসাই পড়ছে।'

বিনু বলল, 'কথা দিলে। নিয়ে যেতে হবে কিন্তু—'

'যামু—যামু—যামু—'

বিনু আর কিছু বলল না। স্বপ্নলোকের রহস্যময় সংকেতের মতো দিগন্তের ওপার থেকে দেলভোগ-সুজনগঞ্জ-মীরপুর-ইনামগঞ্জ, এই বিচিত্র নামগুলো আর যাত্রাগানের আসর তাকে বার বার যেন হাতছানি দিতে লাগল।

pathagar.net

রান্নাবান্না শেষ হতে দুপুর পেরিয়ে গেল। তখনও হেমনাথ ফিরলেন না।

সবার চান হয়ে গিয়েছিল। সুরমা-সুধা-সুনীতি-ঝিনুক বাড়িতেই তোলা জলে চান সেরেছে। অবনীমোহন বিনু আর হিরণ গিয়েছিল পুকুরে। সঙ্গে যুগলও ছিল। আজ থেকেই যুগলের কাছে সাঁতারের তালিম নিতে শুরু করেছে বিনু।

নতুন জায়গা, নতুন জল বলে বেশিক্ষণ পুকুরে হুটোপাটি করতে দেন নি অবনীমোহন। সে জন্য মুখখানা ভারী হয়ে আছে বিনুর।

যাই হোক, রান্নাঘরে বড় বড় কাঁঠাল কাঠের পিঁড়ি পেতে থালা সাজিয়ে স্নেহলতা খেতে ডাকলেন।

অবনীমোহন বললেন, 'মামাবাবুর জন্যে আরেকটু অপেক্ষা করি। তারপর না হয়—'

'অপেক্ষা করে লাভ নেই বাবা। হয়তো আজ ফিরবেনই না।'

'এরকম হয় নাকি?'

স্নেহলতা হাসলেন, 'প্রায়ই হয়। এই যে গেলেন, ফিরতে ফিরতে দু'চারদিনও লেগে যেতে পারে। ওঁর আশায় বসে থাকলে উপোস দিতে হবে।'

অগত্যা কী আর করা, খেতে বসতে হল।

ওবেলার মতো এবারও মাছের ভাগ নিয়ে বায়না করল ঝিনুক, এবং কেঁদে কেটে সব কিছু বিনুর সমান আদায় করে ছাড়ল।

খাওয়া দাওয়ার পর বিশ্রামের সুযোগ মিলল না। তার আগেই রাজদিয়ার এপাড়া ওপাড়া থেকে দলে দলে মানুষ আসতে লাগল। তারা স্নেহলতাকে ছেঁকে ধরল। মেয়ে-জামাই দেখাও, নাতি-নাতনী দেখাও।

স্নেহলতা সকলের সঙ্গে অবনীমোহনদের পরিচয় করিয়ে দিলেন। তাদের কেউ প্রণাম করে, কেউ প্রণাম নিয়ে পানের রসে ঠোঁট টুকটুকে করে বিদায় নিল। যাবার আগে সবাই নিমন্ত্রণ করে গেল, তাদের বাড়ি অন্তত একদিন করে যেতেই হবে।

অবনীমোহন অভিভূত হয়ে গিয়েছিলেন। বললেন, 'শুধু আমাদের দেখবার জন্যে এত লোক এসেছে!'

স্নেহলতা হাসলেন, 'হ্যাঁ। এখানে কারোর বাড়িতে লোকজন এলে রাজ্যের মানুষ ছুটে আসে। এক বাড়িতে উৎসব লাগলে সারা রাজদিয়ায় উৎসব লাগে। কোনও বাড়িতে কেউ মরলে টরলে সবার মন খারাপ হয়ে যায়।'

'চমৎকার জায়গা তো। অথচ কলকাতায়—' বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গেলেন অবনীমোহন। তুলনামূলকভাবে কলকাতা নামে এক উদাসীন, আত্মকেন্দ্রিক নগরীর কথা তাঁর মনে পড়ে যাচ্ছিল।

স্নেহলতা মনে করিয়ে দিলেন, 'কলকাতার কথা কী বলেছিলে অবনী?'

অবনীমোহনের দূরমনস্কতা কেটে গেল। বললেন, 'পাড়া দূরে থাক, এক বাড়িতে তিন ভাড়াটে থাকলে একজনের নাম আরেকজনের জানতে হয়তো বছর কেটে যায়।'

'বল কি অবনী!'

স্নেহলতা বললেন, 'ওখানকার লোক থাকে কী করে! আমি হলে দম বন্ধ হয়ে মরে যেতাম। সেদিক থেকে রাজদিয়ায় আমরা বেশ আছি।'

লোকজনের ভিড় কাটতে কাটতে বেলা পড়ে এসেছিল। আকাশে এখন মেঘ আছে, রোদও আছে—বেলাশেষের নরম সোনালি রোদ। খানিক আগে ঝিরঝির করে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে, এখন ছাটটা জোরাল নয়। কদমফুলের রেণুর মতো বাতাসে গুঁড়ো গুঁড়ো ইলশেগুঁড়ি উড়ছে।

অবনীমোহনেরা সেই পুবদুয়ারী ঘরটায় আবার আসর জমিয়ে বসেছেন। এ বাড়িতে কেউ চা

খায় না, অথচ অবনীমোহনের দু'বেলা চা না হলে পৃথিবী অন্ধকার। কাজেই কলকাতার এই চা-চাতকদের জন্য খেয়ে উঠেই রাজদিয়ার বাজার থেকে চা নিয়ে এসেছে হিরণ।

পেয়ালায় ধূমায়িত সোনালি তরল সামনে সাজিয়ে গল্প হচ্ছিল। ওবেলা অবনীমোহন সুধা আর হিরণ ছিল শুধু। এ বেলা সুনীতি সুরমা বিনু ঝিনুক স্নেহলতা, এমনকি শিবানীও এসে যোগ দিয়েছেন।

এলোমেলো, অসংলগ্ন নানা কথার পর হিরণের প্রসঙ্গ এসে পড়ল।

অবনীমোহন শুধোলেন, 'তুমি কোন ইউনিভার্সিটিতে পড় হিরণ?'

হিরণ বলল, 'ঢাকা।'

'তা হলে তো ঢাকাতেই থাকতে হয়।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি হোস্টেলে থাকি।'

'পুজোর ছুটিতে বাড়ি এসেছ বুঝি?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। ছুটি শেষ হলেই ফিরে যাব।' বলে, একটু থেমে, হিরণ ফের শুরু করে, 'ছুটিছাটা পেলেই আমি বাড়ি চলে আসি। ঢাকা আর কতক্ষণের পথ, স্টিমারে ঘন্টা পাঁচেক লাগে।'

অবনীমোহন বললেন, 'তোমার কোন ইয়ার যেন?'

'ফিফথ।'

'এম. এ'তে বি. এ'র মতো রেজাল্ট হবে তো?'

উত্তর দিতে গিয়ে সুধার সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল। পরিপূর্ণ উজ্জ্বল দৃষ্টিতে সুধা তাকিয়ে আছে। এক মুহূর্ত। তাড়াতাড়ি অন্য দিকে চোখ ফিরিয়ে সলজ্জ সুরে হিরণ বলল, 'দেখি—'

অবনীমোহন কী বলতে যাচ্ছিলেন, সেই সময়ে ঝুমঝুম বাজনার মতো শব্দ ভেসে এল, তার সঙ্গে ঘোড়ার পায়ের খটখট আওয়াজ।

সবাই একসঙ্গে জানালার বাইরে তাকাল। বিনুরা দেখতে পেল, সেই চমৎকার ফিটনটা আবার ফিরে এসেছে। এটায় করেই তারা স্টিমারঘাট থেকে এখানে এসেছিল।

সোজা উঠোনের মাঝখানে এসে গাড়িটা থামল। স্নেহলতা উদ্‌গ্রীব হয়ে ছিলেন। বললেন, 'ভবতোষ মনে হচ্ছে—'

ঠিক সেই সময় ফিটনের ভেতর থেকে যিনি নামলেন তাঁকে যুবকও বলা যায় না, আবার প্রৌঢ়ও না। দুইয়ের মাঝামাঝি তাঁর বয়স থমকে আছে।

ঝিনুক হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, 'বাবা এসেছে, বাবা এসেছে—' তারপর ঊর্ধ্বশ্বাসে উঠোনের দিকে ছুটল।

স্নেহলতা ঝিনুকের পিছু পিছু বড় বড় পা ফেলে ফিটনটার কাছে চলে এলেন। বিনু সুধা হিরণ ছুটে এসেছে। শিবানীও এসেছেন। সুনীতি ফিটন পর্যন্ত আসে নি, ঘর থেকে বেরিয়ে উঠোনে নেমেই থেমে গেছে। অবনীমোহন এবং সুরমা ঘর থেকে বেরোন নি, দরজার কাছাকাছি এসে দ্বিধান্বিতের মতো দাঁড়িয়ে পড়েছেন। সবার দৃষ্টি আগন্তুকের দিকে।

বিনু একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল। এই তবে ঝিনুকের বাবা!

বয়স কত হবে ভবতোষের? চল্লিশোর্ধ্বে, তবে পঞ্চাশের অনেক নিচে। চুল অযত্নে আর অবহেলায় এলোমেলো, কত কাল যে চিরুনি পড়ে নি! সমস্ত মুখ সাদা-কালো অজস্র অঙ্কুরে ছেয়ে আছে। চোখের কোলে ঘন শ্যাওলার মতো কালচে দাগ, কালো মণির চারধারে যে শ্বেত জমি এখন সেখানে রক্ত যেন জমাট বেঁধে আছে। দৃষ্টি উদ্‌ভ্রান্ত। হঠাৎ দেখলে মনে হয়, এই মাত্র শ্মশান থেকে ফিরলেন। তাঁকে ঘিরে দুর্বহ এক শোক রেখায়িত হয়ে রয়েছে।

ঘুম, বিশ্রাম, নিশ্চিন্ত জীবনযাত্রা—এসবের সঙ্গে বুঝিবা কয়েক যুগ সম্পর্ক নেই ভবতোষের। কেমন এক বিহ্বলতা তাঁকে ঘিরে আছে।

ঝিনুক ছুটে গিয়ে বাবার কোলে উঠেছিল। কলকল করে একসঙ্গে অনেক কথা বলে গেল সে। তার কতক বোঝা গেল, বেশির ভাগ দুর্বোধ্য। তবে বলার সুরে অভিমান আর রাগ যে জড়ানো, সেটা অনায়াসে টের পাওয়া গেল।

যেটুকু বোঝা গেছে তা এইরকম। ঝিনুক বলেছে, 'তুমি বললে মা'কে নিয়ে ডাক্তারের কাছে ঢাকায় যাচ্ছ। যাবে আর আসবে। এক মাস দু'মাস হয়ে গেল, তুমি আর আসো না।'

ভবতোষের মুখে মলিন হাসি। 'এক মাস দু'মাস কি রে, গেলাম তো পরশু বিকেলবেলা।'

'মা কোথায়?'

ঝাপসা, ভারী স্বরে ভবতোষ বললেন, 'হাসপাতালে রেখে এসেছি।'

'কবে আসবে?'

'চার পাঁচ দিন পরে নিয়ে আসব।'

ঝিনুকের সব প্রশ্নের উত্তর ঠিকই দিয়ে গেছেন ভবতোষ, তবে কেমন যেন শ্বাসরুদ্ধের মতো। গলার কাছের মোটা মোটা রক্তবাহী শিরাগুলো অস্বাভাবিক স্ফীত হয়ে উঠেছে। চোখ ফেটে হয়তো বা ফিনকি দিয়ে রক্তই ছুটবে।

বাতাসে কদম ফুলের রেণুর মতো যে ফিনফিনে ইলশেগুঁড়ি উড়ছিল, এখন আর তা নেই। তার বদলে শরতের ঝিরঝিরে বৃষ্টি আবার শুরু হয়ে গেছে।

স্নেহলতা বললেন, 'ঘরে চল ভব। এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে ভিজে নেয়ে যাবে।'

'আবার ঘরে যাব? আমি বরং ঝিনুককে নিয়ে এখন যাই। পরে আসব'খন।'

'ঝিনুককে নেবার জন্যেই ছুটে এসেছ নাকি?'

'হ্যাঁ, মানে—'

'সেজন্যে তোমাকে ব্যস্ত হতে হবে না।' স্নেহলতা বলতে লাগলেন, 'তুমি ঘরে এস তো। উঠোন পর্যন্ত এলে, ঘরে গিয়ে না বসলে আমাদের খুব খারাপ লাগবে।'

মৃদু স্বরে ভবতোষ বললেন, 'আচ্ছা, চলুন—'

এমনভাবে কথাগুলো বললেন ভবতোষ, যাতে মনে হয়, নিজের ইচ্ছায় তিনি চলেন না। হয়তো নিজের ইচ্ছা-অনিচ্ছা তাঁর ওপর ক্রিয়া করে না। অন্যের খুশিতে তাঁর চলাফেরা, ওঠাবসা। সমস্ত কিছুই অন্যের তাড়ায়, অন্যের নির্দেশে।

অবনীমোহনরা যেখানে আছেন সেই ঘরটার দিকে পা বাড়ালেন স্নেহলতা। অন্য সবাই তাঁর পিছু পিছু চলল।

যেতে যেতে স্নেহলতা শুধোলেন, 'ঢাকা থেকে কখন ফিরলে ভব?'

ভবতোষ বললেন, 'খানিক আগে। বাড়ি ফিরেই আপনাদের এখানে চলে এসেছি।'

'নারায়ণগঞ্জ থেকে কখন স্টিমার ধরেছ?'

'দশটা নাগাদ।'

'চান-খাওয়া নিশ্চয়ই হয় নি?'

'স্টিমারে মিষ্টি টিষ্টি খেয়েছিলাম।'

'মিষ্টি খেলে কখনও চলে? তোমার বাড়িতে তো রান্নাবান্না হয়নি। রাঁধবেই বা কে?'

ভবতোষ চুপ করে রইলেন। স্নেহলতা ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, 'একটু জিরিয়ে নাও, তারপর খেয়ে দেয়ে বাড়ি ফিরবে।'

অন্যমনস্কের মতো ভবতোষ বললেন, 'আচ্ছা।'

সামন্য নীরবতা। তারপর ভবতোষ ডাকলেন, 'খুড়িমা—'

'কী বলছ?' চলতে চলতে পেছন ফিরে একবার তাকিয়ে নিলেন স্নেহলতা।

'হেমকাকা আমার কাছে সেদিন ফিটনটা চেয়েছিলেন। কাদের আসবার কথা ছিল না?'

'হ্যাঁ।'

'তাঁরা এসেছেন?'

'হ্যাঁ। ভেতরে এস, আলাপ করিয়ে দিচ্ছি।'

pathagar.net

ঘরে এসে অবনীমোহনদের সঙ্গে ভবতোষের পরিচয় করিয়ে দিলেন স্নেহলতা। তারপর বললেন, 'এখন কিছু খাবে ভব?'

'না। তবে—'

'বলে ফেল না—'

'একটা জিনিস পেলে মন্দ হত না, কিন্তু আপনাদের এখানে তার প্রবেশ তো নিষিদ্ধ।'

স্নেহলতা হাসলেন, 'চা নিশ্চয়ই?'

ভবতোষ মাথা নাড়লেন।

স্নেহলতা বললেন 'এ বাড়িতে চা ঢুকে পড়েছে।'

ম্লান বিষণ্ণতার মধ্যেও ভবতোষের চোখে বিস্ময়ের ছায়া পড়ল। বললেন, 'কাকাবাবু চা ঢুকতে দিলেন!'

'না দিয়ে উপায় কী।' স্নেহলতা হাসতে হাসতে বললেন, 'আমার মেয়ে-জামাই, নাতি-নাতনীদের আবার ওই জিনিসটি না হলে চলে না।'

ভবতোষ বললেন, 'যাক, এ বাড়ি নিয়ে রাজদিয়ার সাত বাড়িতে তা হলে চা ঢোকার ছাড়পত্র পেল। এবার থেকে চায়ের লোভেও মাঝে মাঝে আসতে হবে।'

অবনীমোহন অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। বললেন, 'এ বাড়ি বাদ দিলে থাকে ছ'বাড়ি। ওই ছ'বাড়ি ছাড়া রাজদিয়ায় চায়ের চল নেই নাকি?'

ভবতোষ মৃদু হাসলেন, 'না। হেমকাকা নিজে পি. সি. রায়ের শিষ্য, রাজদিয়াকেও তাই করে ছেড়েছেন। শুধু আমরা ক'জন পাষন্ড তাঁকে অমান্য করে চলেছি।'

অবনীমোহনও হেসে ফেললেন।

একটু পরে চা এল। স্নেহলতা বা শিবানীর চা তৈরির অভ্যাস নেই, সুনীতিই করে এনে দিল।

চা খেতে খেতে ভবতোষ স্নেহলতার দিকে ফিরে বললেন, 'ঝিনুক কান্নাকাটি করে নি?'

'না।'

'আমার কথা বলেছিল?'

'মোটেও না। তবে—'

'কী?'

বিনুর দিকে আঙুল বাড়িয়ে স্নেহলতা বললেন, 'ওই দাদাভাইটা আসার পর খুব হিংসে হয়েছে। জেদ করে, বায়না ধরে ওর সমান সমান ভাগ আদায় করেছে।' বলে তিনি হাসতে লাগলেন।

ঘরের অন্য সবাইও হাসল। আর বিনু নেহাত অকারণেই হঠাৎ খুব লজ্জা পেয়ে গেল।

চা খাওয়া হলে তাড়া দিয়ে ভবতোষকে চান করতে পাঠালেন স্নেহলতা। পুকুরঘাট থেকে ফিরে এলে এ ঘরেই আসন পেতে খেতে বসিয়ে দিলেন।

বিশাল ঘরের এক ধারে দু'টো তক্তপোশ জোড়া দেওয়া। তার ওপর অবনীমোহনরা বসে আছেন। তাঁদের দৃষ্টি ভবতোষের ওপরেই স্থির হয়ে রয়েছে। এই মানুষটি সম্বন্ধে হেমনাথ এবং স্নেহলতা দু'জনে গাঢ় বিষাদময় কিছু ভূমিকা করে রেখেছিলেন। অবনীমোহনদের চোখ দেখে মনে হয়, সাগ্রহে কিসের যেন প্রতীক্ষা করছেন।

প্রায় নিঃশব্দেই খেয়ে যাচ্ছিলেন ভবতোষ। আধাআধি খাওয়া হয়েছে, এমন সময় স্নেহলতা ডাকলেন, 'ভব—'

পাত থেকে মুখ তুলে জিজ্ঞাসু চোখে তাকালেন ভবতোষ।

তক্ষুনি কিছু বললেন না স্নেহলতা। বলবেন কি বলবেন না, তাই নিয়ে মনে মনে খুব সম্ভব বোঝাপড়া করতে লাগলেন। অনেকক্ষণ পর দ্বিধান্বিত সুরে জিজ্ঞেস করলেন, 'কাল তোমার ফেরার কথা ছিল না?'

'হ্যাঁ।'

'এলে না যে?'

ভবতোষ উত্তর দিলেন না। ঝোলমাখা ভাতের ভেতর তাঁর হাত থেমে গেছে, কণ্ঠার কাছটা

থর থর কাঁপছে।

স্নেহলতা আবার প্রশ্ন করলেন, 'এই দু'দিন কি বউমাদের বাড়িতেই ছিলে?'

আস্তে মাথা নাড়লেন ভবতোষ, 'না।'

খানিক আগে চায়ের ব্যাপার নিয়ে লঘু কৌতুকের চিকচিকে একটু আভা ফুটেছিল সবার চোখেমুখে। সমস্ত আবহাওয়া আবার অত্যন্ত ভারী, কষ্টকর আর যন্ত্রণাদায়ক হয়ে উঠল।

স্নেহলতা বললেন, 'কোথায় ছিলে তবে?'

'আমার এক বন্ধুর বাড়ি টিকাটুলিতে।' ভবতোষ বললেন।

'বউমা কি সত্যিসত্যিই ওখানে থেকে যাবে?'

'হ্যাঁ।'

'তোমার শ্বশুরমশায় কী বললেন?'

এই ঘর বুঝি বায়ুশূন্য। শ্বাস টানতেও ভবতোষের কষ্ট হচ্ছে। অবরুদ্ধ গলায় বললেন, 'তাঁর কিছু বলবার নেই, মেয়েকে যথেষ্ট বকাবকি করেছেন। বকাই সার।'

'শাশুড়ি?'

'তিনিও মেয়েকে প্রশ্রয় দেননি। আমার সঙ্গেই ফিরিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এনে কী করব বলুন?'

বিমর্ষ সুরে স্নেহলতা বললেন, 'সে তো ঠিকই।'

ভবতোষ বলতে লাগলেন, 'আমার বন্ধুটি যার কাছে দু'দিন কাটিয়ে এলাম সে জগন্নাথ কলেজের অধ্যাপক। একসঙ্গে ঢাকায় ইউনিভার্সিটিতে পড়তাম। তাকে পাঠিয়েছিলাম বোঝাবার জন্যে। কিন্তু—'

'কী?'

'ঝিনুকের মা'র এক কথা, আমার সঙ্গে ঘর করবে না। রাজদিয়াতেও আর কখনও ফিরবে না।'

কেউ লক্ষ করে নি, একদৃষ্টে ভবতোষের দিকে তাকিয়ে সব কথা শুনে যাচ্ছিল ঝিনুক। হঠাৎ জোরে জোরে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

সবাই চমকে ঝিনুকের দিকে ফিরল। ভবতোষ আর স্নেহলতা প্রায় একসঙ্গেই বলে উঠলেন, 'কাঁদছিস কেন ঝিনুক?'

ফোঁপানি থামে নি, ক্রমশ সেটা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতে লাগল। এদিকে লাফ দিয়ে তক্তপোশ থেকে নেমে হিরণ ঝিনুককে কোলে তুলে নিল। মাথায় কপালে হাত বুলোতে বুলোতে, আদর করতে করতে, বলতে লাগল, 'কাঁদে না। তুমি লক্ষ্মী মেয়ে, সোনা মেয়ে। ভাল মেয়ে—'

কাঁদতে কাঁদতে হেঁচকি তুলতে থাকে ঝিনুক। জড়ানো জড়ানো, আধফোটা, আধভাঙা গলায় বলতে লাগল, 'মা আর আসবে না। মা আর আসবে না।'

ভর্ৎসনার সুরে ভবতোষের দিকে তাকিয়ে হিরণ বলল, 'কেন যে তোমরা মেয়েটার সামনে এসব নিয়ে আলোচনা কর!' এর আগেও একবার এ ব্যাপারে স্নেহলতাকে বকাবকি করেছে। সে আর দাঁড়াল না, ঝিনুককে নিয়ে বৃষ্টির ভেতরেই উঠোন পেরিয়ে ওধারের একটা ঘরে চলে গেল। আর এ ঘরে সময় যেন গতি হারিয়ে স্তব্ধ হয়ে রইল। ঝিনুকের সামনে এ প্রসঙ্গ তোলা যে খুবই অন্যায় হয়েছে, নীরবে সবাই তা অনুভব করতে লাগল।

কিছুক্ষণ পর পাতের ভাতগুলো নাড়াচাড়া করে উঠে পড়লেন ভবতোষ।

স্নেহলতা ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, 'ও কি, কিছুই তো প্রায় খেলে না। সব পড়ে রইল।'

বিস্বাদ সুরে ভবতোষ বললেন, 'আমার আর খেতে ইচ্ছা করছে না খুড়িমা—'

স্নেহলতা পীড়াপীড়ি করলেন না।

আঁচিয়ে এসে ভবতোষ বললেন, 'হেমকাকাকে তো দেখছি না।'

'উনি কেতুগেঞ্জ গেছেন।' স্নেহলতা বললেন।

'কখন ফিরবেন?'

স্নেহলতা বললেন, 'সে কথা জিজ্ঞেস কোরো না বাপু। আজও ফিরতে পারেন, কালও পারেন,

পরশুও পারেন। তোমার কাকাটিকে তো চেনোই। আমি একটা সময় বলি, উনি হয়তো তখন এলেন না। মাঝখান থেকে আমি মিথ্যেবাদী সাজতে পারব না।' হেমনাথ সম্পর্কে প্রায় এরকম কথাই খানিক আগে অবনীমোহনকেও বলেছিলেন তিনি।

ভবতোষ মৃদু হাসলেন। একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'আমি তা হলে এখন যাই খুড়িমা—'

'এখুনি যাবে?'

'হ্যাঁ। সন্ধে হয়ে এল। মেয়েটাকে নিয়ে আবার অনেকটা রাস্তা যেতে হবে।'

'ঝিনুককে সত্যিই নিয়ে যেতে চাইছ?'

'হ্যাঁ।'

'কেন?'

'আপনাদের কাছে দু'দিন তো রইল। ভয়ানক দুষ্টু। তার ওপর এঁরা সব এসেছেন—'

ভবতোষের ইঙ্গিত বুঝতে পারলেন স্নেহলতা। নিজের দায়িত্বভার অকারণে অন্যের ওপর চাপিয়ে রাখতে তিনি কুণ্ঠিত হচ্ছেন।

স্নেহলতা বললেন, 'আমার কাছে মাঝে মাঝে তো দিয়ে যাও। এখানে থাকার অভ্যেস ওর আছে, বেশ ভালই থাকে। দুষ্টুমির কথা বলছ? ওটুকু দুষ্টু সব ছেলেমেয়েই। আর ওরা এসেছে তো কী হয়েছে। ওদের সঙ্গে হইচই করে বেশ থাকবে, মায়ের কথা মনে পড়বে না। বরং—'

'বরং কী?'

একটু ইতস্তত করে স্নেহলতা বললেন, 'তোমার বাড়িতে তুমি একা। দিনরাত লেখাপড়া নিয়েই থাকো। ঝিনুকটা না পাবে একটা খেলার সঙ্গী, না পাবে কারোর সঙ্গে কথা বলতে। ও এখানেই থাক।'

ভবতোষ আস্তে আস্তে বললেন, 'আমার মনটা ভাল নেই খুড়িমা, আজ ও চলুক। দু'একদিন পর না হয় দিয়ে যাব।'

চুঁইয়ে চুঁইয়ে জল আসার মতো অদৃশ্য গোপন পথে অনেকখানি দুঃখ এই ঘরে ছড়িয়ে পড়েছিল। স্নেহলতা বুঝতে পারলেন, আজকের দিনটা অন্তত ঝিনুককে কাছে পাওয়া দরকার ভবতোষের। মেয়ের সঙ্গ তাকে খানিক সান্ত্বনা দিতে পারে। গাঢ় সহানুভূতির সুরে তিনি বললেন, 'আচ্ছা, নিয়েই যাও।'

ভবতোষ বললেন, 'রাগ করলেন না তো খুড়িমা?'

'পাগল ছেলে। তোমার ওপর কি রাগ করতে পারি!'

একটু চুপ করে থেকে ভবতোষ বললেন, 'এখন থেকে ঝিনুকের সব দায়িত্ব আপনাকেই নিতে হবে। আমার কলেজ খুললে ওকে কে দেখবে? আপনি ছাড়া মেয়েটাকে কেউ বাঁচাতে পারবে না। নির্ঘাত ও মরে যাবে।'

'ওসব আজ বাজে কথা বলতে নেই।'

'তা হলে এখন যাই?'

'এস।'

pathagar.net

দরজার দিকে পা বাড়াতে গিয়ে অবনীমোহনের কথা মনে পড়ে গেল ভবতোষের। ফিরে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আমাদের বাড়ি একদিন বেড়াতে যাবেন।'

অবনীমোহন বললেন, 'আপনিও আসবেন।'

'আসব।'

শরতের বৃষ্টি, এই আছে এই নেই। একটু আগেই স্বল্পায়ু শৌখিন বর্ষণ থেমে গেছে। ভবতোষ ঘর থেকে বাইরে এলেন, অন্য সবাইও সঙ্গে সঙ্গে এল।

ডাকাডাকি করে পাশের ঘর থেকে ঝিনুক আর হিরণকে বার করলেন স্নেহলতা। কী একটা মজার কথা হচ্ছিল দু'জনের। খুব হাসতে হাসতে ওরা এল। এর মধ্যেই ঝিনুককে ভুলিয়ে ভালিয়ে অন্যমনস্ক করে ফেলেছে হিরণ।

ফিটনটা উঠোনে দাঁড়িয়ে ছিল। স্নেহলতা বললেন, 'ঝিনুককে গাড়িতে তুলে দে হিরণ।'

হিরণ বলল, 'ও কি এখন চলে যাবে?'

'হ্যাঁ।'

ভবতোষ ইতিমধ্যে ফিটনে উঠে বসেছেন। ঝিনুককে তাঁর পাশে বসিয়ে দিতে দিতে হিরণ বলল, 'সারাদিন তো রইলাম, ভবদা'র গাড়িতে আমি বরং চলেই যাই ঠাকুমা।'

'উঁহু—'

'কেন, আর কোনও কাজ আছে?'

'কাজ নেই। তবে তোমার যাবার হুকুমও নেই।'

'দাদু না এলে ছাড়া পাব না?'

'না।'

'অগত্যা।'

ফিটন চলতে শুরু করল। দেখতে দেখতে উঠোন বাগান পেরিয়ে ঝিনুকরা রাস্তায় গিয়ে উঠল। আর অবনীমোহনরা ধীরে ধীরে ফিরে এলেন।

ঘরে এসে স্নেহলতা বললেন, 'ভবতোষের বউর মতো মেয়েছেলে জীবনে আর দেখিনি। সংসারটা একবারে ছারখার করে দিলে।'

সুরমা বললেন, 'কী এমন হয়েছে যে, স্বামীর সঙ্গে ঘর করবে না!'

'সন্ধে হয়ে এল, এসময় ওই অলক্ষ্মীর কথা থাক।'

ভবতোষরা চলে গেছেন, এ বাড়ির ওপর গাঢ় বিষাদ এখনও অনড় হয়ে আছে। বিনু কারোর কথা শুনছিল না, জানালার ফাঁক দিয়ে বাইরে তাকিয়ে ছিল। সেই সকাল থেকে দাদুর ভাগ নিয়ে, মাছের ভাগ নিয়ে, কলা আর রসগোল্লার ভাগ নিয়ে সমানে হিংসে করেছে ঝিনুক। তবু হিংসুটি মেয়েটার জন্য বিনুর মন খুব খারাপ হয়ে গেল।

একটু পর সন্ধে নেমে এল।

মাঝে মাঝে ঝিরঝিরে এক-আধ পশলা বৃষ্টি ছাড়া শরতের দিনটা ছিল বেশ নির্মল। তার গায়ে ছিল নরম সোনালি আভা মাখানো। দেখতে দেখতে জলে কালি গুলে দেবার মতো হাওয়ায় হাওয়ায় কেউ বুঝি কালচে রং মিশিয়ে দিতে লাগল। এই রং মেশানোর খেলাটা চলল অনেকক্ষণ। তারপর অন্ধকার গাঢ় হয়ে ঝপ করে একসময় রাত্রি নেমে গেল।

কলকাতার ফেনায়িত কলরব থেকে এত দূরে বিজলি আলোর দাক্ষিণ্য এসে পৌঁছয়নি। জানালার বাইরে যতদূর চোখ যায়, গাছপালা ঝাপসা দেখাচ্ছে। তৃতীয় ঋতুর এলোমেলো বাতাসে সুপারি বন অল্প অল্প দোল খাচ্ছে, আম বাগানটাকে কেমন ভুতুড়ে মনে হয়। পুকুরটাকে আর চেনাই যায় না। তার ওপারে ধানখেতে মিটমিটিয়ে জোনাকি জ্বলছে আর নিবছে, নিবছে আর জ্বলছে। দিগন্ত পর্যন্ত ধানের মাঠটা যেন একখানা জামদানি শাড়ি, জোনাকিরা তার গায়ে আলোর চুমকি।

স্নেহলতা ইতিমধ্যে ঘরে ঘরে হেরিকেন জ্বালিয়ে দিয়ে গেছেন। তা ছাড়া কাঠের তিনতলা পিলসুজে রেড়ির তেলের আলোও জ্বলছে। তবু ঘরগুলো পুরোপুরি আলোকিত নয়, এ কোণে ও কোণে অন্ধকার যেন জুজুবুড়ি হয়ে বসে আছে।

সেই পুবদুয়ারী ঘরখানায় অবনীমোহন সুধা সুনীতি আর বিনু এখনও বসে আছে। স্নেহলতা শিবানী রান্নাঘরে, রাতের রান্নার জন্য আনাজ কাটছেন। সুরমা কাছাকাছি বসে এ গল্প সে গল্প করছেন। এতকাল পর মামী মাসিকে পেয়ে কথা আর তাঁর ফুরোচ্ছে না।

জানালার বাইরে চোখ মেলেই ছিল বিনু। ধানখেতে জোনাকির নাচানাচি ওড়াওড়ি ছাড়াও মাঝে মাঝে আরও কিছু আলো ছোটাছুটি করে বেড়াচ্ছিল। ওগুলো কিসের আলো বুঝতে পারছিল না সে।

জোনাকি আর মাঝে মাঝে ধানখেতে আলোর ওই বিন্দু ক'টি ছাড়া চারধারে শুধু অন্ধকার—গাঢ়, অথৈ, অতল আঁধার।

পূর্ব বাংলার এই সুদূর প্রান্তে এত অন্ধকার জমা হয়ে থাকবে আর সন্ধে নামতে না নামতেই ঝুপ ঝুপ করে চারদিক থেকে ঘিরে ধরবে, কে ভাবতে পেরেছিল। কলকাতায় রাত্রি টেরই পাওয়া যায় না। সন্ধে হবার সঙ্গে সঙ্গে আলোর ফোয়ারা ছুটে যায়। আলোকিত নিশীথের যে স্বপ্নময়তা—

চিরদিন তাতেই অভ্যস্ত বিনু। কিন্তু এখানকার রাত্রি প্রতি মুহূর্তে বুঝিয়ে দিচ্ছে, সে আছে। সে আছে আকাশ বাতাস জল স্থল, সব কিছুর ওপর ব্যাপ্ত হয়ে। শুধু অচেতন জড় পৃথিবীর ওপর নয়, বুঝিবা জীব জগতের অস্তিত্বের ভেতর, তার গভীর মর্মমূল পর্যন্ত এই রাত্রি ছাড়িয়ে আছে। পূর্ব বাংলার অন্ধকার কোনওদিন ফুরোবে না। আজকের রাত শেষ হয়ে দিনের আলো আবার দেখা দেবে, এমন ভরসা মনের কোথাও খুঁজে পেল না বিনু।

খুব কাছ থেকে কে যেন ফিসফিসিয়ে ডাকল, 'ছুটোবাবু—'

বিনু চমকে উঠল। ভয়ও পেয়ে গেল খুব। চেঁচিয়েই উঠত, তার আগেই দেখতে পেল, জানালার ঠিক ওধারে একটু কোণের দিকে ভূতের মতো যে দাঁড়িয়ে আছে সে যুগল।

চোখাচোখি হতেই যুগল আগের সুরেই বলল, 'আসেন—'

'কোথায় যাব?'

'আসেন না—'

'বাইরে বড্ড অন্ধকার।'

'আন্ধারে ডর লাগে নিকি?' কেমন করে যেন হাসল যুগল।

ভয়ের কথায় পৌরুষে খোঁচা লাগল। গম্ভীর গলায় বিনু বলল, 'মোটেও না।'

'তয় আইসা পড়েন।'

অবনীমোহনরা কথা বলছিলেন। ওবেলার মতো চুপিসারে বেরিয়ে যাচ্ছিল বিনু, হঠাৎ সুধার চোখে পড়ে গেল।

সুধা বলল, 'এই কোথায় যাচ্ছিস রে?'

বিনু বলল, 'বাইরে।'

অবনীমোহন হিরণের সঙ্গে কথা বলতে বলতে মুখ ফেরালেন, 'বাইরে কী?'

একটু চুপ করে থেকে বিনু বলল, 'যুগল ডাকছে।'

'যুগলের সঙ্গে খুব খাতির দেখছি। আচ্ছা যা—'

বিনু ছুট লাগাতে যাচ্ছিল, সুধা বাধা দিল, 'না, যেতে হবে না। ওই ঘুরঘুট্টি অন্ধকারে গিয়ে এক কান্ড করে বোসো, আর আমরা তোমাকে নিয়ে পাগল হয়ে যাই—'

বাধা পেয়ে বিনু খেপে গেল। চোখ দিয়ে আগুনের হলকা ছুটতে লাগল যেন। স্টিমারঘাটে পারে নি, এখন তার পুরোপুরি শোধটুকু তুলে নিল। জিভ ভেংচে টেনে টেনে বলল, 'পা-গ-ল হ-য়ে যা-ই! চুপ কর বাঁদরী। তোর বেশি ওস্তাদি করত হবে না।'

সুধা আর বিনুর মধ্যে সম্পর্কটা নিয়ত শত্রুতার, চোখাচোখি হলেই তাদের যুদ্ধ। মাঝে মাঝে সন্ধি অবশ্য হয়, কিন্তু তা সাময়িক। দু'চার ঘন্টার বেশি তার আয়ু নয়। তারপরেই সব চুক্তি, সব শর্ত ছুঁড়ে দিয়ে তারা পরস্পরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। বারুদ সব সময় কামানে পোরাই আছে, যে কোনও কারণে যে কোনও সময় যুদ্ধ ঘোষণা হয়ে যেতে পারে।

এই অজানা ভুবনে, অচেনা মানুষের ভিড়ে প্রায় গোটা একটা দিন কেটে গেল, দুই ভাইবোনের লড়াই এখনও জমে নি। নতুন পরিবেশটা একটু সইয়ে নেবার শুধু অপেক্ষা।

সুধার চোখমুখ লাল হয়ে উঠেছিল। নেহাত হিরণ রয়েছে, নইলে এতক্ষণে তার নখে বিনুর গালের ছাল উড়ে যেত। সে-ও অবশ্য অক্ষত থাকত না, এক খামচা চুলের স্বত্ব তাকেও ছাড়তে হত।

চকিতে হিরণকে একবার দেখে নিল সুধা। হিরণের শক্তবদ্ধ চাপা ঠোঁটের ফাঁকে যা আবছাভাব ফুটে আছে তার নাম হাসি কিনা, বুঝতে পারা গেল না। দ্রুত চোখ ফিরিয়ে সে চেঁচিয়ে উঠল, 'দেখছ বাবা, দেখছ—কিরকম অসভ্য হয়ে উঠেছে বিনুটা!'

অবনীমোহন হাসতে লাগলেন।

সুধা ঝঙ্কার দিয়ে উঠল, 'তুমি হাসছ বাবা!'

অবনীমোহন বললেন, 'হাসব না তো কী করব?'

সুধা গলার স্বর আরেক পর্দা তুলল, 'আদর দিয়ে দিয়ে তুমি ওটাকে একটা আস্ত বাঁদর করে

তুলছ।'

'আদর তো আমি তোকেও দিই। বিনু বাঁদর হলে তুই কী?'

সুধা চেঁচিয়ে উঠল, 'বাবা!'

ছেলেমেয়েদের পেছনে লাগার স্বভাব অবনীমোহনের। তিনি সমানে হাসতে লাগলেন। হিরণের ঠোঁটদু'টো আরও শক্ত হয়ে গেছে, ভেতরে কিছু একটা চলছিল। বুদবুদের মতো ফুটি ফুটি করেও বেরিয়ে আসতে পারছে না।

বিনু আর দাঁড়াল না, পায়ে পায়ে দরজার দিকে এগুতে লাগল। সুধা বলল, 'ওকে তুমি বারণ কর বাবা, কিছুতেই বাইরে যেতে পারবে না।' সুধার যেন জেদই চেপে গেছে। সে-ও যে বিনুর অভিভাবক, তার ইচ্ছাকে অগ্রাহ্য করে বিনুর কোথাও যাবার সে উপায় নেই, হিরণের সামনে সেটাই প্রমাণ করতে চাইছিল সুধা।

অবনীমোহন হাসি থামিয়ে শান্ত গলায় বোঝাতে লাগলেন, 'এখানে আমাদের মাঝখানে বেচারি মুখ বুজে বসে ছিল। যাক না যুগলের সঙ্গে—'

অবনীমোহন শেষ করতে পারলেন না, সুধা হঠাৎ প্রবল বেগে হাত পা এবং মাথা ঝাঁকাতে শুরু করল। তবে সে আর কিছু বলার আগেই লাফ দিয়ে বিনু বাইরে বেরিয়ে গেল।

বারান্দায় এসে কারোকে দেখতে পাওয়া গেল না। তবে কি যুগল চলে গেছে? আস্তে আস্তে বিনু ডাকল, 'যুগল—যুগল—'

ঘরের ভেতর ঝড়ের আভাস পেয়ে উঠোনে নেমে গিয়েছিল যুগল। অন্ধকার ফুঁড়ে সে কাছে এসে দাঁড়াল, 'এই যে ছুটোবাবু—'

'ওখানে কী করছিলে?'

উত্তর না দিয়ে হি হি করে হাসতে লাগল যুগল। হাসতে হাসতেই বলল, 'ঘরের ভিত্‌রে যা হইতে আছিল, উইহানে খাড়ইয়া থাকতে সাহস হয় নাই। ছুটোদিদি বুঝিন আপনেরে আইতে দিতে চায় না?'

'ধুঁ, আমাকে ও আটকাবে!' বীরের মতো ভঙ্গি করে বিনু বলল, 'কী জন্যে ডাকছিলে বল—'

'আসেন আমার লগে (সঙ্গে)।'

'কোথায়?'

'গ্যালেই দেখতে পাইবেন।'

নিঃশব্দে অন্ধের মতো যুগলকে অনুসরণ করতে লাগল বিনু। উঠোন পেরিয়ে তারা প্রথমে এল রান্নাঘরে। দরজার বাইরে থেকে যুগল ডাকল, 'ঠাউরমা—'

স্নেহলতা সাড়া দিলেন, 'কে, যুগল?'

'হ।'

'কিছু বলবি?'

'আপনের কাছে হেইদিন যে বড় বরিটা (বড়শি) দিছিলাম, হেইটা দ্যান। পুকৈরে শৌল আর বোয়াল যা ঘাই মারতে আছে—'

'বরি' কী, বুঝতে পারল না বিনু।

স্নেহলতা শুধোলেন, 'আবার বুঝি মাছের পেছন লাগতে যাচ্ছিস?'

যুগল ঘাড় চুলকোতে লাগল।

স্নেহলতা জিজ্ঞেস করলেন, 'পাট তোলা হয়ে গেছে?'

'হ।'

হাতের ভর দিয়ে উঠে পড়লেন স্নেহলতা। তারপর সামনের দেয়ালের উঁচু তাক থেকে প্রকাণ্ড একটা বড়শি বার করে বললেন, 'এই নে—'

রান্নাঘরের ভেতর থেকে হেরিকেনের আলো বাইরে এসে পড়ছিল। বড়শি দিতে গিয়ে বিনুকে দেখতে পেলেন স্নেহলতা। বললেন, 'একি, দাদাভাইকেও জুটিয়ে নিয়েছিস দেখছি।'

pathagar.net

এক ফাঁড়া কাটিয়ে এসেছে, আবার যদি বাধা পড়ে সেই ভয়ে তাড়াতাড়ি বিনু বলে উঠল, 'বাবাকে বলে এসেছি।'

সুরমা ভেতর থেকে বললেন, 'ওর সঙ্গে ঘুরছ, ঘোরো। অন্ধকারে বেশি হুটোপুটি কোরো না।'

বিনু তক্ষুনি ঘাড় কাত করল, 'আচ্ছা।'

খানিক পর বিনুকে সঙ্গে নিয়ে উঠোন বাগান পেরিয়ে পুকুরের কাছে চলে এল যুগল। অন্ধকারে বিনুর ভয় ভয় করছিল, কিন্তু সে কথা তো আর যুগলকে বলা যায় না।

ঘরে বসে দেখতে পাওয়া যায় নি, পুকুরপাড়ে এসে বিনু দেখতে পেল, শরতের উজ্জ্বল নীলাকাশে সরু একফালি চাঁদ। চঞ্চল ভারহীন মেঘ তার মুখে বার বার পর্দা টেনে পরক্ষণেই নিরুদ্দেশে পাড়ি দিচ্ছে।

চাঁদ আছে ঠিকই, কিন্তু আলো নেই। আলো বলতে দূরের ধানখেতে রাশি রাশি জোনাকি। আলোর ছুঁচের মতো অন্ধকারকে তারা অবিরাম বিঁধে যাচ্ছে।

সঙ্গে করে একটা লম্বা দড়ি নিয়ে এসেছিল যুগল। অন্ধকারেই দড়ির একটা মাথায় বড়শিটা পরিয়ে একটা জ্যান্ত টাকি মাছ গেঁথে দিয়ে বলল, 'ছুটোবাবু, আমি উই গাছটায় উইঠা 'বরি'টা বাইন্ধা দিমু। তলে একা একা খাড়ইয়া থাকতে ডর লাগব না তো?'

শুনেই বুকের ভেতরটা ছাঁৎ করে উঠল। এখানে একলা দাঁড়িয়ে থাকতে হলে নির্ঘাত দম আটকেই সে মরে যাবে। কিন্তু তা বলা গেল না। তার বদলে বীরত্ব ফলাতে হল, 'একটুও ভয় লাগবে না।' বলল বটে, স্বরটা কিন্তু কেমন কাঁপা কাঁপা শোনাল।

পুকুরের গা ঘেঁষেই একটা ঝুপসি আমগাছ। তার গোটা দুই ডাল জলের ওপর ঝুঁকে পড়েছে। চোখের পলকে তর তর করে উঠে গিয়ে টাকি মাছের টোপসুদ্ধ বড়শিটা জলে নামিয়ে দিল যুগল, তারপর দড়ির অন্য প্রান্তটা ডালে বেঁধে দিয়ে তক্ষুনি নেমে এল।

যতক্ষণ যুগল গাছে ছিল, দমবন্ধ করে দাঁড়িয়ে থেকেছে বিনু। যুগল নেমে এলে ধীরে ধীরে বুকের ভেতর থেকে আবদ্ধ বাতাস বার করে দিল সে।

পুকুর তোলপাড় করে মাছেরা লাফালাফি করছিল। যুগল বলল, 'শুনতে আছেন ছুটোবাবু?'

বিনু যুগলের কাছে আরেকটু ঘন হয়ে এল। ক্ষীণ সুরে বলল, 'কিসের আওয়াজ?'

বিনুর স্বরটা খেয়াল করে নি, যুগলের ধ্যান-জ্ঞান তখন পুকুরের দিকে। লোভী, ফিসফিস গলায় যে বলল, 'মাছ ছুটোবাবু, মাছ। মনে লয়, সাই (প্রকান্ড) বোয়াল কি কাতল (কাতলা)। দুইটাই রাইক্ষইসা মাছ। ইট্টু খাড়ন। অহনই শালারা বরি গিলা ফেলাইব।'

চারদিক নিঝুম, জনহীন। অবশ্য ঝোপঝাড়ে আর নিবিড় বনানীর ফাঁকে ঝিঁঝিদের জলসা বসেছে। একটানা ঝিল্লিস্বর শুনতে শুনতে দু'জনে পুকুরপাড়ে দাঁড়িয়ে রইল।

যুগল আবার কী বলতে যাচ্ছিল, সেই সময় দেখা গেল দূরের ধানখেত চিরে আলোর ক'টি বিন্দু দুলতে দুলতে এগিয়ে আসছে।

বিনু জিজ্ঞেস করল, 'ওগুলো কিসের আলো যুগল?'

যুগল একদৃষ্টে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। তারপর বলল, 'নাও মনে লয় (হয়)।'

যুগলের অনুমানই ঠিক। আরেকটু কাছাকাছি আসতে টের পাওয়া গেল, নৌকোই। বৈঠা টানার ছপছপ আওয়াজ আসতে লাগল।

হঠাৎ দু'টো হাত চোঙার মতো মুখের কাছে ধরে যুগল চেঁচিয়ে উঠল, 'কুন গেরামের নাও?' স্বরটা শরতের বাতাসে দোল খেতে খেতে দিগন্তে মিলিয়ে গেল।

একটু পর দূর থেকে সাড়া এল, 'কেতুগুঞ্জের—'

'নাও যায় কই?'

'হ্যামকত্তার বাড়িত্।'

যুগল ব্যস্ত হয়ে উঠল। বিনুকে বলল, 'বড়কত্তা ফিরা আইল বুঝিন।'

বিনু বুঝতে পেরেছিল। তবু বলল, 'দাদু?'

'হ।'

pathagar.net

দেখতে দেখতে ছইওলা বড় একখানা নৌকো ঘাটে এসে লগি পুঁতল। ছইয়ের তলায় দু'টো হেরিকেন জ্বলছিল। আলো নিয়ে প্রথমে দু'জন মাঝি নামল। তাদের পিছু পিছু হেমনাথ, হেমনাথের পেছনে আলো হাতে আরও দু'টো মাঝি। হেরিকেন ছাড়াও হাতে কলাপাতা দিয়ে মুখ-বাঁধা বড় বড় গোটা তিনেক মাটির হাঁড়ি আর প্রকাণ্ড এক রুই মাছ ঝুলছে।

ঘাট থেকে ওপরে উঠতেই সামনের মাঝি দু'টোকে চিনতে পারল বিনু। ও বেলা এরাই এসে হেমনাথকে কেতুগঞ্জে নিয়ে গিয়েছিল। পেছনের দু'জন অবশ্য অচেনা। খুব সাধারণ মাঝি বা চাষী শ্রেণীর লোক বলে তাদের মনে হল না। দু'জনেই প্রৌঢ়, মুসলমান। পরনে পাজামা আর ফুল শার্ট। মচমচ আওয়াজে টের পাওয়া যাচ্ছে তাদের পায়ে কাঁচা চামড়ার নাগরা। হেরিকেনের আলোয় তাদের সোনার বোতাম আর আংটি ঝিলিক দিয়ে যাচ্ছে, মাথায় সাদা টুপি, গালে চাপদাড়ি। দূর থেকেও আতরের ভুরভুরে উগ্র গন্ধ ভেসে আসছে। গ্রাম্য হলেও দু'জনের চেহারায় বেশ সম্ভ্রান্ত ছাপ আছে।

কাছাকাছি আসার আগেই যুগল ফিসফিসিয়ে বলল, 'আমি যাই। বড়কত্তারা আইছে। ঠাউরমারে খবরটা দেই গিয়া—' বলে আর দাঁড়াল না, ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে চলে গেল।

একটু পর হেমনাথরা কাছে এসে পড়লেন। বিনুকে একা দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তিনি অবাক। থমকে দাঁড়িয়ে বলেন, 'এ কি দাদাভাই, এই রাত্রিবেলা একা একা তুমি পুকুরপাড়ে এসেছ!'

বিনু বলল, 'একা আসি নি, যুগল আমাকে নিয়ে এসেছে।'

হেমনাথ রেগে গেলেন, 'কোথায় সেই হারামজাদা? তোমাকে একলা ফেলে গেল কোন চুলোয়?'

'তুমি এসেছ। দিদাকে সেই খবরটা দেবার জন্যে এই মাত্তর বাড়ি গেল।'

হেমনাথ আবার কী বলতে যাচ্ছিলেন, পেছন থেকে সেই বয়স্ক মুসলমান দু'জন সামনে এগিয়ে এল। একজন শুধলো, 'এ ক্যাঠা ঠাউরভাই (ঠাকুর ভাই অর্থাৎ দাদা)?'

হেমনাথ বললেন, 'নাতি। ওরাই আজ সকালে কলকাতা থেকে এসেছে।'

প্রায় ছুটেই বিনুর সামনে চলে এল প্রৌঢ়টি, বাজপাখির মতো ছোঁ মেরে নিমেষে তাকে বুকের ভেতর তুলে নিল। বাড়ি পর্যন্ত তার বুকের ভেতর বন্দি হয়েই আসতে হল বিনুকে।

বিনু অবশ্য উসখুস করেছে, হাত ছাড়িয়ে নামবার চেষ্টা করেছে। প্রৌঢ় ছাড়ে নি, ঠোঁট টিপে টিপে দুষ্টুমির হাসি হাসছে আর বলছে, 'ছাড়ুম না, কিছুতেই ছাড়ুম না। বক্ষের পিঞ্জরে ধইরা রাখুম।'

বাড়ির ভেতরে এসে দেখা গেল, সাড়া পড়ে গেছে। একেবারে প্রথম যে ঘরখানা সেটা দক্ষিণ-দুয়ারী, সেখানে ঢালা ফরাস পাতা। চারটে হেরিকেন চারদিকে বসানো। ঘরখানা আলোয় ভরে গেছে। একধারে সারি সারি ফরসি সাজানো, জল বদলে এখন তামাক সাজছে যুগল। তার সামনে নারকেল ছোবড়া, তামাকের ডিবে, দেশলাই, কুপি—নানাবিধ সরঞ্জাম।

হেমনাথ সঙ্গীদের নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। মাঝি দু'জন মুখ-বাঁধা হাঁড়িগুলো আর মাছটা নামিয়ে তলায় ফাঁকা মেঝেতে যুগলের কাছে ঘন হয়ে বসল। প্রৌঢ় দু'জন বসল ফরাসের ওপর। বিনু এখনও ছাড়া পায় নি, সেই প্রৌঢ়টির কোলের ভেতর বসে থাকতে হয়েছে তাকে।

হেমনাথ বসলেন না। বললেন, 'তোরা তামাক টামাক খা মজিদ, আমি জামাইদের খবর দিই।'

বিনু দেখতে পেল, যে প্রৌঢ়টি তাকে কোলে নিয়ে বসে আছে সে-ই উত্তর দিল, 'ঠিক আছে ঠাউরভাই।'

এই তা হলে মজিদ মিঞা। কেতুগঞ্জে এঁর বাড়িতেই দাদু ও বেলা গিয়েছিলেন।

হেমনাথ আর কিছু বললেন না, ভেতর-বাড়ির দিকে চলে গেলেন।

খানিক পর অবনীমোহন সুরমা সুধা সুনীতি—সবাইকে নিয়ে ফিরে এলেন হেমনাথ। স্নেহলতা আর শিবানী আসেন নি, রান্নাঘরে নানা কাজে তাঁরা ব্যস্ত।

সবার সঙ্গে আগন্তুকদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হল। মজিদ মিঞা ছাড়া আরেকজন যে প্রৌঢ়

এসেছে তার নাম হাসেম আলি—মজিদ মিঞার বোনাই সে।

অবনীমোহনদের দেখে কী করবে যেন ভেবে পেল না মজিদ মিঞা। মুঠোয় বুঝি আকাশের চাঁদই পেয়ে গেছে। অবনীমোহনের একখানা হাত ধরে উচ্ছ্বসিত স্বরে সে বলতে লাগল, 'আপনেরা আইছেন, আমাগো কি যে সৈভাগ্যি!'

অবনীমোহন বললেন, 'ছি ছি, ও কথা বলবেন না। সৌভাগ্য আমারও কম না। আপনাদের মতো মানুষের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হল—'

মজিদ মিঞা বলল, 'আমরা আবার মানুষ! দোজখের আন্ধারে (পাতালের অন্ধকারে) পইড়া আছি।'

হেমনাথ মাঝখান থেকে বলে উঠলেন, 'তোমরা এসেছ শুনে মজিদ ছুটে চলে এল। আর এমন পাগল—ওই দেখ তিন হাঁড়ি বোঝাই করে তোমাদের জন্যে মিষ্টি আর মাছ নিয়ে এসেছে।'

অবনীমোহন বিব্রত হলেন, সুরমাও। দু'জনে প্রায় একসঙ্গে বললেন, 'আবার শুধু শুধু ও সব আনতে গেলেন কেন?'

মজিদ মিঞা বলল, 'ঠাউরভাইয়ের নাতি-নাতনী ভাগনী-ভাগনীজামাই আমারও নাতি-নাতনী ভাগনী-ভাগনীজামাই। তাগো কিছু খাওয়াইতে বুঝিন সাধ লয় (হয়) না?'

এর ওপর আর কথা চলে না, অবনীমোহনরা অভিভূতের মতো তাকিয়ে রইলেন।

হেমনাথ যুগলকে বললেন, 'মাছ-মিষ্টিগুলো ভেতরে দিয়ে আয়।'

যুগল হাঁড়িটাড়ি নিয়ে রান্নাঘরের দিকে চলে গেল। একটু পর ফিরে এসে জানালো, স্নেহলতা মজিদ মিঞাদের রাতে খেয়ে যেতে বলেছেন।

মজিদ মিঞা হাসল, 'খাইয়া তো যামুই। আমার ঘেটিতে (ঘাড়) কয়টা মাথা যে এই বাড়িত্ আইসা ভাবীর হাতের ভাত ব্যাঞ্জন (রান্না তরকারি) না খাইয়া যাই! যা যুগইলা, হাকিমেরে কইয়া আয়, তেনার হুকুম অমাইন্য করার সাইদ্য আমার নাই।'

বোঝা গেল, এ বাড়িতে আরও অনেক বার এসেছে মজিদ মিঞা এবং যুগলকে খুব ভাল করেই চেনে। আরও টের পাওয়া গেল, এ সংসারের সবার হৃদয়ের একেবারে মাঝখানটিতে তার আসন পাতা।

হঠাৎ অবনীমোহনের কী মনে পড়ে গেল। আস্তে করে হেমনাথকে ডাকলেন, 'মামাবাবু—'

হেমনাথ মুখ ফিরিয়ে তাকালেন, 'কী বলছ?'

'কী একটা দাঙ্গার মীমাংসা করে দিতে না গিয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ।'

'সেটা মিটেছে?'

হাসতে হাসতে হেমনাথ বললেন, 'মজিদকে জিজ্ঞেস করে দেখ না—'

মজিদ মিঞা শুনছিল। জিজ্ঞেস করার আগেই বলে উঠল, 'নবু গাজীর লগে আমার চাইর বচ্ছরের কাইজা এক কথায় মিটাইয়া দিছেন ঠাউরভাই। অ্যামন মীমাংসা করছেন যে কুনোকালে আর কাইজা হইব না।'

অবনীমোহনের কৌতূহল শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছেছিল। শুধোলেন, 'কিরকম?'

'আমার মাইয়ার লগে নবু গজীর পোলার শাদি ঠিক কইরা দিছেন ঠাউরভাই। মাঘ মাসে ধান কাটার পর বিয়া হইব। নবু শালায় আমার মাইয়ার হউর (মেয়ের শ্বশুর) হইব। আপনেই ক'ন, তার লগে চর লইয়া মারামারি আর মানায়?' একটু চুপ করে থেকে আবার বলল, 'ঠাউরভাই অ্যামন ব্যাবোস্তা কইরা দিলেন যে মুখ চিরটা কালের লেইগা বন্ধ। নাইলে শালারে কি ছাড়তাম? সড়কি দিয়া এফোড় ওফোড় কইরা ফালাইতাম।'

ভাবী বেয়াই সম্বন্ধে এ জাতীয় সদিচ্ছায় অবনীমোহনরা হেসে ফেললেন।

মজিদ মিঞা আবার বলল, 'হে যাউক, মাইয়ার শাদির সোময় আপনেগো কিন্তুক যাইতে হইব। আপনেরা হইবেন মাইয়াপক্ষের কত্তা। নবু শালায় তো বরযাত্র আনব কতগুলান চউরা চাষা (চরের চাষা)। শালারে দেখাইয়া দিমু, আমার আপনজনেরা কী দরের মানুষ, আর তার জাতগুষ্টিই বা ক্যামন।'

pathagar.net

অবনীমোহন বললেন, 'কিন্তু—'

'কী?'

'আপনার মেয়ের বিয়ে তো সেই মাঘ মাসে, ধানকাটার পর। ততদিন আমরা এখানে থাকব না।'

'থাকবেন না?' বেশ নিরাশ হয়ে পড়ল মজিদ মিঞা। তারপর হাতের ভেতর মুশকিল আসানটা যেন পেয়ে গেছে, এমন সুরে বলল, 'হেইতে কি, কইলকাতায় একখান টেলি কইরা দিমু, চইলা আইবেন। আইতেই হইব।'

অবনীমোহন আগেই অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন। মজিদ মিঞার আন্তরিকতা তাঁর প্রাণে তরঙ্গ তুলে গেল। বলল, 'আসব, নিশ্চয়ই আসব। আত্মীয়স্বজনের বাড়ি উৎসব লাগলে না এসে পারা যায়?'

কোল থেকে বিনুকে নামিয়ে অবনীমোহনের কাছে আরও নিবিড় হয়ে এল মজিদ মিঞা। একরকম তাঁকে জড়িয়ে ধরে গভীর আবেগের সুরে বলল, 'এই একখান কথার লাখান (মতো) কথা কইছেন—আত্মীয়স্বোজন।'

আবেগটা এ ঘরের অন্য সবাইকেও স্পর্শ করেছিল। সমস্বরে সকলে সায় দিল, এ একটা কথার মতো কথা বটে।

কিছুক্ষণ নীরবতার পর মজিদ মিঞা বলল, 'আমার একখান সাধ আছে।'

অবনীমোহন জিজ্ঞাসু চোখে তাকালেন।

মজিদ মিঞা বলল, 'চরের দুই কানি জমিন লইয়া নবু গাজীর লগে চাইর বচ্ছর আমার কাইজা। আপনেরাও আইলেন, আর আইজই কাইজটা মিটা গেল। আমার সাধ আপনের লগে মিতা পাতাই।'

অবনীমোহন সবটা বুঝতে পারেন নি, অনুমানে ভর করে বললেন, 'বন্ধুত্ব করতে চাইছেন?'

'হ।' করুণ মিনতিপূর্ণ চোখে এমনভাবে মজিদ মিঞা তাকাল যাতে মনে হয়, অবনীমোহনের বন্ধুত্ব না পেলে তার জীবন নিষ্ফল হয়ে যাবে। অবনীমোহনের একটা 'হ্যাঁ' বা 'না'র ওপর তার বাঁচা-মরা নির্ভর করছে।

প্রৌঢ় মানুষটির শিশুর মতো আচরণ, সরলতা, বন্ধুত্বের জন্য কাঙালপনা, সব একাকার হয়ে অবনীমোহনকে মুগ্ধ করে ফেলেছে। বললেন, 'আপনি বন্ধু হতে চাইছেন, এ তো আমার পরম সৌভাগ্য।'

'মিতা হইবেন, কথা দিলেন কিলাম (কিন্তু)—'

'হ্যাঁ।'

'পাকা কথা।'

'পাকা কথা বৈকি।' অবনীমোহন হাসতে হাসতে উত্তর দিলেন।

'এইর লেইগাই কিন্তুক কেতুগুঞ্জ থিকা অ্যাতখানি পথ এই রাইতে আইছি।'

শুধুমাত্র তাঁর বন্ধুত্বের আকাঙ্ক্ষায় একটি মানুষ এত রাতে এতটা পথ চলে এসেছে, যত বার ভাবলেন তত বারই অবাক হয়ে গেলেন অবনীমোহন।

যাই হোক, তারপর শুরু হল গল্প। সুধার সঙ্গে, সুনীতির সঙ্গে, সুরমার সঙ্গে কত কথা যে বলতে লাগল মজিদ মিঞা। কথায় কথায় রাত ঘন হতে লাগল।

একসময় ভেতর থেকে স্নেহলতা খবর পাঠালেন, রান্না শেষ।

এই ঘরেই খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা হল। হাসেম আলি, মজিদ মিঞা এবং মাঝি দু'জনের জন্য আসন পাতা হয়েছে। হেমনাথ হঠাৎ বললেন, 'আমাকেও এখানে ওদের সঙ্গে দিয়ে দাও, বড্ড খিদে পেয়ে গেছে।'

অবনীমোহন বিস্মিত, চমৎকৃত। উনিশ শ' চল্লিশে ব্রাহ্মণ-শূদ্র-বৈশ্য-হিন্দু-মুসলমান ইত্যাদি ইত্যাদি নানা ভাগে, অগণিত ছোট ছোট স্পর্শকাতর কুঠুরিতে বসুন্ধরা যখন খণ্ড খণ্ড হয়ে আছে তখন মজিদ মিঞা হাসেম আলির গা ঘেঁষে খেতে বসা দুঃসাহস বৈকি।

হেমনাথ বললেন, 'অবনীমোহনও বসে যাও না। মিতাই তো হলে মজিদের, একসঙ্গে খেতে

বসে বন্ধুত্বতা পাকা করে নাও।'

ঘোরের ভেতর থেকে অবনীমোহন বললেন, 'বেশ তো—'

অতএব আরও তিনখানা আসন এল। হেমনাথ বসলেন, অবনীমোহন বসলেন, বিনুও বসল। মেয়েরা অবশ্য কেউ বসল না।

খাওয়াদাওয়ার পর মাঝরাত্তিরে পুকুর পেরিয়ে ধানখেতের ওপর দিয়ে কেতুগঞ্জ চলে গেল মজিদ মিঞা।

বিকেলবেলা ভবতোষ গাঢ় বিষাদের ছায়া নিয়ে এসেছিলেন। মেঘের পর রৌদ্রঝলকের মতো মজিদ মিঞা এ বাড়িটাকে আবার আলোকিত করে গেছে।

ভোরবেলা, তখনও ভাল করে ঘুমটা ভাঙে নি, আধো তরল তন্দ্রার ভেতর আচ্ছন্ন হয়ে আছে বিনু। সেই সময় স্তবপাঠের মতো একটানা সুরেলা আওয়াজ ভেসে এল।

কণ্ঠস্বরটা খুবই চেনা, কিন্তু কোথায় শুনেছে এই মুহূর্তে মনে করতে পারল না বিনু। সুরটা খুব ভাল লাগছে। আস্তে আস্তে চোখ মেলল সে।

এখনও রোদ ওঠে নি। চারদিক আবছা আবছা অন্ধকার আলতোভাবে সব কিছুকে ছুঁয়ে আছে।

সময়টা দিনের কোন অংশ—ভোর না সন্ধে, ঠিক বুঝতে পারল না বিনু। পাশ ফিরতেই বড় একটা জানালা চোখে পড়ল। তার ভেতর দিয়ে উঠোন দেখতে পেল বিনু। উঠোন পেরিয়ে বাগান, বাগানের পর যা কিছু এই মুহূর্তে সমস্ত ঝাপসা, নিরবয়ব। উত্তর থেকে দক্ষিণ থেকে জোর বাতাস দিচ্ছে, উলটোপালটা হাওয়ায় বাগানের বড় বড় ঝুপসি গাছগুলো বিজ্ঞের মতো মাথা নাড়াচ্ছে। আকাশের এ প্রান্তে সে প্রান্তে থোকা থোকা সাদা মেঘ রাজহাঁসের মতো ধীর মন্থর গতিতে ভেসে চলেছে।

প্রথমটা বিনু বুঝেই উঠতে পারল না, সে এখন কোথায়। কলকাতায় যে বাড়িতে তারা থাকত তার পাশেই ছিল বড় বড় বাড়ি আর কিছু ঘিঞ্জি বস্তি। বস্তিগুলোর মাথায় টালি আর খাপরার ছাউনি। সকালবেলা চোখ মেললেই বিনুরা দেখতে পেত, বস্তিগুলো নিশ্চল ঢেউয়ের মতো দিগ্বিদিকে ছড়িয়ে আছে। আর কানে আসত কদর্য চিৎকার। ভোর হতে না হতেই কুৎসিত কলহ শুরু হয়ে যেত, তার মেয়াদ মাঝরাত পর্যন্ত।

কিন্তু এখানে? স্তবপাঠের সেই মনোরম সুরেলা শব্দটা এখনও কানে আসছে। বিনুর মনে হল, এসব সত্যি নয়। কেউ যেন ঘুমঘোরে তাকে সুদূর মেঘময় আকাশের নিচে বাগান, গাছপালা, আবছা অন্ধকার আর স্তব উচ্চারণের গম্ভীর মধুর সুরের ভেতর ফেলে দিয়ে গেছে।

চিরদিন মা-বাবার কাছে শোবার অভ্যাস বিনুর। হঠাৎ তার খেয়াল হল, বিছানায় মাও নেই, বাবাও নেই। ধড়মড় করে উঠে বসল সে। তক্ষুনি চোখে পড়ে গেল, উঠোনের পুব দিকটা একেবারে খোলা, সেখানে যুক্তকরে দাঁড়িয়ে তন্ময় হয়ে স্তব পাঠ করছেন হেমনাথ। 'জবাসকুসুম সঙ্কাশ' 'মহাদ্যুতিম্', 'দিবাকরম্' ইত্যাদি দু'চারটে শব্দ ছাড়া আর কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।

হেমনাথকে দেখামাত্র বিদ্যুৎচমকের মতো সব মনে পড়ে গেল। কাল তারা রাজদিয়া এসেছে। স্নেহলতা-শিবানী-যুগল-হিরণ-মজিদ মিঞা—পর পর অনেকগুলো মুখ ছবির মতো চোখের সামনে দিয়ে ভেসে গেল। আর মনে পড়ল ঝিনুককে। দুঃখী মেয়েটার জন্য এক মুহূর্ত মনটা ভারী হয়ে রইল। একটাই মুহূর্ত। নদীর জলে উড়ন্ত পাখির ছায়ার মতো ঝিনুকের মুখ মনে পড়েই মিলিয়ে গেল।

আরও একটা কথা মনে পড়ল বিনুর। কাল রাত্তিরে সে দাদুর কাছে শুয়েছিল। যাই হোক, এখন কী কারণে ভেবে উঠতে পারল না। একবার ইচ্ছে হল, হেমনাথের কাছে যায়। পরক্ষণেই মনে হল, এ সময় তাঁকে বিরক্ত করা ঠিক হবে না।

শরতের এই ভোরের হাওয়া বেশ ঠান্ডা, গায়ে কাঁটা দিচ্ছে। পায়ের দিকে পাট-করা একটা পাতলা চাদর ছিল, সেটা তুলে এনে সর্বাঙ্গে জড়িয়ে বসে রইল বিনু।

একটু পর স্তবপাঠ শেষ হল। পুব দিকে তাকিয়ে আসন্ন সূর্যোদয়ের উদ্দেশে প্রণাম করে ফিরে এলেন হেমনাথ। বিনুকে বসে থাকতে দেখে ভারি খুশি। উচ্ছ্বসিত সুরে বললেন, 'দাদাভাই উঠে পড়েছ?'

বিনু মাথা নাড়ল।

'তুমি তো বেশ তাড়াতাড়ি ওঠো।'

এত ভোরে অবশ্য কোনওদিনই ঘুম ভাঙে না বিনুর। যেহেতু তাড়াতাড়ি ওঠাটা রীতিমতো গৌরবের ব্যাপার, আর হেমনাথ যখন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছেন, তখন এটা মেনে নেওয়া ভাল। বিনু এবারও মাথা নাড়ল। তারপর বলল, 'তুমি গানের মতো করে কী বলছিলে?'

'সূর্যস্তব করছিলাম।'

'ভারি সুন্দর তো।'

সাগ্রহে হেমনাথ বললেন, 'তুমি শিখবে?'

বিনু বলল, 'শিখব।'

'কাল থেকে এইরকম ভোরে উঠো, দু'জনে উঠোনের ওই কোণটায় গিয়ে দাঁড়াব। তুমি আমার সঙ্গে সঙ্গে বলে যাবে। দু'দিনেই শিখে ফেলতে পারবে।'

'আচ্ছা—' বলেই যেন জিভে কামড় খেল বিনু। আজকের মতো দু'একদিন নয়, কাল থেকে রোজ নিয়মিত ভোরবেলায় উঠতে হবে। ঝোঁকের মাথায় রাজি হয়ে কী বিপদেই না পড়া গেল!

হেমনাথ বললেন, 'যাও দাদা, মুখ টুখ ধুয়ে নাও।'

চাদর গায়ে বেরিয়ে এল বিনু। এর মধ্যে আলো ফুটে গেছে। ধানখেত আর বনানীর ওপারে দূর দিগন্তে সূর্যের ঝিকিমিকি টোপরটি আস্তে আস্তে দেখা দিতে শুরু করেছে।

বাইরে এসে বিনু দেখতে পেল, সবাই উঠে পড়েছে। সুধা সুনীতি অবনীমোহন সুরমা শিবানী স্নেহলতা, সব্বাই। স্নেহলতা তো এর ভেতর স্নানই চুকিয়ে ফেলেছেন। তাড়াতাড়ি মুখ ধুয়ে আবার দাদুর কাছে ফিরে এল বিনু।

কাল স্টিমারঘাট থেকে বাড়ি আসতে যা একটু সঙ্গ পেয়েছে বিনু, তারপর সারাটা দিন তো কেতুগঞ্জেই কাটিয়ে এলেন হেমনাথ। রাত্রিবেলা যখন ফিরলেন, মজিদ মিঞারা সঙ্গে রয়েছে। খাওয়া দাওয়া গল্পগুজবের পর অবশ্য হেমনাথকে একেবারে একলা পাওয়া গিয়েছিল, কিন্তু তখন অনেক রাত, আর বিনুর চোখও ঘুমে জড়িয়ে আসছিল।

বিনুর খুব ইচ্ছা, এই সকালবেলা দাদুর সঙ্গে বসে বসে অনেকক্ষণ গল্প করে, কিন্তু সে সুযোগ মিলল না। তার আগেই রান্নাঘরে ডাক পড়ল।

রান্নাঘরটা প্রকান্ড, রাঁধাবাড়া ছাড়াও অনায়াসে পনের-কুড়ি জন লোক বসে খেতে পারে। সারি সারি পিঁড়ি পাতা ছিল। হেমনাথের সঙ্গে এ ঘরে এসে বিনু দেখতে পেল, ইতিমধ্যে অন্য সবাই এসে গেছে। তারা বসে পড়তেই স্নেহলতা আর শিবানী খেতে দিতে শুরু করলেন।

কাল রাত্তিরে প্রচুর মিষ্টি এনেছিল মজিদ মিঞারা। সকালে স্টিমারঘাট থেকে হেমনাথ যে রসগোল্লা আর কলা এনেছিলেন তার অনেকটাই থেকে গেছে। তা ছাড়া, স্নেহলতা গাওয়া ঘিয়ের লুচি তরকারি আর হালুয়া করেছেন।

খেতে খেতে হেমনাথ বললেন, 'মজিদ মিঞাকে কাল কিরকম দেখলে অবনী?'

অবনীমোহন বললেন, 'চমৎকার। এমন সরল ভালমানুষ জীবনে আর কখনও দেখি নি। শুধু আমাদের দেখবার জন্যে রাত্তিরে কেউ এতখানি পথ আসতে পারে, নিজের চোখে না দেখলে কোনও দিন বিশ্বাস করতাম না।'

গভীর আবেগের সুরে হেমনাথ বললেন, 'এখানকার প্রায় সব মানুষই ওই রকম। সরল, ভাল। কিন্তু খেপে গেলে রক্ষে নেই।'

অবনীমোহন হাসলেন।

খানিক চুপ করে থেকে হেমনাথ অন্য প্রসঙ্গে চলে গেলেন, 'কাল সারাদিন কেতুগঞ্জেই কেটে গেছে। তোমাদের সঙ্গে বসে দু'টো কথা বলতে পারি নি। আজ আমি ফ্রি—একেবারে মুক্ত। চল—'

স্নেহলতা নাক কুঁচকে কেমন করে যেন বললেন, 'তুমি মুক্ত! তবেই হয়েছে। দেখ, আবার কোন হাঙ্গামা এসে জোটে!'

'যা-ই জুটুক, আমি কোনও দিকে তাকাচ্ছি না। আজকের দিনটা নাতি-নাতনী-মেয়ে-জামাই নিয়ে হই হই করে কাটাব।'

'সঙ্কল্পটা ভালই।'

হেমনাথ এবার অবনীমোহনকে বললেন, 'কাল সমস্ত দিন তো ঘরে বসে ছিলে। খাওয়াদাওয়া হলে চল একটু ঘুরে আসি। আমাদের রাজদিয়াটা তোমাদের দেখিয়ে আনি।'

গভীর আগ্রহে অবনীমোহন বললেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।'

হেমনাথ কিছু বলতে গিয়ে থেমে গেলেন। হঠাৎ তাঁর কী মনে পড়ে গেছে। বেশ ব্যস্তভাবেই বললেন, 'ইই-হট্টগোলের ভেতর ঝিনুকের কথা খেয়াল ছিল না। সে কোথায়?'

স্নেহলতা বললেন, 'ওর বাবা কাল নিয়ে গেছে।'

'ভবতোষ ঢাকা থেকে ফিরেছে তা হলে?'

'হ্যাঁ।'

'বউমাকে রেখেই এল?'

'হ্যাঁ।' স্নেহলতা বিমর্ষ মুখে মাথা নাড়লেন। স্ত্রীকে রেখে আসার কারণ হিসেবে ভবতোষ কাল যা যা বলে গিয়েছিলেন, সব জানালেন।

তিক্ত সুরে হেমনাথ বললেন, 'নিজেরা খাওয়াখাওয়ি করে মরছে। মাঝখান থেকে ঝিনুকটার জীবন নষ্ট হয়ে গেল।'

কেউ আর কিছু বলল না। বিচিত্র কষ্টদায়ক নীরবতার মধ্যে সকলের খাওয়া শেষ হল। ঝিনুকের প্রসঙ্গ এলেই এ বাড়িতে ঘন হয়ে বিষাদের ছায়া নামে।

খাওয়ার পর হেমনাথ বললেন, 'চল অবনী, এবার বেরিয়ে পড়া যাক। তোরা কে কে যাবি? ঝিনুদাদা নিশ্চয়ই যাবে। সুধাদিদি সুনীতিদিদি, তোরা যাবি তো?'

সুধা সুনীতি, দু'জনেই ঘাড় কাত করল, অর্থাৎ যাবে।

'রমুর গিয়ে দরকার নেই। অনেকখানি হাঁটতে হবে। দুর্বল মানুষ। অত হাঁটাহাঁটি করলে শরীর খারাপ হবে। এক কাজ করলে হত, ভবতোষ কি লালমোহনের ফিটনখানা আগে থেকে চেয়ে রাখলে পারতাম। কাল মনে পড়ে নি। সে যাক গে, পরে গাড়ি ঠিক করে রমুকে একদিন ঘুরিয়ে আনব।'

একসময় হেমনাথরা বেরিয়ে পড়লেন। উঠোন বাগান পেরিয়ে শহরগামী সেই পথটায় আসতেই মনে হল, আশ্বিনের এই চমৎকার উজ্জ্বল সকালটা সামনের দিকে অবিরত হাতছানি দিয়ে যাচ্ছে। এই পথটা ছাড়া রাজদিয়ার আর কিছুই মাথা তুলে নেই, প্রায় সবই জলের তলায় ডুবে আছে।

দু'ধারে কালকের সেই পরিচিত দৃশ্য। মাছরাঙা, বাঁশের সাঁকো, নিস্তরঙ্গ জল, মাঝে মাঝে ছাড়া ছাড়া পিচ্ছিলা দ্বীপের মতো বাড়িঘর, গলানো গিনির মতো রোদ। কথা বলতে বলতে সেই কাঠের পুলটাও পেরিয়ে এল সবাই।

পথ নির্জন নয়। লোক চলাচলে বেশ সরগরমই বলা যায়। যার সঙ্গেই দেখা হচ্ছে, ডেকে ডেকে হেমনাথের সঙ্গে কথা বলছে। বিনুরা যে কলকাতা থেকে এসেছে, সে খবর রাজদিয়ার কারোর জানতে বোধ হয় বাকি নেই। বিনুরা কত দিন থাকবে, এতকাল কেন আসে নি, ইত্যাদি ইত্যাদি হাজারো প্রশ্ন করছে তারা। হেমনাথ উত্তর দিচ্ছেন, অবনীমোহনের সঙ্গে আলাপ টালাপও করিয়ে দিচ্ছেন।

নানা মানুষের কৌতূহল মেটাতে মেটাতে, নানা প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে এবং নিজেদের মধ্যে কথা বলতে বলতে সবাইকে নিয়ে হেমনাথ যখন স্টিমারঘাটের কাছাকাছি পৌঁছলেন, পুব আকাশের

ঢাল বেয়ে সূর্যটা অনেকখানি ওপরে উঠে এসেছে। হোগলা-ছাওয়া সেই মিষ্টির দোকানগুলো থেকে ডাকাডাকি শুরু হয়ে গেল, 'আসেন বড়কত্তা, ভাল মিঠাই আছে। মাইয়া-জামাই-নাতি-নাতনীগো লেইগা লইয়া যান।'

মৃদু হেসে হেমনাথ জানালেন, আজ মিষ্টির দরকার নেই।

একটা ব্যাপার লক্ষ করেছে বিনু, বাড়ি থেকে স্টিমারঘাটে আসতে যত লোকের সঙ্গে দেখা হয়েছে সবাই হেমনাথকে 'বড়কত্তা' বলেছে।

অবনীমোহন হাসতে হাসতে বললেন, 'আমরা এসেছি, একথা দেখছি সবাই জানে। দোকানদারদের কাছেও খবরটা পৌঁছে গেছে।'

হেমনাথ হাসলেন, 'এখানকার মানুষ আমাকে খুব ভালবাসে, স্নেহ করে। আমার সংসারের খুঁটিনাটি সমস্ত খবর ওদের জানা।'

হেমনাথের বাড়ি থেকে স্টিমারঘাট পর্যন্ত রাস্তাটা চেনা। পথটা ওখানেই শেষ নয়, স্টিমারঘাট ছুঁয়ে সেটা অর্ধবৃত্তের আকারে বাঁক নিয়ে দক্ষিণে নিরুদ্দেশ হয়েছে। হেমনাথ বিনুদের নিয়ে সেদিকে চললেন।

ঘাড় ফিরিয়ে বিনু একবার দেখে নিল, কালকের সেই স্টিমারটা নেই। জেটির বাঁধন খুলে কখন কোথায় পাড়ি জমিয়েছে, কে জানে। খুব সম্ভব কলকাতায় চলে গেছে। তবে কালকের সেই শঙ্খচিলগুলো চোখে পড়ল, আকাশময় তারা চক্কর দিয়ে চলেছে।

স্টিমারঘাটের পর নৌকাঘাটটা কালই চোখে পড়েছিল। তারপর একটা বরফ-কল আর সারি সারি মাছের আড়ত। হেমনাথ জানালেন, এখান থেকে কাঠের পেটিতে পরত পরত বরফের ভেতর শুয়ে রোজ শ'খানেক মণ মাছ কলকাতায় চালান যায়। আড়তগুলোর ঠিক তলাতেই নদী। বিনুরা দেখতে পেল অসংখ্য জেলে নৌকো আসছেই, আসছেই। এখানকার বাতাস আঁশটে গন্ধে ভারী আর নিশ্চল হয়ে আছে।

আড়তগুলোর দিকে মুখ ফিরিয়ে হেমনাথ চেঁচিয়ে বললেন, 'তাজা ইলিশ আছে?'

তক্ষুনি সাড়া পাওয়া গেল, 'আছে বড়কত্তা।'

'দর কী?'

'দরের লেইগা আটকাইব না। কয়টা লাগব ক'ন।'

'দাম না বললে নেব না।'

'সব থিকা সেরাটা ট্যাহায় ছয়টা।'

'তিনটে রাখিস, যাবার সময় নিয়ে যাব।'

'আইচ্ছা।'

কাল রসগোল্লার দাম শুনে অবাক হয়েছিলেন অবনীমোহন, আজও হলেন মাছের দর শুনে। তাঁর বিস্ময়-মাখানো মুখের দিকে তাকিয়ে হেমনাথ বললেন, এ হল জলের দেশ। মাছ এখানে শস্তা তো হবেই। কলকাতায় চালান না গেলে টাকায় একশটা করে ইলিশ বিক্রি হত।'

আড়ত পেরিয়ে আসতেই চোখ জুড়িয়ে গেল। হেমনাথের বাড়ির দিকে রাস্তাটা খানিক খোয়ায় ঢাকা, বাকিটা কৌলীন্য হারিয়ে সোজা মাটিতে নেমে গেছে। এদিকটা কিন্তু লাল সুরকিতে ছাওয়া। তার একদিকে নদী, আরেক ধারে সারিবদ্ধ ঝাউগাছ। রাস্তাটা চলেছে তো চলেইছে।

সুধা বলল, 'কী চমৎকার জায়গা! আমরা কিন্তু এখানে রোজ বিকেলে বেড়াতে আসব দাদু—'

হেমনাথ বললেন, 'বেশ তো।'

ঝাউগাছ যেদিকে, সেদিকটাও মনোরম। বর্ষার জলে প্রায় সবটাই ডুবে আছে। তবু তারই ফাঁকে ফাঁকে অনেকগুলো পাকা বাড়ি চোখে পড়ল। শুধু তা-ই নয়, এস.ডি.ও'র বাংলো, দেওয়ানি আর ফৌজদারি আদালত, আর.এস.এন কোম্পানির অফিস, রেজিস্ট্রেশন অফিস, ল্যান্ড অ্যান্ড ল্যান্ড রেভেনিউ অফিস, মেয়েদের একটা হাইস্কুল, ছেলেদের দু'টো, এমনকি ডিগ্রি কলেজও রাজদিয়ার এই প্রান্তে ছড়িয়ে আছে। ওদিকের তুলনায় এদিকটা অনেক বেশি জমাজমাট। জীবনের চেহারা

এখানে অনেকখানি নিবিড়, ঘনবদ্ধ।

ওদিকটার মতো এখানেও হেমনাথ 'বড়কত্তা'। কারও সঙ্গে দেখা হলেই বিনুদের সম্বন্ধে সেই এক প্রশ্ন, হেমনাথের সেই এক উত্তর। সকলের কৌতূহল মেটাতে মেটাতে তাঁরা এগিয়ে চলেছেন।

অবনীমোহন বললেন, 'ওধারের তুলনায় এধারে লোকজন বোধহয় বেশি।'

'তা একটু বেশি।' হেমানাথ বলতে লাগলেন, 'তবে এখন যতটা দেখছ এতটা কিন্তু বছরের অন্য সময় থাকে না।'

দু'চোখে প্রশ্ন নিয়ে তাকালেন অবনীমোহন।

হেমনাথ এবার বুঝিয়ে বললেন। সমস্ত বছর রাজদিয়ায় বেশির ভাগ বাড়ি প্রায় ফাঁকাই পড়ে থাকে। দু'চারটে বুড়োবুড়ি আর জীবন থেকে বাতিল কিছু অথর্ব মানুষের মুখ তখন দেখা যায়। কেননা বাড়ির সক্ষম, সাবালক ছেলেরা সেসময় এখানে থাকে না, চাকরি বাকরি বা অন্য কোনও জীবিকার টানে তাদের কেউ তখন আসামে, কেউ ঢাকায়, কেউ কেউ হিল্লি-দিল্লিতেও। তবে সব চাইতে বেশি যেখানে তার নাম কলকাতা।

ছেলেরা বিদেশে চাকরি করবে, মেস কি হোটেলের ঝাল-মশলাওলা অখাদ্য খেয়ে অকালে পাকস্থলীটির স্বত্ব আমাশা কি অম্লশূলের হাতে তুলে দেবে, তা তো আর হয় না। কাজেই বাপ-মা ছেলের বিয়ে দিয়ে বউমাটিকে সঙ্গে পাঠিয়ে দেন। ঘরের রান্না খেয়ে পেটটা অন্তত বাঁচুক, নাতি-নাতনী হলে তাদের কাছেই থাকে। বাপ-মা অবশ্য ছেলেদের কাজের জায়গায় গিয়ে থাকতে পারেন। কিন্তু তাঁরা গেলে দেশের বাড়িঘর জমিজমা বাগানপুকুর দেখবে কে? যখের মতো পূর্বপুরুষের সম্পত্তি আগলে থাকতে তো হবে কারোকে।

সারা বছর রাজদিয়ায় ঢিমে তালের সুর লেগে থাকে। জীবন তখন মন্থর, ঘুমন্ত, নিষ্প্রভ। তিরতিরে স্রোতের মতো তাতে বেগ হয়তো থাকে, কিন্তু টের পাওয়া যায় না। তারপর আশ্বিন মাসটি যেই পড়ল, আকাশে বাতাসে ছুটির সানাইও বাজল, নদীর ধারে কাশফুলের বন ফুলে ফুলে ছেয়ে গেল আর রোদের রংটি হয়ে গেল গলানো সোনার মতো, সেই সময় রাজদিয়ার গায়ে সোনার কাঠির ছোঁয়া লেগে যায়। জলোচ্ছ্বাসের প্রবল ঢলের মতো দূর দূরান্ত থেকে দুর্বার আকর্ষণে ছেলেরা ফিরে আসে। পূর্ব বাংলার এই তুচ্ছ নগণ্য শহরটা সারা বছর প্রবাসী সন্তানগুলির জন্য উন্মুখ হয়ে থাকে। তাদের ফিরে পেয়ে খুশি আর ধরে না। রাজদিয়া জুড়ে তখন প্রমত্ত উৎসব শুরু হয়ে যায়। তারপর পুজো যেই শেষ হল, ছুটির মেয়াদ ফুরলো, ধীরে ধীরে রাজদিয়াকে অপার শূন্যতার ভেতর ছুঁড়ে দিয়ে একে একে সবাই গিয়ে স্টিমারে ওঠে। ওরা যেন মানস সরোবরের পরিযায়ী পাখি। শরতে আসে, শরৎ ফুরোলেই নিরুদ্দেশ।

রাজদিয়ার মোটামুটি একটা রূপরেখা পাওয়া গেল। হেমনাথ আরও কী বলতে যাচ্ছিলেন, বিনু আস্তে করে ডাকল, 'দাদু—'

হেমনাথ ফিরে তাকালেন 'কী বলছ দাদাভাই?'

বলবে কি বলবে না, খানিক ভেবে নিল বিনু। তারপর দ্বিধান্বিত সুরে জিজ্ঞেস করল, 'ঝিনুকদের বাড়ি কোথায়?'

'খানিকটা দূরে। ওই ওদিকে—' সামনে আঙুল বাড়িয়ে দিলেন হেমনাথ।

বিনু চুপ করে রইল।

হেমনাথ আবার বললেন, 'ভাল কথা মনে করিয়ে দিয়েছ দাদাভাই। কাছাকাছি যখন এসেই পড়েছি, চল ওদের একটু খোঁজ নিয়ে যাই।'

বিনুর খুব ইচ্ছা হচ্ছিল ঝিনুকদের বাড়ি যায়। ঝিনুক মাছের ভাগ নিয়ে, রসগোল্লার ভাগ নিয়ে, দাদু দিদার আদরের ভাগ নিয়ে তার সঙ্গে হিংসে করেছিল—সে কথা মনে করে রাখে নি বিনু। তার যা মনে পড়ছিল সেটা হল ঝিনুকের দুঃখ।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঝিনুকদের বাড়ি যাওয়া হল না। কয়েক পা যাবার পর হঠাৎ কে যেন চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ডাকতে লাগল, 'হেমদাদা হেমদাদা—'

হেমনাথ থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন, দেখাদেখি বিনুরাও থামল।

pathagar.net

একটু দূরে ঝাউগাছের ফাঁকে হলুদ রঙের দোতলা বাড়ি। সামনের দিকে চমৎকার ফুলের বাগান, বাঁশের বেড়া দিয়ে বাগানখানি ঘেরা। যাতায়াতের জন্য কাঠের ছোট একটি গেট।

গেটের কাছে হেমনাথের সমবয়সী কি দু'চার বছরের ছোট একটি বৃদ্ধ দাঁড়িয়ে ছিলেন। হেমনাথের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই তিনি হাতছানি দিলেন।

পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলেন হেমনাথ, বিনুও সঙ্গে সঙ্গে গেল। অবনীমোহনরা অবশ্য রাস্তায় দাঁড়িয়ে রইলেন।

কাছে আসতেই উচ্ছ্বসিত খুশির গলায় বৃদ্ধ বললেন, 'শিশিররা এসেছে।'

বৃদ্ধের উচ্ছ্বাস এবং আনন্দ হেমনাথের স্বরেও যেন উছলে পড়ল। বললেন, 'তাই নাকি? কবে?'

'পরশুর স্টিমারে।'

'কেমন আছে সব?'

'ভাল।' বলতে বলতে সচেতন হলেন যেন বৃদ্ধ। বিনুর দিকে তাকিয়ে শুধোলেন, 'এটি কে হেমদাদা?'

হেমনাথ বললেন, 'নাতি।'

'নাতি!' বৃদ্ধ একটু যেন অবাকই হলেন।

হেমনাথ বললেন, 'হ্যাঁ, আমার ভাগনীর ছেলে।' অবনীমোহনদের দেখিয়ে বললেন, 'ওই যে জামাই আর দুই নাতনী।'

বৃদ্ধ এবার ব্যস্ত হয়ে পড়লেন, 'ওদের ডাকো হেমদাদা। তুমি ডাকবে কেন, আমিই ডেকে আনছি।' তিনি পা বাড়িয়ে দিলেন।

হেমনাথ বললেন, 'এখন থাক রামকেশব—'

বৃদ্ধের নাম তা হলে রামকেশব। তিনি বললেন, 'তাই কখনও হয়, নাতি-নাতিনী-জামাই নিয়ে ঘরের দরজা পর্যন্ত আসবে, ভেতরে ঢুকবে না, প্রাণ থাকতে আমি তা হতে দেব না।'

রামকেশব ছুটে গিয়ে অবনীমোহনদের সঙ্গে করে নিয়ে এলেন। তারপর সাদরে সবাইকে বাড়ির ভেতরে নিয়ে গেলেন।

সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠতে উঠতে রামকেশব হইচই বাধিয়ে দিলেন, 'কই গো, কোথায় গেলে সব—শিশির, বউমা—দেখ দেখ, কাদের নিয়ে এসেছি।'

একজন সধবা প্রৌঢ়া—কপালে ডগডগে সিঁদুরের টিপ, পিঠময় কাঁচাপাকা চুলের স্তূপ, পরনে খয়েরি-পাড় শাড়ি, স্নেহলতার সমবয়সীই হবেন—ডান পাশের একখানা ঘর থেকে বেরিয়ে রামকেশবের সঙ্গে নতুন মানুষ দেখে খানিক অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন।

রামকেশব বললেন, 'হেমদাদার ভাগনীজামাই আর নাতি-নাতনী—'

তাড়াতাড়ি কপাল পর্যন্ত ঘোমটা টেনে সস্নেহে, মৃদু স্বরে প্রৌঢ়া ডাকলেন, 'এস দাদা-দিদিরা—'

রামকেশব শুধোলেন, 'শিশির, বউমা—ওরা সব কোথায়?'

'দক্ষিণের ঘরে।'

একটু ভেবে রামকেশব বললেন, 'আমরা বরং দক্ষিণের ঘরেই যাই। তুমি এদের জন্যে—' বলতে বলতে থেমে গেলেন।

ইঙ্গিতটা বুঝতে পারলেন প্রৌঢ়া। অতিথিদের আপ্যায়নের কথা বলেছেন রামকেশব। তিনি বললেন, 'ঠিক আছে।'

রামকেশবের সঙ্গে দক্ষিণের ঘরে এসে দেখা গেল, একটি সাতাশ আটাশ বছরের সুপুরুষ তরুণকে ঘিরে আসর বসেছে। লোকজন বেশি নেই, আধা-প্রৌঢ় একজন ভদ্রলোক, বছর দশেকে'র একটি মেয়ে, সতের আঠার বছরের একটি তরুণী আর পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ বছরের এক মহিলা—সব মিলিয়ে পাঁচজন। মহিলা তরুণী এবং ছোট মেয়েটি এমন সাজগোজ আর প্রসাধন করে বসে আছে যা চোখে বেঁধে। তাদের জামাকাপড় থেকে সেন্টের গন্ধ চারদিকে ভেসে বেড়াচ্ছে।

তরুণটি হাত-পা-মাথা নেড়ে রোমাঞ্চকর কিছু বলছে, আর মুগ্ধ বিস্ময়ে সবাই শুনছে। রামকেশবরা

pathagar.net

ঘরে ঢুকতেই গল্প থেমে গেল।

আধা প্রৌঢ় সেই ভদ্রলোকটি তাড়াতাড়ি উঠে এসে হেমনাথকে প্রণাম করলেন।

হেমনাথ বললেন, 'কেমন আছিস শিশির?'

'ভাল।' শিশির বললেন, 'আপনি ভাল আছেন তো? জ্যাঠাইমা কেমন আছেন?'

'আমরা গাঁইয়া মানুষ, কখনও খারাপ থাকি না। তোমরা শহরের লোক, পিপল অফ দি মেট্রোপলিস। তোমাদের আজ পেট ভুটভাট, কাল কান কটকট, পরশু বুক ধড়ফড়। আমাদের ওসব বালাই নেই। সে যাক, রামকেশবের কাছে শুনলাম, পরশু তোরা এসেছিস। কাল সারাটা দিন গেছে মাঝখানে, একবার আমাদের ওখানে যেতে পার নি?'

অপরাধীর মতো মুখ করে শিশির বললেন, 'আজ যাব ভেবেছিলাম।'

শিশিরের পর সেই মহিলাটি এসে প্রণাম করলেন। হেমনাথ বললেন, 'বেঁচে থাকো স্মৃতিরেখা। বলতে নেই, তোমার স্বাস্থ্য গেল বারের চাইতে অনেক ভাল হয়েছে। শিশিরটা তো চিরকালের খ্যাপা বাউল, সংসারের কোনও দিকে ওর খেয়াল নেই। যাক, তোমার দিকে ও এবার নজর দিয়েছে দেখছি।'

জানা গেল, মহিলার নাম স্মৃতিরেখা এবং তিনি শিশিরের স্ত্রী।

স্মৃতিরেখার পর কম বয়সের মেয়েটি আর তরুণীটি এসে প্রণাম করল। দু'জনকে পায়ের কাছ থেকে তুলে হেমনাথ বললেন, 'আমার রুমাদিদি ঝুমাদিদি না?'

রুমা ঝুমা দু'জনেই মাথা নাড়ল। বোঝা যাচ্ছে, এ বাড়ির সবাইকেই চেনেন হেমনাথ। বললেন, 'তোমরা দু'জন।' সুধা সুনীতিকে দেখিয়ে বললেন, 'আর ওরা দু'জন। এত বেগম নিয়ে কী যে করি। ভাবছি বাদশাদের মতো একটা হারেম খুলব।'

সবাই মুখ টিপে হাসতে লাগল।

আবার কী বলতে যাচ্ছিলেন হেমনাথ, হঠাৎ তার নজর গিয়ে পড়ল সেই যুবকটির ওপর। বললেন, 'একে তো চিনতে পারলাম না রামকেশব।'

রামকেশব বললেন, 'ও আনন্দ—শিশিরের শালা। কলকাতাতেই থাকে। গেল বছর ল' পাস করেছে। ওর বাবার সঙ্গে কোর্টে যাচ্ছে। এখন ছুটি। তাই বউমার সঙ্গে পুজোয় বেড়াতে এসেছে।'

হেমনাথ বললেন, 'খুব ভাল।'

এই সময় আনন্দ উঠে এসে হেমনাথকে প্রণাম করল। রামকেশব আনন্দর উদ্দেশে বললেন, 'ইনি শ্রীহেমনাথ মিত্র, গোটা রাজদিয়ার অভিভাবক বলতে পার।'

আনন্দ চুপ করে থাকল।

রামকেশব এবার হেমনাথকে বললেন, 'জানো হেমদাদা, আমাদের আনন্দ বাবাজির খুব শিকারের শখ। অনেক বাঘ টাঘ মেরেছে।'

'তাই নাকি?'

বিনু এর আগে শিকারি দেখে নি। চোখ বড় করে আনন্দর দিকে তাকিয়ে রইল। লক্ষ করল, সুনীতিও অবাক বিস্ময়ে আনন্দকে দেখছে। সুধা ওদিকটায় অবনীমোহনের আড়ালে বসে ছিল। সে আনন্দকে দেখছে কিনা, বুঝতে পারা গেল না।

হেমনাথ অবনীমোহনদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। আলাপ টালাপ হলে বললেন, 'অনেক বেলা হল, এবার আমরা উঠি।'

রামকেশব বললেন, 'তাই কখনও হয়! জামাই নিয়ে প্রথম দিন এলে, একটু মিষ্টিমুখ না করিয়ে ছাড়তে পারি? শিশিরের মা তা হলে আমার গর্দান নিয়ে নেবে।'

'তবে আর কী করা, বসেই যাই।'

একটু নীরবতা। তারপর স্মৃতিরেখার চোখে চোখ রেখে হেমনাথ বললেন, 'আমরা এসে তোমাদের জমাটি আসরটি নষ্ট করে দিলাম।'

স্মৃতিরেখা বললেন, 'ও মা, সে কি কথা!'

হেমনাথ বললেন, 'আনন্দ হাত-পা নেড়ে কী যেন বলছিল, তোমরা খুব মন দিয়ে শুনছিলে।'

pathagar.net

আমরা আসতেই বেচারি থেমে গেল। কী বলছিল আনন্দ?'

সেই তরুণীটি, যার নাম রুমা, বলল, 'মামা সেবার সুন্দরবনে বাঘ মারতে গিয়েছিল। সেই গল্প করছিল।'

হেমনাথ উৎসাহিত হলেন। আনন্দকে বললেন, 'আপত্তি না থাকে, আরেক বার বল না। আমরা একটু শুনি।'

লাজুক হেসে আনন্দ বলল, 'আপনাদের কি ভাল লাগবে?'

'লাগবে, নিশ্চয়ই লাগবে। আমাদের খুব বেরসিক ভাবছ নাকি?'

বাঘ শিকারের রোমাঞ্চকর গল্প আরম্ভ হল।

বিনু চোখ বড় করে তাকিয়ে রইল। মাঝে মাঝে লক্ষ করতে লাগল, সুনীতিও অপার বিস্ময় নিয়ে আনন্দর দিকে তাকিয়ে আছে।

গল্প শুনতে শুনতে হঠাৎ বিনুর মনে হল, কে যেন ফিসফিস করে ডাকছে, 'এই—এই—'

চোখ ফিরিয়ে বিনু দেখতে পেল, সেই ছোট মেয়েটা—যার নাম ঝুমা। গায়ের রংখানি শ্যামলা। নাক-মুখ-চোখ সেই ক্ষতিটুকু ষোল আনার জায়গায় আঠার আনা পূরণ করে দিয়েছে। এমন নিখুঁত ধারাল গড়ন কদাচিৎ দেখা যায়। গায়ের হলুদ রঙের ফ্রক, মাথার গোলাপি রিবন কিংবা চোখে কাজলের টান ভারি চমৎকার মানিয়েছে।

বিনুর ধ্যানজ্ঞান এখন বাঘ শিকারের দিকে। অন্যমনস্কের মতো বলল, 'কী বলছ?'

'তুমি লুডো খেলতে পার?'

'পারি।'

'ক্যারম?'

তাচ্ছিল্যের সুরে বিনু বলল, 'নিশ্চয়ই।'

ঝুমা বলল, 'এয়ার গান চালিয়ে পাখি মারতে পার?'

এবার বিনুকে একটু থতিয়ে যেতে হল।

ঝুমা বলল, 'তুমি পার না, আমি কিন্তু পারি।'

যার মামা বাঘ মারতে পারে সে পাখি মারবে তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। থতিয়ে যাওয়া ভাবটা মুহূর্তে কাটিয়ে নিয়ে বিনু বলল, 'চেষ্টা করলে আমিও পারব।'

'তা তো জানিই।' এমনভাবে ঝুমা বলল, যেন বিনুর কোনও কথা জানতে তার বাকি নেই। এইমাত্র যে তার সঙ্গে পরিচয় হয়েছে, সে কথা কে বলবে।

বিনু কিছু বলল না।

ঝুমা ফের বলল, 'আমার একটা ক্যামেরা আছে, জানো। খুব ভাল ছবি ওঠে।'

বিনুর কেন জানি এবার মনে হল, ঝুমাকে আর অবহেলা করা যায় না। আধখানা মন বাঘ শিকারের দিকে রেখে বাকি আধখানা মন দিয়ে ঝুমার কথা শুনছিল সে। এবার পুরোপুরি মনোযোগটা এদিকে সঁপে দিতে হল।

ঝুমা বলল, 'আমার সঙ্গে যাবে?'

'কোথায়?'

'ও ঘরে।' পাশের ঘরের দিকে আঙুল বাড়িয়ে দিল ঝুমা।

'সেখানে কী?'

'লুডো ক্যারম এয়ার গান ক্যামেরা—সব আছে।'

বাঘ শিকারের কাহিনী যত চমকপ্রদই হোক, বিনুকে ধরে রাখা আর সম্ভব হল না। ঝুমার সঙ্গে সে পাশের ঘরেই চলে যেত, কিন্তু বাধা পড়ল। সেই বর্ষীয়সী সধবা মহিলাটি খাবারের থালা সাজিয়ে ঘরে ঢুকলেন। অগত্যা রসগোল্লা সন্দেশেই মনোনিবেশ করতে হল।

খাওয়া হলে হেমনাথরা উঠে পড়লেন।

ঝুমা ফিসফিসিয়ে বলল, 'ক্যারম ট্যারম খেলা হল না। আমার এয়ার গান আর ক্যামেরাটা তোমায় দেখাতে পারলাম না। আরেক দিন আসবে কিন্তু—'

ঝুমার দুর্লভ সম্পত্তিগুলো দেখা হল না বলে মন খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিল। বিরস গলায় বিনু বলল, 'আচ্ছা।'

রামকেশবরা হেমনাথকে বললেন, 'আবার ওদের নিয়ে এস হেমদাদা, ভাগনীকেও এনো।'

'আচ্ছা।' হেমনাথ বললেন, 'তোরাও যাস, সবাইকে নিয়ে যাবি।'

ফের রাস্তায়।

হেমনাথ এবং অবনীমোহন আগে আগে হাঁটছিলেন। সুধা সুনীতি আর বিনু একটু পেছনে। চলতে চলতে সুনীতি বললেন, 'আনন্দবাবু চমৎকার গল্প বলতে পারেন।'

চোখ ঠোঁট কুঁচকে কেমন করে যেন হাসল সুধা, 'হুঁ।'

'আমার মনে হচ্ছিল, সত্যি সত্যি সুন্দরবনে গিয়ে বাঘ দেখছি।'

'তাই নাকি!'

'কেন, তোর মনে হয় নি?'

'আমি তো গল্প শুনছিলাম না, তোর দিকে তাকিয়ে ছিলাম।'

'আমার দিকে তাকিয়ে ছিলি!' সুনীতি অবাক।

'হ্যাঁ।' মাথাটা একেবারে ঘাড় পর্যন্ত হেলিয়ে দিল সুধা। ফিসফিসিয়ে বলতে লাগল, 'তুই কী করছিলি জানিস দিদি?'

ভয়ে ভয়ে সুনীতি শুধলো, 'কী করছিলাম?'

গলার স্বর কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে সুধা বলল, 'একেবারে মুগ্ধ, মুগ্ধ হয়ে—'

বিব্রত, বিপন্ন সুনীতি ঝঙ্কার দিয়ে উঠল, 'তোকে আর ইয়ার্কি করতে হবে না ফাজিল মেয়ে—'

হঠাৎ কে যেন ডেকে উঠল, 'বড়কত্তা, বড়কত্তা—'

বড়কর্তা নিশ্চয়ই হেমনাথ। সবাই চকিত হয়ে উঠল।

অবনীমোহনের সঙ্গে কথা বলতে বলতে আগে আগে হাঁটছিলেন হেমনাথ। ডাকটা কানে আসতে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। তারপর এদিক সেদিক তাকাতেই তাঁর চোখে পড়ে গেল। বিনুরাও দেখতে পেল।

সামনের দিক থেকে একটা লোক লম্বা লম্বা পা ফেলে ব্যস্তভাবে এগিয়ে আসছে। কাছাকাছি আসতে টের পাওয়া গেল, তার বয়স অনেক দিন আগেই পঞ্চাশ পেরিয়েছে। এখন ষাট ছুঁই ছুঁই। বেশির ভাগ চুলই রুপোর তার। অবশ্য কাঁচা চুলেরা একেবারে দখল ছাড়েনি, এখানে ওখানে ছড়িয়ে থেকে যতখানি পেরেছে যৌবনের পতাকা তুলে রাখতে চেষ্ট করছে। মুখখানা পরিষ্কার কামানো। পরনে বাড়িতে-কাচা হাফহাতা পাঞ্জাবি, ঝুল প্রায় হাঁটু পর্যন্ত। তুলনায় ধুতিটা অস্বাভাবিক খাটো, খালি পা। গলায় তিন লহর তুলসীর মালা।

এতখানি বয়স হয়েছে, কিন্তু শরীর মেদশূন্য, স্বাস্থ্যের ভিত বেশ মজবুত। মাঝারি মাপের শক্ত সবল এই মানুষটিকে ঘিরে কোথায় যেন খানিকটা দৃঢ়তা ফুটে আছে।

হেমনাথ বললেন, 'আরে অধর যে। কেমন আছ?'

লোকটা অর্থাৎ অধর বলল, 'ভালই। আপনের শরীল গতিক?'

'ওই একরকম চলছে।' হেমনাথ হাসলেন, 'তারপর এই দুপুরবেলা সেজেগুজে গিয়েছিলে কোথায়?'

বিনুর হাসি পেল। পরেছে তো একটা বেঢপ পাঞ্জাবি আর খাটো ধুতি, তাতে আবার পায়ে জুতো নেই। একে নাকি সাজা বলে!

অধর বলল, 'আপনের বাড়ি গেছিলাম। গিয়া শুনলাম, আমাগো এইদিকে আইছেন। বউ-ঠাইরেন

বইতে কইছিল, আমি আর বসি নাই। লৌড়াইতে লৌড়াইতে ফিরা আইছি, যদি আপনেরে এইহানে ধরতে পারি। শ্যাষম্যাষ পারছি।'

'আমাদের বাড়ি গিয়েছিলে কেন?'

'বড় দরকার—' বলতে বলতে বিনুদের সম্বন্ধে সচেতন হয়ে অধর শুধলো, 'এয়ারা? এগো তো আগে দেখি নাই।'

হেমনাথ আলাপ করিয়ে দিলেন। অধরের পরিচয়টাও এবার পাওয়া গেল। পুরো নাম অধর সাহা। রাজদিয়া থেকে কয়েক মাইল উজানে কমলাঘাটের মস্ত গঞ্জ, অধর সেখানে বড় পাইকারি ব্যবসাদার। অনেকগুলো ধান-চালের আড়ত আছে তার। টাকাপয়সা যে কত তার লেখাজোখা নেই।

পরিচয় টরিচয় হল বটে, বিনুদের সম্বন্ধে কিন্তু তেমন আগ্রহ নেই অধরের। সে হেমনাথকে বলতে লাগল, 'এইদিকে যহন আইসাই পড়ছেন আর দ্যাখাটাও হইয়া গ্যাছে তহন আমার বাড়িত্ একবার পায়ের ধূলা দিতে হইব।'

হেমনাথ বললেন, 'আজ আর তোমার ওখানে যেতে বোলো না অধর। তাকিয়ে দেখ কত বেলা হয়েছে। রামকেশবটা রাস্তা থেকে ওর বাড়ি ধরে নিয়ে গিয়েছিল। বড় দেরি করিয়ে দিয়েছে। বাড়ি ফিরতে ফিরতে আমাদের বেলা হেলে যাবে।'

'রামক্যাশবের বাড়ি যাইতে পারেন আর আমার বাড়ির কাছে আইসা যাইবেন না, হেয়া (তো) কিছুতেই হইব না।' নাছোড় পেয়াদার মতো জেদ ধরল অধর, 'আসেন—'

হেমনাথ বোঝাতে চাইলেন, 'পরে একদিন আসব'খন। এখন তোমার ওখানে গেলে আরও দেরি হয়ে যাবে। ছেলেমেয়েগুলোর এখনও স্নান-খাওয়া হয়নি।'

কিন্তু কে কার কথা শোনে! অধর বলতে লাগল, 'দুই দন্ডও না বড়কত্তা, হের (তার) আগেই আপনেরে ছাইড়া দিমু। এট্টু কষ্ট কইরা একবার খালি আহেন। জবর দরকার—'

হেমনাথ বললেন, 'তোমার দরকারের কথাটা এখানেই বলে ফেল না।'

'এইখানে কইলে হইব না, বাড়িত্ নিয়া কয়টা জিনিস আপনেরে দেখামু।'

'ছাড়বে না যখন কী আর করা। চল—' অধরের জেদ আর মিনতির কাছে নিজেকে সঁপে দিলেন হেমনাথ।

এই সময় অবনীমোহন বলে উঠলেন, 'আপনি ঘুরে আসুন মামাবাবু, আমরা বরং রাস্তায় দাঁড়াই।'

হেমনাথ ব্যস্ত হয়ে পড়লেন, 'রাস্তায় কি দাঁড়িয়ে থাকবে, এস—এস—'

অধরও সায় দিল, 'হ হ, আসেন—'

বিনুরা যেদিক থেকে এসেছিল, আবার সেদিকে খানিকটা পিছিয়ে যেতে হল। তারপর রাস্তা থেকে ডান ধারে দু'পা গিয়ে সরু খালের ওপর বাঁশের সাঁকো, সাঁকো পেরিয়ে অধরের পিছু পিছু যেখানে এসে তারা পৌঁছুল সেটা ফুলফলের বাগান। আশ্বিনের এই দুপুরবেলায় গাছগাছালির ঘন ছায়া এখানে নিবিড় হয়ে আছে। ছায়াচ্ছন্ন বাগানটার পর টিনের চমৎকার একখানা তিনতলা বাড়ি।

কলকাতায় সাততলা আটতলা কত বাড়ি দেখেছে বিনু, তাদের ছাদগুলো যেন আকাশের মেঘেদের ছুঁয়ে আছে। কিন্তু টিনের তেতলা এই প্রথম দেখল। অবাক চোখে চারদিকে তাকাতে লাগল সে।

অধর সাহার বাড়িটার মাথায় প্যাগোডার মতো নকশা-করা টিনের চাল। তার দু'ধারে দু'টো টিনের ময়ূর পেখম মেলে আছে। দেওয়ালগুলো অবশ্য কাঠের।

বাড়ির ভেতরে ঢুকে অধর বলল, 'চলেন, দোতালায় যাই।'

হেমনাথ বললেন, 'আবার টঙে ওঠাবে?'

'উপুরে না গ্যালে তো জিনিসগুলা দেখাইতে পারুম না।'

কাঠের সিঁড়ি বেয়ে আগে আগে ওপরে উঠতে লাগল অধর। হেমনাথরা তাকে অনুসরণ করতে লাগলেন।

একটা ব্যাপার বিনু লক্ষ করল, বাড়িটা আশ্চর্য রকমের নির্জন আর স্তব্ধ। অধর সাহা ছাড়া আর কারোকেই দেখা যাচ্ছে না। শিশু-বৃদ্ধ-যুবক বা যুবতীর কণ্ঠস্বর কোনও দিক থেকেই ভেসে আসছে না। রূপকথার যক্ষপুরীর মতো এখানে জীবনের কোনও অস্তিত্ব বুঝি নেই।

খানিক আগে বিনুরা রামকেশবের বাড়িতে ছিল। অনেক মানুষ, অজস্র হইচই বা ফেনায়িত কোলাহল—সব মিলিয়ে যেন একটা সজীব রঙিন মেলার ভেতর অনেকখানি সময় কাটিয়ে এসেছে। তুলনায় এ বাড়ির নির্জনতা, নৈঃশব্দ চোখে কানে বিঁধতে লাগল।

একটু পর অধরের পিছু পিছু মস্ত একখানা ঘরের মধ্যে চলে এল বিনুরা। ঘরটার একধারে চেলা কাঠের পাহাড়। খুব সম্ভব দু'তিনটে বড় বড় গাছ কেটে ওভাবে রাখা হয়েছে। আরেক পাশে সারি সারি সাজানো অনেকগুলো পেতলের নতুন কলসি, কাঁসার থালা-বাটি-গেলাস, আর নতুন নতুন খাট। তা ছাড়া, আরও অসংখ্য জিনিস।

এক পলকে সব দেখে নিয়ে জিজ্ঞাসু চোখে অধরের দিকে তাকালেন হেমনাথ।

মুখ কাঁচুমাচু করে অধর বলল, 'আপনের লগে পরামশ্য না কইরাই এইসব কিনাকাটা সারছি বড়কত্তা।' একটু থেমে আবার বলল, 'দ্যাখেন জিনিসগুলা—এক্কেবারে বাছা বাছা, পছন্দসই। কোনও শালায় কইতে পারব না অধর সা' দানে খারাপ জিনিস দিছে।'

হেমনাথ বিমূঢ় মুখে বললেন, 'কিন্তু ব্যাপারটা কী?'

হেমনাথের চোখে চোখ রেখে অধর শুধলো, 'বুঝতে পারেন নাই?'

'না।' ধীরে ধীরে হেমনাথ মাথা নাড়লেন।

একটু চুপ করে থেকে অধর বলল, 'দানসাগর ছাদ্দ করুম।'

'শ্রাদ্ধ!'

'হ।'

'কার?'

'কার আবার, আমার।' নিজের বুকে একটা আঙুল রেখে অধর সাহা ফিসফিস করে বলল।

আর হেমনাথ যেন কথা বলতে ভুলে গিয়ে একেবারে বোবা হয়ে গেলেন। তাঁর চোখমুখ দেখে মনে হল, এমন আজগুবি কথা চৌষট্টি পঁয়ষট্টি বছরের জীবনে আর কখনও শোনেন নি।

একটু কি ভেবে নিয়ে অধর আবার বলল, 'উই যে লাকড়ি (চেলা কাঠ) দেখতে আছেন, এগুলান দিয়া আমি মরলে আমারে পোড়ান হইব। আর এই নূতন খাটপালং থাল-ঘটি-গেলাস-বাটি—হগল দানের জিনিস। ছাদ্দের সোময় বামনগো দিমু। বুঝলেন নি বড়কত্তা, মরার আগেই নিজের ব্যবোস্তা নিজেই কইরা রাখলাম। অ্যামন কি আগামী বচ্ছর গয়ায় গিয়া নিজের পিন্ডটাও দিয়া আসুম।'

নিষ্পলক তাকিয়ে ছিলেন হেমনাথ। এতক্ষণে কথা বললেন, 'হঠাৎ তোমার ঘাড়ে এ পাগলামি চাপল কেন?'

ঠিক এভাবে হেমনাথ বলবেন তা যেন আশা করে নি অধর। আহত সুরে বলল, 'এরে আপনে পাগলামি কন!'

'তা ছাড়া কী?'

হেমনাথের কথার উত্তর না দিয়ে অধর বলল, 'আপনে তো হগলই জানেন বড়কত্তা—'

হেমনাথ বললেন, 'কী জানি?'

'আমার পোলা দুইটা ক্যামন।' অধর সাহা বলতে লাগল, 'দশ বচ্ছর তারা আমার লগে সম্পক্ক রাখে নাই। তাগো ভরসা করি না। কিন্তুক—'

হেমনাথ প্রশ্ন করলেন, 'কিন্তু কী?'

'হিন্দু হইয়া জন্মাইছি। মরার পর কে ছাদ্দ করব, কে পিন্ডি দিব তার তো ঠিক নাই। ওইটুকের লেইগা আমার সদ্গতি হইব না। পরকাল বইলা তো একখান কথা আছে।'

'তোমার ভালমন্দ কিছু হলে ছেলেরা আসবে না, এমন কথা আগে থেকেই ভাবছ কেন? তা ছাড়া বলতে নেই, তোমার স্বাস্থ্য বেশ ভালই। বয়েসেও আমার চাইতে ঢের ছোট। এর ভেতর মরার চিন্তা তোমার মাথায় ঢুকল কী করে?'

দার্শনিকের মতো মুখ করে অধর বলল, 'বড়কত্তা, মাইনষের জীবন বড় তাজ্জবের বস্তু। এই আছে, এই নাই। কার কখন ওপারের ডাক আইব, কেউ জানে না। রাবণের সিড়ির লাখান ছাদ্দশান্তি আমি ফেলাইয়া রাখুম না।'

pathagar.net

হেমনাথ উত্তর দিলেন না।

বিনুর এইসব কথাবার্তা ভাল লাগছিল না। টিনের তেতলা দেখার বিস্ময়টাও ধীরে ধীরে কখন ফিকে হয়ে গেছে। সে উসখুস করতে লাগল। এদিকে অবনীমোহন সুধা আর সুনীতি চুপচাপ। তাদের মুখচোখ দেখে প্রতিক্রিয়া বোঝা যাচ্ছে না।

অধর আবার বলল, 'ভাবতে আছি পূজার পরেই এট্টা ভালা দিন দেইখা ছাদ্দটা চুকাইয়া ফেলুম। একশ'জন ভাল বামন ভোজন করামু। আইচ্ছা বড়কত্তা, কারে কারে ডাকা যায় ক'ন তো?'

হেমনাথ বললেন, 'এখনও তো দেরি আছে। পরে এ নিয়ে ভাবা যাবে। আজ চলি।'

'অহনই যাইবেন?'

'হ্যাঁ। আজ আর দেরি করতে পারব না।' বিনুদের নিয়ে হেমনাথ ঘরের বাইরে বেরিয়ে এলেন। সেখান থেকে সিঁড়ি বেয়ে একতলায়। তারপর ঝুপসি বাগান পেরিয়ে সোজা দক্ষিণগামী বড় রাস্তায়।

অধরও সঙ্গে সঙ্গে এসেছিল। সে বলল, 'দুই চাইর দিন পর আমি কিন্তুক আপনের বাড়িত্ যামু।'

হেমনাথ বললেন, 'এস।'

'ছাদ্দশান্তির ব্যাপারে আপনের লগে মেলা (অনেক) পরামশ্য আছে।'

'আচ্ছা, আচ্ছা—'

অধর সঙ্গে সঙ্গে হাঁটছিল। হেমনাথ বললেন, 'কথা তো হয়ে গেল। এই রোদের ভেতর কষ্ট করে আর তোমাকে যেতে হবে না।'

অধর দাঁড়িয়ে পড়ল। হেমনাথরা এগিয়ে গেলেন।

দাদুর পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে অধর সাহার কথা কিন্তু ভাবছিল না বিনু। বার বার ঝিনুকের কথাই মনে পড়ে যাচ্ছিল। এ পাড়ায় আসা হল। সেই সকাল থেকে এতখানি বেলা পর্যন্ত রামকেশব আর অধর এই দু'টো লোক তাদের আটকে রাখল অথচ ঝিনুকদের বাড়িতেই শুধু যাওয়া হল না। বার বছরের বিনুর ছোট্ট, উষ্ণ, কোমল মনটা সেজন্য ভারাক্রান্ত হয়ে আছে।

খানিক যাবার পর অবনীমোহন শুধোলেন, 'লোকটা অদ্ভুত তো—'

বিনু বুঝল, অধরের কথা বলছেন অবনীমোহন। সে জানে মানুষ মরে টরে গেলে অন্যেরা তার শ্রাদ্ধ করে। কিন্তু একটা লোক জীবিত অবস্থায় নিজের শ্রাদ্ধ নিজেই করতে যাচ্ছে দেখেও বিনু খুব অবাক হল না, তেমন কৌতূহলও বোধ করল না। ঝিনুক যেন চারদিকের সব কিছু থেকে তাকে অন্যমনস্ক করে রেখেছে।

হেমনাথ মৃদু হাসলেন, 'তা একটু—'

অবনীমোহন বললেন, 'এমন লোক আগে আর কখনও দেখি নি।'

উত্তর না দিয়ে হেমনাথ হাসতে লাগলেন।

অবনীমোহন বললেন, 'ছেলেদের ওপর খুব রাগ দেখলাম। কারণটা কী?'

'সে অনেক ব্যাপার। পরে বলব।'

'আর কেউ নেই ওঁর?'

'না। স্ত্রীকে ঢের আগেই খেয়ে বসেছে।'

অবনীমোহন আরও কী বলতে যাচ্ছিলেন, হেমনাথ তার আগেই বলে উঠলেন, 'যাই, আড়ত থেকে মাছগুলো নিয়ে আসি। আয় দাদাভাই—' বলেই বিনুকে নিয়ে ডানদিকে নদীর ঢালে নেমে গেলেন।

কথায় কথায় কখন তাঁরা নৌকোঘাটে এসে পড়েছেন, অবনীমোহনের খেয়াল ছিল না। হঠাৎ তাঁর মনে পড়ল, যাবার সময় মাছের জন্য আড়তে পয়সা দিয়ে গিয়েছিলেন হেমনাথ।

নৌকোঘাটটা রাস্তা থেকে বেশ খানিকটা নিচে। নদীর জল জায়গাটা ছুঁয়ে আছে। তার গা ঘেঁষে সারি সারি মাছের আড়ত।

যাবার সময় আড়তগুলোর গায়ে যত জেলেডিঙি বিনুরা দেখে গিয়েছিল, এখন তার দশ গুণ জমা হয়েছে। নদীর দূর দূরান্ত থেকে চিত্রবিচিত্র পাল তুলে আরও অগণিত নৌকো এদিকে ধেয়ে

pathagar.net

আসছে। ইলিশ মাছের ভারী আঁশটে গন্ধ এখানে বুঝি বার মাস অনড়। নদীর এলোমেলো দুরন্ত বাতাসও তা উড়িয়ে নিয়ে যেতে পারছে না।

আড়তে যেতেই সেই লোকটাকে দেখতে পেল বিনু। হেমনাথ এর হাতেই মাছের পয়সা দিয়ে গিয়েছিলেন।

লোকটা মাঝবয়সী। থলথলে মাংসল চেহারা, গায়ের রং কালো। সব সময় জলের কাছে থাকার জন্যই বোধহয় চামড়া রুক্ষ, খসখসে। গ্রীষ্ম বর্ষা হাজার নখে তারা গা চিরে চিরে দিয়েছে। পরনে আধময়লা ধুতি ছাড়া আর কিছুই নেই। হাতে চৌকো সোনার তাবিজ, গলায় সরু হার, মোটা মোটা গাঁটওলা আঙুলে পলা আর গোমেদের আংটি।

কোলের কাছে টিনের ক্যাশ-বাক্স আর লাল হিসেবের খাতা নিয়ে একটা তক্তপোশে বসে ছিল লোকটা। বিনুদের দেখেই লাফ দিয়ে নেমে এল। আপ্যায়নের সুরে ব্যস্তভাবে বলল, 'আসেন—আসেন। বসেন বড়কত্তা—'

হেমনাথ বললেন, 'এখন আর বসব না নকুল। তাড়াতাড়ি মাছ দাও—'

'হেয়া (তাই) কহনও হয়। আড়তে আপনের পায়ের ধূলা পড়ল, একদণ্ড বইসা না গ্যালে শান্তি পামু ক্যান?' বলতে বলতে নকুলের কী যেন মনে পড়ে গেল। বিনুকে দেখিয়ে বলল, 'নাতিরেই খালি আনছেন, জামাই আর নাতিনরা কই?'

রাস্তার দিকে আঙুল বাড়িয়ে হেমনাথ বললেন, 'ওখানে।'

'পথে খাড়া করাইয়া আইছেন! ক্যান, আমার এইহানে বসনের জাগা আছিল না?' নকুলকে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ দেখাল।

হেমনাথ বোঝাতে চেষ্টা করলেন, 'অনেক বেলা হয়ে গেছে, তাই আর আনি নি। আনলে আরও দেরি হয়ে যাবে।'

'এট্টু দেরি হইব বইলা আনবেন না! পেরথম দিন আমার আড়তের দুয়ারে ওনারা আইলেন, মুইটা মিঠাই না খাওয়াইয়া ছাড়তে পারি! আপনের নাতি-নাতিন-জামাইর উপুর আমার জোর নাই? যাই ওনাগো ডাইকা আনি।'

নকুল রাস্তার দিকে ছুটতে যাচ্ছিল, তার আগেই খপ করে তার একখানা হাত ধরে ফেললেন হেমনাথ, 'আজ থাক নকুল। একদিন তোমার বাড়িতে ওদের নিয়ে যাব। তখন যত পার খাইও—'

একটু ভেবে নকুল বলল, 'ঠিক তো?'

'ঠিক।'

'কথা দিলেন কিলাম।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, কথার খেলাপ হবে না। তুমি মাছ দাও—'

বিনু অবাক হয়ে দেখছিল। আড়তদার এই লোকটাকে তার খুব ভাল লাগছে। তার মধুর ব্যবহার, তার আন্তরিকতা বুঝিয়ে দিচ্ছে দাদুকে কতখানি ভালবাসে সে, কতখানি শ্রদ্ধা করে। শুধু কি এই লোকটাই, হিরণ, মজিদ মিঞা, মজিদের বোনাই হাসেম আলি, রামকেশব—সারা রাজদিয়াই হয়তো হেমনাথের জন্য হৃদয় পেতে রেখেছে। বিনু টের পেল তাদের যে এত খাতির, এত মর্যাদা—সব, সব দাদুর জন্য।

নকুল ডাকল, 'আহেন, মাছ বাইছা লন (নিন)—'

আড়তটার সামনের দিকে রাস্তা, পেছনে নদী। দু'টো দিকই খোলা। নকুলের সঙ্গে যেতে যেতে বিনু লক্ষ করল, পেছন দিকে ইলিশের পাহাড় জমে আছে—পূর্ব বাংলার চকচকে লোভনীয় রুপোলি ফসল।

আড়তের তলায় সারি সারি জেলে ডিঙি। আট দশটা লোক ডিঙিগুলো থেকে মাছ গুনে গুনে ইলিশের পাহাড়টার দিকে ছুড়ে দিচ্ছে। মাছির ভনভনানির মতো শোনা যাচ্ছে, 'রামে রাম, রামে দুই, রামে তিন।'

আরেক দল লোক কাঠের প্যাকিং বাক্সে পরত পরত বরফের তলায় মাছ সাজাচ্ছে। বিনু জানে

ওই বাক্সগুলো কলকাতায় চালান যাবে।

একসময় রুপোর পাহাড়টার কাছে এসে পড়ল বিনুরা। একসঙ্গে এত মাছ, এমন ঝকঝকে জীবন্ত জলের ফসল আগে আর কখনও দেখে নি সে।

নকুল বিনুকে বলল, 'পাচখান মাছ বাইছা লও ছোটকত্তা—'

বিনু লজ্জা পেয়ে গেল। মাছ তো বাছলই না, দাদুর আড়ালে গিয়ে দাঁড়াল।

হেমনাথ বললেন, 'পাঁচটা মাছ কেন? তিনটের দাম তো তোমায় দিয়ে গেছি।'

নকুল বলল, 'আইজ জবর মাছ উঠতে আছে বড়কত্তা। দরও ঝপর ঝপর লামতে আছে। অহন ট্যাকায় দশটা বিকাইতে আছে, রাইতের দিকে বিশটা কইরা বেচতে হইব।'

হেমনাথ কিছু বললেন না।

নকুল এবার বিনুকে নিয়ে পড়ল, 'কই, মাছ বাছলা না?'

বিনু একইভাবে দাঁড়িয়ে থাকে।

বিনুর মনোভাব বুঝতে পেরে নিজেই সেরা ছ'টা মাছ বেছে বেঁধে দিল নকুল।

হেমনাথ বললেন, 'আবার ছ'টা কেন?'

হেসে নকুল বলল, 'ছোটকত্তা পয়লা দিন আমার আড়তে আইল। হের (তার) সোম্মান নাই? এট্টা মাছ তারে খাইতে দিলাম।'

মাছ নিয়ে রাস্তায় আসতে সুধা বলল, 'এত দেরি করলে কেন দাদু?'

হেমনাথ বললেন, 'আর বলিস না ভাই। ওই আড়তদার মানে আমাদের নকুলটা কিছুতেই ছাড়ে না। তোদের আড়তে নিয়ে মিষ্টি খাওয়াবার বাই তুলেছিল। কত কষ্টে যে ঠেকিয়েছি! তবে কড়ার করিয়ে নিয়েছে, একদিন ওর বাড়ি তোদের নিয়ে যেতে হবে।'

অবনীমোহন ওধার থেকে বললেন, 'এখানকার মানুষজন বড় ভাল।'

আবেগময় সুরে হেমনাথ উত্তর দিলেন,'সত্যিই ভাল অবনীমোহন—'

এরপর ইলিশ মাছ নিয়ে কিছুক্ষণ উচ্ছ্বসিত আলোচনা চলল। আট আনায় পাঁচটা বড় বড় ইলিশ, তার ওপর একটা ফাউ। অবনীমোহন ভাবলেন, এ যেন এক স্বপ্নের দেশ।

একসময় স্টিমারঘাট, সারি সারি মিষ্টির দোকান, খোয়া বাঁধানো পথ আর নদীটা পেছনে ফেলে সেই কাঠের পুলটার কাছে এসে পড়ল বিনুরা। ঠিক সেই সময় শোনা গেল, 'হেম—হেম—' পেছন থেকে কে যেন খুব চেঁচিয়ে ডাকাডাকি করছে।

হেম নিশ্চয়ই হেমনাথ। তাঁকে যিনি নাম ধরে ডাকতে পারেন, হয় তিনি বন্ধুস্থানীয়, নতুবা গুরুজন টুরুজন হবেন।

সবাই একসঙ্গে ঘুরে দাঁড়াল। আর ঘুরতেই বিনু দেখতে পেল, দূরে পথের বাঁকে কালকের সেই জারাজীর্ণ দুর্বল ঘোড়াটা তার চাইতেও পুরনো ভাঙাচোরা গাড়িটাকে টেনে নিয়ে আসছে। কালকের সেই কোচোয়ানটাকে দেখা যাচ্ছে না, চালকের জায়গায় ধবধবে সাদা একটি মানুষ বসে আছেন।

নিশ্চয়ই লালমোহন, অর্থাৎ ডেভিড লারমোর। তিনি ছাড়া রাজদিয়ায় সাহেব আর কে আছে? কাল এঁর কথা অনেক শুনেছে বিনু। যৌবনের মধ্যদিনে সুদূর আয়ার্ল্যান্ড থেকে পূর্ব বাংলার এই প্রান্তে এসেছিলেন, তারপর কয়েক যুগ কেটে গেছে। তাঁকে সামনাসামনি দেখবার জন্য বিনুর ছোট্ট হৃৎপিন্ড যেন লাফাতে লাগল।

কিছুক্ষণের ভেতর ফিটনটা কাছে এসে থামল। কোচায়ানের সিট থেকে একরকম লাফ দিয়েই নেমে এলেন লারমোর।

হেমনাথ বললেন, 'বয়স কত হল হে?'

লারমোর হেসে বললেন, 'তোমার চাইতে শুনে শুনে চার বছরের বড়।'

'কিন্তু যেভাবে নামলে তাতে তিরিশ বছরের ছোট বলে মনে হচ্ছে। বুড়ো হাড়ে একবার চোট লাগলে দেখতে হবে না। ছ'মাসের জন্যে বিছানা নিতে হবে।'

তাচ্ছিল্যভরে লারমোর বললেন, 'কিচ্ছু হবে না।'

দু'চোখে অসীম বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে ছিল বিনু। লালমোহনের চুল, ঘন জোড়া ভুরু, গায়ের রং, ঋষিদের মতো লম্বা দাড়ি, সব কিছু দুধের মতো সাদা। ভুরুর তলায় স্বচ্ছ জলে আলোর নাচনের মতো দু'টি স্নিগ্ধ চোখ। পিঠ সামনের দিকে একটু নুয়ে পড়েছে। গা-ময় এত কুঞ্চন যাতে চামড়া সোনার জালি জালি মনে হয়। পরনে ধুতি আর কামিজ, পায়ে লাল কাপড়ের জুতো। গলায় কালো কারে রুপোর ক্রশ ঝুলছে।

বড়দিনে কলকাতার সাহেবপাড়ায় রাস্তার মোড়ে মোড়ে প্রচুর আলো টালো দিয়ে 'ক্রিসমাস ট্রি' সাজায়। তার সঙ্গে ধবধবে দাড়িওলা এক বুড়োও থাকে। বিনু বুড়োর নামটা মনে করতে পারল—সান্টা ক্লজ। পোশাকটুকু বাদ দিলে লারমোর যেন অবিকল সান্টা ক্লজ।

হেমনাথ বললেন, 'এস, পরিচয় করিয়ে দিই—'

লারমোর বললেন, 'তোমার আর কষ্ট করতে হবে না, ওটা আমিই পারব।' বলে অবনীমোহনের দিকে ফিরলেন, 'তুমি নিশ্চয়ই আমাদের জামাই।' সুধা-সুনীতি-বিনুকে বললেন, 'আর তোমরা অবশ্যই দাদাভাই দিদিভাই। তোমাদের নাম তো জানি না। নামগুলো বল—'

অবনীমোহনের হঠাৎ কী হয়ে গেল, ঋষির মতো দেখতে এই বয়স্ক বিদেশি মানুষটির পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলেন। দেখাদেখি সুধা-সুনীতি-বিনুও প্রণাম করল। তারপর একে একে সবাই নিজের নিজের নাম বলল।

সবাইকে আশীর্বাদ করে লারমোর অবনীমোহনের উদ্দেশে বললেন, 'কাল স্টিমারঘাটে তোমাদের আনতে যেতে পারি নি। বিশেষ দরকারে হাটে গিয়েছিলাম—'

অবনীমোহন বললেন, 'মামাবাবু সে কথা বলেছেন।'

'কাল হাট থেকে ফিরতে ফিরতে অনেক রাত হয়ে গিয়েছিল। আজ সকালে উঠেই চলে আসব ভেবেছিলাম। তখনও কতকগুলো ঝঞ্ঝাট এসে জুটল। সব মিটিয়ে বেরুতে বেরুতে দুপুর হয়ে গেল। ভাল কথা, রমু কোথায়? তাকে তো দেখছি না।'

হেমনাথ বললেন, 'সে বাড়িতে আছে।'

লারমোর শুধোলেন, 'তোমরা গিয়েছিলে কোথায়?'

'রাজদিয়া শহরটা ওদের একটু ঘুরিয়ে দেখাচ্ছিলাম।'

লারমোর এবার অবনীমোহনকে সাক্ষী মানলেন, 'শোন তোমার মামাশ্বশুরের কথা। আমি গাড়ি থেকে লাফিয়ে নেমেছি বলে তো খুব উপদেশ ঝাড়া হল। আর উনি যে বুড়ো হাড়ে মাইল মাইল ঘোরা এলেন, তার বেলা?'

সবাই হাসতে লাগল। লারমোর আর হেমনাথের ভেতর বন্ধুত্বটা যে কতখানি নির্মল, স্বচ্ছ আর দীপ্তিপূর্ণ তা যেন অনায়াসে টের পাওয়া যাচ্ছে।

বিব্রত মুখে হেমনাথ বললেন, 'লাফানো আর হাঁটা—কিসে আর কিসে। সে যাক গে, রাস্তায় দাঁড়িয়ে আর একটা কথাও নয়।'

লারমোর কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, ঠিক তখনই হেমনাথের হাতে ইলিশ মাছগুলো দেখতে পেলেন। সঙ্গে সঙ্গে সারা মুখে হাসির ছটা ঝলমলিয়ে উঠল। উচ্ছ্বসিত খুশির গলায় তিনি বললেন, 'নজর পড়েছে তা হলে—'

'ঢের আগেই পড়া উচিত ছিল। পেটিগুলো সর্ষে দিয়ে ভাতে দিলে যা হয় না—একেবারে হেভেন।' চোখ বুজে বুঝিবা স্বর্গসুখটা কল্পনা করতে লাগলেন লারমোর।

ভুরু কুঁচকে হেমনাথ বললেন, 'এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে বোধহয় পেটিগুলো ভাতে দেওয়া যাবে না। সেজন্যে বাড়ি যাওয়া দরকার।'

লারমোর ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, সবাই গাড়িতে ওঠ।' বলে নিজেই ফিটনের দরজা খুলে দিলেন।

অবনীমোহন হেমনাথ সুধা আর সুনীতি উঠতেই দেখা গেল, গাড়িতে আর জায়গা নেই। লারমোর বললেন, 'বিনুদাদা কোচোয়ানের সিটে আমার পাশে বসে যাবে।'

পাশাপাশি যেতে যেতে বার বার মুখ তুলে লারমোরকে দেখতে লাগল বিনু। চোখাচোখি হলেই

অবশ্য মুখটা সরিয়ে নিচ্ছে।

এই মুহূর্তে বিনুর মন থেকে রামকেশব, রুমা ঝুমা, অধর সাহা, নকুল, রুপোর পাহাড়ের মতো ইলিশের স্তূপ, মনোরম নদীতীর, এমনকি ঝিনুক পর্যন্ত মুছে গেছে। তার বার বছরের অপরিণত অস্তিত্বের পুরোটাই দখল করে নিয়েছেন এই বিস্ময়কর চমকপ্রদ মানুষটি, যাঁর নাম ডেভিড লারমোর।

বারকয়েক চোখাচোখির পর বিনু ধরা পড়ে গেল। সস্নেহ হেসে লারমোর শুধোলেন, 'কী দেখছ?'

লজ্জা পেয়ে বিনু তাড়াতাড়ি চোখ নামিয়ে নিল, উত্তর দিল না।

কিছুক্ষণ নীরবতা। তারপর আবার তাকাতে লাগল বিনু। তার মনের কথাটা বোধহয় পড়তে পারলেন লারমোর। বিনুর দিকে খানিক ঝুঁকে বললেন, 'আমায় কিছু বলবে?'

এই মানুষটি সম্বন্ধে এই মুহূর্তে বিনুর মনে অনেক জিজ্ঞাসা, অসীম কৌতূহল। ঘাড় ঈষৎ হেলিয়ে সে জানালো—বলবে।

লারমোর বললেন, 'বল না—'

এতক্ষণে গলায় স্বর ফুটল বিনুর। ফিসফিসিয়ে বলল, 'পরে।'

'পরে কেন, এখনই বলে ফেল।'

বিনু চুপ।

একটু ভেবে হাসতে হাসতে লারমোর বললেন, 'আচ্ছা, পরেই বোলো।'

একসময় ফিটনটা বাড়ি পৌঁছে গেল।

ভেতর-বাড়ির উঠোনে এসে ফিটন থামালেন লারমোর। তারপর খানিক আগের মতোই লাফ দিয়ে নেমে চেঁচামেচি জুড়ে দিলেন, 'রমু কই রে—আমার সুরমা কোথায়?'

সুরমা কাছেই ছিলেন। দক্ষিণ-দুয়ারী বড় ঘরখানার বারান্দায় পিঠময় চুল মেলে দিয়ে শিবানী আর স্নেহলতার সঙ্গে চাল বাছতে বাছতে গল্প করছিলেন। ডাকটা কানে যেতে চকিত হয়ে মুখ ফেরালেন। উঠোনের দিকে তাকাতেই চোখে পড়ল, লারমোর দাঁড়িয়ে আছেন। আশ্বিনের এলোমেলো বাতাসে তাঁর সাদা দাড়ি এবং চুল উড়ছে।

এতকাল পরও লারমোরকে দেখেই চিনতে পারলেন সুরমা। নিমেষে তাঁর বয়স থেকে কুড়ি-পঁচিশটা বছর যেন মুছে গেল। কৈশোর যৌবনের মাঝামাঝি একটা সময় কিছুকাল রাজদিয়ায় কাটিয়ে গিয়েছিলেন। তখন সুরমা নীরোগ, সুস্থ। পরিপূর্ণ উজ্জ্বল স্বাস্থ্যে ঝলমল করতেন। প্রাণবন্ত চঞ্চল পাখিটির মতো সারাদিন ছিল তাঁর ছোটাছুটি, ছেলেমানুষির খেলা। বিশেষ করে লারমোরকে কাছে পেলে আবদার আর লাফালাফির মাত্রাটা যেত হাজার গুণ বেড়ে।

এতদিন পর লারমোরকে দেখে সেই উচ্ছল স্নিগ্ধ দিনগুলোতে যেন ফিরে গেলেন সুরমা। রাজদিয়ায় এসে বার বার নিজের বয়স ভুলছেন। অসুস্থ রুগ্‌ণ শরীরের কথা ভুলছেন, পারিবারিক মর্যাদার কথা ভুলছেন। আজও সব ভুলে কুড়ি পঁচিশ বছর আগের মতো কিশোরীটি হয়ে উড়তে উড়তে, ছুটতে ছুটতে উঠোনে নেমে এলেন। লারমোরকে প্রণাম করে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'এই তো আমি লালুমামা—'

এক মুহূর্ত সুরমার দিকে তাকিয়ে রইলেন লারমোর, তারপরেই নির্মল স্নেহের আলোয় মুখখানা ভরে গেল। সুরমাকে বুকের ভেতর টেনে নিয়ে একসঙ্গে কত কথা যে বলে গেলেন। স্নেহলতা, শিবানী বা হেমনাথ যা যা বলেছিলেন সেই সব কথা। এতকাল কেন রাজদিয়ায় আসেন নি সুরমা, শরীর কেন এত রোগা হয়ে গেছে, ইত্যাদি ইত্যাদি। লারমোরের বুকের ভেতর থেকে সুরমা একে একে উত্তর দিতে লাগলেন।

এদিকে ফিটন থেকে সুধা সুনীতি বিনু আর অবনীমোহনও নেমে এসেছেন। ইলিশ মাছ হাতে ঝুলিয়ে হেমনাথও নেমেছেন। ওধারের বারান্দা থেকে স্নেহলতা শিবানী পায়ে পায়ে কাছে এসে

দাঁড়িয়েছেন।

প্রাথমিক উচ্ছ্বাস খানিক কেটে গেলে বন্দিনী সুরমা লারমোরের বুকের ভেতর থেকে মুক্তি পেলেন। আর তখনই চোখ পাকিয়ে, তর্জনী নাচিয়ে স্নেহলতা এগিয়ে এলেন, 'এই যে সাহেব—'

দু'পা পিছিয়ে লারমোর ভয়ে ভয়ে শুধোলেন, 'এমন রণরঙ্গিণী মহিষমর্দিনী রূপে কেন? আমার বুক কিন্তু কাঁপছে।'

আগের সুরেই স্নেহলতা বললেন, 'ক'দিন পর এ বাড়িতে আসা হল?'

'বোধহয় ছ'সাত দিন।'

'মোটেও না।'

ঢোক গিলে লারমোর বললেন, 'তবে?'

স্নেহলতা বললেন, 'বার দিন।'

'অত দিন আসি নি!'

'নিশ্চয়ই, আমি গুনে রেখেছি।'

গলাটাকে খাদের ভেতর নামিয়ে লারমোর এবার বিড়বিড় করলেন, 'আবার গোনাগুনির কী দরকার ছিল!'

স্নেহলতার চোখ আরও বড় হল, গলা আরও তিন পর্দা চড়ল, 'গুনে রেখে অন্যায় করেছি?'

অসহায়ের মতো এদিক সেদিক তাকিয়ে লারমোর কোনওরকমে বলতে পারলেন, 'না মানে—'

তাঁর কথা শেষ হবার আগেই স্নেহলতা ঝলকে উঠলেন, 'কী কথা হয়েছিল শুনি? ঠিক ছিল, এবার থেকে এ বাড়িতে খাওয়া হবে। আমি রোজ দু'বেলা করে বার দিন চব্বিশ বেলা ভাত ফুটিয়ে মরছি আর আসল মানুষের টিকির দেখা নেই।'

লারমোর উত্তর দিলেন না।

স্নেহলতা থামেন নি। একবার অবনীমোহনকে, একবার সুরমাকে, একবার সুধা সুনীতিকে সাক্ষী মেনে সমানে গজগজ করতে লাগলেন। তিনি যা বললেন, সংক্ষেপে এইরকম। লারমোরের কেউ নেই, একা একা রাজদিয়ার আরেক প্রান্তে পড়ে থাকেন। তার ওপর যথেষ্ট বয়সও হয়েছে। খাওয়া দাওয়ার ঠিকঠিকানা নেই। ওঁর গাড়ির বুড়ো কোচোয়ানটা যেদিন চাট্টি ভাত ফুটিয়ে দেয় সেদিন খান, নইলে দু'দিন হয়তো খেলেনই না। এমন করলে শরীর টেকে? তাই স্নেহলতা ক'দিন আগে কথা আদায় করে নিয়েছিলেন, এবার থেকে তাঁর কাছে দু'বেলা খেয়ে যাবেন লারমোর। কথা দিয়ে ভদ্রলোক সেই যে উধাও হয়েছেন, বার দিন পর আবার তাঁকে দেখা গেল। কাজেই স্নেহলতার রেগে যাবার কারণ আছে।

লারমোর আধবোজা চোখে আঁটা-ঠোঁটে চুপচাপ সব শুনে গেলেন।

স্নেহলতা বললেন, 'তোমাকে যখন একবার পেয়েছি সাহেব, চব্বিশ বেলার ভাত একসঙ্গে খাওয়াব।'

পাশ থেকে শিবানী আস্তে করে বললেন, 'আমি একটা মোটা লাঠি জোগাড় করে রেখেছি বউদি। খেতে না পারলে—'

স্নেহলতা বাকিটুকু পূরণ করে দিলেন, 'ওই লাঠিটা দিয়ে আমরা ননদ-ভাজে গলার ভেতর গুঁজে গুঁজে দেব।'

হঠাৎ দু'হাত জোড় করে, মাথা ঝুঁকিয়ে কাঁদো কাঁদো মুখে লারমোর বলে উঠলেন, 'তার চাইতে আমার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হোক মহারানী।'

স্নেহলতা রাগ করতে গিয়েও হেসে ফেললেন, 'খুব হয়েছে। কত রঙ্গই যে জানো সাহেব!'

সমস্ত ব্যাপারটাই যে নির্মল কৌতুকের খেলা, চারধারে দাঁড়িয়ে বিনুরা বেশ বুঝতে পারছিল। স্নেহলতাদের সঙ্গে লারমোরের সম্পর্কটা কতখানি মধুর আর মনোরম তাও টের পাচ্ছিল। যাই হোক, স্নেহলতাকে হাসতে দেখে সবাই হেসে উঠল।

হাসতে হাসতেই স্নেহলতা বললেন, 'নেহাত ভাগনী, ভাগনীজামাই, নাতি নাতনীরা কলকাতা থেকে এসেছে, তাই ছুটে আসা হয়েছে। নইলে কবে আসত তার কি কিছু ঠিক আছে! সারা দিন এত রাজকার্য করতে হয় যে দু'বেলা দু'মুঠো খেয়ে যাবার ফুরসত মেলে না।'

এই সময় পেছন থেকে হেমনাথ বলে উঠলেন, 'রমুদের জন্যেই শুধু না গো গিন্নি, ইলিশের গন্ধেও লালমোহন ছুটে এসেছে।' বলে হাতের মাছগুলো তুলে দেখালেন।

ইলিশ দেখাতে গিয়ে এমন বিপদ হবে, কে জানত। বেশ আড়ালে আড়ালে ছিলেন হেমনাথ, একেবারে তোপের মুখে পড়ে গেলেন। স্নেহলতার মনোযোগ লারমোরের দিক থেকে এবার তাঁর ওপর এসে পড়ল। চোখ কুঁচকে স্নেহলতা বললেন, 'এই যে আরেক জন—'

ভীত সুরে হেমনাথ বললেন, 'আমি আবার কী করলাম?'

'সেই সকাল থেকে কোন দিগ্বিজয় করে আসা হল শুনি? এখন কত বেলা হয়েছে হুঁশ আছে?'

হেমনাথ ভেবেছিলেন, ইলিশের কথা তুললে লারমোরকে নিয়ে মজাটা আরও জমবে। কিন্তু সেটা পুরোপুরি তাঁর বিরুদ্ধেই গেল। মুখ কাঁচুমাচু করে বললেন, 'ওদের রাজদিয়া দেখাতে দেরি হয়ে গেল। তা ছাড়া রামকেশবটা—'

তাঁর কথা শেষ হতে না হতে স্নেহলতা গলা চড়ালেন, 'চান নেই খাওয়া নেই, ঘুরে ঘুরে আমার সোনাদের মুখগুলো কালো হয়ে গেছে। এদিকে রমুটাও না খেয়ে বসে আছে, অসুস্থ রোগা মানুষ। বাড়ি থেকে একবার বেরুতে পারলে ফেরার কথা কি তোমার মনে থাকে!'

মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকতে আর ভরসা হল না হেমনাথের, ইলিশ মাছ নিয়ে বিদ্যুৎগতিতে রান্নাঘরের দিকে অদৃশ্য হলেন।

স্নেহলতা ঠোঁট টিপে হেসে ফেললেন, 'যাবার রকম দেখ না! সারাদিন চড়ায় বড়ায় ঘুরে এখন ইলিশ দিয়ে ভোলাতে এসেছে। ভেবেছে ইলিশ দেখলে আমি স্বর্গে চড়ব।' বলতে বলতে লারমোরের দিকে তাকালেন, 'এই যে সাহেব, আর সঙের মতো দাঁড়িয়ে না থেকে ঘরে আসা হোক। ভাল কথা, আমি কিন্তু এ বেলা ইলিশ রেঁধে খাওয়াতে পারব না।'

লারমোর বললেন, 'বেশ তো, রাত্তিরেই খাব। ও জিনিস যখন চোখে একবার দেখেছি, না খেয়ে যেতে পারব না। গুরুর বারণ।'

'ইলিশের নামে জিভ একেবারে সাত হাত।' মধুর ভ্রূভঙ্গে লারমোরকে বিদ্ধ করে বিনুদের দিকে চোখ ফেরালেন স্নেহলতা, 'এস দাদারা, এস অবনী—'

এ বেলার খাওয়াদাওয়া সারতে সারতে বেলা হেলে গেল। পশ্চিম আকাশের ঢালু পাড় বেয়ে সূর্যটা অনেকখানি নেমে গেছে। রোদের রং এখন কাঁচা হলুদের মতো। গাছের পাতাগুলো দিনশেষের আলোয় যেন সোনালি ঝালর হয়ে উঠেছে। দু'টো পাখি ওধারের ঘরের চালে বসে ছিল। হঠাৎ কী হল, একটা পাখি চঞ্চল ডানায় তার সঙ্গীকে ঘিরে কিছুক্ষণ উড়ে উড়ে মুখোমুখি বসল, তারপর ঠোঁটে ঠোঁট ঘষে সোহাগ জানাতে লাগল, আদর করতে লাগল। বুঝিবা আশ্বিনের এই বিকেল তাদের জাদু করেছে।

উঠোনের এক ধারে আঁচিয়ে অবনীমোহনরা পুবের ঘরের ঢালা তক্তপোশে এসে বসলেন। সবাই এসেছেন, শুধু সুধা বাদ। অবশ্য স্নেহলতা শিবানী এবং সুরমাও আসেন নি। তাঁদের এখনও খাওয়া হয় নি। হেমনাথদের খাইয়ে এই সবে তাঁরা খেতে বসেছেন।

পুবের ঘরে এসে কিছুক্ষণ সবাই চুপচাপ। তারপর লারমোরই শুরু করলেন। প্রথমে বিনু আর সুনীতির সঙ্গে ঠাট্টাটাট্টা করে অবনীমোহনের সঙ্গে কলকাতার গল্প জুড়ে দিলেন। হালকাভাবে হিটলার, ইউরোপ এবং যুদ্ধের প্রসঙ্গও উঠল।

বড় বড় পলকহীন চোখে লারমোরের দিকে তাকিয়েই আছে বিনু। এই মানুষটি সম্বন্ধে তার বিস্ময় আর কাটছে না। কলকাতায় হাজার হাজার সাহেব দেখেছে সে। কিন্তু এদেশের পোশাক, এদেশের ভাষা, এদেশের অন্ন এমন নিষ্ঠায় এমন মমতায় গ্রহণ করে এরকম বাঙালি হয়ে যেতে আগে আর কাউকে দেখে নি।

কলকাতার গল্প, যুদ্ধের গল্প শেষ করে লারমোর হেমনাথের দিকে ফিরলেন, 'বুঝলে ভাই—'

হেমনাথ জিজ্ঞাসু চোখে তাকালেন, 'কী বলছ?'

'ওষুধ তো ফুরিয়ে গেছে।'

'ফুরিয়ে গেছে!'

'হ্যাঁ, হেম।' আস্তে মাথা নাড়লেন লারমোর।

বালিশে শরীর সঁপে দিয়ে আধশোয়ার মতো ছিলেন হেমনাথ। এবার উঠে বসলেন, 'কুড়ি দিনও হয়নি, ঢাকা থেকে আড়াই শ' টাকার ওষুধ তোমাকে আনিয়ে দিয়েছি। এর ভেতর খতম করে ফেললে!'

লারমোর হাসলেন, 'কী করব বল?'

অবাক চোখে এতক্ষণ তাকিয়ে ছিল বিনু। এবার বিমূঢ়ের মতো লারমোরকে দেখতে লাগল। আড়াই শ' টাকার ওষুধ তো একটুখানি ব্যাপার না, লারমোর কি কুড়ি দিনে সব খেয়ে ফেলেছেন! বিনুর একবার ইচ্ছে হল, জিজ্ঞেস করে। কিন্তু সে কিছু বলার আগেই অবনীমোহন শুধোলেন, 'এত ওষুধ দিয়ে কী হল?' বিনুর মতো তিনিও বুঝিবা কিছুটা বিমূঢ় হয়েছেন।

হেমনাথ বললেন, 'বিরাট লাভের কারবার ফেঁদেছে যে লালমোহন।'

লারমোর হাসতে হাসতে বলতে লাগলেন, 'তা যা বলেছ হেম। পনের দিন, বিশ দিন পর পর ঢাকা থেকে দেড়শ' দুশ' টাকার করে ওষুধ আনিয়ে দিচ্ছ। আর চক্ষের পলকে আমি উড়িয়ে দিচ্ছি। কারবারটা লাভের বৈকি।'

অবনীমোহনের মুখ দেখে মনে হল, কিছুই বুঝতে পারছেন না। তাঁর মনের কথা খানিক আন্দাজ করে হেমনাথ বললেন, 'আমি মুখে আর কতটুকু বলতে পারব? লারমোরকে ক'দিন দেখ, এত ওষুধ নিয়ে ও কী করে নিজেই বুঝতে পারবে।'

অবনীমোহন কী বলতে যাচ্ছিলেন, সেই সময় পানের রসে ঠোঁট টুকটুকে করে সুরমা আর স্নেহলতা এ ঘরে এলেন। শিবানী অবশ্য আসেন নি।

ঘরে পা দিয়েই স্নেহলতা বললেন, 'এ বেলা তো বাচা মাছ, সরপুঁটি আর পাবদা খাওয়া হল। ওগুলো কী হবে?'

হেমনাথ বললেন, 'কেন, ইলিশই তো আছে—'

স্নেহলতা কিছু বলবার আগেই হঠাৎ সুর করে ছড়া কেটে উঠলেন লারমোর ঃ

পয়লা পাতে কিছু তিক্ত
ঘৃত দুই হাতা।
তাহার পর মুগ দাইল (মুগ ডাল)
সহ ইলিশ মাথা।
সরিষার পাক দিয়া ইলশার ঝাল,
কাঁচা মরিচ ফোড়ন দিয়া ইলশার ঝোল,
এর সাথে পাই যদি ভাজা খান চার,
স্বর্গ তো থাকে না রামা বেশি
দূরে আর।
শাস্ত্রমতে রাইন্ধো ইলিশ
অন্যথা না হয়
অন্যথা করিবে যে, আমার
মাথা খায়।

চোখ এবং ঠোঁট কুঁচকে শুনে গেলেন স্নেহলতা। তারপর বললেন, 'আজকাল বুঝি খুব মজলকাব্য পড়া হচ্ছে!'

দাঁত বার করলেন লারমোর, 'হ্যাঁ, খুব ভাল জিনিস।'

pathagar.net

'কী ভাল?' চোখের তারা তীক্ষ্ণ করে স্নেহলতা জিজ্ঞেস করলেন, 'সারা মঙ্গলকাব্য, না তার ভেতর থেকে বেছে বেছে এই ইলিশ মাছের জায়গাটা?'

এক গাল হেসে লারমোর বললেন, 'ইলিশ মাছের জায়গাটা। ঈশ্বরের পৃথিবীতে এমন বস্তু আর সৃষ্টি হয় নি।'

সস্নেহ প্রশ্রয়ের সুরে স্নেহলতা বললেন, 'একটা মেছো বেড়াল।'

লারমোর কী বলতে যাচ্ছিলেন, ঠিক সেই মুহূর্তে বিনুর চোখ জানালার বাইরে চলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে চঞ্চল হয়ে উঠল সে। দূরে বাগানের ভেতর ডালপালাওলা ঝুপসি মতো কী যেন টেনে টেনে আনছে যুগল।

আজ এই প্রথম যুগলকে দেখল বিনু। সকালবেলা হেমনাথের সঙ্গে রাজদিয়া দেখতে বেরিয়েছিল তারা। নদীতীর, স্টিমারঘাট, মাঝিঘাট, আশ্বিনের জাদুভরা নীলাকাশ, ইলিশ মাছের আড়ত, রামকেশব, রুমা ঝুমা—নানা দৃশ্য, বিভিন্ন মানুষ, বিচিত্র সব ঘটনা বিনুকে এত মুগ্ধ এবং বিস্মিত করে রেখেছিল যে যুগলের কথা একবারও তার মনে পড়ে নি। অথচ রাজদিয়াতে এসে যাকে সব চাইতে তার ভাল লেগেছে, বিস্ময়কর মনে হয়েছে, সে যুগল।

জানালার বাইরে থেকে চোখদু'টো এবার ভেতরে নিয়ে এল বিনু, একবার লারমোরকে দেখে নিল। এই মানুষটিও তার কাছে কম বিস্ময়কর নন। যুগল এবং লারমোর—দু'ধারের দুই বিস্ময়ের টানাটানিতে শেষ পর্যন্ত যুগলই জিতল। পায়ে পায়ে ঘরের বাইরে এসে এক ছুটে বিনু বাগানে এসে হাজির।

দূর থেকে ঝুপসি জঙ্গলমতো মনে হয়েছিল। কাছে এসে বিনু দেখতে পেল, সরু সরু লম্বা পাতা আর কাঁটাভর্তি মোটা মোটা অসংখ্য লতা স্তূপাকার হয়ে আছে। রুপোর মতো চকচকে ধারাল দা দিয়ে ক্ষিপ্র হাতে পাতাটাতা ছেঁটে যুগল লতাগুলো একধারে সাজিয়ে রাখছিল। বিনুকে দেখে মুখ ভরে হাসল সে, 'এই যে ছুটোবাবু, সকাল থিকা আপনের দেখা নাই। কতবার যে খোজ করছি!'

বিনু বলল, 'আমরা দাদুর সঙ্গে বেরিয়েছিলাম।'

'হে তো জানিই। আপনেরা রাইজদা দেখতে গ্যাছিলেন। তা অ্যাত দেরি করলেন ক্যান?'

দেরি হবার কারণটা সংক্ষেপে জানিয়ে দিল বিনু।

যুগল শুধলো, 'আমাগো রাইজদা ক্যামন দেখলেন ছুটোবাবু?' বলে এমনভাবে তাকাল যেন বিনুর 'ভাল-মন্দ' বলার ওপর তার বাঁচামরা নির্ভর করছে।

'বড্ড ছোট।' অন্যমনস্কের মতো উত্তর দিয়ে কাঁটালতাগুলো দেখিয়ে বিনু বলল, 'এগুলো কী?'

'ব্যাত, ব্যাতের লতা।'

'কী হবে এগুলো দিয়ে?'

রহস্যময় হেসে যুগল বলল, 'হইব এট্টা জিনিস। এট্টু খাড়ন, নিজের চৌখেই দেখতে পাইবেন।'

বিনু উত্তর দিল না।

যুগল আবার বেলল, 'বেথুন খাইছেন ছুটোবাবু?'

'বেথুন' শব্দটা জীবনে এই প্রথম শুনল বিনু। অবাক হয়ে সে বলল, 'বেথুন কী?'

'ব্যাতের ফল।'

'বেতফল আবার খায় নাকি?'

'খায়, খায় ছুটোবাবু। অ্যামন বস্তু না খাইলে জীবন এক্কেরে ব্রেথা (বৃথা)।' বলে, চোখ বুজে মুখের ভেতর যেন বেতফলের স্বাদ নিতে লাগল যুগল।

বেতফল কখনও খায় নি বিনু। ওটা না খেলে জীবন বৃথা হয়ে যায় কিনা, এই মুহূর্তে বুঝতে পারল না সে। আস্তে করে শুধু বলল, 'কেমন লাগে খেতে?'

'নিজের মুখে আর কী কমু ছুটোবাবু, চত্তির মাসে ব্যাতফল পাকব। তহন খাইয়া দ্যাখবেন।'

বিনু বুঝল, যুগলের কথার সত্যাসত্য যাচাই করতে হলে চৈত্র মাস পর্যন্ত তাকে ধৈর্য ধরে থাকতে হবে। এখন সবে আশ্বিন।

দেখতে দেখতে সবগুলো বেতের লতা থেকে পাতাটাতা ছেঁটে ফেলল যুগল। লতাগুলোর গায়ে

pathagar.net

অবশ্য চোখা চোখা ধারাল কাঁটা থেকেই গেল, সেগুলো আর চাঁছল না। পাতা ছাঁটা হলে কাঁটাসুদ্ধ একেকটা বেত নিয়ে পাকিয়ে পাকিয়ে এক ধরনের অদ্ভুত আকারের গোল ঠোঙা তৈরি করতে লাগল যুগল। ঠোঙাগুলোর একটা দিক খুব সরু, তারপর বেতের পাক ক্রমশ বড় হয়ে মুখের কাছটা মস্ত হয়ে উঠেছে। মুখটার ব্যাস প্রায় পৌনে এক হাতের মতো।

পঁচিশ তিরিশটা ঠোঙা তৈরি হলে প্রতিটার সরু দিকে একটা করে লম্বা দড়ি বাঁধতে লাগল যুগল।

চুপচাপ বিনু দেখে যাচ্ছিল। দড়ি বাঁধা যখন শেষ হয়ে এসেছে সেই সময় কোত্থেকে যেন সুধা এসে হাজির। অবাক চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে সে বলল, 'এগুলো কী?'

যুগল বলল, 'ফান্দ্ (ফাঁদ)।'

'কী হবে এসব দিয়ে?'

বিনুকে যেভাবে বলেছিল তেমনি রহস্যের সুরে হেসে হেসে যুগল সুধাকে বলল, 'অহন কমু না।'

সুধা ভুরু কুঁচকে তাকাল, 'বললে কী হবে?'

'আগে থিকা কইলে গুণ নষ্ট হইয়া যাইব।'

সুধার চোখমুখ বিরক্ত, কিছুটা বা বিমূঢ় দেখাল। আর কিছু বলল না সে।

দড়ি বাঁধা হয়ে গিয়েছিল। যুগল বলল, 'আসেন ছুটোবাবু, আসেন ছুটোদিদি, ফান্দ্গুলার ব্যবোস্তা কইরা আসি।'

সুধা আর বিনুকে নিয়ে পুকুরপাড়ে চলে এল যুগল। তারপর বেতের ফাঁদগুলো জলে ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিতে লাগল। লম্বা দড়ির একদিক দিয়ে ফাঁদগুলো বাঁধা, দড়ির অন্য প্রান্তগুলো চারপাশের গাছপালার মোটা ডাল বা গুঁড়িতে বেঁধে রাখল যুগল।

বিনু বলল, 'এগুলো জলে ফেললে যে?'

যুগল বলল, 'সাতখান দিন সবুর করেন ছুটোবাবু, তারপর বুঝতে পারবেন ক্যান ফেলাইছি।'

ফাঁদটাদ ফেলা হয়ে গেলে সুধা-বিনু-যুগল কথা বলতে বলতে আবার বাগানে ফিরে এল। আর তখনই দেখা গেল, রাস্তার দিক থেকে মস্ত এটা বাক্স হাতে ঝুলিয়ে হিরণ আসছে। বিনুরা দাঁড়িয়ে পড়ল।

কাছাকাছি এসে একমুখ হাসল হিরণ। সুধার চোখে চোখ রেখে খুব খুশি গলায় বলল, 'আরে আপনি। বাগানে কী করছেন?'

কেমন করে যেন হাসল সুধা। রাজহাঁসের মতো গলাটা ঈষৎ বাঁকিয়ে মজার গলায় বলল, 'আপনার জন্যেই দাঁড়িয়ে আছি।'

'আমার জন্যে!'

'হ্যাঁ স্যার—'

'আমি এখন আসব, আপনি জানতেন?'

খুব দীর্ঘ টান দিয়ে সুধা বলল, 'হুঁ—'

হিরণ বলল, 'কেমন করে জানলেন?'

'হাত গুনে—'

হিরণ আর কিছু বলল না, উজ্জ্বল হাসিভরা চোখে তাকিয়ে রইল।

একটুক্ষণ নীরবতা। তারপর হিরণের হাতের বাক্সটা দেখিয়ে সুধা বলল, 'ওটা কী?'

'গ্রামোফোন। আপনাদের জন্যে নিয়ে এলাম।'

পাশ থেকে যুগল বলে উঠল, 'গামাফোন কী হিরু দাদা?'

হিরণ বলল, 'কলের গান।'

যুগল আবার প্রায় লাফিয়ে উঠল 'গান শুনুম, গান শুনুম—'

সুধা হিরণকে বলল, 'বাগানে দাঁড়িয়ে থেকে কী হবে, ঘরে গিয়ে গান শোনা যাক।'

'চলুন।'

pathagar.net

চারজনে বাড়ির দিকে চলতে শুরু করল। সুধা হিরণ আগে আগে, যুগল বিনু পেছনে।

যেতে যেতে হিরণের সঙ্গে খুব কথা বলতে লাগল সুধা, আর হাসতে লাগল। এমনিতেই প্রচুর কথা বলে সে, দিনরাতই বকবকায়মান। কিন্তু এখনকার প্রগলভতার তুলনা নেই।

পেছন থেকে আড়ে আড়ে বিনু দেখতে লাগল, ছোটদির চোখে মুখে হাসি নাচছে, আর কী এক অলৌকিক আলো খেলে যাচ্ছে। সুধার মুখে এমন হাসির ছটা, আলোর খেলা আগে আর কখনও দেখে নি বিনু।

হিরণ আর সুধা সোজা পুবদুয়ারী ঘরখানায় চলে এল, তাদের পিছু পিছু বিনুও। যুগলও সঙ্গে এসেছিল। সে ভেতরে ঢুকল না। দরজার কাছে উদ্‌গ্রীব দাঁড়িয়ে থাকল।

অবনীমোহন কি লারমোর, সুরমা কিংবা স্নেহলতা—সবাই ঢিলেঢালাভাবে তক্তপোশে বসে ছিলেন। আর এলোমেলো গল্প করছিলেন।

হিরণকে দেখে প্রায় লাফিয়ে উঠলেন লারমোর। উচ্ছ্বাসের সুরে বললেন, 'আরে শ্যামচন্দর যে! আয় আয়।'

ঘাড় বাঁকিয়ে হাসিমুখে হিরণ বলল, 'আমি তো শ্যামচন্দর—কালো কুটকুটে। তুমি কী?'

সুর করে এক কলি গেয়ে উঠলেন লারমোর, 'আমি গোরাচাঁদ হে—'

'তাই নাকি!'

'নিশ্চয়ই। বিশ্বসংসার সে কথা বলবে।' নিজের একখানা হাত সামনের দিকে বাড়িয়ে লারমোর বললেন, 'দ্যাখ কেমন ধবধবে—'

ঠোঁট কুঁচকে কপট তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে লালমোরের হাতখানা ঠেলে দিল হিরণ, 'এ হাত বার করে আর রঙের গর্ব করতে হবে না। গোরাচাঁদ একদিন হয়তো ছিলে, এখন আর নেই। এদেশে থাকতে থাকতে—'

সন্দিগ্ধ চোখে লারমোর তাকালেন, 'থাকতে থাকতে কী?'

'আমাদের মতো কষ্টিপাথর হয়ে গেছ।'

'বলছিস, বলছিস!'

'একবার কেন, হাজার বার বলছি।'

একটু আগে লারমোরের চোখেমুখে কণ্ঠস্বরে লঘু কৌতুকের আভা ছিল, এবার তাতে ভিনভাবের রং লাগল। আবেগপূর্ণ সুরে তিনি বলতে লাগলেন, 'কষ্টিপাথরই আমি হতে চেয়েছিলাম রে। যেদিন প্রথম এদেশে আসি সেদিন থেকেই আমার সাধ বাঙালি হওয়া তারপর চল্লিশ বছর ধরে সেই চেষ্টাই করে আসছি। নিজের বলতে যা ছিল সব ফেলে দিয়ে, সব ভুলে গিয়ে এ দেশের অন্ন-বস্ত্র-ভাষা মাথায় তুলে নিয়েছি। প্রাণভরে সারা গায়ে এখানকার আলো-বাতাস ধুলো-কাদা মেখেছি। বাকি ছিল গায়ের রংটা। তুই তো বলছিস, রঙের গর্ব আমার ঘুচেছে। এতদিনে আমি কি তবে পুরোপুরি এদেশের মানুষ হতে পারলাম?'

লারমোরের আবেগ হিরণের বুকের অতলে সব চাইতে স্পর্শকাতর তারটাকে ছুঁয়ে গিয়েছিল। গভীর গলায় সে বলল, 'তুমি শুধু এদেশের মানুষ না লালমোহন দাদু, সব দেশের সব কালের মানুষ। তুমি বাঙালি হতে চেয়েছ, তার বদলে আমরা যদি তোমার মতো হতে চাইতাম, জীবন ধন্য হয়ে যেত।'

খানিক আগের ঘোরটা হঠাৎ কেটে গেল। হালকা গলায় লারমোর বললেন, 'থাক, আমাকে আর আকাশে তুলতে হবে না।' একটু থেমে আবার বললেন, 'যার মতো হলে সত্যি সত্যি ধন্য হতে পারতিস সে আমি না, ওই মানুষটা—'

লারমোর আঙুল দিয়ে হেমনাথকে দেখিয়ে দিলেন।

বিব্রতভাবে চেঁচামেচি করে উঠলেন হেমনাথ, 'বেশ তো দু'জনের ভেতর হচ্ছিল। তার মধ্যে আমাকে আবার টানাটানি কেন? হিরণ তোমাকে আকাশে চড়াতে চাইছে। একলাই ওঠ না বাপু। অত উঁচুতে ওঠার লোভ আমার নেই।'

আপন মনেই এবার বুঝি লারমোর বললেন, 'আমি যদি এ দেশের মানুষ হতে পেরে থাকি তা ওই হেমের জন্যে। আমার সব কাজ সব ভাবনার পেছনে ঈশ্বরের দূত হয়ে ও দাঁড়িয়ে আছে।'

হেমনাথ চোখ পাকিয়ে তেড়ে উঠলেন, 'আবার—'

কিছুক্ষণ নীরবতা।

এর ভেতর সুধা আর বিনু তক্তপোশে উঠে সুনীতির গা ঘেঁষে বসে পড়েছে।

একসময় হিরণের চোখে চোখ রেখে হেমনাথ ডাকলেন, 'অ্যাই শিম্পাজি—'

মাথাটা সামনের দিকে ঈষৎ ঝুঁকিয়ে হেসে হেসে হিরণ বলল, 'চমৎকার খেতাব। এই মাথা পেতে নিলাম।'

হিরণ এমনভাবে এমন সুরে বলল যে সবাই হেসে উঠল।

হাসাহাসির ভেতর লারমোর বললেন, 'তুমি দেখছি হিরুটাকে মানুষের ভেতরেই রাখতে চাও না হেম। নাম কেটে একেবারে শিম্পাঞ্জির দলে নামিয়ে দিলে!'

'দেব না?' হেমনাথ বলতে লাগলেন, 'কাল রাত্তিরে সেই যে গেল বাঁদরটা, তারপর আজ এই এতক্ষণে আসার সময় হল। অথচ বলে গিয়েছিল, সকালবেলা আসবে, আমাদের সঙ্গে রাজদিয়া বেড়াতে যাবে। হেন তেন কত কী। একটা কথার যদি ঠিক থাকে!' বলতে বলতে হিরণের দিকে ফিরে চোখ পাকালেন, 'সারাদিন কোন রাজ্যিতে থাকা হয়েছিল শুনি? মিথ্যে কথা বললে কিন্তু মাথা ভেঙে দেব।'

হিরণ চোখ তুলে একবার সুধাকে দেখে নিল। সুধার টেপা ঠোঁটে এবং চোখের তারায় শব্দহীন হাসি খেলে যাচ্ছিল। তার লাঞ্ছনায় মেয়েটা বুঝিবা খুব খুশি। তাড়াতাড়ি চোখ ফিরিয়ে কপট ভয়ে হিরণ বলল, 'ভোর রাত্তিরে উঠে গয়নার নৌকো করে সিরাজদীঘায় আহাদ কাকার বাড়ি গিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম ফিরতি নৌকোয় সকাল সকাল চলে আসতে পারব। আহাদ কাকা দুপুরে না খাইয়ে ছাড়ল না। তাই তো ফিরতে দেরি হয়ে গেল।'

হেমনাথ বললেন, 'আহাদের ওখানে কোন রাজকার্যটা ছিল?'

গ্রামোফোনের বাক্সটা তুলে ধরে হিরণ বলল, 'এইটা আনতে গিয়েছিলাম। গেল মাসে আহাদ কাকার মেয়ের শাদি গেছে না, তখন এটা নিয়ে গিয়েছিল।'

'আজই ওটার কী দরকার পড়ল?'

লারমোর এই সময় বলে উঠলেন, 'গ্রামোফোন দিয়ে কী হয়, ছেলেটা ঘরে পা দিতে না দিতে তুমি যে মোক্তারের জেরা শুরু করে দিলে হেম। বোস্ রে হিরু—'

হিরণ তক্তপোশের একধারে বসল।

গ্রামোফোনের নামে উৎসাহিত হয়ে উঠেছিলেন লারমোর। বললেন, 'আজ একটু গানবাজনা হোক তা হলে।'

হিরণ বলল, 'সেই জন্যেই এটা নিয়ে এলাম।'

লারমোর শুধোলেন, 'কী কী রেকর্ড আছে রে?'

'রবীন্দ্রসঙ্গীতই বেশি।'

'রবীন্দ্রসঙ্গীত! মন্ত্র জপ করার মতো লারমোর বললেন, 'মানুষের পৃথিবীতে নিষ্পাপ, পবিত্র জিনিস খুব বেশি নেই। আছে যে ক'টা আছে তার ভেতর রবীন্দ্রনাথের গান একটা, না কি বল হেম?' বলে হেমনাথের দিকে তাকালেন।

আস্তে মাথা নাড়লেন হেমনাথ, 'হ্যাঁ। ওই গানগুলো দিয়ে ঈশ্বরকে যেন ছোঁয়া যায়।'

'ঠিক বলেছ।' লারমোর আবার হিরণের দিকে ফিরলেন, 'রবীন্দ্রসঙ্গীত ছাড়া আর কী আছে? কীর্তন?'

pathagar.net

হিরণ বলল, 'আছে দু'চারখানা।'

'ভাটিয়ালি?'

'আছে।'

'এ যে একেবারে মহোৎসবের ব্যাপার রে। দে, লাগিয়ে দে।'

স্নেহলতা এতক্ষণ চুপচাপ বসে ছিলেন। এবার বলে উঠলেন, 'উহুঁ উঁহু, এখন না।'

লারমোর বললেন, 'তবে কখন?'

'সন্ধের পর। ইলিশ মাছগুলো রাত্তিরে খেতে হবে তো।'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই।'

'কাঁচা নিশ্চয়ই খাওয়া যাবে না। যাই, কিরকম কী রান্না হবে ওদের বলে আসি।' বলতে বলতে হাতের ভর দিয়ে উঠে পড়লেন স্নেহলতা।

আকুল সুরে লারমোর বললেন, 'ইলিশ ভাতে আর ইলিশের ডিম দিয়ে টক যেন অবশ্যই হয়।'

বর দেবার ভঙ্গিতে স্নেহলতা বললেন, 'হবে।' ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন তিনি।

একটু পরেই সন্ধে নেমে গেল। অন্ধকারটা কোথায় যেন হাত-পা গুটিয়ে চুপটি করে বসে ছিল, লাফ দিয়ে বেরিয়ে এসে চোখের পলকে দিগ্‌দিগন্তে ছড়িয়ে পড়ল। খুব ঘন করে বোনা কালো শাড়ির মতো আশ্বিনের সন্ধে চোখের সামনের সজল শ্যামল দৃশ্যপটকে দ্রুত মুড়ে ফেলতে লাগল।

এতক্ষণ জোনাকিদের দেখা পাওয়া যায় নি। হঠাৎ তারা উঠোনে, দূর ধান বনে, বাগানের নিবিড় গাছপালার ফাঁকে নাচানাচি শুরু করে দিল।

এদিকে স্নেহলতা ইলিশ মাছের ব্যবস্থা করে ঘরে ঘরে হেরিকেন জ্বালিয়ে দিলেন। তারপর দরজায় দরজায় জলছড়া দিয়ে সন্ধেবাতি দেখিয়ে পুবদুয়ারী ঘরে চলে এলেন। তক্তপোশের একধারে বসতে বসতে হিরণকে বললেন, 'নে, এবার আরম্ভ কর।'

গ্রামোফোনে দম দিয়ে নতুন পিন লাগিয়ে রেকর্ড বাজাতে শুরু করল হিরণ। একের পর এক গান—সাহানা দেবীর, নীহারবালার, অমলা দত্তর, কনক দাসের। সবগুলোই রবীন্দ্রনাথের প্রেমের গান।

প্রায় সবাই তন্ময় হয়ে শুনছিল। কিন্তু তক্তপোশের দূর প্রান্তে যেখানে সুধা সুনীতি বসে আছে সেখানকার হাওয়ায় ফিসফিসানির মতো একটা শব্দ ভেসে বেড়াচ্ছে।

বিনুও সুধা সুনীতির কাছেই এতক্ষণ বসে ছিল, এখন শুয়ে পড়েছে। সারাদিন ঘোরাঘুরি গেছে। আর বসে থাকতে পারছিল না সে। চোখের পাতা ধীরে ধীরে ভারী হয়ে জুড়ে আসছিল।

এই মুহূর্তে রবীন্দ্রনাথের সেই গানটা বাজছে, 'আমার প্রাণের মাঝে সুধা আছে—'

আধো ঘুমে বিনু শুনতে পেল সুনীতি সুধাকে বলছে, 'অ্যাই ছুটকি—'

সুধা বলল, 'কী বলছিস?'

'বেছে বেছে কিরকম গান এনেছে দেখেছিস?'

'কিরকম?'

গলা আরও নামিয়ে সুনীতি বলল, 'একেবারে সুধামাখানো।'

আড়ে আড়ে একবার স্নেহলতা সুরমাদের দেখে নিয়ে জিভ ভেংচে দিল সুধা, 'ভাল হবে না বলছি দিদি—ই-হি-হি-হি—'

আগের গানটা শেষ হয়ে গিয়েছিল। হিরণ রেকর্ড বদলে দিল। নতুন গানটায় মৃদু নেশার মতো আলতোভাবে কী যেন জড়ানো।

'ভালবাসিবে বলে ভালবাসি নে,
আমার এই রীতি, তোমা বই জানি নে।
বিধুমুখে মধুর হাসি, দেখিলে সুখেতে ভাসি।
তাই তোমারে দেখতে আসি,
দেখা দিতে আসি নে।'

ছোট বোনের গালে আস্তে টোকা দিয়ে সুনীতি বলল, 'শুনছিস, শুনছিস—'

pathagar.net

সুনীতির দিকে মুখ না ফিরিয়ে ঈষৎ ঝাঁঝাল গলায় সুধা বলল, 'শুনছি। তুই আর বকবক করিস না।'

সুনীতির ঠোঁটে মুখে, চোখের কালো তারায় দুষ্টুমি নাচছিল। এমনিতে সে বেশ গম্ভীর। কিন্তু এই মুহূর্তে প্রগলভতা যেন তার ওপর ভর করে বসেছে। সুধার কানের কাছে মুখটা নিবিড় করে সে বলল, 'এই সব গান খুঁজে খুঁজে কার জন্যে এনেছে জানিস?'

'কার জন্যে?'

'তোর জন্যে।'

চাপা গলায় সুধা ঝঙ্কার দিল, 'তোকে বলেছে?'

সুনীতি হেসে হেসে বলল, 'মুখে ফুটে ঠিক বলে নি। তবে—'

'কী?'

'তোকে ছাড়া আর কাকেই বা এসব গান শোনাতে পারে, বল?'

সুধার মাথায় এবার দুষ্টুমি ভর করল, 'কেন, তোকেও তো পারে।'

মাথাটা ধীরে ধীরে দুলিয়ে সুনীতি বলল, 'উঁহু—'

সুধা এবার আর কিছু বলল না, স্থির দৃষ্টিতে বড় বোনের দিকে তাকাল।

সুনীতি বলল, 'কাল থেকে তোর আর হিরণকুমারের ভেতর যা চলছে তাতে এই গানগুলো না শোনালে আমি ওর প্রাণদন্ড দিতাম।'

সুধা চকিত হল। তার বিব্রত মুখে, চোখের তারায় ভয়ের মতো কিছু যেন ফুটল। কাঁপা গলায় সুধা শুধলো, 'কী চলছে আমাদের ভেতর?'

'কাল ফিটনে করে আসবার সময় দু'জনে মুখোমুখি বসে শুধু গল্প আর গল্প। বাড়ি ফিরেও সে গল্প থামে না। আজও বাগানের ভেতর দিয়ে আসতে আসতে দু'জনে কথার ফোয়ারা ছোটাচ্ছিলি। আর—'

'আর কী!'

'একজন আরেক জনের দিকে কেমন করে তাকিয়েছিলি জানিস?'

'কেমন করে?'

'একেবারে মুগ্ধ, মুগ্ধ, মুগ্ধ হয়ে—'

সুধা ঠোঁট টিপল। চোখের তারা নাচিয়ে বলল, 'যেমন তুই আনন্দবাবুর দিকে তাকিয়েছিলি, না?'

চোখ পাকিয়ে সুনীতি কী বলতে যাচ্ছিল, সেই সময় গ্রামোফোনে কড় কড় করে খানিক কর্কশ আওয়াজ তুলে গান বন্ধ হয়ে গেল। সুধা সুনীতি চমকে সেদিকে তাকাল। বিনুও মাথা তুলতে চেষ্টা করল, পারল না। চোখ দু'টোয় ঘন আঠা লাগিয়ে কেউ যেন আরও বেশি করে জুড়ে দিচ্ছে।

উদ্বেগের সুরে স্নেহলতা বললেন, 'কী হল রে হিরু?'

খানিকক্ষণ গ্রামোফোনটা নাড়াচাড়া করে হিরণ বলল, 'স্প্রিং আর একটা ছোট কল কেটে গেছে।'

'তা হলে?'

'না সারালে রেকর্ড বাজবে না। কালই নারাণগঞ্জ থেকে এটা সারিয়ে আনব।'

লারমোর ওধার থেকে আক্ষেপের সুরে বললেন, 'জমজমাট আসরটা একেবারে মাটি হয়ে গেল।'

হেমনাথ বললেন, 'মাটি বলে মাটি—'

স্নেহলতা সুরমা শিবানী—সবাই মগ্ন হয়ে শুনছিলেন। এমন চমৎকার গানের আসর মাঝপথে ভেঙে যাওয়াতে তাঁরাও দুঃখিত হলেন।

হঠাৎ সুধা বলে উঠল, 'গান কিন্তু এখনও চলতে পারে।'

হিরণ উৎসুক হল, 'কিভাবে?'

সুধা বলল, 'দিদি খুব ভাল গাইতে পারে। যদি একটা হারমোনিয়াম—'

তার কথা শেষ হবার আগেই চাপা গলায় সুনীতি বলতে লাগল, 'এই সুধা, এই—এই '

হিরণ হাসিমুখে বলল, 'ওঁকে এই এই করছেন কেন? আমাদের বাড়ি হারমোনিয়াম আছে। এক্ষুনি নিয়ে আসছি।'

'না—না, কিছুতেই না—' সুনীতি দু'হাত সমানে নাড়তে লাগল।

'না কি হ্যাঁ, পরে বোঝা যাবে'খন। আগে তো হারমোনিয়ামটা নিয়ে আসি।' হিরণ উঠে দাঁড়াল।

'আমি গাইব না, কিছুতেই না।' সুনীতি প্রায় চেঁচাতেই লাগল, 'শুনুন, আমার চাইতে সুধা ঢের, ঢের ভাল গাইতে পারে, অভিনয়ও করতে পারে। কলেজের ফাংশনে গান গেয়ে অভিনয় করে কত কাপ মেডেল পেয়েছে।'

হিরণের চোখের তারা এবার সুধার দিকে ঘুরল। মুখ দেখে মনে হল, এতখানি বিস্মিত আগে আর কখনও হয় নি সে। আস্তে করে বলল, 'অভিনয় করতে পারেন? তাহলে পুজোয় একটা ভাল নাটক করতেই হয়।'

হঠাৎ এই সময় হেমনাথ বললেন, 'আমাদের সুধাদিদি আর হিরণের মধ্যে দেখছি অনেক মিল। দু'জনেই কথাসরিৎসাগর, আবার দু'জনেই অভিনয় করতে পারে।'

সুরমা অবাক হয়ে বললেন, 'হিরণ অভিনয় করতে পারে!'

'পারে আবার না!' হেমনাথ বলতে লাগলেন, 'প্লে বলতে তো ও একেবারে অজ্ঞান, নাওয়া-খাওয়ার কথা পর্যন্ত ভুলে যায়। পুজোর ছুটিতে রাজদিয়ার সবাই ফিরে আসুক, তখন দেখবে হিরণচন্দর নাটক বগলে করে এ বাড়ি ও বাড়ি কেমন ছোটাছুটি করছে। তখন চলা-ফেরা-চাউনি দেখলে মনে হবে স্বয়ং শিশির ভাদুড়ি।'

ঈষৎ অসহিষ্ণু সুরে হিরণ বলল, 'নাটক এখন থাক। আমি ছুটে গিয়ে হারমোনিয়ামটা নিয়ে আসছি।'

সুধা হাসল, 'নীহারবালা, কনক দাসের রেকর্ড শোনার পর আমার গান কারও ভাল লাগবে না। না না, হারমোনিয়াম আনবেন না। কিছুতেই না।'

এরপর হিরণ কী বলল, বিনু শুনতে পেল না। গাঢ় ঘুম চারদিক থেকে তখন তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছিল, মনে নেই। একসময় আবছাভাবে পর পর ক'টা ডাক বিনুর কানে এল, 'এই বিনু—বিনু, দাদাভাই—দাদাভাই—'তারপরেই হাত ধরে টেনে কে যেন তাকে বসিয়ে দিলেন।

চোখভর্তি ঘুম। বসে বসেই ঢুলতে লাগল বিনু। সেই গলাটা আবার শোনা গেল, 'চোখে জল দে দাদাভাই। এই যে জল—'

নিজে থেকে জল দেবার মতো অবস্থা নয়। যিনি কথা বলছিলেন তিনিই তার চোখেমুখে খানিকটা জল ছিটিয়ে দিলেন।

এবার ঘুম অনেকখানি ছুটে গেল। চোখ মেলে বিনু দেখতে পেল— হেমনাথ।

হেমনাথ বললেন, 'খাবি না? চল চল, সবাই খেতে বসে গেছে।'

দু'হাতে বিনুকে কোলে তুলে হেমনাথ রান্নাঘরের বারান্দায় চলে এলেন। এখানে সারি সারি নকশা-কাটা আসন পাতা। অবনীমোহন সুধা সুনীতি হিরণ লারমোর—সবাই একেকটা আসন দখল করে বসে আছেন। সামনের দিকে স্নেহলতা সুরমা এবং এ বাড়ির দু'টি আশ্রিতা বিধবা ভাতটাত নিয়ে প্রস্তুত। এখন হেমনাথ আর বিনু বসে গেলেই হয়।

কোণের দিকের দু'টো আসন ফাঁকা। হেমনাথ একটা আসনে নিজে বসলেন, অন্যটা কাছে টেনে এনে বিনুকে বসালেন।

স্নেহলতা হেমনাথের উদ্দেশে বললেন, 'দাদাভাই কি তোমার সঙ্গে খাবে?'

'হ্যাঁ।' হেমনাথ মাথা নাড়লেন, 'রাত্তিরবেলা কাঁটা টাটা বেছে খেতে পারলে না। তার ওপর

চোখে ঘুম রয়েছে। আমিই ওকে খাইয়ে দেব'খন।'

ঘরশত্রু ছোটদিটা এই সময় নাক কুঁচকে বলে উঠল, 'এত বড় ধেড়ে ছেলে, তাকে আবার খাইয়ে দিতে হয়।'

বিনুর কান লাল হয়ে গেল। লজ্জায় ঘাড় গুঁজে জোরে জোরে প্রবল বেগে সে মাথা নাড়তে লাগল, 'না না—'

হেমনাথ খানিক আন্দাজ করেছিলেন। মৃদু হেসে বললেন, 'কী হল দাদাভাই?'

বিনু মুখ না তুলে বলল, 'আমি তোমার সঙ্গে খাব না।'

সবার চোখেমুখে কৌতুকের হাসি খেলে যাচ্ছিল। হেমনাথ ঈষৎ ঝুঁকে বললেন, 'তবে কার সঙ্গে খাবি?'

'কারোর সঙ্গে না। আলাদা খাব।'

'কিন্তু ইলিশ মাছে বড্ড সরু সরু কাঁটা, বেছে খেতে কি তুই পারবি দাদা? একটা যদি গলায় ফুটে যায়—'

ক্লাস সেভেনে পড়ে বিনু। কিন্তু এখনও কাঁটা বেছে খেতে শেখে নি, কাঁটা সম্পর্কে তার দারুণ ভয়। বিনু কী উত্তর দিতে যাচ্ছিল, তার আগেই চিমটি কাটার মতো করে সুধা বলল, 'একলা খেলে নির্ঘাত ও কাঁটা ফোটাবে। তারপর চেঁচিয়ে মেচিয়ে এক কান্ড করে বসুক। মাঝখান থেকে লাভ হবে এই, আমরা ভাল করে খেতে পারব না। এতখানি বয়েস হলে কী হবে, এখনও একেবারে কচি খোকা।'

বিনু এবার মুখ তুলল, এমনভাবে সুধার দিকে তাকাল যেন ভস্মই করে ফেলবে। জিভ ভেংচে কিছু বলতে যাচ্ছিল সে, তার আগেই মৃদু ভর্ৎসনার সুরে অবনীমোহন সুধাকে বললেন, 'কী হচ্ছে সুধা! কেন ওর পেছনে লেগেছিস?'

সুধা আর কিছু বলল না। তবে ঠোঁট উলটে দিয়ে, ঘাড় বাঁকিয়ে, চোখ নাক কুঁচকে কেমন করে যেন বিনুকে একবার দেখে নিল, তারপর অন্যদিকে মুখ ফেরাল।

হেমনাথ বললেন, 'তা হলে আমার সঙ্গেই খা দাদাভাই—'

আড়ে আড়ে সুধার দিকে তাকিয়ে বিনু বলল, 'কিন্তু ছোটদিটা—'

'না না, সুধা কিছু বলবে না।'

বিনু চুপ করে রইল। বোঝা গেল, হেমনাথের সঙ্গে খেতে তার আর আপত্তি নেই।

সবাই বসে পড়েছে। স্নেহলতা পাতে পাতে গরম ভাত দিতে লাগলেন। জুঁই ফুলের মতো ধবধবে সাদা ভাত। তাঁকে সাহায্য করতে লাগলেন সুরমা। নির্দেশমতো সেই বিধবা দু'টি রান্নাঘর থেকে মাছ-ডাল-ভাজা-টাজা নিয়ে আসতে লাগল।

প্রথমে সরষাটা ঘি, জলসেঁচি শাক ভাজা, উচ্ছে ভাজা, আলুভাজা, মানকচুর বড়া। তারপর এল ইলিশ মাছ ভাজা।

ইলিশ দেখে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন লারামোর। এক টুকরো ভাজা মাছ ওপরে তুলে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে দেখতে একেবারে গানই জুড়ে দিলেন।

'এসো মনোহর রসের আগর
নবনী-মাখানো অঙ্গ।
তোমারে দেখিয়া তোমারে চাখিয়া,
মোহিত এ ভূমি বঙ্গ।'

গানের মধ্যে সবাই মুখ টিপে টিপে হাসতে লাগল। লারমোর থামলে হেমনাথ বললেন, 'ইলিশ দেখে যে খেপে উঠলে!'

বিনু লক্ষ করেছে, দেখেই শুধু নয়, ইলিশের কথা উঠলেই লারমোর একেবারে আত্মহারা হয়ে যাচ্ছেন।

হাসিমুখে লারমোর বললেন, 'ব্যাপার কি জানো হেম, এ মাছটা দেখলে আমার আর আর জ্ঞান থাকে না।'

'সে তো বুঝতেই পারছি।'

লারমোর থামেন নি। গলায় ঈষৎ উত্তেজনা মিশিয়ে বলতে লাগলেন, 'পৃথিবীতে কোনও খাদ্যবস্তু নিয়ে মহৎ সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে কিনা, জানি না। আমার ধারণা ইলিশ মাছ নিয়ে একখানা মহাকাব্য রচনা করা যেতে পারে।'

হেমনাথ বললেন, 'বেশ তো, নতুন মহাভারত শুরু করে দাও।'

'লাইনে লাইনে মিল দিয়ে পদ্য ফাঁদতে পারলে কি এতদিন হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকি?'

লারমোর আরেক প্রস্থ ইলিশের গুণগান করতে যাচ্ছিলেন, বাধা দিয়ে হেমনাথ বললেন, 'যথেষ্ট হয়েছে, এবার খাও দেখি। ভাত জুড়িয়ে জল হয়ে যাচ্ছে।'

'আরে তাই তো—' চকিত লারমোর আবার থালায় মনোনিবেশ করলেন।

তারপর একে একে ইলিশভাতে এল, ইলিশের ঝোল এল, ইলিশের ডিম দিয়ে টক এল। খেতে খেতে একসময় মুখ তুলে অবনীমোহনের দিকে তাকালেন লারমোর, 'আচ্ছা অবনী—'

'আজ্ঞে—' অবনীমোহন সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দিলেন।

'রাজদিয়ায় এবারই তো প্রথম এলে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।' অবনীমোহন ঘাড় হেলিয়ে বললেন, 'রাজদিয়া কেন, পূর্ব বাংলাতেই এই আমার প্রথম আসা।'

'তোমাদের দেশ ছিল কোথায়?'

'শুনেছি বীরভূম জেলায়।'

'শুনেছি মানে?'

'কোনওদিন যাই নি কিনা। দু'পুরুষ ধরে আমরা কলকাতাতেই আছি।'

লারমোর শুধোলেন, 'দেশে যাও নি কেন?'

অবনীমোহন বললেন, 'ঠাকুরদা সত্তর আশি বছর আগে বাস উঠিয়ে কলকাতায় চলে এসেছিলেন। দেশে বাড়িঘর বলতে কিছু নেই। কোথায় যাব?'

'তা বটে।'

একটুক্ষণ নীরবতা। খানিক ভেবে নিয়ে লারমোর বললেন, 'তোমরা তো খাঁটি পশ্চিম-বঙ্গীয়—'

'আজ্ঞে হ্যাঁ—' অবনীমোহন হাসলেন।

'আমাদের ইস্টবেঙ্গল কিরকম দেখছ বল।'

'কতটুকু আর দেখেছি। স্টিমারে আসতে আসতে যা চোখে পড়েছে আর মামাবাবু আজ যেটুকু ঘুরিয়ে দেখিয়েছেন তার বাইরে সবই এখনও অদেখা, অজানা। তবে সামান্য যা দেখেছি তাতে মুগ্ধ হয়ে গেছি। কী ভাল যে লাগছে—'

'কিছুই দেখা হয়নি।' বলতে বলতে হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন লারমোর, 'দেখ দেখ, ঘুরে ঘুরে এর আকাশ দেখ, মেঘ দেখ, ফুল দেখ, ধানের খেত, খাল-বিল-নদী আর মানুষ দেখ। শুধু দেখলেই চলবে না, বুকের ভেতর অনুভবও করতে হবে। বুঝলে অবনী, ইস্টবেঙ্গল না দেখলে, তাকে না জানলে বাংলাদেশকে দেখা বা জানা সম্পূর্ণ হয় না। বাংলাদেশই বা বলি কেন, সারা ভারতবর্ষের সব চাইতে সরস আর প্রাণবন্ত অংশটাই অদেখা, অজানা থেকে যাবে।'

লারমোরের কণ্ঠস্বরে এমন কিছু ছিল, আশ্বিনের বাতাসে ভেসে ভেসে যা সবার বুকে ঢেউ তুলে যেতে লাগল। অবনীমোহন বা অন্য কেউ কিছু বললেন না, অভিভূতের মতো বসে থাকলেন। একজন বিদেশি মানুষ এদেশকে কতখানি ভালবেসেছেন, আপন অস্তিত্ব লুপ্ত করে দিয়ে কিভাবে নিজেকে পূর্ব বাংলার পাখি-মেঘ-ফুল-ফসল-মানুষ এবং প্রকৃতির সঙ্গে একাকার করে দিয়েছেন—অবনীমোহন যত ভাবছিলেন ততই অবাক হয়ে যাচ্ছিলেন। এখানকার আকাশে বাতাসে, মাঠে ঘাটে, শ্যামল বনানীতে নিজেকে শুধু হারিয়েই ফেলেন নি লারমোর, এই সজল সরস বাংলাদেশকে নিয়ে তাঁর গৌরবেরও শেষ নেই।

লারমোর আবার বললেন, 'জানো অবনী, যৌবনে আমি এদেশে এসেছিলাম। তারপর চল্লিশ

পঞ্চাশ বছর ধরে পূর্ব বাংলাকে দেখছি, দেখেই যাচ্ছি। প্রথম দিন দেখে যতখানি মুগ্ধ হয়েছিলাম, বিস্মিত হয়েছিলাম, আজও সেই মুগ্ধতা সেই বিস্ময় আমার কাটে নি।' বলতে বলতে হঠাৎ অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে ডাকলেন, 'হেম—'

পাতের ভাত নাড়াচাড়া করছিলেন হেমনাথ। চোখ তুলে বললেন, 'কী বলছ?'

'দিনরাতই তো তুমি চরকি কলে ঘুরছ। দু'চারটে দিন ঘোরাফেরা একটু বন্ধ রেখে অবনীমোহনদের চারদিক ভাল করে দেখিয়ে দাও।'

'চরকি কলে আমি একলাই ঘুরি? তুমি ঘোরো না?'

বাঁ হাতে ঘাড় চুলকোতে চুলকোতে লারমোর হেসে ফেললেন, 'তা অবশ্য ঘুরি।'

হেমনাথ বললেন, 'ভাগনী ভাগনী-জামাই নাতি-নাতনী আমার একার নয়, তোমারও। এ দেশ ঘুরিয়ে তোমাকেও দেখাতে হবে।'

লারমোর উদীপ্ত হয়ে ওঠেন, 'হাজার বার।' বলে কী একটু ভেবে আবার শুরু করলেন, 'শুভস্য শীঘ্রম। কাল থেকেই শুরু করে দেওয়া যাক। কাল সুজনগঞ্জের হাট আছে। আমাকে ওখানে যেতে হবে। মেয়েরা তো এদেশে হাটে-বাজারে যায় না, কাজেই রমুরা যাবে না। অবনীকেই নিয়ে যাব। আর—'

হেমনাথ বললেন, 'কী?'

'তোমাকেও ছাড়ব না, আমাদের সঙ্গে তোমাকেও যেতে হবে।'

হেমনাথ বললেন, 'তুমি নিয়ে যাবে কি, নিজের গরজেই কাল আমাকে সুজনগঞ্জে যেতে হবে।'

লারমোর শুধোলেন, 'তোমার আবার কিসের গরজ?'

'একটা কোষ নৌকো কিনতে হবে। সুবিধেমতো পেলে একজোড়া হালের বলদ কিনব। কিছু মশলাপাতি আনাজ টানাজ কেনা দরকার। তা ছাড়া—'

'তা ছাড়া?'

'সুজনগঞ্জের দোকানীরা এবার দুর্গাপুজো করতে চাইছে। সে ব্যাপারে আমার সঙ্গে কী যেন পরামর্শ করবে। তাই—'

কিছু না বলে লারমোর হাসতে লাগলেন।

ভুরু কুঁচকে হেমনাথ বললেন, 'হাসছ যে!'

'হাসি পেলে কী করব?'

'শুধু শুধু লোকের হাসি পায়?'

'তাই কখনও পায়? পেল তোমার কথায়। মশলাপাতি-নৌকো-বলদ কেনাটা বাজে ব্যাপার। আসলে দুর্গাপুজোর পরামর্শ দিতেই সুজনগঞ্জে যাচ্ছ।'

হেমনাথ হঠাৎ রেগে গেলেন, 'তোমার কি ধারণা, চারদিকে পরামর্শ দিয়ে বেগার খেটে বেড়ানোই আমার কাজ? নিজের বাড়ির কিছুই দেখি না? তাহলে এই সংসার চলছে কী করে?'

স্নেহলতা এবার উত্তরটা দিলেন, 'ভূতে চালাচ্ছে সংসার।'

চেঁচিয়ে উঠতে গিয়ে হেমনাথ হেসে ফেললেন, 'তা যা বলেছ। আমার ভরসায় থাকলে এ সংসার আর চলত না।'

হেমনাথের দেখাদেখি অন্য সবাই হেসে উঠল।

খানিকক্ষণ হাসাহাসির পর লারমোর বললেন, 'অবনীকে নিয়ে তুমি তৈরি থেকো। আমি খুব ভোর ভোর এসে তোমাদের নিয়ে যাব।'

হেমনাথ বললেন, 'তুমি নৌকো নিয়ে আসবে?'

'হ্যাঁ।'

'তা হলে তোমার নৌকোতেই সুজনগঞ্জে যাওয়া যাবে।'

অনেক আগেই বিনুর ঘুম ছুটে গিয়েছিল। খেতে খেতে অবনীমোহন লারমোর হেমনাথ আর স্নেহলতার কথাবার্তা শুনছিল সে। কিছু কিছু বুঝেছিল, কিছু কিছু আবার বুঝছিল না। নৌকোয় করে সুজনগঞ্জ যাবার কথা কানে যেতে আর চুপ করে থাকতে পারল না সে। আচমকা বলে উঠল,

pathagar.net

'আমিও হাটে যাব।'

লারমোর বললেন, 'তুই হাটে যেতে চাইছিস দাদা? নাই বা গেলি—'

'তুমি তো তখন বললে, মেয়েরা হাটে যায় না। আমি মেয়ে? তবে কেন যাব না?'

'রাইট। আমারই ভুল হয়েছিল, তুমি একেবারে খাঁটি মাসকিউলিন জেন্ডার। কিন্তু—'

'কী—'

'ভারি কষ্ট হবে যে তোর। আমার বেরুব সেই ভোরবেলায়, ফিরতে ফিরতে অনেক রাত হয়ে যাবে।'

'হোক রাত, আমার একটুও কষ্ট হবে না।'

'ঠিক তো?'

'ঠিক।'

হাল ছেড়ে দেবার মতো লারমোর বললেন, 'তাহলে তুমিও তৈরি থেকো।'

কাল প্রথম নৌকোয় চড়বে, আনন্দে বিনুর বুকের ভেতরটা ঢেউয়ের মতো দুলতে লাগল।

খাওয়া দাওয়া হয়ে গিয়েছিল। উঠোনের একধারে আঁচাতে আঁচাতে হঠাৎ চঞ্চল হলেন লারমোর, 'এখন কত রাত হবে বল তো হেম?'

চারদিক নিঝুম নিশুতি হয়ে গেছে। আকাশের দিকে তাকিয়ে হেমনাথ বললেন, 'দু'প্রহর পেরিয়ে গেছে, মনে হচ্ছে।'

'ইস, এত রাত হয়েছে! কথায় কথায় গল্পে গল্পে একদম খেয়াল ছিল না। এক্ষুনি আমাকে ফিরতে হবে। কাদেরের সকাল থেকে জ্বর, ফিরে গিয়ে ওকে ওষুধ খাওয়াতে হবে, বার্লি টার্লি জ্বাল দিয়ে দিতে হবে।'

বিনু শুনেছে লারমোরের কেউ নেই। অথচ এই রাত্রিবেলা ফিরে গিয়ে তাঁকে বার্লি টার্লি জ্বাল দিতে হবে, কাদের নামে একটা লোককে ওষুধ খাওয়াতে হবে। নিতান্ত আপনজন না হলে কেউ কারও জন্য এতখানি চঞ্চল বা চিন্তিত হয় না।

বিনু শুধালো, 'কাদের কে?'

লারমোর বললেন, 'কাদের মিঞা। আমার গাড়ি চালায়।'

সেই বুড়ো রুগ্‌ণ মসুলমান কোচোয়ানটি চোখের সামনে ভেসে উঠল। বিনু বলল, 'তোমার কাছেই থাকে কাদের মিঞা?'

'কোথায় আর থাকবে বল দাদা?' লারমোর বলতে লাগলেন, 'তিরিশ বছর ধরে আমার কাছেই আছে। আমার মতো সংসারে ওরও কেউ নেই।'

লারমোর কোথায় থাকেন, বিনুর একবার ইচ্ছে হল জিজ্ঞেস করে জেনে নেয়। কী ভেবে আর করল না।

লারমোর এবার হেমনাথের দিকে ফিরলেন, 'সেই কথাটা কিন্তু ভুলে যেও না হেম।'

হেমনাথ জিজ্ঞাসু চোখে তাকালেন, 'কোনটা বল তো?'

'ওই যে তখন বললাম, ওষুধ টোষুধ সব ফুরিয়ে এসেছে। দু'চারদিনের ভেতর কিছু যদি আনিয়ে না দাও খুব মুশকিল হবে। বাসাইলের চন্দ্র ভুঁইমালী, সিরাজদীঘার ফণী শেখ, হাসাড়ার মানিক মিঞা, রসুনিয়ার গোঁসাইদাস সা, আরও কতজনের নাম বলব? সবারই কঠিন অসুখ। ঠিকমতো ওষুধ না পড়লে লোকগুলো মরে যাবে।'

হেমনাথ বললেন, 'ওষুধের একটা লিস্ট করে দিও। পরশু হিরণকে দিয়ে আনিয়ে দেব। কি রে হিরণ, পরশু একবার ঢাকায় যেতে পারবি না?'

হিরণ কাছেই ছিল। বলল, 'পারব।'

'তাহলে এখন চলি।'

বিনুরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেটা ভেতর-বাড়ির উঠোন। পুবদুয়ারী ঘরটার ওধারে যে মস্ত উঠোনটা তার একধারে অন্ধকারে সেই ফিটনটা দাঁড়িয়ে আছে। লারমোর সেদিকে চলতে লাগলেন।

হেমনাথ যুগলকে ডেকে বললেন, 'একটা হেরিকেন নিয়ে আয়।'

হেরিকেন এলে সবাই ওধারের উঠোনের দিকে গেল। পেছনে রান্নাঘরের বারান্দা থেকে স্নেহলতা চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বললেন, 'কাল থেকে কিন্তু এ বাড়িতে খাচ্ছেন।'

ঘাড় ফিরিয়ে হাসতে হাসতে লারমোর বললেন, 'নিশ্চয়ই।'

'রান্নাবান্না করে ভাত-তরকারি যদি আবার ফেলতে হয় তা হলে কিন্তু কপালে দুঃখ আছে সাহেব।'

'আমি শিরশ্ছেদের জন্য প্রস্তুত সম্রাজ্ঞী।'

এধারের উঠোনে এসে দেখা গেল, ফিটনের তলায় বুড়ো দুর্বল ঘোড়াটা নির্জীবের মতো দাঁড়িয়ে আছে। লারমোর ডাকলেন, 'গোপাল—এই গোপাল—'

ঘোড়াটা কান খাড়া করল।

লারমোর বললেন, 'একটু কষ্ট করে চল দাদা। একেবারে বাড়ি গিয়েই ঘুমোস।'

ঘোড়াটা আস্তে আস্তে চোখ মেলে।

বিনু অবাক চোখে তাকিয়ে ছিল। ঘোড়ার যে আবার নাম থাকতে পারে, তার সঙ্গে কেউ যে কথা বলে, বিনুর কাছে এসব পরম বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা। সে বলল, 'তোমার কথা ঘোড়াটা বুঝতে পারে লালমোহন দাদু?'

অন্যমনস্কর মতো লারমোর বললেন, 'পারে বৈকি। পনের ষোল বছর আমার কাছে রয়েছে, দু'টো কথা বুঝতে পারবে না?' বলেই আবার ঘোড়াটার দিকে ফিরলেন, 'তোর নিশ্চয়ই খিদে পেয়ে গেছে। দাঁড়া, চাট্টি ছোলা দিই।'

ফিটনের ভেতর থেকে ছোলাভর্তি একটা থলে বার করে এনে মুখের সামনে ধরলেন লারমোর। ঘোড়াটা মুখ ফিরিয়ে নিল, অর্থাৎ খাবার ইচ্ছে নেই।

লারমোর বললেন, 'আমার হাতে তুই তো আবার খাস না। চল কাদেরই তোকে খাওয়াবে'খন।' ছোলার থলেটা ফিটনের ভেতর রেখে ঘোড়াটাকে গাড়ির সঙ্গে জুতে চালকের জায়গায় গিয়ে বসলেন তিনি।

হিরণ হঠাৎ বলে উঠল, 'আমিও তোমার সঙ্গে যাব লালমোহন দাদু। আমাদের বাড়ির সামনে একটু নামিয়ে দিয়ে যেও।'

লারমোর ডাকলেন, 'আয়—'

হিরণ গাড়ির মাথায় উঠে লারমোরের পাশে গিয়ে বসল।

হেমনাথ নীচে থেকে বললেন, 'তোর রেকর্ড টেকর্ড, গ্রামোফোন সব পড়ে রইল যে—'

হিরণ বলল, 'থাক। কাল এসে নিয়ে যাব।'

একটু পর ঝুমঝুম ঘুন্টি বাজিয়ে ফিটন চলতে শুরু করল। দেখতে দেখতে বাগানের ঝুপসি অন্ধকারে লারমোররা অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

হিরণরা চলে গেলে বাইরের উঠোন থেকে ভেতর-বাড়ির দিকে ফিরে আসছিল সবাই। হঠাৎ ফিসফিসানির মতো একটা আওয়াজ শুনতে পেল বিনু, 'ছুটোবাবু—ছুটোবাবু—'

চমকে ডান ধারে তাকাতেই বিনু দেখতে পেল, যুগল তার খুব কাছে ঘন হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। চোখাচোখি হতে গলা আরও নামিয়ে বলল, 'কাইল সুজনগুঞ্জের হাটে আপনে আমার নায়ে যাইবেন।'

বিনু কিছুটা অবাক হয়ে বলল, 'তুমি কাল হাটে যাবে নাকি?'

'নিয়াস। বড়কত্তা হাটে গ্যালে তেনার লগে আমারে যাইতেই হয়। বড়কত্তায় তো লালমোহন সাহেবের নায়ে যাইব। আমি আরেকখান ছোট কোষা নায়ে যামু, আমার লগে আপনে যাইবেন।' একটু থেমে কী ভেবে নিয়ে আবার বলল, 'বড়কত্তার লগে গ্যালে আপনেরে 'ছই'য়ের বাইরে বইতে দিব না। চুপচাপ ভিতরে বইসা থাকতে হইব। আমার লগে গ্যালে মেলা (অনেক) মজা পাইবেন।'

'ছই' কী, বিনু জানে না। তবু উৎসাহিত হয়ে বলল, 'আমি তোমার সঙ্গেই যাব যুগল।'

কথায় কথায় একসময় তারা ভেতর-বাড়িতে ফিরে এল।

এ বাড়িতে ছোটবড় মিলিয়ে মোট আটখানা ঘর। পশ্চিমের ভিটের একখানা ঘরে সেই আশ্রিতা বিধবা দু'জন থাকে। যুগল আর করিম থাকে বাইরের দিকের দু'টো ঘরে। শিবানী থাকেন দক্ষিণের কোণের একটা ঘরে। স্নেহলতা হেমনাথের জন্য পুবদুয়ারী বড় ঘরখানা নির্দিষ্ট। বাকি ঘরগুলো এতকাল

ফাঁকাই পড়ে থাকত। অবনীমোহনরা আসার পর একটা ঘর তাঁকে আর সুরমাকে দেওয়া হয়েছে, আরেকটা দেওয়া হয়েছে সুধা সুনীতিকে। বিনু অবশ্য আলাদা ঘর পায় নি, হেমনাথ স্নেহলতার ঘরখানাই দখল করে বসেছে, তাঁদের মাঝ-মধ্যিখানে শুয়ে ঘুমোয় সে।

কাল শুতে শুতে অনেক দেরি হয়ে গিয়েছিল। সকাল হলেই নৌকোয় করে সুজনগঞ্জের হাটে যাবে, সেই উত্তেজনায় বাকি রাতটুকু ভাল করে ঘুমোতে পারেনি বিনু। শিয়রের দিকে একটা জানালা, বার বার তার বাইরে তাকিয়ে দেখেছে—কখন সকাল হয়, কখন সকাল হয়।

সারারাত চোখ টান টান করে থেকে ভোরের দিকে ঘুমিয়ে পড়েছিল, হেমনাথের ডাকে ধড়মড় করে উঠে বসল।

রগড়ে রগড়ে চোখ থেকে ঘুমের শেষ রেশটুকু মুছে বিনু যখন তাকাল, পুব আকাশে আলো আলো আভা ফুটেছে।

হেমনাথ বললেন, 'চল দাদা, মুখটুখ ধুয়ে সূর্যস্তবটা সেরে নিই।'

বিনুর মনে পড়ল, কাল হেমনাথ বলেছিলেন তাকে সূর্যস্তব শিখিয়ে দেবেন। তক্তপোশ থেকে নামতে গিয়ে দেখতে পেল স্নেহলতা বিছানায় নেই। কখন তাঁর ঘুম ভেঙেছে, কখন উঠে বেরিয়ে গেছেন, কে জানে।

বাইরে এসে বিনুরা মুখটুখ ধুয়ে নিল। তারপর উঠোনের একধারে দোলমঞ্চের কাছে গিয়ে পূবদিকে মুখ করে চোখ বুজে হাত জোড় করে দাঁড়াল। তারও পর হেমনাথের সঙ্গে গলা মিলিয়ে আবৃত্তি করতে লাগল, 'ওঁ জবাকুসুমং সঙ্কাশং—'

সূর্যমন্ত্র শেষ করে ফিরতেই দেখা গেল অবনীমোহন আর সুরমা উঠে পড়েছেন। উঠোনের একধারে দাঁড়িয়ে দাঁতন করছিলেন অবনীমোহন। চোখাচোখি হতে হেসে বললেন, 'দাদুর কাছে এসে বিনুবাবু দেখছি গুড বয় হয়ে যাচ্ছে। কলকাতায় তো আটটার আগে বিছানা ছাড়ত না। এখানে ভোর না হতেই ঘুম ভাঙছে। শুধু তাই নয়, সূর্যস্তবও আওড়ানো হচ্ছে।'

বিনু লজ্জা পেয়ে গেল। হেমনাথ কিছু না বলে হাসলেন।

দেখতে দেখতে যুগল করিম শিবানী সুধা সুনীতি—একে একে সবাই উঠে পড়ল।

এ বাড়িতে এতকাল চায়ের প্রবেশ ছিল নিষিদ্ধ, অবনীমোহনরা আসার পর এই পর্বটা নতুন শুরু হয়েছে।

চিঁড়েভাজা নারকেল কোরা আর ক্ষীরের নাড়ুর সঙ্গে চা খাওয়া যখন শেষ হয়েছে সেই সময় হইহই করতে করতে লারমোর এসে হাজির, 'হেম আরনী বিনুদাদা—সবাই রেডি তো?'

হেমনাথ বললেন, 'ঘোড়ায় একেবারে জিন দিয়ে এসেছ, দেখছি।'

'ওই রকমই। সুজনগঞ্জ কি এখানে? সাত মাইল উজানে গেলে, তবে। যেতে কতক্ষণ লাগবে, খেয়াল আছে? নাও নাও, তাড়াতাড়ি উঠে পড়।'

স্নেহলতা এই সময় বলে উঠলেন, 'একটু চা খেয়ে যান।'

লারমোর আঁতকে ওঠার মতো করে বললেন, 'কি সর্বনাশ, আমি পি.সি.রায়ের ইনডাইরেক্ট শিষ্য। আমাকে চা খাবার কথা বলছেন!'

অবনীমোহন বললেন, 'ইনডাইরেক্ট শিষ্য কিরকম?'

লারমোর জানালেন, 'চায়ের ব্যাপারে হেমনাথ পি. সি. রায়ের সাক্ষাৎ শিষ্য। আমি আবার হেমনাথের শিষ্য। ইনডাইরেক্ট হলাম না?'

লারমোরকে চা খাওয়ানো গেল না, বসানোও না। চিঁড়েভাজা ক্ষীরের নাড়ু খাবার কথা বলতে খানিক চঞ্চল হলেন তিনি। তারপর হাত বাড়িয়ে বললেন, 'দিন, এখন খাব না। সঙ্গে নিচ্ছি। রাস্তায় যেতে যেতে খাব।'

স্নেহলতা বেতের ডালা বোঝাই করে চিঁড়েভাজা আর নাড়ু দিলেন। লারমোর সেগুলো ঢেলে ফতুয়ার পকেট ভর্তি করে নিতে নিতে তাড়া লাগালেন, 'চল হেম, চল—'

হেমনাথ অবনী বিনু—যারা হাটে যাবে, উঠোনে নেমে এল।

এই সময় স্নেহলতা স্বামীর উদ্দেশে বললেন, 'হাটে তো চললে, কী কী আনতে হবে মনে আছে?'

হেমনাথ বললেন, 'নিশ্চয়ই আছে। একটা কোষা নৌকো, একজোড়া হালের বলদ, আনাজ, মাছ, মশলাপাতি—এই তো?'

স্নেহলতা বললেন, 'উঁহু, আরও আছে। এই মাসে নিত্য দাসের মেয়ের সাধ, তার জন্যে একখানা শাড়ি আনবে। ঠাকুরঝির কাপড় নেই, দু'জোড়া থান কিনতে হবে। দুর্গাপুজো সামনে, নারকেল আট দশ গন্ডা এনো—'

তালিকা শেষ হবার আগেই হেমনাথ চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ডাকতে লাগলেন, 'যুগল—যুগল—'

যুগল কাছেপিঠে কোথাও ছিল, ছুটতে ছুটতে এসে হাজির। হেমনাথ বললেন, 'তোর ঠাকুমা কী কী বলে শুনে নে। হাটে গিয়ে মনে করে কিনবি। একটা যদি ভুল হয়ে যায়, আস্ত রাখব না।'

স্নেহলতা ঠোঁট বাঁকিয়ে বললেন, 'দেখ, দেখ তোমরা। সংসারটা কার আর কাকে মনে করে জিনিস কিনতে হবে!' বলে স্বামীর দিকে ফিরে মধুর ভ্রূভঙ্গি করলেন।

হেমনাথ রেগে উঠলেন, 'কেন, যুগল এ সংসারের কেউ নয়? ক'টা জিনিসের কথা মনে করে রাখলে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে?' বলে আগুন হয়ে যুগলের দিকে ফিরলেন, 'কি রে হারামজাদা, বল তুই কোন সংসারের লোক?'

যুগল উত্তর দিল না। মুখ নিচু করে ডান পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে উঠোনের মাটি তুলতে লাগল। ভাবভঙ্গি দেখে মনে হল, হেমনাথের এ জাতীয় রাগটাগ তার কাছে নতুন নয়, বরং এতেই চিরদিন অভ্যস্ত সে।

বিনুর কেন যেন সন্দেহ হল, মুখ নামিয়ে যুগল হাসছে। মাথা হেলিয়ে একবার যুগলের মুখটা দেখতে চেষ্টা করল সে। হেমনাথের রাগ যুগলের কাছে হয়তো ভয় বা দুশ্চিন্তার ব্যাপার নয়, রীতিমতো মজাদার ঘটনা।

হেমনাথ আরও উত্তেজিত হতে যাচ্ছিলেন, লারমোর মাঝখান থেকে তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, 'এই সকালবেলা আর তোমাকে চেঁচামেচি করতে হবে না হেম। আমিই সব মনে করে রাখছি। বলুন গো বউ ঠাকরুন, হাট থেকে কী আনতে হবে—' বলতে বলতে স্নেহলতার দিকে তাকালেন।

স্নেহলতা মুখ বাঁকিয়েই ছিলেন। বললেন, 'থাক, যথেষ্ট হয়েছে। খোঁড়ার সাহায্যে ল্যাংড়া এগিয়ে এলেন। ভুলে টুলে গিয়েও ও তবু কিছু আনত। আপনাকে বললে কিছুই আর এসে পৌঁছবে না।'

'তা যা বলেছেন—' লারমোর হাসতে লাগলেন।

স্নেহলতা বললেন, 'যা বলবার যুগলকেই আমি বলে দিচ্ছি।'

হাটের ফর্দ শুনে নিয়ে যুগল নীচু গলায় বিনুকে বলল, দেখলেন তো ছুটোবাবু, বড়কত্তায় হাটে গ্যালে আমারে লগে যাইতেই হয়।'

একটু পর হেমনাথদের পিছু পিছু বিনু পুকুরঘাটে চলে এল। ঘাটের পাড়ে দু'টো নৌকো লগির সঙ্গে বাঁধা রয়েছে। একটা নৌকো বেশ বড় সড়, লম্বা ধাঁচের। মাঝখানে ক্যাঁচা বাঁশের গোল ছাউনি। যুগল যে 'ছই'-এর কথা কাল বলেছিল, খুব সম্ভব ওটা তাই। গলুইর কাছে পাটাতনের ওপর দু'টো মাঝি বসে আছে। এই নৌকোটা বোধহয় লারমোর নিয়ে এসেছেন। অন্য নৌকোটা বিনুর চেনা, তাতে গলুই বা ছাউনি কিছুই নেই, তেমন লম্বাও নয়, অনেকটা গোল ধরনের। প্রায় সারা দিনই এ নৌকোটা এই ঘাটে বাঁধা থাকে।

ছাউনিহীন নৌকোটায় এক লাফে উঠে পড়ল যুগল, তারপর চোখের ইশারায় বিনুকে উঠতে বলল।

এদিকে লারমোর হেমনাথ আর অবনীমোহন দ্বিতীয় নৌকোটায় উঠে পড়েছেন। হেমনাথ বিনুকে ডাকলেন, 'আয় দাদা—'

বিনু বলল, 'আমি যুগলের নৌকোয় যাব।'

pathagar.net

'না না, ও বাঁদরের সঙ্গে যেতে হবে না। চারদিকে অথৈ জল, শেষে বিপদ আপদ ঘটে যাবে। ওটার আবার হুঁশটুশ কম।'

বিনু কিন্তু শুনল না। কেঁদে টেদে, জেদ ধরে যুগলের নৌকোতেই উঠল। অগত্যা হেমনাথ যুগলকে সতর্ক করে দিলেন, 'সাবধানমতো দাদভাইকে নিয়ে যাবি।'

'আইচ্ছা—' যুগল ঘাড় কাত করে বলল, 'আপনে ভাইবেন না।'

একসময় বাঁধন খুলে নৌকো চলতে শুরু করল। হেমনাথদের নৌকোটা আগে আগে চলেছে, বিনুদেরটা পেছনে।

দু'জন মাঝি হেমনাথদের নৌকো বাইছে। চোখের পলকে পুকুর পেরিয়ে সেটা ধানখেতের ভেতর ঢুকে গেল। বিনুদের নৌকোটা এখনও মাঝপুকুরেই রয়েছে। হঠাৎ ঝুমঝুম ঘুন্টির আওয়াজে যুগল এবং বিনু পেছন ফিরে তাকাল। দেখা গেল, বাগানের গাছগাছালির ফাঁক দিয়ে ঝিনুকদের সেই চমৎকার ঝকঝকে ফিটনটা বাড়ির দিকে ছুটে যাচ্ছে। গাড়ির জানালায় ভবতোষ আর ঝিনুকের মুখও দেখতে পাওয়া গেল।

যুগল বলল, 'বড়কত্তায় তো বাইর হইল, উইদিকে ঝিনুক দিদিরা আইছে—'

সেই কোঁকড়া কোঁকড়া চুল, রুপোর কাজললতার মতো চোখ, গোলগাল জাপানি পুতুলের মতো মেয়েটা আবার এসেছে। বিনু কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে গেল।

খুব বেশিক্ষণ ঝিনুকের কথা বিনুর মনে থাকল না।

জীবনে এই তার প্রথম নৌকোয় ওঠা। ব্যাপারটা খুবই লোভনীয়, এর জন্য কাল সমস্ত রাত উত্তেজনায় ঘুমোতে পারে নি। কিন্তু নৌকোয় উঠবার পর দেখা গেল, জলের ওপর সেটা ভীষণ দুলছে। ফলে মজার বদলে ভয় করতে লাগল বিনুর। মনে হল এই বুঝি পড়ে যায়, এই বুঝি পড়ে যায়। প্রাণপণে দু'হাতে পাটাতনের কাঠ চেপে ধরল সে।

লগি বাইতে বাইতে যুগল লক্ষ করেছিল। বলল, 'ডর নি লাগে ছুটোবাবু?'

অন্য সময় হাজার ভয় পেলেও মুখ ফুটে বলত না বিনু। আর যার কাছেই হোক, যুগলের কাছে ভয়ের কথা বলতে মাথা কাটা যেত। কিন্তু জীবনে এই প্রথম টলমলে নৌকোয় উঠে বীরত্বের একটি কণাও নিজের ভেতর খুঁজে পেল না সে। কাঁপা গলায় বলল, 'হ্যাঁ। নৌকোটা বড্ড দুলছে।'

'ডর নাই। পেরথম পেরথম উইরকম মনে হইব। দুই চাইর দিন নায়ে চড়েন, ঠিক হইয়া যাইব।'

যুগল আশ্বাস দিল বটে, কিন্তু খুব একটা ভরসা বিনু পেয়েছে বলে মনে হয় না। বরং পাটাতন আরও জোরে আঁকড়ে ধরল।

কিন্তু ভয়ের ভাবটাও বিনুকে বেশিক্ষণ আচ্ছন্ন করে রাখতে পারল না। কেননা, যেদিকে যতদূর চোখ যায়, শরৎকাল তার সবটুকু মহিমা নিয়ে দাঁড়িয়ে। মাথার ওপর সাদা সাদা ভবঘুরে মেঘ, তাদের ফাঁকে ফাঁকে নীল নয়নের চকিত চাহনির মতো আশ্বিনের আকাশ। মেঘ ছাড়া ওখানে পাখিও আছে—চেনা-অচেনা কত যে পাখি! আকাশের নীল ছুঁয়ে ছুঁয়ে পাখি আর মেঘেরা বাতাসে গা ভাসিয়ে রেখেছে।

নীচে শুধু জল আর ধানের খেত। মাঝে মাঝে নলখাগড়া, জলঘাসের বন, ঝাড়ওলা ধঞ্চে আর কালো মুত্রার ঝোপ। আর আছে বউন্যা গাছ, কাউফলের গাছ, লাল ফুলে-ভরা মান্দার গাছ। আকাশ যেখানে ধনুরেখায় দিগন্তে নেমেছে, সারি সারি তালগাছ সেখানে এক পায়ে দাঁড়িয়ে। জলঘাসের মাথায়, মুত্রাঝোপে এই সকালবেলায় রাশি রাশি ফড়িং উড়ছে— নানা রঙের চিত্রবিচিত্র ফড়িং। তাদের ধরবার জন্য এসেছে ছোট ছোট বগাই পাখি।

ইতিমধ্যে রোদ উঠে গিয়েছিল। তরল সোনার মতো আলোয় চারদিক ভরে গেছে। এই আশ্বিনে জল যেন ঝকমকে আরশি। তাতে বউন্যাগাছের ছায়া, কাউফল গাছের ছায়া, নলখাগড়ার ছায়া কাঁপছে।

কলকাতা থেকে এতদূরে এই জল-বাংলায় শরৎকালটা বুঝিবা এক আশ্চর্য যাদুকর। ঝাঁপির ভেতর থেকে একের পর এক বিস্ময় বার করে খুব দ্রুত বিনুকে জয় করে নিতে লাগল সে।

কখন মস্ত পুকুরটা পেরিয়ে এসেছিল, বিনুর মনে নেই। নৌকোর তলায় এবং দু'ধারে সর সর আওয়াজে একসময় চমকে উঠল সে। দেখল তারা ধানখেতের ভেতর এসে পড়েছে।

সমানে লগি ঠেলছিল যুগল। নিবিড় ধানবন দু'ধারে সরে সরে নৌকোটাকে পথ করে দিচ্ছে। ধানগাছ কি আর দেখে নি বিনু? অনেক বার দেখেছে। বাসে করে বাবার সঙ্গে কলকাতা থেকে ডায়মন্ডহারবার যাবার সময় রাস্তার দু'পাশে অবারিত ধানের খেত চোখে পড়েছে। কিন্তু সে তো দূরে থেকে দেখা। এত কাছে বসে দেখার কথা আগে কখনও কল্পনাই করে নি সে।

বিনুর ইচ্ছে হল, ঘন সবুজ ধানপাতাগুলোকে একবারে ছুঁয়ে দেখে। হাতও বাড়িয়েছিল সে, কিন্তু ধরবার আগেই যুগল চেঁচিয়ে উঠল, 'ধইরেন না ছুটোবাবু, ধইরেন না—'

চকিত বিনু তক্ষুনি হাতটা সরিয়ে আনল। বলল, 'কেন?'

'ধরলেই হাত কাইটা যাইব, ধানের পাতায় জবর ধার।'

বিনু আর কিছু না বলে হাত গুটিয়ে বসে থাকল।

বাড়ি থেকে মনে হয়েছিল, ধানের খেত একটানা দিগন্ত পর্যন্ত বুঝি ছুটে গেছে। কিন্তু তা নয়, খানিক দূর যাবার পর দেখা গেল ধানবন শেষ। তারপর শুধু জল আর জল। কাচের মতো স্বচ্ছ টলটলে জল পারাপারহীন সমুদ্র হয়ে দিগ্বিদিকে ছড়িয়ে আছে। আশ্বিনের এলোমেলো অস্থির বাতাস তার ওপর অবিরাম ছোট ছোট ঢেউ তুলে যাচ্ছে। ঢেউ ছাড়া এখানে যা আছে তা রাশি রাশি শাপলা ফুল, আর আছে বড় বড় পদ্মপাতা, ফাঁকে ফাঁকে থোকা থোকা কচুরিপানা। কচুরিপানার মাথায় মুকুটের মতো সজীব নীলাভ ফুল। ফুলে ফুলে এই দূরবিস্তৃত জলরাশি ছেয়ে আছে।

যুগল লগি ছেড়ে এখন বৈঠা বাইছে। নৌকোর তলায় ছপ ছপ করে একটানা আওয়াজ শোনা যাচ্ছে।

বিনুর বড় লোভ হল দু'টো শাপলা তুলে নেয়। হাত বাড়াতে গিয়ে এবারও বাধা পড়ল। যুগল চেঁচিয়ে উঠল, 'ঝুইকেন না ছুটোবাবু, ঝুইকেন না। শাপলার লতা টানতে গেলে পইড়া যাইবেন, এহানে কিলাম (কিন্তু) আথাই (অথৈ) জল। আপনে তো আবার সাতর জানেন না।' একটু থেমে ফের বলল, 'আমিই তুইলা দিতে আছি।'

নৌকো বাইতে বাইতে টপাটপ অনেকগুলো শাপলা তুলে বিনুর দিকে ছুড়ে দিল যুগল। কিন্তু নিজে তুলতে না পারলে সুখ কোথায়? বিরস মুখে চুপচাপ বসে থাকল বিনু।

যুগল বলল, 'পদ্মফুল নিবেন ছুটোবাবু?'

ভারী গলায় বিনু বলল, 'না।'

'শালুক?'

'না।'

'কচুরি ফুল?'

'না।'

ক্ষুণ্ণ কণ্ঠস্বর আর ক্রমাগত 'না' 'না' শুনে বিনুর মনোভাব খানিক যেন আন্দাজ করতে পারল যুগল। চিন্তিত মুখে বলল, 'গুসা নি করছেন ছুটোবাবু?'

বিনু চুপ।

এবার একেবারে উদার হয়ে গেল যুগল। বরদানের ভঙ্গিতে বলল, 'আইচ্ছা তোলেন দুই চাইরটা। তয় (তবে) বেশি ঝুইকেন না।'

বলামাত্র পদ্ম শাপলা এবং কচুরি ফুলে নৌকো বোঝাই করে ফেলল বিনু।

যুগল বলল, 'এইবার খুশি তো?'

বিনুর মুখে হাসি ফুটল। কিছু বলল না সে।

জলজ ফুলের বনে আরও কিছুক্ষণ চলার পর হঠাৎ এক জায়গায় এসে নৌকো থামিয়ে দিল

pathagar.net

অবাক হয়ে বিনু শুধলো, 'কী হল?'

সামনের দিকে আঙুল বাড়িয়ে চাপা গলায় যুগল বলল, 'উই দ্যাখেন ছুটোবাবু—' তার স্নায়ুগুলো ধনুকের ছিলার মতো টান টান হয়ে গেছে। দৃষ্টি পলকহীন, প্রখর। সর্বাঙ্গ ঘিরে বিচিত্র এক সংকেত ফুটে বেরিয়েছে যেন।

যুগলের আঙুল যেদিকে, সেদিকে তাকিয়ে বিনু দেখতে পেল, বড় একটা পদ্মপাতার কাছে তামাটে রঙের অসংখ্য মাছের ছানা কিলবিল করছে। বিনু শুধলো, 'কী ওগুলো?'

'চিনতে পারলেন না?'

'না।'

যুগল বলল, 'হেই তো, আপনে চিনবেন ক্যামনে? আপনে কইলকাতার মানুষ। উইগুলা শৈলের (শোলমাছের) পোনা।'

বিনু বলল, 'শোলের পোনা তো বুঝলাম। নৌকো থামালে কেন?'

'দ্যাখেন না, কী বাহারের মজা হয়—' রহস্যময় হেসে পাটাতনের তলা থেকে দশ বার হাত লম্বা একটা সরু বাঁশের টুকরো বার করল যুগল, সেটার মাথায় অনেকগুলো ধারাল লোহার ফলা আটকানো।

বিনু জিজ্ঞেস করল, 'এটা কী?'

'ট্যাটা।'

'কী হবে এটা দিয়ে?'

'ইট্টু সবুর করেন ছুটোবাবু, নিজের চৌখেই দেখতে পাইবেন।' বলতে বলতে পাটাতনের ওপর উঠে দাঁড়াল যুগল, হাতে সেই তীক্ষ্ণমুখ অস্ত্রটা।

নৌকোটা থেমে গিয়েছিল ঠিকই, তবে স্থির হয়ে নেই। হাওয়ার টানে জলের ওপর সেটা দুলছিল। ট্যাটাটা বাগিয়ে ধরে নিষ্পলক, স্থির দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তামারঙের শোলের ছানাগুলোর দিকে তাকিয়ে কী দেখল যুগল, তারপর শরীরের সবটুকু শক্তি দিয়ে অস্ত্রটা ছুড়ে দিল।

জলের তলায় কী ঘটল, বিনু বুঝতে পারল না। তবে চারদিক তোলপাড় করে প্রকান্ড দানবের মতো কী যেন একটা সমানে আছাড় খেতে লাগল। তার ফল হল এই, অনেকখানি জায়গা জুড়ে পদ্ম আর শাপলার বন ভেঙেচুরে ছিঁড়েখুঁড়ে একেবারে তছনছ। আর যুগলের সেই ট্যাটার বাঁশটা একবার জলের তলায় ডুবতে লাগল, আবার ওপরে ভেসে উঠতে লাগল। ডোবা আর ভাসা চলল অনেকক্ষণ ধরে।

এদিকে খুশিতে দু'হাত ওপরে তুলে চিৎকার জুড়ে দিয়েছে যুগল, 'পড়ছে, পড়ছে। শালার শৈল (শোল) যাইবা কই?'

কিছুক্ষণ পর পদ্মবন শান্ত হয়ে এল। ট্যাটার বাঁশটা এখন জলের ওপর অল্প অল্প কাঁপছে। শোলের সেই পোনাগুলো ছত্রভঙ্গ হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে।

বৈঠা বেয়ে নৌকোটাকে ট্যাটার কাছে নিয়ে এল যুগল। জল থেকে অস্ত্রটা যখন ওপরে টেনে তুলল, দেখা গেল, সেটার ধারাল ফলায় আড়াই হাতের মতো লম্বা একটা শোল মাছ বিঁধে আছে।

ক্ষিপ্র হাতে ট্যাটার মুখ থেকে মাছটা খুলে নিয়ে পাটাতনের তলায় ঢুকিয়ে দিল যুগল। তারপর ফলাগুলো ধুয়ে ট্যাটাটা মাছের পাশে রাখতে রাখতে বলল, 'বুঝলেন নি ছুটোবাবু—'

'কী বলছ?' তক্ষুনি সাড়া দিল বিনু।

'বষ্যাকালে শৈলমাছে পোনা ছাড়ে। যতদিন না পোনাগুলা ডাঙ্গর (বড়) হয়, নিজে নিজে ঘুইরা ফিরা খাইতে শিখে ততদিন মা-মাছটা তাগো লগে লগে থাইকা পরি (পাহারা) দ্যায়।'

'তাই নাকি?'

'হ।' যুগল মাথা নাড়ল, 'ইট্টু আগে যে পোনাগুলা দেখছেন, এই মাছটা তাগো মা।'

বিনু হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে গেল, বিষণ্ণও। বলল, 'মাছটাকে তো মেরে ফেললে, ওর বাচ্চাগুলোর এখন কী হবে?'

'কী আবার হইব? অন্য মাছে ওগো খাইয়া ফেলাইব।'

'ইস।' বিনুর চোখেমুখে কষ্টের রেখা ফুটল।

'ছুটোবাবুর শরীলে বড় দয়ামায়া—' যুগল হেসে ফেলল, 'বাচ্চার কথা ভাইবা যদিন মাছ না মারি, আমরাই বা খামু কী? এই লইয়া মন খারাপ কইরা থাইকেন না ছুটোবাবু। পিথীমিতে একজনেরে না মারলে আরেকজন বাচে না।'

তবু বিনুর মন ভারাক্রান্ত হয়ে রইল।

ইতিমধ্যে যুগল আবার নৌকো বাইতে শুরু করেছে। অনেকখানি যাবার পর সে ডাকল, 'ছুটোবাবু—'

বিনু তাকাল।

যুগল বলল, 'এই মাছটা লাইয়া অহন কী করি ক'ন দেখি। অহন তো হপায় (সবে) সকাল, হাট সাইরা ফিরতে ফিরতে রাইত দুফার হইয়া যাইব। ততক্ষণে মাছ যাইব পইচা।' তাকে বেশ চিন্তিত দেখাল।

সত্যিই তো, মাছটা নিয়ে এখন কী করা উচিত বিনুও ভেবে পেল না।

হঠাৎ সমস্যাটার যেন কিনারা করে ফেলেছে এমনভাবে যুগল বলে উঠল, 'হইছে ছুটোবাবু, হইছে—'

'কী হয়েছে?' বিনু জিজ্ঞেস করল।

'পথে আমার এক কুটুমবাড়ি পড়ব। আমার পিসাতো (পিসতুতো) বইনের হউর (শ্বশুর) বাড়ি। ভাবতে আছি, মাছটা হেইখানে দিয়া যামু। শুদাশুদি পচাইয়া লাভ কী?'

'কিন্তু—'

'কী?'

'হাটে যেতে অনেক দেরি হয়ে যাবে না?' বলতে বলতে হঠাৎ কী মনে পড়তে সামনের দিকে তাকাল বিনু।

খানিক আগেও হেমনাথদের নৌকোটা তাদের সামনে শ'খানেক গজের ভেতর ছিল। এখন অনেক দূর চলে গেছে। এখান থেকে ধুধু বিন্দুর মতো দেখাচ্ছে সেটা। বিনু চঞ্চল হল, 'দাদুদের নৌকো কোথায় চলে গেছে দেখ—'

চোখের কাছে হাত এনে যুগল একবার দেখে নিল। তারপর হেসে বলল, 'যাউক না। হাটের পথ কি আমি চিনি না? কুটুমবাড়ি থিকা (থেকে) বাইর হইয়া একখান বাদাম খাটাইয়া দিমু, বড় কত্তাগো আগে হাটে পৌছাইয়া যামু।'

বিনু চুপ করে রইল। তার মুখচোখ দেখে মনে হল না, যুগলের কথায় খুব একটা ভরসা পেয়েছে।

আশ্বিনের সূর্য পুব আকাশের খাড়া পাড় বেয়ে বেয়ে অনেকখানি ওপরে উঠে এসেছে। রোদে আর কোমল সোনালি আভা নেই। স্নিগ্ধতা মুছে গিয়ে তাতে ঝকঝকে রং লেগেছে। যতদূর তাকানো যায়, ছোট ছোট ঢেউ-এর মাথায় তপ্ত রোদ নেচে বেড়াচ্ছে। সেদিকে বেশিক্ষণ কেউ চোখ পেতে রাখবে, সাধ্য কী।

বৈঠা টানতে টানতে যুগল বলল, 'ছুটোবাবু আমার মনে একখান সাধ হইছে।'

'কী?' বিনু জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল।

'আপনেরে একখান গীত শুনামু।'

'গান শোনাতে চাইছ?'

'হ।'

সেদিন গানের কথা বলেছিল বটে যুগল। সারি-জারি-রয়ানি-ভাটিয়ালি, হেন গান নাকি নেই যা সে জানে না। বিনু বলল, 'বেশ তো, গাও না—'

বৈঠাটা নৌকোর ওপর তুলে বাঁ হাতে বাঁ কানখানা চেপে ডান হাত আকাশের দিকে বাড়িয়ে গান ধরল যুগল ঃ

'ও ভাইটাল গাঙ্গের নাইয়া,
ময়ূরপঙ্খী নাও রে বাইয়া
কুন বা দ্যাশে যাও।
এই ঘাটে লাগাইয়া ডিঙ্গা,
আমার একখান কথা লও।
এই তো নদীর উজান বাকে
সোনার বালুচর।
হেইখানেতে আছে আমার
পরান বন্দুর ঘর।
কইও খবর বন্দুর কাছে,
জলছাড়া মীন কয়দিন বাচে,
বাচে রে এ-এ-এ—
এই কথাটি না যদি কও,
আমার মাথা খাও।
ও ভাইটাল গাঙ্গের নাইয়া,
নাইয়া রে-এ-এ-এ—'

বেশ সুরেলা, ভরাট গলা যুগলের। চারদিকের পদ্ম আর শাপলা বন, কচুরি ফুলের বেগুনি শোভা, ঝকঝকে নীলাকাশ, তার গায়ে থোকা থোকা মেঘ, দিগ্‌দিগন্তে ছুটে-যাওয়া আশ্বিনের অথৈ জলরাশি, উড়ন্ত পাখির ছায়া—পূর্ব বাংলার এই সজল ভুবনটির সঙ্গে যুগলের গানের আশ্চর্য মিল রয়েছে। শুনতে শুনতে মুগ্ধ হয়ে গেল বিনু।

গান শেষ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তার রেশ এখনও জলের ঢেউয়ে ঢেউয়ে দুলছে। যুগল সাগ্রহে শুধলো, 'গান ক্যামন শুনলেন ছুটোবাবু?'

বিনু বিভোর হয়েই ছিল। বলল, 'খুব ভাল।'

'দ্যাখলেন তো, আপনেগো যুগইলা হেই দিন মিছা কয় নাই। অ্যামন গান আমার মেলা জানা আছে। আপনেরে শিখাইয়া দিমু ছুটোবাবু। যা যা জানি, বেবাক শিখাইয়া দিমু।' বলে আবার বৈঠা জলে নামাল যুগল।

সীমাহীন এই শাপলা-পদ্মের বনে বসে যেদিকেই তাকানো যায়, শুধু জল আর জল। দূরে ধানের খেত, আরও দূরে নীলাভ বনরেখা। এর ভেতর কোথাও লোকালয় থাকতে পারে, তা যেন ভাবাই যায় না। কিন্তু আছে, মাঝে মাঝে দু'চারখানা কৃষাণ গ্রাম দ্বীপের মতো মাথা তুলে রয়েছে।

কোনাকুনি দক্ষিণে পাড়ি দিয়ে একটা গ্রামে এসে পড়ল যুগলরা। গ্রাম আর কি, বিশ পঁচিশখানা টিনের বাড়ি এলোমেলো ছড়িয়ে আছে।

যুগল যে বাড়িতে এনে নৌকো থামাল সেটা অদ্ভুত ধরনের। এমন বাড়ি আগে আর কখনও দেখে নি বিনু। উঁচু ভিতের ওপর মোট খানচারেক ঘর। উঠোন বলতে কিছু নেই—ঘর ছাড়া বাদ বাকি সব দু'তিন হাত জলের তলায় ডুবে আছে। এক ঘর থেকে আরেক ঘরে যাবার জন্য উঠোনের ওপর দিয়ে সাঁকো পাতা।

এই সকালবেলা দু'তিনটে কালো কালো আধ-ন্যাংটো ছেলেমেয়ে সাঁকোর ওপর বসে বড়শি বাইছিল। উঠোনের জলে পুঁটি আর বাঁশপাতা মাছের ঝাঁক ঘুরে বেড়াচ্ছে। বড়শিতে ভাত গেঁথে ফেলার শুধু অপেক্ষা। সঙ্গে সঙ্গে মাছ এক হ্যাঁচকা টানে জলতল থেকে উঠে আসছে।

যুগল নৌকো ভেড়ানোমাত্র ছেলেমেয়েগুলো চেঁচামেচি জুড়ে দিল, 'যুগলামামায় আইছে, যুগলামামায় আইছে—'

নৌকোটাকে সাঁকোর বাঁশে বাঁধতে বাঁধতে যুগল বলল, 'তগো বাপে কই?'

সবাই সমস্বরে উত্তর দিল, 'বাড়িত্ নাই।'

'মা?'

ছেলেমেয়েগুলো চিৎকার করে ডাকতে লাগল, 'মা মা, দেইখা যাও ক্যাঠা আইছে—'

একটু পর সামনের একখানা ঘর থেকে মাঝবয়সী একটি মেয়েমানুষ বেরিয়ে এল। তেলহীন রুক্ষ চুল তার। এই আশ্বিনেও গা-ভর্তি ঘামাচি, ফলে চামড়া খসখসে, খই-ওড়া। গাল ভাঙা, চোখের কোল বসে গেছে, রংটি এক সময় মাজা মাজাই হয়তো ছিল। পরনে ময়লা ডুরে শাড়ি ছাড়া কিছুই নেই। এসব সত্ত্বেও তাকে ঘিরে নিবু-নিবু একটু লাবণ্য এখনও টিকে আছে।

মেয়েমানুষটার দু'ধারে লম্বা লাউয়ের মতো স্তন চুষতে চুষতে দু'টো তিন চার বছরের ন্যাংটো বাচ্চা ঝুলছিল। দেখে মনে হল, সবসময় ওরা ওই ভাবেই ঝোলে। সাঁকোর ওপর উঠে এসে মেয়েমানুষটি বলল, 'আ রে যুগইলা পোড়াকপাইলা, রোজই নি আমাগো বাড়িত্ আসস!' বলে একমুখ হাসল।

বিব্রত যুগল তাড়াতাড়ি পাটাতনের তলা থেকে শোলমাছ বার করে বলল, 'আইতে আইতে এই মাছটা মারলাম, ভাবলাম তগো দিয়া যাই।'

হাত বাড়িয়ে মাছ নিতে নিতে মেয়েমানুষটি বলল, 'রোজই দেখি মাছ মাইরা দিয়া যাইতে আছস।'

যুগল হাত কচলাতে কচলাতে বলতে লাগল, 'ভাইগনা-ভাগনীগো মাছ খাওয়াইতে বুঝিন সাধ যায় না আমার?'

চোখের তারা নাচিয়ে, ঠোঁট উলটে দিয়ে বিচিত্র ভঙ্গি করল মেয়েমানুষটি, 'আহা লো সুনা (সোনা) লো, ভাইগনা-ভাগনীগো লেইগা বুকের ভিত্রে এক্কেরে ফাত ফাত করে। আসলে কারে মাছ খাওয়াইতে আসো, হে কি বুঝি না?'

যুগলের মুখচোখের চেহারা এই মুহূর্তে অবর্ণনীয়। ঘাড় ভেঙে মাথাটা নিচের দিকে ঝুলে পড়েছে। জড়সড় হয়ে সে বলতে লাগল, 'কারে আবার খাওয়াইতে আনি?'

'কমু?'

মাথা আরও নুয়ে পড়েছে। আধফোটা গলায় যুগল কী বলল, বোঝা গেল না।

মেয়েমানুষটি এ ব্যাপারে আবার কী উত্তর দিতে গিয়ে, হঠাৎ চোখমুখ কুঁচকে তীক্ষ্ণ গলায় চেঁচিয়ে উঠল, 'খাইল, রাইক্ষইসা গুষ্টি আমারে চাইটা চাইটা শ্যাষ করল। যা মড়ারা, যা—' বলে যে ছেলেদু'টো ঝুলে ঝুলে স্তন চুষছিল, তাদের ঝেড়ে ফেলার মতো করে ঠেলে দিল। সঙ্গে সঙ্গে তারা গিয়ে পড়ল উঠোনের জলে।

বিনু নৌকোর মাঝখানে বসে ছিল। ভয়ে চোখ বুজে ফেলল। বুকটা খুব জোরে ঢিপ ঢিপ করতে লাগল। উঠোনে জল তো কম না, প্রায় এক মানুষের মতো। ছেলেদু'টো যদি ডুবে যায়!

একটু পর ভয়ে ভয়ে চোখের পাতা অল্প ফাঁক করতেই বিনু অবাক। সেই ছেলেদু'টো সাঁতরে ওপরে উঠে পড়েছে। সাঁকো বেয়ে তারা মায়ের কাছে চলে এল এবং আগের মতো স্তনে মুখ দিয়ে ঝুলতে লাগল।

ওইটুকু ছেলে সাঁতার কাটতে পারে, নিজের চোখে দেখেও যেন বিশ্বাস করতে পারছে না বিনু। এমন বিস্ময়কর দৃশ্য আগে কখনও দেখে নি, চোখ বড় বড় করে সে তাকিয়ে থাকল। ওদের দেখতে দেখতে মনে পড়ল, এখনও সাঁতারটা শিখে উঠতে পারে নি। তাড়াতাড়ি শিখিয়ে দেবার জন্য কালই যুগলকে ধরতে হবে।

মেয়েমানুষটি এবার আর ছেলেদের জলে ছুড়ে দিল না। বিরক্ত, কটু গলায় গজ গজ করতে লাগল। 'আ আ, আমারে খাইয়া ঠান্ডা হ নিঃবইংশরা। প্যাটে যে কী কাল ধরছিলাম।'

ছেলেদু'টোর ভ্রূক্ষেপ নেই। কুকুরছানার মতো চৌ চৌ করে তার দুধ খেতে লাগল।

pathagar.net

ছেলেদের ছেড়ে আবার যুগলকে নিয়ে পড়ল মেয়েমানুষটি, 'পোড়াকপাইলা যুগইলা, আমার চৌখে তুই ধূল-পড়া দিবি? কই তা হইলে, নামখান কই? পাখিরে মাছ খাওয়াইতে আনস।'

যুগল বলতে লাগল, 'কী যে ক'স টুনি বইন, কী যে ক'স—'

মেয়েমানুষটির নাম জানা গেল—টুনি। এ-ই তবে যুগলের পিসতুতো বোন। বিনু অবশ্য আগেই তা আন্দাজ করেছিল।

টুনি বলল, 'অবিয়াত (অবিবাহিত) মাইয়ারে রোজ রোজ মাছ খাওয়ান ক্যান? আ রে ড্যাকরা, আ রে যুগইলা, তর মনে কী আছে রে—' শরীর বাঁকিয়ে চুরিয়ে হাসতে লাগল টুনি।

যুগলের মুখ লাল হয়ে উঠেছিল। ঘামতে ঘামতে সে বলল, 'অ্যামন কথা যদি ক'স, আমি আর আসুম না তগো বাড়িত্।'

'আবি আবি (আসবি আসবি), ঠিকই আবি। না আইসা কি পারবি সুনা?'

'ক্যান, পারুম না ক্যান?'

'পাখি যে তরে গুণ করছে।'

'হ, তরে কইছে!'

টুনি আগের মতো হাসতে লাগল, কিছু বলল না।

পাখি কার নাম, কেমন করে সে যুগলকে গুণ করেছে, বুঝতে পারছিল না বিনু।

এদিকে আরেকটা ব্যাপার চলছিল। যুগল ঘামছিল, তার মুখ লাল হয়ে উঠেছিল—সবই ঠিক। তারই ভেতর চোরা চোখে এদিক সেদিক তাকিয়ে ব্যাকুলভাবে কাকে যেন খুঁজছিল।

তার এই আড়ে আড়ে তাকানোটা লক্ষ করেছিল টুনি। রঙ্গ করে বলল, 'টালুমালু কইরা চাইর দিকে দ্যাখস কী?'

যুগল চমকে উঠল, 'কী আবার দেখি? কই, কিছু না—'

'কিছু না!'

'না-ই তো।'

'যারে বিচরাইতে আছস (খুঁজছিস), হে নাই। পাখি উড়াল দিছে।'

নিমেষে মুখখানা অন্ধকার হয়ে গেল যুগলের। আবছা গলায় সে বলল, 'তার লেইগাই য্যান আইছি!'

টুনি আবার কী বলতে যাচ্ছিল, হঠাৎ তার চোখ এসে পড়ল বিনুর ওপর। খানিক অবাক হয়ে সে বলল, 'পোলাটা কে রে যুগইলা? ক্যামন ফুটফুইটা!'

কালো কালো যে ছেলেগুলো সাঁকোর ওপর বসে পা ঝুলিয়ে ঝুলিয়ে বড়শি বাইছিল তাদের ভেতর থেকে একজন বলল, 'কী ধলা (ফর্সা), এক্কেরে সাহেবগো লাখান।'

আরেকটা ছেলে বললে, 'পিরানটা (জামাটা) দেখছস বেঙ্গা, দুইখান জেব (পকেট) আছে।'

টুনি তাকে ফুটফুটে বলেছে, তার ছেলেরা বলেছে সাহেবের মতো। নিজের চেহারার এমন খোলাখুলি প্রশংসায় বিনু লজ্জা পেয়ে গেল। মুখ নামিয়ে সে নখ খুঁটতে লাগল।

যুগল বলল 'উনি বাবুগো পোলা।'

টুনি শুধলো, 'কুন বাবুগো?'

'কইলকাতার বাবুগো। হ্যামকত্তার নাতি।'

'হ্যামকত্তার তো পোলামাইয়া নাই, তেনার আবার নাতি হইল কই থিকা?'

'উনি হ্যামকত্তার ভাগনীর পোলা।'

'কইলকাতায় থাকে বুঝিন?'

'হ, কইলাম তো।'

'আইছে কবে?'

'তিন চাইর দিন হইল।'

'একলাই আইছে?'

'না। উইটুক মাইনষে একলা [illegible]'

'তয়?'
'ওনার বাপ-মায়ের লগে আইছে।'
টুনির কৌতূহল অসীম। বলতে লাগল, 'বাপ-মা'ই খালি আইছে নিকি?'
যুগল মাথা নাড়ল, 'না। দু'গা বইনও আইছে।'
'থাকব কদ্দিন?'
'হে আমি কি জানি—'
'শোনস নাই?'
'না।'
একটু কী ভেবে টুনি বলল, 'উই রে যুগইলা—'
যুগল তক্ষুনি সাড়া দিল, 'কী?'
'বাবুগো পোলা নি আমাগো ঘরে আইসা বইব?'
'অহন না।'
'তয়?'
'আরেক দিন নিয়া আসুম।'
'আনিস কিলাম (কিন্তু), মাথা খাস।'
বিরক্ত সুরে যুগল বলল, 'আনুম তো কইলাম।'
টুনি বলল, 'ঘরে নাইকলের লাড়ু আছে, বাবুগো পোলারে নি দুইটা দিমু?'
'না।'
আহত সুরে টুনি বলল, 'ক্যান রে?'
যুগল বলল, 'কইলকাতার বাবুরা লাড়ু খায় না।'
টুনির মুখখানা হঠাৎ ভারী হয়ে গেল। বিষণ্ণ গলায় সে বলল, 'তাইলে কী খাইতে দেই ক' দেখি—'
'অহন তরে কিছু দিতে হইব না।'
টুনির মুখচোখের অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে তাতে ভারি মায়া হতে লাগল বিনুর। একবার ইচ্ছে হল নাড়ু চেয়ে খায়, কিন্তু লজ্জায় বলতে পারল না।
ওদিকে টুনি আবার বলল, 'হ্যামকত্তার নাতি পেরথম দিন আইল, কিছুই হাতে দিতে পারলাম না।'
'রসগুল্লা পানিতুয়া আইনা রাখিস। আরেক দিন যহন নিয়া আসুম তহন ছুটোবাবুরে দিস।'
'আননের আগে আমারে খবর দিবি কিলাম।'
'দিমু।'
টুনির সব কথারই উত্তর দিচ্ছে যুগল, তবে কেমন যেন অন্যমনস্কের মতো। তার চোখদু'টো খাঁচার পাখির মতো অনবরত দিগ্বিদিকে ছোটাছুটি করছে। বেশ বোঝা যায়, পিসতুতো বোন কিংবা তার মাগুর মাছের মতো কালো কালো ছেলেমেয়েগুলোর জন্য বিশেষ উদ্‌গ্রীব নয় যুগল। আসলে যার জন্য তার এ বাড়িতে আসা, তাকে এখনও খুব সম্ভব দেখতে পায় নি। ফলে ভেতরে ভেতরে খুব অস্থির এবং চঞ্চল হয়ে উঠেছে।
একটু ফাঁক পেয়ে যুগল বলল, 'অই লো টুনি বইন—'
'কী?'
'জামাইরে যে দেখি না—'
'হাটে গ্যাছে।'
'সুজনগুঞ্জের?'
'হু।'
'তগো বাড়িটা বড় নিঝ্‌ঝাম টুনি বইন—'
ঠোঁটে ঠোঁট টিপে দুষ্টুমির সুরে টুনি বলল, 'হু। বড় নিঝ্‌ঝাম।'

যুগল টুনির মুখভঙ্গি বা বলার ধরন লক্ষ করে নি। আপন মনে বলল, 'তর হউরে কই (তোর শ্বশুর কোথায়)?'

'উত্তরের ভিটির ঘরে বইসা তামুক খাইতে আছে।'

'হাউরিরেও (শাশুড়িকেও) তো দেখি না।'

'হে (সে) রইছে পুবের ভিটির ঘরে।'

'করে কী?'

'কাইল রাইতে জ্বর আইছিল, কাথা মুড়ি দিয়া শুইয়া শুইয়া কোকাইতে আছে (ককাচ্ছে)।'

'ইস—'

'কী হইল?'

'হাউরিরে ডাক্তর দেখাইছস?'

ঘাড় বাঁকিয়ে গালে একখানা হাত রাখল টুনি, 'অই রে কালামুইখা যুগইলা, ক'স কী তুই?'

যুগল চকিত হল, 'কী কই?'

'একদিনের জ্বরে ডাক্তর দেখামু, আমরা নি ত্যামন বড় মানুষ! আমাগো নি ত্যামন সুখের শরীল! জ্বর আইছে, আবার যাইব গা। হের (তার) লেইগা ডাক্তার কিয়ের (কিসের)? ওষুধ কিয়ের? শুনালি একখান কথা যুগইলা! বাপের জন্মে একখান কথা শুনলাম।'

যুগল বলল, 'কী এমুন কইলাম যা বাপের জন্মে শোনস নাই?'

'তুই চুপ যা তো ছ্যামরা। মায়ের পোড়ে না, বাপের পোড়ে না, মাসির বুক জ্বইলা যায়। আপন কেউ না, পিসাতো বইনের হাউরির লেইগা আমাগো যুগইলার পরান ফাত ফাত করে। অই রে যুগইলা, অই রে ড্যাকরা—'

'কী?'

'হউর-হাউরি থুইয়া আসল কথাখান ক'। তর পরানে যা আছে ক'। যার বিহনে এই পুরী নিঝ্ঝাম লাগে হের কথা ক'।'

'কার বিহনে এই পুরী নিঝ্ঝাম?'

'পরের মুখে নামখান শুনতে বুঝিন মিঠা লাগে? তা হইলে কই—পাখি, পাখি, পাখি—'

যুগল বলল, 'আমার পিছনে যদি অ্যামন কইরা লাগস তয় কিলাম যামু গা।'

কপট দীর্ঘশ্বাস ফেলে টুনি বলল, 'পাখি নাই, থাইকা আর কী করবি সুনা? আইজ বিহান বেলায় অর বাপের লগে গ্যাছে গা।'

যুগলের মুখ আরও কালো হয়ে গেল। আবছা গলায় সে বলল, 'বার বার উই কথা কইলে সত্যসত্যই যামু গা, আর কুনোদিন আসুম না।'

বলছে বটে, যাবার কোনও লক্ষণই কিন্তু দেখা যাচ্ছে না। এমনকি সাঁকোর বাঁশে নৌকোটা যে বেঁধে রেখেছিল যুগল, সেটা বাঁধাই আছে। দড়িটা পর্যন্ত খোলে নি।

এই সময় একটা ছেলে বলে উঠল, 'না গো যুগলামামা, পাখি পিসি যায় নাই। মায় তোমারে ভাটকি দিছে (মিথ্যে বলে ধোঁকা দিয়েছে)।'

খুব নির্লিপ্ত মুখে যুগল বলল, 'থাউক যাউক, হেয়াতে আমার কী?'

টুনি বলল, 'আ লো আমার সুনা লো, কিচ্ছু বুঝিন হয় না তর? পাখি গ্যাছে গা শুইনা তো বুকখানে ঢেকির পাড় পড়তে আছিল।' বলেই গলা চড়িয়ে ডাকতে লাগল, 'পাখি—পাখি—পাখি—'

সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না।

টুনি আবার ডাকল, 'আ লো ছেমরি আয়, লাজ শরম বষ্যার জলে ভাসাইয়া আইসা পড়। পরানের বান্ধব তরে না দেইখা কিলাম এইবার মূচ্ছা যাইব।'

টুনি তার এক ছেলেকে বলল, 'যা রে বেঙ্গা, পাখি পিসিরে ধইরা নিয়া আয়।'

সব চাইতে বড় ছেলেটা ছিপ টিপ একধারে গুটিয়ে উত্তর দিকের উঁচু ঘরখানায় চলে গেল। একটু পর ফিরে এসে বলল, 'পিসি আইব না।'

টুনি শুধলো, 'ক্যান, আইব না ক্যান?'

বেঙ্গা বলল, 'চাউলের মটকিগুলার (জালাগুলোর) পিছে পলাইয়া রইছে।'

টুনি চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলল, 'আ লো ছেমরি, আয় আয়। লাজে তো তুই গেলি!'

হাজার ডাকাডাকিতেও পাখি এল না।

অগত্যা হতাশ, বিমর্ষ যুগল অনেকখানি গলা তুলে বলল, 'যাই গা টুনি বইন, যাই গা—' এবার সত্যি সত্যি নৌকোর বাঁধন খুলে ফেলল সে।

টুনি হেসে গড়িয়ে পড়তে পড়তে বলল, 'আরেট্টু জোরে চিল্লা যুগইলা, যারে শুনাইতে চাস হে (সে) শোনে নাই।'

'কইলাম তো তরে, আর কাওরে (কাউকে) শুনাইতে চাই না।'

টুনি হাসি থামিয়ে এবার অন্য কথা পাড়ল, 'অহন যাবি কই?'

'হাটে।'

'সুজনগুঞ্জে?'

'হ। হ্যামকত্তায়, লালমোহন সাহেব আর এই ছুটোবাবুর বাবায় আরেক নায়ে আগেই গ্যাছে গা। আমরা গিয়া তেনাগো ধরুম।'

'হাটে গ্যালে তগো (তোদের) জামাইর লগে দেখা হইব।'

'হ।'

পাটাতনের তলা থেকে বৈঠাখানা বার করে বাইতে শুরু করল যুগল।

সাঁকোর ওপর থেকে টুনি আরেক বার বলল, 'বাবুগো পোলারে একদিন নিয়া আবি, নিয্যস আনবি।'

'আনুম।'

টুনিদের উঠোন থেকে বেরিয়ে নৌকোটা বাইরের অথৈ, অসীম, জলপূর্ণ প্রান্তরে এসে পড়ল।

আস্তে আস্তে নৌকো বাইছে আর পেছন ফিরে ব্যাকুলভাবে বার বার কী যেন দেখছে যুগল। টুনিদের বাড়ি ছাড়িয়ে খুব বেশি দূর এখনও যায় নি, হঠাৎ যুগলের হাতের বৈঠা থেমে গেল। তার চোখের তারায় আলো নাচতে লাগল।

দ্রুত ঘুরে বসে টুনিদের বাড়ির দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে হাতছানি দিতে লাগল যুগল। তার হাতের দিকে লক্ষ করতেই বিনু দেখতে পেল, টুনিদের উত্তরের ভিটের ঘরখানার পেছনের দরজায় কোমরখানি ঈষৎ বাঁকিয়ে একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে—নিশ্চয়ই পাখি।

দরজার ফ্রেমের ভেতর প্রথমটা মনে হল ছবি। কত বয়স হবে পাখির, ষোল সতেরর বেশি নয়।

গায়ের রংখানি মাজা মাজা। চামড়া এত টান টান, মসৃণ এবং চকচকে যে মনে হয়, মেয়েটির সারা গায়ে প্রতিমার মতো ঘামতেল মাখানো। হাত-পায়ের শক্ত শক্ত গড়নের মধ্যে লাবণ্য যত, তার চাইতে ঢের বেশি বলশালিতা। ঘন পালকে-ঘেরা বড় বড় চোখ, তার মাঝখানে কুচকুচে কালো মণি দু'টো যেন ছায়াচ্ছন্ন সরোবর। চোখ দু'টি সর্বক্ষণ যেন জগতের সব কিছুর দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে আছে। মোটা ঠোঁট, সরু চিবুক, ছোট্ট কপালের ওপর থেকে ঘন চুলের ঘের শুরু হয়ে পিঠের ওপর নিবিড় মেঘের মতো সেই চুল ছড়িয়ে আছে। ছোট হলেও নাকটিতে ধারাল টান আছে, তার খাঁ'ধারের পাটায় সবুজ পাথর বসানো নাকছাবি। হতে লাল বালা আর একগোছা রুপোর চুড়ি, কানে কুমারী মাকড়ি।

কাছাকাছি বসে সবই স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল বিনু। আলাদা আলাদা করে দেখলে নাকে-মুখে হাতে-পায়ে হাজারটা খুঁত বার করা যাবে। কিন্তু সব মিলিয়ে তাকে ঘিরে কোথায় যেন অলৌকিকের একটুখানি ছোঁয়া আছে যা চোখ এবং মন একসঙ্গে জুড়িয়ে দেয়।

নীল ডোরা-দেওয়া হলুদ শাড়ি আর খাটো লাল জামা আঁটোসাঁটো করে পরা। মেয়েটির চোখেমুখে বৈশাখের আশ্বিনের টলমলে সোনালি রোদ এসে পড়েছে। ফলে তাকে এ জগতের মানবী মনে হয় না।

pathagar.net

মেয়েটা যেখানে দাঁড়িয়ে, তার ঠিক তলাতেই জল। নীলচে কাচের মতো স্বচ্ছ টলমলে জলের আরশিতে তার ছায়া কাঁপছে।

সমানে হাতছানি দিয়ে যাচ্ছে যুগল, আর মেয়েটাও তার একখানি হাত বুক পর্যন্ত তুলে নেড়ে নেড়ে ইশারায় না না করে চলেছে। তার ঠোঁটে, চোখের তারায় সরল মধুর হাসির ছটা ঝিকমিক করছে।

যুগল হাত নেড়ে নেড়ে ডাকল, 'আসো—'

মেয়েটি বলল, 'না।'

'নাও নিয়া তোমার কাছে যামু?'

চকিতে ঘাড় ফিরিয়ে বাড়ির ভেতরটা দেখে নিল মেয়েটা। মুখচোখের চেহারা সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। বিব্রতভাবে বলল, 'না—না—না, কেউ দেইখা ফেলব।'

যুগল বলল, 'দেখুক—'

তার কথা শেষ হতে না হতেই সেই উঁচু দরজার ভেতর থেকে জলে ঝাঁপ দিল মেয়েটা। ঝপাং করে একটা শব্দ হল, জল ছিটকে ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। বিনু দেখতে পেল, কখনও পানকৌড়ির মতো, কখনও লাল-হলুদ অলৌকিক একটা মাছের মতো পাখনা মেলে সাঁতার কাটতে কাটতে নিমেষে নৌকোর কাছে চলে এসেছে মেয়েটা।

যুগলের চোখে যে আলো খেলছিল সেটা চকমক করতে লাগল। মেয়েটার দিকে হাত বাড়িয়ে বলল, 'আসো—'

যুগলের হাত ধরে মেয়েটা নৌকোর ওপরে উঠে এল। যুগল বলল, 'ইস, এক্কেরে ভিজা গ্যালা। নাও লইয়া কাছে গ্যালে আর ভিজতে হইত না।'

মেয়েটি বলল, 'ভিজছি, বেশ করছি। আমরা মন হইছে, তাই ভিজছি। নাও লইয়া গ্যালে কেও দেইখা ফেলাইলে আমি গলায় দড়ি দিতাম।'

মেয়েটার শাড়ি থেকে, জামা থেকে, চুল থেকে জল ঝরে ঝরে নৌকোর পাটাতন ভেসে গেল। সে ব্যস্তভাবে বলতে লাগল, 'নাওটা এট্টু দূরে লইয়া যাও মাঝি।'

যুগলকে তা হলে 'মাঝি' বলে মেয়েটা। যুগল বলল, 'দূরে যামু ক্যান?'

'বাড়িত্ থিকা এই জাগাখান (জায়গাটা) দেখা যায়।'

'দ্যাখনের ডর?'

'হ।'

'আমাগো কথা হগলে জানে।'

'জানুক। তুমি নাওখান দূরে লইয়া যাও। নাইলে—'

'নাইলে কী?'

'আমি কিলাম ফির বাড়িত্ যামু গা।'

'আইচ্ছা আইচ্ছা—'

pathagar.net

চারধারে পদ্মবন, শাপলা আর শালুকের অরণ্য। নৌকো বেয়ে অনেকটা দূরে চলে এল যুগল। তারপর বলল, 'টুনি বইনে তহন অত কইরা ডাকল, আইলা না ক্যান?'

মেয়েটা বলল, 'আমার বুঝিন শরম লাগে না?'

'থুইয়া দ্যাও তুমার শরম। আমি খুব গুসা করছি।'

'শুদাশুদি গুসা কইরো না মাঝি। আমি নি মাইয়ামানুষ, তুমাগো যা সাজে, মাইয়া মাইনষের নি তা মানায়!'

যুগল কী উত্তর দিতে গিয়ে হঠাৎ বিনুর সম্বন্ধে সচেতন হল। এতক্ষণ বিনুর কথা বুঝি তার খেয়াল ছিল না। তাড়াতাড়ি মেয়েটাকে দেখিয়ে সে বলে উঠল, 'ছুটোবাবু, এই হইল পাখি।'

মেয়েটা যে পাখি, আগেই তা আন্দাজ করেছিল বিনু। সে একদৃষ্টে পাখির দিকে তাকিয়ে থাকল। যুগল এবার বিনুকে দেখিয়ে পাখিকে শুধলো, 'এনি কে, জানো?'

'জানি—' পাখি ঘাড় হেলিয়ে দিল।

'কে?'

'তুমি যে বাড়িত্ থাকো হেই বাড়ির বাবুর নাতি। কইলকাতা থিকা আইছে।'

'তুমি জানলা ক্যামনে?'

'উত্তরের ঘরের দরজার ফাক দিয়া দেখছি।'

একটুক্ষণ নীরবতা। তারপর গাঢ় গলায় পাখি ডাকল, 'মাঝি—'

'কও—' যুগল মুখ তুলল।

'পূজার সোময় বাপে আমারে নিতে আইব।'

যুগল চমকে উঠল, 'যাইবা গিয়া?'

চোখ নামিয়ে নখ খুঁটতে খুঁটতে পাখি বলল, 'নিতে আইলে থাকুম ক্যামনে? তয়—'

'তয় কী?'

'কেও যদি জোর কইরা ধইরা রাখত, থাইকা যাইতাম।'

বিনুর অস্তিত্ব সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে পাখির কানের কাছে মুখ নামাল যুগল। ফিসফিস গলায় বলল, 'রাখুম, জোর কইরাই ধইরা রাখুম।'

আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ। তারপর পাখিই প্রথম কথা বলল, 'মাঝি—'

'কী?'

'হেই, হেইদিন তুমার টুনি বইনের যেদিন পোলা হইল, রয়ানি গীত শুনাইছিলা, মনে আছে?'

'আছে।'

'কতকাল তুমার গীত শুনি না, আইজ একখান শুনতে সাধ লয়।'

'শুনবা?'

'হ।'

মনে মনে সুর ভেঁজে যুগল শুরু করে দিল ঃ

'চান্‌বদনী তুই লো আমার
জীয়ন মরণ কাঠি,
তোরে না দেখিলে পরে
মরি লো বুক ফাটি।
তালুক মুলুক তুই লো আমার,
তুই লো ট্যাহার তোড়া,
নামাবলী তুই লো আমার
তুই লো ভাঙ্গা বেড়া।
তুই যে আমার রসগুল্লা
মোন্ডা মিঠাই ছানা,
শীতের কাথা তুই যে আমার
রইদের মিছরি পানা।
বষ্যাকালে তুই লো আমার
তালপাতার ছাতি,
তরে পাইলে ফস্যা হয় লো
ঘোর আন্দার রাতি।
চান্‌বদনী তুই লো আমার—'

গান শেষ হবার পরও অনেকক্ষণ দূরবিসারী পদ্মবনের ওপর তার রেশ দুলতে লাগল। একসময় পাখি বলল, 'এইবার যাই গা মাঝি।'

যুগল বলল, 'আরেট্টু বসো।'

'না। কতক্ষণ আইছি, খেয়াল আছে? তুমরা হাটে যাইবা না?'

'হু হু—' যুগল ব্যস্ত হয়ে উঠল, 'চল, তুমারে বাড়িত্ দিয়া

pathagar.net

'না মাঝি, তুমারে আর দিয়া আইতে হইব না। নিজেই যাইতে পারুম।' বলেই জলে ঝাঁপ দিল পাখি।

তারপর নৌকো থেকে বিনু আর যুগল দেখল, পানকৌড়িও না, নীল-হলুদ অলৌকিক মাছও নয়, স্বপ্নলোকের জলপরীর মতো পদ্মবনের ভেতর দিয়ে সাঁতার কেটে দূরে, আরও—আরও দূরে চলে যাচ্ছে পাখি।

পদ্ম আর শাপলার বনে যতক্ষণ দেখা যায়, বিনুরা পলকহীন তাকিয়ে ছিল। একসময় অনেক, অনেক দূরে, টুনিদের বাড়িটা যেদিকে দ্বীপের মতো ভেসে আছে, হলুদ বিন্দু হয়ে পাখি মিলিয়ে গেল।

পাখি নেই, এই জলপূর্ণ চরাচরের কোথাও তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তবু যেন সে আছে, বিনুর চোখের ভেতর হলুদ জলপরীটি হয়ে অবিরাম সাঁতার কেটে চলেছে।

ওধার থেকে যুগল ডাকল, 'ছুটোবাবু—'

ঘোরটা কেটে গেল। চমকে মুখ ফেরাল বিনু।

যুগল বলল, 'পাখি কে বুঝতে নি পারলেন?'

আস্তে মাথা পাড়ল বিনু, 'না।'

'আমার পিসাতো বইন টুনিরে দেখলেন তো?'

'হ্যাঁ—'

'পাখি টুনি বইনের ননদ। আপন ননদ না, অর মাসি হাউরির মাইয়া।'

'ও।'

যুগল একটু ভেবে নিয়ে বলল, 'পাখি এইখানে থাকে না, ওগো বাড়ি ভাটির দ্যাশে।'

বিনু শুধলো, 'ভাটির দেশটা কোথায়?'

'উই দক্ষিণে—' দূর দিগন্তের দিকে আঙুল বাড়িয়ে দিল যুগল, 'উইখানে খালি জল আর মাছ। ভাটির দ্যাশেরে জল আর মাছের দ্যাশও কইতে পারেন। কত কিসিমের যে মাছ! যদিন একবার যান ছুটোবাবু, ফিরতে আর মন চাইব না।' বলতে বলতে উৎসাহিত হয়ে উঠল যুগল। তার চোখ চকচক করতে লাগল। গাঢ়, গভীর এক স্বপ্নের ভেতর ডুবে গেল যেন সে।

একটুক্ষণ নীরবতা।

তারপর যুগলই আবার বলল, 'ভাটির দ্যাশের কথা অহন থাউক। পাখির কথাই কই।'

বিনু উৎসুক চোখে তাকাল।

যুগল বলল, 'কয় দিনের লেইগা টুনি বইনের বাড়িত্ বেড়াইতে আইছে পাখি।'

'তাই বুঝি—'

'হ—' বলেই শুধরে নেয় যুগল, 'ঠিক বেড়াইতে না—'

বিনু জিজ্ঞেস করল, 'তবে?'

'টুনি বইনের তো বচ্ছর বচ্ছর পোলামাইয়া হয়। এইবারও শাবন মাসে এউক্কা মাইয়া হইছে। বইনের একলার সোংসার। হে (সে) গ্যাল আশুচ ঘরে (আঁতুড় ঘরে)। অর হাউরিরও শরীল ভালা না। এইদিকে সোংসার দেখে কে? রান্ধনবাড়ি করে কে? হের লেইগা ভগ্নিপতি ভাটির দ্যাশে গিয়া পাখিরে নিয়া আইছে।'

'ও।'

'হেই আষাঢ় মাসে পাখি আইছে, অহন আশ্বিন। তিন চাইর মাস এইখানে থাইকা গেল। এইবার যাইব গা, অর বাপে আইসা নিয়া যাইব।'

pathagar.net

বিনু আর কী বলবে, চুপ করে রইল।

যুগল থামে নি, 'বইনে খালাস হইয়া গ্যাছে, দরকার মিটা গ্যাছে। পরের বাড়িত্ মাইনষে আর কয়দিন থাকে?' বলতে বলতে হঠাৎ আকাশের দিকে তাকিয়ে চকিত হল, 'ইস, বেইল (বেলা) তো দেখি মেলা চইড়া গ্যাছে!'

এতক্ষণ মনোহর এক স্বপ্নের ভেতর যেন ডুবে ছিল বিনু। চমকে মুখ তুলে সেও ওপর দিকে তাকাল। পুব আকাশের খাড়া পাড় বেয়ে সূর্যটা অনেকখানি ওপরে উঠে এসেছে। আর দু'পা এগুলেই মধ্যাকাশ। দুপুর হতে খুব বেশি বাকি নেই।

যদিও আশ্বিন মাস, অকূল জলের মাঝখানে বিনুরা বসে আছে, তবু ভরদুপুরের আগের এই সময়টায় রোদে বেশ ধার এসে গেছে, গায়ে তার তাত লাগছে। জলো হাওয়া দাহ জুড়িয়ে দিতে পারছে না। তাড়াতাড়ি চোখ নামিয়ে সামনের দিকে তাকাল বিনু। যতদূর দৃষ্টি যায়, একেবারে দিগন্ত পর্যন্ত, অবনীমোহনদের নৌকোটার চিহ্ন নেই। দিগন্তপ্রসারী অথৈ চরাচরে কোথায় সেটা হারিয়ে গেছে, কে বলবে।

সন্ত্রস্তভাবে বিনু বলল, 'দাদুদের নৌকোটা তো দেখতে পাচ্ছি না।'

যুগল বলল, 'হাটের দিকে গ্যাছে গা।'

'আমরা এখন কী করব?'

'কী আর করুম, হাটে যামু।'

'পৌঁছুতে পৌঁছুতে তো অনেক দেরি হয়ে যাবে।'

'ইট্টুও না।' যুগল বলল, 'বাতাসের গতিক দেখছেন ছুটোবাবু?'

একটু খেয়াল করতেই বিনু বুঝতে পারল। খানিক আগেও বাতাসটা ছিল ঝিরঝিরে, এই দুপুরবেলা তাকে যেন নিশিতে পেয়েছে। শাপলাবন শালুকবন ছুঁয়ে অগাধ জলের ওপর দিয়ে সাঁই সাঁই ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছে সেটা।

যুগল আবার বলল, 'ক্যামন জবর বাতাস দিছে। বাদাম খাটাইয়া দেই, দেইখেন বড়কত্তাগো আগেই হাটে পৌছাইয়া যামু।'

হঠাৎ কী মনে পড়তে ব্যস্তভাবে বিনু বলে উঠল, 'তুমি চিনে যেতে পারবে তো?'

এমন মজার কথা বুঝিবা আগে আর কখনও শোনে নি যুগল। একটুক্ষণ অবাক হয়ে বিনুর চোখের দিকে তাকিয়ে থাকল সে। তারপর বলল, 'কথা শোন ছুটোবাবুর! কয় চিনা নি সুজনগুঞ্জের হাটে যাইতে পারুম!' বলে হেসে হেসে নৌকোর ওপর গড়িয়ে পড়ে আর কি।

বিনুর অস্বস্তি হতে লাগল, 'হাসছ যে!'

যুগল বোধহয় শুনতে পেল না। আপন মনে বলে যেতে লাগল, 'আমি যুগল—জলের পোক একখান। তমস্ত দিন এই জলের দ্যাশ মইয়াইয়া বেড়াইতে আছি। ছুটোবাবুর সন্দ, সুজনগুঞ্জের হাট চিনা যাইতে পারুম না। আপনে এক কাম করেন বরম্ (বরং)—'

'কী?'

'কাপড় দিয়া আমার চৌখ বাইন্ধা দ্যান, দেখবেন ঠিক গ্যাছি গা—'

এই পারাপারহীন অশেষ জলরাশির কোন দিকে পাড়ি দিলে সুজনগঞ্জের হাট, কে জানে। সবিস্ময়ে বিনু বলল, 'বল কী!'

'ঠিকই কই ছুটোবাবু—' বলতে বলতে উঠে দাঁড়াল যুগল। একটানে পরনের কাপড়খানা খুলে ফেলল। তলায় ছোট্ট একফালি নেংটি।

নৌকোর মাঝখানটায় ক্ষিপ্র হাতে লগি খাড়া করে বাঁধল যুগল, তারপর কাপড় দিয়ে বাদাম খাটিয়ে হালের কাছে বৈঠা নিয়ে বসল। সঙ্গে সঙ্গে তীরের মতো জল কেটে নৌকো ছুটল।

পদ্মবনের ওপর দিয়ে যাচ্ছে বিনুরা। নৌকোর তলায় সর সর শব্দ হচ্ছে।

যুগল বলল, 'আরেক খান গীত কই ছুটোবাবু।'

যত গান জানা আছে, সব এক দিনেই শুনিয়ে দিতে চায় নাকি যুগল! বিনু কিছু বলবার আগেই

সে শুরু করে দিল ঃ

'যহন বন্দু জুলব পরান, আমারি
নাম লইও,
আমার দেওয়া মালার সনে দুঃখের কথা কইও
বন্দু আমারি নাম লইও।
আমি রইব তুমার লেইগা,
তুমি রইবা আমার লেইগা—'

হঠাৎ গানটা থামিয়ে দিয়ে যুগল বলল, 'গীত থাউক ছুটোবাবু—'

বিনু বলল, 'থাকবে কেন? গাও না—'

'না। একদিনে এত গান নিয়্যস আপনের ভালা লাগতে আছে না।'

'লাগছে লাগছে। তুমি গাও।'

'না। গীতে আর মন লাগে না ছুটোবাবু। তার থিকা—'

'কী?'

'অন্য কথা কই।'

বিনু চুপ করে রইল।

একটু ভেবে নিয়ে যুগল অবার বলল, 'বুঝলেন নি ছুটোবাবু—'

'বল—' বিনু তাকাল।

তক্ষুনি কিছু বলল না যুগল। কিছুক্ষণ পর লাজুক সুরে আরম্ভ করল, 'উই পাখির লগে, বুঝলেন নি ছুটোবাবু—' এই পর্যন্ত বলে চুপ করে গেল।

'পাখির সঙ্গে কী?'

'এইখানে—উই টুনি বইনের বাড়িত্ আমার দেখাশুনা—'

'তাই নাকি?'

'হ। এইর আগে পাখিরে আর দেখি নাই।'

বিনু উত্তর দিল না।

যুগল বলতে লাগল, 'পাখিরে দেখার পর থিকা পেরায়ই টুনি বইনের বাড়িত্ যাই। না গিয়া থাকতে পারি না ছুটোবাবু। এই নিয়া টুনি বইনে ঠাট্টা করে, ঠিসারা করে, আলঠায় (পেছনে লাগে)।'

বিনু বলল, 'তা তো দেখলামই।'

'হ, বড় শরম লাগে ছুটোবাবু। তভু না গিয়া পারি না।'

একটু নীরবতা।

তারপর গলা নামিয়ে ফিসফিসিয়ে যুগল বলল, 'আইচ্ছা ছুটোবাবু—'

তার কণ্ঠস্বরে এমন কিছু আছে যাতে বিনু অবাক হয়ে গেল। বলল, 'কী বলছ?'

চকিত দৃষ্টিতে একবার বিনুর দিকে তাকিয়ে দ্রুত চোখ নামিয়ে নিল যুগল। নৌকোর পাটাতনের সঙ্গে যেন মিশে যেতে যেতে বলল, 'পাখিরে ক্যামন দেখলেন?'

'খুব ভাল। কি সুন্দর সাঁতার কাটতে পারে।'

নিচের দিকে চোখ রেখেই যুগল শুধলো, 'আপনের তাইলে পছন্দ হইছে?'

প্রশ্নটার ভেতর গভীর কোনও ইঙ্গিত আছে কিনা, বিনু বুঝতে পারল না। বুঝবার বয়সও তার নয়। তবে খানিক আগে দরজার ফ্রেমে পাখিকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিল। সেই ছবিটা এখনও চোখ জুড়ে আছে। যে মেয়ে গাছকোমর বেঁধে হলুদ শাড়ি পরে, লাল জামা গায়ে দেয়, নাকে যার সবুজ পাথর-বসানো নাকছাবি, চোখ যার ছায়াচ্ছন্ন অতল সরোবর, যে মেয়ে হলুদ জলপরী হয়ে পদ্মবনে সাঁতার কাটে তাকে যেন পৃথিবীর মানুষ মনে হয় না। স্বপ্নের অলৌকিক মানবী হয়ে নিমেষে মুগ্ধ বিনুকে সে জয় করে নিয়েছে।

ঘাড় অনেকখানি হেলিয়ে বিনু জানায়, পাখিকে তার খুব পছন্দ হয়েছে।

এবার মুখ তুলল যুগল। তার চোখমুখে আলোর ছটা খেলে যাচ্ছে। উৎসাহের সুরে সে বলল, 'নিচ্চিন্ত করলেন ছুটোবাবু, নিচ্চিন্ত করলেন—'

কিভাবে যুগলকে ভাবনাশূন্য করেছে, বিনু বুঝতে পারল না। খানিক অবাক হয়ে সে তাকিয়ে থাকল।

যুগল বলতে লাগল, 'আপনেরা কইলকাতার মানুষ, আপনাগো চৌখই আরেক রকম। আপনেগো চৌখে যহন পাখিরে ভাল লাগছে তহন আর চিন্তা নাই আমার।'

বিনু কিছু বলল না।

খানিক ইতস্তত করে যুগল আবার বলল 'টুনি বইনে কী কয় জানেন?'

জিজ্ঞাসু সুরে বিনু বলল, 'কী?'

অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে লাজুক হাসল যুগল। বলল, 'পাখির লগে আমারে নিকি খুব মানায়। দুইজনের নিকি খুব মিল হইব।'

কথাটা বুঝতে পারল না বিনু।

যুগল আরও বলল, 'টুনি বইনের কী ইচ্ছা জানেন ছুটোবাবু?'

'কী?'

'কইতে শরম লাগে।'

'লজ্জা কিসের? বল না—'

'টুনি বইনের ইচ্ছা, পাখির লগে আমার বিয়া হউক।'

'তাই নাকি?'

'হ—' আস্তে আস্তে মাথা নাড়ল যুগল, 'পাখির বাপের নাম তো আপনে জানেন না।'

বিনু বলল, 'কেমন করে জানব?'

'হে তো ঠিকই। পাখিরেই এই পেরথম দেখলেন। তার বাপের সম্বাদ তো দূরের কথা। পাখির বাপের নাম গোপাল দাস। টুনি বইনে কইছে গোপাল দাস যহন ভাটির দ্যাশ থিকা মাইয়ারে নিতে আইব তহন আমারেও দেইখা যাইব।'

'তোমাকে দেখে যাবে কেন?' বিনুর চোখেমুখে এবং কণ্ঠস্বরে আবার বিস্ময় ফুটল।

নাক কুঁচকে বিচিত্র ভঙ্গি করল যুগল। ফিসফিস গলায় বলল, 'ছুটোবাবু কিছু বোঝেন না, এক্কেরে পোলাপান।'

পোলাপান অর্থাৎ ছেলেমানুষ বলতে রেগে উঠতে যাচ্ছিল বিনু। তার আগেই যুগল আবার বলল, 'আমার হাতে মাইয়া দিব। আমি পোলাখান ক্যামন, রোজগারপাতি ক্যামন করি, খাওয়াইতে-টাওয়াইতে পারুম কিনা—এই সগল দেইখা-শুইনা-বাজাইয়া নিতে হইব না? বাপ হইয়া মাইয়ারে তো আর জলে ফেলাইয়া দিতে পারে না।'

এবার অনেকখানি বুঝল বিনু। যুগলের ওপর তার আর রাগ থাকল না।

প্রকান্ড মাছের মতো জল কেটে কেটে নৌকোটা ছুটে চলেছে। পালে সোঁ সোঁ বাতাস বেজে যাচ্ছে একটানা, যতিহীন। শুনতে শুনতে বিনুর মনে হতে লাগল, নিরবধি কাল বাতাস ওভাবে বেজে যাচ্ছে আর আদিগন্ত জলের মাঝখানে বসে সেও তার বাজনা শুনে চলেছে।

পদ্মবন শালুকবন আর শাপলাবনই শুধু নয়, মাঝে মাঝে নলখাগড়ার ঝোপ, চাপ-বাঁধা কচুরিপানা এবং ধানখেতও পড়ছে। আর পড়ছে মুক্তাবন। মুক্তার কালো কালো নিটোল ডাঁটাগুলো দৃপ্ত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে। তাদের মাথায় থোকা থোকা সাদা ফুলের সমারোহ। এসবের ওপর দিয়ে নৌকোটা যেন পাখা মেলে উড়ে যাচ্ছে।

বাদাম খাটিয়ে দেবার পর বেশিক্ষণ লাগল না। সূর্যটা মধ্যাকাশের দেউড়িতে পা দেবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বিনুরা যেখানে এসে পৌঁছলো সেখানে আর ধানখেত নেই। মুক্তা বা পদ্ম, শাপলা কিংবা শালুকের সন্ধানও পাওয়া যাচ্ছে না। ধানবন শাপলাবন পার হয়ে এখান থেকে নদী শুরু হয়েছে।

নদী অবশ্য এখানে খুব চওড়া নয়, তবে গভীর। কেননা জলের রং গহীন কালো—অনেকটা মেঘের মতো।

যুগলরা যেখানে, সেখান থেকে ওপারটা স্পষ্ট দেখা যায়। বড় বড় চোখদু'টি মেলে সেদিকে তাকিয়ে ছিল বিনু। ওপারে বিশাল উঁচু ভূখণ্ডের শিয়র ছুঁয়ে নদীটা দূরে চলে গেছে। জায়গাটা ঘিরে সারি সারি অগণিত নৌকো লগি পুঁতে রয়েছে। নদীর নানা দিক থেকে আরও কত নৌকো যে ওখানে চলেছে, হিসেব নেই। নৌকোয় নৌকোয় জল দেখা যায় না।

ওপার থেকে মৌচাকের গুঞ্জনের মতো একটানা ভনভনানি ভেসে আসছে, আর দেখা যাচ্ছে অসংখ্য মানুষ।

ধানবন পদ্মবন পেরিয়ে নদীতে পড়তেই বাদাম নামিয়ে ফেলেছিল যুগল। পালের কাপড়টা মালকোঁচা দিয়ে পরতে পরতে বলল, 'উই—উইটা হইল সুজনগুঞ্জের হাট।'

বিনু তাই ভেবেছিল। বলল, 'ও—'

কাপড় পরা হয়ে গিয়েছিল। আয়েশ করে বৈঠা বাইতে বাইতে যুগল বলল, 'আপনে তো ভাবনায় পইড়া গেছিলেন, আমি নি চিনা সুজনগুঞ্জে আইতে পারুম! দ্যাখেন, আইসা পড়ছি—'

বিনুকে স্বীকার করতেই হল, সত্যিসত্যিই যুগল পথ চিনে আসতে পেরেছে। পরক্ষণেই আরেকটা কথা মনে পড়ে গেল।

চিন্তিত মুখে বিনু বলল, 'কিন্তু—'

'কী?'

'দাদুরা কোথায়? তাদের তো দেখতে পাচ্ছি না।'

'হাটেই আইছে। নিচ্চিন্ত থাকেন ছুটোবাবু।'

বিনু নিশ্চিন্ত হতে পারল না। উদ্বিগ্ন স্বরে শুধলো, 'কী করে খুঁজে বার করবে?'

বিনুর দুর্ভাবনাকে বিশেষ গুরুত্ব না দিয়ে যুগল হাসল, 'দ্যাখেন না ক্যামনে বিচরাইয়া (খুঁজে) বাইর করি।' বলেই জিজ্ঞেস করল, 'ছুটোবাবু আপনে নাও চিনেন?'

'না।'

'আসেন চিনাইয়া দেই—' আঙুল বাড়িয়ে একখানা নৌকো দেখিয়ে যুগল বলল, 'উই নাওটার নাম 'গাছি'। আরেকটা দেখিয়ে বলল, 'এইটা 'শালতি'।'

তারপর কোনটা 'একমাল্লাই', কোনটা 'দোমাল্লাই', কোনটা 'কোষ', কোনটা 'মহাজনী'—ছইওলা এবং ছইবিহীন নানা গড়নের নৌকোর কুলশীল গোত্রের খবর দিয়ে যেতে লাগল যুগল।

নৌকো চিনতে চিনতে মজা লেগে গেল বিনুর। উৎসুক মুখে নিজেই একেকটা অচেনা নৌকো দেখিয়ে নাম জিজ্ঞেস করতে লাগল। অবনীমোহন হেমনাথদের কথা আপাতত খেয়াল নেই তার।

নৌকো চেনার ফাঁকে নদী পেরিয়ে একসময় হাটের তলায় এসে পড়ল যুগলরা। অন্য সব নৌকোর গা ঘেঁষে লগি পুঁতে নিজেদের নৌকোটা বেঁধে ফেলল যুগল। আর তখনই হাটের ভনভনানি ছাপিয়ে ঢ্যাড় ঢ্যাড় করে ঢেঁড়া পেটার প্রচণ্ড আওয়াজ শুনতে পাওয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে চকিত হয়ে উঠে দাঁড়াল যুগল। ব্যস্তভাবে বলল, 'চলেন চলেন ছুটোবাবু, ঢেরা দিতে আছে।'

দেখাদেখি বিনুও উঠে দাঁড়িয়েছিল। বলল, 'কিসের ঢেঁড়া?'

'নিয্যস মজার ব্যাপার আছে। আসেন—' বলেই নৌকো থেকে লাফ দিয়ে ডাঙায় নামল যুগল, হাত ধরে বিনুকেও নামাল। তারপর দু'জনে উর্ধ্বশ্বাসে হাটের দিকে ছুটল।

নৌকোঘাট থেকে যুগলের সঙ্গে ওপরে উঠেই বিনু অবাক। যেদিকে যতদূর চোখ যায়, সারি সারি হাটের চালা।

চালা বলতে বাঁশের খুঁটির মাথায় সামান্য হোগলার ছাউনি, তার সব দিক খোলা, বেড়া টেড়া কিছু নেই। সেগুলোর তলায় অস্থায়ী দোকান বসেছে। কোথাও একটানা অনেকগুলো চালা জুড়ে কাঁচা আনাজের বাজার, কোথাও তামাক হাটা, কোথাও মরিচ হাটা, কোথাও মাছের বাজার, কোথাও

ক্ষীরাইয়ের (এক জাতীয় শসা) বাজার। আবার কোথাও বা রঙিন কাচের চুড়ি, লাল ঘুনসি, আয়না, কাকুই, ফুলেল তেল, এমনি নানান মনোহারী জিনিসের পসরা সাজানো।

দু'ধারে হাটের চালা, মাঝখান দিয়ে আঁকাবাঁকা সরু পথ দিগ্বিদিকে ছুটে গেছে।

দু'দণ্ড দাঁড়িয়ে চোখ পেতে যে বিনু সুজনগঞ্জের হাটটা দেখবে তার সুযোগ পাওয়া যাচ্ছে না। কেননা যুগল তাকে এক মুহূর্তও দাঁড়াতে দিচ্ছে না, একখানা হাত ধরে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়ে নিয়ে চলেছে।

ছুটতে ছুটতে বিনু লক্ষ করল, সে আর যুগলই শুধু নয়, হাটের সব মানুষই ছুটছে।

ঢেঁড়ার শব্দ ক্রমশ আরও জোরাল হয়ে উঠেছে। যুগল ছোটার গতি বাড়িয়ে দিল, দেখাদেখি বিনুকেও বাড়াতে হল। পাশাপাশি যে হাটুরে লোকগুলো ছুটছিল তাদের ভেতর থেকে কেউ চেঁচিয়ে বলল, 'আ রে ধলা মিঞা, হইল কী? ঢেরা পড়ে ক্যান?'

ধলা মিঞাই খুব সম্ভব উত্তর দিল, 'নিয্যস রং-তামশার ব্যাপার আছে।'

'তাই মনে লয় (হয়)।'

আরেকজন বলল, 'অনেক কাল পর ঢেরা পড়ল সুজনগুঞ্জে—'

অন্য একজন ব্যস্তভাবে বলল, 'হ। অহন লৌড়াও (দৌড়াও) দেখি সুনাভাই—'

বেশ খানিকক্ষণ ছুটবার পর হাটের মাঝমধ্যিখানে এসে পড়ল বিনুরা। এখানে হাটের চালা নেই। একটা প্রাচীন বট তার বিপুল বিস্তার নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, আর খুশিমতো যেখানে পেরেছে ঝুরি নামিয়েছে। এই দুপুর বেলাতেও, সূর্য যখন খাড়া মাথার ওপর, বটতলা শীতল, ছায়াচ্ছন্ন। তার একধারে পুরনো ভাঙাচোরা একটা মন্দির। কিসের মন্দির বিনু বুঝতে পারল না।

মন্দিরটার সামনের দিকে মস্ত পুকুর, তারপর অনেকখানি জায়গা খোলামেলা। সেখানে এই মুহূর্তে মেলা বসে গেছে যেন। অসংখ্য মানুষ গোল হয়ে দাঁড়িয়ে ঝকমকে চোখে মাঝখানে তাকিয়ে আছে। বিনুকে টানতে টানতে যুগল সেখানে নিয়ে এল। তারপর কনুই দিয়ে ঠেলে ঠেলে অদ্ভুত কৌশলে ভিড়ের ভেতর পথ করে একেবারে সামনে এসে দাঁড়াল।

ভেতরে বেশ খানিকটা জায়গা গোলাকার এবং ফাঁকা। মানুষের ভিড় সেটা ঘিরে, বৃত্তের আকারে তারা দাঁড়িয়ে। ফাঁকা জায়গায় তিনটে মোটে লোক। দু'জনের মাথায় কোঁচকানো বাবরি, একেবারে কাঁধ পর্যন্ত নেমে গেছে। বড় মোটা জুলপি তাদের, পাকানো গোঁফ। গায়ে জামাটামা নেই, পরনে মালকোঁচা দেওয়া খাটো ধুতি। দু'জনেরই হাতে রুপোর চৌকো তাবিজ, গলায় সোনা-বাঁধানো বাঘনখ। গায়ের রং এত কালো আর চকচকে, মনে হয়, গর্জন তেল মেখে আছে।

বাবরিওলারা বেশ জোয়ান, লম্বা-চওড়া বলিষ্ঠ চেহারা। তাদের গলায় মস্ত ঢাক বাঁধা। এই মুহূর্তে মাথা ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে আর নেচে নেচে প্রচন্ডভাবে পিটিয়ে চলেছে। দু'জনে ঢাকদু'টো না ফাঁসানো পর্যন্ত থামবে না বোধ হয়।

দেখতে দেখতে বিনুর মনে হল, ওরা যেন যমজ। কুমোরের দোকানের মানিকজোড় পুতুলের মতো একই ছাঁচে গড়া।

ওরা ঢাক বাজাচ্ছে আর তৃতীয় মানুষটি একটা উঁচু প্যাকিং বাক্সের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। লোকটার শরীরে রসকষ কিছু নেই। ঢ্যাঙা তালগাছের মতো চেহারা। আখমাড়াই কলে ফেলে সবটুকু শাঁস যেন বার করে নেওয়া হয়েছে, ফলে ছিবড়েটুকু পড়ে আছে। লোকটার গাল ভাঙাচোরা, চুল পাঁশুটে রঙের। সেই চুলই তেলে জবজবে করে পরিপাটি টেরি কেটেছে। কত বয়স, কে জানে। হাড় এমন পাকা, মনে হয়, টোকা দিলেই টং করে বেজে উঠবে। পরনে চিটচিটে ঢোলা পাজামা আর রংবেরং-এর হাজারটা তালি দেওয়া আল্লাখাল্লা, খালি পা। সার্কাস দলের ক্লাউনের কথা মনে পড়িয়ে দেয়। তার হাতে লম্বা একটা চোঙা।

এমন যার চেহারা তার চোখের দিকে তাকালে অবাক হতে হয়। সে দু'টো যেমন রসালো তেমনি টলমলে। লোকটা প্যাকিং বাক্সের ওপর দাঁড়িয়ে ঘাড় হেলিয়ে চেয়ে চেয়ে দেখছিল। যখন দেখল, হাটের প্রায় সব লোক চারপাশে জড়ো হয়েছে, হাতের ইশারায় বাবরিওলা দু'টোকে থামিয়ে দিল। তারপর মুখের কাছে চোঙাটা ধরে চেঁচিয়ে বলতে লাগল, 'হিন্দু ভাইরা, মেঞাভাইরা, অনেক দিন

pathagar.net

পর আপনেগো সুজনগুঞ্জে ঢেরা দিতে আইলাম।'

ভিড়ের ভেতর থেকে কেউ বলল, 'হ, অনেক দিন পর আইলা। হেই গেল বচ্ছরের আগের বচ্ছর চৈত মাসে নীল পূজার সময় আইছিলা। হেইর পর এই আইলা।'

আরেক জন বলল, 'অ্যাত দিন আছিলা কই?'

ঢ্যাঙা লোকটা মুখ থেকে চোঙা নামিয়ে বলল, 'এই দ্যাড় বচ্ছরে কত কত মুল্লুক ঘুরলাম। হেই নুয়াখালি জিলা, ফরিদপুর জিলা, তিপুরা জিলা, কুমিল্লা, চানপুর, বরিশাল, আর হেইদিকে উজানে ভাটির দ্যাশ—না গ্যাছি কুনখানে?'

'ঢেরা দিতে গ্যাছ?'

'এ ছাড়া আর কুন কামে যামু ক'ন? এই থিকাই তো আমাগো রুজি-রুজগার, ভাত-কাপড়।'

ভিড়ের ভেতর প্রশ্নকর্তা লোকটা মাথা নাড়ল, 'হ—'

বোঝা যায়, দেশে দেশে ঢেঁড়া দিয়ে বেড়ানোই ঢ্যাঙা লোকটার কাজ এবং জীবিকা।

জটলার অন্য সবাই অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছিল। তারা চেঁচামেচি জুড়ে দিল, 'গপ থুইয়া অহন আসল সম্বাদখান কও। শুইনা যাইগা। উই দিকে আবার হাটের বেইল (বেলা) যায়।'

'হ, হ'-হঠাৎ অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে ঢ্যাঙা লোকটা হাতের লম্বা চোঙাখানা মুখের কাছে আনল, তারপর কণ্ঠস্বর একেবারে চুড়োয় তুলে চিৎকার করে বলতে লাগল, 'মিঞাভাইরা, হিন্দুভাইরা, আপনেরা নাজিরপুরের নাম শুনছেন?'

'কুন নাজিরপুর?'

'নবীগুঞ্জ থানার ভিত্রে পড়ে। পেল্লয় গেরাম।'

ভিড়ের মধ্য থেকে কেউ কেউ জানায়, নাজিরপুরের নাম তারা শুনেছে। তবে বেশির ভাগই শোনে নি।

ঢ্যাঙা লোকটা বলল, 'বাবু ভুবনমোহন দত্তচধ্রি (দত্তচৌধুরী) নাজিরপুরের জমিন্দার। বয়েস হইব ষাইট। তেনির জবর দাপট। অ্যামন যে বাঘে গোরুতে একঘাটে জল খায়। কিন্তুক—'

ভিড়টা সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠল, 'কিন্তুক কী?'

'গ্যাল বচ্ছর জমিন্দারবাবু তেজপক্ষের (তৃতীয় পক্ষের) বিয়া সারছেন। এই পক্ষের বউ একেবারে লক্ষ্মী পর্তিমার লাহান দেখতে। বয়সখানও কম, মোটে আঠার। এই নিয়া একখান কথা রটছে—'

চারদিক থেকে চড়বড়িয়ে খই ফোটার মতো অসংখ্য কণ্ঠস্বর ফুটতে লাগল, 'কী কথা? কী কথা?'

ঢ্যাঙা লোকটা সঙ্গে সঙ্গে উত্তর না দিয়ে সেই ঢাকী দু'টোকে চোখের ইশারা করল। কথাবার্তার ফাঁকে বসে বসে তারা জিরিয়ে নিচ্ছিল ইঙ্গিত পাওয়ামাত্র দামড়া মোষের মতো তড়াক করে লাফিয়ে উঠল এবং উদ্দামভাবে বাবরি ঝাঁকিয়ে ঢাক পেটাতে লাগল।

উৎসাহ দেবার জন্য বোধ হয় ঢ্যাঙা লোকটা প্যাকিং বক্স থেকে নেমে পড়ল। হাতে হাতে তালি বাজাতে বাজাতে বলতে লাগল, 'জোরে ব্যাটারা, আরও জোরে—'

ঢাকী দু'টো উৎসাহিত হয়ে এমন বাজাতে লাগল যে হাত দেখা যায় না।

ঢ্যাঙা লোকটা আগের মতোই তালি দিতে দিতে বলতে লাগল, 'ঘুইরা ফিরা শালারা, নাইচা নাইচা—'

ঘুরে ফিরে ঢাকীদের নাচ শুরু হল।

বেশ খানিকক্ষণ বাজনার পর বাবরিওলা দু'টোকে থামিয়ে আবার প্যাকিং বাক্সের মাথায় উঠল ঢেঁড়াদার। ততক্ষণে সবার কৌতূহল চূড়ান্তে পৌঁছেছে। চারধার থেকে ভিড়টা চেঁচাতে লাগল, 'কও, এইবার কও—'

ধীরেসুস্থে চোঙাটা মুখের কাছে এনে ঢ্যাঙা লোকটা বলতে লাগল, 'নাজিরপুরের বাবু ভুবনমোহন দত্তচধ্রির নামে যে কথাখান রটছে, তা হইল—' এই পর্যন্ত বলে হঠাৎ থেমে গেল।

'কী? কী?'

'তেজপক্ষের বিয়ার পর তেনি নিকি মাউগা হইয়া গ্যাছেন। (তৃতীয় পক্ষের বিয়ের পর তিনি

নাকি স্ত্রৈণ হয়ে গেছেন)। কথাখান নারাণগুঞ্জ-মুন্সিগুঞ্জ-মানিকগুঞ্জ—স্বগ্‌গ-মত্ত হগলখানে রইটা গ্যাছে।' বলতে বলতে কণ্ঠস্বর শীর্ষবিন্দুতে তুলল ঢেঁড়াদার, 'কিন্তুক কথাখান সইত্য না। হিন্দুভাইরা, মেঞাভাইরা, কেউ যদি অ্যামন কথা আপনেগো কয়, বিশ্বাস করবেন না।'

সবাই বলল, 'ক্যান, বিশ্বাস করুম না ক্যান?'

'শত্তুরে শত্তুরতা কইরা এই কথা রটাইছে। আপনেরা শুইনা রাখেন, হগ্‌গলে জাইনা রাখেন, নাজিরপুরের জমিন্দারবাবু ভুবনমোহন দত্তচধ্‌রি মাউগা (স্ত্রৈণ) না—মাউগা না—'

লোকটা থামতে না থামতেই চারধারে হাসির রোল পড়ে গেল। রসিক কেউ একজন হরিধ্বনি দিয়ে উঠল, 'বল হরি—'

ঢেঁড়া দেওয়া হয়ে গেছে। চারপাশের ভিড়টা জলোচ্ছ্বাসের ঢলের মতো এবার হাটে দোকানপাটের দিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল।'

লোকগুলো যাচ্ছে আর হেসে হেসে গড়িয়ে পড়ছে, 'বড় বাহারের সম্বাদ, বড় বাহারের সম্বাদ—'

একজন বলল, 'শালায় বাপের জম্মে অ্যামন কথা শুনি নাই।'

আরেকজন বলল, 'মাউগা না, হেই কথা হাটে হাটে ঢেরা পিটাইয়া নি কইতে হয়!'

দেখতে দেখতে জায়গাটা ফাঁকা হয়ে গেল। দামড়া মোষের মতো সেই জোড়া বাবরিওলাকে নিয়ে ঢ্যাঙা লোকটাও কখন যেন উধাও হয়েছে।

পাশে দাঁড়িয়ে যুগলও হাসছিল। হাসতে হাসতে তার হিলহিলে বেতের মতো শরীর বেঁকেচুরে যাচ্ছে।

এতগুলো লোক কেন হাসছিল, ঢেঁড়াদারের ঘোষণায় কৌতুককর ব্যাপারটা কী ছিল, কিছুই বুঝতে পারেনি বিনু। সে শুধু বিমূঢ়ের মতো একবার এর মুখের দিকে, একবার ওর মুখের দিকে তাকাচ্ছিল।

বাই চলে গেলে বিনু যুগলকে বলল, 'এই, অমন হাসছ কেন?'

'হাসুম না, ক'ন কী ছুটোবাবু?' হাসির বড় একটা ঢেউ যুগলের স্বর বুজিয়ে দিল।

বিনু হাঁ করে তাকিয়ে থাকল।

হাসিটা খানিক সামলে নিয়ে যুগল বলল, 'অ্যামন হাসনের কথা তিরভুবনে কেউ কুনোদিন শোনে নাই ছটোবাবু। কয় কিনা জমিন্দারবাবু মাউগা না—' বলে হাসতে হাসতে ফের শুয়ে পড়ে আর কি।

হঠাৎ যেন কথাটা মনে পড়ে গেল বিনুর। তাড়াতাড়ি সে বলে উঠল, 'আচ্ছা, মাউগা মানে কী? লোকটা বলছিল—'

'বোঝেন নাই?'

'না।'

হাসি থামিয়ে যুগল সোজা হয়ে দাঁড়াল। একটু চিন্তা করে বলল, 'আপনের না বুঝনেরই কথা ছুটোবাবু।'

কলকাতার ছেলে বিনু ক্লাস সেভেনে পড়ে। যে কথা যুগল বুঝতে পারে, জল-বাংলার এই অশিক্ষিত গেঁয়ো হাটুরে লোকগুলো বুঝতে পারে, সেই কথাটা সে বুঝতে পারবে না? অব্যয়ীভাব আর কর্মধারয় সমাস বোঝে সে, পাটিগণিতের বাঘা বাঘা অঙ্ক বোঝে, নেসফিল্ডের গ্রামার থেকে জিরান্ড, অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপজিশন বুঝে বসে আছে, আর তুচ্ছ মাউগা শব্দটা অবোধ্য থেকে যাবে? মাকমুখ কুঁচকে বিরক্ত গলায় বিনু বলল, 'কেন, বুঝতে পারব না কেন?'

'আপনে পোলাপান যে।'

পোলাপান অর্থে ছেলেমানুষ। আষাঢ় মাসে বার পেরিয়ে তেরয় পা দিয়েছে বিনু, মাথায় ছোটদিকে ছাপিয়ে গেছে, তবু বিনা তাকে ছেলেমানুষ ভাবে যুগল। মনে মনে খুব রেগে গিয়ে সে বলল, 'ছেলেমানুষ ছেলেমানুষ করবে না।'

তার গলায় এমন কিছু ছিল যাতে যুগল চমকে উঠল। বলল, 'আইচ্ছা, আর কমু না। এইবারটার লাখান মাপ কইরা দ্যান।'

বিনু খুশি হল। সহজ, সদয় গলায় বলল, 'ঠিক আছে। এখন 'মাউগা'র মানে বল।'

pathagar.net

যুগল বলল, 'ছুটোবাবু মাউগা তারেই কয় যে তমস্ত দিন বউয়ের আচলের তলে থাকে, তার পিছে পিছে বিলাই-ছাওয়ের লাখান (বেড়াল-বাচ্চার মতো) ঘোরে। বউ যা কয় তাই করে। মোট কথা বউ-অন্ত পরান। একদণ্ড বউরে না দেখলে মূচ্ছা যায়।'

তবু ব্যাপারটা বিশেষ বোধগম্য হল না। 'মাউগা' শব্দটা শুনবার সঙ্গে সঙ্গে হাটুরে লোকগুলোর মধ্যে হাসির ধুম পড়ে গিয়েছিল। সেই কথাটা মনে হতেই বিজ্ঞের মতো একবার হেসে নিল বিনু। ভাবখানা, আমিও সব বুঝি। ছেলেমানুষ যা ভেবেছ, আমি তা আদপেই নই।

যাই হোক, ঢেঁড়ার পর্বটা শেষ হয়েছে। হঠাৎ হেমনাথদের কথা মনে পড়ে গেল বিনুর। তাড়াতাড়ি ব্যস্তভাবে সে বলে উঠল, 'দাদু বাবা আর লালমোহনদাদুকে খুঁজে বার করবে না?'

যুগল বলল, 'হ। চলেন।'

'চল—'

দু'পা এগিয়েছে, এমন সময় উঁচু গলার ডাক ভেসে এল, 'যুগল, এই যুগল—'

ডান দিকে তাকাতেই বিনুরা দেখতে পেল, খানিক দূরে অবনীমোহন লারমোর আর লারমোরের নৌকোর সেই মাঝি দু'জন দাঁড়িয়ে আছে। মাঝিদের মাথায় দু'টো বড় বড় টিনের বাক্স। চোখাচোখি হতেই লারমোর হাতছানি দিলেন।

বিনুরা বড় বড় পা ফেলে এগিয়ে গেল।

লারমোর যুগলের উদ্দেশে বললেন, 'কোথায় গিয়েছিলি রে হতভাগা, এত দেরি হল?'

নীচের দিকে তাকিয়ে ঘাড় চুলকোতে চুলকোতে যুগল বলল, 'পথে এক কুটুমের লগে দেখা, হে (সে) আমারে তার বাড়িত্ ধইরা নিয়া গেল। তাই ইট্টু দেরি হইছে।'

কুটুমবাড়ি যাবার কথাটা সত্যি। তবে তার সঙ্গে দেখা হওয়া এবং ধরে নিয়ে যাওয়াটা ডাহা মিথ্যে। বিনু একবার ভাবল, যুগলের মিথ্যেটা ধরিয়ে দেয়। কিন্তু ধরিয়ে দিলে তার ফলাফল কী হবে ভেবে চুপ করে থাকল।

লারমোর আবার বললেন, 'নৌকোয় উঠলে, জল পেলে, তুই আর মানুষ থাকিস না। তোর তো কিচ্ছু হবে না, পদ্মা-মেঘনা-ধলেশ্বরী আর সারা বর্ষার জলের সাধ্যি নেই তোর কিছু করতে পারে। ভয় ওই দাদাভাইটাকে নিয়ে—' আঙুল দিয়ে বিনুকে দেখিয়ে বলতে লাগলেন, 'আমরা সারাক্ষণ ওর কথা চিন্তা করছি।'

যুগল ফিসফিসিয়ে বলল, 'চিন্তার কিছু আছিল না। ছুটোবাবুরে আমার নায়ে তুলছি, আমার এট্টা দায়িত্ব নাই?'

লারমোর সকৌতুকে হাসলেন, 'আছে নাকি। জেনে আশ্বস্ত হওয়া গেল।' বলতে বলতে বিনুর দিকে ফিরলেন, 'তারপর দাদাভাই—'

বিনু তাকাল।

লারমোর বললেন, 'ঢেঁড়া শুনেছ?'

বিনু ঘাড় কাত করল, 'হ্যাঁ।'

'কী শুনলে বল তো।'

'নাজিরপুরের জমিদার মাউগা না।'

সবাই মুখ টিপে হাসতে লাগল। হেসে হেসে লারমোর শুধোলেন, 'মানে বুঝেছ?'

'হুঁ।'

হাসিটা হঠাৎ থমকে গেল লারমোরের। ঈষৎ সন্দিগ্ধভাবে শুধোলেন, 'কী?'

'মাউগা' শব্দের ব্যাখ্যা যুগলের কাছে যা শুনেছিল, গড়গড় করে বলে গেল বিনু। শুনে কিছুক্ষণ হাঁ হয়ে রইলেন লারমোর। অবনীমোহনেরও সেই একই অবস্থা। কিছুক্ষণ পর লারমোর বললেন, 'এত সব কথা তুমি কেমন করে জানলে দাদাভাই? কে শিখিয়েছে?'

শেখানোর কৃতিত্বটা আর যুগলকে দিতে মন চাইল না। বিজ্ঞের মতো মুখ করে, গম্ভীর চালে বিনু বলল, 'কেউ শেখায় নি, আমি নিজেই জানি।'

লারমোর আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, অনেকগুলো হাটুরে লোক পুরনো ভাঙা মন্দিরটার দিক

pathagar.net

থেকে ডাকাডাকি করতে লাগল, 'লালমোহন সাহেব লালমোহন সাহেব, তরাতরি আসেন। বেইল (বেলা) যে যায়—'

লারমোর চঞ্চল হলেন। ব্যস্তভাবে বললেন, 'চল, চল সব—' বলে সামনের দিকে পা বাড়িয়ে দিলেন।

ওই লোকগুলো কেন লারমোরকে ডাকছে, বিনু বুঝতে পারল না। যাই হোক, লারমোর আর অবনীমোহন আগে আগে চলেছেন। তাদের পেছনে বাক্স মাথায় সেই মাঝি দু'টো। সবার শেষে বিনু এবং যুগল।

যেতে যেতে অবনীমোহনের গলা শুনতে পেল বিনু। চাপা স্বরে তিনি লারমোরকে বলছেন, 'এমন ঢেঁড়াও লোকে দেয়!'

লারমোর বললেন, 'মজার ব্যাপারটা সবাই জানল। অথচ তোমার মামাশ্বশুরই শুধু জানতে পারল না। হেমটা একেবারে পাগল। নৌকো থেকে নেমে ঘাড় বেঁকা করে কোন দিকে যে ছুটল!'

'মামাবাবু তো বললেন, নিত্য দাস না কার দোকানে যাবেন।'

'তুমিও যেমন অবনীমোহন, মামাবাবুটিকে তো এখনও চেন নি। নিত্য দাসের দোকান পর্যন্ত সোজা ও পৌঁছুতে পারবে? তার আগেই হয়তো তারক ভুঁইমালী ধরে নিয়ে নিজের দোকানে বসাবে। সেখানে এক দুপুর কাটিয়ে দেবে হেম।'

হেমনাথ সম্বন্ধে ঠিক এইরকম অনুযোগই করেছিলেন স্নেহলতা। অবনীমোহন হাসলেন।

লারমোর বলতে লাগলেন, 'চল্লিশ বছর ধরে দেখছি হেমকে। ওই এক রকমই থেকে গেল। কোনও পরিবর্তন নেই।'

হঠাৎ কী ভেবে অবনীমোহন বললেন, 'তা হলে তো ভারি মুশকিল হবে লালমোহন মামা—'

'কিসের মুশকিল?' জিজ্ঞাসু চোখে তাকালেন লারমোর।

'এক জায়গায় যেতে গিয়ে আরেক জায়গায় যদি আটকে যান, ওঁকে খুঁজে বার করব কী করে?'

'কিছু করতে হবে না। হেমই আমাদের খুঁজে বার করবে।'

'আমরা কোথায় আছি, উনি কেমন করে জানবেন?'

লারমোর বললেন, 'ও জানে। সুজনগঞ্জের হাটে এলে মন্দিরের পাশের বটগাছতলায় আমি বসি। দেখো, ঠিক এসে পড়বে।'

এদিকে যুগল বিনুকে বলছিল, 'জানেন ছুটোবাবু, কয়দিনে আপনে বেশ চালাক-চতুর হইয়া উঠছেন।'

বিনু রেগে গেল, 'আমি আগেও চালাক ছিলাম।'

যুগল বলল, 'হে (সে) তো জানি। তয় এই কয়দিনে আরও চালাক হইছেন।'

ঈষৎ নরম হয়ে বিনু বলল, 'কী করে বুঝলে?'

'উই যে লালমোহন সাহেবরে যহন মিছা কইরা কইলাম, পথ থিকা আমার কুটুমে আমাগো ধইরা নিয়া গেছিল তহন আপনে চুপ কইরা থাকলেন। সত্য কথাখান কইলে লালমোহন সাহেব খুব চেইতা (রেগে) যাইত।'

বিনু উত্তর দিল না।

যুগল আবার বলল, 'যহন যহন দরকার হইব, এইরকম বুদ্ধি খেলাইবেন ছুটোবাবু।'

একসময় তারা মন্দিরের কাছাকাছি সেই ঝুপসি বটগাছটার তলায় এসে পড়ল।

খানিক আগে বিনু এই জায়গাটার ওপর দিয়ে ছুটে গেছে। তখন চোখে পড়েনি, এখন দেখা গেল, একটা শস্তা ছোট টেবিলের মুখোমুখি দু'খানা হাতল ভাঙা চেয়ার সাজানো। সামনের দিকে জনাকয়েক লোক ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। তাদের সবাই গরিব গেঁয়ো চাষী শ্রেণীর। সিকিভাগের মতো হিন্দু, বাদবাকি মুসলমান। চেহারা তাদের রুগ্ণ, দুর্বল। চোখেমুখে অসুস্থতার ছাপ মাখানো। লারমোরকে দেখে সবার চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

এক পলক চেয়ার টেবিলের দিকে তাকিয়ে থেকে লারমোর বললেন, 'এতে তো হবে না, আরও

pathagar.net

দু'খানা চেয়ার লাগবে।'

যে মাঝিদু'টো মাথায় করে বাক্স নিয়ে এসেছিল তার চঞ্চল হল। তাড়াতাড়ি বাক্স নামিয়ে হাটের দিকে ছুটল।

সামনের চেয়ারখানা দেখিয়ে লারমোর অবনীমোহনকে বললেন, 'বোসো অবনী—'

অবনীমোহন বসলেন। তাঁর মুখোমুখি বসতে বসতে লারমোর এবার বিনুকে বললেন,'যতক্ষণ না চোর আসে ততক্ষণ আমার কোলে বসো দাদাভাই। এস—' বলে হাত বাড়িয়ে দিলেন।

কারোর কোলে বসতে ঘোরতর আপত্তি বিনুর। কিছুতেই লারমোরের কাছে গেল না সে। নীচে ঘাসের ওপর যুগল বসে পড়েছিল। সে তার গা ঘেঁষে গিয়ে বসল।

বিনুর দিকে তাকিয়ে মধুর হাসলেন লারমোর, 'দাদাভাই মস্ত বড় হয়ে গেছে। কোলে বসতে তার খুব লজ্জা।'

বিনু চোখ নামিয়ে চুপ করে থাকল।

ওদিকে সেই গ্রাম্য অসুস্থ লোকগুলো অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছে। তারা গুঞ্জনের মতো শব্দ করে বলতে শুরু করল, 'এইবার আমাগো দ্যাখেন লালমোহন সাহেব।'

স্নেহময় সুরে লারমোর বললেন, 'এতক্ষণ বসে আছিস, আরেকটু সবুর কর বাবারা। চেয়ারটা আসুক। না এলে কোথায় বসিয়ে তোদের দেখব?'

লোকগুলো শান্ত হল।

কিছুক্ষণ নীরবতা। তারপর একটু কী ভেবে গভীর স্বরে লারমোর ডাকলেন, 'অবনীমোহন—'

'আজ্ঞে—' অবনীমোহন তক্ষুনি সাড়া দিলেন।

'এটা কত সাল?'

'উনিশ শ' চল্লিশ।'

'ঠিক চল্লিশ বছর আগে উনিশ শ' সালে, তার মানে টুয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরি সবে শুরু হয়েছে—সেই সময় আমি রাজদিয়ায় এসেছিলাম। তখন আমার বয়েস পঁচিশ। রাজদিয়ায় আসার পরের দিন থেকেই আমি সুজনগঞ্জের হাটে আসছি। এই যে বটগাছটা দেখছ, এর তলায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেই যুবক বয়েসে আমি খ্রিস্টধর্ম প্রিচ করতাম।'

'এখন প্রিচ করেন না?'

'না।'

'তবে?'

লারমোর হাসলেন, 'এখন যা করি একটু পরেই দেখতে পাবে।'

অবনীমোহন শুধোলেন, 'এখন আর প্রিচ করেন না কেন?'

লারমোর হাসলেন। বললেন, 'খুব কঠিন প্রশ্ন করেছ অবনী। এর উত্তর তো এক কথায় দেওয়া যাবে না। দিতে গেলে আমার সারা জীবনের কথা বলতে হবে।'

উৎসুক সুরে অবনীমোহন বললেন, 'বেশ তো, বলুন না। আমার খুব জানবার ইচ্ছে।'

সামনের অসুস্থ, উদ্বিগ্ন লোকগুলোকে দেখিয়ে লারমোর বললেন, 'এখন যদি গল্প জুড়ে দিই, ওরা আমাকে আস্ত রাখবে না। পরে আরেক দিন শুনো—'

'আচ্ছা।' আবনীমোহন বললেন, 'পরেই শুনব।'

যুগলের কাছে বসে উদ্‌গ্রীব তাকিয়ে ছিল বিনু। লারমোর নামে এই মানুষটি সম্বন্ধে তার মনে অসংখ্য জিজ্ঞাসা, অসীম কৌতূহল। লারমোরের কথা জানবার জন্য প্রথম দিন থেকেই উন্মুখ হয়ে আছে সে। ভেবেছিল তার কৌতূহল এবার মিটবে। কিন্তু লারমোর নিজের সম্বন্ধে কিছুই বললেন না, ফলে বিনুর মন বেশ খারাপ হয়ে গেল।

অবনীমোহন আবার কী বলতে যাচ্ছিলেন, সেই মাঝি দু'টো দু'খানা হাতল-ভাঙা চেয়ার নিয়ে ছুটতে ছুটতে ফিরে এল।

লারমোর ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। বিনুকে একটা চেয়ারে বসতে বলে ভিড়ের ভেতর থেকে একজনকে ডেকে অন্য চেয়ারটায় বসালেন। তারপর মাঝি দু'টোর উদ্দেশে বললেন, 'বাক্স খোল—'

pathagar.net

মাঝিরা সেই বড় টিনের বাক্স দু'টো খুলে ফেলল। বিনু দেখতে পেল, তার ভেতর নানারকম ওষুধবিষুধ, নাক-কান-গলা-জিভ এবং বুক পরীক্ষার যন্ত্রপাতি, ইঞ্জেকশনের ছোট চ্যাপটা লম্বাটে বাক্স।

যন্ত্রপাতি আর ইঞ্জেকশনের বাক্সটা টেবিলের ওপর সাজিয়ে অন্য চেয়ারের লোকটার দিকে তাকালেন, 'কেমন আছিস রে জিগিরালি?'

লোকটা মধ্যবয়সী। মুখময় কাঁচাপাকা গোঁফদাড়ি খাড়া হয়ে আছে, ফলে শজারুর কাঁটার মতো দেখায়। চোখদু'টি ঘোলাটে এবং রুগ্‌ণ। কাতর সুরে জিগিরালি বলল, 'ভালা না সাহেববাবা।'

লারমোর শুধোলেন, 'কী হল আবার?'

'তিন দিন ধইরা ধুম জ্বর। হেই জ্বর আর ছাড়ে না।'

বুকটুক পরীক্ষা করতে করতে লারমোর বললেন, 'গেল হাটে দেখে গেছি, ভাল। এর ভেতর জ্বর বাধালি কী করে?' বলতে বলতে ভুরু কুঁচকে গেল, 'এ কী!'

জিগিরালি বলল, 'কী সাহেববাবা?'

'বুকে বিশ পাসারি (এক পাসারি—মানে আড়াই সের) কফ জমল কী করে! গেল হাটে তো কফ দেখি নি।'

জিগিরালি চুপ।

লারমোর ধমকে উঠলেন, 'হারামজাদা, মুখ বুজে থাকলে চলবে না। বল, কী করেছিলি—'

ভয়ে ভয়ে একবার চোখ তুলেই নামিয়ে নিল জিগিরালি। অস্ফুট গলায় বলল, 'মাছ মারতে নদীতে নামছিলাম। হেইর লেইগা—'

নিষ্পলক, স্থির দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন লারমোর। তারপর চিৎকার করে উঠলেন, 'তোকে না বলেছিলাম, ঠান্ডা লাগাবি না—'

'কী করুম সাহেববাবা, মাছ না মারলে, হেই মাছ হাটে হাটে গিয়া না ব্যাচলে সোংসার চলব ক্যামনে? পোলাপান খাইব কী?'

'কেন, তোর বড় ছেলেটা করে কী? দু'টো দিন সংসার চালিয়ে নিতে পারে না সে?'

জিগিরালির মুখে নৈরাশ্যের ছায়া পড়ল। তিক্ত স্বরে সে বলল, 'তয় তো বাইচা যাইতাম। হে (সে) চালাইব সোংসার! তাইলে আমার দুঃখু ঘুচব ক্যান? ভাবছিলাম পোলা ডাঙ্গর হইছে, এইবার সুখের লাগুর (নাগাল) পামু। আ আমার বরাত!' কপালে একটা চাপড় মেরে আবার শুরু করল, 'পোলায় হইছে কবিদার (গ্রাম্য কবিগান রচয়িতা এবং গায়ক)। মাথায় গন্ধত্যাল মাইখ্যা, চৌখে সুর্মা লাগাইয়া হে (সে) আসরে গান গায়। বাপের আসান করতে জলে লামব, মাছ মারব—এই হগল কি হেরে (তাকে) মানায়! সোম্মানে লাগে না!'

লারমোর রেগে গেলেন, 'বাপ এদিকে মরছে আর উনি কবিদার হয়ে বসেছেন! কোথায় সেই উল্লুকটা?'

'আসনের সোময় বাড়িতেই দেইখা আইছি।'

'কালই আমার কাছে তাকে পাঠিয়ে দিবি।'

'হে (স) কি আইব?'

'তার ঘাড় আসবে। আমার কথা বলবি। বলবি লালমোহন সাহেব যেতে বলেছে। বাঁশডলা দিয়ে তার কবিয়ালি ছুটিয়ে দেব।'

লালমোহনের যে চেহারাটা বিনুর মনে গভীর রেখায় আঁকা হয়ে গেছে সেটা মধুর, স্নেহময় একটি মানুষের চেহারা। তার বাইরেও যে তাঁর আরেকটা রূপ আছে, তিনি যে এত রেগে যেতে পারেন, বিনু তা কল্পনাই করতে পারে নি। অবাক হয়ে সে তাকিয়ে থাকল।

পরীক্ষা টরীক্ষা করে জিগিরালিকে ওষুধ দিতে দিতে লারমোর বললেন, 'দিনে তিন বার খাবি। সকালে-দুপুরে-রাত্তিরে। আর সংসার রসাতলে যাক, জাহান্নামে যাক, না খেয়ে গুষ্টিসুদ্ধু মরুক, তবু ঘর থেকে বেরুবি না। যদি শুনি এই জ্বর নিয়ে আবার জলে নেমেছ, লাঠি দিয়ে পা দু'খানা গুঁড়ো করে দিয়ে আসব।'

জিগিরালি মাথা নেড়ে জানায়, তিনবার করেই ওষুধ খাবে এবং ঘর থেকে বেরুবে না। বলল,

pathagar.net

'অহন তাইলে যাই। আদাব সাহেববাবা—'

'যাবি তো, পথ্যের পয়সা আছে?'

জিগিরালি উত্তর দিল না, মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল।

লারমোর বললেন, 'পয়সা চাইতে বুঝি মিঞা সাহেবের মানে লাগে?' পকেট থেকে একটা সিকি বার করে দিতে দিতে বলেন, 'এই নে। বার্লি টার্লি কিনে নিস।'

জিগিরালি এবারও কিছু বলতে পারল না। ঠোঁটদু'টো থরথর করল শুধু, আর কৃতজ্ঞতায় চোখ সজল হয়ে উঠল।

জিগিরালি চলে গেলে ভিড়টার দিকে তাকিয়ে লারমোর ডাকলেন, 'বুধাই পাল এস—'

যে উঠে এল তার বয়স ষাটের কাছাকাছি। খালি গা, খালি পা। গায়ের চামড়া খসখসে, খই-ওড়া। গোল গোল হলদে চোখ। জয়ঢাকের মতো মস্ত পেটের ওপর সরু হাড় জিরজিরে বুক। গলাটাও সরু, তার ওপর প্রকান্ড মাথা। পাঁশুটে রঙের চুলে মাথাটা ঝুপসি হয়ে আছে। আচ্ছাদন বলতে নেংটির চাইতে সামান্য বড় একটা ময়লা চিটচিটে টেনি।

জিগিরালির খালি চেয়ারখানা দেখিয়ে লারমোর বললেন, 'বোসো—'

বুধাই পাল বসল না।

লারমোর বললেন, 'কী হল, বোসো—'

ঘাড় চুলকোতে চুলকোতে বিনীত সুরে বুধাই পাল বলল, 'আইজ্ঞা না, আপনের সামনে আমি চ্যারে (চেয়ারে) বইতে পারুম না।'

'কেন হে?'

'আপনের সামনে চ্যারে বসুম, আপনের এট্টা সোম্মান নাই?'

'ঠিকই তো, ঠিকই তো।' রহস্য করে হাসতে হাসতে বুধাই পালের একখানা হাত ধরে জোর করে চেয়ারে বসিয়ে দিলেন লারমোর।

অত্যন্ত কুণ্ঠিত হয়ে পড়ল বুধাই পাল, 'এইটা কী করলেন সাহেববাবা, এইটা করলেন কী!'

'ভয় নেই। তুমি চেয়ারে বসলে আমার সম্মানের একটুও ক্ষতি হবে না।'

বাড়তি দু'খানা চেয়ারের কী প্রয়োজন, এতক্ষণে বুঝতে পেরেছে বিনু। একটা তার জন্য, আরেকটা রুগীদের জন্য। প্রিচ করার বদলে আজকাল হাটে যত রুগী আসে, তিনি তাদের চিকিৎসা করে থাকেন।

লারমোর বললেন, 'তারপর পালমশাই, ক'মাস পর দেখা দিলেন?'

'আইজ্ঞা, দুই মাস।'

'এতদিন ছিলেন কোথায়?'

'গাওয়ালে গেছিলাম।'

এই সময় বিনু বলে উঠল, 'গাওয়াল কী?'

pathagar.net

লারমোর বিনুর দিকে ফিরে হাসলেন, 'কুমোরেরা মাটির হাঁড়ি-কলসি-পাতিলে বড় বড় নৌকো বোঝাই করে নদীর চরের দিকে পাড়ি দেয়। হাঁড়ি-কলসির বদলে ওরা পয়সা নেয় না, ধান নেয়। দু'চার মাস পর নৌকো ভর্তি ধান নিয়ে তারা চর থেকে ফিরে আসে। একে বলে গাওয়াল করা।'

'ও।'

এতক্ষণ বুধাই পাল খেয়াল করে নি। এবার তার চোখ এসে পড়ল বিনু আর অবনীমোহনের ওপর। হতজোড় করে বলল, 'এনারা?'

লারমোর বললেন, 'তোমাদের হেমকর্তার নাতি আর জামাই।'

খুব ব্যস্তভাবে এবং সম্ভ্রমভরে উঠে দাঁড়িয়ে মাথাটা অনেকখানি ঝুঁকিয়ে দিল বুধাই পাল, 'পন্নাম হই গো জামাইবাবু, নাতিবাবু। কী সুভাগ্যি, আমাগো হ্যামকত্তার নাতি আর জামাইরে দ্যাখলাম।'

ঠিক এই সময় জিগিরালি আবার ফিরে এল। মুখ কাঁচুমাচু করে লারমোরকে বলল, 'বড় অন্যায় হইয়া গ্যাছে গো সাহেববাবা—' অবনীমোহনদের দেখিয়ে বলল, 'এনাগো কথা জিগাইতে এক্কেরে

ভুইলা গ্যাছি।'

লারমোর অবনীমোহনদের পরিচয় দিলেন।

এরপর জিগিরালি আর বুধাই পাল, দু'জনে মিলে একের পর এক প্রশ্ন করে যেতে লাগল। অবনীমোহনরা কোথায় থাকেন? কলকাতায় থাকেন শুনে বলল, এতকাল আসেন নি কেন? এসেছেন যখন দু'চার মাস অন্তত এই জলের দেশে থেকে যেতে হবে, ইত্যাদি ইত্যাদি। প্রশ্নোত্তরের পর সসম্ভ্রমে সেলাম করে জিগিরালি চলে গেল। যাবার আগে বলে গেল, 'শরীলটা ইট্টু ভালা হইলে হ্যামকত্তার বাড়িত্ যামু। আপনেগো লগে দুইখান কথা কইলেও পরান জুড়ায়।'

অবনীমোহন অভিভূত হয়ে গিয়েছিলেন। একটা অসুস্থ, রুগ্‌ণ মানুষ শুধু তাঁদের পরিচয় জানবার জন্য জ্বর গায়ে আবার ফিরে এসেছে, আগে তাঁদের কথা জিজ্ঞেস করতে ভুলে গিয়েছিল বলে অসীম সঙ্কোচে বিব্রত হয়ে আছে—ভাবতেই অবাক হয়ে গেলেন তিনি। গাঢ় গলায় বললেন, 'তোমার আসতে হবে না। আমরাই একদিন তোমার বাড়ি যাব।'

'যাইবেন তো, যাইবেন তো?' চোখ আলো হয়ে উঠল জিগিরালির।

'যাব, নিশ্চয়ই যাব।'

জিগিরালি চলে গেলে লারমোর বুধাই পালকে বললেন, 'এখন অন্য কথা নয়, এইবার আপনার পেটের কথা বলুন পালমশাই। কেমন আছেন তিনি?'

মাঝে মাঝে বুধাই পালকে 'আপনি' করে বলছেন লারমোর। বিনু বুঝল, ওটা ঠাট্টা।

এদিকে পেটের কথায় মুখখানা যেন কেমন হয়ে গেল বুধাই পালের।

নাকের ভেতর থেকে দুর্বল একটা সুর বার করে সে বলল, 'প্যাটের গতিক সুবিধা বুঝি না সাহেববাবা।'

'কেন?'

বুধাই পাল চুপ।

লারমোর বললেন, 'কাছে এস, পেটখানা দয়া করে দেখাও—'

ভয়ে ভয়ে সামনে এসে দাঁড়াল বুধাই পাল। লারমোর পেটে হাত দিতে না দিতেই চেঁচিয়ে উঠল, 'উ-উ, লাগে—'

'লাগে নাকি?'

'হ বাবা, জবর লাগে।'

পেটটা আস্তে আস্তে টিপে লারমোর আঁতকে উঠলেন, 'দু'মাসে পেটটাকে করেছ কী!'

'আইজ্ঞা—'

'তোমার পেটে ক'টা পিলে হে?'

'বাবার য্যামন কথা।' বুধাই পাল ফোকলা মাড়ির ওপর কুটা হলদে দাঁত বার করে হাসতে লাগল, 'মাইনষের আবার কয়টা পিলা হয়? একটাই পিলা আমার।'

লারমোর বললেন, 'একটাই ছিল, তবে এই দু'মাসে গাওয়ালে গিয়ে আরও গোটা পাঁচ-সাতেক জুটিয়ে এনেছ। আর এক একটা পিলে গায়েগতরে কোল বালিশের মতো।'

বিনু যুগল অবনীমোহন, এমনকি অদূরে সেই অসুস্থ রোগগ্রস্ত লোকগুলোও হাসতে লাগল। সবার সঙ্গে বুধাই পালও পাল্লা দিয়ে হাসছে।

লারমোর শুধোলেন, 'পেটটার এমন দশা করলে কেমন করে? গাওয়ালে গিয়ে ভেবেছিলে, লালমোহন সাহেব তো সামনে নেই, কে আর বকাঝকা করবে? প্রাণের সুখে অপথ্য কুপথ্য করে গেছ, না?'

তাড়াতাড়ি জিভ কেটে একসঙ্গে হাত এবং মাথা ঝাঁকিয়ে বুধাই বলল, 'গুরুর কিরা (দিব্যি) সাহেববাবা, আপনে যা যা খাইতে কইছিলেন তার বাইরে দাতে কিচ্ছু কাটি নাই।'

'কিচ্ছু না?'

'না।'

'সরষে দিয়ে ইলিশ-ভাতে খাও নি?'

'উই জিনিস না খাইয়া পারি?'

'পেঁয়াজ-রসুন দিয়ে শুটকি মাছ?'

'উইটাও খাইতে চাই নাই। তয়—'

'তবে খেলে কেন?'

কিছুক্ষণ হাত কচলে, নিজের বুকে একখানা আঙুল রাখল বুধাই পাল। করুণ গলায় বলল, 'এইর ভিত্‌রে যার বাস হেই আত্মায় চাইল যে। আমি কী করুম?'

'তাই তো, কী আর করা। তা হ্যাঁ হে পালমশাই, তেঁতুল দিয়ে পুঁটি মাছের টকের কথাটা বল—'

বুধাই পাল চুপ।

লারমোর বললেন, 'লজ্জা কি, লজ্জা কি, বলেই ফেল না। পুঁটি মাছের টকটাও নিশ্চয়ই পরমাত্মা চেয়েছিল?'

বুধাই এবার আর মুখ খুলল না, আস্তে করে মাথা হেলিয়ে বুঝিয়ে দিল।

লারমোর আঙুল দিয়ে তার চিবুকটা ঠেলে ওপর দিকে তুললেন, তারপর চোখের ভেতর তাকিয়ে বললেন, 'পালমশাই, ধন্বন্তরির বাপেরও সাধ্যি নেই আপনার রোগ সারায়। এক কাজ করুন—'

বিপন্ন মুখে বুধাই পাল তাকিয়ে থাকল।

লারমোর বলতে লাগলেন, 'যমরাজকে খবর দিন, খুব তাড়াতাড়ি তিনি আপনাকে নিয়ে যাবার জন্যে একটা পুষ্পকরথ যেন পাঠান।'

হঠাৎ উবু হয়ে বসে লারমোরের দু'খানা পা চেপে ধরল বুধাই পাল। কাতর মিনতিপূর্ণ সুরে বলল, 'আমারে বাচান সাহেববাবা, প্যাটে বড় যন্তন্না। এইবার থিকা আর আপনের আবাইধ্য হমু না। য্যামন কইবেন ত্যামন চলুম।'

'তোমার কথায় বিশ্বাস নেই।'

'আরেক বার, খালি আরেকটা বার—গুরুর কিরা, আর উই সগল খামু না।'

'ঠিক?'

'ঠিক বাবা।'

ওষুধ টোষুধ দিয়ে লারমোর বললেন, 'তেল-টেল, পেঁয়াজ-রসুন, সব বাদ। তিন মাস শুধু দুধ-ভাত খাবে। নইলে পেটের পিলে আর ঘা সিধে তোমাকে স্বর্গে নিয়ে যাবে।'

বুধাই পাল বলল, 'দুধ খাওনের ক্ষ্যামতা কি আমাগো লাখান মাইনষের আছে?'

লারমোর বললেন, 'না থাকে, দু'মাস তুমি আমার কাছে এসে থাকো। আমার তিনটে গরু আছে, সাত আট সেরের মতো দুধ হয়।'

বিনুর হঠাৎ মনে পড়ে গেল, স্নেহলতা লারমোরকে তাঁদের বাড়ি গিয়ে থাকতে বলেছেন। এই নিয়ে স্নেহলতার কত রাগ, কত অভিমান। আর লারমোর কিনা তাঁর কাছে গিয়ে থাকবার জন্য লোক জোটাচ্ছেন! ব্যাপারটা ভাবতেই ভারি মজা লাগল বিনুর।

বুধাই পাল বলল, 'বাড়িঘর ব্যবসাপত্তর ফেলাইয়া আপনের কাছে গিয়া কি থাকতে পারি? সোংসার দেখব কে?'

'তা হলে এক কাজ করো, তোমার নাতিকে আমার ওখানে রোজ সকালে পাঠিয়ে দিও। দুধ দিয়ে দেব।'

'হেই ভালা। তাইলে অহন যাই। পন্নাম সাহেব, পন্নাম জামাইবাবু, নাতিবাবু—' বুধাই পাল চলে গেল।

বুধাই পালের পর ডাক পড়ল সোনা মিঞার, তারপর চন্দ্র ভুঁইমালীর, তারপর রজবালি তালুকদারের। এইভাবে একের পর এক রোগী দেখা চলল।

বুক-পেট পরীক্ষা করতে করতে শুধু রোগ সম্বন্ধেই খোঁজখবর নিচ্ছেন না লারমোর, অন্য কথাও বলছেন। রজবালিকে তিনি হয়তো বললেন, 'এবার কত কানি (চার বিঘেতে এক কানি) জমিতে

পাট বুনেছিলি?'

রজবালি জবাব দিল, 'আড়াই কানি।'

'গেল বার তো পাট বুনে লোকসান দিয়েছিলি। এবার লাভ থাকবে?'

'মনে তো লয় (হয়)। অহন খোদার ইচ্ছা।'

'হ্যাঁ। তাঁর ইচ্ছা ছাড়া কী আর হয় বল—'

চন্দ্র ভুঁইমালীকে হয়তো বললেন, 'এবারের বর্ষায় তোমার দক্ষিণের ভিটের ঘরখানা না পড়ে গিয়েছিল চন্দর?'

'হ।' চন্দ্র মাথা নাড়ে।

'সেটা উঠিয়েছ?'

'আপনেগো আশীব্বাদে উঠাইছি লালমোহন সাহেব। আগে চালে আছিল ছন, এইবার টিন দিছি—নয়া ঢেউ-খেলাইনা (ঢেউ-খেলানো) টিন। খুব পোক্ত হইছে ঘর।'

'খুব ভাল, খুব ভাল।'

'একদিন গিয়া দেইখা আইসেন সাহেববাবা। হ্যামকত্তারেও কইছি পায়ের ধূলা দিতে।'

'যাব যাব, নিশ্চয়ই যাব। হেমকে নিয়ে একদিন তোমার নতুন ঘর দেখে আসব।'

অসুখ আর অসুখের বাইরে অন্য সব কথার ফাঁকে রোগীরা অবনীমোহন এবং বিনুর সঙ্গে যেচে আলাপ করে নিচ্ছে। হেমনাথের জামাই আর নাতি শুনে তাদের কী আনন্দ আর সমাদর!

দেখতে দেখতে ভিড়টা ফাঁকা হয়ে গেল। এখন আর একটিও রোগী নেই। বিনু লক্ষ করেছে, রোগী দেখে একটা পয়সাও নেন নি লারমোর। বরং বিনা পয়সায় সবাইকে ওষুধ দিয়েছেন, কারোকে কারোকে পথ্যের জন্য ফতুয়ার পকেট থেকে পয়সা বার করে দিয়েছেন। বিনুর মনে হল, একেই সেদিন লাভের কারবার বলে ঠাট্টা করেছিলেন হেমনাথ।

ওদিকে অবনীমোহনও অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি এবার বললেন, 'আপনি তো দেখলাম ওই রোগীদের সবাইকে চেনেন।'

লারমোর হাসলেন, 'চিনি বৈকি।'

'নামও জানেন।'

'জানাই উচিত। চল্লিশ বছরের মতো এখানে কেটে গেল।' বলতে বলতে চোখের মণিতে যেন ঘোর লেগে গেল লারমোরের, 'যখন এসেছিলাম তখন আমি যুবক, আর আজ বৃদ্ধ।'

লারমোর যা বলে গেলেন, সংক্ষেপে এইরকম। রাজদিয়াকে ঘিরে ষাট সত্তর মাইলের ভেতর যত গ্রাম, যত জনপদ, যত মানুষ, এমনকি প্রতিটি বৃক্ষলতা আর পাখি—সব, সব তাঁর চেনা। এই সজল বিশাল ভূখণ্ডে আয়ুর প্রায় সবটুকুই তো কাটিয়ে দিলেন। এখানে কোথায় কোন বাড়িতে শিশু জন্মাচ্ছে, কোথায় কার মৃত্যু ঘটছে—সমস্তই জানেন লারমোর। জন্ম-মৃত্যু, কোনও কিছুই তাঁর আগোচরে হবার উপায় নেই। পূর্ব বাংলার এই স্নিগ্ধ, মনোরম অংশের ওপর তিনি ব্যাপ্ত হয়ে আছেন।

কথা বলতে বলতে আকাশের দিকে চোখ পড়তেই হঠাৎ ঘোরটা কেটে গেল। লারমোর চঞ্চল হলেন, 'ইস, বেলা হেলে গেল! এখনও হেমের দেখা নেই।'

সত্যি সত্যিই সূর্যটা এখন আর মধ্যাকাশে নেই, পশ্চিমের আকাশ বেয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে খানিকটা নেমে গেছে। রোদের রং গেছে বদলে। তাতে নরম সোনালি আভা লেগেছে। ফলে চারদিকের গাছপালার পাতা সোনার ঝালর হয়ে দুলছে।

আকাশ থেকে চোখ নামিয়ে লারমোর বললেন, 'হেমের একটা খোঁজখবর নেওয়া দরকার। কোথাও বসে গেলে উঠবার নাম নেই তার।' বলতে বলতে বিনুর সম্বন্ধে সচেতন হলেন, 'আরে, দাদভাইটার মুখ একেবারে শুকিয়ে গেছে। শুকোবার কথাই। সেই কখন দু'টি খেয়ে এসেছে! এই যুগল, চট করে দাদাভাইয়ের জন্যে রসগোল্লা আর সন্দেশ নিয়ে আয়। মনা ঘোষের দোকান থেকে আনবি।' পয়সা বার করতে পকেটে হাত পুরলেন লারমোর।

এতক্ষণ দুই হাঁটুর ফাঁকে মুখ গুঁজে চুপচাপ বসে ছিল যুগল, বলামাত্র তড়াক করে লাফিয়ে উঠল। আর সত্যিই খুব খিদে পেয়েছিল বিনুর, সেটা ধরা পড়ে যাওয়াতে লজ্জায় মাথা নিচু করে থাকল সে।

লারমোর কিন্তু পয়সা বার করতে পারলেন না। তার আগেই বাধা পড়ল। অবনীমোহন বললেন,

'খাবার আনতে হবে না। আমি বরং বিনুকে খাইয়ে আনি, যুগলও সঙ্গে যাক।'

'তুমি আবার কষ্ট করে যাবে কেন?'

'কষ্ট কিছু না। আসলে—'

লারমোর জিজ্ঞাসু চোখ তাকালেন, 'কী?'

অবনীমোহন বললেন, 'পূর্ব বাংলায় এই প্রথম এলাম। এখানকার হাট টাট কিছুই তো দেখি নি। বিনুকে খাওয়াতে গিয়ে হাটটা ঘুরে দেখব।'

লারমোর উৎসাহের সুরে বললেন, 'খুব ভাল। রোগীর কাছে বসে না থেকে একটু ঘুরেই এস।'

'তা ছাড়া—'

'কী?'

'ঘুরতে ঘুরতে যদি মামাবাবুর সঙ্গে দেখা হয়ে যায়—'

'তবে তো আরও ভাল। যাও—যাও—'

একটু ভেবে অবনীমোহন বললেন, 'আপনিও চলুন না লালমোহন মামা—'

লারমোর বললেন, 'আমি কী করে যাব?'

'আপনার রোগী-টোগী তো এখন নেই।'

'তা নেই। কিন্তু যে কোনও সময় এসে যেতে পারে। এত দূর দূর জায়গা থেকে ওরা আসে। দু'দিন পর পর এখানে হাট। আমাকে না পেলে ওদের কত কষ্ট হবে বল তো?'

দু'চোখে অসীম শ্রদ্ধা নিয়ে সেবাব্রতী, নিঃস্বার্থ মানুষটির দিকে তাকিয়ে থাকলেন অবনীমোহন। অনেকক্ষণ পর ধীরে ধীরে বললেন, 'কতক্ষণ এখানে থাকবেন?'

'সেই সন্ধে পর্যন্ত। হাট ভাঙলে উঠব।'

'আপনিও তো সেই সকালবেলা নৌকোয় আসতে আসতে মামীমার দেওয়া চিঁড়ে টিরে খেয়েছেন। আমি কিন্তু আপনার খাবার নিয়ে আসব।'

লারমোর মধুর হাসলেন, 'বেশ তো, এনো।'

অবনীমোহন আর কিছু বললেন না, বিনু আর যুগলকে নিয়ে হাটের দিকে চললেন।

আগে আগে চলেছেন অবনীমোহন, পেছনে যুগল আর বিনু।

একটু পর সবাই সেই পুরনো আধভাঙা মন্দিরটার সামনে এসে পড়ল। ঘাড় ফিরিয়ে অবনীমোহন জিজ্ঞেস করলেন, 'এটা কিসের মন্দির যুগল?'

যুগল বলল, 'বিষহরির।'

বিনু বুঝতে পারে নি। সে তাড়াতাড়ি শুধলো, 'বিষহরি কী?'

'মা মনসা।' যুগল বলতে লাগল, 'আইতেন শাবণ মাসে, দেখতেন এইহানে পূজার কী ধুম! রাইজ্যের মানুষ উই সোময়টায় পাথরের খাদা-ভরা (পাথরের বাটিভর্তি) দুধ আর সবরি কলা নিয়া ভাইঙ্গা পড়ে।'

মন্দিরের পর খানিকটা জঙ্গল মতো। ছোট বড় ক'টা তেঁতুল গাছ, বুনো কচুর ঝাড়, ইত্যাদি ইত্যাদি। তারপর থেকেই হাটের চালা শুরু হয়েছে।

আশ্বিন মাসের এই পড়ন্ত বেলায় রোদের তাপ দ্রুত জুড়িয়ে আসছে। চারদিকের গাছগাছালির মাথায় সোনালি আভা লেগেছে। এই সময় সুজনগঞ্জের হাট জমে উঠেছে। দরাদরি, হইচই আর চিৎকারে চারদিক সরগরম।

বিনুরা এখন হাটের যে অংশে এসেছে সেটা তরিতরকারির বাজার। চারদিকে বড় বড় বেতের ধামা আর বাঁশের চাঙারিতে সজীব, পরিপুষ্ট শাক এবং আনাজ সাজানো। ব্যাপারিরা সবাই চাষী শ্রেণীর মানুষ।

যেতে যেতে একটা ব্যাপারির সামনে দাঁড়িয়ে পড়লেন অবনীমোহন। বললেন, 'তোমার বেগুন কত করে?

লোকটা বলল, 'দ্যাড় পহা স্যার (সের)।'

অবনীমোহন অবাক, 'দেড় পয়সা!'

'হ, তয় আপনে যদিন এক পাসারি কিনেন তিন পহায় দিয়া দিমু।'

'পাসারি কী?'

'আড়াই স্যার।'

'আড়াই সের বেগুন তিন পয়সা। বল কী!'

'দর নি বেশি কইলাম বাবু? তাইলে এক পাসারি দুই পহাই দিয়েন।'

'এত শস্তা!'

ব্যাপারি লোকটা মুসলমান। বিস্ময়-ভরা চোখে ভাল করে অবনীমোহনকে দেখে নিয়ে বলল, 'এরেই শস্তা কইলেন বাবু!'

অবনীমোহন হতবাক, 'শস্তা নয়!'

'উঁহু। গেল সন এই আশ্বিন মাসে পহায় দুই স্যার বাগুন বেচছি। আইজ হেই বাগুনের পাইকারি দর উঠছে পহা পহা স্যার। দিনকাল যে কী পড়ল। হাটখান ঘুইরা দ্যাখেন, জিনিসপত্তরে আর হাত দ্যাওন যায় না। হগল কিছু আক্কারা, এক্কেরে আগুন।'

অবনীমোহনের বিস্ময় বাড়ছিলই। বললেন, 'গেল বছর পয়সায় দু'সের বেগুন ছিল!'

'তয় আর কই কী।' ভাল করে অবনীমোহনকে আরেক বার দেখে নিয়ে বেগুন ব্যাপারি বলল, 'বাবু নিয্যস আমাগো এইদিকে থাকেন না?'

'না।'

'আমিও হেই ভাবছি। এইহানের হইলে পহায় দুই স্যার বাগুন শুইনা আটাশ যাইতেন না (অবাক হতেন না)। বাবু থাকেন কই?'

'কলকাতায়।'

'কইলকাতার মাইনষের কথাই ভেন্ন।'

'কেন?'

'দশ পহা স্যার বাগুন হইলেও তাগো কাছে শস্তা। এক এক পূজায় তেনারা কইলকাতার থিকা আসে আর এইহানে জিনিসপত্তরের দাম চেইতা (চড়ে) যায়।' বলতে বলতে ব্যাপারি একটু থামল। তারপরেই কী ভেবে ডাকল, 'আইচ্ছা বাবু—'

'কী?'

'শুনছি কইলকাতায় নি পহা দিয়া মাটি কিনতে হয়!'

হেসে অবনীমোহন মাথা নাড়লেন।

দু'ধারে হাটের চালা, মাঝখান দিয়ে আঁকাবাঁকা সরু পথ। যেতে যেতে চোখের সামনে যা পড়ছে—মানকচু, মেটে আলু, পটল, শুকনো লঙ্কা, নতুন আউশ চাল, মিঠে কুমড়ো—সব কিছুর দর করছেন অবনীমোহন। ব্যাপারটা তাঁর কাছে যেন মজার খেলা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই উনিশ শ' চল্লিশ সালে চারদিকে যখন দুর্মূল্যের আঁচ লাগতে শুরু করেছে তখন কলকাতা থেকে কয়েক শ' মাইল দূরে পূর্ব বাংলার সজল শ্যামল ভুবনটিতে সমস্ত কিছুই আশ্চর্য রকমের সুলভ। এত প্রাচুর্য এমন সুলভতা আগে আর কখনও দেখেন নি অবনীমোহন। জীবনে এ এক বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা তাঁর।

এদিকে খিদেটা অনেকক্ষণ আগেই পেয়েছিল বিনুর। অবনীমোহনের পিছু পিছু ঘুরতে ঘুরতে পেটের ভেতরটা জ্বালা করছে। আর চলতে পারছিল না সে। তাকে খাওয়ানো এবং হেমনাথকে খুঁজে বার করবার জন্যই লারমোরের কাছ থেকে উঠে এসেছিলেন অবনীমোহন। জিনিসপত্রের দর করতে করতে এমন মজা পেয়ে গেছেন যে খিদের কথা খুব সম্ভব আর খেয়াল নেই তাঁর।

একসময় বিনু আস্তে করে ডাকল, 'বাবা—'

অবনীমোহন চলতে চলতে দাঁড়িয়ে পড়লেন। পেছন ফিরে বললেন, 'কী রে?'

pathagar.net

'বড্ড খিদে পেয়েছে।'

এবার মনে পড়ে গেল অবনীমোহনের। খুব ব্যস্ত হয়ে পড়লেন তিনি, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই তো। আমি একদম ভুলে গেছলাম।' বলেই যুগলের দিকে তাকালেন, 'মিষ্টির দোকান কোথায় রে?'

নদীর দিকে আঙুল বাড়িয়ে যুগল বলল, 'উই দিকে—'

'নিয়ে চল তো।'

নদীর শিয়রে যেখানে মাঝিঘাট, তার একধারে সারি সারি হোগলার ছাউনিওলা অস্থায়ী মিষ্টির দোকান। পেতলের গামলা ভর্তি ধবধবে রসগোল্লা, বড় বড় কাঠের বারকোশে লম্বা লম্বা বাদামী চমচম, পাতক্ষীর আর মাখা-সন্দেশ সাজানো রয়েছে। প্রথম দিন পূর্ব বাংলার মাটিতে পা দিয়ে রাজদিয়ার স্টিমারঘাটে এই রকম মিষ্টির দোকান দেখেছিল বিনু।

কাছাকাছি আসতে চারদিক থেকে দোকানিরা ডাকাডাকি করতে লাগল, 'এই দিকে আসেন বাবু, এই দিকে—'

সামনে যে দোকানটা পাওয়া গেল, বিনুদের নিয়ে অবনীমোহন সেখানেই ঢুকে পড়লেন।

দোকানি লোকটা মধ্যবয়সী। পরনে আধময়লা খাটো ধুতি আর ফতুয়া। গলায় তিন লহর তুলসীর মালা। চোখে মুখে বিনীত ভঙ্গি। সে বলল, 'বসেন বাবুরা, বসেন—'

দোকানের ভেতরে দু'খানা বেঞ্চি পাতা ছিল। অবনীমোহনরা বসলেন।

দোকানি এবার শুধলো, 'কী দিমু বাবু?'

অবনীমোহন বিনু আর যুগলের দিকে তাকালেন, 'কী খাবি রে তোরা?'

বিনু কিছু বলবার আগেই যুগল তার কানে ফিসফিস করল, 'তমন্ত দিন রৈদে (রোদে) ঘুরাঘুরি গ্যাছে ছুটোবাবু। রসগোল্লা পানিতুয়া খাওনের আগে ইট্টু মাঠা খাইয়া লন।'

অবনীমোহন শুনে ফেলেছিলেন। বললেন, 'মাঠা কী?'

যুগল লজ্জা পেয়ে চুপ করে থাকল। বিনুকে বলেছে বটে, তার নিজের মনেও কি মাঠার জন্য একটু লোভ ছিল না?

যুগলের হয়ে দোকানিই জবাব দিল, 'মাঠা হইল দইয়ের ঘোল।'

অবনীমোহন উৎসাহিত হলেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, আগে মাঠাই দাও—'

খুব ভাল করে তিনটে বড় বড় কাচের গেলাস ধুয়ে ননীভরা সাদা ধবধবে ঘোলে ভর্তি করল দোকানি। বিনুদের দিতে দিতে বলল, 'খান বাবুরা, পরে মাখম দিমু।'

ঘোলের গেলাস শূন্য হয়ে গেলে দোকানদার কলার পাতায় করে সবার হাতে এক দলা করে মাখন দিল।

অবনীমোহন বললেন, 'আবার মাখন কেন? মিষ্টিই তো খাব—'

'মাঠা আর মাখম আমরা একলগেই দেই। হের লেইগা পুছা লাগে না।'

মাঠা-মাখনের পর কিছু রসগোল্লা আর চমচম নিলেন অবনীমোহনরা। দু'একটা খাওয়া হলে দোকানি শুধলো, 'মিঠাই ক্যামন লাগল বাবু?'

অবনীমোহন বললেন, 'চমৎকার। তোমার দোকান কতদিনের?'

'অনেক বচ্ছরের। জ্ঞান হওয়া ইস্তক এই কামই করতে আছি। এইটা আমাগো জাইত-ব্যবসা।'

'সুজনগঞ্জের হাটেই দোকানদারি কর?'

'আইজ্ঞা না।' দোকানি হাসল, 'হপ্তায় তো এইখানে মোটে তিনদিন হাট। তিনদিনের বিকিকিনিতে কি সোংসার চলে বাবু?'

'তবে?'

'আইজ সুজনগুঞ্জ, কাইল গিরিগুঞ্জ—এইভাবে হপ্তায় হগল দিনই কুনোখানে না কুনোখানে হাট থাকে। নানান খানে ঘুইরা দোকানপাতি করি।'

অবনীমোহন বললেন, 'এই সব মিষ্টি কোথায় তৈরি করেছ? এখানে তো কোনওরকম সরঞ্জাম দেখতে পাচ্ছি না।'

দোকানি বলল, 'মিঠাই বানাই বাড়িতে। হাট থিকা বাইতে বাড়িত্ গিয়া বানাইতে বসি। পরের

দিন সকালে হেই হগল নায়ে তুইলা হাটে যাই।'

অবনীমোহনের মনে হল, এই সুলভ প্রাচুর্যের দেশেও কারোর কারোর জীবনযাত্রা রীতিমতো কষ্টকর। তিনি বললেন, 'দিনরাত্রি তোমাকে তো বেশ খাটতে হয়।'

'হ বাবু—' দোকনদার হাসল, 'না খাটলে প্যাট চলব ক্যামনে?'

একটু চুপ করে থেকে অবনীমোহন বললেন, 'তা তো ঠিকই।'

খাওয়া হলে লারমোর আর হেমনাথের জন্য দু'টো ছোট মাটির হাঁড়িতে মিষ্টি নিলেন অবনীমোহন। হাঁড়ি দু'টো যুগলের হাতে দিয়ে দাম মিটিয়ে দিতে দিতে বললেন, 'আলাপ টালাপ হল, তোমার নামটাই জানা হয় নি।'

দোকানি বলল, 'আমার নাম হারান ঘোষ। হাটে আইলে আমার দোকানে আবার আইবেন বাবু।'

'আসব।'

'পন্নাম বাবু—'

'নমস্কার।'

মিষ্টির দোকান থেকে বেরিয়ে নদীর পাড় ধরে ধরে অবনীমোহন হাঁটতে লাগলেন। বিনু দেখতে পেল, হাটের তলার সেই মাঝিঘাটে আরও অসংখ্য নৌকো এসে জমেছে। নৌকোয় নৌকোয় নদীর জল দেখা যাচ্ছে না। মাঝিঘাটের মাথায় খয়েরি রঙের চিল উড়ছে—ঝাঁকে ঝাঁকে, শ'য়ে শ'য়ে।

একটু পর নদীর পাড় থেকে হাটের ভেতর ঢুকে পড়ল সবাই। অবনীমোহন আবার দর শুরু করে দিলেন। যে জিনিসটি চোখের সামনে পড়ছে, ছেলেমানুষের মতো একবার হাতে তুলে দাম জেনে নেওয়া চাই তাঁর।

মানুষের স্রোতে লক্ষ্যহীনের মতো কিছুক্ষণ ঘুরবার পর বিনু ডাকল, 'বাবা—'

'কী রে?' অবনীমোহন অন্যমনস্কের মতো উত্তর দিলেন।

'বিকেল হয়ে গেল। দাদুকে খুঁজে বার করবে না?'

'তাই তো। চল—চল—' বলতে বলতে যুগলের দিকে ফিরলেন, 'হ্যাঁ রে যুগল, নিত্য দাসের দোকানটা কোন দিকে?'

'অহনই যাইবেন?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, এখনই।'

ভিড়ের ভেতর দিয়ে পথ করে বিনুদের নিয়ে নদীর আরেক ধারে এসে পড়ল যুগল। এখানে সারি সারি ধান চালের আড়ত। সেগুলোর ছাউনি মজবুত টিনের, বেড়াও টিনের, গায়ে শাল কাঠের শক্ত খিলান। রীতিমতো স্থায়ী বন্দোবস্ত।

আড়তগুলো ঠিক নদীর ধার ঘেঁষে। তার ঠিক তলাতেই বড় বড় হাজারমণী পাঁচশ'মণী মহাজনী নৌকো অগণিত মাস্তুল আকাশের দিকে তুলে দাঁড়িয়ে আছে।

দেখা গেল, একটা আড়তের সামনে খোলামেলা খানিকটা জায়গা। সেখানে বড়সড় একখানা চেয়ারে বসে আছেন হেমনাথ, আর তাঁকে ঘিরে অনেক মানুষ ঘন হয়ে বসে আছে। দেখেই টের পাওয়া যায়, লোকগুলো সুজনগঞ্জের দোকানি এবং আড়তদার। তাঁদের ভেতর গভীর কোনও পরামর্শ চলছিল।

বিনু ছুটে হেমনাথের কাছে চলে গেল। এতক্ষণ বিনুদের কথা খুব সম্ভব খেয়ালই ছিল না। একটুক্ষণ অবাক থেকে তিনি বললেন, 'দাদাভাই, তুই এখানে!' তারপরেই বুঝিবা সব মনে পড়ে গেল, 'যুগল কোথায়?'

বিনু দেখিয়ে দিল, 'ওই তো—'

ঘাড় ফেরাতেই যুগলকে দেখতে পেলেন হেমনাথ। খুব রেগে দিয়ে বললেন, 'এই হারামজাদা, হাটে আসতে এত দেরি করলি কেন? গিয়েছিলি কোথায়?'

ভয়ে ভয়ে যুগল বলল, 'ছুটোবাবুরে নিয়া আমি তো অনেকক্ষণ আইছি।'

'অনেকক্ষণ এসেছিস তো, ছিলি কোথায়?'

কোথায় ছিল, যুগল বলল।

এবার অবনীমোহনের দিকে চোখ পড়ল হেমনাথের। বললেন, 'যুগল সত্যি কথা বলছে অবনী?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ—' অবনীমোহন মাথা নাড়লেন। তারপর সামনের দিকে এগিয়ে এলেন।

যে লোকগুলো হেমনাথকে ঘিরে বসে ছিল, অবনীমোহনদের দেখে তারা কৌতূহলী হয়ে উঠেছে। মুখে অবশ্য কিছু বলছে না, দৃষ্টি কিন্তু অত্যন্ত উৎসুক। হেমনাথ তাদের মনের কথা যেন পড়তে পারলেন। বললেন, 'এরা আমার জামাই আর নাতি। দিন দুই হল কলকাতা থেকে এসেছে।'

বলার সঙ্গে সঙ্গে দু'খানা চেয়ার এসে গেল। বিনু আর অবনীমোহন বসলেন। রাজদিয়ায় পা দেবার পর থেকে যে যত্ন, যে সমাদর আর মর্যাদা পেয়ে আসছেন, এখানেও তাই পেলেন অবনীমোহনরা। সেই এক মনোরম অভিজ্ঞতা।

সবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার পর হেমনাথ অবনীমোহনকে বললেন, 'তোমরা একটু বোসো অবনী। এদের সঙ্গে একটা কথা হচ্ছিল, সেটা সেরে নিই।'

অবনীমোহন বললেন, 'আচ্ছা—'

হেমনাথ এবার চারধারের লোকগুলোর দিকে তাকালেন, 'তা হলে ওই কথাই পাকা তো?'

সবাই সমস্বরে বলল, 'নিয্যস পাকা। আপনে যা কইবেন বড়কত্তা, তার উপুর কুন শালায় রাও (শব্দ) করব?'

হেমনাথ বললেন, 'না না, যদি কোনওরকম আপত্তি বা অনিচ্ছা থাকে, নিশ্চয়ই বলবে। এখন আরেক বার সবাই শুনে নাও। হাটের পুজোয় আড়তদারেরা পাঁচ টাকা করে চাঁদা দেবে, আর দোকানিরা দেবে আট আনা করে। চাঁদা তুলবার ভার নেবে হরিপদ মহেন্দ্র প্রাণবল্লভ নিবারণ বিনোদ—এই পাঁচজন। কে কী করবে তা ঠিক করে দেবে নিত্য দাস।'

সকলে মাথা পাড়ল, 'হ হ, এইর থিকা ভাল ব্যবোস্তা আর কিছু হয় না।'

হেমনাথ বললেন, 'ভাল করে ভেবেচিন্তে দেখ, কারোর কিছু বলবার আছে কিনা—'

চারদিকের ভিড়টা হইচই করে উঠল, 'না, আমাগো কিছু কওয়ার নাই।'

একটুক্ষণ নীরবতা। বোঝা গেল, দুর্গাপুজোর ব্যাপারে পরামর্শ-সভা বসেছে। হাটে আসার সময় এর ইঙ্গিত দিয়েছিলেন হেমনাথ।

এক সময় কে যেন বলে উঠল, 'হুদা (শুধু) দুগ্‌গা পুজাই হইব বড়কত্তা? অন্য বচ্ছরের লাখান আর কিছু হইব না?'

'আর কী?' জিজ্ঞাসু চোখে তাকালেন হেমনাথ।

লোকটা বলল, 'দরিদ্র নারাণের স্যাবা (সেবা) করলে ক্যামন হয়?'

হেমনাথ উৎসাহের সুরে বললেন, 'খুব ভাল কথা। পুজো হবে, ধুমধাম হবে, আর গরিবেরা দু'টো খেতে পাবে না, তাই কখনও হয়?'

লোকটা বলল, 'চাউল ডাইল যা লাগে আমি দিমু।'

হেমনাথ বললেন, 'তোমার উপযুক্ত কথাই বলেছ নিত্য দাস।'

এই তা হলে নিত্য দাস। লোকটার বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। ছোটখাটো মজবুত চেহারা। পরনে ধুতি আর মোটা কাপড়ের নিমা (একজাতীয় জামা)। লোকটার চোখেমুখে, সর্বাঙ্গে বিনয় এবং স্নিগ্ধতা মাখানো।

হেমনাথের কথায় কী প্রেরণা ছিল, কে জানে। আরেকটা লোক বলল, 'মশল্লাপাতি আর আনাজপাতির খরচ আমার।'

ভিড়ের দূর প্রান্ত থেকে অন্য একজন বলে উঠল, 'পূজা হইব আর এক রাইত যাত্রা হইব না? হগল বারই হয় কিলাম।'

হেমনাথ ভিড়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোমাদের কী মত?'

সবাই বলল, 'অন্য অন্য বার যহন যাত্রা হয়, এইবারও হইব।'

'বেশ।'

কে একজন বলে উঠল, 'বরিশালের নট্ট কোম্পানির যাত্রা চাই। আর এক রাইত কবিগান।'

অন্য একজন বলল, 'এক রাইত কাচ নাচ হউক—'

আরেকজন বলল, 'এক রাইত কিলাম সারি গানও দিতে হইব বড়কত্তা—'

কাজেই স্থির হল ষষ্ঠী-সপ্তমী-অষ্টমী-নবমী, পর পর এই চার রাত যাত্রা কবিগান কাচনাচ এবং সারিগানের আসর বসবে।

শুনতে শুনতে বিনুর চোখ চকচক করতে লাগল। মনে পড়ল, যুগলও সেদিন যাত্রাপালা আর কবিগানের কথা বলেছিল। যুগল ভরসা দিয়েছিল, পুজোর সময় একদিন সুজনগঞ্জে নিয়ে আসবে। তবু দাদুকে ধরতে হবে। যাত্রা এবং কবিগানের জন্য, কাচনাচ আর সারিগানের জন্য সে উন্মুখ হয়ে আছে।

পুজোর ব্যাপারে কথা বলতে বলতে হঠাৎ কী মনে পড়ে যেতে চঞ্চল হলেন হেমনাথ। দ্রুত অবনীমোহনের দিকে ফিরে বললেন, 'বিনুদাদা তো সেই সকালবেলা চাট্টি খেয়ে বেরিয়েছে, তুমিও তাই। কিছু খেয়ে—'

তাঁর কথা শেষ হল না। তার আগেই অবনীমোহন বলে উঠলেন, 'আমরা এইমাত্র খেয়ে এসেছি। আপনার জন্যে আর লালমোহন মামার জন্যে মিষ্টি এনেছি।'

হেমনাথ বললেন, 'আমি তো বাইরে বিশেষ খাই না। বরং লালমোহনকে পাঠিয়ে দাও—'

যুগলকে দিয়ে লারমোরের কাছে মিষ্টির হাঁড়ি পাঠিয়ে দিলেন অবনীমোহন। এদিকে কে যেন বলে উঠল, 'আশ্বিনের অহন মাঝামাঝি, পূজা পড়ছে আটাইশ তারিখে। অহনও তো পরতিমা বানাইতে দেওয়া হইল না—'

হেমনাথ বললেন, 'গেল বার ঠাকুর বানিয়েছিল কে?'

'নগা পাল।'

'কোন নগা? তালতলির?'

'হ।'

'লোক পাঠিয়ে নগাকে প্রতিমা বানাতে বলে দেব।'

'তাইলে তো খুব ভালা হয়—'

আবার পুজোর কথায় মেতে উঠলেন হেমনাথ। ইতিমধ্যে লারমোরকে খাবার দিয়ে ফিরে এসেছে যুগল।

এদিকে সূর্যটাকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। পশ্চিমের গাছগাছালির ওপারে সেটা অদৃশ্য হয়েছে। সূর্য নেই কিন্তু তার শেষ আভাটুকু এখনও চারদিক ছুঁয়ে আছে। হঠাৎ-লজ্জা-পাওয়া মেয়ের মুখের মতো আকাশ এখন লাল টুকটুকে। এরই মধ্যে পাখিরা অধীর হয়ে উঠেছে, ঝাঁকে ঝাঁকে তারা ঘরে ফিরে যাচ্ছে।

বেলাশেষের নিবু নিবু রক্তিম আলোর দিকে তাকিয়ে অবনীমোহন চঞ্চল হলেন। আস্তে করে ডাকলেন, 'মামাবাবু—' হেমনাথ তাকালে বললেন, 'সন্ধে হয়ে আসছে। মামীমা কী সব কিনে নিয়ে যেতে বলেছিলেন—'

হঠাৎ অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়ালেন হেমনাথ, 'ঠিক কথা মনে করিয়ে দিয়েছ।' বলেই ভিড়টার উদ্দেশে বললেন, 'আজ আর নয়। তোমার কেউ না কেউ রোজ একটা না একটা ব্যাপারে জড়াচ্ছ, আর আমার বাড়িতে প্রত্যেক দিন গৃহযুদ্ধ বাধছে।'

সবাই একসঙ্গে বলল, 'আপনে ছাড়া আর কার কাছে যামু বড়কত্তা?'

'খুব হয়েছে। এখন চলি—'

বিদায় নিয়ে অবনীমোহনদের সঙ্গে করে হাটের মাঝখানে চলে এলেন হেমনাথ। তারপর ঘুরে ঘুরে আনাজ কিনলেন, মশলা কিনলেন, পান-তামাক কিনলেন, ধুতি টুতি কিনলেন। মাছ কিনলেন দু'রকমের। কই আর চিতল। কই মাছ কেনার সময় একটা মজার ব্যাপার ঘটল।

হেমনাথ জেলেকে বললেন,'তিন বাইশা কই দে—'

বিনু শুধলো, 'বাইশা কি দাদু?'

'বাইশা মানে বাইশ।'

কিন্তু দেখা গেল বাইশের বদলে জেলেটা তিন বার ছাব্বিশটা করে মাছ গিনল। বিনু চেঁচিয়ে

উঠল, 'দাদু লোকটা বেশি মাছ দিয়েছে—'

হেমনাথ হাসলেন,'বাইশার মানে যদিও বাইশ, তবু ছাব্বিশটা করে দেওয়া এদেশে নিয়ম।'

কথাটা মনঃপূত হল না বিনুর। বাইশের জায়গায় কেন ছাব্বিশটা মাছ দেবে, সে ভেবে পেল না।

মাছটাছ কেনা হলে সুজনগঞ্জের আরেক প্রান্তে নৌকোহাটে এলেন হেমনাথরা। বিভিন্ন চেহারা আর নামের নতুন নতুন অগণিত নৌকোর মেলা বসেছে যেন এখানে।

দেখে শুনে বিনুর পছন্দমতো একখানা নৌকো কিনলেন হেমনাথ। নৌকোটা একমাল্লাই এবং ছইওলা। সঙ্গে একটা বৈঠা আর তল্লা বাঁশের লগি পাওয়া গেল।

নৌকোর দাম চুকিয়ে হেমনাথ যুগলকে বললেন, 'তুই নৌকোটা নিয়ে নদী ঘুরে মাঝিঘাটে আয়। আমরা লালমোহনকে নিয়ে আসছি।'

হাটের সত্তদা নিয়ে যুগল নতুন নৌকোয় উঠল। আর অবনীমোহনদের নিয়ে সেই বটগাছটার দিকে হাঁটতে শুরু করলেন হেমনাথ।

অশ্বিনের সন্ধেটা যেন সরু সুতোয় ঝুলছিল। কেনাকাটা সেরে লারমোরের কাছে পৌঁছতে সুতোটা ছিঁড়ে ঝপ করে কোন পাতালে নেমে গেল।

হাটের চালায় চালায় বিকিকিনি বন্ধ হয়ে গেছে। সারা সুজনগঞ্জ জুড়ে এখন ভাঙা আসর। দরাদরি-চিৎকারের সেই একটানা ভনভনে আওয়াজটাও নেই। তার বদলে মৃদু, অবসন্ন একটা গুঞ্জন চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। সারাদিন ধরে এখানকার সুর যেন খুব চড়া একটা তারে বাঁধা ছিল। অন্ধকার নামবার সঙ্গে সঙ্গে সেটা দ্রুত স্তিমিত হয়ে যাচ্ছে।

হাটুরে লোকগুলো বেশির ভাগই মাঝিঘাটে চলে গেছে। এখানে সেখানে দু'চারজন ব্যাপারি কুপি জ্বলিয়ে পয়সা গুনছে। সারাদিনের বেচাকেনার হিসেব মিলিয়ে নিচ্ছে।

বটগাছতলায় এসে দেখা গেল, একটা রোগীও নেই। সেই মাঝিদু'টোর সঙ্গে হাত মিলিয়ে লারমোর টিনের বাক্স গুছোচ্ছেন।

হেমনাথ বললেন, 'সমস্ত দিন বনের মোষ তাড়ানো হল?'

লারমোর হাসলেন, 'তা একরকম হল। তোমার ঘোড়ার ঘাস কাটার খবর বল—'

হেমনাথ হো হো করে মনের সব ক'টি দরজা জানালা খুলে হেসে উঠলেন, 'ঘোড়ার ঘাস কাটা! বেড়ে বলেছ।' বলেই হঠাৎ হাসি থামিয়ে গভীর স্বরে বললেন, 'কিন্তু সত্যিই কি আমরা ঘোড়ার ঘাস কাটি, বনের মোষ তাড়াই লালমোহন?'

হেমনাথের কণ্ঠস্বরের গভীরতা লারমোরকে ছুঁয়ে গিয়েছিল। আস্তে আস্তে তিনি বললেন, 'না।'

একটু চুপচাপ। হেমনাথ বললেন, 'নাও, এখন চল—'

'যাবে তো, বউঠাকরুন যা যা বলে দিয়েছিল, কিনেছ? নইলে আবার হোম ফ্রন্টে লড়াই বেধে যাবে।'

'কিনেছি কিনেছি। যুগলকে দিয়ে সে সব মাঝিঘাটে পাঠিয়ে দিয়েছি। তোমার চিন্তা করতে হবে না। এখন চল।'

মাঝিঘাটে এসে মুগ্ধ হয়ে গেল বিনু। নৌকোয় নৌকোয় আলো জ্বলছে। নদীর জলে সেই আলো পড়ে ঢেউয়ে ঢেউয়ে দোল খাচ্ছে।

মাঝিঘাটে এখন ঘরে ফেরার তাড়া। একের পর এক নৌকো ছেড়ে দিচ্ছে। কাছে দূরে যেদিকে যতদূর চোখ যায়, শুধু আলোর বিন্দু। ওগুলো যে নৌকোর আলো, বিনু জানে। তবু মনে হয় ওরা যেন রহস্যময় কোনও সংকেত, নদীময় ছোটাছুটি করে কাদের যেন বিভ্রান্ত করে চলেছে।

যে নৌকোগুলো এখনও রয়েছে তাদের কোনওটা থেকে মাছের ঝোলের উগ্র গন্ধ ভেসে আসছে, কোনওটা থেকে আসছে শান্ত নামাজের সুর, কোনওটা থেকে খোল-করতাল বাজিয়ে কীর্তনের পদ। ওরা বোধহয় আজ সুজনগঞ্জেই থেকে যাবে।

হেমনাথ খুঁজে খুঁজে যুগলকে বার করলেন। দেখা গেল বুদ্ধি করে নতুন একমাল্লাই নৌকো, নিজের ছোট কোষা নৌকো আর লারমোরের নৌকো—তিনটেকে পাশাপাশি এনে রেখেছে সে।

pathagar.net

অসংখ্য নৌকোর জঙ্গল থেকে কী করে যে লারমোরের নৌকোটাকে যুগল খুঁজে বার করল, কে বলবে।

নৌকো তিনটে, বাইবার লোকও মোট তিনজন। যুগল আর লারমোরের সেই মাঝি দু'টো। স্থির হল, তিনজন তিনটে নৌকো বাইবে। যুগল বাইবে নিজের সেই কোষা নৌকোটা, মাঝি দু'জন বাকি নৌকো দু'টো।

বিনুর ইচ্ছে ছিল, ওবেলার মতো এবারও যুগলের নৌকোতেই যায়। সে কথা বলতেই হেমনাথ মাথা নাড়লেন, 'উঁহু। রাত্তিরবেলা ওই বাঁদরের সঙ্গে নৌকোয় যেতে হবে না।'

বিনুর মনে হল, হেমনাথের কণ্ঠস্বরে এমন কিছু আছে যা অমান্য করা যায় না। হেমনাথ আবার বললেন, 'এই, সবাই উঠে পড়।'

লারমোরের সেই নৌকোটায় একে একে সকলে উঠতে যাবে সেই সময় চিৎকার শোনা গেল, 'সাহেববাবা, সাহেববাবা—'

সবাই চকিত হয়ে ফিরে দাঁড়াতেই দেখা গেল, তিন চারটি মুসলমান চাষী ছুটে আসছে। তাদের একেবারে সামনে যে রয়েছে তার বয়স কম—যুবক। ছুটতে ছুটতে এসে লারমোরের পায়ের কাছে সে আছড়ে পড়ল, 'বাচান আমার বাজানরে, বাচান সাহেববাবা—'

বিব্রতভাবে লারমোর বললেন, 'কে রে, কে?'

'আমি আপনেগো গহরালি—'

লারমোর বললেন, 'কোন গহরালি রে? ওঠ—ওঠ—'

সঙ্গের মুসলমান মাঝি দু'টো একসঙ্গে বলে উঠল, 'চরবেউলার গহইরা—'

'তোরাবালি মন্ডলের ছেলে?'

'হ।'

গহরালি পা জড়িয়ে পড়েই ছিল। লারমোর ব্যস্তভাবে বললেন, 'পা ছাড় গহর। ওঠ—' বলে কাঁধ ধরে তুলবার জন্য ঝুঁকলেন।

গহরালি উঠল না। পায়ের কাছে জোর করে পড়েই থাকল। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলতে লাগল, 'আগে কথা দ্যান, বাজানেরে বাচাইবেন, নাইলে উঠুম না। পায়ে মাথা কুটুম।' বলে সত্যি সত্যি লারমোরের পায়ে মাথা ঠুকতে লাগল।

লারমোর অত্যন্ত বিব্রতভাবে বললেন, 'কী হয়েছে তোর বাজানের?'

'দুই দিন ধইরা গলা দিয়া খালি লৌ উঠতে আছে। হুশ-জ্ঞান কিচ্ছু নাই।'

এক মুহূর্ত কী ভেবে লারমোর বললেন, 'আমার পায়ের পড়ে থাকলে তো বাপের রোগ সারবে না। উঠে দাঁড়া।' হেমনাথের দিকে ফিরে বললেন, 'তোমাদের সঙ্গে এখন আর যাওয়া হল না হেম। গহরালিদের সঙ্গে চরবেহুলা ছুটতে হবে।'

হেমনাথ মৃদু হাসলেন, 'সে আমি বুঝেছি।'

লারমোর বললেন, 'বউঠাকরুনকে বুঝিয়ে বোলো, আজ আর তাঁর হাতের রান্না খাওয়া হল না। ফিরে এসে খাব।'

হাতজোড় করে হেমনাথ বললেন, 'মাপ কর ভাই। তোমার বউঠাকরুনের ব্যাপারে আমি নেই। অধু ধধু গলা বাড়িয়ে কোপ খেতে যাব কোন সাহসে? ফিরে এসে তুমিই বুঝিয়ে বোলো।'

সবাই হেসে ফেলল। হাসতে হাসতে লারমোর বললেন, 'আচ্ছা তাই হবে। খুব বন্ধু হয়েছিলে। বিপদে পড়লে উদ্ধার করতে পার না!'

হেমনাথ হাসলেন। বললেন, 'ফিরছ কবে?'

'চার পাঁচ দিনের আগে নিশ্চয়াই না। দেরিও হতে পারে। চরবেহুলায় যেতেই তো লাগবে একদিন,

pathagar.net

ফিরতে আরেক দিন। দু'টো দিন পথেই কাটবে। তারপর তোরাবালির অবস্থা বুঝে বেশিদিন থাকা না-থাকা নির্ভর করছে।'

'তা বটে। যেতে যখন হবে, আর দেরি কোরো না।'

এদিকে গহরালি পা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছিল। লারমোর তাকে বললেন, 'তোদের সঙ্গে নৌকো আছে?'

'আছে।'

'ভালই হয়েছে। ওই বাক্স দু'টো নিয়ে চল—' যে বাক্স দু'টোয় ওষুধপত্তর ইঞ্জেকশন স্টেথোসকোপ ইত্যাদি আছে তা দেখিয়ে দিলেন লারমোর।

গহরালিরা বাক্স মাথায় তুলে নিল।

লারমোর হেমনাথদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'চলি হেম, চললাম অবনী, চলি রে দাদাভাই—'

অবনীমোহন বললেন, 'আসুন।'

হেমনাথ বললেন, 'এস। সাবধানমতো থেকো। বেশি অনিয়ম টনিয়ম কোরো না। তোমার তো আবার নিজের সম্বন্ধে খেয়াল কম।'

বিনু কিছু বলল না।

নীরব হেসে গহরালিদের সঙ্গে মাঝিঘাটের দূর প্রান্তে চলে গেলেন লারমোর।

কোথায় চরবেহুলা, কে বলবে। চর শব্দটা বিনুর অজানা নয়। চারদিকে অসীম অথৈ জলের মাঝখানে উন্মনা ভুঁইচাঁপাটির মতো চরবেহুলা কোথায় ফুটে আছে, বিনু জানে না।

লারমোর বলেছিলেন, পুরো একটি দিন লাগে সেখানে যেতে। তার মানে আসছে কাল সন্ধেবেলা তিনি চরবেহুলা পৌঁছবেন। বিনু কোনওদিন চর দেখে নি। নদীর মাঝমধ্যিখানে উত্থিত এক টুকরো ভূমির জন্য সে উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছে। লারমোর অবশ্য সঙ্গে নিতেন না, অবনীমোহন আর হেমনাথও যেতে দিতেন না, তবু চরবেহুলায় যাবার জন্য একবার বায়না ধরলে হত।

আগেই ঠিক করা ছিল, যুগল আর সেই মাঝি দু'টো অর্থাৎ তিনজন তিনখানা নৌকো বাইবে। যুগল একটা নৌকোয় উঠে পড়েছিল। লারমোরের নৌকোর সেই মাঝি দু'টো পাড়ের মাটিতে দাঁড়িয়ে। তাদের দিকে তাকিয়ে হেমনাথ বলে উঠলেন, 'আর দাঁড়িয়ে থেকে কী হবে? নৌকোয় উঠে আলো জ্বাল।

মাঝি দু'টো দুই নৌকোয় উঠে হেরিকেন জ্বালল। হেমনাথরা উঠতে যাবেন, সেই সময় একটা ডাক দূর থেকে ভেসে এল, 'হেই—হেই মাঝি—ই—ই—ই—'

হেমনাথ থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। দেখাদেখি অবনীমোহন আর বিনুও দাঁড়াল।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। ছুটতে ছুটতে যারা সামনে এসে পড়ল, তাদের সঙ্গে যে আরেক বার দেখা হয়ে যাবে, বিনু কল্পনাই করতে পারে নি। সেই লোকটা, দুপুর বেলা বটগাছের কাছে দাঁড়িয়ে যে ঢেঁড়া দিয়েছিল সে আর দামড়া মোষের মতো তার দুই বাবরিওলা ঢাকী এসেছে। ঢাকী দু'টো এখন খালি গায়ে নেই, লম্বা ঝুলের কুর্তামতো হাফশার্ট পরেছে। অবাক বিস্ময়ে বিনু তাদের দিকে তাকিয়ে থাকল।

দেখা গেল, তালগাছের মতো ঢ্যাঙা চেহারার ঢেঁড়াদার লোকটা হেমনাথকে চেনে। সে বলল, 'হ্যামকত্তায় নিকি? আন্ধারে দুর থিকা ঠাওর করতে পারি নাই।' বলে ঝুঁকে হেমনাথকে প্রণাম করল। দেখাদেখি বাবরিওলা দু'টোও তাঁর পা ছুঁয়ে মাথায় ঠেকিয়ে উঠে দাঁড়াল।

হেমনাথ বললেন, 'হরিন্দ যে, কী ব্যাপার?'

লোকটার নাম তা হলে হরিন্দ। সে এবার যা বলল, সংক্ষেপে এইরকম। তাদের নিজেদের নৌকো নেই, অথচ নদী পাড়ি দিয়ে যেতে হবে। হেমনাথকে পেয়ে ভালই হয়েছে। হরিন্দদের ইচ্ছা হেমনাথের নৌকোয় যায়

হরিন্দ বলল, 'দয়া কইরা আপনেগো লগে যদি আমাগো ন্যান—'

'তোমরা যাবে কোথায়?'

'অচন যামু ইসলামপুর।'

'ইসলামপুর তো উত্তরে, আমরা যাব পশ্চিমে।'

হরিন্দ বলল, 'পথে অন্য নাও ধইরা নিমু। সুজনগুঞ্জ থিকা সিধা ইসলামপুরের নাও পাইলাম না।'

হেমনাথ বললেন, 'তা হলে ওঠ।'

সবাই উঠলে হেমনাথ আবার বললেন, 'দেখ বাপু, আমার নৌকোয় যাবে তাতে আপত্তি নেই। তবে একটা কথা—'

'ক'ন হ্যামকত্তা—'

'আমার একজন মোটে মাঝি। একা মানুষের পক্ষে এত লোক নিয়ে নৌকো বাওয়া তো সম্ভব নয়। তোমাদেরও বৈঠা ধরতে হবে।'

হরিন্দ তৎক্ষণাৎ বলে উঠল, 'হ হ, হেই কথা আর কইতে।' বলেই জোড়া বাবরিওলার দিকে ফিরল, 'কাগা বগা, তরা গিয়া হালে ব'।'

জোড়া মোষের মতো ওই ঢাকী দু'টোর নাম তা হলে কাগা আর বগা! অদ্ভুত নাম। বিনু এমনিতেই অবাক হয়ে ছিল, তার বিস্ময় আরো কয়েক গুণ বেড়ে গেল।

ঢাক নামিয়ে কাগা বগার একজন বৈঠা নিয়ে বসল সামনের গলুইতে, আরেকজন পেছনে। সেই মাঝিটাকে কিছুই করতে দিল না।

মাঝিটা বলল, 'আমারে আইলসা (অলস) বানাইয়া রাখবা নিকি?'

কাগা বগা একসঙ্গে বলল, 'বইয়া বইয়া অহন তুমি তামুক খাও। আমরা চইলা গ্যালে নাও বাইও।'

'দ্যাখো দেখি কান্ড! অকম্মা হইয়া বইয়া থাকতে ভালা লাগে!'

একসময় নৌকো চলতে শুরু করল।

ছইয়ের তলায় হেরিকেনের আলো ঘিরে এখন বসে আছে চারজন। বিনু হরিন্দ অবনীমোহন এবং হেমনাথ। দুই তাগড়া জোয়ান বৈঠা বাইছে। নৌকো যেন জলের ওপর দিয়ে ডানা মেলে উড়ে চলেছে।

হেমনাথ বললেন, 'এবার অনেক দিন পর এদিকে এলে হরিন্দ।'

'আইজ্ঞা—' হরিন্দ মাথা নাড়ল।

'ঢেঁড়া দিয়েছ শুনলাম।'

'আইজ্ঞা, আপনে ঢেরার জাগায় যান নাই?'

'না। একটা কাজে আটকে গিয়েছিলাম। তা কী ঢেঁড়া দিলে?'

কী ঢেঁড়া দিয়েছে, বিশদভাবে বলল হরিন্দ। শুনে মৃদু হাসলেন হেমনাথ। তাঁর চোখেমুখে কৌতুকের ছটা খেলতে লাগল।

একটু নীরবতা। তারপর হেমনাথ বললেন, 'কত বছর ধরে ঢেঁড়া দিচ্ছ যেন?'

'তা আইজ্ঞা বিশ পচিশ বচ্ছর তো হইবই।'

'জীবনটা ঢেঁড়া দিয়ে দিয়েই কাটিয়ে দিলে!'

'তা একরকম দিলাম হ্যামকত্তা—' হরিন্দ হাসল, 'ঢেরা দেওয়ার কামটা আমার জবর ভালা লাগে। এক মাইনষের কথা কত মাইনষেরে শুনাইতে পারি। এক দ্যাশের বাত্তা মুখে কইরা কত দ্যাশে লইয়া যাই। কী ভালা যে লাগে!'

হরিন্দর চোখ চকচক করতে লাগল। উত্তেজনায় খাড়া হয়ে বসল সে।

'এতে রোজগার কিরকম হয়?'

'ওই একরকম।'

'সংসার-টংসার চলে তো?'

'চলে আর কই। ঢাকীগো দিয়া থুইয়া তেমুন কিছুই থাকে না। বাপের আমলের কয়েক কানি লান জমিন আছে, তাই রক্ষা। নাইলে গুষ্টি সুদ্ধা না খাইয়া মরতে হইত।' বলে একটু থামল হরিন্দ। পরক্ষণেই আবার শুরু করে দিল, 'তয় যে এই আকাম কইরা বেড়াই, নিশা (নেশা) হ্যামকত্তা, নিশা। পাও পাইতা বইসা দুই দণ্ড যে জিরামু, চাষবাস সোংসার দেখুম—ভালা লাগে না, ভালা লাগে

pathagar.net

না। কিসে জানি হগল সোময় আমারে ছুটাইয়া নিয়া বেড়ায়। ঘরে বইতে দ্যায় না।'

হেমনাথ বললেন, 'তোমার বাড়ি তো ফরিদপুর?'

'হ।' ঘাড় কাত করল হরিন্দ, 'পালং থানা, গেরামের নাম ভোজেশ্বর। কবে কইছিলাম, আপনের মনে আছে দেখি!'

'তা আছে।' হেমনাথ হাসলেন, 'বাড়ির খবর কী? সবাই ভাল তো?'

বিব্রত মুখে হরিন্দ বলল, 'বাড়ির খবর জিগাইলে লজ্জা পামু হ্যামকত্তা।'

'কেন হে?'

'ছয় মাস বাড়ি ছাড়া। ভালা মোন্দ কিচ্ছু জানি না।'

'বড় তাজ্জবের মানুষ তুমি!'

'এই কথাহান আমার সম্পক্কে হগলেই কয়।'

হেমনাথ শুধোলেন, 'কবে দেশে ফিরছ?'

হরিন্দ জানাল, 'হে তো কইতে পারুম না। ঢেরা দিতে দিতে যদিন ফরিদপুর যাওন হয়, একবার বাড়িত্ যাইতেও পারি।'

হেমনাথ এবার অন্য প্রসঙ্গ পাড়লেন, 'তোমরা তো এখন ইসলামপুর চললে?'

'আইজ্ঞা—'

'কাল ইসলামপুরের হাট আছে। সেখানে ঢেঁড়া দেবে বুঝি?'

'আইজ্ঞা। হেইহান থিকা যামু হাসাড়া, হেরপর রসুইনা, হেরপর গিরিগুঞ্জ। এই রাইজ্যে যেইহানে যত হাটগুঞ্জ আছে, ঘুইরা ঘুইরা ঢেরা দিতে হইব।'

কী যেন ভেবে নিয়ে হেমনাথ বললেন, 'কতকাল তোমাকে দেখছি। পরের নৌকোয় ঘুরে ঘুরেই ঢেঁড়া দিয়ে বেড়ালে। নিজের নৌকো নিশ্চয়ই এখনও তোমার হয়নি?'

'হইল আর কই! তমস্ত জনমে কুনোদিন বিশ পঞ্চাশ ট্যাকা একলগে করতে পারি নাই। নাও হইব কই থিকা? পনের ট্যাকার কমে কি নাও হয় হ্যামকত্তা?'

'তা তো বটেই।' হেমনাথ আস্তে আস্তে মাথা নাড়লেন।

বড় বড় চোখ মেলে বিনু হরিন্দর দিকে তাকিয়ে ছিল। তার বিস্ময় আর কাটছে না। এই অবারিত জলের দেশে যুগযুগান্ত ধরে দিগ্বিদিকে পাড়ি দিয়ে চলেছে লোকটা, অথচ তার নিজস্ব একটা নৌকোও নেই। হেমনাথ যাবেন পশ্চিমে—সেই রাজদিয়াতে, হরিন্দরা যাবে উত্তরে। তার বিশ্বাস, রাস্তায় উত্তরগামী একটা নৌকো পেয়ে যাবেই, তাতে করে ইসলামপুর চলে যেতে পারবে।

যদি পথে নৌকো না মেলে? তবে তো ইসলামপুরে যেতে পারবে না হরিন্দ। ভাবতে গিয়ে মনে মনে চঞ্চল হয়ে উঠল বিনু।

এদিকে যার সম্বন্ধে বিনুর এত অস্থিরতা তার কিন্তু কোনওরকম দুর্ভাবনাই নেই। এত অনিশ্চয়তা, তবু পরম নিশ্চিন্তে হেমনাথের সঙ্গে কেমন গল্প জুড়ে দিয়েছে হরিন্দ।

হরিন্দ বলছে, 'আমার কথাই খালি জিগাইতে আছেন, আপনের কথা কিছুই জানা হইল না। মা-ঠাইরেন ক্যামন আছেন?'

হেমনাথ বললেন, 'ভালই।

আবার কী বলতে গিয়ে চনমনে চোখে ছইয়ের বাইরে সীমাহীন জলের দিকে তাকাল হরিন্দ। নৌকোটা এর ভেতরে সুজনগঞ্জের হাট পেছনে ফেলে অনেক দূরে চলে এসেছে। যেদিক চোখ যায়, গাঢ় অন্ধকার জল আর আকাশকে একাকার করে রেখেছে। নৌকোটা এখন কোথায়, নদীতে অথবা আশ্বিনের জলেডোবা প্রান্তরে—কে বলবে। নদী, জলপূর্ণ মাঠ ঘাট, শস্যক্ষেত্র কিংবা আকাশকে এখন আর আলাদা করে বুঝবার উপায় নেই।

তবে মাথার ওপর অগণিত স্থির আলোর বিন্দু দেখে টের পাওয়া যায় ওখানে আকাশ আর ওগুলো তারা। নীচেও চোখ পাতলে দূরে দূরে আলোর সঞ্চরণ চোখে পড়ে। বিনু জানে ওগুলো নৌকো—কোনওটা একমাল্লাই, কোনওটা কোষা, কোনওটা বা মহাজনী।

বাইরের অফুরন্ত জলের দিকে একবার তাকিয়ে হরিন্দ কাগা বগার উদ্দেশে বলল, 'হুশ রাখিস শুয়োরেরা। বাত্তি দেখলে খোজ লইস ইসলামপুরের নাও কিনা।'

কাগা বগা সমস্বরে বলল, 'আইচ্ছা।'

চোখ দু'টো আবার ছইয়ের ভেতরে নিয়ে এল হরিন্দ। বলল, 'যে কথা কইতে আছিলাম, মা-ঠাইরেন তাইলে ভালা আছেন।'

'হ্যাঁ।' হেমনাথ ঘাড় কাত করলেন।

'হেইবার, বড় তুফানের সোময় আপনেগো বাড়িত্ গেছিলাম। মা-ঠাইরনের হাতের ভাত-ব্যন্নন খাইয়া আইছিলাম। য্যান অমত্ত (অমৃত)। অহনও মুখে লাইগা আছে। কতবার ভাবছি আরেক দিন গিয়া মা-ঠাইরেনের হাতের পাক খাইয়া আসুম।'

'আজই চল না।'

'না হ্যামকত্তা, আইজ না। অন্য দিন যামু।'

হরিন্দ আর হেমনাথের কথাবার্তার ভেতর কাগা বগা নৌকো বাইতে বাইতে মাঝে মাঝে চিৎকার করছিল, 'মাঝি হে-এ-এ-এ—'

দূর দিগন্ত থেকে সাড়া ভেসে আসছিল, 'কিবা কও-ও-ও-ও—'

'নাও যায় কই?'

'সুবুইড্যার চরে।'

কখনও উত্তর আসছিল, 'রসুলপুর।' কেউ বা বলছিল, 'নবাবগুঞ্জ'। কেউ বলছিল, 'নারাণগুঞ্জ।'

এদিকে ছইয়ের ভেতর হেমনাথ তখন হরিন্দকে বলছেন, 'অন্য দিন আর গেছ! দেড় বছর পর সুজনগঞ্জে এলে। আবার ক'বছর পর এদিকে আসবে তার কি কিছু ঠিক আছে?'

এই সময় কাগা বগার চিৎকার আবার শোনা গেল, 'মাঝি হে-এ-এ-এ-এ-'

হাওয়ার স্রোতে ভাসতে ভাসতে উত্তর এল, 'কিবা কও-ও-ও-ও—'

'কাগো নাও?'

'বেবাইজাগো (বেবাজিয়াদের)।'

'যায় কই?'

'ইসলামপুর।'

ছইয়ের ভেতর হরিন্দ বোধ হয় কান খাড়া করেই ছিল। ইসলামপুরের নামটা শুনতেই হামাগুড়ি দিয়ে বাইরে চলে গেল। তারপর চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলল, 'নাও থামাও বেবাইজারা।' আলোর একটা বিন্দু দেখিয়ে কাগা বগাকে বলল, 'উইদিকে বা (বেয়ে যা)।'

হেমনাথ বললেন, 'আজ ইসলামপুর না গেলে চলত না?'

হরিন্দ বলল, 'আইজ না গ্যালে কাইলের হাট ধরতে পারুম না। ইসলামপুরের হাট আবার মাসে দুই বার। কাইলের হাট না পাইলে আবার পনর দিনের ধাক্কা।'

'তা হলে যাও।'

আলোর বিন্দুটা যত দূরে মনে হয়েছিল, আসলে কিন্তু তত দূরে না। একটু পরেই কাগা বগা একটা নৌকোর গায়ে এসে নৌকো ভেড়াল। কাছাকাছি আসতে টের পাওয়া গেল নৌকোটা বিশাল। একটাই না, পর পর অনেকগুলো। সব মিলিয়ে বিরাট এক বহর।

বড় নৌকোটা থেকে কে যেন বলল, 'নাও থামাইতে কইলেন ক্যান?'

হরিন্দ বলল, 'তোমরা ইসলামপুর যাইবা তো। আমরাও যামু। আমাগো যদি ইট্টু লইয়া যাও।'

'নিয্যস নিমু, আহেন।'

হরিন্দ এবার হেমনাথের দিকে ফিরে বলল, 'যাই হ্যামকত্তা—'

'এস।' হেমনাথ বলতে লাগলেন, 'সময় করে একবার আমাদের বাড়ি যেও।'

'যামু।' হেমনাথকে প্রণাম করে জোড়া বাবরিওলাকে নিয়ে 'বেবাইজা'দের নৌকোয় গিয়ে উঠল হরিন্দ।

কাগা বগা চলে গেছে। কাজেই সেই মাঝিটা বৈঠা নিয়ে হালে বসল। এতক্ষণ আয়েশ করে তামাক টানছিল সে।

দেখতে দেখতে বেবাজিয়াদের নৌকোগুলো গাঢ় অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

একসময় অবনীমোহন বললেন, 'অদ্ভুত মানুষ তো।'

হেমনাথ হাসলেন, 'হ্যাঁ—'

হঠাৎ বিনু বলে উঠল, 'দাদু, বেবাইজা কাকে বলে?'

অবনীমোহনও তাড়াতাড়ি বললেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, বেবাইজা কী?'

হেমনাথ বললেন, 'শব্দটা বেবাইজা না, 'বেবাজিয়া'। মানে বেদে। জিপসি।'

বিনু বই-পড়া বিদ্যে থেকে বলল, 'জিপসিরা তো হেঁটে হেঁটে বেড়ায়, তাঁবুতে থাকে। নৌকোয় করে ঘোরে নাকি?'

'দাদাভাই, এ দেশটা তো জলের দেশ। এখানে পায়ে হেঁটে ঘুরে বেড়াবে কোথায়? তাই নৌকোয় করে ঘুরতে হয়।'

বিনু আর কিছু বলল না। বার বার তার মনে হতে লাগল, হরিন্দ আর কাগা বগার মতো সে-ও যদি বেদেদের নৌকোয় নদীতে নদীতে ঘুরে বেড়াতে পারত!

অন্ধকারে আশ্বিনের পরিপূর্ণ নদী অথবা জলে-ভরা প্রান্তরের ওপর দিয়ে নৌকো চলেছে। এখন কত রাত, কে জানে। একটানা জলের আঘাতে নৌকোর তলায় ছপ ছপ শব্দ হচ্ছে।

এখন বেশ হাওয়া দিয়েছে। জলের মাঝখানে বাতাস বেশ ঠাণ্ডা, গায়ে লেগে শিরশির করছে।

সেই সকাল থেকে ঘোরের ভেতর যেন ছুটছিল বিনু। চান নেই, ভাত খাওয়া নেই, বিশ্রাম নেই। বার বছরের জীবনে গোটা একটা দিন এভাবে আর কখনও ছোটাছুটি করে বেড়ায় নি সে।

অনেক আগেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল বিনু। কিন্তু পাখি, যুগলের সেই বোন, সাঁকোর বাঁশে বসে কালো ছেলেদের বড়শি বাওয়া, সুজনগঞ্জের হাট, ঢেঁড়া-দেওয়া, লারমোরের রোগী দেখা, বুধাই পাল, হরিন্দ, দামড়া মোষের মতো তার দুই ঢাকী, মিষ্টির দোকানে বসে ধবধবে মাঠা খাওয়া, বেবাজিয়াদের বহর—অসংখ্য মানুষ আর অগণিত ঘটনা ক্লান্তির কথা তাকে বুঝতে দেয় নি। এক উত্তেজনা থেকে আরেক উত্তেজনা, এক কৌতূহল থেকে আরেক কৌতূহল তাকে অবিরাম ছুটিয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে। চোখ টান করে অপার বিস্ময়ে সে শুধু দেখে গেছে, কান পেতে শুনে গেছে।

হরিন্দরা বেবজিয়াদের নৌকোয় উঠবার পর আর বসে থাকতে পারল না বিনু। হাজারো বিস্ময় যে ক্লান্তিকে দূরে ঠেলে রেখেছিল, এবার তা লম্বা লম্বা পা ফেলে তাকে ঘিরে ফেলতে শুরু করল। হাত-পা যেন আলগা হয়ে যেতে লাগল বিনুর। জলের একটানা ছপছপানি শুনতে শুনতে একসময় ঘুমিয়ে পড়ল সে।

ঘুমের ভেতরেই বিনু টের পেল, বাড়ি ফিরেছে। ঘুমোতে ঘুমোতেই দাদুর সঙ্গে বসে খেল। খেতে খেতে দু'একবার ঝিনুকের নাম কানে এল। তখুনি তার মনে পড়ে গেল, সকালবেলা যখন সুজনগঞ্জের হাটে যায়, ঘোড়ার গাড়ি করে ঝিনুককে আসতে দেখেছে। ঘুম চোখেই আলোর ছোটাছুটি দেখল সে, স্নেহলতা-শিবানী-সুরমা আর সুধা-সুনীতির গলা শুনতে পেল। ওরা কী বলছে তা অবশ্য বুঝতে পারল না।

তারপর রাত্রিবেলা হেমনাথের কাছে শুয়ে তাঁর বুকে হাত রাখতেই বিনু টের পেল, একটা চুড়ি-পরা ছোট হাত তার হাতটাকে ঠেলে সরিয়ে দিচ্ছে।

গভীর ঘুমে ডুবে যেতে যেতে বিনুর মনে হল, কচি হাতখানা ঝিনুকের। হেমনাথের ভাগ নিয়ে ঘুমের ভেতরই কি মেয়েটা হিংসে শুরু করে দিল?

কানের কাছে মুখ এনে কোমল গলায় কেউ যেন অনেকক্ষণ ধরে কিছু বলছে। স্বরটা বিনুর খুব চেনা, কিন্তু কথাগুলো সে বুঝতে পারছে না। চোখ মেলে তাকিয়ে যে দেখবে, তেমন শক্তিটুকুও তার নেই। গভীর ঘন ঘুম আঠার মতো চোখে জড়িয়ে আছে।

গলার স্বরটা ধীরে ধীরে স্পষ্ট হতে লাগল, সেই সঙ্গে হাতে মৃদু ধাক্কা অনুভব করল বিনু। এবার তার মনে হল, কান দিয়ে চুঁইয়ে চুঁইয়ে দু'একটা শব্দ ভেতরে ঢুকছে।

অনেক কষ্টে চোখের পাতা দু'টো টেনে তুলল বিনু, আর তখনই দেখতে পেল হেমনাথ ঈষৎ ঝুঁকে তার দিকে তাকিয়ে আছেন।

এখনও ভাল করে ভোর হয় নি। ঘরের ভেতরটা আবছা। শিয়রের দিকে একটা জানালা খোলা রয়েছে। তার বাইরে যতদূর চোখ যায়, উঠোন-বাগান-পুকুর, ওপারের ধানবন—সব কিছু ঝাপসা, নিরাকার। ঝুপসি আমবাগানে আর ঢ্যাঙা সুপুরি গাছগুলোর পাতার ভেতর এখনও থোকা থোকা অন্ধকার।

চোখ মেলতেই হেমনাথ আরও একটু নীচু হলেন, 'দাদাভাই, উঠবি না?'

আধবোজা ঘুমন্ত গলায় বিনু বলল, 'কেন?'

'বা রে, ভোর হয়ে গেছে। এক্ষুনি রোদ উঠে যাবে। তার আগে সূর্যস্তব সেরে নিতে হবে না?'

রাজদিয়ায় আসার পর হেমনাথের সঙ্গে ভোরবেলায় উঠছে বিনু, নিয়মিত সূর্যবন্দনা করছে। কাল সমস্ত দিন যা ছোটাছুটি করেছে তাতে হাত-পাগুলো যেন আলগা হয়ে গেছে। বিনুর সারা গায়ে পুরো একটি দিনের ক্লান্তি মাখানো। রাত্তিরে ঘুমোতে ঘুমোতে সুজনগঞ্জের হাট থেকে রাজদিয়া ফিরেছিল সে। সেই ঘুম কাটতেই চাইছে না। বিছানা ছেড়ে উঠতে একটুও ইচ্ছা করছে না।

হেমনাথ আবার তাড়া দিলেন, 'ওঠ দাদা, তাড়াতাড়ি ওঠ—'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও এবার উঠে বসল বিনু। দু'হাতে চোখ রগড়ে রগড়ে যতখানি পারল ঘুম তাড়াল, তারপর করুণভাবে একবার বিছানার দিকে তাকাতে গিয়েই দেখতে পেল, সেই মেয়েটা পাশ ফিরে ঘুমোচ্ছে। সেই মেয়েটা যার কোঁকড়া কোঁকড়া চুল, জাপানি পুতুলের মতো মুখ, টলটলে কালো দু'টো চোখের মণি, যার নাম ঝিনুক।

বিনুর মনে পড়ে গেল, কাল ঘুমের ঘোরে দাদুর বুকের ওপর থেকে এই হিংসুটি মেয়েটাই তার হাত ঠেলে সরিয়ে দিয়েছিল।

বিনু বলল, 'ঝিনুক বুঝি কাল এখানে শুয়েছিল?'

'হ্যাঁ।' হেমনাথ মাথা নাড়লেন, 'তুই শুয়েছিলি আমার বাঁ ধারে, ঝিনুক ডান ধারে।'

অপ্রসন্ন চোখে ঝিনুকের দিকে তাকিয়ে কী বলবে ভাবতে লাগল বিনু। সেই ফাঁকে হেমনাথ বললেন, 'আর দেরি করিস না দাদু, মুখটুখ ধুতে ধুতে কিন্তু রোদ উঠে যাবে।'

নিঃশব্দে এবার বিছানা থেকে নেমে হেমনাথের পিছু পিছু ঘরের বাইরে চলে এল বিনু।

এই ভোরবেলায় ঠাণ্ডা হাওয়া দিয়েছে। এত ঠাণ্ডা, মনে হয়, আশ্বিনের সকালেই সেটা সারা গায়ে পৌষের মেজাজ নিয়ে এসেছে। বাতাসটা গায়ে লাগতে চামড়া কুঁকড়ে যাচ্ছে।

বারান্দার এক কোণে মাটির হাঁড়িতে জল আর নিমের দাঁতন ছিল। তাড়াতাড়ি মুখ ধুয়ে হেমনাথের সঙ্গে উঠোনের শেষ প্রান্তে এসে পুব দিকে মুখ করে দাঁড়াল বিনু।

এর মধ্যেই স্নেহলতা উঠে পড়েছেন। পুকুর থেকে চান সেরে এইমাত্র বাড়ি এসে ঢুকলেন তিনি এবং উঠোনে ভিজে পায়ের ছাপ আঁকতে আঁকতে উত্তরধুয়ারী ঘরের দিকে চলে গেলেন।

এ বাড়িতে স্নেহলতাই বোধহয় সবার আগে ওঠেন। ঘুম থেকে উঠবার পর কোনওদিন তাঁকে শুয়ে থাকতে দেখেনি বিনু। তার ভেতর হয় তাঁর চান সারা হয়ে যায়, নতুবা চান সেরে ভিজে কাপড়ে পুকুর থেকে ফেরেন। সূর্যোদয়ের আগেই এই কাজটি স্নেহলতার চুকিয়ে ফেলা চাই।

আজ একা স্নেহলতাই বিনুদের আগে ওঠেন নি, শিবানীও উঠেছেন। হেমনাথের আশ্রিত দু'টি বিধবাও উঠে পড়েছে।

এই মুহূর্তে শিবানী বাসি উঠোনে জলছড়া দিচ্ছেন। আর সেই বিধবা প্রৌঢ়া দু'টি তকতকে করে ঘরের পিড়া (ভিত) লেপছে।

পুব দিকটা একেবারে ফাঁকা। যতদূর চোখ যায়, সেই দিগন্ত পর্যন্ত বাধা দেবার মতো কিছু নেই, অবশ্য দু'চারটে তাল সুপুরি ঢ্যাঙা পায়ে ডিঙি মেরে অনেক উঁচুতে কী দেখবার চেষ্টা করছে। ওই টুকু বাদ দিলে সব অবারিত।

এই বিশাল ব্যাপ্তির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে চোখ বুজে হেমনাথের সঙ্গে গলা মিলিয়ে একসময় সূর্যবন্দনা শুরু করল বিনু, 'ওঁ অবাক্তসুম—'

দু'চারটে অক্ষর সবে উচ্চারণ করেছে, সেই সময় পেছন থেকে কচি গলার ডাক শোনা গেল, 'দাদু, ও দাদু—'

হেমনাথ ফিরেও তাকালেন না। তন্ময় হয়ে সূর্যস্তব আবৃত্তি করে যেতে লাগলেন।

ডাকটা আবার শোনা গেল, 'দাদু, ও দাদু, ও দাদু—' এবার কণ্ঠস্বর খুবই অস্থির, অসহিষ্ণু।

কে ডাকছে, বিনু বুঝতে পারল। চোখের পাতা অল্প ফাঁক করে একবার হেমনাথকে দেখে নিল সে। হেমনাথের চোখ আগের মতোই বোজা, আগের মতোই ধ্যানস্থ হয়ে আছেন তিনি। পেছনের ডাকটা শুনতে পেয়েছেন বলে মনে হল না।

সূর্যস্তব আওড়াতে আওড়াতে টুক করে একবার মাথা ঘুরিয়ে পেছন দিকে দেখে নিল বিনু। যা ভেবেছিল, ঝিনুক—ঝিনুকই ওখানে দাঁড়িয়ে আছে। তার চোখ কোঁচকানো, মুখ থমথমে।

এক পলক ঝিনুককে দেখে নিয়ে আবার চোখ বুজে সামনের দিকে তাকাল বিনু, এবং হেমনাথের সঙ্গে সূর্যস্তব আবৃত্তি করতে লাগল। আর পেছনে ঝিনুকের গলার সেই ডাকটা একটানা শোনা যেতে লাগল।

সূর্যবন্দনা শেষ হতে হতে আলোর আভা ফুটে গেল। সারারাত সূর্যটা কোথায় ছিল, কে জানে। দিগন্তের তলা থেকে সোনার গোল ঘটের মতো হঠাৎ লাফ দিয়ে উঠে এল। তার উদ্দেশে প্রণাম জানিয়ে হেমনাথ ঘুরে দাঁড়ালেন। বললেন, 'কি রে, অত ডাকাডাকি কেন?'

ভারী গলায় ঝিনুক বলল, 'তোমার সঙ্গে আমি কথা বলব না। কক্ষনো না, কিছুতেই না।

'কেন? কী হয়েছে?'

'না না, কথা বলব না।' বলেই দুপদাপ পা ফেলে ঘরের দিকে চলল ঝিনুক। বোঝা গেল, খুব রাগ করেছে সে।

হেমনাথের দেখাদেখি সূর্যপ্রণাম করে বিনুও ঘুরে দাঁড়িয়েছিল। এই সকালবেলায় ঝিনুকের এত রাগের কারণ সে বুঝতে পারল না। অবাক চোখে তাকিয়ে থাকল বিনু।

লম্বা পায়ে ছুটে গিয়ে ঝিনুককে ধরে ফেললেন হেমনাথ, তারপর টপ করে একেবারে কোলে তুলে নিলেন।

ঝিনুক সমানে হাত-পা ছুড়তে লাগল, 'ছেড়ে দাও, আমায় ছেড়ে দাও বলছি। তোমার কোলে আমি উঠব না, তোমার সঙ্গে কথা বলব না।'

হেমনাথ ছাড়লেন না। বরং কোলের ভেতর ঝিনুককে চেপেচুপে রেখে হেসে হেসে ছড়া কাটতে লাগলেন ঃ

'রাগ করেছেন রাগুনি,
রাঙা মাথায় চিরুনি,
বর আসবে এক্ষুনি
নিয়ে যাবে তক্ষুনি।'

pathagar.net

ঝিনুকের দাপাদাপি আর হাত-পা ছোড়া আরও বেড়ে গেল। অনেক কষ্টে বুঝিয়ে সুঝিয়ে গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে তাকে শান্ত করলেন হেমনাথ। বললেন, 'সকালবেলায় ঝিনুক দিদির এত রাগ কেন, এবার বল দিকি?'

ঝিনুক বলল, 'তুমি আমায় ডেকে তোল নি কেন?'

'কখন রে?'

'একটু আগে।'

'তখন তুই ঘুমোচ্ছিলি যে—'

কোঁকড়ানো চুল ঝাঁকিয়ে ঝিনুক বলল, 'উঁহু—উঁহু—'

হেমনাথ সবিস্ময়ে বললেন,'ঘুমোচ্ছিলি না!'

'না।' ঝিনুক বিনুকে দেখিয়ে বলতে লাগল, 'তুমি ওকে ডাকলে, আমাকে ডাকলে না।'

'ওকে ডেকেছি, তুই জানিস?'

'হ্যাঁ, জানি। একশ' বার জানি।'

'জানিস যদি, উঠে পড়লি না কেন?'

'উঠব না, কিছুতেই না।' ঝিনুক বলতে লাগল, 'ওকে ডেকে তুলবে আর আমাকে ডাকবে না! না ডাকলে উঠব কেন?'

এবার ব্যাপারটা খানিক আন্দাজ করতে পারলেন হেমনাথ। চোখ বড় বড় করে সকৌতুকে বললেন, 'বিনু দাদাকে ডাকলে তোকেও ডাকতে হবে, এই তো?'

'হ্যাঁ।'

'বেশ, কাল থেকে ভোরবেলা উঠবি। ডাকামাত্র উঠে পড়তে হবে।'

'আচ্ছা।'

একটু নীরবতা। তারপর ঝিনুকের চিবুক আঙুল দিয়ে ঠেলে তুলে হেমনাথ বললেন, 'পেট বোঝাই তোমার হিংসে।'

দেখতে দেখতে রোদ উঠে গেল। খানিক আগেও আমবাগান, পুকুর, ধানবন, সুদূর আকাশ—সব কিছু ঝাপসা হয়ে ছিল। সারাটা বর্ষার জলে ধুয়ে ধুয়ে এই আশ্বিনে আকাশখানি বড় উজ্জ্বল, বড় ঝকমকে। এক দিগন্ত থেকে আরেক দিগন্ত পর্যন্ত নীল চাঁদোয়া টাঙানো রয়েছে।

এ বাড়িতে এখন আর কেউ ঘুমিয়ে নেই। অবনীমোহন সুরমা সুধা সুনীতি, সবাই উঠে পড়েছে। পুবের ঘরের বারান্দায় পিঁড়ি পেতে বসে এই মুহূর্তে সকালবেলার খাওয়ার পর্ব চলছে।

খেতে খেতে হেমনাথ বললেন, 'কাল রাত্তিরে ঝিনুকের কথা কী যেন বলছিলে, ঠিক খেয়াল করি নি।'

স্নেহলতা বললেন, 'ও এখন কিছুদিন এখানে থাকবে।'

'বেশ তো।'

'ঝিনুক বাড়ি থাকলে ভবতোষ কোথাও বেরুতে টেরুতে পারে না। বেরুলেও সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে ঘুরতে হয়। ছেলেটা ভারি মুশকিলে পড়ে গেছে।'

একটু চুপ করে থেকে হেমনাথ বললেন, 'কাল কখন ঝিনুককে দিয়ে গেছে?'

স্নেহলতা বললেন, 'তোমরাও হাটে বেরিয়েছ, ওরাও এসেছে।'

'ভবতোষ আর কী বললে?'

'কী ব্যাপারে?'

'বউমার কোনও খবর আছে?'

'না। ও মেয়ে সংসার করবার মেয়ে নয়। চলে যে গেছে, সে একরকম ভালই হয়েছে।'

খানিক গাঢ় বিষাদ আশ্বিনের এই ঝলমলে সকালটাকে যেন নিমেষে মলিন করে দিল।

কিছুক্ষণ নীরবতা। তারপর একেবারে ভিন্ন প্রসঙ্গে চলে গেলেন হেমনাথ। সুরমার দিকে ফিরে বললেন, 'ক'দিন যেন এখানে এসেছিস—'

সুরমা বললেন, 'তিন চার দিন।'

'বলতে নেই, এই ক'দিনে তোকে বেশ ভাল দেখাচ্ছে। সেই ফ্যাকাসে রুগ্‌ণ ভাবটা নেই। স্টিমার থেকে যখন নামলি মুখখানা এই এতটুকু। গায়ে রক্ত নেই, হাঁটতে গিয়ে হাঁপিয়ে পড়ছিলি।'

স্নেহলতা এই সময় ঝংকার দিয়ে উঠলেন, 'বলতে নেই বলতে নেই করে তো সবই বলে ফেললে। ভাল ভাল বলে রোগা মেয়েটার দিকে নজর দিতে হবে না।'

হেমনাথ হেসে ফেললেন, 'বেশ, আর বলব না। নজরও দেব না।'

সুরমা বললেন, 'কেন বলবে না, নিশ্চয়ই বলবে। ভাল হলে ভাল বলবে না? সত্যি, আগের চাইতে কিছুটা সুস্থ লাগছে।'

হেমনাথ বাড়িয়ে কিছু বলেন নি। সামান্য কয়েক দিনে সুরমার চেহারায় সোনার কাঠির ছোঁয়া লেগে গেছে যেন। তাঁকে রীতিমত উজ্জ্বল আর সজীব দেখাচ্ছে। পরিবর্তনটা চোখে পড়ে।

অবনীমোহন এতক্ষণ চুপ করে খেয়ে যাচ্ছিলেন। এবার বললেন, 'রাজদিয়া সত্যি সত্যি টনিকের কাজ করতে শুরু করেছে।'

pathagar.net

আসবার সময় স্টিমারে টনিকের কথা অবনীমোহনও বলেছিলেন। সুরমা হাসলেন, কিছু বললেন না।

হঠাৎ হেমনাথের কী মনে পড়ে যেতে তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, 'ভাল কথা—'

স্নেহলতা জিজ্ঞাসু চোখে তাকালেন, 'কী?'

'দু'দিন ধরে সেই বাঁদরটাকে তো দেখছি না। কোথায় গা ঢাকা দিলে সে?'

'কার কথা বলছ?'

'কার আবার, আমার প্রতিদ্বন্দ্বী সেই হিরণ ছোঁড়ার।' বলে আড়ে আড়ে সুধার দিকে একপলক তাকিয়ে নিলেন।

সুধা সুনীতি আর বিনু একধারে বসে খাচ্ছিল। বিনু শুনতে পেল, চাপা গলায় সুনীতি সুধাকে বলছে, 'দাদু তোর দিকে কেমন করে যেন তাকাচ্ছে।'

মুখ নীচু করে সুধা বলল, 'তাকাক গে।'

'সেই বাঁদরটা কোথায় গেছে জানিস?'

ঠোঁট উলটে সুধা বলল, 'জানতে বয়ে গেছে।'

মুখ টিপে, সুর টেনে টেনে সুনীতি বলল, 'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই।'

এই সময় স্নেহলতা বলে উঠলেন, 'সত্যিই তো, ছেলেটা গেল কোথায়? রোজ দু'বেলা হাজিরা দিচ্ছিল। হঠাৎ হল কী?' বলতে বলতে গলা চড়িয়ে ডাকতে লাগলেন, 'যুগল, যুগল—'

আশেপাশে কোথাও ছিল যুগল। ছুটতে ছুটতে সামনে এসে দাঁড়াল, 'কী ক'ন ঠাউরমা?'

'হিরণদের বাড়ি একবার যা, ওকে সঙ্গে করে নিয়ে আসবি।'

যুগল তক্ষুনি ছুটল।

এরপর সুজনগঞ্জের হাটের কথা উঠল, লালমোরের কথা হল, কালকের সেই মজার ঢেঁড়াটার কথা নিয়ে অনেক হাসাহাসি চলল। এ সবের ফাঁকে হেমনাথ টুক করে একবার বললেন, 'ভাবছি, আমিও একটা ঢেঁড়া দেব কিনা।'

হাসতে হাসতে থমকে গেলেন স্নেহলতা। কিছু একটা আন্দাজ করেছেন তিনি। তীক্ষ্ণ ভ্রূকুটিতে স্বামীকে বিদ্ধ করতে করতে বললেন, 'তুমি আবার কিসের ঢেঁড়া দেবে?'

'এখনই শুনবে?'

'এখনই শুনব।'

'নির্ভয়ে বলি?'

'খালি প্যাকনা (ন্যাকামো)।'

হেমনাথ বললেন, 'ঢেঁড়াটা হবে এইরকম। জেলা ঢাকা, থানা মুন্সিগঞ্জ, শহর রাজদিয়ার শ্রীহেমনাথ মিত্রের বড় বিপদ। কী বিপদ? না চল্লিশ বছর ঘর করার পরও সে তার বউর মন পায় নি। আপনারা জেনে রাখুন—মিঞা ভাইরা, হিন্দু ভাইরা—হেমকর্তার ধর্মপত্নীর মন অন্য পুরুষে মজেছে।'

কথাটা শেষ হতে না হতেই হাসির ধুম পড়ে গেল। অবনীমোহন আর সুরমা অবশ্য মুখ টিপে হাসছেন, ভেতরের উচ্ছ্বসিত কৌতুকটাকে বেরিয়ে আসতে দিচ্ছেন না। সুধা সুনীতি কিন্তু হেসে একেবারে গড়িয়ে পড়ছে। বিনু প্রায় কিছুই না বুঝে আর সবার দেখাদেখি বিজ্ঞের মতো হাসছে।

আড়ে আড়ে সুধা সুনীতির দিকে একবার তাকিয়ে হেমনাথ বললেন, 'ঢেঁড়ার কথা কিন্তু শেষ হয় নি, আরও একটু আছে।'

হাসতে হাসতেই সুধা সুনীতি বলল, 'আরও কী?'

হেমনাথ বলতে লাগলেন, 'মিঞা ভাইরা, হিন্দু ভাইরা—সাকিন রাজদিয়ার হেমকর্তা এই বিপদে তো চুপ করে বসে থাকতে পারে না। তাই সে ঠিক করেছে পুরনো বউকে তালাক দিয়ে আগামী অঘ্রাণ মাসে একজোড়া তরুণী ভার্যা ঘরে তুলবে। তাদের একজনের নাম সুধামুখি, আরেক জনের নাম সুনীতিলতা।'

স্নেহলতা মধুর কৌতুকময় হেসে বললেন, 'ঢেঁড়াতে আমার আপত্তি নেই।'

হেমনাথ বললেন, 'প্রস্তাবটা তা হলে অনুমোদন করছ?'

'করছি।'

এদিকে সুধা সুনীতির হাসি থেমে গিয়েছিল। তারা ঝংকার দিয়ে উঠল, 'বুড়োর ভার্যা হতে আমাদের বয়ে গেছে।'

করুণ মুখে হেমনাথ বললেন, 'বুড়ো বলে দাগা দিলে দিদিরা! সত্যিই কিন্তু আমি বুড়ো হই নি। এই দেখ, একটাও দাঁত পড়ে নি, মাড়ি কী মজবুত!'

সুধা বলল, 'বুড়ো তো হন নি, তবে চুল সাদা হল কী করে?'

'বয়েসের জন্যে না রে দিদি, কুপিত বায়ুর দোষে।'

'আর চামড়া কোঁচকালো কেন?'

'হজমের গোলমালে।'

গল্পে গল্পে, হাসাহাসি আর লঘু কৌতুকে সকালটা কাটতে লাগল। খাওয়ার পালা যখন শেষ হয়ে এসেছে সেই সময় বাইরে বাগানের দিক থেকে একটা গলা ভেসে এল, 'জেঠামশায়—জেঠামশায়—'

হেমনাথ ঘুরে বসে সাড়া দিলেন, 'কে রে?'

'আমি শিশির!'

'আয় আয়—' হেমনাথ ব্যস্ত হয়ে উঠোনে নামলেন।

একটু পর শিশিররা ভেতরে চলে এলেন। দেখা গেল, শিশির একাই নন, তাঁর সঙ্গে স্মৃতিরেখা, রুমা ঝুমা এবং তাদের মামা আনন্দও এসেছে।

শিশির বললেন, 'আপনার বউমাদেরও দিয়ে এলাম।'

'আনবিই তো। আনতেই তো বলেছিলাম। এস, এস সবাই—'

এদিকে বারান্দার আরেক কোণে একটা মজার ব্যাপার চলছিল। বিনু দেখতে পেল, আনন্দকে দেখিয়ে সুধা সুনীতিকে বলছে, 'দিদি, সেই ভদ্রলোক এসেছে। যার দিকে—'

ভুরু কুঁচকে সুনীতি বলল, 'যার দিকে কী?'

ঠোঁটের ফাঁকে প্রগলভ একটি হাসি টিপে রেখে সুধা বলল, 'যার দিকে তাকিয়ে সেদিন তুই একেবারে মুগ্ধ—মুগ্ধ—মুগ্ধ—মুগ্ধ—'

কথা শেষ হবার আগেই সুধার পিঠে দুম করে কিল পড়ল।

হেমনাথ বললেন, 'এখানে না। চল, ঘরে গিয়ে বসি—'

শিশিরদের সঙ্গে নিয়ে সামনের বড় ঘরখানায় গিয়ে ঢুকলেন হেমনাথ। স্নেহলতা সুরমা অবনীমোহনরাও পিছু পিছু এলেন। সুধা সুনীতি ঝিনুক কিংবা বিনু বাইরে বসে থাকল না, তারাও এল।

স্নেহলতা আর শিবানী শিশিরকে চেনেন, স্মৃতিরেখাকে চেনেন, রুমা ঝুমাকে চেনেন। না চিনে যাবেন কোথায়? এই রাজদিয়ারই তো ছেলে শিশির, ছেলেবেলা থেকে তাঁকে দেখে আসছেন। চাকরির খাতিরেই না হয় ক'বছর দেশছাড়া শিশির।

স্নেহলতা এবং শিবানী আনন্দকে চিনতেন না, হেমনাথ তাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। সুরমা কাউকেই চেনেন না, তাঁর সঙ্গেও ওর আলাপ করিয়ে দেওয়া হল। আর অবনীমোহনদের সঙ্গে শিশিরদের তো আগেই আলাপ হয়ে গেছে।

এ ঘরে ঢালা তক্তপোশ পাতা। হেমনাথ বললেন, 'বোসো সব, বোসো—'

সবাই বসলে শিশির স্নেহলতা আর শিবানীর উদ্দেশে বললেন, 'কেমন আছেন পিসিমা? কেমন আছেন জেঠাইমা?'

শিবানী বললেন, 'ভাল আছি বাবা। তোরা সবাই ভাল তো?'

শিশির বললেন, 'হ্যাঁ।'

স্নেহলতা বললেন, 'আমি কিন্তু ভাল নেই শিশির।'

ঈষৎ উদ্বেগের সুরে শিশির শুধোলেন, 'কেন?'

'ছেলেরা যদি দেশের বাড়ি ছেড়ে দূরে গিয়ে থাকে, মা-জেঠিরা ভাল থাকতে পারে না।'

মুখখানা কাঁচুমাচু করে শিশির বললেন, 'কী করব, চাকরি। চাকরির জন্যেই দূরে গিয়ে থাকতে হয়। নইলে আপনাদের ছেড়ে কলকাতায় থাকতে কি আমার ভাল লাগে?'

স্নেহলতা হাসলেন, 'বুঝলাম।' একটু থেমে আবার বললেন, 'তোর ওপর আমি কিন্তু খুব রাগ করেছি।'

শিশির তটস্থ হয়ে উঠলেন, 'কেন?'

'খবর পেয়েছি চার পাঁচ দিন আগে রাজদিয়া এসেছিস। এতদিনে আমার সঙ্গে দেখা করার সময় হল বুঝি?'

বিব্রতভাবে শিশির বললেন, 'রোজই ভাবি আসব। বেরুবার মুখে কেউ না কেউ এসে পড়ছে, এ বাড়িতে আসাই আর হচ্ছে না। আজ তাই ভোরবেলা উঠেই বেরিয়ে পড়েছি।'

শিবানী বললেন, 'কেউ এসে পড়বার আগেই, না রে?'

শিশির হাসলেন, 'হ্যাঁ।'

স্নেহলতা কিন্তু এই কৈফিয়তে খুশি হলেন না। অভিমানের সুরে বললেন, 'দায় সারতে যখন এসেছিস তখন বোস, আমি আসছি।' দরজা পর্যন্ত গিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, 'দুপুরবেলা দয়া করে এখানে দু'টি খেয়ে যাবার সময় হবে তো?'

তাড়াতাড়ি মাথা নেড়ে শিশির বলে উঠলেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, আপনি না বললেও খাব। না খেয়ে এখান থেকে যাচ্ছি না।'

খুব ব্যস্তভাবে এইসময় স্মৃতিরেখা কী বলতে যাচ্ছিলেন, ইশারায় তাঁকে থামিয়ে দিলেন শিশির।

স্নেহলতা চলে গেলেন।

আস্তে আস্তে স্মৃতিরেখা স্বামীকে বললেন, 'তুমি কী বল তো! আজ এখানে থেকে বেরিয়ে গুহদের বাড়ি যাবার কথা ছিল না? সেদিন ওরা অত করে বলে গেল!'

শিশির বললেন, 'এখান থেকে না খেয়ে যাবার সাধ্য আমার নেই। গুহদের বাড়ি আরেক দিন যাওয়া যাবে।'

'বেশ বললে! ওঁরা আমাদের জন্যে বসে থাকবেন না?'

'আমি খবর পাঠিয়ে দিচ্ছি।' বলে শিশির হেমনাথের দিকে তাকালেন, 'জেঠামশায়, আপনাদের সেই ছেলেটা কোথায়? কী যেন নাম—'

হেমনাথ বললেন, 'যুগলের কথা বলছিস?'

'হ্যাঁ, যুগল—'

'ওকে হিরণদের বাড়ি পাঠিয়েছি। অনেকক্ষণ গেছে, এখুনি ফিরে আসবে।'

হেমনাথের কথা শেষ হতে না হতেই যুগল এসে পড়ল। ছুটতে ছুটতে এসেছে, ফলে হাঁপাচ্ছিল। বলল, 'হিরণদাদায় বাড়িত্ নাই।'

হেমনাথ শুধোলেন, 'গেছেন কোথায় বাবু?'

'বিষ্যুদ্‌বার মানিকগুঞ্জে গ্যাছে। হইহান থিকা ঢাকায় যাওনের কথা। অহন তরি (পর্যন্ত) ফিরে নাই।'

'কবে ফিরবে, বলে গেছে?'

'না।'

হেমনাথ বললেন, 'আচ্ছা, এখন শিশির কী বলছে শোন—'

শিশির যুগলকে গুহদের বাড়ি পাঠালেন। বলে দিলেন, দু'তিন দিন পর তাঁদের ওখানে যাবেন। বলামাত্র যুগল তীরের মতো ছুটল।

একটু পর বড় বড় কাঁসার থালায় চিঁড়ের মোয়া, কদমা, পাতক্ষীর, সন্দেশ আর দোভাজা চিঁড়ে, নারকেল কোরা দিয়ে সাজিয়ে নিয়ে এলেন স্নেহলতা। একা তো আর অতগুলো থালা আনা যায় না। সেই বিধবা দু'টিও ক'টা থালা নিয়ে এসেছে।

এ ঘরে ঢুকেই স্নেহলতা বললেন, 'যুগলের গলা পাচ্ছিলাম যেন—'

'হ্যাঁ—' হেমনাথ মাথা নাড়লেন।

'গেল কোথায়?'

যুগল কোথায় গেছে, হেমনাথ বললেন।

স্নেহলতা শুধোলেন,'হিরণের খবর কী?'

'মানিকগঞ্জে গেছে।'

'হঠাৎ মানিকগঞ্জে?'

'কি জানি, যুগল কিছু বলত পারল না।'

'বাবুর কবে ফেরা হবে?'

'হিরণই জানে। বাড়িতে কিছু বলে যায় নি।'

এ প্রসঙ্গে আর কোনও প্রশ্ন করলেন না স্নেহলতা। রুমা-ঝুমা-আনন্দ, সবার হাতে হাতে একটা করে কাঁসার থালা দিয়ে যেতে লাগলেন। দেওয়া হয়ে গেলে স্মৃতিরেখাকে ডাকলেন, 'বউমা—'

স্মৃতিরেখা তাকালেন। চোখে চোখ পড়তে স্নেহলতা বললেন, 'তোমার কাছে আমার একটা অভিযোগ আছে।'

স্মৃতিরেখা হকচকিয়ে গেলেন, 'কী ব্যাপারে?'

'তোমারই ব্যাপারে। এই বয়েসে তোমরা কি আমার ঘর ভাঙাতে চাও?'

মুখচোখ লাল হয়ে উঠল স্মৃতিরেখার। শিথিল কাঁপা গলায় বললেন, 'আপনি কী বলছেন, বুঝতে পারছি না।'

ঘরের অন্য সবাই অবাক হয়ে গিয়েছিল। স্নেহলতার স্বভাব এত কোমল, এত মধুর যে সরাসরি এমন আক্রমণ করে বসতে পারেন, তা যেন ভাবাই যায় না।

স্নেহলতা বললেন, 'বুঝতে যখন পারছ না তখন বুঝিয়ে দিচ্ছি।' রুমা-ঝুমাকে দেখিয়ে বললেন, 'এই সব সুন্দর সুন্দর পরীদের সামনে এনে ধরছ, এরপর আমার ওপর বুড়োর মন কি থাকবে?' বলে হেমনাথের দিকে আড় চাহনির বাণ হানলেন।

এতক্ষণে ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল। সবাই উঁচু গলায় শব্দ করে হেসে উঠল।

হাসির শব্দটা মিলিয়ে যেতে না যেতে স্নেহলতা আবার বললেন, 'রমু তো আগেই আমার সর্বনাশ করে রেখেছে। ওই দু'টিকে নিয়ে এসেছে—' আঙুল বাড়িয়ে সুধা-সুনীতিকে দেখিয়ে বলতে লাগলেন, 'সব সময় ওদের ভয়ে আমি কাঁটা হয়ে আছি। তা ছাড়া ওই পুচকেটাকে দেখ—'

স্নেহলতার আঙুল অনুসরণ করে সবার দৃষ্টি পড়ল ঝিনুকের ওপর।

স্নেহলতা বললেন, 'উনিও কম যান না। আমার সতীন হতে চান।'

হাসতে হাসতে হেমনাথ বললেন, 'ভাবছি এদের নিয়ে একটা মোগল হারেম খুলবই খুলব। তুমি হবে হেড বেগম, বাকি সবাই তোমার বাঁদী।'

কথাটা শেষ হল কি হল না, তার আগেই ঘরময় চেঁচামেচি শুরু হয়ে গেল। রুমা-ঝুমা-সুধা-সুনীতি একসঙ্গে গলা মেলাল, 'বাঁদী হতে আমাদের বয়ে গেছে। কক্ষনো না, কক্ষনো না।'

হালকা হাওয়ায় সবাই যখন রঙিন প্রজাপতিটি হয়ে ভেসে চলেছে সেইসময় ঝিনুককে দেখিয়ে শিশির বললেন, 'এই মেয়েটা কে, জেঠামশায়?'

হেমনাথ বললেন, 'তোদের বলি নি বুঝি?'

'আজ্ঞে না।'

'ও হল ভবতোষের মেয়ে—'

'লাহিড়ী বাড়ির ভবতোষ?'

'হ্যাঁ।'

'সে এখানকার কলেজে প্রফেসরি করে না?'

হেমনাথ মাথা নাড়লেন।

'ভবতোষের মেয়ে এখানে যে?'

হেমনাথ বললেন, 'ও মাঝে মাঝে এখানে এসে থাকে। মেয়েটাকে নিয়ে ভব বড় মুশকিলে

pathagar.net

পড়েছে।'

শিশির কৌতূহলী হলেন, 'কিসের মুশকিল?'

হেমনাথ লক্ষ করলেন, একদৃষ্টে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে বিনু। ঈষৎ স্খলিত স্বরে বললেন, 'ব্যাপারটা ভারি স্যাড। এখন না, তোকে পরে বলব।'

একটু নীরবতা। তারপর প্রসঙ্গটাকে অন্য দিকে ঘুরিয়ে দেবার জন্য স্ত্রীর দিকে ফিরে হেমনাথ তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, 'তোমাকে একটা খবর দেওয়া হয় নি।'

স্নেহলতা জিজ্ঞাসু চোখে তাকালেন, 'কী?'

'আনন্দ মস্ত শিকারি। সুন্দরবনে গিয়ে বড় বড় বাঘ মেরে এসেছে।'

'তাই নাকি!'

'হ্যাঁ—' হেমনাথ মাথা হেলিয়ে বলতে লাগলেন, 'সেদিন শিশিরদের বাড়ি গিয়েছিলাম। আনন্দর নিজের মুখে শিকারের গল্প শুনে এসেছি।'

স্নেহলতা এবার পরিপূর্ণ চোখে আনন্দর দিকে তাকালেন, 'বাঘ মেরেছে, এমন লোক আগে আর দেখি নি। এই প্রথম দেখলাম।'

আনন্দ হাসল।

স্নেহলতা আবার বললেন, 'অবশ্য মুখে বাঘ ভাল্লুক মারে, এমন মানুষ সর্বক্ষণই দেখছি।' বলে চোরা চোখের দৃষ্টি হেনে স্বামীকে বিদ্ধ করলেন।

হেমনাথও কম যান না। আনন্দর উদ্দেশে বললেন, 'তোমাকে দেখবার ঢের আগেই আমি বাঘশিকারি দেখেছি, আর তাকে নিয়েই সারাজীবন—

আনন্দ শুধলো, 'সারা জীবন কী?'

'ঘর করছি।'

কৌতুকের একটি ফোয়ারা কোথায় কোন অগোচরে যেন ফুটি ফুটি করছে। যে কোনও মুহূর্তে সহস্র ধারায় সেটা ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে আসবে। সবাই তা টের পেয়ে গেছে বুঝি, আর গেছে বলেই তাদের ঠোঁটে চোখে হাসি ছলকে যাচ্ছে।

স্নেহলতা ভুরু কুঁচকে বললেন, 'তাই নাকি? আমি বাঘ মেরেছি?'

'নিশ্চয়ই—' হেমনাথ বললেন, 'বিয়ের আগে বাঘই ছিলাম গো।'

'তারপর?'

'তুমি এসে সেই বাঘটাকে মেরে একেবারে পোষা বেড়াল করে ছেড়েছ। তোমার কথায় সে এখন ওঠে, বসে। তোমার পায়ে পায়ে ঘুর ঘুর করে। চোখ পাকালে ভ্যাক করে কেঁদে ফেলে পর্যন্ত।'

যে হাসিটা এতক্ষণ আধোগোপন ছিল, এবার তা আতসবাজির মতো ফস করে জ্বলে উঠল।

স্নেহলতা কপট রাগে আরেক বার ভ্রূভঙ্গ করতে গিয়ে নিজেও হেসে ফেললেন। বাইরে বিব্রত, অথচ তলায় সুখী—এমন একটা ভাব করে বললেন, 'হয়েছে, খুব হয়েছে।'

হাসিটা খানিক স্তিমিত হয়ে এলে স্নেহলতা আনন্দকে বললেন, 'বাঘ মারার গল্প আমাকেও কিন্তু বলতে হবে।'

আনন্দ খুব সপ্রতিভ ছেলে। তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'নিশ্চয়ই বলব। এখুনি শুনবেন?'

স্নেহলতা কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, তার আগেই সুধা বলল, 'হ্যাঁ, এখনই আমরা শুনব। জানেন—'

সুধা-সুনীতি-বিনু এবং ঝিনুক শিশিরদের সঙ্গে ঘরের ভেতর পর্যন্ত আসে নি, দরজার কাছটায় দাঁড়িয়ে ছিল। আনন্দ মুখ ফিরিয়ে সুধার দিকে তাকাল।

সুধা বলল, 'দিদি না—'

কথাটা শেষ হল না। সুধার একটা হাত ধরে জোরে টান লাগাল সুনীতি। চাপা গলায় বলল, 'ভাল হবে না কিন্তু সুধা।'

সুধা গ্রাহ্যও করল না। আড়ে আড়ে সুনীতিকে একবার দেখে নিয়ে খুব নিরীহ মুখ করে বলল, 'সেদিন শিকারের গল্প শুনে দিদি না একেবারে বিভোর হয়ে গিয়েছিল। আপনার খুব ভক্ত হয়ে

উঠেছে। বলুন, শিকারের যত গল্প আপনার জানা আছে বলে যান।'

হাসিভরা উজ্জ্বল চোখে সুনীতিকে এক পলক দেখে নিল আনন্দ, কিছু বলল না।

লজ্জায় সুনীতির মুখ এখন আরক্ত, কারোর দিকে তাকাতে পারছিল না সে। নতচোখে ফিসফিসিয়ে শুধু বলতে পারল, 'বাঁদর মেয়ে, ওরা যাক। তারপর তোমার একদিন কি আমার একদিন।'

সুধা গলা নামিয়ে বলল, 'তখন বুঝি মনে ছিল না?'

সুনীতি বলল, 'কী?'

'হিরণবাবুর নাম করে আমার পেছনে লেগেছিলি।'

'শোধ তুললি বুঝি?'

'নিশ্চয়ই। জানিস না ঢিলটি মারলে পাটকেলটি খেতে হয়।'

'জানতাম, মনে ছিল না।'

'এখন থেকে মনে রাখিস।'

এদিকে স্নেহলতা বললেন, 'এখন তো আমি বসতে পারব না, রান্নাবান্না আছে। ওদের সঙ্গে গল্পটল্প কর আনন্দ। আমি পরে শুনে নেব।'

'আচ্ছা—' আনন্দ মাথা নাড়ল।

স্নেহলতা শিবানী আর সেই বিধবা মেয়ে দু'টিকে নিয়ে চলে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ তাঁর খেয়াল হল, এখন পর্যন্ত কেউ খাবারের থালায় হাত দেয় নি। ব্যস্তভাবে তিনি বললেন, 'ওই দেখ, তোমাদের শুধু বকিয়েই মারছি। খাও, খাও—' বলে চলে গেলেন।

অবনীমোহন উৎসাহের সুরে বললেন, 'খেয়েদেয়ে একটা ভাল দেখে শিকার কাহিনী আরম্ভ কর আনন্দ।'

আনন্দ নিঃশব্দে হাসল, অর্থাৎ এ প্রস্তাবে তার আপত্তি নেই। ওদিকে আরেকটা ব্যাপার চলছিল। খুব তাড়াতাড়ি খেয়ে যাচ্ছিল ঝুমা আর বাঁ হাত দিয়ে সমানে বিনুকে ইশারা করছিল।

প্রথমটা লক্ষ করে নি বিনু। হঠাৎ চোখে পড়ে গেল। চোখাচোখি হতেই জোরে হাতছানি দিতে লাগল ঝুমা।

একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল বিনু, তারপর পায়ে পায়ে ঝুমার কাছে এসে দাঁড়াল।

ঝুমা এই বয়সেই বেশ পাকা। সে বলল, 'বারে, তোমাদের বাড়ি এলাম, আর তুমি কিনা ওখানে দাঁড়িয়ে আছ!'

বিনু বলল, 'তুমি খাচ্ছিলে, তাই—'

ঝুমা খেতে খেতে বলল, 'তোমার ওপর আমি খুব রাগ করেছি।'

'কেন?'

'তুমি তো আমাদের বাড়ি গেলে না। তোমার জন্যে এয়ার-গান ঠিক করে রেখেছিলাম। ক্যারম খেলব ভেবেছিলাম, লুডো খেলব ভেবেছিলাম—'

'আমি তো তোমাদের বাড়ি চিনি না।'

চোখ বড় করে, টেনে টেনে ঝুমা বলল, 'চেনো না!'

'না।'

'সেদিন গেলে না?'

'মোটে তো একদিন।' বলতে বলতে কী মনে হতে অদূরে দরজার কাছটায় তাকাল বিনু। দেখল, সুধাও সুনীতির গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে তার দিকেই একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে ঝিনুক। চোখের পাতা পড়ছে না মেয়েটার।

ঝুমা গম্ভীর গলায় বলল, 'একদিন গেলেই চিনে রাখা যায়। এই যে আজ তোমাদের বাড়ি এলাম, আর আমাকে চিনিয়ে দিতে হবে না। পরে দেখবে, ঠিক চলে এসেছি।'

ঝিনুকের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে বিনু বলল, 'দাদুকে বলব, তোমাদের বাড়ি নিয়ে যেতে।'

কণ্ঠস্বরে লম্বা টান দিয়ে ঝুমা বলল, 'এ মা—'

pathagar.net

বিনু অবাক। বলল, 'কী হল?'

'বুড়ো ধাড়ি ছেলে, একা একা যেতে পারবে না! আবার দাদুকে সঙ্গে চাই!' নাক কুঁচকে ধিক্কার দিয়ে দিয়ে হেসে উঠল ঝুমা।

মুখ লাল হয়ে গেল বিনুর। কী বলতে চেষ্টা করল, পারল না।

এদিকে আনন্দর খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। অবনীমোহন যেন উন্মুখ হয়েই ছিলেন। বললেন, 'শিকার-কাহিনী শুরু করে দাও—'

ঝুমা বিনুর দিকে আরেকটু এগিয়ে এসে নীচু গলায় ডাকল, 'এই—'

ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল বিনু।

আগের স্বরেই ঝুমা বলল, 'চল, আমরা পালাই—'

আধফোটা গলায় বিনু শুধলো, 'কোথায়?'

'ওই বাগান টাগানে—' সামনের দিকে আঙুল বাড়িয়ে দিল ঝুমা।

'শিকারের গল্প শুনবে না?'

'আমরা ঢের শুনেছি।'

বিনুর যেতে ইচ্ছে করছিল না। সে বলল, 'আমি তো শুনি নি।'

'তোমাকে পরে বলে দেব। এখন ওঠ তো।' ঝুমা তাড়া লাগল, 'ওঠ না—'

বিনু উঠতে যাবে, তার কানে ঝুমা ফিসফিস করল, 'মামার গল্প একদম বিশ্বাস করবে না।'

অপার বিস্ময়ে বিনু বলল, 'কেন?'

'দিদি বলে, মামা মশা ছারপোকা ছাড়া কোনও দিন কিচ্ছু মারে নি।'

আড়চোখে একবার রুমাকে দেখে নিয়ে বিনু বলল, 'তা হলে এই সব গল্প—'

'এক্কেবারে গাঁজা। বানিয়ে বানিয়ে বলে। নাও, এখন চল—'

ঝুমার সঙ্গে বেরিয়ে পড়ল বিনু। যেতে যেতে দরজার কাছটায় সে লক্ষ করল, ঝিনুক সেইরকম পলকহীন তাকিয়ে আছে। তার পাশ দিয়ে বিনুরা উঠোনে নেমে গেল।

উঠোনের শেষ মাথায় এসে মনে হতে লাগল, আলতোভাবে তার পিঠটা কেউ ছুঁয়ে যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি ঘুরে দাঁড়াতেই দেখতে পেল, কেউ না। শুধু দূরে দরজার ওপর ডিঙি মেরে দাঁড়িয়ে আছে ঝিনুক, তেমনি একইভাবে তাকিয়ে রয়েছে। এখনও মেয়েটার চোখে পলক পড়ে নি।

বাগানে এসে ঝুমার সঙ্গে ছোটাছুটি করে ফড়িং ধরল বিনু। কোথায় কোন অলক্ষ্যে বসে ঝিঁঝিরা একটানা করুণ সানাই বাজিয়ে যাচ্ছিল, তাদের খুঁজে বার করতে চেষ্টা করল, পারল না অবশ্য। করমচা ফুলের কুঁড়ি ছিঁড়ল রাশি রাশি, জামরুল পাতা কুচিকুচি করে হাওয়ায় উড়িয়ে দিতে লাগল। ডুমুর গাছের মগডালে জোড়া জোড়া মোহনচূড়া পাখি বসে ছিল, তাদের দিকে ঢিল ছুড়ল। অনেক উঁচুতে সুপুরি গাছের মাথায় বসে ছিল কয়েকটা হলদিবনা। সবটুকু জোর দিয়ে ঢিল ছুড়েও যখন নাগাল পাওয়া গেল না, তখন হুস হুস শব্দ করে চেঁচিয়ে তাদের উড়িয়ে দিল।

গাছপালা তছনছ করে, পতঙ্গ আর পাখিদের রাজ্যে আতঙ্ক ছড়াতে ছড়াতে হঠাৎ ঝুমার নজর গেল পুকুরঘাটের দিকে। খুশি গলায় সে চেঁচাল, 'এই—'

'কী?' বিনু তাকাল ঝুমার দিকে।

'ওই দেখ কী মজা।' বলে আঙুল বাড়িয়ে দিল ঝুমা।

বিনু দেখল, পুকুরঘাটে নৌকো বাঁধা রয়েছে—নতুন নৌকো। কাল হাট থেকে হেমনাথ এটা কিনে এনেছেন।

হাততালি দিতে দিতে ঝুমা বলল, 'চল, নৌকো চড়ব—'

বিনু ভয়ে ভয়ে বলল, 'নৌকো তো চড়বে, চালাবে কে?'

'কেন, তুমি আর আমি।'

'আমি নৌকো চালাতে পারি না।'

'আমিও পারি নাকি?'

'তা হলে?'

'চালাতে চালাতে শিখে যাব।'

ঝুমার তর সইছিল না। বিনুর একটা হাত ধরে টানতে টানতে অস্থির গলায় বলল, 'চল না '

ঝুমার সঙ্গে যেতে যেতে বিনু বলল, 'যদি আমরা নৌকো থেকে জলে পড়ে যাই?'

'পড়ে গেলে সাঁতরে উঠে পড়বে। তুমি সাঁতার জানো না?'

ওইটুকু পুচকে মেয়েটা সাঁতার জানে আর সে জানে না, এই কথাটা কিছুতেই বলতে পারল না বিনু। মনে মনে ভাবল, যুগলকে আর ছাড়াছাড়ি নেই, সাঁতারটা তাকে শিখে নিতেই হবে।

বিনু সাঁতার জানে কি জানে না, শুনবার সময় নেই ঝুমার। জোর করে মেয়েটা তাকে নৌকোয় নিয়ে তুলল। তারপর দড়ির বাঁধন খুলে, বৈঠা দিয়ে অপটু হাতে চালাতে শুরু করল।

জল ঠেলে ঠেলে একসময় মাঝপুকুরে নৌকোটাকে নিয়ে এল ঝুমা।

এর আগে যদিও একবার নৌকোয় উঠেছে, তবু ভয় করতে লাগল বিনুর। সে পাটাতনের মাঝখানে কাঠ হয়ে বসে আছে। আশ্বিনের শান্ত জলেও নৌকোটা টলমল করছে।

ঝুমা বলল, 'ভারি মজা, না?'

বিনু চুপ।

ঝুমা বলল, 'জানো, এই আমি প্রথম নৌকোয় চড়লাম। তুমি এর আগে চড়েছ?'

বিনু আস্তে করে বলল, 'চড়েছি।'

তারপর কী মনে পড়ে যেতে ঝুমা বলল, 'বা রে, আমি একাই বাইব নাকি? তুমিও একটা বৈঠা নাও।'

কথামতো আরেকটা বৈঠা তুলে নিল বিনু। ঝুমা নামের এই মেয়েটা সাঙ্ঘাতিক, কিছুতেই তার অবাধ্য হওয়া যায় না। ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, সে যা বলে তা না করে যেন উপায় নেই।

দুই আনাড়ি সমানে বৈঠা চালাচ্ছে। বাইতে বাইতে বিনুর মনে হল, ঝুমা তাকে গভীর জলের রোমাঞ্চকর অজানা রহস্যের দিকে নিয়ে চলেছে।

অপটু হাতে নৌকো বাইতে বাইতে দু'জন পুকুর পেরিয়ে ধানখেতে এসে পড়ল। ঘন ধানবন ঠেলে ঠেলে একটু পর তারা যেখানে এল সেখানে আশ্বিনের শান্ত জলে শুধু পদ্ম আর শাপলা। আর আছে চাপ চাপ কচুরিপানা, সেগুলোর মাথায় থোকা থোকা নীল ফুল, মাঝে মাঝে মুত্রা আর নলখাগড়ার ঝোপ। দু'চারটে মান্দার গাছও চোখে পড়ে, লাল ফুলে ফুলে সেগুলোর ডালপালা ছেয়ে আছে। কিছু কিছু বউন্যা গাছও ইতস্তত ছড়ানো। বউন্যার নীচু নীচু ডাল থেকে শক্ত শক্ত অসংখ্য গোলাকার ফল জলের কাছাকাছি ঝুলছে। আর মুত্রাঝোপ তো সাদা ফুলের মুকুট পরে গরবিনী হয়ে আছে।

শুধু ফুলই না, কত যে পাখি গাছের মাথায় মাথায় আর আকাশময় রঙিন পাপড়ির মতো উড়ছে তার হিসেব নেই।

ঝুমা খুশিতে হাততালি দিয়ে উঠল। তারপর চেঁচিয়ে বলল, 'ইস, কত ফুল! কত পাখি!'

এ দৃশ্য বিনুর অচেনা নয়। কালই চারদিকের এই ঝোপঝাড় ফুলফল এবং পাখিদের রাজ্য পাড়ি দিয়ে পুজোপাড়ের হাটে গিয়েছিল সে। যেতে যেতে প্রতিটি গাছ, প্রতিটি লতা আর পাখির নাম শিখিয়েছিল যুগল। সে সব ঠিক ঠিক মনে আছে বিনুর। ওই যে ওই পাখিটা হল মাছরাঙা, ওইটা ফুলদিপনা, ওইটা পাতিবক—

পরিচিত দৃশ্য। তবু মুগ্ধ হয়ে গেল বিনু।

ঝুমা আবার বলল, 'কী সুন্দর জায়গাটা, না?'

'হ্যাঁ ' বিনু মাথা নাড়ল।

'আমি জোর করে ধরে আনলাম বলে তো, নইলে কি কখনও এখানে আসতে?'

বিনু বলল, 'কালই এসেছিলাম।'

'সত্যি!' ঘাড় বাঁকিয়ে ঝুমা তাকাল। তার গলার স্বরে এবং চোখের তারায় অবিশ্বাস।

'হ্যাঁ, সত্যি। মা কালীর দিব্যি।'

মা কালীর নামে যখন দিব্যি কেটেছে তখন আর সন্দেহ করা চলে না। ঝুমা শুধলো, 'কার সঙ্গে এসেছিলে?'

কে নিয়ে এসেছিল, বিনু বলল।

'কী জন্যে এসেছিলে?'

বিনু তা-ও জানায়।

যুগলের নৌকোয় সুজনগঞ্জে পাড়ি দেবার কথা শুনে কিছুক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল ঝুমা। তারপর ঈর্ষা এবং লোভ-মেশানো গলায় বলল, 'সুজনগঞ্জের হাট কোথায়?'

'অনেক দূর।' বিনু বলতে লাগল, 'সকালবেলা বেরুলে পৌঁছতে দুপুর হয়ে যায়।'

সুর টেনে টেনে ঝুমা বলল, 'এ-ত-দূ-র!'

'হুঁ—'

'সেখানে কী দেখলে?'

কাল হাটে গিয়ে যে সব বিচিত্র অভিজ্ঞতা হয়েছে, বলে গেল বিনু। মন দিয়ে শুনল ঝুমা। বলল, 'যুগলকে একটা কথা বলবে?'

'কী?'

'আমাকে একদিন সুজনগঞ্জে নিয়ে যেতে।'

'বলব।'

'ঠিক তো?'

'ঠিক।'

একটুক্ষণ চুপ।

তারপর চারদিকের অসংখ্য পাখি দেখতে দেখতে ঝুমা বলল, 'ইস, আমার এয়ার-গানটা যদি আনতাম—'

বিনু শুধলো, 'তা হলে কী হত?'

'দেখতে এতক্ষণে কতগুলো পাখি শিকার করে ফেলতাম—'

'তুমি বন্দুক ছুড়তে পার!'

চোখ বড় করে মাথা নাড়তে নাড়তে ঝুমা বলল, 'তোমার বুঝি কিচ্ছু মনে থাকে না! একেবারে হাঁদারাম শিকদার—'

বিনুর মুখ লাল হয়ে উঠল। থতমত খেয়ে সে বলল, 'কী মনে থাকে না আমার?'

'সেদিন তোমাকে এয়ার গান ছোড়ার কথা বললাম না?'

এবার মনে পড়ে গেল। বন্দুক ছোড়ার কথা বলেছিল বটে ঝুমা। তা ছাড়া, যার মামা বাঘ-ভালুক মারতে পারে, তার ভাগনী কি আর দু'একটা পাখি শিকার করতে পারবে না?

ঝুমা আবার বলল, 'কি মশাই, মনে পড়েছে?'

নিঃশব্দে ঘাড় কাত করল বিনু।

ঝুমা পাখিশিকার নিয়ে আর কিছু শুধলো না। চারদিকে ফুটন্ত ফুলের মেলার দিকে তাকিয়ে বলল, 'এয়ার-গান যখন আনি নি তখন ফুল তুলি এস—'

বিনু উৎসাহিত হয়ে নৌকোর ধারে এসে ঝুঁকে বসল। ঝুমাও বসল তার পাশে। তারপর ক্ষিপ্র হাতে দু'জনে ফুল ছিঁড়তে লাগল। চোখের পলকে শাপলা আর পদ্মে, মুক্তা এবং কচুরি ফুলে নৌকো বোঝাই হয়ে গেল।

ফুল তুলতে তুলতে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল ঝুমা, 'ওটা কী গাছ জানো?' বলে সামনের দিকে আঙুল বাড়িয়ে দিল।

অথৈ জলের মাঝখানে গাছটা এক পায়ে দাঁড়িয়ে আছে। ডিঙি মেরে সেটা আকাশের ওপারের কোনও রহস্য বুঝি দেখতে চেষ্টা করছে। কালই গাছটা চিনিয়ে দিয়েছিল যুগল। বিনু বলল, 'ওটা কাউ গাছ।'

গাছটার সারা ডালপালা ফলে বোঝাই। হলুদ আভা-মাখানো সবুজ রঙের ফলগুলো সরু বোঁটায় ঝুলছে। সেগুলো দেখিয়ে ঝুমা বলল, 'ওগুলো খায়?'

'হ্যাঁ—'

'তুমি খেয়েছ?'

'না।'

'তবে কী করে বুঝলে খায়?'

'যুগল বলেছে।'

'খেতে কিরকম লাগে জানো?'

'খুব টক।'

লোভে চোখ চকচক করতে লাগল ঝুমার। দ্রুত চাপা স্বরে সে বলল, 'চল, ক'টা কাউ পাড়ি। বাড়ি গিয়ে নুন দিয়ে খাব।'

ব্যাপারটা খুবই লোভনীয়। বিনু তক্ষুনি রাজি হয়ে গেল, 'আচ্ছা—'

বৈঠা টেনে টেনে নৌকোটাকে কাউ গাছের কাছে নিয়ে এল দু'জনে। আনা মাত্র হাত বাড়াল ঝুমা, কিন্তু ফলগুলো ধরতে পারল না। কাজেই পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে আরও খানিক লম্বা হয়ে নিল। এবারও ফলগুলো ছোঁয়া গেল না।

অগত্যা বিনুর দিকে তাকাল ঝুমা। করুণ হেসে বলে, 'পারলাম না।'

বিনু বলল, 'তুমি বেঁটে যে—'

'তুমি যেন কত লম্বা!'

গম্ভীর চালে বিনু বলল, 'তোমার চাইতে অনেক—'

চোখ কুঁচকে বিনুর পা থেকে মাথা পর্যন্ত একবার দেখে নিল ঝুমা। তারপর বলল, 'কেমন লম্বা এবার দেখব। পাড়ো তো ওই কাউটা—'

নৌকোর একেবারে ধারেই দাঁড়িয়ে ছিল বিনু। খানিক ঝুঁকে গাছের দিকে হাত বাড়াতে গিয়ে হঠাৎ অঘটন ঘটে গেল। টাল সামলাতে না পেরে হুড়মুড় করে সোজা জলে গিয়ে পড়ল সে।

এখানে অগাধ জল, পায়ের তলায় মাটি খুঁজে পেল না বিনু। একবার ডুবে যাচ্ছে সে, পরক্ষণে ভেসে উঠছে। আর সমানে হাত-পা ছুড়ছে। হাত বাড়িয়ে কিছু একটা যে ধরবে তেমন কিছুই নেই কাছাকাছি। এরই ভেতর অনেকখানি জল খেয়ে ফেলল সে।

খানিক পর বিনুর মনে হল, জলের ওপর আর মাথা তুলতে পারছে না। এবার সে নির্ঘাত ডুবে যাবে। নৌকোটা কিংবা কাউফলের গাছটা কোথায় কোন দিকে সে বুঝতে পারছে না, দেখতে পাচ্ছে না। দেখতে পেলে সেদিকে যেতে চেষ্টা করত। শ্বাস বন্ধ হয়ে আসতে লাগল তার, আঙুলের ডগাগুলো ঝিনঝিন করতে লাগল, কানের কাছে একসঙ্গে হাজার ঝিঁঝি একটানা ডেকে চলল। অথৈ জলে ডুবে যেতে যেতে প্রাণপণে চেঁচিয়ে উঠল বিনু, 'মরে গেলাম, মরে গেলাম। আমাকে বাঁচাও—'

আর তখনই সে শুনতে পেল, কেউ যেন ঝপাং করে জলে লাফিয়ে পড়েছে। পরমুহূর্তেই টের পেল, তার চুলগুলো কার হাতের মুঠোয়। জলের ওপর তাকে ভাসিয়ে রেখে চুল ধরে কেউ টেনে নিয়ে চলেছে।

যে চুল ধরেছে তাকে দেখা যাচ্ছে না। তাকে ধরবার জন্য হাত বাড়িয়ে দিল বিনু, কিন্তু সে এমনভাবে জলে ভেসে রয়েছে যে ধরা যাচ্ছে না।

ধরাই যখন যাচ্ছে না তখন আর সে চেষ্টা করল না বিনু। এখন সে ভেসে থাকতে পারছে। বুক ভরে হাওয়া টানতে টানতে হঠাৎ তার মনে হল, ঝুমা আর সে ছাড়া এখানে তো কেউ ছিল না। তবে কি ঝুমাই তাকে বাঁচাতে জলে ঝাঁপ দিয়েছে?

pathagar.net

যতখানি পারল মাথাটা উঁচু করে একবার নৌকোর দিকে তাকাল বিনু। সেখানে কেউ নেই। ঝুমা—নিশ্চয়ই ঝুমা তাকে টেনে নিয়ে চলেছে।

বিনু ডাকল, 'ঝুমা—'

পাশ থেকে ঝুমাই সাড়া দিল, 'কী বলছ?'

'তুমি আমাকে বাঁচালে। নইলে—'

বিনুর কথা শেষ হবার আগেই ঝুমা বলে উঠল, 'এখন কথা বলতে হবে না। আগে নৌকায় উঠে নাও—'

একসময় তারা নৌকোর কাছে এসে পড়ল। গলুই দেখিয়ে ঝুমা বলল, 'এটা ধর।'

বিনু গলুই ধরল।

ঝুমা আবার বলল, 'আমি তোমার কোমর ধরে ওপর দিকে ঠেলে দিচ্ছি। তুমি নৌকোয় ওঠ।'

দু'তিনবার চেষ্টা করেও বিনু উঠতে পারল না। ঝুমা তখন বলল, 'গলুইটা খুব শক্ত করে ধরে থাকো। আমি তোমাকে ছেড়ে দিয়ে নৌকোয় উঠি।'

ত্রস্ত সুরে বিনু বলল, 'আমাকে ছেড়ে দেবে?'

'বা রে, ছেড়ে না দিলে নৌকোয় উঠব কী করে? আমি উঠে তোমায় টেনে তুলব। কোনও ভয় নেই—'

ভরসা দিয়ে বিনুকে ছেড়ে দিল ঝুমা। তারপর ডুব-সাঁতারে নৌকোর ওধারে গিয়ে চোখের পলকে বেয়ে বেয়ে ওপরে পাটাতনে উঠে পড়ল।

প্রাণপণে দু'হাত দিয়ে গলুইটা ধরে ছিল বিনু। জলে পড়ে যাবার পর থেকেই সীমাহীন এক আতঙ্ক তাকে ঘিরে আছে। ঘোরের ভেতর সে ঝুমার সাঁতার কাটা, নৌকোয় ওঠা দেখতে লাগল।

এদিকে পাটাতনে উঠেই বিনুর দিকে অনেকখানি ঝুঁকে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে ঝুমা। সে বলল, 'আমাকে ধরে ওঠ।'

ঝুমার হাত ধরে আস্তে আস্তে নৌকোয় উঠল বিনু। উঠেই টের পেল, পেটটা খুব ভারী লাগছে। মনে পড়ল, খানিক আগে প্রচুর জল খেয়েছে। বুকের ভেতরটা তার থর থর করছিলই, নিরাপদ জায়গায় উঠবার পর কাঁপুনিটা হাজার গুণ বেড়ে গেল। কিছুক্ষণ নির্জীবের মতো বসে থেকে ক্লান্ত গলায় বিনু বলল, 'তুমি না থাকলে আমি আজ মরে যেতাম।'

গলা ঝাঁকিয়ে ঝুমা বলল, 'যেতেই তো। ধাড়ি ছেলে, এখনও সাঁতার শেখ নি!'

মুখ নীচু করে বিনু বলল, 'তুমি কিন্তু খুব ভাল সাঁতার কাটতে পার।'

'পারিই তো।'

'কোথায় শিখলে?'

'কলকাতায় একটা সাঁতারের ক্লাবে। কী করে জল থেকে মানুষ তুলতে হয় তাও শিখেছি। ভাগ্যিস শিখেছিলাম!'

বিনু চুপ করে থাকল। এতক্ষণ কিছুই দেখতে বা শুনতে পাচ্ছিল না সে। বুঝতেও না। তার সামনে থেকে পাখি-ফুল-ধানখেত, পেঁজা তুলোর মতো সাদা মেঘ এবং ঝকঝকে নীলাকাশ দিয়ে ঘেরা জল-বাংলার এই আশ্চর্য রূপের জগৎটি মুছে গিয়েছিল। জলের ভেতর থাকার সময় একটুখানি শক্ত নিরাপদ মাটি আর বুক-ভরা বাতাসের জন্য সে ছটফট করছিল।

এখন ভয়টা দ্রুত কেটে যাচ্ছে। স্পষ্ট করে সব কথা ভাবতে পারছে বিনু। কিভাবে অথৈ জল থেকে চুলের মুঠি ধরে ঝুমা তাকে তুলে এনেছে, এই কথাটা যতই সে ভাবল ততই অপার বিস্ময় যেন চারদিক থেকে ঘিরে ধরতে লাগল। কৃতজ্ঞ চোখে দুঃসাহসী মেয়েটাকে একবার দেখে নিল বিনু।

গম্ভীর চালে ঝুমা বলল, 'সাঁতারটা তাড়াতাড়ি শিখে নেবে, বুঝলে?'

আস্তে মাথা নাড়ল বিনু।

ঝুমা এবার বলল, 'কাউফল খেয়ে আর কাজ নেই, কি বল?' বলে ফিক করে হেসে ফেলল।

বিনু চুপ। ঘাড় নীচু করেই ছিল সে। এবার আরও একটু নুয়ে পড়ল।

ঝুমা ঠোঁট কুঁচকে হেসে বলল, 'তখন তো পাড়তে গিয়ে উলটে মুলটে জলে পড়লে। আবার পাড়তে গেলে কী করে যে বসবে! তার চাইতে চল, বাড়ি যাই।' হঠাৎ কী মনে পড়ে যেতে তাড়াতাড়ি

বলে উঠল, 'উহুঁ—উহুঁ—'

বিনু মুখ তুলে জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে থাকল।

ঝুমা বলল, 'এক্ষুনি তো যাওয়া হবে না।'

এতক্ষণে গলায় স্বর ফুটল বিনুর। অবাক হয়ে বলল, 'কেন?'

আঙুল দিয়ে নিজের এবং বিনুর ভিজে জামাটামা দেখিয়ে বলল, 'এগুলো আগে শুকিয়ে নিই। নইলে—' বলে চোখের একটা ইঙ্গিত করল।

ইঙ্গিতটা বুঝল বিনু। একটু হেসে অন্য দিকে মুখ ফেরাল।

ঝুমা ডাকল, 'অ্যাই—'

খানিক দূরে নলখাগড়া ঝোপের মাথায় এক ঝাঁক ফড়িং পাতলা ফিনফিনে ডানায় উড়ে বেড়াচ্ছিল। তাদের ওড়াউড়ি দেখতে দেখতে বিনু সাড়া দিল, 'কী?'

ঝুমা বলল, 'তুমি যে জলে পড়ে গিয়েছিলে, একথা কিন্তু কাউকে বোলো না। আমার মা যদি জানতে পারে তোমাকে নিয়ে এসেছি, কাউফল পাড়তে বলেছি, আর সেই জন্যেই তুমি জলে পড়ে গেছ, তা হলে কী হবে জানো?'

ফড়িংদের দিক থেকে দ্রুত মুখ ফিরিয়ে বিনু বলল, 'কী?'

'মা আমাকে ঠিক মেরে ফেলবে।'

বিনু বলল, 'জানতে পারলে আমার মা-বাবাও খুব বকবে। আর কক্ষনো নৌকোয় উঠতে দেবে না।'

ঝুমা বার বার সাবধান করে দিল, 'একদম ঠোঁট টিপে থাকবে।'

'আচ্ছা—' বিনু ঘাড় কাত করল। পরক্ষণেই তার মনে পড়ে গেল, বার বছরের জীবনে কোনও দিন কোনও কথা মা-বাবার কাছে লুকোয় নি সে। কিন্তু এই কথাটা গোপন রাখতেই হবে। নইলে বাইরে বেরুবার পথ আজ থেকে বন্ধ, সারাক্ষণ কেউ না কেউ তাকে পাহারা দিয়ে রাখবে।

সব চাইতে মজার ব্যাপার, ঝুমাকে সে ভাল চেনে না, জানে না। রাজদিয়াতে এসেই তাকে প্রথম দেখেছে। অথচ এই প্রায়-অচেনা মেয়েটা তার লুকনো কথাটা জানবে, আর কেউ না।

আরও কিছুক্ষণ বসে থেকে জামাপ্যান্ট যখন শুকিয়ে গেল, জলে ডোবার কোনও চিহ্নই যখন আর নেই, সেই সময় ঝুমা বলল, 'চল, এবার যাই।'

বিনু বৈঠা নিয়ে তখনকার মতো গলুইর কাছে যাচ্ছিল, ঝুমা চেঁচিয়ে উঠল, 'না—না—'

চমকে বিনু তাকাল, 'কী হল?'

'তোমাকে আর ওস্তাদি করে নৌকো বাইতে হবে না। মাঝখানে বসে থাকো। বৈঠা চালাতে গেলে আবার যদি পড়ে যাও—'

ঝুমা যেভাবে যে কণ্ঠস্বরে কথা বলছে তাতে মনে হয় সে বিনুর চাইতে অনেক বড়। বিনু তার কাছে যেন অবোধ শিশু। ঝুমার চালচলন, ভাবভঙ্গি, সব কিছুই অভিজ্ঞ, বয়স্ক মহিলার মতো।

সাঁতার না জেনে অথৈ জলে পড়ে যাওয়া খুব লোভনীয় ব্যাপার নয়। একটু আগে বিনুর সে অভিজ্ঞতা হয়েছে। কাজেই বৈঠা ফেলে ঝুমার কথামতো তাড়াতাড়ি নৌকোর মাঝখানে এসে বসল সে।

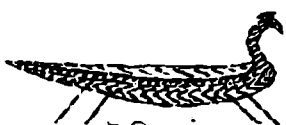

একা একা জল ঠেলে নৌকোটাকে পুকুরঘাটে নিয়ে এল ঝুমা। আর আসতেই দেখা গেল, বাগানের ভেতর সুধা সুনীতি আনন্দ রুমা এবং ঝিনুক ঘুরে বেড়াচ্ছে। শিকার-কাহিনীর আসর তা হলে ভেঙেছে।

সুধারাও বিনুদের দেখতে পেয়েছিল। দেখামাত্র ছুটে এল। উদ্বেগের সুরে সুধা বলল, 'এই, তোরা কোথায় গিয়েছিলি রে?' সুনীতি-আনন্দ-রুমাও সেই একই প্রশ্ন করল। ঝিনুক অবশ্য কিছু বলল

না। তীক্ষ্ণ কুটিল চোখে ঝুমা আর বিনুকে দেখতে লাগল।

বিনু নীরব। ঝুমা লাফ দিয়ে নৌকো থেকে মাটিতে নামল। তারপর বলল, 'আমরা ফুল তুলতে গিয়েছিলাম। এই দেখ কত নিয়ে এসেছি—' পদ্ম শাপলা আর কচুরি ফুলে নৌকো বোঝাই হয়ে আছে। সেগুলো দেখাল ঝুমা।

রুমা বলল, 'কী দস্যি মেয়ে তুই!'

এদিকে নিঃশব্দে বিনুও নেমে এসেছিল। সুধা তাকে ধরল, 'ওইটুকু বাচ্চা মেয়ের সঙ্গে গিয়েছিলি, যদি জলে পড়ে যেতিস? তুই তো সাঁতার টাতার জানিস না!' বলতে বলতে তার চোখ প্রখর হয়ে উঠল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বিনুকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে নিয়ে বলল, 'এদিকে আয় তো—'

ভেতরে ভেতরে ভয় পেয়ে গেল বিনু। ছোটদির যা চোখ, ওকে বিশ্বাস নেই। হয়তো তার জলে ডোবার ব্যাপারটা ধরেই ফেলেছে। দূর থেকেই সে বলল, 'না, যাব না।'

'তোর চুল কিরকম ভেজা ভেজা, জামা-প্যান্ট কোঁচকানো মোচকানো। জলে ভিজেছিলি নাকি?'

আরেকটু দূরে সরে আবছা গলায় বিনু কী বলল, বোঝা গেল না।

সন্দিগ্ধ চোখে বিনুর হাবভাব দেখতে দেখতে আবার কিছু বলতে যাচ্ছিল সুধা, এই সময় রুমা বলে উঠাল, 'এই ঝুমা, তোর চুলগুলোও তো ভেজা, ইজের ফ্রক কোঁচকানো কোঁচকানো। কী করছিলি বল তো তোরা?'

বিনু লক্ষ করল, ঝুমা একটুও ভয় পেল না। যেন কিছুই হয় নি, এমনভাবে নিরীহ ভালমানুষের মতো মুখ করে ডাহা মিথ্যে বলে গেল, 'বিনুদাদা না আমার গায়ে জল ছিটিয়ে দিচ্ছিল, আমিও ওর গায়ে দিয়েছি। তাই ভিজে গিয়েছিলাম।'

'পাজি মেয়ে—'

ব্যাপারটা আরও কিছুক্ষণ হয়তো চলত, তার আগেই আনন্দ বলে উঠল, 'আমার একটা প্রস্তাব আছে।'

সবাই উৎসুক চোখে তার দিকে ফিরল। সুধা জিজ্ঞেস করল, 'কিসের প্রস্তাব?'

কবজি উলটে ঘড়ি দেখে নিয়ে আনন্দ বলল, 'সবে এগারটা বাজে। খাওয়াদাওয়ার এখনও দেরি আছে। ততক্ষণ নৌকোয় করে আমরা একটু ঘুরে আসি না কেন।'

সুধা বলল, 'খুব ভাল, খুব ভাল—'

সুনীতি কিছু বলল না। তবে ঘাড় কাত করে জানালো, এ ব্যাপারে তার বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই। রুমা তো প্রায় হাততালি দিয়ে উঠল, 'আমরা নৌকোয় চড়ব। কী ভাল যে লাগছে!'

আনন্দ বলল, 'সবাই যখন রাজি তখন আর দেরি করে দরকার নেই। আসুন—আসুন—'

সুনীতি সবার আগে ছিল। সে প্রথমে নৌকোয় উঠল। তারপর উঠল আনন্দ। আনন্দর ঠিক পরেই ছিল সুধা। নৌকোর দিকে পা বাড়াতে গিয়ে হঠাৎ থমকে গেল সে।

আনন্দ বলল, 'কী হল?'

সুধার মাথায় ততক্ষণে অনেকখানি দুষ্টুমি ভর করে বসেছে। কৌতুকের আভায় তার নীলচে চোখ ঝিকমিক করছে। ঠোঁট টিপে সে বলল, 'কিছু হয় নি।'

'তা হলে উঠে পড়ুন।'

ভুরু কুঁচকে কেমন করে যেন আনন্দর দিকে তাকাল সুধা। বলল, 'উঠব?'

আনন্দ বলল, 'বাঃ, বেশ! নৌকোয় করে ঘোরা হবে বলে কথা হল। না উঠলে ঘুরবেন কী করে?'

সুধা উত্তর দিল না। কেউ কিছু বুঝবার আগেই হঠাৎ এক কান্ড করে বসল সে। গলুই ধরে জোর ধাক্কায় নৌকোটাকে গভীর জলের দিকে ঠেলে দিল।

আনন্দ প্রথমটা বিমূঢ়। পরক্ষণে চেঁচিয়ে উঠল, 'এটা কী হল, এটা কী হল!'

সুধার ষড়যন্ত্রটা ধরতে পেরে সুনীতিও চিৎকার করছে, 'বাঁদর মেয়ে, পাজি মেয়ে—'

সুধা পুকুরঘাট থেকে গলা তুলে বলতে লাগল, 'আনন্দদা, দিদি আপনার শিক্ষায়ের গল্প খুব

ভালবাসে। শুনতে শুনতে একেবারে মুগ্ধ-মুগ্ধ-মুগ্ধ হয়ে যায়। সুযোগ করে দিলাম, যত পারেন শুনিয়ে দেবেন।' বলে হেসে হেসে গলে পড়তে লাগল।

পুকুরের মাঝখান থেকে সুনীতি সমানে চেঁচিয়ে যাচ্ছে, 'শয়তান মেয়ে, মাকে বলে তোমার ফাজলামি বার করে ছাড়ব।'

আনন্দ বিব্রত, হতভম্ব। কী করবে তা যেন ভেবে উঠতে পারছে না। হাতের ইশারায় সুধা তাকে নৌকো নিয়ে দূরে পাড়ি দিতে বলল। তারপর রুমার দিকে ফিরে বলল, 'তুমি নিশ্চয়ই খুব রাগ করেছ—'

রুমা বলল, 'এ মা, শুধু শুধু রাগ করব কেন?'

'নৌকো করে বেড়াতে পারলে না বলে।'

'নৌকোয় আমি ঢের চড়েছি। আজ না হয় নাই চড়লাম।' রুমা বলতে লাগল, 'আমি কি ছেলেমানুষ যে এই জন্যে রাগ করব?'

একটু চুপ করে থেকে সুধা বলল, 'ব্যাপারটা কী জানো ভাই—'

'কী?'

'তোমার মামাটি আমার দিদিভাইয়ের—' এই পর্যন্ত বলে সুধা চোখ টিপল।

রুমাও চোখ নাচাল। সুর টেনে বলল, 'সত্যি!'

মাথা অল্প কাত করে হেসে সুধা বলল, 'সত্যি—'

'তাই বুঝি দু'জনকে চান্স করে দিলে?'

'হ্যাঁ।'

'তোমার মতো দয়ালু মেয়ে আর কক্ষনো দেখি নি।'

'বলছ!'

'হুঁ-উ-উ—'

একটু চুপ করে থেকে রুমা আবার বলল, 'তোমার কথা জানা রইল। দরকার হলে আমাকেও এইরকম চান্স টান্স করে দিও—'

সকৌতুক, রসাল গলায় সুধা বলল, 'নিশ্চয়ই। কবে দরকার হচ্ছে?'

চোখ ছোট করে রুমা বলল, 'এক্ষুনি ঠিক বলতে পারছি না।'

কী বলতে যাচ্ছিল সুধা, হঠাৎ দেখতে পেল বিনু ঝুমা আর ঝিনুক পলকহীন তাকিয়ে আছে। সুধা ঝংকার দিয়ে উঠল, 'কী শুনছিস রে তোরা? এই উল্লুক ছেলে—'

বিনু বলল, 'তোরা যা বলছিস তাই শুনছি।'

সুধা তাড়া লাগল, 'খুব পাকা হয়েছ, না? যা যা, এখান থেকে ভাগ—'

'তোরা ভাগ—'

সুধা রেগেমেগে উঠতে যাচ্ছিল, রুমা বলে উঠল, 'চল চল, আমরা ওই বাগানের দিকটায় যাই—'

উত্তর দিকে বাগানটা যেখানে বেতের লতা আর হলুদ রঙের লটকা ফলের গাছে ঘন হয়ে আছে, সুধারা সেদিকে চলে গেল।

বিনুরা দাঁড়িয়েই ছিল। ঘাড় ফিরিয়ে পুকুরটার দিকে তাকাতে গিয়েই সে অবাক। ওদের নৌকোটার চিহ্নমাত্র নেই, ধানখেতের ভেতর কোথায় কখন অদৃশ্য হয়ে গেছে, কে জানে।

বিনুর দেখাদেখি ঝুমাও পুকুরের দিকে তাকাল। বলল, 'কী খুঁজছ?'

বিনু বলল, 'নৌকোটা কোথায় গেল বল তো—'

ভুরু নাচিয়ে ঠোঁট টিপে চাপা গলায় ঝুমা বলল, 'আমার মামা তোমার দিদিকে নিয়ে হয়তো—'

'কী?'

'আমরা যেখানে গিয়েছিলাম সেখানে চলে গেছে।'

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে যেতে ভয়ে ভয়ে বিনু বলল, 'জানো, আমার বড়দিটা সাঁতার জানে না। ফুল তুলতে গিয়ে কি কাউফল পাড়তে গিয়ে যদি জলে পড়ে যায়?'

ঝুমা বলল, 'এই জন্যে তুমি ভয় পাচ্ছ?'

'হুঁ—'

'কোনও ভয় নেই। আমার মামাই তো সঙ্গে আছে।'

'তোমার মামা বুঝি সাঁতার জানে?'

'হ্যাঁ।'

'তোমার মতো?'

'আমার চাইতে ঢের, ঢের ভাল। তোমার দিদি যদি জলে পড়ে যায়, মামা ঠিক তুলে আনবে।'

আরেকটু কাছে এগিয়ে এসে খুব আস্তে আস্তে বিনু বলল, 'যেমনি করে তুমি আমায় তুলে এনেছিলে?'

একটুখানি ভেবে নিয়ে ঝুমা বলল, 'কেমন করে আনবে জানি না। একেক জন একেক রকম করে তুলে আনে। আমি তো তোমার চুলের মুঠি ধরে তুলেছিলাম। কেউ কেউ আবার জড়িয়ে ধরেও তোলে।'

হঠাৎ গলা চড়িয়ে বিনু বলে উঠল, 'কক্ষনো না।'

ঝুমা অবাক, 'কী!'

'তোমার মামা আমার দিদিকে কক্ষনো জড়িয়ে ধরে জল থেকে তুলবে না।'

'যেমন করে পারে তুলুক, তাতে তোমার কী, আমার কী। চল, এখন বাড়ি যাই—'

আগে আগে বিনু আর ঝুমা চলেছে। পেছনে ঝিনুক।

যেতে যেতে সরু গলায় ঝুমা ডাকল, 'অ্যাই—'

বিনু অন্যমনস্কের মতো হাঁটছিল। ব্যস্তভাবে চোখ তুলে পাশের দিকে তাকাল।

ঝুমা বলল, 'সেই কথাটা কিন্তু কাউকে বোলো না।'

'কোন কথাটা?'

'হাঁদারাম শিকদার। একটু আগে কাউফল পাড়তে গিয়ে কী হয়েছিল মশাই?'

চট করে ঘাড় ফিরিয়ে ঝিনুককে দেখে নিল বিনু। মেয়েটা গোয়েন্দা চোখে একদৃষ্টে তার দিকে তাকিয়ে আছে। তাড়াতাড়ি বিনু বলে উঠল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, আমার মনে আছে।'

'সেটা বললে দু'জনেরই কিন্তু—'

'কী?'

কানের কাছে মুখ এনে ঝুমা ফিসফিস করল, 'মার হবে।'

সেই অবস্থাতেই বিনু যতখানি পারল, মাথাটা নেড়ে ঝিনুককে দেখতে চেষ্টা করল। মেয়েটা ঝুমার কথা শুনবার জন্য কান খাড়া করে আছে।

একসময় তারা বাড়ি এসে গেল।

দুপুর পেরিয়ে সূর্যটা যখন পশ্চিমে খানিকটা ঢলে পড়েছে, রোদের রঙে যখন হলুদ আভা ফুটল, সেই সময় খাবার ডাক পড়ল।

রান্নাঘরের লম্বা বারান্দায় সারি সারি আসন পড়েছে। সবাইকে একসঙ্গে বসিয়ে দিলেন স্নেহলতা।

আনন্দ-সুধা-সুনীতি-ঝুমা-রুমা আর ঝিনুক বসেছে একদিকে। আরেক দিকে অবনীমোহন শিশির এবং হেমনাথ।

খেতে খেতে, আড়ে আড়ে সুধা আর রুমা আনন্দ এবং সুনীতিকে দেখতে লাগল। তাদের চোখেমুখে চাপা দুষ্টুমির হাসি আঠার মতো মাখানো।

সুনীতি চোখ তুলে কারোর দিকে তাকাচ্ছে না, ঘাড় গুঁজে পাতের ওপর ঝুঁকে খুব মনোযোগ দিয়ে খেয়ে যাচ্ছে। ভাত-ডাল-মাছভাজা দিয়ে সাজানো প্রকাণ্ড একখানা কাঁসার থালা ছাড়া তার

pathagar.net

আশেপাশে সামনে পেছনে আর কিছুই যেন নেই, বিশ্বসংসার সব মুছে গেছে।

সুধা দু'চারবার ডাকাডাকি করে যখন সুনীতির সাড়া পেল না তখন আনন্দর দিকে ফিরল। গলার খুব গভীর থেকে ডাকল, 'এই যে—এই মশাই—'

আনন্দ তাকাল। হেসে হেসে বলল, 'কী বলছেন?'

'আছেন কেমন?'

'ভালই।'

চোখের তারাদু'টো খঞ্জনপাখির মতো কিছুক্ষণ নেচে বেড়াল সুধার। তারপর সে বলল, 'নৌকোভ্রমণ কেমন লাগল?'

আধবোজা চোখে আধফোটা গলায় আনন্দ বলল, 'ওই একরকম।'

অবাক হবার মতো করে সুধা বলল, 'একরকম কী মশাই!'

'তবে কিরকম?'

'বলুন চমৎকার।'

ঘাড়খানা খানিক বাঁকিয়ে হাসতে হাসতে আনন্দ বলল, 'বেশ, তাই—'

সুধা বলল, 'কেমন একখানা সুযোগ করে দিলাম বলুন তো?'

'ধন্যবাদ।'

'শুধু ধন্যবাদে চলবে না।'

'তবে?'

'তার জন্যে পুরস্কার চাই।'

'কী পুরস্কার?'

'সে আপনি জানেন।'

একটু ভেবে নিয়ে আনন্দ বলল, 'এক্ষুনি তো আর দেওয়া যাবে না। পুরস্কারের কথাটা মনে থাকল। আমাকে যেরকম সুযোগ করে দিয়েছেন তেমনি একটা সুযোগ টুযোগ আপনাকেও—'

সরু করে জিভ বার করে দ্রুত ভেংচে উঠল সুধা, 'এ-হে-হে—' তারপর সুনীতির দিকে তাকিয়ে বলল, 'নৌকোয় সময়টা বেশ কাটল, না রে দিদি?'

সুনীতি চুপ। পাতের দিকে ঝুঁকেই ছিল সে, আরও অনেকখানি নুয়ে পড়ল।

ওদিকে বারান্দার দূর প্রান্তে আরেকটা খেলা চলছে। বিনু খুব মনোযোগ দিয়ে সুধাদের কথা শুনছিল। আর তার পাশ থেকে একটু পর পরই ফিস ফিস গলায় ডেকে যাচ্ছিল ঝিনুক, 'অ্যাই—অ্যাই—অ্যাই—'

ক'দিন হল বিনুরা রাজদিয়ায় এসেছে। এর ভেতর তার সঙ্গে একটি কথাও বলে নি ঝিনুক। আজ তাকে ডাকতে শুনে অবাক হয়ে গিয়েছিল বিনু। কিন্তু তার চাইতেও বড় বিস্ময় ছিল সুধাদের দিকে। বিনুর চোখ-কান-মন, সব সুধারাই চুম্বকের মতো টেনে রেখেছিল। ফলে ঝিনুকের ডাকটা শুনতে পেলেও সে সাড়া দিচ্ছিল না, অন্যমনস্কের মতো বসে ছিল।

সুধা একটু থামলে ঝিনুকের দিকে ফিরল বিনু। সুধাদের কথা শুনতে শুনতে আবছাভাবে যে বিস্ময়টা সে অনুভব করছিল, এবার তা মুখেচোখে খুব স্পষ্ট ফুটে বেরুল।

ঝিনুক তাকিয়েই ছিল। চোখাচোখি হতে বলল, 'কতক্ষণ ধরে তোমায় ডাকছি। শুনতে পাও না?'

বিনু বলল, 'ডাকছ কেন?'

'তখন নৌকোয় করে তোমরা কোথায় গিয়েছিলে?'

'ওই ধানখেতের ওধারে।'

'কী করতে?'

কী করতে গিয়েছিল, বিনু বলল।

ঝিনুক বলল, 'খুব ঘুলটুল তুললে তা হলে।'

'হুঁ—' বিনু ঘাড় কাত করল।

একটু চুপ করে থেকে ঝিনুক বলল, 'কাউফল পাড়তে গিয়ে তোমার কী হয়েছিল?'

বিনু ভীষণ চমকে উঠল। ভীতু চোখে ঝিনুককে দেখতে দেখতে বলল, 'কী আবার হবে? কিছু হয় নি তো—'

বিনুর চোখের ভেতর তাকিয়ে ঝিনুক বলল, 'নিশ্চয়ই হয়েছে।'

কাঁপা সুরে বিনু বলল, 'সত্যি বলছি, হয় নি।'

'তা হলে ও তোমাকে কী একটা কথা বলতে বারণ করল কেন?' বলে আড়চোখে ঝুমাকে দেখিয়ে দিল ঝিনুক।

চট করে মনে মনে বানিয়ে নিয়ে বিনু বলল, 'ও—হ্যাঁ হ্যাঁ, এবার মনে পড়েছে। কাউফল পাড়তে যখন যাই একটা কাক আমার মাথায় ঠুকরে দিয়েছিল। সেই কথাটা বলতে বারণ করেছে ঝুমা।'

একদৃষ্টে তাকিয়েই ছিল ঝিনুক। খুব আস্তে আস্তে সে মাথা নাড়ল, 'উহুঁ—উহুঁ—উহুঁ—'

'কী?'

'কাক না।'

'তবে কী?'

'আর কিছু হয়েছে। তুমি আমার কাছে লুকোচ্ছ।'

'না না, আর কিচ্ছু হয় নি।'

'মা কালীর দিব্যি?'

'তোমার বুঝি বিশ্বাস হচ্ছে না?'

'মা কালীর দিব্যি বললে বিশ্বাস হবে।'

ওধার থেকে হেমনাথ ডেকে উঠলেন, 'আনন্দ—'

সুধা-আনন্দ-সুনীতি আর রুমার মধ্যে সেই মজার খেলাটা চলছিলই। চাপা মৃদু গলায় তারা কথা বলছিল, হাসাহাসি করছিল। ডাকটা শুনতে পায় নি আনন্দ।

হেমনাথ রগুড়ে গলায় আবার ডাকলেন, 'এই যে বাঘ-ভাল্লুক মারিয়ে—'

চমকে আনন্দ তাকাল, 'আজ্ঞে, আমায় ডাকছেন?'

হেমনাথ ঘাড় কাত করলেন। ইঙ্গিতময় সুরে বললেন, 'আপনি কি ওদিকে খুব ব্যস্ত?'

আনন্দ হকচকিয়ে গেল। মুখ ঈষৎ নত করে আস্তে আস্তে বলল, 'আজ্ঞে না। এমনি গল্প করছিলাম।'

হেমনাথ বললেন, 'কী গল্প?'

'এই নানারকম, আজে বাজে—'

'যুবক যুবতীদের কথায় আমাদের থাকতে নেই। সে যাক গে—'

এই সময় সুধা চেঁচিয়ে উঠল, 'এ কি দাদু!'

সুধার গলায় এমন একটা সুর ছিল যাতে থতিয়ে গেলেন হেমনাথ। বললেন, 'কী রে?'

'তখন না বললেন আপনি ইয়ং ম্যান, একটা দাঁতও পড়ে নি, চামড়া কোঁচকায় নি, চশমা ছাড়া দশ মাইল দূরের জিনিস দেখতে পান। আরও কত কী। আমাদের নিয়ে একটা মোগল হারেমও খুলতে চেয়েছিলেন। এখন বলছেন যুবক যুবতীদের কথায় থাকেন না। তবে কি আপনি বুড়ো?'

'খুব ধরেছিস দিদি, খুব ধরেছিস—' হেমনাথ উচ্ছ্বসিত হয়ে হেসে উঠলেন। শরতের দমকা হাওয়ায় তাঁর হাসির শব্দ এদিক সেদিক ভেসে বেড়াতে লাগল।

হাসি থামলে আবার আনন্দকে নিয়ে পড়লেন হেমনাথ, 'তুমি তো ইস্টবেঙ্গলে এই প্রথম এলে—'

'আজ্ঞে হ্যাঁ—' আনন্দ মাথা নাড়ল।

'কেমন লাগছে জায়গাটা?'

'ভাল। তবে বড্ড জল। নৌকো ছাড়া দূরে কোথাও বেরুনো যায় না।'

'এলেই তো বর্ষার সময়, জল থাকবে না?'

pathagar.net

'বর্ষা কোথায়? এ তো আশ্বিন মাস—শরৎকাল।'

'আমাদের বর্ষা আরম্ভ হয় আষাঢ়ের গোড়ায়, চলে একটানা কার্তিক মাস পর্যন্ত। শীতের সময় কি গরমে এলে দেখতে মাঠে জল নেই, চারদিক শুকনো খটখটে।'

একটু চুপ করে থেকে আনন্দ বলল, 'জামাইবাবু বলেছিলেন, এ সময় এলে ভাল গেম হবে। আমি ছর্‌রা টর্‌রা, কার্তুজ-বন্দুক, সব নিয়ে এসেছি। বাঘটাঘ দূরে থাক, এই জলের ভেতর কোথায় গিয়ে যে দু'টো পাখি মারব তাই ভেবে পাচ্ছি না।'

হেমনাথ অবাক। বললেন, 'পাখি শিকারের জায়গাও তোমায় কেউ দেখিয়ে দেয় নি!'

'আজ্ঞে না।'

'ঠিক আছে, যুগলের সঙ্গে তোমাকে নিশিন্দার চরে পাঠিয়ে দেব। কত পাখি মারতে পার, একবার দেখব।'

আনন্দ প্রায় লাফিয়ে উঠল, 'কবে পাঠাবেন?'

'যেদিন বলবে।'

'কাল?'

'বেশ তো।'

এই সময় শিশির বললেন, 'কাল কেমন করে যাবে? কাল বাড়োরি বাড়ি নেমন্তন্ন আছে না?'

আনন্দ বলল, 'তা হলে পরশু টরশু—' বলতে বলতে হঠাৎ কী মনে পড়ে গেল, 'এক কাজ করলে কী হয়?'

হেমনাথ শিশির অবনীমোহন—সবাই উৎসুক হলেন।

আনন্দ বলতে লাগল, 'একা একা আমি না গিয়ে সবাই মিলে গেলে দিনটা দারুণ কাটবে। সকালবেলা খাবার দাবার নিয়ে বেরিয়ে যাব, পাখি টাখি শিকার করে ফিরব সেই রাত্তিরে।'

অবনীমোহন বিপুল উৎসাহে সমর্থন জানালেন, 'চমৎকার আইডিয়া। সবাই মিলে একসঙ্গে একটা দিন হইহই করে কাটানো যাবে।'

অবনীমোহন সেই মানুষ সবসময় চমকপ্রদ কিছুর জন্য যাঁরা উন্মুখ হয়ে থাকেন, হাতের কাছে যখন যে স্রোতটি পান তাতেই ঝাঁপিয়ে পড়েন। ছোট বড় যেরকম ঢেউই উঠুক না, তাঁকে দুলিয়ে যায়। তিনি বলতে লাগলেন, 'জানো আনন্দ, কম বয়েসে দু'চারটে পাখি আমিও মেরেছি।'

এবার আনন্দর অবাক হবার পালা, 'তাই নাকি!'

ঘাড় ঈষৎ হেলিয়ে অবনীমোহন বললেন, 'তোমার কাছে এক্সট্রা বন্দুক টন্দুক আছে?'

'আছে।'

'খুব ভাল, খুব ভাল। বুড়ো বয়েসে একবার চাঁদমারি করে দেখা যাবে কেমন হয়।'

সুরমা স্নেহলতার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ছিলেন। নাক কুঁচকে, চোখের মণিতে আলতো করে কপট তাচ্ছিল্য মিশিয়ে স্নেহলতা বললেন, 'তুমি মারবে পাখি, তবেই হয়েছে! গাছের ডালে পাখির মনে পাখি বসেই থাকবে, তোমার গুলি যাবে তিন মাইল দূর দিয়ে। শুধু শুধু ছর্‌রা নষ্ট।'

হেমনাথ বললেন, 'না পারলেই বা কী। আনন্দ করতে যাওয়া, সেটা হলেই হল।'

স্নেহলতা বললেন, 'আমাকেও তোমাদের সঙ্গে যেতে হবে নাকি?'

অবনীমোহন বললেন, 'নিশ্চয়ই। সবাই যাবে আর আপনি বাড়ি বসে থাকবেন, তা হতে পারে না। তা হলে আনন্দের অর্ধেকটাই মাটি।'

'আমি কিন্তু পরশু যেতে পারব না।'

হেমনাথ বললেন, 'কেন?'

'আমার সেদিন উপোস।'

'তা হলে কবে যাবে?'

'এক্ষুনি কী করে বলি? এমন ঘোড়ায় জিন দিয়ে থাকলে চলে?'

ঠিক হল, কালও না, পরশুও না—পরে সুবিধেমতো দিন ঠিক করে নিশিন্দার চরে শিকারে যাওয়া হবে।

খাওয়াদাওয়ার পর সারা বিকেল গল্প করে সন্ধের আগে আগে শিশিররা চলে গেলেন। তারপরও অনেকক্ষণ ওদের কথা হল, বিশেষ করে আনন্দর।

অবনীমোহন বললেন, 'বেশ ছেলেটি।'

হেমনাথ বললেন, 'হ্যাঁ, খুব স্মার্ট। সুপুরুষ।'

এদিকে একধারে বসে চাপা নীচু গলায় সুধা সুনীতিকে বলতে লাগল, 'শুনছিস দিদি, শুনছিস—'

অস্বস্তির গলায় সুনীতি বলল, 'কী আবার শুনব?'

'বাবা কেমন আনন্দবাবুর ভক্ত হয়ে উঠেছে!'

'উঠেছে তো বেশ করেছে।'

'আমার কী মনে হয় জানিস?'

অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে সুনীতি বলল, 'জানতে চাই না।'

সুনীতির মুখ যেদিকে, সেদিকে গিয়ে আঙুলের ডগায় তার চিবুকটা তুলে ধরল সুধা। হালকা গলায় বলল, 'আনন্দবাবুকে বাবা বোধহয় জামাই করে নেবে।'

সুনীতি ভেংচে ভেংচে বলল, 'তোকে বলেছে!'

'এখনও বলে নি। তবে বাবার কথাবার্তা শুনে তাই মনে হচ্ছে।'

চট করে কী ভেবে নিয়ে তরল পরিহাসের চোখে বোনের দিকে তাকাল সুনীতি, 'বাবার ভাবগতিক দেখে আমার কিন্তু আরেকটা কথা মনে হয়—'

ঠিক বুঝতে না পেরে সুধা বলল, 'কী?'

'আনন্দবাবুর আগে হিরণবাবুকেই বাবা জামাই করে নেবে।'

চোখ পাকিয়ে সুধা বলল, 'ভাল হবে না বলছি দিদি।'

কাছাকাছি বসে শুনতে শুনতে বিনু টের পাচ্ছিল, আনন্দ আর হিরণকে নিয়ে দুই দিদির ভেতর এক মজার খেলা শুরু হয়েছে।

শিশিররা যখন যান তখনও একটু রোদ ছিল। শরৎকালের বেলাশেষের কুণ্ঠিত আলো। দেখতে দেখতে সেটুকুও আর থাকল না। লাটাইতে সুতো গুটনোর মতো গাছপালার মাথা থেকে, ঝকঝকে নীলাকাশ থেকে, তুলোর পাহাড়ের মতো ভারহীন মেঘেদের গা থেকে, কেউ যেন অতি দ্রুত অবেলার রোদ টেনে নিতে লাগল। তারপরেই সমস্ত চরাচর জুড়ে একখানা কালচে রঙের অদৃশ্য জাল এসে ছড়িয়ে পড়ল। দেখতে দেখতে রৌদ্রময় আকাশ, গাছগাছালি, দূরের জলপূর্ণ প্রান্তর—সব কিছু ঝাপসা হয়ে গেল। আশ্বিনের সন্ধে লম্বা পায়ে নেমে আসতে লাগল।

ঝাঁঝরির ফাঁক দিয়ে যেমন জল ঝরে যায় তেমনি করে হইচই, হুল্লোড়, ছোটাছুটির ভেতর দিয়ে দিনটা কখন ফুরিয়ে গেছে টের পাওয়া যায়নি। সন্ধের পর যখন আকাশের দূর প্রান্তে এক টুকরো চাঁদ উঠল, আবছা আলোয় অন্ধকারটাকে জলো কালির মতো মনে হতে লাগল, ধানের খেতে জোনাকি জ্বলতে লাগল মিটমিটিয়ে, আর অবনীমোহনদের গল্প, সুধা সুনীতির লঘু সুরের পরিহাস জমে উঠতে লাগল, সেই সময় চোখের পাতা জুড়ে এল বিনুর। বসে বসেই ঢুলতে লাগল সে।

স্নেহলতা দেখতে পেয়েছিলেন। বললেন, 'এই দাদাভাই—'

চোখ পুরোপুরি মেলে তাকাতে চেষ্টা করল বিনু, পারল না। আধবোজা দৃষ্টিতে একবার তাকিয়েই আবার চোখ বুজল।

স্নেহলতা বললেন, 'ঘুম পেয়েছে?'

'হুঁ—' অস্ফুটে উত্তর দিয়ে আস্তে করে মাথা নাড়ল বিনু।

সুরমা বললেন, 'ঘুম পাবে না তো কী। সারা দিনে এক মুহূর্তও কি পা পেতে বসে। সবসময়

খালি হুড়োহুড়ি, ছুটোপুটি। সন্ধে হলে আর তাকিয়ে থাকতে পারে না।'

অবনীমোহন বললেন, 'রাজদিয়া আসা থেকে তো বইটইয়ের সঙ্গে সম্পর্ক ঘুচে গেছে। পড়া নেই শোনা নাই, ফিরে গিয়ে অ্যানুয়াল পরীক্ষাটা তো দিতে হবে।' বলতে বলতে স্ত্রীর দিকে ফিরলেন, 'বাক্স থেকে ওদের বই বার করেছ?'

সুরমা বললেন, 'না।'

'আজ রাত্তিরেই বার করে রাখবে।'

হেমনাথ বললেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, খালি বেড়ালেই চলবে না, পড়াশোনাও করতে হবে। চর্চা না থাকলে সব ভুলে যাবে। কাল থেকে সকালবেলাটা শুধু লেখাপড়া।'

স্নেহলতা বললেন, 'কালকের কথা কালকে হবে। আয় রে দাদাভাই, ঝিনুকও আয়। তোদের খাইয়ে বিছানায় পাঠিয়ে দিই।'

ঘুমের ঘোরেই খেয়ে নিল বিনু। অস্পষ্টভাবে টের পেল তার পাশে বসে ঝিনুকও খাচ্ছে, নিজে খাচ্ছে না, কেউ খাইয়ে দিচ্ছে। কে দিচ্ছে, বোঝা গেল না। বুঝতে চেষ্টা করল না বিনু।

রাত্তিরে বিনু আর ঝিনুক পুবের ঘরে হেমনাথের কাছে শোয়। দু'জনকে খাইয়ে দাইয়ে সেখানে দিয়ে গেলেন স্নেহলতা। হেমনাথের শুতে এখনও অনেক দেরি। হাতমুখ ধোবেন, কিছুক্ষণ বই টই পড়বেন। তারপর তো শোওয়া।

স্নেহলতার সঙ্গে ঢুলতে ঢুলতে এ ঘরে এসেছিল বিনু। চোখ দু'টো জুড়েই ছিল। বিছানায় পড়ামাত্র রাজ্যের ঘুম চারদিক থেকে তাকে ঘিরে ধরল।

অথৈ ঘুমে ডুবে যেতে যেতে হঠাৎ বিনুর মনে হল, ছোট ছোট হাত দিয়ে কেউ তাকে ঝাঁকুনি দিচ্ছে। সমানে বলছে, 'অ্যাই-অ্যাই-অ্যাই—'

এ ঘর প্রায় অন্ধকার। মাথার দিকের টেবিলে একটা হেরিকেন নিবু নিবু হয়ে জ্বলছে। স্নেহলতা যাবার সময় চাবি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ওটার জোর কমিয়ে দিয়ে গেছেন।

অস্পষ্ট আলোয় চোখ মেলে একবার দেখে নিল বিনু। এমনিতে হেমনাথ মাঝখানে শোন, তাঁর দু'ধারে তারা দু'জনে থাকে। আজও মাঝখানে হেমনাথের জায়গা রেখে বিনুরা শুয়েছিল। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে, ঝিনুকটা অনেকখানি কাছে সরে এসেছে। সে-ই তাকে ধাক্কা দিচ্ছে, ডাকাডাকি করছে।

চোখ মেলতেই চোখাচোখি হয়ে গিয়েছিল। ঝিনুক বলল, 'তোমার বড্ড ঘুম, ভোঁস ভোঁস করে খালি নাক ডাকে।'

বিরক্ত, জড়ানো গলায় বিনু বলল, 'ঠেলছ কেন?'

'তখন তো মা কালীর দিব্যি বললে না—'

বিনু ভুলে গিয়েছিল। বলল, 'মা কালীর দিব্যি বলব কেন?'

ঝিনুক অবাক, 'বা রে, মনে নেই?'

'উঁহু—'

'ঝুমার সঙ্গে কাউফল পাড়তে গিয়ে কী হয়েছিল, জিজ্ঞেস করলাম। তুমি বললে, কিছুই হয় নি। তখন মা কালীর দিব্যি দিতে বললাম। এবার মনে পড়ছে?'

বিনু হতভম্ব। কী শয়তান মেয়ে রে! কথাটা একদম ভোলে নি, কাঁচা ঘুম ভাঙিয়ে মনে করিয়ে দিচ্ছে।

ঝিনুক বলল, 'বল, মা কালীর দিব্যি বল—'

মা কালীর নামে দিব্যি করতে বিনুর খুব আপত্তি। দেবতাদের মধ্যে কালীকেই তার সব চাইতে বেশি ভয়। হাতে খড়্গ, গলায় অসুরমুণ্ডের মালা—এই ভয়ঙ্করী দেবীটি সম্বন্ধে অনেক সাঙ্ঘাতিক গল্প বিনুর জানা। সেই জন্যই তাকে ঘাঁটাতে চায় না সে।

বিনু বলল, 'শুধু শুধু দিব্যি কাটব কেন? তোমাকে তো বললাম, কাউ পাড়তে গিয়ে কিছু হয় নি।'

চাপা গলায় ঝিনুক বলল, 'বুঝেছি।'

'কী?'

pathagar.net

'দিব্যি দিতে ভয় পাচ্ছ। নিশ্চয়ই কাউ পাড়তে গিয়ে কিছু হয়েছে। শিগ্‌গির আমাকে বল, নইলে—'

'নইলে কী?'

'আমি তোমার মা বাবাকে বলে দেব।'

বিনু চমকে উঠল, 'কী বলবে?'

ঝিনুক বলতে লাগল, 'তোমার চুলগুলো আর জামা প্যান্ট কেমন দেখাচ্ছিল। আমার মনে হয়, তুমি জলে পড়ে গিয়েছিলে।'

কাজেই আর গোপন রাখা গেল না। কাউফল পাড়ার সময় যা যা ঘটেছিল, সব বলে ফেলল বিনু।

সমস্ত শুনে ঝিনুক বলল, 'খুব তো লুকিয়ে রাখতে চেয়েছিলে। পারলে?'

বিনু চুপ।

ঝিনুক আবার বলল, 'জানো, আমায় কেউ ফাঁকি দিতে পারে না।'

কথাটা যে হাজার বার সত্যি, মনে মনে বিনুকে তা মানতেই হল।

ঝিনুক বলল, 'আর কখনও আমাকে ফাঁকি দেবে না, বুঝলে?'

'আচ্ছা—' সুবোধ ছেলের মতো ঘাড় কাত করল বিনু।

'দিতে চেষ্টা করলে কিন্তু ঠিক ধরে ফেলব।'

একটু চুপ করে থেকে করুণ অনুনয়ের সুরে বিনু বলল, 'তোমায় সব বললাম। জলে পড়ার কথাটা মা-বাবাকে বোলো না কিন্তু—'

'বললে কী হবে?'

'খুব মারবে।'

'আচ্ছা বলব না। তবে—'

'কী?'

'আমি যা বলব তাই করবে তো?'

যে কোনও শর্তেই এখন বিনু রাজি। তক্ষুনি ঘাড় কাত করল সে, 'হ্যাঁ।'

একটু ভেবে ঝিনুক বলল, 'আমার ঘুম পেয়েছে, আর কথা বলতে পারছি না।'

বিনু বলল, 'আমিও।'

'এস, ঘুমিয়ে পড়ি।'

ঘুমিয়ে পড়তে পড়তে বিনুর মনে হল, ঝিনুকের কাছে কিছুই গোপন রাখা যাবে না। যে সিন্দুকেই পুরে রাখুক না, কুলুপ ভেঙে মেয়েটা সেটি ঠিক বার করে নেবে।

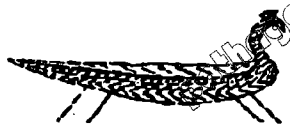

কাল রাত্তিরেই বই বার করে রেখেছিলেন সুরমা।

ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে মুখটুখ ধুয়ে হেমনাথ আর ঝিনুকের সঙ্গে প্রথমে সূর্যস্তব সেরে নিল বিনু। তারপর পড়তে বসল। পুজোর ছুটির পর স্কুল খুললেই অ্যানুয়াল পরীক্ষা। এখন থেকেই একটু আধটু পড়াশোনা না করে গেলে ডাহা ফেল।

বিনু একাই না, সুধা সুনীতিও আজ তাড়াতাড়ি উঠে বই নিয়ে বসেছে। কলেজ খুললেই অবশ্য তাদের পরীক্ষা নয়। তবু চর্চাটা রাখা ভাল। নইলে সব ভুলে বসে থাকবে।

পুবের ঘরের বারান্দায় তিন ভাই বোন পড়তে বসেছিল। দূর প্রান্তে বসে ছিলেন হেমনাথ, তাঁর পাশে ঝিনুক।

পড়ার ফাঁকে বিনুর চোখ বার বার ঝিনুকের দিকে চলে যাচ্ছিল। ঝিনুকও একদৃষ্টে তার দিকে তাকিয়ে আছে।

বিনু শুনতে পেল, অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে থাকার পর নীচু গলায় ঝিনুক হেমনাথকে ডাকল, 'দাদু—'

হেমনাথ দূরে ধানখেতের দিকে তাকিয়ে কিছু ভাবছিলেন। মুখ ফিরিয়ে বললেন, 'কী রে—'

'আমি পড়ব।'

'খুব ভাল কথা। পড় না—'

'আমাকে বই দাও—'

'কোথায় তোর বই?'

'আমাদের বাড়িতে।'

'আচ্ছা আনিয়ে দেব'খন। তখন পড়িস।'

ঝিনুক শুনল না। মাথা ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে বায়না জুড়ে দিল, 'এক্ষুনি আনাও, এক্ষুনি আনাও—'

হেমনাথ বললেন, 'এক্ষুনি তোদের বাড়ি কে যাবে? ও বেলা—'

'না না—'

'আরে বাপু, একবেলা না পড়লে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে না।'

বায়নার সঙ্গে এবার কান্না জুড়ে দিল ঝিনুক, 'বিনুদাদা পড়ছে যে—'

চোখ বড় বড় করে বিস্ময়ের গলায় হেমনাথ বললেন, 'ও, বিনুদাদা পড়ছে বলে পড়তে হবে!'

'হ্যাঁ—' ঝিনুক ঘাড় কাত করল।

'হিংসের জ্বালা কত!' বলেই গলা তুলে ডাকতে লাগলেন হেমনাথ, 'স্নেহ—স্নেহ—'

স্নেহলতা ভেতর-বাড়িতে ছিলেন, বড় বড় পা ফেলে চলে এলেন। তাঁর সঙ্গে সুরমা।

স্নেহলতা বললেন, 'এত চেঁচামেচি কেন? হয়েছে কী?'

'তাড়াতাড়ি খেতে দাও। আমি বেরুব।'

'কী রাজকার্য আছে শুনি?'

রাজকার্যটা কী, হেমনাথ বললেন।

শুনে হাসলেন স্নেহলতা, 'তা হলে তো যেতেই হবে।'

কোমল গলায় ওধার থেকে সুরমা বললেন, 'আহা পড়ুক, পড়ুক। বিনুকে হিংসে করে মেয়েটা যদি মায়ের কথা ভুলে থাকে তো থাক। ওর অন্যমনস্ক হওয়া দরকার।'

সুরমারা চলে গেলেন।

একটু পর সকালবেলার খাবার এসে গেল।

খাওয়া যখন আধাআধি হয়ে এসেছে সেই সময় বাগানের দিক থেকে অবনীমোহন এলেন।

হেমনাথ বললেন, 'কী ব্যাপার অবনী, ওদিকে কোথায় গিয়েছিলে?'

অবনীমোহন বললেন, 'ঘুম থেকে উঠে রাস্তা ধরে একা একা অনেকখানি ঘুরে এলাম। ভারি ভাল লাগছিল। কলকাতার ধোঁয়া নেই, ভিড় নেই, গুঁতোগুঁতি ধাকাধাক্কি নেই। মনে হয়, এখানেই থেকে যাই। আর ফিরে যেতে ইচ্ছে করছে না।'

হালকা গলায় হেমনাথ বললেন, ' বেশ তো, থাকো না।' তারপরেই কী মনে পড়ে যেতে তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, 'মুখ টুখ ধুয়েছ?'

'আজ্ঞে না।'

'চট করে ধুয়ে খেয়ে নাও। তোমাকে নিয়েই বেরুই—'

'কোথায় যাবেন?'

হেমনাথ বললেন।

অবনীমোহন উৎসাহিত হয়ে উঠলেন, 'ওই সঙ্গে একবার শিশিরবাবুদের বাড়িটা ঘুরে আসব।'

হেমনাথ শুধোলেন, 'কেন বল তো?'

'আনন্দর কাছ থেকে একটা বন্দুক চেয়ে আনব। কাল নিশিন্দার চরে যাবার কথা হল না?

pathagar.net

অনেকদিন তো প্র্যাকটিশ নেই। আগে থেকে একটু মহড়া দিয়ে রাখব।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, খুব ভাল।'

তাড়াতাড়ি মুখ ধুয়ে সকালবেলার খাওয়া যখন শেষ করে এনেছেন অবনীমোহন, বিনু পড়াটড়া ছেড়ে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, 'দাদু—'

হেমনাথ তার দিকে ফিরে বললেন, 'কী বলছিস দাদাভাই?'

'আমি তোমাদের সঙ্গে যাব।'

হেমনাথ বললেন, 'তুই তো এখন পড়ছিস। আমাদের সঙ্গে গেলে পড়াটা নষ্ট হবে।'

ওধার থেকে অবনীমোহন বললেন, 'এখন যেতে হবে না।'

বিনু বলল, 'ওবেলা ঠিক পড়ব।'

এবার রাগের গলায় অবনীমোহন বললেন, 'ওবেলা টোবেলা নয়। পড়তে বসেছ, পড়ে যাও। ক'দিন তো বই টই খুলে দেখ নি। আজ যদিও বা বসলে, বাঁদরামি শুরু করে দিয়েছ। বেলা দশটা পর্যন্ত কোনও দিকে তাকাবে না, মন দিয়ে শুধু পড়া। ছুটির পরেই পরীক্ষা, খেয়াল যেন থাকে।'

বিনু এবার লাফালাফি শুরু করে দিল। সেই সঙ্গে নাকি সুরের একটানা ঘ্যানঘ্যানানি চলল, 'আমি যাব, আমি যাব—'

অবনীমোহন ধমক দিতে যাচ্ছিলেন, তার আগেই হেমনাথ বলে উঠলেন, 'লম্ফ ঝম্ফ আর কান্নাকাটি থামা বাপু—'

'বল, নিয়ে যাবে—'

'যাব। তবে এক শর্তে—'

দাদু যখন ভরসা দিয়েছেন তখন যাওয়া নিশ্চয়ই হবে। তাঁর ওপর অবনীমোহন কথা বলবেন না। কিন্তু শর্তটা কী, বোঝা যাচ্ছে না। লাফ ঝাঁফ থামিয়ে সন্দিগ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকল বিনু।

হেমনাথ বললেন, 'শর্তটা হল, এখন যদি যাও দুপুর-সন্ধে দু'বেলাই পড়তে হবে। তখন কিন্তু গোলমাল করতে পারবে না।'

বিনু তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'না না, মোটে গোলমাল করব না। দুপুরবেলা সন্ধেবেলা যতক্ষণ পড়তে বলবে ততক্ষণ পড়ব।'

'এখন তো খুব ভাল ভাল কথা বেরুচ্ছে। ফিরে এসে দেখা যাবে'খন।' হেমনাথ হাসলেন, 'যা, জামা প্যান্ট বদলে আয়।'

বিনু ভেতর-বাড়ির দিকে ছুটতে যাচ্ছিল, সেই সময় তীক্ষ্ণ, চাপা গলায় ঝিনুক চেঁচিয়ে উঠল, 'না না—'

হেমনাথ বললেন, 'তোর আবার কী হল রে?'

ঝিনুক আগের সুরেই বলল, 'বিনুদা যাবে না—'

একে তো অনেক কষ্টে, বহু কান্নাকাটির পর বেড়াতে যাবার সনদ মিলেছে, আর ঝিনুক কিনা বাগড়া দিতে চাইছে! মাথার ঠিক থাকল না বিনুর। জিভ ভেংচে চেঁচিয়ে উঠল, 'যাবে না! ইল্লি রে! যাব তো, নিশ্চয়ই যাব।' বলেই আর দাঁড়াল না, লম্বা পা ফেলে চোখের পলকে ভেতর-বাড়িতে অদৃশ্য হয়ে গেল।

চোখ কুঁচকে বিনুর যাওয়া দেখল ঝিনুক। তারপর আস্তে আস্তে হেমনাথের পাশ থেকে উঠে ভেতরে চলে গেল।

ঝিনুক যখন বিনুকে খুঁজে বার করল তখন তার প্যান্ট-জামা পরা শেষ, নটি বয় শু পায়ে দিয়ে ফিতে বাঁধছে। সোজা গিয়ে ঝিনুক তার মুখোমুখি দাঁড়াল, এবং কোমরে হাত দিয়ে ঘাড় হেলিয়ে দেখতে লাগল।

ফিতে বাঁধতে বাঁধতে একবার ঝিনুককে দেখে নিল বিনু। তারপর খুব বিরক্তভাবে মুখটা অন্য দিকে ফিরিয়ে নিল।

ঝিনুক ডাকল, 'অ্যাই—'

না তাকিয়েই বিনু সাড়া দিল, 'কী?'

'তুমি তা হলে যাবে?'

'হ্যাঁ।'

'আমার কথা শুনবে না?'

'না।'

'বেশ। আমি মাসিমাকে সেই কথাটা বলে দিচ্ছি।'

বিনু শুধলো, 'কোন কথাটা?'

খুব আলতো করে ঝিনুক বলল, 'সেই যে জলে পড়ে গিয়েছিলে—'

বিনু ভয় পেয়ে গেল। অনুনয়ের সুরে বলে, 'না না, বোলো না।'

'আমার কথা না শুনলে বলবই।'

বিনু এবার বোঝাতে চেষ্টা করল। সে গেলে ঝিনুকের তো কোনও ক্ষতি নেই। ঝিনুক কিন্তু কোনও কথাই কানে তুলল না। বলল, 'তুমি গিয়ে ঝুমার সঙ্গে দেখা করবে। ওর এয়ার-গান আছে, লুডো আছে, ক্যারম আছে, আমি সব জানি।'

বিনু অবাক। হতভম্বের মতো বলল, 'ঝুমার সঙ্গে খেললে তোমার কী?'

'নানা—'

'কী?'

'তুমি ওর সঙ্গে খেলতে পারবে না।'

পুবের ঘরের বারান্দা থেকে হেমনাথের গলা ভেসে এল, 'কী হল রে দাদাভাই, জামা প্যান্ট পরতে কতক্ষণ লাগছে? শিগগির আয়—'

ঝিনুক বলল, 'বলে দাও তুমি যাবে না।'

বিনু বিদ্রোহ করতে যাচ্ছিল। তার চোখমুখ লক্ষ করে ঝিনুক দ্রুত বলে উঠল, 'না বললে সেই কথাটা কিন্তু—'

বিনু ম্রিয়মাণ হয়ে গেল। মনে মনে বানিয়ে গলা তুলে বলল, 'আমি যাব না দাদু, বড্ড পেট ব্যথা করছে।' বলে ধীরে ধীরে একে একে জুতো জামা খুলে ফেলতে লাগল। ভাবল, ঝিনুক নামে এই মেয়েটা বয়সে ছোট হলে কী হবে, অত্যন্ত সাঙ্ঘাতিক। একটা অমোঘ অস্ত্র পেয়ে গেছে সে। সেটা দেখিয়ে চিরকাল হয়তো ঝিনুক নিজের ইচ্ছেমতো বিনুকে চালিয়ে যাবে।

একটু নীরবতা। তারপর বিনু ঝাঁঝিয়ে উঠল, 'যেতে তো দিলে না, এখন আমি কী করব?'

খুব নিরীহের মতো মুখ করে ঝিনুক বলল, 'পড়বে। পড়া হলে আমার সঙ্গে খেলা করবে।'

রাগে বিনুর গা জ্বলতে লাগল। পারলে ঝিনুকের ঝুঁটি ছিঁড়ে দিত। তার বদলে চেঁচিয়ে মেচিয়ে বাড়ি মাথায় তুলে ফেলল, 'বয়ে গেছে এখন পড়তে, বয়ে গেছে তোমার সঙ্গে খেলতে।'

দুপুরবেলা ঝিনুকের বই আর একখানা বন্দুক নিয়ে ফিরে এলেন হেমনাথরা। তারপর বাকি দিনটা বন্দুকের পরিচর্যা করে কাটালেন অবনীমোহন, সেই সঙ্গে সমানে শিকারের গল্প চলল। জিম করবেট থেকে শুরু করে পৃথিবীর বাঘা বাঘা শিকারিদের চমকপ্রদ কীর্তিকাহিনী বলে গেলেন তিনি। শুনতে শুনতে মনে হল, পশুপাখির প্রাণ নেওয়া ছাড়া জগতে অন্য কিছু জানা নেই অবনীমোহনের। সারা জীবন এই একটা কাজই তিনি করেছেন। মোট কথা, যখন যে স্রোতটি আসে সেটাই অবনীমোহনকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়।

দেখতে দেখতে আরও চার পাঁচটা দিন রঙিন প্রজাপতি হয়ে চোখের সামনে দিয়ে উড়ে গেল। এর ভেতর প্রায় রোজই বিনুরা বেড়াতে বেরিয়েছে। হেমনাথদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে স্টিমারঘাট পার হয়ে স্কুল, সেটেলমেন্ট অফিস, থানা, আদালত পেছনে ফেলে নদীপাড়ের সুদূর ঝাউবন পর্যন্ত একটানা পাড়ি। ফলে রাজদিয়াকে খুব ভাল করেই চেনা হয়ে গেছে। কতটুকুই বা শহর। মেরুদণ্ডের

মতো একটা বড় রাস্তার দু'ধারে সরু সরু শাখা প্রশাখায় যতখানি সম্ভব, তার চাইতেও অনেক কমই বেড়েছে রাজদিয়া। এ শহর বড় কুণ্ঠিত, তার স্বভাব অসীম সঙ্কোচ দিয়ে ঘেরা। সবাই যখন বাড়ে, প্রগলভ হয়, তখন রাজদিয়া জড়সড় হয়ে থাকতে ভালবাসে।

শুধু রাজদিয়ার ভূগোলটাকে ভাল করে জেনে নেওয়া নয়, এই চার পাঁচ দিন আরও একটা ব্যাপার ঘটেছে। দল বেঁধে সবাই একদিন নিশিন্দার চরে গিয়ে পাখিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে এসেছে বিনুরা।

নদীর মাঝমধ্যিখানে সুবিশাল ভূখণ্ড জুড়ে শুধু শ্যামল বনানী। এখানে মানুষের বসতি এখনও গড়ে ওঠে নি। মানুষ আসার আগেই, পৃথিবীর আদি সন্তান উদ্ভিদেরা এসে গেছে। হেমনাথ জানিয়েছেন, এখানকার মাটি ফসল ফলানোর যোগ্য হয়ে উঠলেই ঝাঁকে ঝাঁকে মানুষ হানা দেবে।

নিশিন্দার চরের ঝোপঝাড় বনভূমি জুড়ে শুধু পাখি। হরিয়াল ঘুঘু ডাহুক দোয়েল পাতিবক মোহনচূড়া—চেনা-অচেনা কত যে বিহঙ্গ, তার হিসেব নেই।

শিকারি বলতে বিনুদের দলে মোটে দু'জন—অবনীমোহন আর অনন্দ। অবনীমোহন তবু দু'চারটে হরিয়াল টরিয়াল মেরেছেন, আনন্দ কিন্তু একটা গুলিও নিশানায় লাগাতে পারে নি। এই নিয়ে সবাই, বিশেষ করে সুধা আর হেমনাথ আনন্দর পেছনে লেগেছিল।

ঠোঁট টিপে বিদ্রূপের সুরে সুধা বলেছে, 'কি মশাই, আপনি না বাঘ মেরেছেন, গণ্ডার মেরেছেন, হেন মেরেছেন, তেন মেরেছেন। আজ যে একটা পাখিও মারতে পারলেন না!'

হেমনাথ বলেছেন, 'ও কী করবে বল দিদি? পাখিগুলো যা বদমাইশ, ওর গুলির সামনে বুক পেতে দিচ্ছে না যে।'

মুখ লাল হয়ে উঠেছে আনন্দর। বিব্রতভাবে সে জানিয়েছে, কিছুদিন ধরে তার চোখটা ভাল যাচ্ছে না, সব ঝাপসা দেখছে, কাজেই নিশানা ঠিক করতে পারে নি। তুচ্ছ পাখি মেরে কী হবে, সত্যিকারের বাঘ মেরে সে দেখিয়ে দেবে।

সুধা বলেছে, 'এখানে বাঘ কোথায় পাবেন? চারদিকে জল, আপনার হাতে মরবার জন্য জল সাঁতরে আসতে তাদের বয়ে গেছে।'

হেমনাথ সকৌতুকে বলেছেন, 'আচ্ছা আচ্ছা, একটা বাঘটাঘ জোগাড় করতে পারি কিনা দেখি। বেচারা অত করে বললে মারবে—'

সবাই হো হো করে হেসে উঠেছে। আনন্দ আর মুখ তুলতে পারে নি।

নিশিন্দার চরে আরও একটা ব্যাপার হয়েছে। সেটা এইরকম। অবনীমোহন-আনন্দ হেমনাথ-সুধারা যখন শিকার টিকার আর ঠাট্টায় ব্যস্ত সেই সময় ঝুমা বিনুকে নিয়ে বালুকাময় প্রান্তরের ওপর দিয়ে ছুটোছুটি হুটোপুটি করে বেড়িয়েছে। ছোটাছুটির ফাঁকে বিনু লক্ষ করেছে, সেখানে যেখানে তারা গেছে ঝিনুক ঠিক ছায়ার মতো তাদের পিছু নিয়েছে। কিছুই বলে নি ঝিনুক, শুধু চোখ কুঁচকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকেছে। ফলে কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করেছে বিনু।

আজকাল আড়ালে বিনুর সঙ্গে কথা বলে ঝিনুক, কিন্তু ঝুমা কাছে থাকলে সে একবারে বোবা।

পাখিশিকার, রাজদিয়াকে ভাল করে চেনা, এসব তো হয়েছেই এই ক'দিন। সব চাইতে উল্লেখযোগ্য যে ঘটনাটি বিনুর জীবনে ঘটেছে তা হল যুগলের কাছে সাঁতার শেখা। ডুব সাঁতার, চিত সাঁতার, বুক সাঁতার, তিন রকম সাঁতারই শিখে ফেলেছে সে।

আরও দিনকয়েক পর এক সকালবেলায় হঠাৎ হিরণ এসে হাজির। বিনুরা পুবের ঘরের বারান্দায় পড়তে বসেছিল। অবনীমোহন নেই। আজকাল সকাল হলে আর বাড়ি থাকেন না তিনি, বেরিয়ে পড়েন। কোনও দিন একা একাই রাজদিয়ার নিরালা পথে গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে হাঁটেন, কোনও দিন বা যুগলকে নিয়ে নৌকোয় করে জলমগ্ন প্রান্তরে পাড়ি জমান। পূর্ব বাংলা তার রমণীয় আকাশবাতাস, ধানবন, আশ্বিনের মেঘ, স্নিগ্ধ দৃশ্যপট দিয়ে তাঁকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

হেমনাথ কোথাও বেরুতে যাচ্ছিলেন, হিরণকে দেখে একেবারে চেঁচামেচি জুড়ে দিলেন, 'আসুন আসুন, হিজ ম্যাজেস্টির আসতে আজ্ঞা হোক।' বলেই স্নেহলতাকে ডাকতে লাগলেন, 'ওগো, দেখে

যাও কে এসেছে।'

ভেতর বাড়ি থেকে ছুটতে ছুটতে এলেন স্নেহলতা। তাঁর পিছু পিছু শিবানী আর সুরমা।

হিরণকে দেখে স্নেহলতা ভারি খুশি, কিছুটা অবাকও। এই মুহূর্তে তাকে আশা করেন নি বোধহয়। বললেন, 'বলা নেই কওয়া নেই, কোথায় গিয়েছিলি রে হনুমান?'

হিরণ হাসিমুখে বলল, 'মানিকগঞ্জ হয়ে ঢাকায়—'

'সে তো জানি। যুগলকে সেদিন তোদের বাড়ি পাঠানো হয়েছিল, সে এসে বলল। মানিকগঞ্জে না হয় তোর মাসির বাড়ি। গতমাসে বলেছিলি সেখানে যাবি। ঢাকা যাবার কী দরকারটা ছিল শুনি?'

'বই কিনতে গিয়েছিলাম।'

'বই কিনতে ক'দিন লাগে? সকালবেলা এখান থেকে বেরুলে সন্ধেবেলা ফিরে আসা যায়। তুই গেলি ক'দিন পর?' স্নেহলতা চোখ পাকালেন।

হাতজোড় করে কাঁচুমাচু মুখে হিরণ বলল, 'প্রসন্ন হও দেবী, প্রসন্ন হও। অত রাগারাগি করলে আমি কিন্তু ভীষণ ভয় পেয়ে যাব।'

তার ভাবভঙ্গি দেখে সবাই হেসে ফেলল।

স্নেহলতাও হাসলেন, 'তোকে নিয়ে আর পারি না। আমি শুনে রেখেছি, আট দিন তুই মানিকগঞ্জের আর ঢাকায় গিয়ে ছিলি। কেন?'

'বললাম তো বই কিনতে গিয়েছিলাম। তারপর পড়লাম বন্ধুবান্ধবদের পাল্লায়, তারা আসতে দিতে চায় না।'

হেমনাথ এই সময় বললেন, 'উনি বন্ধুবান্ধব নিয়ে ফুর্তি করছেন। আমরা এদিকে ভেবে মরছি। হ্যাঁ রে বাঁদর, ঢাকা থেকে কী বই কিনে আনলি?'

'এই যে—' বগলের তলা থেকে দু'খানা বই বার করল হিরণ। বলল, 'একটা শরৎচন্দ্রের 'দত্তা'র নাট্যরূপ। আরেকটা রবীন্দ্র রচনাবলীর একটা খণ্ড, এতে 'শ্যামা' নৃত্যনাট্যটা আছে।'

'কী হবে এ সব দিয়ে?'

'বা রে, পুজোর সময় নাটক টাটক হবে না?' হিরণ বলতে লাগল, 'অন্য বার শুধু নাটক হয়, এবার এমন একটা কিছু করব যা রাজদিয়াতে কোনও দিন হয়নি।'

হেমনাথ চোখ কুঁচকে শুধোলেন, 'সে বস্তুটা কী?'

'ড্যান্স ড্রামা—'

'সেটা কিরকম?'

রহস্যময় হেসে হিরণ বলল, 'যথাসময়ে দেখতে পাবেন।'

হেমনাথও হাসলেন, 'বেশ, তাই হবে। আমি এখন চলি, তোরা কথাবার্তা বল। এতদিন পর এলি, একেবারে খাওয়াদাওয়া করে যাস।'

'খাওয়া দাওয়ার কথা বলতে হবে না। সেটি না করে আমি নড়ছি না। আমি এলাম আর আপনি চললেন কোথায়?'

'লালমোহনের খোঁজে।'

হিরণকে চিন্তিত দেখাল 'খোঁজে মানে?'

'আর বলিস না, ক'দিন আগে সুজনগঞ্জের হাট থেকে রোগী দেখতে চরবেহুলা গিয়েছিল। বলেছিল পরের দিন ফিরবে। সাত আট দিন পার হতে চলল, এখনও পাত্তা নেই।' হেমনাথ বলতে লাগলেন, 'রোজ একবার করে খবর নিচ্ছি। আজও যদি না এসে থাকে, কাউকে চরবেহুলা পাঠাতে হবে।'

'হ্যাঁ, পাঠানো তো দরকারই। দেখুন গিয়ে লালমোহনদাদু ফিরেছেন কিনা—'

হেমনাথ চলে গেলেন। স্নেহলতাও হিরণকে বসতে বলে ভেতর-বাড়ির দিকে পা বাড়ালেন। এখন সুধা সুনীতি ঝিনুক সুরমা এবং হিরণ ছাড়া এখানে আর কেউ নেই।

বারান্দার একধারে বসতে বসতে হিরণ বলল, 'অন্য অন্য বার আমারা ঐতিহাসিক নাটক করি। এবার সুধাদেবী সুনীতিদেবী এসেছেন, তাই বেছে বেছে সা[illegible]ক নাটক আর নৃত্যনাট্য কিনে এনেছি।

pathagar.net

দেখবেন চারদিকে কেমন সাড়া পড়ে যায়। আমি তো ঢাকায় বন্ধুবান্ধবদের নেমন্তন্ন পর্যন্ত করে এসেছি। সপ্তমী আর অষ্টমীর দিন ওরা নাটক দেখতে আসবে। একবার দেখলে বাছাধনদের মাথাটি ঘুরে যাবে।'

বিনুদের পড়াশোনা থেমে গিয়েছিল। সুনীতি আঁতকে ওঠার মতো করে বলল, 'আবার নেমন্তন্নও করে এসেছেন!'

উৎসাহের সুরে হিরণ বলল, 'বা রে, করব না! শুধু ঢাকায় নাকি, মানিকগঞ্জেও করে এসেছি। কাল পরশু মুন্সিগঞ্জ-মীরকাদিম-ব্রজযোগিনী, এই সব জায়গাতেও খবর পাঠাব—'

'আপনার বুঝি ধারণা, আমরা দারুণ নাচতে, গাইতে আর অভিনয় করতে পারি?'

'নিশ্চয়ই।'

'আমাদের নাচও দেখেন নি, গানও শোনেন নি, অভিনয়ও দেখেন নি। তবু কী করে যে এমন ধারণা হল! শেষ পর্যন্ত একটা কেলেঙ্কারি হবে।'

নিরুদ্বেগ গলায় হিরণ বলল, 'শেষ পর্যন্ত কী হবে, আমি জানি। সে জন্যে আপনাদের ভাবতে হবে না। শুধু আমি যা বলি তাই করে যাবেন।' একটু থেমে আবার শুরু করল, 'ক'দিন ছিলাম না, এর ভেতর কারা কলকাতা থেকে রাজদিয়ায় এসেছে জানি না। আজই খোঁজ নিয়ে অ্যাক্টর অ্যাকট্রেসদের একটা লিস্ট করে ফেলতে হবে। পুজোর আর দেরি নেই। কা'ল থেকে রিহার্সালে বসতে হবে।'

গান-বাজনা নাটক-টাটকে বিশেষ আগ্রহ ছিল না সুরমার। একটু সুযোগ পেতেই তিনি বলে উঠলেন, 'তোমাদের বাড়িটা কোন দিকে হিরণ?'

হিরণ সুরমার প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিল না। তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে বলল, 'আজ্ঞে, স্টিমারঘাটের কাছাকাছি—'

'রাজদিয়া আসার পর অনেকেই তাদের বাড়ি যেতে বলে গেছে, যাওয়া হয় নি। ভেবে রেখেছি আগে তোমাদের বাড়ি যাব, তারপর অন্যদের—' হিরণকে ঘিরে সুরমার মনে রঙিন বাসনার আভা লেগেছে।

বিব্রত মুখে হিরণ বলল, 'আমাদের বাড়ি যাবেন?'

তার কণ্ঠস্বরে এমন কিছু ছিল যাতে আহত হলেন সুরমা। বললেন, 'তোমার আপত্তি থাকলে অবশ্য যাব না।'

হিরণ চকিত হয়ে দু'হাত নাড়তে লাগল, 'না না, আপত্তি নয়। তবে—'

'তবে কী?'

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে মৃদু গলায় হিরণ বলল, 'বুড়ো অথর্ব ঠাকুরদা আর এক বিধবা জেঠাইমা ছাড়া বাড়িতে অন্য কেউ নেই।'

সুরমা চমকে উঠলেন, 'কেন, তোমার বাবা-মা, ভাই-বোন?'

'আমার জন্মের পরই বাবা-মা মারা গেছেন। আমি তাঁদের একমাত্র সন্তান।' হিরণ বলতে লাগল, 'ঠাকুরদাও আজ দশ বার বছর নানা রোগে প্রায় শয্যাশায়ী। জেঠাইমার মারাত্মক রকমের শুচিবাই, কেউ বাড়ি ঢুকলে গোবর জল ছিটিয়ে শুদ্ধ করে নেয়। সেই জন্যে কাউকে নিয়ে যেতে চাই না।'

সহানুভূতিতে সুরমার মুখ আর্দ্র হয়ে উঠেছিল। কোমল সুরে তিনি বললেন, 'কিছু মনে কোরো না বাবা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—'

'বেশ তো, করুন না।'

'তুমি ঢাকায় থেকে পড়। ঠাকুরদার ওই অবস্থা, জমিজমা বিষয় সম্পত্তি দেখাশোনা করে কে?'

হিরণ হাসল, কিছু বলল না।

সুরমা শুধোলেন, 'হাসলে যে?'

'একখানা বাড়ি আর কিছু জমি ছাড়া বিশেষ কিছুই নেই আমাদের।'

'তা হলে—' কথা শেষ না করে হঠাৎ চুপ করে গেলেন সুরমা।

'আপনি কী বলতে চান, বুঝেছি। বিশেষ জমিজমা নেই, বিষয়-সম্পত্তি নেই, তবু আমাদের সংসার

কেমন করে চলে, এই তো?'

আস্তে মাথা নাড়লেন সুরমা, অর্থাৎ তাই।

গম্ভীর গলায় হিরণ বলল, 'হেমদাদু চালান। আমাদের সংসার, আমার পড়াশোনা—সব তাঁর দয়ায় চলছে। খোঁজ নিলে জানতে পারবেন, এই রাজদিয়ায় কত মানুষকে হেমদাদু বাঁচিয়ে রেখেছেন। উনি না থাকলে আমরা মরে যেতাম। অবশ্য—'

সুধা সুনীতি আর বিনু হেমনাথের কথা শুনতে শুনতে অভিভূত হয়ে গিয়েছিল। তারা কিছু বলছিল না, এবারও বলল না। সুরমা বললেন, 'অবশ্য কী—'

সামান্য হেসে হিরণ বলল, 'আমার ব্যাপারে হেমদাদুর একটু স্বার্থ আছে।'

'কিরকম?'

'এম. এ'টা যদি পাশ করতে পারি রাজদিয়া কলেজে আমাকে পড়াতে হবে। অন্য কোথাও চাকরি দিয়ে যাওয়া চলবে না।'

'যদি ভাল চাকরি পাও?'

'তবুও না। হেমদাদু বলেন, সবাই যদি টাকাপয়সার লোভে দেশ ছেড়ে চলে যায়, চলবে কেমন করে?'

সুরমা বললেন, 'সে তো ঠিকই—'

প্রসঙ্গটা আরও কিছুক্ষণ হয়তো চলত। এই সময় অবনীমোহন ফিরে এলেন। হিরণকে দেখে খুব খুশি তিনি। বললেন, 'ঢাকা থেকে কবে এলে?'

হিরণ বলল, 'আজই। সকালবেলা ফিরেছি, ফিরেই আপনাদের বাড়ি এসেছি।'

'বেশ করেছ। ঢাকা গিয়েছিলে কেন?'

কেন গিয়েছিল, হিরণ বলল। নাটকের কথা শুনে প্রায় লাফিয়ে উঠলেন অবনীমোহন। হইচই বাধিয়ে দিলেন, 'অভিনয় দেখেছি বটে শিশির ভাদুড়ি মশায়ের।' তারপর একে একে গিরিশ ঘোষ, অর্ধেন্দু মুস্তাফি, দানীবাবু, কর্ণার্জুন, মিশরকুমারি, নীলদর্পণ, আলমগির—উচ্ছ্বসিত সুরে কত দিগ্বিজয়ী অভিনেতা আর নাটকের নাম যে করে গেলেন, হিসেব নেই।

এই অবনীমোহনই ক'দিন আগে শিকার ছাড়া আর কিছুই জানতেন না। পশু পাখিদের প্রাণহনন ছাড়া অন্য কোনও স্বপ্ন দেখতেন না। এখন সে সবের বিন্দুমাত্রও মনে নেই তাঁর। আপাতত তাঁর চোখ জুড়ে শুধু রঙ্গমঞ্চের মোহময় জগৎ।

দুপুরবেলা খেয়েদেয়ে আর বসল না হিরণ, চলে গেল। ফিরে এল রাত্তিরে। জানিয়ে গেল, নাটক এবং নৃত্যনাট্যের জন্য অভিনেতা অভিনেত্রী ঠিক হয়ে গেছে। সুধা একাই 'শ্যামা'তে শ্যামা, আর 'দত্তা'র নাট্যরূপ 'বিজয়া'তে বিজয়ার ভূমিকা পেয়েছে। দু'টো বইয়েরই নামভূমিকা তার। অবনীমোহন পেয়েছেন 'বিজয়া'তে দয়ালের ভূমিকা। সুনীতি করবে 'বিজয়া'তে নলিনী, 'শ্যামা'য় তার কোনও ভূমিকা নেই। অবশ্য তাকে পশ্চাৎপটে বসে 'শ্যামা'র গানগুলো গাইতে হবে।

সব শুনে সুধার কানে মুখ গুঁজে দিল সুনীতি। ফিসফিসিয়ে বলল, 'পক্ষপাতিত্বটা দেখলি? সব মেইন মেইন রোল তোর জন্যে, আমার বেলা ঘুঁটেকুড়ুনির পার্ট।'

সুধা বলল, 'হিংসে হচ্ছে? বলিস তো, তোকে শ্যামা আর বিজয়ার রোল দু'টো দিতে বলি।'

'অত কাঙাল নই আমি।' বলেই গলাটা আরও অতলে নামিয়ে দিল সুনীতি, 'দেখিস ও 'শ্যামা'তে পঞ্চাশেন, 'বিজয়া'তে নরেনের রোল নেবে। দু'জনে না—'

'কী?'

'জমিয়ে দিবি।'

সুধা বলল, 'হিংসে করিস নি দিদিভাই। অনন্দবাবুকে বলব দু'টো বাঘ মেরে যেন বলে একটা বাঘ মেরেছিস। চারদিক ধন্য ধন্য পড়ে যাবে। জমবে ভাল।'

সুনীতি হাসতে হাসতে বলল, 'থাম বাঁদর মেয়ে—'

দেখতে দেখতে আরও কয়েকটা দিন কেটে গেল। রাজদিয়ার প্রবাসী সন্তানেরা প্রায় সবাই পুজোর

ছুটিতে দেশে ফিরেছে। শহর এখন জমজমাট। কুমোরপাড়ার প্রতিমাগুলোতে এক-মেটে, দু-মেটে, তে-মেটের পর অঙ্গরাগ শুরু হয়েছে। এদিকে হিরণদের নাটকের রিহর্সাল চলেছে পুরোদমে।

মহালয়ার যখন দিন তিনেক বাকি, সেই সময়ে দু'টো চমকপ্রদ ঘটনা ঘটল।

আগে প্রথম ঘটনাটির কথা।

সেদিন অধর সাহা যা বলেছিল শেষ পর্যন্ত তাই করে ছাড়ল। মহালয়ার দিনকয়েক আগে স্বয়ং সামনে দাঁড়িয়ে থেকে নিজের শ্রাদ্ধ চুকিয়ে ফেলল। যেমন তেমন করে নয়, রীতিমত ধুমধাম করে দানসাগর শ্রাদ্ধ। এই কাজটা আর ভরসা করে ছেলেদের জন্য ফেলে রাখল না সে।

রাজদিয়ার হেন মানুষ নেই যাকে নেমন্তন্ন করে নি অধর সাহা। শুধু রাজদিয়া কেন, আশেপাশের আট দশটা গ্রামগঞ্জের তাবৎ বাসিন্দাকে নেমন্তন্ন করে এসেছিল।

একজন জীবন্ত মানুষ তিন তিনটে ছেলে বেঁচে থাকতে এই মর্তলোকেই নিজের পারলৌকিক কাজ সেরে যাচ্ছে, এমন বিস্ময়কর ঘটনা রাজদিয়াতে আর কখনও ঘটে নি। নিমন্ত্রিত অনিমন্ত্রিত, চেনা-অচেনা, এই শ্রাদ্ধের খবর যার কানে গেছে সে-ই অধর সাহার বাড়ি ছুটেছে।

বিনুরাও হেমনাথের সঙ্গে গিয়ে শ্রাদ্ধের নেমন্তন্ন খেয়ে এসেছিল।

দ্বিতীয় ঘটনাটি আরও মজার।

মহালয়ার ঠিক আগের দিন দুপুরবেলা রান্নাঘরের সামনে দাঁড়িয়ে ছিল বিনু। স্নেহলতা এবং শিবানী ছিলেন ভেতরে। রান্না প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, বাকিটুকু দু'জনে ক্ষিপ্র হাতে সেরে ফেলছিলেন।

বিনু জানতে এসেছিল, কখন খেতে দেওয়া হবে। এর আগে ঘন্টা দুয়েকের মতো পুকুরে পড়ে ছিল, লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে চারদিক উথলপাথল করে তুলেছে। চোখদু'টো এখন টকটকে লাল। এত পরিশ্রমের পর খিদে পেয়ে গিয়েছিল খুব।

বিনু কিছু বলবার আগেই বাগানের দিক থেকে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে ছুটতে যুগল এসে হাজির। ভেতর-বাড়ির উঠোনে এসে চাপা, উত্তেজিত গলায় সে ডাকতে লাগল, 'ঠাউরমা—ঠাউরমা—'

বিনু চমকে ঘুরে দাঁড়াল। শিবানী এবং স্নেহলতাও বাইরে এসে দাঁড়িয়েছেন।

যুগলের পরনে একটা নেংটি মতো, এ ছাড়া আর কিছুই নেই। সারা গায়ে পচা ভিজে পাটের ফেঁসো লেগে আছে, দুর্গন্ধ ভেসে আসছে। প্রথম দিন রাজদিয়ায় এসে বিনু দেখেছিল, পচা পাটের আঁশ ছাড়াচ্ছে যুগল। এখনও তা শেষ হয় নি।

চোখের পলকে কাছে এসে পড়ল যুগল। আগের সুরেই বলল, 'সব্বনাশ হইয়া গ্যাছে ঠাউরমা, সব্বনাশ হইয়া গ্যাছে—'

স্নেহলতা উদ্বিগ্ন মুখে বললেন, 'কী হয়েছে?'

'অরা আইসা গ্যাছে। অহন আমি কী করি?'

স্নেহলতা শুধোলেন, 'কারা এসেছে রে?'

যুগল মুখ নামিয়ে ফিসফিস করল, 'টুনি বইনের জামাই আর—'

'আর কে?'

'গোপাল দাস।'

ভুরু কুঁচকে স্নেহলতা একটু ভেবে নিলেন। তারপর বললেন, 'কোন গোপাল দাস রে?'

নতমুখেই যুগল বলল, 'উই যে ভাটির দ্যাশের। গেরামের নাম মোহনগুপ্ত—'

'বুঝেছি—' চোখের তারায় কৌতুক ঝিকমিকিয়ে উঠল স্নেহলতার, 'পাখির বাপ তো?'

'হ।' আস্তে করে ঘাড় কাত করল যুগল।

বোঝা গেল, পাখির ব্যাপারটা জানেন স্নেহলতা। বললেন, 'গোপাল দাস বলছিস যে? শ্বশুরমশাই

বলতে বুঝি লজ্জা লাগে?'

যুগল পারলে মাটির সঙ্গে মিশে যায়। সে বলল, 'অহনও তো হয় নাই।'

'কী হয় নি?'

'হুউর।'

'ও—' কণ্ঠস্বরে দীর্ঘ টান দিয়ে স্নেহলতা বলতে লাগলেন, 'পাখির সঙ্গে বিয়ে না হলে বুঝি শ্বশুর বলবি না?'

'হেই কী কওন যায়।' বলতে বলতে হঠাৎ সেই কথাটা মনে পড়ে যেতে যুগলের মুখ অত্যন্ত করুণ আর বিপন্ন হয়ে উঠল, 'অহন আমি কী করি ঠাউরমা?'

'কেন, তোর আবার কী হল?'

'ওনাগো কাছে ক্যামনে গিয়া খাড়ামু?'

'ছোঁড়া তো লজ্জায় গেলি। পুরুষমানুষ না তুই!' বলেই হাসতে শুরু করলেন স্নেহলতা। ডাকতে লাগলেন, 'ওগো, এদিকে একটু শুনে যাও—'

হেমনাথ, অবনীমোহন উত্তরের ঘরে ছিলেন। সুধা সনীতিরা কোথায়, কে জানে। উত্তরের ঘর থেকে হেমনাথ সাড়া দিলেন, 'যাই—'

যুগল চকিত হল, 'বড়কত্তায় আহে, আমি পলাই—'

'পালাবি কেন, দাঁড়া—'

যুগল দাঁড়াল না, বাড়ির পেছন দিকে ছুট লাগাল। স্নেহলতা এবং শিবানী হাসতে লাগলেন।

বিনু খিদের কথা ভুলে গেছে। আদিগন্ত জলের মাঝমাঝিখানে দ্বীপের মতো টুনিদের বাড়িটা তার চোখের সামনে ভাসছিল। বার বার পাখির কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল তার। দরজার ফ্রেমে ছবির মতো পাখির দাঁড়িয়ে থাকা, স্বপ্নালোকের জলপরীর মতো আশ্বিনের টলটলে শান্ত জলে সাঁতার কেটে নৌকোয় আসা, যুগলের গান—এসব যেন দিনকয়েক আগের ব্যাপার নয়, এখন এই মুহূর্তে ঘটে চলেছে।

উত্তরের ঘর থেকে হেমনাথ এসে পড়লেন। বললেন, 'ডাকছ কেন?'

শিবানী এবং স্নেহলতা সমানে হাসছিলেন। হাসিটা এমন প্রবল উচ্ছ্বাসময় যে উত্তর দিতে পারলেন না।

চোখ কুঁচকে একটুক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন হেমনাথ। তারপর বললেন, 'এত হাসাহাসি কেন?'

এতক্ষণে নিজেকে অনেকখানি সামলে নিয়েছেন স্নেহলতা। খুব মজার গলায় বললেন, 'আমাদের যুগল তো মহা বিপদে পড়েছে।'

'কিসের বিপদ?'

বিপদটা কী, স্নেহলতা বুঝিয়ে দিলেন।

সব শুনে হেমনাথ ব্যস্ত হয়ে ওঠেন, 'গোপাল দাস আর যুগলের বোনাই কোথায়?'

'তা তো জানি না। তাদের কোথায় যেন দেখে ছুটে এসেছিল যুগল।' স্নেহলতা বললেন।

হেমনাথ বিরক্ত হলেন, 'লোক দু'টো এল। তাদের বসানো হল কি হল না, সেদিকে হুঁশ নেই। তোমরা ঠাট্টা-তামাশা হাসাহাসি নিয়েই আছ।' বলে আর দাঁড়ালেন না, বড় বড় পা ফেলে পুকুরঘাটের দিকে চলে গেলেন। খুব সম্ভব গোপাল দাসদের অভ্যর্থনা করে আনতে।

বিনু মনোযোগ দিয়ে শুনছিল। সেও আর দাঁড়িয়ে থাকল না। খানিক আগে যুগল যেদিকে গেছে সেদিকে ছুট লাগাল।

যুগল গিয়েছিল বাড়ির পেছন দিকে। জায়গাটা চোখ-উদানে আর সোনালের জঙ্গলে ঝুপসি হয়ে আছে। ফাঁকে ফাঁকে পিঠক্ষীরা এবং লটকা ফলের গাছ। তাদের মাথায় গুচ্ছ গুচ্ছ বনজ ফুল ফুটে আছে। ঝাঁকে ঝাঁকে মৌমাছি আর ফড়িং ফুলের ওপর উড়ে বেড়াচ্ছে।

জঙ্গলের পর মস্ত খাল।

বাড়ির পেছন দিকে এসে এদিকে সেদিকে তাকাতেই বিনু দেখতে পেল, খালে নেমে সমানে ডুবের পর ডুব দিয়ে চলেছে যুগল।

জঙ্গলের ভেতর দিয়ে পথ করে খালের পাড়ে এসে পড়ল বিনু। যুগলকে না ডেকে চুপচাপ

pathagar.net

দাঁড়িয়ে থাকল।

এক নিশ্বাসে প্রায় শ'খানেক ডুব দিয়ে যুগল থামল। তারপর হঠাৎ কী মনে পড়ে যেতে তাড়াতাড়ি খাল থেকে উঠে এল। পাড়ে আসতেই সে অবাক, 'ছুটোবাবু যে, কহন আইছেন!'

'অনেকক্ষণ।'

'আমি ট্যারই পাই নাই।'

বিনু হাসল, 'টের পাবে কী করে? যা ডুব দিচ্ছিলে!'

'হ। এক উয়াসে বিশ পঞ্চাশটা ডুব না দিলে ছান কইরা আরাম পাই না।' যুগল হাসল। তারপর বলল, 'আপনে এট্টু খাড়ন ছুটোবাবু, আমি একখান বস্তু লইয়া আসি।'

'কী?'

'আনলেই দেখতে পাইবেন।'

যুগল পলকে বাড়ির ভেতরে অদৃশ্য হয়ে গেল। খানিক পরে যখন ফিরে এল, তার হাতে একটা গন্ধসাবান।

সাবানটা দেখে ফেলেছিল বিনু। বলল, 'চান তো একবার করলে, আবার সাবান মাখবে?'

যুগল বিনুর দিকে তাকাল। চোখাচোখি হতেই দ্রুত মুখ নামিয়ে সলজ্জ অস্ফুট গলায় বলল, 'ছান করার সোময় সাবানের কথা মনে আছিল না, মনে পড়তেই লইয়া আইলাম।'

অন্য দিনও যুগলকে চান করতে দেখেছে বিনু। কিন্তু সে চানের সঙ্গে সাবান এবং তেলের সম্পর্ক নেই। কোনও রকমে গামছাটি কোমরে জড়িয়ে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে, ঘণ্টা দেড় দুই খাল বিল তোলপাড় করে যখন ডাঙায় ওঠে তখন চোখ দু'টো রক্তজবা। এই তো তার চানের নমুনা।

হঠাৎ কেন যে আজ গন্ধসাবান মাখার মতো এতখানি শৌখিন হয়ে উঠল যুগল, সেইটাই বোঝা যাচ্ছে না। বিনু সবিস্ময়ে তাকিয়ে থাকল।

বিনুর মনোভাব বুঝতে পেরেছিল যুগল। তখনকার মতো লাজুক সুরে বলল, 'আইজের দিন গোন্ধসাবান মাখুম না তো কবে আর মাখুম! ছুটোবাবু বুঝমান মানুষ হইয়া বোঝেন না ক্যান? আইজ—' বলতে বলতে চুপ করে গেল।

বিনু বলল, 'আজ কী?'

'আমার হউরে নি আইছে।'

এতক্ষণে যুগলের শৌখিনতার কারণটা টের পাওয়া গেল। বিপুল উৎসাহে বিনু বলল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, আজই তো সাবান মাখার দিন।'

অতএব আরও অনেকটা সময় লাগিয়ে গোটা সাবানের আধখানা গায়ে ঘষে ঘষে ক্ষইয়ে দিল যুগল। তারপর পঞ্চাশ-ষাটটা ডুব দিয়ে পাড়ে উঠল। ভাল করে গা-মাথা মুছে বলল, 'চলেন ছুটোবাবু, আমার ঘরে চলেন।'

যুগল থাকে এ বাড়ির দক্ষিণ দিকের একটা ঘরে। দু'জনে সোজা সেখানে চলে এল।

এ ঘরে আরও অনেকবার এসেছে বিনু। যুগলের সম্পত্তি বলতে এখানে যা আছে তা হল একটা তক্তপোশ, গোলাপফুল-আঁকা একটা টিনের সুটকেস, একটা হাত-আয়না, কাঠের চিরুনি, খানকতক জামাকাপড়।

টিনের বাক্স থেকে সব চাইতে ফর্সা জামা আর ধুতি বার করল যুগল। বলল, 'এইগুলাই পরি ছুটোবাবু?'

বিনু সায় দিলে বললে, 'পরো।'

'আরেক খান কথা—'

'কী?'

'চত্তির মাসে নীলপূজার মেলায় এক শিশরি গোন্ধত্যাল কিনছিলাম। আইজ এট্টু মাখুম। আপনে কী ক'ন?'

'নিশ্চয়ই মাখবে।'

টিনের বাক্সের কোণ থেকে সন্তর্পণে একটা ফুলেল তেলের শিশি বার করে আনল যুগল। চৈত্র

মাসে কিনেছে, এখনও তার ছিপি খোলা হয় নি। শিশিটা আস্তই আছে।

শিশি খুলে হাতে একটু তেল নিয়ে মাথায় মাখল যুগল। তারপর হাত-আয়নাটা মুখের সামনে ধরে পরিপাটি করে টেরি কেটে আঁচড়াতে লাগল।

আঁচড়ানো-টাঁচড়ানো হয়ে গেলে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নিজের মুখখানা কতবার যে আয়নায় দেখল যুগল তার ঠিক নেই। তারপর ডাকল, 'ছুটোবাবু—'

বিনু উদ্‌গ্রীব হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। ডাকামাত্র সাড়া দিল।

যুগল বলল, 'আপনেরা নি কইলকাতার মানুষ। কত কিছু দ্যাহেন, কত কিছু শোনেন, জানেন। আমরা গেরামে পইড়া থাকি, ফ্যাচন-ফুচন (ফ্যাশন-ট্যাশন) তো জানি না। দ্যাহেন দেহি, আমারে ক্যামন লাগে। ঠিক য্যামন লাগে ত্যামন কইবেন। মন রাখা কথা কইবেন না।'

অন্য সময়ের তুলনায় যুগলকে সত্যিই ভাল দেখাচ্ছিল। হবু শ্বশুরমশায়ের কাছে নিজেকে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য কম কান্ড তো করে নি। বিনু বলল, 'খুব ভাল দেখাচ্ছে।'

থুতনি নুয়ে পড়ল যুগলের, 'সত্য ক'ন?'

'সত্যি।'

'হউরে আমারে পছন্দ নি করব?'

'নিশ্চয়ই করবে।'

'নিচ্চিন্ত করলেন ছুটোবাবু, নিচ্চিন্ত করলেন।' নিজের সাজসজ্জা সম্বন্ধে আর কোনও দুর্ভাবনাই নেই যুগলের। সে বলতে লাগল, 'আপনেরা কইলকাতার মানুষ, আপনেগো চৌখে যহন ভালা লাগছে তহন উই গোপাল দাসের চৌখে কি আর লাগব না? করে তো হাইলা চাষার (হেলে চাষা) কাম, ফ্যাচনের হ্যায় কী বোঝে?'

বিনু মাথা নাড়ল, 'সে তো ঠিকই।'

একটু ভেবে নিয়ে যুগল এবার বলল, 'আরেকখান কথা ছুটোবাবু—'

'কী?'

'এই যে গোন্ধসাবান গোন্ধত্যাল মাখছি, এই হগল কথা কারোরে কইবেন না কিন্তুক। ভগমানের কিরা (দিব্যি)।'

'বললে কী হবে?'

'হগলে আমার পিছে লাগব, আলঠাইব। আমারে এক্কেরে পাগল কইরা মারব।'

মনে মনে ভেবে নিল বিনু, কথাটা মিথ্যে নয়। ব্যাপারটা একবার সুধা বা সুনীতির কানে তুলে দিলে দেখতে হবে না, যুগলকে বাড়িছাড়া করে দেবে। তার চাইতেও বড় কথা, যে যুগল বিনুকে এত সম্মান দেয়, এত বিশ্বাস করে, যত্ন করে তাকে সাঁতার শিখিয়েছে, নৌকোয় চড়িয়ে দিগ্বিদিকে ঘুরিয়ে বেড়িয়েছে, জল-বাংলার পাখি-পতঙ্গ-গাছপালা-সরীসৃপ চিনিয়েছে, তার গোপন খবর ঢাক বাজিয়ে অন্যকে জানানো উচিত নয়। এতে বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়।

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে যাওয়ায় বিনু তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'আমি তো কাউকে বলব না। কিন্তু—'

দু'চোখে পশ্ন নিয়ে তাকাল যুগল।

বিনু বলতে লাগল, 'ফুলেল তেল আর সাবানের গন্ধ ঢাকবে কী করে?'

যুগলকে চিন্তিত দেখাল, 'হেই কথা তো ভাবি নাই ছুটোবাবু—'

সমস্যাটার কোনও সমাধানই যখন খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না সেই সময় স্নেহলতার গলা শোনা গেল, 'বিনু কোথায় রে, বিনু? অ্যাই দাদাভাই, শিগগির খেতে আয়। ভাত বাড়া হয়ে গেছে।'

বিনু ছুটল। ভেতর-বাড়িতে এসে দেখল, রান্নাঘরের দাওয়ায় সারি সারি আসন পড়েছে। হেমনাথেরা খেতে বসে গেছেন। একধারে আরও দু'টো পাত পড়েছে। সেখানে বসেছে দু'জন অচেনা মধ্যবয়সী লোক। দেখেই বোঝা যায় চাষী শ্রেণীর গ্রাম্য মানুষ। মুখময় কাঁচাপাকা দাড়ি। পরনে ক্ষারে-কাচা ধুতি এবং ফতুয়া। চুলে চিরুনি চালিয়েছে ঠিকই কিন্তু সেগুলো এমন দুর্বিনীত যে হেলানো যায় নি, আকাশের দিকে খাড়া হয়ে আছে। নিশ্চয়ই যুগলের বোনাই এবং ভাবী শ্বশুর গোপাল

দাস। কে বোনাই আর কে শ্বশুর তা অবশ্য বোঝা যাচ্ছে না।

বিনু লক্ষ করল, সুধা সুনীতি লোকদু'টিকে আড়ে আড়ে দেখছে আর ঠোঁট টিপে টিপে হাসছে। এমন কি সুরমা-স্নেহলতা-শিবানীরাও মুখ আড়াল করে হাসছেন। হাসির কারণটা মোটামুটি আন্দাজ করতে পারল বিনু।

গোপাল দাসদের দিকে চোখ রেখে সুধা-সুনীতির পাশের খালি আসনটায় গিয়ে বসে পড়ল বিনু।

অবনীমোহন হেমনাথের পাশে বসেছিলেন। বললেন, 'কোথায় ছিলি রে? ডেকে ডেকে পাওয়া যায় না।'

বিনু বলল, 'যুগলের ঘরে ছিলাম।'

অবনীমোহন কিছু বলবার আগেই হেমনাথ বলে উঠলেন, 'যুগল কী করছে রে দাদাভাই?'

সাজসজ্জার কথা বলেই ফেলত বিনু, এই সময় যুগলের করুণ অনুরোধ মনে পড়ে গেল। তাড়াতাড়ি সে বলে উঠল, 'বসে আছে।'

'চান টান করেছে?'

'হ্যাঁ।'

হেমনাথ স্ত্রীর দিকে ফিরলেন, 'যুগলকেও না হয় আমাদের সঙ্গেই বসিয়ে দাও। শ্বশুর-জামাই এক আসরে বসে খাক।'

স্নেহলতা বললেন, 'খুব ভাল কথা।'

গলা চড়িয়ে হেমনাথ ডাকতে লাগলেন, 'যুগল—যুগল—'

যুগল সহজে এল না, অনেক ডাকাডাকির পর চোখ নামিয়ে জড়সড় হয়ে সামনে এসে দাঁড়াল। তেল এবং সাবানটা যদিও শস্তা, সেগুলোর গন্ধটা কিন্তু উগ্র। যুগল এসে দাঁড়াতেই চারদিকের বাতাস সুগন্ধে ভারী হয়ে উঠল।

প্রথমটা কেউ কোনও কথা বলতে পারল না। সবাই চোখ বড় বড় করে অবাক বিস্ময়ে যুগলের দিকে তাকিয়ে থাকল। তারপর হেমনাথই সুর টেনে টেনে বলে উঠলেন, 'করেছিস কি যুগলা, অ্যাঁ! মাথায় টেরি, গায়ে ফুল-হাতা জামা, নতুন কাপড়, ভুরভুরে তেল-সাবানের গন্ধ—একেবারে রাজবেশ যে রে ব্যাটা!'

দুরন্ত হাসির একটা স্রোত এতক্ষণ পাথরের আড়ালে আটকে ছিল যেন, হঠাৎ আড়ালটা সরে গিয়ে চারদিক থেকে কলকল করে ফেনায়িত উচ্ছ্বাসে বেরিয়ে এল।

সবাই হেসে হেসে গলে পড়তে লাগল। তার ভেতরেই হেমনাথের গলা আবার শোনা গেল, 'শ্বশুরকে দেখেই এইরকম সেজেছিস যুগলা, শ্বশুরের মেয়েকে দেখলে কী যে করবি!'

যুগল আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না, এক দৌড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

হেমনাথ ব্যস্ত হয়ে ডাকাডাকি করতে লাগল, 'যুগল—যুগল—যুগল—'

যুগলের আর সাড়া পাওয়া গেল না। খুব সম্ভব বাড়ির সীমানা পেরিয়ে গেছে সে। ঠাট্টা এবং হাসাহাসি খানিক স্তিমিত হয়ে এলে হেমনাথ অচেনা লোকদু'টোর দিকে ফিরে ডাকলেন, 'গোপাল—'

দু'জনের মধ্যে যে লোকটা মোটাসোটা সে তাকাল। বোঝা গেল, এ-ই গোপাল দাস এবং হেমনাথ তাকে চেনেন।

হেমনাথ বললেন, 'তারপর যে কথা হচ্ছিল, যুগলের বিয়ের ব্যাপারে তুমি আমার কাছে আসতে গেলে কেন? ওর মা-বাবাই তো আছে।'

বিনুর মনে হল, যুগলের বিয়ে-টিয়ে নিয়ে দু'জনের ভেতর আগেই কিছু কথা হয়েছে। ভূমিকা করে রাখা হয়েছিল, এখন তা নিয়ে বিশদ আলোচনা হবে।

গোপাল দাস বলল, 'যুগলের বাপের কাছে গেছিলাম। হে কইল, আপনের কাছে আইতে। আপনে

যা কইবেন হেই হইব। আপনের কথার উপুর তার কুনো কথা নাই।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে হেমনাথ বললেন, 'যুগলের সঙ্গে তোমার মেয়ের কবে বিয়ে দিতে চাও?'

গোপাল দাস তৎক্ষণাৎ বলল, 'আপনে যেই দিন কইবেন।'

হেমনাথ হাসলেন, 'তোমরা দেখি দু'জনেই আমার ঘাড়ে দায় চাপাতে চাও।'

দ্বিতীয় লোকটি অর্থাৎ যুগলের বোনাই বলল, 'আপনে ছাড়া আমাগো আর আছে কে? আপনের উপুর হগল দায় দিয়া আমরা নিচ্চিন্ত।'

চিন্তিত মুখে হেমনাথ বললেন, 'আমার কথা যদি শোন, তাড়াতাড়ি কিন্তু বিয়ে হবে না।'

গোপাল দাস বললে, 'তরাতরির ঠেকা নাই। তভু কী মাস তরি হইব যদি ক'ন—'

হেমনাথ বললেন, 'সেই ফাল্গুন মাসে, ধান উঠবার পর।'

'এইটা হইল আশ্বিন মাস, হেইর পর কাত্তিক-অঘ্‌ঘান-পৌষ-মাঘ। মইদ্যখানে চাইরখান মোটে মাস। দেখতে দেখতে কাইটা যাইব। ফাল্গুন মাসে আমার আপত্তি নাই।'

'তিন চার মাস সময় নিলাম কেন জানো?'

'ক্যান?'

'যুগল তো বউ নিয়ে আমার কাছেই থাকবে। নতুন বউর জন্যে নতুন ঘরদোর তুলতে হবে। তা ছাড়া, আমার এক শ' দেড়শ' কানি ধানজমি আছে। মাঝখানে মোটে একটা মাস, তারপরেই আমন ধান উঠবে। ধান ওঠার সময় আমি কোনও দিকে নজর দিতে পারব না। ধানের ঝঞ্ঝাট কাটবার পর নিশ্চিন্ত হতে হতে সেই মাঘ ফাল্গুন।'

একটু নীরবতা।

তারপর হেমনাথই আবার শুরু করলেন, 'তোমার মেয়ের জন্যে পণ দিতে হবে তো?'

গোপাল দাস এক গাল হাসল, 'হ, হে তো দিতেই হইব।'

'কিরকম পণ চাইছ?'

সোজাসুজি প্রশ্নটার উত্তর না দিয়ে গোপাল দাস বলল, 'বাপ হইয়া আমি তো কইতে পারি না। তয় পাচজনে কয় মাইয়া আমার সোন্দরী। কথাখান ঠিক কি বেঠিক, তুমিই কও—' বলে সঙ্গীর দিকে তাকাল।

যুগলের বোনাই-এর নাম ধনঞ্জয়। সে সায় দিয়ে বলল, 'ঠিকই।'

হেমনাথ বললেন, 'সুন্দরী যে আগেই বুঝেছি।'

গোপাল দাস বলল, 'আপনে দেখছেন?'

'না।'

'তয়?'

রহস্যময় হেসে হেমনাথ বললেন, 'তোমার মেয়ে ওই ওর বাড়ি এসে আছে তো?' বলে যুগলের বোনাইকে দেখিয়ে দিলেন।

গোপাল দাস ঘাড় কাত করল, 'হ—'

'খবর পাই, আমাদের যুগল ঘুরে ফিরে রোজই একবার ওখানে যায়। তোমার মেয়েকে দেখে মাথাখানা না ঘুরে গেলে কি রোজ বাঁদরটা যেত! সে যাক, কত পণ চাও বল—'

'হে আপনে বিচার কইরা দিয়েন।'

হেমনাথ একটু ভেবে নিয়ে বললেন, 'দেনা-পাওনার কথা পরে হবে। তার জন্যে আটকাবে না। তুমি বরং পৌষ মাসের শেষ দিকে একবার এস।'

গোপাল দাস বলল, 'হেই ভালা। আমি কিন্তুক আপনের ভরসায় থাকুম বড় কত্তা—'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, আমার কথার নড়চড় হবে না।'

জিভ কেটে গোপাল দাস বলল, 'হে তো আমি জানিই।'

হেমনাথ কিছু বললেন না।

খাওয়া দাওয়ার পর আর বসল না গোপাল দাস। মেয়ের বিয়ের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হয়ে ধনঞ্জয়কে

pathagar.net

নিয়ে চলে গেল।

তারপর বাকি দিনটা যুগলকে এ বাড়ির ত্রিসীমানায় দেখা গেল না।

মহালয়ার পর থেকেই পড়াশোনা একরকম বন্ধ করে দিল বিনুরা। যে বইগুলো বাক্স থেকে বার করা হয়েছিল সেগুলো আবার বাক্সে গিয়ে ঢুকল না অবশ্য, তাকের ওপর সারি সারি গিয়ে জমা হল। সেগুলোর ওপর আশ্বিনের ধুলো জমতে লাগল।

মহালয়ার দিন থেকেই রাজদিয়ার রং গেছে বদলে। বর্ষার নতুন জলের মতো দিগ্বিদিক থেকে প্রবাসী সন্তানেরা সবাই ফিরে এসেছে।

রাজদিয়ার এ পাড়া সে পাড়া থেকে এখন ঢাকের আওয়াজ ভেসে আসে। আশ্বিনের শেষাশেষি বাতাস যেন সানাই হয়ে উঠেছে। আর রোদটা যেন সারা গায়ে কাঁচা হলুদ মেখে এসে দাঁড়ায়। শিউলি গাছগুলোর পাতা আর দেখা যায় না, ফুলে ফুলে সেগুলো ছেয়ে গেছে। নদীতীরে আর খালের পাড়ে কাশবন তাদের শেষ ফুলটিও ফুটিয়ে দিয়েছে। আকাশের নীল এখন আরও ঝকমকে, আরও উজ্জ্বল। পেঁজা তুলোর মতো মেঘগুলো আরও শুভ্র, আরও ভারহীন মনে হয়। হলদিবনা আর মোহনচূড়া পাখিগুলো, হরিয়াল-টুনটুনি-ঝুটকলি এবং দানিভোলার ঝাঁক নিতান্ত অকারণেই নেশা-প্রমত্তের মতো আকাশময় উড়ে উড়ে বেড়ায়।

এ সময় বইয়ের পাতায় কারোর মন বসে!

তা ছাড়া নাটকের ব্যাপার আছে। বেশির ভাগ দিনই রিহার্সালের আসর বসে হেমনাথের বাড়িতে। বিকেলবেলা রাজ্যের মানুষ জুটিয়ে এনে হিরণ নাটকের মহড়া শুরু করে দেয়। এ ব্যাপারে সব চাইতে বেশি উৎসাহ অবনীমোহনের, হেমনাথও কম মেতে ওঠেন নি। হইচই, চিৎকার, হাসাহাসি এবং পরিহাসে আসর সরগরম হয়ে ওঠে। রিহার্সাল ভাঙতে ভাঙতে রাতদুপুর।

এত হুল্লোড়ে পড়াশোনা হবার কথা নয়। বিনুর আজকাল সারাদিনই ছুটি। 'বিজয়া' নাটকে ছোট একটা রোল পেয়েছে সে। সেটুকু রিহার্সাল দিতে কতক্ষণ আর লাগে! নইলে বাকি দিনটা যুগলের সঙ্গে কিংবা একা একাই ঘুরে বেড়ায়। ছোট্ট নগণ্য রাজদিয়া শহরের সব কিছুই চিনে ফেলেছে বিনু। নদীতীর, চিত্রবিচিত্র পালতোলা অসংখ্য নৌকো, ইলশেডিঙি, স্টিমারঘাটা, কাশফুল, শিউলি বনে আশ্বিনের মোহিনী মায়া—এ সবের আকর্ষণ তো আছেই। সব চাইতে বড় আকর্ষণ যেটা, তা হল প্রতিমা।

রাজদিয়ায় মোট সাতখানা পুজো হচ্ছে। দু'টো বারোয়ারি, বাকিগুলো বংশ পরম্পরায় বাড়ির পুজো।

পটুয়াদের এখন আর ব্যস্ততার শেষ নেই। সারাদিনই প্রতিমার গায়ে রং লাগাচ্ছে, শোলা দিয়ে জরি দিয়ে ডাকের সাজ তৈরি করছে। সারা রাজদিয়া টহল দিয়ে প্রায় সমস্ত দিনই প্রতিমা দেখে বেড়ায় বিনু।

এইভাবে চলছিল। হঠাৎ একদিন সকলবেলা স্নেহলতা হেমনাথকে বললেন, 'তুমি কী বল তো?'

হেমনাথ হকচকিয়ে গেলেন।

স্নেহলতা বলতে লাগলেন, 'একটু হুঁশ টুঁশও যদি তোমার থাকে! পুজো এসে গেল, এখনও নতুন কাপড়-চোপড় কিছুই কেনা হল না। ওরা এই প্রথম দাদুর বাড়ি/দার কাছে এল। ষষ্ঠীর দিনে ওদের হাতে একটু নতুন সুতো দিতে হবে না?'

অপরাধীর মতো মুখ করে হেমনাথ বললেন, 'বড্ড ভুল হয়ে গেছে। আজই কমলাঘাটের বাজারে গিয়ে কিনে নিয়ে আসব।'

'নিশ্চয়ই।'

বেলা একটু চড়লে অবনীমোহনকে নিয়ে কমলাঘাট রওনা হলেন হেমনাথ। বিনুকেও নিয়ে যেতে

চেয়েছিলেন। রাজদিয়ার একচালির বিশাল বিশাল প্রতিমাগুলি ছেড়ে সে যেতে রাজি হল না।

আজ রিহার্সাল বসেছিল হেমনাথদের বাড়ি। শুরু হয়েছিল সেই সন্ধেবেলায়, একটানা ঘন্টাতিনেক চলবার পর সে পালা চুকল। তারপর আরও কিছুক্ষণ গল্পটল্প করে হিরণরা চলে গেল।

হিরণরা যখন যায় তখন দুপুর রাত। চারদিকের ঝোপঝাড় বাগান-পুকুর এবং ধানখেত—সব একাকার হয়ে এখন যেন নিশুতিপুর।

হেমনাথরা সকালবেলা সেই যে কমলাঘাটের গঞ্জে পুজোর জামাকাপড় কিনতে গিয়েছিলেন, এখনও ফেরেন নি। তাঁদের জন্য বিনুদের আর অপেক্ষা করতে দিলেন না স্নেহলতা। সুধা-সুনীতি ঝিনুক-বিনু, এমন কি সুরমাকেও খেতে বসিয়ে দিলেন।

সুরমা আপত্তি করতে যাচ্ছিলেন, স্নেহলতা শুনলেন না। বললেন, 'তুমি রোগা মানুষ, রাতদুপুর পর্যন্ত আর না খেয়ে জেগে বসে থাকতে হবে না। খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড় গিয়ে।'

সুরমা তবু খুঁতখুঁত করতে লাগলেন, 'মামারা এখনও ফিরলেন না। পুরুষমানুষদের কারোর খাওয়া হল না, আর আমি আগেই গিলতে বসে যাই!'

'পুরুষমানুষদের জন্যে অত ভাবনার দরকার নেই। সে জন্যে আমি আছি, ঠাকুরঝি আছে। তোর খাওয়া তুই খেয়ে নে তো—'

না না করেও স্নেহলতার ভয়ে সুরমাকে খেতে বসতে হল।

খাওয়া যখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে সেই সময় হইচই করতে করতে হেমনাথরা ফিরে এলেন। পুকুরঘাট থেকে তাঁর গলা পাওয়া গেল, 'কোথায় রে আমার দাদাভাই দিদিভাইরা? যুগল কোথায়? সব ঘুমিয়ে পড়লি নাকি?'

সকালবেলা যুগল তাঁদের সঙ্গে কমলাঘাটের গঞ্জে যায় নি। নিজের ঘরে বসে এই মুহূর্তে কী যেন করছিল। ডাক শোনামাত্র হেরিকেন নিয়ে ছুটল।

বিনুরা ধীরে ধীরে গল্প করতে করতে খাচ্ছিল, এখন গোগ্রাসে শেষ ভাত ক'টা মুখে পুরতে লাগল। তাদের খাওয়ার মধ্যেই হেমনাথরা ভেতর-বাড়ির উঠোনে এসে পড়লেন।

হেমনাথ অবনীমোহন সামনের দিকে ছিলেন। তাঁদের ঠিক পেছনে আরেক জন কেউ আছে, অন্ধকারে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।

স্নেহলতা লক্ষ করছিলেন। স্বামীর উদ্দেশে বললেন, 'তোমাদের পেছনে কে গো?'

রহস্যময় হেসে হেমনাথ বললেন, 'তোমার আসামী।'

'মানে?'

'আলোটা তুলে দেখই না—'

দাওয়ার দু'ধারে দু'টো হেরিকেন জ্বলছিল। একটা নিয়ে উঁচুতে তুলে ধরলেন স্নেহলতা। আর তখনই দেখা গেল, হেমনাথদের পেছনে যিনি গুটিসুটি মেরে লুকিয়ে আছেন তিনি আর কেউ নন—লারমোর।

ঘাড়খানা বাঁকিয়ে চোখ কুঁচকে কিছুক্ষণ লারমোরকে দেখলেন স্নেহলতা। তারপর ডাকলেন, 'ঠাকুরঝি, ঠাকুরঝি—'

শিবানী কাছাকাছি ছিলেন, ছুটে এলেন।

লারমোরের দিকে আঙুল বাড়িয়ে স্নেহলতা বললেন, 'দেখ দেখ, কেমন গোরুচোরের মতো দাঁড়িয়ে আছে।'

শিবানীও তাঁর সঙ্গে তাল দিয়ে বেজে উঠলেন, 'যা বলেছ। ঠিক গোরুচোর—'

স্নেহলতা এবার সোজাসুজি লারমোরকে বললেন, 'আর রঙ্গ করতে হবে না সাহেব, আড়াল থেকে বেরিয়ে এস। নতুন করে রূপ দেখে চোখ জুড়োই—'

ভয়ে ভয়ে হাতজোড় করে বেরিয়ে এলেন লারমোর। তাঁর ভঙ্গি দেখে স্নেহলতা হেসে ফেললেন। বললেন, 'আর পারি না আপনাকে নিয়ে।'

স্নেহলতা কখনও লারমোরকে 'আপনি' বলেন, কখনও 'তুমি।' দু'জনের সম্পর্ক অত্যন্ত মধুর

এবং নির্মল। মাঝে মধ্যে স্নেহলতা রেগে যান ঠিকই, তার ভেতর কিন্তু দাহ নেই। যা আছে তা হল কৌতুক—মলিনতাহীন স্নিগ্ধ পরিহাস।

লারমোর বললেন, 'এই বারটা, শুধু এইবারটা ক্ষমা করে দিন বউঠাকরুন। আর কখনও এরকম হবে না।'

তীক্ষ্ণ ভ্রূকুটিতে লারমোরকে বিদ্ধ করতে করতে স্নেহলতা বললেন, 'চল্লিশ বছর ধরে খালি 'এইবারটা' 'এইবারটা' শুনছি। এবাড়ির সীমানা পেরুলে আমার কথা কি আপনার মনে থাকে?'

'এবার থেকে ঠিক থাকবে।'

'ঠিক যে কত থাকবে, সে আমি জানি।' স্নেহলতা বলতে লাগলেন, 'সুজনগঞ্জের হাট থেকে সেদিন ফিরে আসার কথা ছিল না?'

'ছিল—' লারমোর মাথা নাড়লেন। ভয়ে ভয়ে বললেন, 'কিন্তু ওখান থেকে এক রোগীর জন্যে চরবেহুলা যেতে হল যে। সে কথা তো হেম জানে। আপনাকে বলে নি?'

'থাক, চোরের সাক্ষী গাঁটকাটাকে ডাকতে হবে না। এখন দয়া করে হাত-পা ধুয়ে কাপড় ছেড়ে নিন।'

হাতমুখ ধোয়া হয়ে গেলেও রেহাই পেলেন না লারমোর। স্নেহলতা সমানে বলতে লাগলেন, 'খালি রোগী—রোগী—রোগী! নিজের ঘুম-বিশ্রাম-স্বাস্থ্য—কোনও দিকে নজর নেই। রোগীরা স্বর্গে বাতি জ্বেলে দেবে!'

লারমোর চুপ।

কী ভেবে স্নেহলতা প্রশ্ন করলেন, 'বয়েস কত হল শুনি?'

লারমোর বললেন, 'ষাট পঁয়ষট্টি হবে।'

'জোয়ান বয়েসে যা মানাত এখন আর তা মানায় না, বুঝলেন মশাই। দৌড়ঝাঁপ লাফালাফিগুলো একটু থামান। একবার বিছানায় পড়লে এই বয়েসে আর উঠতে হবে না।'

'হ্যাঁ—'

স্নেহলতা ঝঙ্কার দিয়ে উঠলেন, 'কী হ্যাঁ?'

লারমোর ভীরু গলায় বললেন, 'এবার থেকে নিজের দিকে খুব নজর দেব। আমারই যদি ভালমন্দ কিছু একটা হয়ে যায়, দেখবে কে? রোগী ধুয়ে তখন কি জল খাব?'

সঙ্গে সঙ্গে কিছু বললেন না স্নেহলতা। ঘাড়খানা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে এদিক থেকে সেদিক থেকে লারমোরকে দেখতে লাগলেন। পরে বললেন, 'বেশ ভাল ভাল কথা বেরুচ্ছে মুখ থেকে। কিন্তু আমি তো জানি—'

'কী জানেন?'

'স্বভাব যায় না মরলে, আর—'

স্নেহলতাকে শেষ করতে দিলেন না লারমোর, তার আগেই তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, 'দেখে নেবেন, এবার থেকে গুড বয় হয়ে যাব।'

অবিশ্বাসের গলায় স্নেহলতা বললেন, 'দেখা যাবে।'

বিনুদের খাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছিল। আঁচিয়ে টাঁচিয়ে তারা হেমনাথদের কাছে এসে দাঁড়াল।

দু'চোখে অবাক বিস্ময় মেখে অপলক তাকিয়ে ছিল বিনু। লারমোরকে প্রথম যেদিন দেখে সেদিন থেকেই যে বিস্ময় আর মুগ্ধতার শুরু, এখনও তা কাটে নি। বরং দিন দিন বেড়েই চলেছে।

একটা কথা জানবার ভারি ইচ্ছে হচ্ছিল বিনুর। সুজনগঞ্জের হাট থেকে গহরালিদের সঙ্গে সেই যে লারমোর চলে গিয়েছিলেন তারপর এ ক'দিন কোথায় কাটালেন? গহরালিদের বাড়িতেই কী?

বিনু হয়তো জিজ্ঞেস করত। তার মনের কথাটা অন্তর্যামীর মতো আগে ভাগে জানতে পেরে বুঝি স্নেহলতা সেই প্রশ্নটাই করলেন।

লারমোর যা উত্তর দিলেন তা এইরকম। চরবেহুলায় তিনি ছিলেন মোটে দু'দিন। তাঁর যাবার খবর আগেভাগেই রটে গিয়েছিল। ফলে চারপাশের গ্রাম গঞ্জে যত যত রোগী আছে, তাদের আত্মীয়-স্বজনেরা এসে ছেঁকে ধরেছিল। একবার যখন ওদিক যাওয়াই হয়েছে তখন তো আর অসুস্থ শয্যাশায়ী

pathagar.net

মালপত্তরগুলোকে ফেলে আসতে পারেন না লারমোর। কাজেই চরবেহুলা থেকে তাঁকে যেতে হয়েছে কুকুটিয়া, সেখানে থেকে রসুনিয়া, রসুনিয়া থেকে আউটশাহী। এইভাবে নানা জায়গা ঘুরে আজ দুপুরে এসেছিলেন কমলাঘাটের গঞ্জে। রাজদিয়াগামী নৌকো খুঁজছিলেন তিনি। এদিকে যারা আসবে তাদের কারোর সহযাত্রী হবেন, এই রকম ইচ্ছে। এমন সময় হেমনাথদের সঙ্গে দেখা, তাঁদের সঙ্গে সারাদিন ঘুরে ঘুরে কেনাকাটা করেছেন লারমোর। তারপর সন্ধের আগে আগে নৌকোয় উঠেছেন।

স্নেহলতা বললেন, 'অনেক বক্তৃতা হয়েছে। এবার খেতে চলুন।'

আচমকা যেন মনে পড়ে গেছে এমনভাবে লারমোর বলে উঠলেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, বড্ড খিদে পেয়েছে।'

খেতে খেতে বিনুর সঙ্গে, সুধা সুনীতির সঙ্গে, সুরমা শিবানী ঝিনুকের সঙ্গে অনেক গল্পটল্প করলেন লারমোর। তারপর হঠাৎ অবনীমোহনের দিকে ফিরে বললেন, 'তোমরা তো একদিনও আমার ওখানে গেলে না?'

স্নেহলতা ঝঙ্কার দিয়ে উঠলেন, 'যেতে কখনও বলেছেন যে যাবে?'

ধবধবে ফর্সা মানুষটি একেবারে লাল হয়ে গেলেন। বিব্রত মুখে বললেন, 'যেতে যে বলব, নানা ঝঞ্ঝাটে একেবারেই মনে ছিল না।'

স্নেহলতা বললেন, 'রমু না হয় আরও এসেছে। কিন্তু অবনী-সুধা-সুনীতি-বিনু, ওরা তো এই প্রথম রাজদিয়া এল। কোথায় তাদের নিয়ে আমোদ-আহ্লাদ করবে, তা নয়। আজ চরবেহুলা, কাল রসুনিয়া, এই করে বেড়াচ্ছে!'

লারমোর বললেন, 'সত্যি খুব অন্যায় হয়ে গেছে।' বলেই অবনীমোহনের দিকে ফিরলেন, 'কবে আমার ওখানে যাচ্ছ বল। সকালবেলা চলে যাবে, সারাদিন থাকতে হবে।'

অবনীমোহন বললেন, 'তাড়া কি, যাব একদিন।'

'একদিন ট্যাকদিন না, ঠিক তারিখটা জানতে চাই।'

হেমনাথ এতক্ষণ চুপচাপ খেয়ে যাচ্ছিলেন। এবার বললেন, 'পুজোর ভেতর একদিন যাবে। ধর, সপ্তমীর দিন।'

লারমোর বললেন, 'বেশ, পাকা কথা তো?'

অবনীমোহনদের হয়ে হেমনাথ জবাব দিলেন, 'পাকা কথা।'

খাওয়া দাওয়ার পর লারমোর বললেন, 'এখন তা হলে আমি চলি—'

স্নেহলতা বললেন, 'এত রাত্তিরে কোথায় যাবেন?'

'আমার গীর্জায়।'

'আজ আর যেতে হবে না। বিছানা করে দিচ্ছি, শুয়ে পড়ুন। কাল সকালবেলা উঠে চলে যাবেন।'

দু'হাত জোড় করে লারমোর বললেন, 'আজ আর থাকতে বলবেন না বউঠাকরুন, চরবেহুলা আসার আগে কাদেরের জ্বর দেখে গিয়েছিলাম। ক'দিন তার খবর জানি না। বড্ড চিন্তা হচ্ছে।'

'এতদিন হুঁশ ছিল না। রাজদিয়ায় পা দিতেই বুঝি কাদেরের জন্যে প্রাণ কেঁদে উঠল!'

'না না, সব সময় ওর কথা ভেবেছি। কিন্তু কী করব, রোগী ফেলে তো আর আসা যায় না। রাজদিয়ায় যখন এসেই পড়েছি তখন—'

এই সময় বিনু বলে উঠল, 'কাদের কে?'

লারমোর বললেন, 'আরেক দিনও তার কথা জিজ্ঞেস করছিলি দাদাভাই। কাদের আমার ফিটন গাড়িটা চালায়। আমার কাছেই থাকে ও।'

এবার বিনুর মনে পড়ে গেল। আর কিছু বলল না সে।

স্নেহলতা আরও দু'একবার রাতটা কাটিয়ে যেতে বললেন, লারমোর রাজি হলেন না।

অগত্যা হেমনাথ বললেন, 'একা একা এতটা পথ অন্ধকারে যাবে। যুগল বরং হেরিকেন নিয়ে তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসুক।'

লারমোর বললেন, 'যুগল যাবে? এই রাত্তিরবেলা ছেলেটাকে আবার কষ্ট দেওয়া!'

হেমনাথ বললেন, 'কিচ্ছু কষ্ট না। তুমি একটু দাড়াও, ও খেয়ে নিক।' তারপর স্ত্রীর দিকে ফিরে বললেন, 'তাড়াতাড়ি যুগলকে খেতে দাও—'

তিন থাবায় খাওয়া শেষ করে লারমোরের সঙ্গে চলে গেল যুগল। একটু পর বাগানের দূর প্রান্ত থেকে লারমোরের গম্ভীর সুরেলা কণ্ঠস্বর ভেসে এল। অন্ধকারে নির্জন পথে যেতে যেতে তিনি খ্রিস্টবন্দনা শুরু করেছেন:

Hear the right O Lord,
Attend unto my cry,
Give ear unto my prayer,
That goeth not out of feigned lips.

কাল রাত্তিরে কমলাঘাটের বন্দর থেকে বড় বড় দু'টো বাক্স বোঝাই জামাকাপড় কিনে এনেছিলেন হেমনাথরা। সুধা-সুনীতি-বিনু-ঝিনুক—বাড়ির সবার জন্য তো নতুন পোশাক এসেছেই, তা বাদে অসংখ্য শাড়ি-ধুতি, নানা মাপের ফ্রক-ইজের-শার্টও আনা হয়েছে। এত জামা-টামা দিয়ে কী হবে বিনু বুঝতে পারে নি, অবশ্য জিজ্ঞেসও করে নি।

আজ সকালে ঘুম থেকে উঠে ঝিনুক আর হেমনাথের সঙ্গে সূর্যস্তব করবার পর স্নেহলতার সঙ্গে দেখা।

অন্যদিনের মতো এর ভেতরেই চান সেরে ফেলেছেন স্নেহলতা। পরনে পাটভাঙা লালপাড় শাড়ি, গরদের জামা, সিঁথিতে চওড়া করে সিঁদুর টানা। কপালে মস্ত সিঁদুরের টিপ, নির্মল আকাশে সূর্যোদয়ের কথা মনে করিয়ে দেয়। খোঁপা বাঁধেন নি, দু'একবার চিরুনি টেনে ভিজে চুলগুলো পিঠময় ছড়িয়ে দিয়েছেন, প্রান্তে আলগা করে গিঁট বাঁধা।

স্নেহলতা গলা তুলে ডাকতে লাগলেন, 'ঠাকুরঝি—ঠাকুরঝি, গৌরদাসী—জবা—'

শিবানী-জবা-গৌরদাসী, সবাই ছুটে এল। এমন কি সুরমা-অবনীমোহনরাও এসে পড়েছেন। জবা আর গৌরদাসী সেই আশ্রিত বিধবা দু'টির নাম।

স্নেহলতা বললেন,'আজ আমার ছুটি।'

শিবানী হাসলেন, 'বেশ তো।'

'রান্নাবান্না-সংসার সব আজ তোমরা সামলাবে। রোজ রোজ এই চরকি কলে ঘুরতে পারব না। এক-আধদিন আমারও ছুটিছাটার দরকার, বুঝলে?'

'বুঝলাম—' শিবানী হাসতে লাগলেন, 'এই সক্কালবেলা এমন সাজের বাহার, ব্যাপার কী?'

সুধা সুনীতিকে দেখিয়ে স্নেহলতা বললেন,'ওরা দিনরাত সাজছে, আমার বুঝি একটু আধটু সাজগোজ করতে ইচ্ছে করে না? সাজলে আমাকে খুব খারাপ দেখায় নাকি?'

সুধা সুনীতি কলকল করে উঠল, 'আমাদের হিংসে হচ্ছে?'

'হচ্ছেই তো।'

শিবানী বললেন, 'পটের বিবি হয়ে পায়ের ওপর পা'টি তুলে তুমি বসে থাকো। আমরা যাই। রান্নাবান্না চড়াতে হবে তো।'

স্নেহলতা দু'ধারে মাথা নাড়লেন, 'উঁহু—'

'কী?'

'বসে থাকব না।'

'তবে?'

'বেরুতে হবে।'

'কোথায়?'

স্নেহলতা বললেন, 'কাল জামা কাপড় কিনে আনা হল না? পুজোপার্বণের দিনে সবাই আশা

করে বসে আছে। তাদের হাতে দিয়ে আসতে না পারলে ভাল লাগছে না।'

শিবানী বললেন, 'এই তোমার ছুটি নেওয়া!'

স্নেহলতা হেসে ফেললেন।

শিবানী আবার বললেন, 'রাজদিয়া জুড়ে তোমার রাজ্যপাট আর ছেলেমেয়ে। যাও, সবার ভালোবাসা পূর্ণ করে এস।'

স্নেহলতা হাসতে হসেতে ডাকলেন, 'যুগল—যুগল—'

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই যুগল এসে হাজির। কাল রাত্তিরে লারমোরকে পৌঁছে দিয়ে কখন সে ফিরে এসেছে, বিনু জানে না। তার আগেই সে ঘুমিয়ে পড়েছিল।

স্নেহলতা বললেন, 'পুবের ঘরে দু'টো কাপড়ের গাঁটরি আছে, সে দু'টো নৌকোয় নিয়ে যা।'

কাপড়ের গাঁটরি মাথায় চাপিয়ে পুকুরঘাটের দিকে চলে গেল যুগল।

স্নেহলতা এবার বিনুদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমার সঙ্গে তোরা কে কে যাবি?'

বেড়াতে যাবার নামে বিনু ঝিনুক নেচে উঠল, 'আমি যাব,আমি যাব—'

'যাবি—যাবি—' স্নেহলতা তাদের শান্ত করে সুধা সুনীতিকে বললেন, 'তোরা দিদিভাই?'

সুধা সুনীতি জানালো, তারা যাবে না। ছুটির কিছুদিন পরেই পরীক্ষা। রাত্তিরবেলা তো রিহার্সালের জন্য পড়তে ছুঁতেই পারে না। সকালে যদি একটু আধটু না পড়ে, তবে নির্ঘাত ফেল।

স্নেহলতা এবার সুরমাকে বললেন, 'তুই চল রমু—'

'আমি?'

'হ্যাঁ। রাজদিয়ায় আসার পর একদিন মোটে বেরিয়েছিলি। সবাই তোকে যেতে বলে। ঘুরেটুরে পাঁচজনের সঙ্গে কথা বললে দেখবি, ভাল লাগবে।'

'চল তা হলে।'

বিনু ঝিনুক-সুরমাকে নিয়ে একটু পর পুকুরঘাটে চলে এলেন স্নেহলতা।

সেদিন সুজনগঞ্জের ঘাট থেকে যে নতুন নৌকোখানা কিনেছিলেন হেমনাথ সেটার গলুইতে উন্মুখ হয়ে বসে ছিল যুগল। স্নেহলতারা উঠতেই নৌকো ছেড়ে দিল। বলল, 'কই যাইবেন ঠাউরমা?'

স্নেহলতা বললেন, 'আগে কুমোরপাড়ায় চল—'

পুকুরটার পুব দিকে ধানের খেত, উত্তরে খাল। অবশ্য আলাদা আলাদা করে খাল এবং পুকুরকে চিনবার উপায় নেই। এই আশ্বিনেও অথৈ জলে সব সীমারেখা ডুবে রয়েছে। নৌকো নিয়ে যুগল খালের ভেতর এসে পড়ল।

খালের গা ঘেঁষে সেই রাস্তাটা, মেরুদন্ডের মতো যেটা রাজদিয়ার মাঝখান দিয়ে চলে গেছে। প্রথম দিন থেকেই এ রাস্তা বিনুর চেনা। ওই পথটা ধরে যেতে যেতে জলের মাঝখানে খন্ড খন্ড দ্বীপের মতো অনেক বসতি তার চোখে পড়েছে।

একসময় নৌকোটা রাস্তার কাছ থেকে সরে এসে বসতিগুলোর দিকে এগিয়ে গেল।

চারদিকে সেই পরিচিত দৃশ্য। হেলেঞ্চা লতা, জলঘাস আর ধঞ্চের বন উদ্দাম হয়ে আছে। ফাঁকে ফাঁকে নলখাগড়ার ঘন ঝোপ। আজ পাখি চোখে পড়ছে না তেমন। মাঝে-মধ্যে দু'একটা মৌটুসকি কি মাছরাঙা, কদাচিৎ শালিক অথবা চড়ুই। তবে পতঙ্গরা আছে, নলখাগড়ার দীর্ঘ সজীব ডাঁটাগুলোর মাথায় নাচানাচি করে বেড়াচ্ছে।

রাজদিয়ায় আসার পর কতবার এই ছবি দেখেছে বিনু, তবু তার মুগ্ধতা কাটল না। সে পাখি দেখতে লাগল, ফুল দেখতে লাগল। যে সব আগাছা কোনও দিন কারও প্রায়োজনে লাগবে না,অবাক বিস্ময়ে সেগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকল।

পাশে বসে স্নেহলতা-সুরমা-ঝিনুক সমানে কথা বলে যাচ্ছে। লতাপাতা-পাখি-পতঙ্গ সব একাকার হয়ে জল বাংলার মনোরম দৃশ্য বিনুকে এমন বিভোর করে রেখেছে যে সে কিছুই শুনতে পাচ্ছে না। হঠাৎ যুগলের উঁচু গলা কানে এল, 'বুধাই পালের ঘাটে নাও ভিড়াই ঠাউরমা?'

স্নেহলতা বললেন, 'ভেড়া—'

বুধাই পাল। নামটা কোথায় শুনেছে, এই মুহূর্তে মনে করতে পারল না বিনু। ঘুরে ফিরে তার

কথাই ভাবতে লাগল সে।

খালের পাড়ে খানিক পর পরই নারকেল গুঁড়ি দিয়ে ঘাটলা পাতা রয়েছে। কিছুক্ষণের মধ্যে যুগল একটা ঘাটে নৌকো থামাল।

স্নেহলতা বললেন, 'কাপড়ের একটা গাঁটরি নিয়ে আমার সঙ্গে আয় যুগল।'

লগি পুঁতে নৌকো বেঁধে কাপড়ের বোঝা মাথায় নিয়ে পাড়ে নামল যুগল। তারপর নামলেন স্নেহলতারা।

খালপাড়ে ঘন গাছপালার ভেতর দিয়ে পথ। পথটার যেখানে শেষ, সেখান থেকেই কুমোরপাড়া শুরু।

কুমোরপাড়ার বাড়িগুলো গা-ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে আছে। বাড়ি আর কি, জীর্ণ টিনের চাল আর ক্যাঁচাবাঁশের বেড়ায়-ছাওয়া এলোমেলো বিক্ষিপ্ত কতকগুলো ঘর। সেগুলোর আবার দরজা-জানালার বালাই নেই। জানালা বলতে ক'টা ফোকর। দরজাগুলোও ফোকরই, তবে তুলনায় জানালার চাইতে বড়। সারা বছর সেগুলোর ভেতর দিয়ে শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা অজস্র ধারায় তাদের করুণা এবং অভিশাপ বর্ষণ করে চলেছে।

কুমোরপাড়ার সর্বাঙ্গে যে নিদারুণ ঈশ্বর আপন শীলমোহর মেরে রেখেছে তার নাম দারিদ্র্য।

মানুষ তার গৃহকে সুসজ্জিত করে তুলবার জন্য যুগ যুগ ধরে সাধনা করে চলেছে। তার ফলেই সৃষ্টি হয়েছে নগর-বন্দর এবং রম্য জনপদের। কুমোরপাড়ার বাড়িগুলোর পেছনে তেমন সুচারু সাধনা, তেমন পরিকল্পনার চিহ্নমাত্র নেই। সেই আদিম যুগের মতো যেখানে সেখানে, যেমন তেমন করে মাথা গোঁজার জন্য আস্তানা খাড়া করা ছাড়া আর কোনও গভীর উদ্দেশ্যই খুঁজে পাওয়া যাবে না এখানে।

জায়গাটা যে কুমোরপাড়া, বলে দিতে হয় না। সারা গায়ে সেটা তার বিজ্ঞাপন মেরে রেখেছে। যেদিকেই চোখ ফেরানো যাক, সমাপ্ত-অসমাপ্ত হাঁড়ি-কলসি ছড়িয়ে আছে। কোথাও চাক-ঘর, কোথাও 'পইত্না' আর গাছের গুঁড়ি কেটে বানানো হাঁড়িকড়ার ছাঁচ। কোথাও বা 'পুইন' (এর ভেতর মাটির হাঁড়ি টাড়ি পোড়ানো হয়), কোথাও এঁটেল মাটির পাহাড়।

কুমোরপাড়ায় স্নেহলতারা পা দিতেই সাড়া পড়ে গেল। হাতের কাজ ফেলে বউ-ঝিরা ছুটে এল, এল পুরুষমানুষেরা, আর এল কালো কলো মাটি-মাখা এক পাল আধ-ন্যংটো ছেলেমেয়ে।

সবার আগে যে রয়েছে, দেখামাত্র তাকে চিনতে পারল বিনু। সেদিন সুজনগঞ্জের হাটেও একে দেখেছিল। লোকটা বুধাই পাল। খানিক আগে নামটার সঙ্গে তাকে কিছুতেই মেলাতে পারছিল না।

বুধাই পাল চেঁচিয়ে উঠল, 'মা জননী আইছে, মা জননী আইছে—'

স্নেহলতা বললেন, 'তোমরা কেমন আছ?'

সকলের প্রতিনিধি হিসেবে বুধাই পাল বলল, 'আপনে আর হামকত্তা মাথার উপুর থাকতে মোন্দ থাকনের জো আছে?'

স্নেহলতা তাড়াতাড়ি জিভ কেটে বললেন, 'আমরা ভালি রাখার কে? ক্ষমতা কতটুকু আমাদের? ভাল মন্দ যা রাখবার তা রাখেন ঈশ্বর—' বলে আকাশের দিকে দেখিয়ে দিলেন।

'কথাখান ঠিকই মা-জননী, তয় ঈশ্বরের তো চৌখে দেখি নাই। দেখছি আপনেগো—'

বাধা দিয়ে স্নেহলতা বললেন, 'হয়েছে হয়েছে। রাস্তায় দাঁড় না করিয়ে এখন কোথায় নিয়ে বসাবে চল।'

বুধাই পাল ব্যস্ত হয়ে উঠল, 'আমি কি আহাম্মক! পথেই খাড়া করাইয়া রাখছি। আসেন মা-জননী, আসেন—'

স্নেহলতারা চলতে লাগলেন। জনতা হই হই করতে করতে তাঁদের সঙ্গ নিল।

বুধাই পাল সোজা নিজের বাড়িতে এনে তুলল স্নেহলতাদের। উঠোনের তিন কোণে তিনটে বাতাবি লেবু গাছ ছাতা ধরে আছে। ফলে জায়গাটা ছায়াচ্ছন্ন, তার তলায় ক'খানা জলচৌকি পেতে দেওয়া হল। স্নেহলতা বসলেন। কুমোরপাড়ার জনতা তাদের ঘিরে দাঁড়িয়ে থাকল।

বুধাই পাল বলল, 'মা-জননী অন্য বচ্ছর মহালয়ার আগেই আহেন। এইবার কিন্তুক দেরি কইরা

pathagar.net

আইছেন। হ্যাদিকে নয়া জামা কাপড়ের লেইগা পোলাপানগুলা মাথা খাইয়া ফালাইতে আছে। তাগো ভর, এইবার বুঝিন আপনে কুমারপাড়ার কথা ভুইলা গ্যাছেন। আমি যত বুঝাই হেরা শোনে না।'

জনতার মধ্য থেকে সবাই সায় দিয়ে উঠল, 'হ হ, পোলাপানগুলা বুঝ মানে না।'

স্নেহলতা বললেন, 'তোমাদের কথা কখনও ভুলতে পারি? এবার এরা এসেছে, তাই আসতে দেরি হয়ে গেল।' বলে সুরমাদের দেখিয়ে দিলেন।

বুধাই এবং ভিড়ের ভেতর থেকে কেউ কেউ বলল, 'আপনের ভাগনী, না?'

'হ্যাঁ।'

'শুনছি ওনারা আইছেন। ভাগনী, ভাগনীজামাই, নাতি-নাতনী—'

'হ্যাঁ।'

'থাকব তো কিছুদিন?'

'হ্যাঁ।'

'যামু একদিন দেখতে।'

'যেও।'

হঠাৎ বুধাই পাল বিনুকে দেখিয়ে বলে উঠল, 'আমি এনারে চিনি, জামাইবাবুরেও চিনি। হেইদিন ঘাটে দেখছিলাম, না?'

বিনু মাথা নাড়ল, 'হ্যাঁ।'

কথা হচ্ছিল পুরুষদের সঙ্গে। সুরমাদের সম্বন্ধে মেয়েমহলেও কৌতূহল অসীম। চাপা গলায় তারা ফিসফাস করছে, 'কইলকাতার মানুষ ওনারা—'

'বড় লোক—'

'ক্যামন সোন্দর, দেখছ?' ইত্যাদি ইত্যাদি—

তাদের কথা শুনতে শুনতে আমোদ লাগছিল বিনুদের। স্নেহলতা, সুরমা হাসছিলেন। কখনও এক আধটা রসালো মন্তব্য করছিলেন।

হঠাৎ ভিড়ের ভেতর থেকে একটি মধ্যবয়সিনী সামনে এগিয়ে এল। এই বয়সেও তার বড় লজ্জা। নাক পর্যন্ত ঘোমটা টানা, জড়সড় পুঁটুলির মতো দেখাচ্ছে তাকে।

স্নেহলতা বললেন, 'কে? হলধরের বউ না?'

ঘোমটার তলা থেকে মধ্যবয়সিনী বলল, 'হ।'

'কিছু বলবে?'

'হ। আমার মাইয়া বিন্দি চাইর বচ্ছর মাঘ-মন্ডলের বর্‌তো (ব্রত) করছে। হগল বচ্ছরই আপনে আইছেন। এইবার তার বর্‌তো সাঙ্গ হইব। আপনেরে আইতে হইব কিলাম।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই আসব। সেই মাঘ মাসে তো—'

'হ। আমি আগে থাকতে কইয়া রাখলাম।'

চারদিকের জনতাকে দেখে নিয়ে স্নেহলতা শুধালেন, 'বিন্দি কই? তাকে তো দেখছি না।'

মধ্যবয়সিনী বলল, 'বাড়িত্ নাই। খালপারে সেচি শাক তুলতে গ্যাছে।'

একটু নীরবতা।

তারপর স্নেহলতা বললেন, 'আর বসতে পারব না, অনেক জায়গায় যেতে হবে। তোমাদের জামাকাপড়গুলো নিয়ে যাও।' যুগলকে বললেন, 'কাপড়ের গাঁটরিটা খোল।'

ছেলেমেয়ে বুড়ো বাচ্চা সবাইকে ডেকে নিজের হাতে নতুন জামাকাপড় দিলেন স্নেহলতা।

ভিড়ের ভেতর থেকে কে একজন বলল, 'পূজার সোময় আপনে আহেন মা। সারা বচ্ছরে এই একবার এট্টু নয়া সুতা গায়ে ওঠে। কত আশা বুকে লইয়া যে এই দিনটার লেইগা বইসা থাকি।'

এত জামাকাপড় কেন কেনা হয়েছে, এবার বুঝতে পারল বিনু। আরও বুঝল, রাজদিয়ার ঘরে ঘরে স্নেহলতার অসংখ্য সন্তান। প্রতি বছর পুজোর সময় গরিবের চাইতেও গরিব, নগ্ন শীর্ণ মানুষগুলোকে নতুন পোশাকে সাজাতে না পারলে তাঁর সুখ নেই।

স্নেহলতাকে এই মুহূর্তে রাজেশ্বরীর মতো মনে হতে লাগল বিনুর।

আরও কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলে সবাই উঠল।

শুধু কুমোরপাড়াই না, কামারপাড়া, যুগীপাড়া, বারুইপাড়া—নানা জায়গায় ঘুরে ঘুরে কাপড়চোপড় বিলোলেন স্নেহলতা। সমস্ত বছর রাজদিয়ার মানুষগুলো তাঁর জন্য উন্মুখ হয়ে ছিল যেন। যেখানেই স্নেহলতা গেছেন, দু'দন্ড বসেছেন, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সকলের সুখ-দুঃখের খবর নিয়েছেন।

এই রাজদিয়ার সবখানেই স্নেহলতার জন্য হৃদয় পাতা রয়েছে। তার ওপর দিয়ে পা ফেলে ফেলে স্বর্গের দেবীর মতো তিনি সকলের প্রাণের গভীর অন্তঃপুরে চলে যান।

ঘুরতে ঘুরতে দুপুর হয়ে গেল। নিটোল পেয়ালার মতো শরতের ঝকঝকে নীল আকাশের ঠিক মাঝমধ্যিখানে সূর্যটা কখন এসে দাঁড়িয়েছে, টের পাওয়া যায় নি।

এইমাত্র স্নেহলতারা বারুইপাড়া থেকে বেরিয়ে নৌকোয় উঠলেন। আকাশের দিকে তাকিয়ে স্নেহলতা বললেন, 'ইস, অনেক বেলা হয়ে গেল। এখনও নাপিতপাড়া, আচার্যিপাড়া বাকি আছে। এদিকে বিনু ঝিনুকের নিশ্চয়ই খিদে পেয়ে গেছে। আজ থাক, কাল ওদের জামাকাপড় দিয়ে যাব। চল যুগল, বাড়ি যাই—'

নৌকো এগিয়ে চলল। খানিকটা যাবার পর স্নেহলতা হঠাৎ বললেন, 'এ পাড়ায় এলাম, ভব'টাকে একবার বরং দেখে যাই। সেই যে ঝিনুককে দিয়ে চলে এল, আর যায় নি। এই ঝিনুক, বাবার কাছে যাবি?'

ঝিনুক মাথা নাড়ল, অর্থাৎ যাবে।

স্নেহলতার যুগলকে বললেন, 'ভব'দের ঘাটে নৌকো লাগা।'

ভবতোষদের বাড়িতে আগে আর কখনও যায় নি বিনু। ভবতোষ অবশ্য যেতেও বলেন নি। বিনুর ধারণা ছিল, বাড়িটা আদালতপাড়ার কাছাকাছিই হবে। কিন্তু সে তো বড় রাস্তা ধরে হেঁটে আসতে হয়। নৌকোয় করেও খাল দিয়ে যে আসা যায়, বিনু জানত না।

ঝিনুকদের বাড়ি আসার কথা তেমন করে কখনও মনে হয় নি বিনুর। তাদের কথা গভীরভাবে কোনওদিন ভাবেও নি সে। তেমন করে ভাববার বয়সও নয় তার। ঝিনুকের মা চলে গেছেন, তার বাবার বিষণ্ণ চেহারা, মেয়েকে তিনি অন্যের বাড়ি ফেলে রেখেছেন, এই সবের জন্য দুঃখ হয়েছে বিনুর, ঝিনুকের জন্য খানিক সহানুভূতি বোধ করেছে সে। এই পর্যন্ত ।

কিন্তু এই মুহূর্তে ঝিনুকদের বাড়ির কাছাকাছি এসে সেখানে যাবার খুব ইচ্ছে হল বিনুর। কেন হল সে নিজেই জানে না।

একটু পর নৌকোটা যেখানে ভিড়ল সেটা কাঠের তক্তা দিয়ে বাঁধানো ঘাটলা। খাল ধরে আসতে আসতে এইরকম ঘাটলা অনেক দেখেছে বিনু। বুঝেছে দু'ধারে যাদের বাড়ি এইরকম ঘাট পেতে খালটাকে তারা ব্যবহার করে।

নৌকো ভিড়তেই স্নেহলতা বললেন, 'তোর আর গিয়ে কাজ নেই যুগল। একটু বোস। আমি ওদের নিয়ে ভবতোষের সঙ্গে দেখা করে আসি। যাব আর আসব।'

যুগল বসে থাকল। বিনুদের সঙ্গে নিয়ে স্নেহলতা ওপরে উঠলেন। কয়েক পা যেতেই ছোট্ট একখানা বাড়ি। তার মেঝে পাকা, চারধারে ক্যাঁচা বাঁশের রং-করা বেড়া, মাথায় নকশা-কাটা ঢেউটিনের চাল।

স্নেহলতা ডাকলেন, 'ভব—ভব—' ডেকে অবশ্য দাঁড়ালেন না, ভেতরে চলে এলেন।

ভবতোষ বেরিয়ে আসছিলেন। অবাক হয়ে বললেন, 'আপনি খুড়িমা!'

স্নেহলতা বললেন, 'হ্যাঁ, আমি।'

আরও কী জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিলেন ভবতোষ, সুরমাদের দেখতে পেয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন, 'আসুন—আসুন। ঘরে চলুন—'

বিনু লক্ষ করল, ভবতোষের চোখমুখ মলিন, দীপ্তিহীন। কপালে কালো কালো ছোপ পড়েছে। দাড়ি গোঁফ কতদিন যে কাটা হয় নি, অযত্নে অবহেলায় সেগুলো বেড়েই চলেছে। চেহারাও আগের চাইতে অনেক খারাপ হয়ে গেছে। কৃশ, করুণ এবং অত্যন্ত অসহায় দেখাচ্ছে তাঁকে। কিছুটা কুঁজোও যেন হয়ে পড়েছেন, সামনের দিকে ঈষৎ ঝুঁকে হাঁটছেন। পরনে খদ্দরের ময়লা পাজামা আর পাঞ্জাবি।

pathagar.net

একটা ঘরে এনে সবাইকে বসালেন ভবতোষ। আসবাব বলতে এখানে একটা খাট, তার ওপর মোংরা ধামসানো বিছানা। একধারে খানকতক চেয়ার, একটা টেবিল। আর চার-পাঁচটা আলমারি বোঝাই বই। বিনু শুনেছে, ভবতোষ এখানকার কলেজে পড়ান।

স্নেহলতা বললেন, 'সেই যে মেয়েটাকে দিয়ে এলে, তারপর থেকে আর দেখা নেই। ব্যাপারটা কী?'

মৃদু গলায় ভবতোষ বললেন, 'দু'একদিনের ভেতর যাব যাব ভাবছিলাম।'

'আমরা এদিকে এসেছিলাম। ভাবলাম তোমার সঙ্গে একবার দেখা করে যাই।'

'বেশ করেছেন। কিন্তু—'

ভবতোষের মনের কথাটা যেন পড়তে পারলেন স্নেহলতা। বললেন, 'আমাদের জন্যে ব্যস্ত হতে হবে না। আমরা এক্ষুনি উঠব।'

ভবতোষ বললেন, 'আপনার জন্যে ভাবছি না। ওঁরা প্রথম দিন এলেন—'

স্নেহলতা ধমক দিয়ে উঠলেন, 'ওদের জন্যেও ভাবাভাবি করতে হবে না।' একটু থেমে আবার, 'চেহারাখানা তো চমৎকার দাঁড় করিয়ে ফেলেছ!'

ভবতোষ হাসলেন।

'খাওয়া দাওয়া ঠিকমতো হচ্ছে?'

'হ্যাঁ।'

'দেখে তো মনে হয়, হচ্ছে না। রসিক সাহার বিধবা বউটা কাজ করছে?'

'করছিল। দু'দিন হল বেতকায় তার এক বোনের বাড়ি গেছে। থাকবে ক'দিন।'

'এ দু'দিন রান্নাবান্না করল কে?'

'আমিই করেছি।'

স্নেহলতা রেগে উঠলেন, 'আমরা কি মরে গিয়েছিলাম? আমাদের ওখানে চলে যেতে পার নি?'

ভবতোষ বললেন, 'ঝিনুককে দিয়ে এসেছি। তার ওপর আরও ঝঞ্ঝাট বাড়াতে ইচ্ছে হয় না।'

এবার এক কাণ্ড করে বসলেন স্নেহলতা। এমনিতে তাঁর স্বভাব খুব মৃদু, কোমল। জোরে কখনও কথা বলেন না, হাসেন না। এই মুহূর্তে আত্মবিস্মৃত হয়ে গেলেন যেন। স্বভাববিরুদ্ধ চিৎকার করে উঠলেন, 'পারব না, পারব না তোমার মেয়ের দায়িত্ব নিতে। ঝিনুক থাকল, আমরা চললাম।'

অজান্তে কোথায় আঘাত দিয়ে ফেলেছেন, নিমেষে বুঝতে পারলেন ভবতোষ। স্নেহলতার পা ছুঁয়ে বললেন, 'আমার অন্যায় হয়েছে খুড়িমা। কাল থেকে দু'বেলা আপনার কাছে গিয়ে খেয়ে আসব। আমাকে ক্ষমা করুন।'

সঙ্গে সঙ্গে স্নেহলতার সব রাগ, অভিমান শান্ত হয়ে গেল। স্নেহের সুরে বললেন, 'যতদিন রসিক সাহার বউ না আসছে আমার ওখানে খাবে।'

'আচ্ছা।'

'একটু চুপ।

তারপর স্নেহলতা বললেন, 'বউমার কোনও খবরটবর আর পেয়েছ?'

বিষণ্ণ মুখে ভবতোষ বললেন, 'না।'

আবার কী জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিলেন ভবতোষ, এই সময় ফিসফিস করে ঝিনুক বিনুকে ডাকল, 'এই—এই—'

বিনু খুব মনোযোগ দিয়ে ভবতোষের কথা শুনছিল। এবার মুখ ফিরিয়ে বলল, 'কী বলছ?'

'চল, তোমাকে একটা জিনিস দেখাব।'

'কী?'

'চলই না।'

একপ্রকার জোর করেই বিনুকে বাইরে নিয়ে এল ঝিনুক।

বিনু বলল, 'কী দেখাবে, দেখাও—'

'আগে আমাদের বাড়িটা দেখাব। তারপর—'

pathagar.net

'তারপর?'

'সেই জিনিসটা।'

এ ঘর, সে ঘর, ফুলফলের ছোট্ট বাগান—সব দেখানো হলে একটা ছোট্ট ঘরে বিনুকে নিয়ে এল ঝিনুক। এখানে হাতল-ভাঙা সাইকেল, ছেঁড়া তোষক, ভাঙা আলুর পুতুল, সংসারের যাবতীয় বাতিল জিনিস স্তূপীকৃত হয়ে আছে। আবর্জনার তলা থেকে ফ্রেমে-বাঁধানো একটা ফোটো বার করে আনল ঝিনুক। ফোটোটা এক তরুণীর। বড় বড় চোখের পাতায়, ঠোঁটে হাসির আলো মাখানো। ছোট্ট কপালের ওপর থেকে ঘন চুলের ঘের। গলায় প্রকাণ্ড লকেটওলা সীতাহার। কপালে সিঁদুরের টিপ।

ঝিনুক বলল, 'এই ফোটোটা আমি লুকিয়ে রেখেছি। বাবা জানতে পারলে বকবে।'

বিনু শুধলো, 'কার ফোটো এটা?'

'আমার মা'র।' ঝিনুক বলতে লাগল, 'মা'র সব ফোটো বাবা ফেলে দিয়েছে। খালি এটা পারে নি।'

বিনু একদৃষ্টে ফোটোর দিকে তাকিয়ে ছিল, কিছু বলল না।

ঝিনুক আবার বলল, 'জানো, আমার মা চলে গেছে। আর কক্ষনো আসবে না।'

সান্ত্বনা দেবার মতো করে বিনু বলল, 'আসবে, আসবে—'

ঝাঁকড়া মাথা নেড়ে ঝিনুক বলল, 'না না, কক্ষনো না—'

একসময় স্নেহলতার গলা ভেসে এল, 'বিনু, ঝিনুক, কোথায় গেলি রে তোরা?'

তাড়াতাড়ি ফোটোটা আবর্জনার তলায় ঢাকা দিয়ে বিনুকে নিয়ে বেরিয়ে এল ঝিনুক। স্নেহলতা ততক্ষণে বাইরে বেরিয়ে এসেছেন। বললেন, 'চল চল, অনেক বেলা হয়ে গেছে।'

নৌকোয় করে বাড়ি ফিরতে ফিরতে বার বার ঝিনুকের মা'র কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল বিনুর। জলের দিকে তাকিয়ে, দু'ধারের পরিচিত দৃশ্যগুলির দিকে তাকিয়ে, বার বার অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছিল সে।

হঠাৎ সুরমার গলা শোনা গেল, 'ওইটা কিসের চুড়ো মামী?'

দূরমনস্কের মতো একবার ঘাড় ফিরিয়ে দেখল বিনু, খানিকটা দূরে কিসের একটা ধারাল মাথা আকাশকে বিদ্ধ করে আছে।

স্নেহলতা বললেন, 'ওটা গীর্জা, লালমোহন সাহেব ওখানে থাকে।'

লারমোরের কথা শুনেও খুব আগ্রহ বোধ করল না বিনু। ঝিনুকের মা'র কথাই করুণ গানের কলির মতো ঘুরে ঘুরে তার মনের ভেতর হানা দিতে লাগল।

অমন সুন্দর স্নেহময় যাঁর চেহারা, তিনি কেমন করে ঝিনুককে ফেলে চলে গেলেন? হঠাৎ বিনুর মনে হল তার মা-ও যদি এরকম তাকে ফেলে চলে যেতেন? পরক্ষণে সে ভাবল, তার মা কখনই এমন নিষ্ঠুর হবেন না।

ঝিনুকের জন্য এতদিন দুঃখ বোধ করেছে বিনু, আজ অসীম মমতায় তার মন ভরে গেল।

দূর আকাশের পট থেকে গীর্জার চুড়ো ততক্ষণে মুছে গেছে।

মহালয়ার পর থেকে দিনগুলো যেন পাখায় ভর করে উড়ছিল। দেখতে দেখতে চতুর্থী, পঞ্চমী, এমন কি ষষ্ঠীও পেরিয়ে গেল।

ক'দিন আগে হঠাৎ হঠাৎ ঢাক বেজে উঠত, সেটা ছিল মহড়া। এখন প্রায় সারাদিনই রাজদিয়ার আকাশ বাতাস জুড়ে কখনও ঢিমে তালে, কখনও দ্রুতলয়ে ঢাকের শব্দ শোনা যায়। প্রতিমাগুলোর অঙ্গরাগ কবেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। মার্জনার পর ঘামতেল লাগিয়ে তাদের উজ্জ্বলতা বাড়িয়ে তোলা হয়েছে। তারপর খুব যত্ন করে পরানো হয়েছে রঙিন পাটের শাড়ি আর জরির অলঙ্কার। মাথায়

তাদের কারুকার্যময় মুকুট, হাতে গোছা গোছা চুড়ি, কঙ্কণ এবং অঙ্গদ। নাকের পাটায় সুগোল নথ, কানে কর্ণভূষণ, কণ্ঠ বেষ্টন করে চিক এবং সাতলহর হার। পায়ে মঞ্জীর। এ বেশ দেবীমূর্তিগুলির। কার্তিক এবং গণেশের চুড়ি কঙ্কণ নথ বা কণ্ঠবেষ্টনী নেই। তবে অঙ্গদ আর বীরবৌলি আছে।

পূর্ব বাংলার প্রতিমাগুলি কলকাতার মতো নয়। কলকাতার বেশির ভাগ জায়গায় নকল পাহাড় বানিয়ে লক্ষ্মী সরস্বতী-কার্তিক-গণেশ এবং দুর্গাকে আলাদা আলাদ বসানো হয়। এখানকার সব মূর্তিই কিন্তু এক চালির ভেতর!

পেছনে নকশা-করা প্রকাণ্ড চালচিত্র। তার মাথায় মহাদেবের ছবি। সামনের দিকে প্রতিমা। পূর্ব বাংলার মূর্তিগুলি বিরাট বিরাট, সাত আট হাতের মতো লম্বা। বড় বড় বিশাল চোখ তাদের, সেদিকে তাকালে ভয়ও করে, ভক্তিও হয়।

রাজদিয়ায় এখনও বিজলি আলোর দাক্ষিণ্য এসে পৌঁছয় নি। কাজেই রাত্তিরবেলায় পুজোমণ্ডপগুলিতে হ্যাজাক কি ডে-লাইট জ্বলতে থাকে। ডাকের সাজে ঝলমলে দেবীমূর্তিগুলিকে তখন কী সুন্দরই না দেখায়।

সাতখানা তো মোটে প্রতিমা।

সেই এক-মেটে দু-মেটে তে-মেটের সময় থেকেই দেখে আসছে বিনু। তার চোখের সামনে মূর্তিগুলিতে রং লাগানো হল, রঙিন পাটের শাড়ি এবং ডাকের সাজ পরানো হল, চালচিত্র আঁকা হল।

কতবার দেখেছে, তবু বিস্ময় আর মুগ্ধতা যেন কিছুতেই কাটছে না বিনুর। পঞ্চমীর দিন প্রতিমাগুলিকে পুজোমণ্ডপে আনবার পর থেকে বাড়িতে আর এক মুহূর্তও থাকছে না সে। ঘুরে ঘুরে ঠাকুর দেখতে চলে আসছে।

আজ সপ্তমী।

আশ্বিনের শুরু থেকে ঝকমকে নীলাকাশ, নরম তুলোর মতো থোকা থোকা মেঘ, নদীতীরের কাশ ফুল, হলুদ বোঁটার মাথায় রাশি রাশি হাসিমুখ শিউলি, অল্প অল্প শিশির—যার জন্য এত আয়োজন তা যেন আজ শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছে গেছে। সকাল থেকে ঢাকের শব্দে কান আর পাতা যায় না। রাজদিয়ার দক্ষিণ প্রান্তে দত্তদের বাড়ি, বংশ পরম্পরায় সেখানে পুজো হয়ে আসছে। এবার তাদের পুজোর ঘটা কিছু বেশি। ঢাকা থেকে তারা ব্যান্ডপার্টি আনিয়েছে। চারদিকের ঢাকের শব্দের সঙ্গে ব্যাণ্ডপার্টির বাজনা মিশে আকাশ বাতাস উৎসবময় হয়ে উঠেছে।

রাজদিয়ার কোনও মানুষই, বিশেষ করে বাচ্চা ছেলেমেয়েরা আজ আর বাড়িতে নেই। দল বেঁধে তারা বেরিয়ে পড়েছে, মণ্ডপে মণ্ডপে ঘুরছে।

বিনুরা সারাদিন সবার সঙ্গে ঘুরে ঘুরে বেড়াল। বহুবার দেখা প্রতিমাগুলি আরও বহুবার দেখল। তারপর সন্ধের আগে আগে বাড়ি ফিরে এল।

বাড়িতে তখন সাজ সাজ রব পড়ে গেছে। হেমনাথ সুরমা সুধা সুনীতি ঝিনুক অবনীমোহন স্নেহলতা, সবাই বেরুবার জন্য প্রায় প্রস্তুত। বিনুর জন্য তাঁরা অপেক্ষা করছিলেন।

বিনুকে দেখে সকলে একসঙ্গে চেঁচামেচি জুড়ে দিল, 'কী ছেলে রে তুই! সেই পঞ্চমীর দিন থেকে দু'দণ্ড যদি বাড়িতে পা পেতে বসছে!'

অবনীমোহন শুধোলেন, 'কোথায় ছিলি এতক্ষণ?'

বিনু বলল, 'ঠাকুর দেখতে গিয়েছিলাম।'

'ঠাকুর, ঠাকুর, ঠাকুর! দিন রাত খালি ঠাকুর—'

হেমনাথ সস্নেহে বললেন, 'পুজোর এই ক'টা দিনই তো। আহা, দেখুক দেখুক—'

অবনীমোহন আর কিছু বললেন না।

হেমনাথ এবার বিনুর দিকে ফিরলেন। এক পলক তাকে দেখে নিয়ে বললেন, 'জামা-প্যান্টগুলো তো চটকে মটকে নোংরা করে ফেলেছিস। শিগগির ওগুলো বদলে ভাল জামা-প্যান্ট পরে নে।'

বিনু বলল, 'কেন।'

'কেন আবার, আমাদের সঙ্গে যাবি।'

সারাদিন ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল বিনু। এক্ষুনি আর বেরুবার ইচ্ছা ছিল না তার। তবু বলল, 'কোথায় যাব তোমাদের সঙ্গে?'

হেমনাথ বললেন, 'বা রে, তোর কিছুই দেখি মনে থাকে না দাদাভাই। আজ 'শ্যামা' নৃত্যনাট্য হবে না?'

বিনুর মনে পড়ে গেল। আগে থেকেই ঠিক করা আছে সপ্তমীর দিন রাত্তিরবেলা হবে 'শ্যামা', অষ্টমীর রাত্রে 'বিজয়া'। স্টিমারঘাট পেরিয়ে সারি সারি মাছের আড়ত এবং বরফ-কল পেছনে ফেলে একটুখানি গেলেই রাজদিয়ার সব চাইতে বড় বারোয়ারি পুজো। সেখানেই নাটক টাটকগুলো হবে। পঞ্চমীর দুপুর থেকে পুজোমন্ডপের সামনের মাঠে স্টেজ বাঁধা শুরু হয়েছিল, আজ সকালবেলা শেষ হয়েছে। হিরণই দলবল নিয়ে ওটা বেঁধেছে। নাটক নির্বাচন, রিহার্সাল, স্টেজ বাঁধা—সব কিছুর পেছনেই একটি মানুষ। সে হিরণ।

শুধু রিহার্সাল টিহার্সালই নয়, রাজদিয়ার সদর রাস্তার দু'ধারে বড় বড় গাছগুলো রেহাই পায় নি। তাদের গায়ে কত যে লাল নীল রঙে লেখা পোস্টার পড়েছে, হিসেব নেই। পোস্টারগুলোতে আছেঃ

আসুন আসুন, দলে দলে যোগদান করুন।
স্থান ঃ রাজদিয়া বারোয়ারি পূজামন্ডপ।
সময় ঃ মহাসপ্তমী, রাত্রি আটটা।
ও
মহাষ্টমী, রাত্রি সাতটা।
বিষয় ঃ সপ্তমীর রাত্রে 'শ্যামা' নৃত্যনাট্য।
অষ্টমীর রাত্রে 'বিজয়া' নাটক।
অভিনয়ে অংশ গ্রহণ ঃ কলিকাতার নৃত্যগীত পটীয়সী শ্রীমতী সুধা ও শ্রীমতী সুনীতি বসু। (হেমকর্তার নাতনী)। তৎসহ আরও অনেকে।

এ সবই হিরণের কাজ। বিনু শুনেছে, শুধু রাজদিয়াতেই নয়, সুজনগঞ্জ-কমলাঘাট, ওদিকে বেতকা-আউটশাহী, সব জায়গায় ঘুরে ঘুরে যাকে পেয়েছে তাকেই নিমন্ত্রণ করে এসেছে হিরণ। ফলে নৃত্যনাট্য এবং নাটকের ব্যাপারে চারদিকে সাড়া পড়ে গেছে।

বিনুকে আর তাড়া দিতে হল না। এক ছুটে ঘরে গিয়ে জামা প্যান্ট বদলে তক্ষুনি ফিরে এল। হেমনাথ বললেন, 'তা হলে এবার বেরিয়ে পড়া যাক।'

সবাই সায় দিল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, আর দেরি করে কী হবে!'

ঘরে ঘরে তালা লাগানো হল। পুজোর দিনে কেউ বাড়িতে বসে থাকবে, তা হয় না। তা ছাড়া নাটকের ব্যাপার আছে। সুধা সুনীতি অভিনয় করবে, রাজ্যের মানুষ দেখবে আর যুগল টুগলরা দেখতে পাবে না, তা কী করে হয়? শখ টখ তাদেরও তো আছে। কাজেই কাউকে আর বাদ দেন নি হেমনাথ, বাড়ি ফাঁকা করেই বেরিয়ে পড়েছেন।

রাস্তায় এসে কী মনে পড়তে তাড়াতাড়ি সুরমাকে ডাকলেন হেমনাথ, 'অ্যাই রমু, অ্যাই—'

'কী বলছ মামা?'

'তুই কি হেঁটে হেঁটে অতখানি পথ যেতে পারবি?'

'পারব।'

'অনেকখানি রাস্তা কিন্তু—'

'কতখানি আর, স্টিমারঘাটের কাছাকাছি তো?'

'খুব কাছাকাছি না, স্টিমারঘাট পেরিয়ে বেশ খানিকটা। এক কাজ করি বরং—'

'কী?'

'সবাই নৌকোয় করে যাই।'

সুরমা জোরে জোরে মাথা নাড়লেন, 'না মামা, নৌকোর দরকার নেই। রাজাদিয়ায় এসে বেশ ভাল আছি। এই রাস্তাটুকু হেঁটেই যেতে পারব। তা ছাড়া—'

জিজ্ঞাসু চোখে তাকালেন হেমনাথ।

pathagar.net

সুনমা বলতে লাগলেন, 'কতকাল দেশের পুজো দেখি না। নৌকোয় করে গেলে ঘুরে ঘুরে দেখতে পাব না।'

'তবে হেঁটেই চল।'

হইচই করতে করতে হেমনাথরা এগিয়ে চললেন। সবাই প্রায় কথা বলছে। হেমনাথ-সুধা-সুনীতি-অবনীমোহন—সব্বাই। এলোমেলো, টুকরো টুকরো, বিচ্ছিন্ন কোলাহল। ফাঁকে ফাঁকে ফস করে আলো জ্বলে ওঠার মতো হাসি।

চলতে চলতে উঁচু গলায় হেমনাথ বললেন, 'তোদের নৃত্যনাট্য ক'টার সময় রে?'

সুধা বলল, 'আটটায়।'

'তা হলে তো ঢের সময় আছে। ঠাকুর টাকুর দেখে ধীরে সুস্থে গিয়ে পৌঁছলেই হবে।'

'উঁহু উঁহু—'

'কী?'

'সাড়ে ছ'টার ভেতর না গেলে—'

'না গেলে কী?'

সুধা উত্তর দিল না। তার পাশ থেকে চোখের পাতা নাচাতে নাচাতে চাপা সকৌতুক সুরে সুনীতি বলে উঠল, 'হিরণবাবু একেবারে অজ্ঞান হয়ে যাবেন।'

বিনু কাছেই ছিল। লক্ষ করল, সবার আগোচরে সুনীতিকে চোরা চিমটি কষাল সুধা।

সুনীতি আধফোটা গলায় চেঁচিয়ে উঠল, 'উ-হু-হু-হু—'

হেমনাথ বললেন, 'কী হল রে?'

সুনীতি মুখ খুলবার আগেই সুধা তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'কিছু হয়নি দাদু।'

চোখ কুঁচকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন হেমনাথ। বুঝতে চেষ্টা করলেন দুই বোনের ভেতর কিছু একটা চলছে—গভীর এবং গোপন। বললেন, 'কিছু হয় নি মানে? নিশ্চয় হয়েছে। সুনীতিদিদি কী যেন বলছিল! সাড়ে ছ'টার ভেতর না পৌঁছলে হিরণটার যেন কী হবে?'

সুধা হকচকিয়ে গেল। বিব্রত মুখে বলল, 'বা রে, হিরণবাবু কতবার করে দুপুরবেলা বলে গেলেন না, তুমি তো তখন শুনলে। সাড়ে ছ'টার ভেতর না গেলে কখনও হয়? মেক-আপ টেক-আপ নিতে সময় লাগবে না?'

'ঠিক ঠিক—' গম্ভীর চালে মাথা নাড়লেন হেমনাথ। কিন্তু তার ভেতর কোথায় একটা ধারাল কৌতুক কাঁটার মতো মাথা তুলে থাকল।

আরও কিছুটা যাবার পর হঠাৎ একটা গাছের দিকে আঙুল বাড়িয়ে হেমনাথ বললেন, 'দ্যাখ দ্যাখ—'

নাটক আর নৃত্যনাট্যের পোস্টারগুলোর দিকে সবার দৃষ্টি ফিরল। হেমনাথ বললেন, 'নিশ্চয়ই হিরণটার কাজ।'

বিনু এই সময় বলে উঠল, 'ছোটদি আর বড়দির নাম লেখা আছে, দেখেছ দাদু?'

'তা আর দেখি নি! ওই দ্যাখ, ওই দ্যাখ—' চারদিকের গাছগুলো বিজ্ঞাপনে বিজ্ঞাপনে ছয়লাপ, আঙুল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সেগুলো দেখাতে লাগলেন হেমনাথ। বলতে লাগলেন, 'চারদিকে সুধা সুনীতির নামাবলী লাগিয়ে রেখেছে। হতচ্ছাড়াটার কান্ড দেখেছ!'

হতচ্ছাড়াটা কে, সবাই বুঝতে পারল।

নিজের নামের দিকে তাকিয়ে সুধা সুনীতি প্রথমে অবাক। তারপর চেঁচামেচি জুড়ে দিল, 'এ মা, আমাদের নাম এইরকম করে লিখে রেখেছে!'

হেমনাথ হাসলেন, 'ভালই তো করেছে। কেমন ফেমাস হয়ে গেছিস বল দেখি। তোদের দাদু হিসেবে আমিও বিখ্যাত হয়ে গেলাম।'

'হিরণবাবুর সঙ্গে একবার দেখা হোক না—'

এদিককার প্রতিমা দেখে স্টিমারঘাটের কাছে যখন হেমনাথরা পৌঁছলেন, আশ্বিনের সন্ধে ধীর

pathagar.net

পায়ে নেমে আসতে শুরু করেছে। এর মধ্যেই নদীপাড়ের সারি সারি দোকানগুলিতে, স্টিমারঘাটে, বরফ-কলে আলো জ্বলে উঠেছে। বেশির ভাগই গ্যাসবাতি, তবে হ্যাজাক এবং ডে লাইটও আছে। নদীর খাড়া পাড়ের তলায় নৌকোঘাট। নৌকোগুলোতে মিটমিটে জোনাকির মতো হয় হেরিকেন, নয়তো কোরোসিনের ডিবে জ্বলছে। চারদিকের এত আলো নদীর কালো জলে প্রতিফলিত হয়ে ঢেউয়ে ঢেউয়ে দোল খেয়ে চলেছে।

হেমনাথ যতই ঠাট্টা টাট্টা করুন, আকাশের দিকে তাকিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন, 'তাড়াতাড়ি একটু পা চালাও সবাই। আর দেরি করলে সত্যি সত্যিই কিন্তু হিরণ ভিরমি খাবে।'

একটু পর বরফ-কল, মাছের আড়ত পেছনে ফেলে সবাই বারোয়ারি পুজোমন্ডপে এসে পড়ল।

সামনের দিকের খোলা মাঠটায় যেখানে বাঁশ টাঁশ পুঁতে অস্থায়ী মঞ্চ তৈরি হয়েছে সেখানে ইতিমধ্যেই ভিড় জমতে শুরু করেছে। দূরদূরান্ত থেকে হেরিকেন ঝুলিয়ে দলে দলে আরও অনেক লোক আসছে। তাদের বেশির ভাগই জেলে-মাঝি, চাষী-কৃষাণ ইত্যাদি শ্রেণীর মানুষ। একধারে, খানকতক চেয়ার পাতা। সেগুলো রাজদিয়ার সম্ভ্রান্ত মানুষদের জন্য নির্দিষ্ট। দেখা গেল দত্তবাড়ি, মল্লিকবাড়ি, গুহবাড়ি, সোমেদের বাড়ি—এমনি নানা বাড়ি থেকে বউ-ঝিরা সেজেগুজে এসে চেয়ার দখল করে বসেছে। এমনকি রুমা ঝুমারাও এসে গেছে। আনন্দ-স্মৃতিরেখা-শিশিরকেও দেখা গেল।

চারধারে খুঁটি পুতে সেগুলোর মাথায় হ্যাজাক টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছে। একটা হ্যাজাকের তলায় দলবল নিয়ে উদ্‌গ্রীব দাঁড়িয়ে ছিল হিরণ আর বার বার রাস্তার দিকে তাকাচ্ছিল। হেমনাথদের দেখতে পেয়ে ছুটে এল। স্বস্তির সঙ্গে খানিক অনুযোগ মিশিয়ে বলল, 'আসতে পারলেন তা হলে!'

হেমনাথ বললেন, 'পারলাম।'

'ক'টার সময় আসবার কথা ছিল?'

'সাড়ে ছ'টায়।'

'এখন ক'টা বাজে বলুন তো?'

'সাড়ে ছ'টা।'

'মোটেও না। সাতটা বেজে গেছে।'

'আধঘন্টার জন্যে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে না।' বলেই আরও কাছে এসে খুব মনোযোগ দিয়ে হিরণকে দেখতে লাগলেন হেমনাথ।

হিরণ অস্বস্তি বোধ করছিল। বলল, 'কী দেখছেন অমন করে?'

'তোকে।'

'আমাকে যেন আগে আর কখনও দেখেন নি!'

'সে দেখা নয়।'

'তবে?'

'দেখছি তুই ভিরমি খেয়েছিস কিনা—' আড়ে আড়ে সুধা সুনীতির দিকে তাকিয়ে হেমনাথ বলতে লাগলেন, 'সুধাদিদি—সুনীতিদিদি বলছিল—'

অন্যমস্কের মতো হিরণ শুধলো, 'কী বলছিলেন ওঁরা?'

'সাড়ে ছ'টার ভেতরে আমরা না এলে তুই অজ্ঞান হয়ে যাবি।'

লক্ষ্যভেদ যেখানে হবার সেখানে ঠিকই হল। হেমনাথকে চোরা চোখের অগ্নিবাণে বিদ্ধ করে দ্রুত অন্যদিকে মুখ ফেরাল সুধা। সুনীতি ঠোঁট টিপে হাসতে লাগল।

নেপথ্যে কী আছে, কোন গভীর সঙ্গোপন কৌতুক, অতশত জানে না হিরণ। জানবার কথাও নয়। একটু খেয়াল করলে হেমনাথের চোখেমুখে কিছু একটা ষড়যন্ত্র অনায়াসেই ধরে ফেলতে পারত সে, অন্তত তার আভাস পেত। কিন্তু সে সব লক্ষ করবার সময় এখন নেই। ব্যস্তভাবে হিরণ বলল, 'আরেকটু দেরি করলে সত্যিই ভিরমি খেতাম। আটটায় শো আরম্ভ করার কথা। ঠিক সময় আরম্ভ করতে না পারলে—'

'না পারলে কী?'

এ ধারের জনতাকে দেখিয়ে হিরণ বলল, 'ওরা আমার গর্দান নেবে।'

pathagar.net

লঘু সুরে হেমনাথ বললেন, 'ওরা তো ঘন্টা-সেকেণ্ড মিলিয়ে চলে! আটটার এক মিনিট দেরি হলে বাবুদের সম্পত্তি নিলামে চড়ে যাবে।'

হিরণ আর কথা বাড়াল না। ব্যস্তভাবে বলল, 'আসুন, আসুন—' সবাইকে নিয়ে স্টেজের পেছন দিকে গ্রীনরুমে চলে গেল সে।

স্টেজের মতো গ্রীনরুমটা অস্থায়ী। সেখানে আরও ক'টি ছেলেমেয়েকে দেখা গেল। যেমন দত্তদের বাড়ির যমুনা, সোমেদের বাড়ির লতিকা, গুহদের বাড়ির মাধুরী। রুমাও কখন চলে এসেছে এখানে। ছেলেদের মধ্যে আছে আচার্যবাড়ির নরেন, সেনেদের বাড়ির শৈলেন, এমনি আরও অনেকে। সবাই এরা কলকাতা-প্রবাসী, পুজোর ছুটিতে রাজদিয়ায় এসেছে। 'শ্যামা' নৃত্যনাট্যে কারোর ভূমিকা নর্তকীর, কারোর গায়কের।

সমস্ত কাণ্ডখানা যার নির্দেশে চলছে সে হিরণ। যারা 'শ্যামা' নৃত্যনাট্যে নাচবে গাইবে, তারা বাদে বাকি সবাইকে তাড়া দিয়ে স্টেজের সামনের দিকে পাঠিয়ে দিল সে। তারপর নাচিয়ে গাইয়েদের বলল, 'আর সময় নেই। তাড়াতাড়ি সবাই রেডি হয়ে নিন।'

আজকের নৃত্যনাট্যে বিনুর কোনও ভূমিকা নেই। কালকের 'বিজয়া' নাটক থেকেও তাকে বাদ দেওয়া হয়েছে। দিনকয়েক রিহার্সালের পর দেখা গেছে তার অভিনয় ঠিক হচ্ছে না। যাই হোক, হিরণের তাড়া সত্ত্বেও সে গ্রীনরুম থেকে যায় নি। ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ তার নজরে পড়ল, সুধা-সুনীতি হিরণকে ঘিরে ধরেছে। সুধা বলল, 'এটা কিরকম হল?'

তার গলায় এমন কিছু ছিল যাতে চকিত হয়ে উঠল হিরণ। বলল, 'কোনটা?'

এতক্ষণ হেমনাথরা ছিলেন, তাই সুযোগ পাওয়া যায় নি। পাওয়ামাত্র সুধারা আক্রমণ করে বসেছে।

সুধা বলল, 'ওই যে গাছে গাছে আমাদের নামে বিজ্ঞাপন লাগিয়েছেন—'

ঢোক গিলে হিরণ বলল, 'ভালই তো হয়েছে। দেশসুদ্ধু লোক একদিনে আপনাদের চিনে ফেলবে।'

রাতারাতি বিখ্যাত হবার কথা হেমননাথও বলেছিলেন। সুধা বলল, 'খুব অন্যায় করেছেন। আমাদের বুঝি লজ্জা করে না?'

'কিসের লজ্জা?'

এবার সুনীতি বলল, 'বা রে, আমরা দু'বোনই শুধু অভিনয়-টভিনয় করছি নাকি? আরও অনেকেই করছে। তাদের নাম কোথায়? লোকে কী বলবে জানেন?'

'কী?' হিরণ তাকাল।

'আমাদের ব্যাপারে আপনার পক্ষপাতিত্ব আছে।' বলতে বলতে সুনীতির মাথায় হঠাৎ দুষ্টুমি ভর করল। আড়চোখে বোনকে একবার দেখে নিয়ে সে বলতে লাগল, 'সুধার নামটা রেখে আমার নামটা বাদ দিলে পারতেন।'

সুধা এমনভাবে সুনীতির দিকে তাকাল, যেন ভস্মই করে ফেলবে।

দুই বোনের ভেতর কী হয়ে গেল, হিরণ খেয়াল করে নি। চিন্তাগ্রস্তের মতো সে বলল, 'আপনি ঠিকই বলেছেন। যারা যারা অভিনয় করছে, কালই তাদের নাম দিয়ে নতুন পোস্টার লাগাব।'

এই সময় সুধা বলল, 'আগেভাগে নাম দিয়ে আমাদের ভারি বিপদে ফেলে দিয়েছেন। এটা ভীষণ অন্যায়।'

হিরণ ভীরু সংশয়ের চোখে তাকাল। আক্রমণটা আবার কোন দিক থেকে আসছে সে বুঝতে পারল না।

সুধা বলল, 'আমাদের নামে অত ঢাক পিটিয়েছেন। লোকে ভাবছে না জানি আমরা কী ওস্তাদ গাইয়ে বাজিয়ে। যখন সত্যি সত্যি নাচতে গাইতে দেখবে, ঠিক ঢিল ছুড়বে। আমার বুক ঢিপ ঢিপ করছে।'

শো আরম্ভ হবার সময় হয়ে আসছে। মনে মনে বুঝিবা অস্থির হয়ে উঠল হিরণ। তাড়াতাড়ি সে বলল, 'ঢিল ছুড়লে কি ফল ছুড়বে, দেখা যাবে'খন। যান যান, শিগগির মেক-আপ নিয়ে নিন।'

একটু দূরে দত্তবাড়ির যমুনা বসে ছিল। সুধাদের আর কিছু বলার অবকাশ না দিয়ে হিরণ তার দিকে ছুটল। মনে হল, পালিয়েই যেন গেল সে।

তাকিয়ে তাকিয়ে একটু দেখল সুধা। আজকের নৃত্যনাট্যের ব্যাপারে খুব মনোযোগ দিয়ে যমুনাকে তালিম দিচ্ছে হিরণ। এখন কোনও দিকে তার নজর নেই। মৃদু হাসল সুধা। সে জানে শেষ মুহূর্তে এত তালিমের প্রয়োজন নেই। প্রয়োজনটা কেন, তার অজানা নয়।

হিরণ যমুনাকে নিয়ে ব্যস্ত। অগত্যা সুধা আর কী করে? সাজসজ্জায় মন দিল সে। 'শ্যামা' নাটকে নাম-ভূমিকা তার। সুনীতির মেক-আপের দরকার নেই, সে নেপথ্যে বসে গান গাইবে।

এদিকে চঞ্চল পায়ে আরও কিছুক্ষণ গ্রীনরুমে ঘোরাঘুরি করল বিনু। তারপর পাখির মতো ফুড়ুত করে স্টেজের সামনে চলে এল।

ইতিমধ্যে ভিড় আরও বেড়েছে। একটা চেয়ারও আর খালি পড়ে নেই। ভিড়ের প্রতিটি মানুষ কথা বলছে, ফলে চারদিকে জুড়ে গুঞ্জন উঠছে।

স্টেজের তলায় এত ভিড় যে একটুও জায়গা নেই। চারধার থেকে জনতা চাপ বেঁধে স্টেজটাকে ঘিরে ধরে আছে।

কোথায় বসবে, কোথায় বসলে ভাল করে দেখা যাবে, ঠিক করতে পারল না বিনু। এদিকে সেদিকে হতাশভাবে তাকাচ্ছিল সে। হঠাৎ একটা গলা কানে ভেসে এল, 'বিনুদা, এ্যাই বিনুদা—

মাথা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বিনু দেখতে লাগল। গলাটা আবার শোনা গেল, 'এই যে, এখানে—'

এবার দেখতে পাওয়া গেল, স্টেজের ঠিক তলায় বসে আছে ঝুমা। চোখাচোখি হতেই সে হাতছানি দিল।

বিনু চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলল, 'যাব কী করে? এত ভিড়!'

ঝুমটা আস্ত ডাকাত। সে পরিচয় আগেও পেয়েছে বিনু, আজও আরেক বার পেল। এক লাফে উঠে দাঁড়িয়ে একে সরিয়ে, ওকে ধাক্কা মেরে, তাকে কাত করে একটা রাজপথ বানিয়ে ফেলল সে।

প্রথমটা বিনু বিমূঢ়। তারপর পায়ের সামনে একটা রাস্তা পেয়ে গেলে কে আর দাঁড়িয়ে থাকে? চোখের পলকে ঝুমার কাছে গিয়ে বসে পড়ল সে।

বিনু বসবার পর ঝুমাও বসল। চারদিকে হইচই চেঁচামেচি চলছে। সে সব ছাপিয়ে ঝুমার গলা উঁচুতে উঠল, 'তুমি একটি হাবা গঙ্গারাম—'

এমন একটি সম্ভাষণে খুশি হবার কথা নয়। রাগের গলায় বিনু বলল, 'হাবা টাবা বলবে না।'

'নিশ্চয় বলব। হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকবে আর বলবে না! কী করে রাস্তা করে নিতে হয় বুঝেছ?'

অপ্রসন্ন মুখে মাথা নাড়ল বিনু, অর্থাৎ বুঝেছে।

একটু চুপ। তারপর ঝুমা আবার বলল, 'তুমি বড্ড মিথ্যেবাদী।'

বিনু হকচকিয়ে গেল, 'কেন?'

'সেদিন বললে আমাদের বাড়ি যাবে। খুব গেলে তো।'

বিনু মনে মনে বানিয়ে নিয়ে বলল, 'একদম ভুলে গিয়েছিলাম।'

'খালি খালি তুমি ভুলে যাও। সেবারও গেলে না, এবারও এলে না।' ঝুমা বলতে লাগল, 'একা একা আমাদের বাড়ি আসতে ভয় করে নাকি?'

ভয়ের কথাটা আরেক দিনও বলেছিল ঝুমা। বীরের মতো মুখ করে বিনু বলল, 'মোটেও না। একা একা অমি সব জায়গায় যেতে পারি আজকাল। দেখবে কালই তোমাদের বাড়ি চলে গেছি।'

'ঠিক তো?'

'ঠিক।'

ঝুমা আবার কী বলতে যাচ্ছিল, সেই সময় পর্দা সরে গিয়ে নৃত্যনাট্য শুরু হয়ে গেল। শ্যামা, উত্তীয়, বজ্রসেন, কোটাল, শ্যামার সহচরীরা—দৃশ্যের পর দৃশ্যে মনোহর নৃত্যভঙ্গিমায় সবাই এক রমণীয় স্বপ্নলোক সৃষ্টি করতে লাগল। নেপথ্যে বসে গাইছে সুনীতিরা। নাচ আর গান, একই তালে একই সুচারু ছন্দে চলছে। অগণিত মানুষ আচ্ছন্নের মতো পলকহীন তাকিয়ে আছে। মাঝে মাঝে দর্শকদের মধ্যে থেকে মুগ্ধ কণ্ঠস্বর কানে ভেসে আসছে, 'কুন দুইজন হ্যামকত্তার নাতিন?'

pathagar.net

আরেক জন বলল, 'কে বা জানে!'

'কইলকাত্তার মাইয়ারা কিবা নাচে!'

'হু।'

'কিবা গীত গায়।'

'হু।'

একসময় নৃত্যনাট্য শেষ। দূরদূরান্তের দর্শকরা চলে যেতে লাগল। ভিড় পাতলা হলে বিনু আর সুধা গ্রীনরুমের দিকে ছুটল। সেখানে আসতেই পেছন দিকের নিরালা অন্ধকারে একটা নিভৃত দৃশ্য চোখে পড়ে গেল।

গ্রীনরুমের ডানদিকে ছোটখাটো ঝোপের মতো। জায়গাটা বেশ নিরিবিলি। দূরে একটা হ্যাজাক জ্বলছে, তার আলো এখানে এসে পৌঁছয়নি। ফলে আবছা অন্ধকারে চারদিক ছেয়ে আছে।

ঝোপের গা ঘেঁষে হিরণ এবং সুধা দাঁড়িয়ে ছিল। বিনুরা ছুটে আসতে আসতে তাদের দেখে থমকে গেল।

হিরণ বলছিল, 'তখন তো খুব বলেছিলেন, আপনার নাচ দেখলে লোকে ঢিল ছুড়বে। এখন?'

সুধা ঠোঁট টিপে গরবিনীর মতো হাসল। উজ্জ্বল চোখে এক পলক হিরণকে দেখে নিয়ে বলল, 'এখন কী?'

'সবাই আপনাকে খোঁজাখুঁজি করছে।'

কপট ভয়ের গলায় সুধা বলল, 'ও মা, কেন?'

একটু রহস্য করে হিরণ বলল, 'কেন, আপনিই ভেবে দেখুন।'

'আমি ভাবতে পারছি না।'

'তবে আমিই বলি। তারা একবার খালি আপনাকে দেখতে চায়। রাজদিয়ার লোক একেবারে পাগলা হয়ে গেছে।'

'নাকি?'

'ইয়েস।'

চোখের তারা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে এবার বেশ কিছুক্ষণ হিরণকে দেখল সুধা। চতুর সুরে বলল, 'আর আপনি?'

'আমি?' ঘন আবেগের গলায় হিরণ বলতে লাগল, 'আমিও ম্যাড, বুঝলেন? এমন নাচ আগে আর কখনও দেখি নি।'

খুব আস্তে সুধা বলল, 'দেখবেন, বেশি ম্যাড ট্যাড হবেন না। তাতে বিপদ আছে।'

হিরণ শুনতে পেল কিনা, কে জানে। বলল, 'আমার কী ইচ্ছে জানেন?'

মুখ তুলে সুধা বলল 'কী?'

'বললে আপনি হাসবেন।'

'হাসার মতো কিছু করবেন নাকি?'

'আগে শুনুন না—'

'আচ্ছা বলুন।'

হিরণ বলল, 'ইচ্ছে হচ্ছে আপনাকে মাথায় তুলে সারা রাজদিয়া এক পাক ঘুরে আসি।'

দুষ্টু চোখ কপালে তুলে সুধা বলল, 'দৃশ্যটা কিন্তু—' এই পর্যন্ত বলে চুপ করে গেল।

'দৃশ্যটা কী?'

'খুব মনোরম হবে না।'

'না হোক।'

'ত ছাড়া—'

'আবার কী?'

ঘাড় বাঁকিয়ে সুধা বলল, 'একটু আগে যা বলছিলেন তার লক্ষণ কিন্তু দেখা দিয়েছে। খুব সাবধান।'

কপাল কুঁচকে কিছুক্ষণ ভাবল হিরণ। পরে বলল, 'অর্থাৎ পাগলামির?'

'ইয়েস স্যার।'

'দিক দেখা—' সুধার কাছে আরেকটু নিবিড় হয়ে এল হিরণ। গাঢ় গলায় ডাকল, 'সুধা—'

একটু দূরে বিনু আর ঝুমা দাঁড়িয়ে ছিল। ঝুমা ফিসফিস করে ডকাল। 'এই বিনুদা—'

বিনু মুখ ফেরাল।

ঝুমা বলল, 'ওরা কারা? সুধাদি আর হিরণদা?'

অন্যমনস্কের মতো বিনু বলল, 'হুঁ। কী করছে?'

সুধার কাছে হিরণ যখন ঘনিষ্ঠ হয়ে এল তখন থেকেই বিনুর মনে হচ্ছে, কেন হচ্ছে কে জানে, এখানে আর দাঁড়িয়ে থাকা ঠিক নয়। সে বলল, 'কী করছে, কে জানে। চল—'

ঝুমাকে নিয়ে ঝোপের ওধারে যেতেই আবার সেই দৃশ্য, অবিকল একরকম। তবে পাত্র পাত্রী আলাদা। ওখানে ছিল সুধা হিরণ। এখানে আনন্দ সুনীতি। বিনুরা আগের মতো থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

চাপা আবেগপূর্ণ গলায় আনন্দ বলছিল, 'আপনার মতো গাইতে আর কাউকে শুনি নি। মানুষ যে এমন গাইতে পারে, আমার ধারণা ছিল না।'

'শ্যামা' নৃত্যনাট্যে নাচের ভূমিকা ছিল না সুনীতির, নেপথ্যে বসে সে গেয়েছিল। যাই হোক, সুনীতি লজ্জা পেয়ে গেল, মনে মনে খুশিও। আনন্দকে এক পলক দেখে নিয়ে বিচিত্র লীলাভরে বলল, 'ছাই গাইতে জানি।'

আনন্দ এবার কিছু বলল না, সুনীতির কাছে আরেকটু এগিয়ে গেল।

বিনুর পাশ থেকে ঝুমা বলল, 'আমার মামা আর তোমার দিদি!'

বিনু ঘাড় কাত করল, 'হুঁ—'

'অন্ধকারে ওরা কী করছে?'

'কে জানে।'

আরও কিছুক্ষণ পর সবার সঙ্গে বাড়ি ফিরছিল বিনু। আগে আগে ছিলেন হেমনাথ অবনীমোহন সুরমা আর স্নেহলতা। মাঝখানে বিনু ঝিনুক গৌরদাসী এবং জবা। একেবারে পেছনে সুধা-সুনীতি-যুগলরা।

সবাই প্রায় কথা বলছে। আজকের নৃত্যনাট্যে কার ভূমিকা কিরকম হল, কে কেমন নাচল, কেমন গাইল, তারই রসালো আলোচনা চলছে। ফাঁকে ফাঁকে লঘু পরিহাস, উচ্ছ্বাসময় সকৌতুক হাসি।

নদীপাড়ের পথ দিয়ে অন্যমনস্কের মতো হাঁটছিল বিনু। বরফ-কল, সারি সারি মাছের আড়ত, স্টিমারঘাট, ক্যাঁচা বাঁশের বেড়ায় ছাওয়া মিষ্টির দোকানগুলো একে একে পেরিয়ে এসে এখন তারা বাঁকের মুখে। রাস্তাটা এখান থেকেই বাঁ দিকে ঘুরেছে। পথের দু'ধারের কোনও ছবি বিনুর চোখে পড়ছিল না। হেমনাথের হাসাহাসি, ঠাট্টা-টাট্টা কিংবা কণ্ঠস্বরও সে শুনতে পাচ্ছিল না। ঘুরে ঘুরে গ্রীনরুমের নিরালা ঝোপের অন্ধকারে সেই নিভৃত দৃশ্য দু'টি চোখে ভেসে উঠছে। বার বার বিনুর মনে হচ্ছিল, সুধা সুনীতির কাছে হিরণ আর আনন্দ যেন দু'টো মুগ্ধ, লোভী পতঙ্গ।

সুধা সুনীতি মোটামুটি ভালই নাচে, ভালই গায়। কিন্তু তারা যে এমনই নিপুণা কলাবতী, সে কথা আনন্দ আর হিরণ গদগদ আবেগের গলায় না বললে কোনও দিনই জানতে পারত না বিনু।

নদীর বাঁক পেছনে ফেলে আরও অনেক দূর চলে এসেছে বিনুরা। সামনেই সেই কাঠের পুলটা। দু'ধারে গাছপালা-বনানীর ভেতর থোকা থোকা অন্ধকার জমে আছে, আর আছে জোনাকিরা। সপ্তমীর রাত্রিটাকে বিঁধে বিঁধে আলোর পোকাগুলো একবার জ্বলছে, একবার নিবছে। জ্বলা আর নেবার এই খেলা চলছে সেই সন্ধে থেকে। যতক্ষণ অন্ধকার আছে, এই খেলাও আছে।

হঠাৎ চাপা গলায় ঝিনুক ডেকে উঠল, 'বিনুদা—'

সুধা-সুনীতি হিরণ-আনন্দর কথা ভাবতে ভাবতে সব ভুলে গিয়েছিল বিনু। চমকে ঝোপঝাড়

জোনাকির দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে তাকাল। বলল, 'ডাকছ কেন?'

আগের গলায় ঝিনুক বলল, 'তোমার ওপর আমি রাগ করেছি।'

'কেন।'

'তখন তোমায় অত করে ডাকলাম, তুমি শুনতেই পেলে না।'

'কখন আবার ডাকলে!' বিনু সত্যি সত্যিই অবাক। দু'চোখে বিস্ময় ফুটিয়ে অন্ধকারে সে তাকিয়ে থাকল।

'ওই যখন নাচ-গান হচ্ছিল—'

'তাই নাকি!'

'হুঁ—' ঝিনুক ঘাড় কাত করল, 'আমি তোমার জন্যে জায়গা রেখে কত ডাকাডাকি করলাম আর তুমি কিনা ঝুমার কাছে গিয়ে বসলে!'

বিনু অবাক হয়েই ছিল। তার বিস্ময় আরও বাড়ল, 'আমার জন্যে কোথায় জায়গা রেখেছিলে?'

'চেয়ারে।'

'সত্যি তোমাকে আমি দেখতে পাইনি, তোমার ডাকও শুনতে পাইনি।'

হিংসের গলায় ঝিনুক বলল, 'ঝুমাকে কিন্তু ঠিক দেখতে পেয়েছিলে, ঝুমার ডাক ঠিক শুনতে পেয়েছিলে।'

বিনু আর কিছু বলল না। দেখতে পেল, অন্ধকারে জাপানি পুতুলের মতো মেয়েটার চোখ জ্বলজ্বল করছে।'

পরের দিন অর্থাৎ অষ্টমীর রাত্তিরে 'বিজয়া' নাটক।

আজ আসর আরও জমজমাট। সন্ধের আগে থেকেই পুজোমন্ডপের স্টেজটাকে ঘিরে যেন মেলা বসে গেছে। দূরদূরান্ত থেকে— কোথায় বেতকা, কোথায় পাইকপাড়া, কোথায় কাজির পাগলা আর কোথায় মীরকাদিম—নৌকোয় করে দলে দলে লোক আসছে তো আসছেই। তা ছাড়া, রাজদিয়ার মানুষ তো আছেই। আজ আর এ শহরে কেউ বুঝি বাড়ি বসে নেই। পুজোমন্ডপের স্টেজটা হাতছানি দিয়ে তাদের ঘরের বার করে এনেছে।

শিশির-স্মৃতিরেখা-আনন্দরা তো এসেছেই, আজ রামকেশবকেও দেখা গেল। অধর সাহা, ভবতোষ—কে না এসেছেন! এমনকি লারমোরও বাদ নেই। কাল অবশ্য তাঁকে দেখা যায়নি।

কালকের মতো রাত করে হেমনাথরা আজ আসেননি, বেলা থাকতে থাকতেই এসে পড়েছেন। স্টেজের কাছাকাছি আসতেই লারমোরের সঙ্গে দেখা।

সবার আগে ছিলেন অবনীমোহন, একেবারে তোপের মুখে পড়ে গেলেন। লারমোর বললেন, 'এই যে অবনী, এর মানেটা কী?'

অবনীমোহন হকচকিয়ে গেলেন, 'আজ্ঞে—'

হেমনাথ ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছিলেন, ঠোঁট টিপে হাসতে লাগলেন।

লারমোর বললেন, 'সপ্তমীর দিন আমার ওখানে তোমাদের যাবার কথা ছিল না?'

অবনীমোহন অপ্রস্তুত। বিব্রত, লজ্জিত মুখে বললেন, 'একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম। কেউ আমায় মনেও করিয়ে দেয়নি। আপনি আমায় ক্ষমা করুন লালমোহন মামা।'

ক্ষুব্ধ গলায় লারমোর বললেন, 'সপ্তমীর দিন সকাল থেকে পথের দিকে চেয়ে আছি, এই আসো এই আসো। শেষ পর্যন্ত এলে আর না। ওদিকে কত মাছটাছ জোগাড় করেছিলাম—'

এতক্ষণে হেমনাথ কথা বললেন, 'সত্যি খুব অন্যায় হয়ে গেছে। আজ তো অষ্টমী। দশমীর পরদিন অবনীরা তোমার ওখানে যাবে, আমি ওদের সঙ্গে করে নিয়ে যাব।'

'ঠিক তো? আবার ভুলে যাবে না?'

'না না, তুমি নিশ্চিন্ত থাকো।'

কালকের মতো হিরণরা স্টেজের সামনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল না। গ্রীনরুমে ছিল। হেমনাথদের আসার খবর পেয়ে ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে এল। সুধা-সুনীতি-অবনীমোহন বাদে সবাইকে দর্শকদের

pathagar.net

চেয়ারে বসিয়ে বলল, 'আপনারা বসুন, আমি আমার আর্টিস্টদের নিয়ে যাচ্ছি।'

স্নেহলতা বললেন, 'আজ তোদের প্লে কখন শুরু হচ্ছে?'

'তাড়াতাড়িই। সাতটার ভেতর।'

'শেষ ক'টায়?'

'সাড়ে-দশটা এগারটা হবে।'

'সে তো মাঝ রাত।'

হিরণ হাসল, 'অত বড় বই, তার আগে কী করে শেষ করব!' বলে আর দাঁড়াল না। সুধা সুনীতিদের নিয়ে সাজঘরের দিকে চলে গেল। হেমনাথরা বসে বসে গল্প করতে লাগলেন।

হোমনাথ শুধোলেন, 'কাল নৃত্যনাট্য দেখতে এসেছিলে লালমোহন?'

লারমোর বললেন, 'না।'

'জিনিসটা চমৎকার হয়েছিল।'

'শুনলাম। সুধাদিদি নাকি চমৎকার নেচেছে?'

'হ্যাঁ। সুনীতি আর রুমা খুব ভাল গেয়েছে।'

'তাও শুনেছি। শুনে আর লোভ সামলাতে পারি নি, আজ ছুটে এসেছি।'

ওধারে রামকেশব বসে ছিলেন। বললেন, 'কাল আমিও আসি নি। আজ আর ঘরে বসে থাকতে পারলাম না।'

স্নেহলতা বললেন, 'ছেলেমেয়েগুলো যা কান্ড করছে! এমন আনন্দের ব্যাপার রাজদিয়াতে আর কখনও হয় নি। আমার মাথায় যে অত বড় সংসার, আমিও কি বাড়ি বসে থাকতে পেরেছি? দু'দিন ধরে নাচতে নাচতে চলে আসছি।'

এদিকে আরও একটা মজার খেলা চলছিল। আজ আর সাজঘর কি স্টেজের কাছে ঘোরাঘুরি করতে পারে নি বিনু। প্রথম থেকেই ঝিনুক নিজের কাছে তাকে বসিয়ে রেখেছে। একটু দূরে স্টেজের ঠিক তলায় কালকের মতো বসে ছিল ঝুমা। সমানে বিনুকে ডাকাডাকি করছে সে আর হাতছানি দিচ্ছে, 'বিনুদা, বিনুদা—এখানে এস। তোমার জন্যে জায়গা রেখেছি।'

স্টেজের খুব কাছে বসে নাটক দেখতে ভারি লোভ হচ্ছিল বিনুর। সে উঠতে যাচ্ছিল, চাপা গলায় ঝিনুক বলল, 'তুমি যাবে না।'

চোখ কুঁচকে বিনু বলল, 'কেন?'

'কাল তুমি ওখানে বসেছ, আজ এখানে বসবে।'

দুর্বিনীত ঘাড় বাঁকিয়ে বিনু বলল, 'আমি এখানে বসব না। এখান থেকে ভাল দেখা যায় না।'.

ঝিনুক বলল, 'ওখানে গেলে সেই কথাটা তোমার মাকে বলে দেব।'

'কোন কথাটা?'

'সেই যে জলে ডুবে গিয়েছিলে।'

বার বার একই অস্ত্র দেখিয়ে মেয়েটা তাকে হাতের মুঠোয় পুরে রাখবে, তা তো হতে পারে না। হাত-পা ছুঁড়ে বিনু চেঁচিয়ে উঠল, 'বল গে। আমি তোমার কাছে কিছুতেই বসব না।' বলল বটে বসবে না, কিন্তু বসেই থাকল।

হিরণ বলেছিল, সাতটার ভেতর নাটক শুরু করবে। আরম্ভ করতে করতে সাড়ে আটটা বেজে গেল। শেষ হল বারটায়।

'বিজয়া' নাটকে বিজয়ার ভূমিকায় অভিনয় করেছে সুধা, হিরণ করেছে নরেনের রোল। সুনীতি হয়েছে নলিনী, অবনীমোহন দয়াল। সবার অভিনয়ই চমৎকার। দু'তিন হাজার লোক মুগ্ধ হয়ে দেখেছে।

নাটক শেষ হলে হেমনাথরা বাড়ি ফিরতে চেয়েছিলেন, রামকেশব ফিরতে দিলেন না। বললেন, 'এত রাত্তিরে আর ফিরতে হবে না হেমদাদা। ভোর হতে কতক্ষণই বা বাকি! এই ক'ঘন্টা আমার ওখানেই থেকে যান।'

হেমনাথ বললেন, 'কিন্তু—'

'কিন্তু টিন্তু না।'

'বাড়িটা যে খালি পড়ে থাকবে।'

'রাজদিয়ার হেমকর্তার বাড়িতে চোর আসবে না। ধনদৌলত, সোনাদানা উঠোনে ফেলে রাখলেও কেউ সেদিকে তাকাবে না। আপনি আসুন তো।'

এরকম জোর করেই হেমনাথদের নিজের বাড়ি নিয়ে তুললেন রামকেশব। তারপর হই হই করতে করতে রান্নাবান্না, খাওয়া। খাওয়ার পালা চুকতেই শোবার ব্যবস্থা হল। দোতলার ঘরে ঘরে ঢালা বিছানা পড়ল।

বিনুরা এসেছে, তাদের বাড়ি রাত্তিরে থাকবে। ঝুমা ভারি খুশি। সে বলল, 'চল, আমরা ওপরে গিয়ে শুয়ে পড়ি।'

বিনু বলল, 'চল।'

ঝিনুকটা আশেপাশে কোথায় ছিল। তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'আমিও তোমাদের সঙ্গে যাব।'

ঝুমার তাতে আপত্তি নেই, 'এস না।'

তিনজনে দোতলায় এসে ঢালা বিছানায় শুয়ে পড়ল।

মাথার দিকের জানালাগুলো খোলা। সেখানে সারি সারি সুপারিগাছ একপায়ে দাঁড়িয়ে, আশ্বিনের এলোমেলো বাতাস পাতার ভেতর খেলে বেড়াচ্ছে। এই মধ্যরাতে আকাশের মাঝখানে চাঁদ দেখা দিয়েছে। আবছা আলোয় সুপারিগাছের ছায়া এসে পড়েছে ঘরে। ওধারে কোথায় যেন শিউলি ফুটেছে, তার গন্ধে বাতাস আকুল।

পাশাপাশি শুয়ে কত কথা যে বলছে ঝুমা। আবোল তাবোল হাজার রকমের গল্প। বিনুও সমানে বকবক করে যাচ্ছে। ঝিনুক কিন্তু একেবারে চুপ।

গল্প করতে করতে একসময় বিনু আর ঝুমার গলা জড়িয়ে এল। গাঢ় গভীর ঘুম সরোবর হয়ে তাদের যেন অতলে টানতে লাগল।

বিনুরা প্রায় ঘুমিয়েই পড়েছিল, হঠাৎ শিয়রের দিক থেকে কে যেন ডেকে উঠল, 'ছুটোবাবু—ছুটোবাবু—'

প্রথমে আবছাভাবে কানে এসেছিল। তারপরেই চট করে ঘুমটা ভেঙে গেল বিনুর। চমকে মাথার দিকে তাকাতেই চোখে পড়ল, সব চাইতে কাছের সুপারি গাছটায় উঠে কেউ বসে আছে। ভয় পেয়ে কাঁপা গলায় বিনু চেঁচিয়ে উঠল, 'কে। কে ওখানে?'

ইতিমধ্যে ঝুমাও উঠে পড়েছে। ঝিনুকের কিন্তু নড়াচড়ার লক্ষণ নেই। বিছানার একধারে অসাড় পড়ে আছে সে।

সুপারি গাছে চড়ে দোতলা পর্যন্ত যে উঠেছে সে তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'আমি যুগইলা। ডর কি পাইছেন ছুটোবাবু?'

ভয় সত্যিই পেয়েছিল বিনু। যুগলের কথায় উত্তর না দিয়ে সে বলল, 'তুমি ওখানে উঠেছ কেন?'

'আপনের লেইগা—'

'আমার জন্যে।' বিনু অবাক।

'হ।' অন্ধকারে মাথা নাড়ল যুগল।

'কেন?'

'আপনেরে একখান কথা দিছিলাম, মনে আছে?'

'কী কথা?'

'ছুটোবাবুর কিছুই মনে থাকে না। কইছিলাম না, পূজার সোময় আপনেরে যাত্রা দেখামু।'

এইবার মনে পড়ে গেল। উৎসাহের গলায় বিনু বলল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, কিন্তু দেখালে না তো।'

'হেই লেইগাই তো দুফার রাইতে গাছ বাইয়া আপনারে ডাকতে আইছি। আইজ সুজনগঞ্জে ভাল পালা আছে। যাইবেন?'

প্রস্তাবটা লোভনীয়। কিন্তু যাবার পথে যে হাজার কাঁটা ছড়ানো। বাবা-মা এত রাত্তিরে কিছুতেই যেতে দেবেন না। অথচ সুদূর সুজনগঞ্জ থেকে আলোকোজ্জ্বল যাত্রার আসরটা তাকে অবিরত হাতছানি

pathagar.net

দিতে লাগল।

তার মনোভাবটা যেন বুঝতে পারল যুগল। বলল, 'আপনে কি আপনের বাপ-মা'র কথা ভাবেন?'

'হ্যাঁ।'

'ভাবনের কিছু নাই। নিচে নাইমা পাছ-দুয়ার দিয়া আইসা পড়েন। এহানে খাল আছে, আমি নাও আইনা রাখছি। আপনে আইলে বাদাম খাটাইয়া দিমু। চোখের পাতা পড়তে না পড়তে সুজনগুঞ্জ পৌঁছাইয়া যামু।'

'কিন্তু—'

'কী?'

'বাবা-মা?'

'তাগো কওয়ার দরকার নাই। লুকাইয়া আইসা পড়েন।'

দ্বিধাটা তবু কাটল না। বিনু বলল, 'কিন্তু—'

'আবার কী?'

'বাবা-মা যখন জানতে পারবে?'

'আইজ রাইতে তো আর জানতে আছে না।'

'কাল যখন জানবে?'

যুগল এবার অসহিষ্ণু হয়ে উঠল, 'তাইলে (তা হলে) ঘুমান, আমি যাই।' বলে তর তর করে সুপারি গাছ বেয়ে খানিকটা নেমেও গেল যুগল। নামতে নামতে বলল, 'রাইত কইরা নদীর উপুর দিয়া নায়ে (নৌকোয়) যাওন, হে যে কী মজা, বুঝতে পারলেন না ছুটোবাবু। আপনে পইড়া পইড়া ঘুমান।'

মুহূর্তে সব দ্বিধা কেটে গেল। কাল ধরা পড়লে কী হবে, কাল দেখা যাবে। খোলা নদীর ওপর দিয়ে বাদাম টাঙিয়ে যাওয়া, আবছা আবছা জ্যোৎস্না, যাত্রার আসর—এসব ছাড়া চোখের সামনে এখন আর কিছুই নেই। সব একাকার হয়ে বিনুকে যেন তারা আচ্ছন্ন করে ফেলল, তারপর জাদুকরের মতো কী এক আমোঘ আকর্ষণে টানতে লাগল।

বিছানায় আর বসে থাকতে পারল না বিনু। ছুটে জানালার কাছে চলে গেল। ততক্ষণে যুগল অনেক নীচে নেমে গেছে।

বিনু ডাকল, 'যুগল—'

তলা থেকে সাড়া এল, 'কী ক'ন?'

'একটু দাঁড়াও, আমি আসছি।'

'সত্যই যাইবেন?'

'হ্যাঁ।'

'তাইলে তরাতরি আহেন।'

জানালার কাছ থেকে এধারে আসতেই ফিস ফিস করে ঝুমা বলল, 'আমিও যাব।'

একটু ভেবে নিল বিনু। দু'জনে গেলে মার-টার বকুনি-টকুনিগুলো ভাগাভাগি করে নেওয়া যাবে, নইলে পুরোটাই একার ওপর এসে পড়বে। সে বলল, 'আচ্ছা চল।' বলেই কী মনে পড়তে গলাটা অনেক নীচুতে নামাল, 'যাচ্ছি যে, ঝিনুক যেন টের না পায়।' বলতে বলতে আপনা থেকে তার মাথাটা ডানদিকে ঘুরল।

কী আশ্চর্য। বিছানাটা একেবারে খালি, ঝিনুক নেই। একটু আগেই তো মেয়েটা ছিল, নিঃসাড়ে ঘুমোচ্ছিল। এর ভেতরে কোথায় গেল সে?

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বিনু বলল, 'ভালই হয়েছে। চল, এই বেলা বেরিয়ে পড়ি। ঝিনুক দেখতে পেলে সবাইকে বলে দেবে, আর যাওয়া হবে না।'

পা টিপে টিপে খুব সন্তর্পণে দু'জনে একতলায় এল। বাঁদিকে লম্বা বারান্দা। শেষ প্রান্তে রান্নাঘর। সেখানে আলো জ্বলছে, অবনীমোহনদের গলাও ভেসে আসছে। ওঁরা এখনও শুতে যান নি।

বিনুরা ডান দিকে ঘুরে পেছনের দরজা দিয়ে বাইরে এসে পড়ল। আসতেই যুগলের সঙ্গে দেখা।

যুগল বলল, 'আহেন, আহেন—'

pathagar.net

তার পিছু পিছু ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে একসময় খালপাড়ে এসে পড়ল বিনুরা। একটু আগে যুগল নৌকোর কথা বলেছিল, সেটা জলের ওপর ভাসছে।

যুগল বলল, 'নায়ে ওঠেন—'

উঠতে গিয়ে থমকে গেল বিনু, তার পেছনে ঝুমাও। নৌকোর ঠিক মাঝখানে কে যেন বসে আছে। বিনু চেঁচিয়ে উঠল, 'কে?'

নৌকো থেকে উত্তর এল, 'আমি ঝিনুক।'

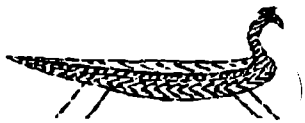

কিছুক্ষণ থ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল বিনুরা। তারপর বলল, 'তুমি কখন এখানে এসেছ!'

ঝিনুক বলল, 'ওই যে যুগলদাদা বলছিল যাত্রা শুনতে যাবে, বাড়ির পেছন দিকে নৌকো বাঁধা আছে। তাই শুনেই তো চলে এলাম।'

'একলা এসেছ?'

'হুঁ।'

কী দুর্জয় সাহস মেয়েটার! এই নিশুতি রাতে ঝুমাদের বাড়ি থেকে নির্জন খালপাড়ে বিনু নিজেই কি একা একা আসতে পারত?

এইসময় যুগল ডেকে উঠল, 'ঝিনুকদিদি—'

ঝিনুক তক্ষুনি সাড়া দিল, 'কী বলছ?'

'এত রাইত কইরা তোমারে সুজনগুঞ্জে যাইতে হইব না। শুইয়া থাকো গা। আরেক দিন তোমারে যাত্রা শুনাইয়া আনুম।'

'না না—' জোরে জোরে প্রবলবেগে মাথা নাড়তে লাগল ঝিনুক।

যুগল শুধলো, 'কী হইল?'

'আমি আজই যাব।'

যুগল হয়তো ভাবল, খোলা নৌকোয় তিনটে অল্পবয়সী ছেলেমেয়েকে বসিয়ে জলপূর্ণ প্রান্তর পাড়ি দেওয়া খুবই বিপজ্জনক। বিনু ছাড়া আর কারোকেই নেবার ইচ্ছা ছিল না তার, ঝুমাটা নেহাত জোর করেই সঙ্গ নিয়েছে। সে বোঝাতে চেষ্টা করল, 'ঝিনুকদিদি, তুমি সুনা(সোনা) বইন তো—'

যুগলের গলায় তোষামোদের সুর শুনে কিছু একটা আন্দাজ করল ঝিনুক। ডাইনে-বাঁয়ে মাথা নাড়তে নাড়তে সমানে বলতে লাগল, 'না না না না —'

তারই ভেতর যুগল বলল, 'না না করে না। লক্ষ্মী বইন, তুমি পোলাপান মানুষ, রাইত জাগলে শরীল খারাপ হইব।'

হঠাৎ মাথা ঝাঁকানি বন্ধ করে ঝিনুক বলল, 'তা হলে ও যাচ্ছে কেন? ও কি বুড়োমানুষ?'

'কার কথা কও?'

ঝিনুক ঝুমার দিকে আঙুল বাড়িয়ে দিল।

নিজের ফাঁদে এমন করে জড়িয়ে পড়বে, যুগল ভাবে নি। ছেলেমানুষ হলে যাওয়া যদি নাকচ হয়ে যায়, ঝুমা যাচ্ছে কী করে?

ঝিনুক বলল, 'ও গেলে আমিও যাব। আমাকে যদি না নাও—

যুগল শুধলো, 'না নিলে কী?'

'চেঁচিয়ে এক্ষুনি সবাইকে ডাকব। তোমাদের যাত্রা শোনা বেরিয়ে যাবে।'

কাজেই ঝিনুককে নৌকো থেকে নামানো গেল না, তার সঙ্গে রীতিমতো সন্ধি করে নিতে হল।

যুগল বলল, 'বেশ, তোমারে লইয়া যামু। কিন্তুক দুষ্টামি করতে পারবা না।'

যে কোনও শর্তেই এখন ঝিনুক রাজি। মাথা হেলিয়ে সে বলল, 'আচ্ছা।'

'আমি যা কমু হেই করতে হইব।'

pathagar.net

'আচ্ছা।'

যুগল এবার বিনুদের দিকে তাকাল, 'ওঠেন ছুটোবাবু, নায়ে ওঠেন।'

নৌকোয় উঠতে উঠতে বিনুর মনে হল, ঝিনুকের চোখে ধুলো ছিটিয়ে কিছু করবার উপায় নেই, সে ঠিক ধরে ফেলবে।

সবাই উঠলে আর এক মুহূর্তও দেরি করল না যুগল। নৌকো ছেড়ে দিল। গলুইর ওপর বসে সবল হাতে জোরে জোরে বৈঠা বাইছে সে, নৌকোটা যেন পাখির মতো ডানায় ভর করে উড়ে চলেছে।

চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে বিনুরা খাল পেরিয়ে পারাপারহীন প্রান্তরে এসে পড়ল।

আশ্বিনের শেষাশেষি এই নিশুতি রাতে বাতাস যেন কেমন কেমন, তাকে বুঝি বা ডাকিনীতে পেয়েছে। জলমগ্ন মাঠের ওপর দিয়ে নেশাগ্রস্তের মতো দিগ্বিদিকে সেটা ছুটে বেড়ায়। বিনুরা যেখান দিয়ে যাচ্ছে সেখানে কোথাও পদ্মবন, কোথাও শাপলাবন, মাঝে মাঝে ধানের খেত। পদ্মবনে শাপলাবনে কিংবা ধানের পাতায় হাওয়া লেগে শব্দ ওঠে সাঁই সাঁই।

চন্দনের ফোঁটার মতো আকাশময় যে কত তারা সাজানো! তার মাঝখানে একটুখানি চাঁদ। আশ্বিনের শেষাশেষি এই সময়টায় হিম পড়তে শুরু করেছে। ফলে কুয়াশার ভেতর দিয়ে যে চাঁদের আলোটুকু এসে পড়েছে তাতে কোনও কিছুই স্পষ্ট নয়। ধানখেত, দূরের বনানী, শাপলা-পদ্মের বন— এই মুহূর্তে সব ঝাপসা, রহস্যময়, কুহেলিবিলীন।

সমুদ্রের মতো এই অথৈ অপার জলরাশির মাঝখানে বসে শীত শীত করে। হাওয়া লেগে গায়ে কাঁটা দেয়।

নৌকোর মাঝখানে বিনু ঝুমা আর ঝিনুক কুঁকড়ি মুকড়ি মেরে বসে ছিল। যুগল ডাকল, 'ছুটোবাবু—'

বিনু বলল, 'কী বলছ?'

'শীত নি করে?'

'হ্যাঁ।'

'বুদ্ধি কইরা যদিন চাদর চুদর লইয়া আইতেন—'

'আমি কি জানি, এইরকম শীত করবে? তোমার বলা উচিত ছিল।'

একটু নীরবতা।

তারপর যুগলই শুরু করল, 'আইজ জবর উল্টা পালটা বাতাস। তা এক কাম করি ছুটোবাবু—'

'কী?'

'বাদাম খাটাইয়া দেই।'

'দাও।'

সেদিন যা করেছিল, আজও তাই করল যুগল। পরনের কাপড়খানা ফস করে খুলে বাদাম খাটাতে খাটাতে বলল, 'এইবারে ছোত্ (চট) কইরা চইলা যামু।'

বিনু কিছু বলল না।

বাদাম টাঙিয়ে বৈঠা নিয়ে হালে বসল যুগল। কিছুক্ষণ পরে বলল, 'চুপচাপ বইসা থাকতে ভালা লাগে না ছুটোবাবু—'

'তবে কী করতে চাও?'

'একখান গীত গাই?'

ঝুমা হঠাৎ বলে উঠল, 'গান?'

যুগল বলল, 'হ ঝুমাদিদি—'

'তুমি গান জানো!' ঝুমা অবাক।

ঝুমার গলায় এমন কিছু ছিল যাতে আহত হল যুগল। 'জানি কি না-জানি, ছুটোবাবুরে জিগাইয়া দেখ।'

বিনু তাড়াতাড়ি সায় দিয়ে বলে উঠল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ,খুব ভাল গাইতে পারে। গাও যুগল, শুরু করে

দাও—'

ছোটবাবু তার গানের তারিফ করেছে, যুগল মনে মনে খুশি হল। একটু চুপ করে থেকে সুর ধরল :

'বিদ্যাশেতে রইলা মোর বন্দুরে,
ও আমার পরান বন্দুরে—
বিধি যদি দিত রে পাখা,
উইড়া গিয়া দিতাম দেখা,
আমি উইড়া পড়তাম
সোনা বন্দুর দ্যাশে।
বন্দু যদি আমার হও,
নিজে আইসা দেখা দ্যাও,
আমার পরান—'

গাইতে গাইতে হঠাৎ থেমে গেল যুগল।

ঝিনুদের খুব ভাল লাগছিল। বিনু, ঝুমা, এমনকি ঝিনুক—তিনজনে একই সঙ্গে বলে উঠল, 'থামলে কেন? গাও—'

যুগল কিন্তু আর গাইল না। আস্তে করে ডাকল, 'ছুটোবাবু—'

ঝিনু তার দিকেই তাকিয়ে ছিল। বলল, 'কী বলছ?'

'অহন আমরা কুনহানে আছি, ক'ন তো?'

ঝিনু জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় আছি?'

যুগল বলল, 'ভাল কইরা ইট্টু ঠাওর করেন, বুঝতে পারবেন।'

ঝিনু চারদিকে তাকাতে লাগল। আবছা আবছা চাঁদের আলো চোখের সামনের সব কিছু ঢেকে রেখেছে। দূরের ঝোপঝাড়, বনভূমি, ধানের খেত কিংবা অগাধ জলরাশি, সমস্ত একাকার হয়ে এই মুহূর্তে এক রহস্যময় স্বপ্নের দেশ।

এই আদিগন্ত রহস্যময়তার মাঝখানে তাদের নৌকোটা যে কোথায়, ঝিনু কিছুতেই ঠিক করতে পারল না।

যুগল আবার বলল, 'বুঝতে নি পারলেন ছুটোবাবু?'

ঝিনু বলল, 'না।'

'আপনে কিন্তুক এইহানে আরেক দিন আইছিলেন।'

'তাই নাকি?'

'হ।' যুগল মাথা নাড়ল, 'আমিই আপনেরে লইয়া আইছিলাম। দ্যাহেন দ্যাহেন, আবার ঠাওর করেন।'

আরেক বার জায়গাটা দেখে নিল ঝিনু। আগের মতোই তা অচেনা থেকে গেল।

হালের বৈঠাটা এক হাতে চেপে, আরেকটা হাত এবার ডান দিকে বাড়িয়ে দিল যুগল। দূরে খানিকটা জায়গা জুড়ে ঝুপসি অন্ধকার। সেটা দেখিয়ে যুগল শুধলো, 'দ্যাহেন তো, উইটা চিনতে পারেন কিনা—'

ঝিনু বলল, 'না।'

'হায় রে আমার কপাল, দেহাইয়া দিলেও চিনতে পারে না।'

'কী ওটা?'

ঝিনুর কৌতূহল শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছে গিয়েছিল। এতক্ষণে বুঝি করুণা হল যুগলের। সে বলল, 'ওইটা টুনি বইনের বাড়ি।'

এই অস্পষ্ট রহস্যের জগৎ থেকে টুনিদের বাড়িটা কেমন করে যে যুগল খুঁজে বার করল, কে বলবে। টুনিদের বাড়ি বলার সঙ্গে সঙ্গে ঝিনুর চোখের সামনে দ্বীপের মতো ভাসমান ক'টি ঘর, উঠোনের ওপর দিয়ে বাঁশের সাঁকো, ভাতের টোপ দিয়ে কালো কালো ছেলেদের পুঁটি আর বাঁশপাতা

pathagar.net

মাছ ধরা—এমনি অসংখ্য ছবি মনে পড়ে গেল। আর মনে পড়ল পাখিকে। উত্তরের ঘরের পাছ-দুয়ার থেকে ঝপাং করে জলে লাফিয়ে পড়েছিল পাখি। লালের ছোপ-দেওয়া হলুদ মাছের মতো সাঁতার কেটে কেটে যুগলের নৌকোয় এসে উঠেছিল। গাঢ় গলায় তার কানে কত কথা বলেছিল যুগল, একখানা গানও গেয়েছিল। তারপর যেমন এসেছিল আবার তেমন করেই কাচের মতো স্বচ্ছ জলে সাঁতার কেটে কেটে ফিরে গিয়েছিল পাখি।

বিনু বলল, 'তোমার টুনি বোনের বাড়ি যাবে?'

যুগল বলল, 'না। এত রাইতে মাইনষের বাড়িত্ যায়। অরা ঘুমাইয়া আছে না?'

কথাটা ঠিক। মাঝরাত্তিরে ঘুম থেকে উঠিয়ে গল্প করতে যাওয়া কোনও কাজের কথা নয়। বিনু চুপ করে থাকল।

যুগল আবার বলল, 'হে ছাড়া—'

'কী?' বিনু উন্মুখ হল।

'শুদাশুদি তাগো বাড়িত্ গিয়া কী লাভ? যার লেইগা যাওন হেয় (সে) তো নাই।'

'কার কথা বলছ?'

'পাখির।'

বিনু কথাটা জানত না। অবাক হয়ে বলল, 'এখানে নেই তো কোথায় গেছে?'

যুগল বলল, 'আপনের কিছুই মনে থাকে না ছুটোবাবু। হেই দিন গোপাল দাসেরে দেখলেন না? উই যে আমাগো বাড়িত্ গেছিল—'

বিনুর মনে পড়ে গেল। যুগলের বিয়ের কথাবার্তা বলতে লোকটা হেমনাথের কাছে গিয়েছিল। বিনু বলল, 'গোপাল দাস কী করেছে?'

'হে (সে) তো পাখির বাপ।'

'তা তো জানি।'

'পাখিরে লইয়া গোপাল দাস নিজের বাড়িত্ হেই ভাটির দ্যাশে গ্যাছে গা।'

'কবে?'

'হেই দিনই। কুন দিন বুঝছেন?'

বিনু বলল, 'বুঝেছি। যেদিন গোপাল দাস আমাদের বাড়ি গিয়েছিল।'

'হ।' যুগল বলল, 'কয়দিন আর মাইনষে কুটুমবাড়ি পইড়া থাকে ক'ন! টুনি বইনেরে খালাস করতে আইছিল। খালাস হইয়া গ্যাছে। আর থাকনের কাম কী?'

বিনু মাথা নাড়ল, কিছু বলল না।

যুগল বলতে লাগল, 'আইজ কাইল আমি আর টুনি বইনের বাড়িত্ যাই না ছুটোবাবু।'

'কেন? আগে তো রোজ যেতে।'

'পাখি নাই, গিয়া আর কী করুম! বুঝমান মানুষ হইয়া বোঝেন না ক্যান? আমি কি টুনি বইনের লগে প্যাচাল পাড়তে যাইতাম নিকি? যাইতাম পাখির লেইগা।'

বিনু উত্তর দিল না।

হঠাৎ ঝুমা বলে উঠল, 'পাখি কে?'

বিনু জানাল, 'যুগলের বউ।'

যুগল তক্ষুনি শুধরে দিল, 'অহনও হয় নাই ঝুমাদিদি। কথাবাত্রা চলতে আছে। মাঘ-ফাগুনে বিয়া হইব।'

বিনুরা যখন সুজনগঞ্জে পৌঁছল, রাত ভোর হতে খুব বেশি দেরি নেই। যুগল তাদের নিয়ে সোজা নিত্য দাসের ধানচালের আড়তগুলোর কাছে চলে এল।

হ্যাজাক আর ডে-লাইটের আলোয় আলোয় জায়গাটা যেন দিন হয়ে উঠেছে। তার ভেতর দেখা গেল লাল শালুর প্রকাণ্ড শামিয়ানা খাটানো, তলায় যাত্রার আসর বসেছে। আসরটাকে ঘিরে কত যে দর্শক! দোকানদার ব্যাপারি পাইকার-আড়তদার থেকে শুরু করে সুজনগঞ্জের তাবত মানুষ এখানে

ভেঙে পড়েছে। এত মানুষ, তবু এতটুকু শব্দ নেই। মন্ত্রমুগ্ধের মতো সবাই পালা শুনছে।

বিনুদের সঙ্গে করে ভিড় ঠেলে একেবারে সামনে এসে বসল যুগল। এই মুহূর্তে আসরের মাঝখানে দুই রাজার যুদ্ধ চলছে। তাদের মাথায় রাংতার মুকুট, গায়ে ঝলমলে পোশাক, কাঁধে তূণীর, হাতে টিনের তলোয়ার। তাদের বুকে আবার অনেকগুলো করে জাপানি সিলভারের মেডেল আঁটা, আলো পড়ে সেগুলো ঝকমকিয়ে উঠছে। রণাঙ্গনটাকে বাস্তব করে তুলবার জন্য কয়েকটা মৃত সৈনিকও ইতস্তত শুয়ে আছে।

আসরের একধারে বসেছে বাজনদাররা। কত রকমের যে বাজনা তার হিসেব নেই। কর্নেট, ফ্লুটবাঁশি, ক্ল্যারিওনেট, হারমোনিয়াম, ডুগি-তবলা, খঞ্জনি ইত্যাদি ইত্যাদি। পালাগানের তালে তালে কখনও ঢিমে সুরে, এখনও দ্রুত লয়ে কনসার্ট বেজে চলেছে।

বাজনদারদের ঠিক পাশেই একটা লোক বসে। মোটাসোটা গোলগাল চেহারা, বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। মাথায় ঢেউ-খেলানো বাবরি, জুলপি দু'টো গালের মাঝামাঝি নেমে এসেছে। লোকটা বেশ শৌখিন। পরনে তার ধুতি আর হাফ-হাতা পাঞ্জাবি। গলায় চুনোট-করা চাদর, ফাঁক দিয়ে সোনার মফচেন দেখা যাচ্ছে। দু'হাতে পাঁচ-সাতটা আংটি। মস্ত বড় দুই চোখ ঈষৎ আরক্ত। ঠোঁটের ওপর পাকানো গোঁফ। সব মিলিয়ে তার সর্বাঙ্গে নিদারুণ এক ব্যক্তিত্বের আভাস রয়েছে।

লোকটার হাতে একখানা বই ছিল। মাঝে মাঝে সেটা থেকে সে প্রম্পট্ করে যাচ্ছে, আর আসরের দুই রাজা কণ্ঠস্বর সপ্তমে তুলে চেঁচিয়ে চলছে ঃ

'রে রে রক্ষোকুলাধম
পামর রাবণ,
তোরে আজ বধিব পরানে।'

শুধু প্রম্পট্ই নয়, আঙুল নেড়ে নেড়ে বাজনদারদের নির্দেশও দিচ্ছে। তার সামান্য অঙ্গুলি হেলনে এতগুলো লোক যন্ত্রের মতো গাইছে, বাজাচ্ছে, চেঁচাচ্ছে। দেখেশুনে মনে হল, এই লোকটাই আসল অর্থাৎ অধিকারী।

ইতিমধ্যে দর্শকদের কারোর কাছ থেকে খবর জোগাড় করে যুগল বিনুকে জানাল, আজ 'রাবণ বধ' পালা চলছে এবং এটাই শেষ দৃশ্য।

বিনুর কোনও দিকে লক্ষ্য নেই। যুগলের কথা হয়তো শুনতেই পেল না। একদৃষ্টে পলকহীন আলোকোজ্জ্বল আসরের দিকে তাকিয়ে আছে সে। জীবনে এই তার প্রথম যাত্রা দেখা। রাম-রাবণের ঝলমলে পোশাক, ঝকমকে মেডেল, কনসার্টের উত্থান-পতন, সব একাকার হয়ে এই আসরটা যেন আশ্চর্য এক মায়ালোক। ঝুমা এবং ঝিনুকও সবিস্ময়ে তাকিয়ে ছিল।

লড়াইটা হচ্ছিল খুব নিরীহ রকমের। নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে রাম-রাবণ এমনভাবে কনসার্টের তালে তালে তলোয়ার চালাচ্ছিল যে, হাজার বছর যুদ্ধ চললেও কারোর গায়ে সামান্য আঁচড়টুকু লাগার সম্ভাবনা নেই। তবু ভাল লাগছিল বিনুর, মুগ্ধ বিস্ময়ে সে দেখেই যাচ্ছিল। বাজনার সুরে সুরে তার বুকের ভেতরটা যেন দুলছিল।

আধ ঘণ্টাখানেক যুদ্ধ চলবার পর হঠাৎ রাম করল কি, ঈষৎ ঝুঁকে সেই লোকটাকে ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল, 'আর কতক্ষণ চালামু অধিকারীমশই?'

অধিকারী চট করে শামিয়ানার বাহিরে আকাশটাকে একবার দেখে নিয়ে বলল, 'অহনও আন্ধার আছে, ভোর তরি চালাইয়া যা। দিনের আলোও ফুটব, রাবণও মরব। তার আগে থামন নাই। থামলে চাইর দিকের মাইনষে আমারে খাইয়া ফেলাইব।' বলেই বাজনদারদের দিকে ফিরে দ্রুত আঙুল নাড়তে লাগল।

সঙ্গে সঙ্গে চড়া সুরে কনসার্ট বেজে উঠল, রাম-রাবণের তলোয়ার জোরে জোরে ঘুরতে লাগল। নিষ্প্রভ আসর নিমেষে সজীব হল।

আরও কিছুক্ষণ যুদ্ধ চলল। তারপর আচমকা এক কাণ্ড। ঘুরতে গিয়ে অসাবধানে রাবণের পা গিয়ে পড়ল এক মৃত সৈনিকের ঘাড়ে। বেচারা নিঃসাড়ে শুয়ে থাকতে থাকতে কখন যেন ঘুমিয়ে পড়েছিল। একে শেষ রাত, তাতে নদীপাড়ের আরামদায়ক জলো হাওয়া, ঘুমিয়ে পড়াই স্বাভাবিক।

ঘাড়ে পা পড়তে খুব সম্ভব তার ঘুমে বিঘ্ন ঘটে থাকবে, তড়াক করে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল ছোকরা। গালাগাল দিয়ে কটু গলায় বলল, 'হারামজাদা বান্দর, তগো লেইগা কি ইট্টু ঘুমাইতেও পারুম না?'

নিস্তব্ধ, মন্ত্রমুগ্ধ জনতার মধ্যে হাসির রোল উঠল, 'শালার কাটা সৈন্য লম্ফ দিয়া উইঠা দেহি কথা কয়!'

ওদিকে লালচে চোখ পাকিয়ে বাঘের মতো গলা করে হুমকে উঠেছে অধিকারী, 'কুত্তার ছাও, বাপের জমিন্দারি পাইছ? শুইয়া থাকতে কইছিলাম, নোয়াবের পোলা ঘুমাইয়া পড়ছ! শুলি কুত্তা, শুলি! পালা একবার ভাঙ্গুক, জুতাইয়া পিঠের ছাল তুইলা ফেলামু আইজ।'

বিমূঢ়, মৃত সৈনিক একটুক্ষণ ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকল। তারপর কাটা কলাগাছের মতো ধপাস করে আসরে শুয়ে পড়ল, আর নড়ল না।

তাল কেটে গিয়েছিল। কাজেই একটানা কিছুক্ষণ ঝড়ের বেগে কনসার্ট বাজিয়ে বেসুরো অবস্থাটা কাটিয়ে নেওয়া হল। তারপর ফের শুরু হল সম্মুখসমর। এবার আর কোনও ব্যাঘাত ঘটল না।

ভোর পর্যন্ত নিরাপদ যুদ্ধ চালিয়ে, যখন পুব দিকটা ফরসা হতে শুরু করেছে, সেই সময় টিনের তলোয়ারের সামান্য একটু খোঁচা খেয়েই রাবণ বধ হয়ে গেল।

যাত্রা শুনে পরের দিন বাড়ি ফিরতে ফিরতে বেলা দুপুর। তেমন হাওয়া থাকলে বাদাম খাটিয়ে ঢের আগে পৌঁছনো যেত। কিন্তু আশ্বিনের এই দিনটা একেবারেই বুঝি বায়ুশূন্য। সারাটা পথ যুগলকে নিতান্ত হাতের জোরে বৈঠা বেয়ে আসতে হয়েছে।

রাজদিয়ায় পা দিতেই টের পাওয়া গেল, চারদিকে হুলস্থুল পড়ে গেছে। থানায় থানায় খবর পাঠানো হয়েছে। তাদের খোঁজে সারা শহর তোলপাড় করে ফেলা হয়েছে। এখন কান্নাকাটি চলছে।

সোজা ঝুমাদের বাড়িতেই চলে এসেছিল বিনুরা। হেমনাথরা এখনও ওখানে আছেন। বিনুদের দেখামাত্র তাঁরা একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তারপর বাকি দিনটা সমানে বকুনি, শাসানি আর শাসন চলল। সব চাইতে বড় ঝড়টা গেল যুগলের ওপর দিয়ে।

অষ্টমীর পর নবমী। নবমীর পর দশমী। রাজদিয়ার পুজোমন্ডপগুলো শূন্য করে সন্ধেবেলায় প্রতিমাগুলোকে হাজারমণী মহাজনী নৌকোয় তোলা হল, তারপর অনেক রাত পর্যন্ত নদীতে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বিসর্জন দেওয়া হল। তারও পর হেমনাথের সঙ্গে রাজদিয়ার বাড়ি বাড়ি গিয়ে বিজয়া করার সে কি ধুম! শুধু কি বিনুরাই গেছে, রাজদিয়ার সব মানুষ তাদের বাড়ি এসেও বিজয়া করে গেল।

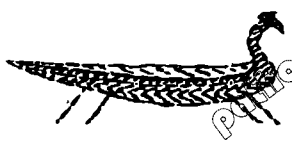
pathagar.net

দশমীর পর একাদশী।

একাদশীর দিন তখনও ভাল করে সকাল হয় নি, লারমোরের জীর্ণ ফিটন গাড়িটা এসে হাজির।

বিনুর তখনও ঘুম ভাঙে নি। হেমনাথ ডাকতে লাগলেন, 'ওঠ দাদাভাই, ওঠ। লালমোহন দাদুর ওখানে যাবি না? সে ফিটন পাঠিয়ে দিয়েছে।'

চোখ ডলতে ডলতে উঠে বসল বিনু। মনে পড়ল, আজ তাদের লারমোরের গীর্জায় যাবার কথা। না গিয়ে উপায় নেই। পাছে অবনীমোহনরা ভুলে যান, তাই এই ভোর বেলাতেই ঘোড়ার গাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছেন লারমোর। চালক সেই বুড়ো রুগ্‌ণ কাদের।

বাড়িতে ঢুকেই কাদের তাড়া দিতে শুরু করেছে, 'চলেন হ্যামকত্তা, চলেন।'

হেমনাথ বললেন, 'তুই যে একেবারে ঘোড়ায় জিন দিয়ে এসেছিস কাদের। এতখানি পথ এলি, দু'দন্ড জিরিয়ে নে, কিছু খা। তারপর তো যাবার কথা—'

'না।' কাদের ডাইনে বাঁয়ে মাথা নাড়ল।

'না কেন?'

'হুকুম নাই।'

হেমনাথ ঈষৎ অবাক, 'কিসের হুকুম?'

কাদের বলল, 'পা পাইতা বসনের, জিরানের, খাওনের।'

হেমনাথ কৌতুক বোধ করছিলেন। চোখ কুঁচকে বললেন, 'তবে কী হুকুম আছে শুনি?'

'আমারে এক দন্ড দেরি করতে নিষেধ করছে লালমোহন বাবা। আইসাই আপনাগো গাড়িতে তুইলা নিয়া যাইতে কইছে।'

'জোর তলব দেখছি।'

'হ।' কাদের হাসল।

হেমনাথ বললেন, 'তা হলেও কিছুক্ষণ তোকে বসতে হবে।'

'ক্যান?'

'বা রে, আমাদের এখনও মুখটুখ ধোয়া হয় নি। তা ছাড়া বাচ্চাগুলো অতখানি রাস্তা যাবে, যেতে যেতে খিদে পেয়ে যাবে। ওরা কিছু খেয়ে নিক।'

'উঁহু উঁহু—' প্রবলবেগে মাথা ঝাঁকাতে লাগল কাদের।

হেমনাথ শুধোলেন, 'আবার কী হল রে?'

'হুকুম নাই। লালমোহন বাবায় কইয়া দিছে, খালি মুখ ধোওনের সময় দিতে। খাওন দাওন হগল কিন্তুক আমাগো গীর্জায় গিয়া।'

চোখ বড় বড় করে হেমনাথ বললেন, 'বাব্বা!'

হেমনাথের মনোভাব খানিক আন্দাজ করতে পেরেছিল কাদের। তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'লালমোহন বাবায় যা কইয়া দিছে তাই কইলাম।'

'বেশ বাবা, বেশ। হিজ ম্যাজিস্টি যখন হুকুম দিয়েছেন তখন তো নড়চড় হবার জো নেই। মুখ ধুয়েই তোমার পুষ্পক রথে উঠছি।'

এ বাড়ির সবার এখনও ঘুম ভাঙে নি। যারা ঘুমোচ্ছিল তাদের জাগিয়ে মুখটুখ ধুয়ে নিতে বললেন হেমনাথ। নিজেও ধুয়ে নিলেন, দেখাদেখি ঝিনুক বিনুও ধুলো। তারপর হেমনাথ ওদের দু'জনকে নিয়ে সূর্যবন্দনা সেরে নিলেন।

এদিকে সারা বাড়িতে সাজ সাজ রব পড়ে গেছে। সুধা-সুনীতি-অবনীমোহন, প্রায় সকলেই জামাকাপড় পরে বেরুবার জন্য তৈরি। স্নেহলতা অবশ্য যাবেন না। সপ্তমী অষ্টমী, পর পর দু'দিন থিয়েটার আর নৃত্যনাট্য দেখতে গিয়েছিলেন। বাড়ির কর্ত্রী তিনি, সর্বময় ঈশ্বরী। রোজই যদি সবার সঙ্গে নাচতে নাচতে বেরিয়ে পড়েন, এত বড় সংসার চলে কী করে? সবে নতুন পাট উঠেছে, সেগুলো ধোয়ার ব্যাপার আছে। শুকোবার ব্যাপার আছে। শ্রাবণ-ভাদ্র মাসের ডোল বোঝাই আউশ ধান ভানিয়ে রাখতে হবে। তা ছাড়া, ক'দিন পর কোজাগরী লক্ষ্মীপুজো। খই ভাজতে হবে, মুড়ি ভাজতে হবে। পঞ্চাশটা নারকেলের নাড়ু পাকানো আছে, চন্দ্রপুলি, ছাপা সন্দেশ বানানো আছে, মুড়কি বানানো আছে। চিঁড়ে কোটা আছে। খই-মুড়ি-চিঁড়ে দিয়ে তিন রকমের মোয়া বানানো আছে। কাজ কি তাঁর এক-আধটা? দায়িত্ব কি সামান্য? কোন দিকে তাঁর নজর না দিলে চলে?

স্নেহলতা যাবেন না। কাজেই শিবানী জানিয়ে দিলেন, তিনিও যাবেন না। সম্পর্কটা যদিও ননদ-ভাজের, আসলে তাঁরা যেন অভিন্নহৃদয় দুই সখী। স্নেহলতা না বেরুলে কার সাধ্য শিবানীকে নড়ায়।

দু'রাত গায়ে মাথায় হিম লেগে শরীর খারাপ হয়েছে সুরমার। তিনিও বেরুবেন না।

যাবার মধ্যে সুধা-সুনীতি-অবনীমোহন-ঝিনুক আর বিনু। দেরি না করে তাদের নিয়ে ফিটনে উঠলেন হেমনাথ। ওঠার শুধু অপেক্ষা, সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি চালিয়ে দিল কাদের।

স্টিমারঘাট, তারপর বরফ কল, মাছের আড়ত, সেটেলমেন্ট অফিস, আদালত পাড়া পর্যন্ত বিনুর দৌড়। সে সব পেছনে ফেলে ফিটন আরও অনেক দূরে এগিয়ে গেল। জায়গাটা ক্রমশ সরু হয়ে যেখানে শেষ হয়েছে সেটাই গীর্জা। তারপর থেকে জল। খুব সম্ভব স্টিমারঘাটের কাছের বড় নদীটা ঘুরে গীর্জার পেছনে চলে এসেছে।

গীর্জার সব চাইতে বড় বিস্ময় তার তীক্ষ্ণাগ্র চুড়োটা, ধীরে ধীরে সরু হয়ে অনেক উঁচুতে আকাশের গায়ে সেটা বিঁধে রয়েছে। সেদিন স্নেহলতার সঙ্গে পুজোর কাপড় বিলোতে বেরিয়ে দুর থেকে চুড়োটা দেখতে পেয়েছিল বিনু।

গীর্জার সামনের দিকে খানিক ফাঁকা জমি সবুজ ঘাসে ঢেকে আছে। কাদের ফিটন নিয়ে সোজা সেখানে চলে এল।

লারমোর বোধহয় দেখতে পেয়েছিলেন, গীর্জার ভেতর থেকে ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে এলেন। তাঁর নীলাভ চোখদু'টো খুশিতে আলো হয়ে উঠল। ব্যস্তভাবে বলতে লাগলেন, 'হেম এসেছে। অবনী এসেছে। আমার দাদা দিদিরা এসেছে। কী আনন্দ যে হচ্ছে!'

হেমনাথ বললেন, 'হ্যাঁ, আমরা এসেছি। সারাদিনের জন্যে নিজেদের তোমার হাতে ছেড়ে দিলাম। এখন যা ইচ্ছে কর।'

লারমোর কী যে করবেন, ঠিক করে উঠতে পারছিলেন না। ছেলেমানুষের মতো লাফ দিয়ে ফিটনের পাদানেই উঠে পড়লেন। গাড়ির ভেতর উঁকি দিয়ে অস্থির গলায় বললেন, 'এ কী!'

'কী হল?'

'রমু কোথায়!'

নীচে দাঁড়িয়ে গাড়ির ভেতরকার সবটুকু দেখতে পান নি লারমোর। পাদানে উঠতেই কারা এসেছে আর কারা আসে নি, বুঝতে পারলেন।

হেমনাথ বললেন, 'রমুটার শরীর ভাল না। আসতে অবশ্য চেয়েছিল, আমিই বারণ করেছি।'

লারমোর বললেন, 'হঠাৎ শরীরটা খারাপ হল যে?'

'নাটক টাটক দেখে হিম লাগিয়েছিল, তাই—'

'রমু না হয় আসতে পারে নি। বউঠাকরুন? শিবুদিদি?'

স্নেহলতা শিবানী কেন আসেন নি, হেমনাথ জনিয়ে দিলেন।

লারমোর বললেন, 'আনন্দর অর্ধেকটাই মাটি।'

একটু নীরবতা। তারপর হেমনাথ তাড়া দিলেন, 'কী ব্যাপার, গাড়ি থেকে নামতে দেবে না? রাস্তা ছাড়—'

লারমোরের খেয়াল ছিল না, রাস্তা জুড়ে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন। বিব্রতভাবে পাদান থেকে তাড়াতাড়ি নীচে নামলেন। হেমনাথরা আর অপেক্ষা করলেন না, দরজা খুলে নেমে পড়লেন।

লারমোর বললেন, 'এস—'

তাঁর সঙ্গে যেতে যেতে হেমনাথ বললেন, 'আমাদের আনবার জন্যে ভাল লোক পাঠিয়েছিলে বটে।'

হেমনাথ কী বলতে চান, বুঝতে না পেরে সন্দিগ্ধ গলায় লারমোর শুধোলেন, 'কী ব্যাপার বল তো? কাদের অন্যায় কিছু করেছে? ও তো সেরকম লোক না।'

হেমনাথ বললেন, 'আরে না না, শুধু শুধু অন্যায় করতে যাবে কেন? তুমি তো ধরে আনতে বলেছিলে। ও একেবারে আমাদের বেঁধে এনেছে।'

'কিরকম?'

'কিরকম আবার, ঘুম থেকে উঠবার পর মুখটা খালি ধুতে পেরেছি। তারপর আর দাঁড়াতে দেয় নি কাদের। নিশ্বাস ফেলতে দেয় নি। টেনে তোমার ওই গাড়িটায় তুলে ফেলেছে।'

একটু আগে সংশয় ছিল। দেখতে দেখতে লারমোরের চোখমুখের চেহারা বদলে গেল। নিশ্চিন্ত, উৎফুল্ল সুরে তিনি বললেন, 'যাক, তা হলে যা বলে দিয়েছিলাম তাই করেছে কাদের।'

হেমনাথ উত্তেজিত হয়ে উঠলেন, 'জানো, খেয়ে পর্যন্ত আসতে দেয় নি।'

'আমি তাও বলে দিয়েছিলাম।'

'যেমন মনিব তেমনি তো তার কর্মচারী হবে।'

লারমোর উত্তর দিলেন না, সকৌতুকে হাসতে লাগলেন।

হেমনাথ বললেন, 'হেসো না তো। ছেলেমেয়েগুলো এত বেলা পর্যন্ত না খেয়ে আছে। ওদের

কিন্তু খুব খিদে পেয়েছে।'

আড়ে আড়ে বন্ধুর দিকে তাকিয়ে লারমোর বললেন, 'আর তোমার?'

'আমারও।'

'সেই কথাটাই বল। এই জন্যেই এত রাগ?'

হেমনাথ হেসে ফেললেন।

হাসতে হাসতে লালমোর বললেন, 'চল। গিয়েই খেতে দিচ্ছি।'

ঘাসের জমিটার পরই চার্চ। এটুকু পথ পেরিয়ে লারমোরের পিছু পিছু সবাই সেখানে চলে এল।

গীর্জাটা কত কালের, কে জানে। তার বয়সের বুঝি আদি-অন্ত নেই। দেওয়ালের গা থেকে বালির আস্তর খসে খসে নানা জায়গায় ইট বেরিয়ে পড়েছে। সে ইটও নোনা-ধরা। শীত-গ্রীষ্ম বর্ষা-শরৎ, মৌসুমি বাতাসের আঘাতে আঘাতে আর জলের ছাটে ছাটে কত জায়গা যে ভেঙেচুরে ক্ষয়ে গেছে। দরজা-জানালাগুলোও আস্ত নেই, উইদের দাঁতে তারা নিশ্চিহ্ন হবার পথে। অশ্বত্থেরা ভিতের তলায় তলায় শিকড় চালিয়ে ধ্বংসের কাজ অনেকখানি এগিয়ে রেখেছে।

গীর্জাবাড়িটা কতকাল যে সারানো হয় নি, কতকাল যে তার কলি ফেরানো হয় নি!

ভেতরের চেহারাও বাইরের মতোই। দেওয়ালের কোণে কোণে বছরের পর বছর ঝুল জমছে, মাকড়সারা জালের পর জাল বুনে যাচ্ছে। ঘুলঘুলিতে পায়রা আর চড়াইরা বংশপরম্পরায় বাসা বাঁধছে। দীর্ঘকাল বসবাসের ফলে এ বাড়িতে তাদের স্বত্ব কায়েম হয়ে গেছে যেন।

গীর্জায় ঢুকলেই প্রথমে যা চোখে পড়ে তা হল প্রকান্ড বেদির ওপর যিশু-মূর্তি। মানবপুত্র ওখানে ক্রুশবিদ্ধ হয়ে আছেন। সর্বাঙ্গে কোথাও যন্ত্রণার চিহ্ন নেই, ক্ষমাসুন্দর চোখে মূঢ় অন্ধকার জগতের দিকে তিনি যেন তাকিয়ে আছেন। তাঁকে ঘিরে স্নিগ্ধ এক জ্যোতির্বলয়।

মূর্তিটির দিকে তাকালে স্বর্গীয় সুষমায় মন ভরে যায়, উত্তেজিত রিপুতাড়িত স্নায়ুর ওপর প্রশান্তি নেমে আসে।

লারমোরের সঙ্গে আসতে আসতে খ্রিস্টমূর্তির কাছে কিছুক্ষণ সবাই থমকে দাঁড়াল।

ভক্তিপূর্ণ মুগ্ধ স্বরে অবনীমোহন বললেন, 'চমৎকার মূর্তি। তাকালেই প্রাণ ভরে যায়।'

হেমনাথ আস্তে আস্তে মাথা নাড়লেন, 'হ্যাঁ। আমি মাঝে মাঝে এসে ওই মূর্তিটার সামনে বসে থাকি। কী মনে হয় জানো অবনী? মনে হয়, পৃথিবীতে কোনও হীনতা নেই, নীচতা নেই, নোংরামি নেই। এখানে এলে নিজের ভেতর অনেকখানি শক্তি পাওয়া যায়।'

অবনীমোহন উত্তর দিলেন না, একদৃষ্টে মানবপুত্রের দিকে তাকিয়ে থাকলেন।

লারমোর ডাকলেন, 'এস।'

যিশুমূর্তির পেছন দিকে খানিকটা গেলে দু'খানা বড় বড় ঘর। লারমোর একটা ঘরে অবনীমোহনদের নিয়ে এলেন। এক ধারে ছোট্ট তক্তপোশ, তার ওপর এলোমেলো ময়লা বিছানা। আরেক ধারে হাতলভাঙা ক'খানা বেতের চেয়ার, একটা মাঝারি টেবিল, দু'টো আলমারি বোঝাই বই আর গদিমোড়া একখানা ইজিচেয়ার। আরেক কোণে দেওয়ালে পেরেক পুঁতে দড়ি খাটানো রয়েছে, তাতে খানকতক ক্ষারে-কাচা ধুতি এবং ফতুয়া ঝুলছে। এখানে ওখানে এক আধটা বাক্স, মাটির একটা কলসি, দু'টো চীনে মাটির গেলাস, কালি-পড়া হোরিকেন ইতস্তত ছড়ানো।

লারমোর বললেন, 'এই আমার সাম্রাজ্য। বোসো তোমরা, বোসো—'

সবাই বসলে লারমোর দরজার দিকে মুখ করে ডাকতে লাগলেন, 'পরানের মা, পরানের মা—'

ওদিকের কোত্থেকে সাড়া এল, 'যাই—'

একটু পর একজন বিধবা মধ্যবয়সিনী এ ঘরে এসে দাঁড়াল। নাক পর্যন্ত তার ঘোমটা টানা। লারমোর শুধোলেন, 'রান্নাবান্নার কতদূর?'

মৃদু গলায় বিধবাটি বলল, 'বসাইয়া দিছি।'

'মাছ তরকারি ভাতটাত তুমি রাঁধো। পায়েসটা আমি করব। গোরুগুলো দোয়ানো হয়েছে?'

'না।'

'ঠিক আছে, আমি দুইয়ে নিচ্ছি। এখন আমাদের খেতে টেতে দাও। কাল রাত্তিরে পাতক্ষীর আর চমচম এনে রেখেছিলাম। সে সব দিও।'

মেয়েমানুষটি স্বল্পভাষিণী। এত লোকজন দেখে সে জড়সড় হয়ে গেছে। ঘোমটার ভেতর মাথা নেড়ে জানাল, লারমোর যেমন বলছে ঠিক তেমন তেমনই দেবে।

লারমোর আবার বললেন, 'ডাল হবে, ভাত হবে, বেগুন ভাজা আলু ভাজা, পাঁচ রকমের মাছ— এত সব হবে। রান্না শেষ হতে বেলা হেলে যাবে। এখন পেট ভরে না খেলে বাচ্চারা খিদেয় কষ্ট পাবে। যাও যাও, বেশি করে খাবার নিয়ে এস—'

লারমোরের কথায় হেমনাথ সায় দিলেন।

বিধবাটি চলে গেল।

একদৃষ্টে তার দিকে তাকিয়ে ছিলেন হেমনাথ। বললেন, 'একে কোথায় পেলে লালমোহন? কাজির পাগলার সনাতনের বউ না, যে গেল বছর বর্ষাকালে উদরীতে মরেছে?'

'হ্যাঁ।' লারমোর বলতে লাগলেন, 'স্বামী মরবার পর থেকে মেয়েটার দুর্গতির শেষ নেই। শরিকেরা যা করবার করেছে, ঠকিয়ে সর্বস্বান্ত করে ওকে রাস্তায় দাঁড় করিয়েছিল। তারপর দু' মুঠো ভাতের জন্যে আজ এ বাড়ি, কাল ও বাড়ি করে বেড়াচ্ছিল। উদয়াস্ত খাটত। তবু যদি কেউ একটু ভাল মুখে কথা বলত! উঠতে বসতে খালি লাথি আর ঝাঁটা। এভাবে কি মানুষ বাঁচতে পারে?'

'তারপর—'

'তারপর আর কি, পরশু দিন রোগী দেখতে কাজির পাগলা গিয়েছিলাম, সনাতনের বউ এসে আমাকে ধরল। বলল, আমি তার ধর্মবাপ। তাকে আমার কাছে আশ্রয় দিতে হবে। এ অবস্থায় তো ফেলে আসতে পারি না, সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি। তুমিই বল হেম, ঠিক করি নি?'

'ঠিকই করেছ। আচ্ছা—'

'বল—' লারমোর উন্মুখ হলেন।

হেমনাথ বললেন, 'পরান বলে ওর একটা ছেলে ছিল না?'

'ছিল তো। সে মানুষ হলে তার মায়ের দুঃখ তো ঘুচেই যেত।'

'সে ছোকরা কোথায়?

'বছর তিনেক আগে এক ঢপের দলে গিয়ে জুটেছিল, তারপর থেকে পাত্তা নেই।'

কিছুক্ষণ নীরবতা।

লরমোর অবার কী বলতে যাচ্ছিলেন, পরানের মা বেতের সাজিতে চিঁড়ে-মুড়ি-ক্ষীর-চমচমের ফলার সাজিয়ে নিয়ে এল। সবার হাতে একটা করে সাজি দিয়ে নিঃশব্দে চলে যাচ্ছিল সে, লারমোর ডাকলেন, 'তুমি খেয়েছ?'

পরানের মা উত্তর দিল না, মুখ নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকল।

লারমোর বললেন, 'এখনই গিয়ে খেয়ে নেবে, বুঝেছ? মোটে লজ্জা করবে না। এখন থেকে এটা তোমার নিজের বাড়ি।'

আধফোটা বিব্রত স্বরে পরানের মা বলল, 'আইচ্ছা।' বলে আর দাঁড়াল না।

খাওয়া দাওয়ার পর লারমোর বললেন, 'এতখানি বেলা হল, গোরুগুলো গোয়ালে আটকে রয়েছে। দুধ দুয়ে ওদের ছেড়ে দিই গে। যাবে না কি তোমরা?' বলতে বলতে উঠে দাঁড়ালেন।

অবনীমোহন বললেন, 'ঘরে বসে থেকে আর কী করব? চলুন আপনার দুধ দোয়া দেখি—'

এইসময় সুধা বলে উঠল, 'আপনি সত্যিই দুধ দুইতে পারেন লালমোহন দাদু!' সে ভারি অবাক হয়ে গেছে।

মধুর হেসে লারমোর বললেন, 'গাই দোয়া কি খুব কঠিন কাজ রে দিদি? আমি না পারি কী?'

'কী কী পারেন তার একটা লিস্ট দিন দেখি—' ঘাড় বাঁকিয়ে ভুরু নাচিয়ে সুধা বলল।

'সব পারি রে দিদি, সব পারি। ধান ভানতে পারি, চিঁড়ে কুটতে পারি, জলসই-এর গান গাইতে পারি, আবার পায়েসও রাঁধতে পারি।'

'সে পায়েস খাওয়া যাবে তো?'

pathagar.net

'খেয়েই বলিস। ওটা তো আজ আমিই রাঁধব।'

একটু ভেবে নিয়ে সুধা বলল, 'আমার মতো নাচতে পারেন আপনি?'

মাথাটা সামনের দিকে অনেকখানি নীচু করে লারমোর বললেন, 'ওইখানটায় তোর জিত দিদিভাই। এই বয়েসে কোমর আর ঘোরে না। যদি সেই বয়েসে তোর সঙ্গে দেখা হত রে—'

সুধা ঝঙ্কার দিয়ে উঠল, 'তা হলে কী হত শুনি?'

'সে কথা কি হাটের মাঝখানে বলা যায়?'

'তবে কোথায় বসে বলা যায়?'

'নির্জনে দু'জনে—'

লারমোরের কথা শেষ হবার আগেই হেমনাথ হুঙ্কার দিলেন, 'অ্যাইও—'

লারমোর ঘাড় ফিরিয়ে বললেন, 'কী হল হে? অমন হুমকে উঠলে? ল্যাজে পা পড়েছে মনে হচ্ছে।'

'একশ' বার পড়েছে। আমার হেড বেগমের কানে নির্জনে কী বলতে চাও হে বেয়াদপ? জানো তোমার গর্দান চলে যেতে পারে।'

'দুঃখিত, দুঃখিত। একে যে তোমার হেড বেগম করে বসে আছ, বুঝতে পারি নি।' বলতে বলতে করুণ চোখে সুধার দিকে তাকালেন লারমোর। হেমনাথকে দেখিয়ে বললেন, 'ওই কালো কষ্টিপাথরটাকে মন প্রাণ সঁপে না দিয়ে—'

সুধা ভেংচে উঠল, 'আহা—হা—'

লারমোর এবার নিজের বুকে আঙুল রেখে আবেগপূর্ণ গলায় বললেন, 'এই গোরাচাঁদের গলায় যদি বরমাল্য দিতিস রে সুধারানী—'

সুধা আগের মতোই ভেংচাতে লাগল, 'অসভ্য কোথাকার—'

সবাই হাসছিল। হাসাহাসির ভেতর একসময় লারমোর গীর্জার পেছন দিকে এসে পড়লেন।

গীর্জার পর অনেকখানি ফাঁকা মাঠ, তারপর নদী। মাঠটার এক ধারে সারি সারি খানকতক টিনের ঘর। একটা ঘরে দেখা গেল অনেকগুলো ধানের ডোল, আরেক ঘরে চার পাঁচটা গোরু বাঁধা। এটাই সম্ভবত গোয়াল।

গোয়ালঘরের কাছে এসে লারমোর ডাকতে লাগলেন, 'কাদের, কাদের—'

তৃতীয় ঘরখানা থেকে কাদের বেরিয়ে এল। কখন কোন পথ দিয়ে সে এখানে এসে ঢুকেছিল, কেউ টের পায় নি।

লারমোর বললেন, 'দুধ দোয়াব, পেতলের দু'টো বলতি আর তেল্লের বাটি নিয়ে আয়।'

কাদের চলে গেল।

বিনু হঠাৎ বলে উঠল, 'কাদের তো আপনার কাছে থাকে না লালমোহনদাদু?'

'হ্যাঁ।' যে ঘরটা থেকে কাদের বেরিয়ে এসেছিল সেটার দিকে আঙুল বাড়িয়ে লারমোর বললেন, 'ওটা কাদের আর চম্পকের ঘর।'

'চম্পক কে?'

'ওই যে ঘোড়াটা, যেটা আমাদের ফিটন টানে। ওর আরেকটা নামও আছে—গোপাল।'

বিনু অবাক। ওই রোগা চেহারার বুড়ো হাড্ডিসার ঘোড়াটার যে নাম থাকতে পারে, তাও এরকম চমকপ্রদ শৌখিন নাম—কে ভাবতে পেরেছিল! গোপাল না হয় মেনে নেওয়া যায়, তাই বলে চম্পক! বিমূঢ়ের মতো বিনু তাকিয়ে থাকল। অনেকক্ষণ পরে বলল, 'ঘোড়াটা আর কাদের এক ঘরে থাকে!'

'হ্যাঁ।'

অন্য সকলেও অবাক হয়ে গিয়েছিল। সমস্বরে তারা বলল, 'কেন?'

'আর বোলো না—' লারমোর বলতে লাগলেন, 'চম্পককে ছাড়া এক মুহূর্ত সে থাকেব না। ঘোড়ার জন্যে আলাদা ঘর করে দিতে চেয়েছিলাম, কাদের রাজি না। ওই চম্পকের সঙ্গেই তার

ওঠা বসা, চলা ফেরা। এমনকি ওটার সঙ্গে কথাও বলে সে। পনের বছর আগে ঘোড়াটা কেনা হয়েছিল। তখন থেকেই সে কাদেরের বন্ধু, সঙ্গী।'

বালতি আর তেলের বাটি নিয়ে কাদের ফিরে এল। তার সামনে ঘোড়ার প্রসঙ্গ নিয়ে কেউ আর কিছু বলল না।

দুধ দোয়াবার সরঞ্জাম এসে গেছে। লারমোর গোয়ালে ঢুকলেন। তাঁর পিছু পিছু বিনুরাও গেল।

গোরুর বাঁটে তেল মেখে দুই হাঁটুর ফাঁকে বালতি নিয়ে নিপুণ হাতে দুইতে শুরু করলেন লারমোর। পাঁচটা গোরুর দুধে দু'টো বালতি কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে গেল।

দুধটা কাদেরকে দিয়ে পরানের মায়ের কাছে পাঠিয়ে গোরুগুলোকে ছেড়ে দিলেন লারমোর। তারা ছুটে গিয়ে সামনের মাঠে শরতের কোমল, সজীব ঘাসে মুখ ডুবিয়ে দিল।

লারমোর বললেন, 'একটা বড় কাজ হল। চল, জায়গাটা তোমাদের ভাল করে ঘুরিয়ে দেখাই।'

গীর্জার চারধার, এখানকার নদীতীর, একটু দূরের ঝাউবীথি—দেখতে দেখতে বেলা বেড়ে গেল। ঝকঝকে নীলাকাশের খাড়া পাড় বেয়ে বেয়ে সূর্যটা অনেকখানি ওপরে উঠে এসেছে।

আশ্বিন যায় যায়। তবু এখনও রোদে বেশ ধার আছে। সবার কপালে ঘামের দানা জমেছে। হেমনাথ বললেন, 'আর না, এবার ফেরা যাক।'

গীর্জায় ফিরে খানিকক্ষণ বিশ্রামের পর অবনীমোহন বললেন, 'আচ্ছা লালমোহন মামা—'

'বল—' লারমোর উন্মুখ হলেন।

'এই গীর্জায় আপনি কতদিন আছেন?'

মনে মনে হিসেব করে লারমোর বললেন, 'প্রায় চল্লিশ বছর। এইটিন নাইনটি নাইনে এখানে এসেছিলাম, আর এটা হল গিয়ে নাইনটিন ফরটি।'

হঠাৎ কী মনে পড়তে অবনীমোহন বললেন, 'একটা কথা জানবার খুব ইচ্ছে আমার। যত বারই জানতে চেয়েছি, বলেছেন, পরে বলবেন। আজ কিন্তু আপনাকে ছাড়ব না।'

'কী কথা বল তো?'

'আপনার জীবনের কথা।'

স্নিগ্ধ হেসে লারমোর বললেন, 'শোনাবার মতো কিছুই নেই। অতি তুচ্ছ জীবন আমার।'

অবনীমোহন বললেন, 'তুচ্ছ কিনা, সেটা আমরা বুঝব। আপনি বলুন—'

'বেশ, তোমার যখন এত আগ্রহ, শোন—' লারমোর নিজের জীবন-কথা শুরু করলেন।

জন্মসূত্রে লালমোর আইরিশ। ওই পর্যন্তই। আয়ার্ল্যান্ডের কথা আজকাল তাঁর বিশেষ মনেও পড়ে না।

জন্মভূমির নামে মানুষের বুকে আবেগের নদী দুলতে থাকে। তেমন কোনও অনুভূতি লারমোরের মধ্যে অবশিষ্ট আছে কিনা সন্দেহ।

থাকবেই বা কী করে? সেই কবে ইন্ডিয়ায় চলে এসেছেন লারমোর, সে কি আজকের কথা! একটা শতাব্দীর প্রায় আধাআধি তো তাঁর এ দেশেই কেটে গেল।

এসেছিলেন যৌবনের শুরুতে। দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে এখন তিনি জীবনের শেষ প্রান্তে পৌঁছেছেন। এখানে দাঁড়িয়ে পেছনে ফিরলে জন্মভূমির সেই দেশটাকে ধুধু স্বপ্নের মতো মনে হয়।

লারমোরের স্মৃতি থেকে কত কিছুই তো মুছে গেছে। তবু মনে পড়ে, খুব ছেলেবেলাতেই বাবা-মাকে হারিয়েছেন। তারপর খুব দূর সম্পর্কের এক কাকা তাঁকে নিজের কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন। নিজের কাছে বলতে চার্চে।

কাকা বিয়েটিয়ে করেন নি। তিনি ছিলেন গীর্জাবাসী সন্ন্যাসী—সেবাব্রতী এবং ধর্মযাজক। বহুজনহিতায় বহুজনসুখায় তাঁর জীবন উৎসর্গ করা।

লারমোরের দিকে তাকাবার সময় কাকার ছিল না। চার্চের নানা দায়িত্বপূর্ণ কাজে সর্বক্ষণ তাঁকে ব্যস্ত থাকতে হত। চার্চে একটা অরফ্যানেজ ছিল, কাকা তাঁকে সেখানে ভর্তি করে দিয়েছিলেন। অনেকগুলো অনাথ পিতৃপরিচয়হীন শিশুর সঙ্গে লারমোরের প্রথম জীবন কাটতে শুরু করেছিল।

মনে পড়ে, অরফ্যানেজে ভর্তি করে দিয়েই কাকা তাঁর কর্তব্য শেষ করে ফেলেন নি। কাজের ফাঁকে ফাঁকে দু'চার মাস পর পর এসে লারমোরের খোঁজও করতেন। বলতেন, 'বাবা-মা নেই বলে

দুঃখ কোরো না, প্রভুর হয়তো এটাই ইচ্ছে।'

সেই বয়সে লারমোর এসব বুঝতে পারতেন না। বড় বড় অবোধ চোখ মেলে তাকিয়ে থাকতেন।

কাকা আবার বলতেন, 'চারদিকে তাকিয়ে দেখ, জগতে কত ছেলে অনাথ। তোমার তো তবু বলবার মতো একটা পিতৃপরিচয় আছে, ওদের তা-ও নেই। প্রভু করুণাময়, তাঁর ওপর বিশ্বাস রাখো। সব দুঃখ ঘুচে যাবে।'

সেদিন না হলেও, বড় হয়ে কাকার কথাগুলো বুঝতে পেরেছিলেন লারমোর।

ছাত্র হিসেবে চিরদিনই তিনি অসাধারণ মেধাবী। স্কুলের জীবন শেষ করে মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন। চার্চই তাঁর পড়ার খরচ চালাত।

জগতে এত শাস্ত্র থাকতে কেন লারমোর চিকিৎসা শাস্ত্রের অনুরাগী হয়েছিলেন তার কারণ আছে। কারণটা তাঁর পরিবেশ। ছেলেবেলা থেকেই লারমোর তাঁর চারধারে যা দেখেছেন তা হল কল্যাণময় সেবার জগৎ। দেখেছেন সুখ-সাধ-কামনা-বাসনা, নিজেদের বলতে যা কিছু সব বিসর্জন দিয়ে সর্বত্যাগী মিশনারির দলকে পরার্থে জীবন সঁপে দিতে। পবিত্র গীর্জা, কল্যাণব্রতী ফাদারের দল এবং কাকা—এঁরা সবাই মিলে তাঁর অস্তিত্ব যেন আচ্ছন্ন করে রেখেছিলেন। তাঁদের প্রভাব এত বিপুল, এমন সর্বব্যাপী যে তার বাইরে পা বাড়াবার উপায় ছিল না লারমোরের। অমোঘ নিয়তির মতো তাঁরা যেন লারমোরের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করতে শুরু করেছিলেন।

লারমোর তখন ভাবতেন ডাক্তার হতে পারলে মানুষের যতখানি সেবা করা যায়, আর কিছুতেই তা সম্ভব নয়। তাই স্কুলের পড়া শেষ করেই মেডিক্যাল কলেজে গিয়েছিলেন। সেই বয়সেই নিজের ভবিষ্যৎ মোটামুটি স্থির করে ফেলেছিলেন লারমোর।

চিকিৎসা-বিজ্ঞান পড়তে পড়তে হঠাৎ আরেক দিকে চোখ পড়েছিল তাঁর। চার্চে ভারতবর্ষের ওপর লেখা কিছু বই ছিল। নিতান্ত কৌতূহলের বশে একদিন সেগুলো নিয়ে পাতা ওলটাতে শুরু করেছিলেন। ওলটাতে ওলটাতে কখন যে ইন্ডোলজির বইগুলো তাঁকে একেবারে কুহকিত করে ফেলেছে, লারমোর নিজেই জানেন না।

ভারতবর্ষের মানুষ, তার গাছপালা, তার দারিদ্র্য, তার পরাধীনতা, তার রূপকথা, সামাজিক রীতিনীতি—সব মিলিয়ে ইন্ডিয়া যেন এক বিচিত্র স্বপ্নের দেশ। পড়তে পড়তে কখনও ব্যথিত হয়েছেন লারমোর, কখনও অস্থির, কখনও বিহ্বল, কখনও বা মুগ্ধ।

চার্চে ক'খানাই বা বই ছিল! যেখান থেকে পারতেন ইন্ডোলজির আরও বই জোগাড় করে পড়তেন লারমোর। পূর্ব গোলার্ধের এক অজানা দেশ তাঁর নেশা ধরিয়ে দিয়েছিল যেন। কয়েক হাজার মাইল দূর থেকে ভারতবর্ষ তাঁকে অবিরত হাতছানি দিয়ে যাচ্ছিল।

ভবিষ্যৎ আগেই স্থির হয়ে ছিল। কাকা তখনও জীবিত। মেডিক্যাল কলেজের রেজাল্ট বেরুবার পর লারমোর তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন।

কাকা বললেন, 'তুমি পরীক্ষার ফার্স্ট হয়েছ। আই অ্যাম ভেরি হ্যাপি মাই বয়। অরফ্যানেজে থেকে কষ্ট করেছ। প্রভু করুণাময় আজ সে কষ্টের পুরস্কার দিয়েছেন। এখন তোমার কাছে সুখ-অর্থ-প্রতিষ্ঠা, সব কিছুর দরজা খোলা। জীবনে উন্নতি কর, তাই আমি চাই।'

মৃদু গলায় লারমোর বলেছিলেন, 'অর্থ-সুখ-প্রতিষ্ঠায় আমার লোভ নেই। আমি—'

'তুমি কী?'

'আমি আপনার মতো মিশনারি হতে চাই।'

এক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে কাকা লারমোরকে বুকের ভেতর টেনে নিয়েছিলেন। আবেগের সুরে বলেছিলেন, 'গড ব্লেস ইউ মাই বয়। প্রার্থনা করি, জগতের সব চাইতে শ্রেষ্ঠ আনন্দ তুমি লাভ কর।'

লারমোর তাঁর বুকের ভেতর থেকে বলেছিলেন, 'একটা কথা—'

'বল।'

'মিশনারি হয়ে আমি এদেশে থাকতে চাই না।'

'তবে কোথায় যাবে?'

'ইণ্ডিয়ায়।'

দু'চোখে অপার বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে ছিলেন কাকা, 'ইন্ডিয়া!'

লারমোর বলেছিলেন, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনি আমাকে অনুমতি দিন।'

'কিন্তু—'

'বলুন—'

দ্বিধান্বিত সুরে কাকা বললেন, 'নিজের দেশ থাকতে ইন্ডিয়া কেন? সেখানকার কতটুকু জানো তুমি?'

লারমোর বলেছিলেন, 'ওরা বড় দুঃখী, বড় গরিব আর পরাধীন।' ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যা জানতেন সব বলে গিয়েছিলেন তিনি।

কাকা অবাক হয়ে বলেছেন, 'এত সব কী করে জানলে?'

'বই পড়ে।'

একটু নীরব থেকে কাকা বলেছিলেন, 'যদি মনে করো, ভারতবর্ষের কিছু ভাল করতে পারবে, যাও। আমার আপত্তি নেই। কে কোন জাত, কার গায়ের রং কী, কে কোথাকার বাসিন্দা—এ সব বড় কথা নয়। আসল কথা হল মানুষের কল্যাণ, মানুষের সেবা।'

কাকার সম্মতি পাওয়া গেছে, আশীর্বাদ আর শুভেচ্ছাও তিনি জানিয়েছেন। কাজেই কোথাও কোনও বাধা ছিল না। মিশনারি হয়ে সোজা ইন্ডিয়ায় চলে এসেছিলেন লারমোর।

ভারতবর্ষের আর কোথাও নয়, প্রথমেই তিনি এসেছিলেন কলকাতায়। সেখানে দিন তিন চারেক থেকে পূর্ব বাংলায়—এই রাজদিয়াতে।

আজ রাজদিয়ার এই গীর্জাটার জরাজীর্ণ করুণ দশা, সেদিন কিন্তু এরকম ছিল না। চারদিক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, ঝকঝক তকতক করত। দেওয়ালগুলোর পলেস্তারা এমন করে খসে পড়েনি। নতুন কলিতে গীর্জাবাড়িটাকে চমৎকার দেখাত।

তখন এখানে ছিলেন ফাদার পারকিন্স। পারকিন্সের যথেষ্ট বয়স হয়েছিল, প্রায় সত্তরের কাছাকাছি। এদেশে থাকতে থাকতে একখানা খানদানী ম্যালেরিয়া বাধিয়ে ফেলেছিলেন, তার ওপর ছিল বাত। বার মাসই অসুস্থ হয়ে বিছানায় শুয়ে থাকতে হত। ফলে মিশনের কাজ প্রায় বন্ধ হবার দাখিল। ফাদার পারকিন্সকে সাহায্য করবার জন্যই লারমোর রাজদিয়া এসেছিলেন।

এখানে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে ফাদার পারকিন্স জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'ইস্ট বেঙ্গলে আগে কখনও এসেছ?'

'আজ্ঞে না।' লারমোর জানিয়েছিলেন, 'ইস্টবেঙ্গল কেন, ইন্ডিয়াতেই এই আমার প্রথম আসা।'

'এখানে আসার আগে বাংলা ভাষাটা নিশ্চয়ই শিখে ফেলেছ?'

'না।'

'এখানকার হালচালও নিশ্চয়ই জানো না?'

'না।'

pathagar.net

এবার স্পষ্টতই বিরক্ত হয়েছিলেন ফাদার পারকিন্স, 'এদেশের কিছুই জানা নেই, এমন আনকোরা সব ছেলে ধরে ধরে পাঠাবে! এদের দিয়ে যে কী করে কাজ চলবে!'

লারমোর উত্তর দেন নি।

ফাদার পারকিন্স আবার বলেছিলেন, 'এসে যখন পড়েছই তখন কী আর করি। প্রথমে বাংলা ভাষাটা শেখ। মাঝে মাঝে আমার সঙ্গে বেরুতেও হবে।'

'আচ্ছা—' তক্ষুনি ঘাড় কাত করেছিলেন লারমোর।

ফাদার পারকিন্স আর দেরি করেন নি ; সেদিন থেকেই তালিম দিতে শুরু করেছিলেন।

মাসখানেকের ভেতর বাংলা ভাষাটা কাজ চালাবার মতো শিখে ফেলেছিলেন লারমোর। এর মধ্যে বারকয়েক তাঁকে বেরুতেও হয়েছিল। যেদিন জ্বরটা নতুন করে আসত না কিংবা বাতের ব্যথাটা ঝিমিয়ে থাকত, সেদিন ফাদার পারকিন্স তাঁকে নিয়ে গ্রামে-গঞ্জে অথবা দূরের কোনও হাটে পাড়ি জমাতেন। একদিন বলেছিলেন, 'আমার শরীরের অবস্থা তো দেখছ।'

ফাদার পারকিন্স কী বলতে চান বুঝতে না পেরে লারমোর বলেছিলেন, 'আজ্ঞে—'

'বয়েস হয়েছে। রোগে দুর্বল হয়ে পড়েছি। একদিন ভাল যায় তো তিনদিন বিছানায় পড়ে থাকি। আমি একরকম খরচের খরেই চলে গেছি। আমার সঙ্গে ঘুরে ঘুরে চারদিক ভাল করে দেখে নাও। রাজাদিয়া গীর্জার সব ভার তোমাকেই নিতে হবে।'

এ দেশের ভাষা, সামাজিক রীতিনীতি জেনে না আসার জন্য প্রথম দিন বিরক্ত হয়েছিলেন ফাদার পারকিন্স। তাতে মনে মনে দমে গিয়েছিলেন লারমোর। কিন্তু মাসখানেক নিরন্তর মেলামেশার ফলে বোঝা গিয়েছিল, ফাদার পারকিন্স মানুষটি বেশ সজ্জন, বিবেচক, হৃদয়বান। কোনও ব্যাপারে লারমোরের অসুবিধা হচ্ছে কিনা, আস্বাচ্ছন্দ্য ঘটছে কিনা—সে সব দিকে তাঁর তীক্ষ্ণ লক্ষ্য। ধীরে ধীরে মানুষটিকে ভালই লেগেছিল লারমোরের।

সেদিন কথার উত্তরে লারমোর বলেছিলেন, 'এ আপনি কী বলছেন?'

'কী বলছি?'

'আপনি থাকতে গীর্জার ভার আমি নেব! আমি জানিই বা কী, বুঝিই বা কী?'

ফাদার পারকিন্স হেসেছিলেন, 'আমি তো চিরকাল থাকব না। শরীরের যা আবস্থা তাতে আজ আছি কাল নেই। আমি যখন থাকব না তখন কাউকে তো দায়িত্ব নিতেই হবে।'

লারমোর ব্যথিত সুরে বলেছিলেন, 'মৃত্যুর কথা এখনই ভাবছেন কেন? অত বয়েস আপনার হয়নি।'

তাঁর পিঠে হাত রেখে ফাদার পারকিন্স বলেছিলেন, 'যতই তুমি কমাতে চাও না, যথেষ্ট বয়েস আমার হয়েছে। বয়েসটা বড় কথা নয়, শরীর যদি ভাল থাকত! অসুস্থ রুগ্‌ণ দেহ নিয়ে বেঁচে থাকা শিউরনা। সে যাক গে, যতদিন বাঁচব রাজদিয়াতে আছি, ততদিন তোমার চিন্তা নেই।'

হাটে-গঞ্জে কি সুদূর নদীর চরে গিয়ে ফাদার পারকিন্স কিছুক্ষণ জিরোতেন। জিরোতে জিরোতে বলতেন, 'আমার দেশ ব্রিটেন, তোমার আয়ার্ল্যান্ড। জন্মভূমি ছেড়ে, আত্মীয়স্বজন ছেড়ে কেন আমরা এত দূরে এসে পড়ে আছি, বল তো?'

লারমোর বলতেন, 'আজ্ঞে আমরা মিশনারি। মানুষের কল্যাণের জন্যে, তাদের সেবা করতে—'

বাধা দিয়ে ফাদার পারকিন্স বলতেন, 'সেবা টেবা তো আছেই। আরও একটা বড় ব্যাপার আছে।'

'কী?'

'প্রিচিঙ। সমস্ত পৃথিবী জুড়ে অন্ধকারের বাসিন্দারা পোকার মতো কিলবিল করে বেড়াচ্ছে। তাদের আলোকমন্ত্রে দীক্ষা দিতে হবে। সেই জন্যেই আমরা মিশনারিরা সারা ওয়ার্ল্ডে ছড়িয়ে পড়েছি। যেখানে যতদূরে যে মানুষই থাক, প্রভুর বাণী তাদের কাছে পৌঁছে দিতেই হবে।' বলতে বলতে উঠে দাঁড়াতেন ফাদার পারকিন্স, 'কিভাবে প্রিচ করতে হয়, কিভাবে সন্স অফ সিনারদের আলোকের মাঝখানে নিয়ে আসতে হয়, 'দেখে শেখো। এরপর তোমাকেও এভাবে প্রিচ করতে হবে।'

লারমোর কিছু বলতেন না ; অসীম কৌতূহলে তাকিয়ে থাকতেন।

এবার আর লারমোরের দিকে নজর থাকত না ফাদার পারকিন্সের। নদীর চর কিংবা হাটের জনতাকে ডেকে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলতেন, 'আইস, আইস পাপাচারীর সন্তানেরা, তোমাদের আমি আলোকের পথে লইয়া যাইব। প্রভু যিশুই সেই আলোক, যিশুই পথ। নিজের রক্তে তিনি এই জগৎকে শুচি করিয়া গিয়াছেন।' এইভাবে অনেকক্ষণ চেঁচাবার পর হাঁপাতে হাঁপাতে বসে পড়তেন। লারমোরকে বলতেন, 'দেখলে তো?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।' লারমোর মাথা নাড়তেন।

'আমার বয়েস হয়েছে, বেশিক্ষণ চেঁচাতে পারি না। বাংলা ভাষাটা তো কাজ চালাবার মতো শিখেছ। এবার তোমাকেই কিন্তু প্রিচ করতে হবে।'

'আচ্ছা—'

আসার সময় থলে বোঝাই করে মথি আর লুক লিখিত সুসমাচার আনা হত, নির্দেশমতো হাটুরে অথবা চরের মানুষদের হাতে হাতে বিলিয়ে দিতেন লারমোর।

এইভাবে মাস পাঁচেক কাটল। তারপর ফাদার পারকিন্স নিজের সম্বন্ধে যা আশঙ্কা করেছিলেন তা-ই ঘটল। তিনদিনের ধুম জ্বরে মারা গেলেন।

ফাদার পারকিন্সের মৃত্যুর পর রাজদিয়া গীর্জার সব দায়িত্ব এসে পড়ল লারমোরের হাতে। পারকিন্স যেমন যেমন শিখিয়েছিলেন, প্রথম প্রথম তা-ই করতেন লারমোর। চার্চের সম্পত্তি দু'টো নৌকো আর একখানা ফিটন ছিল। ফিটন চালাত কাদের। এখানে আসা থেকেই কাদেরকে দেখেছেন লারমোর, সে তাঁর দীর্ঘকালের সহচর। খরার দিনে ফিটন, নইলে নৌকো করেই প্রচার করতে বেরুতেন লারমোর। সুজনগঞ্জে, কমলাঘাটে কি রসুলপুরের হাটে কিংবা নদীর চরে চরে ঘুরে তিনি চেঁচাতেন, 'ওই মহাপ্রলয় আসিল, ওই ঘন ঘন বজ্রপাত হইতে লাগিল। আইস আইস—'

চিৎকারের পর সুসমাচার বিতরণ। তারপর চার্চে ফিরে আসা।

এই নিয়মেই দিন যাচ্ছিল, দিন আসছিল। এর মধ্যে হঠাৎ একটা মজার ব্যাপার ঘটল।

সেদিন সুজনগঞ্জে প্রিচ করছিলেন লারমোর। কৌতূহলী জনতা তাঁকে ঘিরে দাঁড়িয়ে ছিল।

যথারীতি আলোকমন্ত্রে দীক্ষার কথা বলে সুসমাচার বিলি করতে শুরু করলেন লারমোর। লালচে কাগজে ছাপা চার পৃষ্ঠার পুস্তিকাগুলো প্রতি হাটেই তিনি নিয়ে যান। সবাই হাত পেতে নেয়, কিছু বলে না। সেদিন কিন্তু কালো দোহারা চেহারার একটি যুবক, তাঁরই সমবয়সী হবেন, সুসমাচারটা নিয়ে বললেন, 'আপনি বুঝি এখানে নতুন?'

থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন লারমোর। ছ'আট মাস প্রিচ করছেন, সুজনগঞ্জের হাটে তাঁর চারধারে যারা ভিড় জমায় তাদের সকলেই তাঁর মুখচেনা। জনতার মধ্যে যুবকটিকে আগে আর কখনও দেখেন নি।

লারমোর বলেছিলেন, 'হ্যাঁ, আমি নতুন। ক'মাস হল, এ দেশে এসেছি।'

'তাই হবে। মাসকয়েক আমি এখানে ছিলাম না। থাকলে আগেই আপনার সঙ্গে আলাপ হত। আপনি নিশ্চয়ই রাজদিয়ার চার্চে আছেন?'

'হ্যাঁ।'

'তা একা প্রিচ করতে বেরিয়েছেন যে? ফাদার পারকিন্স কোথায়?'

'ফাদার পারকিন্সকে আপনি চেনেন!'

'চিনি বৈকি। আমাদের অনেক দিনের পরিচয়। উনি আমাকে খুব স্নেহ করেন।'

একটু চুপ করে থেকে লারমোর বলেছিলেন, 'ফাদার পারকিন্স নেই।'

যুবকটি যেন চকিত হয়ে উঠেছিলেন, 'মানে!'

'মাস চারেক হল মারা গেছেন।'

আক্ষেপের সুরে যুবক বলেছিলেন, 'উনি মারা গেলেন, অথচ আমি জানতেই পারি নি। ওঁর কাছে কত আবদার করেছি, কত উৎপাত করেছি—' বলতে বলতে থেমে গিয়েছিলেন।

কিছুক্ষণ নীরবতা। তারপর লারমোরই জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'এখানে আপনি কোথায় থাকেন?'

'রাজদিয়ায়। রাজদিয়ার দক্ষিণ দিকের শেষ বাড়িখানা আমাদের।'

'তবে তো ভালই হল। মাঝে মাঝে চার্চে আসবেন।'

'নিশ্চয়ই আসব।'

একটু ভেবে লারমোর বলেছিলেন, 'আপনার সঙ্গে আলাপ টালাপ হল। নামটাই কিন্তু জানা হয় নি ভাই—'

যুবক বলেছিলেন, 'আমার নাম হেমনাথ মিত্র।'

'আরেকটা কথা—'

'বলুন—'

'তখন বললেন না মাঝখানে ক'মাস আপনি এখানে ছিলেন না—'

'হ্যাঁ।'

'কোথায় ছিলেন তবে?'

'ঢাকায়। ইউনিভার্সিটির শেষ পরীক্ষাটা বাকি ছিল। সেটা দিয়ে ঝামেলা মিটিয়ে এলাম।'

'কী সাবজেক্ট ছিল আপনার?'

'দর্শন—'

'আপনার সঙ্গে আলাপ করে খুব ভাল লাগল। আসবেন কিন্তু চার্চে। আপনার জন্যে আমি অপেক্ষা করে থাকব।'

'সেদিন ওই পর্যন্ত।

পরের হাটে আবার হেমনাথের সঙ্গে দেখা। 'ওই জলপ্রলয় আসিল, ওই ঘন ঘন বজ্রপাত হইতে লাগিল --' বলে কণ্ঠস্বর যখন শীর্ষবিন্দুতে তুলেছেন লারমোর, সেই সময় চোখে পড়েছিল, হাটুরে জনতার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছেন হেমনাথ, ঠোঁট টিপে টিপে হাসছেন।

অমন হাসির কারণ কী থাকতে পারে? মনে মনে অস্বস্তি বোধ করেছিলেন লারমোর।

লিচিডের পর সুসমাচার বিতরণ টিতরণ হয়ে গেলে লারামোর হেমনাথের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন, 'ভাল আছেন?'

হেমনাথ ঘাড় কাত করেছিলেন 'আছি। আপনি?'

'ওই একরকম। আপনাকে কিন্তু চার্চে খুব আশা করেছিলাম। রোজই ভেবেছি, আসবেন। আসেন নি।'

বিব্রতভাবে হেমনাথ বলেছিলেন, 'বাড়ির ক'টা কাজে আটকে গিয়েছিলাম। দু'একদিনের ভেতর ঠিক যাব।'

লারমোর বলেছিলেন, 'বুঝতেই পারেন, এদেশে নতুন এসেছি। আপনজন কেউ নেই। ফাদার পারাকিল ছিলেন, তিনি তো মারাই গেছেন। চার্চে যতক্ষণ থাকি একরকম মুখ বুজে থাকতে হয়। আপনাকে কেন জানি সামান্য আলাপেই বন্ধু বলে ভাবতে শুরু করেছি।'

'নিশ্চয়ই ভাববেন। দেখবেন, এরপর থেকে চার্চে এতবার হানা দেব যে অতিষ্ঠ হয়ে উঠবেন।'

'দেখা যাবে।'

একটু চুপ। তারপর সামান্য দ্বিধার সুরে লারমোর বলেছিলেন, 'একটা ব্যাপার জানতে ইচ্ছে করছে।'

'স্বচ্ছন্দে।'

'আমি যখন হাটের লোকগুলোর কাছে প্রভু যিশুর কথা, বাইবেলের কথা বলছিলাম তখন হাসছিলেন কেন?'

'এমনি।'

'না, এমনি না। কারণ আছে।'

হেমনাথ স্বীকার করেছিলেন, 'আছে।'

'কী সেটা?' জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়েছিলেন লারমোর।

'তার আগে বলুন আপনি এদেশে কী করতে এসেছেন?'

'ধরুন প্রিচ করতেই।'

'তাহলে বলব আপনার আসাটা পুরোপুরি বিফলে যাবে।'

'কেন?' লারমোরের চমক লেগেছিল।

হেমনাথ বলেছিলেন, 'যে ভাষায় আপনি ওদের বোঝাতে চাইছেন সেটা ওদের ভাষা নয়। ওরা তা বোঝে না।'

'কিন্তু—'

'বলুন।'

'এটা তো বাংলা ভাষাই।'

'একশ' বার।'

'তবে?'

হেমনাথ বলেছিলেন, 'তাহলে পরিষ্কার করেই বলি। ধরুন আমি বাঙালি। এই হাটে যত মানুষ আছে তারাও বাঙালি। আমি ইউনিভার্সিটিতে পড়েছি। যতখানি ভাবতে পারি, বুঝতে পারি, ওরা

pathagar.net

নিশ্চয়ই তা পারে না। সাধারণ মানুষের নিজস্ব ভাষা আছে। তাদের বোঝাতে হলে সেটা জানা দরকার। সেটা না জানলে ওদের কাছে পৌঁছনো যাবে না।'

'কিন্তু—'

'কী?'

'শুনেছি, ফাদার পারকিন্সও এখানে কুড়ি বছরের মতো কাটিয়েছেন। তিনিও ওই ভাষাতেই প্রিচ করতেন। আপনার কি ধারণা, কুড়ি বছর ধরে তিনি ভুল করে গেছেন?'

উত্তর না দিয়ে একটা হাটুরে লোককে ডেকে এনেছিলেন হেমনাথ। জিজ্ঞেস করেছিলেন 'পাদ্রিসাহেব চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে যা বলছিলেন, বুঝতে পেরেছিস?'

লোকটা মাথা নেড়েছে, 'আইজ্ঞা না। বড় পাদ্রিও (পারকিন্স) এইরকম খটর মটর কইরা কী জানি কইত। কার বাপের সাইধ্য বোঝে।'

'আচ্ছা, তুমি যাও।'

লারমোরের চোখের সামনে থেকে একটা পর্দা সরে গিয়েছিল যেন। লোকটা চলে গেলে বলেছিলেন, 'এই জন্যেই বুঝি তখন মিটিমিটি হাসছিলেন।'

হেমনাথ ঘাড় হেলিয়ে বলেছিলেন, 'হ্যাঁ।'

'কিন্তু সাধারণ মানুষের ভাষা শিখব কী করে?'

'তাদের সঙ্গে মিশতে হবে। তাদের প্রতিদিনের সুখদুঃখের ভাগীদার হতে হবে। তবেই শেখা যাবে।'

লারমোর এবার নীরব থেকেছেন।

হেমনাথ আবার বলেছিলেন, 'ফাদার পারকিন্স সম্বন্ধে আমার কী ধারণা জানেন?'

'কী?'

'কুড়ি বছর প্রিচ করেও খুব একটা কিছু উনি করতে পারেন নি।'

লারমোর চুপ।

হেমনাথ থামেন নি, 'এই প্রিচিঙের ব্যাপারে আমার একটা কথা মনে হয়।'

'কী কথা?'

বলতে গিয়েও থেমে গিয়েছিলেন হেমনাথ। কিছুক্ষণ চিন্তা করে বলেছিলেন, 'আপনার সঙ্গে সবে আলাপ হয়েছে, এক্ষুনি বললে আপনি আহত হবেন, ভুলও বুঝতে পারেন। তাই এখন নয়, তেমন বুঝলে পরে বলব।'

পরেই বলেছিলেন। ততদিনে লারমোরের সঙ্গে বন্ধুত্বের রং পাকা হয়ে গিয়েছিল। ভুল বোঝার অবকাশ আর ছিল না। দিনে তিন বার করে তখন তিনি চার্চে আসতেন। 'আপনি' থেকে কবে যে সম্বোধনের ভাষাটা 'তুমি'তে নেমেছিল, নিজেদেরই খেয়াল নেই।

হেমনাথ বলেছিলেন, 'আমার কী মনে হয় জানো, এই প্রিচিঙের কোনও প্রয়োজন নেই।'

ভ্রূ ছোট করে লারমোর শুধিয়েছিলেন, 'কেন?'

'এক ধর্ম থেকে আরেক ধর্মে নিয়ে মানুষের উপকার করা যায় বলে আমার মনে হয় না।'

'কিন্তু—'

'কী?'

'খ্রিস্টধর্ম জগতের সব চাইতে সেরা ধর্ম, এটা তো তুমি মানবে।'

'খ্রিস্টধর্ম সম্বন্ধে আমার অসীম শ্রদ্ধা। কিন্তু কোনও ধর্মের চাইতে কোনও ধর্ম খাটো, এ আমি মানি না।'

অনেক তর্কাতর্কির পর হেমনাথ বলেছিলেন, 'তুমি অন্য ধর্ম সম্বন্ধে কতটুকু জানো?'

'কিছু কিছু জানি।'

'আমার কাছে অনেক বই আছে, ছুটি করে পড়ে দেখ। দেখবে কোনও ধর্মই অ্যান্টি-হিউম্যান নয়।'

'বেশ, বইগুলো দিও।'

অন্য ধর্ম সম্বন্ধে লারমোরের ধারণা ছিল ভাসা ভাসা, অস্বচ্ছ। বইগুলো পড়বার পর তাঁর সমস্ত আগ্রহ জুড়ে আলোড়ন শুরু হয়ে গিয়েছিল। চোখের মণিতে নতুন দৃষ্টা এসে লেগেছিল যেন। মনে হয়েছিল, খ্রিশ্চিঙ নিরর্থক। যুগযুগান্ত ধরে আপন পিতৃপুরুষের ধর্মবোধ নিজের অস্তিত্বে ধারণ করে মানুষ হয়তো পরম শান্তিতে আছে, তাকে উন্মূল করে অন্য মাটিতে স্থাপন করতে যাওয়া ঠিক না। সম্ভবত তা নিষ্ঠুরতাও। লারমোর স্থির করেছিলেন, আর খ্রিশ্চিঙ করবেন না। অন্যভাবে মানুষের কল্যাণের কথা ভাববেন। তবে কেউ যদি স্বেচ্ছায় খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করে, আলাদা কথা।

সিদ্ধান্তটা নেবার সঙ্গে সঙ্গে বিপদ ঘটেছিল। কলকাতার মিশন এখানকার গ্রান্ট বন্ধ করে দিয়েছিল। সে কথা হেমনাথকে বলতেই একখানা উষ্ণ বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন তিনি। তাঁর বাবা তখনও জীবিত। বাবাকে বলে চার্চের নামে পাঁচিশ বিঘে জমি লিখে দিয়েছিলেন। ওই জমি থেকেই চার্চের খরচ চলবে।

লারমোর বলেছিলেন, 'খাওয়া-পরার ব্যাপারে তো নিশ্চিন্ত করলে। কিন্তু আরেক দিক থেকে যে ভাবনা বাড়ল। খ্রিশ্চিঙ ছিল, তবু একটা কাজের মধ্যে থাকতাম। এখন থেকে যে একেবারে নৈষ্কর্ম ব্রত।'

হেমনাথ বলেছিলেন, 'কে বললে? এখন থেকেই তো আসল কাজ শুরু!'

'কিরকম?'

'তুমি ডাক্তার তো?'

'হ্যাঁ।'

'এ দেশ বড় গরিব। বিনা চিকিৎসায়, বিনা ওষুধে ভুগে ভুগে কত মানুষ যে প্রতিদিন মরে যাচ্ছে। গ্রামে-গঞ্জে হাটে-হাটে ঘুরে তাদের সেবা শুরু কর। দেখবে কাজের অন্ত নেই।'

ঈশ্বরের নির্দেশ যেন হেমনাথের মধ্যে দিয়ে এসে গিয়েছিল। লারমোর তাঁর পথ খুঁজে পেয়েছিলেন।

তারপর কত বছর কেটে গেছে। পূর্ব বাংলার গাছপালা, শস্যপূর্ণ মাঠ, নদী, বন, মনোহর পাখির ঝাঁক, এখানকার মানুষ, তাদের সুখদুঃখ, শোক-উৎসব—সমস্ত একাকার হয়ে লারমোরকে যেন মগ্ন করে রেখেছে।

কাহিনী শেষ করে লারমোর হাসলেন, 'এই আমার জীবন। অতি সামান্য, অতি তুচ্ছ। নিশ্চয়ই তোমাদের ভাল লাগল না।'

কেউ কোনও কথা বলল না, অভিভূতের মতো সবাই বসে থাকল।

এদিকে সূর্যটা কখন যে খাড়া মাথার ওপর এসে উঠেছে সেদিকে চোখ পড়তেই লারমোর চঞ্চল হলেন, 'চল চল। ঢের বেলা হয়ে গেছে। চান টান সেরে নেওয়া যাক।'

রাজদিয়ায় দুর্গাপুজোর চাইতে লক্ষ্মীপুজোর সমারোহ অনেক বেশি। সারা শহরে দুর্গাঠাকুর আর ক'টা? বারোয়ারি-টারোয়ারি ধরে মোট সাতখানা। আর লক্ষ্মীপুজো? তার লেখাজোখা নেই। কাপুইপাড়ায় যুগীপাড়ায় বামুনপাড়ায় কায়েতপাড়ায়—সারা রাজদিয়াতে যেখানে যত বাড়ি, সব জায়গায় কোজাগরী পূর্ণিমার দিন ঘরদোর নিকিয়ে আলপনা এঁকে লক্ষ্মী এনে বসানো হয়। এখানে ঘরে ঘরে লক্ষ্মীবন্দনা। ধন-সম্পদ আর পরিপূর্ণতার এই দেবীর আরাধনা করতে কেউ ভোলে না।

রাজদিয়ায় দুর্গাপুজো হয় প্রতিমা বানিয়ে। লক্ষ্মীর বেলা কিন্তু অন্য নিয়ম। কেউ জলপূর্ণ ঘটে আম্রপল্লব আর শিষওলা ডাব বসিয়ে, তাতে সিঁদুরের ফোঁটা দিয়ে পুজো সারে। তবে বেশির ভাগ লোকই কুমোরপাড়া থেকে লক্ষ্মীসরা কিনে আনে, জলচৌকি কিংবা মাটির বেদির ওপর বসিয়ে তার পুজো হয়।

বিনুরা লারমোরের গীর্জায় গিয়েছিল একাদশীর সকালে। মাঝখানে তিনটে দিন; তারপরই কোজাগরী পূর্ণিমা অর্থাৎ লক্ষ্মীপুজো এসে গেল।

মাঝের তিনদিন নিশ্বাস ফেলার সময় ছিল না স্নেহলতার। শুধু কি স্নেহলতার? শিবানী-জবা-গৌরদাসী, এ বাড়ির মানুষগুলো নাইতে-খেতে এমন কি চোখের পাতা এক করতেও ভুলে গিয়েছিল।

কাজ কি একটুখানি? দেড় মণ চালের মুড়ি ভাজা হয়েছে এর ভেতর, আধ মণ ধানের খই। চিঁড়েও কোটা হয়েছে মণখানেক। তার ওপর তিলের নাড়ু, ক্ষীরের নাড়ু, মুগের নাড়ু, নারকেলের সন্দেশ-চন্দ্রপুলি-ছাপা, মুড়ি-চিঁড়ে-খইয়ের মোয়া—এসব তো আছেই।

লক্ষ্মীপুজোর দিন সকালবেলা উঠেই ঘরদোর ধোয়ামোছা শুরু করলেন স্নেহলতা। অবনীমোহন আর হেমনাথকে পুজোর বাজার করতে পাঠালেন সুজনগঞ্জের হাটে। বার বার বলে দিলেন হাটে গিয়ে যেন ফেরার কথা ভুলে না যান হেমনাথ। বিকেলের ভেতর এসে না পৌঁছলে পুজোই হবে না।

হেমনাথরা চলে গেলে স্নেহলতা সুধা সুনীতিকে ডাকলেন, 'এই যে দিদিভাইরা, তোদের কিন্তু আজ অনেক কাজ—'

সুধা সুনীতি বলল, 'কী কাজ দিদা?'

'চালের গুঁড়ো গুলে রেখেছি, তাই দিয়ে সারা বাড়ি আলপনা দিতে হবে।'

'ওরে বাবা—'

'কী হল?'

সুধা সুনীতি একসঙ্গে হাত নেড়ে বলতে লাগল, 'ওসব আমরা পারব না।'

'পারবি না কিরকম?' চোখ কুঁচকে স্নেহলতা তাকালেন। একটু অপ্রসন্নই হেয়েছেন তিনি, 'পারতেই হবে—'

'বা রে—'

'কী?'

'আমরা কোনওদিন আলপনা দিয়েছি নাকি?'

'না দিয়েছিস বেশ করেছিস। এখন দিতে হবে।' স্নেহলতা বলতে লাগলেন, 'কলকাতায় থেকে থেকে তো মেমসাহেব হয়ে উঠেছ। যতই যা-ই হও, নাচো আর গাও, উর্দু পড় আর ফারসি পড়—বাঙালির ঘরের মেয়ে তো। পুজোআর্চা, সংসারের কাজ, এ সব শিখতেই হবে। মেমসাহেবি করে দিন কাটালে চলবে না।'

সুধা সুনীতি কিছু বলল না।

স্নেহলতা আবার বললেন, 'আমার কাছে যখন এসেই পড়েছ তখন আর নিস্তার নেই। দুপুরবেলা আমি আলপনা দিতে বসব। দেখে দেখে শিখে নেবে, বুঝলে?'

সুধা-সুনীতি একসঙ্গে ঘাড় কাত করল, 'আচ্ছা।'

'আরেকটা কথা—'

'কী?'

'সকালবেলা কিছু খেয়েছিস?'

'না।'

'ভালই হয়েছে। কিছু খাস টাস নি। একেবারে পুজো হয়ে গেলে খাবি।'

সুধা সুনীতি আঁতকে উঠল, 'পুজো তো হবে সেই রাত্তিরে!'

স্নেহলতা তাকালেন, 'হ্যাঁ, তাতে কী হয়েছে?'

'অতক্ষণ উপোস দিয়ে থাকতে হবে?'

'কতক্ষণ আর, একটা বেলা তো মোটে।'

দুই বোনে নাকে-কান্না জুড়ে দিল, 'রাত পর্যন্ত না খেয়ে থাকলে মরে যাব, একেবারে মরে যাব।'

স্নেহলতা ওদের কান্ড দেখে হেসে ফেললেন, 'মরে যাবি কি বেঁচে থাকবি, দেখা যাবে'খন।'

সুধা সুনীতির কাঁদুনির মধ্যে স্নেহলতা গলা তুলে ডাকলেন, 'বিনু—বিনু—বিনুদাদা—'

ভেতর-বাড়ির উঠোনে দাঁড়িয়ে স্নেহলতারা কথা বলছিলেন, আর বাইরের দিকে দক্ষিণের ঘরের বারান্দায় বসে পড়ছিল বিনু। সেখান থেকে স্নেহলতাদের দেখতে পাচ্ছিল সে। কথাবার্তাও শুনতে পাচ্ছিল।

স্নেহলতার ডাক কানে যেতেই বিনু ছুটে এল। বলল, 'কী দিদা?'

'আজ আর পড়তে হবে না।'

বিনু ভারি খুশি, তার চোখ চকচক করতে লাগল।

স্নেহলতা বললেন, 'একটা কাজ করতে পারবি?'

কী কাজ না জেনেই বিনু তক্ষুনি রাজি। মাথা অনেকখানি হেলিয়ে বলল, 'হুঁ-উ উ—'

'হুঁ তো করলি। আমি যদি বলি আকাশের চাঁদ পেড়ে এনে দে, পারবি?'

'আহা—'

'আহা কী?'

'তুমি অমন কথা বলবেই না।'

'আমার ওপর খুব বিশ্বাস দেখছি।'

আবার আগের মতো ঘাড় কাত করল বিনু, 'হুঁ—'

স্নেহলতা এবার কাজের কথায় এলেন, 'একবার কুমোরপাড়ায় তোকে যেতে হবে দাদাভাই। বুধাই পালকে চিনিস তো? তাদের বাড়ি।'

'কেন?'

'আজ পুজো। লক্ষ্মীসরা আনতে হবে না?'

'লক্ষ্মীসরা কী দিদা?'

'কুমোরপাড়ায় গেলেই দেখতে পাবি। বুধাই পালকে বলবি, ভাল দেখে যেন সরা দেয়। বুঝলি?'

'আচ্ছা। এক্ষুনি যাব?'

'হ্যাঁ।' বলতে বলতে হঠাৎ কী মনে পড়ে গেল। একটু থেমে কী ভেবে নিলেন স্নেহলতা, তারপর বললেন, 'পাঠাব তো। কিন্তু যুগলটা ওদের সঙ্গে হাটে গেল।'

বেরুবার মুখে পাছে বাধা পড়ে যায়, সেই ভয়ে বিনু তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'বুধাই পালের বাড়ি আমি চিনি, ঠিক চলে যেতে পারব।'

কুমোরপাড়ায় দু'ভাবে যাওয়া যায়। নৌকোয় করে কিংবা পায়ে হেঁটে। হেঁটে গেলে অনেকখানি ঘুরতে হবে—সেই স্টিমারঘাট, বরফ কল, মাছের আড়ত বাঁয়ে ফেলে মাইলখানেক পাড়ি দিলে তবে কুমোরপাড়া। বিনু হেঁটে যাবার কথাই ভাবছিল।

স্নেহলতা বললেন, 'কিভাবে যাবি?'

'হেঁটে।'

'না—না। অতখানি রাস্তা হেঁটে যাওয়া-আসা সোজা নাকি! তোকে পাঠিয়ে শেষে একটা বিপদে পড়ি।'

বিনু কী বলতে যাচ্ছিল, এই সময় এ বাড়ির দ্বিতীয় কামলা করিম এসে হাজির। তাকে পেয়ে সমস্যাটার সমাধান হয়ে গেল।

স্নেহলতা বললেন, 'এই করিম, তোর এখন কী কাজ?'

করিম জানালো, বাগানের দক্ষিণ কোনায় যে লেবুবতী আমের গাছটা বাজে পুড়ে ভূতের চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সেটা কেটে ফেলতে হবে। হেমনাথ তা-ই বলে গেছেন। গাছটা কাটবার জন্য একটা কুড়ুল জোগাড় করতে ভেতর-বাড়িতে এসেছিল সে।

স্নেহলতা বললেন, 'এখন তোর গাছ কাটতে হবে না। বিনুকে নিয়ে নৌকোয় করে একটু কুমোরপাড়ায় যা।'

করিম চোখেমুখে ভয় ফুটিয়ে বলল, 'আরে সব্বনাশ।'

'কী হল?'

'গাছ না কাইটা অহন যদিন কুমারবাড়ি যাই, বড়কত্তায় আইসা আমারে শ্যাষ করব।'

pathagar.net

'কিছু করবে না। তুই যা।'

'আপনে কিন্তুক দায়ী রইলেন। বড়কত্তায় যদিন কিছু কয় আপনে আমারে বাচাইবেন।'

স্নেহলতা বললেন, 'আচ্ছা, সে ভাবনা তোকে করতে হবে না যা বলবার আমি তাকে বলব'খন।' বিনুকে বললেন, 'যা দাদাভাই ওর সঙ্গে—'

ছুটে দক্ষিণের ঘরের বারান্দায় চলে গেল বিনু। বইপত্র ছত্রাকার হয়ে ছিল। সেগুলো গুছিয়ে রেখে বেরুতে যাবে, সেই সময় কোত্থেকে ঝিনুক এসে পড়ল। তীক্ষ্ণ, ধারাল চোখে বিনুকে দেখতে দেখতে বলল, 'কোথায় যাচ্ছ?'

'কুমোরবাড়ি।' বলেই করিমের সঙ্গে চলতে শুরু করল বিনু।

'কেন?'

'লক্ষ্মীসরা আনতে।'

'আমি যাব তোমার সঙ্গে।'

'না।'

'হ্যাঁ যাব।'

মেয়েটা যেন আঠার মতো সব সময় পেছনে লেগে আছে। যেখানেই বিনু যাক, যা-ই করুক— তার চোখকে ফাঁকি দিয়ে কিচ্ছু হবার উপায় নেই। মনে মনে খুব বিরক্ত হচ্ছিল বিনু। বলল, 'না।'

ঝিনুক সঙ্গ ছাড়ল না। পেছনে ছুটতে ছুটতে বলতে লাগল, 'নিয়ে চল না, নিয়ে চল না—'

বিনুর সেই এক উত্তর, 'না।'

আশায় আশায় পুকুরঘাট পর্যন্ত এল ঝিনুক। কিন্তু যখন দেখল সে উঠবার আগেই বিনুরা তাড়াতাড়ি উঠে নৌকো ছেড়ে দিয়েছে তখন কেঁদে ফেলল। কাঁদতে কাঁদতে জড়ানো গলায় বলল, 'সেই কথাটা তোমার মাকে বলে দেব।'

সেই কথাটা বলতে জলে ডোবার ব্যাপারটা। বার বার একই অস্ত্র দেখিয়ে মেয়েটা তাকে হাতের মুঠোয় পুরে রাখবে, তা তো আর হয় না। তা ছাড়া অনেক দিন হয়ে গেছে, সেই ব্রহ্মাস্ত্রের ধারও আর তেমন নেই। তাচ্ছিল্যের সুরে বিনু বলল, 'বল গে—'

কুমোরপাড়ার কাছাকাছি আসতেই বিনুরা দেখতে পেল, খালপাড়ে কত নৌকো যে এসে জমেছে তার লেখাজোখা নেই।

বিনু অবাক। শুধলো, 'এত নৌকো কিসের করিম?'

করিম বলল, 'মনে লাগে, পিতিমা টিতিমা নিতে আইছে।'

খালের ধারে সারি সারি বউন্যা গাছ। তাদের একটার ডালে নৌকো বেঁধে করিম আর বিনু ওপরে উঠে এল।

কুমোরপাড়ায় ঢুকতেই দেখা গেল, মেলা বসে গেছে। দূরদূরান্ত থেকে কত মানুষ যে লক্ষ্মীসরা কিনতে এসেছে! পটুয়াদের ঘিরে ধরে সমানে তাড়া দিয়ে যাচ্ছে। কেউ বলছে, 'পালমশয়, আমারে আগে দ্যান—'

আরেক জন অমনি বলে উঠল, 'না পালমশয়, আমারে আগে। হেই ভোর রাইতে আইছি, বেলা দুফার হইতে চলল।'

অন্য একজন বলল, 'পালমশয়, আমার কথাখান বিবেচনা করেন। আমারে যাইতে হইব হেই গিরিগুঞ্জে। যাইতে যাইতে বিকাল হইয়া যাইব।'

পটুয়ারা কেউ বসে নেই, রং তুলি দিয়ে বড় বড় মাটির সরার উলটো পিঠে লক্ষ্মীর চিত্র এঁকে চলেছে। ঝড়ের গতিতে তাদের হাত চলছে। এত ব্যস্ততা যে হুঁকোতে দু'টো টান দেবারও ফুরসত পাচ্ছে না।

বুধাই পালের বাড়িতেও সেই একই দৃশ্য। তাকে ঘিরে প্রায় শ'খানেক লোক উদ্‌গ্রীব বসে আছে।

বুধাই পাল তার তিন ছেলেকে নিয়ে সরা চিত্তির করছিল। একা কেউ সবটা করছে না। কেউ হয়তো হাত-পা মুখ আঁকছে, কেউ চোখ ফোটাচ্ছে, কেউ প্যাঁচাটা বসাচ্ছে। প্রথম ছেলের হাত থেকে দ্বিতীয় ছেলের হাতে, তারপর তৃতীয় ছেলের হাত ঘুরে বাপের কাছে এসে ছবিটা সম্পূর্ণ হচ্ছে।

একেকটা সরা শেষ হলে তৎক্ষণাৎ সেটা কিনে নিয়ে একেক জন খদ্দের চলে যাচ্ছে।

বিনুরা একটুক্ষণ দাড়িয়ে থাকল। সরা থেকে যে চোখ তুলবে তেমন ফাঁকাই পাচ্ছে না বুধাই

পাল। পেলে নিশ্চয়ই তাদের দেখতে পেত।

কতক্ষণ আর দাঁড়িয়ে থাকা যায়? করিম হঠাৎ ডাকল, 'পালমশয়—'

এবার তাকাল বুধাই পাল। তাকিয়েই বিনুকে দেখে অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে পড়ল, 'ওরে ক্যাঠা আছস রে, একখান জলচকি লইয়া আয়। হ্যামকত্তার নাতি আইছে।'

তক্ষুনি একখানা জলচৌকি চলে এল। বিনুকে তার ওপর বসিয়ে বুধাই বলল, 'কী মনে কইরা নাতিবাব?'

বিনু বলল, 'লক্ষ্মীসরা নিতে এসেছি।'

অন্য কাজ ফেলে, সবাইকে বসিয়ে রেখে, খুব যত্ন করে একখানা সরা চিত্তির করল বুধাই পাল। গোটা সরাটা একাই আঁকল সে, ছেলেদের কিছুই করতে দিল না।

অন্য খদ্দেররা অসন্তুষ্ট। চাপা গলায় তারা বলতে লাগল, 'এইটা ক্যামন বিচার! আমরা এতক্ষণ বইসা আছি—'

বুধাই পাল বলল, 'বিচার টিচার বুজি না। হ্যামকত্তার নাতি আইছে। তারটা আগে কইরা দিতেই হইব। যদি তোমরা গুসা (রাগ) কর, আমার কিছুই করনের নাই।'

লোকগুলো কেউ আর কিছু বলল না।

সরাটা আঁকা হলে বিনুর হাতে দিতে দিতে বুধাই পাল বলল, 'ধরেন নাতিবাবু—'

হাতে নিয়ে বিনু অবাক। লক্ষ্মীর ছবিই না, বুধাই পাল সরার ওপর দুর্গা মূর্তিও এঁকেছে। অবশ্য কার্তিক-গণেশ-সরস্বতীর মতো লক্ষ্মীও তাতে আছে। বিনু বলল, 'এ কি, এটা যে দুর্গা ঠাকুর!'

বুধাই পাল হাসল, 'হ, দুগ্‌গাঠাকুরই। কোজাগরীতে আপনের দাদুর বাড়িত্ এই সরাই পূজা হয়।'

'কিন্তু—'

'কী?'

'আমি দেখলাম, কাউকে কাউকে শুধু লক্ষ্মী এঁকে দিলেন—'

'তাগো হেই নিয়ম। হ্যামকত্তার বাড়ির নিয়ম হইল কোজাগরীতে দুগ্‌গামূত্তি পূজা। আপনে নিচ্চিন্ত মনে লইয়া যান—'

লক্ষ্মীসরা নিয়ে বাড়ি ফিরতে ফিরতে দুপুর। পুকুরঘাটে নেমে বাগান আর বাইরের দিকের উঠোন পেরিয়ে সবে বিনু ভেতর-বাড়িতে পা দিয়েছে, সুরমা ছুটতে ছুটতে এসে তার কান টেনে ধরলেন, 'হারামজাদা বাঁদর—'

এইরকম একটা অভ্যর্থনা কল্পনাই করে নি বিনু। প্রথমটা হতভম্ব, তার পরেই চেঁচিয়ে উঠল, 'কী করেছি আমি? কী করেছি?'

'কী করেছি?' বলেই এক চড় কষালেন সুরমা, 'কেন, কেন তুই ঝিনুককে নিয়ে গেলি না? জানিস না মেয়েটার কত কষ্ট!'

বিনু লক্ষ করল, মায়ের ঠিক পিছনেই ঝিনুক দাঁড়িয়ে। রাজদিয়াতে আসার দিন থেকেই মেয়েটার প্রতি মায়ের পক্ষপাতিত্ব। নিশ্চয়ই এমন করে সে লাগিয়েছে যাতে মা রেগে গেছেন।

ঝিনুকের দিকে তাকিয়ে মাথার ভেতরটা যেন জ্বালা করতে লাগল বিনুর, তারপরেই লজ্জায় অপমানে চোখের মণিদু'টো ফেটে জল বেরিয়ে এল।

আরও দু'-চারটে চড়টড় হয়তো পড়ত, তার আগেই এ ঘর ও ঘর থেকে সুধা-সুনীতি-স্নেহলতা-শিবানী—সবাই ছুটে এলেন। সুরমার হাত থেকে বিনুকে ছাড়িয়ে নিতে নিতে স্নেহলতা বকাবকি করতে লাগলেন, 'এই পুজোর দিনে ছেলেটার গায়ে হাত তুললি! কী যে তোদের রাগ, বুঝি না।' ঝিনুককে দেখিয়ে বললেন, 'আর ওই এক মেয়ে হয়েছে—'

সন্ধের পর চন্দনের পাটার মতো কোজাগরীর পরিপূর্ণ চাঁদ উঠল। আলোয় আলোয় চরা র ভেসে যেতে লাগল। তার একটু পর এল পুরুত। আয়োজন সম্পূর্ণ করে রেখেছিলেন স্নেহলত । পুরুত এসেই পুজোয় বসে গেল।

পুজোটুজো হয়ে গেলে প্রসাদ বিতরণের পালা। রাতদুপুর পর্যন্ত রাজ্যের লোক এসে প্রসাদ খে র গেল।

একটা ব্যাপার বিনু লক্ষ করেছে, দুপুরবেলা সেই মারধোরের পর থেকে সারাদিন অপরাধীর মতো মুখ করে তার পেছনে ঘুর ঘুর করেছে ঝিনুক। বিনু কিন্তু নিজের মনকে পাষাণ করে ফেলেছে, একটি কথাও বলে নি। চোখাচোখি হলে তক্ষুনি অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। যতই ঘুরুক, যতই মুখ চুন করে থাকুক, বিনু আর তার দিকে ফিরেও তাকাচ্ছে না।

রাত্রিবেলা এক বিছানায় শুয়ে ঝিনুক ফিসফিস করে ডাকল, 'বিনুদাদা—'

বিনু সাড়া দিল না।

ঝিনুক বলতে লাগল, 'আর কক্ষনো মাসিমার কাছে তোমার নামে কিচ্ছু বলব না।'

বিনু এবারও চুপ।

ঝিনুক কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, 'তুমি আমার সঙ্গে কথা বলবে না?'

উত্তর না দিয়ে বিনু ঝিনুকের দিক থেকে এ পাশ ফিরে শুল।

লক্ষ্মীপুজোর পরদিন বিনুদের কেতুগঞ্জে যেতে হল।

দুপুরবেলা খাওয়া দাওয়ার পর বিনু-ঝিনুক-অবনীমোহন-সুধা-সুনীতি-হেমনাথ আর সুরমা নৌকোয় উঠলেন। নৌকোটা বেয়ে যাবে যুগল আর করিম।

বিনুরা রাজদিয়া আসবার দিনটি থেকে মজিদ মিঞা কতবার যে হেমনাথের বাড়ি এসেছে তার হিসেব নেই। যতবার এসেছে ততবারই অবনীমোহনকে বলেছে, 'আমাগো বাড়িত্ কবে যাইবেন মিতা?'

অবনীমোহন বলেছেন, 'শিগ্‌গিরই একদিন যাব।'

'যাব যাব' করেও যাওয়া হচ্ছিল না, রোজই একটা না একটা বাধা এসে পড়ছিল। শেষ পর্যন্ত মজিদ মিঞা ক্ষোভে-দুঃখে রাজদিয়া আসা বন্ধই করে দিয়েছে। তার অভিমান ভাঙাবার জন্য আজ অবনীমোহনের না বেরিয়ে উপায় ছিল না।

চারদিকে অথৈ জলের মাঝখানে কেতুগঞ্জ গ্রামটা দ্বীপের মতো ভেসে আছে। মাইলের পর মাইল ধানবন, পদ্মবন, শাপলাবন আর জলমগ্ন প্রান্তর পেরিয়ে বিনুরা যখন সেখানে পৌঁছল, রোদের রং বদলে হলুদ হয়ে গেছে। হাওয়ায় টান ধরতে শুরু করেছে। সূর্যটা পশ্চিমের আকাশ বেয়ে অনেকখানি নেমে এসেছে। এখন বিকেল।

আগে থেকেই খবর দেওয়া ছিল। যুগলরা ঘাটে নৌকো ভেড়াতেই মজিদ মিঞা ছুটে এল। তার পেছনে নতুন জামা টামা পরা একদল ছেলেমেয়ে, নাক পর্যন্ত ঘোমটা টানা এক প্রৌঢ়া, চোদ্দ পনের বছরের এক কিশোরীও এসেছে। তাদের সঙ্গে এসেছে এক বৃদ্ধ, গায়ের চামড়া তার কোঁচকানো, চুল পাটের ফেঁসোর মতো, চোখে পুরু সরের মতো ছানি, ঠোঁট দু'টি কিন্তু পানের রসে টুকটুকে—যেন টিয়াপাখির ঠোঁট।

পরম সমাদরের গলায় মজিদ মিঞা বলল, 'আসেন আসেন।' সুধা-সুনীতি-বিনুর দিকে তাকিয়ে বলল, 'আসো গো মায়েরা, বাবারা—'

একে একে বিনুরা নৌকো থেকে নামল। সবার শেষে নামলেন অবনীমোহন। তাঁর একখানা হাত ধরে মজিদ মিঞা বলল, 'আপনে না আইলে কিন্তুক আমি আর যাইতাম না।'

হাসতে হাসতে অবনীমোহন বললেন, 'তা তো জানি, সেই জন্যেই চলে এলাম।'

বাড়ির দিকে যেতে যেতে সবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল মজিদ মিঞা। নতুন জামা-পরা বাচ্চাগুলো তারই ছেলেমেয়ে। তাদের কারোর নাম রাশেদ, কারোর মতিয়া, কারোর ওসমান, কারোর কামরণ। বিনুরা আসবে বলেই তাদের সাজসজ্জার এমন ঘটা। নতুন জামা টামা পরে সেই সকাল

থেকে বসে আছে।

ঘোমটা-ঢাকা প্রৌঢ়াটির নাম নছিরণ—মজিদ মিঞার বিবি। তার হাত দু'টোই শুধু দেখা যাচ্ছে, তাতে রুপোর কঙ্কণ আর চুড়ি, কোমরে রুপোর ভারী গেট। বৃদ্ধটি মজিদ মিঞার মা। চোদ্দ পনের বছরের সেই কিশোরীটি তার মেয়ে, নাম রহিমা।

হঠাৎ কী মনে পড়তে অবনীমোহন তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, 'আচ্ছা মিতা—'

মজিদ মিঞা উন্মুখ হল, 'কী ক'ন?'

'আমরা যেদিন প্রথম রাজদিয়া আসি সেদিন শুনেছিলাম কার সঙ্গে যেন জমি নিয়ে আপনার ঝগড়া হয়েছে। মামাবাবু সে ঝগড়ার মীমাংসা করে দিয়েছিলেন। ঠিক হয়েছিল, যার সঙ্গে ঝগড়া তার ছেলের সঙ্গে আপনার মেয়ের বিয়ে হবে। আপনার সেই মেয়ে কোনটি?'

'এই যে—' বলে পেছন ফিরে মজিদ মিঞা ডাকতে লাগল, 'রহিমা কই রে, রহিমা—'

সেই কিশোরীটি একটু পেছনে পড়ে গিয়েছিল, ডাক শুনে সামনে এগিয়ে এল।

প্রথমটা রহিমাকে ভাল করে লক্ষ করে নি বিনু। এবার পরিপূর্ণ চোখে তাকাল। রহিমার গড়ন গোল গোল, গায়ের রং কাঁচা হলুদের মতো, নাকটি একটু বোঁচাই হবে। চোখ দু'টি ভারি সরল আর নিষ্পাপ। জগতের সব কিছুর দিকে তাকিয়ে সে দু'টি যেন সর্বক্ষণ অবাক হয়ে আছে। নাকে তার সোনার বেশর, কানে কানফুল। হাতের সোনার চুড়ি গায়ের রঙের সঙ্গে মিশে গেছে।

মজিদ মিঞা বলল, 'এই মাইয়ার লগে নবু হালার পোলার শাদি দিমু।'

বিয়ের কথায় রহিমা ছুটে পালিয়ে গেল

মজিদ মিঞা আবার বলল, 'শাদির সোময় আপনেরে আসতে হইব কিলাম। কথা দিছিলেন।'

'নিশ্চয়ই। আমার মনে আছে।'

মজিদ মিঞার বাড়িখানা বেশ পরিচ্ছন্ন। ঢালা বড় একটা উঠোন ঘিরে ক'খানা বড় বড় তিরিশের বন্দ'র টিনের ঘর। উঠোনে মোটা মোটা আউশ ধান টাল হয়ে রয়েছে। রাজ্যের পায়রা আর শালিক এসে সোনার দানার মতো শস্য খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে। দেখেই মনে হয় সম্পন্ন গৃহস্থের বাড়ি।

বাড়ি এসে মজিদ মিঞা কী করবে, অবনীমোহনদের কোথায় বসাবে যেন ঠিক করে উঠতে পারল না। নিজেই ছুটে গিয়ে একখানা নকশা-করা চিকন্দি পেতে দিল। জলচৌকি আর হাতল-ভাঙা খানকতক চেয়ার টেনে নিয়ে এল।

তারপর বাকি দিনটা শুধু গল্প, ঠাট্টা-ঠিসারা, হাসাহাসি। ফাঁকে ফাঁকে কতবার কত রকমের খাবার যে এল!

বিনুদের আসার খবর কেমন করে রটে গিয়েছিল। কেতুগঞ্জের মুসলমান পাড়া ভেঙে কত লোক যে তাদের দেখে গেল।

মজিদ মিঞার বাড়ি থেকে ছাড়া পেয়ে বিনুরা যখন রাজদিয়া ফিরল তখন নিশুতি রাত।

লক্ষ্মীপুজোর পর থেকেই রাজদিয়ায় ভাটার টান ধরেছে। যে প্রবাসী সন্তানেরা কয়েক দিনের জন্য এসে শহর সরগরম করে তুলেছিল একে একে স্টিমারে করে তারা চলে যেতে লাগল। কেউ গেল আসামে, কেউ বার্মায়, তবে অধিকাংশরই গন্তব্য কলকাতা।

এর মধ্যে একদিন শিশিররা এলেন। সবাই এসেছেন—শিশির স্মৃতিরেখা রুমা ঝুমা আনন্দ।

খানিক এ গল্প সে গল্পের পর শিশির বললেন, 'আমরা কাল চলে যাচ্ছি জেঠিমা—'

স্নেহলতা বললেন, 'কালই যাবি?'

'হ্যাঁ।'

pathagar.net

'এক বছর পর তো এলি। ক'টা দিনই বা বাড়িতে থাকলি!'

'কী করব। চাকরি করি, যেতেই হবে। ছুটিও আর নেই। নিয়মমতো দশমী পর্যন্ত ছুটি, তার পরও এ ক'দিন থেকে গেলাম। আর থাকলে চাকরিটা যাবে।'

শিশিররা কথা বলছিলেন। শুনতে শুনতে হঠাৎ বিনুর চোখে পড়ল, আনন্দ সুনীতিকে কী যেন ইশারা করছে।

একটু পর সুনীতি বেরিয়ে বাগানের দিকে গেল। তার কিছুক্ষণ পর আনন্দও বেরিয়ে পড়ল। উঠোনে খানিক ঘোরাঘুরি করে সেও বাগানের রাস্তা ধরল।

বিনু আর বসে থাকতে পারল না। বিচিত্র এক কৌতূহল যেন তাকে ঘিরে ধরছিল। একসময় সেও উঠে পড়ল।

আশ্বিন মাসের শেষ তারিখে ছিল লক্ষ্মীপুজো। লক্ষ্মী ভাসানের দিন থেকে কার্তিক মাস পড়েছে। আজ তেসরা কার্তিক।

সবে কার্তিকের শুরু, এরই মধ্যে বিকেলের হাওয়ায় হিমের ছোঁয়া টের পাওয়া যায়। রোদের রংও গেছে বদলে। শিউলি ফুলের বোঁটার মতো উজ্জ্বল হলদে আভা আর তাতে নেই, বাসি হলুদের মতো তা মলিন।

বাগানে এসে বিনু দেখতে পেল, সূর্যটা রক্তিম গোলকের মতো পশ্চিম আকাশের ঢাল বেয়ে গড়িয়ে অনেকখানি নেমে গেছে। বাগানের ভেতর এখন ঘন ছায়া। মাথার ওপর ডালপালা আর পাতার চাঁদোয়া, তার ফাঁক দিয়ে টুকরো টুকরো রোদ এসে হাওয়ায় দুলছে।

এই তো বিকেল হল। এরই ভেতর পাখিরা ফিরে আসতে শুরু করেছে। কেউ সারাদিন আকাশে সাঁতার কেটেছে, কেউ মাঠে মাঠে শস্যকণা খুঁজেছে। ক্লান্ত পাখিরা এখন বাগানের গাছে গাছে তাদের সাধের বাসায় ডানা ঝাপটাচ্ছে, কিচিরমিচির করছে। চেঁচামেচিতে চারদিক মুখর।

বাগানে এসে বিনু পাখিদের দিকে তাকল না, অনুজ্জ্বল মলিন রোদ লক্ষ করল না, হিমেল হাওয়ার কথা ভাবল না। সে শুধু চনমন চোখে চারদিকে খুঁজতে লাগল। এইটুকু সময়ের ভেতর আনন্দ আর সুনীতি গেল কোথায়?

বেশিক্ষণ খোঁজাখুঁজি করতে হল না। উত্তর দিকে যে বেতবন রয়েছে তার গায়ে ঝাঁকড়া-মাথা একটা পিটক্ষীরা গাছ। গাছটার অনেকগুলো মোটা মোটা শেকড় মাটির ওপর ছড়িয়ে আছে। দু'টো শেকড়ে মুখোমুখি বসে রয়েছে সুনীতি আর আনন্দ।

জায়গাটা আড়াল মতো। পা টিপে টিপে বিনু পিটক্ষীরা গাছটার কাছে চলে এল। এমনভাবে দাঁড়াল যাতে সুনীতিরা তাকে দেখতে না পায়।

আনন্দ বলছিল, 'কালই আমরা চলে যাচ্ছি।'

মৃদু আধফোটা গলায় সুনীতি বলল, 'সে তো শুনলাম। আপনার জামাইবাবু তখন বললেন।'

আনন্দ বলল, 'তুমি কিছু বলবে না?'

দূরে দাঁড়িয়ে বিনু অবাক। আনন্দ তো বড়দিকে 'আপনি' বলত, সম্ভাষণের ভাষাটা কবে থেকে বদলে গেল কে জানে।

সুনীতি আগের স্বরেই বলল, 'আমি কী বলব?'

'বা রে, চলে যাচ্ছি। ভালমন্দ কিছু বলবে না?'

সুনীতি উত্তর দিল না।

একটু ভেবে আনন্দ বলল, 'আবার কবে দেখা হবে?'

সুনীতি বলল, 'তা কী করে বলি—'

'তোমরা কলকাতায় যাচ্ছ কবে?'

'বলতে পারছি না।'

'তবু?'

'পুজোর ছুটি শেষ না হলে দাদু বোধহয় যেতে দেবেন না।'

'কোন পুজোর ছুটি? স্কুল-কলেজের, না অফিস-টফিসের?'

pathagar.net

'স্কুল কলেজের।'

ঈষৎ হতাশার সুরে আনন্দ বলল, 'ওরে বাবা, সে তো এখনও অনেক দিন! সেই ভাইফোঁটার পর শেষ হবে।'

সুনীতি আস্তে ঘাড় কাত করল।

'ততদিন তা হলে দেখা হবার সম্ভাবনা নেই?'

'তাই তো মনে হচ্ছে।'

একটু নীরবতা। তারপর আনন্দ বলল, 'আমার খুব খারাপ লাগছে, খুব খারাপ।'

মৃদু কণ্ঠস্বরে সুনীতি বলল, 'আমারও খুব ভাল লাগছে না।'

'তোমরা কিন্তু স্বচ্ছন্দে কালই আমাদের সঙ্গে কলকাতায় যেতে পারতে।'

'ও ব্যাপারে আমার কোনও হাত নেই।'

চিন্তাগ্রস্তের মতো আনন্দ বলল, 'তা বটে।'

সুনীতি কিছু বলল না।

আনন্দ আবার বলল, 'তোমাদের কলকাতার ঠিকানা কী?'

সুনীতি ঠিকানা জানিয়ে দিল।

আনন্দ বলল, 'ঠিকানা নিলাম, তোমাদের বাড়ি কিন্তু যাব।'

'নিশ্চয়ই আসবেন।'

'কেউ কিছু মনে করবে না তো?'

'কারোর মনে করাকরিতে আপনার কিছু যাবে আসবে?'

'তার মানে?'

সুনীতি লীলাভরে ঘাড় বাঁকিয়ে হাসল, 'মানে আসবেন, যখন খুশি আসবেন।'

আনন্দ বলল, 'সে তো অনেক দেরি। মাঝখানের এই দিনগুলো—'

'কী?'

'কেমন করে কাটবে?'

'আমাকে দেখার আগে যেমন করে কাটত।'

'উঁহু—'

'কী?'

'তা আর হয় না।'

চোখের তারায় কেমন করে যেন হাসল সুনীতি। বলল, 'কেন মশাই?'

আনন্দ বলল, 'বুঝতে পারছ না?'

'না।'

'সত্যি?'

'হুঁ—'

'তা হলে কারণটি বলি?'

'বলতে হবে না।'

একটু চুপ। তারপর কী ভেবে আনন্দ বলল, 'ভাবছি কলকাতায় গিয়ে একটা কাজ করব।'

সুনীতি জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল, 'কী?'

আনন্দ বলল, 'তোমাকে রোজ একখানা করে চিঠি লিখব।'

সুনীতি চমকে উঠল, 'ও মা, না না—' তারপর দু'হাত এবং মাথা একই সঙ্গে জোরে জোরে প্রবলবেগে নেড়ে বলতে লাগল, 'কিছুতেই না, কিছুতেই না। চিঠি টিঠি লিখবেন না।'

'কেন লিখব না?'

'সবাই কী ভাববে!'

'যা সত্যি তাই ভাববে।'

'না না, আমি ভারি লজ্জায় পড়ে যাব। কারোর মুখের দিকে তাকাতে পারব না। আর সুধাটা তো'

pathagar.net

'সুধা কী?'

'আমাকে একেবারে পাগল করে ছাড়বে।'

আনন্দ আর সুনীতির বাকি কথাগুলো আর শোনা হল না। তার আগেই পাশ থেকে কে ডেকে উঠল, 'বিনুদা—'

চমকে পেছন ফিরতেই বিনু দেখতে পেল, ঝুমা। চোখাচোখি হতেই মেয়েটা হাসল, 'এখানে কী করছ?'

ইঙ্গিতে আনন্দ সুনীতিকে দেখিয়ে ঠোঁটের ওপর আঙুল রাখল বিনু। নিচু গলায় বলল, 'চুপ।'

ঝুমাটা ভারি চালাক। চট করে ব্যাপারটা বুঝে নিয়ে ফিসফিস গলায় বলল, 'লুকিয়ে লুকিয়ে ওদের কথা শুনে কী হবে? চল আমরা ওদিকে যাই।'

আনন্দ সুনীতি এত তন্ময়, নিজেদের নিয়ে এতই মগ্ন যে বিনুদের অস্তিত্ব টের পেল না। বিনু শুধলো, 'ওধারে কোথায় যাবে?'

এদিক ওদিক দেখে ঝুমা বলল, 'চল, পুকুরঘাটে গিয়ে বসি।'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও ঝুমার সঙ্গে যেতে হল। শান-বাঁধানো পুকুরঘাটে এসে জলে পা ডুবিয়ে পাশাপাশি বসল দু'জন।

পুকুরের ওপারে ধানের খেত। এই তো সেদিন বিনুরা রাজদিয়া এল। পুরোপুরি একটা মাসও হয় নি। তখন ধানগাছগুলো সবে শিষ ছাড়তে শুরু করেছে। আর এখন, কার্তিকের এই শুরুতে? পাতা আর দেখা যায় না। ধানের মঞ্জরীতে মঞ্জরীতে চারদিক ছেয়ে গছে। সবুজ তুষের ভেতর এখন অবশ্য দুধ জমছে, একটু টিপলেই বেরিয়ে আসে। ক'দিন পর আর এই দুধ থাকবে না, ঘন হয়ে জমাট বেঁধে একেক দানা শস্য হয়ে যাবে—মানুষের বাঁচার আশ্বাস, তার সঞ্জীবনী।

এখনও মাঠ জুড়ে সবুজের সমারোহ। যুগল বলেছে, ক'দিন পর অঘ্রাণ পড়লেই এ রং থাকবে না। ধান পেকে মাঠের ঝাঁপি সোনালি লাবণ্যে ভরে যাবে।

পা দিয়ে জলে ঢেউ তুলতে তুলতে ঝুমা ডাকল, 'বিনুদা—'

দূর ধানখেতের দিকে তাকিয়ে বিনু আনন্দ আর সুনীতির কথা ভাবছিল। ঝুমার ডাকে অন্যমনস্কের মতো সাড়া দিল।

ঝুমা বলল, 'আমার কিন্তু খুব মন কেমন করবে।'

'কেন?'

'কেন আবার, তোমার জন্যে।'

বিনু উত্তর দিল না।

ঝুমা এবার বলল, 'সেদিন নৌকোয় করে আমরা ফুল তুলতে গিয়েছিলাম—'

'হুঁ—'

'তুমি কাউফল পাড়তে গিয়ে জলে ডুবে গিয়েছিলে—'

'হুঁ—'

'তারপর পুজোর সময় পাশাপাশি বসে থিয়েটার দেখলাম—'

'হু—'

'মাঝরাত্তিরে নৌকো চড়ে যুগলের সঙ্গে সুজনগঞ্জে যাত্রা শুনতে যাওয়া—'

'হুঁ—'

'কলকাতায় গিয়ে এই সব খুব মনে পড়বে।'

বিনু কিছু বলল না, আস্তে আস্তে মাথা নাড়ল।

ঝুমা বলল, 'তোমরা কলকাতায় যাবে না?'

বিনু বলল, 'যাব না মানে? ছুটির পর স্কুল খুললেই অ্যানুয়াল পরীক্ষা। এখানে বসে থাকলে পরীক্ষা দেব কী করে?'

'তা তো ঠিকই। তোমরা কবে যাচ্ছ?'

'অক্টোবরের বাইশ তারিখে স্কুল খুলবে, তার আগেই যাব।'

pathagar.net

'কলকাতায় গেলে আমাদের বাড়ি আসবে তো?'

'যাব।'

'আমাদের বাড়ি হেদোর কাছে, বত্রিশ নম্বর রামকান্ত চাটুজ্যে লেন।'

বিনু কী বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই বাড়ির ভেতর থেকে ডাক এল, 'কোথায় গেলি রে তোরা? এই বিনুদাদা—ঝুমাদিদি—শিগগির বাড়ি আয়—'

হেমনাথের গলা। বিনু বলল, 'চল, বাড়ি যাই। দাদু ডাকছে।'

যেতে যেতে ঝুমা বলল, 'আমাদের বাড়ি যাবার কথা মনে থাকে যেন। তুমি আবার বড্ড ভুলে যাও।'

'ভুলব না। তবে—'

'কী?'

'আমি তো একা একা অতদুর যেতে পারব না। বাবাকে বলব, না নিয়ে গেলে কিন্তু যাওয়া হবে না।'

ভুরু কুঁচকে বিনুর দিকে তাকাল ঝুমা। গলার স্বরে ধিক্কার মিশিয়ে বলল, 'কী ছেলে তুমি! ভবানীপুর থেকে দু'নম্বর দোতলা বাসে উঠবে, সোজা হেদোয় এসে নামবে।' একটু ভেবে বলল, 'ঠিক আছে, তোমাকে আগে যেতে হবে না। আমরাই আগে তোমাদের বাড়ি যাব।'

'কার সঙ্গে যাবে?'

'কার সঙ্গে?' চোখের পাতা নাচাতে নাচাতে ঝুমা বলল, 'আমার মামার সঙ্গে। তখন শুনলে না, সুনীতিদিদিকে মামা বলছিল, তোমাদের বাড়ি যাবে। মামা গেলেই আমি তার পিছু নেব।'

'সেই ভাল।'

একটু চুপ করে থেকে ঝুমা বলল, 'আচ্ছা বিনুদা—'

'কী?'

'সুনীতিদিদির সঙ্গে মামার খুব ভাব, না?'

'হুঁ—'

ঘাড় কাত করে ঝুমা এবার বলল, 'তোমার সঙ্গে আমারও খুব ভাব—'

বিনু উত্তর দিল না। আড় চোখে একবার ঝুমাকে দেখে নিল।

বাড়ি ফিরবার পর ঝুমারা বেশিক্ষণ থাকল না। সন্ধে নামতে না নামতেই চলে গেল।

যাবার সময় হেমনাথ বললেন, 'তোরা কাল দুপুরের স্টিমারে যাচ্ছিস তো?'

শিশির বললেন, 'হ্যাঁ।'

'যদি পারি স্টিমারঘাটে যাব।'

'আবার কষ্ট করে—'

'কষ্ট আর কি—'

pathagar.net

দিন দুই আগে কোজাগরী পূর্ণিমা গেছে। তার রেশ এখনও রয়েছে। সন্ধের ঠিক পরেই আকাশের গা বেয়ে রুপোর থালার মতো চাঁদ উঠে এল। চারদিকে—বাগানে, ধানখেতে, পুকুরের শান্ত স্থির টলটলে জলে জ্যোৎস্নার বান ডাকল। পাখিদের আর সাড়াশব্দ নেই, সারাদিনের ক্লান্তিমাখা দেহে তাদের ঘুম নেমে এসেছে। বিকেলবেলা থেমে থেমে ঝিঁঝিরা ডাকছিল, এখন আর মাঝখানে ছেদ নেই। একটানা তাদের কণ্ঠসাধনা চলছে।

ঝুমারা খানিক আগে চলে গেছে। অবনীমোহন বললেন, 'বিনু-ঝিনুক-সুধা-সুনীতি, তোরা সব পড়তে বসে যা।'

দক্ষিণের ঘরের বারান্দায় পাটি পেতে দু'খানা হোরিকেন জ্বেলে চারজনে পড়তে বসল। বিনুর দেখাদেখি হিংসেয় হিংসেয় আজকাল ঝিনুকও পড়তে বসে।

বিনুর কাছাকাছি বসে ছিল ঝিনুক। কিছুক্ষণ পড়ার পর সবার কান বাঁচিয়ে ঝিনুক ডাকল, 'বিনুদাদা।'

পড়ার বই থেকে মুখ তুলল বিনু, 'কী বলছ?'

'তখন তোমরা কী করছিলে?'

সেদিন লক্ষ্মীসরা আনতে যাবার সময় ঝিনুককে সঙ্গে নেয় নি, সে জন্য মায়ের হাতে মার খেতে হয়েছিল। সেই থেকে ঝিনুকের সঙ্গে বিশেষ কথা বলে না বিনু, মনে মনে মেয়েটার ওপর খুব রেগে আছে। নিস্পৃহ সুরে সে বলল, 'কখন?'

'বিকেলবেলা।' ঝিনুক বলতে লাগল, 'তুমি আর ঝুমা পুকুরঘাটে পা ডুবিয়ে বসে ছিলে, সেই তখন?'

বিনু চমকে উঠল, 'তুমি আমাদের দেখেছ?'

'হ্যাঁ।' ঝিনুক বলতে লাগল, 'প্রথমে সুনীতিদিদি গেল, তার পেছন পেছন গেল আনন্দদাদা। আনন্দদাদার পর তুমি গেলে, তারপর ঝুমা। ঝুমার পিছু পিছু আমি গেলাম।'

অবাক বিস্ময়ে বিমূঢ়ের মতো তাকিয়ে থাকল বিনু।

ঝিনুক থামে নি, 'তখন তোমরা কী করছিলে, বল না—'

বিনু আস্তে করে বলল, 'গল্প করছিলাম।'

'কী গল্প?'

'সে অনেক রকম।'

'হোক অনেক রকম, তুমি বল।'

বিনু বলল, 'অত আমার মনে নেই।'

ঝিনুক নাছোড়বান্দা, 'যা আছে তাই বল।'

একটু ভেবে নিয়ে বিনু বলল, 'ঝুমারা তো কাল কলকাতা চলে যাবে। আমরাও ক'দিন পর যাচ্ছি। ঝুমা বলছিল, কলকাতায় গেলে ওদের বাড়ি যেতে, ওরাও আমাদের বাড়ি আসবে। এই সব—'

হঠাৎ আলো নিবে গেলে যেমন হয়, ঝিনুকের মুখখানা নিমেষে সেই রকম মলিন হয়ে গেল। চোখ দু'টি কেমন যেন ব্যথিত আর করুণ। কাঁপা, শিথিল গলায় সে বলল, 'তোমরা কলকাতায় চলে যাবে!'

'বা রে, আমরা এখানে সারা জীবন থাকতে এসেছি নাকি?'

মুখখানা আরও বিষণ্ণ হয়ে গেল ঝিনুকেরা। নীলকান্ত মণির মতো চোখের তারাদু'টো জলে ডুবে যেতে লাগল।

এই মেয়েটার জন্য ক'দিন আগে যে মার খেতে হয়েছিল তা আর মনে থাকল না বিনুর। ঝিনুকের জন্য হঠাৎ অত্যন্ত মমতা বোধ করল সে। গাঢ় গলায় বলল, 'তুমি কাঁদছ!'

ঝিনুকের চোখ থেকে পোখরাজের দানার মতো জলের বিন্দুগুলি টপ টপ করে ঝরতে লাগল। বিনুর দিকে সে আর তাকিয়ে থাকতে পারছিল না আপনা থেকেই তার মাথাটা নীচের দিকে নেমে গেল।

বিনু ভীষণ বিব্রত বোধ করছিল। সবার কান বাঁচিয়ে যতখানি সম্ভব চাপা গলায় বলতে লাগল, 'এই বোকা মেয়ে, কাঁদে না।'

ঝিনুকের কান্না থামল না। শব্দ করে সে অবশ্য কাঁদছে না, নীরবে পোখরাজের দানাগুলো বিরামহীন ঝরেই যাচ্ছে।

বিনু আবার বলল, 'আরে বাপু, এক্ষুনিই তো আমরা চলে যাচ্ছি না, আরও কিছুদিন থাকব।'

পরের দিন দুপুরবেলা শিশিরদের বিদায় জানাবার জন্য হেমনাথ স্টিমারঘাটে গেলেন। তাঁর সঙ্গে সুনীতি ঝিনুক আর বিনু।

শিশিররা ততক্ষণে এসে গেছেন। তাঁদের সঙ্গে এসেছেন রামকেশব আর তাঁর স্ত্রী, অর্থাৎ শিশিরের বাবা-মা।

শিশিররা এখনও স্টিমারে ওঠেন নি, জেটিতে দাঁড়িয়ে ছিলেন। শিশিরের মা খুব কাঁদছিলেন

আর আঁচলে ঘন ঘন চোখ মুছছিলেন। রামকেশবের চোখদু'টিও ফোলা ফোলা, ঈষৎ আরক্ত। বোঝা যায়, গোপনে তিনিও কেঁদেছেন। দীর্ঘ এক বছরের জন্য ছেলে কলকাতায় চলে যাচ্ছে, বিদায়ের সময় কেউ আর স্থির থাকতে পারছেন না।

শিশির-স্মৃতিরেখা-রুমা, কারোর চোখই শুকনো নেই। সবাই ভারাক্রান্ত, বিষাদমলিন। রামকেশব এবং তাঁর স্ত্রীর কান্না ওদের মধ্যেও সঞ্চারিত হয়েছে।

হেমনাথ বললেন, 'খুব তো কান্নাকাটি চলছে। স্টিমার ক'টায় ছাড়বে হুঁশ আছে?'

শিশির যেন সময় সম্বন্ধে এতক্ষণে সচেতন হলেন। বললেন, 'সোয়া বারটায়—' বলেই পকেট থেকে চেনে-বাঁধা ঘড়ি বার করলেন, 'ইস, বারটা বাজে! আর মোটে পনের মিনিট সময় হাতে আছে।'

হেমনাথ বললেন, 'বেশ মানুষ তোরা! মালপত্র স্টিমারে তুলতে হবে না? টিকিট কাটা হয়েছে?'

শিশির জানালেন, 'টিকিটটা কালই করে রাখা হয়েছে।'

'কিসে যাচ্ছিস, ডেকে না কেবিনে?'

'ডেকে।'

'মালপত্র তুলবার ব্যবস্থা কর। ছেলেপুলে নিয়ে যাবি, হাত-পা ছড়িয়ে বসবার শোবার মতো খানিকটা জায়গা তো চাই। একটা রাতের মতো স্টিমারে থাকতে হবে।'

অতএব হিন্দুস্থানী কুলিদের ডাক পড়ল। মালপত্র মাথায় নিয়ে তারা স্টিমারের দিকে ছুটল। সবাইকে সঙ্গে করে হেমনাথও স্টিমারে এলেন। তাঁর নির্দেশমতো চারদিকে বাক্স-ট্রাঙ্ক-টিফিন ক্যারিয়ার, এইসব নামিয়ে রেখে কুলিরা ডেকের অনেকখানি জায়গা দখল করে ফেলল। মাঝখানে পেতে দিল ঢালা বিছানা।

হেমনাথ বললেন, 'সাবধানমতো যাবি, কলকাতায় গিয়েই পৌঁছ-সংবাদ দিয়ে চিঠি লিখবি।'

শিশির বললেন, 'লিখব।'

'এর মধ্যে ছুটিছাটা পেলে বউমাদের নিয়ে চলে আসবি।'

'গোস্পানির চাকরি, ছুটিছাটা বড় কম। আসছে বছর পুজোর আগে আসার আর সম্ভাবনা নেই।'

বাড়ি আসার ব্যাপারে শিশির রামকেশব এবং হেমনাথের মধ্যে কথা হতে লাগল।

এদিকে ঝুমা বিনুর গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ছিল। ডাকল, 'বিনুদা—'

বিনু তার দিকে তাকাল।

ঝুমা বলল, 'সেই কথাটা মনে আছে তো?'

'কোনটা?'

'কলকাতায় গিয়ে আমাদের বাড়ি যাবে, আমি তোমাদের বাড়ি যাব।'

'মনে আছে। তুমি কিন্তু আমাদের বাড়ি আগে আসবে।'

কথায় কথায় খেয়াল ছিল না। হঠাৎ বিনুর চোখে পড়ল, একটু দূরে জলের কাছটায় স্টিমারের রেলিঙ ধরে সুনীতি আর আনন্দ খুব ঘন হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

একটু পর স্টিমারঘাট থেকে ঘন্টির শব্দ ভেসে এল। হিন্দুস্থানী কুলি আর খালাসিরা চিৎকার করে উঠল, যাঁরা স্টিমারে যাবেন না তাঁরা যেন নেমে যান। কেননা গ্যাংওয়ে এক্ষুনি সরিয়ে নেওয়া হবে।

হেমনাথ ব্যস্ত হয়ে পড়লেন, 'এবার আমরা নামব শিশির। সুনীতি কোথায় রে? বিনু, ঝিনুক—'

বিনুরা কাছেই ছিল। সুনীতি ছুটে এল। তারপর আরম্ভ হল প্রণাম পর্ব। শিশিররা একে একে হেমনাথ রামকেশব আর তাঁর স্ত্রীকে প্রণাম করলেন। বিদায় নিয়ে আশীর্বাদ করে হেমনাথরা জেটিঘাটে নেমে এলেন। তাঁরা নামবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে গ্যাংওয়ে সরিয়ে নেওয়া হল। জেটি আর স্টিমারের মাঝখানে কাঠের পাটাতনের সংযোগটুকু ছিন্ন হয়ে গেল।

তারপর দু'মিনিটও কাটল না, ভোঁ বাজিয়ে স্টিমার ছেড়ে দিল। জলযানের দু'ধারে বড় বড় চাকা দু'টো নদী তোলপাড় করে বিপুল গর্জনে ঘুরে চলেছে, ফলে ঢেউ উঠছে পাহাড়প্রমাণ। আর তাতে চারদিকের নৌকোগুলো মোচার খোলার মতো দুলে চলেছে।

pathagar.net

স্টিমারের যত যাত্রী সব এদিকের রেলিং-এর কাছে ভিড় জমিয়েছে আর সমানে হাত নাড়ছে। তাদের ভেতর ঝুমাদের দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। ঝুমা হাত নাড়ছিল না, রুমাল ওড়াচ্ছিল।

ঝুমার জন্য মনটা ভারি খারাপ হয়ে গেছে বিনুর। আস্তে আস্তে সেও হাত নাড়ছিল।

প্রথম দিকে স্টিমারটার গতি ছিল রাজহাঁসের মতো মন্থর, ধীরে ধীরে তাতে দুর্দম বেগ এসে যেতে লাগল। একসময় ঝুমাদের নিয়ে অনেক দূরে একটা বিন্দু হয়ে মিলিয়ে গেল স্টিমারটা।

এতক্ষণ পলকহীন তাকিয়ে ছিলেন শিশিরের মা। যখন আর স্টিমারটা দেখা গেল না, আচমকা জোরে শব্দ করে কেঁদে উঠলেন।

শিশিরের মায়ের কান্না দেখতে দেখতে, হঠাৎ, কেন কে জানে বিনুর মনে হল, তারা যখন রাজদিয়া থেকে চলে যাবে নদীতীরে দাঁড়িয়ে ঝিনুকও হয়তো এই রকম কাঁদবে।

এক দিকে ঝুমা, আরেক দিকে ঝিনুক, দুইয়ের মাঝখানে নিজেকে কেমন যেন মনে হয় বিনুর!

দুর্গাপুজোর পর কোজাগরী। তারপর একে একে কালীপুজো, ভ্রাতৃদ্বিতীয়াও চলে গেল। অবনীমোহন কলকাতায় ফেরার কথা আর বলেন না।

কার্তিকের শেষাশেষি একদিন সুরমা বললেন, 'কি গো, তোমার মতলবটা কী?'

অবনীমোহন বললেন, 'কিসের মতলব?'

'কলকাতায় ফিরছ কবে?'

'কলকাতায় আর ফিরছি না।'

'তার মানে?'

'ইস্টবেঙ্গলেই থেকে যাব ভাবছি।'

সুরমা অবাক, 'কী বলছ তুমি!'

অবনীমোহন হাসতে হাসতে বললেন, 'মাথার ভেতর সেই পোকাটা নড়ে উঠেছে।'

পুবের ঘরের দাওয়ায় বসে সুরমা আর অবনীমোহন কথা বলছিলেন। তাঁরা ছাড়া আরও দু'জন এখানে রয়েছে—বিনু এবং ঝিনুক। সুধা সুনীতি কোথায়, কে জানে। হয়তো ভেতর-বাড়িতে স্নেহলতা শিবানীর সঙ্গে গল্পটল্প করছে; কিংবা বাগানে ঘুরে বেড়াচ্ছে। হেমনাথ বাড়ি নেই, ভোরবেলা উঠেই কী একটা কাজে কমলাঘাটের গঞ্জে গেছেন। ফিরতে ফিরতে রাতদুপুর।

সময়টা বিকেল। এই তো খানিক আগে দুপুর পার হয়েছে। কিন্তু এর মধ্যেই হেমন্তের শেষ বেলাটা দ্রুত জুড়িয়ে যাচ্ছে। রোদ কেমন যেন মলিন আর স্তিমিত। বাগানে ছায়া ঘন হতে শুরু করেছে। অনেক দূরে—পুকুর এবং ধানখেতের ওপারে আকাশ আর দিগন্ত যেখানে একাকার, সেই জায়গাটা কেমন যেন ঝাপসা। বেলা থাকতে থাকতেই কি ওখানে হিম পড়ছে?

বিনুর কোনও দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। মা-বাবার মুখের দিকে পলকহীন সে তাকিয়ে আছে, গোগ্রাসে তাদের কথা গিলছে। ঝিনুকও একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল।

অবনীমোহন যখন বললেন, কলকাতায় আর ফিরবেন না, রাজদিয়াতেই থেকে যাবেন, তখন থেকেই উত্তেজনায় আনন্দে বিনুর বুকের ভেতরটা দুলতে শুরু করেছে। আদিগন্ত ধানের খেত, জল-পূর্ণ প্রান্তর, পাখির ঝাঁক, লারমোর, হেমনাথ, যুগল, দ্বীপের মতো ভাসমান গ্রামগুলি, সুজনগঞ্জের হাট, যাত্রার আসর—সব একাকার হয়ে এই স্নিগ্ধ শ্যামল দেশ বিনুকে একেবারে জাদু করে ফেলেছে। এদের ছেড়ে যেতে হলে ভয়ানক কষ্ট হতো তার।

ওদিকে সংশয়ের গলায় সুরমা বললেন, 'সত্যিসত্যিই কলকাতায় যাবে না?'

অবনীমোহন বললেন, 'কেন, আমার কথা বিশ্বাস হচ্ছে না?'

'কিন্তু—'

'কিন্তু টিন্তু নয়, আমি মনস্থির করে ফেলেছি।'

'মাথার ভেতর সত্যিই তা হলে পোকাটা নড়েছে?'

'ইয়েস ম্যাডাম।'

সুরমা এবার আর অবাক হলেন না, কেননা তিরিশ বছর ধরে তিনি অবনীমোহনকে দেখে আসছেন। মানুষটি বিচিত্র। আর দশজনের সঙ্গে অবনীমোহনের মেলে না। তাঁর স্বভাবের ভেতর কোথায় যেন একটা অস্থির যাযাবরের বাস। সেটা দু'দন্ড তাঁকে পা পেতে বসতে দেয় না, নিয়ত ছুটিয়ে নিয়ে বেড়ায়।

কেউ হয়তো কোনও অজানা দেশের গল্প করল, অমনি ঘর-সংসার ভুলে অবনীমোহন ছুটলেন। কিছুদিন সেখানে গিয়ে থাকতে না পারলে তাঁর স্বস্তি নেই। কেউ হয়তো রমণীয় কোনও দৃশ্যের, কোনও পাহাড়-নদী-জলপ্রপাত কিংবা সমুদ্রের খবর নিয়ে এল। আর যায় কোথায়? অবনীমোহনের ঘুম গেল, খাওয়া গেল। জগৎ রসাতলে যাক, তিনি সে সব জায়গায় না গিয়ে পারবেন না।

আজ রামেশ্বর, কাল অমরকন্টক, পরশু দ্বারকা—সারা বছর এ সব লেগেই আছে। চিরদিন এই ছোটাছুটির খেলা দেখে আসছেন সুরমা। এর জন্য ছেলেমেয়েদের ক্ষতিও কি কম হয়েছে?

কোথাও গিয়ে সেই জায়গাটা যদি মনে ধরে গেল, কার সাধ্য সেখান থেকে অবনীমোহনকে নড়ায়? যতক্ষণ না নতুন চমকপ্রদ কোনও অঞ্চলের খবর আসছে, তিনি সেখানেই থেকে যাবেন। একবার কাশী গিয়ে তো বছর খানেকই কাটিয়ে এলেন, আরেক বার মধুপুরে থেকে এলেন ন'মাসের মতো। এই করে সুনীতির দু'টো বছর নষ্ট হয়েছে। সুধার গেছে দেড় বছর। নইলে এতদিনে ওরা বি.এ, টি.এ পাস করে যেত। বিনুর অবশ্য ক্ষতি হয় নি। একটা বছর যেতে যেতে কোনও রকমে বেঁচে গেছে।

দেখে শুনে একেক সময় তাঁকে দায়িত্বজ্ঞানহীন মনে হয়। আসলে কিন্তু তিনি তা নন। এই যে নিয়ত ছুটে বেড়াচ্ছেন সেটা যেন পুরোপুরি সজ্ঞানে নয়, বিচিত্র এক ঘোরের মধ্যে। অস্থিরতার ঈশ্বর যেন তাঁকে দুই অদৃশ্য ডানা দিয়ে এই পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন আর তীক্ষ্ণ চোখে লক্ষ রাখছেন। না, থামবার উপায় নেই অবনীমোহনের।

দূর দেশের আকর্ষণেই শুধু নয়, কলকাতা শহরেই কি কম ছোটাছুটি করে বেড়ান অবনীমোহন? বছরে কতবার করে যে বাড়ি বদলান তার আর লেখাজোখা নেই। আজ হয়তো টালিগঞ্জে আছেন, কাল লরীতে মালপত্র চাপিয়ে চলে গেলেন কসবা, পরশু পাড়ি জমালেন বাগবাজরে। শেষ পর্যন্ত ভবানীপুরে একখানা বাড়ি কিনে থিতু হয়েছেন।

অবনীমোহনের পেছনে ঘুরে ক্লান্ত, ছুটে ছুটে বিরক্ত, সুরমা প্রথম প্রথম বলতেন, 'এক জায়গায় দু'দিন স্থির হয়ে থাকতে কি তোমার ইচ্ছে করে না?'

অবনীমোহন মাথা নাড়তেন আর হাসতেন, 'না সখী। না—'

অবনীমোহন বলতেন, 'আমার কি ভাল লাগে জানো?'

সুরমা জিজ্ঞাসু চোখে তাকাতেন, 'কী?'

'নিত্য নতুন।'

'নিত্য নতুন কী? জায়গা না মানুষ?'

মজাটা বুঝতে পেরে হেসে অবনীমোহন বলতেন, 'দুই-ই।'

এবার সুরমার গলায় পরিহাসের ছোঁয়া লাগত, 'আমি কিন্তু পুরনো হয়ে গেছি। দেখো, এই বয়সে আর নতুনের পেছনে ছুটো না।' বলে স্বামীর দিকে তরল চোখের দৃষ্টি হানতেন।

রগড়ের গলায় অবনীমোহন বলতেন, 'তার আর উপায় নেই প্রাণেশ্বরী।'

কপট ভয়ের সুরে সুরমা বলতেন, 'উপায় থাকলে বুঝি ছুটতে?'

'ভেবে দেখিনি। এবার থেকে ভাবব।'

'ভাল কথাই মনে করিয়ে দিলাম দেখছি।'

একটু নীরব থেকে দূরমনস্কের মতো অবনীমোহন বলতেন, 'আমার স্বভাবটাই কেমন যেন সৃষ্টিছাড়া। কোথাও একটানা থাকতে ইচ্ছে করে না, এক কাজ বেশিদিন করতে ইচ্ছে করে না।'

স্বভাবের এই যাযাবরত্ব তাঁর নিজেরই কম ক্ষতি করে নি। অবশ্য এই ক্ষতিকে ক্ষতি বলেই

pathagar.net

মানেন না অবনীমোহন।

সাধারণ মানুষ পায়ের তলায় নিশ্চিন্ত একটু আশ্রয় পেলেই স্থির হয়ে বসে। সেইখানেই জীবনকে ফুলফলে ভরে তোলে। অবনীমোহন কোনও দিন তা পারলেন না। পায়ের নিচে স্থির ভূমি তো কতবারই তিনি পেয়েছেন। প্রথম জীবনে বিরাট সরকারি চাকরি পেয়েছিলেন, সেটা থাকলে এতদিনে হাজার টাকার বেশি মাইনে হয়ে যেত। কিন্তু বছর ঘুরতে না ঘুরতেই চাকরি ছেড়ে কলেজে অধ্যাপনা শুরু করলেন। অধ্যাপক হিসেবে প্রচুর খ্যাতি হল, কিন্তু তার আয়ুও বেশিদিন নয়, বড় জোর বছর চারেক। তারপর কালো কোট গায়ে চাপিয়ে উকিল সাজলেন, ওকালতিতে যথেষ্ট পয়সা হল। কিন্তু একদিন দেখা গেল, আদালত টাদালতের বদলে শেয়ার মার্কেটে যাতায়াত শুরু করেছেন, হেসিয়ান আর বুলিয়ান মার্কেটের রহস্য কিছুদিন তাঁকে আচ্ছন্ন করে রাখল।

মোট কথা, কোথাও নোঙর ফেলে বসা তাঁর স্বভাবে নেই। এটা ছাড়ার জন্য তাঁর কতখানি ক্ষতি হল, ওটা পেয়ে কতখানি লাভবান হলেন, অবনীমোহন কোনও দিন তা ভাবেন না। লাভ-ক্ষতি, কোনও কিছুর জন্য তাঁর অনুশোচনা নেই, দুঃখ নেই, আসক্তি নেই।

এই বসুন্ধরায় কত দিকে কত রঙের মেলা সাজানো। এক জায়গায় থেমে থেকে জীবনকে একরঙা প্রতিমা বানাতে চান না অবনীমোহন। সমস্ত পিছুটান আর একঘেয়েমি ছিঁড়ে সামনের দিকে তিনি শুধু ছোটেন আর নিজের জন্য এক আশ্চর্য জগৎ গড়ে তোলেন।

অবনীমোহন যখন একবার স্থির করেছেন যাবেন না, তখন এই রাজদিয়াতেই থেকে যেতে হবে। যতদিন পূর্ব বাংলা তাঁকে মুগ্ধ বিস্মিত চমৎকৃত করে রাখছে ততদিন এখান থেকে যাবার কোনও আশাই নেই।

তবু সুরমা বললেন, 'দুম করে তো বলে বসলে যাবে না। সব দিক ভেবে দেখেছ?'

অবনীমোহন বললেন, 'সব দিক বলতে?'

'প্রথমে ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার কথাই ধর। বছর শেষ হতে চলল, আর ক'দিন পর পরীক্ষা। এখন এখানে থেকে গেলে নির্ঘাত একটা করে বছর নষ্ট।'

'নষ্ট যাতে না হয় তার ব্যবস্থা করতে হবে।'

'কেমন করে?'

'মামাবাবুর সঙ্গে পরামর্শ করে দেখি।'

চিন্তিত মুখে সুরমা বললেন, 'ছেলেমেয়েগুলোর যা হবে তা তো বুঝতেই পারছি। কিন্তু তোমার ব্যবসা? এত খেটেখুটে যে দাঁড় করালে, তার কী হবে?'

রাজদিয়া আসার আগে ব্যবসা শুরু করেছিলেন অবনীমোহন—এজেন্সির ব্যবসা। কয়েকটা বড় বিলিতি কোম্পানির এজেন্সি জোগাড় করেছিলেন। এজন্য তাঁকে প্রচুর পরিশ্রম করতে হয়েছে। রাতদিন কত যে ছোটাছুটি করেছেন আর কত লোককে ধরেছেন তার হিসেব নেই।

অবনীমোহন বললেন, 'ব্যবসা আর করব না।'

এমন অক্লেশে তিনি কথাগুলো বলে গেলেন যে সুরমা একেবারে থ। বিমূঢ়ের মতো প্রতিধ্বনি করলেন, 'ব্যবসা করবে না!'

'না।'

একটুক্ষণ নীরবতা। তারপর সুরমা আবার বললেন, 'ব্যবসা না হয় নাই করলে কিন্তু কলকাতায় বাড়ি আছে, সেখানে আমাদের মালপত্র রয়েছে। সে সবের কী হবে?'

অবনীমোহন বললেন, 'মাঝখানে আমি একবার কলকাতায় যাব, সমস্ত বন্দোবস্ত করে আসব।'

'যা ভাল বোঝ কর, আমি আর কী বলব!' সুরমা বলতে লাগলেন, 'এই পূর্ব বাংলাই যে তোমার কতদিন ভাল লাগবে তা-ই ভাবছি। কবে আবার বলবে, এখান থেকে পাততাড়ি গুটিয়ে আরেক জায়গায় চল—'

অবনীমোহন হাসতে লাগলেন।

মৃদু ধমকের গলায় সুরমা বললেন, 'অমন হেসো না তো—'

'তবে কী করব?'

হাসতে হাসতে অবনীমোহন শুধোলেন।

এ প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে সুরমা বললেন, 'তোমার হাসি দেখলে আমার গা জ্বলে যায়।'

অবনীমোহন কিছু বললেন না, নিঃশব্দে হাসতেই থাকলেন।

সুরমা থামেননি, 'সত্যি, একটা কথা ভাবলে আমার মাথার ঠিক থাকে না।'

'কী কথা?'

'প্রায় পঞ্চাশ বছর বয়েস হল তোমার, এখনও ওড়ার স্বভাব গেল না। কবে যে তোমার স্থিতি হবে!'

'ওটা বোধহয় এ জন্মে আর হবে না।'

'আমারও তাই মনে হয়।'

এবার অবনীমোহন যা বললেন তা এই রকম। এই পৃথিবীতে ক'দিনের জন্যেই বা মানুষ আসে। পঞ্চাশ ষাট কিংবা সত্তর বছর। তার বেশি তো নয়। অল্পক্ষণের এই প্রবাসে এক জায়গায় স্থির হয়ে গিয়ে জীবনকে বদ্ধজলার মতো গতিহীন, বর্ণহীন করে তোলার কোনও মানে হয় না। তার চাইতে বহতা নদীর মতো দেশ দেশান্তরে ঘুরে যত দিকের যত মাধুর্য পার, লুট করে নাও।

জীবন সম্পর্কে অবনীমোহনের ধ্যানধারণার সঙ্গে সুরমার মেলে না। বিরক্ত গলায় তিনি বললেন, 'চিরকাল ওই এক বক্তৃতা। শুনে শুনে কান পচে গেল—'

অবনীমোহন কী বলতে যাচ্ছিলেন, ভেতর-বাড়ি থেকে স্নেহলতার গলা ভেসে এল, 'রমু—রমু—'

সুরমা উঠে পড়লেন, 'মামীমা ডাকছে, যাই—' বলতে বলতে পা বাড়িয়ে দিলেন।

একটু পর অবনীমোহনও উঠলেন। তিনি অবশ্য ভেতরে গেলেন না, উঠোন পেরিয়ে বাগানের গাছপালার ভিড়ে অদৃশ্য হলেন।

তারপরও খানিকটা সময় কাটল।

হেমন্তের শেষ বেলাটা দ্রুত নিবে যাচ্ছে। লাটাইতে সুতো গুটনোর মতো কেউ যেন দিনান্তের রোদটুকু টেনে নিতে শুরু করেছে। গাছপালার মাথায়, দূরের ধানবনে গাঢ় বিষাদের মতো কী যেন নামছে।

আশ্বিন মাসে বিনুরা যখন রাজদিয়া এল, আকাশ তখন কত উজ্জ্বল। সারা বর্ষার জলে ধুয়ে ধুয়ে তার নীল রংখানি শরতে খুলে গিয়েছিল। সমস্ত দিন পরিষ্কার আয়নার মতো আকাশটা ঝকঝক করত। কিন্তু কার্তিক পড়তে না পড়তেই তার চেহারা বদলে গেছে। আকাশ এখন ধূসর, শোকাতুরের মতো সারাদিন বিষণ্ণ হয়ে থাকে।

একটু পরেই ঝপ করে সন্ধে নেমে যাবে। তার নিঃশব্দ আয়োজন চলছে চারদিকে।

হঠাৎ পাশ থেকে ঝিনুক ডেকে উঠল, 'বিনুদাদা—'

বিনু ঝাপসা আকাশের দিকে তাকিয়ে ছিল। সেখানে চোখ রেখেই আস্তে সাড়া দিল।

ঝিনুক বলল, 'কী মজা, না?'

'কিসের মজা?'

'বারে, মেসোমশাই কী বলল, শোন নি?'

অন্যমনস্কের মতো বিনু বলল, 'কী বলল?'

ঝিনুক বলল, 'তোমাদের কলকাতায় যাওয়া হবে না।'

বিনু উত্তর দিল না।

'আমার খুব আনন্দ হচ্ছে। তোমার?'

বিনুর যে আনন্দ হচ্ছিল না, তা নয়। হঠাৎ ঝুমার কথা মনে পড়ে গেল তার। বলল, 'আমাদের কলকাতায় যাওয়া না হলে ভারি মুশকিল হবে।'

ঝিনুক জানতে চাইল, 'কিসের মুশকিল?'

'ঝুমারা কলকাতায় আমাদের বাড়ি আসবে বলেছিল। আমরা না গেলে ওরা এসে নিশ্চয়ই ফিরে যাবে।'

pathagar.net

একদৃষ্টে কিছুক্ষণ বিনুকে দেখল ঝিনুক। মনে মনে তার ভীষণ রাগ হচ্ছিল। একসময় গম্ভীর গলায় বলল, 'তা হলে রাজদিয়াতে থাকতে তোমার আনন্দ হচ্ছে না, কেমন?'

বিনু ঝুমার কথা ভাবছিল, তাই সাড়া দিল না।

রাগ করে আর কোনও কথাই বলল না ঝিনুক। গাল ফুলিয়ে বসে থাকল।

হেমন্তের সন্ধেটা যেন সরু সুতোয় ঝুলছিল। সুতোটা ছিঁড়ে গিয়ে ঝপ করে গাঢ় অন্ধকার নেমে এল।

ঘরে ঘরে সন্ধে প্রদীপ দেখাতে বেরিয়ে পুবের বারান্দার এসে স্নেহলতা অবাক। বিনু আর ঝিনুক তখনও বসে আছে।

স্নেহলতা বললেন, 'তোরা এখানে?'

ঝিনুক বিনু একসঙ্গে বলে উঠল, 'হুঁ—'

'ভূতের মতো চুপচাপ বসে এখানে তোরা কী করছিস?'

'এমনি বসে আছি।'

স্নেহলতা আবার কী বলতে যাচ্ছিলেন, ঝুম ঝুম ঘুন্টির আওয়াজ ভেসে এল। মুখ ফেরাতেই দেখতে পেলেন, ভবতোষদের সেই ফিটনটা উঠোনের দিকে এগিয়ে আসছে।

ঝিনুক আর বিনুও সেদিকে তাকিয়ে ছিল। ঝিনুক হঠাৎ লাফ দিয়ে উঠে পড়ল, 'বাবা এসেছে, বাবা এসেছে—'

একটু পর ফিটনটা উঠোনের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। সত্যি সত্যি ভবতোষ এসেছেন, দরজা খুলে তিনি নেমে পড়লেন। ঝিনুক ছুটে গিয়ে তাঁর কোলে চড়ে বসল।

স্নেহলতা বললেন, 'এস ভব—'

পুজোর আগে ক'টা দিন ভবতোষের বাড়িতে রান্নাবান্নার লোক ছিল না, নিজেই রেঁধে খাচ্ছিলেন। স্নেহলতা রাগারাগি করতে এ বাড়ি এসে খেয়ে যেতেন। তখন পর পর ক'দিন ভবতোষকে দেখা গেছে। তারপর রান্নার লোক ফিরে এলে এ বাড়ি আসা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। প্রায় কুড়ি বাইশ দিন পর আবার আজ এলেন।

পুবের ঘরে এনে ভবতোষকে বসালেন স্নেহলতা। ক্ষিপ্র হাতে হেরিকেন জ্বেলে গলা তুলে ডাকতে লাগলেন, 'সুধা-সুনীতি-রমু—শিগগির আয়, ভবতোষ এসেছে। অবনীকেও ডেকে নিয়ে আয়—'

চারদিক থেকে ছোটাছুটি করে সুধা সুনীতিরা এসে পড়ল।

সবাই এলে স্নেহলতা বললেন, 'তুমি কেমন মানুষ ভব!'

স্নেহলতা কী বলতে চান, বুঝতে না পেরে হকচকিয়ে গেলেন ভবতোষ।

'আজ্ঞে—'

'সেই যে দশমীর দিন এলে, তারপর থেকে আর পাত্তাই নেই। ভেবেছিলাম লক্ষ্মীপুজোর দিন আসবে, তাও এলে না।'

'রোজই আসব ভাবি। আসি আসি করে আসা হচ্ছিল না।'

'কত রাজকার্য তোমার! এখন কলেজ ছুটি। কষ্ট করে হেঁটে আসতে হয় না। ঘোড়ার গাড়িতে উঠতে পারলেই হল। সেটুকুও পেরে ওঠ না?'

ভবতোষ ম্লান হাসলেন, 'আসলে ব্যাপারটা কী জানেন খুড়িমা?'

'কী?'

'কিছুই আজকাল ভাল লাগে না।'

একটু নীরবতা। তারপর স্নেহলতা বললেন, 'বউমার কোনও খবর আছে?'

ভবতোষ ঘাড় কাত করলেন, 'আছে।'

এ ঘরের সবাই উদ্‌গ্রীব হলেন। উৎসুক গলায় স্নেহলতা শুধোলেন, 'কী খবর?'

ভবতোষ বললেন, 'ঝিনুকের মা লোক পাঠিয়েছে।'

pathagar.net

স্নেহলতার ভ্রূ কুঁচকে গেল। তীক্ষ্ণ চাপা গলায় জিজ্ঞেস করলেন, 'হঠাৎ?'

'অনেক দিন মেয়েকে দেখে নি। তাই—'

'তাই কী?'

একটু চুপ করে থেকে ভবতোষ বললেন, 'লোকটার সঙ্গে ঝিনুককে পাঠিয়ে দিতে বলেছে।'

বিদ্রূপের সুরে স্নেহলতা বললেন, 'পাঠিয়ে দিতে বলেছে! নবাব নন্দিনী নিজে আসতে পারেন নি?'

নবাবনন্দিনী কে, বুঝতে পারলেন ভবতোষ। আবছা গলায় কী বললেন, বোঝা গেল না।

আগের সুরে স্নেহলতা আবার বললেন, 'সে এখান থেকে গেছে কতদিন?'

'মাস দেড়েকের মতো। আশ্বিনের দু'তারিখে তাকে ঢাকায় দিয়ে এসেছিলাম।'

'দেড় মাসের মধ্যে বুঝি ঝিনুকের কথা তার মনে পড়ে নি!'

ভবতোষ উত্তর দিলেন না।

স্নেহলতা আবার বললেন, 'এতকাল পরে মেয়ের জন্যে তার সোহাগ উথলে উঠল যে?'

ভবতোষ এবারও চুপ। এ প্রশ্নের উত্তর তিনি কেমন করে দেবেন?

স্নেহলতা থামেন নি। ধীরে ধীরে তাঁর কণ্ঠস্বর উঁচুতে উঠতে লাগল, 'আশ্চর্য মেয়েছেলে! ভগবান কী বস্তু দিয়ে যে গড়েছিলেন! স্বামীর সঙ্গে না হয় বনে নি, কিন্তু মেয়েটা? দেড় মাস ওই দুধের শিশুকে ছেড়ে আছে। এতদিন যখন ছেড়ে থাকতে পেরেছে তখন আর নতুন সোহাগে দরকার নেই।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ। তারপর খুব আস্তে ভবতোষ ডাকলেন, 'খুড়িমা—'

স্নেহলতা তক্ষুনি সাড়া দিলেন।

বলি বলি করেও ইতস্তত করতে লাগলেন ভবতোষ। তারপর দ্বিধান্বিত সুরে শুধোলেন, 'আপনি কী বলেন?'

'কী ব্যাপারে?

'ঝিনুককে ঢাকায় পাঠাব?'

স্নেহলতা এমনিতে প্রিয়ভাষিণী, গলা উঁচুতে তুলে কখনও কথা বলেন না। স্বভাবখানি যেমন মধুর তেমনি স্নেহময় এবং আমোদপ্রিয়। কৌতুকের একটু ছোঁয়ায় এই বয়সেও তিনি সবার সঙ্গে তাল দিয়ে বেজে উঠতে পারেন। তিনি যে পথে হাঁটেন তার দু'ধারে যেন নিমেষে থোকায় থোকায় সুগন্ধি ফুল ফুটে যায়।

আপন স্বভাবের কথা বুঝিবা মনে থাকল না। রাগের গলায় স্নেহলতা চেঁচিয়ে উঠলেন, 'না, কিছুতেই না। ঝিনুককে ঢাকায় পাঠাতে পারবে না।'

স্নেহলতার এমন ক্রুদ্ধ, ভীষণ চেহারা আগে আর কখনও দেখেন নি ভবতোষ। তিনি প্রায় বিমূঢ় হয়ে গিয়েছিলেন। ভয়ে ভয়ে বললেন, 'কিন্তু—'

'কী?'

'ঝিনুককে যখন একবার দেখতে চেয়েছে—'

ভবতোষ কথা শেষ করতে পারলেন না। তার আগেই চোখ পাকিয়ে সন্দিগ্ধ সুরে স্নেহলতা জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার মতলবটা কী ভব?'

কিছু হয়তো বলবার ছিল ভবতোষের, কিন্তু সাহসে কুললো না। স্নেহলতার মুখের দিকেও তিনি তাকিয়ে থাকতে পারছিলেন না। তাড়াতাড়ি চোখ নামিয়ে দুরু দুরু বুকে বসে থাকলেন।

স্নেহলতা আবার বলে উঠলেন, 'তোমাকে পরিষ্কার জানিয়ে দিচ্ছি, ঝিনুককে ঢাকায় পাঠানো চলবে না। নবাবের বেটির যদি মেয়ে দেখতে ইচ্ছে হয়, এখানে এসে দেখে যেতে হবে। বুঝলে?'

ভয়ে ভয়ে ঘাড় কাত করলেন ভবতোষ, 'আচ্ছা—'

'আর এর ফলও ভাল হবে না।'

'কিসের?'

'কিসের আবার, ঝিনুককে ঢাকায় পাঠানোর।' স্নেহলতা বলতে লাগলেন, 'মাকে এখন দেখছে

pathagar.net

না, সে একরকম ভাল। কিন্তু দু'চারদিনের জন্যে পাঠিয়ে যদি দাও, আসবার সময় মেয়ের মন খারাপ হয়ে যাবে। এখানে আসার পরও তার রেশ থেকে যাবে। না না, ঢাকায় পাঠিয়ে মেয়ের মন আমি নষ্ট হতে দেব না। তা ছাড়া—'

ভবতোষ উন্মুখ হলেন।

স্নেহলতা প্রশ্ন করলেন, 'ঝোঁকের মাথায় মেয়ে পাঠাতে তো চাইছ, কিন্তু অন্য দিকটা ভেবে দেখেছ?'

'কোন দিকটা?'

'ঝিনুককে যদি ওরা ফেরত না পাঠায়?'

এ ব্যাপারটা আগে ভাবেন নি ভবতোষ। ঈষৎ চকিত হয়ে বললেন, 'সে তো ঠিকই।'

স্নেহলতা বললেন, 'মেয়ে ছাড়া তুমি বাঁচবে?'

'না, কক্ষনো না।'

একটু চুপ। তারপর ভবতোষ মুখ তুলে স্নেহলতাকে দেখলেন। যেই চোখাচোখি হল অমনি চোখ নামিয়ে নিলেন। বারকতক এই রকম চলল।

স্নেহলতা লক্ষ করেছিলেন। বললেন, 'আমায় কিছু বলবে?'

'হ্যাঁ।' আস্তে করে মাথা নাড়লেন ভবতোষ।

'কী?'

ভয়ে ভয়ে ভবতোষ বললেন, 'ঝিনুক তো অনেকদিন আপনার কাছে রইল। সেই পুজোর আগে থেকে আছে—'

স্নেহলতার চোখ কুঁচকে গেল, 'তাতে কী হয়েছে?'

'কিছু না—'

'তবে ও কথা বললে যে?'

তক্ষুনি উত্তর দিলেন না ভবতোষ। একটুক্ষণ ভেবে নিয়ে বললেন, 'অনেকদিন মেয়েটা আমার কাছ ছাড়া, একেবারে ভাল লাগছে না। ভাবছি—'

'কী?'

'আজ ওকে নিয়ে যাব। দিনতিনেক পর আমার কলেজ খুলবে। কলেজ খুললে তো নিজের কাছে রাখার অসুবিধে। এই তিনটে দিন ঝিনুক আমার কাছে থেকে আসুক।'

স্নেহলতা জোরে জোরে মাথা নাড়লেন, 'না।'

বিমূঢ়ের মতো ভবতোষ বললেন, 'কী?'

'ঝিনুক আজ যাবে না।'

'কেন।'

'তোমাকে তো সেই ছেলেবেলা থেকে দেখছি ভব, মানুষটা তুমি ভারি নরম। বাড়ি যেতে যেতে হয়তো মতি বদলে গেল। সেই লোকটা তোমাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে ঝিনুককে ঢাকায় নিয়েও যেতে পারে। লোকটাকে বিদেয় করে মেয়ে নিয়ে যেও। তার আগে না।'

অসহায়ের মতো কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে ভবতোষ বললেন, 'তা হলে আর কি, এখন আমি যাই—'

'এখুনি যাবে? রাত্তিরে একেবারে খাওয়াদাওয়া করে যেও।'

'না খুড়িমা, আজ আর খাব না। বাড়িতে রান্নাবান্না করা আছে। এখানে খেয়ে গেলে সব নষ্ট হবে।'

'তা হলে বাড়িতেই খেও।' স্নেহলতা হাসলেন।

এতক্ষণ স্নেহলতার সঙ্গেই কথা বলছিলেন ভবতোষ। ঘরে যে আরও মানুষ আছে সেদিকে লক্ষ ছিল না। এবার অবনীমোহনদের দিকে ফিরলেন তিনি। মৃদু হেসে বললেন, 'আমি কিন্তু খুড়িমার সঙ্গেই কথা বলে যাচ্ছি।'

pathagar.net

অবনীমোহন বললেন, 'দরকার থাকলে বলতে হবে বৈকি।'

খানিক ভেবে ভবতোষ বললেন, 'আপনার সম্বন্ধে আমার কিছু অভিযোগ আছে—'

অবনীমোহন চকিত হলেন, 'কী?'

'রাজদিয়ায় এতদিন কাটালেন, অথচ আমার বাড়িতে একবারও এলেন না—'

'সত্যি ভারি অন্যায় হয়ে গেছে। এবার একদিন যাব।'

'যাবেন না, বুঝতেই পারছি। গেলে এতদিনে ঠিকই যেতেন।' ভবতোষ বলতে লাগলেন, 'পুজো-টুজো গেল। এবার তো কলকাতায় ফিরবেন। আমার ওখানে আর যাবেন কবে?'

অবনীমোহন বললেন, 'কলকাতায় আমরা ফিরছি না।'

'সত্যি!' ভবতোষ অবাক।

'সত্যি।' অবনীমোহন হাসলেন, 'এবার থেকে আমরা আপনাদের রাজদিয়ার বাসিন্দা হয়ে যাচ্ছি।'

'খুবই আনন্দের কথা। কিন্তু—'

'কী?'

'আপনারা শহরের মানুষ, চিরকাল কলকাতায় থেকেছেন। এই ম্যাড়মেড়ে নিঝুম গ্রামদেশ কি বেশিদিন ভাল লাগবে?'

ওধার থেকে সুরমা হঠাৎ বলে উঠলেন, 'বলা মুশকিল। তবে—'

'তবে কী?'

'মাথার ভেতর পোকাটা যতদিন কট কট করছে ততদিন এখানেই থাকবে।' বলে কৌতুকময় চোখে স্বামীকে বিদ্ধ করলেন সুরমা।

সুরমার কথাগুলো ভাল করে বুঝতে পারেন নি ভবতোষ। কিছুটা বিমূঢ়ের মতো একবার তাঁর দিকে, একবার অবনীমোহনের দিকে তাকাতে লাগলেন।

এই সময় হঠাৎ কী মনে পড়ে গেল অবনীমোহনের। তাড়াতাড়ি ভবতোষের দিকে ফিরে বলে উঠলেন, 'আপনাকে পেয়ে ভালই হল। আচ্ছা—'

'কী?'

'আপনি তো এখানকার কলেজে অধ্যাপনা করেন?'

'হ্যাঁ।'

'একটা ব্যাপারে আমাকে একটু সাহায্য করতে হবে ভাই—'

ভবতোষ জিজ্ঞাসু চোখে তাকালেন।

অবনীমোহন বললেন, 'এই আমার মেয়েদের ভর্তির ব্যাপারে। কাল কি পরশু মামাবাবুকে নিয়ে আপনার বাড়ি যাচ্ছি। তখন বলব।'

'আচ্ছা।'

আরও কিছুক্ষণ গল্প টল্প করে ভবতোষ উঠে পড়লেন।

pathagar.net

বেশ কিছুক্ষণ হল, ভবতোষ চলে গেছেন। তারপরও স্নেহলতারা উঠলেন না, পুবের ঘরেই বসে থাকলেন। তাঁদের মধ্যে ভবতোষের কথাই হতে লাগল।

ভবতোষের সংসারের কথা ভেবে সবাই দুঃখিত, বিষণ্ণ, ব্যথিত। তিনটে তো মোটে মানুষ—ভবতোষ, তাঁর স্ত্রী এবং ঝিনুক। তিনজনে আজ তিন জায়গায়। একজন ঢাকায়, আর দু'জন রাজদিয়ার দুই প্রান্তে। সংসারটা তিন টুকরো হয়ে তিন দিকে ভেসে বেড়াচ্ছে। অথচ কোনও অভাব ছিল না, সুখের সব উপকরণ ছিল হাতের কাছে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সামান্য বনিবনা থাকলে ওরা কত সুখীই না হতে পারত।

দেখতে দেখতে হেমন্তের রাত গাঢ় হয়ে উঠল। ক'দিন আগে ছিল অমাবস্যা। আকাশের প্রান্তে যে এক ফালি ক্ষীণায়ু চাঁদ উঠেছে, জল-বাংলার এই অংশটিকে তা আলোকিত করে তুলতে পারে নি। তার ওপর আছে গুঁড়ো গুঁড়ো হিমের রেণু। ফলে গাছপালা, আকাশ, দূরের ধানখেত—সমস্ত কিছুই ঝাপসা, অস্পষ্ট, কুহেলিবিহীন। বিচিত্র মায়াবরণের মতো এই রাত রাজদিয়াকে ঢেকে রেখেছে।

ভবতোষ যাবার পর কতক্ষণ কেটেছে, কে জানে। হঠাৎ বাইরের উঠোনে হেমনাথের গলা পাওয়া গেল, 'কোথায় রে বিনুদাদা, ঝিনুকদিদি—'

কমলাঘাটের গঞ্জ থেকে রাতদুপুরে ফেরার কথা ছিল হেমনাথের। দেখা গেল, অনেক আগেই ফিরে এসেছেন। স্নেহলতারা হেরিকেন নিয়ে ব্যস্তভাবে বাইরের বারান্দায় বেরিয়ে এলেন।

হেমনাথ একাই আসেন নি, যুগলকেও তাঁর পেছনে দেখা গল। সকালবেলা তাকে সঙ্গে নিয়ে কমলাঘাট গিয়েছিলেন হেমনাথ।

কেউ কিছু বলবার আগেই লাফ দিয়ে বারান্দা থেকে উঠোনে নামল ঝিনুক। ছুটতে ছুটতে কাছে এসে হেমনাথকে জড়িয়ে ধরল, 'দাদু দাদু, একটা কথা শুনেছ?'

দু'হাত দিয়ে সস্নেহে ঝিনুককে কোলে তুলে নিলেন হেমনাথ, 'কী কথা রে দিদিভাই?'

ঝিনুক হেসে হেসে রহস্যের গলায় বলল, 'কী কথা তুমিই বল না?'

'আমি কেমন করে বলব? আমি কি অন্তর্যামী? তবে ঝিনুকদিদি যখন এত খুশি তখন নিশ্চয়ই কথাটা খুব ভাল—'

'হুঁ।' ঝিনুক বলতে লাগল, 'তোমাকে বলতে হবে, কী কথা—'

'বলতেই হবে?'

'হ্যাঁ।'

মুখখানা গম্ভীর করে চোখ কুঁচকে কত না ভাবনার ভান করলেন হেমনাথ। তারপর বললেন, 'এইবার বুঝতে পেরেছি—'

সাগ্রহে ঝিনুক জিজ্ঞেস করে, 'কী?'

'তোর দিদা আরেক বার নিকের ব্যবস্থা করেছে। তাই না রে?' বলে আড়ে আড়ে স্ত্রীর দিকে তাকালেন হেমনাথ।

লক্ষ্যভেদ ঠিকমতোই হয়েছিল। স্নেহলতা ঝঙ্কার দিয়ে উঠলেন, 'আহা হা, বুড়ো বয়সে রস একেবারে উথলে উঠেছে। মুখে কিছু আটাকায় না।'

হেমনাথ রগড়ের গলায় বললেন, 'তোমার দিকে তাকালে রস না উথলে যে পারে না সখী। চেহারাখানা এই বয়সেও যা ডাঁটো রেখেছ।'

স্নেহলতা ধমকে উঠলেন, 'থাম, আর ফাজলামো করতে হবে না।'

হেমনাথ হাসতে লাগলেন। তিনি কি একাই, অবনীমোহন-সুরমা-শিবানী সুধা-সুনীতি সবাই ঠোঁট টিপে হাসতে লাগল।

হেমনাথের রসিকতা বুঝবার মতো বয়স নয় ঝিনুকের। সে বলে উঠল, 'পারলে না দাদু বলতে, পারলে না—'

ঝিনুকের দিকে ফিরে হেমনাথ বললেন, 'পারলাম না, না? দিদুর নিকের কথাটা তা হলে ঠিক নয়?'

'না।'

'তবে কি—' আগের মতো ভাবনার অভিনয় করে হঠাৎ সকৌতুকে হেমনাথ বলে উঠলেন, 'সুধা সুনীতি আমাকে তালাক দিয়ে আর কারোর সঙ্গে ঝুলে পড়তে চাইছে? এবার ঠিক হয়েছে, না রে ঝিনুকদিদি?'

কথাটা শেষ হল কি হল না, তার আগেই সুধা সুনীতি চেঁচামেচি জুড়ে দিল, 'খুব খারাপ হয়ে

যাবে দাদু, খুব খারাপ হয়ে যাবে—'

যে কারণেই হোক মনটা খুব ভাল ছিল, এর তার পেছনে লেগে মজা করতে লাগলেন হেমনাথ।

এদিকে ঝিনুক অসহিষ্ণু হয়ে উঠল। সে বলতে লাগল, 'তোমার একটা কথাও ঠিক হচ্ছে না।'

মুখখানা করুণ করুণ করে হেমনাথ বললেন, 'একটাও হচ্ছে না?'

'না।' ঝিনুক জোর জোর মাথা নাড়ল, 'তুমি তো পারলে না, আমিই বলে দিচ্ছি—' মনের কথাটা না বলা পর্যন্ত স্বস্তি হচ্ছিল না ঝিনুকের।

'সব শুনব, তার আগে ঘরে চল—'

ঝিনুককে কোলে নিয়েই ঘরে এলেন হেমনাথ। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে স্নেহলতারাও ভেতরে ঢুকলেন। যুগল বারান্দায় উঠে খুঁটিতে ঠেসান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল।

কোল থেকে ঝিনুককে নামিয়ে হেমনাথ বললেন, 'কী বলবি বল—'

ঝিনুক এক নিশ্বাসে বলে গেল, 'জানো দাদু, জানো—বিনুদাদারা আর কলকাতায় যাবে না, আমাদের এখানেই থাকবে।' আনন্দে, উত্তেজনায় তার চোখ মুখ ঝকমক করতে লাগল।

'তাই নাকি?'

'হুঁ। তুমি ওদের জিজ্ঞেস করে দেখ না—'

এই সময় অবনীমোহন বলে উঠলেন, 'ঝিনুক ঠিকই বলেছে মামাবাবু। আমরা আর কলকাতায় ফিরছি না।'

এই কথাটা আগেও আরও দু'একবার বলেছিলেন অবনীমোহন। এই দেশ, পূর্ব বাংলার এই শ্যামল সজল ভূখন্ড তাঁর ভাল লেগেছে। এখান থেকে তিনি আর যাবেন না, স্থায়ীভাবে রাজদিয়াতেই তাঁর থাকার ইচ্ছে—মাঝে মাঝে এরকম ইঙ্গিত দিয়েছেন। কিন্তু সে সব নেহাতই কথাচ্ছলে বলা। হেমনাথ তেমন গুরুত্ব দেন নি। কিন্তু অবনীমোহন যে সুরে আজ বললেন সেটা খুব হালকা নয়। স্থির চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে হেমনাথ বললেন, 'তুমি কি এ ব্যাপারে মনস্থির করে ফেলেছ?'

অবনীমোহন মাথা নাড়লেন, 'আজ্ঞে হ্যাঁ মামাবাবু।'

'তোমরা এখানে থাকবে, সে তো খুবই আনন্দের কথা। কিন্তু—'

'কী?'

একটু চুপ করে রইলেন হেমনাথ। তারপর বললেন, 'কিছু মনে কোরো না, একটা কথা জিজ্ঞেস করি—'

অবনীমোহন উদ্‌গ্রীব হলেন।

'হঠাৎ ইস্টবেঙ্গলে থাকা ঠিক করলে কেন?'

অবনীমোহন যা উত্তর দিলেন সংক্ষেপে এই রকম। তিনি পশ্চিম বাংলার মানুষ, আদি সাকিন বীরভূম জেলায় অর্থাৎ রাঢ়ে। তবে চাকরি বাকরি এবং ব্যবসা ট্যাবসার খাতিরে তিন পুরুষ কলকাতাতেই আছেন, দেশের সঙ্গে যোগসূত্র একরকম নেই বললেই হয়। ন'মাসে ছ'মাসে এক-আধবার যাওয়া হয় কিনা সন্দেহ। যত ক্ষীণই হোক, রাঢ়বঙ্গের সঙ্গে তবু কিছু সম্পর্ক আছে।

অবনীমোহন পূর্ব বাংলার মেয়ে বিয়ে করেছেন, কিন্তু ওই পর্যন্তই। শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে তাঁকে পদ্মা-মেঘনা পাড়ি দিতে হয় নি। কেননা সুরমার বাবা চিরকাল কলকাতাতেই কাটিয়েছেন, অবনীমোহনের বিয়েও হয়েছিল কলকাতায়।

বিয়ের পর অনেক বার, প্রায় প্রতি বছরই হেমনাথ তাঁদের পূর্ব বাংলা দেখে যেতে লিখেছেন। আসি আসি করেও জীবনের অর্ধ শতাব্দী কেটে গেছে। এতকাল পর এখানে এসে মুগ্ধ হয়ে গেছেন অবনীমোহন—মুগ্ধ, বিস্মিত, চমৎকৃত। বাংলাদেশের এমন একটা স্নিগ্ধ মনোরম রূপ যে থাকতে পারে কোনও দিন তিনি তা কল্পনাও করেন নি।

রাঢ়ে যে বাংলাদেশ রাঢ়-কর্কশ-কঠিন, সেই বাংলাই এখানে সুজলা-সুফলা, ঐশ্বর্যময়ী। শস্যে-

pathagar.net

স্বর্ণে আর অনন্ত সম্ভাবনায় তার ভান্ডার এখানে পরিপূর্ণ হয়ে আছে। কড়ি আর কোমলে মেশা বাংলার কত না রূপ! তার বহুরূপিণী মৃত্তিকার অর্ধেকেরও বেশি পড়েছে এই পূর্ব বাংলায়।

অবনীমোহনের দুর্ভাগ্য, এতকাল তিনি এখানে আসেন নি। যখন এসেই পড়েছেন তখন জল-বাংলাকে তার আপন মহিমায় চিনতে চেষ্টা করবেন। ছেলেমেয়েরা যাতে গোটা দেশেকে চিনতে পারে সে জন্য কিছুকাল তাঁদের এখানে থাকা দরকার। পূর্ব-বাংলাকে না চিনলে অখণ্ড বাংলাদেশকে চেনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

॥ প্রথম পর্ব সমাপ্ত ॥

pathagar.net

দ্বিতীয় পর্ব

pathagar.net

অবনীমোহনের ধারণা, পূর্ব বাংলাকে চেনার মন্ত্র হেমনাথ-লারমোর-স্নেহলতার মতো মানুষদের হাতে রয়েছে এবং এই বাংলাকে না জানলে গোটা বাংলা দেশটাকেই জানা যাবে না। তাঁর বিশ্বাস এখানে তাঁদের থাকা ব্যর্থ হবে না, অবেগপূর্ণ সুরে সেই কথাই তিনি বলে গেলেন। তারপর উৎসুক দৃষ্টিতে হেমনাথের দিকে তাকালেন।

অভিভূতের মতো শুনে যাচ্ছিলেন হেমনাথ। আচ্ছন্ন গলায় বললেন, 'তুমি যে এভাবে ভেবেছ, আমি চিন্তাই করিনি।'

অবনীমোহন হাসলেন।

হেমনাথ আবার বললেন, 'তুমি ঠিকই বলেছ, পুব বাংলাকে না জানলে গোটা বাংলাদেশকে জানা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।'

একটু চুপ।

তারপর অবনীমোহন বললেন, 'কিন্তু একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে মামাবাবু—'

'কী সমস্যা?'

'আমরা যদি এখানে থেকে যাই, ছেলেমেয়েগুলো পরীক্ষা টরীক্ষা দিতে পারবে না। তাতে একটা করে বছর নষ্ট।'

'পরীক্ষার জন্য আটকাবে না। আমি হেডমাস্টারকে বলে দেব, জানুয়ারি মাসে বিনুকে পরের ক্লাসে ভর্তি করে নেবে। অবশ্য অ্যাডমিসন টেস্ট দিতে হবে। আর সুধা সুনীতির জন্যে তো ভবতোষই আছে। ওদের কলেজে ভর্তি হতে অসুবিধা হবে না।'

অবনীমোহন বললেন, 'ভবতোষবাবু সন্ধেবেলা এসেছিলেন। সুধা সুনীতির ভর্তির ব্যাপারে আমি তাঁকে একটু আভাস দিয়েছি। বলেছি, দু'একদিনের ভেতর আপনাকে নিয়ে তাঁর বাড়ি যাব।'

হেমনাথ বললেন, 'বেশ তো—'

হঠাৎ কী মনে পড়ে যেতে অবনীমোহনকে চিন্তিত দেখাল। বললেন, 'ভর্তি তো করব, কিন্তু—'

'কী?'

'ওরা কলকাতা ইউনিভার্সিটির কোর্স করেছে। এখানে—'

বাধা দিয়ে হেমনাথ বলে উঠলেন, 'সে জন্যে তোমার দুশ্চিন্তা নেই। এখানকার কলেজটা কলকাতা ইউনিভার্সিটির আন্ডারে। ঢাকা শহর বাদ দিলে ইস্টবেঙ্গলে যত স্কুল কলেজ আছে তার প্রায় সবগুলোই কলকাতা ইউনিভার্সিটির আওতায় পড়ে।'

'তাই নাকি! আমার জানা ছিল না। যাক, ভালই হয়েছে।' অবনীমোহন নিশ্চিন্ত হলেন।

হেমনাথ খানিক ভেবে বললেন, 'এখানে তো থাকবে, কিন্তু কলকাতায় তোমার ব্যবসা ট্যবসা আছে না?'

'আছে।'

'তার কী হবে?'

'তুলে দেব। মাঝখানে একবার কলকাতায় যেতে হবে। সব বন্দোবস্ত করে সপ্তাখানেকের ভেতর ফিরে আসব। ভাবছি—'

'কী?'

pathagar.net

'চুপচাপ হাত-পা গুটিয়ে তো বসে থাকা যাবে না। এখানে কিছু ধান জমিটমি কিনে চাষবাস করব। একটা নতুন অভিজ্ঞতা হবে।'

'ঠিক আছে। কালই তোমার মিতাকে একটা খবর পাঠাচ্ছি। তার কাছে অনেক জমির খোঁজ আছে।'

'মিতা মানে মজিদ মিঞা?'

'হ্যাঁ।'

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হেমনাথ আর অবনীমোহনের কথা গোগ্রাসে গিলছিল বিনু। হঠাৎ কে যেন চাপা গলায় ডেকে উঠল, 'ছুটোবাবু—'

চমকে পেছন ফিরতেই দেখা গেল, বারান্দার খুঁটিতে ঠেসান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে যুগল। চোখাচোখি হতেই যুগল হাতছানি দিল।

পায়ে পায়ে ঘর থেকে বাইরে এল বিনু। বলল, 'ডাকছ কেন?'

চাপা খুশির সুরে যুগল বলল, 'বড় বাহারের সম্বাদ (খবর) ছুটোবাবু, বড় বাহারের সম্বাদ—'

বুঝতে না পেরে বিনু শুধলো, 'কী?'

'আপনেরা রাইজদাতেই থাকবেন।'

তারা রাজদিয়াবাসী হবে, এতে সবাই খুশি। হেমনাথ-ঝিনুক-শিবানী-স্নেহলতা, সব্বাই। যুগলও যে খুশি হবে, মনে মনে বিনু তা জানত।

যুগল বলল, 'ল'ন (চলুন) আমার লগে।'

'কেন?'

'মেলা কথা আছে।'

বিনু আর কিছু জিজ্ঞেস করল না। অন্ধকারে যুগলের সঙ্গে তার ঘরে চলে এল। হাতড়ে হাতড়ে কোত্থেকে একটা হেরিকেন বার করে জ্বালিয়ে ফেলল যুগল। বলল, 'বয়েন—'

বিনু পা ঝুলিয়ে চৌকিতে বসল। তারপর জানতে চাইল, 'কী কথা যেন বলবে—'

'তরাতরির কী ছুটোবাবু, ধীরেসুস্থে শোনেন—'

যুগলের চোখেমুখে আলো খেলে যাচ্ছে। দুই ঠোঁটের মধ্যিখানে আধফোটা একটু হাসি। বাইরেটা দেখে মনে হয়, প্রাণের ভেতর তার আনন্দের বান ডেকেছে। উৎসুক চোখে বিনু তাকিয়ে থাকল।

কিছুক্ষণ পর যুগল বলল, 'আইজ বিহান বেলায় বড়কত্তার লগে কমলাঘাট গ্যাছিলাম।'

বিনু বলল, 'জানি।'

'হেইহানে কী হইছে জানেন ছুটোবাবু?'

'কী?'

খুশির সঙ্গে খানিকটা উত্তেজনা মিশিয়ে যুগল ফিসফিস করল, 'গোপাল দাসের লগে দেখা। হেও (সেও) কমলাঘাট আইছিল।'

এত আনন্দের কারণ কিছুটা আন্দাজ করতে পারল বিনু। তাকিয়েই ছিল। বলল, 'সেই জন্যেই বুঝি এত ফুর্তি?'

যুগল শব্দ করে হাসতে লাগল।

বিনু আজকাল বিয়ের ব্যাপারে যুগলের সঙ্গে ঠাট্টা টাট্টা করে। রগড়ের গলায় বলল, 'শ্বশুরের সঙ্গে দেখা হলে কার না আনন্দ হয়!'

যুগল বলল 'অহনও হউর হয় নাই কিলাম।'

'দু'দিন পর হবে তো।'

'তা হইব।' যুগল তক্ষুনি ঘাড় কাত করল।

বিনু শুধলো, 'গোপাল দাস কী বললে?'

'আমারে কিছু কয় নাই। কথা বাত্‌রা যা কিছু বড়কত্তার লগেই হইছে।' যুগল বলতে লাগল, 'গোপাল দাস কী কইছে জানেন?'

'কী?'

pathagar.net

'বিয়ার সোময় পাখিরে যা-যা গয়নাগাটি দিব, বানাইয়া ফালাইছে। হার, চুড়ি, আংটি, কানের দুল, জামাইর আংটি—কিচ্ছু বাকি নাই। হেরপর অন্য জিনিসের কথা ধরেন। নয়া কাপড়-চোপড়, টিনের তোরঙ্গ, বিছনা-পাটি, আয়না-কাকই, বাসন-কোসন—হগল কিনা (কেনা) হইয়া গ্যাছে।' বলতে বলতে একেবারে বিভোর হয়ে গেল যুগল। তার চোখ চকচক করতে লাগল।

বিনু বলল, 'এত তাড়াতাড়ি সব কিনে ফেলল?'

যুগল অবাক, 'তরাতরি কই ছুটোবাবু! দিনের হিসাব কইরা দেখছেন?'

বিনু ঘাড় নাড়ল, হিসেব করেনি।

যুগল বলল, 'কাত্তিক মাস শ্যাষ হইয়া আইল। আর ছয় দিন পর অঘ্‌ঘান পইড়া যাইব। অঘ্‌ঘানের মাজামাজি ধান কাটা। একবার ধান কাটা আরম্ভ হইলে উয়াস (নিশ্বাস) ফালানের সময় পাইব না গোপাল দাস। এক-আধটুক জমিন তো হের (তার) না, এক লপ্তে বিশ কানি জমিন। বিশ কানিতে কত ধান হয়, চিন্তা কইরা দ্যাখেন। হেই হগল কাইটা-কুইটা, সেইত্যা ঘরে তুলতে পৌষ-মাঘ দুইখান মাস যাইব গিয়া। হের পরেই ফাগুন মাস। আর—'

'আর কী?' জিজ্ঞাসু চোখে বিনু তাকাল।

যুগল বলল, 'ফাগুন মাস পড়লেই বিয়া। এর ভিত্‌রে কিনা-কাটা সাইরা না রাখলে চলে?'

বিনুকে মাথা নাড়তেই হল, 'তা তো ঠিকই—'

একটু ভেবে যুগল আবার বলল, 'দুই-একদিনের ভিত্‌রেই গোপাল দাস আমাগো এইহানে আসব।'

'কেন?'

'বড়কত্তার কাছ থিকা পণের ট্যাকা আদায় করতে।'

বিনুর মনে পড়ে গেল, পাখির জন্য সেদিন পণ চেয়েছিল গোপাল দাস।

যুগল আবার বলল, 'ধান কাটার আগেই হগল ঝামেলা চুকাইয়া রাখতে চায় গোপাল দাস। হের পর ফাগুন পড়লেই পাখির আর আমার দুইজনের চাইর হাত এক কইরা দিব। ঝামেলা আগেই মিটাইয়া রাখন ভাল, না কী ক'ন ছুটোবাবু?' সমর্থনের আশায় বিনুর চোখের দিকে তাকাল সে।

বিনু মাথা হেলিয়ে দেয়।

কিছুক্ষণ নীরবতা।

তারপর যুগলই আবার শুরু করল, 'আমার বিয়ার সোময় আপনেরে কিন্তুক বরযাত্তী যাইতে হইব ছুটোবাবু। না গ্যালে ছাড়ুম না।'

বিনু তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'যাব, নিশ্চয়ই যাব।'

'আপনেরা এইহানে থাকবেন, আমার বিয়ায় যাইবেন—পরানে কী যে আনন্দ হইতে আছে ছুটোবাবু!'

বিনু উত্তর দিল না।

যুগল বলতে লাগল, 'পাখি আর আমার ব্যাপারটা আপনে তো হগলই জানেন ছুটোবাবু। হেই জল সাতরাইয়া পাখি আমার নায়ে আইল, তারে গান শুনাইলাম, তার লেইগা ছোক ছোক করতে করতে টুনি বইনের বাড়িত্ যাইতাম—কী না জানেন আপনে। আপনেরে যদি বিয়ার সোময় না পাইতাম, কী দুঃখু যে হইত!'

বিনু এবারও চুপ করে থাকে।

ধীরে ধীরে কার্তিকের রাত গাঢ় হতে লাগল।

পরের দিন সকালেই নৌকো দিয়ে যুগলকে কেতুগঞ্জে পাঠিয়ে দিলেন হেমনাথ। মজিদ মিঞাকে নিয়ে সে যখন ফিরল, হেমন্তের সূর্য মাথার ওপর উঠে এসেছে।

ক'দিন আগেও দুপুরবেলাটা অসহ্য লাগত। চারদিকে এত গাছপালা, এত জল, স্নিগ্ধ সুশ্যাম মাঠ, এমন অঢেল হাওয়া, তবু সূর্য মাথার ওপর এলে তাতে গা পুড়ে যেত।

কার্তিক মাস পড়তেই সূর্যটা কেমন যেন জুড়িয়ে যেতে শুরু করেছে। রোদের স্বভাব যাচ্ছে দ্রুত বদলে। দুপুরবেলাগুলোও এখন বেশ আরামদায়ক। হাওয়াতে টান ধরেছে। শীত যে আসছে, এ তারই ভূমিকা।

মজিদ মিঞাকে আনবার জন্যই যুগলকে পাঠানো হয়েছিল। যেতে-আসতে যুগলের দুপুর হয়ে যাবে। মোটামুটি সময়ের এই হিসেব ধরে হেমনাথ আর অবনীমোহন বাইরের ঘরে অপেক্ষা করছিলেন। বিনুও সেখানে ছিল।

আন্দাজটা মোটামুটি সঠিক। জানলা দিয়ে বিনুরা দেখতে পেল, যুগলের নৌকো পুকুরঘাটে এসে ভিড়েছে। ভিড়বার সঙ্গে সঙ্গে লাফ দিয়ে পাড়ে নামল মজিদ মিঞা। তারপর উল্লসিত, উত্তেজিত গলায় চেঁচাতে চেঁচাতে বাড়ির দিকে ছুটতে শুরু করল, 'আমার মিতায় কই? ঠাউর ভাই কই?'

মজিদকে দেখে সবাই বাইরে এসে দাঁড়িয়েছিল। হেমনাথ গলা তুলে বললেন, 'এই যে আমরা।'

কাছে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে মজিদ মিঞা বলল, 'কথাহান কি সত্য ঠাউর ভাই?' বলে হেমনাথের দিকে তাকাল।

হেমনাথ শুধোলেন, 'কোন কথা?'

'আমার মিতায় নিকি রাইজদায় থাইকা যাইব?'

'হ্যাঁ।'

অত বড় মানুষটা, প্রায় অবনীমোহনের সমবয়সী—আনন্দে উত্তজনায় কী করবে, কী না করবে যেন ভেবে পেল না। ছুটে এসে বিনুকে কোলেই তুলে নিল, তারপর আবেগের গলায় বলল, 'যুগইলা গিয়া যহন এই কথা কইল, আমি তো বিশ্বাসই করি নাই।'

হেমনাথ বললেন, 'ঘরে আয়—'

সবাই ঘরে গেল। মজিদ মিঞা বিনুকে ছাড়ে না, তাকে কোলে নিয়েই তক্তপোশে বসল। বিনু বারকতক উশখুশ করল, কিন্তু মুক্তি পাওয়া গেল না।

মজিদ মিঞা বলল, 'বিহানবেলা বাইর হইতে আছি, যুগইলা গিয়া হাজির। তারে দেইখা আমি আটাস (অবাক), মনে মনে এট্টু ডরও ধরছিল। দরকার পড়লে ঠাউর ভাই নিজেই আমার বাড়িত্ যায়, তয় যুগইলা আইল ক্যান? কী সম্বাদ হেয় (সে) লইয়া আইছে, কেঠা জানে।'

হেমনাথ শুধোলেন, 'তারপর?'

মজিদ মিঞা আর বলতে পারল না। পুকুরঘাট থেকে যুগল এসে কখন যে চৌকাঠের ওপর দাঁড়িয়েছে, কারোর খেয়াল নেই। সে বলল, 'হেরপর আমি যহন কইলাম, জামাইকত্তারা (অবনীমোহনরা) এইহানেই থাকব তহন মিঞাভাই তেনার পোলাপানেরে ডাইকা, বাপেরে ডাইকা, মায়েরে ডাইকা, ভাবীজানরে ডাইকা, কেতুগঞ্জের বেবাক মাইনষেরে ডাইকা চাইর দিক উথাল পাথাল কইরা ফেলাইল। মিঞাভাইর মুখে খালি একহান কথা, আমার কইলকাতার মিতায় এইবার রাইজদাবাসী হইব।'

মুখময় কাঁচাপাকা দাড়ি। তার ফাঁকে জগতের সরলতম হাসিটি হেসে মজিদ মিঞা বলল, 'কথাহান শুইনা আহ্লাদে আটখান হইয়া গ্যাছিলাম। আহ্লাদ হইলে মাইনষেরে ডাইকা ডাইকা কমু না?'

মজিদের আনন্দ, মজিদের আন্তরিকতা প্রাণের ভেতরটাকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায়। অভিভূত অবনীমোহন বললেন, 'হাজার বার বলবেন—'

মজিদ মিঞা যেন শুনতে পেল না। ঘোরের ভেতর থেকে বলে উঠল, 'আইজ বিহান বেলায় যার মুখ দেইখা যে উঠছিলাম, জন্ম জন্ম য্যান তার মুখ দেইখাই উঠি।'

একটুক্ষণ চুপ।

তারপর মজিদ মিঞা নীরবতা ভাঙল, 'অহন ক'ন কিসের লেইগা ডাইকা পাঠাইছেন—'

হেমনাথ বললেন, 'খুব দরকারী কথা আছে তোর সঙ্গে—'

মজিদ মিঞা উৎসুক চোখে তাকাল।

হেমনাথ বলতে লাগলেন, 'এখন না, খাওয়াদাওয়া কর। তারপর ধীরে সুস্থে শুনিস।'

মজিদ মিঞার তর সয় না। বলল, 'না, অহনই ক'ন।'

এইসময় ভেতর-বাড়ি থেকে করিম এসে জানায়, রান্নাবান্না হয়ে গেছে। স্নেহলতা বলে দিয়েছেন, এক্ষুনি যেন সবাই চান টান করে নেয়।

হেমনাথ বললেন, 'ওই যে তলব এসে গেছে। এখন যদি বসে বসে কথা বলতে থাকি, তোর আমার কারোর মাথাই বাঁচবে না।'

খাওয়াদাওয়ার পর পর্যন্ত ধৈর্য ধরে থাকতে পারল না মজিদ মিঞা। খেতে বসে সে বলল, 'ঠাউর ভাই, আমি কিন্তুক সোয়াস্তি পাইতে আছি না।'

হেমনাথ তাকালেন, 'কেন?'

'ক্যান আবার। যে কথা কওনের লেইগা ডাইকা আনলেন অহনও তা কইতে আছেন না—'

হেমনাথ হেসে ফেললেন, 'তুই বড় অস্থির মজিদ—'

মজিদ মিঞা তক্ষুনি ঘাড় কাত করল, 'লাখ কথার এক কথা। সত্যই আমি বড় অস্থির। ধৈয্য বড় কম।'

সঙ্গে সঙ্গে কিছু বললেন না হেমনাথ। মনে মনে খানিক চিন্তা করে একসময় শুরু করলেন, 'অবনীর খুব ইচ্ছে এখানে কিছু জমিজমা কেনে। চাষ-আবাদ করতে চায়—'

মজিদ মিঞা লাফিয়ে উঠল, 'এ তো বড় আনন্দের কথা—'

'আগে সবটা শোন। তারপর লাফাস।'

'আইচ্ছা ক'ন—'

হেমনাথ বলতে লাগলেন, 'আমি তো জমিজমার খবর রাখি না। তুই এ ব্যাপারে দেখেশুনে কিছু ভাল জমি অবনীমোহনকে কিনে দে। দেখিস, পরে যেন আবার মামলা মোকদ্দমা না বাধে।'

মজিদ মিঞা বলল, 'জমিন কিনতে হইব না।'

হেমনাথ অবাক, 'না কিনলে পাবে কোত্থেকে?'

'আমার দ্যাড় শ' কানি জমিন আছে। তার থিকা তিরিশ কানি মিতারে দিয়া দিমু। শখ মিটাইয়া তেনি চাষবাস করুক।'

অবনীমোহন অভিভূত। কেউ যে এমন অক্লেশে মাত্র দু'দিনের আলাপে অতখানি জমি দিয়ে দেবার কথা বলতে পারে তা যেন অভাবনীয়। তবু বিব্রত বোধ করতে লাগলেন অবনীমোহন। বললেন, 'না না, আপনার জমি দেবেন কেন?'

মজিদ মিঞা বলল, 'দিলামই না হয়। আপনে আমার আপনজন না?'

'নিশ্চয়ই আপনজন। তবে—'

অবনীমোহন কথা শেষ করতে পারলেন না। তার আগেই মজিদ মিঞা বলে উঠল, 'নিজের ভাই-বন্দুরে কেও যদিন কিছু দ্যায় তা নিতে দোষের কিছু আছে?'

অবনীমোহন বললেন, 'দোষের কিছু না—'

'তয়?'

'নেবারও তো সীমা থাকা উচিত।'

মজিদ মিঞা কোনও কথাই শুনতে চায় না। বিনে পয়সায় তার জমি নিতেই হবে। না নিলে চারধারে তাবত মানুষকে বলে দেবে কেউ যেন অবনীমোহনের কাছে জমি না বেচে।

মজিদ মিঞা কিছুতেই দাম নেবে না। ওদিকে অবনীমোহনও দাম ছাড়া জমি নেবেন না।

শেষ পর্যন্ত হাসতে হাসতে হেমনাথই মধ্যস্থতা করলেন। বললেন, 'দ্যাখ মজিদ, তোর কথাটা বুঝতে পারছি। অবনীমোহনকে তুই নিজের জন ভাবিস। সেদিক থেকে কিছু দিলে হাত পেতে নেওয়াই উচিত। কিন্তু অবনীমোহনের দিকটাও ভেবে দ্যাখ—'

'কুন দিক?'

'দাম দিয়ে না কিনলে কোনও জিনিসই নিজের মনে হয় না। মনে হয় দান নিচ্ছি। অবনী যদি দাম দিতে না পারত সেটা ছিল আলাদা কথা। তাই বলছিলাম কি—'

'কী?'

'বাজারে যা দাম, তুই তার চাইতে কিছু কম নে। ওটুকু সুবিধা করে দিলেই অবনী খুশি। বন্ধু ছাড়া, নিজের লোক ছাড়া কে-ই বা তা দেয়।'

একটু চুপ করে থেকে মজিদ মিঞা বলল, 'আপনে যা কইলেন তাই হইব। কুনোদিন আপনের অবাইধ্য তো হই নাই। তয় একহান কথা—'

'বল।'

'আমি যে দাম কমু তার বেশি সিকি পয়সা দিলেও কিন্তুক নিতে পারুম না।'

'বেশ, তাই হবে।' হেমনাথ হাসলেন।

মজিদ মিঞা বলল, 'তরাতরি খাইয়া দাইয়া ল'ন, আইজই মিতারে জমিন দেখাইয়া দিমু।'

খাওয়াদাওয়ার পর বিশ্রামের সুযোগ পাওয়া গেল না। একরকম তাড়া দিয়েই অবনীমোহন আর হেমনাথকে নৌকোয় নিয়ে তুলল মজিদ মিঞা। বিনু সঙ্গ ছাড়ল না, সেও ওঁদের সঙ্গে নৌকোয় উঠল।

যুগলের এখনও চান-খাওয়া হয়নি। ঠিক হল, মজিদ মিঞা নিজেই নৌকো বেয়ে যাবে।

বিনু অবাক হয়ে গিয়েছিল, জমি দেখানোর ব্যাপারে সবার চাইতে বেশি উৎসাহ মজিদ মিঞার। অবনীমোহনরা রাজদিয়াবাসী হলে জগতে তার মতো সুখী বুঝিবা আর কেউ হবে না।

হেমন্তের প্রান্তরে ঘুরে ঘুরে জমি দেখা শুরু হল। মাটি অবশ্য দেখা গেল না। কেননা, কার্তিকের শেষাশেষি এই সময়টায় মাঠে জল আছে। আর সেই জলের ওপর মাথা তুলে আছে থোকা থোকা— একটানা দিগন্ত পর্যন্ত—ধানের মঞ্জরী। যেদিকে যতদূর চোখ ফেরানো যাক, মাঠের ঝাঁপি পরিপূর্ণ হয়ে আছে।

ক'দিন আগেও ধানের রং সবুজ দেখেছে বিনু। নরম তুষের ভেতর তখন সবে দুধ জমেছে। আর এখন? ধানের খেতকে আর চেনাই যায় না। কোনও জাদুকর শ্যামল মাঠকে সোনালি লাবণ্যে কখন ভরে দিল, কে জানে।

জমি দেখাতে দেখাতে বিকেল হেলে গেল। ধানের মঞ্জরীর ভেতর দিয়ে পথ করে নৌকো চলেছে তো চলেছেই।

একসময় মজিদ মিঞা অবনীমোহনের উদ্দেশে বলল, 'এতগুলান জমিন দেখাইলাম, কুনটা পছন্দ হইল ক'ন—'

অবনীমোহন বললেন, 'আমার তো সব জমিই ভাল লাগল। চমৎকার ধান হয়ে আছে।'

জোরে জোরে মাথা নেড়ে মজিদ মিঞা বলল, 'উঁহু—'

'কী?'

'এই চকের সব জমিনই ভালা না মিতা। এইর ভিতর সরস নীরস আছে।'

'তাই নাকি?'

'হ—' মজিদ মিঞা ঘাড় কাত করল।

অবনীমোহন বললেন, 'আমি তো বুঝতে পারছি না। সব জায়গাতেই সুন্দর ধান ফলেছে।'

'মিতা, আপনে ভালা কইরা ধানটা খেয়াল করেন নাই। করলে বুঝতেন, যেই জমিনে ঘন হইয়া মোটা গোছে ধানগাছ ফনফনাই উঠছে হেই জমিনই ভালা জমিন। আর যেই জমিনে ধানগাছ পাতলা পাতলা, হেই জমিন তত ভালা না।'

'সত্যি, আমি অতটা খেয়াল করিনি।'

মজিদ মিঞা বলল, 'জমিন চিনা (চেনা) সহজ না।'

অবনীমোহন বললেন, 'নিশ্চয়ই। আমি বলি কি, আর ঘোরাঘুরিতে দরকার নেই। আপনি যে জমি পছন্দ করে দেবেন, আমি তাই নেব।'

কথাটা যুক্তিসঙ্গত মনে হল। মজিদ মিঞা বলল, 'হেই ভাল।'

জমি দেখার পর ফেরার পালা। বাড়ি ফিরতে ফিরতে সন্ধে নেমে গেল।

দিন দুই পর অবনীমোহন কলকাতা রওনা হলেন। ওখানকার সব ব্যবস্থা করে ফিরতে ফিরতে এক সপ্তাহ। রাজদিয়ায় ফিরেই জমি রেজিস্ট্রি করার ইচ্ছা। হেমনাথ এবং মজিদ মিঞাকে এ ব্যাপারে সব বন্দোবস্ত করে রাখতে বলেছেন তিনি। দুপুরের স্টিমারে অবনীমোহন চলে গেলেন।

বিকেলবেলা পুবের ঘরে সুধা আর বিনু বসে ছিল। সুনীতি জানালার শিক ধরে বাইরের দিকে

pathagar.net

তাকিয়ে গাইছিল ঃ

'ভালবাসিবে বলে ভালবাসি নে
আমার এই রীতি,
তোমা বই জানি নে।
বিধু মুখে মধুর হাসি
দেখিলে সুখেতে ভাসি,
তাই তোমারে দেখিতে আসি,
দেখা দিতে আসি নে।'

গাইতে গাইতে হঠাৎ থেমে গেল সুনীতি।

সুধা বলল, 'বেশ তো গাইছিলি, থামলি কেন?'

ঠোঁট টিপে সুনীতি বলল, 'তোর বিধু মুখে মধুর হাসি দেখবার জন্যে কে আসছে দ্যাখ সুধা। উঠে দ্যাখ—'

সুধা, তার সঙ্গে বিনু জানালার বাইরে তাকাতেই দেখতে পেল, বাগান পেরিয়ে এদিকেই আসছে হিরণ।

অনেক দিন পর হিরণ এ বাড়িতে এল। পুজোর আগে নাটক টাটকের ব্যাপারে নিয়মিত হানা দিত সে। পুজোর পার বার দুই মোটে তাকে দেখা গেছে। বিজয়ার পরের দিন একবার, আরেক বার কোজাগরীর রাত্তিরে। তারপর থেকে হিরণ নিরুদ্দেশ।

এই তো সেদিন তার সঙ্গে আলাপ। দেখামাত্র বিনুদের জয় করে নিয়েছিল হিরণ। বিশেষ করে সুরমা আর অবনীমোহনের তো খুবই ভাল লেগেছে তাকে।

নিয়ম করে যে দু'বেলা আসছিল, হঠাৎ পনের কুড়ি দিন তার খোঁজখবর নেই। সুরমা এবং অবনীমোহন চিন্তিত হয়েছেন, রোজই হিরণের কথা বলাবলি করেছেন। হেমনাথের অবশ্য দুর্ভাবনা নেই। হিরণকে তিনি চেনেন। হাসতে হাসতে বলেছেন, 'ওটা এরকমই। এল তো দিনে দশ বারই এল। তারপর এমন উধাও হল যে বিশ পঁচিশ দিন আর পাত্তাই নেই।' হিরণের স্বাভাব জেনেও তার খোঁজে যুগলকে কয়েক দিন পাঠিয়েছেন। যুগল এসে জানিয়েছে, হিরণ নেই। কোথায় গেছে, বাড়ির লোকেরা জানে না।

বাগান পেরিয়ে একটু পর হিরণ পুবের ঘরে চলে এল। খুশির সুরে বলল, 'তিন ভাইবোনই এখানে আছে দেখছি।'

'হ্যাঁ।' সুনীতি ঘাড় কাত করল। কণ্ঠস্বরে দোলা দিয়ে বলল, 'আপনি তো বেশ লোক মশাই—'

হিরণ হকচকিয়ে গেল, 'কেন?'

'সেই যে লক্ষ্মীপুজোর দিন এলেন, তারপর আর পাত্তাই নেই। বাড়িতে লোক পাঠিয়েও খোঁজ পাওয়া যায় না। কোথায় নিরুদ্দেশ হয়েছিলেন?'

'মুন্সিগঞ্জে আমার এক বন্ধুর বাড়ি গিয়েছিলাম। ওরা কিছুতেই ছাড়ল না। দিন পনের কুড়ি কাটিয়ে আসতে হল।'

'বাঃ বাঃ, চমৎকার!'

ভয়ে ভয়ে হিরণ জিজ্ঞেস করল, 'কী?'

সুনীতি বলল, 'পনের কুড়ি দিন উধাও হয়ে থাকলেন। বাড়িতে একটা খবরও তো পাঠাতে হয়।'

'রোজই ভেবেছি পাঠাব। পাঠাব পাঠাব করে পাঠানো আর হয়নি, শেষ পর্যন্ত চলে এলাম।'

'বাড়ির লোকেদের দুশ্চিন্তায় ফেলে কী লাভ?'

'বাড়ির লোকেরা দুশ্চিন্তা করে না। মাঝে মাঝেই আমি ডুব দিই, সবার এতে অভ্যেস হয়ে গেছে।' হিরণ বলতে লাগল, 'সে যাক গে। আজই মুন্সিগঞ্জ থেকে ফিরেছি। স্টিমারঘাটে নেমে একটা সুখবর পেলাম। শুনে আমাদের বাড়িতে একবার দেখা দিয়েই আপনাদের এখানে ছুটতে ছুটতে আসছি।'

pathagar.net

সুনীতি শুধলো, 'কী এমন সুখবর যে ছুটে আসতে হল?'

উৎসাহের গলায় হিরণ বলল, 'আপনারা নাকি কলকাতায় ফিরছেন না; রাজদিয়াতেই থেকে যাবেন?'

'আপনাকে কে বললে?'

'জীবন ঘোষ।'

'জীবন ঘোষ আবার কে?'

হিরণ হাসল, 'সবাইকে কি আপনি চিনবেন? স্টিমারঘাটের পাশে সারি সারি মিষ্টির দোকান দেখেছেন তো?'

সুনীতি মাথা নেড়ে জানালো, দেখেছে।

হিরণ বলল, 'প্রথম দোকানটা জীবন ঘোষের।'

সুনীতি অবাক। বিস্ময়ের সুরে বলল, 'মিষ্টির দোকানদারদের কাছেও এ খবর পৌঁছে গেছে!'

'ইয়েস ম্যাডাম।' হিরণ জিজ্ঞেস করল, 'খবরটা ঠিক তো?'

'ঠিক।'

হিরণের চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। উৎফুল্ল সুরে বলল, 'সত্যি গুড নিউজ। আমার কী আনন্দ যে হচ্ছে!'

সুনীতির কপাল কুঁচকে গেল। ঘাড়খানা ঈষৎ হেলিয়ে চোখ আধাআধি বুজে নীরস গলায় শুধলো, 'আমরা থাকব, তাতে আপনার আনন্দ কেন হবে মশাই?' বলেই আড়ে আড়ে সুধার দিকে তাকাল।

সুধার অবস্থা অবর্ণনীয়। মুখ নীচু করে সমানে নখ খুঁটে যাচ্ছে সে, খুঁটেই যাচ্ছে।

এদিকে হিরণ থতমত খেয়ে গেছে। ফস করে জোরালো ঝলমলে আলো নিবে গেলে যেমন হয়, তার মুখের চেহারা অবিকল সেইরকম। কাঁপা শিথিল গলায় বলল, 'বা রে, আপনারা থাকলে আমার আনন্দ হবে না?'

এমনিতে সুনীতি বেশ গম্ভীর, মৃদুভাষিণী। চপলতা তরলতা ওর ধারে কাছে নেই। কিন্তু হিরণকে এতদিন পর পেয়ে আজ যেন কী হয়ে গেছে। আপন স্বভাবে ফিরে আসা মানেই নেই সুনীতির। প্রগলভতার ঈশ্বর বুঝিবা তার ওপর ভর করে বসেছে। কপালে আরও কটা ভাঁজ ফেলে, চোখ আরও ছোট করে সে বলল, 'আনন্দের একটা কারণ তো থাকবে। সেটা কী?'

সুধা আর বিনুকে দ্রুত এক পলক দেখে নিয়ে বিব্রত, বিপন্ন মুখে হিরণ বলল, 'মানে—মানে—আপনারা হেমদাদুর আত্মীয়। তাই—'

'হেমদাদুর আত্মীয় তো আপনার কী? আনন্দ হলে হেমদাদুরই হওয়া উচিত।' সুনীতি আজ বড়ই নির্দয়।

হিরণ কী বলবে, ভেবে পেল না। কিছু একটা বলতে চেষ্টা করল, গলায় স্বর ফুটল না।

একটু নীরবতা।

তারপর অতি দ্রুত সুনীতির মুখচোখের চেহারা বদলে যেতে লাগল। গলাখানা আগের মতো ঈষৎ বাঁকিয়েই রাখল সে। চোখের তারা দু'টো উজ্জ্বল কালো মণির মতো কৌতুকে ঝিকমিক করতে লাগল। ঠোঁটের প্রান্তে আধোগোপন একটুখানি হাসি। তার সারা গায়ে অদৃশ্য ঢেউয়ের মতো কী যেন খেলে বেড়াতে লাগল।

খুব চাপা গলায় সুনীতি হঠাৎ ফিসফিস করল, 'বুঝলেন মশাই—'

চকিত হিরণ তার চোখের দিকে তাকিয়ে ভীরু গলায় সাড়া দিল, 'কী?'

'খুব আনন্দ হয়েছে, না?'

হিরণ চুপ। কী উত্তর দিলে ঠিক হবে তা যেন স্থির করে উঠতে পারছে না। ক্ষণে নিঠুরা, ক্ষণে মধুরা—সুনীতির এইরকম দ্রুত স্বভাব-বদল আগে আর কখনও দেখেনি সে।

রঙ্গিণী নায়িকার মতো লীলাভরে হাত নেড়ে সুনীতি বলল, 'পনের কুড়ি দিন উধাও হয়ে থেকে আজ এসে বলছেন, আনন্দ হয়েছে। ওভাবে আনন্দ প্রকাশ করে না মশাই—'

ইতিমধ্যে খানিকটা সাহস সঞ্চয় করে নিয়েছে হিরণ। মুখ তুলে একবার সুনীতিকে দেখে নিয়ে

বলল,'কিভাবে তা হলে করে?'

'সুধার কাছে জেনে নিন।' বলেই বিনুর দিকে ফিরল সুনীতি, 'চল রে বিনু, আমরা বাগানে যাই—'

হিরণের চোখেমুখে আগের উজ্জ্বলতা ফিরে এসেছে। রঙ্গিণী এবং নির্দয়া, দুই রূপেই যে সুনীতি মজা করেছে, এতক্ষণে বুঝে ফেলেছে হিরণ। মাথাটা সামনের দিকে অনেকখানি ঝুঁকিয়ে সে বলল, 'আপনি সত্যিই মহানুভব।'

'বলছেন?'

'একশ'বার।'

বিনুকে নিয়ে দু'পা গিয়েই হঠাৎ কী মনে পড়ে যেতে পেছন ফিরল সুনীতি। বলল, 'দুনিয়ার সব স্কুল-কলেজ খুলে গেছে। আপনার ইউনিভার্সিটি এ বছর খোলার আশা আছে?'

'নিশ্চয়ই আছে।' হেসে হেসে হিরণ বলল, 'আজ থেকে তিনদিন পর খুলবে।'

'ইউনিভার্সিটি খুললেই তো ঢাকায় গিয়ে থাকবেন?'

'তা তো থাকতেই হবে।'

'কিন্তু—'

'কী?'

একটু ভেবে সুনীতি বলল, 'একটানা ঢাকায় গিয়ে থাকলে চলবে না। মাঝে মাঝে এখানে এসে আনন্দ প্রকাশ করে যাবেন, বুঝলেন?'

মাথাটা অনেকখানি হেলিয়ে হিরণ বলল, 'আপনার আদেশ মাথা পেতে নিলাম।'

সুনীতি আর কিছু বলল না। বিনুকে সঙ্গে নিয়ে ইঙ্গিতময় একটু হেসে বাগানের দিকে চলে গেল।

কিছুক্ষণ পর ছুটতে ছুটতে সুধা বাগানে এল। হেমন্তের বাতাসে তার পিঠময় খোলা চুল উড়ছে, চোখের তারায় আগুনের হলকা খেলে যাচ্ছে। বুকটা ঢেউয়ের দোলায় একবার উঠছে, একবার নামছে। সুধা যেন এখন রণরঙ্গিণী।

বিনু সুনীতি এখানেই ছিল। বাগানের উত্তর দিকে খালের ধার ঘেঁষে একটা রোয়াইল ফলের গাছ। হলুদ রঙের গোল গোল ফলগুলি যেমন টক তেমনি সুস্বাদু। সুনীতি কোঁচড় ভরে পেড়ে নিয়েছিল, বিনু নিয়েছিল পকেট বোঝাই করে। তারপর বাগানময় ঘুরে ঘুরে টপাটপ মুখে ফেলছিল।

সুধা এসে সোজা সুনীতির একটা হাত চেপে ধরল। এত জোরে ধরেছে যে বাহুর কোমল মাংসে নখ বসে গেছে।

সুনীতি বলল, 'উঃ, লাগে। ছাড় সুধা—' যন্ত্রণায় তার চোখমুখ কুঁচকে গেছে।

সুধা ছাড়ল না। ধারাল গলায় বলল 'এটা কী হল?'

'কোনটা?'

'আমাকে আর হিরণবাবুকে ওভাবে রেখে চলে এলি যে?'

যন্ত্রণার মধ্যেও হেসে ফেলল সুনীতি। গলা নামিয়ে ফিসফিস করল, 'তোরা তাই চেয়েছিলি যে।'

সুধা খুব রেগে গেল, 'কী চাই, তোর কানে কানে বুঝি বলেছিলাম?'

'বলতে হবে কেন?'

'তবে?'

'আমি কি কচি খুকি, কিছুই বুঝি না?'

সুধা ভেংচি কাটার মতো করে বলল, 'কচি খুকি হবি কেন, তুই সব্বার ঠাকুমা। বুঝবি আবার না? একেবারে অন্তর্যামী হয়ে বসে আছিস।'

সুনীতি হাসতে লাগল, 'আছিই তো।'

সুধা এবার খেপে উঠল, 'আমাকে আর হিরণবাবুকে নিয়ে আবার যদি এরকম করিস খুব খারাপ হয়ে যাবে।'

কৌতুকের গলায় সুনীতি বলল, 'সত্যি।' শব্দটার ওপর কণ্ঠস্বরের সবটুকু জোর ঢেলে দিল সে।

'সত্যি না তো মিথ্যে?'

সুনীতি এবার এক কান্ডই করল। আঙুলের ডগায় পানপাতার সরু সুছাঁদ প্রান্তের মতো সুধার মনোহর চিবুকটি তুলে ধরে মাথা দুলিয়ে বলল, 'আমার বেলায় বুঝি মনে ছিল না?'

সুধা বলল, 'তোর সঙ্গে আবার কী করলাম?'

'এর ভেতরেই ভুলে গেলি?'

'কিছু করলে তো মনে থাকবে।'

সুর টেনে টেনে সুনীতি বলল, 'কিচ্ছু করো নি?'

সুধা বলল, 'না।'

'আনন্দবাবু আর আমাকে নৌকোয় তুলে সেদিন ঠেলে দিয়েছিল কে? এবার মনে পড়েছে?' সুধার চিবুকটা আরেকটু ওপরে তুলল সুনীতি।

সুধা এবার হেসে ফেলল, 'তাই বুঝি শোধ তুললি?'

'ঠিক তাই। এবার থেকে মনে রাখবি, এক মাঘে শীত যায় না।'

'রাখব, তুইও রাখিস।'

দুই বোন হাত ধরাধরি করে হঠাৎ গলা মিলিয়ে হেসে উঠল।

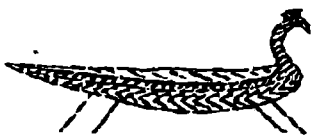

হিরণ ভবতোষ কিংবা মজিদ মিঞাই শুধু নয়, বিনুরা যে এখন থেকে রাজদিয়াতে থাকবে, এখানকার স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে যাবে, এ খবরটা জানতে রাজদিয়ার কারোর আর বাকি রইল না। এবং মুখে মুখে দিগ্বিদিকে ছড়িয়েও পড়তে লাগল।

সকাল নেই দুপুর নেই, আজকাল লোক আসছেই। নিকারীপাড়া মৃধাপাড়া কুমোরপাড়া কামারপাড়া যুগীপাড়া ঋষিপাড়াই বা কেন, দূর দূরান্তের গ্রামগঞ্জ থেকে জলস্রোতের মতো মানুষ আসছে। বিনুরা এখানে থাকবে, তাদের প্রতিবেশী হিসাবে পাওয়া যাবে—এতে সবাই আনন্দিত, গর্বিত। আনন্দ আর গর্বের কথাটা তারা আন্তরিক সুরে বলে যেতে লাগল।

বিনুদের জন্য সারা রাজদিয়া জুড়ে উৎসব শুরু হয়ে গেছে বুঝি। তাদের থাকার কথা শুনে এত লোক যে ছুটে আসতে পারে তা যেন ভাবাই যায় না।

বিস্মিত, অভিভূত সুরমা তো বলেই ফেলেছেন, 'যেখানকার মানুষ এত ভাল সে জায়গা স্বর্গ।'

দেখতে দেখতে অঘ্রান মাস পড়ে গেল।

একদিন সকালবেলা দুই দিদি আর ঝিনুকের সঙ্গে দক্ষিণের ঘরের বারান্দায় পড়তে বসেছিল বিনু। কলকাতায় গিয়ে অ্যানুয়াল পরীক্ষা অবশ্য দিতে হবে না। সেদিক থেকে দুর্ভাবনা না থাকলেও জানুয়ারি মাসে অ্যাডমিসন টেস্ট দিয়ে এখানকার স্কুলে ভর্তি হতে হবে। তাই বই টইগুলোর সঙ্গে একটু আধটু যোগাযোগ রাখা দরকার।

পড়াশোনা যখন চলছে, হঠাৎ কোত্থেকে যুগল এসে হাজির। উঠোনের কোণ থেকে ইশারায় বিনুকে ডেকে নিয়ে খুব উৎসাহের সুরে বলল, 'ছুটোবাবু, কাউঠ্যার মাংস খাইছেন কুনোদিন?'

বিনু বলল, 'কাউঠ্যা কী?'

'কাউঠ্যা চিনেন না?'

'না।'

যুগল এবার এমনভাবে তাকাল যাতে মনে হয়, 'কাউঠ্যা' না চেনার ফলে জীবন একেবারে ব্যর্থ হয়ে গেছে বিনুর। কিছুক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকার পর 'কাউঠ্যা' নামক প্রাণীটির রূপগুণ বংশ-পরিচয়ের বিবরণ দিতে শুরু করল সে, 'কাউঠ্যা জলে থাকে, গোল দেখতে। পিঠের চারাখান লোহার লাখান শক্ত। কাউঠ্যার লাখান আরেকখান জলের পোক আছে—কাছিম। কাছিমের দুই ধারে যে বাদি আছে তা খাইতে লাগে নাইরকলের লাখান। চাবাইলে কচ কচ করে।'

সবটা বলা হল না। আধাআধি শুনেই বিনু প্রায় চেঁচিয়ে উঠল, 'তুমি কচ্ছপের কথা বলছ?'

'হ হ, কচ্ছম—'

'তাই বল। আমি ভাবলাম, না জানি কী। কাউঠ্যা কাউঠ্যা করলে লোকে কখনও চিনতে পারে?'

এবার বিব্রত হবার পালা যুগলের। হাত কচলাতে কচলাতে সে বলল, 'কী করুম ছুটোবাবু, আমরা তো আর এংরাজি-মেংরাজি শিখি নাই। আমরা কাউঠ্যাই কই—'

ইংরেজি শেখার সঙ্গে 'কাউঠ্যা' বলার সম্পর্ক কী, বিনু ভেবে পেল না। এ ব্যাপারে আর কিছু জিজ্ঞেস না করে বলল, 'কচ্ছপ আমি ঢের দেখেছি, তবে তার মাংস খাইনি।'

'মাংস যদি খাইতে হয়, ল'ন আমার লগে। এক শালারে জলের তলে উদ্দিশ কইরা এক-নাইলা (যার একটিমাত্র ফলা) টেটা নিতে আইছি। গিয়াই গাথুম।' যুগল বলতে লাগল, 'টেটা নিতে আইসা আপনের কথা মনে পড়ল ছুটোবাবু। ভাবলাম ডাইকা নিয়া যাই—'

মাংসের লোভ খুব একটা নেই। জলের তলায় কোথায় কচ্ছপ দেখে এসেছে যুগল, কিভাবে সেটাকে গেঁথে ওপরে তুলবে, তাই ভেবে উত্তেজনা বোধ করতে লাগল বিনু। উৎসাহের সুরে বলল, 'চল—'

'এট্টু খাড়ন, টেটাটা নিয়া আসি।'

ছুটে গিয়ে নিজের ঘর থেকে এক ফলাওলা একটা টেটা এবং এক টুকরো চ্যাপ্টা ভারী লোহার পাত নিয়ে এল যুগল। বলল, 'আহেন—'

বইপত্তর দক্ষিণের ঘরের বারান্দায় ছড়িয়েই রইল। যুগলের পিছু পিছু ছুট লাগায় বিনু। এই মুহূর্তে, কোথায় কোন অদৃশ্যে বসে জলতলের এক প্রাণী তাকে অবিরাম হাতছানি দিয়ে যাচ্ছে যেন।

উঠোন বাগান পেরিয়ে রাস্তায় আসতেই হঠাৎ বিনুর মনে সন্দেহ দেখা দিল। আস্তে করে সে ডাকল, 'যুগল—'

যুগল তক্ষুনি সাড়া দিল, 'কী ক'ন ছুটোবাবু?'

সংশয়ের গলায় বিনু বলল, 'তুমি তো সেই কখন কচ্ছপটাকে দেখে এসেছ। সে কি এতক্ষণ আমাদের জন্যে বসে আছে! গিয়ে হয়তো দেখব, পালিয়ে গেছে।'

বিজ্ঞের মতো একটু হাসল যুগল, 'কাউঠ্যার চরিত্তির আপনে জানেন না ছুটোবাবু—'

যুগল ঠিক কী বলতে চায়, বুঝতে না পেরে জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে থাকল বিনু।

যুগল আবার বলল, 'শালারা অ্যামন আইল্সা (অলস) যে সহজে লড়তে চায় না। দিনের পর দিন এক জাগায় শুইয়া থাকতে ভালাবাসে। আমি যে কাউঠ্যাটারে এট্টু আগে দেইখা আইছি, হেইটা ঠিক উইহানেই থাকব। তয়—'

'তবে কী?'

'আর কারোর নজরে পড়লে অন্য কথা।'

বিনু শুধলো, 'আর কেউ দেখলে কী হবে?'

যুগল হাতের অস্ত্রটা দেখিয়ে বলল, 'এইরকম টেটা দিয়া গাইথা নিয়া যাইব গা।'

একটু চুপ।

তারপর যুগলই আবার শুরু করল, 'জানেন ছুটোবাবু, নানান জাতের কাউঠ্যা আছে। জউলা কাউঠ্যা, কালি কাউঠ্যা, ছন্দি কাউঠ্যা—'

এক নাগাড়ে কত নাম যে বলে গেল যুগল। শুনতে শুনতে অবাক হয়ে গিয়েছিল বিনু। বলল, 'এত রকম কচ্ছপ!'

'হ।'

'আমাকে চিনিয়ে দেবে?'

'নিয়্যস দিমু।'

যুগল আরও যা বলল তা এইরকম। পূর্ব বাংলার জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে যত পশুপাখি ঘুরে বেড়ায়, উড়ে বেড়ায়, তাদের সবাইকে চেনে সে। কেমন তাদের স্বভাব, কোথায় তাদের বসতি, কিভাবে তাদের ধরতে হয়, এ সব সম্বন্ধে তার বিপুল জ্ঞান, বিশাল অভিজ্ঞতা। নিজের অভিজ্ঞতার সমস্তটুকুই অকাতরে সে ছোটবাবুর হাতে তুলে দেবে।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে বিনুরা স্টিমারঘাটের দিকে হাঁটছিল। কিছুক্ষণ হাঁটার পর সেই কাঠের পুলটার ওপর এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল যুগল। দেখাদেখি বিনুও দাঁড়াল।

যুগল বলল, 'আমরা আইসা গ্যাছি ছুটোবাবু।'

বিনু বলল, 'এখানেই তোমার কচ্ছপ আছে?'

'হ। দেখবেন আহেন—'

পুলের তলা দিয়ে খাল গেছে। বিনুকে নিয়ে পুলের ডান দিকে একেবারে জলের ধারে এসে দাঁড়াল যুগল।

হেমন্তের মাঝামাঝি এই সময়টায় জল শান্ত, স্থির। কোথাও সামান্য ঢেউ পর্যন্ত নেই।

খালের দিকে আঙুল বাড়িয়ে যুগল বলল, 'উই দ্যাহেন ছুটোবাবু, শালার কাউঠ্যা উইহানে আরাম কইরা শুইয়া আছে।'

বিনু তাকাল। পলকহীন, তীক্ষ্ণ চোখে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকেও অঘ্রানের নিস্তরঙ্গ খালে অতল কালো জল ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেল না।

পাশ থেকে সাগ্রহে যুগল শুধলো, 'দেখতে নি পাইছেন?'

বিনু মাথা নাড়ল, 'না।'

'ভালা কইরা ঠাওর করেন।'

চোখদু'টো আরও শাণিত করল বিনু। কিন্তু কোথাও কচ্ছপের চিহ্ন নেই। সে বলল, 'কোথায় তোমার কচ্ছপ?'

ধিক্কারের গলায় যুগল বলল, 'কী চৌখ আপনের ছুটোবাবু! সামনে রইছে, অথচ দেখতে পান না। উই যে দ্যাহেন—'

এবার বিনু দেখতে পেল, অনেকক্ষণ পর পর জলের অতল থেকে একটা দু'টো করে বুদ্বুদ উঠে আসছে।

বিনু বলল, 'ওগুলো তো বুজকুড়ি—'

'হ। উইগুলির তলেই শালার কাউঠ্যা শুইয়া রইছে আর গলা বাইর কইরা পুটুর পুটুর ভুরভুরি ছাড়তে আছে। খাড় বউয়ার ভাই, এইবার তোমার নীলা সাঙ্গ করি—'

যুগলের হাতে যে অস্ত্রটা ছিল, তার চেহারা মোটামুটি এইরকম। সরু মতো লম্বা একটা বাঁশের মাথায় ইস্পাতের ধারাল ফলা আটকানো। ফলার কাছাকাছি জায়গায় বাঁশটাকে ঘিরে সেই ভারী লোহার পাতটা পরিয়ে শক্ত করে বেঁধে দিল যুগল। ফলে ওটার ওজন বেড়ে গেল অনেকখানি। তারপর পুলের কিনারে এসে বুদ্বুদগুলি নিশানা করে খুব আস্তে টেটাটা ছুড়ে দিল।

আস্তে ছুড়লে কী হবে, লোহার পাতের ভারে অস্ত্রটা তীরের মতো জলের অতলে নেমে গেল।

একটু পর টেটার বাঁশ ধরে যুগল যখন টেনে তুলল, দেখা গেল, ফলার মাথায় সত্যি সত্যিই একটা কচ্ছপ। ফলাটা তার নরম মাংসল গলা ভেদ করে ওধারে চলে গেছে।

যুগল বলল, 'অঘ্‌ঘান পৌষ মাসে জল যহন থির হইয়া যায়, হেই সময় কাউঠ্যারা কী করে জানেন ছুটোবাবু? জলের তলে গলা বাইর কইরা উয়াস ছাড়ে, হেই দেইখা ঠাওর করতে হয়। মনে থাকব তো?' বলতে বলতে ক্ষিপ্র হাতে টেটার ফলা খুলে দড়ি দিয়ে কচ্ছপটার চার পা বেঁধে হাতে ঝুলিয়ে নিল।

আজ থেকেই পাঠ শুরু করে দিয়েছে যুগল। বিনু বলল, 'থাকবে।'

'হ'ন, এইবার বাড়িত্ যাই।'

বাড়ির দিকে সবে পা বাড়িয়েছে, হঠাৎ বিনু দেখতে পেল, ডান ধারে ঠিক খালের ওপারে অদ্ভুত ধরনের বড় বড় সাতখানা নৌকো দাঁড়িয়ে আছে। রাজদিয়ায় আসার পর অনেক রকম নৌকো দেখেছে বিনু—গাছি, শালতি, কোষ, মহাজনী ভর। কিন্তু এইরকম নৌকো প্রথম দেখল।

অপার বিস্ময়ে বিনু শুধলো, 'ওগুলো কিসের নৌকো যুগল?'

একপলক দেখে নিয়ে যুগল বলল, 'উইগুলা বেবাইজা (বেবাজিয়া) বহর। অনেক কাল পরে বেবাইজারা রাইজদায় আইল। ল'ন যাই, ওগো ডাইকা বাড়িত্ লইয়া যাই—' বলেই ছুটল।

যুগলের পেছনে ছুটতে ছুটতে বিনু বলল, 'বেবাইজা কী?'

'গ্যালেই বুঝতে পারবেন।'

খানিকটা ছুটবার পর ডান ধারে খালের ওপর দিয়ে বাঁশের সাঁকো। সেটা পেরুলেই ওপারে সারি সারি বেবাজিয়া নৌকোর বহর।

সাঁকোর কাছাকাছি এসে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে যুগল ডাকতে লাগল, 'বেবাইজা হে-এ-এ-এ—'

ওপার থেকে কেউ সাড়া দিল, 'কিবা কও-ও-ও—'

'কার বহর?'

'আঞ্জুমান বেবাইজানীর।'

মুখ ফিরিয়ে এবার বিনুর দিকে তাকাল যুগল, 'চিনা মানুষ। আঞ্জুমান বেবাইজানীরা বচ্ছরে একবার আমাগো এইহানে আসে—'

সেই কৌতূহলটা মনের ভেতর টগবগ করছিল। বিনু আবার শুধলো, 'বেবাইজা কী বললে না তো—'

ঈষৎ বিরক্ত হল যুগল, 'আপনের আর তর সয় না ছুটোবাবু। কইলাম, অগো বহরে গ্যালেই ট্যার পাইবেন। তা না—'

বিনু কিছু বলল না, ঘাড় গোঁজ করে রইল।

বিনুর চোখমুখ দেখে হয়তো করুণাই হয়ে থাকবে। যুগল বলল, 'বাইদ্যা কারে কয় জানেন তো?'

এতক্ষণে মনে পড়ে গেল। বেবাইজা শব্দটা আজই প্রথম শুনছে না বিনু, আগেও একবার শুনেছে। সেদিন রাত্রিবেলা সুজনগঞ্জের হাট থেকে ফেরার সময় মাঝনদীতে তাদের একটা বহরও দেখেছিল্। ঢেঁড়াওলা হরিন্দ তার দুই সাকরেদ কাগা বগাকে নিয়ে সেই বহরে উঠে কোন এক ইসলামপুরের দিকে পাড়ি জমিয়েছিল।

শব্দটা ঠিক বেবাইজা নয়, বেবাজিয়া। অর্থাৎ বেদে। এই জলের বেদেদের যে বেবাজিয়া বলে, বিনু কেমন করে জানবে? সেদিন হাট থেকে ফেরার সময় হেমনাথ তা কিছুটা বুঝিয়ে দিয়েছিলেন।

কলকাতায় ইরানী যাযাবরদের দেখেছে বিনু, ভূগোল বইতে আরব বেদুইনদের কথাও পড়েছে। তারা সব স্থলচর জীব, হেঁটে হেঁটে অথবা উটের পিঠে দেশদেশান্তরে ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু এই খাল-বিল-নদীর রাজ্যে তা তো আর সম্ভব নয়, নৌকোয় নৌকোয় জলচর মাছের মতো এখানকার বেবাজিয়ারা ভেসে বেড়ায়।

বিনু বলল, 'তোমাকে আর বুঝিয়ে দিতে হবে না। বেবজিয়াদের আমি আগেও দেখেছি।'

যুগল বলল, 'আগে দেইখা থাকলে 'বেবাইজা কী' 'বেবাইজা কী' কইরা আমারে পাগল কইরা মারতে আছিলেন ক্যান?'

'আমার মনে পড়ছিল না যে।'

একটু নীরবতা।

'কাউঠ্যা নিয়া আর বেবাইজা বহরে যামু না। শালারে এইহানে বাইন্ধা রাইখা যাই।' হাতের কচ্ছপটাকে সাঁকোর সঙ্গে দ্রুত বাঁধতে লাগল যুগল।

বিনু কিছু বলল না।

বাঁধাছাঁদা হয়ে গেলে যুগল শুধলো, 'সাকো পার হইতে পারবেন নি ছুটোবাবু?'

সরু একখানা বাঁশের ওপর দিয়ে ওপারে যেতে হবে। দু'ধারে যদিও হাত তিনেক উঁচুতে ধরনি (ধরবার জন্য অন্য একটি বাঁশ) রয়েছে, তবু বুক কাঁপতে লাগল বিনুর। আগে আর কখনও সাঁকো

পার হয় নি সে।

অন্য সব ব্যাপারে যুগলের কাছে প্রচুর বীরত্ব দেখিয়েছে বিনু, কিন্তু সাঁকো পারাপারের কথায় তার মুখখানা ভারি করুণ দেখাল। মাথা নেড়ে আস্তে করে সে বলল, 'না।'

'আপনে কুনো কামের না ছুটোবাবু। আহেন, আমার হাত ধইরা পার হইবেন।'

যুগলের হাত ধরে খাল পেরুতে পেরুতে তলার দিকে তাকাল বিনু। সাঁকোর অনেক নিচে অথৈ জল। একবার যদি হাত ফসকে যায়? যদিও সাঁতার শিখেছে, বুকের ভেতরটা ঢিপ ঢিপ করতে লাগল তার।

ওপারে গিয়ে যুগল চেচাঁমেচি জুড়ে দিল, 'কই গো বেবাইজা বেবাইজানীরা, কই গেলা হগল? বাইর হও দেখি—'

যুগলের ডাকাডাকিতে নৌকোগুলোর ভেতর থেকে অদ্ভুত ধরনের জনাকয়েক মেয়ে পুরুষ বেরিয়ে এল।

সেদিন রাত্রিবেলা সুজনগঞ্জ থেকে ফেরার সময় মাঝনদীতে অন্য একটা বেদে-বহর সামনে পড়েছিল। একজন বেবাজিয়ার গলার আওয়াজও শোনা গিয়েছিল। কিন্তু অন্ধকারে তাদের স্পষ্ট দেখা যায় নি। আজ দিনের আলোয় জগতের বিচিত্র এক মানবগোষ্ঠীর দিকে অসীম বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকল সে।

মেয়েগুলোর পরনে ইরানী নৌকোর পালের মতো চিত্রবিচিত্র ঘাঘরা এবং খাটো খাটো জামা। রুক্ষ চুলে কাঠের কাকুই, টানা চোখে ছুরির ধার। হাতে পায়ে মেহেদি মাখা। সারা গায়ে অঢেল উদ্দাম যৌবন। পুরুষগুলির পরনে হয় ডোরাকাটা লুঙ্গি, নতুবা কুঁচি-দেওয়া ঢোলা পাজামা। মাথায় ধনেশ পাখির পালক গোঁজা। সারা গায়ে তাদের উল্কির আঁকিবুকি। পাখি সাপ গরু ছাগল—কত রকমের ছবি যে আঁকা!

মেয়ে হোক পুরুষ হোক, সবাই অত্যন্ত নোংরা, অপরিচ্ছন্ন। তাদের চিটচিটে পোশাক থেকে দুর্গন্ধ উঠে আসছে। মুখটুখ ধোবার অভ্যাস নেই, দাঁতের ওপর এক ইঞ্চির মতো পুরু হলুদ রঙের সর পড়ে আছে। হাত-পায়ের নখ বড় বড়। সেগুলোর মাথা খানিক ভেঙেছে, খানিক ক্ষয়ে গেছে।

যুগল বলল, 'তোমরা রাইজদা আইলা কবে?'

একটি বেদেনী উত্তর দিল, 'আইজ, বিহান বেলায়—'

'থাকবা কয় দিন?'

'চকিদারে (চৌকিদারে) যা বাইন্ধা দিছে হেই আড়াই দিন। হের বেশি তো থাকনের উপায় নাই।'

'হ। হে তো ঠিক কথাই।' যুগল মাথা নাড়ল। তারপর চারদিকে তাকাতে তাকাতে বলল, 'হগলরে দেখতে পাই, কিন্তুক এই বহর যার হেই আঞ্জুমান বেবাইজানীরে তো দেহি না। হে গেল কই?'

'এই যে আমি—' পেছন দিক থেকে চিলের মতো তীক্ষ্ণ, সরু গলায় কেউ চেঁচিয়ে উঠল।

মুখ ফেরাতেই বিনু দেখতে পেল, সব চাইতে বড় নৌকোটার গলুইতে একটা বুড়ি দাঁড়িয়ে আছে। চুলগুলো পাটের ফেঁসোর মতো লালচে, জট-পাকানো। গায়ের চামড়া কুঁচকে শিথিল। হঠাৎ দেখলে মনে হয়, ঢিলে একটা খোলসই বুঝি পরে আছে। সারা গায়ে বেবাজিয়া পুরুষদের মতো উল্কি এবং রুপোর ভারী ভারী গয়না—মেখলা, তেঁতুলপাতা হার, চুটকি, কানে গোলাকার মস্ত চাকতি।

এত বয়স হয়েছে আঞ্জুমানের, তবু চোখের দৃষ্টি আশ্চর্য সজীব। যেমন ধারাল তেমনি দূরভেদী। চিকন তীরের মতো তা বুঝি বুকের ভেতরে বিঁধে যায়।

যুগলও ঘুরে দাঁড়িয়েছিল। এক মুখ হেসে বলল, 'আরে, এই যে তুমি। আছ ক্যামন?'

আঞ্জুমান বেবাজিয়ানী বলল, 'ভালাই।' বলেই ভুরুর ওপর হাত রেখে শুধলো, 'তুমি কেউগা? চিনা চিনা লাগে—'

'আমার নাম যুগল—'

'যুগল।' চোখমুখ কুঁচকে স্মৃতির ভেতর কিছুক্ষণ হাতড়ে বেড়াল আঞ্জুমান বেবাজিয়ানী। তারপর বলল, 'তোমারে কই দেখছি কও তো বাসী—'

যুগল বলল, 'হ্যামকত্তার বাড়িত্। আমি তেনার কাছে কামলা খাটি।'

'হ হ, এইবার মনে পড়ছে।' চোখের তারায় হঠাৎ যেন আলো খেলে গেল আঞ্জুমান বেবাজিয়ানীর। সাগ্রহে শুধলো, 'হ্যামকত্তায় ক্যামন আছে?'

যুগল বলল, 'ভালা, হ্যামকত্তায় কুনো সোময়ে মোন্দ থাকে না।'

দেখা যাচ্ছে, এই ভবঘুরে যাযাবরের দলও হেমনাথকে চেনে। বিনু অবাক তাকিয়ে থাকল।

আঞ্জুমান বেবাজিয়ানী কী বলতে যাচ্ছিল, হঠাৎ তার চোখ এসে পড়ল বিনুর ওপর। কিছুক্ষণ পলকহীন তাকিয়ে থেকে জিজ্ঞেস করল, 'অ যুগইলা, এই পোলাগা ক্যাঠা?'

যুগল বলল, 'হ্যামকত্তার নাতি।'

'তাই নিকি?'

'হ।'

'ক্যামন নাতি? আমি জানতাম হ্যামকত্তার পোলা-মাইয়া নাই। তয় এই নাতিখান আইল কই থিকা?'

অঞ্জুমান বেবাজিয়ানী সোজা সহজ হিসেবটাই ধরে নিয়েছে। অর্থাৎ ছেলেমেয়ে থাকলে তবেই তো নাতি-নাতনীর সম্ভাবনা। যার ছেলেমেয়ে নেই তার ও সব আসবে কোত্থেকে? আকাশ থেকে নিশ্চয়ই পড়তে পারে না!

বিনুর সঙ্গে হেমনাথের সম্পর্কটা বুঝিয়ে দিল যুগল।

আঞ্জুমান বলল, 'হেই কও। ভাগনীর পোলা। কিন্তুক—'

'কী?'

'আমরা তো বচ্ছর বচ্ছর রাইজদা আহি। আইলেই হ্যামকত্তার বাড়িত্ যাই। কিন্তুক তেনার ভাগনী, ভাগনীর ঘরের নাতি-নাতকুড়েরে তো দেখি নাই।'

যুগল বলল, 'দ্যাখবা ক্যামনে? ওনারা তো এইহানে এই পেরথম আইল।'

আঞ্জুমান বেবাজিয়ানী শুধলো, 'আগে আছিল কই?'

বিনুরা কোথায় ছিল, যুগল জানিয়ে দিল।

এবার বিনুর দিকে ফিরে আঞ্জুমান বেবাজিয়ানী সস্নেহে ডাকল, 'আসো গো ভাই, আমাগো নায়ে আসো—'

দেশ-দেশান্তরের বেদেদের সম্বন্ধে অনেক ভয়ঙ্কর গল্প শুনেছে বিনু। আঞ্জুমান বেবাজিয়ানী ডাকতে তার বুকের ভেতরটা গুরগুর করে উঠল। নিজের অজান্তে সে গিয়ে দাঁড়াল যুগলের পেছনে। ভীরু গলায় বলল, 'না।'

'এইটা ক্যামন কথা হইল! তুমি আমাগো হ্যামকত্তার নাতি। এই তরি (এখান পর্যন্ত) আইসা বহরে না আইলে মন নি ভালা লাগে? আসো আসো, ইট্টু মিঠাই খাইয়া যাও। তোমার নানার বাড়িত্ গিয়া আমরা কত কী খাইয়া আহি। কত খাতির পাই।'

বিনু উত্তর দিল না, চুপ করে থাকল। তার মনোভাব বুঝতে পেরেছিল যুগল। বলল, 'আপনে কইলকাতার পোলা, বেবাইজা দেইখা ডরান?'

বিনু এবারও চুপ।

যুগল বলল, 'অরা চিনা মানুষ। ল'ন যাই। আহ্লাদ কইরা ডাকলে যাইতে হয়।'

ভয়ও হচ্ছিল, আবার বেদে-বহর সম্বন্ধে অপার কৌতূহলও বোধ করছিল বিনু। সেদিন সুজনগঞ্জ থেকে ফেরার সময় হেমনাথ জানিয়েছিলেন, এই জলের দেশে বেবাজিয়ারা নৌকোয় নৌকোয় ভেসে বেড়ায়। নৌকোতেই তাদের ঘর-সংসার। এখানে শিশু জন্মায়, বুড়োরা মরে। যৌবন অসীম সম্ভাবনায় এখানেই পুষ্পিত হয়ে ওঠে। জগতের বিচিত্র ভাসমান এই মানবগোষ্ঠী নৌকোর ওপরেই জীবনের ধারা অব্যাহত রাখে। শোক-দুঃখ, সুখ-আনন্দ, জন্ম-মৃত্যু, জীবনের এমন কোনও লীলাই নেই যা পাঁচ-সাতখানা হাজারমণী বিশাল নৌকোর মধ্যে ঘটে না যায়।

আঞ্জুমান বেবাজিয়ানী আবার ডাকল, 'আসো গো হ্যামকত্তার নাতি। আমাগো ঘর-গিরস্থালি দেইখা যাও। ডরের কিছু নাই—'

পুঁড় বেদেনী কি অন্তর্যামী? বেদে-বহরের ভেতরটা দেখার খুবই ইচ্ছা, তবু নিজের থেকে বিনু

pathagar.net

হয়তো যেত না। যুগলই একরকম জোর করে তাকে বেদে-বহরে নিয়ে তুলল।

আঞ্জুমান বেবাজিয়ানী শুধলো, 'আগে কী করবা কও?'

বেদেনী কী বলতে চায়, বুঝতে না পেরে তাকিয়ে থাকল বিনু।

আঞ্জুমান এবার বুঝিয়ে দিল, 'আগে পান-তামুক-মিঠাই খাইবা, না আমাগো ঘর-গিরস্থালি দেখবা?'

বিনু বলল, 'পান-তামাক আমি খাই না।'

বুড়ি বেদেনী বেশ রঙ্গিণী। কপালে একটা চাপড় মেরে বলল, 'আ আমার কপাল!'

ভয়ে ভয়ে বিনু শুধলো, 'কী হল?'

রসাল কৌতুকের গলায় আঞ্জুমান বেবাজিয়ানী বলল, 'পান খাও না, তামুক খাও না, কেমনতরো পুরুষ তুমি!' বলতে বলতে বাদামী ভুরুর তলায় তার নীলচে চোখের মণি খাঁচার পাখির মতো ছটফট করতে লাগল।

বিনু এবার আর কিছু বলল না। তার মুখচোখ দেখে আঞ্জুমান কী বুঝল, কে জানে। তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'থাউক থাউক, পান-তামুক খাইতে হইব না।' বলতে বলতে আঙুলের ডগায় বিনুর থুতনিটা তুলে অল্প অল্প নাড়তে লাগল, 'অখনও মোচ গজায় নাই, এক্কেরে পোলাপান। আগে দাড়িমোচ গজাউক, পুরুষমানুষ হও। হের পর পান-তামুক খাইও। অহন মিঠাই খাও।'

শুধু মিঠাই না, পাকা অমৃতসাগর কলা আর ক্ষীরাইও বিনুদের খেতে দিল আঞ্জুমান। খাওয়া দাওয়া হয়ে গেলে সারা বহর ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নিজেদের ঘর-সংসার দেখাতে লাগল।

মোট সাতখানা নৌকো। একটা নৌকোয় শুধু সাপের ঝাঁপি। ছোটবড়, চৌকো, গোল—নানা আকারের অগণিত বেতের ডালা পর পর সাজানো। সেগুলোর ভেতর অসংখ্য রকমের সাপ—শঙ্খচূড়, কালজাতি, দুধরাজ, খরিস, লাউডগা, পাহাড়ী অজগর, শামুকভাঙা, চন্দ্রবোড়া। আরও কত কী!

একেকটা ডালা খোলে আঞ্জুমান, আর বিদ্যুৎচমকের মতো সাঁ করে সাপগুলো লেজের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়ায়। লিকলিকে সরু জিভ বার করে ফণা দোলাতে দোলাতে কুটিল চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। আঞ্জুমান তাদের নাম-ধাম বংশ-পরিচয় মুখস্থ বলার মতো গড় গড় করে বলে যায়। সাপ দেখতে দেখতে এবং তাদের ইতিহাস শুনতে শুনতে বুকের রক্ত হিম হয়ে যাচ্ছিল বিনুর।

কোনও নৌকোয় শুধুই বিছানা। কালো চিটচিটে শতরঞ্চি-জড়ানো কাঁথা বালিশের স্তূপ একেবারে ছইয়ের মাথা পর্যন্ত ঠেকেছে। একটা নৌকোয় এসে দেখা গেল, সেখানে শুধু পশু আর পাখি। ছাগল, গরু, খচ্চর, ভেড়া, গোটা দুই বাঁদর এবং অগুনতি খাঁচার ভেতর নানারকম পাখি—শালিক, ময়না, টিয়া, মোহনচূড়া, ঝুটকলি, সিদ্ধিগুরু, কোড়াল, এমন কি বাজও রয়েছে।

আঞ্জুমানের পিছু পিছু ঘুরতে ঘুরতে শেষ নৌকোখানায় এসে পড়ল বিনুরা। বেবাজিয়া বহরের এটাই সব চাইতে ছোট নৌকো। আঞ্জুমান বলল, 'এইটা আমাগো পান্‌হা ঘর—'

আঞ্জুমানকে অনেকক্ষণ দেখছে। বুড়ি বেদেনীর সহজ, আন্তরিক ব্যবহারে ভয় কেটে গিয়েছিল। বিনু শুধলো, 'পান্‌হা ঘর কী?'

'দ্যাখো—' সামনের দিকে আঙুল বাড়িয়ে দিল আঞ্জুমান।

দেখা গেল, উঁচু একটা বেদির ওপর মাটির সপ্তনাগ। তার মাথায় দেবী মনসার সিংহাসন। এমন মানসা-মূর্তি আগে আর কখনও দেখে নি বিনু। মাথার পেছন থেকে বরুণ ছত্র ধরেছে কালীয় নাগ। খরিস আর শঙ্খচূড় সাত লহর হার হয়ে বুকের কাছে ঝুলছে। মণিবন্ধে কঙ্কণ হয়েছে খৈজাতি। দেবীর সুডৌল বক্ষকুম্ভ কাঁচুলি হয়ে ঢেকেছে চক্রচূড় আর উদয়নাগ। লাউডগা আর কালচিতি, চন্দ্রবোড়া আর গোক্ষুর বুনে বুনে ঘাঘরা বানানো হয়েছে। দেবীর কটিতট থেকে তা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে, আঙুলে আঙুলে অঙ্গুরী হয়েছে সুতোশঙ্খ। পায়ে জড়িয়ে জড়িয়ে মল হয়েছে দাঁড়াস। কর্ণভূষণ হয়ে দোদুল দুলছে সাদা চিতির ফণা। দেবীর চোখে বিষের কাজল, নিশ্বাসে গরল ঝরছে যেন অবিরল।

মনসামূর্তির সামনে অনেকগুলো ধুনুচি। সেগুলো থেকে ধূপের গন্ধ উঠে আসছে। খানকতক পেতলের সরাও চোখে পড়ল, সেগুলোতে কাঁচা দুধ আর সবরি কলা সাজিয়ে রাখা হয়েছে।

আঞ্জুমান বেবাজিয়ানী বলল, 'এইটাই আমাগো আসল জাগা। মা মনসার ঘরে আমরা কুনো

পাপ কাম করি না, শত্তুরও যদি ন এইহানে আইসা আশশ্য় লয় তার গায়ে হাত তুলি না। রোজ সন্ধ্যায় মনসার নামে এইখানে ছদ্‌গা (উৎসর্গ) হয়। আমরা বেবাইজা মাইয়ারা তহন ল্যাংটা হইয়া ধূপতি (ধুনুচি) নাচ নাচি। 'ছদ্‌গা'র সময় পুরুষমানুষ এই ঘরে আইতে পারে না।'

সবটা বুঝতে না পারলেও বিনু এটুকু বুঝল, এই পান্‌হা ঘর বেদেদের কাছে অতি পবিত্র জায়গা। এখানে এমন কিছু তারা করে না যা অশুচি, যা অন্যায়, যা ধর্মবিরুদ্ধ।

আরও কিছুক্ষণ গল্পটল্প করার পর যুগল হঠাৎ বলল, 'অনেকখানি সোময় তোমাগো এইহানে কাটাইয়া গ্যালাম। অহন আমরা যাই।'

আঞ্জুমান বলল, 'আইচ্ছা—'

'আমাগো বাড়িত্ যাইবা তো?'

'নিয্যস য্যামু। রাইজদায় আইসা হ্যামকত্তার বাড়িত্ যামু না, আমার ঘেটিতে কয়টা মাথা! হেয়া ছাড়া—'

'কী?'

'কইলকাতা থনে তেনার নাতি আইছে, নাতিন আইছে, ভাগনী আইছে। যাইতে আমাগো হইবই। বিকালে যামু।'

'আইচ্ছা। এই বেলা ছুটবাবুরে কিছুই দেখাইলা না। উই বেলা গিয়া সাপখেলা দেখাইবা কিলাম।'

'দেখামু।'

'মনসার গীত শুনাইবা—'

'শুনামু।'

বিনু এইসময় বলে উঠল, 'যাবে কিন্তু। নিশ্চয়ই যাবে।'

কিছুক্ষণ পর বাড়ির দিকে ফিরতে ফিরতে বেদেদের সম্বন্ধে আরও কিছু চমকপ্রদ খবর দিল যুগল। এরা অদ্ভুত জাত। মনসা পুজোও করে, আবার কেউ কেউ নামাজও পড়ে। অনেক খ্রিস্টানও এখানে এসে জুটেছে। সাপখেলা, বাঁদারখেলা, ছাগলখেলা, নানারকম শারীরিক কসরত এবং ভেল্কিবাজি দেখিয়ে ওরা পয়সা রোজগার করে। তা ছাড়া, সাপে কামড়ালে ওঝাগিরিও করে। কিন্তু এসব দিনের আলোর ব্যাপার । রাতের অন্ধকারেই ওদের আসল খেলা—সেটা হল চুরি। যেখানে বেবাজিয়া বহর ভেড়ে সে জায়গায় বাসিন্দাদের চোখ থেকে ঘুম ছুটে যায়। সর্বক্ষণ তারা তটস্থ হয়ে থাকে।

আঞ্জুমান বেবাজিয়ানীরা এসেছে। রাজদিয়াতে এরার চুরির ধুম পড়ে যাবে।

বিকেলবেলা সত্যি সত্যিই আঞ্জুমান হেমনাথের বাড়ি এল। তার সঙ্গে এসেছে দু'টো যুবতী বেদেনী। আঞ্জুমান এবং তার সঙ্গিনীদের মাথায় পর পর সাজনো অনেকগুলো করে সাপের ঝাঁপি।

বাগান পেছনে ফেলে বার-বাড়ির উঠোনে পা দিয়েই আঞ্জুমান চিলের মতো সরু গলায় চেঁচিয়ে উঠল, 'কই গ্যালেন হগলে—'

বেদেনীরা যে আসবে সে খবর বাড়ি ফিরে ওবেলাই দিয়ে রেখেছিল বিনু। আঞ্জুমানের গলা পেয়ে সুরমা-সুধা সুনীতি স্নেহলতা বিনু কিংবা যুগল—কেউ আর ঘরে বসে থাকতে পারল না। এধার থেকে ওধার থেকে ছুটোছুটি করে বেরিয়ে এল।

মাথা থেকে সাপের ঝাঁপি মাটিতে নামাল আঞ্জুমান। তারপর স্নেহলতার দিকে ফিরে বলল, 'আইলাম গো বইনদিদি—' বলে হাসল।

স্নেহলতাও হাসলেন, 'তা তো দেখতেই পাচ্ছি।'

'আইজই আমরা রাইজদায় আইছি।'

'শুনেছি।'

আঞ্জুমান বলতে লাগল, 'অন্য হগল বার এইহান থিকা যাওনের দিন আপনেগো বাড়িত্ আসি। এইবার কিলাম পেরথম দিনই আইলাম।'

স্নেহলতা উত্তর দিলেন না। হাসিটুকু তাঁর ঠোঁটে স্নিগ্ধ আভার মতো লেগে রইল।

আঞ্জুমান আবার বলল, 'এইবার রাইজদায় আইসা আমি আটাস (অবাক)!'

স্নেহলতা উৎসুক হলেন, 'কেন?'

'বিহান বেলায় আপনেগো যুগইলার লগে এউক্কা সোন্দর ফুটফুইটা পোলা আমাগো বহরে গ্যাছিল। শুনলাম পোলাগা নিকি আপনের নাতি। শুইনা আমার ধন্দ লাইগা গেল।'

'কেন?'

'আমি তো জানতাম আপনেগো পোলা মাইয়া নাই। নাই-ই যদিন, নাতিখান আইল কই থিকা? শ্যাষে যুগইলাই কইল, পোলাগা আপনের ভাগনীর ঘরের, কইলকাতা থিকা আইছে।'

স্নেহলতা মাথা নাড়লেন, 'হ্যাঁ।'

আঞ্জুমান বলল,'বিহান বেলায় নাতি গিয়া কইল সাপের খেলা দেখব, আমাগো আইতেও হইল। বড় মুখ কইরা নাতি দাওয়াত কইরা আইছে। হেই লেইগা পেরথম দিনই আইলাম।'

'ভাল করেছ।'

টিয়াপাখির মতো লাল টুকটুকে ঠোঁট নেড়ে আঞ্জুমান বলল, 'মেলা কথা তো হইল। এইবার ভাগনী ভাগনী-জামাই দেখান। নাতিরে দেখছি, নাতিন দেখান।'

স্নেহলতা বললেন, 'ভাগনী-জামাই তো দেখাতে পারব না। ক'দিন হল সে কলকাতায় গেছে। অন্য সবাই আছে, তাদের দেখাচ্ছি।'

সুরমা সুধা এবং সুনীতির সঙ্গে আঞ্জুমানের আলাপ করিয়ে দিলেন স্নেহলতা।

আঞ্জুমান বলল, 'হগলের লগে আলাপ-সালাপ হইল, ভাগনী-জামাইরেই খালি দেখলাম না। আ আমার কপাল!' বলতে বলতে তার চোখ সুরমার ওপর স্থির হল, 'আ গো বইনদিদি—'

স্নেহলতা সাড়া দিলেন 'কী বলছ?'

'ভাগনী আমাগো অ্যামন কাহিল ক্যান? শরীলহানে কিছু নাই, য্যান ফু দিলে উইড়া যাইব।'

'হ্যাঁ, ও ভারি রোগা। শরীরটা একেবারেই সারছে না। ওকে নিয়ে আমাদের বড্ড ভাবনা।'

একটু চুপ করে থেকে আঞ্জুমান বলল, 'বাতাস লাগছে মনে লয়।'

স্নেহলতা প্রায় হতাশার সুরেই বললেন, 'কী জানি, ক'বছর ধরেই তো এরকম চলছে। ডাক্তার-কবিরাজ, ওষুধ বিষুধ বার মাস লেগেই আছে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হচ্ছে না।'

আঞ্জুমান বলল, 'ভাগনীরে একখান শিকড় দিয়া যামু। তামার তাবিজে ভইরা ভাগনীর কমরে (কোমরে) পরাইয়া দিয়েন। সাইরা যাইব।'

'আচ্ছা।'

এবার সুধা সুনীতিকে ভাল করে লক্ষ করল আঞ্জুমান। বলল, 'কপালে সিন্দুর নাই, নাতিন দু'গা অবিয়াত মনে লাগে—'

'হ্যাঁ।'

'নাতিনগো বিয়ার সোময় দাওয়াত য্যান পাই।' বলেই সুধা সুনীতির কাছে গিয়ে হাত ঘুরিয়ে ছড়া কাটল ঃ

'আইবা নি ভাই, যাইবা নি—
নাতিন খাওয়াইব সাধের মেজবানি!'

বেদেনীর রকমসকম দেখে সুধা সুনীতি খিলখিল করে হেসে উঠল।

স্নেহলতা বললেন, 'নেমন্তন্ন তো করব, তোমাদের পাব কোথায়? ঘরদুয়ার কি কিছু আছে তোমাদের? সারা বছর শুধু ভেসে ভেসেই বেড়াও—'

'কাক-পক্ষীর কাছে খবর দিয়া দিয়েন, ঠিক উড়াল দিয়া আইসা পড়ুম।' আঞ্জুমান হাসতে লাগল।

খানিক নীরবতা।

তারপর আঞ্জুমান আবার শুরু করল, 'হগলের লগে দেখাশুনা হইল, হ্যামকত্তারেই খালি দেখি না। তেনি কই?'

স্নেহলতা বললেন, 'দুপুরবেলা আবদুলাপুর গেছে।'

pathagar.net

'ফিরলে আমাগো কথা কইয়েন।'

'বলব।'

'পারলে আমাগো বহরে য্যান যায়।'

'আচ্ছা।'

আঞ্জুমান বলল, 'আলাপ সালাপ হইয়া গেল। এইবার আমাগো পান-তামুক খাওয়ান গো বইনদিদি—'

তার মুখ থেকে কথা খসবার আগেই যুগল আর করিম ছুটে গিয়ে তামাকের ডিবে, পানের ডাবর, আগুনের মালসা, হুঁকোটুকো নিয়ে এল। তারপর তামাক সেজে হুঁকোর মাথায় কলকে বসিয়ে আঞ্জুমাদের হাতে দিল। আঞ্জুমান এবং তার দুই সহচরী পালা করে তামাক খেতে লাগল এবং আয়েশ করে নাকমুখ দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে লাগল।

বিনু অবাক হয়ে গিয়েছিল। বেদেনী হলেও আঞ্জুমানেরা মেয়েমানুষ। আগে আর কখনও মেয়েমানুষকে তামাক খেতে দেখে নি বিনু। পায়ে পায়ে যুগলের কাছে এগিয়ে গিয়ে ডাকল, 'এই—'

যুগল মুখ ফেরাল, 'কী ক'ন?'

ফিসফিস গলায় বিনু বলল, 'ওই দেখ, বেবাজিয়ানীরা তামাক খাচ্ছে।'

বিনু ঠিক কী বলতে চায়, বুঝতে না পেরে যুগল তাকিয়ে থাকল।

পরে খুব সহজ গলায় যুগল বলল, 'খাইব না ক্যান? নিশার জিনিস হগলেই খাইতে পারে। তার পুরুষমানুষ মাইয়ামানুষ নাই। খালি কি এই বাইদানীরাই—কামারপাড়ায়, যুগীপাড়ায় ঘুইরা দ্যাখেন গা। হগল বাড়িতেই দু'গা চাউরগা কইরা মাইয়ামানুষ হুক্কা খায়।'

যত সহজে যুগল কথাগুলো বলল, ঠিক তত সহজে মেনে নিতে পারল না বিনু। আবার কী বলতে যাচ্ছিল সে, ঠিক সেইসময় সাপের ঝাঁপি খুলল বেদেনীরা। তিনটে ঝাঁপি থেকে তিনটে কাল কেউটে বিদ্যুৎচমকের মতো সাঁ করে লেজের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়াল।

এদিকে একটা বেদেনী তুমড়ি বাঁশ বার করে বাজাতে শুরু করেছে। বাঁশির তালে তালে সাপ তিনটে ফণা দোলাতে লাগল।

একজন বাঁশি বাজাচ্ছে। সাপের নাচের সঙ্গে সঙ্গে আঞ্জুমান সরু গলায় সুর করে গান ধরল ঃ

চান্দ্ রাজার দাপট গেল বাতাসে মিশিয়া—

তৃতীয় বেদেনীটি গাইল ঃ

হায় বিষহরির দোয়া!

আঞ্জুমান এক কলি করে গায়। তৃতীয় বেদেনীটি, 'হায় বিষহরির দোয়া' বলে ধুয়ো ধরে। এই ভাবে গান চলতে লাগল।

বেউলা সতী কান্দে শোন আলুথালু হইয়া—
হায় বিষহরির দোয়া।
কালনাগিনী খাইল আজি সোনার লখাইরে—
হায় বিষহরির দোয়া।
সোনার অঙ্গ ভাসাইল গাঙ্গুনীর নীরে—
হায় বিষহরির দোয়া।
তাহার দোয়ায় সূয্যি ওঠে পুবের আকাশে—
হায় বিষহরির দোয়া।
পরান পাইয়া ভেলায় বইসা লখাই হাসে—
হায় বিষহরির দোয়া।

গান চলছে। তার মধ্যেই যুগল ডেকে উঠল, 'ছুটোবাবু—'

চোখকান ধ্যানজ্ঞান বেদেনীদের দিকে রেখে সাড়া দিল বিনু।

যুগল শুধলো, 'এইটা কী গান জানেন?'

BanglaBook.org

'না।'

'ভাসানের গান। মা মনসা আছে না?'

'হ্যাঁ।'

'মনসার গানেরে ভাসানের গান কয়। মনে কইরা রাইখেন।'

বিনু মাথা হেলিয়ে দিল, মুখে কিছু বলল না।

যুগল আবার বলল, 'অহন থনে আপনেরা তো এই দ্যাশে থাকবেন। শাওন মাসের শ্যাষে যহন মনসা পূজা হইব তহন থিকা ঘরে ঘরে ভাসানের গান শুনতে পাইবেন।'

'তাই নাকি?'

'হ।'

গানটানের পর সাপ খেলা দেখিয়ে ক্ষীর-মুড়কির ফলার করল বেদেনীরা। আরেক প্রস্থ পান-তামাক খেল। তারপর বকশিস হিসেবে একডালা ধান, চার আনা পয়সা, কিছু আনাজপাতি আদায় করল।

পান চিবুতে চিবুতে আঞ্জুমান বলল, 'এইবার যাই গো বইনদিদি—'

স্নেহলতা বললেন, 'এখনই যাবে?'

'হ। চকিদারে থাকতে তো দিব আড়াই দিন। এইর ভিত্‌রে রাইজদার হগল বাড়িত্ যাইতে হইব। বাড়ি তো আর এউক্কা দু'গা না—'

বেবাজিয়ানীরা সাপের ঝাঁপি, ধানের ডালা টালা মাথায় চাপিয়ে উঠে দাঁড়াল।

স্নেহলতা বললেন, 'আবার এস।'

আঞ্জুমান বলল, 'এইবার আর আহন হইব না বইনদিদি। আইতে আইতে হেই ফিরা বচ্ছর।'

হঠাৎ সেই কথাটা মনে পড়ে গেল স্নেহলতার। তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, 'চলে তো যাচ্ছ, ভাগনীকে শিকড় দিয়ে গেলে না?'

'আমার লগে তো নাই। নায়ে আছে। যুগইলারে আমার লগে পাঠাইয়া দ্যান, দিয়া দিমু অনে।'

আঞ্জুমানদের সঙ্গে যুগলকে বেদে-বহরে পাঠিয়ে দিলেন স্নেহলতা।

অবনীমোহন বলেছিলেন, দিন সাতেকের ভেতর কলকাতার সব ব্যবস্থা করে ফিরে আসবেন। ফিরতে ফিরতে দু' সপ্তাহ কেটে গেল।

সন্ধেবেলা পুবের ঘরের তক্তপোশে সুধা-সুনীতি-বিনু এবং ঝিনুক গা ঘেঁষাঘেঁষি করে পড়তে বসেছিল। তাদের সামনে দু'টো ঝকঝকে হেরিকেন।

হেমনাথও এই ঘরেই আছেন। তক্তপোশের ধার ঘেঁষে একটা ক্যাম্প খাট। তার ওপর কাত হয়ে শুয়ে মূল বাল্মীকি রামায়ণ পড়ছেন।

সময়টা অঘ্রানের মাঝামাঝি। নিয়ম অনুযায়ী পৌষ থেকে শীত শুরু। নিয়ম যা-ই থাক, এ বছর শীতের যেন আর তর সইছে না, তার বড় তাড়া। হেমন্ত থাকতে থাকতেই হিমঋতু এসে দরজায় দরজায় ধাক্কা দিতে শুরু করেছে। ক'দিন ধরেই এলোমেলো উত্তুরে বাতাস ছেড়েছে। আজ যেন সেটা হিমালয়ের বরফ ছুঁয়ে ছুঁয়ে আসছে। কাজেই বিনুরা চাদর বা কম্বল, যে যা পেরেছে তাই জড়িয়ে পড়তে বসেছে।

এখন কৃষ্ণপক্ষ। বাইরে যতদূর চোখ যায়, চাপ চাপ অন্ধকার। চাঁদটা আজ নিরুদ্দেশ। আকাশ পুকুর বা ধানখেত—কিছুই বোঝা যায় না। সব অদৃশ্য, নিরবয়ব। শুধু কাছাকাছি যে জোনাকিরা উড়ছিল তাদের দেখা যাচ্ছে। আলোর ছুঁচের মতো এই পোকাগুলো অন্ধকারকে বিঁধে বিঁধে যাচ্ছিল।

হঠাৎ বাইরের উঠোন থেকে অবনীমোহনের গলা ভেসে এল, 'বিনু, সুধা—কে আছিস রে, একটা আলো টালো নিয়ে আয়। বড্ড অন্ধকার—'

বিনু তড়াক করে লাফিয়ে উঠল। তারপর চেঁচামেচি জুড়ে দিল, 'বাবা এসেছে, বাবা এসেছে—'

সুধা সুনীতি সামনের হেরিকেন দু'টো নিয়ে বাইরে ছুটল। হেমনাথও রামায়ণ রেখে ব্যস্ত গলায় ডাকাডাকি শুরু করলেন, 'কোথায় গো, কোথায় গেলে সব—অবনী এসেছে—' বলতে বলতে বাইরে এলেন। তাঁর পিছু পিছু ঝিনুকও এল।

চেঁচামেচি শুনে রান্নাঘরের দিক থেকে স্নেহলতারাও ছুটে এলেন।

উঠোনের মাঝখানে অবনীমোহন দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাঁর পেছনে তিন চারটে কুলি। কুলিদের মাথায় গন্ধমাদন চাপানো।

হেমনাথ বললেন, 'বড্ড ঠাণ্ডা। এস এস—ঘরে এস অবনী—'

আলো দেখিয়ে অবনীমোহনকে ঘরে আনা হল। কুলিরা বারান্দায় মালপত্র নামিয়ে ভাড়া নিয়ে চলে গেল।

এখন সবাই অবনীমোহনকে ঘিরে বসে আছে। স্নেহলতা বললেন, 'তুমি কেমন মানুষ বল তো অবনী! সাতদিনের নাম করে গিয়ে চোদ্দ দিন কাটিয়ে এলে। না একটা খবর, না একটা কিছু।'

অবনীমোহন অপ্রতিভের মতো হাসলেন, 'ঝামেলা মেটাতে মেটাতে দেরি হয়ে গেল।'

হেমনাথ বললেন, 'আজ যে আসবে আগে জানালে না কেন? লালমোহন কি ভবতোষের ফিটন নিয়ে স্টিমারঘাটে যেতাম। স্টিমারঘাট থেকে আমাদের বাড়ি তো একটুখানি পথ নয়। শুধু শুধু কষ্ট করতে গেলে।'

অবনীমোহন বললেন, 'ভেবেছিলাম চিঠি লিখে জানাব। তারপর কেমন যেন আলস্য লেগে গেল। লিখি লিখি করে আর লেখা হল না।'

সুরমা এতক্ষণ চুপাচাপ বসে ছিলেন। এবার মুখ বাঁকালেন, 'চিরদিন ওই এক স্বভাব।'

অবনীমোহন হাসতে লাগলেন।

একটু নীরবতা। তারপর হেমনাথ বললেন, 'কলকাতার সব কাজ হয়ে গেছে তো?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'আর যাবার দরকার নেই?'

'আজ্ঞে না। সমস্ত ঝঞ্ঝাট চুকিয়েই এসেছি। বাড়িটা অবশ্য আছে। তালাবন্ধ।'

খানিক ভেবে হেমনাথ এবার শুধোলেন, 'তারপর বল, কলকাতায় গিয়ে কী দেখলে। ওখানকার হালচাল কী?'

অবনীমোহন নড়ে চড়ে বসলেন। তাঁকে রীতিমতো উত্তেজিত দেখাল। বললেন, 'ফিরেই আপনাকে খবরটা দেব, তা নয়। কথায় কথায় একেবারে ভুলে গেছি।'

হেমনাথ উৎসুক হলেন, 'কী খবর?'

'আপনি যা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, অক্ষরে অক্ষরে তা মিলে গেছে মামাবাবু।'

'কিরকম, কিরকম?'

'সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার। ইউরোপের যুদ্ধ বাংলাদেশের দিকে ছুটে আসছে। পরশু রাত্তিরে কলকাতায় প্রথম ব্ল্যাক-আউটের মহড়া হয়ে গেল। ট্রেঞ্চ খুঁড়ে খুঁড়ে শহরটার কী অবস্থা যে করেছে! পনের ষোল দিনের খবরের কাগজ এনেছি। পড়লেই বুঝতে পারবেন—'

উত্তেজনায় হেমনাথের গলা কাঁপতে লাগল, 'কোথায় খববের কাগজ?'

'আমার সুটকেসে—'

অবনীমোহন উঠতে যাচ্ছিলেন, বাধা পড়ল। স্নেহলতা বললেন, 'উঁহু উঁহু, এখন না। যুদ্ধ নিয়ে মাতলে রাত কাবার হয়ে যাবে। ট্রেনে স্টিমারে দু'দিন কাটিয়ে এসেছে ছেলেটা। আগে হাত মুখ ধুয়ে কিছু খেয়ে নিক। তারপর ওসব হবে।'

হেমনাথ তক্ষুনি সায় দিলেন, 'সেই ভাল, সেই ভাল। যাও অবনী, তাড়াতাড়ি হাতমুখ ধুয়ে কাপড় ছেড়ে নাও।'

সারা গায়ে দু'দিনের ক্লান্তি মাখা। আর আছে ট্রেন-স্টিমারের ধুলো। অবনীমোহন একেবারে স্নানই

pathagar.net

সেরে নিলেন।

হেমনাথের ধৈর্য থাকছিল না। পুবের ঘর থেকে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বললেন, 'তোমার স্নান হয়েছে অবনী?'

ওধারের কোনও একটা ঘর থেকে অবনীমোহনের গলা ভেসে এল, 'হয়েছে।'

'তা হলে এখানে চলে এস।'

'যাই মামাবাবু।'

অবনীমোহন আবার যখন পুবের ঘরে এলেন তখন তাঁর গায়ে দু'দিনের ধুলোবালি-ঘাম-মাখা পোশাক নেই। তার বদলে পাটভাঙা ধবধবে ধুতি আর হাফ শার্ট। চুল পরিপাটি করে আঁচড়ানো। গালে, গলায় এবং ঘাড়ের কাছে এখনও ফোঁটা ফোঁটা জল। স্নানের পর ভাল করে মোছেন নি বোধহয়।

এবার হেমনাথ গলা তুলে স্ত্রীকে ডাকলেন, 'স্নেহ—স্নেহ—' এই বয়সেও স্ত্রীকে তিনি নাম ধরে ডাকেন।

রান্নাঘরের দিক থেকে স্নেহলতা সাড়া দিলেন,'কী বলছ?'

'অবনীর খাবার এ ঘরে দিয়ে যাও—'

'আচ্ছা।'

একটু পরে স্নেহলতা এলেন। তাঁর এক হাতে কাঁসার থালা, তাতে ঘি-মাখানো চিঁড়ে ভাজা, নারকেল-কোরা আর দু'টো চমচম সাজানো। আরেক হাতে চায়ের কাপ।

স্নেহলতা বললেন, 'এখন তোমাকে ভাত দিলাম না অবনী—'

অবনীমোহন বললেন, 'না না, এখনই ভাত খাব কী, সবে তো সন্ধে। এখন চা-ই খাই।'

হেমনাথ অধীর হয়েই ছিলেন। বললেন, 'খেতে খেতে কলকাতার কথা বল। যুদ্ধের হালচাল কিরকম দেখে এলে, শোনাও—'

চায়ে চুমুক দিয়ে অবনীমোহন বললেন, 'অবস্থা খুব খারাপ মামাবাবু। পরশুর আগের দিন রাত্তির থেকে কলকাতায় ব্ল্যাক আউট আর এয়ার-রেইড প্রিকশানের মহড়া চলছে। চারদিকে কেমন একটা থমথমে ভাব।'

'এ কথা তো তুমি তখন বললে।'

'বলেছি নাকি?'

'হ্যাঁ।' হেমনাথ ঘাড় কাত করলেন। সাগ্রহে শুধোলেন, 'তা মহড়াটা কিরকম হচ্ছে?'

অবনীমোহন বলতে লাগলেন, 'সন্ধের পর কলকাতার সব আলো নিবিয়ে সাইরেন বাজানো হয়। শকুনের কান্নার মতো কাঁপা কাঁপা একটানা সুর। তখন রাস্তায় কেউ থাকতে পারে না। হয় কাছাকাছি কোনও বাড়ির ভেতর ঢুকে যেতে হবে। নইলে পার্ক স্ট্রীটের ট্রেঞ্চে গিয়ে লুকোতে হবে। তা না হলে এ-আর-পি'র লোকেরা ধরে নিয়ে যাবে। এক ঘন্টা কি দু'ঘন্টা বাদে অল ক্লিয়ার সাউন্ড বাজলে আবার বাইরে বেরুনো চলবে।'

তক্তপোশের একধারে বসে দম বন্ধ করে শুনে যাচ্ছিল বিনু, চোখে পলক পড়ছিল না। রাত্রিবেলা সব আলো নিবে যাবার পর নির্জন রাস্তায় একটানা কান্নার মতো কোনও সুর যদি বাজতে থাকে, কলকাতা শহর কতখানি ভীতিকর হয়ে উঠতে পারে? ভয়ের সে ছবিটা পুরাপুরি কল্পনা করতে পারল না বিনু, তবে তার গা ছমছম করতে লাগল।

হঠাৎ বিনু বলে উঠল, 'সাইরেন কী?'

অবনীমোহন তার দিকে ফিরে বললেন, 'শত্রুদের বিমান আক্রমণের আগে হুঁশিয়ার করে দেবার জন্যে একরকম সুর বাজানো হয়, তাকে বলে সাইরেন।'

বিনুর কৌতূহল অসীম। সে আবার বলল, 'এ-আর-পি কাকে বলে? ট্রেঞ্চ কী?'

অবনীমোহন বুঝিয়ে দিলেন।

একটু চুপ।

তারপর হেমনাথের দিকে আবার ঘুরে অবনীমোহন বললেন, 'আপনি শেষ কবে কলকাতায়

গিয়েছিলেন মামাবাবু?'

এক মুহূর্তও না ভেবে হেমনাথ বললেন, 'নাইনটিন টোয়েন্টি ফাইভে—সেই যেবার দেশবন্ধু মারা গেলেন। উঃ, কলকাতায় সে শোকের দৃশ্য কোনওদিন ভুলব না।' বলতে বলতে অন্যমনস্ক, বিষণ্ণ হয়ে গেলেন হেমনাথ। তাঁর চোখের সামনে শোকাচ্ছন্ন বিহ্বল মহানগর যেন ছবির মতো ফুটে উঠেছে।

অবনীমোহন বললেন, 'সেই কলকাতাকে এখন চিনতেই পারবেন না। পার্ক আর ফাঁকা জায়গা যেখানে যতটুকু পেয়েছে, ট্রেঞ্চ খুঁড়ে খুঁড়ে সর্বনাশ করে রেখেছে। শুধু কি ট্রেঞ্চ, প্রায় প্রত্যেকটা বাড়ির সদরে ব্যাফল ওয়াল তোলা হয়েছে, সেগুলোর সামনে বালির বস্তার স্তূপ। স্টেশনে, সিনেমা হাউসে, রাস্তায়-ঘাটে—যেখানে যাবেন শুধু গভর্নমেন্টের পোস্টার।'

'কিসের পোস্টার?'

'নানা রকমের। যেমন 'গুজবে কান দেবেন না', 'গুজব রটাবেন না,' 'দলে দলে সেনাবাহিনীতে নাম লেখান', 'দেশের স্বার্থবিরোধী কাজ করলে ভারত রক্ষা আইনে গ্রেপ্তার হবেন', ইত্যাদি ইত্যাদি।

হেমনাথকে বেশ চিন্তিত দেখাল। কপাল জুড়ে এলোমেলো গভীর রেখা ফুটতে লাগল তাঁর। ধীরে ধীরে বললেন, 'তোমার কী মনে হয় অবনী?'

'কী ব্যাপারে?' অবনীমোহন জিজ্ঞাসু চোখে তাকালেন।

'কলকাতায় বোমা পড়তে পারে?'

'তার খুবই সম্ভাবনা।'

'কেমন করে বুঝলে?'

অবনীমোহন বলতে লাগলেন, 'এই তো পরশুর আগের দিন এক সরকারি বড়কর্তা মিস্টার সেমন্ড রেডিওতে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। ফার ইস্টে অবস্থা যেভাবে ঘোরালো হয়ে উঠছে, তাতে কলকাতায় যে কোনওদিন বিমান আক্রমণ ঘটতে পারে। নইলে—'

হেমনাথ শুধোলেন, 'নইলে কী?'

'এত ব্ল্যাক-আউট, এত ট্রেঞ্চ খোঁড়াখুঁড়ি আর এয়ার-রেইড প্রিকশানের ঘটা চলছে কেন?'

অন্যমনস্কের মতো হেমনাথ বললেন, 'তা তো বটেই।' একটু চুপ করে থেকে গম্ভীর মুখে আবার বললেন, 'যুদ্ধ বাংলাদেশে এসে হাজির হলে সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার। সব ছারখার হয়ে যাবে। ওয়ারের আফটার এফেক্ট যে কী, ভাবতেই শিউরে উঠছি।'

অবনীমোহন এবার আর কিছু বললেন না।

হেমনাথ বলতে লাগলেন, 'কলকাতায় আর কী দেখলে বল।'

'চারদিকে মিলিটারি ছাউনি পড়েছে। যেখানে যাবেন সেখানেই মিলিটারি। রাস্তাঘাটে যত গাড়ি দেখবেন তার বেশির ভাগই মিলিটারির—হেভি ট্রাক আর জিপের জন্যে হাঁটাই মুশকিল। মনে হয়, সমস্ত শহরটা মিলিটারির হাতে চলে গেছে।' বলতে বলতে হঠাৎ কিছু মনে পড়ে গেল অবনীমোহনের, 'আরেকটা ব্যাপার চোখে পড়ল মামাবাবু—'

উৎসুক সুরে হেমনাথ জানতে চাইলেন, 'কী?'

'ব্যাঙের ছাতার মতো অলিতে গলিতে ব্যাঙ্ক গজাচ্ছে। পুজোর আগে যখন এখানে এলাম তখনও এত ব্যাঙ্ক দেখিনি। আমার তো ধারণা রোজ একটা করে ব্যাঙ্ক জন্মাচ্ছে।'

'যুদ্ধ বেধেছে, ইনফ্লেশন আরম্ভ হয়ে গেছে, ব্যাঙ্ক তো গজাবেই। দেখবে, টাকা এখন হাওয়ায় উড়তে থাকবে।'

'থাকবে কি, উড়তে শুরু করে দিয়েছে।'

চা খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। হেমনাথ তাড়া লাগালেন, 'এবার খবরের কাগজ বার কর অবনী—'

হিন্দুস্থানী কুলিরা বারান্দায় বাক্স টাঙ্ক এবং মালপত্তর নামিয়ে রেখে গিয়েছিল। অবনীমোহন বাইরে গিয়ে সুটকেস খুলে সপ্তাহ দুয়েকের খবরের কাগজ বার করলেন।

কাগজগুলো হাতে পাওয়া মাত্র হেমনাথ ঝুঁকে পড়লেন। তারপর চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পড়তে লাগলেন,

'২রা নভেম্বর। গ্রিসে ইতালীয় বাহিনীর অগ্রগতি। বৃটেন কর্তৃক টিরানায় বোমাবর্ষণ। তুরস্ক বর্তমানে যুদ্ধ বর্জন করিয়া চলিবে—প্রেসিডেন্ট ইনেনুর ঘোষণা।'

'৩রা নভেম্বর। মহারানী ভিক্টোরিয়ার জন্মস্থান কেনসিংটন প্রাসাদ বোমাবিধ্বস্ত। জার্মানির উপর প্রবল আক্রমণ—রাজকীয় বিমান-বহরের দাবী। জাপান হইতে আমেরিকানদের স্বদেশে প্রত্যাবর্তন। রাষ্ট্রপতি আজাদ কর্তৃক কংগ্রেসের জরুরি অধিবেশন আহ্বান। ভারতরক্ষা আইনে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু গ্রেপ্তার, কারা প্রাচীরের অন্তরালে বিচার।'

'৪ঠা নভেম্বর। গ্রীসের সাহায্যার্থে বৃটিশ সেনাবাহিনীর অগ্রগতি। জাপান কর্তৃক শত্রুপক্ষের নৌবহর বাজেয়াপ্ত। জার্মান-অধিকৃত দেশগুলিতে—পোল্যান্ড, ডেনমার্ক, চেকোশ্লোভাকিয়া, হল্যান্ড, ফ্রান্স, বেলজিয়াম ইত্যাদি ইত্যাদি—নাৎসীদের নিদারুণ অত্যাচার।'

'৫ই নভেম্বর। দারদানেলেস সমস্যার সমাধান, জার্মানির মধ্যস্থতা। সোভিয়েট রাশিয়ার সহিত ইটালির সঙ্ঘর্ষের সম্ভাবনা তিরোহিত। ডানিয়ুব সম্মেলন। বৃটিশ নোটের উত্তরে সোভিয়েট বক্তব্য এইরূপ, 'আমরা এই যুদ্ধে নিরপেক্ষ থাকিব।' মলোটভের ইঙ্গিতপূর্ণ বার্লিন পরিদর্শন। দীর্ঘ ছাপ্পান্ন দিন পর লন্ডনবাসীদের একটি বোমাবর্ষণহীন রাত্রি অতিবাহিত।'

'৬ই নভেম্বর। প্রতিরক্ষা বাহিনীর সম্প্রসারণ, ভারতবর্ষের যুদ্ধকালীন পরিকল্পনা। সমর-প্রস্তুতির প্রাথমিক ব্যয় তেত্রিশ কোটি টাকা। পরবর্তী প্রতি বছরে ব্যয় ষোল কোটি টাকা। অর্থের জন্য নূতন কর বসানো হইবে।'

'৭ই নভেম্বর। রুজভেল্ট তৃতীয় বারের জন্য আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত। পশ্চিমের মরু-রণাঙ্গনে বৃটিশ ট্যাঙ্কবাহিনী।'

'৮ই নভেম্বর। কালিনিনের সতর্কবাণী, রাশিয়া যুদ্ধ বর্জন করিয়া চলিবে। তবে কেহ তাহার সীমানা অতিক্রম করিতে চাহিলে চূর্ণ করিয়া দেওয়া হইবে।'

'৯ই নভেম্বর। আয়ারল্যান্ড নিরপেক্ষতা বজায় রাখিয়া চলিবে—ডি ভ্যালেরার ঘোষণা। টাওয়ার অফ লন্ডন বোমাবিধ্বস্ত। সোভিয়েট বাহিনীর প্রস্তুতি, সারা দেশে আপৎকালীন অবস্থা। ওয়ার্ধায় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির জরুরি সভা। রাজেন্দ্রপ্রসাদ, কৃপালনী, গান্ধীজি, পন্থ, রাজাগোপালাচারি, প্রফুল্ল ঘোষ, শঙ্কর রাও দেও প্রভৃতি নেতৃবৃন্দের উপস্থিতি।'

'১০ই নভেম্বর। ফুয়েরার কর্তৃক সর্বপ্রকার সমর সম্ভার দিয়া মুসোললিনিকে সাহায্য করার সিদ্ধান্ত। পরলোকে চেম্বারলেন। মিউনিক প্যাক্টের জনক, ইতিহাসে যাঁহাকে 'গৌরবময় ব্যর্থতা' আখ্যা দেওয়া হইয়াছে, তিনি আর নাই। নর্থের পর এমন দুর্বল প্রধানমন্ত্রী বৃটিশ সাম্রাজ্যে আর কখনও দেখা যায় নাই।'

'১১ই নভেম্বর। আফ্রিকার মরু অঞ্চলে যুদ্ধ সম্প্রসারিত। গাবন রক্ষার্থে ফরাসি সিদ্ধান্ত। জেনারেল দ্য গলের দৃঢ়তা।'

'১২ই নভেম্বর। হিটলার কর্তৃক বার্লিনে মলোটভের সংবর্ধনা। রুদ্ধদ্বার কক্ষে দীর্ঘ আলোচনার সময় রিবেনট্রপের উপস্থিতি। ফুয়েরার কর্তৃক অক্ষশক্তির প্রতি সোভিয়েট সাহায্য প্রার্থনা। সোভিয়েট সংবাদপত্রগুলি এ ব্যাপারে নীরব। লন্ডনে জল্পনা-কল্পনা।'

'পূর্ব রণাঙ্গনে ভয়াবহ জাপানি আক্রমণ। হাইনান ও ফরমোসায় বিপুল সৈন্য সমাবেশ। সায়গন, ফরাসি ইন্দোচিন ও কামরণ উপসাগরে অতর্কিত আক্রমণের সম্ভাবনা। সিঙ্গাপুরে চাঞ্চল্য।'

'১৭ই নভেম্বর। দীর্ঘ বিরতির পর লন্ডনে প্রবলতম বোমাবর্ষণ, প্রচন্ড নৈশ আক্রমণ। লণ্ডনবাসীদের ভূগর্ভে আশ্রয় গ্রহণ।'

'১৮ই নভেম্বর। সর্দার প্যাটেল কারারুদ্ধ। সুভাষচন্দ্রের বিরুদ্ধে মামলা। ভুলাভাই দেশাই কর্তৃক সত্যাগ্রহের সিদ্ধান্ত।'

হেমনাথ পড়ে যেতে লাগলেন।

অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে ছিল বিনু। কোথায় টিরানা, কোথায় আড্রিয়াটিক সাগর আর এজিয়ান সাগর, কোথায় দারদানেলেস আর ডানিয়ুব এবং ইন্দোচিন—ভূগোলের কোন প্রান্তে এই নামগুলো ছড়িয়ে আছে, কে বলবে। বিনুর কল্পনা অতদূর পৌঁছয় না। কালিনিন কি রিবেনট্রপ, ডি ভ্যালেরা

কিংবা টিমোশেঙ্কো, গোয়েবলস অথবা ইনেনু—এই সব নাম যাঁদের, তাঁদের চেহারাগুলো কতখানি ভয়াবহ তাই বা কে জানে।

কাগজ পড়া শেষ করে হেমনাথ মুখ তুললেন। অবনীমোহনের উদ্দেশে বললেন, 'অবস্থা তা হলে রীতিমতো ঘোরালোই হয়ে উঠেছে।'

'তাই তো মনে হচ্ছে।' অবনীমোহন মাথা নাড়লেন।

'আচ্ছা, তোমার কি মনে হয় রাশিয়া এই যুদ্ধ এড়িয়ে যেতে পারবে?'

'কী জানি, বুঝতে পারছি না।'

খানিক চিন্তা করে হেমনাথ বললেন, 'চারদিকে যেরকম বেড়া আগুন তাতে রাশিয়া কতদিন গা বাঁচিয়ে থাকতে পারবে, সেইটেই হচ্ছে কথা। টার্কি বা আয়ারল্যান্ড নিউট্রাল থাকুক বা যুদ্ধে নামুক, তার গুরুত্ব তেমন নয়। কিন্তু রাশিয়ার মতো এত বড় দেশ যদি যুদ্ধে নামে—ওয়ারের চেহারাই যাবে বদলে।'

সংশয়ের সুরে অবনীমোহন বললেন, 'এই তো সেদিন রাশিয়ায় রেভোলিউশন হয়ে গেল, এর মধ্যে যুদ্ধ করার মতো শক্তি কি ওদের হয়েছে?'

'একটা ব্যাপার তুমি বোধ হয় লক্ষ কর নি।'

'কী?'

'বৃটেন আর জার্মানি—দুই দেশই চাইছে রাশিয়া নিউট্রাল থাক। এর অর্থ কী?'

অবনীমোহন উৎসুক চোখে তাকালেন।

হেমনাথ বলতে লাগলেন, 'নিশ্চয়ই তার শক্তি আছে। যে পক্ষে রাশিয়া যাবে তার পাল্লা ভারী হবে। শত্রুর পাল্লা ভারী হোক, কে-ই বা তা চায়।' একটু থেমে আবার বললেন, 'একটা কথা তোমার খেয়াল নেই অবনী—'

'কী?'

'রেভোলিউশনের পর রাশিয়ার খবর দুনিয়ার লোক বিশেষ কিছুই জানে না। চারদিকে আয়রন কারটেন ফেলে ভেতরে ওরা কতদূর এগিয়ে গেছে, কে বলবে। আমার তো ধারণা, ধীরে ধীরে খুবই শক্তিধর হয়ে উঠেছে।'

অবনীমোহন কিছু বললেন না, আস্তে আস্তে মাথা নাড়লেন। হেমনাথের কথাগুলো খুবই যুক্তি-সঙ্গত। তার বিপক্ষে বলবার মতো কিছুই নেই।

কিছুক্ষণ চুপ। তারপর হেমনাথই আবার শুরু করলেন, 'আচ্ছা, এই যুদ্ধে বৃটেনের অবস্থা তোমার কী মনে হয়?'

'খুবই সঙ্গিন।'

'আমারও তাই মনে হয়। ব্যাটারা দারুণ ঠ্যাঙানি খাচ্ছে। হিটলার ওদের হাড়গোড় একেবারে ভেঙে দিচ্ছে। রয়াল এয়ার ফোর্স বলছে আমরা টিরানায় বোমা ফেলেছি, বার্লিন উড়িয়ে দিয়ে এসেছি—সব মিথ্যে, সব বাজে। ধাপ্পা দিয়ে দুনিয়ার কাছে মুখ রাখতে চাইছে আর কি। কিন্তু লোকে যা বুঝবার ঠিকই বুঝবে।'

দেখা গেল, রাশিয়ার ব্যাপারে কিছু সংশয় থাকলেও বৃটেন সম্বন্ধে অবনীমোহন আর হেমনাথ সম্পূর্ণ একমত। চিন্তিত গম্ভীর মুখে হেমনাথ বলতে লাগলেন, 'ওয়ার বেধেছে, তা ঠেকাবার ক্ষমতা তো আমাদের নেই। তবে—'

'তবে কী?'

'ওয়ারটা যদি ইউরোপেই আটকে থাকত, মন্দের ভাল। নিজেরা কাটাকাটি করে মরত, আমরা দূরে থেকে দেখতাম। কিন্তু তা তো হচ্ছে না। আগুন একেবারে দরজার সামনে এসে পড়েছে।'

'তাই তো মনে হচ্ছে।'

'এদেশে খুব দুর্দিন আসছে অবনী, খুবই দুর্দিন—' একই কথা দু'বার করে উচ্চারণ করলেন হেমনাথ।

অবনীমোহন বললেন, 'তা বুঝতে পারছি। এদিকে বৃটিশ গভর্নমেণ্ট কংগ্রেস নেতাদের একে

একে জেলে নিয়ে পুরছে, বিচারের নামে ফার্স করছে। 'ডিফেন্স অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্ট' একখানা করেছে বটে!'

'যা বলেছ।' হেমনাথ বলতে লাগলেন, 'ওয়ারের খরচ চালাবার জন্য আবার ট্যাক্স বসাবে। হরামজাদারা ইন্ডিয়াকে এবার ঝাঁঝরা করে ছাড়বে। সাধারণ মানুষের কী দুরবস্থা হয়, এবার দেখো।'

অবনীমোহন এবং হেমনাথ আসন্ন দুর্দিনের চেহারাটা দেখবার চেষ্টা করতে লাগলেন যেন।

বিনু প্রায় কিছুই বুঝতে পারছিল না। তবু রাশিয়া-জাপান-হিটলার-চার্চিল-স্টালিন এবং মহাযুদ্ধ—এই শব্দগুলির মধ্যে এমন প্রচন্ড আকর্ষণ আছে যে অন্য দিকে চোখ ফেরাতে পারছিল না সে, নিশ্বাস বন্ধ করে হেমনাথের আলোচনা শুনে যাচ্ছিল।

এদিকে আরেকটা ব্যাপার চলছিল। হেমনাথের পড়া খবরের কাগজগুলো নিয়ে সুধা-সুনীতি তক্তপোশের আরেক ধারে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল। বিনুর কানে এখন তাদের ফিসফিসানি ভেসে আসছে।

সুনীতি বলছে, 'দ্যাখ দ্যাখ, 'বিজলী'তে 'পথ ভুলে' আরম্ভ হয়েছে। প্রতিমা, ডি জি, পান্না, রণজিৎ রায় অভিনয় করছে। ইস, কলকাতায় থাকলে দেখতে পেতাম।'

সুধা বলল, ''উত্তরা'য় ন'সপ্তাহ ধরে 'শাপমুক্তি' চলছে। আসবার সময় দেখে এলাম না। আর কোনও দিন দেখাই হবে না।'

ধীরে ধীরে ঘুরে বসল বিনু। দেখল, দুই বোন সিনেমার পাতায় মুখ গুঁজে আছে। যুদ্ধ নিয়ে এত যে আলোচনা চলছে, সেদিকে তাদের এতটুকু লক্ষ্য নেই। তাদের দেখে মনে হয় না, পৃথিবীতে আদৌ কোনও সমস্যা আছে, দুই গোলার্ধ ঘিরে একটানা ভয়াবহ আগুনের চাকা ঘুরে চলেছে।

সুনীতি বলল, 'ভবানীপুরে আমাদের বাড়ির কাছে 'রূপালী' সিনেমা। সেখানে 'হাঞ্চব্যাক অফ নতরদ্যাম' চলছে। নাম ভূমিকায় চার্লস লটন।'

সুধা বলল, 'চার্লস লটনের অ্যাক্টিং আমার খুব ভাল লাগে।'

'আমারও।'

'দ্যাখ সুধা, কলকাতায় কত ছবি চলছে। প্যারাডাইসে 'বন্ধন', পূর্ণতে মধু বোস সাধনা বোসের 'রাজনর্তকী'। কিছুই দেখতে পেলাম না।'

কলকাতার মোহময় চিত্রজগৎ দুই বোনকে যেন হাতছানি দিয়ে চলেছে। নতুন নতুন কত বিচিত্র লোভনীয় ছবির মেলা বসেছে সেখানে, অথচ কিছুই তাদের দেখা হল না। সুধা সুনীতির কাছে এর চাইতে অপূরণীয় ক্ষতি আর কিছু নেই।

অবনীমোহন কলকাতা থেকে ফিরে এসেছেন। খবর পেয়েই মজিদ মিঞা কেতুগঞ্জ থেকে ছুটে এল। বলল, 'তাহলে আর দেরি করনের কাম নাই মিতা। আপনের জমিন বুইঝা ল'ন। কবে রেজিস্টারি করবেন, ক'ন?'

হেমনাথ কাছেই ছিলেন। হেসে ফেললেন, 'জমিটা অবনীকে না দেওয়া পর্যন্ত তোর দেখি ঘুম আসছে না!'

'তা যা কইছেন।' মজিদ মিঞা বলতে লাগল, 'কুনো ব্যাপার একবার মাথার ভিত্‌রে ঢুকলে যতক্ষণ হেইটা না হইতে আছে, আমার সোয়াস্তি নাই। হে কথা যাউক। আর কয়দিনের মইদ্যে ধান কাটা আরম্ভ হইয়া যাইব। তহন আর উয়াস (নিশ্বাস) ফেলানের সময় পামু না। ধানকাটার আগেই আমি জমিন রেজিস্টারি করতে চাই।'

স্নেহলতা এ আসরে আছেন। তিনি বললেন, 'সেই ভাল। ধানকাটা শেষ হতে হতে পৌষ মাস হয়ে যাবে। পৌষ মাসে শুভ কাজ করতে হবে না। কেনাকাটা যা করবার এই অঘ্রানেই একটা ভাল দিন দেখে সেরে ফেলা উচিত।'

তক্ষুনি একটা পঞ্জিকা এসে পড়ল। পাতা উলটে উলটে সপ্তাখানেক বাদে একটা শুভদিনও ঠিক করে ফেললেন হেমনাথ।

দিন তারিখ স্থির হবার পর মজিদ মিঞা বলল, 'এইর ভিত্‌রে একখান কথা আছে কিলাম মিতা—'

অবনীমোহন শুধোলেন, 'কী কথা?'

'যে জমিন আপনেরে দিমু হেয়াতে ধান আছে। এই সনের ধান কিন্তুক আপনে পাইবেন না, কারণটা হইল বর্গাদারেরে উই জমিন চাষ করতে দিছিলাম। আমি ছাইড়া দিলেও বর্গাদার তো ছাড়ব না। ধান উইঠা গ্যালে জমিনের দখল পাইবেন।'

অবনীমোহন তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, 'কী আশ্চর্য, ও ধান আমি নেব কেন? যারা খেটেছে ও ফসল তাদেরই প্রাপ্য।'

'তা হইলে কথা পাকা হইয়া গ্যাল।'

জমি কেনার ব্যবস্থা পাকা হয়ে যাবার পর একদিন দুপুরবেলা খেয়েদেয়ে সুধা সুনীতি আর বিনু পুকুরঘাটে আঁচাতে যাচ্ছিল। হঠাৎ রাস্তার দিক থেকে উঁচু গলার ডাক ভেসে এল, 'হ্যামকত্তা আছেন, হ্যামকত্তা—'

বিনুরা দাঁড়িয়ে পড়ল।

একটু পর রাস্তার দিক থেকে বাগানের ভেতর যে এসে পড়ল তার বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। মাথার চুল কাঁচা পাকায় মেশানো। শরীরের কোথাও বিন্দুমাত্র মেদ নেই। ছোটখাটো মানুষটি। চোখের দৃষ্টি কিছুটা অন্যমনস্ক, অনেকখানি উদাস। পোশাক আশাক আর কাঁধের ঝোলাখানা দেখে টের পাওয়া গেল, সে ডাক পিওন।

বিনুদের দেখে লোকটা দাঁড়িয়ে পড়েছিল। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে জিজ্ঞেস করল, 'আপনেরা?'

লোকটা কী জানতে চায়, বুঝতে পেরেছিল সুনীতি। নিজেদের পরিচয় দিল সে। হেমনাথের সঙ্গে সম্পর্ক কী, তাও বলল।

লোকটার চোখমুখ আলো হয়ে উঠল, 'তিন মাস আমি এই বাড়িত্‌ আসি নাই। হেইর লেইগা জানতে পারি নাই। আগে আইলে আপনেগো লগে চিনা-পরিচয় হইত। আমার নামখান কইয়া রাখি— নিবারণ ভুইমালী। আমি ডাকপিওন। হে যাউক, একহান কথা জিগাই—'

'কী?'

'আপনাগো ভিত্‌রে কেও সুনীতিরানী বসু আছেন?'

সুনীতি যেন চমকে উঠল, 'কেন?'

নিবারণ বলল, 'একহান চিঠি আইছে

কাঁপা গলায় সুনীতি এবার বলল, 'দিন। আমার নাম সুনীতি—'

ঝোলার ভেতর থেকে একটা খাম বার করল নিবারণ। সুনীতির ডান হাত এঁটো, ভাত টাত মাখানো রয়েছে। কাজেই বাঁ হাতে খামটা নিল সুনীতি। খামের ওপরকার নামঠিকানা চোখ পড়তেই তার মুখে রক্তোচ্ছ্বাস খেলে যেতে লাগল।

বিনু পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। সুনীতির মুখের দ্রুত রংবদল দেখতে দেখতে সে অবাক হয়ে যাচ্ছিল। ভেবেই পেল না, সুনীতিকে কে চিঠি লিখতে পারে!

নিবারণ এই সময় বলে উঠল, 'হ্যামকত্তায় বাড়িত্‌ আছেন?'

সুনীতি বুঝিবা শুনতে পেল না। হাতের খামটার দিকে পলকহীন তাকিয়ে ছিল। তার মুখে নানা রঙের খেলা চলতে লাগল।

ওধার থেকে সুধা উত্তর দিল, 'দাদু নেই। সকালবেলা উঠে বেরিয়ে গেছেন। সন্ধের আগে ফিরবেন না।'

নিবারণ এবার শুধলো, 'বউ-ঠাইরেন আছে তো?'

নিবারণ যে স্নেহলতার কথা বলছে, সুধা বুঝতে পারল। বলল, 'আছেন।'

'যাই, বউ-ঠাইরেনের লগে দেখা করি গা। ঘরের দুয়ারে আইসা তেনার লগে দেখা না করলে

pathagar.net

রক্ষা নাই। নিষ্যস আমার গর্দান যাইব।' নিবারণ বড় বড় পা ফেলে ভেতর-বাড়ির দিকে চলে গেল।

একটু নীরবতা।

তারপর সুনীতির দিকে ঝুঁকে সুধা বলল, 'কার চিঠি রে দিদি?' তার মুখচোখ থেকে কৌতূহল যেন উপচে পড়ছিল।

সুনীতি চকিত হয়ে বলল, 'কারোর না।' বলে শাড়ির ভেতর খামটা লুকোতে যাবে, তার আগেই ডিঙি মেরে দেখে নিল সুধা।

বিনুরও খুব ইচ্ছে করছিল, সুধার মতো পায়ের বুড়ো আঙুলে ভর দিয়ে দেখে নেয়, কিন্তু একটু দেরি হয়ে গেল। ততক্ষণে চিঠিটা অদৃশ্য হয়েছে।

এদিকে সুধার চোখ কৌতুক এবং দুষ্টুমিতে ঝকমকিয়ে উঠেছে। ঠোঁট ছুঁচলো করে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে খুব রগড়ের গলায় সে বলল, 'ফ্রম আনন্দ ঘোষ। আনন্দচন্দ্র তা হলে কথা রাখল। চিঠি দেবে বলেছিল, ঠিক দিয়েছে।'

শিউরে ওঠার মতো করে চারদিক একবার দেখে নিল সুনীতি। তারপর ভীতু গলায় বলল, 'অ্যাই সুধা, আই—চেঁচাচ্ছিস কেন? কেউ শুনতে পাবে।'

'শুনবে না। আমরা ছাড়া এখানে কেউ নেই।'

'না থাক, তুই মোটে চেঁচাবি না।'

'এক শর্তে চেঁচানো থামাতে পারি।'

সংশয়ের গলায় সুনীতি শুধলো, 'কী?'

সুধা বলল, 'আমাকে চিঠিটা পড়াবি। আনন্দ মহাপ্রভু কেমন করে তোর ভজনা করেছে, দেখতে হবে।'

জোরে জোরে প্রবলবেগে মাথা নেড়ে সুনীতি বলে, ' না না না—'

'তা হলে কিন্তু আমি সব্বাইকে বলে দেব।'

সুনীতি তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'হাত শুকিয়ে কড়কড়ি হলে গেল। চল আঁচিয়ে আসি।'

সুধা বলল, 'আঁচাবার পর কিন্তু পড়াবি। না পড়ালে ছাড়ছি না।'

পুকুরঘাটের দিকে যেতে যেতে সুনীতি ফিসফিস করল, 'কী অসভ্য লোক ভাই—'

'কার কথা বলছিস?'

'আহা, কার কথা যেন বুঝতে পারছে না—আনন্দদা'র কথা।'

সুধা বলল, 'অসভ্যের কী হল?'

সুনীতি বলল, 'এমন করে চিঠি কেউ লেখে!'

'ঢঙ করিস না দিদি।'

'ঢঙের কী হল?'

'আনন্দদা'র চিঠির জন্যে তো হা-পিত্যেশ করে বসে ছিলি।'

'তোকে বলেছে!'

'বলিস নি। তবে—'

'তবে কী?'

চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সুধা বলল, 'যেরকম উদাস উদাস চোখে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতিস আর ফোঁত ফোঁত করে দীর্ঘশ্বাস ফেলতিস তাতে মনে হচ্ছিল আনন্দদা'র চিঠি না এলে বুজি আত্মহত্যা করে বসবি।'

'তবে রে বাঁদর মেয়ে—' সুনীতি করল কি, এঁটো হাতেই সুধার পিঠে দুম করে কিল বসিয়ে দিল। পিঠ বাঁকিয়ে নাকি সুরে উঁ উঁ করতে করতে সুধা বলল, 'পেটে খিদে মুখে লাজ। সত্যি কথা বললেই দোষ।'

'সত্যি কথা তোকে বলাচ্ছি। আয়—'

দ্বিতীয় কিলটি পড়বার আগেই ছুটে দূরে সরে গেল সুধা।

পুকুরঘাটে আঁচাতে আঁচাতে সুনীতি বলল, 'ভাগ্যিস পিন্টুটার সঙ্গে আমাদের দেখা হয়ে গিয়েছিল।

pathagar.net

বাবা কি দাদু টাদুর হাতে চিঠিটা পড়লে কী হত বল দেখি।'

এক মুখ জল নিয়ে পিচকিরির মতো ছুঁড়ে দিল সুধা। তারপর বলল, 'খুব ভাল হত। ওঁরা বুঝতে পারতেন কী পাকাটাই না তুই পেকেছিস।'

'আমাকে নিয়ে বেশি মজা কোরো না, নিজের কথাটা একটু ভেবে দেখো।'

'আমার আবার কী কথা?' সুধার চোখ কুঁচকে গেল।

সুনীতি বলল, 'শ্রীমান হিরণকুমার ঢাকায় বসে আছেন। তিনিও এইরকম চিঠি ছাড়তে পারেন। আর তা দাদু কি বাবার হাতে পড়তে পারে।'

চমকে ওঠার মতো করে সুধা বলল, 'কক্ষনো না—'

'না নয়, হ্যাঁ।'

সুধাকে এবার চিন্তিত দেখাল, 'তাই তো রে দিদি, কী করা যায় বল দেখি—'

নারকেল-গুঁড়ি দিয়ে বাঁধানো ঘাটে দুই বোন পাশাপাশি বসল। বিনু তাদের সঙ্গেই ছিল, হাত নেড়ে নেড়ে হেমন্তের স্থির জলে ঢেউ তুলতে লাগল। কান দু'টো কিন্তু তার সুধা সুনীতির দিকেই ফেরানো।

সুনীতি বলল, 'আজই কলকাতায় চিঠি লিখে জানিয়ে দেব, আমাকে যেন আর চিঠি টিঠি না লেখে—'

সুধা বলল, 'তোর কথা শুনবার জন্যে বসে আছে আনন্দদা।'

'তা হলে হিরণকুমারও তা-ই।'

'যা বলেছিস। বারণ করলে ওরা আরও বেশি করে চিঠি লিখবে।'

একটু ভেবে সুনীতি হঠাৎ খুব উৎসাহিত হয়ে উঠল, 'একটা ফন্দি মাথায় এসেছে রে সুধা—'

সুধা উৎসুক চোখে তাকাল, 'কী?'

উত্তর না দিয়ে সুনীতি বিনুকে ডাকল। বিনু তাকাতেই বলল, 'পোস্ট অফিসটা কোথায় জানিস?'

বিনু ঘাড় কাত করল, অর্থাৎ জানে।

'দু'দিন পর পর একবার করে পোস্ট অফিসে যাবি ভাই?'

'কেন?'

'সুধার কি আমার চিঠি থাকলে নিয়ে আসবি।'

চোখ কুঁচকে একটু ভাবল বিনু। তারপর বলল, 'যেতে পারি। কিন্তু—'

সুনীতি উঠে এসে বিনুর গা ঘেঁষে বসে পড়ল, 'কিন্তু কী?'

'আমাকে কী দিবি?'

'কী আবার দেব? যাবি তো বাবা এখান থেকে ওখানে—'

'এখান থেকে ওখানে! সেই স্টিমারঘাট বরফকল ছাড়িয়ে তবে পোস্ট অফিস। পাক্কা দেড়-দু'মাইল রাস্তা। এমনি এমনি অতখানি পথ আমি যেতে পারব না।'

সুনীতি তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'আচ্ছা আচ্ছা, কী নিবি বল—'

বিনু বলল, 'যেদিন পোস্ট অফিসে যাব সেদিন দু'আনা পয়সা দিবি।'

'দু'আনা!' সুর টেনে সুনীতি বলল, 'তুই কী ডাকাত রে—'

'তা হলে যেতে পারব না।'

'আচ্ছা আচ্ছা, দু'আনাই দেব।'

ওদিক থেকে সুধা ডাকল, 'দিদি—'

সুনীতি আবার সুধার কাছে ফিরে গেল, 'কী বলছিস?'

'পোস্ট অফিসের ব্যাপারটা তো মিটল। এবার আনন্দদা'র চিঠি বার কর।'

'না না—'

'না বললে শুনছি না। বার কর—' সুনীতির শাড়ির আড়াল থেকে চিঠিটা বার করার জন্য টানাটানি শুরু করে দিল সুধা।

শাড়ি সামলাতে সামলাতে বিব্রতভাবে চেঁচামেচি জুড়ে দিল সুনীতি. 'এই সুধা, এই—'

সুধার এক কথা, 'বার কর, বার কর—'

আত্মরক্ষার জন্য সুনীতি তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'ছাড় ছাড়, কী ছেলেমানুষি করছিস! বিনু রয়েছে না?'

'বিনু গেলে চিঠি দেখাবি?'

'সে দেখা যাবে।'

সুধা এবার বিনুর উদ্দেশে বলল, 'তুই এখন যা তো বিনু—'

বিনুর মোটেই যাবার ইচ্ছে নেই। আনন্দদা সুনীতিকে কী লিখেছে, জানবার ভারি কৌতূহল হচ্ছিল। সে বলল, 'না, যাব না।'

'যাবি না?

'না।'

একটা ছোটখাটো খণ্ডযুদ্ধ বেধে যাবার সম্ভাবনা ছিল। তার বদলে অগ্নিদৃষ্টিতে একবার বিনুকে দেখে নিয়ে সুধা বলল, 'চল দিদি, আমরা ওদিকে যাই। হনুমান ছেলে এখানে বসে থাক।' সুনীতিকে সঙ্গে নিয়ে বাগানের উত্তর দিকে ঘন রোয়াইল আর সিনজুরি ঝোপের ভেতর চলে গেল সুধা।

একা একা ক্ষুণ্ণ মনে কিছুক্ষণ পুকুরঘাটে বসে থাকল বিনু। তারপর একসময় টুক করে উঠে পড়ে চঞ্চল পাখির মতো অস্থির পায়ে বাগানের ভেতর ঘুরে বেড়াতে লাগল। একবার ইচ্ছে হল, রোয়াইল আর সিনজুরি বনে ঘন ছায়ার ভেতর সুধা সুনীতি যেখানে বসে আছে সেখানে চলে যায়। পরক্ষণেই ভাবল ওরা যখন তাকে ফেলে চলেই গেছে, আর হ্যাংলার মতো যাবে না।

অনেকক্ষণ পর বাড়ির ভেতর চলে এল বিনু। এসেই অবাক।

রান্নাঘরের দাওয়ায় নিবারণ পিওন একটা মোটা গামছা পরে খালি গায়ে তেল মাখছিল। কোথায়ই বা তার ইউনিফর্ম, কোথায়ই বা তার চিঠি পত্তরের ঝোলা! তার মুখে অনবরত খই ফোটার মতো কথা ফুটছিল।

স্নেহলতা-সুরমা-শিবানী-অবনীমোহন, বাড়ির প্রায় সবাই নিবারণের সামনে দাঁড়িয়ে। পায়ে পায়ে বিনুও গিয়ে সেখানে দাঁড়াল। তার মনে হল, এত যখন তেল মাখার ঘটা, নিবারণ এখানে খাবেও।

নিবারণ বলছিল, 'চিঠি লইয়া এই বাড়িত্ যেদিনই আসি হেইদিনই ছান-খাওয়া সাইরা যাই। হেইদিন খাওন আমার বান্ধা। না খাইয়া গ্যালে হ্যামকত্তা আর বউ-ঠাইরেন আস্তা রাখব না।'

কথাগুলো অবনীমোহনের উদ্দেশে বলা। অবনীমোহন উত্তর দিলেন না, নিঃশব্দে হাসলেন শুধু।

নিবারণ বলতে লাগল, 'রাইজদার হ্যামকত্তার বাড়ি, বাজিতপুরে অভয় কবিরাজের বাড়ি, সুনামগঞ্জে ইসমাইল মেরধার (মৃধা) বাড়ি, গিরিগুঞ্জে ছোভান (সোভান) আলি মৌলবীর বাড়ি, হাসাড়ায় মল্লিকগো বাড়ি—এই কয় বাড়িতে চিঠি লইয়া গ্যালে খাইতে হইবই।'

অবনীমোহন এবার ঈষাৎ বিস্ময়ের সুরে বললেন, 'আপনি তো অনেকগুলো গ্রামের নাম করলেন—'

'হ।'

'এত এত গ্রামে আপনাকে ঘুরতে হয়?'

'মোটে তো চাইরহান গেরামের নাম কইলাম। আমারে বিশহান গেরামে ঘুরতে হয় জামাইকত্তা—'

অবনীমোহন হেমনাথের ভাগনী-জামাই। সেই সুবাদে এরই ভেতর 'জামাই কত্তা' ডাকতে শুরু করেছে নিবারণ।

অবনীমোহন বললেন, 'বিশখানা গ্রাম একদিনে যান কী করে?'

'একদিনে ক্যাঠা (কে) যায়।'

'তবে?'

নিবারণ এরপর যা উত্তর দিল, সংক্ষেপে এইরকম। রাজদিয়া এবং আশেপাশের কুড়িখানা গ্রাম নিয়ে এখানে মাত্র পোস্ট অফিস, আর ডাক পিওন বলতে একা নিবারণ। মস্ত ঝোলায় চিঠিপত্র

বোঝাই করে প্রতি সোমবার সে বেরিয়ে পড়ে। পথে নদী খাল বিল পড়লে, নৌকোর মাঝিদের ডেকে ডেকে পাড়ি জমায়, কখনও বা 'গয়নার নৌকো' ধরে নেয়। যেখানেই যাক, এই জলের দেশে মানুষ বড় ভাল, বড় দয়ালু। দু'মুঠো না খাইয়ে কেউ ছাড়তে চায় না। রাত্রিবেলা কোথাও না কোথাও একটা আশ্রয় জুটে যায়ই।

সোম থেকে শনি, একটানা ছ'দিন চিঠি বিলির পর রাজদিয়ায় ফিরে আসে নিবারণ। মাঝখানে রবিবারটা বিশ্রাম। তারপর আবার সোমবার দূরের গ্রাম-গঞ্জ-জনপদে বেরিয়ে পড়া। পঁচিশ তিরিশ বছর ধরে এই রকমই চলছে।

সব শুনে অবনীমোহন কী বলতে যাচ্ছিলেন, তার আগেই স্নেহলতা বলে উঠলেন, 'বকবকানি থামিয়ে এখন চান করতে যা নিবারণ। তোকে খেতে দেবার পর আমরা খাব।'

'এই যাই—' ব্যস্তভাবে নিবারণ পুকুরঘাটের দিকে চলে গেল। একটু পর ফিরে এসে যখন খেতে বসল তখনও তার কথার শেষ নেই। খেতে খেতে গল্প করতে লাগল সে।

একধারে দাঁড়িয়ে বিনুর মনে হল, লোকটা যেন বকবক করার কল। দম দেওয়াই আছে, সব সময় গল গল করে কথা বেরিয়ে আসছে।

খাওয়াদাওয়ার পর নিবারণ বিনুকে ঘিরে পড়ল, 'তোমার লগে ভালা কইরা আলাপই হইল না নাতিবাবু। লও যাই, ইট্টু গপ-সপ করি।' বিনুকে সঙ্গে নিয়ে যুগলের ঘরে গিয়ে ঢুকল সে। বোঝা গেল, এ বাড়ির সব অন্ধিসন্ধিই তার চেনা। টের পাওয়া গেল, এতক্ষণ বকবক করেও তার সাধ মেটে নি, আরও কিছুক্ষণ সে গল্প করতে চায়।

লোকটাকে খুব খারাপ লাগছিল না বিনুর। যুগলের নীচু তক্তপোশে নিবারণের পাশাপাশি বসে উন্মুখ হয়ে থাকল সে।

একটা বিড়ি ধরিয়ে নিবারণ বলল, 'তোমরা তো কইলকাত্তার পোলা?'

বিনু মাথা নাড়ল।

'কইলকাত্তা দ্যাশখান ক্যামন কইবা?'

কলকাতা কেমন শহর, কথায় কথায় তার মোটামুটি ছবি এঁকে নিবারণের চোখের সামনে যেন সেঁটে দিল বিনু।

শুনে কিছুক্ষণ বোবা হয়ে থাকল নিবারণ। তারপর বলল, 'আলিসান ব্যাপার, না?'

'হ্যাঁ।'

'কইলকাত্তার কথা তো শুনলাম। এইবার আমাগো জলের দ্যাশের গপ শোন।'

'বলুন—'

দেখা গেল নিবারণ লোকটা সত্যি সত্যি গল্পের খনি। বিপুল অভিজ্ঞতা তার। কবে কার্তিক মাসের ঝড়ে বড় গাঙে 'গয়নার নৌকো' উলটে গিয়ে মরতে বসেছিল, তার পর দু'খানা মোটে হাতের ভরসায় দু'মাইল উথলপাথল নদী পাড়ি দিয়েছিল, কবে চরের মুসলমানদের সঙ্গে শুধু লাঠি পেটা করে একটা প্রকাণ্ড কুমির মেরে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কাছ থেকে দশ টাকার পুরস্কার পেয়েছিল, কবে কোথায় সাক্ষাৎ যমের মতো ডানাওলা উড়ন্ত সাপ দেখেছিল, কোথায় দু'শ' বছরের এক বুড়ো ফকিরের অলৌকিক মন্ত্রবলে বিশাল দীঘির সব জল দুধ হয়ে গিয়েছিল—হাত-পা চোখমুখ নেড়ে কত বিচিত্র বিস্ময়কর গল্প যে নিবারণ বলে গেল, হিসেব নেই।

গল্প বলতে জানে বটে লোকটা! মুগ্ধ বিস্ময়ে শুনে যাচ্ছিল বিনু। তার চোখে পলক পড়ছিল না।

গল্পে গল্পে বিনুকে জয় করে বিকেলের খানিক আগে নিবারণ চলে গেল। এখান থেকে পথে কারোর নৌকো ধরে সোজা সুজনগঞ্জ যাবে সে।

নিবারণ চলে যাবার কিছুক্ষণ পরে হেমন্তের ছায়া যখন আরও দীর্ঘ এবং ঘন হল সেই সময় সিনজুরি বন থেকে বেরিয়ে সুধা সুনীতি বাড়ি চলে এল।

পুবের ঘরের দাওয়ায় বসে সুরমা চুল বাঁধছিলেন। বিনু তার কাছেই ছিল। মেয়েদের দেখে সুরমা

বললেন, 'কোথায় ছিলি রে তোরা এতক্ষণ?'

সুনীতি বলল, 'বাগানে—'

'কী করছিলি?'

'গল্প।'

'কলকাতা থেকে নাকি চিঠি এসেছে?'

সুনীতি থতমত খেয়ে যায়। আধফোটা গলায় বলল, 'হ্যাঁ।'

সুরমা শুধলেন, 'কার চিঠি?'

'আমার—'

'তোকে আবার কে চিঠি দিলে?'

'আমার কলেজের এক বন্ধু, সেই যে বেলা বলে মেয়েটা, কলকাতায় আমাদের বাড়ি আসত—'

সুরমা আর কিছু জিজ্ঞেস করলেন না।

বিনু লক্ষ করল, সুধা সুনীতি চোরা চাহনিতে পরস্পরকে দেখতে দেখতে ঠোঁট টিপে হাসছে। বিনুর একবার ইচ্ছে হল, চিঠির আসল রহস্যটা ফাঁস করে দেয়। কী ভেবে শেষ পর্যন্ত চুপ করে থাকল, কিছু বলল না।

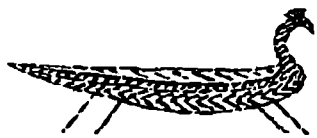

অঘ্রানের মাঝামাঝি বিনুদের জমি কেনা হয়ে গেল।

রেজিস্ট্রি হবার পর অবনীমোহন বিনু আর সুরমা রেজিস্ট্রি অফিস থেকে বেরিয়ে আসছিলেন। মজিদ মিঞা, হেমনাথ তখনও অফিসের ভেতর। সুরমাকে এতদূর আসতে হয়েছে, কেননা জমি তাঁর নামেই কিনেছেন অবনীমোহন।

হঠাৎ একটা লোক—মাথার চুলে জট বাঁধা, মুখময় দাড়ি-গোঁফ, ভাঙা-ভাঙা নখ, পায়ে হাজা, লালচে উদ্‌ভ্রান্ত চোখ, সব মিলিয়ে পাগলাটে চেহারা—অবনীমোহনের সামনে এসে দাঁড়াল। বলল, 'সালাম বাবু। আপনে বুঝিন জমিন কেনলেন?'

অবনীমোহন অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। বললেন, 'হ্যাঁ, কেন?'

'আপনের লগে একহান কথা আছে।'

অবনীমোহন বললেন, 'কী কথা?'

হলদে হলদে অসমান দাঁত বার করে লোকটা বলল, 'কার জমিন কেনলেন?'

'মজিদ মিঞার।'

চোখের ওপর হাত রেখে ভুরু কুঁচকে লোকটা ভাবতে চেষ্টা করল যেন। বলল, 'কোন মজিদ মেঞা ক'ন দেখি? বাড়ি কুনখানে?'

অবনীমোহন বললেন, 'কেতুগঞ্জে।'

'কেতুগঞ্জের মজিদ মেঞা বড় ভালা মানুষ।' লোকটার চোখমুখ আলো হয়ে উঠল, 'মেঞাভাইর কুন জমিন কেনলেন?'

'উত্তরের দিকের মাঠের।'

'উত্তরের চকের জমিন? বড় বাহারের জমিন। হেই ধারে সুজনগুঞ্জের হাট, আর এইধারে ধলেশ্বরীর গাঙ—এইর ভিতরে অ্যামন ভালা জমিন আর নাই।'

অবনীমোহন অবাক হয়ে গিয়েছিলেন, 'তুমি এখানকার সব জমি চেনো নাকি।'

'চিনি আবার না! হগ্‌গল চিনি, মেঞাভাইর যেই জমিন আপনে কেনলেন হেয়াতে ধান দ্যান, পাট দ্যান, মুঙ-মুসৈর-কলই—যা ইচ্ছা দ্যান, ফলন যা হইব—চোমৎকার—চোমৎকার—'

একটু চুপ।

তারপর লোকটাই আবার শুরু করল, 'আপনের লগে এত কথা কইলাম, আপনে কে, হেয়াই জানলাম না।'

অবনীমোহন নিজের পরিচয় দিলেন।

অপার বিস্ময়ে লোকটা খানিকক্ষণ হাঁ হয়ে থাকল। তারপর বলল, 'আপনে হ্যামকত্তার জামাই!'

অবনীমোহন আস্তে মাথা নাড়লেন। হেমনাথের সঙ্গে সম্পর্ক থাকাটাই যেন এখানে পরমাশ্চর্য ঘটনা। এ লোকটার চোখেমুখে যে বিস্ময় তা রাজদিয়াবাসী প্রতিটি মানুষের চোখে আগেই দেখেছেন অবনীমোহন।

লোকটা বলল, 'আপনে নিয্যস কইলকাত্তায় থাকতেন?'

'হ্যাঁ। তোমায় কে বললে?'

'কে কইছিল মনে নাই। তয় শুনছিলাম, কইলকাত্তা থিকা হ্যামকত্তায় ক্যাঠা যিনি আইছে। ভাবছিলাম আপনেরে দেখতে যামু—'

'যাও নি তো—'

'না।'

'গেলেই পারতে।'

একটু ভেবে লোকটা বলল, 'যাওনের সোময় কই? চকে চকে মাঠে ঘাটে ঘুইরা দিন কাইটা যায়। কুনোখানে যাওনের ফুরসুত নাই।'

বিনু একধারে দাঁড়িয়ে ছিল। সে ভেবেই পেল না, মাঠে ঘাটে এত কী কাজ লোকটার! ইচ্ছে হল একবার জিজ্ঞেস করে, কী ভেবে করল না।

অবনীমোহন বললেন, 'নামটা কী ভাই?'

'তালেব—তালেব মেঞা—'

'তুমি এই রাজদিয়াতেই থাকো?'

'না।'

'তবে?'

তালেব কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর উদাস গলায় অন্যমস্কের মতো বলল, 'বাড়ি আমার এই দ্যাশে না।'

অবনীমোহন শুধোলেন, 'কোথায়?'

'হেই ম্যাঘনার পারে। তয়—'

'কী?'

'দ্যাশ কইতে কিচ্ছু নাই আমার। ম্যাঘনায় ঘরবাড়ি খাইছে, ভাসতে ভাসতে এইহানে চইলা আইলাম। দশ বিশ বচ্ছর ধইরা এইহানেই আছি।'

'তোমার কে কে আছে?'

'কেউ না। এক্কেরে ঝাড়া হাত-পাও।'

অবনীমোহন হয়তো কৌতূহল বোধ করছিলেন। বললেন, 'এখানে কোথায় থাকো তুমি?'

তালেব বলল, 'থাকনের ঠিকঠিকানা নাই। যহন যেইহানে পারি হেইহানে পইড়া থাকি। তয় মাঠে ঘাটেই থাকি বেশি।'

'রাত্তিরেও?'

'হ।'

সঙ্গে সঙ্গে কিছু বললেন না অবনীমোহন।

তালেব আবার কী বলতে যাচ্ছিল, সেই সময় মজিদ মিঞাকে নিয়ে হেমনাথ এসে পড়লেন। এতক্ষণ রেজিস্ট্রি অফিসের ভেতর মুহুরি আর উকিলের সঙ্গে কথাবার্তা বলছিলেন তাঁরা।

হেমনাথকে দেখে অনেকখানি ঝুঁকে সম্ভ্রমের গলায় তালেব বলল, 'ছালাম বড়কত্তা, শরীল গতিক ভালা তো?'

হেমনাথ বললেন, 'ভাল। তুই কেমন আছিস তালেব?'

pathagar.net

'আপনেরা য্যামন রাখছেন।'

'আমরা রাখবার কে?' আকাশের দিকে দেখিয়ে হেমনাথ বললেন, 'ভাল মন্দ যা রাখবার ওই ওপরওলাই রাখেন।'

তালেব জোরে মাথা নেড়ে বলল, 'লাখ কথার এক কথা। খোদাতাল্লা ছাড়া কে আর রাখতে পারে।'

ওপাশ থেকে মজিদ মিঞা বলে উঠল, 'জমিন রেজিস্টারির খবর বুঝিন পাইয়া গেছস?'

নোংরা জট-পাকানো দাড়িগোঁফের ভেতর জগতের সরলতম হাসিটি ফুটিয়ে তালেব মাথা হেলিয়ে দিল।

মজিদ মিঞা আবার বলল, 'গোন্ধ পাইয়াই লৌড়াইয়া (দৌড়ে) আইছস?'

'হ।'

হেমনাথ এই সময় তাড়া দিলেন, 'এখানে আর দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না। বেলা হেলতে চলল, এবার বাড়ি ফেরা যাক।'

মজিদ মিঞা ব্যস্ত হয়ে উঠল, 'হ হ, শুদাশুদি খাড়ইয়া থাকনের কুন কাম? ল'ন যাই।'

সুরমাকে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। রাজদিয়ার এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত, এতখানি রাস্তা তাঁর মতো দুর্বল, রোগা মানুষের পক্ষে একবার হেঁটে এসে আবার ফিরে যাওয়া অসম্ভব। শরীরে তা হলে আর কিছুই থাকবে না। তাই সকাল বেলাতেই লারমোরের ফিটনখানা আনিয়ে রেখেছিলেন হেমনাথ।

সামনের দিকে একটা ডালপালা-ওলা বিশাল জামরুল গাছের তলায় লারমোরের ফিটনটা দাঁড়িয়ে ছিল। বয়স্ক, রুগ্‌ণ ঘোড়াটা আর কোচোয়ান কাদের দু'জনেই ঝিমুচ্ছিল। হেমনাথরা সোজা সেখানে চলে এলেন।

মজিদ মিঞা গলা চড়িয়ে ডাকল, 'কাদের—'

অতি কষ্টে চোখের পাতা দু'টো ওপর দিকে টেনে তুলল কাদের। ঘুমন্ত গলায় সাড়া দিল, 'হ—'

'ঘুমাস নিকি?'

'না।' বলতে বলতেই আবার কাদেরের চোখ বুজে এল।

'ঘুমাস না তো চৌখ বুইজা আছস ক্যান?' মজিদ মিঞা বলতে লাগল, 'নে, চৌখ টান কর। তর ঘোড়ারে জাগা। আমাগো কাম হইয়া গ্যাছে। এইবার বাড়িত্ যামু।'

একে একে সবাই ফিটনে উঠল।

হেমনাথের সঙ্গে জামরুল তলায় তালেবও এসেছিল। সবাইকে গাড়িতে উঠতে দেখে সে উৎকণ্ঠিত হল। ফিটন ছাড়বার মুখে তাড়াতাড়ি অবনীমোহনকে ডাকল, 'জামাইকত্তা—'

অবনীমোহন তাকালেন, 'কী বলছ?'

'আমার হেই কথাহান কিলাম কওয়া হয় নাই।'

অবনীমোহনের মনে পড়ে গেল। সাগ্রহে বললেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, বল—'

তালেব বলল, 'জমিন কিনলেন, ধান রুইবেন তো?'

'সেইরকমই ইচ্ছে। চাষ না করলে আর কিনলাম কেন?' অবনীমোহন হাসলেন।

'অঘ্‌ঘান, পৌষ মাসে ধান কাটার পর—' তালেব বলতে লাগল, 'আপনের জমিনে যা দুই-চাইর দানা পইড়া থাকব, হেগুলান কিলাম আমার। ইন্দুরের গাদে (ইঁদুরের গর্তে) যা ধান থাকব হেও (তাও) আমার।'

'কিন্তু—'

'কী?'

'মাটির সঙ্গে যে ধান মিশে থাকবে তা তুলবে কী করে?'

'হে আমি য্যামনে পারি। আপনে খালি কথা দ্যান, উই ধান আমারে দিবেন।'

সংশয়ের গলায় অবনীমোহন বললেন, 'তুমি যদি তুলে নিতে পার, আমার আপত্তি নেই।'

pathagar.net

তালেবের চোখমুখ থেকে আনন্দ যেন উছলে পড়তে লাগল। এত বড় জয় যেন আর কখনও হয়নি তার। উৎফুল্ল সুরে মাথা হেলিয়ে সে বলতে লাগল, 'কথা দিলেন কিলাম, পাকা কথা—'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, পাকা কথা বৈকি—'

একসময় ফিটন চলতে শুরু করল।

অনীমোহনের বিস্ময় আর কাটছিল না। বললেন, 'অদ্ভুত লোক—'

হেমনাথ বললেন, 'হ্যাঁ, অদ্ভুতই। প্রায়ই এই রেজিস্ট্রি অফিসে এসে বসে থাকে। আর যে জমি কেনে তাকে গিয়ে ধরে, যাতে ধান ওঠার পর ঝড়তি পড়তি ফসল ও কুড়িয়ে নিতে পারে।'

'আর কিছু করে না?'

'না। করতে তো অনেকেই বলে। আমি বলেছি, মজিদ বলেছে, রামকেশব বলেছে, গুয়াখোলার রহিম মিঞা বলেছে। কামলার তো সবারই দরকার। আমরা ওকে বাড়িতে এসে থাকতে বলেছি। কিন্তু কে কার কথা শোনে!'

'ধান কুড়িয়ে দিন চলে?'

'ভগবান জানে।'

সারা রাস্তা তালেবের কথাই হল। কথায় কথায় একসময় বরফ কল, স্টিমারঘাট, সারি সারি মিঠাইর দোকান পেরিয়ে ফিটন হেমনাথের বাড়ি এসে থামল।

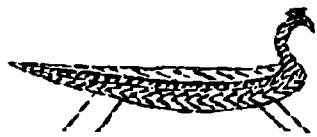

পুজোর আগে সেই যে ঝিনুক এ বাড়ি এসেছিল, এখনও যায়নি। ভবতোষ অবশ্য মাঝে মধ্যে এসে মেয়েকে দেখে গেছেন। ঠিক হয়েছে এখানে থেকেই পড়াশোনা করবে ঝিনুক। ইংরেজি নতুন বছর পড়লে স্কুলে ভর্তি হবে।

এখনও মাছের বড় টুকরোটা নিয়ে, দাদুর কাছে শোওয়া নিয়ে, স্নেহলতার ভাগ নিয়ে বিনুর সঙ্গে সমানে হিংসে করে যাচ্ছে ঝিনুক। তবে পুজোর ছুটিতে কলকাতা থেকে ঝুমারা আসার পর ঝিনুক যেমনটি হয়ে উঠেছিল, এখন আর তেমন নেই। তখন সব সময় বিনুর দিকে তাকিয়ে থাকত সে। বিনু কী করে, কোথায় যায়, সব তীক্ষ্ণ ধারাল চোখে লক্ষ করত। ঝুমার সঙ্গে বিনু খেলা করলে, কথা বললে, কিংবা বেড়াতে গেলে রাগে-আক্রোশে-বিদ্বেষে জর্জরিত হয়ে যেত। আজকাল সে ভাবটা নেই তার।

একটা ব্যাপার বিনু লক্ষ করেছে, লেখাপড়া খেলাধুলো কিংবা তার সঙ্গে হিংসের ফাঁকে ফাঁকে কখনও কখনও পুবের ঘরের দাওয়ায় চুপচাপ গালে হাত দিয়ে বসে ঝিনুক, উদাস চোখে হেমন্তের অনুজ্জ্বল ধূসর আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে। যে ঝিনুক হিংসে করে, যে ঝিনুক দাদু-দিদার ভাগ নিয়ে গাল ফুলিয়ে দুর্বিনীত ঘাড় বাঁকিয়ে থাকে, তাকে তবু চেনা যায়। কিন্তু এই মেয়েটা বড় অচেনা, তাকে বড় দূরের মনে হয়।

এমনিতে ঝিনুককে বিশেষ পছন্দ করে না বিনু, আবার অপছন্দও করে না। কিন্তু নির্বাক, বিষণ্ণ প্রতিমার মতো এই সুদূর, অচেনা মেয়েটা তাকে যেন অসীম আকর্ষণে টানতে থাকে।

একেক সময় বিনু তার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। জিজ্ঞেস করে, 'এখানে বসে কী করছ?'

প্রথমটা হয়তো শুনতেই পায় না ঝিনুক। দু'চারবার ডাকাডাকির পর সে চমকে তাকায়। বিনু আগের প্রশ্নটাই আবার করে, 'এখানে কী করছ?'

গাঢ় বিষাদের গলায় ঝিনুক বলে, 'মা'র কথা ভাবছি।'

দুঃখী মেয়েটা নিমেষে যেন বিনুকে অভিভূত করে ফেলে। তার অনেকখানি কাছে গিয়ে অপার সহানুভূতির সুরে সে শুধোয়, 'মা'র জন্যে মন কেমন করছে?'

আস্তে আস্তে কোঁকড়ানো চুলে ভরা মাথাটা নেড়ে অস্ফুট গলায় ঝিনুক বলে, 'হুঁ—' রুপোর

কাজললতার মতো বড় বড় চোখদু'টো প্রথমে জলে ভরে যায়, তারপর ফোঁটায় ফোঁটায় টপ টপ ঝরে পড়তে থাকে।

এই সময়টা একেবারে দিশেহারা হয়ে যায় বিনু। কিভাবে ঝিনুককে সান্ত্বনা দেবে, কেমন করে কোন সমবেদনার কথা বললে মেয়েটা শান্ত হবে, সে ভেবেই পায় না। বিমূঢ়ের মতো কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে গম্ভীর ভারী গলায় বিনু বলে, 'কেঁদো না।'

কান্না থামে না। ঝিনুক ফুলে ফুলে ফোঁপাতেই থাকে, আর ভাঙা ভাঙা, গলায় বলে, 'মাকে আমি আর কক্ষনো দেখতে পাব না।'

গলার কাছটা, বুকের ভেতরটা কেমন ভারী হয়ে আসে বিনুর। কান্নার মতো কিছু একটা উথলে বেরিয়ে আসতে চায়, কিন্তু পথ পায় না। ফিসফিস করে বিনু এবার যা বলে, ঝিনুক তো নয়ই, নিজেও স্পষ্ট বুঝতে পারে না।

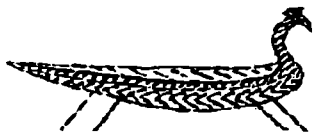

অঘ্রানের শেষাশেষি একদিন হেমনাথ বললেন, 'মাঠের ধান তো পেকে এল। আর ক'দিন পর কাটা শুরু হবে। তার আগে একটা কাজ করা দরকার।'

স্নেহলতা-অবনীমোহন-সুধা-সুনীতি-বিনু, এমনকি যুগলও কাছাকাছি ছিল। সবাই জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল, 'কী?'

'ধানকাটার পরই তো যুগলের বিয়ে। তার আগে একখানা ঘর তুলতে হয়। নইলে—'

স্নেহলতা বললেন, 'নইলে কী?'

হেমনাথ বললেন, 'নতুন বউ এসে থাকবে কোথায়? যুগল যে ঘরে থাকে সেখানে নতুন বউকে তো তোলা যায় না।'

'সে তো ঠিকই।' স্নেহলতা উৎসাহিত হয়ে উঠলেন, 'তা ঘর উঠবে কোথায়?'

উত্তর না দিয়ে হেমনাথ যুগলের দিকে তাকালেন, 'কি রে, কোথায় ঘর তুলবি?'

যুগল ঘাড় গুঁজে এক মনে নখ খুঁটে যাচ্ছিল, আরও ঝুঁকে পড়ল সে, জবাব দিল না।

হেমনাথ বললেন, 'লজ্জায় তো একেবারে গেলি! তাড়াতাড়ি বল, কাল থেকে কামলা লাগাব।'

যুগল আর বসে থাকতে পারল না, উঠে বার-বাড়ির দিকে দৌড় লাগাল।

হেমনাথ হেসে উঠলেন, দেখাদেখি অন্য সবাইও হাসল।

সেইদিনই ঘুরে ঘুরে যুগলের ঘরের জন্য জায়গা ঠিক করে ফেললেন হেমনাথ। দক্ষিণের ঘরের গা ঘেঁষে ঢেঁকিঘর। তার পেছন দিকে কইওকড়া আর চোখ-উদানে গাছের ঝুপসি জঙ্গল। স্থির হল, এই জায়গাটা সাফ-টাফ করে কাল থেকে ঘর তোলা হবে। পঁচিশের বন্দ'র মস্ত ঘর।

হেমনাথ যা বলেছিলেন তাই করলেন। পরের দিনই মজুর লাগিয়ে দিলেন।

ঢেঁকিঘরের পাশে যুগলের জন্য নতুন ঘর উঠতে লাগল। আর এদিকে হেমনাথ তাঁর পুকুরে 'মাঝধরা' দিলেন।

অঘ্রান মাসের শুরু থেকেই এদেশের পুকুরগুলো খারাপ হয়ে যায়। যত কচুরিপানা, টোপাপানা, বাইচা (এক জাতের জলজ আগাছা), সব পচতে শুরু করে। ফলে জল যায় নষ্ট হয়ে, তার রংও যায় বদলে। কালচে দূষিত জল থেকে দুর্গন্ধ উঠতে থাকে। এই সময় জলের ভেতর মাছেদের বেঁচে থাকা প্রায় অসম্ভব। পাবদা-ট্যাংরা-ফলুই-নলা-গরমা-বোয়াল-বজুরি-ভাগ্না—ঝাঁক বেঁধে পুকুরের সব মাছ জলতল থেকে আধমরার মতো ওপরে উঠে ভাসতে থাকে। এদেশে একে বলে, 'মাঝ গাবানো'।

মাছ গাবাতে শুরু করলে ধরে ফেলতেই হবে। নইলে জলজ আগাছার সঙ্গে মাছ মরে পচতে থাকলে আবহাওয়া বিষাক্ত হয়ে উঠবে। কিন্তু একসঙ্গে এত মাছ দিয়ে কী হবে? তাই বড় বড় গৃহস্থরা 'মাছধরা' দেয়। রাজ্যের লোক জুটিয়ে এনে 'গাবানো মাছ' ধরিয়ে ফেলে। যে যতটা ধরতে পারে সবটাই তার। এর জন্য পুকুরের মালিককে ভাগ দিতে হয় না।

'মাছধরা' দিলে দু'দিক থেকে সুবিধে। এক, মরা আধমরা মাছগুলো জল থেকে ছেঁকে আনা যায়। দুই, অসংখ্য মানুষ মাছধরার ফলে পুকুরের সমস্ত আগাছা যায় সাফ হয়ে।

'মাছধরা' দেবার জন্যে ঢেঁড়া দিতে হয় না। দু'চারজনের কানে তুলে দিলেই হল। তারাই খবরটা দিগ্‌দিগন্তে পৌঁছে দেয়।

একদিন সকালবেলা বিনু দেখল কয়েক শ' মানুষ পলো, ধর্মজাল, ঝাঁকিজাল নিয়ে তাদের পুকুরে এসে পড়েছে। তারপর সমস্ত দিন ধরে জল তোলপাড় করে চলল মাছধরা। মানুষের সঙ্গে মাছরাঙা আর শঙ্খচিলেরাও মাছ ধরবার জন্য পাল্লা দিতে লাগল।

বেলা একটু বাড়লে বিনুও বায়না ধরে যুগলের সঙ্গে পুকুরে নামল। এবং কী আশ্চর্য, সারা গায়ে জল আর পাঁক মেখে দু'টো মেনি আর একটা সরপুঁটি মাছ ধরেও ফেলল।

শুধু হেমনাথের পুকুরেই না। পর পর ক'দিন রাজদিয়ায় আরও অনেক পুকুরে মাছধরা চলল। যুগলের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে সে সব জায়গা থেকেও মাছ নিয়ে এল বিনু।

দেখতে দেখতে পৌষ মাস পড়ে গেল।

আশ্বিনের শুরুতে মাঠময় শুধু ছিল জল। অথৈ অপার সমুদ্র হয়ে শরতের মাঠ দিগ্‌দিগন্ত জুড়ে দুলতে থাকত। তার ওপর আমন ধানের চারাগুলো মাথা তুলে ছিল। তখন যেদিকে চোখ যেত, সবুজ আর সবুজ।

কার্তিকের গোড়াতেই জলে টান ধরেছিল। পৌষ মাস পড়তে না পড়তেই মাঠ একেবারে শুকনো, এক ফোঁটাও জল নেই। অবশ্য মাটি এখনও নরম, কোথাও কোথাও কাদা জমে আছে।

তবে সব চাইতে বিস্ময়কর যা, তা হল ধানগাছগুলো। কোন এক জাদুকরের ছোঁয়ায় সেগুলো এখন সোনা হয়ে গেছে। মাঠের ঝাঁপি ফসলের লাবণ্যে ভরে উঠেছে।

হেমনাথ একদিন বললেন, 'আর দেরি করা যাবে না। দু'একদিনের মধ্যে ধানকাটা শুরু করতে হবে।'

একটু চিন্তা করে অবনীমোহন বললেন, 'কিন্তু মামাবাবু—'

হেমনাথ জিজ্ঞাসু চোখে তাকালেন।

অবনীমোহন বলতে লাগলেন, 'আপনার জমি এক শ' কানির মতো। বার মাসের লোক বলতে মোটে দু'জন—যুগল আর করিম। দু'টো লোকের পক্ষে এত জমির ধান কেটে ঘরে তোলা অসম্ভব। আরও কয়েকজন তো দরকার।'

হেমনাথ কিন্তু আদৌ চিন্তিত নন। ব্যাপারটা যেন কোনও সমস্যাই নয় এমনভাবে বললেন, 'তা তো দরকার।'

'দু'একদিনের মধ্যে যদি ধানকাটা শুরু করেন, অন্তত আজকালের ভেতর লোকজন জোগাড় করে নিতে হবে।'

'সে ঠিক জুটে যাবে।'

হেমনাথকে যতখানি ভাবনাশূন্য দেখাল, অবনীমোহন কিন্তু ততখানি নিশ্চিন্ত নন। কিভাবে কোত্থেকে এত লোক জোগাড় হবে, তিনি ভেবে উঠতে পারছিলেন না। অবশ্য এ প্রসঙ্গে আর কোনও প্রশ্ন করলেন না।

হেমনাথ বুঝিবা অবনীমোহনের মনোভাব টের পেয়েছিলেন। হাসতে হাসতে বললেন, 'দেখো, লোক ঠিক বাড়িতে এসে হাজির হবে।'

'আপনি আগেই ঠিক করে রেখেছেন?'

'না।'

'তবে?' অবনীমোহনকে ঈষৎ বিমূঢ় দেখাল।

হেমনাথ বললেন, 'আগে থেকে ঠিক করার দরকার নেই। সময়মতো ওদের পাওয়া গেলেই তো হল।'

হেমনাথ যা বলেছিলেন তা-ই। লোক জোগাড় করতে হিন্নি দিন্নি ছুটতে হল না, ঘরে বসেই পাওয়া গেল।

pathagar.net

সেইদিনই বিকেলবেলা লক্ষ্মীছাড়া, হাভাতে চেহারার একদল মানুষ এসে হাজির। হাত-পা তাদের ফাটা ফাটা, চামড়া থেকে খই উড়ছে। চুল জট-পাকানো, চিরুনি এবং তেলের সঙ্গে সেগুলোর বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই। পরনে চিটচিটে লুঙ্গি আর চেক-কাটা জামা কিংবা গেঞ্জি। সবার হাতেই দু'টো করে ধানকাটা কাস্তে। চেহারা এবং পোশাক আশাক দেখে এক পলকেই বোঝা গেল, ওরা খুব গরিব মুসলমান।

সবার আগে ছিল বুড়োমতো একটা লোক, সম্ভবত সে-ই দলপতি। হেমনাথের কাছে এগিয়ে এসে বলল, 'আদাব হ্যামকত্তা—'

অন্য লোকগুলোও বিনীত সুরে বলে উঠল, 'আদাব আদাব—'

হেমনাথও হাতজোড় করে বললেন, 'আদাব। তারপর কী খবর বল। আজই এলে নাকি?'

'জি—' সবার প্রতিনিধি হিসেবে বুড়ো লোকটা বলল, 'দেরি নি হইয়া গ্যাল কত্তা?'

'না। ঠিক সময়েই এসেছ?'

'ধানকাটা কামলা রাখেন নাই তো?'

'না। তবে আজকালের মধ্যে তোমরা না এলে অন্য লোক দেখতে হত।'

'নসিব ভাল, আইজই আমরা আইছি। তা ধানাকাটা আরম্ভ হইব কবে?'

'এসেই যখন পড়েছ, কাল থেকেই শুরু করব।'

'হেই ভালা। আইলসা বইসা থাইকা লাভ কী?'

হেমনাথ শুধোলেন, 'তোমরা ক'জন এসেছ?'

বুড়ো লোকটা জানাল, 'পচিশ জন।'

'ঠিক আছে। পঁচিশ জনই আমার দরকার।' হেমনাথ গলা তুলে ডাকলেন, 'যুগল, যুগল—'

যুগল বার-বাড়ির দিক থেকে ছুটে এল। হেমনাথ দলটাকে দেখিয়ে বললেন, 'এদের থাকার ব্যবস্থা করে দে।'

আরেক প্রস্থ আদাব জানিয়ে লোকগুলো যুগলের সঙ্গে চলে গেল।

অবনীমোহন অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। বললেন, 'এরা কারা?'

হেমনাথ বললেন, 'চরের কৃষাণ।'

'আপনি জানতেন, ওরা আসবে?'

'জানতাম। প্রত্যেক বছরই ওরা আসে।' হেমনাথ এরপর যা বললেন, সংক্ষেপে এইরকম।

অঘ্রানের শেষাশেষি ধলেশ্বরীর চরগুলো থেকে এবং সুদূর ভাটির দেশ থেকে দলে দলে ভূমিহীন গরিব কৃষাণ রাজদিয়ার দুয়ারে দুয়ারে এসে হানা দেয়। ফি বছরই এই সময়টা ওরা এখানে আসে। শুধু অঘ্রানেই না, বৈশাখ-জষ্ঠি-আষাঢ়ে—ধান-পাট রোয়ার দিনগুলোতেও আসে। দরকার মতো সম্পন্ন ধানী গৃহস্থেরা তাদের কাজে লাগায়, সাময়িক প্রয়োজন ফুরোলে তারা আবার দল বেঁধে ফিরে যায়। যে লোকগুলোকে আজ হেমনাথ রেখেছেন তারাও নির্ভূম, নিরন্ন চাষী।

অবনীমোহন স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন। এই বিশাল দেশে যেখানে এত প্রাচুর্য, জিনিসপত্র এত অকল্পনীয় রকমের শস্তা, সেখানেও মানুষের দু'মুঠো ভাত জোটে না? পূর্ব বাংলার দিগ্‌দিগন্ত জুড়ে ফসলের মাঠ ছড়ানো। অথচ এদেশে বেশির ভাগ মানুষই নাকি ভূমিহীন। অবনীমোহন আরও জানতে পারলেন, জমিজমাওলা বড় বড় গৃহস্থের বাড়িতে বছরে মোটে চার মাসের মতো তারা কাজ পায়।

অবনীমোহন শুধোলেন, 'বাকি আট মাস ওদের কিভাবে কাটে?'

'আন্দাজ কর না—' হেমনাথ হাসলেন।

'বুঝতে পারছি না।'

হেমনাথ এবার বিশদভাবে বুঝিয়ে দিলেন। চার মাস লোকের জমিতে ধান-পাট বুনে এবং খেটে ওদের কাটে। সারা বছরে এই সময়টাই যা একটু সুখের মুখ ওরা দেখতে পায়। একমাস কাজ করে পানের 'বরজ'-এ। মাস দুয়েকের মতো মুত্রা আর বাঁশ দিয়ে ধামা-কুলো-পাটি, এই সব বুনে হাটে হাটে বেচে। তা ছাড়া, খালে-বিলে-নদীতে মাছমারা তো আছেই। জীবনধারণের জন্য তাদের নির্দিষ্ট সম্মানজনক কোনও জীবিকা নেই, আছে হাজার রকমের উঞ্ছবৃত্তি।

হেমনাথ বলে যাচ্ছিলেন, 'দু'চারটে মাস বাদ দিলে দুর্ভিক্ষ ওদের নিত্য সঙ্গী। কত কষ্টে যে ওরা দিন কাটায় ভাবতে পারবে না।'

একটু ভেবে অবনীমোহন বললেন, 'আমার ধারণা ছিল, এদেশের সব মানুষ খুব সুখে আছে।'

'ধারণাটা ঠিক নয়।'

'তাই তো দেখছি।'

একটু নীরবতা। তারপর অবনীমোহনই আবার শুরু করলেন, 'এত প্রচুর ফসল এদেশে, এত শস্তাগণ্ডা, তবু লোকে খেতে পায় না! আশ্চর্য ব্যাপার।'

হেমনাথ আস্তে আস্তে মাথা নাড়লেন। আবছা গলায় বললেন, 'সত্যিই আশ্চর্য।'

'আচ্ছা মামাবাবু—'

'বল—'

'এভাবে এত কষ্টের ভেতর কতদিন মানুষ বাঁচতে পারে?'

'বংশ পরম্পরায় ওরা বেঁচে আছে। আমাদের সমাজ-ব্যবস্থাই এইরকম। কী আর করা যাবে!'

অবনীমোহন উত্তর দিলেন না।

একধারে চুপচাপ বসে দাদু আর বাবার কথাগুলো শুনছিল বিনু। সব বোঝে নি সে। তবু গরিব ওই মানুষগুলোর জন্য অসীম দুঃখে তার বুক ভারী হয়ে গেল।

পঁচিশ জন লোক রেখেছেন হেমনাথ। তারা সবাই ধলেশ্বরীর চর থেকে এসেছে। উদয়াস্ত খাটলেও এক শ' কানি জমির ধান কাটতে, সেই ধান ঝেড়ে শুকিয়ে ডোলে তুলতে কম করে মাস দুই লাগবে। নতুন লোকগুলো ততদিন এখানেই থাকবে। অর্থাৎ ফিরে যেতে যেতে তাদের সেই ফাল্গুন মাস।

যতদিন ধানকাটা চলবে ততদিন খোরাকি পাবে লোকগুলো। মুজরি হিসেবে টাকাপয়সা অবশ্য দেবেন না হেমনাথ, দু'মাস পর দেশে ফেরার সময় প্রত্যেককে তিন মণ করে ধান, দু'খানা করে নতুন লুঙ্গি আর গামছা দেবেন।

উত্তর আর দক্ষিণের দু'খানা ঘর লোকগুলোকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা তাদের নিজেদের। অবশ্য চাল-ডাল-তেল-মশলা স্নেহলতা পাঠিয়ে দেবেন। রান্নাবান্না ওরা করে নেবে।

লোকগুলো কাজে লাগবার পর থেকেই ছায়ার মতো বিনু তাদের সঙ্গে সঙ্গে আছে। ভোরবেলা উঠেই কাঠকুটো জ্বেলে ওরা রান্না চড়িয়ে দেয়। তারপর উনুনের চারধারে গোল হয়ে বসে হাত-পা সেঁকতে থাকে। তখনও কুয়াশা আর হিমে চারদিক ঝাপসা, সূর্যের তো দেখাই পাওয়া যায় না। তার বদলে আকাশের দূর প্রান্তে প্রভাতিয়া তারাটা জ্বলজ্বল করতে থাকে।

ওদের ওঠার আওয়াজ পেলেই আজকাল ঘুম ভেঙে যায় বিনুর। ধড়মড় করে বিছানা থেকে উঠে পড়ে। প্রতিদিনই উঠে সে দেখে, হেমনাথ বসে আছেন। এমনিতেই হেমনাথ তাড়াতাড়ি ওঠেন। ইদানীং ধানকাটা শুরু হবার পর তাঁর চোখ থেকে ঘুম গেছে। সারারাত বোধহয় জেগেই থাকেন।

তাড়াতাড়ি দাদুর সঙ্গে সূর্যবন্দনা সেরে সকালবেলার জলখাবার খেতে খেতে রোদ উঠে যায়। শীতের নিরুত্তাপ, স্তিমিত রোদ।

এদিকে অবনীমোহনও উঠে পড়েন। ওদিকে লোকগুলোর খাওয়াও হয়ে যায়। সকালবেলায় অবশ্য ওরা ভরপেট খায় না। নাকেমুখে দু'চার গরাস কোনও রকমে গুঁজে বাকি ভাত-তরকারি আর নুন-লঙ্কা-পেঁয়াজ মেটে পাতিলে ভরে গামছায় বেঁধে নেয়।

সকালে খাওয়া হলে আর এক দণ্ডও বসে থাকে না লোকগুলো। ধানকাটা কাঁচি, ভাতের পাতিল আর তামাকের যাবতীয় সরঞ্জাম নিয়ে ঝাঁক বেঁধে বেরিয়ে পড়ে। হেমনাথ, অবনীমোহন আর বিনুও রোজ তাদের সঙ্গে চলে যায়। ধানকাটা শুরু হতেই লেখাপড়া একরকম বন্ধ করে দিয়েছে বিনু।

এমনিতে কোনও রাস্তা নেই। জমির আলের ওপর দিয়ে পথ। পথের ঘাস শিশিরে ভিজে থাকে। পৌষ মাসের সকালে তার ওপর দিয়ে যেতে যেতে পা শিরশির করতে থাকে বিনুর। অঘ্রানের মাঝামাঝি থেকেই উত্তুরে হাওয়া ছাড়তে শুরু করেছিল। পৌষ মাসে তার যেন দাঁত বেরিয়েছে। শরীরের যে জায়গাগুলো খোলা, বাতাস সেখানে কেটে কেটে বসে।

যতখানি সম্ভব বিনুরা দামী, গরম জামা-কাপড়ে গা মুড়ে আসে। কিন্তু ধানকাটা এই লোকগুলোর বড় কষ্ট। আচ্ছাদন বলতে লুঙ্গি আর মার্কিন কাপড়ের পিরহানের ওপর জ্যালজেলে চাদর। অনেকে আবার চাদরটাও জোটাতে পারেনি। পৌষ মাসের শীতল প্রভাতে খোলা আকাশের তলায় হু হু উত্তুরে বাতাসের মধ্য দিয়ে যেতে যেতে লোকগুলো হি-হি করে কাঁপতে থাকে। রোদ থেকে যে ভরসা পাবে তারও উপায় নেই। এই শীতে সূর্যালোক বড় কৃপণ, বড় কুণ্ঠিত, বড় নিস্তেজ। যদিও রোদ উঠে যায়, কাছে-দূরে কুয়াশার পর্দাগুলো ঝুলতে থাকে। কুয়াশার জন্য পরিষ্কার কিছুই চোখে পড়ে না। উত্তরের চক, দক্ষিণের চক, পুব-পশ্চিমের আদিগন্ত ধানের খেত—সব কিছুই ঝাপসা, নিরবয়ব।

যেতে যেতে লোকগুলো বলাবলি করে, 'এই বচ্ছর বেজায় শীত। জবর হিয়ল (কুয়াশা)।'

'হ।'

'হাত-পাও কালাইয়া (শীতে জমে যায়) যায়।'

'হ।'

'সুজনগুঞ্জের হাট থিকা একহান চাদর যদিন কিনতে পারতাম।'

'চাদরের যা মুল (দাম)!'

'কত?'

'আড়াই ট্যাহা, তিন ট্যাহা—'

'হায় আল্লা, অত ট্যাহা কই পামু!'

একটু চুপচাপ।

তারপর কে একজন ডেকে ওঠে, 'বছির ভাই—'

বছির নামে লোকটি তক্ষুনি সাড়া দেয়, 'কী কও তাহের ভাই—'

তাহের বলে, 'ধান কাটতে বাইর হওনের সোময় ছোট মাইয়াটার ধুম জ্বর দেইখা আইছিলাম—'

'হ।'

'অহন ক্যামন আছে, ক্যাঠা (কে) জানে।'

'মনহান খারাপ নি লাগে?'

'হ।'

'মাইয়ার ব্যারাম, তোমার বাইরন (বার হওয়া) ঠিক হয় নাই।'

বিষণ্ণ গলায় তাহের বলে, 'তুমি তো কইলা বাইরন ঠিক হয় নাই। কইয়াই খালাস। কিন্তুক—'

'কী?' জিজ্ঞাসু সুরে বছির শুধোয়।

তাহের বলে, 'ধানকাটা হইয়া গ্যালে তিন মণ ধান পামু। লুঙ্গি গামছা পামু দুইহানি কইরা। মাইয়া লইয়া ঘরে বইসা থাকলে কে আমারে এই হগল দিব? এই ধানটা পাইলে দুই মাসের লেইগা নিচ্চিন্তি—'

'তয় আড়বুইঝার (অবুঝ) লাখান কথা কইতে আছিলি যে বড়! মাইয়া বাচুক-মারুক, এইটা কি আমাগো ঘরে বইসা থাকনের সোময়?'

'না।'

'বাইচা থাকলে মাইয়া লইয়া পরে সুহাগ করন যাইব।'

'হ।'

একটু চুপ করে থেকে বছির বলে, 'তোমার মাইয়ার কথায় আমার একহান কথা মনে পড়ল তাহের ভাই—'

তাহের বলে, 'কী?'

'আহনের সোময় বিবির হাতে তিনহান ট্যাহা দিয়া আইছিলাম। ঘরে আছিল তিন পাসারি চাউল, দুই স্যার তিল আর এক আগইল (ধামা) কাঐনের (কাউনের) চাউল। দুইটা মাস চাইরটা পোলা লইয়া ক্যামনে যে চালাইব!'

pathagar.net

তাহের উত্তর দেয় না।

বছির আবার বলে, 'ঘরে এক টুকরা সোনা দানা নাই যে বেইচা, কি বান্ধা দিয়া দুইটা পয়সা পাইব! কী যে করব বউটা!'

তাহের এবার বলে, 'ভাইবা কী করবা? পথ আছে কুনো? শুদাশুদি মন খারাপ। তার থিকা যা করতে আছ, কর।'

ধানকাটা লোকগুলোর টুকরো টুকরো ঘর সংসারের কথা শুনতে শুনতে একসময় বিনুরা জমিতে এসে পড়ে।

ধানখেতে এসে প্রথমে লোকগুলো এক ছিলিম করে তামাক খেয়ে গা গরম করে নেয়। তারপর জামাটি খুলে সযত্নে গাছের ডালে ঝুলিয়ে লুঙ্গিতে মালকোঁচা মারে, তারও পর খাঁজকাটা বাঁকানো ধারাল কাস্তেটি হাতে নিয়ে জমিতে নামে। শুরু হয়ে যায় ধানকাটা। সমস্ত মাঠ জুড়ে শব্দ ওঠে খসর্-র্-খস্। গোড়া থেকে খড়সমেত ধানের গোছা কেটে একেক জন একেক জায়গায় স্তূপাকার করতে থাকে।

হেমনাথের বসবার সময় নেই। মাঠময় ঘুরে ঘুরে তিনি ধানকাটা তদারক করতে থাকেন। অবনীমোহন আর বিনুও বসে থাকে না। হেমনাথের পিছু পিছু ঘুরতে থাকে।

কিছুক্ষণ নিঃশব্দে ধানকাটার পর নতুন লোকগুলোর ভেতর থেকে কেউ হয়তো বলে ওঠে, 'মুখ বুইজা কাম করন যায় না। এই ছ্যামরারা একখান গীত ধর—'

সঙ্গে সঙ্গে তালমাত্রাহীন বেসুরো গলায় গান শুরু হয়ে যায় ঃ

'দোহাই আল্লা মাথা খাও
হামাক ফেইল্যা কই বা যাও
বিদ্যাশ গ্যালে এবার তুমার
সঙ্গ ছাড়ুম না—আ-আ-আ—
বাপো নাই মোর, মাও নাই,
একলা ঘরে কাল কাটাই,
গোসা করলে আর তো
আমি ছালুন রান্দুম না—আ-আ-আ—
নয়া শীতের জারেতে
যাইবা যহন ধান দাইতে,
তুমার কাচি-ক্যাথা, হক্কা-তামুক
দিমু না—আ-আ-আ—
খসম আমি তুমার
সঙ্গ ছাড়ুম না—আ-আ-আ—
নিদয় হইলে মানুষ পাইবা
পিরীত পাইবা না—আ-আ-আ—'

রোজই অবশ্য গান হয় না। কোনও কোনও দিন অল্পবয়সী ছোকরারা দলের সব চাইতে বর্ষীয়ান কৃষাণটিকে ডেকে বলে, 'একহান কিচ্ছা কও খলিল চাচা।'

খলিল বলে, 'কী কিচ্ছা শুনবি?'

'হেই 'গুলেবাখালি' রাজকইন্যার—'

'রাজকইন্যার কিচ্ছায় বড় রস, না?'

ছোকরারা কিছু বলে না, শব্দ করে হাসতে থাকে শুধু।

বুড়ো খলিল ধবধবে দাড়ি আর শীর্ণ হাত নেড়ে গল্প জুড়ে দেয়, 'এক আছিল রাজকইন্যা। তার চিকন চিকন চুল, চাম্পা ফুলের লাখান বন্ন (রং), মুক্তার লাখান দাত। হেয় হাসলে হাজারহান চান্দ য্যান ঝলমলাইয়া ওঠে—'

কাজের ফাঁকে ফাঁকে গান কিংবা গল্প। গানে গানে, গল্পে গল্পে বেলা দুপুর হয়ে যায়। শীতের

সূর্য খাড়া মাথার ওপর এসে ওঠে। এ সময়টা ধানকাটা বন্ধ রেখে লোকগুলো পাশের একটা খাল থেকে হাত-মুখ ধুয়ে, ভাতের পাতিল খুলে, আলের ওপর সারি সারি খেতে বসে যায়।

দুপুরবেলায় হেমনাথ মাঠে থাকেন না। অবনীমোহন আর বিনুকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ি ফিরে আসেন। জিরোবার সময় নেই। কোনওরকমে চান-খাওয়া সেরেই আবার ধানখেতে ছোটেন। এ বেলাও অবনীমোহন এবং বিনু তাঁর সঙ্গে সঙ্গে যায়।

সূর্যটা পশ্চিম আকাশের ঢাল বেয়ে খানিক নেমে গেলেই ধানকাটা বন্ধ করে দেয় লোকগুলো। তখন ফেরার পালা। সকাল থেকে একটানা পরিশ্রমে যে শস্য কেটে কেটে স্তূপাকার করা হয়েছিল, কৃষণেরা এবার তা মাথায় নিয়ে বাড়ির পথ ধরে। একবারে তো এত ফসল নিয়ে যাওয়া যায় না। তাই বার বার তাদের মাঠে আসতে হয়।

সমস্ত শস্য বাড়ি নিয়ে তুলতে সন্ধে নেমে যায়। তারপর পুকুরে হাত-পা ধুয়ে এসে লোকগুলো উত্তর আর দক্ষিণের ঘরে বসে কিছুক্ষণ জিরিয়ে নেয়।

সারাদিন তো কাছে কাছেই থাকে, বাড়ি ফিরেও তাদের সঙ্গ ছাড়ে না বিনু। উত্তর কি দক্ষিণের ঘরে গিয়ে ওদের কথা শোনে।

লোকগুলোকে সারাদিন দেখেও বিনুর বিস্ময় কাটে না। কোথায় কতদূরে তাদের দেশ, কে জানে। ঘর-সংসার ছেলেমেয়ে ফেলে শুধু দু'মুঠো ভাতের জন্য তারা এখানে পড়ে আছে। কতদিন ওরা বাড়ি নেই, বাবাকে না দেখে ওদের ছেলেমেয়েদের মন খারাপ হয়ে যায় না? বিনু ভাবতে চেষ্টা করে।

সমস্ত দিন তো কথা বলার ফুরসত নেই। সন্ধেবেলা মাঠ থেকে ফেরার পর লোকগুলো বিনুর সঙ্গে গল্প জুড়ে দেয়।

বছির বলে, 'অ বাবুগো পোলা—'

বিনু তক্ষুনি সাড়া দেয়, 'কী বলছ?'

'আপনের নাম কী?'

'বিনু—বিনয়কুমার বসু।'

'বড় বাহারের নাম।' বছির বলতে থাকে, 'কিষানগো কাম আপনের ভালা লাগে?'

বিনু ঘাড় হেলিয়ে বলে, 'হ্যাঁ।'

'আমাগো লগে ধান নি কাটবেন?'

বিনু উত্তর দেবার আগেই ওধার থেকে বুড়ো খলিল বলে ওঠে, 'কী যে ক'স বছিরা, বাবুগো পোলায় ধান কাটব কোন দুঃখে? লিখাপড়া শিখা দারোগা হইব, ম্যাজিস্টর হইব।'

বছির বলে, 'আমি তামসা করলাম স্যান—'

এমনি টুকরো টুকরো কথা। কথায় কথায় শীতের রাত ঘন হতে থাকে। উত্তুরে বাতাস বাগানের গাছগাছালির ফাঁক দিয়ে শনশনিয়ে ছুটে যায়। কোথায় যেন কালাবাদুড় ডানা ঝাপটায়, রাতজাগা পাখিরা গাঢ় গলায় খুনসুটি করে। ভারী কুয়াশা জমে জমে চারদিক ঝাপসা হয়ে যায়।

হঠাৎ একসময় খেয়াল হতে ব্যস্তভাবে কেউ বলে ওঠে, 'রাইত মেলা হইল, আর কত গপ করবি? ভাত বসাইতে হইব না?'

সবাই চকিত হয়ে উঠে পড়ে।

ওদিকে ভেতর-বাড়ি থেকে স্নেহলতার গলা ভেসে আসে, 'বিনু—বিনু, খাবি আয়—'

লাফ দিয়ে উত্তর কি দক্ষিণের ঘর থেকে বেরিয়ে বিনু ছুট লাগায়।

শুধু হেমনাথের জমিতেই নয়, চকের পর চক জুড়ে এখন ধানকাটা চলছে। শীতের নিস্তেজ রোদেও কৃষাণদের হাতের কাস্তেগুলো ঝকমক করতে থাকে।

হেমনাথের জমির পশ্চিমে রামকেশবের জমি, উত্তরে লারমোরের। ধানকাটা তদারক করার ফাঁকে ফাঁকে লারমোর আর রামকেশব গল্প করতে আসেন।

রামকেশব বলেন, 'এইবার ফলন বেশ ভাল।'

হেমনাথ আর লারমোর মাথা নাড়েন, 'হ্যাঁ—'

'আমার পঞ্চাশ কানি জমিতে কম করে পাঁচ শ' মণ ধান উঠবে।'

হেমনাথ বলেন, 'অত ধান নিয়ে কী করবি?'

রামকেশব বলেন, 'বছরের খোরাকি রেখে বাকিটা বেচে দেব।'

'আমারও তাই ইচ্ছে। তা দরটর কেমন শুনছিস?'

'দর বেশ তেজী। সেদিন নিত্য দাসের সঙ্গে দেখা হয়েছিল, সে বলল।'

'বাজার তেজী থাকলে ভালই। দু'টো পয়সা হাতে আসবে।' হেমনাথ বলতে থাকেন, 'তবে একটা কথা।'

'কী?' জিজ্ঞাসু চোখে তাকান রামকেশব।

'আমাদের তো সুবিধেই। কিন্তু যাদের জমিজমা নেই, শরীরের খাটুনিই ভরসা, তারা খুব মুশকিলে পড়ে যাবে।'

একটু নীরবতা।

একসময় হেমনাথ বলেন, 'যা হবার তা হবে। তারপর লালমোহন—'

'বল—' লারমোর মুখ তুলে তাকান।

'খুব তো ধানখেতে এসে বসে আছ, তোমার রোগীরা ছাড়লে? হাটে যাচ্ছ না আজকাল?'

হেমনাথের কোনও নেশা নেই। চা-পান-বিড়ি-সিগারেট কিছুই খান না। রামকেশবও তা-ই। লারমোর কিন্তু নেশার জিনিসটা হাতে পেলে ছাড়াছাড়ি নেই। পেলেন তো দিনে দশ বার চা-ই খেলেন। বান্ডিল বান্ডিল বিড়ি শেষ করলেন। না পেলেন তো বছরখানেক কিছুই খেলেন না।

আলে কৃষাণদের হুঁকো-কলকে-তামাক, সব কিছু মজুদ থাকে। পরিপাটি করে এক ছিলিম তামাক সেজে আয়েস করে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে লারমোর বলেন, 'ধানকাটার জন্যে ক'দিন রোগীদের কাছ থেকে ছুটি নিয়েছি। বলেছি, তেমন জরুরি কেস থাকলে গীর্জায় আসে যেন। বুঝতেই তো পারছ, এই সময়টা ধান টান ঠিকমতো তুলতে না পারলে সারা বছর না খেয়ে থাকতে হবে।'

হেমনাথ হাসেন, 'ত্যাগব্রতী হলে কী হবে, আসল ব্যাপারে টনটনে—'

লারমোর জোরে জোরে মাঠ কাঁপিয়ে হাসতে থাকেন, 'যা বলেছ।'

ধানকাটার মধ্যেই একদিন সময় করে নিলেন হেমনাথ। বললেন, 'আজ বিনুদাদা আর আমি মাঠে যাব না। কৃষাণদের নিয়ে অবনী একলা যাবে।'

অবনীমোহন শুধোলেন, 'আপনার কোনও কাজ আছে?'

'হ্যাঁ।'

'কী?'

'আজ বিনুদাদাকে স্কুলে ভর্তি করতে নিয়ে যাব।'

হঠাৎ যেন কথাটা মনে পড়ে গেছে, এমনভাবে অবনীমোহন বললেন, 'ও হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি তো একেবারে ভুলেই গিয়েছিলাম।'

হেমনাথ বললেন, 'তুমি মাঠে গিয়ে একলা অতগুলো লোককে সামলোতে পারবে তো?'

'পারব।'

দুপুরবেলা খাওয়াদাওয়ার পর হেমনাথের সঙ্গে স্কুলে রওনা হল বিনু। স্টিমারঘাট, বরফকল, মাছের আড়ত পেরিয়ে ল্যান্ড রেভিনিউ অফিসের গায়ে স্কুলবাড়িটা। নাম 'রাজদিয়া হাই স্কুল'।

স্কুল বাড়িটাকে ঘিরে কোনও বিস্ময় নেই। টিনের ঢাল আর ক্যাঁচা বাঁশের বেড়া লাগানো অসংখ্য ঘর সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ানো। সামনের দিকে প্রকান্ড মাঠ, সবুজ সতেজ ঘাসে ছেয়ে আছে। মাঠটার দু'ধারে বাঁশের গোলপোস্ট।

রাজদিয়ার এ প্রান্তে কতবার এসেছে বিনু, যাতায়াতের পথে দূর থেকে স্কুল-বাড়িটাকে দেখেছে। ভেতরে অবশ্য ঢোকেনি।

আজ হেমনাথের সঙ্গে সামনের মাঠখানা পেরিয়ে স্কুলের দিকে যেতে যেতে বুকের মধ্যেটা কেন

pathagar.net

যেন দুরু দুরু করতে লাগল বিনুর। হঠাৎ সে ডেকে উঠল, 'দাদু—'

'কী রে—' হেমনাথ মুখ ফিরিয়ে তাকালেন।

'ভর্তি হতে হলে পরীক্ষা দিতে হবে, না?'

'নিশ্চয়ই দিতে হবে।'

বিনু কী বলতে গিয়ে থেমে গেল। তার চোখমুখ দেখে কিছু অনুমান করলেন হেমনাথ। বললেন, 'আর কিছু বলবি?'

'হুঁ—'

'কী?'

খানিক ইতস্তত করে বিনু বলল, 'হেডমাস্টার মশায়কে তুমি চেনো?'

হেমনাথ বললেন, 'চিনব না কেন?'

'তুমি তাঁকে একটু বলবে—'

'কী বলব?'

'আমার পরীক্ষা যেন না নেন—'

পূর্ণ দৃষ্টিতে হেমনাথ বিনুকে দেখলেন। তারপর খুব গম্ভীর গলায় বললেন, 'না। ওটা বলতে পারব না। ভর্তি হতে হলে পরীক্ষা দিতেই হবে।'

বিনু চমকে উঠল। আশ্বিনের শুরুতে রাজদিয়া এসেছে তারা। এখন পৌষ মাস। হেমনাথের এমন কণ্ঠস্বর আগে আর কখনও শোনেনি সে।

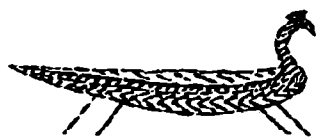

সামনের মাঠখানা পার হয়ে স্কুলবাড়ির বারান্দায় উঠলেন হেমনাথরা। লম্বা মাটির বারান্দা, তার শেষ প্রান্তে হেডমাস্টারের ঘর। সেখানে উঁচু টুলের ওপর দপ্তরী জাতীয় একটা লোক বসে আছে।

ডিসেম্বরের মাঝামাঝি এই সময়টা স্কুল বন্ধ। ক্লাসঘরগুলোতে তালা লাগানো রয়েছে। নিয়ম অনুযায়ী অ্যানুয়াল পরীক্ষা হয়ে যাবার কথা। খুব সম্ভব রেজাল্টও বেরিয়ে গেছে। ইংরাজি নতুন বছর না পড়লে নতুন করে ক্লাস শুরু হবে না। সারা বছর একটানা খাটুনির পর ক্লান্ত স্কুলবাড়িটার গায়ে এখন ছুটি আর আলসেমির আমেজ লেগেছে।

দূর থেকেই হেমনাথ চেঁচিয়ে ডাকলেন, 'এই উপেন—'

টুলের ওপর থেকে দপ্তরীটা চকিত হয়ে উঠে দাঁড়াল, 'আইজ্ঞা—'

'হেডমাস্টার আছে রে?'

উপেন বলল, 'আছেন—'

কথা বলতে বলতে এগিয়ে এসেছিলেন হেমনাথ। বিনুকে সঙ্গে নিয়ে পর্দা ঠেলে হেডমাস্টারের ঘরে ঢুকলেন।

ঘরখানা প্রকান্ড। চারদিকে সারি সারি কাচের আলমারি। সেগুলোর ভেতর শুধু বই আর বই। আলমারিগুলোর মাথায় গ্লোব, ডাস্টার, ঝাড়ন, চকের বাক্স এবং অসংখ্য জিনিস সাজানো। দেওয়ালে দেওয়ালে মাহাপুরুষদের ছবি। গান্ধীজি রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্র বিবেকানন্দ তিলক বিদ্যাসাগর—এমনি অসংখ্য। তাঁদের কাউকে কাউকে চেনে বিনু, অনেকেই অচেনা।

রবীন্দ্রনাথের ছবিটার তলায় একটা গোলাকার বড় ঘড়ি। তার তলায় মস্ত একখানা টেবিল। টেবিলের এধারে অনেকগুলো কাঠের চেয়ার। ওধারে একটি মাত্র চেয়ারে যিনি বসে আছেন তাঁর বয়স ষাটের কাছাকাছি। পরনে মোটা খদ্দরের ধবধবে পাজামা এবং পাঞ্জাবি। চোখে পুরু লেন্সের গোল চশমা।

ভদ্রলোকের গায়ের রং টকটকে, ধারাল নাক, তীক্ষ্ণ চিবুক। দীর্ঘ চোখ দু'টি অত্যন্ত সজীব, দূরভেদী। মুখময় কাঁচাপাকা দাড়ি। মাথাটা কিন্তু একেবারেই সাদা, একটি কালো চুলও সেখানে খুঁজে বার করা

যাবে কিনা সন্দেহ। এই বয়সেও মেরুদন্ড আশ্চর্য ঋজু, চামড়ায় তেমন ভাঁজ পড়েনি।

ঘরে আর কেউ ছিল না। বিনু বুঝতে পারল, ইনিই হেডমাস্টার। তার বুক টিপ টিপ করতে লাগল।

হেমনাথকে দেখে হেডমাস্টার উঠে দাঁড়লেন। একটু অবাক হয়ে বললেন, 'হেমদাদা যে—'

হেমনাথ হাসলেন, 'হ্যাঁ, আমিই—'

হেডমাস্টার বললেন, 'আপনি হঠাৎ স্কুলে!'

'সাধে কি আর এলাম রে, দরকারে আসতে হল। তারপর কেমন আছিস মোতাহার?'

'ওই একরকম। আপনি?'

'খুব ভাল। কখনও আমি খারাপ থাকি?'

'তা বটে।' হেডমাস্টার অর্থাৎ মোতাহার সাহেব হাসলেন, 'কতকাল আপনাকে দেখছি। খারাপ আছেন, এমন কথা কক্ষনো শুনিনি।' বলতে বলতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন, 'এ কি হেমদাদা, দাঁড়িয়ে কেন? বসুন—বসুন—'

হেমনাথ বসলে মোতাহার সাহেব বসলেন। বিনুও নিঃশব্দে দাদুর গা ঘেঁষে বসে পড়ল।

হেমনাথ বললেন, 'ব্যাপার কী রে? স্কুলে ছুটি, তুই একা একা এখানে কী করছিলি?'

'নতুন বছরের বুক লিস্টটা এখনও তৈরি হয় নি। তা-ই করছিলাম।'

'স্কুল কতদিন বন্ধ থাকবে?'

'জানুয়ারির দু'তারিখ পর্যন্ত।'

'তারপর অন্য সব খবর টবর কী?'

'কোন খবর জানতে চান, বলুন—'

একটু ভেবে হেমনাথ বললেন, 'তোর খবর তো মোটে দু'টো। এক কংগ্রেস আর এই স্কুল।'

মোতাহার সাহেব কিছু বললেন না, চশমার কাচ মুছে গভীর দৃষ্টিতে হেমনাথের দিকে তাকালেন।

হেমনাথ থামেননি, 'বিয়ে করলি না, শাদি করলি না, ঘর নেই, সংসার নেই। চিরটা কাল স্কুল আর কংগ্রেস নিয়েই থাকলি।'

মৃদু গলায় মোতাহার সাহেব বললেন, 'কিছু একটা নিয়ে থাকতে হবে তো। সত্যি বলছি হেমদাদা, স্কুল আর কংগ্রেস ছাড়া আমি আর কিছু ভাবতেই পারি না।' বলে হাসলেন।

হেমনাথ বললেন, 'অনেক দিন তোর কাছে আসা হয়নি। তা স্কুল কেমন চলছে?'

'ভালই। তবে—'

'কী?'

'আমার বড় ইচ্ছা স্কুলবাড়িটা পাকা হোক—'

মোতাহার সাহেবের কথা শেষ হবার আগেই হেমনাথ বলে উঠলেন, 'এক শ' বার হওয়া উচিত। দু'চার বছর পর পর বর্ষায় ক্যাঁচা বাঁশের বেড়া নষ্ট হয়ে যায়, মাটির ভিত ধসে যায়। সে সব কতবার তো পালটালি। বার বার কামলা লাগিয়ে খরচও তো কম হয় না।'

'খরচ বলে খরচ! স্কুলের কত আর আয় বলুন। বেশির ভাগ ছেলেই তো ফ্রি, হাফ ফ্রি'তে পড়ছে—'

হেমনাথ বললেন, 'একবার একটু কষ্ট করে পাকাপাকি বন্দোবস্ত করতে পারলে সব দিক থেকেই ভাল।'

মোতাহার সাহেব বললেন, 'কিন্তু টাকা পাব কোথায়? আপনি তো জানেন, গভর্নমেন্ট থেকে একটা পয়সাও পাওয়া যাবে না।'

'কেন যাবে শুনি? সারা গায়ে কংগ্রেসের গন্ধ মাখিয়ে রেখেছিস, ইংরেজদের তাড়াবার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছিস। আর ওরা দেবে টাকা!'

হাসতে হাসতে মোতাহার সাহেব বললেন, 'তাই ভাবছিলাম, দু'একদিনের ভেতর আপনার কাছে যাব।'

পাকা ভুরু কুঁচকে হেমনাথ বললেন, 'আমার কাছে কেন?'

pathagar.net

'আপনার কাছে ছাড়া আর কার কাছে যেতে পারি?'

'আমি বুঝি তোর স্কুলের জন্যে টাকার থলে নিয়ে বসে আছি?'

'তা জানি না।'

'তবে কী জানো শুনি?'

মোতাহার সাহেব গভীর গলায় বলেন, 'একটা কথাই জানি। তা হল, রাজদিয়ার হেমনাথ মিত্রের কাছে কোনও শুভ কাজের আর্জি নিয়ে গেলে কেউ কখনও বিমুখ হয়ে ফেরে না।'

হেমনাথ বললেন, 'আমাকে তোরা কল্পতরু পেয়েছিস নাকি?'

'পেয়েছিই তো।'

'কিন্তু—'

জিজ্ঞাসু চোখে মোতাহার সাহেব বললেন, 'কী?'

চিন্তিত মুখে হেমনাথ বললেন, 'স্কুল বিল্ডিং করে দেবার মতো অত টাকা তো আমার নেই। অবশ্য একটা কাজ করা যেতে পারে—'

'কী কাজ?

'সবার কাছ থেকে টাকা তোলা। যার যেমন সাধ্য সে তেমন দেবে। মোট কথা, একটা ফান্ড খোলা দরকার।'

'সে আপনি যা ভাল বোঝেন—'

'তুই কবে আমার বাড়ি যাচ্ছিস?'

'কবে যেতে বলেন?'

'যেদিন তোর খুশি—'

'পরশু সকালে যাব।'

'আচ্ছা।'

একটু নীরবতা।

তারপর মোতাহার সাহেব হাসতে হাসতে বললেন, 'যাক, আমার দুর্ভাবনা কাটল। স্কুলবাড়ি এবার হয়ে যাবেই।'

হেমনাথ হাসলেন, 'স্কুলের কথা জিজ্ঞেস করতে গিয়ে আমার ভালই লাভ হল দেখছি। তারপর তোর কংগ্রেসের খবর কী?'

নিমেষে হাসি থেমে গেল। কপালে অসংখ্য রেখা ফুটল মোতাহার সাহেবের। গম্ভীর গলায় বললেন, 'খুবই সাঙ্ঘাতিক। খবরের কাগজে নিশ্চয়ই দেখেছেন ডিফেন্স অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্টে ছোট-বড় সব নেতাই অ্যারেস্টেড। সত্যাগ্রহ শুরু হয়ে গেছে।'

'দেখেছি। তোর কী মনে হয়?'

'আমার তো মনে হয়, ভেতরে ভেতরে ইংরেজরা খুব দুর্বল হয়ে পড়েছে। ভেতরে যত কাবু হচ্ছে, বাইরে অত্যাচার ততই বেড়ে চলেছে।'

'তুই তো এখানকার কংগ্রেসের সেক্রেটারি। তোকে কি অ্যারেস্ট করবে?'

'বুঝতে পারছি না। তবে—'

'কী?'

'গেল সপ্তাহে দু'তিন বার পুলিশ এসেছিল।'

হেমনাথ বললেন, 'এখানে কি সত্যাগ্রহ শুরু করবি?'

মোতাহার সাহেব বললেন, 'এখনও কিছু ঠিক করিনি। আরও কয়েক দিন দেখি।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে হেমনাথ এবার শুধোলেন, 'যুদ্ধের হালচাল কেমন বুঝছিস মোতাহার?'

'খুব খারাপ। মিত্রশক্তি চারদিকেই মার খাচ্ছে। ইউরোপ আফ্রিকার কথা থাক, ইস্টার্ন ওয়ার্ল্ডের অবস্থাও ভাল নয়। আমার ধারণা, কলকাতায় যে কোনও দিন বোমা পড়তে পারে। কলকাতায় বোমা পড়া মানে সারা বাংলাদেশ তোলপাড় হওয়া। কী যে হবে!'

'সেদিন কাগজে পড়লাম, কলকাতায় ব্ল্যাক-আউটের মহড়া চলছে। এয়ার-রেডের সবরকম

pathagar.net

প্রিকশানও নেওয়া হয়েছে।'

'হ্যাঁ।' ধীরে ধীরে মাথা নাড়লেন মোতাহার সাহেব।

হেমনাথ বললেন, 'তোর কী ধারণা, এ যুদ্ধে ইংরেজরা হারবে?'

'বলা মুশকিল। হারুক জিতুক, আমি একটা ব্যাপার দেখতে পাচ্ছি।'

'কী?'

'ভারতবর্ষের স্বাধীনতা খুব বেশি দূরে নেই।'

'হঠাৎ তোর এ ধারণা হল?'

মোতাহার সাহেব থেমে থেমে বলতে লাগলেন, 'হিটলারের বোমা খেয়ে খেয়ে ইংল্যান্ডের আর কিছু নেই। যতই ওরা গলা ফাটাক 'আমাদের কিচ্ছু হয়নি,' লোক তা বিশ্বাস করে না। আমরা তো আর ঘাস খাই না, আসল ব্যাপারখানা মোটামুটি আন্দাজ করতে পারি। যুদ্ধ থেমে গেলে ইংল্যান্ডে রিকনস্ট্রাকশনের প্রশ্ন দেখা দেবে। তখন নতুন করে পোড়া ঘর তুলবে, না এতদূরে ইন্ডিয়ার কলোনি সামলাবে? অবশ্য—'

'কী?'

'এই হচ্ছে সব চাইতে বড় সুযোগ। আমাদের তা হাতছাড়া হতে দেওয়া উচিত নয়। একবার যদি এ সুযোগ আমাদের হাতের বাইরে চলে যেতে দিই, পরে আপসোস করেও কূলকিনারা পাব না।'

হেমনাথ বললেন, 'সুযোগ বলতে?'

মোতাহর সাহেব ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিলেন, ইংরেজ এখন যুদ্ধ নিয়ে অস্থির হয়ে আছে। ইউরোপে-এশিয়ায়-আফ্রিকায়, যেদিকেই তাকানো যাক, শুধু বারুদের গন্ধ। এ সময় সমস্ত ভারতবর্ষ জুড়ে যদি একটা আন্দোলন করা যেত।

হেমনাথ বললেন, 'তোর কি ধারণা, শিগগিরই কোনও মুভমেন্ট শুরু হবে?'

'আমার তো তাই মনে হয়। এ সময় যদি মুভমেন্ট না করা যায় তবে আর কবে হবে? দেখা যাক, নেতারা কী করতে বলেন—'

হেমনাথ এবার আর কিছু বললেন না। তাঁর পাশে বসে দাদু আর মোতাহার সাহেবের কথা শুনছিল বিনু। অল্পস্বল্প বুঝতে পারছিল সে, তবে বেশির ভাগই অবোধ্য।

একটুক্ষণ চুপচাপ।

তারপর মৃদু হেসে মোতাহার সাহেব বললেন, 'দেশের কথা, কংগ্রেসের কথা এখন থাক। তখন কী একটা দরকারের কথা বলছিলেন যেন—' বলতে বলতে হঠাৎ বিনুর দিকে নজর পড়ল, 'ছেলেটি কে হেমদাদা?'

'আমার নাতি।'

'কিরকম নাতি?'

কিরকম, হেমনাথ বুঝিয়ে দিলেন।

মোতাহার সাহেব বললেন, 'শুনেছিলাম বটে, কলকাতা থেকে আপনার আত্মীয়স্বজন এসেছে। তা হলে এরাই?'

'হ্যাঁ।'

'এবার বলুন দরকারটা কী।'

বিনুকে দেখিয়ে হেমনাথ বললেন, 'দরকারটা এর জন্যেই। ওকে তোর স্কুলে ভর্তি করতে এসেছি।'

মোতাহার সাহেব ঈষৎ অবাক হলেন, 'ভর্তি করতে এসেছেন মানে! ওরা কি এখানেই থাকবে?'

'হ্যাঁ।'

'কলকাতা ছেড়ে এই গ্রামে থাকতে ভাল লাগবে!'

'ওর বাবার খেয়াল। কলকাতায় ব্যবসা ট্যাবসা ছিল। সব তুলে দিয়ে এখানে জমিজমা কিনেছে। ইস্টবেঙ্গল নাকি ওর খুব ভাল লেগেছে।'

'খুব ইন্টারেস্টিং তো।' মোতাহার সাহেব কৌতূহলের গলায় বললেন, 'ভদ্রলোকের সঙ্গে একদিন

pathagar.net

আলাপ করতে হয়।'

হেমনাথ বললেন, 'পরশু আমাদের বাড়ি যাচ্ছিস তো, তখন আলাপ করিয়ে দেব'খন।'

'আচ্ছা। কিন্তু হেমদাদা—'

'কী বলছিস?'

'সামান্য একটা ভর্তির জন্যে আপনি আবার কষ্ট করে নিজে এসেছেন কেন? এখন তো স্কুল বন্ধ। জানুয়ারির ফার্স্ট উইকে কাউকে দিয়ে পাঠিয়ে দেবেন। ভর্তি করে নেব।'

'উঁহু—' জোরে জোরে প্রবল বেগে মাথা নাড়তে লাগলেন হেমনাথ, 'আমার খাতিরে এমনি এমনি ভর্তি করলে চলবে না। যে ক্লাসে ভর্তি হবে তার যোগ্য কিনা পরীক্ষা করে নিতে হবে।'

স্থির চোখে হেমনাথকে দেখলেন মোতাহার সাহেব। তারপর অসীম সম্ভ্রমের সুরে বললেন, 'পরীক্ষা করে নেবার কথা কোনও অভিভাবকই বলে না। আপনার ওপর আমার শ্রদ্ধা দশগুণ বেড়ে গেল হেমদাদা। আপনি যখন চাইছেন, পরীক্ষা আমি নেব।'

'আজ যখন এসে পড়েছি, আজই নিয়ে নে। পরে না হয় মাইনেপত্তর দিয়ে ফি-বুক, বুকলিস্ট নিয়ে যাবে।'

মোতাহার সাহেব অদ্ভুত হাসলেন।

হেমনাথ শুধোলেন, 'হাসলি যে?'

'আমাকে বুঝি আপনার বিশ্বাস নেই? পাছে অন্য কারোর সঙ্গে পাঠালে পরীক্ষা না নিই তাই এখনই নিতে বলছেন।'

বিব্রতভাবে হেমনাথ বললেন, 'না, ঠিক তা নয়।'

হাসতে হাসতে মোতাহার সাহেব বললেন, 'বেশ বেশ, আপনার যখন এতই অবিশ্বাস তখন পরীক্ষাটা নিয়ে নিচ্ছি।'

দাদুর ওপর ভীষণ রাগ হচ্ছিল বিনুর। হেডমাস্টারমশাই যেখানে এমনিতেই ভর্তি করে নিতে চাইছেন সেখানে দাদু 'পরীক্ষা' 'পরীক্ষা' করে অস্থির হয়ে উঠছেন। শুধু রাগই না, তার সঙ্গে অভিমানও মিশল।

চোখে প্রায় জলই এসে যাচ্ছিল বিনুর। সেই সময় মোতাহার সাহেবের গলা শোনা গেল, 'তোমার নাম কী?'

বিনু চমকে উঠল। বুকের ভেতরটা ভয়ানক দুলতে লাগল তার। কাঁপা গলায় বলল, 'বিনয়কুমার বসু—'

'বাবার নাম?'

'অবনীমোহন বসু—'

চোখ কুঁচকে মোতাহার সাহেব বলেন, 'শুধু অবনীমোহন বসু? বাবার নামের আগে একটা শ্রীযুক্ত বসাতে হয় তাও জানো না?'

মুখ নীচু করে বসে রইল বিনু।

pathagar.net

'কলকাতায় কোন স্কুলে পড়তে?'

'সাউথ সাবারবনে—'

'কোন ক্লাস ছিল?'

'সেভেন।'

'তার মানে এইটে ভর্তি হবে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'আচ্ছা, ওই ছবিটা কার বল তো?'

চোখ তুলতেই বিনু দেখতে পেল, মোতাহার সাহেব ডানদিকের দেওয়ালে একটা ছবির দিকে আঙুল নির্দেশ করেছেন।

ছবির মানুষটিকে বিনু চিনত। বলল, 'উনি রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—'

'গুড—' বলেই আরেকটা ছবি দেখালেন মোতাহার সাহেব, 'উনি?'

'লালা লাজপত রায়।'

'আচ্ছা বলতে পার, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন কবে হয়েছিল?'

ভাগ্য ভাল, উত্তরটা জানা ছিল বিনুর। তাড়াতাড়ি বলে উঠল, '১৯০৫-এ—'

'ভেরি গুড—'

নিঃশব্দে বসে ছিলেন হেমনাথ। হঠাৎ বলে উঠলেন, 'এ সব কী পরীক্ষা রে মোতাহার?'

'এগুলোই তো আসল পরীক্ষা দাদা—' মোতাহার সাহেব বলতে লাগলেন, 'দেশের ছেলে দেশের সত্যিকার খবর রাখে কিনা সেটা জানা দরকার।'

'একটু পড়াশোনার কথাও জিজ্ঞেস কর—'

'নিশ্চয়ই করব।'

গোটা পাঁচেক ট্রানস্লেশন ধরলেন মোতাহার সাহেব, বিনু তিনটে পারল। অ্যালজেব্রার ফরমুলাগুলো ঠিক ঠিক বলল। বাংলা ব্যাকরণের উত্তরগুলোও নির্ভুল হল।

পরীক্ষা হয়ে যাবার পর মোতাহার সাহেব বললেন, 'বিনয়বাবু আমাদের বেশ ভাল ছেলে। স্কুল খুললে রোজ ক্লাস করবে, বুঝলে? একদিনও ফাঁকি দেবে না।'

'আজ্ঞে না—' বিনু আধফোটা গলায় বলল। তারপর মাথা হেলাল।

হেমনাথ বললেন, 'ক্লাস এইটে ও পারবে তো?'

মোতাহার সাহেব বললেন, 'নিশ্চয়ই পারবে। দেখবেন, স্ট্যান্ড করবে।'

আরও কিছুক্ষণ এলোমেলো কথার পর হেমনাথ বললেন, 'এবার তা হলে উঠি—'

'এখনই উঠবেন?'

'হ্যাঁ, ধানকাটা চলছে। একবার মাঠে যাওয়া দরকার।' বলতে বলতে উঠে দাঁড়ালেন হেমনাথ। তারপর হঠাৎই যেন কথাটা মনে পড়ে গেল। বিনুর দিকে ফিরে বললেন, 'মাস্টারমশাইকে প্রণাম কর।'

মোতাহার সাহেবকে প্রণাম করে বিনু যখন উঠে দাঁড়াল, হেমনাথ আবার বললেন, 'এঁকে আজ প্রথম দেখলে, ভবিষ্যতে অনেক বার দেখবে। জীবনে এই মানুষটির মতো হবার চেষ্টা কোরো।'

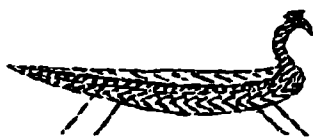

ধানকাটার মধ্যে সময় করে একে একে সুধা সুনীতি এবং ঝিনুককেও ভর্তি করে দিলেন হেমনাথ। সুধা সুনীতিকে কলেজে, ঝিনুককে মেয়েদের স্কুলে।

স্থির হয়েছে, আপাতত ঝিনুক এই বাড়িতেই থেকে যাবে। এখানে থেকেই লেখাপড়া করবে। পরে যা-হয় ভেবে ঠিক করা যাবে। ভবতোষও এতে রাজি হয়েছেন। না হয়ে উপায়ই বা কী? তাঁর কলেজ খুলে গেছে। ফাঁকা বাড়িতে ঝিনুককে কার কাছে রাখবেন? কে তাকে দেখবে? সব দিক বিবেচনা করে এই ব্যবস্থাই ভবতোষের যুক্তিসঙ্গত মনে হয়েছে।

সবাই ভর্তি টর্তি হয়ে যাবার দিনকয়েক পর এক সন্ধেবেলায় লারমোর এসে হাজির। এ বাড়িতে তাঁর অনিয়মিত যাতায়াত নিয়ে স্নেহলতার অভিমান আছে। অবশ্য সে অভিমানের ভেতর অভিযোগ নেই, স্নিগ্ধ কৌতুকের আভায় তা ঝলমলে।

অনেক দিন পর লারমোর আজ এ বাড়ি এলেন। দীর্ঘকাল না আসার জন্য যথারীতি অনুযোগ করলেন স্নেহলতা, ঠাট্টা-টাট্টাও করলেন।

হাতজোড় করে পুরোপুরি আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে লারমোর বললেন, 'এইবার—এইবারটা শুধু ক্ষমা করে দিন বউঠাকরুন। ক'দিন পর থেকে দেখবেন, রোজ আসছি।'

লারমোরের সারল্য, কাঁচুমাচু মুখভঙ্গি, করুণ ক্ষীণ কণ্ঠস্বর—সব মিলিয়ে এমন একটা আবহাওয়া তৈরি হয়ে যাতে না হেসে কেউ পারে না। আজও সবাই হাসল। স্নেহলতা কিন্তু হাসলেন না। তীক্ষ্ণ ভ্রূকুটিতে লারমোরকে বিদ্ধ করতে করতে বললেন, 'যেদিন থেকে সাহেব তোমার সঙ্গে আলাপ

হয়েছে সেদিন থেকেই তো এ কথা শুনে আসছি। তা প্রায় চল্লিশ বছর হতে চলল।'

'যা হবার হয়ে গেছে। এবার থেকে আমি সুবোধ বালক হয়ে যাব।'

'ঠিক?'

'ঠিক।'

'কতবার তো প্রতিজ্ঞা করা হল! সে যাক গে, এতদিন পর কোত্থেকে উদয় হলেন? করছিলেন কী?'

'রোগী-টোগী ছিল। তার ওপর ধান উঠছে। নানা ঝঞ্ঝাটে আসা হচ্ছিল না।'

স্নেহলতা শুধোলেন, 'আজ হঠাৎ কী মনে করে?'

লারমোর একটু যেন অবাকই হলেন, আহতও। বললেন, 'বা রে, সব ভুলে গেছেন!'

তবু মনে করতে পারলেন না স্নেহলতা। অপ্রস্তুত মুখে বললেন, 'কী বলুন তো?'

হেমনাথ খানিক দূরে বসে ছিলেন। তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, 'পরশু পঁচিশে ডিসেম্বর, বড়দিন। তাই না?'

'হ্যাঁ।' আস্তে মাথা হেলিয়ে দিলেন লারমোর।

স্নেহলতা লজ্জিত, বিব্রত। বললেন, 'সত্যি, আমার একেবারেই খেয়াল ছিল না। মন আজকাল যে কি বেভুলো হয়ে যাচ্ছে!'

হেমনাথ বললেন, 'বড়দিনের নেমন্তন্ন করতে এসেছ বুঝি লালমোহন?'

লারমোর বললেন, 'হ্যাঁ। পরশু আমার ওখানে সবাই যাবে।'

একটু ভেবে হেমনাথ বললেন, 'গীর্জা পরিষ্কার টরিষ্কার করিয়েছ? চারধার যা নোংরা করে রেখেছিলে।'

'না। কোথায় আর করানো হল!' লারমোর বলতে লাগলেন, 'ধানকাটা শুরু হয়ে গেল, তাই নিয়ে মেতে উঠলাম।'

'চমৎকার!' হেমনাথ অত্যন্ত রেগে গেলেন, 'পরশু বড়দিন, এখনও নাকে তেল দিয়ে ঘুমোচ্ছ! গীর্জা ধোয়ামোছা মাজা-ঘষা হবে কবে?'

'কাল সকালবেলা তুমি যদি একবার আসো—'

'যেতেই হবে। ভাবছি যুগলকে নিয়ে যাব।'

'তা হলে খুব ভাল হয়। আমার ওখানে পরানের মা আছে। সবাই হাত লাগালে কতক্ষণ আর লাগবে?'

একটু চুপ করে থেকে হেমনাথ বললেন, 'যা দেখছি, গীর্জা সাফটাফ করে সাজিয়ে-গুজিয়ে কাল আর আমার ফেরা হবে না।'

'কাল তোমাকে ফিরতে দিচ্ছে কে? তুমি ফিরবে পরশু বিকেলে।' বলতে বলতে লারমোরের হঠাৎ কী মনে পড়ে গেল, 'ভাল কথা—'

'কী?'

'আমরা না-হয় পরিষ্কার টরিষ্কার করব। গীর্জা সাজানোর ভার সুধাদিদি সুনীতিদিদিকে দিলে কেমন হয়?'

'খুব ভাল, খুব ভাল—'

'তা হলে কাল বিকেলে সুধা সুনীতিকে নিয়ে যাবার জন্যে গাড়ি পাঠিয়ে দেব। বাকি সবাই পরশু যাবে।'

'আচ্ছা।'

একধারে বসে বসে চুপচাপ সবার কথা শুনে যাচ্ছিল বিনু। হঠাৎ সে বলে উঠল, 'কাল সকালে দাদুর সঙ্গে আমিও যাব।'

সুরমা ওধার থেকে তাড়াতাড়ি বললেন, 'না। কাজের মধ্যে গিয়ে তোমাকে আর ঝঞ্ঝাট করতে হবে না। আমাদের সঙ্গে তুমি পরশু যাবে।'

বিনুর মুখখানা কালো হয়ে গেল।

pathagar.net

লারমোর বিনুকে লক্ষ করছিলেন। সস্নেহ গলায় বললেন, 'না না, পরশু নয়, কালই তুমি যাবে।'

ঝিনুক এতক্ষণ একটি কথাও বলেনি। বিনুর যাবার ব্যবস্থা হয়ে যাচ্ছে দেখে হিংসুটি মেয়েটা আর মুখ বুজে থাকতে পারল না। কান্নার মতো সরু গলায় হঠাৎ বায়না জুড়ে দিল, 'বিনুদাদা গেলে আমিও যাব, আমিও যাব।'

অত্যন্ত বিরক্ত চোখে বিনু ঝিনুকের দিকে তাকাল। মেয়েটা তার পেছনে সবসময় প্রায় জোঁকের মতো লেগে আছে।

লারমোর বললেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, যাবি। নিশ্চয়ই যাবি।'

সুধা সুনীতিও এ ঘরেই ছিল। সুধা হঠাৎ বলল, 'বড়দিনে আমাদের ক্রিসমাস কেক খাওয়াবেন তো লালমোহন দাদু?'

লারমোর হাসলেন, 'এই গ্রামদেশে কেক কোথায় পাব দিদি? তবে—'

'কী?'

'চমচম খাওয়াব, পাতক্ষীর খাওয়াব, রসগোল্লা খাওয়াব। দেখব, কে কত খেতে পারিস।'

সুধা কিন্তু খুঁতখুঁত করতে লাগল, 'বড়দিনে কেক না হলে ভাল লাগে না।'

পর দিন ভোরবেলা ফিটন পাঠিয়ে দিলেন লারমোর।

ধানকাটা এখনও চলেছে। একশ' কানি জমির ফসল তো অল্প স্বল্প ব্যাপার নয় যে মুখের কথা খসলেই খেত থেকে উঠে এল।

ঠিক হল, কৃষাণদের সঙ্গে জমিতে গিয়ে অবনীমোহন আজকের দিনটা ধানকাটা তদারক করবেন। কাল ভোরবেলা যুগল ফিরে আসবে। যুগল ফিরলে অবনীমোহন বাড়ির বাকি সবাইকে নিয়ে গীর্জায় যাবেন। কালকের দিনটার ধানকাটা দেখাশোনার ভার থাকবে যুগলের ওপর।

এত ভোরে রোদ ওঠেনি। কুয়াশায় চারদিক আচ্ছন্ন। পৌষের হাওয়া এত ঠাণ্ডা, মনে হয় বরফের দেশ থেকে ছুটে আসছে। ভেজা মাটি থেকে এমন হিম উঠছে যে পা ফেলা যায় না। সারা গায়ে গরম জামাকাপড়, তবু শীত কাটে না। হি হি কাঁপতে কাঁপতে বিনু ঝিনুক হেমনাথ এবং যুগলের সঙ্গে ফিটনে গিয়ে উঠল।

গীর্জায় পৌঁছতে পৌঁছতে রোদ উঠে গেল। শীতের রোদ—নিস্তেজ, উত্তাপহীন। তবু তো রোদ। পকেট থেকে হাত বার করে সিঁটানো আঙুলগুলো সেঁকে নিতে লাগল বিনু।

গীর্জায় এসে এক মুহূর্তও বসলেন না হেমনাথ। যুগল আর লারমোরকে সঙ্গে নিয়ে ঝাড়পোঁছ শুরু করে দিলেন। দুপুরবেলা খাওয়াদাওয়ার সময়টুকু বাদ দিলে সারাদিন ধোয়ামোছা চলতে লাগল।

বিকেলে সুধা সুনীতি এল। ততক্ষণে ঘষে মেজে গীর্জাটাকে ঝকঝকে করে তোলা হয়েছে। চারদিক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।

সুধারা আসতে না আসতেই বিনুকে সঙ্গে নিয়ে যুগল বেরিয়ে পড়ল। ঘুরে ঘুরে রাজ্যের ফুল, লতা পাতা জোগাড় করে গীর্জার সামনে স্তূপাকার করল। নদীপাড়ের মনিহারি দোকান থেকে লাল-নীল-সবুজ, নানা রঙের কাগজ কিনে আনল।

লারমোর বললেন, 'সুধাদিদি সুনীতিদিদি, আর কী লাগবে বল—'

সুধা সুনীতি একসঙ্গে বলল, 'আর কিছু না।'

'এবার তা হলে সাজাতে শুরু কর।'

দু'বোন কোমর বেঁধে লেগে গেল। ফুল এবং লতাপাতায় চমৎকার নকশা করে গেট সাজাল, তিন চারটে তোরণ বানালো। নানা রঙের কাগজ কেটে অসংখ্য শিকলি বানিয়ে চারদিকে টাঙিয়ে দিল। দেওয়ালে আর মেঝেতে আলপনা আঁকল অনেক। একটা ক্রিসমাস-ট্রি বানাল, তার তলায় কাগজ টাগজ দিয়ে বুড়ো সান্তা ক্লজ তৈরি করে দাঁড় করিয়ে দিল। সব চাইতে সুন্দর করে সাজাল যিশুখ্রিস্টের ছবিখানা। অবশ্য যুগল-লারমোর-বিনু-ঝিনুক, যার যেমন সাধ্য সুধা সুনীতিকে সাহায্য করেছে।

রাত পোহালেই বড়দিন। কোথায়, কত শতাব্দী আগে বেথেলহেমের আকাশে উজ্জ্বল তারাটি

দেখা দিয়েছিল। তারপর এই ধূলিধূসর মর্তে আবির্ভাব হয়েছিল মানবপুত্রের। আপন রক্তে এই রিপুতাড়িত জগৎকে তিনি শুদ্ধ করে গেছেন।

সেই জ্যোর্তিময় পুরুষটিকে কৃতজ্ঞ মানুষ আজও ভোলেনি। বহু শতাব্দী পরও বসুন্ধরার এক প্রান্তে রাজদিয়া নামে এক অখ্যাত নগণ্য জনপদে তাঁর পুণ্য জন্মদিন স্মরণ করে তারা ধন্য হচ্ছে।

লারমোর ঘুরছেন, ফিরছেন আর সুসজ্জিত গীর্জা বাড়িটাকে দেখছেন, যিশুর ছবিখানা দেখছেন। দেখে দেখে সাধ যেন তাঁর মেটে না।

দেখেন আর ঘন আবেগের গলায় লারমোর বলেন, 'চল্লিশ বছর ধরে রাজদিয়ায় আছি। সব বছরই তো বড়দিনের উৎসব হয়। কিন্তু কোনও বার এমন করে গীর্জাবাড়ি সাজাতে পারিনি। ভাগ্যিস সুধাদিদি সুনীতিদিদিরা রাজদিয়া এসেছিল। কী আনন্দ যে হচ্ছে!'

ক'ঘন্টা পরেই বড়দিন। গীর্জার চারধারে ক'টি মানুষ তার জন্য হৃদয় বিছিয়ে রেখেছে।

গীর্জা সাজাতে সাজাতে অনেক রাত হয়ে গেল। তারপর খেয়ে দেয়ে সবাই শুয়ে পড়ল। কতক্ষণের জন্যই বা শোওয়া! খানিক পরে, তখনও রাতের অন্ধকার রয়েছে, লারমোর উঠে পড়লেন। এমন যে ঘুমাকাতুরে বিনু, সেও শুয়ে থাকতে পারল না।

শীতের এই শেষ রাতে চারদিক যখন বরফের মতো ঠান্ডা, পেছনের নদী থেকে লারমোর এবং হেমনাথ স্নান করে এলেন। সুধা সুনীতিও স্নান করতে চেয়েছিল, হেমনাথ করতে দেননি। অভ্যেস তো নেই। শেষে অসুখ বিসুখ হয়ে যেতে পারে। দু'একখানা বেশি জামাকাপড় নিয়ে এসেছিল ওরা। তাড়াতাড়ি মুখটুখ ধুয়ে কাপড় বদলে নিল।

এত ঠান্ডায় প্যান্টজামা বদলাতে ইচ্ছা করছিল না বিনুর। হেমনাথ বললেন, 'কী ছেলে রে তুই, উৎসবের দিনে কেউ বাসি জামা টামা পরে থাকে! যা যা, পরিষ্কার জামাপ্যান্ট পরে নে—'

অগত্যা কী আর করা, চটকানো বাসি জামাটামা ছাড়তেই হল বিনুকে। দেখাদেখি ঝিনুকও চট করে ফ্রক বদলে নিল।

এদিকে যিশুর ছবির সামনে অসংখ্য মোমবাতি জ্বেলে দিয়েছেন লারমোর। একসময় সবাইকে ডেকে পবিত্র শুদ্ধ মনে চোখ বুজে আশ্চর্য সুরেলা গলায় বড়দিনের প্রার্থনা শুরু করে দিলেন। যিশু-বন্দনার পর বাইবেল থেকে তাঁর প্রিয় ক'টি পদ আবৃত্তি করলেন ঃ

Make a joyful noise
unto the Lord, all ye lambs
Serve the Lord, with gladness.
Come before his presence with singing.
Know ye that the Lord he is
God. it is he that hath made us.
And not we ourselves, we are his
People, and the sheep of his pasture.

pathagar.net

আবৃত্তি শেষ হলে অসংখ্য পবিত্র প্যারাবেল শোনালেন লারমোর। ওল্ড এবং নিউ টেস্টামেন্ট থেকে অনেক কথা শোনালেন। যিশুর জন্ম থেকে ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ পর্যন্ত পুণ্য জীবনকাহিনী বর্ণনা করলেন। বুড়ো সান্তা ক্লজের কথা বললেন। হেমনাথ-সুধা-সুনীতি-বিনু-ঝিনুক, সবাই অভিভূত হয়ে শুনতে লাগল।

যিশুভজনা শেষ হতে ভোর হয়ে গেল। ঘন করে বোনা কুয়াশার ভারী পর্দাগুলো ছিড়েখুঁড়ে রোদ উঠল।

রাত থাকতে থাকতেই যুগল বাড়ি ফিরে গিয়েছিল। তাকে আবার কৃষাণদের সঙ্গে মাঠে যেতে হবে।

বেলা বাড়লে সুরমা স্নেহলতাকে নিয়ে অবনীমোহন গীর্জায় এলেন। শিবানী আসেননি, ক'দিন

ধরে তাঁর জ্বর। তা ছাড়া, সবাই চলে এলে তো হয় না, বাড়ি পাহারা দেবার জন্য এক-আধজন থাকা দরকার।

শুধু হেমনাথদের বাড়ির লোকজনই নয়, বেলা যত চড়তে লাগল রাজদিয়া এবং দূর-দুরান্তের গ্রাম-গঞ্জ থেকে কত মানুষ যে আসতে লাগল গীর্জায়! চেনাজানা যাকে পেয়েছেন তাকেই নেমন্তন্ন করেছেন লারমোর।

যে আসছে তারই হাতে ফল-টল মিষ্টি-টিষ্টি দিচ্ছেন লারমোর, ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পরিচ্ছন্ন সুসজ্জিত গীর্জাবাড়ি দেখাচ্ছেন আর বলছেন, 'কেমন দেখলে বল তো?'

'চোমৎকার! কতকাল ধইরা এই গীজ্জায় বড়দিন দেখতে আছি। কিন্তুক অ্যামন সাজান-গুঁজান কুনোদিন দেখি নাই।'

'কোত্থেকে দেখবে? আমরা কি সাজাতে টাজাতে জানতাম?'

'এইবার তাইলে অ্যামন সোন্দর কইরা সাজাইলেন ক্যামনে?'

'আমরা কি সাজিয়েছি?'

'তয়?'

'আমরা নাতনীরা সাজিয়েছ।' বলে সুধা সুনীতির হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে এসে সগর্বে সবাইকে দেখান লারমোর।

সারাদিনই লোক আসছে। একদল যায় তো আর একদল তক্ষুনি এসে পড়ে। জনস্রোতের আর বিরাম নেই। এ তো শুধু খ্রিস্টানদেরই উৎসব নয়, সমস্ত মানবজাতির কাছেই এক পরম পবিত্র দিন। অন্তত রাজদিয়ার মানুষ এইভাবেই দিনটিকে গ্রহণ করেছে।

লোক আসছে, যাচ্ছে। হেমনাথরা কিন্তু ছাড়া পেলেন না।

বেলা অনেকখানি চড়লে স্নেহলতা একবার বললেন, 'বড়দিনের উৎসব তো মিটল। এবার আমরা বাড়ি যাই?'

তাঁর কথা শেষ হতে না হতেই চেচাঁমেচি জুড়ে দিলেন লারমোর, 'কোথায় মিটল। আজ সারা দিনই বড়দিন।'

'তার মানে কী বলতে চান আপনি?'

কপাল কুঁচকে, কপট শঙ্কার গলায় স্নেহলতা বললেন, 'সারা দিন!'

'হ্যাঁ, সারা দিন।' লারমোর ঘাড় হেলিয়ে দিলেন।

সন্ধে পর্যন্ত একটানা গল্পগুজব, খাওয়াদাওয়া, এবং হালকা সুরের ঠাট্টা টাট্টা চলল। স্নিগ্ধ মনোরম একটি দিন কাটিয়ে অনেক, অনেক রাত্তিরে বিনুরা ফিটনে উঠল। এতক্ষণে বাড়ি ফেরার অনুমতি মিলেছে।

দিনকয়েক পর এক সকালবেলায় পুরের ঘরের তক্তপোশে বসে ছিল বিনু। নাকের ডগা এবং চোখদু'টো বাদ দিলে গা গরম চাদরে ঢাকা। একটা পুঁটুলির মতো দেখাচ্ছিল তাকে। বাতাস এমন কনকনে যে চাদরের ভেতর থেকে হাত-পা বার করতে ইচ্ছে হয় না।

একটু আগে ঘুম ভেঙেছে বিনুর। স্কুলে ভর্তির সমস্যাটা মিটে যাবার পর আজকাল বই টই ছুঁচ্ছে না সে। বিনু জানিয়ে দিয়েছে, নতুন বছরে নতুন ক্লাস শুরু না হলে সে আর পড়ছে না।

দাদুর কাছে যদিও সে শোয়, ইদানীং এত ঠান্ডায় ভোরবেলা আর উঠতে চায় না। হেমনাথও টানাটানি করেন না। শীতকালের মাঝামাঝি এই হিমবর্ষী দিনগুলোর জন্য বিনুর সূর্যস্তব স্থগিত আছে।

এখন বেশ বেলা হয়েছে। আকাশের খাড়া দেওয়াল বেয়ে সূর্যটা অনেকখানি ওপরে উঠে এসেছে। জানালার বাইরে তাকিয়ে ছিল বিনু। উঠোনভর্তি এখন শুধু ধান আর ধান, হেমনাথের খেতের ধান—

সোনার পাহাড়ের মতো স্তূপাকার হয়ে আছে। উঠোনের পর বাগান, তারপর পুকুর। অঘ্রানের গোড়াতেই পুকুরের ওপারের মাঠ থেকে জল নেমে গিয়েছিল। এখন ওখানকার মাঠ একেবারে নিঃস্ব। কৃষাণেরা ধান কেটে নিয়ে গেছে। ধানকাটা ফাঁকা মাঠ কেমন যেন ধূসর দেখায়। শস্যকণার খোঁজে ঝাঁকে ঝাঁকে মোহনচূড়া পাখি আর বুলবুলি সেখানে চক্কর দিয়ে ফিরছে। এছাড়া আর কেউ নেই, কিছু নেই।

হেমনাথ ঘরে ঢুকলেন। বললেন, 'কী করছিস বিনুদাদা?'

দূর মাঠের দিকে চোখ রেখেই অনমনস্কের মতো বিনু উত্তর দিল, 'বসে আছি।'

কৌতুকের গলায় হেমনাথ এবার বললেন, 'ফাঁকা মাঠের শোভা দেখছিস?' বলে শব্দ করে হাসলেন।

একটু পর পেছন দিকে কিসের আওয়াজ হতে বিনু মুখ ফেরাল। তার চোখে পড়ল, তক্তপোশের তলা থেকে প্রকাণ্ড স্টিলের বাক্স বার করে খুলে ফেলেছেন হেমনাথ। এবং তন্ময় হয়ে ভেতরে কী সব দেখছেন।

আগেও বারকয়েক এই বাক্সখানা খুলে বিভোর হয়ে হেমনাথকে তাকিয়ে থাকতে দেখেছে বিনু। তখন কিছু জিজ্ঞেস করেনি।

আজ পৌষ মাসের এই অলস সকালে হঠাৎ অত্যন্ত কৌতূহলী হয়ে উঠল বিনু। ডাকল, 'দাদু—'

হেমনাথ প্রথমটা শুনতে পাননি। আরও দু'চারবার ডাকাডাকির পর মুখ তুললেন, 'কী বলছিস?'

'বাক্সের ভেতর কী দেখছ?'

উত্তর না দিয়ে হেমনাথ জিজ্ঞেস করলেন, 'তুই দেখবি?'

বিনুর কৌতূহল ক্রমশ বেড়েই যাচ্ছিল। বলল, 'হ্যাঁ।'

'আয়—

জানালার পাশ থেকে উঠে পড়ল বিনু, পায়ে পায়ে হেমনাথের কাছে চলে এল।

বাক্সের ডালাটা পুরোপুরি মেলে ধরলেন হেমনাথ। বললেন, 'দ্যাখ—'

ভেতরে চমৎকার চমৎকার সব জিনিস স্তূপীকৃত হয়ে আছে। বেতের সাজি, নকশা-করা কাশ্মিরি শালের পাড়, বহুবর্ণময় ময়ূরের পালক, অসংখ্য ছবি, মাটির পুতুল, পট, ডাকের সাজের অগণিত নমুনা, কারুকার্য-করা প্রাচীন কাঁথা, নানারকম রঙচঙে পাথর, মণিপুরী চাদর, মোটা আর্ট পেপারে ঘন কালো কালির অতি সুন্দর হস্তাক্ষর, কাঠের এবং হাড়ের রমণীয় শিল্পকার্য—এমনি কত কী।

বিনু অবাক হয়ে গিয়েছিল। বলল, 'এসব কার দাদু?'

হেমনাথ বললেন, 'আমার। একটা বাক্স দেখলি তো?'

'হ্যাঁ।'

'এইরকম আরও পাঁচ ছ'টা বাক্স আছে। এখন আমার বয়স পঁয়ষট্টির মতো। কুড়ি পঁচিশ বছর বয়স থেকে এসব জিনিস জমাচ্ছি। যেখানে যা কিছুই ভাল, যা কিছু সুন্দর চোখে পড়েছে, চেয়ে চিন্তে বা পয়সা দিয়ে কিনে এনে জমিয়ে রেখেছি।'

বিনু কী বলতে যাচ্ছিল, কোত্থেকে হঠাৎ ঝিনুক এসে হাজির। এক পলকে সমস্ত ব্যাপারটা বুঝে নিয়ে সুর টেনে টেনে বলল, 'বিনুদাদাকে কী দেখাচ্ছ গো?'

বাক্সের ভেতরটা দেখিয়ে হেমনাথ বললেন, 'এই সব—'

'বিনুদাদাকে দেখালে আমাকেও দেখাতে হবে—' ঝিনুক নাকে-কান্না জুড়ে দিল।

'কাঁদছিস কেন, দ্যাখ না—'

এই এক মেয়ে হয়েছে। বিনু যা করবে, যা দেখবে, যেখানে যাবে, তারও তাই করা চাই, সেখানে যাওয়া চাই।

মনে মনে ঝিনুকের ওপর রেগে গেল বিনু। একবার ইচ্ছা হল, ঝুঁটিটা টেনে ছিঁড়ে দেয় কিন্তু কিছুই করল না। ঝিনুককে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে সে বলল, 'এত সব জিনিস জমিয়েছ কেন?'

হেমনাথ বললেন, 'এমনি, শখ।' একটু চুপ করে থেকে দূরমনস্কের মতো আবার বললেন,

pathagar.net

'ঠিক শখ না। ভাল ভাল, সুন্দর সুন্দর জিনিস জোগাড়ের নেশা থাকলে মন খারাপ দিকে যায় না। তা ছাড়া—'

'কী?'

'মাঝে মাঝে কোনও কারণে বুকের ভেতরটা ভারী হয়ে থাকলে বাক্স খুলে বসি। এসব দেখতে দেখতে সব ভার কেটে যায়।'

হেমনাথের শেষ কথাগুলো খানিক বুঝল বিনু, অনেকখানিই দুর্বোধ্য থেকে গেল। বিমূঢ়ের মতো তাকিয়ে থাকল সে।

হেমনাথ আবার বললেন, 'জিনিসগুলো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। সুধা সুনীতিকে বলব, যেন সাজিয়ে-গুছিয়ে ঠিক করে রাখে।'

দেখতে দেখতে ইংরেজি নতুন বছর পড়ে গেল। আজ থেকে বিনুদের ক্লাস শুরু হবে। একা বিনুর না, সুধা সুনীতি এবং ঝিনুকেরও।

চারজনেরই স্কুল আর কলেজ কাছাকাছি। খেয়ে দেয়ে দল বেঁধে তারা বেরিয়ে পড়ল।

প্রথমে পড়ে মেয়েদের স্কুল। সেখানে ঝিনুককে রেখে বাকি তিনজন এগিয়ে গেল। ঠিক হল, ফেরার পথে ঝিনুককে তারা নিয়ে যাবে।

ঝিনুকের পর বিনুর স্কুল। সুধা সুনীতি তার স্কুলে আর এল না। বড় রাস্তা ধরে সোজা কলেজের দিকে চলে গেল। বিনু ডান দিকের মাঠের ওপর দিয়ে স্কুলবাড়ির দিকে চলল।

মাঠের মাঝামাঝি আসতেই বিনু শুনতে পেল, পেছন থেকে কেউ ডাকছে। এখানে কে ডাকতে পারে তাকে? সবাই তো অচেনা। ঘুরে দাঁড়াতেই সে দেখতে পেল, হেডমাস্টার মোতাহার হোসেন চৌধুরি সাহেব আসছেন।

কাছে এসে মোতাহার সাহেব সস্নেহে হাসলেন, 'স্কুল খোলার দিনই চলে এসেছ?'

বুক ঢিপ ঢিপ করছিল বিনুর। চোখ নামিয়ে আবছা গলায় বলল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ—'

'গুড, ভেরি গুড।' বিনুর কাঁধে একখানা হাত রেখে মোতাহার সাহেব বললেন, 'কখন এলে?'

'এইমাত্র।'

'এখনও তা হলে ক্লাসে যাও নি?'

'আজ্ঞে না।'

'এস আমার সঙ্গে—' বিনুকে সঙ্গে নিয়ে মোতাহার সাহেব তাঁর ঘরে গেলেন।

সেদিন মনে হয়েছিল, এ ঘরখানা হেডমাস্টার সাহেবের জন্য আলাদা করে নির্দিষ্ট। কিন্তু আজ দেখা গেল, অন্যান্য মাস্টার মশাইরাও এখানেই বসেন। মোট কথা, এটাই রাজদিয়া হাই স্কুলের টিচার্স কমন রুম।

এখনও স্কুল বসার সময় হয়নি। সব মাস্টারমশাই এর মধ্যেই এসে গেছেন। তাঁদের সবার সঙ্গে বিনুর আলাপ করিয়ে দিলেন মোতাহার সাহেব। কোণের দিকে যে লম্বা রোগামতো প্রৌঢ়টি, যাঁর নাম আশু দত্ত—তিনি ইংরেজির টিচার এবং অ্যাসিস্টান্ট হেডমাস্টার। উনি সোমনাথ সাহা, অঙ্কের টিচার। উনি রজনী চট্টরাজ, ভূগোলের টিচার। ইত্যাদি—

মাস্টার মশাইদের পরিচয় টরিচয় দিয়ে মোতাহার সাহেব বললেন, 'এই ছেলেটির নাম বিনয়—বিনয়কুমার বসু। আমাদের হেমদাদার ভাগনীর ঘরের নাতি। এ বছর ক্লাস এইটে ভর্তি হয়েছে। আপনারা একটু লক্ষ রাখবেন। ছেলেটি বেশ ব্রাইট।'

হেমনাথের নাতি এবং হেডমাস্টার সাহেবের প্রশংসা শুনে সবাই বেশ আগ্রহান্বিত হলেন। বিনুরা আগে কোথায় ছিল, হঠাৎ রাজদিয়ায় এসে ভর্তিই বা হল কেন, এমন নানা প্রশ্ন করতে লাগলেন বিনু উত্তর দিয়ে যেতে লাগল।

কথায় কথায় ক্লাসের সময় হয়ে গেল। দপ্তরী বাইরে ঘন্টা বাজিয়ে দিল।

মোতাহার সাহেব তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, 'ক্লাস এইটের প্রথম ক্লাস কার?'

অ্যাসিস্টান্ট হেডমাস্টার রোগা, লম্বামতো আশু দত্ত বললেন, 'আমার—'

'বিনয়কে আপনার সঙ্গে নিয়ে যান। ছেলেমানুষ, আজ নতুন এসেছে—'

বিনুর দিকে তাকিয়ে আশু দত্ত ডাকলেন, 'এস—'

ক্লাসে আসতে দেখা গেল বেঞ্চিগুলো বোঝাই হয়ে গেছে। ছেলেরা আগেভাগে সেগুলো দখল করে বসে আছে।

বিনু লক্ষ করল, বেশির ভাগ ছেলেই তার চাইতে অনেক বড়। পেছন দিকে যারা বসে আছে তাদের মুখ দেখে মনে হল, নিয়মিত দাড়িগোঁফ কামায়। দু'একজন বিনুর সমবয়সী থাকতেও পারে, কিন্তু এত ছেলের ভিড়ে এই মুহূর্তে তাদের খুঁজে বার করা অসম্ভব।

ক্লাসের দিকে তাকিয়ে আশু দত্ত বললেন, 'তোমাদের নতুন এক বন্ধু এসেছে। আজই এর সঙ্গে সবাই আলাপ টালাপ করে নেবে।' বলে বিনুকে দেখিয়ে দিলেন। তারপরেই হঠাৎ কী মনে পড়ে যেতে খুব দ্রুত ফের বলে উঠলেন, 'তবে হ্যাঁ, দু'জন এর সঙ্গে মিশবে না, কথাও বলবে না।' বলেই ডাকলেন, 'রুস্তম—পতিতপাবন—'

সঙ্গে সঙ্গে পেছন দিকের বেঞ্চ থেকে বাইশ তেইশ বছরের দুই গাট্টাগোট্টা জোয়ান উঠে দাঁড়াল। এত বড় বড় ধেড়ে ছেলেরা যে ক্লাস এইটে পড়তে পারে, বিনুর কাছে তা এক অভাবনীয় ব্যাপার। অবাক চোখে তাকিয়ে থাকল সে।

আশু দত্ত বললেন, 'তোমাদের দু'জনকে সাবধান করে দিলাম, বিনয়ের পেছনে লাগবে না। ওর সঙ্গে মিশবে না।'

'আইচ্ছা স্যার—' রুস্তম এবং পতিতপাবন দু'জনেই ঘাড় হেলিয়ে আবার বসে পড়ল।

আশু দত্ত কেন যে রুস্তম আর পতিতপাবনকে তার সঙ্গে মিশতে বারণ করে দিলেন, বিনু ভেবে পেল না।

বেশিক্ষণ সেই ভাবনাটা নিয়ে থাকা গেল না। সামনের বেঞ্চের ছেলেদের একটু চেপেচুপে বসে বিনুকে জায়গা করে দিতে বললেন আশু দত্ত। বিনু বসলে বললেন, 'রোজ তুমি ওই জায়গায় বসবে।'

'আচ্ছা স্যার—' বিনু মাথা নাড়ল।

অ্যানুয়াল পরীক্ষার পর নতুন বছরে আজই প্রথম স্কুল বসেছে। এখনও ছেলেদের বইটই কেনা হয়নি। বই কেনা হবে কোত্থেকে? এখনও বুক লিস্টই দেওয়া হয়নি। কাজেই গল্প করে সময় কাটানো ছাড়া কাজ নেই।

অলস মন্থর গতিতে একটার পর একটা ক্লাস গড়িয়ে চলল। তারপর একসময় টিফিনের ঘন্টা বাজল। সঙ্গে সঙ্গে জলোচ্ছ্বাসের দিশেহারা ঢলের মতো স্কুলবাড়ির সবগুলো ঘর থেকে হুড়মুড় করে ছেলেরা বেরিয়ে পড়ল। স্রোতে গা ভাসিয়ে বিনুও বাইরে এল।

ছেলেরা ছোটাছুটি করছে। একদল সামনের মাঠে 'দাড়িয়াবান্ধা'র কোর্টে নেমে পড়েছে। আরেক দল খেলেছে 'গোল্লাছুট'। তবে বেশির ভাগই শীতের রোদে পিঠ দিয়ে আড্ডা দিচ্ছে।

কারোর সঙ্গেই এখনও ভাল করে আলাপ হয়নি। চারদিকে আলতোভাবে ভেসে বেড়াতে লাগল বিনু। একবার 'দাড়িবান্ধা'র কোর্টে, একবার 'গোল্লাছুটে'র আসরে ঘুরতে ঘুরতে কখন যে মাঠের প্রান্তে সারি সারি কাঠবাদাম গাছগুলোর কাছে এসে পড়েছিল, খেয়াল নেই।

হঠাৎ চাপা গলায় কারা যেন ডেকে উঠল, 'বিনয়—'

চমকে এদিকে তাকাতেই বিনু দেখতে পেল, ডান দিকের কাঠবাদাম গাছটার তলায় রুস্তম, পতিতপাবন এবং তাদের বয়সী আরও দু'তিনটে জোয়ান ছেলে বসে আছে।

মাস্টারমশাই তার সঙ্গে রুস্তমদের মিশতে বারণ করে দিয়েছেন। নিষেধটা একতরফা নয়। রুস্তমরা যেমন তার সঙ্গে মিশবে না, তাকেও তেমনি ওদের কাছ থেকে দূরে থাকতে হবে। বিনুর কেমন যেন ভয় ভয় করতে লাগল। রুস্তমদের কাছে যাবে কি যাবে না, ঠিক করে উঠতে পারল না।

তার মনোভাবটা রুস্তমরা যেন বুঝতে পারল। বলল, 'ডর নাই, এইহানে মাস্টারমশাই আসব

না। আসো—আসো—'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও কখন যে রুস্তমদের কাছে এসে বসেছে, বিনু টের পায়নি।

রুস্তম বলল, 'কইলকাতার থিকা আইছ?'

'হ্যাঁ—' বিনু মাথা নাড়ল।

একটা ব্যাপার বিনু লক্ষ করেছে, রাজদিয়া আসার পর যার সঙ্গেই আলাপ হয়েছে, প্রথমেই তারা কলকাতার কথা জানতে চেয়েছে। কলকাতা সম্বন্ধে তাদের মনে অপার, অসীম বিস্ময়।

রুস্তমরাও কলকাতা সম্বন্ধে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অনেক প্রশ্ন করল। অবাক হয়ে বিনুর মুখে অজানা রহস্যময় শহরটির নানা চমকপ্রদ কাহিনী শুনল। শুনতে শুনতে পকেট থেকে বিড়ির বাণ্ডিল বার করে একটা করে ধরিয়ে নিল। বিনুর দিকেও একটা বাড়িয়ে দিল।

বিনু চমকে উঠল। প্রথমত, স্কুলের ছেলেরা বিড়ি খায়, এমন দৃশ্য আগে আর কখনও দেখে নি। তার পক্ষে এ এক নিদারুণ অভিজ্ঞতা। তার ওপর তাকেও বিড়ি সাধছে। বিনুর বুকের ভেতরটা কাঁপতে লাগল। বলল, 'না—না—'

'বিড়ি বুঝিন খাও না?'

'না।'

'তয় কী খাও? সিগ্রেট?'

'না—না—'

বিস্ময়ে চোখ গোল হয়ে গেল রুস্তমের, 'বিড়ি খাও না, সিগ্রেট খাও না, ক্যামন কইলকাত্তার পোলা!'

বুক থরথর করছিলই, এখন মাথা ঝিমঝিম করতে লাগল। বিনু বলল, 'আমি এখন যাই—'

খপ করে তার একটা হাত ধরে ফেলে রুস্তম বলল, 'আরে যাইবা কই? বসো—বসো—আলাপ-পরিচয়ই হইল না। বিড়িতে একখান টান দিয়াই দ্যাখো না, অ্যামন সুখ আর কিছুতে নাই—'

'না না, আমাকে ছেড়ে দিন—'

'আরে, কী আশ্চয্যি, আমাগো 'আপনে' 'আইজ্ঞা' কইরা কও ক্যান? এক লগে পড়ি, 'তুমি' কইরা কইবা। 'তুই'ও কইতে পার।'

বিনু স্তম্ভিত। পড়লই বা এক ক্লাসে, দামড়া মোষের মতো তাগড়া তাগড়া ওই জোয়ান দু'টোকে কখনও 'তুমি' কি 'তুই' বলা যায়! বিনু উঠবার জন্য ছটফট করতে লাগল।

রুস্তম বলল, 'অ্যামন কর ক্যান? আমরা বাঘ না ভাল্লুক?'

বিনু ফস করে বলে ফেলল, 'মাস্টারমশাই আমার পেছনে আপনাদের না লাগতে বারণ করে দিয়েছেন?'

তাচ্ছিল্যের গলায় রুস্তম বলল, 'মাস্টারমশইরা অ্যামন কত কথাই কয়। হেই হগল ধইরা বইসা থাকলে চলে নিকি? আমাগো লগে মিশো, মজা পাইবা।'

'কিসের মজা?'

রুস্তম উত্তর দিল না। পতিতপাবনের দিকে তাকিয়ে চোখ টিপল। বলল, 'তুই-ই কইয়া দে—'

পতিতপাবন কিছুক্ষণ চোখ কুঁচকে থাকল। তারপর খুব চাপা গলায় ফিসফিসিয়ে বলল, 'রুস্তইমার তিন বিবি, আমারও বউ আছে। মেলা রসের কথা আমাগো জানা, তোমারে শিখাইয়া পড়াইয়া চালাক কইরা দিমু—'

কথাগুলো ঠিক যে বুঝল বিনু তা নয়। তবে টের পেল, এর ভেতর নোংরা, অশ্লীল গন্ধ আছে। তার নাক-কান ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগল।

রুস্তমরা আবার কী বলতে যাচ্ছিল, সেই সময় ঘন্টা বেজে উঠল। অর্থাৎ টিফিন শেষ।

টিফিনের ঠিক পরের ক্লাসটাই আবার আশু দত্তের। ক্লাসে ঢুকেই তিনি হুঙ্কার দিলেন, 'রুস্তম, পতিতপাবন—'

শেষ বেঞ্চ থেকে দু'জন উঠে দাঁড়াল।

pathagar.net

আগের স্বরই আশু দত্ত আবার বললেন, 'কী বলেছিলাম তোদের?'

ত্রস্ত চোখে একবার মাস্টারমশাইকে দেখেই ঘাড় নীচু করল রুস্তমরা। আবছা স্বরে বলল, 'আইজ্ঞা—'

'তোদের না বলেছিলাম, বিনয়ের পেছনে লাগবি না। নিজেরা তো জাহান্নামে গেছিসই, বছর বছর ফেল করে একেকটা ধর্মের ষাঁড় হয়ে উঠেছিস্। নিজেরা যা খুশি কর, ছোট ছোট ছেলেগুলোর সর্বনাশ করা কেন?'

'আমরা তো কিছু করি নাই।'

'করিস নি! ফের মিথ্যে বলা হচ্ছে!' রাগে চিৎকার করে উঠলেন আশু দত্ত, 'ভেবেছিস, আমার চোখে কিছুই পড়েনি!' টিফিনের সময় বাদাম গাছের তলায় বিনয়কে ডেকেছিলি কেন? বল হারামজাদা বদের ধাড়িরা—'

রুস্তম পতিতপাবন, দু'জনই এবার চুপ। মুখ তুলে মাস্টারমশাইয়ের দিকে তাকাবার সাহাসটুকুও তাদের আর অবশিষ্ট নেই।

রুস্তম আর পতিতপাবনের চেহারা অসুরের মতো। অথচ রোগা দুর্বল আশু দত্তর সামনে ভয়ে তারা সিটিয়ে গেছে। দৃশ্যটা খুবই মজাদার, বিনুর খুব ভাল লাগল।

আশু দত্ত থামেন নি, 'তোরা হলি দাগী আম। একসঙ্গে থাকলে বাকিগুলোরও বারটা বাজাবি। স্কুল থেকে তোদের তাড়াতে হবে, দেখছি। যা, এখন ক্লাসের বাইরে গিয়ে 'হাফ নীল ডাউন' হয়ে থাক—'

রুস্তম এবং পতিতপাবন সুড়সুড় করে বাইরের টানা বারান্দায় চলে গেল। তারপর ত্রিভঙ্গ মূর্তিতে 'হাফ নীল ডাউন' হয়ে রইল।

বিনুর খুব হাসি পাচ্ছিল। বাড়ি ফিরে প্রথম দিনের অভিজ্ঞতাটা রঙচঙ ফলিয়ে বলবার জন্য তার আর তর সইছিল না।

পৌষ মাস থাকতে থাকতেই মাঠগুলো ফাঁকা করে দিয়ে ধান উঠে গেল। বাড়ির উঠোনে এখন সোনার পাহাড় সাজানো।

যে পঁচিশ জন কৃষাণকে হেমনাথ কাজে লাগিয়েছেন তারা আজকাল আর চকে যায় না। খড়সমেত যে ধান কেটে এনেছে, সারাদিন ঝেড়ে ঝেড়ে তা থেকে শস্যের দানাগুলোকে আলাদা করে। তারপর রোদে শুকিয়ে ডোল বোঝাই করতে থাকে। আর খড়গুলো দিয়ে পালা সাজায়।

এদিকে অবনীমোহন মজিদ মিঞার যে জমি কিনেছেন তার ধানও উঠে গেছে। ফসল কেটে নিয়ে যাবার পর মজিদ মিঞা অবনীমোহনকে জমির দখল দিয়ে দিয়েছেন।

দেখতে দেখতে পৌষ সংক্রান্তি এসে গেল। সংক্রান্তির দিন বিনুদের স্কুল আর সুধা সুনীতির কলেজ ছুটি। এই দিনটিতে এ দেশে অনেকেই বাস্তুপুজো করে থাকে। হেমনাথরাও করেন। অবনীমোহন নতুন জমি কিনেছেন, ঠিক হয়েছে তিনিও বাস্তুপুজো করবেন।

আগের দিনই দু'জন পুরুত এবং দু'জন ঢাকীকে খবর দিয়ে রাখা হয়েছিল। সংক্রান্তির দিন সকালবেলা তারা এসে হাজির।

বাস্তুপুজোর প্রথাটি বেশ। প্রথম পুজোটি হয় বাড়ির মধ্যেই। পুরুত ঠাকুর চরু রেঁধে বাস্তুদেবকে উৎসর্গ করে। তারপর যেখানে যেখানে জমিজমা আছে, সব জায়গায় ঘুরে ঘুরে পুজো হয়।

এবার দুই পুরুত, দুই ঢাকী এসেছে। কেননা, হেমনাথ আর অবনীমোহনের আলাদা আলাদা পুজো হবে।

বাড়ির পুজো সেরে দুই পুরুত দু'দিকে বেরিয়ে পড়ল। বাড়ির মানুষরা দু'ভাগ হয়ে দুই পুরুতের পিছু পিছু চলল। আর দুই ঢাকী বাজাতে বাজাতে আগে আগে চলেছে।

শুধু বিনুদেরই না, এখানে ঘরে ঘরে বাস্তুপুজো। চারদিকের মাঠ জুড়ে কত ঢাক বাজছে, কত পুরোহিতের মন্ত্রোচ্চারণ যে শোনা যাচ্ছে! একদল আধ-ন্যাংটো কালো কালো ছেলেমেয়ে একটু প্রসাদের আশায় এ ঘর থেকে ও ঘরে ছোটাছুটি করে বেড়াচ্ছে।

ঢাকের বাজনা শুনতে শুনতে, বাতাসে চরুর মধুর সুঘ্রাণ নিতে নিতে এবং জমিতে জমিতে ঘুরে পুজো দেখতে দেখতে পৌষের বেলা হেলে গেল। সারাদিনের ক্লান্তি গায়ে মেখে বিনুরা যখন বাড়ি ফিরল, শীতের সন্ধে নেমে গেছে।

মাঘ মাসের প্রথম দিকেই সব ধান ডোলে তুলে খড় দিয়ে সারি সারি পালা সাজিয়ে চরের মুসলমান কৃষ্ণাণরা চলে গেল।

তারপর একটানা অলস, মন্থর দিনযাপন। যুগল করিমকে এখন আর মাঠে যেতে হয় না। হেমনাথের অবশ্য কাজের শেষ নেই। বাড়ির কাজ তাঁর যত, তার হাজার গুণ বাইরের কাজ। ইদানীং স্কুলবাড়ির জন্য গঞ্জে গঞ্জে ঘুরে টাকা তুলে বেড়াচ্ছেন। নাওয়াখাওয়ার ফুরসতটুকু পর্যন্ত তাঁর নেই।

নতুন ধান উঠবার পর এ বাড়িতে পিঠে পায়েস বানাবার ধুম পড়ে গেছে। চালও অঢেল, দুধেরও অভাব নেই। কাজেই পিঠেটিঠে না বানিয়ে কি থাকতে পারেন স্নেহলতা?

পিঠেও কি এক আধ রকমের? ভাপা পিঠে, পাটি সাপটা, চিতই, রাঙা আলুর পুলি, সিদ্ধ পুলি, দুধ পুলি, মুগ পুলি, ভাজা পুলি—রকমের আর লেখাজোখা নেই। তা ছাড়া পায়েস আছে, চসি আছে।

নতুন ধান উঠবার পর আরেকটা পরিবর্তন ঘটেছে। আগে আগে সকালবেলা চিঁড়ে-মুড়ি-ক্ষীর-দুধ খেতে দিতেন স্নেহলতা। আজকাল ভোর ভোর উঠেই মাটির হাঁড়িতে ফেনাভাত বসিয়ে দেন। চিঁড়ে মুড়ির বদলে নতুন চালের সুঘ্রাণে ভরা ফেনাভাত, সর-বাটা ঘি আর আলুভাতে বা কাঁঠাল বিচি সিদ্ধ দিয়ে খেতে কী ভাল যে লাগে।

এরই মধ্যে এক রবিবার, স্কুলে যাবার তাড়া ছিল না বিনুর, দুপুরবেলা খাওয়াদাওয়ার পর রোদ পোয়াচ্ছিল। কোথায় যেন খেজুর গুড় জ্বাল দেওয়া হচ্ছে। বাতাসে তার সুগন্ধ ভেসে আসছে। হঠাৎ যুগল এসে সামনে দাঁড়াল, 'কী করতে আছেন ছুটোবাবু?'

বিনু বলল, 'এই তো বসে আছি।'

'শুদাশুদি বইসা থাইকা কী করবেন? চলেন চকে যাই। এই সময় চকে সুন্দি কাউঠা বাইর হয়। খাইতে যা লাগে ছুটোবাবু, কী কমু! য্যামন সোয়াদ, ত্যামন ত্যাল—'

বিনু লাফিয়ে উঠল, 'চল—'

কবেই ধান কাটা হয়ে গেছে। শীতের দুপুরে এখন মাঠ জুড়ে শূন্যতা। ফসল নেই, ধানগাছের গোড়াগুলো শুকিয়ে শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। যেদিকেই চোখ ফেরানো যায়, সব কিছু বর্ণহীন। ঠিক বর্ণহীন নয়, ধূসর। শীতের আদিগন্ত মাঠের ওপর অসীম বিষাদ ঘন হয়ে আছে।

মাথার ওপর ঝাঁকে ঝাঁকে চড়াই আর বুলবুলি উড়ছিল। মাঝে মাঝে তারা নীচে নেমে মাটিতে ঠোকর দেয়, কিন্তু বৃথাই। কেউ তাদের জন্য একদানা শস্যও ফেলে রেখে যায় নি।

একটা বুড়ো গোসাপ আলের ওপর দিয়ে পেট টেনে ধীর মন্থর গতিতে যাচ্ছিল। ধানকাটার সময় সাপটাকে এই মাঠে আরও অনেক বার দেখেছে বিনু। আজ কী হয়ে গেল, চট করে একটা মাটির ঢিল কুড়িয়ে নিল। ছুড়তে যাবে, যুগল হাতটা চেপে ধরল, 'করেন কী ছুটোবাবু, করেন কী? ও হইল এই চকের দ্যাবতা, অরে মারলে সব্বনাশ হইয়া যাইব।'

ঢিলটা আস্তে আস্তে ফেলে দিয়ে বিনু শুধলো, 'কী সর্বনাশ হবে?'

'জমিনে আর ফসল ফলব না। এইহানকার মাইনষেরে জিগাইয়া দেইখেন।'

মানুষের বিশ্বাসের ওপর কথা নেই। বিনু আর কিছু বলল না। গোসাপটাকে ডান দিকে রেখে তারা এগিয়ে চলল।

আরও কিছুদূর যাবার পর সেই লোকটাকে দেখতে পেল বিনু, নাম যার তালেব। সেদিন ল্যান্ড রেজিস্ট্রি অফিসে একে প্রথম দেখেছিল সে।

এখন, শীতশেষের এই ফাঁকা মাঠে খুব মনোযোগ দিয়ে ইঁদুরের গর্তে কাঠি ঢুকিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে তালেব ধান বার করছে। সেদিন হেমনাথ বলেছিলেন, এইভাবেই নাকি লোকটা মাস তিনেকের মতো পেটের দানা জোগাড় করে।

দূরে দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ তালেবকে দেখল বিনুরা। তারপর আবার হাঁটতে শুরু করল। তালেব তাদের দেখতে পায় নি।

তারপর সারা দুপুর খোঁজাখুঁজি করে মোটে তিনটে ছোট ছোট সুন্দি কচ্ছপ পাওয়া গেল। তাদের পা বেঁধে ঝুলিয়ে বাড়ির দিকে ফিরতে ফিরতে যুগল বলল, 'একহান কথা ছুটোবাবু—'

'কী কথা?' বিনু জানতে চাইল।

আনন্দ-লজ্জা-সঙ্কোচ সব মিলিয়ে যুগলের মুখের ওপর দিয়ে পর পর অনেকগুলো ঢেউ খেলে গেল। তারপর খুব আস্তে করে সে বলল, 'কাইল গোপাল দাস আসব।'

'কে বললে?'

'পরশু লোক পাঠাইছিল।'

'আমি তো দেখি নি।'

'আপনে তহন ইস্কুলে—'

সত্যি সত্যি পরের দিন, ভাটির দেশ থেকে পাখির বাপ গোপাল দাস আর যুগলের সেই বোনাই ধনঞ্জয় এসে হাজির। প্রথমে তারা পণের আট কুড়ি টাকা গুনে গুনে নিল, তারপর বিয়ের দিন ঠিক করল। মাঘ মাসের চব্বিশ তারিখে বিয়ে। এও স্থির হল, বিয়ে করতে অতদূরে ভাটির দেশে যেতে হবে না। মেয়ে নিয়ে একেবারে ধনঞ্জয়ের বাড়িতে চলে আসবে গোপাল দাস, সেখানেই শুভ কাজ সারা হবে।

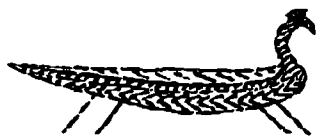

যুগলের বিয়ে নিয়ে বিরাট কাণ্ড করে বসলেন হেমনাথ। রাজদিয়ার হেন বাড়ি নেই, হেন মানুষ নেই, যাদের নেমতন্ন করা হল না। দেখেশুনে কে বলবে, যুগল হেমনাথদের বাড়ির কামলা।

কেউ কেউ বলল, 'কামলার বিয়ায় অত ঘটা ক্যান?'

হেমনাথ বললেন, 'যুগলকে তো আমি কামলা ভাবি না, ও আমার বাড়ির ছেলে। তা ছাড়া, আমাদের বাড়িতে বহুকাল শুভ কাজ হয় না। বিয়েটা উপলক্ষ করে ঘটা না হয় করলামই।'

বিয়ের আগের দিন থেকেই নিমন্ত্রিতদের আনাগোনা শুরু হল। বরণকুলো সাজিয়ে জনা কুড়ি এয়ো জুটিয়ে অধিবাসের গান শুরু করে দিলেন স্নেহলতা ঃ

'আইজ রামের অধিবাস কাইল রামের
বিয়া গো কমলা,
আমরা জল ভরিতে যাই,
সই আমরা জলে যাই।
তোমার রামের অধিবাসের
রানী সময় গেল।
গা তোল কৌশল্যা রানী
নিশি পরভাত হইল।
তোমরা সখি আন গো হলুদ, আন গো
হলুদ সকলে।
আমার রামেরে সিনান করাও
অতি সকালে।'

একটু থেমে আবার শুরু হয় ঃ

'বরণকুলা আনো সখি, বরণকুলা আনো

pathagar.net

আমরা শ্যামের ঘাটে যাই।
আমরা জল সইতে যাই।
ঘিয়ের প্রদীপ জ্বালাও সখি,
ঘিয়ের প্রদীপ জ্বালাও।
ধান দিয়া, দূর্বা দিয়া, রামের ওই
বরণডালা সাজাও।
আমরা জল সইতে যাই।
আমরা ফুল তুলতে যাই।'

এয়োদের মধ্যে যারা স্নেহলতার সমবয়সিনী তারা বলে, 'পরের পুতের লেইগা এই! নিজে তো বিয়াইলেন না দিদি, বিয়াইলে না জানি কী করতেন!'

স্নেহলতার ছেলেমেয়ে নেই। নিমেষে তাঁর মুখে বিষাদের ছায়া পড়ে। পরক্ষণেই স্নিগ্ধ হাসিতে ঝলমলিয়ে ওঠেন, 'না বিয়োলে বুঝি ছেলে হয় না? রাজদিয়া জুড়ে এত ছেলেমেয়ে তবে কার?'

'হেয়া ঠিক, হেয়া ঠিক—'

পরের দিন বিকেলবেলা বরযাত্রী আর বরকে নিয়ে রওনা হলেন হেমনাথ। বরযাত্রীদের ভেতর সুধা সুনীতি বিনু ঝিনুকও রয়েছে।

বিয়ে উপলক্ষে যুগলের বাপ-মা-বোন এসেছে তাদের বাড়ি থেকে। বাপ ভাইরা বরযাত্রীদের সঙ্গে ধনঞ্জয়ের বাড়ি চলেছে। মা আর বোন থেকে গেছে হেমনাথের বাড়ি।

বর্ষাকাল হলে ডুবন্ত মাঠের ওপর দিয়ে নৌকোয় যাওয়া যেত। কিন্তু এই শীতে জল সরে গিয়ে ডাঙা জেগেছে, ডাঙার ওপর দিয়ে তো নৌকো চলে না, তাই হেঁটেই চলেছেন হেমনাথরা।

রাজদিয়া থেকে ধনঞ্জয়ের বাড়ি মাইল দুয়েকের রাস্তা। কোনাকুনি মাঠ পাড়ি দিলে কতক্ষণ আর লাগবে।

যেতে যেতে কৃষাণ গ্রাম চোখে পড়ে। কৌতূহলী কেউ কেউ চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে শুধোয়, 'কিয়ের মিছিল?'

বরযাত্রীদের ভেতর থেকে কে যেন উত্তর দেয়, 'বিয়ার—'

'কার বিয়া?'

'হ্যামকত্তার বাড়ির যুগইলার।'

'আমরা যামু?'

'আসো।'

নানা গ্রাম থেকে দু'জন চারজন করে জুটে বিরাট এক জনতা তৈরি হল। তারা বরযাত্রীদের পিছু পিছু চলতে লাগল।

সন্ধের কিছু পরে বিনুরা ধনঞ্জয়ের বাড়ি পৌঁছে গেল।

এ বাড়ি বিনুর অচেনা নয়। আশ্বিন মাসে সুজনগঞ্জের হাটে যাবার পথে যুগলের সঙ্গে এখানে এসেছিল সে।

তখন চারদিকে জল থইথই করছে। আশ্বিনের মাঠঘাট, ধানের খেত, শাপলাবন, মুত্রাবন—সব কিছু ভেসে গিয়ে একখানা সমুদ্র হয়ে গিয়েছিল যেন। ধনঞ্জয়ের বাড়িটা তার ওপর দ্বীপের মতো মাথা তুলে ছিল।

এত জল যে ঘরের উঠোন পর্যন্ত চলে এসেছিল। এক ঘর থেকে আরেক ঘরে যাবার জন্য উঠোনের ওপর দিয়ে সাঁকো দেখেছে বিনু। তার ওপর বসে ধনঞ্জয়ের কালো কালো আধ-ন্যাংটো ছেলেদের ভাতের টোপ দিয়ে পুঁটি এবং বাঁশপাতা মাছ ধরতে দেখেছে।

এখন, এই মাঘের শেষে জল নেই কিন্তু উঠোনের সাঁকোগুলো আছে। সারা বছরই বোধ হয় ওগুলো থাকে। থাকবারই কথা। এদেশে শুকনোর মাস আর ক'টা? পৌষ মাঘ থেকে বৈশাখ পর্যন্ত। জষ্ঠির মাঝামাঝি মাঠঘাট ভাসিয়ে নতুন বর্ষার জল এসে পড়ে। তারপর থেকে অঘ্রান পর্যন্ত চারদিকে শুধু জল আর জল—অথৈ, অপার জলরাশি। কাজেই সাঁকো তুলে ফেলে কী লাভ? ক'মাস পরেই

তো আবার বসাতে হবে। ধনঞ্জয় অতখানি পরিশ্রম করতে বুঝি রাজি নয়।

আজ বাড়িটার চেহারাই গেছে বদলে। হাজার হোক বিয়ে বাড়ি। বউ-ঝি, আত্মীয়-কুটুম, নাইওরি-ঝিওরিতে বোঝাই।

উঠোনের চার কোণে চারটে এবং মাঝখানে একটা, মোট পাঁচটা হ্যাজাক জ্বলছে। উত্তরের ঘরের ঢালা বারান্দায় ধবধবে ফরাস পাতা। মনে হল, ওটাই বর এবং বরযাত্রীদের বসবার জায়গা।

বিনুরা পৌঁছুবার সঙ্গে সঙ্গে সাড়া পড়ে গেল।

'আইছে রে, আইছে। বরযাত্তররা আইসা পড়ছে।'

'বইতে দে, বইতে দে—'

'সিগ্রেট কই, পান তামুক বাইর কর—'

হঠাৎ কে চেঁচিয়ে উঠল, 'বর আইছে, জোকার (উলু) দে ছেমরিরা—'

তক্ষুনি ভেতর বাড়ি থেকে ঝাঁক ঝাঁক উলুর সুমিষ্ট চিকন শব্দ ভেসে আসতে লাগল।

আরেকজন কে যেন ব্যস্তভাবে বলল, 'ঢাকীগুলা গ্যাল কই? বাদ্যি বাজা—'

বলার শুধু অপেক্ষা। তারপরেই পাঁচ ছ'টা ঢাকী উঠোনে লাফ দিয়ে পড়ল। জল-বাংলার এই সুদূর গ্রামের ভেতর ইংরেজি-বাজনা কোথায় পাওয়া যাবে? তাই হয়তো ঢাকীদের ডাকা হয়েছে।

নিমেষে ঢাকের শব্দে বিয়েবাড়ি সরগরম হয়ে উঠল এবং বিনুদের কানে তালা লেগে যেতে লাগল।

এরই ভেতর গোপাল দাস, ধনঞ্জয় এবং ক'টি বৃদ্ধ এগিয়ে এল।

গোপাল দাস আর ধনঞ্জয়কে আজ চেনাই যাচ্ছে না। মুখ পরিষ্কার করে কামানো। দু'জনেই মাথায় প্রচুর তেল ঢেলেছে, ফলে চুলগুলো চপচপে। জুলপি ঘাড় এবং কপাল বেয়ে সেই তেল গড়িয়ে আসছে। পরনে ক্ষারে-কাচা ধুতি আর হার্ফ শার্ট, তার ওপর শস্তা পশমি চাদর। কন্যাপক্ষের কর্তা ওরাই, সাজগোজের একটু বাহার তো থাকবেই।

গোপাল দাসরা হাতজোড় করে বলল, 'আসেন আসেন—' উত্তরের ঘরের ঢালা ফরাসে বিনুদের নিয়ে এল তারা।

যুগলকে মাঝখানে বসিয়ে হেমনাথরা চারধারে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আরাম করে বসলেন।

তৎক্ষণাৎ সিগারেট এল, পান-তামাক এল।

হেমনাথের কোনও নেশা নেই। অন্য বরযাত্রী যারা এসেছে সবাই তাঁকে মানে, শ্রদ্ধা করে। তাঁর সামনে বসে সিগারেট বা তামাক খাওয়ার কথা ভাবাই যায় না। নেশার সরঞ্জামগুলি বৃথাই ফরাসের ওপর পড়ে রইল।

যুগলের গা ঘেঁষে বসেছিল বিনু। তার কানের কাছে মুখ এনে চাপা নীচু গলায় যুগল ফিসফিস করল, 'বড়কত্তায় না থাকলে একহান সিগ্রেট খাইতাম। কতক্ষণ বিড়ি-টিড়ি খাই না, গলা খুচুর খুচুর করতে আছে।'

বিনু বলল, 'আড়ালে গিয়ে খেয়ে এস না—'

যুগল বলল, 'কী যে ক'ন ছুটোবাবু—'

বিনু অবাক, 'কী বলেছি!'

'আমি না এই বাড়ির জামাই হমু? আমার নি সিগ্রেট লইয়া আবডালে গিয়া খাওন মানায়! আমার এট্টা সোম্মান নাই?'

আস্তে আস্তে মাথা নাড়ল বিনু। এ দিকটা সে ভেবে দেখেনি। বলল, 'তাই তো।'

ওদিকে ঝাঁক ঝাঁক উলুধ্বনি আর আর ঢাকের আওয়াজ চলছেই। ঢাকীগুলো উঠোনময় নেচেকুঁদে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে বিপুল উৎসাহে বাজিয়ে যাচ্ছে।

কানে হাত চাপা দিয়ে হাসতে হাসতে হেমনাথ বললেন, 'হয়েছে হয়েছে। এবার ওদের একটু থামতে বল। কান ঝালাপালা হয়ে গেল।'

শশব্যস্ত গোপাল দাস ঢাকীদের বলল, 'হ্যামকত্তায় কইছে, বাদ্যি থামা ব্যাটারা, বাদ্যি থামা। কানের পোক (পোকা) না বাইর করলে আর হয় না!'

তক্ষুনি বাজনা থামল।

এধারে আরও একটা ব্যাপার ঘটেছে। বরযাত্রীদের দলে সুধা সুনীতিকে দেখে বিয়ে বাড়িতে

pathagar.net

খুবই চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। সাড়া পড়ে গেছে চারদিকে।

এদেশে বরযাত্রী হিসেবে মেয়েদের যাওয়ার রেওয়াজ নেই বললেই হয়। ফলে রীতিমতো ভিড় উত্তরের ঘরের দাওয়ার সামনে অনড় হয়ে আছে। দূর থেকে নানা বয়সের বউরা লম্বা লম্বা ঘোমটা অল্প একটু তুলে চকিতে সুধা সুনীতিকে দেখে নিচ্ছে এবং একজন আরেকজনকে ঠেলা দিয়ে চাপা গলায় ফিসফিস করছে, 'আউ আউ, মাইয়ামাইন্‌ষে নি বরযাত্তর আসে!'

আরেকজন বলল, 'আসে, আসে—'

'কই, আমরা তো যাই না।'

মুখ বাঁকিয়ে দ্বিতীয় জন বলল, 'কিসের লগে কিসের তুলুনা! চান্দের লগে প্যান্দের। আমরা হইলাম বগার ঘরের বগী, বেঙ্গার ঘরের বেঙ্গী। আর উনারা বাবুগো ঘরের মাইয়া।'

'হে কথাখান ঠিকই।'

'শুদা (শুধু) কি বাবুগো মাইয়া, কইলকাত্তার মাইয়া। তেনাগো চালই ভিন্ন।'

'ঠিকই।'

'কইলকাতার মাইয়ারা ক্যামন ধলা, ফকফইকা—'

'মেমসাহেবগো লাখান—'

'মেমসাহেব বাপের জন্মে দেখছস?'

'দেখি নাই, তাগো পরস্তাব তো শুনছি—'

এই সময় গোপাল দাস, ধনঞ্জয় এবং কর্তাস্থানীয় জনকয়েক এসে বরযাত্রীদের কাছে জোড়হাত করে দাঁড়াল। বিশেষ করে হেমনাথের উদ্দেশে বলল, 'এইবার হুকুম করেন হ্যামকত্তা, বিয়ার জোগাড় হইয়া গ্যাছে, জামাই লইয়া যাই—'

হেমনাথ বললেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।'

যুগলকে নিয়ে গোপাল দাসরা ভেতর-বাড়ির দিকে চলল। বিনুরাও তাদের পেছন পেছন গেল।

আলপনা এঁকে এঁকে ভেতর-বাড়ির উঠোনটাকে চমৎকার সাজানো হয়েছে। মাঝখানে চিত্র-করা বড় বড় দু'টো পিঁড়ে, সে দু'টো বর-কনের আসন। এ ছাড়া আছে দু'পক্ষের পুরুত, কন্যাকর্তা, বরকর্তা এবং যে সম্প্রদান করবে তাদের সবার জন্য আসন।

যুগলকে নিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে শাঁখ বেজে উঠল, ঝাঁক ঝাঁক উলুধ্বনি শুরু হয়ে গেল। হেমনাথরা যাতে বসে বিয়ে দেখতে পারেন সেজন্য ক'খানা জলচৌকিও এসে গেল।

ঢাকীগুলো পুবের ঘরের দাওয়ায় বসে জিরোচ্ছিল। কে যেন চেঁচিয়ে উঠল, 'ব্যাটারা কি ঘুমাইয়া পড়লি নিকি? বাজা—বাজা—'

বলার শুধু অপেক্ষা। ঢাকীরা সঙ্গে সঙ্গে উঠোনে নেমে পড়ল। শাঁখ উলু এবং ঢাক, তিনে মিলে মুহূর্তে মাঘ মাসের রাত্তির সরগরম হয়ে উঠল।

এদিকে যুগল যে জামাকাপড় পরে এসেছিল সেগুলো বদলে মেয়ের বাড়ির নতুন পোশাক পরে নিল। তারপরেই ওদিকের কোনও একটা ঘর থেকে হাত ধরে মেয়েরা পাখিকে নিয়ে এল।

পাখিকে এর আগে মোটে একবারই দেখেছে বিনু, সেই আশ্বিন মাসে। স্বপ্নলোকের জলপরীর মতো সাঁতার কেটে কেটে যুগলের নৌকোয় এসেছিল সে।

আর আজ?

আজ চেনাই যাচ্ছে না পাখিকে। পরনে তার রাঙা পাটের শাড়ি আর লাল জামা, হাতে গোছা গোছা চুড়ি, গলায় মুড়কি হার, কানে ঝুমকো, আঙুলে চৌকো আংটি, নাকের পাটায় আগুনের ফুলকির মতো নাকছাবি। লজ্জায় মুখ তুলতে পারছে না পাখি। নতমুখিনী মেয়েটা যেন মর্তভূমির কেউ নয়, স্বর্গলোকের অপ্সরী।

ভিড়ের ভেতর দাঁড়িয়ে পলকহীন তাকিয়ে থাকল বিনু।

ঘন ঘন উলুধ্বনি, পুরুতের মন্ত্রপাঠ এবং শাঁখের আওয়াজের মধ্যে পাখি-যুগলের মালাবদল হয়ে গেল। তারপর শুভদৃষ্টি। দু'জনের মাথার উপর পাতলা একটা চাদরের ঘেরাটোপ দিয়ে কে যেন বলল, 'তাকা যুগইলা, নয়ন মেইলা পরানেশ্বরীরে দ্যাখ—'

যুগল বড় বড় ড্যাবডেবে চোখ মেলে তাকাল, কিন্তু পাখি আর মুখ তোলে না।

সবাই কত সাধ্যসাধনা করল কিন্তু পাখির চোখের পাতা যেন সীসের পাতের মতো ভারী হয়ে গেছে। কিছুতেই তা মেলতে পারছে না মেয়েটা।

কেউ যখন পারল না তখন টুনিকে এগিয়ে আসতে হল। যুগলের পিসতুতো বোন টুনি। টুনিকেও আজ চেনা যাচ্ছে না। আশ্বিন মাসে তার গা থেকে খই উড়তে দেখেছিল বিনু। লাউয়ের মতো লম্বা স্তন ধরে কোলের বাচ্চাগুলোকে ঝুলতে দেখেছিল। আজ সে লাল-পাড় নতুন শাড়ি পরেছে, নীল জামা পরেছে, গয়নাগাটি পরেছে, এমনকি পাতা কেটে পরিপাটি একখানি খোঁপাও বেঁধেছে। গোসাপের মতো খসখসে কর্কশ চামড়া আজ মসৃণ, তেলতেলে। কপালে নতুন পয়সার মতো মস্ত সিঁদুর টিপ, সিঁথিতে চওড়া করে সিঁদুরের টান। সম্পর্কে টুনি হল পাখির ননাস। (স্বামীর বড় বোনকে বলে ননাস)। সে বলল, 'আ লো, ছেমরি তো গেলি! মুখ তোল মাইয়া—'

পাখি তবু অবনতমুখী।

টুনি এবার ঠোঁটে ঠোঁট টিপে চোখ পাকিয়ে বলল, 'ও মাইয়া, অহন তোমার এত শরম! ধরুম একবার কিষ্ণবুলি (কৃষ্ণবুলি), ধরুম? ধরি? ভাদাই আশ্বিন মাসে আমার খালাসের সোময় যহন এইহানে আছিলি তহন রোজ আইত যুগইলা। তহন কী করতি দুই জনে? কই—সভার মইদ্যে হেই কথাহান কই—'

টুনির কথা শেষ হবার আগেই টুক করে একবার যুগলের চোখের দিকে তাকিয়ে মুখ নামাল পাখি।

বিয়ের পর বর কনেকে নিয়ে যাওয়া হল বাসর ঘরে। সেখানে ঘিয়ের প্রদীপ জেলে এক গলা ঘোমটার তলা থেকে প্রথমে পাখির মা মেয়ে-জামাইর মুখ দেখল। মুখটুখ দেখা হলে বরণকুলো ঠেকিয়ে ধান্দূর্বা দিয়ে আশীর্বাদ করল। পাখির মায়ের পর একে একে অন্য এয়োরাও বরকনেকে আশীর্বাদ করল।

তারপর শুরু হল চালখেলা। পেতলের সরাভর্তি চাল এনে এয়োরা পাখিকে বলল, 'ছড়াইয়া দে—'

পাখি প্রথমটা কিছুতেই ছড়াবে না। অনেক পীড়াপীড়ির পর সরা থেকে চালগুলো ঢেলে অল্প একটু ছড়িয়ে দিল।

এয়োদের ভেতর থেকে কে যেন বলে উঠল, 'ও মা, বিয়া হইতে না-হইতেই সোয়ামীর উপুর অ্যাত টান! ভালা কইরা আউলাইয়া (ছড়িয়ে) দে—' বলে নিজেই পাখির একখানা হাত ধরে চালগুলো যতদূর পারল ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিল। পরে যুগলকে বলল, 'এইবার চাউলগুলান গুছাইয়া একহানে কর।'

বাধ্য ছেলের মতো চালগুলো এক জায়গায় জড়ো করে যুগল। আবার সেগুলো ছড়িয়ে দিল পাখি, ফের এক জায়গায় করল যুগল। এইভাবে বারকয়েক খেলা চলল।

কৌতুকমুখী এয়োর দল বলল, 'মনে রাইখো জামাই, আমাগো মাইয়া এই রকম আউল ঝাউল করব আর তুমি মানাইয়া গুছাইয়া নিবা। বুঝলা?'

উত্তর না দিয়ে যুগল হাসল।

চালখেলার পর জলখেলা।

মস্ত একখানা পাথরের থালা জলে ভর্তি করে আনা হল। একজন এয়ো আঙুল দিয়ে অনেকক্ষণ ধরে জল ঘোরাতে লাগল। জল যখন ঘূর্ণির মতো ঘুরছে সেই সময় বর আর কনের টোপর থেকে দু'টো শোলার টুকরো ছিঁড়ে তাতে ফেলে দেওয়া হল। কখনও দেখা গেল পাখির শোলাটা আগে যাচ্ছে, যুগলেরটা তার পিছু নিয়েছে। অমনি এয়োদের মধ্যে সাড়া পড়ে যাচ্ছে।

'জামাই আমাগো বউ-অন্ত পরান। দ্যাখ ক্যামন মাইয়ার পিছন পিছন লৌড়াইতে আছে। মাইয়া আমাগো সুখে থাকব।'

আবার যখন ঘূর্ণিতে পড়ে যুগলের শোলাটা আগে আগে যায়, পাখিরটা তাকে অনুসরণ করে তখন এয়োরা বলাবালি কের, 'দেখিস, মাইয়া জামাই ছাড়া আর কিছু চিনব না। জামাইর পিছে

pathagar.net

ঘুরতে ঘুরতে পিথীমির হগল ভুলব।'

একজন বর্ষীয়সী ওধার থেকে বলে ওঠে, 'ভুলুক, তভু সুখে থাউক অরা।'

ঘুরতে ঘুরতে ঘূর্ণির ভেতর শোলার টুকরো দু'টো যখন এক হয়ে যায় তখন খেলা শেষ। চালখেলার মতো বারকয়েক জলখেলাও চলল।

বিনুরা বাসরে চলে এসেছিল। নানা খেলার ফাঁকে হঠাৎ তাকে দেখতে পেল যুগল। বলল, 'ছুটোবাবু কতক্ষণ?'

বিনু বলল 'অনেকক্ষণ এসেছি।'

'খাওন দাওন হইছে?'

'না।'

একটু ভেবে যুগল এবার বলল, 'একহান কথা রাখবেন ছুটোবাবু?'

'কী?' বিনু জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল।

'আইজের রাইতহান এইহানে থাইকা যান। কাইল বিকালে আমার লগে বাড়িত্ যাইয়েন।'

'এখানে থেকে কী হবে?'

'বাসর ঘরে কুনোদিন রাইত কাটাইছেন?'

'না।'

'তয় তো আপনেরে আটকাইতেই হইব।' বলতে বলতে মুখটা বিনুর কানের কাছে আরও ঘন করে আনল যুগল। গলার স্বর অতলে নামাল, 'বাসর ঘরে জবর মজা ছুটোবাবু, জবর মজা। দেইখেন রসের মেলা বইব।'

বিনু উত্তর দিল না।

একটু ভেবে যুগল আবার বলল, 'আমার লাখান আপনেরেও একদিন বাসর ঘরে যাইতে হইব। হগল দেইখা-শুইনা-বুইঝা ল'ন। পরে কামে দিব।'

'কিন্তু—'

'আবার কী হইল?'

'দাদু আর বাবা কি আমাকে থাকতে দেবে?'

'কইয়া দ্যাখেন না একবার। আপনে থাকলে আমার বড় ভালা লাগব।'

'আচ্ছা বলব।'

একসময় খাবার ডাক পড়ল।

উত্তরের ভিটির প্রকাণ্ড ঘরখানায় বরযাত্রীদের আসন পড়েছে। বিনুরা গিয়ে সারি সারি বসে পড়ল।

গোপাল দাস মেয়ের জন্য আট কুড়ি টাকা পণ যেমন নিয়েছে, খরচও করেছে তেমনি দু'হাতে। খাওয়ার ব্যবস্থা প্রায় রাজসিক।

এই ডলবাংলায় লুচি-টুচির তেমন চল নেই। ভাতের রেওয়াজ। কলার পাতায় জুঁই ফুলের মতো ধবধবে পানকাইজ চালের গরম ভাত, এখনও ধোঁয়া উড়ছে। সর-বাটা গাওয়া ঘি, আলু ভাজা, বেগুন ভাজা, কপির বড়া, মুগের ডাল, রুই-চিতল-ইলিশ-টাইন—চার রকমের মাছ, চাটনি, পায়েস এবং রসগোল্লা।

যতক্ষণ খাওয়া চলল, এক ধারে গলবস্ত্র হয়ে হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে থাকল গোপাল দাস। আর ধনঞ্জয় হাঁক ডাক করে পরিবেশন করাতে লাগল। 'এই পাতে চিতল মাছের কোল দাও, উই পাতে মিষ্টান্ন দাও, হেই পাতে রসগুল্লা দাও—'

খেতে খেতে হেমনাথ বললেন, 'খুব খাইয়েছ গোপাল—'

ঘাড়খানা একধারে হেলিয়ে বিনীত সুরে গোপল দাস বলল, 'খুব খাওয়ামু, আমার সাইদ্য কী?'

'না না, চমৎকার আয়োজন হয়েছে।'

'আপনেগো লাখান মানুষ আমার বাড়ির কিয়া-কম্মে পাত পাতছেন, এইতেই ভাগ্যি। কী আনন্দ যে পাইছি হ্যামকত্তা, মুখে কইয়া বুঝাইতে পারুম না। দিন যদিন ত্যামন থাকত, পরান ভইরা

খাওয়াইতাম—'

খাওয়াবার কথায় দেশ কালের কথা এসে পড়ল। কী দিন ছিল আর কী দিন এল! এখন জিনিসপত্র আক্রা, হাত ছোঁয়ানো যায় না, এমন আগুন দর। আগের দিন থাকলে গোপাল দাস তিন দিন আগে বরযাত্রীদের নিয়ে আসত, খাওয়ানো কাকে বলে দেখিয়ে দিত, সবই অদৃষ্ট, ইত্যাদি ইত্যাদি।

বরযাত্রীদের ভেতর থেকে একজন বর্ষীয়ান লোক জানাল, আগেকার দিনে বরযাত্রীদের বিয়ের চার পাঁচ দিন আগে মেয়ের বাড়ি যাবার রেওয়াজ ছিল। বরিশাল-ফরিদপুর-কুমিল্লা, এই জলের দেশের নানা জায়গায় সে এভাবে নেমন্তন্ন খেয়ে বেড়িয়েছে। তা সে রামও নেই, সে অযোধ্যাও না।

খাওয়া দাওয়ার পর হেমনাথরা বাড়ি ফিরবেন, হঠাৎ বিনু বলে উঠল, 'আমি যাব না।'

অবনীমোহন বললেন, 'যাবি না তো থাকবি কোথায়?'

যুগল বোধ হয় তাকে তাকে ছিল। বাসর ঘর থেকে চট করে বেরিয়ে এসে বলল, 'আমার কাছে থাকব। কাইল আমি লইয়া যামু—'

অবনীমোহন আপত্তি করতে যাচ্ছিলেন। যুগলের মুখচোখ দেখে হেমনাথের মায়া হয়ে থাকবে। তিনি বললেন, 'আচ্ছা থাক, একটা দিন আমোদ-আহ্লাদ করুক।' বলে যুগলের দিকে ফিরে একটু ঠাট্টাও করলেন, 'তুই আবার অপ্সরীদের মধ্যে গিয়ে মুণ্ডু ঘুরিয়ে বসে থাকিস না, আমার দাদাভাইটাকে একটু দেখিস।'

রাত্রিবেলা বাসর ঘরে মজা বেশ ভালই জমল যুবতী **মেয়ে সরু চিকন গলায় গাইল ঃ**

'এক দিন শ্যাম নীল জলে,
রাধা বদন হেরব বলে
ধীরে ধীরে চলে শ্যাম রায়।
গিয়ে যুমনার কদম্বমূলে,
দাঁড়াইল কুতূহলে
কুটিলা তাই দেখিবারে পায়।
কুটিলা কয় শোন লো বউ
জল আনিতে যাইস না লো কেউ
ব্রজের যত আছে ব্রজাঙ্গনা।
কাল কুম্ভীর এল যমুনাতে,
দেখে এলাম স্বচক্ষেতে
তাই তো তোদের যেতে করি মানা।'

একটা মাজা-ভাঙা সধবা বুড়ি, সম্পর্কে যুগলের দিদিশাশুড়ি, পাকা চুলে তার সিঁদুর, কপালে সিঁদুর, কোমর দুলিয়ে দুলিয়ে রগড় করে করে নাচতে লাগল। ঘরভর্তি যত যুবতী, যত কিশোরী, যত প্রৌঢ়া হেসে একেবারে কুটিপাটি। এ ওর গায়ে ঢলে পড়তে পড়তে বলতে লাগল, 'ঠাউরমা য্যান কী! একহান সং—'

নাচগানের পর হঠাৎ ঘরভর্তি মেয়ের দল যুগলকে ছেড়ে বিনুকে নিয়ে পড়ল। একটি রঙ্গিণী স্বভাবের যুবতী চোখে চোখ রেখে বলল, 'অ বাবুগো পোলা, আপনের বিয়া হইচে?'

চোখ নামিয়ে বিনু আস্তে আস্তে মাথা নাড়ল।

গালে একটা করে হাত রেখে অন্য মেয়ের দল কলকল করে উঠল, 'আ লো, মা লো মা, অহন তরি বিয়াই করেন নাই! তয় করছেন কী?'

বিনু চুপ। তার মুখ লাল হয়ে উঠতে লাগল।

সেই যুবতীটি আবার বলল, 'বিয়া তো করেন নাই, এই দিকে জামাইর লগে বাসরে আইসা ঢুকছেন। বাসরের রীত কানুন জানেন?'

এবারও মাথা নেড়ে বিনু বুঝিয়ে দিল, জানে না।

pathagar.net

যুবতী বলল, 'দুইখান ধান্দা (ধাঁধা) জিগাই, জবাব দ্যান—'

এতক্ষণে বিনুর গলায় স্বর ফুটল, 'আমি ধাঁধা-টাঁদা জানি না। **বলতে পারব না।**'

'না কইলে হইব না। আইচ্ছা শোনেন ঃ

'রক্তে ডুবু ডুবু, কাজলের ফোটা
এক কথায় যে কইতে পারে
হ্যায় মজুমদারের ব্যাটা।'

এইবার ক'ন বস্তুখান কী?'

বিনু অনেকক্ষণ ভাবল। কিন্তু হাজার ভেবেও কিছুই বার করতে পারল না। বলল, 'জানি না।'

যুবতী বলল, 'আইচ্ছা আরেকখান জিগাই—

'ওপার থিকা আইল টিয়া
সোনার টুপর মাথায় দিয়া
যদি টিয়ায় মন করে
মাঠের মাটি চুর করে।'

বিনু এবারও পারল না।

হঠাৎ ভিড়ের ভেতর থেকে এক থুথুরে বুড়ি উঠে এসে বিনুর চিবুক ধরে নাড়তে নাড়তে বলল, 'একহান ধান্দারও জবাব দিতে পারলা না। তোমার শাস্তি হইব গোরাচান।'

অন্য মেয়েরা চেঁচামেচি জুড়ে দিল, 'কী শাস্তি, কী শাস্তি?'

বুড়ি বলল, 'আমারে বিয়া করতে হইব।'

সঙ্গে সঙ্গে ঘরময় হাসির রোল উঠল। আর বিনুর চোখ-মুখ-নাক-কান ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগল।

হাসি টাসি থামলে মেয়েরা আবার যুগল এবং পাখিকে নিয়ে মাতল। গোপাল দাসের বউ অর্থাৎ যুগলের শাশুড়িকে তারা ঠেলতে ঠেলতে বাসর ঘরের বাইরে বার করে দিল, 'তুমি হাউড়ি মানুষ, তুমি এইহানে ক্যান? আমরা জামাই লইয়া কত কী করুম অহন, কত নীলাখেলা! যাও, যাও—'

গোপাল দাসের বউ হাসতে হাসতে চলে গেল, 'যা ইচ্ছা তরা কর—'

'করুমই তো।'

মেয়েরা এবার পাখিকে জোর করে যুগলের কোলে বসিয়ে সমস্বরে গান ধরে ঃ

'শ্যামের কোলে রাইকিশোরী
এ রূপ দেখে মরি মরি—'

রাতের সঙ্গে সঙ্গে রঙ্গিণীদের মাতামাতি, কৌতুক এবং হাসিও পাল্লা দিয়ে বাড়তে লাগল।

পরের দিন বাসি বিয়ে হল, আংটি খেলা হল, কাদা খেলা হল। কাদায় কাদায় যুগল আর পাখিকে, এমনকি বিনুকেও ভূত বানিয়ে ছাড়ল মেয়েরা।

বিকেলবেলা বাড়ির সবাইকে কাঁদিয়ে যুগলের সঙ্গে পাখি শ্বশুরবাড়ি রওনা হল।

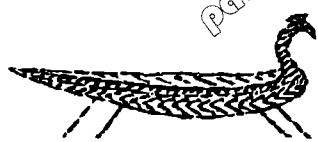

কাল হেমনাথ বলে গিয়েছিলেন, বেলা থাকতে থাকতে যেন যুগলরা বাড়ি চলে যায়। কিন্তু পৌঁছতে পৌঁছতে রাত হয়ে গেল।

শাঁখ বাজিয়ে, উলু দিয়ে বর কনেকে ঘরে নিয়ে তুললেন স্নেহলতা। সেই ঘরখানায়, যেটা যুগলের জন্য নতুন তোলা হয়েছিল।

ঘরের ভেতর ঢুকে বিনু অবাক হয়ে গেল। কাল বিকেল থেকে আজকের রাত, একটা দিনের কিছু বেশি সময় সে বাড়িতে ছিল না। এর ভেতর যুগলের ঘরখানা কি চমৎকার করেই না সাজিয়ে দিয়েছেন স্নেহলতা।

আজ কালরাত্রি। জামাই-মেয়ে এক ঘরে রাত কাটাবে না। বরণ টরণ এবং অন্য সব রীতি পালনের

পর পাখিকে নিয়ে ভেতর-বাড়িতে চলে গেলেন স্নেহলতা। রাত্তিরটা সেখানেই কাটাবে পাখি, আর যুগল একা এ ঘরে থাকবে।

আত্মীয়-কুটুম্ব, নাইওরি-ঝিওরি, সবাই নতুন বউর সঙ্গে ভেতর-বাড়ি চলে গেছে। নতুন ঘরে এখন শুধু যুগল আর বিনু।

যুগল ডাকল, 'ছুটোবাবু—'

'কী?'

'ঠাউরমা'র বিচারটা দেখলেন?'

'কিসের বিচার?'

'আপনেই ক'ন, বিয়ার পর বউ বিহনে রাইত কাটান যায়?'

বিনু ফস করে বলে ফেলল, 'একটা তো মোটে রাত। কাল থেকেই তো—'

ক্ষোভ এবং অভিমানের গলায় যুগল বলল, 'একটা রাইতও অহন একা একা ভালা লাগে না। একা না বোকা। আপনে অবিয়াত পোলা, আপনে এইর মম্ম বুঝবেন না।'

বিনু বিমূঢ়ের মতো তাকিয়ে থাকল।

রাত পোহালেই বউ-ভাত।

রাজদিয়ার হেন মানুষ নেই যাকে নেমন্তন্ন করেননি হেমনাথ। যুগীপাড়া-কুমোরপাড়া-তেলিপাড়া-বামুনপাড়া-কায়েতপাড়া, সমস্ত জায়গায় ঘুরে ঘুরে সবাইকে বলে এসেছেন। হেমনাথ বলেছেন পুরুষদের, স্নেহলতা বলে এসেছেন মেয়েদের। হেমনাথের সঙ্গে বিনুও ঘুরে ঘুরে নেমন্তন্ন করতে গেছে।

শুধু কি রাজদিয়ার বাসিন্দাদের, এই জল-বাংলায় যত চেনাজানা মানুষ আছে সবাইকে নেমন্তন্ন করে এসেছেন হেমনাথ। বহুকাল বাড়িতে কোনও উৎসব হয় নি, যুগলের বিয়েটা উপলক্ষ করে হেমনাথ আর স্নেহলতা প্রাণভরে সাধ মিটিয়ে নিচ্ছেন।

আজ সকাল থেকেই এ বাড়িতে মেলা বসে গেছে। কেতুগঞ্জ থেকে বাড়ির মেয়েদের নিয়ে এসেছে মজিদ মিঞা। সুজনগঞ্জ থেকে এসেছে নিত্য দাস, চন্দ্র ভুঁইমালী। কমলাঘাট থেকে এসেছে রমজান সাহেব, মালখানগর থেকে বৈকুণ্ঠ কুণ্ডু। তা ছাড়া এই রাজদিয়ার লারমোর, অধর সাহা, দ্বারিক দত্ত, রামকেশব, আশু দত্ত, হেডমাস্টার মোতাহার সাহেব—এঁরা তো আছেনই।

সন্ধের পর ডে-লাইট আর হ্যাজাকের আলোয় বাড়িটা যেন দিনের মতো হয়ে উঠল। তখন থেকে দলে দলে অন্য নিমন্ত্রিতেরা আসতে লাগল।

পুবের ভিটির বড় ঘরখানা সাজিয়ে গুছিয়ে সিংহাসনের মতো কারুকাজ-করা প্রকাণ্ড একটা চেয়ারে পাখিকে বসানো হয়েছে। সারা বিকেল ধরে সুধা সুনীতি তাকে সাজিয়েছে। স্নেহলতা লোহার সিন্দুক খুলে গয়নার বাক্স বার করে দিয়েছিলেন।

পাখির পরনে লাল টুকটুকে বেনারসী। মাথায় সোনার মুকুট, কপালের কাছে গোল টিকলি, ওপর হাতে আড়াই-পেঁচি অনন্ত, নীচের দিকে গোছা গোছা চুড়ি, গলায় সীতাহার। দু'হাতে কম করে ছ'টা আংটি, কোমরে সোনার বিছে, পায়ে তোড়া।

সব মিলিয়ে পাখিকে রাজেন্দ্রাণীর মতো দেখাচ্ছিল।

পুবের ঘরেই সব চাইতে বেশি ভিড়। বিনু আর ঝিনুকও ওই ঘরেই আছে। স্নেহলতা-সুধা-সুনীতি-সুরমা পাখিকে ঘিরে বসে আছেন।

একেকটা দল আসছে, পাখির হাতে উপহার তুলে দিচ্ছে। পাখির হাত ঘুরে সেগুলো যাচ্ছে সুধা সুনীতির কাছে। সুধারা সেগুলো একধারে সাজিয়ে নম্বর দিয়ে খাতায় লিখে রাখছে।

স্নেহলতা উপহারদাতাদের শুধোন, 'বউ কেমন দেখলে?'

উত্তর আসে, 'সোন্দর। কিবা রং, কিবা চৌখ, কিবা হাত-পায়ের গড়ন—'

'আমার বাড়িতে মানাবে, কি বল?'

'নিয়্যস—'

pathagar.net

উৎসবের ঘোর বুঝি ছোট্ট ঝিনুকের মনেও লেগেছে। ফিসফিস গলায় সে ডাকে, 'বিনুদাদা—'

মুখ ফিরিয়ে বিনু বলে, 'কী?'

'বিয়ে করতে বেশ লাগে, না?'

অন্যমনস্কের মতো বিনু জবাব দেয় 'হুঁ—'

উত্তরের ঘর, দক্ষিণের ঘর, পুবের ঘর, পশ্চিমের ঘর—সব জায়গায় নিমন্ত্রিতদের জন্য আসন পড়েছে। রাত একটু বাড়লে খাবার ডাক পড়ল।

নিমন্ত্রিতরা সবে বসতে শুরু করেছে, সেই সময় গোলগাল ঘটের মতো চেহারার একটি লোক এসে উঠোনে দাঁড়াল। ফর্সা টুকটুকে রং তার। পরনে হাঁটু পর্যন্ত খাটো ধুতি আর ফতুয়া। কাঁধে পাট-করা ময়লা চাদর, খালি পা।

উঠোনে পা দিয়েই সে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলল, 'অতিথ আইলাম হ্যামকত্তা—'

হেমনাথ আর লারমোর কাছেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। উদ্দেশ্য, নিমন্ত্রিতদের খাওয়াদাওয়া তদারক করা। তাঁদের পাশে বিনু। হেমনাথ প্রায় ছুটেই লোকটার কাছে চলে গেলেন। বললেন, 'এস—এস চক্কোত্তি, তোমার কথাই আজ সকাল থেকে মনে পড়ছিল। আমার বাড়িতে একটা শুভ কাজ হচ্ছে, অথচ তোমারই পাত্তা নেই।'

লোকটা এক গাল হাসল, 'আপনে নিচ্চিন্ত থাকেন হ্যামকত্তা। কুনো বাড়িতে কিয়াকম্ম হইলে আমি ঠিক ট্যার পইয়া যাই। আমারে ফাকি দ্যাওন সহজ না।'

লারমোর ওধার থেকে বলে উঠলেন, 'তা ঠিক। বিশ মাইল দূর থেকে তুমি লুচিভাজার গন্ধ পাও।'

লোকটা হাসতেই লাগল, 'তা যা কইছেন লালমোহন সায়েব।'

এদিকে লোকটাকে দেখে নিমন্ত্রিতদের মধ্যে সাড়া পড়ে গেছে। সবাই উৎসুক, চকচকে চোখে তার দিকে তাকিয়ে বলাবলি করছে, 'গদু চক্কোত্তি আইছে, গদু চক্কোত্তি আইছে। আইজ আসর জমব ভালা।'

লোকটার নাম জানা গেল—গদু চক্কোত্তি। এমন অদ্ভুত নাম আগে আর কখনও শোনেনি বিনু। তা ছাড়া, নিমন্ত্রিতদের তালিকায় গদু চক্কোত্তি ছিল না। যাদের যাদের নেমন্তন্ন করা হয়েছে তাদের বাড়িতে হেমনাথের সঙ্গে গিয়েছিল বিনু, গদু চক্কোত্তির বাড়ি সে যায় নি।

সে যাই হোক, দেখা যাচ্ছে, সবাই গদু চক্কোত্তিকে চেনে এবং সে আসতে সকলেই ভারি খুশি।

লারমোরের পাশ থেকে বিনু হঠাৎ বলে উঠল, 'লোকটা কে লালমোহন দাদু?'

লারমোর বললেন, 'গদু চক্কোত্তি—'

'নামটা তুমি বলবার আগেই শুনেছি। কিন্তু—'

বিনুর মনের কথাটা চট করে বুঝে নিলেন লারমোর। তারপর বললেন, 'নাম শুনলেই চলবে না, কেমন? কোথায় থাকে, কী তার পরিচয়, এ সবও জানতে হবে, তাই না? ওর বাড়ি হচ্ছে কাজির পাগলা বলে একটা গ্রামে। এখান থেকে মাইল দশেক পুবে। আর পরিচয়? সেটা একটু পরেই টের পাবি দাদাভাই। আমি আর মুখে কতটুকু বলতে পারব!'

বিনুর খুঁতখুঁতুনি তবু গেল না। সে বলল, 'কিন্তু—'

'আবার কী?'

'আমার যদ্দুর মনে আছে একে নেমন্তন্ন করা হয়নি।'

'ওকে নেমন্তন্ন করতে হয় না।'

বিমূঢ়ের মতো তাকিয়ে থাকল বিনু। বিনা নেমন্তন্নে কেউ এভাবে চলে আসতে পারে, তার কাছে এটা নিতান্তই অভাবনীয়।

লারমোর এবার যা বুঝিয়ে বললেন, সংক্ষেপে এইরকম। এই জল-বাংলায় যত গ্রাম-গঞ্জ আছে, সব জায়গায় গদু চক্কোত্তির অবাধ গতিবিধি। এ দেশের সবাই তাকে চেনে। বিয়ে-অন্নপ্রাশন-পৈতা—

pathagar.net

যেখানে উৎসবের ব্যাপার থাকে, খাওয়াদাওয়ার ব্যাপার থাকে, গন্ধ শুঁকে শুঁকে গদু চক্কোত্তি ঠিক হাজির হবেই। এই জলের দেশে খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারে সে অশ্বমেধের ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছে। ভালমন্দ খাওয়া ছাড়া তার আর কোনও কাজ নেই। তার কাছে বেঁচে থাকার একটিই মাত্র উদ্দেশ্য, তা হল খাওয়া। এক ভোজবাড়ি থেকে আরেক ভোজবাড়ি, সারা জীবন এইভাবে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে গদু চক্কোত্তি। এই প্রাচুর্যের দেশে সে রবাহূত হয়ে এলেও কেউ অসন্তুষ্ট হয় না, বরং যথেষ্ট সমাদর করেই তাকে গ্রহণ করা হয়।

যত শুনছিল ততই অবাক হয়ে যাচ্ছিল বিনু।

এদিকে হেমনাথ গদু চক্কোত্তিকে বলছিলেন, 'কি চক্কোত্তি, এখনই খেতে বসবে, না নতুন বউ দেখে, পরে—'

তাঁর কথা শেষ হবার আগেই গদু চক্কোত্তি বলে উঠল, 'পাত যহন পইড়াই গ্যাছে তহন বইসাই পড়ি। পরে বউ দেখুম।'

এখানেই হাত-পা ধোয়ার জল আনিয়ে দিলেন হেমনাথ। হাত-মুখ ধুয়ে একটা আসনে বসতে বসতে নিমন্ত্রিতদের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিল গদু চক্কোত্তি। তাচ্ছিল্যের সুরে বলল, 'একজনেরও খাওইয়ার লাখান চেহারা না। এগো তো সব বগের আধার (এরা বকের মতো সামান্য খায়)। এগো লগে খাইতে বইসা সুখ নাই, নিজেরই লজ্জা। পাল্লাদার না হইলে আসর জমে না।' বলতে বলতে কী মনে পড়তে চোখমুখ আলো হয়ে উঠল তার, 'ভালা কথা, আপনেগো এইহানে বুধাই পালের ভাই হাচাই পাল তো মন্দ খাওইয়া না। হেরে (তাকে) খবর দ্যান হ্যামকত্তা—'

হাচাই পালের নেমন্তন্ন হয়েছিল। খোঁজ নিয়ে জানা গেল, সে এখনও আসেনি। তক্ষুনি লোক পাঠিয়ে কুমোরপাড়া থেকে তাকে ধরে আনা হল। সব শুনে হাতজোড় করে হাচাই পাল বলল, 'আমি কি চক্কোত্তি ঠাউরের লগে পাল্লা দিতে পারুম?'

গদু চক্কোত্তি হাচাই পালের এই বিনয়ে খুবই সন্তুষ্ট। মুরুব্বিয়ানার সুরে বলল, 'তুমি ক্যান, এই ঢাকার জিলায় কুনো সুমুন্দি নাই আমার লগে পাল্লা দ্যায়। তয় কিনা, একজন ভালা খাওইয়া কাছে বইলে খাইতে আইট হয়।'

অগত্যা হাচাই পালকে তার মুখোমুখি বসতে হল।

হেমনাথ চেঁচিয়ে উঠলেন, 'ও রে লুচি দে, লুচি দে—'

গদু চক্কোত্তি খায় আর গল্প করে। কোথায় কোন রাজবাড়িতে দশ সের দই খেয়ে তাক লাগিয়ে দিয়েছিল, কোথায় শুধু তিন কড়াই মুগের ডাল খেয়েছিল, কোথায় বড় বড় খাইয়েরা পাল্লা দিতে এসে তার কাছে হেরে ভূত হয়ে গেছে, ইত্যাদি ইত্যাদি অসংখ্য দিগ্বিজয়ের কাহিনী বলে যেতে লাগল।

গদু চক্কোত্তির খাওয়া সত্যিই দর্শনীয়। নিমন্ত্রিতরা খাবে কি, হাঁ করে তাকিয়ে আছে। শুধু কি তাই, বাড়ির ভেতর থেকে মেয়েরা পর্যন্ত বেরিয়ে এসে তার খাওয়া দেখছে। এর মধ্যেই বিনু টের পেয়ে গেছে, খাইয়ে হিসেবে এ অঞ্চলে গদু চক্কোত্তির বিপুল খ্যাতি, অসীম প্রতিষ্ঠা।

হাচাই পাল মোটামুটি ভালই পাল্লা দিয়ে যাচ্ছে। গদু চক্কোত্তি শুধু বেগুনভাজা দিয়ে কুড়িখানা লুচি খেল, হাচাই পালও তাই খেল। ফুলকপির তারকারি দিয়ে গদু চক্কোত্তি খেল চল্লিশখানা লুচি, হাচাই পালও চল্লিশখানাই খেল। তবে লক্ষ করা গেল, তার চোখমুখ যেন কেমন কেমন। পেটটা সামনের দিকে অনেকখানি এগিয়ে গেছে, পিঠটা পেছনে হেলে যাচ্ছে।

কপির পর এল মাছ। পঞ্চাশ টুকরো মাছ আর বত্রিশখানা লুচি অদৃশ্য করে দেবার পর হাচাই পালের চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসছে। পেছন দিকে আরও হেলে পড়েছে সে। হঠাৎ দুই হাতজোড় করে সে লম্বা হয়ে পড়ল। বিড়বিড় করে বলল, 'আমারে ক্ষ্যামা করেন চক্কোত্তি কত্তা, আপনের লগে পাল্লা দ্যাওন আমার কাম না। হুকুম করেন, আমি যাই।' বলে দু'জনের কাঁধে ভর দিয়ে বাড়ি চলে গেল।

হাচাই পাল চলে গেলে কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইল গদু চক্কোত্তি। তারপর বিমর্ষ মুখে বলল, 'এই হগল মানুষ ক্যান যে আসরে আইসা বসে! খাওনটাই মাটি।' বলে আবার খেতে শুরু করল।

একটা ব্যাপার লক্ষ করেছিল বিনু। গদু চক্কোত্তির কোমরের কষিটা বুকের কাছে বাঁধা। খাচ্ছিল আর খানিকটা পর পরই হ্যাঁচকা টানে সেটা নীচের দিকে নামাচ্ছিল সে।

অবাক বিস্ময়ে বিনু লরামোরকে জিজ্ঞেস করল, 'ওইটুকু ওইটুকু করে কাপড়টা নামাচ্ছে কেন লালমোহনদাদু?'

লারমোর হাসতে হাসতে সকৌতুকে বললেন, 'পেটের যেটুকু যেটুকু ফিল-আপ হচ্ছে, কাপড়টা সেইটুকু সেইটুকু নামাচ্ছে। তারপর নাইকুণ্ডুল থেকে যখন এক ইঞ্চি ওই কষি নামাবে তখন খাওয়া শেষ।'

নাভির তলায় কাপড় নামাতে পরিবেশনকারীদের যে কতবার ছোটাছুটি করতে হল তার আর হিসেব নেই।

খাওয়া দাওয়ার পর ট্যাঁক থেকে একটা দোয়ানি বার করে পাখিকে আশীর্বাদ করল গদু চক্কোত্তি। তারপর হেমনাথকে বলল, 'অহন যাই হ্যামকত্তা।'

হেমনাথ বললেন, 'এত রাতে কোথায় যাবে?'

'নবীগুঞ্জের 'গয়নার নাও' ধরুম।'

'কাল সকালে গেলে হয় না?'

'উঁহু। কাইল সকালে উইহানে এক বাড়িতে পৈতা আছে। আইজই আমারে রওনা দিতে হইব।'

'তা হলে তো তোমাকে ছেড়ে দিতেই হয়।'

গদু চক্কোত্তি চলে গেল। যাবার আগে বিনুর মনে বিচিত্র বিস্ময়ের রেশ রেখে গেল।

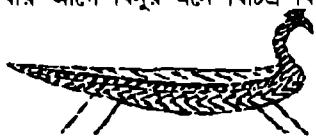

বউ-ভাতের দিন পাখিদের বাড়ির সবাই এসেছিল। তাদের নিয়ে এসেছিল গোপাল দাস আর ধনঞ্জয়। গোপাল দাস সেদিন কিছুতেই খায়নি। যতদিন না মেয়ের ছেলেপুলে হচ্ছে ততদিন তার শ্বশুরবাড়ির জলটুকুও ছোঁবে না।

বউ-ভাতের অনুষ্ঠান শেষ হলে গোপাল দাসরা চলে গিয়েছিল। যাবার আগে মেয়ে-জামাইকে দ্বিরাগমনে নেমন্তন্ন করে গেছে।

পাখিরা টুনিদের বাড়ি দ্বিরাগমনে যাবে না, যাবে ভাটির দেশে গোপাল দাসের বাড়ি।

গোপাল দাসদের নিয়ম অনুযায়ী বউ-ভাতের আড়াই দিন পর দ্বিরাগমনে যাবার কথা। যুগলদের রওনা হতে হতে পাঁচদিন কেটে গেল। এখন শুকনোর সময়। বাড়ি থেকে লারমোরের ফিটনে নদীর ঘাটে এসে কেরায়া নৌকোয় উঠল পাখিরা। তাদের বিদায় দেবার জন্য বাড়ির সবাই সঙ্গে এসেছিল।

নৌকো ছাড়ার মুখে স্নেহলতা বললেন, 'সাত দিনের মধ্যে ফিরে আসবি যুগল।'

যুগল মাথা নাড়ল, 'আইচ্ছা—'

'বেশিদিন কিন্তু শ্বশুরবাড়ি থাকতে নেই, বুঝলি?'

ঘাড় কাত করে যুগল জানাল, বুঝেছে।

স্নেহলতা আবার বললেন, 'বেশিদিন থাকলে নিন্দে হয়।'

সেই যে যুগল দ্বিরাগমনে গিয়েছিল তারপর আর কোনও খবর নেই। সাত দিনের ভেতর ফিরে আসার কথা। সাত দিনের জায়গায় পনের দিন গেল, পনের দিনের পর মাসও যায় যায়। না ফিরল যুগল, না এল পাখি।

সবাই অস্থির, চিন্তিত। হেমনাথ ঠিক করলেন, ভাটির দেশে গোপাল দাসের বাড়িতে লোক পাঠাবেন। লোক আর পাঠাতে হল না, তার আগেই যুগলের চিঠি এল। নিজে তো আর লেখাপড়া জানে না, অন্য কাউকে দিয়ে লিখে পাঠিয়েছে।

'শ্রীচরণকমলেষু,

প্রণাম অন্তে জানিবেন, আমরা মঙ্গলমতো পৌঁছিয়াছি। পত্র দিতে দেরি হইল বলিয়া মনে কিছু করিবেন না।

যাহা হউক, বর্তমান জানিবেন আমাদিগের আর রাজদিয়া ফিরত যাওয়া হইবে না। শ্বশুরমহাশয়ের পুত্রাদি নাই। তাঁহার ইচ্ছা আমি এইখানেই বসবাস করি।

এইখানে আমার থাকিবার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু কী করিব? শ্বশুরমহাশয়ের অনেকগুলি পুকুর। ইদানীং কয়েকটি বিলও তিনি ইজারা লইয়াছেন। বিল এবং পুকুরে প্রচুর মাছ। কই, বোয়াল, চিতল, মাগুর, কাজলি, বাতাসী, কালিবাউস, রুই, কাতল, ফলি, পাবদা ইত্যাদি। এত মাছ ফেলিয়া আমার রাজদিয়া ফিরিয়া যাইতে মন চায় না।

ঠাকুমা, আপনি এবং বাটিস্থ সকলে আবার প্রণাম নিবেন। ছোটবাবুকে বলিবেন আমার জন্য যেন মন খারাপ না করে।

আগতে আপনাদের কুশল দানে সুখী করিবেন। ইতি—

আপনার সেবক—যুগল।'

চিঠি পড়ে কিছুক্ষণ বিষণ্ণ মুখে বসে রইলেন হেমনাথ। স্নেহলতা কাঁদলেন। সত্যিই ছেলেটার ওপর বড় মায়া পড়ে গিয়েছিল তাঁদের।

যুগল না ফেরাতে সব চাইতে যার বেশি মন খারাপ হয়েছে সে বিনু। বুকের ভেতরটা সবসময় তার ভারী হয়ে থাকে।

যুগল তাকে হাতে ধরে জলে নামিয়েছে, সাঁতার শিখিয়েছে। নৌকো বাওয়ার, মাছমারার কৌশল আয়ত্ত করিয়েছে। হেমন্তের স্থির, নিস্তরঙ্গ জলে অলস কচ্ছপ এবং শীতের শূন্য মাঠে 'সুন্দি কাউঠ্যা'র আস্তানা চিনিয়েছে। এই জলের দেশের প্রতিটি বৃক্ষলতা, প্রতিটি পশুপাখি, প্রতিটি তৃণের নাম সে মুখস্ত করিয়েছে। এখানকার বিশাল নদী, বিরাট আকাশ আর সীমাহীন মাঠের মাঝখানে এক অপার অথৈ বিস্ময়ের ভেতর বার বার তাকে টেনে নিয়ে গিয়ে বিনুর চোখে নতুন রং ধরিয়ে দিয়েছে। একা একা মাঠেঘাটে ঘুরে বেড়াতে, জলের ভেতর মাছের খেলা দেখতে কিংবা গাছের ডালে মোহনচূড়া পাখিটার নাচানাচি লক্ষ করতে করতে যে আজকাল ভাল লাগে, সে ওই যুগলের জন্য। এই অসীম বিশ্বের বাধাবন্ধহীন ফসলের খেতে, আঁকাবাঁকা আলপথে, স্তূপের মতো সাজানো আকাশের মেঘগুলিতে কিংবা স্থির জলে নলঘাসের প্রতিবিম্বের মধ্যে যে এত আনন্দ ছড়ানো ছিল, এ খবর যুগলের আগে আর কেউ তাকে দেয়নি।

আপন অভিজ্ঞতার সবটুকু সার বিনুর হাতে তুলে দিয়ে চলে গেছে যুগল। তার জন্য তোলা সেই নতুন ঘরখানা তালা দিয়ে রেখেছেন স্নেহলতা। প্রায় রোজই তার কথা হয়। অনেক দিনের অনেক স্মৃতির কথা বলতে বলতে চোখ ঝাপসা হয়ে যায় স্নেহলতার। শুনতে শুনতে বিনুর মনে বিষাদ ঘন হতে থাকে।

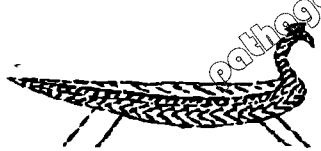

যুগল নেই। আজকাল বিনুর ছোটাছুটি ঘোরাঘুরি অনেক কমে গেছে। কাজ বলতে এখন শুধু পড়াশুনো, স্কুলে যাওয়া, ঝিনুকের সঙ্গে ঝগড়া, আর দু'চারদিন পর পর পোস্ট অফিসে গিয়ে সুনীতির চিঠির খোঁজ করা। আনন্দর চিঠি এলে বইয়ের ভেতর লুকিয়ে বাড়ি এসে সুনীতিকে দেয় বিনু, তার জন্য দু'আনা করে পয়সা পায়।

নিবারণ পিওন বলে, 'দাদুভাই, তুমি আইসা চিঠি নিয়া যাও। আমি গ্যালে একবেলা দুই মুঠা ভালামন্দ খাইতে পাইতাম।'

বিনু বলে, 'চিঠির সঙ্গে কী, আপনি এমনি গিয়ে খেয়ে আসবেন। আর এই চিঠির কথা কাউকে বলবেন না।'

হেসে হেসে নিবারণ বলে, 'হেয়া আমি জানি, ব্যাপারখান বড় গুপন (গোপন)।'

বিনু হাসে, কিছু বলে না। সুনীতির চিঠির ব্যাপারটা নিয়ে নিবারণের সঙ্গে অলিখিত একটা চুক্তি হয়ে গেছে তার।

মাঘের শেষাশেষি যুগল দ্বিরাগমনে গিয়েছিল। তারপর একে একে ফাল্গুন এল, চৈত্র এল। হেমনাথের বাগানে মান্দার গাছগুলো ফুলে ফুলে ছেয়ে গেল, শিমুলগাছের মাথায় থোকা থোকা আগুন জ্বলতে লাগল। জামরুল আর কালোজাম, রোয়াইল আর কাউগাছগুলো ফলের ভারে নুয়ে পড়ল। আমের গাছগুলোতে বোল এসেছিল মাঘের গোড়ায়, এখন গুটি ধরেছে। লক্ষ লক্ষ ফড়িং ফিনফিনে পাতলা ডানায় বাগানময় উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে। আর উড়ছে পাখি—শালিক, চড়ুই, বুনো টিয়া, বুলবুলি। দক্ষিণ দিক থেকে আজকাল ঝিরঝিরে স্নিগ্ধ হাওয়া বইতে থাকে।

এই ফুল-ফল-হাওয়া, এই পাখি পতঙ্গ, যুগল ছাড়া সব অর্থহীন, সবই বৃথা। অন্তত বিনুর তাই মনে হয়।

যুগল চলে যাবার পর কিছুদিন সময় যেন থমকে ছিল। তারপর আবার চিরাচরিত পুরনো নিয়মে চলতে শুরু করেছে। নবু গাজির ছেলের সঙ্গে মজিদ মিঞার মেয়ের শাদিও হয়ে গেছে এর মধ্যে। বিনুরা কেতুগঞ্জে গিয়ে সারাদিন থেকে নেমন্তন্ন খেয়ে এসেছে। স্নেহলতা-শিবানী-সুরমা-হেমনাথ, প্রত্যেকেই যে যার নিজের কাজের চাকায় বাঁধা। এরই ভেতর একদিন সময় করে বুধাই পালের মেয়ের মাঘমণ্ডলের ব্রত সাঙ্গ করিয়ে এসেছেন স্নেহলতা। হেমনাথের মতো তাঁরও দায়দায়িত্ব কি এক-আধটা? পারিবারিক দায়িত্ব, সামাজিক দায়িত্ব, সবই পালন করতে হয়। সুধা সুনীতি নিয়মিত কলেজ করে যাচ্ছে।

তবে সব চাইতে পরিবর্তন হয়েছে অবনীমোহনের। জমি পেয়ে একেবারে মেতে উঠেছেন তিনি। ধান উঠে যাবার পর পৌষ মাসে রবিশস্যের বীজ ছড়িয়েছিলেন—মুগ তিল মটর খেসারি। চৈত্রের গোড়ায় রবিফসল উঠে গেছে। চৈত্রের শেষাশেষি হাল-লাঙল নিয়ে আবার মাঠে নেমে পড়েছেন। এ জন্য আটটা কামলা রেখেছেন অবনীমোহন, বলদ কিনেছেন ষোলটা। জমি চৌরস করে রাখবেন এখন, তারপর নতুন বর্ষার জল পড়লেই আউশ বুনবেন।

হেমনাথ ঠাট্টা করেন, 'তুমি দেখি দু'দিনেই আমাদের চাইতেও বড় চাষী হয়ে উঠলে অবনী।'

অবনীমোহন কিছু বলেন না, শুধু হাসেন।

সুরমা বলেন, 'দেখ, ক'দিন উৎসাহ থাকে।'

চৈত্রের পর এল নিদারুণ খরার দিন। মাঠ ফেটে এখন চৌচির। আলের ধারের জলসেঁচি শাকগুলো পুড়ে পুড়ে হলুদ হয়ে যেতে লাগল। মেঘশূন্য আকাশ সারাদিন গলা কাঁসার রং ধরে থাকে। অনেক, অনেক দূরে আকাশ যেখানে ধনুরেখায় দিগন্তে নেমেছে সেইখানে আগুনের হলকা কাঁপতে থাকে। কার সাধ্য সেদিকে তাকায়।

সারাদিন মাঠে মাঠে ঘুরে সন্ধেবেলা ফেরেন অবনীমোহন। ফিরেই দু'দিনের বাসি খবরের কাগজ নিয়ে বসেন।

pathagar.net

পুজোর পর সেই যে কলকাতায় গিয়েছিলেন অবীমোহন তখনই তাঁর নামে রাজদিয়ায় খবরের কাগজ পাঠাবার ব্যবস্থা করে এসেছিলেন। টাটকা টাটকা খবর আর কেমন করে পাওয়া যাবে? কলকাতায় যে কাগজ আজ বার হয় ট্রেনে স্টিমারে রাজদিয়ায় পৌঁছতে পৌঁছতে তার দু'দিন লেগে যায়। কী আর করা যাবে, এই গ্রামদেশে দু'দিনের বাসি খবর নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয় অবনীমোহনকে।

আজকাল কাগজভর্তি শুধু যুদ্ধের খবর। ক'মাস আগেও রাজদিয়ার মানুষের যুদ্ধ সম্বন্ধে মাথাব্যথা ছিল না। কোথায় জার্মানি, কোথায় ফ্রান্স, কোথায় গ্রিস, কোথায় ইংল্যান্ড, কোথায় বা বলকান কান্ট্রি—ভূগোলের কোন প্রান্তে এই দেশগুলো ছড়িয়ে আছে তার খোঁজ রাখার প্রয়োজন বোধ করত না তারা। কিন্তু ইদানীং রাজদিয়ার গায়ে যুদ্ধের আঁচ লাগতে শুরু করেছে।

সন্ধে হলে নিকারীপাড়ার আইনুদ্দি, সর্দারপাড়ার ইচু মণ্ডল, কুমোরপাড়ার হাচাই পাল, বুধাই পাল, যুগীপাড়ার গোঁসাইদাস—এমনি অনেকে এসে হাজির হয়। এ ছাড়া হেমনাথ-সুধা-সুনীতি-বিনুরা তো আছেই।

সবাই এসে জড়ো হলে অবনীমোহন হেরিকেনের আলো উসকে দিয়ে কাগজ পড়তে শুরু করেন।

পুজোর পর বাড়ির এবং ব্যবসাপত্তরের ব্যবস্থা করতে কলকাতায় গিয়েছিলেন অবনীমোহন। ফিরে আসার পর থেকেই খবরের কাগজ পড়ার আসর বসছে। প্রথম দিকে ইচু মন্ডলরা আসত না, তখন বাড়ির লোকেদের পড়ে পড়ে শোনাতেন অবনীমোহন। পরে খবর পেয়ে ইচু মন্ডলরা আসতে শুরু করেছে। আজকাল তারা নিয়মিত আসে।

অবনীমোহন কোনও দিন পড়েন, 'মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধের আওতার ভিতর চলিয়া আসিতেছে। তাহাদের প্রেরিত সমরোপকরণ যাহাতে ব্রিটেনে পৌছাইতে না পারে সে জন্য জার্মান বিমান ও ইউ বোটগুলি আটলান্টিকে হানা দিয়া ফিরিতেছে।'

'দূর প্রাচ্যে ঘোরালো অবস্থা। ব্রিটেন সেখানে ব্যাপক সামরিক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছে।'

'সিঙ্গাপুরের খবরে প্রকাশ, হাজার হাজার অস্ট্রেলিয়ান সৈন্য সিঙ্গাপুরে পৌছিয়াছে এবং মালয়ের বিভিন্ন স্থানে যাত্রা করিয়াছে।'

কোনও দিন পড়েন, 'বাংলা সরকারের ইস্তাহার, বিমান আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হউন। কলিকাতা শহরে হাজার হাজার আগুনে বোমা পড়িতে পারে, তবে আগুনে বোমা দেখিয়া ভয় পাইবেন না।'

'সিঙ্গাপুরের খবর ঃ হাইনান ও টঙ্কিনে জাপানিরা দশ ডিভিশন সৈন্য সন্নিবেশ করিতেছে। ইন্দোচিনের দরিয়ায় জাপানের নৌবাহিনী টহল দিতেছে।'

কোনও দিন পড়েন, 'জাপ পররাষ্ট্র সচিব মাৎসুওকা বার্লিন যাইবার পথে মস্কোতে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করিয়াছেন।'

কোনও দিন পড়েন, 'জার্মানি কর্তৃক যুগোশ্লাভিয়া ও গ্রিস আক্রমণ। যুগোশ্লাভিয়াকে হাত করিয়া গ্রিসের উপর আক্রমণ চালাইবার পরিকল্পনা ব্যর্থ হওয়ায় নাৎসীরা যুগোশ্লাভিয়া আক্রমণ করে। বেলগ্রেডে প্রচণ্ড বোমাবর্ষণ—'

'জাপ-সোভিয়েট অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষরিত।'

'জার্মানির দুর্ধর্ষ সামরিক বিমান 'যুঙ্কারের' আবির্ভাব।'

কোনও দিন অবনীমোহন পড়েন, 'চিন-জাপান যুদ্ধের নূতন অধ্যায়। মহাচিনে চুংকিঙ সরকারের সহিত কমিউনিস্টদের মিটমাট হইয়াছে। চিয়াং কাইশেক কমিউনিস্ট চতুর্থ বাহিনী ভাঙিয়া দিবার পর উত্তর-পশ্চিম চিনে কমিউনিস্ট অষ্টম বাহিনী চুংকিঙের সহিত সহযোগিতা করিতেছিল না। ফলে তাহারা জাপ আক্রমণ ঠেকাইতে পারিতেছিল না। এই অবস্থায় চুংকিঙ সরকার কমিউনিস্টদের নিকট আবেদন জানান। ইহার পর কমিউনিস্টরা তাহাদের সহিত যোগদানের সিদ্ধান্ত করে। এখন তাহারা মিলিতভাবে আক্রমণ করায় জাপানিরা মুশকিলে পড়িয়াছে।'

'শেনসি, সানসি ও হোনানে পাল্টা আক্রমণ চলিতেছে।'

কোনও দিন পড়েন, 'জার্মানির বিরুদ্ধে আমেরিকার আচরণ ক্রমেই উগ্রতর হইয়া উঠিতেছে। মার্কিন সরকার আমেরিকায় জার্মান দূতাবাস, তাদের পাঠাগার, টুরিস্ট ব্যুরো, ট্রান্স ওসেন নিউজ এজেন্সি বন্ধ করিয়া দিয়াছেন।'

কোনও দিন পড়েন, 'রুশ-জার্মান যুদ্ধের শুরু।'

'লেনিনগ্রাদ, সেবাস্টিপুল, ওদিকে হেলিসিঙ্কি, ওয়ারশ, ডানজিগে জার্মান বোমাবর্ষণ।'

'কৃষ্ণসাগর হইতে শ্বেতসাগর পর্যন্ত যুদ্ধের বিস্তৃতি।'

'জার্মানদের বর্তমানে চারটি প্রধান লক্ষ্য—মুরমানস্ক, লেনিনগ্রাদ, মস্কো ও কিয়েফ।'

কোনও দিন পড়েন, 'চিন-জাপান যুদ্ধ চার বছর পার হইয়া পাঁচ বছরে পড়িল।'

'রুশ-জার্মান যুদ্ধ শুরু হইবার পর আমেরিকার সামরিক ঘাঁটি বিস্তারের দিকে মনোযোগ।'

খবরের কাগজের পাতা জুড়ে শুধু যুদ্ধ আর যুদ্ধ, উত্তেজনা আর আতঙ্ক। শ্বাস টানলে বাতাসে বারুদের গন্ধ পাওয়া যায়। দেশ-দেশান্তর জুড়ে সেই আগুনের চাকা যেন আরও, আরও বড় হয়ে ঘুরতে শুরু করেছে।

রোজই খবরের কাগজ পড়া হয়ে গেলে যুদ্ধ নিয়ে আলোচনা আরম্ভ হয়।

ইচু মন্ডল বলে, 'জারমান-জুরমান, মাৎসুকা, লেনিনগারদ—নামগুলান জবর খটমইট্যা।'

অবনীমোহন হাসেন, 'হ্যাঁ।'

'জাগাগুলি (জায়গাগুলো) কুনখানে জামাই?'

'ওর ভেতর শুধু জায়গার নামই নেই, মানুষের নামও আছে। জায়গাগুলো এখান থেকে অনেক, অনেক দূরে।'

ইচু মন্ডল মাথা নাড়ে, 'হেয়া বুঝছি। আমাগো দ্যাশে অ্যামন খটর মটর নাম নাই।'

বুড়ো রসিক শীল বলে, 'আইচ্ছা জামাই—'

ইতিমধ্যে রাজদিয়া এবং চারদিকের গ্রাম-গঞ্জ-জনপদে 'জামাই' নামে পরিচিত হয়েছেন অবনীমোহন। হেমনাথের ভাগনী-জামাই, সেই সুবাদে এ অঞ্চলের জামাই হয়ে গেছেন। ওই নামেই সবাই তাঁকে ডাকে।

অবনমোহন বলেন, 'কী বলছেন?'

'খবরের কাগজ শুইনা তো মনে লাগে, চাইর দিকে বেড়া আগুন লাগছে। আপনের কী মনে লয় (হয়)?'

'কী ব্যাপারে?'

'যুজ্য (যুদ্ধ) কি আমাগো এই রাইজ্জাতেও আইসা পড়ব?'

'কেমন করে বলি!'

ওধার থকে হাচাই পাল বলে ওঠে, 'এইহানে যুজ্য লাগব কিনা ক্যাঠা কইব। তয়—'

অবনীমোহন শুধোন, 'তবে কী?'

'বাজারে আগুন লাইগা গ্যাছে।'

বুধাই পাল বলে 'হে যা কইছ ঠাউরভাই, আগুনই লাগছে। আমাগো লাখান গরিব মাইনষে আর বাচব না। বাইগনের (বেগুনের) স্যার (সের) আছিল এক পহা দ্যাড় পহা, হেই বাইগন অহন তিন পহা চাইর পহায় বিকাইতে আছে।'

ইসমাইল চৌকিদার বলে, 'মলন্দি মাছ আর বজুরি মাছের ভাগা আছিল দুই পহা কইরা। তার দাম উঠছে ছয় পহা। এক গ্যালাস মাঠা চাইর পহা। পটল যে পটল, মূলা যে মূলা, ঝিঙ্গা যে ঝিঙ্গা, বাঙ্গী যে বাঙ্গী—কুন জিনিসখানে হাতে দিতে পারবা! হগল আগুন।'

ইচু মন্ডল বলে, 'মাছ-বাগুন-মূলা-পটল এক কিনারে থুইয়া দাও। যেই দব্য না হইলে পরান বাচে না তার খবর রাখ?'

সমস্বরে অন্য সবাই শুধোয়, 'কোন দব্য?'

ইচু মন্ডল বলে, 'চাউল রে ভাই, চাউল। চাউলেই ঘাউল করছে। গ্যাল হাটে চাউলের দর কত উঠছে জানো?'

'কত? কত?'

'আঠার ট্যাকা মণ।'

অনেকগুলো ভীতিবিহ্বল কণ্ঠস্বর শোনা যায়, 'কও কী মন্ডলের পুত!'

ইচু মন্ডল মাথা নাড়ে, 'ঠিকই কই রে দাদারা, ঠিকই কই।'

বুধাই পাল বলে, 'গ্যাল হাটে চাউল কিনি নাই। তার আগের হাটে কিনছিলাম। তহন দর আছিল বার ট্যাকা মণ। সাত দিনের ভিতরে ছয় ট্যাকা চইড়া গেল!'

ইচু মন্ডল বলে, 'দরের অহনই দেখছ কী! ব্যাপারিরা কইতে আছিল, পরের হাটে আরও চড়ব।'

'সাচা (সত্যি)?'

'সাচা—'

'তাইলে উপায়! আরও দর চেতলে (বাড়লে) খামু কী? পোলা-মাইয়ারে খাওয়ামু কী?'

'খাইতে আর হইব না, শুকাইয়া মরতে হইব।'

'কী যুজ্য যে লাগল!'

এ ক'মাসে খবরের কাগজের পাতা জুড়ে যুদ্ধের খবরই বেশি। তার ফাঁকে ফাঁকে অন্য খবরও চোখে পড়েছে অবনীমোহনের। সেগুলোও পড়ে পড়ে শুনিয়েছেন তিনি।

'সত্যাগ্রহ করিয়া মৌলানা আজাদের আঠার মাস সশ্রম কারাদন্ড লাভ।'

'সুভাষচন্দ্রের অন্তর্ধান। কিছুদিন যাবৎ সুভাষচন্দ্র মৌনাবলম্ব করেন এবং নিজের ঘরে গীতা,

চণ্ডী ইত্যাদি ধর্মগ্রন্থ পাঠ করিতে থাকেন। হঠাৎ দেখা যায় তিনি অন্তর্ধান করিয়াছেন। যেদিন তাঁহার গৃহত্যাগের সংবাদ প্রকাশ পায় সেদিন ভারতরক্ষা আইনের বলে তাঁহার বিচারের দিন ছিল। সুভাষচন্দ্রের অন্তর্ধানের ফলে সারা ভারতবর্ষে নিদারুণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে।'

'নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যের অগ্নিমূল্য। দাম বাড়িয়া যাওয়ায় অসন্তোষে নানা স্থানে ধর্মঘট।'

এসব ছাড়া মুসলিম লিগের খবর, কংগ্রেসের খবর, নেহরু-জিন্না-গান্ধিজি এবং হক সাহেবের খবর তো ছিলই। আর ছিল জিন্নাসাহেবের দেশ ভাগাভাগি করে নেবার পরিকল্পনা এবং দাবি।

সুভাষচন্দ্র-পাকিস্তান-গান্ধি-জিন্না, এসব নিয়েও হেমনাথের ঘরের দাওয়ায় হেরিকেনের অনুজ্জ্বল আলোয় বসে শ্রোতাদের মধ্যে কম আলোচনা হয়নি, দেশের রাজনৈতিক আর রাষ্ট্রীয় সমস্যা নিয়ে তারা কম মাথা ঘামায় নি।

ইচু মন্ডল বলেছে, 'আইচ্ছা জামাই—'

'বলুন—' জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়েছেন অবনীমোহন।

'সুভাষবাবু গ্যাল কই?'

'কী করে বলি।'

'সুভাষবাবু খুব বড় মনিষ্য (মানুষ)।'

'নিশ্চয়ই।'

'এংরাজগো চৌখেরে ফাকি দিয়া যাওন সোজা না।'

'তা তো ঠিকই।'

ওধার থেকে উদ্বেগের গলায় ইসমাইল চৌকিদার শুধিয়েছে, 'সুভাষবাবুরে এংরাজরা আর ধরতে পারব?'

অবনীমোহন বলেছেন, 'কিছুই বলতে পারছি না।'

ইচু মণ্ডল বকের পাখার মতো সাদা ধবধবে দাড়ি নেড়ে বলেছে, 'সুভাষবাবুরে আমি দেখছি।'

ইসমাইল চৌকিদার, রজবালি সিকদার, বুধাই পালেরা সাগ্রহে জিজ্ঞেস করেছে, 'কই দেখলা চাচা, কই দেখলা?'

'বরিশালে, তেনি উইহানে আইছিল। কী সোন্দর দেখতে, য্যান রাজপুত্তুর।'

কথায় কথায় দেশভাগের কথাও এসে পড়েছে। পাকিস্তানের কথা এসেছে।

এ প্রসঙ্গে বুধাই পাল বলেছে, 'অ গো হ্যামকত্তা, অ গো জামাইকত্তা—'

হেমনাথ অবনীমোহন দু'জনেই তার দিকে তাকিয়েছেন।

বুধাই পাল একবার বলেছে, 'মাইনষের মুখে শুনি, খবরের কাগজেও লেখছে, দ্যাশখান নিকি ভাগাভাগির কথা হইতে আছে। একখান ভাগ হিন্দুর, একখান মুসলমানের।'

হেমনাথ আস্তে আস্তে মাথা নাড়েন।

'দ্যাশ আবার ক্যামনে ভাগ হয়?'

'কী জানি—'

এই সময় ইচু মন্ডল হঠাৎ বলে উঠেছে, 'দ্যাশভাগের কথায় একহান কথা মনে পড়ল। সম্বাদহান তোমাগো শুনাই।'

'কও, কও—' সবাই উৎসাহিত হয়ে উঠেছে।

'বুঝলা নি ভাইস্তারা (ভাইপোরা), হেই—হেইবার—' গলার স্বরে দীর্ঘ টান দিয়ে একটু থেমেছে ইচু মন্ডল। হয়তো মনে মনে বক্তব্যটাকে গুছিয়ে নিচ্ছিল সে।

শ্রোতাদের তর আর সইছিল না। ভাববার মতো সময়টুকু দিতেও রাজি নয়। সকলে সমস্বরে তাড়া দিয়ে উঠেছে, 'কুন বার চাচা, কুন বার?'

ইচু মন্ডল পাকা ভুরুদু'টো কুঁচকে বলেছে, 'হেই যেইবার জোড়া বান ডাকল। কী তুফান বড় নদীতে! এই রাইজদা জলের তলে পরায় (প্রায়) সাত দিন ডুইবা আছিল। ঝড়ে আমার বাড়ির মধুটুকরি আমের গাছটা মাটিতে শুইয়া পড়ল, দুইহান ঘরের চাল উইড়া গিয়া পড়ল নয় মাইল তফাতে। হেইবারের দুই বছর আগে কি পরে, মনে নাই—'

pathagar.net

সময় সম্পর্কে এখানকার মানুষের ধারণা অদ্ভুত। সাল-তারিখের হিসেব নিয়ে তাদের দুর্ভাবনা নেই, তার ধারও তারা ধারে না। ভয়াবহ কোনও প্রাকৃতিক দুর্যোগ কিংবা ওইরকম কোনও ঘটনার স্মৃতি দিয়ে তারা সময়ের হিসেব করে।

ইচু মন্ডল থামেনি, 'হেইবার, বুঝলা ভাইস্তারা, এংরাজরা ঠিক করছিল বাংলা দ্যাশখানেরে দুই টুকরা করব—'

'পারছিল?'

'হে কি পারে! বড় বড় বাবুরা আর বড় বড় মেঞাছাবরা দ্যাশখান উথালপাথাল কইরা ছাড়ল। শ্যাষম্যাষ এংরাজরা ডরাইয়া গেল, দ্যাশ আর টুকরা টাকরি করতে সাহস পাইল না।'

রোজই এই খবরের কাগজ পড়ার সময় কিছুক্ষণ অবনীমোহনদের কাছ এসে বসে বিনু। কী একটা বইতে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের কথা পড়েছিল সে। বিনু বুঝতে পেরেছে, সেই কথাই বলছে ইচু মন্ডল।

বুধাই পাল, হাচাই পাল এবং ইসমাইল চৌকিদারও বয়সে বেশ প্রবীণ। অবশ্য ইচু মন্ডলের চাইতে ঢের ছোট। ইচুর কথায় তাদেরও যেন মনে পড়ে গেছে। ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে তারা বলেছে, 'আমাগো ছুটোকালে এইরকম একহান কথা শুনছিলাম য্যান।'

ইচু মন্ডল আবার কী বলতে যাচ্ছিল, হঠাৎ তার নজর এসে পড়েছে হেমনাথের ওপর। হেমনাথ চুপচাপ ওদের কথা শুনছিলেন। ইচু মন্ডল তাঁকেই সাক্ষী মেনে এবার বলেছে, 'এই যে হ্যামকত্তা, আপনেই তো এই রাইজদা তুলফাড় কইরা ফালাইছিলেন। মনে পড়ে, বাড়ি বাড়ি ঘুইরা বুঝাইছিলেন, হিন্দুই হউক আর মুসলমানই হউক, হগল বাঙ্গালীই এক।'

হেমনাথ উত্তর দেন নি, অল্প হেসে ঘাড় হেলিয়ে দিয়েছেন।

ইচু মন্ডল আবার বলেছে, 'এংরাজ পারে নাই, ওনারা পারব! যত তামশার কথা!'

বয়স যাদের কম তারা শুধিয়েছে, 'এই হগল কত কাল আগের কথা চাচা?'

ইচু মন্ডল বলেছে, 'তা বিশ পঞ্চাশ বচ্ছর আগের হইব।' বলতে বলতে হেমনাথের দিকে ফিরেছে, 'না হ্যামকত্তা?'

হেমনাথ কৌতুক বোধ করেছেন। বলেছেন, 'তুমি তো সবই জানো।'

কমবয়সীরা জিজ্ঞেস করেছে, 'তখন তোমার কত ব'স (বয়স) চাচা?'

ইচু মন্ডল বলেছে, 'হে হইব দ্যাড় কুড়ি। ছ্যামরারা, তহন আমার জুয়ান ব'স (বয়স), ঘরে তিন বিবি—'

শুনতে শুনতে সবাই হেসে উঠেছে।

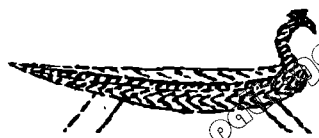

এই জল-বাংলায় ঋতু বলতে চারটি—শীত গ্রীষ্ম বর্ষা এবং শরৎ। বাকি ঋতুগুলি কখন যায় কখন আসে, বিশেষ টেরও পাওয়া যায় না। তারা আসে চুপিচুপি, যায় আরও নিঃশব্দে।

চার ঋতু বাদ দিয়ে থাকে হেমন্ত আর বসন্ত। মাঠভর্তি জলে যখন টান ধরে, উত্তুরে বাতাসে যখন চামড়া ফাটতে থাকে, সকালের দিকে ঠান্ডায় গায়ে কাঁটা দেয়, কুয়াশায় হিমে সন্ধেটা যখন ঝাপসা, সেই সময়টা হেমন্ত। ভাল করে হেমন্তকে বুঝবার আগেই শীত নেমে যায়। শীতের পর মান্দার আর শিমুল গাছে থোকা থোকা রক্তবর্ণ ফুলের নিশান উড়িয়ে বসন্ত আসে, কিন্তু তার আয়ু আর কতটুকু। দেখতে দেখতে মাঠ ঘাট শুকিয়ে চৌচির হয়ে যেতে থাকে। ফাটলের ভেতর থেকে বিষাক্ত নিঃশ্বাসের মতো পৃথিবীর অন্তঃপুরের যত উত্তাপ বেরিয়ে আসে। আকাশ যেখানে ধনুরেখায় দিগন্তে বিলীন, সেখানে যখন আগুনের হলকার মতো রোদ কাঁপতে থাকে তখন টের পাওয়া যায় খরা এসে গেল।

হেমন্ত আর বসন্ত ছাড়া বাকি চার ঋতুর চেহারা এখানে স্পষ্ট। এসেই তাদের পালাই পালাই

নেই। একবার এলে যেতেই চায় না, রীতিমতো আসর জাঁকিয়ে বসে, আকাশে বাতাসে আপন স্বভাবটি মুদ্রিত করে তবে যাবার নাম করে।

এখন আষাঢ়। জষ্ঠির মাঝামাঝি খালবিল ছাপিয়ে নতুন বর্ষার জল আসতে শুরু করেছিল। পশ্চিমা বাতাসের টানে আকাশ জুড়ে তখন থেকেই কালো কালো ভবঘুরে মেঘেদের আনাগোনা। জষ্ঠি মাসে যে মেঘগুলো ছিল অস্থির, উড়ু-উড়ু, নিয়ত চঞ্চল, তারাই একাকার হয়ে জমাট বেঁধে আকাশময় বিরাট এক চাঁদোয়ার মতো মাথার ওপর অনড় হয়ে আছে।

সারাদিন বৃষ্টি পড়ছেই। কখনও ঝিপ ঝিপ, কখনও ঝর ঝর। ভরা বর্ষার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে বিনুর মনে হয়, যুগযুগান্ত ধরে কাল-কালান্তর পার হয়ে এ বৃষ্টি পড়ছেই, পড়েই যাচ্ছে।

হেমনাথের পুকুরটা বর্ষার প্রথম দিকেই ভেসে গিয়েছিল। মাঠ-ঘাট-খেত সব এখন জলের তলায়। নতুন বর্ষার জল পড়তেই বীজ বোনা হয়েছিল। ধানগাছ এখন জলের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ফনফনিয়ে বেড়ে উঠছে।

কচুবনে দিন রাত ব্যাঙ ডাকছে, ঝিঁঝিদের রাজ্যেও একটানা জলসার আসর বসেছে। আকাশ পাতাল জুড়ে তাদের মিলিত সুর সব কিছুকে করুণ, বিষণ্ণ, উদাস করে তুলেছে। এ ছাড়া যেন পৃথিবীতে আর কোনও শব্দ নেই।

এই জল-বাংলায় এত যে পাখি—জলপিপি, কবুতর, মোহনচূড়া, বখারি, শালিক, সিদ্ধিগুরু, বুনো টিয়া—বর্ষা নামবার পর থেকে তাদের আর দেখা নেই। কোথায়, কোন ঠিকানায় তারা দেশান্তরী হয়েছে, কে জানে।

সমস্ত চরাচর বৃষ্টির অবিরাম দীর্ঘ ধারাগুলির ওধারে ঝাপসা হয়ে আছে। কদাচিৎ পুকুরের ওপারে ধানখেতের ভেতরে এক আধটা নৌকো চোখে পড়ে। দেখেও যেন বিশ্বাস হতে চায় না। মনে হয়, অনেকদিন আগের দেখা কোনও আবছা স্মৃতির ভেতরে নৌকোগুলো দোল খাচ্ছে।

বৃষ্টি মাথায় নিয়ে একদিন হেমনাথ আর অবনীমোহনের সঙ্গে সুজনগঞ্জের হাটে গেল বিনু। অনেক দিন পর এবার সুজনগঞ্জে এল সে। স্কুল চলছে, এখন হাটে আসবার সময় কোথায় তার।

এত জল, এত বাদলা, তবু সুজনগঞ্জের হাটে ভিড় একই রকম আছে। শিয়রের দিককার নদীটা নৌকোয় নৌকোয় তেমনই ঢাকা। কয়েক মাইলের ভেতরে এই একটাই তো হাট। বিকিকিনির জন্য, ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য, প্রতিদিনের প্রয়োজনীয় জিনিসটুকুর জন্যও হাটের মুখ চেয়ে বসে থাকতে হয়। মানুষ না এসে কী করবে?

জল-বাংলায় বেশ কিছুদিন কেটে গেল বিনুদের। দাদুর সঙ্গে খুব বেশি না হলেও সুজনগঞ্জের হাটে খুব কমও আসেনি সে। আর অবনীমোহন তো প্রতি হাটেই আসছেন। নিয়মিত যাতায়াতের ফলে সুজনগঞ্জের সব ব্যাপারি-পাইকার-আড়তদার-দোকানদারের সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়ে গেছে।

হেমনাথের বাড়ি ইচু মন্ডলরা সন্ধেবেলা এসে যা বলাবলি করে, দেখা গেল তা সত্যি। মাছের বাজারে, আনাজপাতির বাজারে, ডাল-মশলার বাজারে—যেখানেই যাচ্ছে সেখানেই এক কথা।

'জিনিসপাতি আগুন হইয়া উঠছে। কী যে করুম—'

'দর বাড়লে তোমাদের তো ভালই। লাভ বেশি।'

'লাভ বেশি ঠিকই, কিন্তুক আমাগোও তো চড়া দরে চাউল ডাইল কিনতে হয়। বেশি ভালা কইরা সুফল কী? আগে দশ ট্যাকা বার ট্যাকার মাল বিকাইতে পারলে হপ্তার খরচ উইঠা যাইত, পোলা-মাইয়ারে দুধে-ভাতে রাখতে পারতাম। আইজ-কাইল বিশ পঞ্চাশ ট্যাকা বেইচাও ব্যাড় (বেড়) পাই না। দিনকাল কী যে পড়ল!'

হাটে এলেই হেমনাথ চারদিক টহল দিয়ে বেড়ান। এখানে একটু বসেন, ওখানে দু'দন্ড দাঁড়িয়ে গল্প করেন। হেমনাথের সঙ্গে থেকে থেকে তাঁর এই স্বভাবটি পেয়ে গেছেন অবনীমোহন। হাটের সব মানুষের সঙ্গে দু'একটা কথা বলতে না পারলে তাঁর ভালই লাগে না।

ঘুরতে ঘুরতে বিনুরা একসময় নিত্য দাসের ধানের আড়তে এসে পড়ল। খুব খাতির টাতির করে নিত্য দাস তাদের বসাল।

হেমনাথ বললেন, 'তারপর খবর কী নিত্য?'

নিত্য দাস শুধলো, 'শুন খবর জানতে চান বড়কত্তা?'

'কোন খবর আর, ধান চালের—'

'ধান চাউলের খবর জবর মোন্দ—'

'কেমন?'

'চাউলের দর বিশ ট্যাকায় উঠছে।'

'গেল হাটে না আঠার ছিল?'

'হ।' নিত্য দাস মাথা নাড়ে, 'অহন রোজ দর চেততে (চড়তে) আছে।' বলতে বলতে গলা নামিয়ে ফিসফিস করে, 'একহান বড় খারাপ সম্বাদ শুনলাম বড়কত্তা—'

কপাল কুঁচকে হেমনাথ জিজ্ঞেস করেন, 'কী সংবাদ?'

'ধান চাউল নিকি আর পাওয়া যাইব না।'

'কে বললে?'

'পরস্পর কানে আইতে আছে।'

হেমনাথ চিন্তিত মুখে বললেন, 'ঠিক শুনেছিস?'

নিত্য দাস বলল, 'হ, বড়কত্তা।'

'এ দেশ ধান চালের দেশ। এত ধান চাল যাবে কোথায়?'

'যুজ্যে নিকি লাগব।'

একটু নীরবতা। তারপর নিত্য দাসই আবার শুরু করল, 'বড়কত্তা একহান কথা জিগাই।'

'কী?'

'আপনের হগল ধান বেইচা দিছেন?'

'না।'

'সব ধান অহন ছাইড়েন না, 'রাখি' করেন। পরে কামে দিব।'

'দেখি।'

নিত্য দাসের আড়ত থেকে বেরিয়ে বিনুরা বিষহরি তলায় চলে এল। বর্ষা কালে বিষহরি তলার ওধারে পুকুরপাড়ের ফাঁকা জমিতে রোগী দেখতে বসেন না লারমোর। মন্দিরের একধারে একটা বারান্দায় চেয়ার-টেবিল-ওষুধের বাক্স সাজিয়ে বসেন। আজও বসেছিলেন।

বিনুরা এসে তাঁর সঙ্গে গল্প জুড়ে দিল। রোগী দেখতে দেখতে কথা বলতে লাগলেন লারমোর।

অবনীমোহন বললেন, 'জিনিসপত্রের দর ভয়ানক চড়ছে লালমোহন মামা।'

অন্যমনস্কের মতো লারমোর বলেন, 'চড়ছে নাকি?'

'বা রে, আপনি জানেন না!'

'জানবার সময় কোথায়?' লারমোর বলতে থাকেন, 'সারাদিন রোগী নিয়েই থাকি। অন্য দিকে তাকাবার ফুরসতই পাই না। অবশ্য—'

অবনীমোহন বলেন, 'কী?'

'রোগীরা দর চড়ার কথা বলে বটে।'

অবনীমোহন এবার চুপ করে রইলেন।

লারমোর আবার বললেন, 'দর যদি চড়েই, তুমি আমি কী করতে পারি বল? ভেবে কিছু লাভ নেই।'

কথাটা ঠিক। ধীরে ধীরে মাথা নাড়লেন অবনীমোহন।

লারমোর বলতে লাগলেন, 'ঘরে কছু চাল আছে। দর চড়লে জিনিসপত্তর যদি কিনতে না পারি একবেলা ফেনা ভাত করে খাব। দিনে একবার খেতে পেলেই আমার চলে যাবে।'

যে মানুষের ঘর-সংসার নেই, ছেলেমেয়ে নেই, বহুজনের হিতে যিনি জীবন উৎসর্গ করেছেন তাঁর সঙ্গে দর চড়া নিয়ে আলোচনা করতে যাওয়া বৃথা। তা বুঝে অবনীমোহন অন্য প্রসঙ্গে চলে গেলেন। এবারকার বর্ষা, লারমোরের রোগী, ইত্যাদি নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা চলল।

কথায় কথায় একসময় বৃষ্টি ধরে এল। পুব দিকের ঘন মেঘে ফাটল ধরিয়ে চিকচিকে একটু

pathagar.net

আভা ফুটে বেরুল।

হেমনাথ বললেন, 'বৃষ্টি থেমেছে। এই ফাঁকে কেনাকাটা সেরে নিলে ভাল হত না?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ—' ব্যস্তভাবে অবনীমোহন উঠতে যাবেন, সেই সময় দুরের ফাঁকা মাঠটায় একজোড়া ঢাক বেজে উঠল।

চমকে বিনু সেদিকে চোখ ফেরাতেই দেখতে পেল সেই ঢেঁড়াদার লোকটা—নাম যার হরিন্দ—একটা উঁচু প্যাকিং বাক্সের মাথায় দাঁড়িয়ে আছে। তার সামনে মা কালীর অসুরের মতো কুচকুচে কালো দুই ঢাকী, কাগা আর বগা, মাথা ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে প্রচন্ডভাবে ঢাক পিটিয়ে চলেছে।

বিনুর মনে পড়ে গেল, যুগলের সঙ্গে প্রথম যেদিন সে সুজনগঞ্জের হাটে আসে সেদিনও কাগা বগা আর হরিন্দকে ঢেঁড়া দিতে দেখেছিল। অনেক—অনেকদিন পর হরিন্দ এবং তার সাঙ্গোপাঙ্গকে আবার সুজনগঞ্জে দেখা গেল।

ঢাকের আওয়াজ পেয়ে তামাক-হাটা, আনাজ-হাটা, নৌকো-হাটা ভেঙে দিগ্বিদিক থেকে মানুষ ছুটে আসতে লাগল। মুহূর্তে হরিন্দদের গোল করে ঘিরে ভিড় জমে গেল।

হেমনাথ বললেন, 'হরিন্দরা এসেছে দেখছি।'

অবনীমোহন বললেন, 'হ্যাঁ।'

'কিসের ঢেঁড়া দিতে এল, কে জানে।'

অবনীমোহন কৌতূহলী হয়ে উঠেছিলেন। উৎসুক সুরে বললেন,'চলুন মামাবাবু, একটু দেখে আসি।'

তাঁর মনের কথাটা বুঝিবা পড়তে পারলেন হেমনাথ। বললেন, 'চল।'

কাছাকাছি আসতে বিনুরা দেখতে পেল, মাথাটা একদিকে হেলিয়ে লোকজন দেখছে হরিন্দ। যখন বুঝতে পারল, সারা হাট তার চারধারে ভেঙে পড়েছে সেই সময় হাতের ইঙ্গিতে কাগা বগাকে থামিয়ে দিল।

ভিড়ের ভেতর থেকে হাটুরে মানুষগুলো প্রশ্ন ছুড়তে লাগল, 'এতকাল পর কী মনে কইরা গো ঢ্যাড়াওলা?'

হরিন্দ বলল, 'সম্বাদ আছে।'

হরিন্দর আসা মানেই রসের বান ডেকে যাওয়া। পাখি যেমন নানা দেশ থেকে ঠোঁটে ঠোঁট শস্যকণা কুড়িয়ে আনে, হরিন্দও তেমনি মজার মজার চমকদার খবর নিয়ে আসে। এই জল-বাংলায় জীবন যেখানে মৃদু, নিঃশব্দ তিরতিরে স্রোতের মতো বেগবর্ণহীন, হরিন্দ সেখানে আনন্দের দূত। ঝুলি বোঝাই করে সে আনন্দ নিয়ে আসে। হরিন্দ এলেই তাই হাটে সাড়া পড়ে যায়।

হাটুরে লোকেরা উৎসাহিত হয়ে উঠল, 'কী সম্বাদ, কী সম্বাদ?'

হরিন্দ বলল, 'শুনলেই বুঝবা, ধৈয্য ধর।'

লোকগুলোর ধৈর্য মানে না। অধীর গলায় তারা বলতে লাগল, 'রসের সম্বাদ তো, অ ঢ্যাড়াওলা?'

উত্তর না দিয়ে হরিন্দ এবার ঢাকী দু'টোর দিকে তাকাল, 'বাজা ব্যাটারা, ঘুইরা ফিরা বাজা—'

একধারে বসে কাগা বগা বিড়ি টানছিল, তড়াক করে লাফিয়ে উঠে ঢাকে কাঠি দিয়ে চারদিক সরগরম করে তুলল।

এটা হরিন্দর পুরনো কৌশল। এর সঙ্গে বিনুর আগেই পরিচয় হয়েছে। লোকের কৌতূহল উসকে দেবার জন্য মাঝে মাঝে কথা বন্ধ করে কাগা বগাকে দিয়ে ঢাক বাজাতে থাকে।

কিছুক্ষণ বাজাবার পর হরিন্দ কাগা বগাকে থামাল। তারপর গলা উঁচুতে তুলে বলল, 'হাটৈরা (হাটুরে) ভাইরা, তোমরা অহন যাইও না। দুইজন মাইন্যগণ্য মনিষ্য আইজ এইহানে আইব।'

সমস্ত ভিড়টা চেঁচিয়ে উঠল, 'তোরা কারা?'

'এছ.ডি.ও সাব আর জিলা ম্যাজিস্টর সাব। মটর লঞ্চে কইরা তেনারা আইব।'

ভিড়ের ভেতর এবার গুঞ্জন শুরু হয়ে গেল, 'এছ.ডি.ও সাব, ম্যাজিস্টর সাব এইহানে ক্যান? অ ঢ্যাড়াওলা ভাই, তুমি কিছু বিত্তান্ত জানো?'

হরিন্দ বলল, 'জানি। তয়—'

'তয় কী?'

'কমু না।'

'ক্যান কইবা না? ক্যান?'

'নিষেধ আছে। যা কওনের তেনারা আইসা কইব। ইট্টু সবুর কর।'

ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট এবং এস.ডি.ও'র মতো মানুষ যে সুজনগঞ্জের হাটে আসতে পারেন, এ এক অভাবনীয় ঘটনা। কেন তাঁরা আসছেন, উদ্দেশ্যটা কী, কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। কাজেই হাটুরে মানুষগুলোর ভেতর গবেষণা শুরু হয়ে গেল।

মাছ ব্যাপারি গয়জদ্দি বলল, 'আমার মনে লয়, ধান চাউলের দর-দাম বাড়তে আছে, ম্যাজিস্টর সাবরা এইর এট্টা পিতিকার করব। হেই লেইগা আইতে আছে।'

বেগুন ব্যাপারি নোয়াজ মিঞা বলল, 'আমার কিন্তুক অন্য কথা মনে লয়।'

মরিচ ব্যাপারি বিনোদ পাল শুধলো, 'কী মনে লয় নোয়াজ ভাই?'

'আমাগো হাটৈরা মানুষগো পিছামোড়া বাইন্ধা লইয়া যাইব।'

'শুদাশুদি বাইন্ধা নিব ক্যান? আমাগো অপরাধহান কী?'

'গরিব মাইনষের অপরাধ লাগে না, বাইন্ধা নিলেই হইল।'

ওধার থেকে গো-হাটার কাদের মিঞা হালকা গলায় রঙ্গ করে, 'আমার কী মনে লয় জানস? ম্যাজিস্টর সাবের পোলার লগে এছ.ডি.ও সাবের মাইয়ার শাদি হইব। হেই লেইগা আমাগো দাওয়াত করতে আইতে আছে।'

সবাই হেসে উঠল।

হালকা এবং গম্ভীর, যত আলোচনাই চলুক, ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবদের আসার উদ্দেশ্যটা বোঝা যাচ্ছে না। তাই হাটুরে মানুষগুলো ভীত, চিন্তিত, সন্ত্রস্ত হয়ে রইল। সন্দেহে সংশয়ে দুলতে লাগল।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না, সত্যি সত্যি একটু পর ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবরা এসে পড়লেন। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব খাস ইংরেজ, লাল টকটকে চেহারা। ছ'ফুটের বেশি লম্বা, প্রকান্ড বুকের পাটা, মাথায় হ্যাট। এস.ডি.ও সাহেব কিন্তু বিশুদ্ধ বঙ্গসন্তান। কিন্তু গায়ের রংটি বাদ দিলে কে বলবে তিনি বাঙালি! হ্যাট-কোট-প্যান্ট এবং চালচলন ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের চাইতে তিন কাঠি ওপরে।

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবদের আগমনটি সত্যিই দর্শনীয়। সামনে এক অক্ষৌহিণী বন্দুকধারী পুলিশ, পেছনে আরেক অক্ষৌহিণী। দু'টো লম্বা লোক ম্যাজিস্ট্রেট এবং এস.ডি.ও সাহেবের মাথায় ছাতা ধরে আছে।

তাঁরা এসে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে কোত্থেকে দু'টো বড় বড় কারুকাজ-করা ভারী চেয়ার এসে পড়ল। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবরা বসলেন। চারদিকের জনতা দম বন্ধ করে দাঁড়িয়ে রইল।

চেয়ারে বসেই এস.ডি.ও সাহেব ইশারায় হরিন্দকে কাছে ডাকলেন, তাঁর কানের কাছে মুখ নিয়ে নিচু গলায় কী ফিসফিস করলেন। তারপরেই হরিন্দ লাফ দিয়ে ঢাকী দু'টোর কাছে গিয়ে হাওয়ায় হাত ঘোরাতে ঘোরাতে বলল, 'বাজা ব্যাটারা, বাজা—'

কিছুক্ষণ বাজনার পর কাগা বগাকে থামিয়ে হরিন্দ চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলতে লাগল, 'হাটৈরা ভাইরা, এইবার এছ.ডি.ও সাব আপনেগো কিছু কইবেন—' বলে একধারে সরে গেল।

এস.ডি.ও সাহেব উঠে দাঁড়ালেন।

কোথাও এতটুকু আওয়াজ নেই। বাতাস বুঝি থেমে গেছে। গাছের একটা পাতা খসলেও এখন তার শব্দ শোনা যাবে।

গলায় খাকারি দিয়ে এস.ডি.ও সাহেব হঠাৎ শুরু করলেন, 'বন্ধুগণ, আপনারা নিশ্চয়ই শুনেছেন যুদ্ধ লেগেছে—'

কেউ উত্তর দিল না। গলা লম্বা করে জনতা উদ্‌গ্রীব দাঁড়িয়ে আছে, তাদের চোখের পলক পড়ছে না।

এস.ডি.ও সাহেব চারদিকের সারি সারি মানুষগুলের মুখের ওপর দিয়ে দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিয়ে গেলেন। তারপর বলতে লাগলেন, 'যুদ্ধ আমাদের এই পূর্ব বাংলাতেও চলে আসতে পারে। তাই বলছিলাম, মা-বোন-সংসার এবং দেশ রক্ষা করবার জন্যে আপনারা দলে দলে সেনাদলে নাম লেখান।'

জনতার ভেতর গুঞ্জন উঠল, 'যুজ্যে যাইতে কয়। হায় আল্লা, উই কারবারে আমি নাই।'

আরেকজন কে বলল, 'যুজ্যে গিয়া মরি আর কি।'

অন্য একটি গলা শোনা গেল, 'লও যাই, মানে মানে অহন সইরা পড়ি।'

একটু থেমে এস.ডি.ও সাহেব খুব সম্ভব জনতার প্রতিক্রিয়া লক্ষ করছিলেন। আবার তিনি শুরু করলেন, 'দেশের জন্যে, মাতৃভূমির জন্যে, নিজের ভাইবোন সন্তানদের জন্যে আপনাদের এগিয়ে আসতে হবে, শত্রুর মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে। নইলে সব কিছু ছারখার হয়ে যাবে।' একটু ভেবে, 'আজই আপনাদের যুদ্ধে নাম লেখাতে হবে না, বাড়ি গিয়ে সবাই ভাবুন। আসছে হাটে আবার আমরা আসব। তার পরের হাটেও আসব। এখন থেকে প্রতি হাটেই আমরা আসব। আপনারা এর ভেতর ভেবেচিন্তে নিন। মনে রাখবেন, সেনাদলে এমনি এমনি নাম লেখাতে বলছি না। ভালই মাইনে পাবেন, পোশাক পাবেন, ভাল খেতে পাবেন। আমার কথা শেষ হল, এবার ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব আপনাদের কিছু বলবেন।' বলে বসে পড়লেন তিনি।

ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট এবার উঠে দাঁড়ালেন। বাংলাটা তিনি ভালই বোঝেন, কিন্তু তেমন বলতে পারেন না। ভাঙা ভাঙা যা বললেন তা এইরকম।

'বন্ধুগণ, আপনারা যুদ্ধে আসিলে টাকা পাইবে, অনেক সুখ হইবে। গভর্নমেন্টের খুব আনন্দ হইবে।' ইত্যাদি ইত্যাদি—

খাস ইংরেজের আড়ষ্ট জিভে জায়গা পেয়ে গর্বে বাংলা ভাষার বুক যেন দশ হাত ফুলে উঠল।

একটু পর ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবরা চলে গেলেন।

হাটুরে মানুষগুলো সেনাদলে নাম লেখাবার ব্যাপার নিয়ে সন্ত্রস্ত আলোচনা করতে করতে তামাক-হাটা, মরিচ-হাটা, গো-হাটার দিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল।

বিনুরা তখনও দাঁড়িয়ে ছিল।

উদ্বেগের গলায় হেমনাথ বললেন, 'যুদ্ধে রিক্রুটমেন্টের জন্যে ম্যাজিস্ট্রেট, এস.ডি.ও পর্যন্ত ছুটে এসেছে। অবস্থা খুব ভাল না অবনীমোহন।'

জষ্ঠির শেষাশেষি সেই যে বৃষ্টি নেমেছিল, এখনও তার থামবার নাম নেই। মনে হয়, দু'এক দিন নয়, দু'চার মাসও নয়, অনাদি অনন্তকাল ধরে ঝরছেই। ঘন কালো মেঘে আকাশ আচ্ছন্ন হয়ে আছে। বৃষ্টির লক্ষ কোটি ধূসর ধারায় চরাচর ঝাপসা, বর্ণহীন, বিষাদ।

ঘরের জানালায় বসে আকাশ দেখতে দেখতে বিনুর মনে হয়, কোনওদিন আর বেরুতে পারবে না, আর কখনও রৌদ্রোজ্জ্বল ঝকমকে দিনের মুখ দেখতে পাবে না। এই ঘরটুকুর মধ্যেই চিরকাল বন্দি হয়ে থাকতে হবে। অথচ ঘরে থেকে থেকে তাঁর প্রাণ অস্থির হয়ে উঠেছে।

জানালার কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে বিনুর মনে হয়, জলের গন্ধ, ভেজা মাটির গন্ধ, গাছপালার গন্ধ চুঁইয়ে চুঁইয়ে তার বুকের ভেতর ঢুকে যাচ্ছে এবং সেখানে বিচিত্র এক বিষাদ গাঢ় করে তুলছে। খুব খারাপ লাগে বিনুর, খুব খারাপ লাগে।

তাকে একা একা দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলে ঝিনুক কখনও কখনও কাছে এসে দাঁড়ায়। অন্যমনস্কের মতো বিনু বলে, 'বৃষ্টি বোধহয় আর থামবে না।'

ঝিনুক বলে, 'থামবে না, তোমায় বলেছে!'

'আবার রোদ উঠবে?'

'উঠবে।'

'কবে?'

'বর্ষা গেলেই।'

যেদিন সকালের দিকে জোর বৃষ্টি নামে সেদিন আর স্কুলে যেতে পারে না বিনু। অল্প বৃষ্টি

থাকলে অবশ্য ছাতা মাথায় দিয়ে বেরিয়ে পড়ে।

এই বর্ষার সময়টা প্রায়ই স্কুল কামাই হচ্ছে। সারাদিন বাড়িতে আটকে থেকে পরিচিত মানুষগুলোকে বার বার, হাজার বার দেখে দেখে ক্লান্ত হয়ে পড়ে বিনু। সন্ধের সময় ইচু মন্ডলরা জলে ভিজে ভিজে যখন যুদ্ধের খবর শুনতে আসে, সেই সময়টা মোটামুটি উন্মাদনার মধ্যে কেটে যায়।

রোজই খবরকাগজ নতুন নতুন উত্তেজনা নিয়ে আসে। যুদ্ধের তান্ডব ক্রমশ বেড়েই চলেছে। এক দিগন্ত থেকে আরেক দিগন্ত পর্যন্ত তার অশুভ ভয়াবহ ছায়া পড়ছে। বর্ষার অনড় মেঘের মতো পুরো গোলার্ধকে কী এক অভিশাপ যেন ঢেকে ফেলেছে।

যুদ্ধের খবরের মধ্যে একদিন অবনীমোহন পড়ে শোনালেন, রবীন্দ্রনাথ খুব অসুস্থ। তারপর আরেক দিন পড়লেন তিনি সুস্থ হয়ে উঠেছেন।

দিনের পর দিন যেতে লাগল।

সেদিন অল্প অল্প বৃষ্টির ভেতর স্কুলে গেল বিনু। দু'টো ক্লাস হবার পর হঠাৎ থার্ড পিরিয়ডে হেড মাস্টার মোতাহর সাহেব এলেন। অবোধ বালকের মতো তিনি কাঁদছেন। চোখের জলে বুক ভেসে যাচ্ছে। কাঁদতে কাঁদতে ভাঙা গলায় বললেন 'রবীন্দ্রনাথ আর নেই। আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। তিনি কী ছিলেন, কত বিরাট, কত বিপুল, আজ বুঝতে পারবে না। বড় হয়ে তাঁকে বুঝতে চেষ্ট কোরো। যাও, আস্তে আস্তে বাড়ি চলে যাও।'

বাড়ি ফিরে বিনু দেখতে পেল, সমস্ত বাড়িটা যেন শোকাচ্ছন্ন, নিস্তব্ধ। পুবের ঘরের ঢাকা বারান্দায় অবনীমোহন আর হেমনাথ বসে ছিলেন। খুব চাপা গলায় ফিসফিস করে কী বলাবলি করছিলেন।

কাছে যেতে হেমনাথের গলা বিনুর কানে এল, 'পৃথিবী জোড়া অন্ধকারে ওই একটুখানি আলো ছিল, তাও নিবে গেল।'

বিনু বুঝতে পারল, রবীন্দ্রনাথের কথাই হচ্ছে।

রবীন্দ্রনাথ কত বড়, কত বিশাল, কত মহৎ—বিনুর জানা নেই। তবু পাষাণভারের মতো কী যেন তার বুকের ভেতর নিশ্চল হয়ে রইল। শ্বাসটা আটকে আসতে লাগল যেন।

গত বছর পুজোর ছুটির পর সেই যে হিরণ ঢাকায় গিয়েছিল, সেই থেকে তার আর খোঁজখবর ছিল না।

হিরণ যাবার পর তাকে নিয়ে এ বাড়িতে আলোচনা কম হয়নি।

একদিন হেমনাথ বলেছিলেন, 'বাঁদরটা ওইরকম। কাছে থাকলে দিনরাত মাখামাখি, যেই চোখের আড়াল হল অমনি সব ভুলে গেল।'

সেদিনই সন্ধেবেলায় সুধা-সুনীতি-বিনু, তিন-ভাই-বোন পড়তে বসেছিল। চারদিক দেখে নিয়ে নীচু গলায় সুনীতি সুধাকে বলেছিল, 'দাদু হিরণচন্দর সম্বন্ধে তখন কী বলছিল শুনেছিস তো? এমন মানুষকে মন দিলি ভাই, একবার খোঁজও নেয় না।'

সুধা ঠোঁট উলটে দিয়ে তাচ্ছিল্যের সুরে বলেছিল, 'খোঁজ নেয় না বলে তো আমি একেবারে মরে গেছি।'

'গেছিসই তো—'

'তোকে বলেছি?'

'মা বললে কি। তোর মুখ দেখে বুঝতে পারি না, ভেবেছিস?'

'ও বাবা -' সুধা গালে হাত রেখে বলেছিল, 'কবে থেকে অন্তর্যামী হলি রে দিদি!'

সুনীতি বলেছিল, 'যেদিন হিরণচন্দরের সঙ্গে তোর আলাপ হয়েছে সেদিন থেকে—'

একটু চুপ। তারপর সুনীতিই আবার শুরু করেছিল, 'ওই ভদ্রলোকটি কিন্তু বেশ। কলকাতা থেকে

pathagar.net

ঠিক চিঠিপত্তর দিয়ে যাচ্ছে।'

সুধা মুখ টিপে হেসেছিল, 'তোর কথাই আলাদা। মনের মতো মনের মানুষ পেয়েছিস।'

'তোরটা বুঝি মনের মতো নয়?'

'বিচ্ছিরি।'

'আয় তা হলে বদলা বদলি করে নিই।'

'বদলা বদলির দরকার নেই। দু'টোকেই তুই নিয়ে নে—'

মুখ লাল হয়ে উঠেছিল সুনীতির। ঝঙ্কার দিয়ে বলেছিল, 'তুই ভারি অসভ্য হয়ে উঠেছিস সুধা।'

সুধা উত্তর দেয়নি, হেসে সে গড়িয়ে পড়েছিল।

বলা নেই কওয়া নেই, হঠাৎ দুপুরবেলা বৃষ্টি মাথায় নিয়ে ঢাকা থেকে আজ হিরণ এসে হাজির। পুবের ঘরে সুধা-সুনীতি-বিনু আর হেমনাথ বসে ছিলেন। হিরণকে দেখে হেমনাথ প্রায় লাফিয়ে উঠলেন, 'আরে কালাচাঁদ যে, আয় আয়—'

হিরণ ছাতা নিয়ে এসেছিল। ছাতাটা মুড়ে বাইরে রেখে ভেতরে এসে বসল।

হেমনাথ আবার বললেন, 'কী ব্যাপার, এতদিন খবর নেই বার্তা নেই, একবার আসিসও নি। ঢাকায় বসে কী করছিলি?'

হিরণ খুব গম্ভীর গলায় বলল, 'সরস্বতীর আরাধনা।'

হেমনাথ ভ্রূকুটি হানলেন, 'তার মানে?'

'তার মানে পড়াশোনা নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম। মাসে মাসে আমার পেছনে কতগুলো করে টাকা ঢালছ, খেয়াল আছে?'

হেমনাথ কিছু না বলে জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে থাকলেন।

হিরণ বলল, 'অন্তত একটা ফার্স্ট ক্লাস যদি না পাই, তুমি আমাকে আস্ত রাখবে?'

হেমনাথ হেসে ফেললেন, 'তা রাখব না। শুধু কি তা-ই, এখানকার কলেজে চাকরিও দেব না।'

'তা হলেই বুঝে দেখ, ঢাকা থেকে হুট হুট ছুটে আসা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

'না-ই বা এলি, মাঝে মাঝে চিঠি লিখলেও পারিস তো।'

'চিঠি লেখা আমার কোষ্ঠীতে নেই, তা তো তুমি জানোই।'

'তোর কোষ্ঠীতে নেই। এদিকে আরেক জনের দিকে যে তাকানো যায় না। মুখে সব সময় মেঘ জমে আছে।'

'কার?'

আঙুল বাড়িয়ে সুধাকে দেখিয়ে দিলেন হেমনাথ। হিরণ-সুধা বা সুনীতি-আনন্দর মধ্যে যে হৃদয়রাগের খেলা চলছে এ বাড়িতে তা বিশেষ গোপন নেই। এ ব্যাপারে হেমনাথদের কিছু প্রশ্রয়ও আছে। তাঁদের স্নেহের ছায়ায় চারটি উন্মুখ তরুণ মনে উৎসব শুরু হয়ে গেছে যেন।

হাত-পা নেড়ে একেবারে চেঁচামেচি জুড়ে দিল সুধা, 'আহা-হা, আহা-হা—'

এই সময়ে হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন হেমনাথ। রসালো সুর টেনে টেনে বললেন, 'আহা আহা করিস না লো সই।' বলেই হাত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে গান ধরলেন ঃ

'নয়ন-নীরে কি নেভে মনের অনল,
সাগরে প্রবেশি যদি না হয় শীতল।
তৃষায় চাতকী মরে, অন্য বারি নাহি হেরে,
ধারাজল বিনে তার সকলই বিফল।
যবে তারে হেরে সখি, হরিষে বরিষে আঁখি,
সেই নীরে নিভে সখি অনল প্রবল।'

সুধা লাফ দিয়ে উঠে পড়ল। আরক্ত মুখে বলল, 'এরকম করলে আমি কিন্তু চলে যাব দাদু—'

হাত ধরে সুধাকে তক্তপোশে বসিয়ে দিতে দিতে হেমনাথ বললেন, 'আচ্ছা আচ্ছা, এই গান থামিয়ে দিলাম। তোরা গল্পটল্প কর। আমাকে বেরুতে হবে। হিরণ, তুই এখানে খেয়ে যাবি। হোম

ডিপার্টমেন্টে বলে যাচ্ছি।'

হিরণ ঘাড় হেলিয়ে জানালো, খেয়েই যাবে।

বেরিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ কী মনে পড়ায় দাঁড়িয়ে পড়লেন হেমনাথ। হিরণের চোখে চোখ রেখে বললেন, 'হ্যাঁ রে—'

'কী বলছ?'

'পুজো তো এসে গেল।'

'হ্যাঁ।'

'গেল বারের মতো এবারও নাটক টাটক করবি তো?'

হিরণ বলল, 'এবার পুজোর ছুটিতে আমি আসছি না। ঢাকাতেই থাকব।'

একটু অবাক হলেন হেমনাথ, 'কেন রে?'

'ছুটির পর কতটুকু আর সময় পাওয়া যাবে। তারপরই পরীক্ষা—'

'তাই তো, আমার খেয়াল ছিল না। না না, ছুটিতে তোর আসার দরকার নেই। পরীক্ষা আগে. জীবনে ফুর্তি করার ঢের সময় পাওয়া যাবে। আচ্ছা এখন যাই।'

হেমনাথ বেরিয়ে যাবার পর মুখ নীচু করে নিঃশব্দে নখ দিয়ে তক্তপোশে আঁকিবুকি কাটতে লাগল সুধা। হিরণের সঙ্গে কথা টথা যা বলবার, সুনীতিই বলল। তার এতদিন ডুব দিয়ে থাকা নিয়ে ঠাট্টা করল, প্রাণ খুলে হাসির ফোয়ারা ছোটাল। তারপর একসময় কাজের ছল করে উঠে গেল।

এখন ঘরের ভেতর ওরা তিনজন। সুধা হিরণ আর বিনু। বিনু জানালার বাইরে তাকিয়ে ছিল। আকাশ জুড়ে শুধু মেঘ, চরাচর আচ্ছন্ন করে ধূসর রেখায় বৃষ্টি ঝরেই যাচ্ছে। ধানখেতের দিক থেকে হঠাৎ হঠাৎ দমকা বাতাস ছুটে আসে, বাগানের সুপুরি গাছগুলো নুয়ে নুয়ে পড়ে। জামরুল আর কালোজাম গাছ দু'টো পরস্পরের দিকে ঝুঁকে ফিসফিস গলায় কী পরামর্শ করতে থাকে।

অনেকক্ষণ নীরবতার পর হিরণই প্রথম কথা বলল, 'কেমন আছ সুধা?'

সুধা উত্তর দিল না।

হিরণ আবার বলল, 'খুব রাগ করে রয়েছ, না?'

এবার সুধা ভারী গলায় উত্তর দিল, 'না। খুশিতে—'

'খুশিতে কী?'

'ডগমগ হয়ে আছি।'

'সত্যি খুব অন্যায় হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে এক-আধবার রাজদিয়াতে আসা উচিত ছিল। কিন্তু এমন অভ্যেস আমার—'

'খুব খারাপ অভ্যেস—' এতক্ষণ সুধার গলা ভারী ছিল, এবার কাঁপতে লাগল, 'মরে গেছি কি বেঁচে আছি, খোঁজ নেওয়ার দরকার মনে করেন না, ওদিকে জানেন—'

'কী?'

'আনন্দদা সপ্তায় দু'টো করে চিঠি লেখে দিদিকে—'

'আনন্দবাবু লেখে দু'টো করে। ঢাকায় গিয়ে এবার থেকে আমি চারটে করে লিখব—'

'ইয়ার্কি হচ্ছে?'

'না না—' হিরণ কিন্তু ব্যস্ত হয়ে পড়ল, 'তুমি দেখে নিও—'

সুধা ভয় পেয়ে গেল যেন, 'দোহাই আপনার, অত চিঠি লিখবেন না। দিদি তা হলে আমাকে খেপিয়ে মারবে। মাঝে মাঝে এক-আধটা লিখলেই আমি খুশি—'

কী উত্তর দিতে যাচ্ছিল হিরণ, হঠাৎ কিছু ভেবে গলা নামিয়ে বলল, 'এই সুধা—'

'কী বলছেন?'

'আমরা তো খুব প্রাণের কথা চালিয়ে যাচ্ছি। ওদিকে—'

'ওদিকে কী?'

'ঘরের ভেতর বিনু রয়েছে না?'

pathagar.net

এক পলক বিনুকে দেখে নিয়ে সুধা বলল, 'ওটা একটা হাবা গঙ্গারাম। জানালার ফাঁক দিয়ে বৃষ্টি দেখছে, আমাদের কথা কানেও যাচ্ছে না। ভারি অন্যমনস্ক ছেলে—'

হাবা গঙ্গারামটির চোখ অবশ্যই জানালার বাইরে ছিল, কিন্তু ধ্যানজ্ঞান ছিল ঘরের ভেতরে। কান খাড়া করে হিরণদের প্রতিটি কথা শুনে যাচ্ছিল বিনু।

সুধা বলা সত্ত্বেও সন্দেহ গেল না হিরণের। সংশয়ের গলায় বলল, 'যদি শুনে থাকে—'

সুধা বলল, 'কিচ্ছু শোনেনি, আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। কিরকম অন্যমনস্ক দেখবেন?' বলেই ডাকল, 'অ্যাই বিনু—'

বিনু প্রথমটা সাড়া দিল না। বৃষ্টির লম্বা লম্বা ধূসর রেখাগুলি এবং তাদের একটানা ঝমঝম শব্দ ছাড়া জগতের আর কোনও দিকে তার বিন্দুমাত্র মনোযোগ আছে বলে মনে হল না।

সুধা আবার ডাকল। বারকয়েক ডাকাডাকির পর চমকে ওঠার ভঙ্গি করে বিনু ঘুরে দাঁড়াল, 'কী বলছিস?'

'কী করছিস, জিজ্ঞেস করছিলাম—'

'বৃষ্টি দেখছি।'

'আমি তোকে ক'বার ডেকেছি বল তো?'

'এই তো একবার।'

'আমরা কী বলছিলাম, শুনেছিস?'

'না তো—'

'ঠিক আছে, তুই বৃষ্টি দ্যাখ—'

বিনু আবার জানালার বাইরে মেঘাচ্ছন্ন আকাশের দিকে তাকাল।

আর সুধা হিরণকে বলল, 'দেখলেন তো?'

হাতেনাতে এত বড় প্রমাণ পাওয়া সত্ত্বেও বিনু সম্পর্কে সতর্ক হয়ে রইল হিরণ। যতখানি সম্ভব গলাটা অতলে নামিয়ে সে ফিসফিস করতে লাগল। সঙ্গগুণেই কিনা কে জানে, সুধাও গলা নামাল।

আর জল-বাংলার ক্লান্তিহীন বর্ষণ দেখতে দেখতে উৎকর্ণ বিনু ঘরের ভেতর দু'টি অন্তরঙ্গ গাঢ় গলার ফিসফিসানি শুনতে লাগল।

দেখতে দেখতে পুজো এসে গেল।

এই সেদিনও আকাশ জুড়ে কালো মেঘ অনড় হয়ে ছিল। এখনও মেঘ আছে, তবে রং গেছে বদলে।

সারা বর্ষার জলে ধুয়ে আকাশখানি এখন আশ্চর্য নীল। এত চকচকে, এত ঝকমকে যে মনে হয় এক দিগন্ত থেকে আরেক দিগন্ত পর্যন্ত একখানা নীল আয়না কেউ টাঙিয়ে রেখেছে। তার গায়ে থোকা থোকা সাদা মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে।

আশ্বিন মাস পড়তেই খাল-বিল আর নদীপাড়ের কাশবন সাদা হয়ে গেছে। হিজল গাছগুলোর পাতা দেখা যায় না, শুধু ফুল আর ফুল।

বর্ষার সময়টা এই জল-বাংলা থেকে সব পাখি অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল। দিন-রাত একটানা বৃষ্টির ভেতর তারা বেরোয় কী করে? আশ্বিনের শুরুতে যেই বৃষ্টি থামল, মেঘ কেটে ঝলমলে সোনালি রোদ দেখা দিল, অমনি নিরুদ্দেশ পাখির ঝাঁক রাজদিয়ার আকাশে ফিরে আসতে লাগল। দিবানিশি তাদের কিচিরমিচিরে চারদিক এখন মুখর। আর এসেছে পতঙ্গেরা—ফড়িং, প্রজাপতি, নানারকম পোকা।

পুকুর, ধানখেত, দূরের মাঠ, মাঠের মাঝখানে ছোট ছোট কৃষাণ গ্রাম—বর্ষায় সব ভেসে গিয়েছিল। মাঠের জল, ধানখেতের জল, খালবিলের জল, সব জায়গায় জল এখন স্থির। কৃষাণ গ্রামগুলোকে

pathagar.net

আজকাল দ্বীপের মতো দেখায়। দূরে দূরে মাঠের মাঝখানে ভেসাল জাল পাতা। ভেসালের বাঁশে শঙ্খচিল কি কানি বক ধ্যানস্থ হয়ে বসে থাকে। নিস্তরঙ্গ জলে ধানগাছের ছায়া, মুত্রার ছায়া, নলঘাস এবং দক্ষের ছায়া সারাদিন স্থির হয়ে থাকে। শুধু উড়ন্ত পাখিদের ছায়া দুলতে দুলতে ধু ধু দিগন্তের দিকে চলে যায়।

ক'টা মাস একটানা বর্ষায় স্যাঁতসেঁতে, সিক্ত থাকার পর রোদে-বাতাসে-আলোয় এবং উত্তাপে জল-বাংলা আবার যেন সজীব, প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে।

হেমনাথ আর অবনীমোহন এবার জমিতে আউশ ধান দিয়েছিলেন, পাটও রুয়েছিলেন। শ্রাবণের শেষাশেষি আউশ উঠে গেছে। বর্ষায় পাট জাগ দিয়ে রাখা হয়েছিল। কামলারা এখন বার-বাড়ির দালানে বসে পাটের আঁশ ছাড়াচ্ছে।

জমিজমা নিয়ে একেবারে মেতে উঠেছেন অবনীমোহন। দিনরাত ধান-পাট, কামলা-কৃষাণ, এসব নিয়েই আছেন। কে বলবে, মাত্র ক'মাস আগে জমি কিনেছেন! দেখেশুনে তো মনে হয়, চাষবাসই তাঁর জীবনের সারাৎসার, নিরবধি কাল ধরে এই কাজই করে যাচ্ছেন।

খরার দিনে নিজে দাঁড়িয়ে থেকে জমি চৌরস করিয়েছেন অবনীমোহন। বর্ষায় নতুন জল এলে বীজ বুনিয়েছেন। বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে আউশ ধান আর পাট কাটিয়েছেন। এখন যে পচা পাট থেকে আঁশ ছাড়ানো হচ্ছে, তাও সারাদিন সামনে বসে থাকেন। চাষবাসের জীবন তাঁকে পুরোপুরি আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

ধান-পাট ছাড়া আর কিছুই আজকাল ভাবতে পারেন না অবনীমোহন। অন্য কোনও দিকে মনেযোগ দেবার মতো যথেষ্ট সময়ও তাঁর নেই।

হেমনাথ কিন্তু তাঁর নিজস্ব নিয়মেই চলছেন। বাড়ি থেকে একবার বেরুতে না পারলে তাঁর ঘুমই হয় না। এই রাজদিয়া কিংবা আশেপাশের গ্রামগঞ্জগুলোর খোঁজ নেওয়া চাই-ই। জষ্ঠির পর থেকে এত যে বর্ষা, এত যে জল, তবু তাঁকে কেউ বাড়িতে আটকে রাখতে পারেনি, ছাতাটি মাথায় দিয়ে ঠিক বেরিয়ে পড়েছেন।

আশ্বিন মাস পড়বার পর একদিন দুপুরবেলা কোত্থেকে বাড়ি ফিরে হেমনাথ বললেন, 'পুজোর ছুটি পড়ে গেছে। আজকের স্টিমারে কলকাতা থেকে রাজেন গুহর ছেলে-বউ এল।'

স্নেহলতা বললেন, 'কে, অলক?'

'হ্যাঁ।'

'গুহবাড়ির ছেলে তো এল। অন্য বাড়ির কেউ আসেনি?'

'এখনও আসেনি। দু'একদিনের ভেতর এসে পড়বে।'

পুজোর ছুটি পড়তেই গৃহকোণলোভী প্রবাসী সন্তানেরা ফিরে আসতে শুরু করেছে। দেখতে দেখতে রাজদিয়া ভরে যাবে। এখানকার মৃদু, স্তিমিত, বেগবর্ণহীন জীবন সরগরম হয়ে উঠবে।

একেক দিন একেক জনের খবর নিয়ে আসেন হেমনাথ। কোনওদিন এসে বলেন, 'আজ মল্লিকবাড়ির সরোজরা এল।' কোনওদিন বলেন, 'আজ সাহাবাড়ির প্রাণকান্তরা এল।' কোনওদিন বলেন, 'আজ রুদ্রবাড়ির মহিমরা এল।'

হেমনাথ যখন খবর নিয়ে আসেন, সুধা-সুনীতি-বিনুরা অসীম আগ্রহে কাছে এসে দাঁড়ায়।

একেক দিন একেক জনের কথা বলেন হেমনাথ, কিন্তু ঝুমাদের সম্বন্ধে কিছুই বলেন না।

এই নিয়ে সুধা সুনীতি চাপা গলায় নিজেদের মধ্যে ফিসফিস করে। সুধা বলে, 'কিরে দিদি—'

সুনীতি বলে, 'কী?'

'দাদু শিশির মামাদের কথা একবারও তো বলছেন না।'

'ওঁরা আসেননি, তাই বলছেন না।'

'ওঁরা এলে—'

'এলে কী?'

'আনন্দদাও আসবে।'

'তার কি কিছু ঠিক আছে?'

চোখ ঘুরিয়ে সুধা বলে, 'আসবে রে, আসবে। তুই এখানে পড়ে আছিস, চিঠিতে কত আর মনের কথা লেখা যায়! বিধুমুখ দেখতে না পেলে—'

তার পিঠে দুম করে এক কিল বসিয়ে সুনীতি বলে, 'খুব ফাজলামি শিখেছিস!'

পিঠ বাঁকিয়ে খানিকক্ষণ 'উঁ-উঁ-উঁ' করে সুধা। তারপর ঘন গলায় বলে, 'আনন্দদা এলে বেশ হয়, না?'

সুনীতি বলে, 'জানি না, যা—'

পুজোর সপ্তাখানেক আগে একদিন বিকেলবেলা বাড়ি ফিরে হেমনাথ চেঁচামেচি জুড়ে দিলেন, 'কই গো, কোথায় গেলে সব—'

সবাই ছুটে এল। স্নেহলতা বললেন, 'কী হয়েছে, অত চিৎকার করছ কেন?'

হেমনাথ বললেন, 'খুব খারাপ খবর।'

উদ্বিগ্ন মুখে স্নেহলতা শুধোলেন, 'কী?'

'আজ রামকেশবের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। ও কী বললে জানো?'

'কী?'

'শিশিররা এবার পুজোর দেশে আসছে না।'

কেন?'

'শিশিরের বড় মেয়ে রুমার খুব অসুখ। ডাক্তার নড়াচড়া করতে বারণ করেছে। তাই—'

স্নেহলতা বললেন, 'কী অসুখ?'

হেমনাথ বললেন, 'টাইফয়েডের মতো—'

'সত্যিই খুব খারাপ খবর। হিরণটা পরীক্ষার জন্য আসতে পারবে না, শিশিররা আসবে না। এবারকার পুজোয় তেমন আনন্দ হবে না।'

একধারে সুধা সুনীতি দাঁড়িয়ে ছিল। সুধা চাপা গলায় বলল, 'এই দিদি, তোর মুখটা অমন কালো হয়ে গেল কেন রে?'

শিশিররা আসবে না শুনে সুনীতির মুখখানা সত্যিই ভারি করুণ হয়ে গিয়েছিল। সুধার কথায় হাসবার চেষ্টা করল সে, 'কোথায় কালো হয়েছে?'

সুধা বলল, 'আমাকে তুই ফাঁকি দিতে চাস দিদি?'

সুনীতি উত্তর দিল না।

একটু চুপ করে থেকে ভারী গলায় সুধা বলল, 'একজন ঢাকা থেকে রাজদিয়া আসতে পারবে না, আরেক জন কলকাতায় পড়ে থাকবে। না আসুক গে—'

সেদিনই রাত্রিবেলা বিছানায় শুয়ে শুয়ে ঝুমার কথা ভাবছিল বিনু। আগের বছর পুজোর সময় তার সঙ্গে নৌকোয় করে ভাসতে ভাসতে মাঠের মাঝখানে চলে গিয়েছিল। সেখানে কাউ ফল পাড়তে গিয়ে পড়েছিল অথৈ জলে। ডুবেই যেত, ঝুমাই সেদিন তাকে নৌকোয় টেনে তুলেছিল।

শুধু কি তাই, ঝুমার পাশে বসে থিয়েটার দেখেছে। ঝাপসা রহস্যময় জ্যোৎস্নায় যুগলের নৌকোয় উঠে সুজনগঞ্জে যাত্রা শুনতে গেছে। নিশিন্দার চরে গেছে চড়ুইভাতি করতে। দুঃসাহসী মেয়েটার অসংখ্য স্মৃতি নানা দিক থেকে বিনুর চারপাশে ভিড় করে আসতে লাগল।

হঠাৎ ঝিনুক ডাকল, 'বিনুদা—'

বিনু চমকে উঠল, 'কী বলছ?'

'ঝুমারা এবার আসবে না।'

'হুঁ।'

'এবার থিয়েটারের সময় তোমার জন্যে আমি জায়গা রাখব।'

অন্যমনস্কের মতো বিনু বলল, 'হুঁ—'

ঝিনুক আবার বলল, 'সুজনগঞ্জের হাটে রাত্রিবেলা নৌকোয় করে যাত্রা শুনতে যাব।'

'হুঁ—

হিরণ আসেনি, শিশিররা আসেন নি। তবু পুজোর সমারোহ কম হল না। অন্যবারের মতো এবারও ধুনুচি-নাচের, ঢাকের বাজনার প্রতিযোগিতা হল, নাটক হল, যাত্রা হল, ভাসান গান হল, জারি-সারি-কাচ নাচের আসর বসল, একদিন ধুমধাম করে বাইচ খেলাও হয়ে গেল।

নিয়মমতো সবই হল, কিন্তু মানুষের মন এবার বড় অস্থির, বড় চঞ্চল। পুজোমন্ডপে, জারি-সারি-ভাসান গান কি যাত্রার আসরে—সর্বত্রই এক কথা, এক আলোচনা।

'যুদ্ধ্য লাগছে, কী যে হইব!'

'এইবার আর রক্ষা নাই।'

'জিনিসপত্তরের দাম যা চড়তে আছে হেইতে আর বাচতে হইব না।'

'জিনিসপত্তর আর পাইবা নিকি, বাজার থিকা চাউল ডাইল হগল উধাও হইয়া যাইতে আছে। ট্যাকা যার আছে হেও না খাইয়া মরব, যার নাই হে তো মরবই।'

কলকাতা-প্রবাসী কেউ কাছাকাছি থাকলে আলোচনাটা আরও জমে ওঠে। কালকাতার মানুষ অনেক বেশি জানে-শোনে, অনেক বেশি খবর রাখে। তারা যুদ্ধ সম্বন্ধে এমন এমন সব কথা বলে যাতে ভয়ে, আতঙ্কে রাজদিয়াবাসীদের বুকের ভেতর শ্বাস আটকে যায়।

মোট কথা, সবাই আশঙ্কা করে আছে, কিছু একটা ঘটবে। নিদারুণ, বিপজ্জনক, অনিবার্য কিছু। সারা দেশ, সমস্ত বিশ্বব্রহ্মান্ড জুড়ে তারই আয়োজন চলছে। রাজদিয়াবাসীরা ভাবে, যুদ্ধ যেভাবে ছড়িয়ে পড়ছে তাতে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে, এই রাজদিয়ারও নিস্তার নেই।

দুর্গাপুজোর পর লক্ষ্মীপুজো। তারপর রাজদিয়া আবার ফাঁকা হয়ে গেল। একে একে কলকাতার চাকুরেরা ফিরে যেতে লাগল। ক্ষণিকের জন্য রাজদিয়া উৎসবে, উচ্ছ্বাসে মুখর হয়ে উঠেছিল, তার পর আবার স্তিমিত, নিরুচ্ছ্বাস, বর্ণহীন দিন নেমে আসতে লাগল।

লক্ষ্মীপুজোর পর কালীপুজো।

কালীপুজোর রাত্তিরে একটা মজার ঘটনা ঘটল। মজার এবং বিস্ময়েরও।

রাত্তিরে খাওয়াদাওয়া হয়ে গেলে বিনু আর ঝিনুক হেমনাথের ঘরে শুতে আসছিল। স্নেহলতা ঝিনুককে ডাকলেন।

ঝিনুক দাঁড়িয়ে পড়ল, 'কী বলছ?'

স্নেহলতা তার কথার উত্তর না দিয়ে বিনুকে বললেন, 'তুই শুতে চলে যা দাদাভাই—'

বিনু বলল, 'ঝিনুক যাবে না?'

'না।'

ঝিনুক এইসময় চেঁচিয়ে উঠল, 'বা রে, আমার বুঝি ঘুম পায় না!'

স্নেহলতা বললেন, 'ঘুম পেয়েছে তো আমার বিছানায় শুয়ে থাক গে—'

ঝিনুক অবাক, 'তোমার বিছানায় শোব কেন?'

'আজ থেকে আমার কাছেই শুবি।'

'না না, দাদুর কাছে শোব, বিনুদাদার কাছে শোব—' ঝিনুক হাত-পা ছুড়তে লাগল।

বড় বড় চোখ পাকিয়ে স্নেহলতা বললেন, 'যা বলছি তাই কর। যাও আমার বিছানায়।'

স্নেহলতার এ চেহারা আগে আর কখনও দেখে নি ঝিনুক, এমন কণ্ঠস্বর শোনেনি। নিমেষে তার হাত-পা ছোড়া বন্ধ হল, কিন্তু জেদটা একেবারে গেল না। ঘাড় বাঁকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল সে, আর সমানে বলতে লাগল, 'কেন ওদের কাছে শোব না, কেন?'

খুব শান্ত গলায় স্নেহলতা এবার বললেন, 'তুমি এখন বড় হয়ে গেছ, তাই—'

ঝিনুক বিহ্বলের মতো প্রতিধ্বনি করল, 'বড় হয়ে গেছি!' বলে নিজের দিকে তাকাল, তাকিয়েই রইল।

স্নেহলতা বললেন, 'হ্যাঁ।'

pathagar.net

ঝিনুক কী বুঝল, কে জানে। আর কিছুই বলল না।

আর বিমূঢ় বিনু অবাক চোখে ঝিনুককে দেখতে লাগল। গেল বার পুজোর সময় তারা রাজদিয়া এসেছে। এবার আরেক পুজো গেল। এক বছরের ভেতর কখন, কোন ফাঁকে মেয়েটা বড় হয়ে গেছে, সে ভেবেই পেল না।

খানিক তাকিয়ে থেকে একসময় একাই হেমনাথের ঘরে চলে গেল বিনু।

পুজোর ছুটির পর স্কুল খুলল। মাঝখানে মোটে দেড়টি মাস, তারপরেই অ্যানুয়াল পরীক্ষা।

সারা রাজদিয়া জুড়ে এখন পড়ার মরশুম চলছে। আজকাল যে বাড়িতেই যাওয়া যাক, সকাল-সন্ধে কচি কচি গলায় একটানা বিচিত্র সুর কানে আসে, 'থ্রি সাইডস অফ এ ট্রাঙ্গেল—' অথবা 'জলস্পর্শ করবো না আর চিতোর রানার পণ, বুঁদির কেল্লা মাটির পরে থাকবে যতক্ষণ।' ইত্যাদি ইত্যাদি। জিরান্ড, ভার্বেল নাউন, বহুব্রীহি সমাস, জ্যামিতির কঠিন কঠিন উপপাদ্য, অ্যালজেব্রার ফরমুলাগুলো রাজদিয়া জুড়ে রাজত্ব করে চলেছে।

একদিন সন্ধেবেলা দক্ষিণের ঘরে বিনুরা পড়তে বসেছে। বাইরের বারান্দায় অবনীমোহন, হেমনাথ খবরের কাগজ নিয়ে আসর জমিয়েছেন। ইচু মন্ডল, ইসমাইল চৌকিদার, কুমোরপাড়ার হাচাই পাল, বুধাই পাল—এমনি অনেকে ঘন হয়ে বসে নিঃশ্বাস বন্ধ করে যুদ্ধের খবর শুনছে।

হঠাৎ বাগানের দিক থেকে রাজদিয়া স্কুলের অ্যাসিস্টান্ট হেড-মাস্টার আশু দত্তর গলা ভেসে এল, 'হেমদাদা আছেন?'

পড়তে বসেই ঢুলুনি শুরু হয়ে গিয়েছিল বিনুর, চোখ বুজে আসছিল। বার বার বইয়ের ওপর ঝুঁকে পড়ছিল সে।

আশু দত্তর গলা কানে আসতেই ঝিমুনি ছুটে গেল। খাড়া হয়ে বসে শেষ পর্দায় গলা চড়িয়ে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বিনু পড়তে লাগল, 'আফ্রিকার কঙ্গো নদীর অববাহিকায় পিগ্‌মি নামক জাতি বাস করে। ইহারা পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র মানব, মাত্র চার ফুট দীর্ঘ। এই অঞ্চলের তীব্র সূর্যতাপের জন্য—'

চোখ বইয়ের পাতায় আছে ঠিকই, কিন্তু কান রয়েছে বাইরে। ওদিকে হেমনাথ বারান্দা থেকে সাড়া দিয়েছেন, 'আছি। কে, আশু?'

'হ্যাঁ।'

'আয়, আয়—'

আশু দত্ত এলে একটা জলচৌকিতে তাঁকে বসানো হল। হেমনাথ বললেন, 'কী ব্যাপার আশু, হঠাৎ রাত্রিবেলা কী মনে করে?'

আশু দত্ত বললেন, 'একটু খোঁজখবর নিতে এলাম।'

'কিসের?'

'আপনার না, আমার ছাত্রের।'

'মানে বিনুর?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

জিজ্ঞাসু সুরে হেমনাথ বললেন, 'বিনু তো ভালই আছে। ওই যে পড়ছে। কিন্তু—'

আশু দত্ত হেসে বললেন, 'ভাবনার কিছু নেই। আমি পড়াশোনারই খোঁজ নিতে এসেছি। বুঝতেই তো পারছেন, অ্যানুয়াল পরীক্ষার আর বেশি দেরি নেই। ছেলেগুলো পড়ছে কি ঘুমাচ্ছে, দেখতে হবে না?'

হেমনাথ হেসে ফেললেন, 'তা তো ঠিকই। বিনুকে ডাকব?'

'ডাকতে হবে না, আমিই ঘরে যাচ্ছি।'

pathagar.net

'যা—'

আশু দত্ত ঘরের ভেতর এলেন। গলার স্বর আরেক পর্দা চড়িয়ে দিল বিনু।

আশু দত্ত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ পড়া শুনলেন। তারপর ডাকলেন, 'বিনয়—'

স্কুলে বিনয় নামটাই চালু। বিনু বই থেকে মুখ তুলে বলল, 'আজ্ঞে—'

'পড়াশোনা কেমন হচ্ছে?'

রাজদিয়া ছোট জায়গা। এখানে সবাই সবাইকে চেনে। সুধা সুনীতির সঙ্গে আগেই আশু দত্তর পরিচয় হয়েছিল।

সুধাটা চিরকালই বিভীষণ। সে বলল, 'কোথায় পড়া, এই তো একটু আগে ঢুলছিল।'

কটমট করে সুধাকে একবার দেখে নিয়ে মিনমিনে গলায় বিনু বলল, 'ঢুলছিলাম না স্যার।'

আশু দত্ত বললেন, 'মন দিয়ে পড়। ইংরেজি র‍্যাপিড রিডার আর গ্রামার কিন্তু তোমার ঠিকমতো তৈরি হয়নি। ওগুলো দেখে রাখবে।'

'রাখব স্যার।'

'মুখে বললে হবে না, কাজে দেখাতে হবে। পড়ায় ফাঁকি দিচ্ছ কিনা, সেটা দেখতে আমি আবার আসব।'

'কবে আসবেন?'

'তা কি বলে আসব? যে কোনও দিন আসতে পারি।'

আশু দত্ত ঘরের বাইরে যেতে হেমনাথ বললেন, 'বোস, চা খাবি?'

আশু দত্ত অবাক, 'আপনার বাড়িতে চা ঢুকেছে নাকি!'

হেমনাথ হাসলেন, 'জামাইয়ের চায়ের অভ্যাস। চা না ঢুকিয়ে কী করি বল।'

'তা হলে খেয়েই যাই।'

একটু পরে চা এল। খেয়েই উঠে পড়লেন আশু দত্ত।

হেমনাথ বললেন, 'এক্ষুনি যাবি? আরেকটু বোস না। খবরের কাগজ এসেছে, গরম গরম অনেক যুদ্ধের খবর আছে, শুনে যা।'

'আমার বসবার সময় নেই হেমদাদা।'

'কেন, তোমার কী এমন রাজকার্জ?'

'আর বলবেন না। লাহিড়ীবাড়ি যেতে হবে, মুন্সিবাড়ি যেতে হবে, রুদ্রদের বাড়ি যেতে হবে।'

'কেন?'

'ওদের বাড়ির ছেলেরা পড়ায় বড্ড ফাঁকি দেয়। এখন থেকে যদি পেছনে না লেগে থাকি ম্যাট্রিকে স্কুলের রেজাল্ট ভাল হবে কী করে? আমি চাই রাজদিয়ার প্রত্যেকটি ছেলে লেখাপড়ায় ভাল হোক, মানুষ হোক।' একটু থেমে আশু দত্ত আবার বললেন, 'যুদ্ধের খবর শুনবার জন্যে বসতে বলছেন? শুনে কী করব? যুদ্ধ তো আর আমি ঠেকাতে পারব না। যা হবার তা-ই হবে।'

হেমনাথ মাথা নাড়লেন, 'হ্যাঁ। ছেলেদের চিন্তায় আশুটা পাগল। কে পড়ছে না, কার কী অসুবিধা হচ্ছে—এসব দেখে না বেড়ালে ওর ঘুমই হয় না।'

অসীম শ্রদ্ধায় অবনীমোহন উচ্চারণ করলেন, 'সত্যি, এরকম শিক্ষক আগে আর কখনও দেখিনি।'

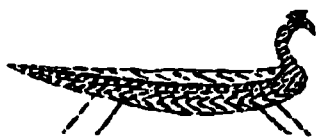

অ্যানুয়াল পরীক্ষার সময় ক'দিন খুব হইচই। জাপানিরা যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। পার্ল হারবারে, সিঙ্গাপুরে, ম্যানিলায় বোমা ফেলেছে। 'প্রিন্স অফ ওয়েলস' আর 'রিপালস' নামে দু'টো বড় বড় জাহাজ ডুবিয়ে দিয়েছে।

ভয়, দুশ্চিন্তা, উদ্বেগ এবং শকমারি গুজবের মধ্যে বিনুদের পরীক্ষা হয়েও গেল।

পরীক্ষার কিছুদিন পর খবরের কাগজ আরও মারাত্মক সংবাদ বয়ে আনল। জাপানিরা ঘরের

কাছে বর্মায় নাকি এবার বোমা ফেলেছে। শুধু তাই না, বর্মা থেকে দলে দলে লোক পায়ে হেঁটে দুর্গম পাহাড় পর্বত বনজঙ্গল পেরিয়ে ভারতবর্ষের দিকে চলে আসছে।

একদিন হেমনাথ বললেন, 'ত্রৈলোক্য সেনের নাম শুনেছ তো?'

স্নেহলতা বললেন, 'যে রেঙ্গুনে থাকত?'

'হ্যাঁ। সে আজ রাজদিয়ায় ফিরে এসেছে।'

স্নেহলতা বললেন, 'ত্রৈলোক্য সেন একা এসেছে?'

হেমনাথ বললেন, 'একা আসবে কি, ছেলেপুলে নাতি-নাতিকুড় সবাইকে নিয়ে এসেছে। তাদের কোথায় রেখে আসবে?'

'হঠাৎ চলে এল?'

'বা রে, তুমি কি কিছুই খোঁজ রাখো না!'

হেমনাথ বলতে লাগলেন, 'বর্মায় জাপানিরা বোমা ফেলেছে। অনেক লোক মরেছে। বাড়িঘর, রাস্তাঘাট, সব ধ্বংসস্তূপ। বোমা পড়তেই রেঙ্গুন শহর থেকে লোক পালাতে শুরু করেছিল। রেঙ্গুন এখন একেবারে ফাঁকা।'

কোথায় বর্মা, কোথায় জাপান, কোথায় শ্বেতসাগর, কোথায় ডানজিগ-সেবাস্টিপুল-মস্কো, কোথায় বলকান-যুগোশ্লাভিয়া-পোল্যান্ড—ভূগোলের কোন প্রান্তে এই জায়গাগুলো পড়ে আছে, দুই গোলার্ধের কোথায় কোথায় বোমা পড়ছে, কত লোক মরছে, মানবজাতিকে নিশ্চিহ্ন করবার জন্য কারা উন্মত্ত হয়ে উঠেছে, এ সব কোনও খবরই রাখেন না স্নেহলতা। এই রাজদিয়া, হাচাই পালের মেয়ের মাঘমণ্ডলের ব্রত, নাটাইচণ্ডীর ব্রত, নীলপুজো, কোজাগরী লক্ষ্মীপুজো, বাস্তুপুজো, কারোর বিয়ে হলে জল সইতে যাওয়া, বাসর জাগা—এ সবের মধ্যেই তাঁর ভূমণ্ডল, তাঁর জগৎ। এতকাল এর বাইরে কোনও কিছু সম্বন্ধেই তাঁর দুর্ভাবনা ছিল না।

ত্রস্ত সুরে স্নেহলতা বললেন, 'তাই নাকি, এত কাণ্ড হয়েছে!'

'হ্যাঁ। ওইরকম অবস্থায় মানুষ কখনও বর্মায় পড়ে থাকতে পারে?'

'তা তো ঠিকই।'

হেমনাথ বললেন, 'ত্রৈলোক্যদের যা দুর্গতি হয়েছে কী বলব! জাহাজ নেই, নৌকো নেই—'

'তবে এল কী করে?'

'হেঁটে।'

'বর্মা তো শুনেছি অনেক দূর।'

'হ্যাঁ। ছেলেপুলে নাতি-নাতনীর হাত ধরে পাহাড়-পর্বত-বন-জঙ্গল পেরিয়ে প্রথমে আসামে এসেছিল। সেখান থেকে রাজদিয়া।'

একটু ভেবে স্নেহলতা বললেন, 'হেঁটে তো এসেছে। জিনিসপত্র কিছু আনতে পেরেছে কি?'

হেমনাথ জোরে জোরে মাথা নাড়লেন, 'কিচ্ছু না, কিচ্ছু না। নিজেদের হাত-পা আর পরনের জামাকাপড় ছাড়া কুটোটুকুও আনতে পারে নি।'

'আহা রে, কী কষ্ট!'

একটু চুপ।

তারপর স্নেহলতা আবার বললেন, 'অনেক কাল পরে ত্রৈলোক্য সেনরা রাজদিয়া এল, তাই না?'

হেমনাথ বললেন, 'হ্যাঁ। তা বছর তিরিশেক হবে।'

'বর্মায় ওরা তো বেশ ভালই ছিল।'

'ভাল বলে ভাল। বিরাট অবস্থা করে ফেলেছিল ত্রৈলোক্য। এক রেঙ্গুনেই তিনখানা বাড়ি, প্রোমে ছিল একখানা। তা ছাড়া জমিজমা, নারকেল বাগান। নগদ টাকাপয়সাও প্রচুর।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে স্নেহলতা বললেন, 'কিছুই আনতে পারল না। সর্বস্ব বিদেশেই পড়ে রইল।'

হেমনাথ বললেন, 'বাড়িঘর যাক। নিজের নিজের প্রাণটুকু নিয়ে যে আসতে পেরেছে, এই ঢের।'

হঠাৎ কী মনে পড়তে স্নেহলতা তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, 'ভাল কথা—'

pathagar.net

'কী?'

'অনেক কাল ওরা ছিল না। রাজদিয়ায় ওদের বাড়ি তো জঙ্গলে ঢেকে গেছে। তা উঠল কোথায়? আমাদের বাড়ি নিয়ে এলেই পারতে। যদ্দিন না কিছু একটা ব্যবস্থা হয় এখানেই থাকত।'

হেমনাথ বললেন, 'ভাল জায়গাতেই উঠেছে। সে জন্যে চিন্তা নেই। স্টিমারঘাট থেকে রামকেশব ত্রৈলোক্যদের নিজের বাড়ি নিয়ে তুলেছে।'

'আপাতত ওখানেই থাকছে তা হলে?'

'হ্যাঁ।'

'কাল একবার যাব।'

'হ্যাঁ, যাওয়া দরকার।'

ম্যাপ বইতে বর্মার মানচিত্র দেখেছে বিনু। ভারতবর্ষের ঠিক গায়েই ব্রহ্মদেশ। আরাকান ইরাবতী পেগু মান্দালয়—সে দেশের নদ-নদী শহর-বন্দরের নাম ভূগোল বইয়ের কল্যাণে তার মুখস্থ। ম্যাপে যত কাছে মনে হয়, ব্রহ্মদেশ আসলে তত কাছে নয়, সে কথা বিনু জানে। ভারতবর্ষ, বিশেষ করে এই রাজদিয়া থেকে বর্মা শত শত মাইল দূরে।

রাজদিয়া নামে জল-বাংলার এক অখ্যাত নগণ্য মফস্বল শহরের লোক বর্মায় গিয়ে দীর্ঘ তিরিশ বছর ছিল, জাপানি বোমার ভয়ে এত কাল পর সপরিবারে পাহাড় পর্বত ডিঙিয়ে আবার জন্মভূমিতে ফিরে এসেছে—সমস্ত ব্যাপারটাই যেন অবিশ্বাস্য। একধারে দাঁড়িয়ে ত্রৈলোক্য সেনদের কথা শুনতে শুনতে বিস্ময়ে চোখে আর পলক পড়ছিল না বিনুর। বুকের ভেতর শ্বাস যেন বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ সে চেঁচিয়ে উঠল, 'তোমার সঙ্গে আমিও যাব দিদা—' ত্রৈলোক্য সেনদের দেখবার জন্য মনে মনে সে অস্থির, উন্মুখ হয়ে উঠেছে।

বিনু যেতে চেয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে ঝিনুকও সুর ধরল, 'আমিও যাব ঠামু—'

দেখা গেল সুধা সুনীতি, এমন কি সুরমা-শিবানী-অবনীমোহনেরও এ ব্যাপারে বেশ আগ্রহ। বর্মা-ফেরত মানুষগুলোকে দেখার জন্য সকলে যেন পা বাড়িয়ে আছে।

স্নেহলতা বললেন, 'সবাই যাবে।' বলেই হেমনাথের দিকে ফিরলেন, 'ওদের জিজ্ঞেস করেছ?'

হেমনাথ বললেন, 'কী?'

'টাকাপয়সা কি অন্য কিছুর দরকার আছে কিনা?'

'না। সবে এসেছে। তা ছাড়া, রামকেশব নিজের বাড়ি নিয়ে গেছে। এক্ষুনি জিজ্ঞেস করাটা খারাপ দেখায়।'

একটু চুপ করে থেকে স্নেহলতা বললেন, 'আমি কিন্তু কাল ত্রৈলোক্য ঠাকুরপোকে জিজ্ঞেস করব।'

চিন্তিত মুখে হেমনাথ বললেন, 'কোরো। তবে রামকেশবের সামনে না।'

'তা তোমাকে বলে দিতে হবে না। আমার ঘটে সেটুকু বুদ্ধি আছে।' স্নেহলতা হাসলেন।

'আছে নাকি?' হেমনাথও হাসলেন।

বাকি দিনটা ত্রৈলোক্য সেনদের নিয়ে আলোচনাতেই কাটল।

ত্রৈলোক্য সেনের বাবা ছিলেন নাম-করা কবিরাজ, লোকে বলত স্বয়ং ধন্বন্তরি। অম্বিকা কবিরাজ ছুঁলেই নাকি রোগ অর্ধেক সেরে যেত। কবিরাজি তাঁদের কৌলিক ব্যবসা, বংশ পরম্পরায় চলে আসছিল। বিপুল পশার ছিল অম্বিকা কবিরাজের। ঢাকা-বরিশাল-ময়মনসিংহ, দেশ বিদেশ থেকে তাঁর ডাক আসত। প্রচুর পয়সাও করেছিলেন। লোকে সম্মান করত, ভক্তি করত।

জল-বাংলার দূর-দূরান্ত থেকে চিকিৎসাশাস্ত্র শিখতে অম্বিকা সেনের কাছে ছাত্ররা আসত। কিন্তু হাজার চেষ্টা করেও নিজের ছেলেকে কুলবিদ্যা ধরাতে পারেন নি অম্বিকা সেন। বংশগত ব্যবসা না করুক, ছেলে অন্তত লেখাপড়া শিখে মানুষ হোক, এই আশায় ত্রৈলোক্যকে ইংরেজি স্কুলে পাঠিয়েছিলেন অম্বিকা কবিরাজ। তখন ইংরেজির খুব রবরবা, তার তোপের মুখে ভারতবর্ষের যত প্রাচীন বিদ্যা উড়ে যাচ্ছে। এক-আধ পাতা 'এ বি সি' শিখলেও করে খেতে পারবে।

কিন্তু দু'চার বছরের বেশি ইংরেজি স্কুলে যাতায়াত করেন নি ত্রৈলোক্য সেন। আসলে লেখাপড়ায় মনটি ছিল না। যৌবনের শুরুতেই বেছে বেছে খারাপ সঙ্গী জোগাড় করেছিলেন। কুসঙ্গে পড়ে

নেশা-টেশা ধরেছিলেন, মাঝে মাঝে বাইরে রাত কাটিয়ে আসতেন। অনেক বার যুগীপাড়া, তেলীপাড়া থেকে মার খেয়ে এসেছেন।

ছেলের চরিত্র শোধরাবার জন্য কম বয়সেই বিয়ে দিয়েছিলেন অম্বিকা সেন। সে আমলে মেয়েদের ছোটবেলাতেই বিয়ে হত। ঘরে যাতে ছেলের মন বসে, তাই খুঁজে খুঁজে সুন্দরী, যুবতী পুত্রবধূ এনেছিলেন। তাতে কাজও হয়েছিল। ত্রৈলোক্য সেন আর বাড়ি থেকে বেরুতেন না।

ছেলেকে তরুণী মেয়ে ঘুষ দিয়ে নিজের ইচ্ছামতো হয়তো চালাতে পারতেন, কিন্তু তার আগেই অম্বিকা সেন মারা গেলেন। বাবার মৃত্যুর পর তাঁর যা কিছু সঞ্চয় ভেঙে ভেঙে খেলেন ত্রৈলোক্য সেন। তারপর একে একে দেড়শ' কানি ধানজমি বেচলেন। পৈতৃক বাড়িখানা ছাড়া যখন আর কিছু নেই, সেই সময় একদিন ছেলেপুলে এবং স্ত্রীকে নিয়ে সুদূর বর্মায় পাড়ি দিলেন ত্রৈলোক্য। এত রাজ্য থাকতে কেন যে মগের মুল্লুকে গেলেন, তিনিই জানেন।

সে কি আজকের কথা! তিরিশ বছর আগে, তখন প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হয় নি, ত্রৈলোক্য সেন বর্মা গিয়েছিলেন। সেখান থেকে হেমনাথকে একখানা মোটে চিঠি লিখেছেন। তারপর এতকাল রাজদিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক ছিল না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের জাপানি বোমার ভয়ে দেশে ফিরে আসতে হল তাঁকে।

ভাগ্যের সন্ধানে বর্মায় গিয়েছিলেন ত্রৈলোক্য সেন। ভাগ্য তাঁকে ছলনা করে নি, দশ হাতে ঢেলে দিয়েছিল। কাঠের ব্যবসা করে অজস্র পয়সা করেছিলেন, বাড়িঘর করেছিলেন। কিন্তু জীবন এমন ব্যঙ্গরসিক যে সব ফেলে চলে আসতে হয়েছে।

পরদিন বিকেলবেলা বিনুরা রামকেশবের বাড়ি গেল।

ত্রৈলোক্য সেনরা যে জাপানি বোমার ভয়ে চলে এসেছে, সে খবর জানতে কারোর বুঝি বাকি নেই। সারা রাজদিয়া রামকেশবের বাড়িতে ভেঙে পড়েছে। রাজদিয়া কেন, আশেপাশের গ্রাম-গঞ্জ থেকেও অনেকে এসেছে। সবার চোখে মুখে আগ্রহ, বিস্ময়, ভয় এবং আতঙ্ক।

বিনুরা যেতেই সাড়া পড়ে গেল। চারপাশের ভিড়টা বলাবলি করতে লাগল, 'হ্যামকত্তার বাড়িত্ থিকা আইছে।'

'ভিতরে যাইতে দাও।'

খবর পেয়ে রামকেশব ছুটে এলেন। সম্ভ্রমের সুরে বললেন, 'আসুন, আসুন বউ-ঠাকরুন। কাল হেমদাদা এসেছিলেন, তাঁর মুখে নিশ্চয়ই ত্রৈলোক্যদাদার খবর পেয়েছেন—'

স্নেহলতা বললেন, 'হ্যাঁ। সেই জন্যেই তো ছুটে এলাম।'

'তা জানি। নইলে—'

জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে থাকলেন স্নেহলতা।

রামকেশব আবার বললেন, 'ত্রৈলোক্যদাদা এসেছেন বলে গরিবের বাড়ি আপনার পায়ের ধুলো পড়ল।'

চোখ কুঁচকে, মাথা নেড়ে নেড়ে, কপট রাগের গলায় স্নেহলতা বললেন, 'আমি বুঝি আসি না?'

'কই আর আসেন। কদ্দিন পর এলেন, চট করে বলে দিতে পারবেন?'

রণে ভঙ্গ দিলেন স্নেহলতা। হাসতে হাসতে বললেন, 'হিসেব-নিকেষ ভবিষ্যতের জন্যে থাক। এখন সেন ঠাকুরপোর কাছে নিয়ে চলুন।'

কৌতুকের গলায় রামকেশব বললেন, 'অমন মোহন হাসি হাসলে চলবে না। কোমর বেঁধে ঝগড়া করব। তবে ছাড়ব।'

'আচ্ছা, আমি তার জন্যে তৈরি।'

'দেখা যাবে।'

রামকেশব তাঁদের নিয়ে দোতলার একটা ঘরে এলেন। এ ঘরে সব চাইতে বেশি ভিড়। একটি লম্বামতো সুপুরুষ বৃদ্ধকে ঘিরে রাজদিয়াবাসী অনেক লোকজন বসে আছে।

বৃদ্ধ কিছু বলছিলেন। আর চারধারের জনতা উদ্‌গ্রীব হয়ে শুনেছিল। শ্বাস টানতে পর্যন্ত তারা

pathagar.net

ভুলে গেছে।

ঢুকেই রামকেশব ডাকলেন, 'সেনদাদা—'

বোঝা গেল উনিই ত্রৈলোক্য সেন। রামকেশব বললেন, 'আপনার আরও শ্রোতা এসেছে।' বলে স্নেহলতাকে দেখিয়ে দিলেন, 'এঁকে চিনতে পারছেন?'

একদৃষ্টে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন ত্রৈলোক্য। ধীরে ধীরে বললেন, 'চেনা চেনা লাগছে, কিন্তু ঠিক ধরতে পারছি না।'

রামকেশব বললেন, 'আমাদের বউ-ঠাকরুন। হেমদাদা—'

চোখের তারায় আলো নেচে গেল ত্রৈলোক্যের, 'আর বলতে হবে না। ওঃ, কতকাল পর আপনাকে দেখলাম। চিনবার কি উপায় আছে! চুলটুল সব পাকিয়ে ফেলেছেন।'

'চুল পাকবে না? আয়নায় নিজের চেহারাখানা দেখেছেন? আপনিও কিন্তু আর নবীন যুবকটি নেই।'

'তা যা বলেছেন।' বলতে বলতে উঠে এসে স্নেহলতাকে প্রণাম করলেন ত্রৈলোক্য।

বিব্রতভাবে পিছোতে পিছোতে স্নেহলতা বললেন, 'থাক থাক, আবার প্রণাম কেন?'

ত্রৈলোক্য বললেন, 'আপনি আমাদের প্রণামের পাত্রী, তাই—'

রামকেশব এরপর একে একে অবনীমোহন সুরমা সুধা সুনীতিদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন।

পরিচয়-পর্ব চুকলে ত্রৈলোক্য বললেন, 'বেশ বেশ। বসুন বউ-ঠাকরুন, বোসো বাবা অবনী। সুরমা তোমরাও বোসো।'

সবাই বসবার পর স্নেহলতা বললেন, 'আপনাকে তো দেখছি। আমার বোন, ছেলে, ছেলের বউ, নাতি-নাতনীরা কোথায়?'

'বড় নাতি ছাড়া আর সবাই আমাদের বাড়ি দেখতে গেছে।'

'আপনাদের বাড়ি কি আর বাসের যোগ্য আছে?'

'কী করে থাকবে বলুন। কতকাল আমরা দেশছাড়া। বাড়িঘর এখন জঙ্গলে বোঝাই। সাপখোপের আস্তানা হয়ে উঠেছে। আজ থেকে কামলা লাগল। বাড়ি সারিয়ে সুরিয়ে যেতে হবে তো। রামকেশবের ওপর কদ্দিন আর জুলুম করব!' বলতে বলতে হঠাৎ কী মনে পড়তে গলা চড়িয়ে ডাকতে লাগলেন, 'শ্যামল কোথায় রে, শ্যামল—'

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দরজায় যে ছেলেটি এসে দাঁড়াল তার বয়স চোদ্দ পনেরর মতো, বিনুর প্রায় সমবয়সী, কি বছর খানেকের বড়।

কোঁকড়া কোঁকড়া চুল, লম্বাটে মুখ, ভাসা ভাসা বড় চোখ, গায়ের রংখানি উজ্জ্বল শ্যাম। সব মিলিয়ে চেহারাটি ভারি মিষ্টি, তাকালেই চোখ স্নিগ্ধ হয়ে যায়। ছেলেটির শ্যামল নাম সার্থক। নামের সঙ্গে চেহারার এমন মিল কদাচিৎ দেখা যায়।

ত্রৈলোক্য ডাকলেন, 'আয়—'

ছেলেটি ভেতরে এল। ত্রৈলোক্য বললেন, 'এই আমার বড় নাতি।'

স্নেহলতাদের দেখিয়ে শ্যামলকে বললেন, 'ইনি ঠাকুমা। উনি হলেন পিসিমা, উনি পিসেমশায়, ওঁরা দিদি। যাও প্রণাম কর।'

টিপ টিপ করে স্নেহলতা-সুরমা-অবনীমোহন-সুধা-সুনীতির পায়ে কপাল ঠেকিয়ে বিনুর পাশে গিয়ে বসল শ্যামল।

এদিকে ঘরে অন্য লোকজন যারা আগে থেকে বসে ছিল, অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছে। কিছু অবশ্য বলছে না। তবে মুখ চুখ দেখে তা টের পাওয়া যায়।

স্নেহলতা লক্ষ করছিলেন। বললেন, 'আমরা আসবার আগে কী কথা হচ্ছিল সেন ঠাকুরপো?'

'এই বর্মার কথা বলছিলাম সবাইকে।'

রামকেশব বিনুদের পৌঁছে দিয়ে চলে যান নি, একধারে দাঁড়িয়ে ছিলেন। বললেন, 'সেনদাদা, কাল থেকে কতবার যে বর্মার কথা বলছে, লেখাজোখা নেই। সারাদিন লোক আসছে, সারাদিন বকবকানি চলছে। বকতে বকতে মুখে ফেনা উঠবার জোগাড়।'

ত্রৈলোক্য হাসলেন, 'কী আর করা যাবে। লোকে এত আগ্রহ নিয়ে আসছে। না শুনিয়ে পারি কখনও?'

স্নেহলতা বললেন, 'আমরাও কিন্তু বর্মার গল্প শুনতে এসেছি।'

ত্রৈলোক্য বললেন, 'নিশ্চয়।' বলে ভিড়টার দিকে তাকালেন, বউ-ঠাকরুন এসেছে। তাহলে গোড়া থেকে আবার শুরু করা যাক।'

দেখা গেল, এ ব্যাপারে কারোর আপত্তি নেই। সবাই মাথা নেড়ে বলল, 'হ হ, হেই ভালা। আরেক বার শুনা যাইব।'

ত্রৈলোক্য আরম্ভ করলেন। বেশ সুখেই ছিলেন তাঁরা বর্মায়। হঠাৎ কেন যে যুদ্ধ লাগল! আর লাগবিই যদি, পৃথিবীতে ঢের জায়গা পড়ে ছিল। সেসব ছেড়ে জাপানি ব্যাটারা এসে বর্মার ওপর বোমা ফেলল। চোখে না দেখলে বিশ্বাস হয় না, পলক পড়তে না পড়তে বহুকাল ধরে তিল তিল যত্নে গড়ে ওঠা মনোরম জনপদ কিভাবে ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। বাড়িগুলো তাসের ঘরের মতো কাত হয়ে পড়ল। রাস্তায় রাস্তায় প্রকাণ্ড গর্ত। আহত মানুষের চিৎকার, মানুষের স্তূপাকার মৃতদেহ, ঘন ঘন সাইরেনের শব্দ, ঝাঁক ঝাঁক জাপানি প্লেনের আক্রমণ—সব মিলিয়ে বর্মা যেন নরকের আরেক নাম।

ত্রৈলোক্য বলতে লাগলেন, 'বোমা পড়বার সঙ্গে সঙ্গে রেঙ্গুন টেঙ্গুন থেকে পালোনোর হিড়িক লেগে গেল। কিন্তু যাবে কোথায়? বার্মিজরা গ্রামের দিকে পালাল। আর ইন্ডিয়ানরা ভারতবর্ষের দিকে পা বাড়াল। কিন্তু আসতে চাইলেই তো আসা যায় না। দশ দিন পর একটা করে কলকাতার জাহাজ। দামের তিন গুণ দিয়েও তার টিকিট পাওয়া যায় না। সেই জাহাজ আসাও একদিন বন্ধ হয়ে গেল। এদিকে রেঙ্গুনে বসে থাকা মানে নির্ঘাত মৃত্যু। অগত্যা বহু মানুষ হাঁটা পথ ধরল, আমরাও পা দু'খানার ওপর ভরসা করে রওনা হলাম।'

স্নেহলতা বললেন, 'তারপর?'

'সে যে কী কষ্ট, বলে বোঝাতে পারব না বউ-ঠাকরুন। পাহাড় পর্বত বন-জঙ্গলের ভেতর দিয়ে ছেলেমেয়ে নিয়ে দিনের পর দিন হাঁটছি তো হাঁটছিই। হাঁটতে হাঁটতে পা ফুলে গেল। কত লোক যে রাস্তায় পড়ে মরেছে, তার হিসেব নেই। খাদ্য নেই, জল নেই। খিদের জ্বালায় পেট পুড়ে গেছে, তেষ্টায় ছাতি ফেটে গেছে। কোথাও ঝরনা দেখে হয়তো ছুটে গেছি। কাছে যেতেই চোখে পড়েছে, দা হাতে মগেরা দাঁড়িয়ে আছে। দশ টাকা করে দিলে এক বালতি জল পাওয়া যাবে। ভয়ে ভয়ে ফিরে এসেছি। কোথাও বনের ভেতর কলা ফলে আছে। সেখানেও দা হাতে মগ। হাঁটতে হাঁটতে বাচ্চাগুলোর জ্বর হয়ে গেল। তাদের কাঁধে তুলে চলতে লাগলাম।'

স্নেহলতা বললেন, 'আহা রে—'

বর্মা থেকে রাজদিয়া পর্যন্ত পথের ভয়াবহ নিদারুণ বর্ণনা দিয়ে যেতে লাগলেন ত্রৈলোক্য, 'রাস্তায় কতবার যে ডাকাতের হাতে পড়েছি তার হিসেব নেই। শুধু আমরাই তো নই, বর্মা থেকে আরও অনেক মানুষ আসছিল। ডাকাতরা যদি টের পেয়েছে, কারোর সঙ্গে টাকা পয়সা সোনাদানা আছে, গলার কাছে রামদা ধরে সব কেড়ে কুড়ে নিয়েছে। দিতে না চাইলে স্রেফ কেটে ফেলেছে। এভাবে যে কত লোক প্রাণ দিয়েছে তার হিসেব নেই বউ-ঠাকরুন।'

মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনে যাচ্ছিল বিনু। হঠাৎ পাশ থেকে কে ডাকল, 'এই—'

চমকে সেদিকে তাকাল বিনু। দেখল সেই ছেলেটা, যার নাম শ্যামল। চোখাচোখি হতেই শ্যামল হাসল। বলল, 'তোমার নাম কি ভাই?'

বিনু স্কুলের ভাল নামটাই বলল, 'বিনয়কুমার বসু—'

শ্যামল বেশ সহজ সাবলীল ছেলে, সঙ্কোচ টঙ্কোচ তার নেই বললেই হয়। হাসতে হাসতে বলল, 'ও তো ভাল নাম। মস্ত বড়। ডাক-নাম নেই তোমার?'

'আছে। বিনু—'

'সুন্দর নাম তো।'

বিনু বলল, 'তোমার নামটাও সুন্দর।'

শ্যামল বলল, 'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ।'

'সবার সঙ্গে দাদু আলাপ করিয়ে দিয়েছেন, শুধু তোমার সঙ্গেই বাদ।'

কথাটা ঠিক। বিনু বলল, 'হয়তো খেয়াল করেননি।'

শ্যামল বলল, 'সে যাক গে। তোমার সঙ্গে আমি কিন্তু সেধে আলাপ করলাম। রাগ করলে না তো?'

'বা রে, রাগ করব কেন?'

'তুমি কোন ক্লাসে পড় ভাই?'

'এবারে নাইনে উঠেছি।'

শ্যামল উৎসাহিত হয়ে উঠল, 'রেঙ্গুনে আমি ক্লাস এইটে পড়তাম। এ বছর নাইনে উঠবার কথা ছিল। ভালই হল, নাইনে ভর্তি হব, তোমার সঙ্গে পড়ব।' একটু থেমে বিমর্ষ সুরে আবার বলল, 'কিন্তু বিনু—'

'কী?'

'আমাকে কি এখানে ক্লাস নাইনে নেবে?'

'কেন নেবে না?'

'আমার যে ভাই ওখানে অ্যানুয়াল পরীক্ষা দেওয়া হয়নি। ট্রান্সফার সার্টিফিকেট আনতে পারিনি। আসব কী করে বল? জাপানিদের বোমা পড়ল। সব ফেলে পালিয়ে আসতে হল—'

বিনু বলল, 'এখানে ভর্তি হতে হলে একটা অ্যাডমিশন টেস্ট দিতে হবে। আমিও কলকাতা থেকে এসে অ্যাডমিশন টেস্ট দিয়ে ভর্তি হয়েছিলাম।'

চিন্তিত মুখে শ্যামল শুধলো, 'খুব কঠিন পরীক্ষা নেয়?'

নিজের ফাঁড়া তো কেটে গেছে। মুরুব্বিয়ানা চালে বিনু বলল, 'তেমন কঠিন আর কি—'

শ্যামল বলল, 'বড্ড ভয় করছে।'

বিনু শ্যামলের সঙ্গে কথা বলছিল ঠিকই। কিন্তু তার কান দু'টো ছিল ত্রৈলোক্য সেনদের দিকে। জাপানি বোমার ভয়ে দুর্গম পাহাড় পর্বত ডিঙিয়ে পালিয়ে আসার দীর্ঘ রোমাঞ্চকর বিবরণ শোনার মতো উন্মাদনা আর কী থাকতে পারে? প্রবল আকর্ষণে ত্রৈলোক্য বিনুকে তাঁর দিকে টানছিলেন।

বিনু যে মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছে, শ্যামল তা লক্ষ করছিল। বলল, 'দাদুর কথা বুঝি ভাল লাগছে?'

বিনু মাথা নাড়ল, 'হ্যাঁ।'

'দাদু আর কতটুকু বলছে! আমি তোমাকে পরে সব বলব। জাপানিরা প্রথম দিন এসে কেমন করে বোমা ফেলল, ইংরেজ সৈন্যরা তখন কী করছিল, আমরা কী করছিলাম, রেঙ্গুনের লোকেরা কী করছিল, আমরা কেমন করে এলাম—সব বলব। কত শুনতে পার তখন দেখা যাবে। শোনাতে শোনাতে কান একেবারে ঝালাপালা করে ছাড়ব। এখন আমার সঙ্গে গল্প কর দেখি।'

কী আর করা, ত্রৈলোক্য সেনের গল্পের আশা ছাড়তে হল বিনুকে। চোখ কান মেলে শ্যামলের দিকে তাকাল সে।

শ্যামল বলল, 'তখন কলকাতার কথা কী বলছিলে?'

বিনু বলল, 'আমরা কলকাতায় থাকতাম।'

'কবে এসেছ?'

'বছর দেড়েকের কাছাকাছি।'

'রাজাদিয়াতে তোমরা কোথায় থাকো?'

কোথায় থাকে, বিনু বলল।

'তোমাদের বাড়ি একদিন যাব।'

'নিশ্চয়ই যাবে।'

'তোমাকেও আসতে হবে। তোমাকে আমার খুব ভাল লেগেছে।'

'আসব। তোমাকেও আমার ভাল লেগেছে।'

দু'জনের মধ্যে টুকরো টুকরো, এলোমেলো, অসংলগ্ন গল্প চলতে লাগল। কথা বলতে বলতে বিনুর হঠাৎ মনে পড়ল, ঝুমার সঙ্গে এখানেই তার আলাপ হয়েছিল। সেই দুঃসাহসী, ভয়লেশহীন মেয়েটা! কতকাল তার সঙ্গে দেখা হয় না! ঝুমার কথা ভাবতে গিয়ে মনটা খারাপ হয়ে গেল বিনুর।

ওধারে একসময় ত্রৈলোক্য সেনের বিচিত্র ভয়াবহ অভিজ্ঞতার কাহিনী শেষ হল।

স্নেহলতা ছাড়া একে একে অন্য শ্রোতার দল চলে যেতে লাগল।

সবাই চলে গেলে ঘর যখন ফাঁকা, স্নেহলতা শুধোলেন, 'একটা কথা সেন ঠাকুরপো—'

ত্রৈলোক্য সেন উৎসুক চোখে তাকালেন, 'কী?'

'মগের মুল্লুকে সবই তো ফেলে টেলে এসেছেন। কিছুই আনতে পারেন নি।'

'হ্যাঁ।'

'টাকাপয়সার দরকার থাকলে কিন্তু বলবেন। একটুও লজ্জা করবেন না।'

'আপনাদের কাছে লজ্জার কিছু আছে নাকি! তবে—'

'কী?'

'টাকাপয়সার এখন দরকার নেই বউ-ঠাকরুন।'

কিছুই আনতে পারেন নি অথচ পয়সাকড়ির প্রয়োজন নেই, ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছিলেন না স্নেহলতা। বিমূঢ়ের মতো তিনি তাকিয়ে থাকলেন।

স্নেহলতার মনোভাব খানিক যেন অনুমান করতে পারলেন ত্রৈলোক্য। হাসতে হাসতে বললেন, 'তা হলে আপনাকে একটা কথা বলি—'

'কী?'

'হাজার বিশেক টাকা আমি আনতে পেরেছি।'

'কিভাবে?' বিস্ময়ে আর উত্তেজনায় গলা কাঁপতে লাগল স্নেহলতার, 'ডাকাতরা ধরে নি?'

আস্তে আস্তে মাথা নেড়ে ত্রৈলোক্য সেন বললেন, 'সে একটা চালাকি করেছিলাম বউ-ঠাকরুন। পা যেন ভেঙে গেছে, তা দেখাবার জন্যে হাঁটু থেকে গোড়ালি পর্যন্ত ব্যান্ডেজ করে নিয়েছিলাম। ব্যান্ডেজের ভাঁজে ভাঁজে একশ' টাকার নোট রেখেছি। লোকের চোখে ধুলো ছিটোবার জন্যে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটতাম। কিরকম ফন্দি খাটিয়েছিলাম বলুন তো?' চোখেমুখে গর্বের ভাব ফুটিয়ে ত্রৈলোক্য তাকালেন।

গালে হাত দিয়ে মাথাটি হেলিয়ে দিলেন স্নেহলতা, 'বাব্বা, আপনার মাথায় এতও এসেছিল?'

ত্রৈলোক্য হাসতে লাগলেন, 'হাজার হোক ওরা মগ ডাকাত। আর আমি—'

'আপনি কী?'

'ঢাকাইয়া পোলা।' শব্দ দু'টো পূর্ব বাংলার টান দিয়ে উচ্চারণ করলেন ত্রৈলোক্য।

স্নেহলতা এবার হেসে ফেললেন।

কথায় কথায় বেলা ফুরিয়ে এল। শীতের অবেলায় রোদের রং যখন বাসি হলুদের মতো সেই সময় ত্রৈলোক্য সেনের স্ত্রী, ছেলে, ছেলের বউ, অন্য নাতি-নাতনীরা নিজেদের বাড়ি দেখে ফিরে এল।

অগত্যা আরও কিছুক্ষণ বসে যেতে হল বিনুদের। স্নেহলতা ত্রৈলোক্য সেনের স্ত্রী এবং ছেলের বউদের সঙ্গে আলাপ জমিয়ে ফেললেন।

দেখতে দেখতে সন্ধ্যা নেমে এল। নদীর দিক থেকে ঠান্ডা বাতাস ছুটে আসতে লাগল। হিমে-কুয়াশায় চারদিক ঝাপসা, অস্পষ্ট। কাছাকাছি ঝোপঝাড়গুলোর ভেতর থেকে শিয়ালের ডাক ভেসে আসছে। আলোর ছুঁচের মতো অন্ধকারকে বিঁধে বিঁধে জোনাকিরা একবার জ্বলছে, একবার নিবছে। সারা রাতের জন্য এই জ্বলা এবং নেবার খেলা চলবে।

বাইরের দিকে তাকিয়ে চঞ্চল হলেন স্নেহলতা, 'এবার আমরা যাই বোন।'

ত্রৈলোক্য সেনের স্ত্রী বললেন, 'এখনই যাবেন দিদি?'

'হ্যাঁ। রাতের রান্না পড়ে আছে। গিয়ে বসাতে হবে। তোমরা যেও—'

pathagar.net

'বুঝতেই তো পারছেন দিদি, এখন যাওয়ার খুব অসুবিধে। নিজের বাড়িঘরে থিতু হয়ে বসি, তারপর যাব।'

'তোমাদের বাড়ি সারাই হতে কদ্দিন লাগবে?'

'আজই সবে কামলা লাগল। সাত আট দিনের আগে হবে বলে তো মনে হয় না।'

'বাড়ি গিয়ে বসবার পরই তা হলে যেও।'

'যাব। আপনারও আসবেন।'

'আসব।' বলতে বলতে উঠে পড়লেন স্নেহলতা।

দিনকয়েক পর শ্যামল বিনুদের ক্লাসে ভর্তি হয়ে গেল। এখন রোজই তার সঙ্গে দেখা হয়। দিনের অনেকখানি সময় এক সঙ্গে কাটে দু'জনের।

কলকাতা থেকে আসার পর এখানে বিশেষ বন্ধু টন্ধু পায় নি বিনু। ক্লাসের ছেলেরা অবশ্য ছিল। কিন্তু তাদের সঙ্গে তেমন মিশত না।

বন্ধুর জন্য বিনুর প্রাণের যে জায়গাটা ফাঁকা পড়ে ছিল, শ্যামল এসে তা ভরিয়ে তুলল।

টিফিনের সময় কিংবা স্কুল ছুটির পর বিনুরা নদীর পাড়ে গিয়ে বসে। কখনও হাঁটতে হাঁটতে বরফ কল, স্টিমারঘাটের দিকে চলে যায়।

এর মধ্যে বর্মার অনেক গল্প করেছে শ্যামল। রেঙ্গুন শহর, শোয়েডাগন প্যাগোডা, রয়াল লেক, বর্মিদের জল-উৎসব, সাগরের জলে ভরপুর নীলকণ্ঠ ইরাবতী—এমনি অজস্র গল্প।

একদিন গল্প করতে করতে শ্যামল বলল, 'জানো বিনু, দু'জনের জন্যে আমার ভারি কষ্ট হয়।'

'তারা কে?'

'সুব্রত আর মা-পোয়ে। সুব্রত ছিল আমার প্রাণের বন্ধু, রেঙ্গুনে আমরা এক রাস্তাতেই থাকতাম। বোমা পড়বার পর সবাই যখন পালাচ্ছে, সুব্রতরা জাহাজের টিকিট পেয়ে গেল। ওরা কলকাতায় এসেছিল, তারপর কোথায় গেছে, কে জানে। জীবনে আর হয়তো কোনও দিন ওর সঙ্গে দেখা হবে না।' বলতে বলতে কণ্ঠস্বর ভারী হয়ে ওঠে শ্যামলের। চোখমুখ বিষণ্ণ দেখায়।

বিনু শুধোয়, 'মা-পোয়ে কে?'

'একটা বার্মিজ মেয়ে। ওরা আমাদের পাশের বাড়িতে থাকত। ওর বাবা আমার বাবার বন্ধু। আমাদের বাড়ি ওরা সবসময় আসত, আমরাও ওদের বাড়ি যেতাম। বোমা পড়বার পর মা-পোয়েরা মান্দালয়ের দিকে গেল, আমরা এলাম এই রাজদিয়াতে।'

বিনু এবার কিছু বলল না।

একটু চুপ করে থেকে শ্যামল বলল, 'মা-পোয়ের মা আর বাবা আমাকে খুব ভালবাসতেন। ওঁদের খুব ইচ্ছে ছিল, বড় হলে মা-পোয়ের সঙ্গে আমার বিয়ে দেবেন। আমার মা-বাবারও ইচ্ছে ছিল।'

একটা কথা মনে হতে বিনু তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'মা-পোয়েরা বার্মিজ না?'

'হ্যাঁ।'

'বার্মিজদের সঙ্গে বাঙালির বিয়ে হয়?'

'অনেক হয়েছে। বর্মায় গিয়ে দেখে এস না—'

এরপর আর কেউ কিছু বলল না। শ্যামল উদাস চোখে অনেক দূরে নদীর ওপারে ধূ ধূ বনানীরেখার দিকে তাকিয়ে বসে থাকে।

একদিন স্কুল ছুটির পর বিনুরা অলস পায়ে নদীর পাড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। হঠাৎ তাদের চোখে পড়ল, স্টিমারঘাটে নতুন একটা স্টিমার এসে লেগেছে। গোয়ালন্দ থেকে রোজ সকালে যে সাদা

pathagar.net

ধবধবে স্টিমারটা যাত্রী নিয়ে আসে এটা সেইটা নয়। এর রং ধূসর, আকারেও অনেক বড়।

বিনুরা দেখল, অনেক লোক স্টিমারঘাটের দিকে ছুটছে। দেখাদেখি ওরাও ছুটল এবং মুহূর্তে সেখানে পৌঁছেও গেল।

স্টিমারঘাটের জেটিটাকে ঘিরে মেলা বসে গেছে যেন। রাজদিয়ার যত দোকানদার-আড়তদার-মাছ ব্যাপারি, সবাই ছুটে এসেছে।

স্টিমার, এমনকি জেটির ওপরেও কাউকে যেতে দেওয়া হচ্ছে না। অগুনতি পুলিশ চারদিক ঘিরে রেখেছে। এগুতে চাইলেই লাঠি তুলে তাড়া করে আসছে।

ভিড়ের ফাঁক দিয়ে একসময় বিনুরা দেখে ফেলল, স্টিমার থেকে বিশাল ফৌজ নামছে।

চারপাশের ভিড়টা চাপা, ভীতু সুরে বলাবলি করতে লাগল, 'সৈন্য আইছে। রাইজদাতেও তাইলে যুজ্যু আইসা গেল!'

'হায় আল্লা, কী হইব!'

'হা ভগমান, কপালে কী লেখছিলা!'

কয়েকদিনের ভেতরেই দেখা গেল সেটেলমেন্ট অফিসের পেছন দিকে যে বিশাল ফাঁকা মাঠখানা পড়ে ছিল, তারকাঁটা দিয়ে সেটা ঘিরে ফেলা হয়েছে, এবং তার মধ্যে মিলিটারির জন্য সারি সারি অসংখ্য তাঁবু উঠেছে।

শুধু তাই নয়, বরফকল এবং মাছের আড়তগুলোর ওধারে একেবারে নদীর ধার ঘেঁষে মাইলের পর মাইল নিচু জমি পড়ে ছিল। বর্ষায় জায়গাটা জলে ডুবে যায়, অন্য সময় কাদায় থক থক করে। তার ওপর জলসেঁচি আর বিশল্যকরণীর বন উদ্দাম হয়ে বাড়তে থাকে। কাদাখোঁচা আর পাতিবকের দল নরম মাটিতে হাঁটু পর্যন্ত ডুবিয়ে জলসেঁচির বনে সারাদিন কী যে খুঁজে বেড়ায়!

মিলিটারির নজর পড়ল জায়গাটার ওপর। কোত্থেকে ঠিকাদাররা এসে গেল। চারধারের গ্রাম-গঞ্জ থেকে, নদীর ধু ধু চর থেকে, মোটা মজুরির লোভ দেখিয়ে হাজার দুই তিন লোক জুটিয়ে ফেলল তারা। কানের কাছে কাঁচা পয়সার ঝনঝনানি চলতে থাকলে কতক্ষণ কে আর ঘরে বসে থাকতে পারে!

মজুরদের প্রায় সকলেই ভূমিহীন কৃষাণ। অন্যের জমিতে ধান কেটে, হাল দিয়ে এবং আরও হাজারটা উঞ্ছবৃত্তিতে তাদের দিন কাটত। বছরের বেশির ভাগ সময়ই তাদের জীবনে দুর্ভিক্ষ লেগে আছে।

ঠিকাদাররা প্রথমে তাদের মাটি ভরাটের কাজে লাগাল। নিচু জমিটাকে রাস্তার সমান উঁচু করতে হবে।

সারাদিন কাজ তো চলেই, র [illegible] নিশ্বাস ফেলবার সময় নেই। আলো জ্বালিয়ে মাটি ফেলা হচ্ছে তো হচ্ছেই।

স্কুলে যাবার পথে সময় হয় না। তবে টিফিনে কি ছুটির পর শ্যামলকে সঙ্গে নিয়ে বিনু ওখানে চলে যায়। দু তিন মাইল জায়গা জুড়ে হাজার কয়েক লোক ঝোড়া বোঝাই করে এনে মাটি ফেলছে। মজুরদের ব্যস্ততা, ঠিকাদারের লোকদের ধমক, খিস্তি খেউড়, চিৎকার, হই হই—সব মিলিয়ে বিরাট ব্যাপার।

বিনু বলে, 'ওখানে কী হবে বলতে পার?'

শ্যামল বলে, 'কী জানি—'

ঠিকাদারের লোকেরা, যারা মজুর খাটায়, জিজ্ঞেস করলে বলে, 'দেখ না, কী হয়।' বলেই ব্যস্তভাবে চলে যায়।

একদিন দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে সেই লোকগুলোকে দেখতে পেল বিনু—তাহের, বহির, বুড়ো

খলিল। ওরা সবাই চরের মুসলমান। প্রতি বছর ধানকাটার সময় চুক্তিতে কাজ করতে আসে। এবারও অঘ্রান মাসে এসে তারা বিনুদের ধান কেটে গেছে।

বছরে মাস দুয়েকের মতো বছিররা রাজদিয়ায় এসে থাকে। আসে অঘ্রানের মাঝামাঝি, মাঘ পড়তে না পড়তে চলে যায়। কোনও কোনও বার অবশ্য দেরিও হয়, যেতে যেতে মাঘের শেষ কিংবা ফাল্গুনের শুরু।

ধানকাটার মরশুম বাদ দিলে বছরের অন্য সময় বছিরদের রাজদিয়ায় দেখা যায় না। এবারটা কিন্তু ব্যাতিক্রম। এই তো সেদিন ধান কেটে গেল ওরা। এর মধ্যেই আবার মাটি ভরাটের কাজে ফিরে এসেছে।

বিনুকে এগিয়ে গিয়ে কথা বলতে হল না। মাটি ফেলতে ফেলতে বছিররাই তাকে দেখে ফেলল। দেখামাত্র বছির আর তাহের লম্বা লম্বা পা ফেলে কাছে এল। খুশি গলায় বলল, 'বাবুগো পোলা না?'

বিনু মাথা নাড়ল, 'হ্যাঁ।'

বিনুর হাতে বই খাতা-টাতা ছিল। বছির বলল, 'ইচ্কুল(স্কুল) থিকা আইলেন বুঝিন?'

'হ্যাঁ। একটু আগে ছুটি হল।'

'হ্যামকত্তায় ভালা আছে?'

'হ্যাঁ।'

'জামাইকত্তায়?'

'হ্যাঁ।'

'বাড়ির আর হগলে?'

'সবাই ভাল। তোমরা?'

'খোদা য্যামন রাখছে।'

একটু নীরবতা। তারপর বিনু শুধলো, 'এখানে কদ্দিন কাজ করছ?'

বছির হিসেব করে বলল, 'দশ দিন।' একটু চুপ করে থেকে উজ্জ্বল, উৎফুল্ল মুখে আবার বলল, 'বাহারের কাম ছুটোবাবু।'

বিনু উৎসুক সুরে জানতে চাইল, 'কিরকম?'

'রোজ নয় সিকা কইরা মজুরি। তাইলে হিসাব কইরা দ্যাহেন, দশ দিনে কত ট্যাকা পাইছি। বাপের জম্মে অ্যাত ট্যাকার মুখ আর দেখি নাই।' বলে তাহেরের দিকে তাকাল বছির, 'না কি কও তাহের ভাই?'

দেখা গেল তাহেরের এ ব্যাপারে দ্বিমত নেই। জোরে জোরে মাথা নেড়ে সে বলল, 'সাচা কথা।'

বছির বলতে লাগল, 'হেই ইনামগুঞ্জ, নিশিন্দার চর, চরবেউলা, গিরিগুঞ্জ, কেতুগুঞ্জ, ডাকাইতা পাড়া—যেইহানে যত কিষান আছে, হগলে মাটি কাটার কামে আসছে। আসব না ক্যান? অ্যাত মজুরি, অ্যাত টাকা পাইব কই? শুনতে আছি—'

'কী?'

'সুজনগুঞ্জেও নিকি মাটি কাটার কাম শুরু হইব।'

'কে বললে?'

'পরস্পর কানে আইল।'

'ওখানে মাটিকাটা কেন?'

'সৈন্যগো পেয়োজন (প্রয়োজন)।'

'ওখানেও সৈন্য যাবে!' বিনু অবাক।

বছির বলল, 'হেই তো শুনতে আছি।'

বিনু চুপ করে থাকল।

বছির উৎসাহের গলায় বলতে লাগল, 'এইরকম কাম যদিন মিলে, কিষানরা আর চাষবাস করব না। জমিন ফেলাইয়া হগলে যুজ্যের কামে লৌড়াইব।'

pathagar.net

তাহের বলল, 'আমাগো নসিবে যুজ্যু বাধছে! দুইহান পহা লাড়াচাড়া করতে পারি, পোলামাইয়ারে দুই বেলা প্যাটভরা ভাত দিতে পারি। হায় রে আল্লা, জন্ম ইস্তক কী দিনই না গ্যাছে!'

বছির বলল, 'মাইনষে কয়, যুজ্যু নিকি মোন্দ, আমরা কই যুজ্যু ভালা। যুজ্যুর কালানে (কল্যাণে) বউ-পোলার মুখে হাসন ফুটছে।'

আর কিছুক্ষণ হয়তো গল্প টল্প করত বছিররা, তা আর হল না। ঠিকাদারের একটা লোক শকুনের চোখ নিয়ে চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। সে প্রায় তাড়া করে এল। দাঁতমুখ খিঁচিয়ে লোকটা অশ্লীল খিস্তি দিল প্রথমে। তারপর বলল, 'সুমুন্দির পুতেরা, গপ (গল্প) মারনের জাগা পাও না! দুই ঝোড়া মাটি ফেলাইয়া নয় সিকা পহা গইনা লইতে বড় সুখ! আইজ শালা তোগো মজুরি যদি না কাটি তো আমার নাম ফিরাইয়া রাখিস।'

বছির আর তাহেরের মুখ ম্লান হয়ে গেল। বিষণ্ণ সুরে তারা বলল, 'যাই ছুটোবাবু, অহন আর খাড়নের সোময় নাই।'

বিনু বলল, 'একদিন এস আমাদের বাড়ি।'

'যামু।'

দেখতে দেখতে নদীপাড়ের নীচু জমি উঁচু হল। তার ওপর সারি সারি ব্যারাক উঠল মিলিটারিদের জন্য।

শুধু কি তাই, রাজদিয়ায় আগে বিজলি আলো ছিল না। মিলিটারির কল্যাণে, যুদ্ধের কল্যাণে রাতারাতি তা এসে গেল। অবশ্য বিজলি আলোটা সাধারণ মানুষের জন্য নয়, শুধু মিলিটারির জন্য। রাজদিয়ার একমাত্র বড় রাস্তাটাকে দ্বিগুণ চওড়া করে পিচ ঢেলে চেহারা একেবারে বদলে দেওয়া হল। নতুন নতুন আরও অনেকগুলো কংক্রিটের রাস্তাও তৈরি হল। সব চাইতে মজার ব্যাপার যেটা তা হল এইরকম। এখানকার যত তালগাছ, সেগুলোর মাথা কেটে আলকাতরা দিয়ে কালো রং করে দেওয়া হল, সেগুলোকে এখন অ্যান্টি-এয়ারক্র্যাফট কামানের মতো দেখায়। অনেকগুলো নকল কামানকে নদীর ধারে ধারে আবার হেলিয়ে রাখা হয়েছে।

এখন সারাদিন সারারাত রাজদিয়া জুড়ে কাজ চলছে। অগুনতি ঠিকাদার আর হাজার হাজার মজুর শুধু খেটেই যাচ্ছে। রোড রোলার এবং নানারকম যন্ত্রের শব্দে জায়গাটা আজকাল সরগরম।

রাজদিয়ার গায়ে যেন ময়দানবের ছোঁয়া লেগেছে। এতকাল জায়গাটা যেন ঘুমিয়ে ছিল। শতাব্দীর অতল নিদ্রা থেকে সেটা আচমকা জেগে উঠেছে।

ক'দিন আগেও এখানকার জীবন ছিল স্তিমিত, বেগবর্ণহীন, নিস্তরঙ্গ। তিরতিরে স্রোতের মতো যুগ-যুগান্তরের ওপর দিয়ে নিঃশব্দে, চুপিসারে অতি সঙ্গোপনে সময়ের ধারা বয়ে যেত। রাজদিয়ার সেই শান্ত, অচঞ্চল জীবনযাত্রায় হঠাৎ যেন জলোচ্ছ্বাসের বেগ এসেছে।

আগে আগে সারাদিনে গোয়ালন্দের একখানা স্টিমার আসত। আজকাল যাত্রীবাহী স্টিমার তো আছেই। তা ছাড়া, সপ্তাহে একবার করে মিলিটারিদের সেই স্টিমারটা সৈন্যসামন্ত, লরি-ট্রাক-জিপ এবং অসংখ্য সরঞ্জাম নিয়ে আসছে। মিলিটারিদের স্টিমারটা এলে জেটিঘাট থেকে নতুন ব্যারাকগুলো পর্যন্ত রাস্তাটা দিয়ে লোক চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়। কাছাকাছি কারোকে এগোতে পর্যন্ত দেওয়া হয় না। সাধারণ পুলিশ টুলিশ নয়, কয়েক শ' মিলিটারি পুলিশ জায়গাটাকে ঘিরে ফেলে। তারপর কী সব জিনিসপত্র ঢাকাঢুকি দিয়ে সবার অলক্ষ্যে ব্যারাকের দিকে নিয়ে যাওয়া হয়।

আড়ালে রাজদিয়ার বাসিন্দারা ফিসফিস করে, 'শালারা কী আনছে কও দেখি?'

'ক্যামনে কই?'

'আমার মনে লয়, কামান আর গোলাগুলি।'

'হইতে পারে। ঢাইকা ঢুইকা আনে ক্যান?'

'কী জানি। যুজ্যে বুঝি গুপন (গোপন) রাখা নিয়ম।'

বিনু লক্ষ করেছে, প্রথম দিন স্টিমারটা এসেছিল দুপুরবেলায়। আজকাল বেশির ভাগ আসে রাতের দিকে। রাত্রিবেলা কখন আসে, টের পাওয়া যায় না। সমস্ত রাত ওখানে থেকে কী করে, কে বলবে। তবে সকাল হলেই রাজদিয়াবাসীরা দেখতে পায়, স্টিমারটা জেটিঘাট ছেড়ে চলে যাচ্ছে।

আগে ফিটন আর কদাচিৎ দু'একখানা সাইকেল ছাড়া এখানে অন্য কোনও রকম গাড়িটাড়ি ছিল না। ইদানীং দিনরাত রাজদিয়ার হৃৎপিন্ড কাঁপিয়ে মিলিটারি ট্রাক-জিপ ছুটতে থাকে। শোনা যাচ্ছে, এখানে নাকি একটা এরোড্রোমও তৈরি হবে।

মিলিটারি ব্যারাক, রাস্তাঘাট, বিজলি আলো—এত কিছু হয়েছে রাজদিয়াতে, তবু যেন কাজের শেষ নেই। ব্যারাকের উলটো দিকের ফাঁকা জায়গাগুলোতে ক্যাঁচা বাঁশের চালা তুলে ঠিকাদার আর মজুরদের থাকবার ব্যবস্থা হয়েছে।

আগে রাজদিয়াতে চায়ের দোকান একটাও ছিল না। দোকান দূরের কথা, চা খাওয়ার রেওয়াজই ছিল না। রাজদিয়ার মোট সাতটি বাড়িতে চা ঢুকত। আজকাল মজুরদের অস্থায়ী আস্তানাগুলোর গায়ে কম করে কুড়িটা চায়ের দোকান বসেছে।

এক ছুটির দিনের সকালে পুবের ঘরের দাওয়ায় বসে হেমনাথরা আসর জমিয়েছেন। স্কুল কলেজ বন্ধ। রান্নাবান্নার তাড়া ছিল না। সকাল থেকেই দিনটার গায়ে যেন আলস্য মাখানো। স্নেহলতারা পর্যন্ত রান্নাঘর ছেড়ে গল্প করতে বসেছেন।

কথা হচ্ছিল এই রাজদিয়া নিয়ে। খুব চিন্তিত মুখে হেমনাথ বললেন, 'কী জায়গা ছিল আর এখন কী দাঁড়িয়েছে!'

অবনীমোহন বললেন, 'আমরা এসেও যা দেখেছি তা আর নেই। রাতারাতি সব বদলে গেল।'

'তা বদলাক। রাস্তাঘাট হয়েছে। ইলেকট্রিক আলো এসেছে। এখন অবশ্য মিলিটারির জন্যে, দু'দিন পর আমাদের ঘরেও আসবে। কিন্তু—'

'কী?'

'একটা বড় সাঙ্ঘাতিক খবর শুনলাম অবনীমোহন—'

'কী খবর মামাবাবু?'

'মিলিটারিরা মদটদ খেয়ে রামকেশবদের পাড়ায় খুব হামলা করেছে। সেদিন নাকি অতুল নাহাদের বাড়িতে ঢুকে পড়েছিল।'

'আমিও শুনেছি।'

'সন্ধেবেলা মেয়েদের নিয়ে রাস্তায় বেরুনো এখন নিরাপদ নয়। পরশু দিন রাত্তিরে দু'টো মাতাল টমি রুদ্রবাড়ির আরতিকে তাড়া করেছিল। ভাগ্য ভাল, সেইসময় মিলিটারি পুলিশের একটা জিপ এসে পড়ে। তাতে মেয়েটি বেঁচে যায়। বেশ শান্তিতে ছিলাম আমরা। কী উৎপাত শুরু হল বল দেখি—'

সুরমা এতক্ষণ চুপচাপ বসে ছিল। শিউরে উঠে বললেন, 'সুধা সুনীতির কলেজও তো ওদিকে। আমি ওদের আর পাঠাব না। কোন দিন কী বিপদ হয়ে যাবে—'

হেমনাথ কী বলতে যাচ্ছিলেন, সেই সময় বাইরের উঠোন থেকে একটা গলা ভেসে এল, 'হ্যামকত্তা—'

হেমনাথ সেদিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, 'কে রে?'

'আমি নিত্য—নিত্য দাস—'

'আয়—আয়—'

একটু পর নিত্য দাস পুবের ঘরের দাওয়ার এসে উঠল। সুজনগঞ্জের হাটে আগেই তাকে দেখেছে বিনু। গলায় তিনকণ্ঠি তুলসীর মালা, মুখে বসন্তর কালো কালো দাগ। পরনে খাটো ধুতি আর ফতুয়া। দেখতে দেখতে এ চেহারা মুখস্থ হয়ে গেছে বিনুর।

নিত্য দাস দাওয়ার এক ধারে মাটির ওপরেই বসে পড়ল।

হেমনাথ বললেন, 'তোদের খবরটবর কী?'

নিত্য দাস বলল, 'আপনেগো আশীব্বাদে ভালাই।'

'বাড়ির সবাই কেমন আছে?'

'ভালা।'

একটু ভেবে হেমনাথ এবার বললেন, 'তারপর এত সকালে কী মনে করে রে?'

নিত্য দাস বলল, 'একখান কামে আইতে হইল। ভাবলাম, রাইজদায় যহন আইলাম, হ্যামকত্তা আর বৌঠাইনের চরণ দশ্‌শন কইরা যাই।'

হেমনাথ হাসতে হাসতে বললেন, 'তুই কাজের মানুষ। শুধু শুধু যে আসিস নি, বুঝতে পেরেছি। তা কাজটা কী?'

'এছ.ডি.ও সাহেবের বাংলায় একবার যাইতে হইব।'

'কেন রে?'

'ক্রাচিন (কেরোসিন), চিনি আর কাপড় কনটোল হইয়া যাইতে আছে।'

হেমনাথ বিস্ময়ের গলায় বললেন, 'কনট্রোল!'

'হ—' আস্তে আস্তে মাথা নাড়ল নিত্য দাস, 'তিনটা জিনিস বাইরে আর মিলব না। গরমেন্ট লাইছেন (লাইসেন্স) দিয়া কনটোলের দোকান খুলব। গরমেন্ট মাথাপিছু একটা হিসাব ঠিক কইরা দিব, তার বেশি চিনি টিনি পাওয়া যাইব না। এছ.ডি.ও সাহেবেরে ত্যাল দিয়া দেখি একহান লাইছেন পাই কিনা—'

'কনট্রোল যে হবে, এ খবর তুই কোথায় পেলি?'

'কয়দিন আগে ঢাকায় গেছিলাম। হেইহানেই শুইনা আইছি।'

'কবে নাগাদ কনট্রোল হবে, কিছু জানিস?'

'দিন তারিখ জানি না, তবে খুব তরাতরিই হইব।'

হেমনাথ এবার আর কিছু বললেন না। তাঁর কপালে দুশ্চিন্তার রেখাগুলি গভীরভাবে ফুটে উঠতে লাগল।

নিত্য দাস কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে চাপা গলায় বলল, 'এছ.ডি.ও সাহেবের কাছে তো যাইতে আছি। শুনছি তেনার জবর খাঁই।'

চমকে হেমনাথ শুধোলেন, 'কিসের খাঁই?'

'ঘুষের। পরস্পর শুনলাম, বিনা ঘুষে লাইছেন বাইর করন যাইব না। হেহ লেইগা—'

'কী?'

'পাচ শ' ট্যাকা আনছি। পাচ শ'তে হইব না হ্যামকত্তা?'

'কী করে বলি? আমি তো আর এস.ডি.ও সাহেবের অন্তর্যামী না।'

'আপনে কত কী দেখছেন, শুনছেন। কত কী জানেন। এট্টা আন্দাজ যদিন দিতেন—'

সে কথার উত্তর না দিয়ে হেমনাথ বললেন, 'কী এমন লাভের কারবার যাতে পাঁচ শ' টাকা ঘুষ দিতে চাইছিস?'

রহস্যময় হেসে নিত্য দাস বলল, 'লাভ আছে বড়কত্তা, লাভ আছে। যদিন না হইব এই সক্‌কালবেলা সুজনগুঞ্জ থিকা লৌড়াইয়া আসুম ক্যান? এছ.ডি.ও'র বাংলায় গিয়া দেখুম আমার আগে আরও কয়জন বইসা আছে।' একটু থেমে আবার বলল, 'আমাগো এইদিকে অহনও কনটোল হয় নাই, কিন্তুক ইনামগুঞ্জে, রসুলপুরে হইয়া গ্যাছে। কনটোলের দোকান দিয়া একেক জন লাল হয়ে গ্যাল।'

'লাল কী করে হবে, বুঝতে পারছি না।'

'তার পথ আছে বড়কত্তা। আপনে তো আর ব্যবসায়ীত্ না। হইলে বুঝতে পারতেন।'

হেমনাথ বিমূঢ়ের মতো তাকিয়ে থাকেন।

নিত্য দাস আবার বলল, 'শুদা কাপড়-চিনি-ক্রাচিনের লাইছেন নিতেই আসি নাই বড়কত্তা। আরও একহান কামেও আইছি—'

'কী কাজ?'

'উই যেইহানে মিলিটারিগো থাকনের বাড়িঘর উঠছে, তার উলটা দিকে মদের দোকান খোলনের লাইছেন দিব গরমেন্ট—'

হেমনাথ চমকে উঠলেন, 'রাজদিয়াতে মদের দোকান খোলা হবে!'

'হ।'

'তুই তার লাইসেন্স নিবি নাকি?'

'হেই রকমই ইচ্ছা—'

হেমনাথ এবার প্রায় চিৎকার করে উঠলেন, 'না, কিছুতেই না।'

হেমনাথ ধীর, স্থির, অচঞ্চল মানুষ। কোনও ব্যাপারে তাঁকে অসহিষ্ণু বা বিচলিত হতে দেখা যায় না। হঠাৎ তাঁকে এরকম চেঁচিয়ে উঠতে দেখে সবাই অবাক, কিছুটা বা চিন্তিত।

নিত্য দাস ভয় পেয়ে গিয়েছিল। কাঁপা গলায় বলল, 'আইজ্ঞা—'

হেমনাথ বলতে লাগলেন, 'তুই না ধর্মকর্ম করিস! নারায়ণ সেবা না করে জল খাস না! তোর এত অধঃপতন হয়েছে! মদের দোকান খুলে এখানকার মানুষের সর্বনাশ করতে চাইছিস!'

'কিন্তুক—'

'কী?'

'এয়া তো ব্যবসা, ধম্মের লগে এয়ার সম্পক্ক কী?'

'সম্পর্ক নেই?'

'থাকলেও আমি বুঝতে পারতে আছি না। হে ছাড়া—'

'আবার কী?'

'আমি যদিন মদের দোকানের লাইছেন না লই, আর কেউ নিয়া নিব—'

'যে খুশি নিক, তুই নিতে পারবি না, এই বলে দিলাম—'

নিত্য দাস উত্তর নিল না। শীতল চোখে হেমনাথের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে মুখ নামাল। একটু পর চলে গেল সে।

নিত্য দাস যা বলেছিল, তা-ই। দেখতে দেখতে খোলাবাজার থেকে চিনি, কাপড় এবং কেরোসিন উধাও হয়ে গেল। সুজনগঞ্জের দোকানদারদের কাছে ধরনা দিলে জোরে জোরে দু'হাত নেড়ে তারা শুধু বলে, 'নাই, নাই—'

চিনি না হলে তবু চলে। কিন্তু কেরোসিন আর কাপড় ছাড়া সংসার অচল। রাজদিয়া, কেতুগঞ্জ, ইসলামপুর, ডাকাইতা পাড়া—সারা তল্লাটের লোক কাপড় কেরোসিনের জন্য দিগ্বিদিকে ছোটোছুটি করতে লাগল।

এই ডামাডোলের ভেতর একদিন দেখা গেল, রাজদিয়াতে কাপড়-কেরোসিন-চিনির জন্য তিনটে কনট্রোলের দোকান বসেছে। একটা কেতুগঞ্জের রায়েবালি শিকদারের, একটা ইসলামপুরের অখিল সাহার, আর তৃতীয়টি নিত্য দাসের।

একজন যাতে বার বার কেরোসিন না নিতে পারে সেজন্য পরিবার পিছু রেশন কার্ডও হল। রেশন কার্ড দেখালে তবেই ওই দুর্লভ বস্তুগুলো পাওয়া যায়।

আরও কিছুদিন পর রাজদিয়াবাসীরা দেখল, মিলিটারি ব্যারাকের উলটো দিকে একটা মদের দোকান খোলা হয়েছে। দোকানটার মালিক আর কেউ না, স্বয়ং নিত্য দাস।

নিত্য দাস মদের দোকান খুলেছে, এই খবরটা এল দুপুরবেলা। শুনে তক্ষুনি হেমনাথ ছুটলেন। স্নেহলতা বারণ করলেন, 'এখন বেরুতে হবে না।'

অবাক বিস্ময়ে হেমনাথ বললেন, 'বেরুব না, বল কী!'

'বেরিয়ে কী হবে? তার চাইতে দু'দন্ড বিশ্রাম কর।'

'তোমার কি মাথা টাথা খারাপ হল স্নেহ! মদের দোকান দিয়ে হারামজাদা সারা রাজদিয়াকে জাহান্নামে পাঠাবে, আর ঘরে বসে আমি বিশ্রাম করব!'

ভয়ে ভয়ে স্নেহলতা বললেন, 'ওখানে গিয়ে তুমি কী করবে?'

pathagar.net

শান্ত অথচ কঠিন গলায় হেমনাথ বললেন, 'যাতে এখানকার সর্বনাশ না করতে পারে গোড়াতেই তার ব্যবস্থা করব।'

'কিন্তু—'

'কী?'

'এটা ওর ব্যবসা—'

'যে ব্যবসা মানুষের ক্ষতি করে তা চালাতে দেওয়া উচিত নয়। এ ব্যাপারে আমার কর্তব্য আছে।'

হেমনাথকে আটকানো গেল না, দুপুরের সূর্য মাথায় নিয়ে তিনি বেরিয়ে পড়লেন।

বেশ কিছুক্ষণ পর হেমনাথ ফিরে এলেন। এখন আর তাঁর দিকে তাকানো যাচ্ছে না। সমস্ত রক্ত বুঝি মুখে গিয়ে জমা হয়েছে। চোখ দু'টো যেন ফেটে পড়বে।

উদ্বিগ্ন মুখে স্নেহলতা শুধোলেন, 'কী হয়েছে?'

হেমনাথ উত্তর দিলেন না।

স্নেহলতা কাছে এগিয়ে এসে আগের স্বরেই আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'কী হয়েছে, বলছ না কেন?'

হেমনাথ এবার বললেন, 'নিত্য আমাকে অপমান করেছে।' অসহ্য আবেগে তাঁর ঠোঁট এবং কণ্ঠস্বর কাঁপতে লাগল।

'অপমান!'

'তা ছাড়া কী?' হেমনাথকে অত্যন্ত উত্তেজিত দেখাল, 'আমি নিত্যকে বললাম দোকান বন্ধ করে দে। কিছুতেই সে শুনল না।'

বিনু-ঝিনুক-অবনীমোহন-সুরমা, হেমনাথকে ফিরতে দেখে সবাই ছুটে এসেছিল। কেউ কিছু বলল না। স্নেহলতাও এবার চুপ করে রইলেন।

হেমনাথ আবার বললেন, 'সারা জীবন মানুষের হিত ছাড়া অহিত চিন্তা করি নি। যাকে যা বলতাম সে তা-ই শুনত, সেইমতো চলত। কিন্তু এই শেষ বয়েসে নিত্য দাস আমার কথাটা রাখল না, আমাকে অমান্য করল।' দুঃখে অভিমানে তাঁর গলা বুজে এল।

আবছা গলায় স্নেহলতা বললেন, 'তখনই তো তোমাকে বললাম, যেও না—'

উত্তর না দিয়ে হেমনাথ ঘরের ভেতর চলে গেলেন। তারপর দুই হাঁটুর ওপর মুখ রেখে আচ্ছন্নের মতো বসে থাকলেন।

বিনু দাঁড়িয়ে ছিল। আস্তে আস্তে একসময় এগিয়ে গিয়ে উঁকি দিল। কিছুক্ষণের মধ্যে হেমনাথ যেন একবারে ভেঙেচুরে গেছেন। তাঁকে ক্লান্ত, পরাভূত, মলিন দেখাচ্ছে।

দাদুর অবস্থা খানিকটা অনুমান করতে পারছিল বিনু। রাজদিয়াকে ঘিরে বিশ পঁচিশ মাইলের মধ্যে যত গ্রাম-গঞ্জ-জনপদ, সব কিছুর ওপর ঈশ্বরের মতো ব্যাপ্ত হয়ে আছেন হেমনাথ। তিনি আঙুল তুলে সামান্য একটু ইঙ্গিত করলে চারদিক থেকে হাজার হাজার মানুষ ছুটে আসে। সবাই তাঁকে ভালবাসে, শ্রদ্ধা করে।

যে মানুষ এতকাল শুধু সম্মানই কুড়িয়েছেন, যাঁর প্রতিষ্ঠা ছিল সম্রাটের মতো, জল-বাংলার এই জায়গাটুকু জুড়ে সহস্র হৃদয়ে যাঁর সিংহাসন পাতা, জীবনের শেষ প্রান্তে পৌঁছে সেই হেমনাথ আজ প্রচন্ড আঘাত পেয়েছেন। নিত্য দাস অবাধ্য হবে, হেমনাথের পক্ষে তা ছিল অকল্পনীয়। এই একটি আঘাত তাঁকে একেবারে চুরমার করে দিয়েছে।

অবনীমোহনরা এখনও বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন। স্নেহলতা হঠাৎ ফিসফিস গলায় বললেন, 'কী লক্ষ্মীছাড়া যুদ্ধ যে বাধল! মানুষকে একেবারে বদলে দিচ্ছে। ওই নিত্য দাস আগে আগে এ বাড়িতে পড়ে থাকত। একটা পয়সা ছিল না তার। তোমার মামাবাবু টাকা দিয়ে ব্যবসায় বসিয়ে দিলে। সেই থেকে তার উন্নতি। এখন তার আড়তে সবসময় দু'তিন শ' মণ ধান মজুত থাকে, যখন তখন দশ বিশ হাজার টাকা বার করে দিতে পারে। যার জন্যে এত, তার কথাটাই রাখল না নিত্য দাস!'

অবনীমোহন কিছু বললেন না, বিষণ্ণ মুখে তাকিয়ে থাকলেন।

দিনকয়েক পর সন্ধের সময় যথারীতি খবরের কাগজ পড়ার আসর বসেছে। ইচু মণ্ডল, হাচাই পালরা অন্ধকার নামতে না নামতেই এসে হাজিরা দিয়েছে।

অবনীমোহন পড়ছিলেন, 'রেঙ্গুনের পতন। মাত্র কয়েকদিন আগে সিঙ্গাপুর অধিকার করিবার পর জাপবাহিনী আজ রেঙ্গুন দখল করিয়াছে। মিত্র সৈন্যরা সাফল্যের সহিত পশ্চাদপসরণ করিতেছে।'

'জাপানী আক্রমণের আতঙ্কে কলিকাতা সন্ত্রস্ত। মহানগরী ত্যাগ করিয়া বহু লোকের নানা দিকে পলায়ন—'

হঠাৎ পড়া থামিয়ে অবনীমোহন বললেন, 'কলকাতায় ইভাকুয়েশন শুরু হয়ে গেল মামাবাবু—'

এর ভেতর সেদিনের সেই আঘাতটা অনেকখানি সামলে নিয়েছেন হেমনাথ। বললেন, 'তাই তো দেখছি। আমার মনে হয়, রাজদিয়ার লোক যারা কলকাতায় থাকে, তারাও চলে আসবে।'

হেমনাথ যা অনুমান করেছেন তা-ই। দু'একদিনের ভেতর দেখা গেল স্টিমার বোঝাই হয়ে রাজদিয়ার প্রবাসী সন্তানেরা জাপানি বোমার ভয়ে কলকাতা থেকে চলে আসছে। দেখতে দেখতে নাহাপাড়া, গুহপাড়া, দত্তপাড়া, আদালতপাড়া, কলেজপাড়ার ফাঁকা বাড়িগুলো ভরে গেল।

কলকাতা থেকে যারা এসেছে তাদের মুখে চমকপ্রদ সব খবর পাওয়া যাচ্ছে। জলোচ্ছ্বাসের দিশেহারা ঢলের মতো কলকাতার লোকেরা নাকি যে যেদিকে পারছে পালাচ্ছে। রেলওয়ে বুকিং অফিসগুলোতে দু'মাইল লম্বা 'কিউ' পড়েছে, কিন্তু টিকিট মিলছে না। ন্যায্য দামের সঙ্গে দ্বিগুণ তিনগুণ ঘুষ দিয়েও না। হাওড়া আর শিয়ালদা স্টেশনে ঢুকবার উপায় নেই। একেক ট্রেনে দশটা ট্রেনের যাত্রী উঠছে। বেঞ্চির তলায় পা রাখবার জায়গা নেই। সেখানেও মানুষ। ল্যাট্রিন, পা-দানি, এমনকি ছাদের ওপর উঠেও মানুষ পালাচ্ছে। ছাদে যারা ওঠে তাদের মধ্যে কত লোক যে ওভারব্রিজে ধাক্কা খেয়ে মরছে, হিসেব নেই।

মারোয়াড়ী, হিন্দুস্থানী, গুজরাটিরা জলের দরে বাড়ি বেচে দিচ্ছে। রেলের আশায় তারা কলকাতায় বসে থাকছে না। স্রেফ পা দু'খানার ওপর ভরসা করে গ্র্যাণ্ড ট্র্যাঙ্ক রোড ধরে পাড়ি জমাচ্ছে। বাঙালিরা বেশির ভাগ যাচ্ছে গ্রামের দিকে। যাদের অনেক পয়সা তারা মধুপুর, গিরিডি, যশিডিতে গিয়ে টপাটপ বাড়ি কিনছে। প্রাণের মায়া বড় কঠিন মায়া।

ত্রৈলোক্য সেনরা আসার পর বর্মার খবর শুনবার জন্য রাজদিয়াবাসীরা তাঁর কাছে ছুটত। বর্মা সম্বন্ধে উৎসাহ মলিন হয়ে গেছে। এখন কলকাতার খবর শুনতে এখানকার লোকজন নাহাপাড়া, আদালতপাড়া, দত্তপাড়ায় ছুটছে।

সব শুনে অবনীমোহন সুরমাকে বললেন, 'এখানে জমিজমা কিনে বুদ্ধিমানের কাজই করেছিলাম, না কি বল?'

সুরমা বলেন, 'ভাগ্যিস কিনেছিলে। নইলে এ সময়ে কোথায় যে যেতাম!'

ঝিনুকও কলকাতা থেকে লোক পালানোর খবর শুনেছিল। এ সব কথা যখন হত, অসীম আগ্রহে সে গিলতে থাকত।

একদিন সবার আড়ালে ঝিনুক বলল, 'আচ্ছা বিনুদা—'

বিনু বলল, 'কী?'

'কলকাতা থেকে লোক তো পালাচ্ছে—'

'হ্যাঁ।'

'তা হলে ঝুমারাও এখানে চলে আসবে?'

ঝুমাদের কথা অনেকদিন ভাবে নি বিনু। ঝিনুকের কথায় হঠাৎ চকিত হয়ে উঠল। তাই তো,

pathagar.net

কলকাতা থেকে সবাই চলে আসছে। ঝুমারা তো এখনও এল না!

কলকাতা থেকে লোক পালাবার হিড়িক শুরু হয়েছে। ফলে শুধু রাজদিয়াই নয়, আশেপাশে গ্রাম-গঞ্জ জনপদ দ্রুত ভরে উঠছে। চারধারের গ্রামগুলোই কি শুধু? সারা জল-বাংলাই হয়তো মানুষে মানুষে ছেয়ে যাচ্ছে।

এতদিন রাজদিয়ার বাড়ি বাড়ি ঘুরে খবর আনছিলেন হেমনাথ। ইদানীং কিছুদিন ধরে চারদিকের গ্রামগুলোতে যাচ্ছেন। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই বেরিয়ে যান। ফিরতে ফিরতে বিকেল কিংবা সন্ধে। ফিরে কোনও দিন বলেন, 'আজ দেবীপুরে গিয়েছিলাম। শুধু কলকাতারই লোক।' কোনও দিন বলেন, 'আজ গিয়েছিলাম বাজিতপুরে, সেখানেও এক অবস্থা।' কোনও দিন বলেন, 'ভাগ্যিস যুদ্ধটা বেধেছিল আর জাপানি ব্যাটারা বার্মায় বোমা ফেলেছিল, তাই না ঘরের ছেলেরা ঘরে ফিরে এসেছে। যারা কখনও এখানে আসত না, এখানকার পাট চুকিয়ে কলকাতাবাসী হয়েছিল, যুদ্ধের কল্যাণে দেশের বাড়ির জন্যে তাদের প্রাণ কেঁদে উঠেছে।'

জিনিসপত্রের দাম আগে থেকেই বাড়ছিল, কলকাতায় ইভাকুয়েশন শুরু হবার পর হু হু করে আরও চড়ছে। এখন সব জিনিসেরই সকালে এক দর, দুপুরে এক দর, সন্ধেয় আরেক দর। দরটা কখন কিভাবে কতগুণ চড়বে, আগে তার হদিসই পাওয়া যায় না। বাজার এখন বড় অস্থির।

তবু যত দামই বাড়ুক, কলকাতার তুলনায় অনেক কম।

আজকাল হাটে গেলে মজার মজার অভিজ্ঞতা হয়। কলকাতার বাবুরা হঠাৎ এই শস্তাগন্ডার দেশে এসে একেবারে অবাক হয়ে গেছেন। যে জিনিস দেখেন তাই কিনে ফেলেন, দরদস্তুর কিছুই করেন না। যা দাম চাওয়া যায়, ঝনাৎ করে ফেলে দেন। আর কথায় কথায় বলেন, 'ড্যাম চিপ —'

সেদিন অবনীমোহন আর হেমনাথের সঙ্গে সুজনগঞ্জের হাটে গিয়েছিল বিনু। সেখানে চমকপ্রদ একটা ব্যাপার ঘটল।

একজন মুসলমান ব্যাপারি ক'টা গাছপাকা পেঁপে নিয়ে বসে ছিল। সব চাইতে বড় ফল দু'টো বেছে অবনীমোহন বললেন, 'দাম কত?'

ব্যাপারি বলল, 'একহান আধুলি লাগব বাবু।'

জল-বাংলায় আসার পর প্রথম প্রথম দরদাম করতেন না অবনীমোহন। আজকাল এখানকার হালচাল বুঝে গেছেন। যে জিনিসের দাম চার পয়সা, ব্যাপারি হাঁকে দু'আনা। কজেই দর টর না করলে কি চলে।

অবনীমোহন বললেন, 'বল কি, ওই দু'টো পেঁপের দাম আট আনা!'

'হ বাবু। সিকি আধলাও কমাইতে পারুম না।'

'ন্যায্য দাম বল, নিয়ে যাই।'

'চাউলের মণ বাইশ ট্যাকা, বাইগনের স্যার ছয় পহা, ঝিঙ্গার তিন পহা। দুইটা বড় পাউপার (পেঁপে) দাম আষ্ট আনা চাইয়া অলেহ্য (অন্যায়) কাম করি নাই।'

'শোন ব্যাপারি, তোমার কথাও থাক, আমার কথাও থাক, ছ'আনা দিচ্ছি। দিয়ে দাও।'

ব্যাপারি এবার উত্তর দিল না। মুখ ঘুরিয়ে পাশের মরিচ-ব্যাপারির সঙ্গে গল্প জুড়ে দিল।

অবনীমোহন বললেন, 'কী হল, আমার কথাটা শুনতে পেলে না?'

মুখ না ফিরিয়ে ব্যাপারি বলল, 'শুনছি।'

'আমি যা বললাম সেই দামে দেবে কি দেবে না, কিছু বললে না তো?'

একটু চুপ করে থেকে ব্যাপারি বলল, 'আপনের কাম না বাবু—'

অবনীমোহন অবাক, 'কী আমার কাজ নয়?'

'আমার পাউপা কিনন (কেনা)। আপনের কাছে তো আষ্ট গন্ডা পহা চাইছি। ড্যাঞ্চি বাবুরা

(ড্যাম চিপ বাবুরা) আইলে এক ট্যাকা দিয়া লইয়া যাইব।'

সত্যিই তাই। তাঁদের কথাবার্তার মধ্যে কলকাতার এক বাবু এসে ছোঁ মেরে পেঁপে দু'টো কিনে নিল। দাম বাবদ একটি টাকা আদায় করে গেঁজেতে পুরতে পুরতে সগর্বে হাসল ব্যাপারি, 'দ্যাখলেন তো।'

এ নিয়ে তর্কাতর্কি ঝগড়াঝাঁটি বাধানো যেত। অবনীমোহন কিছুই করলেন না। মুখ লাল করে মাছহাটার দিকে চলে এলেন।

সুজনগঞ্জে এসেই হেমনাথ ধানের আড়তগুলোর দিকে চলে গিয়েছিলেন। অবনীমোহন আর বিনু গিয়েছিল বাড়ির জন্য সওদা করতে।

মাছের বাজারে এসে প্রায় একই রকম অভিজ্ঞতা হল।

এক চেনাজানা মাছ-ব্যাপারি, নাম তার গয়জদ্দি নিকারি, এক কোণে দোকান সাজিয়ে বসেছিল। সুজনগঞ্জে প্রথম যেদিন এসেছিলেন, সেদিন থেকেই গয়জদ্দির কাছে মাছ কিনছেন অবনীমোহন। গয়জদ্দি তাঁর বাঁধা ব্যাপারি।

গয়জদ্দি আজ ভাল ভাল, লোভনীয় মাছ এনেছে। তার সামনে দু'টো বড় বড় বেতের চাঙাড়ি। চাঙাড়ির ঢাকনার ওপর পেট-লাল গরমা, কালবোস, কাজলি এবং কুলীন জাতের চকচকে পাবদা মাছ সাজানো।

এই জলের দেশে যেখানে অঢেল মাছ, সেখানেও এরকম পাবদা দুর্লভ। মাছগুলোর লালচে রুপোলি শরীর এত চকচকে যে মনে হয় পালিশ করা।

অবনীমোহন বললেন, 'ক'কুড়ি পাবদা আছে গয়জদ্দি?'

গয়জদ্দি বলল, 'তিন কুড়ি।'

'দাম কত নেবে?'

'পাবদাগুলা আপনেরে দিমু না জামাইকত্তা—'

'কেন?'

গয়জদ্দি বলল, 'উইগুলার অন্য গাহেক (খদ্দের) আছে।'

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়তে কৌতুকের গলায় অবনীমোহন বললেন, 'ড্যাঞ্চিবাবুরা নাকি?'

গয়জদ্দি একগাল হাসল, 'হ। ড্যাঞ্চিবাবুরা এক্কেবারেই মূলায় (দরদাম করে) না। যা কই হেই দিয়া যায়। এই সুযুগে দুইখান পহা কইরা লই।'

অবনীমোহন বললেন, 'পাবদা না দাও, কালবোসটা দাও।'

'কালিভাউসটাও ড্যাঞ্চিবাবুগো লেইগা রাখছি।'

অগত্যা ডুলা বোঝাই করে কাজলি মাছই কিনলেন অবনীমোহন।

এখন সুজনগঞ্জের হাটে 'ড্যাঞ্চি' বাবুদেরই জয়জয়কার।

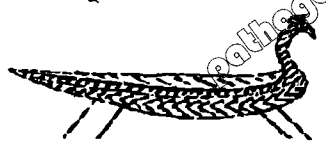

বোমার ভয়ে কলকাতা থেকে যারা পালিয়ে এসেছে তাদের ছেলেমেয়েরা রাজদিয়ার স্কুল-কলেজে ভর্তি হতে লাগল।

বিনুর ক্লাসেও দশ-বারটা ছেলে ভর্তি হয়েছে। তাদের মধ্যে সব চাইতে চমকদার হল গোঁসাই বাড়ির অশোক। প্রথম দিন স্কুলে এসেই সে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিল। বিনু আর শ্যামল তো রীতিমতো তার ভক্তই হয়ে দাঁড়িয়েছে। হবার মতো যথেষ্ট কারণও রয়েছে।

অশোক স্কুলে আসে সাইকেলে করে। ঝকঝকে নতুন সাইকেল তার। স্কুলের সামনের মাঠটায় বোঁ করে একটা পাক দিয়ে সাইকেলটা যখন সে থামায় সেই বিস্ময়কর দৃশ্যের দিকে অন্য ছেলেরা হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। এত সুন্দর সাইকেল সারা রাজদিয়াতে আর কারোর নেই।

সাইকেলের নানারকম খেলাও জানে অশোক। একটু আগে আগে স্কুলে এসে সে সবও দেখায়

সে। হ্যান্ডেল না ধরে অশোক সাইকেল চালাতে পারে। চলন্ত অবস্থায় সিটে বসে জামাকাপড় পরতে পারে।

বিনু আর শ্যামলের চাইতে অশোক বেশ বড়। অন্তত দু'তিন বছরের তো বটেই। ফেরতা দিয়ে কাপড় পরে সে, লম্বা জুলপি রাখে। ঘাড়ের ওপর জামার কলারটা সবসময় খাড়া হয়ে থাকে। বুকের কাছে একটা মোটে বোতাম আটকানো, বাকি দু'টো খোলা। ফলে ভেতরের গেঞ্জি দেখা যায়। ছোকরার ঠোঁটের ওপর সরু শৌখিন গোঁফ। যখন কায়দা করে হাঁটে, পায়ের চটি দু'ফুট আগে আগে চলে। কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে চমৎকার শিস দিতে পারে সে।

একেক দিন একেক রকম করে চুল আঁচড়ে আসে অশোক। একদিন হয়তো ব্যাকব্রাশ করে এল, একদিন এল অ্যালবার্ট কেটে, কিংবা চুলে ঢেউ খেলিয়ে।

কোনও দিন এসে অশোক বলে, 'কার মতো চুল আঁচড়েছি বল তো?'

সারা ক্লাস চারদিক থেকে সাগ্রহে, সমস্বরে শুধোয়, 'কার মতো?'

'রবীন বিশ্বাসের।'

বিনু ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করে, 'রবীন বিশ্বাস কে ভাই?'

রবীন বিশ্বাসের নাম জানে না, এমন ছেলে হয়তো এই প্রথম দেখল অশোক। অবাক বিস্ময়ে সে বিনুর দিকে তাকিয়ে থাকে। বলে, 'রবীন বিশ্বাসকে চেনো না!'

রবীন বিশ্বাসকে না চেনার লজ্জায় মাথা আপনা থেকেই নুয়ে পড়ে বিনুর।

অশোক আবার বলে, 'স্টাইল যদি শিখতে হয় রবীন বিশ্বাসের সিনেমা দেখতেই হবে।'

বিনু এতক্ষণে বুঝতে পারে, রবীন বিশ্বাস একজন ফিল্মস্টার।

কোনও দিন এসে অশোক বলে, 'আজ ছবি মজুমদারের স্টাইলে চুল আঁচড়েছি।'

কোনও দিন বলে, 'আজ জহর ব্যানার্জির মতো আঁচড়েছি।'

জামাও অশোক একরকম পরে না। বেশির ভাগ দিনই কলারওলা অথবা হাতাহীন পাঞ্জাবি পরে আসে। বলে, 'কী একটা বইয়ে মনে পড়ছে না, অমলেশ বড়ুয়া এইরকম জামা পরেছিল।'

ছোটদি আর বড়দির মুখে অমলেশ বড়ুয়ার নাম শুনেছে বিনু। কাজেই তাঁর সম্বন্ধে আর জিজ্ঞেস করে না।

কিন্তু এ সব অতি সামান্য ব্যাপার। ছেলেদের নিশ্বাস বন্ধ করে দেবার মতো আরও অনেক কিছু জানে অশোক। হেন সিনেমা নেই যা সে দেখেনি। শুধু সিনেমা দেখাই নাকি, ছায়ালোকের তাবৎ কিন্নর-কিন্নরীকেও সে চেনে। অশোক বলে, স্টার—চিত্রতারকা। কলকাতায় থাকতে সে নাকি তাদের সঙ্গে ঘুরে বেড়াত। সে লীলারানীকে দেখেছে, কনকবালাকে দেখেছে, ছবি মজুমদারকে দেখেছে। জহর ব্যানার্জি, অমলেশ বড়ুয়া, মহীন্দ্র গাঙ্গুলি, কাকে না চেনে সে? কাকে না দেখেছে?

ক্লাসে, ক্লাসের বাইরে সারক্ষণ সিনেমার নানা গল্প করে যায় অশোক। ফাঁকে ফাঁকে গান। কত গানই না সে জানে।

'এসো যৌবন,
এসো যৌবনমত্তা ওগো।
মধুমাস এলো কি—
সাগরের কল্লোল শুনি তব বক্ষে
বিজলির ঝিলিমিলি আনিয়াছ চক্ষে।'

কিংবা

'তাহারে যে জড়াতে চায় দু'টি বাহুলতা—
কে শুনেছে মোর কামনার নীরব ব্যাকুলতা।'

কিংবা

'আমার ভুবনে এল বসন্ত তোমারই তরে।
আঁখি দু'টি তব রাখ, রাখ মোর আঁখির পরে।'

ছায়ালোকের অজস্র জ্ঞানে বোঝাই হয়ে যে এসেছে তার ভক্ত না হওয়াটাই তো আশ্চর্যের।

pathagar.net

ক্লাসের সব ছেলেই অশোকের ভক্ত, তবু তাদের মধ্যে বিনু আর শ্যামলের তুলনা হয় না। অশোকের দিকে সর্বক্ষণ তারা মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকে। অশোক যা বলে অভিভূতের মতো শুনে যায়। একই কথা বার বার শুনেও ক্লান্তি নেই। অশোককে একবার পেলে তার সঙ্গ ছাড়তে চায় না। গুড়ের গায়ে মাছির মতো বিনু আর শ্যামল তার গায়ে লেগেই আছে।

এমন ভক্ত পেলে কে না খুশি হয়। অশোকও সবার ভেতর থেকে বিনুদের বেছে বার করেছে। তাদের সঙ্গেই সে বেশি মেশে, বেশি গল্প করে, বেশি ঘোরে। মোট কথা, তাদের ওপরেই অশোকের বেশি অনুগ্রহ।

আগে জামাকাপড় পোশাকটোশাকের দিকে নজর থাকত না বিনুর। ছেঁড়া হোক, ময়লা হোক— একটা কিছু পরতে পেলেই হত। জুতো পায়ে দেবার বিশেষ বালাই ছিল না। এ সব ব্যাপারে একেবারেই উদাসীন ছিল।

অশোক আসার পর সাজটাজের দিকে মন গেছে বিনুর। আজকাল আর ময়লা জামাপ্যান্ট পরতে চায় না। পোশাকটি ধবধবে হওয়া চাই, তাতে কড়া ইস্তিরি থাকা চাই। জুতোটা চকচকে ঝকমকে না হলে আজকাল আর চলে না।

প্রায় কান্নাকাটি করেই একটা ধুতি কিনেছে বিনু। কলারওলা হাতাহীন পাঞ্জাবি বানিয়েছে। অশোকের মতো কায়দা করে ফেরতা দিয়ে আজকাল ধুতি পরে সে। বাড়িতে অবশ্য করে না, রাস্তায় বেরুলেই জামার কলার উলটে দেয়। চটিটা সামনের দিকে ছুড়তে ছুড়তে হাঁটে।

এ তো গেল পোশাকের কথা। তা ছাড়া, অশোককে আরও নানা দিক থেকে নকল করছে বিনু। তার মতো স্টাইল করে চুল আঁচড়ায়, সরু করে শিস দেওয়া প্র্যাকটিশ করে। আর গান তো আছেই। দিনরাত গুন গুন করেই যাচ্ছে সে

'শত জনমের কামনা বাহিয়া।
রূপ ধরে আজ এসেছ কি প্রিয়া?
যত ভালবাসা তত যদি আশা—'

বিনুর হঠাৎ পরিবর্তনটা সুধা সুনীতির চোখেও পড়েছে। এত দ্রুত বদলে গেলে না পড়ে উপায় কী। সুনীতি গালে হাত দিয়ে ঘাড় বাঁকিয়ে বলে, 'ও বাবা, দিন দিন ছেলে কেমন স্টাইল শিখছে দেখ না!'

সুধা ঝঙ্কার দিয়ে বলে, 'ছোঁড়া একেবারে ঝুনো হয়ে উঠেছে। ওই গোঁসাইবাড়ির অশোকটা আসার পরই পাকামো শুরু হয়েছে। হ্যাঁ রে বিনু, লুকিয়ে লুকিয়ে বিড়ি টিড়ি খাচ্ছিস নাকি?'

সুধার কথা শেষ হবার আগেই লঙ্কাকান্ড বেধে যায়। বিনু তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

ঝিনুক অবশ্য অন্য কথা বলে, 'তুমি অমন গুন গুন কর কেন বিনুদা? গলা ছেড়ে গাইতে পার না? কী সুন্দর গলা তোমার!'

যত জ্ঞানের জাহাজ হয়েই আসুক, তার তো শেষ আছে। একদিন সিনেমার গান আর গল্পের ঝুলি ফুরিয়ে গেল অশোকের। ফুরোবার পর আবার নতুন করে সেগুলো শোনাল সে। তারপর আবার, এবং আরও অনেক বার।

শুনতে শুনতে সব গান মুখস্থ হয়ে গেছে বিনুর। যত রোমাঞ্চকর আর যত চমকপ্রদই হোক না, একই গল্প কত বার শুনতে ভাল লাগে! আজকাল যখন অশোক চিত্রতারকার গল্প নিয়ে বসে, বিনু বা শ্যামল ততটা আগ্রহ নিয়ে শোনে না।

ভক্তদের বিস্ময় আর মুগ্ধতা যে কমে আসছে তা লক্ষ করে একদিন অশোক বলল, 'চল, মিলিটারিদের ব্যারাক থেকে ঘুরে আসি।'

মিলিটারির কথায় ভয় পেয়ে গেল বিনু। বলল, 'না না, ওখানে গিয়ে দরকার নেই।' নদীর পাড়ে ব্যারাকগুলো যখন তৈরি হচ্ছিল তখন খুব যেত বিনু। নিগ্রো আর আমেরিকান টমিরা ওখানে আসার পর আর যায় না।

অশোক বলল, 'যাবে না কেন?'

'ওরা যদি ধরে রেখে দেয়?'

'ভীতু কোথাকার। আমরা কলকাতায় কত মিলিটারির সঙ্গে মিশেছি। কই আমাদের তো ধরত না।'

বিনু বলল, 'কলকাতায় এখন বুঝি খুব মিলিটারি!'

অশোক মাথা নাড়ল, 'মিলিটারি ছাড়া কলকাতায় এখন আর কিছু নেই। রাস্তায় রাস্তায় মিলিটারি ট্রাক আর জিপ। লালমুখো আমেরিকান টমি আর নিগ্রো সোলজার। লেকের দিকে কখনও গেছ?'

'অনেক বার।'

'সেখানে মিলিটারিদের ছাউনি পড়েছে। ওদিকে যেতে কেউ সাহস পায় না। কিন্তু বন্ধুদের নিয়ে আমি ঠিক চলে যেতাম—'বলে সগর্বে তাকাল অশোক।

বিনু আর শ্যামল অবাক হয়ে গেল।

অশোক আবার বলল, 'শুধু যেতামই না, ওদের সঙ্গে ভাব জমিয়ে চকোলেট, টফি, ড্রাই ফুড, টিনের মাছ—কত কী আদায় করতাম।'

বিনুরা সবিস্ময়ে ফিসফিসিয়ে বলল, 'তাই নাকি!'

অশোক বলল, 'হুঁ হুঁ—' তারপর হঠাৎ কী মনে পড়তে তাড়াতাড়ি আবার বলে উঠল, 'ধরে রাখার কথা বললে না তখন—'

'হ্যাঁ।'

'ধরে তোমাকে ঠিকই রাখবে। যদি—'

'যদি কী?'

'তুমি মেয়ে হতে।'

'মেয়ে হলে ধরে রাখবে কেন?

ঠোঁট টিপে চোখ কুঁচকে কিছুক্ষণ বিনুকে দেখল অশোক। তারপর কানের কাছে মুখ এনে ফিস ফিস করে কী বলল।

সঙ্গে সঙ্গে মুখ লাল হয়ে উঠল বিনুর, কান ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগল।

হাসতে হাসতে অশোক বলল, 'তুমি একটা ভোঁদা। তোমাকে মানুষ করতে অনেক সময় লাগবে।' বলে একরকম টানতে টানতে মিলিটারি ব্যারাকের দিকে নিয়ে গেল।

ব্যারাকের সীমানা তারকাঁটা দিয়ে ঘেরা। কয়েক মাইল জুড়ে এই সীমানা। অবশ্য মাঝে মাঝে কাঠের গেট রয়েছে। সেখানে মিলিটারি পুলিশ রাইফেল কাঁধে পাহারা দিচ্ছে।

বিনুরা যখন সেখানে গিয়ে পৌঁছল, প্রথম গেটটা থেকে কিছু দূরে তারকাঁটার ওপর একটা করে পা রেখে পাঁচ ছ'টা লালমুখো টমি দাঁড়িয়ে আছে। সীমানার বাইরে একদল আধ-ন্যাংটো, কালো ক্ষুধার্ত মানুষ জড়ো হয়েছে। তাদের লুব্ধ, করুণ চোখ টমিগুলোর দিকে। মনে হয়, ওরা প্রায়ই এখানে আসে। টমিগুলোর সঙ্গে তাদের পরিচয় আছে।

অশোক বিনুদের নিয়ে বাইরে জনতার কাছে এসে দাঁড়াল। তারপর বলল, 'এখানে দেখছি অনেক খদ্দের। এই কালো কালো জানোয়ারগুলো এসে জুটেছে। কলকাতায় আমরা দু' চারজন মোটে যেতাম।' বলেই টমিদের দিকে ফিরে বলল, 'হ্যালো জো—'

টমিরা ভুরু বাঁকিয়ে তাকাল, কিছু বলল না।

অশোক আবার বলল, 'ইউ আর ভেরি কাইন্ড। প্লিজ গিভ আস চকোলেট, টফি। হ্যালো জো—'

টমিরা নিজেদের ভেতর কী বলাবলি করল। তারপর পকেট থেকে মুঠো মুঠো চকোলেট আর টফি বার করে ছুড়তে লাগল। নিমেষে বাইরে জনতার ভেতর চিৎকার চেঁচামেচি মারামারি কাড়াকাড়ি শুরু হয়ে গেল। অশোকও তার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল। বিনু আর শ্যামল অবশ্য দাঁড়িয়ে রইল।

একটা টমি উৎসাহ দেবার ভঙ্গিতে চেঁচাতে লাগল, 'গো অন ফাইটিং, ইউ ডগস, ম্যাচ ম্যাচ—বাইট দ্যাট সোয়াইন—পুশ দ্যাট বাস্টার্ড—'

আরেকটা টমি দাঁতমুখ খিঁচিয়ে চিৎকার করে উঠল, 'ব্লাডি ইন্ডিয়ানস—বেগারস, সন্স অফ

দিচ্ছ

পাকা টমিগুলো কিছুই বলল না, ক্যামেরা বার করে টকাটক ছবি তুলতে লাগল।

কাড়াকাড়ি করে অনেকগুলো চকোলেট কুড়িয়েছে অশোক। সেগুলো নিয়ে বিনুদের কাছে এসে বলল, 'আচ্ছা ছেলে তো তোমরা, চুপচাপ হাঁদার মতো দাঁড়িয়ে রইলে! তোমরা কুড়োলে আরও কত চকোলেট পাওয়া যেত।'

বিনু হঠাৎ বলে ফেলল, 'টমিরা কী বলছিল জানো?'

'কী?'

'ব্লাডি বেগারস, ডগস, সোয়াইনস—এমনি আরও কত কি। এ সব শুনবার পরও ওদের জিনিস কুড়োতে যাব!'

অশোক গ্রাহ্য করল না। গা থেকে গালাগালগুলো ঝেড়ে ফেলে বলল, 'বলুক গে। গায়ে তো আর ফোস্কা পড়ছে না। ওদের চকোলেট খেয়ে দেখ, জীবনে এমন জিনিস আর কখনও খাও নি। খাস আমেরিকায় তৈরি। শুধু টমিদের জন্যে জাহাজে করে আসে।' বলে একটা বড় চকোলেট এগিয়ে দিল।

বিনু কিন্তু নিল না।

মিলিটারি ব্যারাকে সেই একদিনই গেল না বিনুরা। অশোক প্রায় রোজই তাদের ধরে নিয়ে যেতে লাগল।

টমিরা তারকাঁটার বেড়ার ওধারে দাঁড়িয়ে রোজ শুধু চকোলেট ছোড়ে না, এক-আধদিন বিস্কুটের টিন, ড্রাই ফুডের টিনও ছোড়ে। মাঝে মাঝে মুঠো মুঠো রেজগিও ছুড়ে দেয়। পয়সা যেদিন ছড়ায়, মারামারিটা সেদিন সাঙ্ঘাতিক রকমের ঘটে যায়।

প্রথম প্রথম বিনু ওদের কোনও জিনিসই ছুঁত না। অশোকের দেখাদেখি কবে থেকে যে সে কাড়াকাড়ি করতে শুরু করেছে, নিজেই জানে না।

আমেরিকান টমিদের পেছন পেছন ঘুরে বেড়ানোটা আজকাল বিনুদের নেশায় দাঁড়িয়ে গেছে। টমিদের খোঁজে এখন আর ব্যারাক পর্যন্ত যেতে হয় না। রাজদিয়ার রাস্তায়, স্টিমারঘাটে, নদীর পাড়ে আউবনের দিকটায় সবসময় টমিগুলো টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে।

একদিন বিনুরা দেখতে গেল, তাদের বাড়ি থেকে খানিকটা দূরে সেই কাঠের পুলটার ওপর দুই টমি একটা প্রকাণ্ড পাকা কাঁঠাল নিয়ে বসে আছে। খানিকটা দূরে মুসলমান চাষীদের এক জনতা উদ্গ্রীব দাঁড়িয়ে। মাঝে মাঝে টমি দু'টোকে দেখিয়ে ফিসফিস গলায় নিজেদের ভেতর কী বলাবলি করছে।

বিনুরা প্রথমে চাষীদের কাছে গেল। শ্যামল শুধলো, 'কী ব্যাপার? কী হয়েছে?'

একটি জোয়ান চাষী জনতার ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে বলল, 'সাহেবগো কাছে আমরা একহান কাঠল (কাঁঠাল) বেচছি। কত দাম নিছি জানেন?'

'কত?'

'চাইর ট্যাকা।'

'তাই নাকি!'

'হ। কাঠলটার দাম বড় জোর আষ্ট আনা। নগদ সাড়ে তিনি ট্যাকা লাভ করলাম।' একটা কাঁঠালে সাড়ে তিন টাকা লাভ করা দিগ্বিজয়ের সমান। গর্বে ছোকরার বুক ফুলে উঠছিল।

আরেকটি মধ্যবয়সী চাষী বলল, 'হালারা যে কই থিকা আসছে! যা দাম চাই হেই দিয়া দ্যায়। ট্যাকা পয়সার উপুর দয়ামায়া নাই। একখান কাঠল বেইচা চাইর ট্যাকা পাওন যায়—বাপের জন্মে আমনা কথা শুনি নাই।'

আরেক জন বলল, 'যা দ্যাখে হালারা হেই কিনে (তাই কেনে)। হেই দিন আমি তো আড়াই ট্যাকায় একহান কুমড়া বেচছিলাম।'

তারপর দেখা গেল, শুধু কুমড়োই না, অবিশ্বাস্য অকল্পনীয় দামে আরও অনেক অনেক কিছু টমিদের কাছে বিক্রি করেছে।

অশোক এই সময় বলে উঠল, 'কাঁঠাল তো বেচেছ, আবার দাঁড়িয়ে রয়েছ কেন?'

সেই জোয়ান চাষীটি বলল, 'সাহেবরা আমাগো কী জানি কইতে আছে, বুঝতে পারতে আছি না।'

মধ্যবয়সীটি বলল, 'অ্যামন তরাতরি এংরাজি কয় য্যান ছাগলে নাইদা (নেদে) যায়। কার সাইদ্য বোঝে!' ভাবখানা এই, তাড়াতাড়ি না বলে ধীরে সুস্থে বললে সে ইংরেজি ভাষাটা অক্লেশে বুঝে ফেলত।

অশোক কী বলতে যাচ্ছিল, সেই সময় টমি দু'টো ডাকল, 'ইউ গায়—'

বিনুরা ফিরে তাকাতে টমিরা হাতের ইশারায় ডাকল।

টমিদের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে ঘুরে সাহস বেড়ে গিয়েছিল। এখন আর তাদের ভয় পায় না বিনুরা। অশোক বলল 'চল, ব্যাটারা কী বলছে শুনে আসি।'

বিনু শ্যামল আর অশোক, তিনজনে পায়ে পায়ে পুলটার ওপর গিয়ে উঠল। উৎসুক জনতা পেছনে দাঁড়িয়ে থাকল।

একটা টমি শুধোলে, 'নো ইংলিশ?' অর্থাৎ অশোকরা ইংরেজি জানে কি না, সেটাই তার জিজ্ঞাস্য।

অশোক বলল, 'ইয়েস।'

কাঁঠালটা দেখিয়ে এবার টমিটা বলল, 'উয়াটস দিস?'

প্রথমে খুব চাপা গলায় অশোক বাংলায় বলে নিল, 'ব্যাটারা কী কিনেছে তাই জানে না।' তারপর ইংরেজিতে বলল, 'ফ্রুট।'

'খায়?'

'নিশ্চয়ই।'

'কেমন করে খেতে হয়?' বলে দূরের জনতাকে দেখিয়ে টমিরা বলল, 'ব্লাডিগুলোকে জিজ্ঞেস করছি, কিছু বলছে না।'

অশোক বলল, 'ওরা ইংরেজি জানে না, তাই তোমাদের কথা বুঝতে পারে নি।'

'দ্যাট মে বি—'

এবার কাঁঠালটা ভেঙে খাওয়ার কায়দা দেখিয়ে দিল অশোক। একটা করে কোয়া মুখে পুরতে যেই স্বাদটা টের পাওয়া গেল আর যাবে কোথায়। দুই টমি চার হাতে কোয়া খুলে টপাটপ খেতে লাগল। খাওয়াটা সত্যিই দর্শনীয়। নিশ্বাস ফেলার যেন সময় নেই। বিচিসুদ্ধ কোয়াগুলো মুখ পুরে চিবোতে চিবোতে বিচিগুলো গালের পাশ দিয়ে বার করে দিচ্ছে।

দেখতে দেখতে কাঁঠালটা শেষ হয়ে গেল। পড়ে রইল মাঝখানের মোটা ভুতি আর কর্কশ কাঁটাওলা ছালটা।

খাওয়া তো হল। তারপরেই দেখা গেল আরেক সমস্যা। কাঁঠালের আঠায় হাত-মুখ, গাল-গলা,. নাক, ভুরু, এমনকি জামা পর্যন্ত মাখামাখি হয়ে গেছে। টমিরা যতই ঘষে ঘষে তুলতে চাইছে ততই আঠা লেপটে যাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত বিরক্ত, বিব্রত হয়ে আবার অশোকের শরণ নিল তারা, 'এ গায়—'

অশোক বলল, 'ইয়েস—'

'ব্লাডি আঠা তো তুলতে পারছি না।'

অশোক চৌকস ছেলে। বিনুদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'শালাদের ট্যাঁক থেকে কিছু খসাচ্ছি।' তারপর থেমে থেমে, ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে টমিদের উদ্দেশে বলল, 'আঠা তুলে দিতে পারি, পাঁচ টাকা লাগবে।'

'ও, ইয়েস—' হিপ পকেট থেকে এক মুঠো রেজগি আর নোট বার করে একটা টমি অশোকের হাতে দিল, গুনল না পর্যন্ত।

অশোক অবশ্য শুনল—প্রায় সাত টাকার মতো। টাকাটা পেয়েই সে বিনুকে বলল, 'তোমাদের বাড়ি তো কাছে। শিশিতে করে সরষের তেল নিয়ে এস। একটু বেশি করেই এনো।'

সরষের তেল এলে তিন বন্ধু ডলে ডলে টমিদের হাত আর মুখ থেকে কাঁঠালের আঠা তুলে ফেলল।

টমি দু'টো বেজায় খুশি। মাথা নেড়ে বলল, 'থ্যাঙ্ক ইউ, থ্যাঙ্ক ইউ, কাম অন—' বলে তিনজনের হাত ধরে ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে কাঁধের জোড় প্রায় আলগা করে ফেলল।

উচ্ছ্বাস খানিকটা স্তিমিত হলে টমি দু'টো বলল, 'সিট ডাউন। এস, তোমাদের সঙ্গে গল্প করি।'

বিনুরা বসল।

দুই টমি জড়ানো জড়ানো উচ্চারণে কত কথা যে বলতে লাগল। ক্লাস নাইনের ইংরেজি বিদ্যেয় তার সামান্যই বুঝতে পারল বিনু, বেশিটা দুর্বোধ্য থেকে গেল। অশোক অবশ্য টমিদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সমানে 'ইয়েস' 'নো' করে যেতে লাগল। তবে একটা কথা জানা গেল, রাজদিয়া আসার আগে টমি দু'টো কলকাতায় ছিল।

অনেকক্ষণ গল্পটল্প করার পর একটা টমি হঠাৎ বলে উঠল, 'হেঃ গায়—'

অশোক জিজ্ঞাসু চোখ তাকাল, 'ইয়েস—'

একটি চোখ কুঁচকে আরেকটা চোখ ইঙ্গিতপূর্ণ করে চাপা গলায় টমিটা বলল, 'বিবি হাউস মালুম?' কলকাতায় থাকার ফলস্বরূপ দু'চারটি হিন্দি শব্দও তারা শিখে এসেছে।

একটু ভেবে অশোক বলল 'ইয়েস—'

'ইউ গুড গায়। আমাদের নিয়ে চল—'

'টেন রুপিজ—'অশোক বলল। অর্থাৎ দশটি টাকা দিলে, তবেই 'বিবি হাউসে'র দোরগোড়ায় পৌঁছে দিয়ে আসবে।

'ইয়া ইয়া—'হিপ পকেট থেকে আবার এক মুঠো নোট টোট বার করে অশোককে দিল টমিটা।

'বিবি হাউসে'র ব্যাপারে টমি দু'টোর প্রচন্ড উৎসাহ। টাকা দিয়েই লাফ দিয়ে উঠে পড়েছে তারা এবং অশোকের হাত ধরে টানাটানি শুরু করেছে।

অগত্যা অশোকদের উঠতেই হল। এই সময় বিনু অশোকের কানে ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল, 'বিবি হাউস কী?'

অবাক চোখে একটুক্ষণ তাকিয়ে থেকে অশোক বলল, 'জানো না!'

'না।' বিনু বিমূঢ়ের মতো মাথা নাড়ল।

অশোক বলল, 'পরে বলব।' তারপর আঙুল কামড়াতে কামড়াতে গুলাটা নামিয়ে দিল, 'বিবি হাউস'-এর নাম করে তো দশ টাকা আদায় করলাম। এখন ব্যাটাদের কোথায় নিয়ে যাই?' পরক্ষণে কী মনে পড়তে তার চোখের তারা নেচে উঠল, 'হয়েছে—'

বিনু শুধলো, 'কী?'

'ব্যাটাদের এক জায়গায় পৌঁছে দিচ্ছি।'

'কোথায়?'

'চলই না। গেলে বুঝতে পারবে।'

অশোক টমিদের নিয়ে দক্ষিণ দিকের রাস্তা ধরল।

পুলের তলায় জনতা এখনও দাঁড়িয়ে আছে। মাঝবয়সী সেই মুসলমানটি ভিড়ের ভেতর থেকে বলে উঠল, 'বাবু কাঠলের আঠা তোলনের লেইগা কত নিলেন?'

অশোক বলল, 'সাত টাকা।'

'তাহিলে এক কাঠল খাইতে এগার ট্যাকা লাইগা গেল।'

উত্তর না দিয়ে অশোক হাসল।

লোকটা আবার শুধলো, 'সৈন্য দুইটা আরও ট্যাকা দিল না আপনেরে?'

দ্বিতীয় বার টাকা দেওয়াও সে তা হলে লক্ষ করেছে। ব্যাপারটা স্বীকার করতেই হল অশোককে।

মধ্যবয়সী বলল, 'এই ট্যাকাটা পাইলেন কোন খাতে?'

pathagar.net

খানিক চিন্তা করে অশোক বলল, 'সে তোমাকে পরে বলব।'

'অহন ওগো নিয়া চললেন কই?'

'শ্বশুরবাড়ি দেখাতে।'

দক্ষিণ দিকে খানিকটা যাবার পর অশোকরা পুবে ঘুরল। তারপর কোনাকুনি কিছুক্ষণ হেঁটে বাংলো মতো একটা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। বাইরে থেকেই অশোক বলল, 'যাও, ভেতরে যাও—' বলেই পেছন ফিরে বিনুদের নিয়ে দৌড়। মুহূর্তে এর রান্নাঘর, ওর বাগান, তার ঢেঁকিঘরের ওপর দিয়ে উধাও হয়ে গেল।

বিনুরা থামল একেবারে তাদের পুকুরপাড়ে এসে। ঘাটে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে বসে তিনজন অনেকক্ষণ হাঁপাল।

তারপর বিনু বলল, 'যেখানে টমি দু'টোকে দিয়ে এলে, ওটা তো পুলিশের বড়সাহেব মিস্টার রজার্সের বাড়ি—'

যেন বিরাট এক কীর্তি করেছে, ভুরু নাচিয়ে নাচিয়ে কায়দা করে কিছুক্ষণ হাসল অশোক। তারপর বলল, 'ইচ্ছে করেই তো দিয়ে এলাম। একটু পর খোঁজ নিলে জানতে পারবে বাছাধনদের হাড়-মাংস আলাদা করে রজার্স সাহেব মিলিটারি পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে। উল্লুকরা বাংলা দেশে এসে 'বিবি হাউস' খুঁজছে!'

চকিতে সে কথাটা মনে পড়ে গেল বিনুর। বলল, ''বিবি হাউস' মানে কী, বললে না তো?'

কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে কী বলল অশোক। শুনতে শুনতে নাকমুখ ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগল বিনুর, মাথা ঝিমঝিম করতে লাগল।

কলকাতা থেকে জ্ঞানবৃক্ষের অনেক ফল নিয়ে এসেছে অশোক। একটা একটা করে বিনুকে খাওয়াতে শুরু করেছে সে।

দিনকয়েক পরের কথা।

বিকেলবেলা স্কুল থেকে ফিরছিল বিনুরা। স্টিমারঘাটের সামনে আসতেই চোখে পড়ল, একটা পান-বিড়ি-সিগারেটের দোকানে ভিড় জমেছে।

কৌতূহলের বশে বড় বড় পা ফেলে কাছে আসতেই বিনুরা দেখতে পেল, একটা টমি একের পর এক সিগারেটের প্যাকেট কিনছে, তারপর সেগুলো খুলে হরিলুটের মতো ছড়িয়ে দিচ্ছে।

চারপাশের মানুষগুলো যেন চোখমুখ শানিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সিগারেট ছড়ালেই ঝাঁপিয়ে পড়ছে।

বিনুরা একপাশে দাঁড়িয়ে মজা দেখতে লাগল।

হঠাৎ টমিটার চোখ বোঁ করে ঘুরে এসে পড়ল বিনুদের ওপর। দেখেই বোঝা গেল, মদে চুর হয়ে আছে সে। তারই মধ্যে হিপ পকেট থেকে চ্যাপটা বোতল বার করে মাঝে মাঝে গলায় ঢালছে।

আচমকা টমিটা চেঁচিয়ে উঠল, 'ইউ ব্লাডি সোয়াইন—'

বিনুরা ভয় পেয়ে গেল।

টমিটা ছুটে এসে অশোকের কলার চেপে ধরে চেঁচাল, 'ইউ আর স্ট্যান্ডিং—'

অমন যে তুখোড় ছেলে অশোক, সেও একেবারে তোতলা হয়ে গেল, 'ইয়ে-এ-এ- এস স্যার—'

'ওয়াই?'

'ফর নাথিং স্যার, ফর নাথিং—'

টমি গর্জে উঠল, 'নো—'

মাতালটা ঠিক কী বলতে চায়, বুঝতে না পেরে চুপ করে রইল অশোক। ভয়ে তার হাত-পা কাঁপতে লাগল। চোখের তারা যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসবে।

হঠাৎ টমিটা ধাক্কা দিয়ে অশোককে দশ হাত দূরে সরিয়ে দিল। তারপর সিগারেট কিনে ছড়াতে

ছড়াতে বলল, 'টেক টেক—'

এতক্ষণে বোঝা গেল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মজা দেখলে চলবে না, সবার সঙ্গে কাড়াকাড়ি করে হরির লুটের সিগারেট নিতে হবে। কী আর করা, সিগারেট কুড়োতেই হল।

বিনু আর শ্যামল দাঁড়িয়ে ছিল। টমির ভয়ে তাদেরও সিগারেট কুড়োতে হল। কুড়িয়েই যদি মুক্তি পাওয়া যেত! দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে টমিটা চিৎকার করল, 'ইউ ব্লাডি— স্মোক।'

বিনু ভাবল, একদিন আশু দত্ত রুস্তম আর পতিতপাবনের হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন। এই নদীর পাড়ে স্টিমারঘাটের আশেপাশে এমন কেউ নেই যে তাকে বাঁচাতে পারে।

সিগারেট খাওয়ার কথা ভাবাই যায় না। গলার ভেতরটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাচ্ছিল বিনুর। হাতের আঙুলগুলো থরথর করছিল। মনে হচ্ছিল, মাথাটাথা ঘুরে পড়েই যাবে।

টমির আরেকটা হুঙ্কারে সিগারেট ধরিয়ে টান লাগাল বিনু।

সেই যে একটা নিষিদ্ধ রাজ্যের দরজা খুলে গিয়েছিল, তারপর থেকে নদীর পাড়ে লুকিয়ে ঝাউবনের ভেতর ঢুকে দুই বন্ধুর সঙ্গে সিগারেট খেতে লাগল বিনু। সিগারেট টমিরাই বেশি যোগাত, মাঝে মাঝে তারা নিজেরাও কিনত।

এ ব্যাপারে ভয় আছে, পাছে কেউ দেখে ফেলে। তবু লুকিয়ে লুকিয়ে নিষিদ্ধ কিছু করার ভেতর বিচিত্র এক উত্তেজনাও রয়েছে। সিগারেট টানতে টানতে বিনুর মনে হতে লাগল, সে যেন আর বাচ্চাদের দলে নেই, সিগারেটের ধোঁয়ায় চড়ে হঠাৎ অনেক বড় হয়ে গেছে।

সিগারেট খেয়ে চোরের মতো বাড়ি ফেরে বিনু। চনমন করে সবাইকে লক্ষ করে, সহজে কারোর কাছে ঘেঁষতে চায় না। তার আশঙ্কা, বুঝিবা তার মুখ থেকে কেউ সিগারেটের গন্ধ পেল।

মোটামুটি এইভাবে চলছিল।

হঠাৎ এক ছুটির দিনের বিকেলবেলা বিনু বেরুচ্ছে, ঝিনুক কাছে এসে দাঁড়াল। বলল, 'বেড়াতে যাচ্ছ?'

শ্যামল আর অশোক স্টিমারঘাটের কাছে দাঁড়িয়ে থাকবে। বিনু সংক্ষেপে উত্তর দিল, 'হ্যাঁ— 'বলেই ব্যস্তভাবে উঠোনে নেমে গেল।

পেছন থেকে ঝিনুক ডাকল, 'বিনুদা—'

বেরুবার মুখে বাধা পড়ায় বিনু বিরক্ত। পেছন ফিরে রুক্ষ গলায় বলল, 'কী বলছ?'

'তোমার সঙ্গে কথা আছে।'

'পরে শুনব।'

'না, এক্ষুনি।'

লম্বা লম্বা পা ফেলে ঝিনুকের কাছে ফিরে এল বিনু। চোখটোখ কুঁচকে বলল, 'কী বলবে, তাড়াতাড়ি বল—'

ঝিনুক হাসল, 'অত তাড়া কেন? বন্ধুরা বুঝি দাঁড়িয়ে আছে?'

শ্যামল আর অশোক যে তার সব সময়ের সঙ্গী, এ কথা জানতে আর কারোর বাকি নেই। বিনু কিছু বলল না, তার চোখ আরও কুঁচকে যেতে লাগল।

ঝিনুক একটু ভেবে বলল, 'তুমি আজকাল একটা জিনিস খাচ্ছ?'

'কী?'

'তুমিই বল না—'

'বুঝতে পারছি না।'

চারদিক ভাল করে দেখে নিয়ে খুব চাপা গলায় ঝিনুক বলল, 'সিগারেট।'

পলকে মুখখানা একেবারে কাগজের মতো সাদা হয়ে গেল। ভাল করে কথা বলতে পারল না বিনু। তোতলাতে তোতলাতে কোনও রকমে বলল, 'মিথ্যে কথা।'

'মিথ্যে?' বিনুর চোখের দিকে তাকিয়ে, মাথা ঝাঁকিয়ে বলল ঝিনুক।

'নিশ্চয়ই—' বিনু খুব জোর দিয়ে বলতে চাইল বটে, কিন্তু গলার ভেতর থেকে দুর্বল একটা আওয়াজ

boiRboi.net

বেরুল মাত্র।

'তা হলে তোমার পকেট থেকে সিগারেট বেরুল কেমন করে?'

'আমার পকেট থেকে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, মশাই।'

বিনু কিছু বলতে চেষ্টা করল, পারল না। তার বুকের ভেতরটা ঢাকের আওয়াজের মতো গুর গুর করতে লাগল।

ঝিনুক আবার বলল, 'ধোপাবাড়ি পাঠাবার জন্যে মাসিমা আমাকে তোমার ময়লা জামা আনতে বলেছিল। পকেট টকেটগুলো দেখে নিচ্ছিলাম, যদি পয়সাকড়ি কিছু থাকে। পয়সার বদলে ও মা, একেবারে সাপ বেরিয়ে পড়ল—'

বিনুর এবার মনে পড়ে গেল, সেদিন টমিদের কাছ থেকে অনেকগুলো সিগারেট জোগাড় করেছিল। ঝাউবনে বসে কয়েকটা টেনেছিল, ক'টা রেখেছিল পকেটে। ভেবেছিল, পরে ফেলে দেবে। অসাবধানে ফেলে দিতে ভুলে গেছে।

শ্বাস আটকে আসছিল বিনুর। নাকের ডগাটা ঝিঁ ঝিঁ করছিল। সমস্ত শরীর যেন অসাড় হয়ে আসছে। কোনও রকমে সে বলতে পারল, 'মাকে সিগারেট দেখিয়েছ নাকি?'

আস্তে আস্তে মাথা হেলিয়ে দিল ঝিনুক, 'হুঁ —'

বিনুর হৃৎপিন্ডটা লাফ দিয়ে গলার কাছে উঠে এল যেন, 'সত্যি?'

একদৃষ্টে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল ঝিনুক। তারপর মাথাটা ধীরে ধীরে দু'ধারে নাড়ল। অর্থাৎ বলে দিল।

'সত্যি বলছ?'

'হুঁ—'

'আমাকে ছুঁয়ে বল।'

বিনুর গায়ে আঙুল ঠেকিয়ে ঝিনুক বলল, 'হল তো?'

এতক্ষণে সহজভাবে শ্বাস টানতে পারল বিনু। একটু হেসে বলল, 'বাঁচালে।'

'এই প্রথম, এই শেষ। এর পর খেলে আর বাঁচাব না। ঠিক মাসিমাকে বলে দেব।'

'আর খাবই না।'

'শ্যামলদা আর অশোকদার সঙ্গে মিশে মিশে তুমি খারাপ ছেলে হয়ে যাচ্ছ।'

বিনু এ কথার উত্তর না দিয়ে বলল, 'সিগারেটগুলো কোথায়?'

ঝিনুক বলল, 'আমার কাছে।'

বিনু মুখ কাঁচুমাচু করে অনুনয়ের সুরে বলল, 'আমাকে দিয়ে দাও না—'

ঝিনুক বলল, 'উঁহু—'

'দাও না, দাও না—'

'না। ওগুলো আমার কাছে থাকবে।'

'সিগারেট দিয়ে তুমি কী করবে?'

'তুমি যদি আমার কথা না শোন, মাসিমাকে-দাদুকে-দিদাকে, সবাইকে দেখাব।'

কী সাঙ্ঘাতিক মেয়ে! বিনুর মনে পড়ল, ঝুমার সঙ্গে কাউফল পাড়তে গিয়ে খালের জলে ডুবে গিয়েছিল। সেই কথাটা মাকে বলে দেবে, এই ভয় দেখিয়ে অনেক দিন ঝিনুক তাকে তটস্থ করে রেখেছে, এক মুহূর্তও সুখে থাকতে দেয় নি।

জলে ডোবার ব্যাপারটা মলিন হয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে পকেট থেকে সিগারেট বেরুল। আর কী আশ্চর্য, তার যত কুকীর্তি, সবই কিনা ঝিনুকের হাতে ধরা পড়ছে। ভাগ্যিস ঝিনুক ধরেছে। অন্য কারোর হাতে পড়লে কী যে হত, ভাবতে সাহস হয় না।

বিনু আর পীড়াপীড়ি করল না। শুধু বলল, 'সিগারেটগুলো একটু লুকিয়ে রেখো, কেউ যেন দেখে না ফেলে।'

'সে তোমাকে বলতে হবে না। এমন জায়গায় রেখেছি, কারোর সাধ্যি নেই খুঁজে পায়।'

pathagar.net

একটু চুপ করে থেকে বিনু বলল, 'আমি তা হলে এখন যাই?'

আস্তে আস্তে মাথা ঝাঁকাল ঝিনুক, 'উঁহু—' এইভাবে মাথা ঝাঁকানো তার কতকালের অভ্যাস।

'না গিয়ে এখন কী করব?'

'আমার সঙ্গে ক্যারাম খেলবে।'

নদীর পাড়ে, ঝাউবনে কি স্টিমারঘাটের ওধারে মিলিটারি ব্যারাকে কোথায় অশোকদের সঙ্গে ঘুরে বেড়াবে তা নয়। শুধু বাড়িতে বসে থাকো। করুণ গলায় বিনু বলল, 'ক্যারাম!'

'হ্যাঁ। নতুন বন্ধু পেয়ে আজকাল বাড়িতেই থাকো না। এখন আমার সঙ্গে খেলতেই হবে।'

জলে ডোবার পর এই নতুন এক মারণাস্ত্র পেয়ে গেছে ঝিনুক। নাঃ, মেয়েটার হাত থেকে কোনও দিন মুক্তি নেই।

বিষণ্ণ মুখে ক্যারাম খেলতে বসে গেল বিনু।

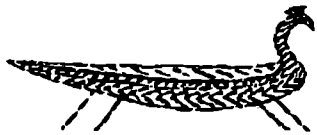

ঝিনুকের কাছে ধরা পড়বার পর অশোকদের এড়িয়ে চলতে লাগল বিনু। আজকাল টিফিনের সময় তাদের ফাঁকি দিয়ে স্কুলের পেছন দিকের সোনাল ঝোপে গিয়ে একা বসে থাকে। ছুটি হলেই চোখকান বুজে বাড়ির দিকে ছোটে।

কিন্তু ক'দিন আর। একদিন ছুটির পর চারদিক দেখে ছুটতে যাবে, তার আগেই অশোকরা ধরে ফেলল।

শ্যামল বলল, 'কি ভাই, আজকাল যে আমাদের সঙ্গে মিশতেই চাও না।'

বিনু আবছা গলায় বলল, 'না, মানে পরীক্ষা এসে গেল। তাই—'

চোখের তারা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে অশোক বলল, 'হঠাৎ গুড বয় হয়ে গেলে যে! পরীক্ষা বুঝি আমাদের নেই?'

'না, মানে—'

'বার বার মানে মানে কী করছ? এস—'

'কোথায়?'

'বা রে, তুমি দেখছি এ ক'দিনে সব ভুলে গেছ! ছুটির পর আমরা যেখানে যাই সেখানেই যাব। স্টিমারঘাটে, টমিদের ব্যারাকে, ঝাউবনে—'

তীব্র আকর্ষণ বোধ করছিল বিনু, আবার ভয়ও লাগছিল। শেষ পর্যন্ত ভয়ের দিকটাই ভারী হয়ে দাঁড়াল। বিনু বলল, 'তোমরাই যাও ভাই, আমার বাড়িতে একটু কাজ আছে।'

'কোনও কাজ নেই।'

জোর করে বিনুকে টানতে টানতে অশোকরা ঝাউবনে নিয়ে গেল। গাছের আড়ালে বসে অশোক পকেট থেকে সিগারেট বার করল।

দেখেই বিনু হাত নেড়ে ভয়ে ভয়ে বলল, 'আমি কিন্তু ভাই সিগারেট খাব না।'

'কেন?'

ঝিনুকের কাছে যে ধরা পড়ে গেছে তা আর জানায় না বিনু। শুধু বলল, 'এমনি।'

একদৃষ্টে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে আঙুলের ডগায় বিনুর থুতনিটা নাড়তে লাগল অশোক। ঠাট্টার গলায় বলল, 'সিগারেট তো খাবে না, তা হলে কী খাবে? ডুডু? কচি খোকা!' বলতে বলতে একটা সিগারেট বিনুর ঠোঁটের ফাঁকে গুঁজে দিয়ে ফস করে দেশলাই ধরাল।

কয়েক দিনের জন্য ঝিনুক বিনুকে ফিরিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু অশোকদের টান এত প্রবল, নিষিদ্ধ জিনিসের আকর্ষণ এত তীব্র যে আবার সে ভেসে যেতে লাগল।

অশোকদের সঙ্গে ফের ঘুরতে শুরু করেছে বিনু, আবার লুকিয়ে সিগারেট খাচ্ছে। যুদ্ধ লাগবার

পর পূর্ব বাংলার হৃদয়ের গভীরে লুকানো এই মায়াবী রাজদিয়াকে ঘিরে যে উদ্‌ভ্রান্ত ঘূর্ণি ঘুরে চলেছে তা যেন হাজার হাতে তাকে টানতে লাগল। বিনুকে ফেরাতে পারে তেমন শক্তি ঝিনুকের ক্ষুদ্র দুর্বল বাহুতে নেই।

অশোকদের পাল্লায় পড়ে সিগারেট টানে বটে, তবে আগের চাইতে অনেক বেশি সাবধান হয়ে গেছে বিনু। বাড়ি ফেরার সময় ভাল করে পেয়ারা পাতা চিবিয়ে নেয়, যাতে মুখে গন্ধ না থাকে। পকেট টকেটগুলো অনেক বার করে দেখে উলটে পালটে।

মোটমুটি এইরকম চলছিল।

হঠাৎ একদিন অঘটন ঘটে গেল। সেদিন আর ঝাউবনে বসে সিগারেট খাচ্ছিল না বিনুরা । সাহস দেখাবার জন্য বড় রাস্তা দিয়ে তিন বন্ধু বুক ফুলিয়ে হাঁটছিল, তাদের ঠোঁটের একধারে সিগারেট ঝুলছে। ভাবখানা এই, কাউকে পরোয়া করি না।

ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে যখন তারা আদালতপাড়ার কাছে এসেছে, সেই সময় বিনু টের পেল একটা কর্কশ শক্ত হাত কানে সাঁড়াশির মতো চেপে বসেছে।

চমকে পেছনে ফিরতেই বিনু দেখতে পেল—মজিদ মিঞা। মুখ থেকে সব রক্ত যেন নিমেষে নেমে গেল, ঠোঁট থেকে সিগারেট খসে পড়ল। ভয়ে চোখের তারা স্থির, হাত-পা একেবারে জমে গেছে।

মজিদ মিঞাকে চেনে না অশোক। একটি অপরিচিত মুসলমানকে বিনুর কান ধরতে দেখে প্রথমটা হকচকিয়ে গিয়েছিল সে। তার পরেই রুখে উঠল, 'আপনি ওর কান ধরছেন যে?'

মজিদ মিঞা বলল, 'বেশ করছি।'

'আপনি কি ওর গার্জেন?'

'গার্জেন-গুর্জেন উই হগল এংরাজি বুঝি না। অর কানটা যদিন ছিড়াও ফেলাই কেউ কিছু কইব না। কানটা তো পেরথমে ছিড়ুমই। হের পর ভাইবা দেখুম, আর কী করন দরকার—' বলে বিনুর কানে প্রচন্ড এক মোচড় দিল মজিদ মিঞা।

অশোক এবার ধমকের গলায় বলল, 'ভাল চান তো শিগগির ওর কান ছেড়ে দিন।'

'ছ্যামরা তর কথায় নিকি?'

'হ্যাঁ, আমার কথায়।'

'মোচের র‍্যাখ (রেখা) পড়ে নাই, গলায় টিফি দিলে (টিপলে) মায়ের দুধ উইঠা আসব। ওই ব'সে (বয়সে) সিগরেট খাও, আবার চোখ লাল কর! র' ছ্যামরা, তরে মজা দেখাই।' বিনুর কানটা ডান হাতে ধরা ছিল, বাঁ হাত দিয়ে ঠাস করে অশোকের গালে এক চড় কষিয়ে দিল মজিদ মিঞা। সঙ্গে সঙ্গে রাস্তায় ঘুরে পড়ল অশোক।

মজিদ মিঞা একাই ছিল না। তার সঙ্গে অন্য একটা লোকও ছিল। অশোক পড়ে যেতেই মজিদ মিঞা সঙ্গীকে বলল, 'ধর তো ছ্যামরারে, কত বড় বান্দর হইছে একবার দেখি।'

মজিদ মিঞার মুখ থেকে কথা খসবার আগেই লোকটা বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে অশোককে ধরে ফেলল। ব্যাপার সুবিধের নয় বুঝে শ্যামল এই সময় ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুট লাগাল।

পেছন থেকে মজিদ মিঞা চেঁচিয়ে বলল, 'তোমারে আমি চিনি বাসী, তৈলোক্য স্যানের নাতি তুমি। লৌড়াইয়া (দৌড়ে) পলাইবা কই? যাইতে আছি তোমাগো বাড়িত্।'

এদিকে অশোককে টানতে টানতে সেই লোকটা সামনে এনে দাঁড় করিয়েছে। মজিদ মিঞা তার পা থেকে মাথা পর্যন্ত একবার দেখে নিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কাগো বাড়ির পোলা তুমি?'

অশোকের অবস্থা অবর্ণনীয়। এত যে তুখোড় সে, এত চৌকস, চোখে মুখে যার কথার খই ফোটে, একটু আগেও যে রুখে উঠছিল, এখন তার ঠোঁট কাঁপছে, চোখ জলে ভরে গেছে।

মজিদ মিঞা ধমকে উঠল, 'কী হইল, মুখ দিয়া দেখি রাও (শব্দ) বাইর হয় না!'

কাঁদো কাঁদো মুখে অশোক বলল, 'আর কক্ষনো করব না।'

'কান্‌তে (কাঁদতে) আরম্ভ করলা দেখি। গজ্জন তজ্জন গ্যাল কই? কান্দনে আমি ভুলুম না। কুন বাড়ির পোলা আগে কও। না কইলে কিলাম ল্যাঠা আছে।'

ভয়ে ভয়ে অশোক এবার বলল, 'গোঁসাইবাড়ির—'

'তোমার বাপের নাম কী?'

'অনন্তকুমার গোস্বামী।'

হঠাৎ ভীষণ রেগে উঠল মজিদ মিঞা। অশোকের গালের কাছে হাত নিয়ে এসে চিৎকার করে উঠল, 'হারামজাদা, বাপেরে সোম্মান দিতে জান না! নামের আগে শিরিযুক্ত বাবু বসাইতে মানে লাগে!'

মুখ নামিয়ে চুপ করে রইল অশোক।

মজিদ মিঞা এবার তার সঙ্গীকে বলল, 'কাশমা, তুই উই ছ্যামরারে গোসাইবাড়ি লইয়া যা। আমি হ্যামকত্তার বাড়িত্ থিকা আইতে আছি।'

কাশমা অর্থাৎ কাশেম অশোককে নিয়ে চলে গেল। আর মজিদ মিঞা বড় রাস্তার ওপর দিয়ে বিনুর কান ধরে টানতে টানতে তাদের বাড়ি নিয়ে গেল। তার এমন ভয়ানক চেহারা আগে আর কখনও দেখেনি বিনু।

হেমনাথ অবনীমোহন স্নেহলতা সুরমা, সবাই বাড়িতেই ছিলেন। মজিদ মিঞা আর বিনুকে এভাবে আসতে দেখে তাঁরা উদ্বিগ্ন মুখে বেরিয়ে এলেন।

হেমনাথ শুধোলেন, 'কী হয়েছে রে মজিদ?

সংক্ষেপে সব ঘটনা বলে গেল মজিদ মিঞা। শুনতে শুনতে অবনীমোহন সুরমা এবং স্নেহলতার নিশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে এল। অবনীমোহন মাথায় হাত দিয়ে সেখানেই বসে পড়লেন। স্নেহলতা আর সুরমা কিছু বলতে চেষ্টা করলেন, গলা দিয়ে তাঁদের স্বর বেরুল না। সুধা সুনীতি ফিসফিস করে নিজেদের ভেতর কী বলাবলি করতে লাগল। আর স্তব্ধ মূর্তির মতো একধারে দাঁড়িয়ে রইল ঝিনুক।

হেমনাথ একদৃষ্টে, পলকহীন তাকিয়ে ছিলেন। কথাটা যেন তিনি বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। অনেকক্ষণ পর আস্তে করে বললেন, 'বলিস কী!'

'হ ঠাউর ভাই। এইর এট্টা বিহিত করেন।' মজিদ মিঞা বলতে লাগল, 'অহনও সোময় আছে। পোলা চৌখের সামনে নষ্ট হইয়া যাইব. এ আমি সইতে পারুম না।'

হেমনাথ হঠাৎ যেন খেপে উঠলেন, 'বিহিতের জন্যে আমার কাছে ধরে এনেছিস কেন, নিজে শাসন করতে পার নি? তুমি ওর কেউ হও না?'

অবনীমোহন এই প্রথম কথা বললেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, আপনি যা ভাল বোঝেন করুন। আমি তো ভাবতেই পারি না, ছেলেটা এত বড় উল্লুক হয়ে উঠেছে!'

মজিদ মিঞা আবেগের গলায় বলল, 'হ, আমারই শাসন করা উচিত আছিল। আমি পরের লাখান কাম করছি। এইবার আপন মাইনষের লাখান কাম করি।' বলে উঠোনের এক ধারে একটা খুঁটির সঙ্গে বিনুকে কষে বাঁধল। তারপর কোত্থেকে একটা কাঠের লম্বামতো টুকরো জোগাড় করে এনে সমানে মারতে লাগল।

একেকটা ঘা পড়ছে আর চামড়া ফেটে ফেটে রক্ত ছুটছে। বিনু আকাশ ফাটিয়ে চেঁচাতে লাগল, 'আমাকে মেরে ফেলল, আমাকে মেরে ফেলল। আর কক্ষনো ও কাজ করব না।'

দেখাদেখি ঝিনুকও কান্না জুড়ে দিল। ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, 'বিনুদাকে মেরে ফেললে গো—'

স্নেহলতাও ঝিনুকের সঙ্গে সুর ধরলেন, 'মজিদ, আর ওকে মেরো না।'

অবনীমোহন বললেন, 'মারুন আপনি, মেরে শেষ করে দিন। এরকম ছেলের দরকার নেই আমার।'

সুরমাও তা-ই বললেন। হেমনাথ উঠে গিয়ে স্নেহলতা আর ঝিনুককে রান্নাঘরে দিয়ে এলেন।

একসময় মেরে টেরে মজিদ মিঞা চলে গেল।

মারের চোটে কত জায়গায় যে কেটে গেছে। হাত-পায়ের আর কিছু নেই, ফুলে ডুমো ডুমো হয়ে উঠেছে। রক্ত জমাট বেঁধে জায়গায় জায়গায় কালশিটে পড়ে গেছে। ব্যথার তাড়সে সন্ধেবেলায় জ্বর এসে গেল বিনুর। ধুম জ্বর।

জ্বর আসার খানিকক্ষণ পর হাঁড়িভর্তি রসগোল্লা, মোহনবাঁশি কলার ছড়া আর একটা নতুন ফুটবল নিয়ে আবার এল মজিদ মিঞা। বাড়িতে পা দিয়েই বিনুর খোঁজ করল।

হেমনাথ বললেন, 'ওর জ্বর এসেছে।'

'জ্বর!' মজিদ মিঞা চমকে উঠল, 'বিনু কই?'

'পুবের ঘরে শুয়ে আছে।'

পাগলের মতো ছুটে পুবের ঘরে ঢুকল মজিদ মিঞা। তারপর বিনুর মাথার কাছে ফুটবল, মিষ্টির হাঁড়িটাড়ি রেখে, তার সারা গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে কাঁদতে লাগল, 'অয় রে, কী পাষাণ পরান আমার, দুধের শিশুরে মাইরা ফেলাইলাম—'

কিছুক্ষণ হাত বুলোবার পর মজিদ মিঞা চলে গেল। ঘন্টাখানেক পর লারমোরকে নিয়ে আবার এসে হাজির হল। বলল, 'দ্যাখেন লালমোহন সাহেব, পোলায় নি আমার বাচব!' বলে তার কী কান্না।

অবনীমোহন হেমনাথ যত বোঝান, 'জ্বর হয়েছে, সেরে যাবে—' মজিদ মিঞা শোনে না। তার কান্না বাড়তেই লাগল, 'অয় রে, কী পাষাণ পরান আমার—'

সারা রাত বিনুর শিয়রে জেগে বসে থাকল মজিদ মিঞা।

এরই ভেতর একদিন ঢাকা ইউনিভার্সিটির এম.এ পরীক্ষার রেজাল্ট বেরিয়ে গেল। যা আশা করা গিয়েছিল, তা-ই হল। হিরণ ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছে।

কলেজের চাকরি হয়েই ছিল। রেজাল্ট বেরুবার পর রাজদিয়ায় এসে প্রফেসারি নিল হিরণ।

জ্বর ছাড়ার পর অবনীমোহনের সঙ্গে একদিন সুজনগঞ্জের হাটে গেল বিনু। হেমনাথ আসেন নি। ক'দিন ধরে তাঁর জ্বর, একেবারে শয্যাশায়ী হয়ে আছেন। বিনু সেরে উঠবার পরই তিনি জ্বরে পড়েছেন।

দু'বছর হল বিনুরা রাজদিয়া এসেছে। এই প্রথম হেমনাথকে সে অসুস্থ হতে দেখল।

হাটে পা দিতেই বিনুদের কানে এল, সুজনগঞ্জে চাল পাওয়া যাচ্ছে না। এতবড় একটা গঞ্জ, যেখানে ফি হাটে কম করে হাজার, দেড়-হাজার মণ ধান-চাল বিকিকিনি হয় সেখানে একদানা শস্যও নেই। নদীর ধার ঘেঁষে সারি সারি আড়তগুলোতে তালা ঝুলছে। পুব দিকে হাটুরে চালার তলায় চারপাশের গ্রাম থেকে চাষীরা ঘরে ভানা চাল এনে বসত। চালাগুলো আজ ফাঁকা।

চাল নেই, চাল নেই।

তামাকহাটা বেগুনহাটা মরিচহাটা—যেখানেই বিনুরা যাচ্ছে, সন্ত্রস্ত গুঞ্জন শুনতে পাচ্ছে।

'হায় আল্লা, বাজারে চাউল নাই। নিজেরা খাই কী? পোলাপানরে বাচাই ক্যামনে?'

'হে ভগমান, অদ্দিষ্টে কী যে আছে!'

বিনুরা দেখতে পেল, হাটের নানা জায়গায় থোকা থোকা ভিড় জমেছে। সবাই ভয়ার্ত, বিহ্বল, দিশেহারা। চাল ছাড়া কেউ অন্য কোনও কথা বলছে না।

ঘুরতে ঘুরতে মাছ ব্যাপারি গয়জদ্দির সঙ্গে দেখা। সে বলল, 'হাটে কুন সময় (কখন) আইলেন জামাইকত্তা?'

অবনীমোহন বললেন, 'একটু আগে।'

'খপর শুনছেন?'

'হ্যাঁ, শুনলাম।'

'পঞ্চাশ ষাইট বচ্ছর ব'স (বয়স) হইল, চাউলের অ্যামন আকাল আর দেখি নাই। ঘরে এক পাসারি চাউল আছে, তিন ওক্ত কইরা খাইলে তিনদিনও চলব না। দুই ওক্ত কইরা খাইলে বড় জোর চাইর রোজ। হেরপর কী যে করুম!'

অবাক হয়ে অবনীমোহন বললেন, 'তোমার ঘরে মোটে এক পসারি চাল থাকবে কেন? তোমার না দশ কানি ধানের জমি!'

গয়জদ্দি কপালে চাপড় মেরে বলল, 'আর কইয়েন না জামাইকত্তা, বুদ্ধির দুষ (দোষ) আর লোভ। দুইয়ে পইড়া এইবার গুষ্ঠিসুদ্ধা মরলাম।'

'কিরকম?'

'ধান-চাউলের দর যহন চ্যাতনের (চড়বার) মুখে হেই সোময় ঘরের বেবাক ধান-চাউল দিলাম বেইচা। ট্যাকা হাতে পাইয়া মাথা গ্যাল গরম হইয়া। চাষীর হাতে কাচা ট্যাকা। বুঝলেন জামাইকত্তা, বড় পোলার শাদি দিলাম। শাদির পর পনর দিন ধইরা খাওনের কী চোট! আত্মবান্ধব মিলাইয়া চাল্লিশজন বাড়িত্ বইসা খাইল। রুজ মাছ। এই ব্যালা চিতল তো উই ব্যালা কাতল। হের উপুর গোস্ত, মিষ্টান্ন, পাতক্ষীর। অন্য পোলারা কমলাঘাটের বড় গুঞ্জ থিকা নয়া জোতা কিনা আনল, পিরহান কিনা আনল। টচ (টর্চ) বাত্তি, লুঙ্গি, ফস্টার পেন (ফাউন্টেন পেন), কত জিনিস যে কিনল! অহন ঘরে চাউলও নাই, ট্যাকাও নাই। অহন খালি কপাল থাপড়াই আর পাছা থাপড়াই। হগলই বুদ্ধির দুষ (দোষ)।'

অবনীমোহনদের কথা বলতে দেখে আরও অনেকে এসে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। যেমন মোতালেফ নিকারি, মনা ঘোষ, বৃন্দাবন ভুঁইমালী— এমনি পনের কুড়িজন। তারাও একই কথা বলল। দর চড়তে দেখে অনেকেই ধান-চাল বেচে দিয়ে কাঁচা টাকা দু'হাতে উড়িয়ে দিয়েছে।

মনা ঘোষ বলল, 'চাউলের কী করন? একখান বুদ্ধি দ্যান দেখি জামাইকত্তা—'

অবনীমোহন বললেন, 'কী বুদ্ধি দেব, আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।'

বৃন্দাবন ভুঁইমালী বলল, 'সুজনগুঞ্জে চাউল নাই। কাইল একবার মীরকাদিম, বেতকা, আউশ্‌শইতে (আউটশাহীতে) যামু। দেখি পাওন যায় কিনা—'

মোতালেফ নিকারি এই সময় বলে উঠল, 'কুনোহানে চাউল নাই। আমার বইনের জামাই পরশু ঘুইরা আইছে।'

'তয়?'

'তয় আর কি, মরণ। একহান কথা শুনছ?'

'কী?'

'কাইল গিরিগুঞ্জের বাজারে দুইটা দোকান লুট হইছে।'

'নিকি?'

'হ।'

'জন্ম ইস্তক চাউল লুটের কথা আর শুনি নাই।'

'প্যাটের জ্বালায় মাইনষের মাথা ঠিক থাকে। লুটপাট তো হপায় (সবে) আরম্ভ হইল। দ্যাখ না, কী কান্ড হয়।'

'আরেকখান কথা শুনছ?'

'কী?'

'ভাটির দ্যাশে চাউল না পাইয়া মাইনষে শাগ-পাতা খাইতে আছে।'

'কী যে হইব!'

কথায় কথায় দুপুর হয়ে গেল। এখন সূর্যটা খাড়া মাথার ওপর উঠে এসেছে। অবনীমোহন কী বলতে যাচ্ছিলেন, সেই সময় বিষহরিতলার ওধারের মাঠ থেকে ঢাকের আওয়াজ ভেসে এল। চমকে বিনু দেখতে পেল, ঢেঁড়াদার হরিন্দ উঁচু প্যাকিং বাক্সের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। তার দুই চেলা কাগা ঘণা সমানে ঢাক বাজিয়ে যাচ্ছে। এস.ডি.ও সাহেব একধারে চেয়ারে বসে আছেন, একটা লোক তাঁর মাথায় ছাতা ধরে দাঁড়িয়ে। চারপাশে অসংখ্য লাল পাগড়ি। নতুনত্বের ভেতর আজ কয়েকজন মিলিটারি অফিসারকে দেখা যাচ্ছে।

বিনু ফিসফিস করে বলল, 'বাবা মিলিটারি এসেছে।'

অবনীমোহন বললেন, 'হ্যাঁ।'

'আগে তো মিলিটারি দেখি নি।'

'তিন চার হাট তুই আসিস নি, তাই জানিস না। আজকাল ফি হাটে মিলিটারি আসছে।'

'কেন?'

'যুদ্ধের জন্যে লোক জোগাড় করছে। একে রিক্রুট করা বলে।'

pathagar.net

বিনু আবদারের গলায় বলল, 'বাবা, আমি রিক্রুট করা দেখব।'

খুব একটা ইচ্ছা ছিল না অবনীমোহনের। তবু ছেলে যখন ধরেছে, আর না বলতে পারলেন না। বললেন, 'চল—'

বিষহরিতলার কাছে আসতে দেখা গেল, লারমোর ঝাঁকড়া বটগাছের তলায় যথারীতি তাঁর রোগীপত্তর নিয়ে বসে আছেন। এত যে ডামাডোল, আকাল, যুদ্ধ, সমস্ত জল-বাংলা জুড়ে যে এত দুর্ভিক্ষের দুর্ভাগ্যের ছায়া, সে সবের কোনও দিকেই লক্ষ্য নেই তাঁর। বহুজনহিতায় বহুজনসুখায় এক প্রশান্ত ধ্যানের ভেতর তিনি মগ্ন হয়ে আছেন।

বিষহরিতলা বাঁয়ে ফেলে খোলা মাঠের কাছে আসতে দেখা গেল, ঢাকের বাজনা থেমে গেছে। এর ভেতর হাটের নানা দিক থেকে মানুষ গিয়ে সেখানে জমা হতে শুরু করেছে।

এস.ডি.ও সাহেব জমায়েতটার দিকে তাকিয়ে ছিলেন। মোটামুটি শ'চার পাঁচেক লোক জমেছে দেখে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'যারা সৈন্যদলে নাম লেখাবে তারা ডান দিকের ওই ফাঁকা জায়গায় গিয়ে দাঁড়াও।'

ভিড়ের ভেতর থেকে একজন দু'জন করে ফাঁকা জায়গায় গিয়ে দাঁড়াতে লাগল। বিনুর মনে পড়ল, তিন চার সপ্তাহ আগে যখন সুজনগঞ্জের হাটে এসেছিল তখন রিক্রুমেন্টের কথায় হাটুরে লোকেরা ভয় পেয়ে গিয়েছিল। এক মাসের কম সময়ের ভেতর কী এমন ঘটল যাতে তাদের ভয় কেটে গেছে?

হঠাৎ বিনুর চোখে পড়ল, তার ঠিক পাশে খলিল বছির তাহের এবং আরও ক'জন চরের মুসলমান দাঁড়িয়ে আছে। ধানকাটার মরশুমে তারা হেমনাথের বাড়ি আসে। কিছুদিন আগেও তাদের রাজদিয়ায় মাটি ভরাট এবং মিলিটারি ব্যারাক তৈরি করতে দেখা গেছে।

বছিরদের দেখে বিনু অবাক। বলল, 'তোমরা এখানে?'

বছির বলল, 'যুজ্যে নাম লিখাইতে আইছি।'

'তোমরা যুদ্ধে যাবে!'

'হ।'

এই সময় অবনীমোহন তাদের দিকে ফিরলেন। বছিরদের শেষ কথাগুলো তিনি শুনতে পেয়েছিলেন। বিস্ময়ের সুরে বললেন, 'যুদ্ধে যাবে কেন?'

বছির বলল, 'কাম কাইজ নাই। কিছু এট্টা তো করন লাগব।'

বিনু বলে উঠল, 'কাজ নেই মানে! এই তো ক'দিন আগে মিলিটারিদের ওখানে মাটি কাটছিলে। ব্যারাক তৈরি করছিলে—'

'হে আর কয়দিনের কাম? শ্যাষ হইয়া গ্যাছে।'

খানিক ভেবে অবনীমোহন বললেন, 'আর কোথাও কোনও কাজ পেলে না?'

'না জামাইকত্তা—' বিষণ্ণভাবে মাথা নাড়ল বছির, 'কুনোহানে কাম নাই। এই দিকে ধান-চাউল মিলে না। আগে চাষবাসের খন্দ গ্যালে মাইনষের বাড়িত্ কামলা খাটতাম। অহন কেও কামলা নেয় না। উপাস দিয়া দিয়া আর পারি না জামাইকত্তা। পোলাপান মরতে বইছে।'

তাহের বলল, 'শুনছি, যুজ্যে গ্যালে প্যাটভরা খাওন মিলব, মাস মাস ট্যাকা পাওন যাইব। না খাইয়া মরার থিকা যুজ্যে যাওন ভালা না?'

অবনীমোহন কী বলবেন, ভেবে পেলেন না।

তাহের আবার বলল, 'আমাগো চরের কেউ আর ঘরে বইসা থাকব না। হগলে যুজ্যে যাইব গিয়া।'

খলিল বলল, 'ছদা (শুধু) আমাগো চরের নিকি, চাইর দিকে যা আকাল লাগছে, হেয়াতে যাগো ঘরে চাউল আছে হেরা (তারা) ছাড়া বেবাক মাইনষে যুজ্যে যাইব। না গিয়া উপায় নাই জামাইকত্তা। নিজেরা না খাইয়া থাকি, হে এক কথা। কিন্তুক চৌখের সামনে পোলা-মাইয়া প্যাটের জ্বালায় দাপাইয়া মরব, এ সয় না।'

অবনীমোহন অসহায়ের মতো তাকিয়ে থাকলেন। এবারও কিছু বলতে পারলেন না।

ওদিক থেকে একটা কনস্টেবলের গলা ভেসে এল, 'যারা যুজ্যে যাইবা, উই ধারে গিয়া লাইন দিয়া খাড়াও—যারা যুজ্যে যাইবা—'

প্রথমে এস.ডি.ও সাহেব যুদ্ধে যাবার ডাক দিয়েছিলেন। এখন তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে কনস্টেবলটা চেঁচাচ্ছে। আর এস.ডি.ও সাহেব চেয়ারে বসে মাথা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সমস্ত কিছু পর্যবেক্ষণ করছেন। তাঁর পাশে বসে আছে মিলিটারি অফিসাররা।

বাছাই আর অপেক্ষা করল না। ডান দিকে যেখানে লম্বা লাইন পড়েছে তার পেছনে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। চোখের পলকে লাইনটা বিশ হাত বেড়ে গেল।

যুদ্ধে যেতে ইচ্ছুক লোকগুলোর সংখ্যা যখন একশ' ছাড়িয়ে গেছে, সেই সময় এস.ডি.ও সাহেব বললেন, 'এবার বাছাইয়ের কাজ শুরু কর।'

তিন চারটি কনস্টেবল ফিতে দিয়ে ব্যস্তভাবে মাপামাপি শুরু করে দিল। একবার তারা লোকগুলোর পা থেকে মাথা পর্যন্ত মাপছে, তারপর বুকের ছাতি মাপছে।

সেনাদলে যাকে তাকে নেওয়া হয় না। সেখানে নাম লেখাতে হলে বিশেষ শরীরিক উচ্চতা, ওজন আর বুকের মাপ থাকা দরকার। তার কম হলে চলবে না।

কেউ লম্বায় ঠিক হচ্ছে তো বুকের মাপে আটকে যাচ্ছে। কারোর বুকের মাপ ঠিক হচ্ছে তো লম্বায় আটকে যাচ্ছে।

এর ভেতর যারা চলাক চতুর তারা পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে উচ্চতা বাড়াবার চেষ্টা করছে। যাদের বুক ঢোলা পাখির মতো তারা জোরে ফুসফুসে বাতাস টেনে টেনে ফুলিয়ে রাখছে। কিন্তু কনস্টেবলদের চোখে ধুলো ছিটানো সহজ নয়। যারা ডিঙি মেরে লম্বা হয়েছিল রুলের গুঁতোয় তাদের বেঁটে করে দিচ্ছে তারা। যারা বুক ফুলিয়ে রেখেছে তাদের পেটে ঘুষি মেরে হাওয়া বার করে দিচ্ছে।

যাদের মাপ মিলল, মুরগি বাছাইয়ের মতো তাদের একধারে দাঁড় করিয়ে রাখল কনস্টেবলরা, বাকিদের ভাগিয়ে দিল। দেখা গেল, শ'খানেক লোকের ভেতর অর্ধেকই বাতিল হয়ে গেছে।

বাছাইয়ের প্রথম কাজ হল দৈর্ঘ্য প্রস্থের মাপ নেওয়া। তারপর বাক্সের মতো চৌকো একটা যন্ত্রের ওপর বসিয়ে পছন্দ-করা লোকগুলোর ওজন নেওয়া হল। ওজন নিতে গিয়ে আরও কিছু লোক ছাঁটাই হয়ে গেল।

ওজনের পর যারা টিকে রইল এস.ডি.ও সাহেব নিজের হাতে তাদের নাম ঠিকানা লিখে নিলেন। তারপর বললেন, 'পরশু দিন তোমরা রাজদিয়া মিলিটারি ব্যারাকে চলে যাবে।'

লোকগুলো শুধলো, 'কহন যামু?'

'সকালবেলা। হ্যাঁ, ভাল কথা, খালি পেটে আসবে। সেদিন তোমাদের মেডিক্যাল হবে।'

'মেডিক্যাল কী?'

'স্বাস্থ্য পরীক্ষা।'

তাড়াহুড়ো বাছাইয়ের কাজ সুচারুভাবে সম্পন্ন করে এস.ডি.ও সাহেব, মিলিটারি অফিসার এবং পুলিশ বাহিনী নিয়ে চলে গেলেন।

চরের যে মুসলমান কামলারা ধানকাটার সময় হেমনাথের বাড়ি আসে তাদের ভেতর একজনকে মোটে পছন্দ করা হয়েছে। সে তাহের। প্রাথমিক পরীক্ষায় বাকি কারোর যোগ্যতা প্রমাণিত হয় নি।

খলিল বছিররা অযোগ্যতার গ্লানি দুই কাঁধে ঝুলিয়ে হতাশ মুখে ফিরে এল। তাহেরও তাদের সঙ্গে এসেছে। অন্য কেউ সেনাদলে চাকরি পাবে না, সেজন্য বেচারা প্রাণ খুলে আনন্দ পর্যন্ত করতে পারছে না। রিক্রুটমেন্টের লোকেরা সবাইকে বাদ দিয়ে তাকে পছন্দ করেছে, এ যেন তারই অপরাধ। খলিলদের পিছু পিছু মুখ চুন করে তাহের এসে দাঁড়াল।

বিনুরা এখনও সেইখানেই দাঁড়িয়ে আছে।

অনাদিমোহন বললেন, 'তোমাদের একজনকে বেছে নাম লিখে নিল, দেখলাম।'

খলিল বলল, 'হ। তাহেররে অগো পছন্দ হইছে। আর আমরা ফ্যালনা, গাঙের পানিতে ভাইসা আসছি।'

অনাদিমোহন চুপ করে থাকলেন।

খলিল আবার বলল, 'আমি উচায় (উচ্চতায়) খাটো হইলাম। আরে আমি যে খাটো হেয়াতে কি আমার হাত আছে? খোদায় যামন বানাইছে তামন হইছি। ইচ্ছা কইরা খাটো হইছি?'

অবনীমোহন মাথা নাড়েন, 'তা তো বটেই।'

বছির এবার বলল, 'বুকের মাপে আমি খারিজ হইয়া গ্যালাম। ছাতির ওসার (প্রস্থ) নিকি আমার কম। কম হইব না তা কি বেশি হইব। উপাস দিয়া দিয়া পরান যায়। ছাতি বড় হইব ক্যামনে? বাইচা যে আছি, হেই না কত!'

সবাই ক্ষুব্ধ, আশাহত, দুঃখিত। অবনীমোহনের উত্তর দেবার মতো কিছুই ছিল না।

খলিল বলল, 'হগলই নছিব জামাইকত্তা। আমরা যুজ্যে গিয়া যে দু'গা খাইয়া বাচুম, খোদাতাল্লায় তা চায় না।'

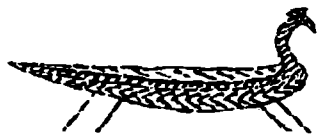

হেমনাথ সেই যে জ্বরে পড়েছিলেন, সারতে দশ দিন লেগে গেল। জ্বর সারলেও দুর্বলতা কাটল না। একটু হাঁটলেই পা ভেঙে আসে, মাথা ঘুরতে থাকে।

চিরকাল বয়সকে অস্বীকার করে এসেছেন হেমনাথ। বয়সও এতকাল উদাসীন ছিল। হঠাৎ সে তাঁর দিকে নজর দিতে শুরু করেছে, এবং প্রথম সুযোগেই বিছানায় ফেলে দিয়েছে।

অসুস্থ, দুর্বল শরীর নিয়ে কোথায় গিয়ে কী বিপদ ঘটাবেন, সেই ভয়ে স্নেহলতা তাঁকে বাইরে বেরুতে দেন না। পাছে বেরিয়ে যান, সেজন্য চোখে চোখে রাখছেন।

এত বড় সংসার যাঁর মাথায় তাঁর তো এক জায়গায় বসে থাকলে চলে না। কোনও দরকারে উঠে যেতে হলে ঝিনুক কিংবা সুধা সনীতিকে পাহারাদার হিসেবে হেমনাথের কাছে বসিয়ে রেখে যান স্নেহলতা।

হেমনাথ চেঁচামেচি করেন, 'বসিয়ে বসিয়ে আমাকে একেবারে অথর্ব করে ফেলছ স্নেহ।'

স্নেহলতা হাসেন, 'তাই নাকি?'

'নিশ্চয়ই। দেখো, আমাকে ঠিক বাতে ধরবে।'

'তা হলে আমি খুশি হব।'

হেমনাথ অবাক হয়ে বলেন, 'খুশি হবে!'

মজার ভঙ্গি করে ঘাড় হেলিয়ে দেন স্নেহলতা, 'হব হব, একশ'বার হব।'

'কেন?'

'বাতে শুয়ে থাকলে অন্তত চরকির মতো ঘোরাটা তোমার বন্ধ হবে। এত বয়েস হল, তবু ঘোরা বাই যাচ্ছে না।'

একটু চুপ করে থেকে কৌতুকের গলায় হেমনাথ বলেন, 'তুমি তো অসুখের জন্যে আমাকে বেরুতে দিচ্ছ না। রাজদিয়ার লোক কিন্তু অন্যরকম ভাবতে শুরু করেছে।'

অস্বস্তির সুরে স্নেহলতা জিজ্ঞেস করেন, 'কী ভাবছে?'

'বুড়ো বয়েসে তোমার নাকি রস উথলে উঠেছে। দিনরাত আমাকে কোলে শুইয়ে, মুখে মুখ রেখে—'

কথা আর শেষ করতে পারেন না হেমনাথ। তার আগেই স্নেহলতা মুখ লাল করে ঝঙ্কার দিয়ে ওঠেন, 'আহা, কথার কি ছিরি! কিছুই আটাকায় না মুখে!'

হেমনাথ হাসতে থাকেন।

স্নেহলতা আগের সুরে বলতে লাগলেন, 'তোমার চালাকি আমি বুঝি। লোকের ওসব কথা বলতে বয়ে গেছে। বললেও তোমাকে বাড়ির বার হতে দিচ্ছ না।'

হেমনাথের বন্দিত্ব যেন আর ফুরোতে চায় না। এরই ভেতর একদিন বিকেল বেলা মীরকাদিমের রজবালি শিকদার এসে হাজির।

রজবালির বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। গায়ের রং টকটকে। এই বয়সেও শরীরের বাঁধুনি বেশ মজবুত। হাতের হাড় চওড়া, চোয়াল শক্ত, চিবুক ধারাল। দাড়ি এবং গোঁফ নিপুণ করে ছাঁটা। চোখদু'টি

সবসময় সজাগ এবং তীক্ষ্ণ। তাকে ফাঁকি দিয়ে কিছু হবার উপায় নেই। যার দিকে রজবালি তাকায় তার বুকের গভীর পর্যন্ত যেন দেখতে পায়।

পরনে ডোরাকাটা সিল্কের লুঙ্গি আর ফিনফিনে পাঞ্জাবি। তার তলায় জালিকাটা গেঞ্জির আভাস। মাথায় নকশা-করা ধবধবে টুপি। কানে আতর মাখানো গোলাপি রঙের তুলো। পায়ে কাঁচা চামড়ার নাগরা। চোখের কোলে সুর্মার সূক্ষ্ম টান। সব মিলিয়ে মানুষটি রীতিমতো শৌখিন।

মীরকাদিমের গঞ্জে রজবালির ধান-চাল মুগ-মসুর তিল-তিসি ইত্যাদি শস্যের ব্যবসা। শাল কাঠের খিলান-দেওয়া টিনের প্রকান্ড চারটে আড়ত রয়েছে তার। সবসময় সেগুলো বোঝাই, কম করে এক দেড় হাজার মণ শস্য মজুত থাকে। এছাড়া আছে হাঁড়ি বালতির দোকান, মনিহারি দোকান। সব মিলিয়ে এলাহী ব্যাপার।

হেমনাথ বললেন, 'রজবালি যে, আয়—আয়—' বিনু কাছেই ছিল। তাকে একটা জলচৌকি এনে দিতে বললেন।

জলচৌকি এলে তার ওপর বসতে বসতে রজবালি বলল, 'ক্যামন আছেন হ্যামকত্তা? শরীল কাহিল কাহিল ঠ্যাকে।'

হেমনাথ তাঁর অসুখের কথা বললেন, এবং কিছুদিন ধরে যে বন্দি জীবন যাপন করছেন, তা-ও জানলেন।

রজবালি আন্তরিক সুরে বলল, 'আপনের অ্যামন অসুখ, খপর পাই নাই তো। পাইলে আগেই আসতাম।'

হেমনাথের মুখ দেখে মনে হল, রাজবালির আন্তরিকতাটুকু খুবই ভাল লেগেছে তাঁর। মৃদু হেসে বললেন, 'তোদের খবর ভাল তো?'

'আপনেরা য্যামন রাখছেন।'

'আমরা রাখবার কে? যিনি রাখবার তিনিই রেখেছেন।'

যা কইছেন।'

'তারপর কী মনে করে? কোনও দরকারে এসেছিস, না এমনি বেড়াতে?'

রজবালি হাসল, 'ব্যবসায়ীত্ মানুষ, বিনা দরকারে কুনোহানে যাওনের উপায় আছে? সোময় কই?'

জিজ্ঞাসু চোখে তাকালেন হেমনাথ।

রজবালি বলল, 'এইহানে যে মিলিটারি আসছে আমি তাগো কাছে ছাপ্লাইয়ের এট্টা 'অডার' পাইছি।'

'কী সাপ্লাই?'

'হাস-মুরগি-পাঠা-ডিম, চাউল-ডাইল—এই হগল। অডারের ব্যাপারটা পাকা করতে আইজ আইছিলাম।'

বিনুর হঠাৎ নিত্য দাসের কথা মনে পড়ল। দেখা যাচ্ছে, মিলিটারির কল্যাণে চারদিকের বড় বড় ব্যবসায়ী আর আড়তদাররা রাজদিয়ায় হানা দিতে শুরু করেছে।

হেমনাথ শুধোলেন, 'অর্ডারের কথা পাকা হল?'

'হ।'

'কবে থেকে সাপ্লাই দিতে হবে?'

রজবালি বলল, 'পরশু থিকা। ভাবতে আছি রাইজদায় এট্টা বাড়ি ভাড়া নিমু। এইহানে 'রাখি' কইরা না রাখতে পারলে রুজ রুজ ঠিক সোময় মাল ছাপ্লাই দিতে পারুম না। এয়া তো এতি-পেতি লইয়া কারবার না, মিলিটারি বইলা কথা। টাইমে দিতে না পারলে ঘেটিতে মাথা থাকব না।'

রজবালি আরও জানালো, স্টিমারঘাটের কাছে মস্তাজ মিঞা যে নতুন বাড়িখানা করেছে, সেটাই ভাড়া করতে চাইছে। মোটামুটি কথাবার্তা হয়ে গেছে। কাল পরশু বাড়িটার দখল পাওয়া যেতে পারে।

হেমনাথ এবার অন্য প্রসঙ্গ নিয়ে এলেন, 'তোদের ওদিকে ধানচালের খবর কী বল—'

'জবর খারাপ হ্যামকত্তা। দশ পনর দিন ধইরা মীরকাদিমের বাজারে একদানা চাউল নাই। চাউল বইলা কথা। মাইনষে পাগলের লাখান ঘুরতে আছে।'

চিন্তিত মুখে হেমনাথ বললেন, 'খুবই বিপদের কথা। তা হ্যাঁ রে, তোর আড়তে তো অত ধান ছিল। সব বিক্রি করে ফেলেছিস?'

চকিতে চারদিক একবার ভাল করে দেখে নিয়ে রজবালি বলল, 'না। অত ধান চাউল কি দুই-চাইর-দশ দিনে ব্যাচা যায়! ছয় মাস ধইরা ব্যাচলেও শ্যাষ করন যাইব না।' একটু চুপ করে থেকে আবার বলল, 'হগল ব্যবসায়ীতে যা করছে, আমিও হেই করছি হ্যামকত্তা।'

'কী করেছিস?'

'ধান চাউল সরাইয়া ফেলাইছি।'

'কেন?' বিমূঢ়ের মতো জিজ্ঞেস করলেন হেমনাথ।

রজবালি বলল, 'দর আরও চেতুক (চড়ুক), হের পর ছাড়ুম। আমার এক সুমুন্দি মানিকগুঞ্জের উই দিকে চাউলের ব্যবসায়ীত্। হেয় কইছে, দর আরও চেতবো। যত পারি অহন য্যান ধান-চাউল 'রাখি' করি।'

হেমনাথ বললেন, ''রাখি' তো করছিস। দেশের লোক না খেয়ে শুকিয়ে মরছে, সেদিকে খেয়াল আছে?'

কথাটা শুনেও শুনল না রজবালি। অন্যমনস্কের মতো বলতে লাগল, 'আমরা ব্যবসায়ীত্। দ্যাশের মাইনষের দিকে তাকাইলে আমাগো কি চলে!' একটু থেমে আবার বলল, 'আপনের তো মেলা জমিন। বাড়তি ধান চাউল কিছু আছে? থাকলে আমারে দিতে পারেন। ভাল দাম দিমু।'

হেমনাথ মাথা নাড়লেন, 'নেই। প্রত্যেক বার ধান ওঠার পরই বাড়তি ধান বেচে দিই। এবারও দিয়েছি। বেশি কিছু থাকলেও তোকে দিতাম না। লোককে বিলিয়ে দিতাম।'

রজবালি কথাটা গায়ে মাখল না। হাসতে হাসতে বলল, 'আপনের লগে কার তুলুনা। আপনে নিজে না খাইয়াও মাইনষেরে খাওয়াতে পারেন। কিন্তুক আমরা হইলাম ব্যবসায়ীত্ মানুষ।'

হেমনাথ উত্তর দিলেন না।

রজবালি বলল, 'অনেকক্ষণ আইছি। এইবার যাই হ্যামকত্তা।' উঠতে গিয়ে কী মনে পড়তে বসে পড়ল, 'ভালা কথা, আপনেরে একখান খপর দেওয়া হয় নাই—'

'কী খবর?'

'মুছলিম লিগের নাম শুনছেন?'

'মুসলিম লিগ? শুনব না কেন?'

'হ।' রজবালি মাথা নাড়ল, 'কয়দিন আগে ঢাকা থিকা মুছলিম লিগের বড় মিঞারা মীরকাদিমে আইসা মিটিন করল। মিটিনে তেনারা কী কইল জানেন?'

'কী?'

'মুছলমানগো লেইগা একখান দ্যাশ চাই। তার নাম পাকিস্থান। তেনারা আরও কইল, যেহানে যত মুছলমান আছে হগলের লিগে নাম লিখান দরকার। অত বড় মানুষগুলা কইছে, কেও আর না কইতে পারল না। আমাগো উইদিকের মেলা মাইনষে মুছলিম লিগে নাম লিখাইতে আছে।'

একটু পর রজবালি চলে গেল।

কনট্রোল হবার আগেই চিনি কেরোসিন আর কাপড় বাজার থেকে উধাও হয়ে গিয়েছিল। তারপর এই রাজদিয়ায় তিনখানা কনট্রোলের দোকান বসল। একটা নিত্য দাসের, একটা অখিল সাহার আর তৃতীয়টি রায়েবালি শিকদারের।

প্রথম প্রথম রেশন কার্ড দেখিয়ে জিনিস তিনটে পাওয়া যাচ্ছিল। তারপর কনট্রোলের দোকান থেকে সেগুলো অদৃশ্য হয়ে গেল।

মিলিটারি ব্যারাকগুলি বাদ দিলে রাজদিয়ার ঘরে ঘরে আজকাল আর হেরিকেন জ্বলে না। গন্ধক-

শলা কি রেড়ির তেলের প্রদীপ জ্বালিয়ে সবাই রাতের কাজ সারে। চারদিকের গ্রামগুলোর অবস্থা আরও করুণ। সেখানকার মানুষেরা বিকেল থাকতে থাকতে খেয়েদেয়ে (যে খাবার জোটাতে পারে) ঘরে খিল লাগিয়ে দেয়। ফলে সন্ধে নামতে না-নামতেই গ্রামগুলো নিশুতিপুর। সারা পূর্ব বাংলা জুড়ে পাতালের অন্তহীন, গাঢ় অন্ধকার যেন অনড় হয়ে আছে।

বিনুদের রেশন কার্ড পড়েছে নিত্য দাসের দোকানে। চিনি আর কেরোসিন আনতে বিনুকে সেখানে যেতে হয়। যখনই যায়, তার চোখে পড়ে, দোকানটার সামনে উলটো চন্ডীর মেলা লেগে আছে। শুধু নিত্য দাসের দোকানেই না, অখিল সাহা আর রায়েবালি শিকদারের দোকান দু'টোরও একই হাল।

বাইরে রেশন কার্ড আর বোতল হাতে ঝুলিয়ে জনতা তীর্থের কাকের মতো তাকিয়ে থাকে। ভেতরে দেখা যায়, নিত্য দাস একটা তক্তপোশে বসে আছে। তার সামনে ক্যাশবাক্স, রসিদ বই। ডান ধারে বড় বড় কেরোসিনের ড্রামগুলো শূন্য, চিনির বস্তাগুলো ফাঁকা। পেছনে কাপড় রাখার জন্য যে সারি সারি কাচের আলমারি বসানো আছে সেগুলোতে কিছুই নেই।

বাইরে জনতা করুণ গলায় গোঙানির মতো আওয়াজ করে ডাকে, 'অ দাস মশয়, অ দাস মশয়—'

একশ'বার ডাকলে তক্তপোশের ওপর থেকে একবার মোটে সাড়া দেয় নিত্য দাস, 'কী কও—'

'ইট্টু ক্রাচিন দ্যান। আন্ধারে থাইকা থাইকা আর পারি না। হেই দিন রাইতে ঘরে সাপ ঢুকছিল।'

'ক্রাচিন নাই।'

'ইট্টু ব্যবোস্তা করেন দাস মশয়—'

'ব্যবোস্তা কি আমার হাতে? উই দেখ না ক্রাচিনের ডেরামগুলান শূইন্য (শূন্য)।'

'দয়া করেন দাস মশয়—'

'দয়ার কী আছে! তোমরা ট্যাকা দিয়া মাল কিনবা, কিন্তুক ব্যাপারখান কী জানো?'

'কী?'

'ছাপ্পাই নাই। উই দেখ চিনির ছালাগুলান (বস্তাগুলো) শূইন্য পইড়া রইছে।'

'মিঠার লেইগা পোলাপানগুলো কাইন্দা মরে। কনটোলে চিনি পাইলে কিনতে পারি। কিন্তুক বাইরে গুড়ের দর এক্কেবারে আগুন। কাছে আউগান (এগুনো) যায় না।'

'ক্যান যে তোমরা এত ঘ্যান ঘ্যান কর! কইতে আছি চিনি নাই, নিজের চৌখে হগলে দেখতেও আছ। তবু বিশ্বাস যাও না।'

'চিনি না দ্যান, কাপড় দ্যান—'

'কাপড়েরও ছাপ্পাই নাই।' আঙুল দিয়ে সারি সারি ফাঁকা আলমারিগুলো দেখিয়ে দেয় নিত্য দাস।

জনতা বলে, 'চিনি ক্রাচিন না দ্যান তো না দিলেন। কিন্তুক একখান শাড়ি না দিলে চলব না দাস মশয়। কাপড় বিহনে ঘরের বউ-মাইয়া বাইর হইতে পারে না। গামছায় কি শরম ঢাকে! তারা কয় গলায় দড়ি দিব।'

অসীম ধৈর্য নিত্য দাসের। সবার কথা, সবার মিনতি, সবার আবেদন কান পেতে গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনে যায়। তারপর বলে, 'কাপড় কই পাই? ছাপ্পাই না থাকলে আমি কী করতে পারি? আমার তো আর ধুতি-শাড়ির মেচিন নাই যে বানাইয়া দিমু।'

'আপনের কুনো কথা শুনুম না। কাপড় না পাইলে এইহানে 'হত্যা' (হত্যে) দিয়া পইড়া থাকুম।'

'হত্যা দিলে কি কাপড় মিলব! হের থিকা এক কাম কর—'

'কী?'

'গরমেন্টেরে (গভর্নমেন্টকে) গিয়া ধর।'

'গরমেন বুঝি না, আপনেই আমাগো হগল। বাচান দাস মশয়, ঘরের বউ-ঝি'র ইজ্জত বাচান।'

এই সব আবেদন-নিবেদন কাকুতি-মিনতির মধ্যে হঠাৎ বিনুকে দেখতে পেলেই হাতের ইশারা করে নিত্য দাস। ভিড় ঠেলে ঠেলে বিনু দোকানের ভেতর চলে আসে।

নিত্য দাস তার কানের কাছে মুখ এনে ফিস ফিস করে, 'কি ছুটোবাবু, ক্রাচিন নিতে আসছেন?' হেমকর্তার নাতিকে অন্য সবার মতো সেও আপনি করে বলে।

বিনু মাথা নাড়ে, 'হ্যাঁ।'

'যাও গা, রাইতে পাঠাইয়া দিমু।'

'কিন্তু—'

'কী?

'আপনার দোকানে তো কেরোসিন নেই।'

'থাউক না থাউক, হে আপনেরে দেখতে হইব না। আপনে ক্রাচিন পাইলেই তো হইল।' নিত্য দাস বলতে থাকে, 'রাইতে যে ক্রাচিন পাঠামু হেই কথাহান গুপন (গোপন) রাইখেন। একবার জানতে পারলে উই শকুনের গুষ্টি আমারে ছিড়া খাইব।' বলে সামনের জনতাকে দেখিয়ে দেয়।

বিনু যেদিনই কেরোসিন আনতে যায়, সেই একই কথা বলে তাকে বাড়ি পাঠিয়ে দেয় নিত্য দাস। তারপর রাত্রিবেলা তার লোক চটের থলেতে ঢাকাঢুকি দিয়ে কেরোসিনের টিন নিয়ে আসে।

এইভাবেই চলছিল।

নিত্য দাসের যে গোমস্তা কেরোসিন দিয়ে যায় তার নাম সুচাঁদ। হঠাৎ একদিন সে হেমনাথের সামনে পড়ে গেল।

হেমনাথ বললেন, 'তুই নিত্য দাসের দোকানে কাজ করিস না?'

সুচাঁদ বলল, 'আইজ্ঞা।'

'এই রাত্রিবেলা আমার বাড়ি কী মনে করে?'

'আইজ্ঞা ক্রাচিন।'

'কেরোসিন?'

'হ—'সতর্ক চোখে চারদিক দেখে নিয়ে কাপড়ের আড়াল থেকে মাঝারি একটা টিন বার করল সুচাঁদ।

হেমনাথ বিমূঢ়ের মতো বললেন, 'কী ব্যাপার? এইভাবে চোরের মতো কেরোসিন নিয়ে এসেছিস! আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।'

তাঁর বাড়িতে এভাবে গোপনে যে কেরোসিন পাঠানো হচ্ছে, হেমনাথ জানতেন না। তাঁর বিমূঢ় হবারই কথা।

বিনু কাছেই ছিল। সে সমস্ত ব্যাপারটা খুলে বলল।

শুনে চিৎকার করে উঠলেন হেমনাথ, 'হারামজাদার এত বড় সাহস, কেরোসিন ঘুষ দিয়ে আমাকে খুশি করতে চায়!' সুচাঁদকে বললেন, 'বেরো আমার বাড়ি থেকে। বেরো—'

সুচাঁদ ভয় পেয়ে গিয়েছিল, 'আইজ্ঞা—'

উত্তেজিত সুরে হেমনাথ আবার বললেন, 'এখনও দাঁড়িয়ে আছিস! কেরোসিন টিন নিয়ে এক্ষুনি চলে যা—'

সুচাঁদ পালিয়ে গেল।

চেঁচামেচি শুনে স্নেহলতারা বেরিয়ে এসেছিলেন।

স্নেহলতা বললেন, 'কী হল, অত হইচই কেন?'

উত্তেজনা যেন শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছুল হেমানাথের, 'ওই নিত্য দাসের স্পর্ধা দেখেছ!'

'কেন, কী করেছে সে?'

'কী করে নি? রেশনের চিনি-কেরোসিন-কাপড় ব্ল্যাকে দশ গুণ দামে বিক্রি করছে। রাজদিয়া-কেতুগঞ্জ-রসুলপুর, চারদিকের গ্রামগুলোর কোনও লোক ন্যায্য দামে এক দানা চিনি পাচ্ছে না, এক ফোঁটা কেরোসিন পাচ্ছে না, কাপড়ের একটা সুতো পাচ্ছে না। আর রাত্রিবেলা লোক দিয়ে আমাকে ঘুষ পাঠানো হচ্ছে! ওকে আমি পুলিশে দেব, জেলে পাঠাব।'

স্নেহলতা শুধোলেন, 'সুচাঁদ কি কেরোসিন এনেছিল?'

হেমনাথ বললেন, 'এনেছিল। আমি তাড়িয়ে দিয়েছি।'

'তাড়িয়ে তো দিলে, হেরিকেন জ্বলবে কেমন করে?'

pathagar.net

'জ্বলবে না। গন্ধকশলা আর রেড়ির তেল দিয়ে কাজ চালাও। তা যদি না পার, অন্ধকারে থাকবে। সারা দেশে আলো নেই, আর তুমি নিজের ঘরে দেয়ালি জ্বালবে—এ হতে পারে না স্নেহ।'

বিনু অভিভূতের মতো হেমনাথের দিকে তাকিয়ে থাকে।

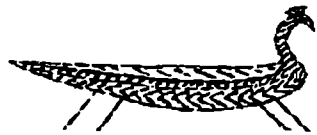

সিগারেট খাওয়ার জন্য মজিদ মিঞার হাতে সেই যে মার খেয়েছিল, তার পর থেকে শ্যামল আর অশোকের সঙ্গে মেশে না বিনু। হেমনাথ-অবনীমোহন-সুরমা-স্নেহলতা, সবাই ওদের সঙ্গে মেলামেশা করতে বারণ করে দিয়েছেন। নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে, স্কুল ছুটির পর পারতপক্ষে ওদের সঙ্গে বেড়ায় না বিনু। বেশির ভাগ দিন সোজা বাড়ি চলে আসে।

আজও ফিরছিল সে।

পশ্চিম আকাশের ঢালু পাড় বেয়ে সূর্যটা অনেকখানি নেমে গেছে। রোদের রং এখন বাসি হলুদের মতো। বিকেলের নিবু নিবু অনুজ্জ্বল আলো গায়ে মেখে ঝাঁকে ঝাঁকে বালিহাঁস আর পানিকাউ উড়ছিল। উত্তর আকাশে তুলোর স্তূপের মতো সাদা সাদা ভবঘুরে মেঘ।

বরফ কল, মাছের আড়ত পেরিয়ে স্টিমারঘাটের কাছে আসতেই কে যেন ডাকল, 'বিনুদা—বিনুদা—'

চমকে ঘুরে দাড়াতেই বিনু দেখতে পেল, জেটির কাছে ঝুমা।

চোখাচোখি হতেই ঝুমা হাতছানি দিল।

প্রথমটা বিশ্বাসই করতে পারল না বিনু। এই বিকেলবেলায় নদীর দিক থেকে যখন এলোমেলো হাওয়া দিয়েছে, সূর্যটা ডুবুডুবু, রোদের রং মলিন, যখন পশ্চিমের ভাসমান মেঘ ফুলে ফুলে পাহাড়ের মতো হয়ে আছে, সেই সময় স্টিমারঘাটের কাছে ঝুমার সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে, কে ভাবতে পেরেছিল! অবাক বিনু দাঁড়িয়েই থাকল।

ঝুমা আবার ডাকল, 'দাঁড়িয়ে রইলে কেন? এস—'

দু'চোখে অপার বিস্ময় নিয়ে আস্তে আস্তে এগিয়ে গেল বিনু।

স্তূপাকার মালপত্রের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে ঝুমা। ট্রাঙ্ক, সুটকেস, বেতের বাস্কেট, কুঁজো, চার-পাঁচটা হোল্ডঅল, টিফিন-কেরিয়ার—কত যে জিনিস, লেখাজোখা নেই। ঝুমারা ছাড়া আর কাউকেই দেখা যাচ্ছে না।

পলকহীন তাকিয়েই ছিল বিনু। চোখ কুঁচকে ঝুমা বলল, 'একেবারে বোবা হয়ে গেলে যে! আমাকে যেন চিনতেই পারছ না—'

হঠাৎ দেখলে সত্যিই চেনা যায় না। মাথায় অনেকখানি লম্বা হয়ে গেছে ঝুমা। দু'বছর আগে ছিল বালিকা, বড় বড় পা ফেলে কখন সে কৈশোরকে ধরে ফেলেছে, কে বলবে। গায়ের চামড়া টানটান, মসৃণ, তাতে চকচকে আভা ফুটেছে। প্রচুর স্বাস্থ্য মেয়েটার, গায়ের আঁটোসাঁটো জামাটায় ধরতে চায় না।

চোখ এমনিতেই বড়, তার মাঝখানে কালো কুচকুচে মণিদু'টো নিয়ত অস্থির, নিয়ত ছটফটে।

বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকতে পারল না বিনু। অন্য দিকে চোখ ফিরিয়ে বিব্রতভাবে বলল, 'না, মানে—'

'মানে আবার কী?'

'অনেকদিন পর তোমাকে দেখলাম কিনা।' একটু সামলে নিয়ে বিনু আবার বলল, 'তুমি একলা এখানে, এই স্টিমারঘাটে?'

ঝুমা বলল, 'আজই আমরা কলকাতা থেকে এলাম যে—'

'কখন এসেছ?'

'এক্ষুনি এলাম। দেখছ না স্টিমারটা—'

বিনু তাকিয়ে দেখল, জেটিঘাটের ওপারে রাজহাঁসের মতো সেই স্টিমারটা দাঁড়িয়ে আছে। সেটার মাস্তুলে খয়েরি রঙের শঙ্খচিল। হঠাৎ বিনুর মনে পড়ল, ও বেলা স্কুলে আসার সময় স্টিমারটা চোখে পড়ে নি। সে বলল, 'স্টিমার তো সকালবেলা আসার কথা—'

ঝুমা বলল, 'হ্যাঁ, বড্ড দেরি করে এসেছে। পাক্কা দশ ঘন্টা লেট—'

এবার বিনু ভাল করে লক্ষ করল, ঝুমার চুল রুক্ষ, উস্কখুস্ক। প্রায় দু'দিন স্টিমার এবং ট্রেনে কাটিয়ে আসার ফলে মুখচোখ মলিন। তারপর একটা কথা খেয়াল হতে তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'তোমাকেই শুধু দেখছি, আর সবাই কোথায়?'

'জেটিঘাটের ভেতর। কুলিদের দিয়ে মালপত্তর এনে এনে রাখছে। আমি এখানে পাহারা দিচ্ছি। দাদু আর বাবা গেছেন একটা ঘোড়ার গাড়ি জোগাড় করতে। ওঁরা এলেই আমরা বাড়ি যাব।' বলতে বলতে হঠাৎ কী মনে পড়ে গেল ঝুমার, 'আচ্ছা বিনুদা—'

'কী বলছ?'

'তোমরা তো সেই থেকেই দেশে আছ, আর কলকাতায় যাও নি—তাই না?'

'হ্যাঁ। তোমায় কে বললে?'

'বা রে, কলকাতায় গেলে তুমি বুঝি আমাদের বাড়ি যেতে না? তা ছাড়া—'

'কী?'

চোখের তারা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ঝুমা এবার বলল, 'তোমরা যে দেশে আছ, সে খবর আমরা পেয়েছি।'

'কেমন করে?'

'হাঁদা গঙ্গারাম, কিছুই জানো না! সুনীতিদিদি প্রত্যেক সপ্তাহে আমার মামাকে দু'খানা করে চিঠি লেখে। তাতেই জানতে পেরেছি।'

বিনু মনে মনে ভাবল, সত্যিই সে হাঁদা। সুনীতির সব চিঠিই তো সে নিজের হাতে ডাকবাক্সে দিয়ে আসত, অথচ এমন সোজা জিনিসটা তার মাথায় ঢুকল না!

ঝুমা এবার গলা নামিয়ে ফিসফিস করল, 'তোমার দিদি আর আমার মামার ভেতর ব্যাপার আছে, না বিনুদা—' বলে দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ভুরু নাচিয়ে নাচিয়ে কেমন করে যেন হাসতে লাগল।

ঝুমার ইঙ্গিতটা বুঝতে পেরেছে বিনু। তার মুখ লাল হয়ে উঠল। দু'বছর আগে মেয়েটা ছিল দুর্দান্ত, ডানপিটে। ভয় টয় বলে তার কিছুই ছিল না। টের পাওয়া যাচ্ছে, সেই ঝুমা এবার অন্য দিক থেকে পেকে টুসটুসে হয়ে এসেছে।

একটু নীরবতা।

তারপর ঝুমাই আবার ডাকল, 'বিনুদা—'

'কী বলছ?'

'সেই হিংসুটি মেয়েটা এখন কোথায় গো?'

'কার কথা বলছ?'

'ঝিনুক—ঝিনুক—'

বিনু বলল, 'ঝিনুক আমাদের বাড়িতেই আছে।'

ঝুমা ঘাড় বাঁকিয়ে শুধলো, 'সেই তখন থেকে?'

'হ্যাঁ।' গভীর সহানুভূতির গলায় বিনু বলতে লাগল, 'কোথায় আর যাবে বল। ওর মা তো এখানে নেই—'

'ঝিনুকের মা এখনও আসে নি?'

'না।'

'আর আসবে না মনে হয়।'

'তাই শুনেছি।'

একটু কী ভেবে ঝুমা এবার জিজ্ঞেস করল, 'ঝিনুক এখন কত বড় হয়েছে বিনুদা?'

ঝুমার কথায় চকিত হল বিনু। সত্যিই বড় হয়ে উঠেছে ঝিনুক, প্রায় ঝুমার মতোই কিশোরী। দু'বছর হতে চলল, একই বাড়িতে সাতাশের বন্দে'র ছ'খানা ঘর, ঢালা উঠোন, স্নিগ্ধ ছায়াচ্ছন্ন বাগান,

pathagar.net

টলটলে পুকুর, পাখিদের অশ্রান্ত কিচির মিচির আর গ্রীষ্ম-বর্ষা-শরৎ-হেমন্ত দিয়ে ঘেরা ছোট্ট মনোরম একটি ভুবনের মাঝখানে তারা পাশাপাশি আছে। অথচ তিল তিল করে কখন যে ঝিনুক বড় হয়ে উঠেছে, লক্ষই করে নি বিনু। আজ ঝুমার কথায় মনে পড়ে গেল।

ঝিনুক যেন শ্বাসবায়ুর মতো। সে কাছেই আছে, কিন্তু তার কথা মনেই থাকে না।

বিনু বলল, 'তোমার মতোই বড় হয়েছে।'

'তা হলে তো—' বলে চোখ কুঁচকে ঠোঁট কামড়াতে লাগল ঝুমা।

'তা হলে কী?'

ভুরু নাচিয়ে নাচিয়ে ঝুমা বলল, 'দু'জনে বেশ চালাচ্ছ—' কথায় কথায় ভুরু নাচানো মেয়েটার স্বভাব।

কান ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগল বিনুর। আবছা গলায় সে বলল, 'কী যা-তা বলছ!'

ঝুমা আবার কী বলতে যাচ্ছিল, সেই সময় জেটিঘাটের ভেতর থেকে চার পাঁচটা কুলির মাথায় বড় বড় স্টিলের ট্রাঙ্ক চাপিয়ে স্মৃতিরেখা বেরিয়ে এলেন। তাঁর পেছনে রুমা আর আনন্দ।

আনন্দও তবে এসেছে!

কাছাকাছি এসে কুলিরা ট্রাঙ্কগুলো নামাল। স্মৃতিরেখা বিনুকে দেখতে পেয়েছিলেন। একটুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, 'বিনু না?'

বিনু বলল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'চিনতেই পারা যায় না। কত বড় হয়ে গেছে!'

লজ্জায় চোখ নামাল বিনু। স্মৃতিরেখা বললেন, 'তুমি এখানে কোত্থেকে এলে?'

বিনু বলল, 'স্কুল থেকে। বাড়ি ফিরছিলাম, ঝুমা ডাকল।'

একটু চুপ করে থেকে স্মৃতিরেখা এবার বললেন, 'বোমার ভয়ে পালিয়ে এলাম। কলকাতায় যে কোনও দিন এখন বোমা পড়তে পারে।'

চোখ মাটির দিকে রেখেই বিনু বলল, 'কলকাতা থেকে অনেক লোক রাজদিয়া চলে এসেছে।'

'তাই নাকি?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

স্মৃতিরেখা বললেন, 'কলকাতা একেবারে ফাঁকা হয়ে গেছে। যে যেদিকে পারছে, প্রাণের ভয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। সে যাক গে। হ্যাঁ বিনু—'

মুখ তুলে জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল বিনু।

স্মৃতিরেখা বললেন, 'শুনেছি, তোমরা নাকি সেই থেকেই রাজদিয়ায় আছ—'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'জমিজমাও কিনেছ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'কতটা?'

'তিরিশ কানির মতো।'

'তোমার বাবা বুদ্ধিমানের মতো কাজ করেছেন।'

একটু চুপ।

তারপর স্মৃতিরেখা আবার বললেন, 'বাড়ির সবাই ভাল তো?'

বিনু মাথা নাড়ল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

এরপর এলোমেলো, অসংলগ্ন নানারকম কথা হতে লাগল। যুদ্ধের কথা, জাপানি বোমার কথা, রাজদিয়ার কথা, কলকাতা থেকে আসার সময় ট্রেনে-স্টিমারে অসম্ভব ভিড়ের মধ্যে প্রচন্ড কষ্টের কথা, ইত্যাদি ইত্যাদি।

একসময় শিশির আর রামকেশব ঘোড়ার গাড়ি নিয়ে ফিরে এলেন। দেখেই বিনু চিনতে পারল, গাড়িটা ঝিনুকদের। শিশিররা তা হলে ঝিনুকদের ফিটন চেয়ে আনতে গিয়েছিলেন!

কুলিগুলো একধারে দাঁড়িয়ে ছিল। রামকেশব তাড়া লাগালেন, 'মাল তুলে ফেল—'

pathagar.net

বাক্সপ্যাঁটরা তোলা হলে কুলিরা ভাড়া নিয়ে চলে গেল। রামকেশব বললেন, 'সবাই গাড়িতে ওঠ।'

স্মৃতিরেখা বিনুর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমাদের বাড়ি যাবে নাকি? চল না—'

ঝুমাও তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'চল, চল—'আগ্রহে তার চোখ চকচক করতে লাগল।

যাবার খুব যে একটা অনিচ্ছা ছিল তা নয়। হয়তো যেতও বিনু, কিন্তু পরক্ষণে সেই নিষেধাজ্ঞার কথা মনে পড়ে গেল। আজকাল স্কুল ছুটির পর আর এক মুহূর্তও বাইরে থাকার উপায় নেই। মজিদ মিঞা তার কি সর্বনাশটাই না করেছে! অবশ্য অশোকরা মাঝে মাঝে তাকে ধরে ওদের সঙ্গে নিয়ে যায়। একটু ভেবে বিনু বলল, 'এই মাত্র আপনারা এলেন। আজ বিশ্রাম টিশ্রাম করুন। আমি পরে যাব।'

স্মৃতিরেখা বললেন, ' সেই ভাল। ট্রেনে স্টিমারে দু'দিন যা ধকল গেছে! এখন চান করে একটু শুতে পেলে বাঁচি। তোমাকে নিয়ে গিয়ে ভাল করে কথাই বলতে পারব না। পরে আসবে কিন্তু—'

'আসব।'

ঝুমা বলল, 'কালই এস—'

বিনু হাসল।

স্মৃতিরেখা আর কিছু না বলে ফিটনে উঠলেন। তাঁর পিছু পিছু শিশির রুমা আর রামকেশবও উঠলেন।

উঠতে উঠতে রামকেশব বিনুকে বললেন, 'হেমদাদা আর বউ-ঠাকরুনকে বলিস, কলকাতা থেকে শিশিররা আজ এসেছে।'

বিনু ঘাড় হেলিয়ে দিল, 'বলব।'

আনন্দ আর ঝুমা এখনও নিচে দাঁড়িয়ে। সবার কান বাঁচিয়ে নীচু চাপা গলায় আনন্দ বলল, 'বাড়িতে আমার কথাও বোলো।'

ঝুমাটা কাছেই আছে, তাকে ফাঁকি দেওয়া যায় নি। চোখ কুঁচকে ঠোঁট ছুঁচলো করে সে বলল, 'কার কাছে বলবে মামা? সুনীতিদিদির কাছে?'

'তুই ভীষণ ফাজিল হয়েছিস।' আলতো করে ঝুমার মাথায় চাঁটি কষিয়ে দিল আনন্দ।

নাকের ভেতর থেকে কপট কান্নার শব্দ করতে লাগল ঝুমা, 'উঁ-উঁ-উঁ—'

'আর বাঁদরামো করতে হবে না। গাড়িতে ওঠ—' দু'জনে ফিটনে উঠে দরজা বন্ধ করল।

সঙ্গে সঙ্গে রামকেশব চেঁচিয়ে বললেন, 'গাড়ি চালা রে রসুল—'ঝিনুকদের কোচোয়ানটার নাম রসুল।

ফিটন চলতে শুরু করল। জানালার বাইরে মুখ বার করে হাত নাড়তে লাগল ঝুমা। যতক্ষণ দেখা যায়, নদীর পাড়ে স্টিমারঘাটে দাঁড়িয়ে থাকল বিনু।

বাড়ি ফিরতে ফিরতে আজ সন্ধে হয়ে এল। পুকুরের ওপারে ধানের খেত এর মধ্যে ঝাপসা হয়ে গেছে। আকাশ যেখানে পিঠ বাঁকিয়ে দিগন্তে নেমেছে, সেই জায়গাটা নিরাকার, অস্পষ্ট। বাগানের এ কোণে ও কোণে থোকা থোকা অন্ধকার জমতে শুরু করেছে। সোনাল আর পিঠক্ষীরা ঝোপের ভেতর জোনাকিদের নাচানাচি শুরু হয়ে গেছে।

স্টিমারঘাটে যে সূর্যটা ছিল ডুবু ডুবু, এখন তার চিহ্নমাত্র নেই। আকাশ জুড়ে যুঁই ফুলের মতো অগণিত তারা ফুটতে শুরু করেছে।

উঠোনে পা দিতেই সুরমা ছুটে এলেন, 'তোর তো লজ্জা নেই বিনু। সেদিন যে মজিদ মিঞা অত করে মারল, এর মধ্যেই ভুলে গেলি!'

স্নেহলতা সুধা সুনীতি শিবানী ঝিনুক, সবাই একধারে দাঁড়িয়ে আছে। খুব সম্ভব তার ফেরার জন্য ওরা উঠোনে অপেক্ষা করছিল। অবনীমোহন আর হেমনাথকে অবশ্য দেখা গেল না।

স্নেহলতা বললেন, 'গায়ের ব্যথাও মরল, আবার যে কে সে-ই হয়ে দাঁড়ালি!'

বিনু তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'তোমরা যা ভাবছ তা নয় দিদা—'

সুধা এই সময় গলা কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে ভেংচি কাটার মতো মুখ করে বলল, 'তোমরা যা ভাবছ

তা নয় দিদা। নিশ্চয়ই তা-ই। আবার ওই বাঁদরগুলোর সঙ্গে মিলিটারি ব্যারাকে গিয়ে ভিখিরিদের মতো চকলেট চাইছিলি, সিগারেট খাচ্ছিলি। দাঁড়া আজই মজিদ মামাকে খবর পাঠাচ্ছি। চ্যালা কাঠ দিয়ে যাতে—'

সুধার কথা শেষ হল না, তার আগেই বিনু ঝাঁপিয়ে পড়ল। নিমেষে দেখা গেল সুধার চুলের গোছা বিনুর মুঠোয়। সুধাও ছাড়ে নি, দু'হাতের দশটা নখ বিনুর গালে বসিয়ে দিয়ে ধরে আছে।

চেঁচামেচি এবং টানাটানি করে স্নেহলতারা দু'জনকে ছাড়িয়ে দিলেন।

যে সুনীতি চিরদিনই ধীর স্থির শান্ত, হঠাৎ কী যেন হয়ে গেল তার। ছুটে এসে বিনুর গালে এক চড় কষিয়ে দিল। চোখ পাকিয়ে বলল, 'অন্যায়ও করবে, আবার লোকের গায়ে হাতও তুলবে! দিন দিন তোমার আস্পর্ধা বেড়েই চলেছে। খুনি কোথাকার—'

দুর্বিনীত ঘাড় বাঁকিয়ে বিনু বলল, 'আমি অন্যায় করি নি।' চড় খেয়ে তার চোখ টসটস করছে। মনে হচ্ছে সে দু'টো বুঝি ফেটেই যাবে।

সুরমা বললেন, 'অন্যায় করিস নি তো এতক্ষণ ছিলি কোথায়? তোকে না বলে দেওয়া হয়েছে স্কুল ছুটির পর এক মিনিটও বাইরে থাকবি না। আবার সন্ধে করে বাড়ি ফিরতে শুরু করেছ!'

বিনু বলল, 'স্কুল ছুটির পর আমি তো আসছিলামই। স্টিমারঘাটের কাছে ঝুমাদের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।'

'কোন ঝুমা?'

'ওই যে রামকেশবদাদুর নাতনি—'

স্নেহলতা বললেন, 'ওরা এসেছে নাকি?'

বিনু বলতে লাগল, 'হ্যাঁ, আজই বিকেলবেলা এসেছে। স্টিমারঘাটে নেমেই আমাকে দেখতে পেয়ে ওরা আটকাল। কথা বলতে বলতে দেরি হয়ে গেল।'

সুধাটা চিরকালের ঘরশত্রু। সে হঠাৎ বলল, 'গোয়ালন্দের স্টিমার তো আসে সকালে। বিকেলবেলা এসেছে কিরকম?'

দাঁতমুখ খিঁচিয়ে চেঁচিয়ে মেচিয়ে বাড়ি মাথায় তুলে ফেলল বিনু, 'বিশ্বাস না হয়, ঝুমাদের বাড়ি গিয়ে জিজ্ঞেস করে আয় না রাক্ষুসী।'

আবার একটা কুরুক্ষেত্র বেধে যাবার উপক্রম হচ্ছিল। তাড়াতাড়ি দু'জনকে থামিয়ে স্নেহলতা বললেন, 'ঝুমাদের জন্যে দেরি হয়েছে, সে কথা বলবি তো। কী বোকা ছেলে তুই! শুধু শুধু মার খেলি!'

অভিমানের গলায় বিনু বলল, 'তোমরা আমাকে বলতে দিলে কোথায়?'

বিনুর একখানা হাত ধরে স্নেহের সুরে স্নেহলতা বললেন, 'চল, হাত মুখ ধুয়ে খাবি। সেই কখন চাট্টি খেয়ে স্কুলে গিয়েছিলি।'

খেয়েটেয়ে বিনু পড়তে বসল। বেশ রাত হয়ে গেছে। খানখেত, পুকুর, সুদূর বনানী, গাছপালা—সব কিছুই এখন গাঢ় অন্ধকারে অবলুপ্ত।

সুধা সুনীতি আর ঝিনুক আগেই পড়তে বসেছিল।

এ বাড়িতে আজকাল আর কেরোসিন ঢোকে না। হেমনাথের বারণ। সারা দেশ যখন অন্ধকারে ডুবে আছে তখন নিজের ঘরে তিনি দেওয়ালি জ্বালাতে চান না। তা ছাড়া, নিত্য দাসের ওপর তিনি এতই অসন্তুষ্ট যে তার দোকানের একটা কুটোও বাড়িতে ঢুকতে দেবেন না।

কেরোসিন আসে না। এ বাড়িতে আজকাল রেড়ির তেল জ্বলে।

এই মুহূর্তে পুবের ঘরের এক কোণে দু'টো আড়াই-তলা কাঠের পিলসুজে প্রদীপ জ্বলছে। রেড়ির তেলের নিরুত্তেজ আলোয় চারধার স্নিগ্ধ। বিনুরা তিন ভাই বোন আর ঝিনুক সুর করে পড়ে যাচ্ছিল।

বিনুর ডান পাশে বসেছে সুনীতি। তারপর সুধা এবং ঝিনুক।

পড়তে পড়তে মুখ তুলে সুনীতি একবার বিনুকে দেখে নিল। তারপর আবার বাইরের দিকে তাকাল। কিছুক্ষণ পর আবার বিনুকে দেখল, তারপর চোখ নামিয়ে বই নাড়াচাড়া করতে লাগল।

pathagar.net

অনেকক্ষণ ইতস্তত করার পর খুব আস্তে, গলার ভেতর থেকে সুনীতি ডাকল, 'বিনু—'

বিনু শুনেও শুনল না, গলা চড়িয়ে পড়তে লাগল।

ফের ডাকল সুনীতি।

এবার বিরক্ত, অপ্রসন্ন চোখে তাকাল বিনু।

সুনীতি বলল, 'খুব পড়া দেখাচ্ছিস, না?' বলে হাসল।

বিনু কিছু বলল না, চোখ কুঁচকেই থাকল।

সুনীতি এবার কোমল গলায় বলল, 'গালে খুব লেগেছিল, না রে?'

মুখ বাঁকিয়ে বিনু বলল, 'না, লাগবে না!'

'সত্যি, আর মারব না। হঠাৎ এমন রাগ হয়ে গিয়েছিল।' বিনুর মাথায় হাত বুলোতে লাগল সুনীতি।

এক ঝটকায় সুনীতির হাতটা সরিয়ে দিল বিনু, 'মারবার সময় মনে ছিল না? এখন আদর ফলানো হচ্ছে!'

সুনীতি আবার বিনুর মাথায় হাত রাখল। খোশামোদের গলায় বলল, ' জীবনে আর কক্ষনো তোর গায়ে হাত তুলব না। মা কালীর দিব্যি । আর—'

'আর কী?'

'তোকে একটা জিনিস দেব।'

'কী জিনিস?'

'দু'টো টাকা।'

বিনু এবার নরম হল। একটু ভেবে বলল, 'কখন দেবে?'

'আজকেই।'

'ঠিক?'

'ঠিক।'

একটু চুপ করে থেকে সুনীতি গলার স্বর আরও নামিয়ে দিল, 'অ্যাই—'

'কী বলছ?'

'ঝুমারা কে কে এসেছে রে?'

'ঝুমা রুমাদি শিশিরমামা মামী আর—'

নিশ্বাস বন্ধ করে পলকহীন তাকিয়ে ছিল সুনীতি। চাপা গলায় ফিসফিস করে বলব, 'আর কে?'

বিনুর চোখ চিকচিক করতে লাগল। সে বলল, 'যার কথা শুনবার জন্যে দম বন্ধ করে আছ—সে। আনন্দদাও এসেছে।'

'আহা, দম বন্ধ করে থাকবার আর লোক পেলাম না!' বলেই বইয়ের ওপর ঝুঁকে মনোযোগ দিয়ে পড়তে লাগল সুনীতি।

বিনু বলল, 'আমার টাকা দাও—'

'দেব'খন।'

'ও, কাজের বেলায় আঁটিসুটি, কাজ ফুরালে দাঁত কপাটি। টাকা না দিলে কিন্তু খুব খারাপ হয়ে যাবে।'

কিছুক্ষণ পড়াশোনার পর বিনু হঠাৎ শুনতে পেল, নীচু গলায় সুধা সুনীতিকে বলছে, 'তোর মনস্কামনা পূর্ণ হল তো দিদি—'

সুনীতি বলল, 'কিসের আবার মনস্কামনা?'

উত্তর না দিয়ে সুধা রগড়ের গলায় বলল, 'আনন্দদার খবর জানবার জন্যে নগদ দু'টো টাকা খরচ করতে হবে দিদিভাই।'

সুনীতি ঝঙ্কার দিয়ে উঠল, 'আহা—হা—'

একসময় খাবার ডাক পড়ল।

বইটই গুছিয়ে প্রথমে সুধা সুনীতি রান্নাঘরের দিকে চলে গেল।

পুবের ঘর আর রান্নাঘরের মাঝখানে উঠোন। সুধা সুনীতির পর বিনু ঝিনুক খেতে গেল। অন্ধকারে

pathagar.net

যেতে যেতে ঝিনুক বলল, 'তোমার তো এখন ভারি মজা, না বিনুদা?'

বিনু বলল, 'কেন?'

'ঝুমা এসেছে।'

বিনু কিছু বলল না। উঠোন পেরুতে পেরুতে ঝিনুকের কথাগুলো বুঝবার চেষ্টা করতে লাগল শুধু।

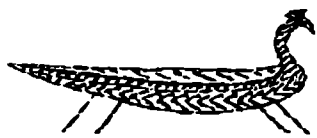

দিন দুই পর ছিল রবিবার। দুপুরবেলা বিনুরা সবে খেয়েদেয়ে উঠেছে, সেই সময় ঝুমা আর আনন্দ এসে হাজির।

সঙ্গে সঙ্গে বাড়িময় সাড়া পড়ে গেল। সুরমা-শিবানী-হেমনাথ-অবনীমোহন, সবাই ছুটে এলেন।

আনন্দ বলল, 'কলকাতা থেকে আমরা বেস্পতিবার এসেছি।' বলে হাসল, তার হাসিটা কেমন যেন লজ্জার রঙে ছোপানো।

সুরমা বললেন, 'বিনুর কাছে সেদিনই আমরা খবর পেয়ে গেছি।'

'বিনুর সঙ্গে স্টিমারঘাটে আমাদের দেখা হয়েছিল।'

স্নেহতলা বললেন, 'উঠোনে দাঁড়িয়ে কথা নয়। চল, ঘরে চল—' ঝুমাদের হাত ধরে তিনি ঘরে এনে বসালেন। অন্য সবাই তাদের সঙ্গে সঙ্গে এল।

আনন্দ বলল, 'জাপানি বোমার ভয়ে কালকাতা থেকে লোক পালাবার হিড়িক পড়েছে। চারদিক এখন ফাঁকা। আমার বাবা মা ভাইবোনেরা মধুপুরে চলে গেছে—'

সুরমা শুধোলেন, 'মধুপুরে কে আছে?'

'কেউ নেই। আমাদের একটা বাড়ি আছে, একজন মালী দেখাশোনা করে।'

'কলকাতায় একখানা বাড়ি আছে না তোমাদের?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

আগের বার সুযোগ হয়নি। এবার খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব কথা জেনে নিলেন সুরমা। আনন্দর বাবা অ্যাডভোকেট, দুই দাদা বড় সরকারি চাকুরে। ছোট ভাইটা বি.এ পড়ছে। বড় বোনেদের বিয়ে হয়ে গেছে। ছোট যে বোনটা রয়েছে সে ছাত্রী। বাকি রইল আনন্দ নিজে। আগেই এম. এ আর ল'টা পাশ করেছিল। কিছুদিন হল, বাবার সঙ্গে কোর্টে যেতে শুরু করেছে। আশা, বাবা বেঁচে থাকতে থাকতেই সে দাঁড়িয়ে যাবে। অ্যাডভোকেট হিসেবে বাবার বিপুল প্রতিষ্ঠা। তাঁর প্রতিষ্ঠা এবং খ্যাতি আনন্দকে অনেকখানি এগিয়ে দেবেই। দু'চার বছর বাবার সঙ্গে বেরুতে পারলে সাফল্যের চাবিকাঠিটার সন্ধান নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। তবে যুদ্ধটা বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ওটা না থামলে কিছুই হবে না।

সুরমার সব প্রশ্নের উত্তর দিয়ে আবার আগের প্রসঙ্গে ফিরে গেল আনন্দ, 'জাপানি বোমার ভয়ে আমাদের বাড়ির সবাই গেল মধুপুর। দিদি-জামাইবাবু আমাকে কিছুতেই ছাড়লেন না, টানতে টানতে রাজদিয়ায় নিয়ে এলেন।'

কৌতুকের গলায় হেমনাথ হঠাৎ বলে উঠলেন, 'রাজদিয়ায় আসতে তোমার বুঝি একটুও ইচ্ছে ছিল না?' বলে চোখের মণি দু'টো কোণে এনে আড়ে আড়ে সুনীতির দিকে তাকালেন।

বিনু লক্ষ করেছে, এতক্ষণ একদৃষ্টে আনন্দের দিকে তাকিয়ে ছিল সুনীতি। তার চোখমুখে ঢেউয়ের মতো কী খেলে যাচ্ছিল। হেমনাথ তাকাতেই দ্রুত মুখ নামিয়ে নখ খুঁটতে লাগল।

এদিকে আনন্দ থতমত খেয়ে গিয়েছিল, 'না—মানে, দু'বছর আগে যখন এসেছিলাম, রাজদিয়া আমার খুব ভাল লেগেছিল। তাই—'

বাধা দিয়ে হেমনাথ বলতে লাগলেন, 'তুমি আর যাই হও, উৎকৃষ্ট উকিল হতে পারবে না—' বলে ঠোঁট টিপে টিপে হাসতে লাগলেন, 'নিজের কেসটা পর্যন্ত ভাল করে সাজাতে পার না।'

অপলক তাকিয়ে থেকে কী যেন বুঝতে চেষ্টা করল আনন্দ, তারপর হেমনাথের সঙ্গে সুর মিলিয়ে

হেসে উঠল।

একটু ভেবে হেমনাথ বললেন, 'এবার বন্দুক টন্দুক এনেছ তো? তোমার যা শিকারের নেশা!'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। পুরো এক বাক্স কার্তুজও এনেছি।'

স্নেহলতা বললেন, 'রাজদিয়ার জন্তু-জানোয়ার আর পাখিদের দেখছি বড়ই দুর্দিন।'

প্রগলভতার ঈশ্বর আজ বুঝি হেমনাথের কাঁধে ভর করে বসেছে। চোখের তারা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে রগড়ের সুরে আনন্দকে বললেন, 'তুমি কী ধরনের শিকারি তা আমার জানা আছে। নিশানার এক শ' হাত দূর দিয়ে গুলি চলে যায়। অবশ্য—'

আনন্দ জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল।

হেমনাথ বলতে লাগলেন, 'এক জায়গায় তীর ঠিক বিঁধিয়েছ। সেখানে নিশানা ভুল হয় নি—' বলে চোরা চোখে সুনীতিকে বিদ্ধ করলেন।

সুনীতি সেই যে মুখ নামিয়েছিল, আর তোলে নি। সমানে নখ খুঁটেই চলেছে।

হকচকিয়ে আনন্দ কী বলতে যাচ্ছিল, সেই সময় বিনুর মনে হল কাঁধের কাছে কেউ মৃদু টোকা দিচ্ছে। মুখ ফেরাতেই সে দেখতে পেল—ঝুমা।

চোখে চোখ পড়তেই ঝুমা বলল, 'চল—'

'কোথায়?'

'তোমাদের বাগানে বেড়াই গে। এখানে বসে বসে বড়দের কথা শুনে কী হবে? তার চাইতে আমরা গল্প করব।'

একটু চুপ করে থেকে বিনু বলল, 'চল—'

দু'জনে ঘর থেকে বেরিয়ে বাগানে চলে এল।

হেমনাথের বাড়ির নকশা-করা টিনের চালগুলোতে রোদ ঝলকে যাচ্ছে। পুকুরে, দূর ধানখেতে, গাছপালার মাথায় কিংবা আকাশ জুড়ে—যেদিকেই চোখ ফেরানো যাক, রোদের ছড়াছড়ি। কিন্তু বাগানের ভেতরটা বড় ছায়াচ্ছন্ন, নিঝুম, মায়ের কোলের মতো ঠান্ডা। এখানে এলেই যেন ঘুমে চোখ জুড়ে যায়।

মৌটুসকি আর হলদিবনা পাখিগুলো ঘন জামরুল পাতার ভেতর বসে খুনসুটি করছিল। চোখ-উদানে ঝোপের জঙ্গলে ঝাঁকে ঝাঁকে সোনাপোকা উড়ছে। বড় বড় ঘাসের মাথায় সবুজ রঙের গঙ্গাফড়িং ঢ্যাঙা পায়ে লাফিয়ে বেড়াচ্ছে। কতকগুলো বহুরূপী গিরগিটি অকারণেই ছোটাছুটি করছে। আর শোনা যাচ্ছিল ঝিঁঝির ডাক। কোন পাতাল থেকে তাদের বিলাপ উঠে আসছে, কে বলবে।

মুত্রাঝোপের পাশে, কাঁটাবেতের বনের ধারে কিংবা আম-জাম-বাতাবি লেবু গাছের তলায় তলায় বিনুরা কিছুক্ষণ ঘুরে বেড়াল। কিন্তু একটা জায়গাও মনঃপূত হল না।

শেষ পর্যন্ত ঝুমা বলল, 'চল, পুকুরঘাটে গিয়ে বসি—'

বিনু তক্ষুনি সায় দিল, 'চল—'

পুকুরঘাটটা নারকেল গুঁড়ি দিয়ে বাঁধানো। বসতে গিয়েই ঝুমার চোখে পড়ল, ডান ধারে সরু পিঠক্ষীরা গাছটার গায়ে একটা ছোট একমাল্লাই নৌকো বাঁধা রয়েছে।

ঝুমা তাড়াতাড়ি মত বদলে ফেলল, 'এখানে বসব না।'

'তা হলে কোথায় বসবে?'

'নৌকোয় চড়ব।'

নৌকোর নামে বিনুও উৎসাহিত হয়ে উঠল, 'সেই ভাল। এস—'

দু'জন পিঠক্ষীরা গাছটার দিকে এগিয়ে গেল।

প্রথম ঝুমাকে নৌকোয় তুলল বিনু, তারপর নিজে উঠে বাঁধন খুলে বৈঠা হাতে গলুইর কাছে বসল।

ঝুমা বলল, 'সেবার তুমি আর আমি নৌকোয় করে অথৈ জলে চলে গিয়েছিলাম, মনে আছে বিনুদা?'

'হুঁ—' বলেই বৈঠার খোঁচায় নৌকোটাকে মাঝ-পুকুরে নিয়ে এল বিনু।

'সেবার কিন্তু আমরা নৌকো বাইতে জানতাম না। কী কষ্টে যে পুকুর পার হয়ে ওই ধানখেতের দিকে গিয়েছিলাম!'

'এবার আর কষ্ট হবে না। আমি নৌকো বাওয়া শিখে গেছি।'

সেবারের মতো এবারও চারদিকে শুধু জল। পুকুরের ওপারে ধানখেত, মাঠ—সব একাকার। মাঠের মাঝখানে হিজল আর বউন্যা গাছগুলোর বুক পর্যন্ত ডুবে গেছে। হিজলের যে ডালগুলো জলের ওপরে, ফুলে ফুলে সেগুলো ছাওয়া। আর বউন্যা গাছের ডাল থেকে শক্ত শক্ত অসংখ্য গোলাকার ফল ঝুলছে। ধানখেত বাদ দিলে যে মাঠ, সেখানে শুধু শাপলা শালুক আর পদ্মবন।

পুকুর ধানখেত পার হয়ে একসময় শাপলাবনে এসে পড়ল বিনুরা।

হঠাৎ কী একটা কথা মনে পড়তে ঝুমা বলে উঠল, 'তোমাকে তো নিয়ে এলাম। সেবারের মতো আবার কান্ড করে বসবে না?'

'কিসের কান্ড?'

'কাউফল পাড়তে গিয়ে জলে ডুবে গিয়েছিলে, মনে পড়ে?'

বিনু বলল, 'এখন আর ডুবব না, সাঁতার শিখে গেছি।'

চোখের তারা স্থির করে ঝুমা বলল, 'বাব্বা, তুমি দেখছি অনেক কিছু শিখে গেছ! নৌকো বাইতে শিখেছ, সাঁতার কাটতে শিখেছ—'

'বা রে, আমি বড় হয়েছি না!'

'বড় হয়েছ!' বলে নৌকোর মাঝখান থেকে অনেক কাছে চলে এল ঝুমা। তারপর মাথা ঘুরিয়ে এদিক থেকে ওদিকে, মিটমিটি দুষ্টুমির চোখে বিনুকে দেখতে লাগল।

বিব্রত মুখে বিনু বলল, 'কী দেখছ?'

'সত্যিই তো বড় হয়ে গেছ। ঠোঁটের ওপর গোঁফ উঠছে—'

বিনু লজ্জা পেয়ে চোখ নামাল।

ঝুমা আবার বলল, 'বড় তো হয়েছ, সিগারেট খাও?'

সিগারেট খাওয়ার সঙ্গে যে স্মৃতিটা জড়ানো তা খুব মনোরম নয়। বিনু অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। আস্তে আস্তে মাথা নেড়ে জানালো, সে সিগারেট খায় না।

ঈষৎ ধিক্কারের গলায় ঝুমা বলল, 'সিগারেট খাও না, তা হলে কী বড় হয়েছ!'

বিনু চুপ।

কিছুক্ষণ পর ঝুমা শুধলো, 'সেই কাউগাছটা এখনও আছে বিনুদা?'

বিনু বলল, 'আছে।'

'চল, কাউ পাড়ি গে—'

'কাউ এখনও পাকে নি। কাঁচা কাউ পেড়ে কী হবে?'

'তা হলে থাক। শাপলাই তুলি।'

নৌকোর ধারে গিয়ে ঝুঁকে ঝুঁকে কাচের মতো টলটলে জল থেকে শাপলা তুলতে তুলতে ঝুমা বলল, 'আচ্ছা বিনুদা—'

বিনু তক্ষুনি সাড়া দিল, 'কী বলছ?'

'মনে পড়ে, সেবার রাত্রিবেলা লুকিয়ে লুকিয়ে যাত্রা শুনতে গিয়েছিলাম—'

'হুঁ।'

'ঝিনুকটার কী হিংসে! আগে থেকে নৌকোয় উঠে বসে ছিল—'

'হুঁ।'

'আমরা কলকাতায় চলে যাবার পর তুমি আর যাত্রা দেখেছ?'

'না।'

'কেন?'

'কে দেখাবে বল?'

'কেন, মুগল?'

pathagar.net

'যুগল তো এখানে নেই।'

'কোথায় গেছে?'

'বিয়ের পর ভাটির দেশে শ্বশুরবাড়ি চলে গেছে।'

'ও মা, তাই নাকি! আর ফিরবে না?'

'না।'

অনেকক্ষণ চুপচাপ।

তারপর ঝুমাই আবার শুরু করল, 'জানো বিনুদা—'

'কী?'

'কলকাতায় যাবার পর তোমার কথা খালি মনে পড়ত।'

'আমারও।'

'ছাই।' ঠোঁট উলটে দিল ঝুমা।

বিনু বলল, 'বিশ্বাস কর, সত্যি মনে পড়ত।'

'রোজ ভাবতাম, আমাদের বাড়ি আসবে।'

'কী করে যাব বল। আমরা তো রাজদিয়ায় থেকে গেলাম। কলকাতায় যাওয়া হল না।'

ঝুমা বলল, 'যাওয়া না হয় না-ই হয়েছিল, চিঠি লিখলেও তো পারতে।'

বিমূঢ়ের মতো বিনু বলল, 'চিঠি লিখব!'

'হ্যাঁ। জানো না 'লাভার'রা চিঠি লেখে। তোমার দিদি আর আমার মামা ঝুড়ি ঝুড়ি চিঠি লিখত।'

'লাভার' শব্দটার মানে বিনুর অজানা নয়। তবু সে জিজ্ঞেস করল, 'লাভার কী?'

'আহা-হা। তুমি একটি গর্দভচন্দ্র শিকদার—' লাজুক হেসে দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়াতে কামড়াতে ঝুমা বলল, 'যাদের মধ্যে ভাব থাকে তাদের লাভার বলে।'

ফস করে বিনু বলে ফেলল, 'আমি কি তোমার—'শেষ শব্দটা গলায় ভেতর থেকে কিছুতেই বার করে আনতে পারল না সে।

ঘাড় বাঁকিয়ে কেমন করে যেন হাসল ঝুমা, 'তুমি আমার কী?'

বিনু কিছু বলতে পারল না, ঝুমার দিকে তাকিয়েও থাকতে পারল না। মুখ নামিয়ে এলোমেলো নৌকো বাইতে লাগল।

এরপর কিছুক্ষণ দু'জনেই চুপ। শাপলা আর বড় বড় পদ্মপাতা তুলে তুলে নৌকো বোঝাই করে ফেলতে লাগল ঝুমা, আর বিনু লক্ষ্যহীনের মতো কখনও উত্তরে কখনও দক্ষিণে নৌকোটা ছুটিয়ে বেড়াতে লাগল।

একসময় ঝুমা ডাকল, 'বিনুদা—'

'কী বলছ?' এক পলক তাকিয়ে চোখ নামিয়ে নিল বিনু।

'কলকাতা থেকে আসবার আগের দিন একটা ইংরেজি সিনেমা দেখেছিলাম—'

'কী সিনেমা?'

'ফাইটের। খুব লড়াই ছিল। আর—'

'আর কী?'

ঠোঁট টিপে টিপে চোখের তারায় হাসতে লাগল ঝুমা, 'এখন বলব না।'

বিনু শুধলো, 'কখন বলবে?'

'একদিনে সব শুনতে চাও নাকি? কাল স্কুল ছুটির পর আমাদের বাড়ি যেও। তখন বলব।'

সেবার ঝুমা ছিল দুরন্ত, দুর্দান্ত, দুঃসাহসী। দু'বছর পর কলকাতা থেকে অসীম রহস্যময়ী হয়ে ফিরে এসেছে মেয়েটা।

একটু ভেবে বিনু বলল, 'স্কুল ছুটির পর দেরি করে বাড়ি ফিরলে মা বকে—'

ঝুমা বলল, 'আমি মাসিমাকে বলব'খন।'

'আচ্ছা।'

নৌকোয় ওঠার পর থেকে কত কথা যে বলেছে ঝুমা! অনেক সময় এক কথার সঙ্গে আরেক

pathagar.net

কথার মিল ছিল না। তবু এই অসংখ্য অসংলগ্ন কথা, ঝুমার হাসি, চোখের তারায় অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত—সব মিলেমিশে বিনুকে হাতছানি দিয়ে দিয়ে এক অচেনা রহস্যের দিকে যেন টেনে নিয়ে যাচ্ছিল।

আদিগন্ত এই মাঠের ভেতর শুধু জল আর জল। মাঝে মাঝে ধানখেত, নলখাগড়ার ঝোপ, মুত্রার জঙ্গল, শাপলাবন, শালুকবন, পদ্মবন, কদাচিৎ দু'চারটি বউন্যা কি হিজল গাছ ছাড়া কেউ নেই, কিছু নেই। এই নির্জন জলমগ্ন চরাচরে নিঝুম দুপুরবেলায় ঝুমাকে বড় ভাল লাগছে। আবার কেমন যেন ভয়ও করছে বিনুর। বুকের ভেতর ছোট ছোট ঢেউয়ের মতো কী যেন বয়ে যাচ্ছে তার।

রোদের রং যখন গাঁদাফুলের মতো হলুদ হয়ে এল সেই সময় ঝুমা বলল, 'অনেকক্ষণ এসেছি। এবার ফিরবে না?'

বিনু বলল, 'হ্যাঁ।'

পুকুরঘাটে ফিরে এসে বিনু অবাক। জলে পা ডুবিয়ে নারকেল গুঁড়ির সিঁড়িতে একা বসে আছে ঝিনুক।

সেই পিঠক্ষীরা গাছটার গায়ে নৌকো বাঁধতেই প্রথমে লাফ দিয়ে পাড়ে নামল ঝুমা, তারপর বিনু। নেমেই বিনু ঝিনুককে শুধলো, 'এখানে বসে আছ যে?'

আধফোটা গলায় ঝিনুক বলল, 'এমনি।'

'কখন থেকে বসে আছ?'

'অনেকক্ষণ। তোমরা যখন নৌকোয় করে ধানখেতের ভেতর ঢুকলে সেই তখন থেকে—'

বিনুর একবার ইচ্ছে হল, জিজ্ঞেস করে, তাদের পিছু পিছু কি ঘর থেকে পুকুরঘাট পর্যন্ত চলে এসেছিল ঝিনুক? কী ভেবে করল না। বিনুর মন ছায়াচ্ছন্ন হয়ে রইল।

বাড়িতে এসে বেশিক্ষণ থাকতে পারল না ঝুমা। একটু পর তাকে নিয়ে আনন্দ চলে গেল।

যাবার আগে অবশ্য ঝুমা সুরমাকে বলে গেছে, 'স্কুল ছুটির পর বিনুদা কিন্তু মাঝে মাঝে আমাদের বাড়ি যাবে মাসিমা। আপনি বকতে পারবেন না।'

সরল মনে সুরমা বলেছেন, 'তোমাদের বাড়ি গেলে বকব কেন? নিশ্চয়ই যাবে।'

বিনু লক্ষ করেছে, সেইসময় একবার তার দিকে, আরেক বার ঝুমার দিকে তাকাচ্ছিল ঝিনুক। কী যেন খুঁজবার চেষ্টা করছিল সে।

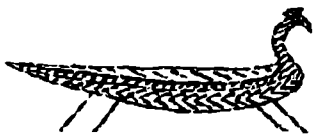

পরের দিন স্কুল ছুটির পর ঝুমাদের বাড়ি গেল বিনু।

তাকে দেখেই চোখের কোণে হেসে ফেলল ঝুমা, 'একেবারে গুড বয়। আজ আসতে বলেছি, আজই এসেছে—'

খানিকক্ষণ এ গল্প সে গল্পের পর ঝুমাকে একলা পেয়ে বিনু বলল, 'এবার সিনেমার কথাটা বল।'

'ও বাবা, ছেলের আর তর সয় না।'

কিছুতেই সিনেমার কথাটা সেদিন বলল না ঝুমা।

সেদিন কেন, আরও দিনকয়েক বিনুকে ঘোরাল ঝুমা। তারপর একদিন বিকেলবেলা বিনু ওদের বাড়ি যেতেই তাকে ছাদে নিয়ে গেল। কার্নিসের ধারে নিরালা একটু কোণ দেখে এসে দাঁড়াল।

দূরে স্টিমারঘাট আর বরফ কলের চুড়োটা চোখে পড়ছে। ডান ধারে ঝাউবনের ওপারে সারি সারি মিলিটারি ব্যারাক। ব্যারাকের ওধারে বিকেলের রোদ গায়ে মেখে নদীর ঢেউগুলো টলমল করছে। মোচার খোলার মতো কেরায়া আর ভাউলে নৌকাগুলো দুলছে। ছেঁড়া রঙিন পাপড়ির মতো আকাশে ঝাঁক ঝাঁক পাখি উড়ছে।

বিনু বলল, 'এখন বল—'

ভুরু দু'টো বাঁকিয়ে চুরিয়ে ঝুমা বলল, 'শুনবার জন্যে ঘুম হচ্ছিল না বুঝি?'

এবার প্রথম দু'একদিন মুখচোরার মতো ছিল বিনু, এখন সাহস বেড়ে গেছে। সে বলল, 'হচ্ছিলই

না তো—'

একটু চুপ করে থেকে ঝুমা বলল, 'সিনেমাটায় কী ছিল জানো—' বলেই দু'হাতে মুখ ঢেকে খিল খিল করে হেসে উঠল।

'হাসছ কেন? বল—'

অনেকক্ষণ হাসার পর স্থির হল ঝুমা। অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে ফিসফিস গলায় বলতে লাগল, 'সিনেমায় একটা সাহেব একটা মেমসাহেবকে খুব কিস খাচ্ছিল—'

নাক মুখ ঝাঁ ঝাঁ করে উঠল বিনুর। অবিশ্বাসের গলায় সে বলল, 'যাঃ—'

'সত্যি বিনুদা। মা কালীর দিব্যি।'

খানিক চিন্তা করে বিনু বলল, 'সাহেবটার কত বয়েস?'

'সাতাশ আটাশ—'

'আর মেমটার?'

'বাইশ তেইশ।'

'এত বড় ছেলেমেয়ে কখনো 'কিস' খায়।'

মুখ ফিরিয়ে ঝুমা বলল, 'তুমি একটা হাঁদারাম। কিচ্ছু জানো না। লাভার হলেই কিস খায়। এই যে আমার দিদি—'

বিনু শুধলো, 'তোমার দিদি কী?'

'কলকাতায় দিদির এক লাভার আছে—অনিমেষদা। আমাদের বাড়ি এলেই দু'জনে ছাদে চলে যেত। তারপর খুব কিস খেত।'

সমস্ত শরীর কেমন যেন জ্বরের মতো লাগছিল। ঝাপসা কাঁপা গলায় বিনু বলল, 'সত্যি!'

'সত্যি।'

তারপর কী হয়ে গেল, কে বলবে। সময় যেন কিছুক্ষণ গতি হারিয়ে এই নির্জন ছাদে স্তব্ধ হয়ে রইল। বিনুর যখন জ্ঞান ফিরল, দেখতে গেল, তার বুকের ভেতর ঝুমা চোখ বুজে আছে। চকিত বিনু এক ধাক্কায় তাকে সরিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে সিঁড়িঘরের দিকে ছুটল। তর তর করে নীচে নেমে রাজদিয়ার রাস্তা দিয়ে আচ্ছন্নের মতো দৌড়তে লাগল। তার চারধারে চরাচর যেন দুলতে শুরু করেছে।

বিনু জানে না, একটু আগে ঝুমা তার হাত ধরে কৈশোর থেকে যৌবনের সিংদরজায় পৌঁছে দিয়েছে।

স্কুলের ছুটি হলে আজকাল আর কোনও দিকে তাকায় না বিনু। সম্মোহিতের মতো নেশাগ্রস্তের মতো ঝুমাদের বাড়ি চলে যায়। এই সময়টার জন্য সারাদিন অস্থির, উন্মুখ হয়ে থাকে সে।

অশোকের কাছে জীবনের রহস্যময় একটা কথা কিছু কিছু শুনেছিল বিনু। কিন্তু সে সব ভাসা ভাসা, মৌখিক। ঝুমা যেন এক টানে চারদিকের সব পর্দা ছিঁড়ে সেই রহস্যটাকে তার মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।

এই ভাবেই চলছিল। হঠাৎ একদিন স্কুল ছুটির পর ঝুমাদের বাড়ি এসে বিনু অবাক, ঝিনুক বসে আছে।

বিনু শুধলো, 'তুমি!'

ঝিনুক বলল, 'সুধাদিদি সুনীতিদিদির ছুটি হতে আজ অনেক দেরি হবে। কতক্ষণ আর স্কুলে বসে থাকব? তুমি আমাকে বাড়ি নিয়ে চল।'

স্কুল ছুটির পর ঝিনুক তার ক্লাসে বসে থাকে। কলেজ থেকে ফেরার পথে সুধা সুনীতি তাকে বাড়ি নিয়ে যায়। দু'বছর এই নিয়মেই কেটেছে। আগেও তো সুধা সুনীতি কত দেরি করে তাকে বাড়ি নিয়ে গেছে। এতকাল পর হঠাৎ বিনুর সঙ্গে বাড়ি ফেরার কেন যে দরকার হল ঝিনুকের, কে বলবে।

আজ আর ঝুমার সঙ্গে ভাল করে কথাই বলতে পারল না বিনু। একটু পর ঝিনুককে নিয়ে বাড়ি চলে গেল।

আশ্চর্য! পরের দিনও ছুটির পর দেখা গেল ঝুমাদের বাড়ি এসে বসে আছে ঝিনুক। তারপরের দিনও সেই ব্যাপার।

দু'চারদিন দেখে ঝিনুকের চাতুরি ধরে ফেলল বিনু। এখন আর ছুটির পর ঝুমাদের বাড়ি যায় না সে। স্কুল কামাই করে দুপুরবেলা ঝুমাদের বাড়ি যেতে লাগল।

ঝিনুকের সাধ্য কি ঝুমার কাছ থেকে বিনুকে ফেরায়।

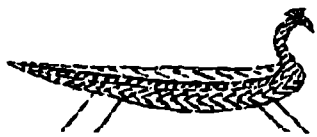

কিছুদিন ধরেই খবরের কাগজে ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছিল, ঝড় আসছে।

পরাধীন দেশের আত্মা অপমানে অত্যাচারে টগবগ করে ফুটছিল। টের পাওয়া যাচ্ছিল, যে কোনও দিন বিস্ফোরণ ঘটে যাবে।

কিছুদিন আগে ক্রিপস মিশন ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেছে। তারপর কয়েকটা মাস সমস্ত ভারতবর্ষ যেন রুদ্ধশ্বাসে অনিবার্য কোনও পরিণামের প্রতীক্ষা করছিল।

শেষ পর্যন্ত সেই দিনটি এসে গেল। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির কাছে গান্ধীজি আগেই 'কুইট ইন্ডিয়া' আন্দোলনের কথা বলেছিলেন। ওয়ার্কিং কমিটি সেটা একটা প্রস্তাবে রূপ দেয়।

আটই আগস্ট বোম্বাইতে ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাব নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতিতে বিপুল ভোটাধিক্যে গৃহীত হল।

এই সময় বক্তৃতা প্রসঙ্গে গান্ধীজি বলেছেন, 'এই আন্দোলনে আমি আপনাদের নেতৃত্ব গ্রহণ করছি। অধিনায়ক হিসেবে নয়, আপনাদের সকলের ভৃত্য হিসেবে।' তারপরেই সমস্ত জাতির উদ্দেশ্যে ডাক দিলেন, 'ব্রিটিশ ভারত ছাড়—কুইট ইন্ডিয়া—'

সারা দেশে যেখানে যত বিক্ষোভ, যত বেদনা, যত অসম্মান পুঞ্জীভূত হয়ে ছিল, সব এক নিমেষে দৃপ্ত অগ্নিশিখা হয়ে উঠল যেন। আর সেই ঊর্ধ্বমুখ শিখার শীর্ষে দু'টি অক্ষর জ্বলতে লাগল, 'কুইট ইন্ডিয়া—'

'কুইট ইন্ডিয়া—' শৃঙ্খলিত দেশ এই মন্ত্রটির জন্য যুগ যুগ তপস্যা করেছে। কোটি কোটি মানুষ বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো চকিত হয়ে উঠল।

কিন্তু তারপরেই নিদারুণ খবর এল। রাষ্ট্রীয় সমিতির বোম্বাই অধিবেশনের পর গান্ধীজি, রাষ্ট্রপতি আজাদ, প্যাটেল, জওহরলাল, সরোজিনী নাইডু, ডক্টর প্রফুল্ল ঘোষ, আসফ আলি, কৃপালনি, সীতারামাইয়া এবং সৈয়দ মামুদ সহ ওয়ার্কিং কমিটির সব সদস্যকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

বিড়লা ভবনে কস্তুরবা, গান্ধীজির একান্ত সচিব প্যারেলাল, ডাক্তার সুশীলা নায়ারকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পাটনায় গ্রেপ্তার হয়েছেন রাজেন্দ্রপ্রসাদ। এলাহাবাদে ট্যান্ডন এবং কাটজু ।

সারা দেশ জুড়ে শুধু ধরপাকড়ের খবর। নেতাদের কেউ বাইরে নেই, সবাই কারাপ্রাচীরের অন্তরালে।

নেতৃহীন অনাথ দেশ এ অসম্মান নীরবে মেনে নিল না। যুগ-যুগান্তর ধরে বুকের ভেতর যে স্তূপীকৃত বিক্ষোভ বারুদ হয়ে ছিল, দিকে দিকে তার বিস্ফোরণ শুরু হল। কোথায় মহারাষ্ট্র, কোথায় বিহার, কোথায় পাঞ্জাব—দিগ্‌দিগন্ত থেকে কত খবর যে আসতে লাগল! এখানে টেলিগ্রাফের তার কেটে দিয়েছে, ওখানে মাইলের পর মাইল রেললাইন উপড়ে ফেলেছে, সেখানে থানা আক্রমণ, ডাকঘরে আগুন। ওদিকে বিদেশি শাসকও হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকল না। রক্তচক্ষু মেলে তারা দিগ্বিদিকে ছুটতে লাগল। পরাধীন দেশের জাগ্রত বিবেককে স্তব্ধ করে না দেওয়া পর্যন্ত তার স্বস্তি নেই।

শুরু হয়ে গেল সন্ত্রাসের রাজত্ব। গুলি, কাঁদানে গ্যাস, গ্রেপ্তার। বেয়নেটের ধারাল ফলায় কত মানুষের বুক ফালাফালা হয়ে গেল, রাইফেলের নল থেকে বুলেট ছুটে গিয়ে কত মানুষের পাঁজর বিদীর্ণ করে দিল। জেলখানাগুলো ভরে উপচে পড়তে লাগল।

সৌরাষ্ট্র থেকে আসাম, হিমালয় থেকে কন্যাকুমারী—সমস্ত দেশ উত্তাল, ছোট বড় অসংখ্য ঢেউয়ে তরঙ্গিত। কোটি কণ্ঠে মন্ত্রোচ্চারণের মতো একটি মাত্র শব্দ শোনা যায়, 'কুইট ইন্ডিয়া—'

'ব্রিটিশ—'

'ভারত ছাড়—'

সারা দেশ যখন দুলছে, রাজদিয়া কি স্থির থাকতে পারে? দূরের ঢেউ এই ছোট রাজদিয়াতে এসেও ভেঙে পড়ল।

বিনুদের স্কুলের হেডমাস্টার মোতাহার হোসেন সাহেব, কংগ্রেসের স্থানীয় সেক্রেটারি, সেদিন একটা মিছিল বার করলেন। পতিতপাবন, রুস্তম থেকে শুরু করে কে নেই তাতে? কলেজের ছেলেরা এসেও যোগ দিল। শুধু কি স্কুল কলেজের ছেলেরা, রাজদিয়াবাসীদের অনেকেই মিছিলে এসেছে। সারা শহর বেরিয়ে পড়েছে। বিনু কি চুপ করে ঘরে বসে থাকতে পারে? সেও ছুটে এসেছে। প্রায় সবার হাতেই একটা করে ত্রিবর্ণ পতাকা।

সমস্ত দেশ জুড়ে যে বর্বরতা চলছে তার প্রতিবাদ করতে হবে। শোভাযাত্রা শহরময় ঘুরে বেড়াতে লাগল। সেই সঙ্গে অসংখ্য কণ্ঠে শোনা যেতে লাগল ঃ

'বন্দে মাতরম্—'

'বন্দে মাতরম্—'

'ভারত মাতাকি—'

'জয়—'

'ব্রিটিশ—'

'ভারত ছাড়—'

ঘুরতে ঘুরতে থানার কাছে অসতেই হঠাৎ পুলিশ লাঠি চার্জ শুরু করে দিল। একটা লাঠি পড়ল বিনুর হাঁটুতে। লুটিয়ে পড়তে পড়তে বিনু দেখতে পেল, মোতাহার হোসেন সাহেবের মাথা ফেটে ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরুচ্ছে। শুধু কি মোতাহার সাহেবই, কত ছেলের যে হাত-পা ভেঙেছে, হিসেব নেই। শোভাযাত্রা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। অনেকে পালাচ্ছে। থেকে থেকে গোঙানির শব্দ ভেসে আসছে।

দেখতে দেখতে একসময় বেহুঁশ হয়ে পড়ল বিনু। জ্ঞান ফিরলে দেখল, সদর হাসপাতালে শুয়ে আছে, পায়ে মস্ত ব্যান্ডেজ। তার পাশের বেডে মোতাহার সাহেব। চারদিকের সারি সারি বেডগুলোতে আরও অনেক ছেলে। বেড বেশি নেই বলে অনেককে মেঝেতে ফেলে রাখা হয়েছে।

হাসপাতালে সাত দিন থাকতে হল। এর ভেতর হেমনাথ আর ঝিনুক রোজই আসে।

ঝিনুক ছলছল করুণ চোখে তাকিয়ে বলে, 'তোমার খুব লেগেছে, না বিনুদা?'

বিনু হাসে, 'না, তেমন কিছু নয়।'

সুরমা, অবনীমোহন, সুধা সুনীতি একদিন পর পর এসে দেখে যায়। ঝুমাও এল একদিন। ঠোঁট টিপে বলল, 'আচ্ছা বীরপুরুষ।'

হাসপাতালে থাকার সময় বিনু লক্ষ করেছে, দিনরাত পুলিশ সারা হাসপাতালটা ঘিরে রেখেছে। সাত দিন পর পুলিশের পাহারাতেই কোর্টে যেতে হল। তাদের বিরুদ্ধে থানা আক্রমণের অভিযোগ আনা হয়েছে।

বিচারে পনের দিনের জেল হয়ে গেল বিনুর, মোতাহার সাহেবের হল দু'মাস। অন্য ছেলেদেরও দশ থেকে পনের দিনের সাজা হল।

মুক্তির দিন জেল গেটে সে কী দৃশ্য! সারা রাজদিয়া যেন ভেঙে পড়েছে সেখানে। বিনুরা বেরিয়ে আসতেই কারা যেন গলায় ফুলের মালা দিয়ে তাকে কাঁধে তুলে ফেলল। কাঁধে চড়েই বাড়ি ফিরল সে।

জেল-খাটা, পা-ভাঙার জন্য অবনীমোহন বা সুরমা সুখী নন। তাঁরা বলতে লাগলেন, 'হই চই করে কতগুলো দিন নষ্ট করল। এ বছর কিছুতেই ও পাশ করতে পারবে না। একটা বছর মাটি হবে।'

হেমনাথ বিনুর পক্ষ নিয়ে বললেন, 'হোক নষ্ট, পড়াশোনার জন্য সারা জীবন পড়ে আছে, কিন্তু এমন দিন আর কখনও আসবে না। সেদিন নিজে থেকে প্রশেসানে না গেলে আমিই ওকে দিয়ে আসতাম।'

'ভারত ছাড়' আন্দোলন উত্তেজনা কেটে যেতে বেশ সময় লাগল। তারপর স্কুল, পড়াশোনা, ছুটির পর ঝুমাদের বাড়ি যাওয়া, ঝিনুকের সঙ্গে লুকোচুরি দিয়ে ঘেরা সেই পুরনো অভ্যস্ত জীবনের ভেতর

আবার ফিরে গেল বিনু।

অবনীমোহনের সঙ্গে একদিন হাটে গিয়ে বিনু দেখে এসেছিল, একদানা ধানচাল পাওয়া যাচ্ছে না। নদীর পাড় ঘেঁষে সারি সারি আড়তগুলো তালাবন্ধ। বিনু শুনে এসেছিল, এখান থেকে বিশ মাইল উত্তরে গিরিগঞ্জ নামে যে বাজারটা আছে সেখানে ক'টা ধানচালের দোকান লুট হয়ে গেছে।

সেই থেকে অবস্থা দিন দিন আরও খারাপ হয়ে যাচ্ছে। সারা রাজ্য থেকে খাদ্যশস্য উধাও হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে দূর দূরান্তের হাট থেকে লুটপাটের খবর আসে। চারদিকের গ্রামগুলো থেকে, নদীর চরগুলো থেকে আরও যা খবর পাওয়া যায় তা ভয়াবহ। ধানচাল নেই, তাই ওসব জায়গার বাসিন্দারা মেটে আলু, মিট কুমড়ো, কচু, কন্দ, শাপলা শালুক সেদ্ধ করে প্রথম দিকে চালিয়েছে। তারপর আমাপাতা, জামপাতা, শিউলি পাতা, যা পেয়েছে তাই খেয়েছে। এখন নাকি ইঁদুর, খরগোশ পুড়িয়ে খাচ্ছে।

ধানচাল উধাও হবার পর হেমনাথের বাড়িতে লোকজনের আনাগোনা বেড়ে গেছে। প্রতিদিনই দুপুরে আট দশ জন করে বাইরের লোক খেয়ে যাচ্ছে। আজকাল নিবারণ পিওন প্রায়ই আসে। এছাড়া এ গ্রামের, ও গ্রামের চেনা-অচেনা কত মানুষ যে আসছে! ঠিক দুপুরবেলা বার-বাড়ির উঠোনে এসে করুণ গলায় তারা বলে, 'অতিথ্ আসলাম গো মা-ঠাইরেন, পাচ দিন প্যাটে ভাত পড়ে নাই।'

এ তো গেল দুপুরবেলার কথা, রাতের অন্ধকারে যুগীপাড়া-ঋষিপাড়া-নমঃশূদ্রপাড়ার বউ-ঝিরা আসে। স্নেহলতাকে বলে, 'দুই মুঠা চাউল দ্যান গো বইনদিদি, তিনদিন আখা (উনুন) ধরাই নাই।'

চিরদিন স্নেহলতা বা হেমনাথ দিয়ে এসেছেন, কাউকে কখনও বিমুখ করেন নি। এই দুঃসময়েও তাঁরা দিয়েই যাচ্ছেন। কিন্তু এভাবে কতদিন চলবে, কে জানে।

প্রতি বছরই মাঠ থেকে ধান উঠবার পর খোরাকির চাইতে কিছু বেশি রেখে বাদবাকি বেচে দেন হেমনাথ। যেভাবে লোকজন খেয়ে যাচ্ছে, যুগীপাড়া-ঋষিপাড়ার বউ-ঝিরা চাল নিচ্ছে, তাতে নিজেদেরই হয়তো একদিন উপোস দিয়ে থাকতে হবে। কিন্তু পরের কথা ভেবে স্নেহলতা বা হেমনাথ মন ভারক্রান্ত করেন না। পরে যা হবার হবে, এখন মানুষের প্রাণ তো বাঁচুক।

দেখতে দেখতে আরেক পুজো চলে গেল।

পুজোর পর মাঠের জলে যখন টান ধরল, ধানের শিষগুলো গাঢ় সবুজ হয়ে এল, সেইসময় একদিন হরিন্দ এবং তার দুই মোষের মতো ঢাকী কাগা বগা রাজদিয়ার রাস্তায় ঢেঁড়া দিয়ে গেল। 'যার যত নাও আছে, তিন দিনের ভিতরে হগল থানায় জমা দিবা। গরমেনের হুকুম। জমা না দিলে বিপদ আছে—'

বিনু স্কুলে যেতে যেতে ঢেঁড়া শুনে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'নৌকো জমা দিতে হবে কেন?'

হরিন্দ যা বলল তা এইরকম। জাপানিরা যে কোনও দিন পূর্ব বাংলায় এসে পড়তে পারে। এসেই যদি নৌকো পেয়ে যায়, মিত্রশক্তির পক্ষে বিপদ ঘটে যাবে। তাই সতর্কতা এবং নিরাপত্তার কারণে নৌকো আটক করা হচ্ছে। বিপদ কেটে গেলেই ফেরত দেওয়া হবে।

বিনু একাই না, রাজদিয়ার আরও অনেকে হরিন্দদের চারপাশে ভিড় জমিয়েছিল। তাদের ভেতর ভীত, সন্ত্রস্ত গুঞ্জন উঠল, 'হে ভগমান, নাও হইল আমাগো হাত-পাও। নাও যদিন আটকায়, আমরা চলাফিরা করুম ক্যামনে? খামু কী?'

'এইবার মরণ, মরণ—'

তিন দিনের মধ্যেই দেখা গেল, খাল-বিল-নদী শূন্য করে থানার পাশের মস্ত মাঠটায় অসংখ্য নৌকো

উঠে এসেছে। গাছি, ভাউলে, মহাজনী, কোষ, একমাল্লাই, দু'মাল্লাই, চারমাল্লাই— কত রকমের যে নৌকো তার লেখাজোখা নেই।

শুধু রাজদিয়ারই নয়, চারদিকের গ্রাম-গঞ্জ-জনপদ, সব জায়গার নৌকোই আটক করা হয়েছে। নৌকো আটকের পর একটা সপ্তাহও কাটল না।

সেদিন স্কুলে যাবার সময় বিনু দেখতে পেল, নদীর পাড়ে বিরাট ভিড় জমেছে। পায়ে পায়ে এগিয়ে একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখে সে বিমূঢ় হয়ে যায়।

শত শত লোক নদী সাঁতরে রাজদিয়ার দিকে আসছে। তারা পাড়ে উঠতেই কে যেন জিজ্ঞেস করল, 'তোমরা কুনহানের মানুষ?'

আগন্তুকদের মধ্যে একজন বলল, 'চরবেউলার।'

'নদী সাতইরা আইলা যে?'

'কী করুম, গরমেন নাও লইয়া গ্যাছে। হেয়া ছাড়া আমাগো চরে এক দানা চাউল নাই। পোলামাইয়া লইয়া না খাইয়া জান যায়।'

আরেকজন বলল, 'হুদা (শুধু) আমাগো চর নিকি, কুনো চরেই চাউল নাই। দ্যাখেন না, দুই-একদিনের ভিত্‌রে আরও কত মানুষ রাইজদায় আসে।'

সত্যিই দেখা গেল, কয়েকদিনের মধ্যে অসংখ্য মানুষ খাদ্যের আশায় রাজদিয়াতে হানা দিল।

লোকগুলো সারাদিন মানুষের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরে বেড়ায় আর গোঙানির মতো শব্দ করে বলে, 'দু'গা ভাত দিবেন মা, ইট্টু ফ্যান দিবেন—'

বিমর্ষ হেমনাথ বলতে লাগলেন, 'দুর্ভিক্ষ—দুর্ভিক্ষ শুরু হয়ে গেছে।'

শুধু নদীর চরগুলো থেকেই নয়, চারদিকের গ্রাম-গঞ্জ থেকেও খাদ্যের সন্ধানে কত মানুষ যে রাজদিয়ায় ছুটে এল! এমনকি আঞ্জুমান বেবাজিয়ানীরা পর্যন্ত এসেছে। থানা থেকে তাদের নৌকোও 'সিজ' করে নিয়েছে। যুদ্ধ ভাসমান বেদে-বহরকেও রেহাই দেয় নি।

আজকাল সমস্ত রাজদিয়া জুড়ে দিনরাত শুধু শোনা যায়, 'মা জননী, দু'গা ভাত দ্যান, ইট্টু ফ্যান দ্যান। না খাইয়া খাইয়া শরীলে আর দ্যায় না।'

রাস্তায় বেরুলেই চোখে পড়ে কঙ্কালসার প্রেতের মতো দলে দলে মানুষ দুর্বল, অশক্ত পায়ে টলমল করে হাঁটছে। এক দুয়ার থেকে তাড়া খেয়ে যাচ্ছে আরেক দুয়ারে।

অবশ্য রাজদিয়াবাসীরা একেবারে নির্দয় নয়। সব বাড়ি থেকে চাল ডাল জোগাড় করে শহরের দু'মাথায় দু'টো লঙ্গরখানা খোলা হয়েছে। সারাদিন পর বেলা হেলে গেলে মাথাপিছু দু'হাতা করে তরল ট্যালটেলে খিচুড়ি দেওয়া হতে লাগল।

কিন্তু দেশজোড়া দুর্ভিক্ষের বিরুদ্ধে দু'টো মোটে লঙ্গরখানা খাড়া করে কতক্ষণই বা যুদ্ধ চালানো যায়! ক'টা লোককেই বা খাওয়ানো চলে!

কাজেই চারদিকে চুরির হিড়িক পড়ে গেল।

বাজার থেকে ধান চাল উধাও হবার পর থেকেই চুরি শুরু হয়েছিল। কিন্তু এখন যা চলেছে তার সঙ্গে আর কিছুর তুলনাই হয় না।

থালা-ঘটি-বাটি-গাড়ু-বদনা, কাঁসা বা পেতলের এক টুকরো বাসনও বাইরে ফেলে রাখার উপায় নেই। রান্না-করা ভাত-তরকারি পর্যন্ত নিয়ে যাচ্ছে। তবে সব চাইতে বেশি যা চুরি হচ্ছে তা ধান।

কার্তিকের মাঝামাঝি মাঠের জল নেমে গিয়েছিল। রাজদিয়ার দক্ষিণে এসে দাঁড়ালে, যতদূর চোখ যায়, এখন শুধু ধান, ধান আর ধান।

সবে অঘ্রান পড়েছে। এই মাসের শেষ থেকে আমনের মরশুম। ধানের শিষগুলো এখনও কাঁচাই রয়েছে। তাতে সোনালি আভা লাগেনি। সবুজ তুষের ভেতরকার শস্য এখনও যথেষ্ট পুষ্ট নয়। তা

pathagar.net

হলে কি হবে, রাতের অন্ধকারে ক্ষুধার্ত মানুষ মাঠকে মাঠ কাঁচা ধানই কেটে নিয়ে যাচ্ছে।

ধানই যদি চলে যায়, সারা বছর লোকে খাবে কী? চুরি ঠেকাবার জন্য রাজদিয়ার সব বাড়ি থেকে ছেলে জোগাড় করে ডিফেন্স পার্টি তৈরি হল।

ডিফেন্স পার্টির দু'টো কাজ। প্রথমত, রাত জেগে জেগে জমির ধান পাহারা দেওয়া। দ্বিতীয়ত, নদীর ধারে ধারে ঘুরে মহাজনী নৌকাগুলোর ওপর নজর রাখা।

এ অঞ্চলের প্রায় সব নৌকোই যুদ্ধের কল্যাণে 'সিজ' করা হয়েছে। তবে 'স্পেশাল পারমিট' নিয়ে কেউ কেউ দু'একখানা রাখতে পেরেছে। যেমন ব্যবসাদারেরা।

যুদ্ধ আর দুর্ভিক্ষ শুরু হবার পর ধানচাল জামা কাপড়ের কারবারীরা আর মানুষ নেই। দুঃশাসনের মতো সারা দেশকে বিবস্ত্র এবং নিরন্ন করে তারা মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

রাতের অন্ধকারে বেশি লাভের আশায় ব্যবসায়ীরা নৌকো বোঝাই করে রাজদিয়ার ধান চাল এবং অন্যান্য সব শস্য দূর-দূরান্তে পাচার করে দিতে চাইছে। ডিফেন্স পার্টি তা হতে দেবে না। ঘুরে ঘুরে তারা মহাজনী নৌকো ধরছে।

সব বাড়ি থেকেই দু'টি একটি করে যুবক নেওয়া হয়েছে ডিফেন্স পার্টিতে। ঠিক ওই বয়সের ছেলে হেমনাথের বাড়িতে নেই। কাজেই বিনুকেই দলে নিতে হল।

যুদ্ধের দৌলতে রাজদিয়ায় তো কম ছেলে নেই। সবাইকে একসঙ্গে রাত জাগতে হয় না। ছোট ছোট গ্রুপে ভাগ হয়ে পালা করে তারা জাগে। আজ এর পালা পড়লে কাল ওর। সপ্তাহে দু'দিন জাগতে হয় বিনুকে।

ছেলেরা রাত জাগবে। তাই বাড়ি বাড়ি চাঁদা তুলে পাঁচ ব্যাটারির বড় বড় অনেকগুলো টর্চ কেনা হয়েছে, চা আর মুড়মুড়ে 'এস' বিস্কুটের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

প্রথম দিন রাত জাগতে এসে বিনু দেখল, তার দলে শ্যামল আর অশোকও রয়েছে।

মজিদ মিঞার হাতে মার খাবার পর অশোক শ্যামলের সঙ্গে তেমন মিশত না বিনু। অশোকরাও খুব সম্ভব মার খেয়েছে। মজিদ মিঞা ওদের বাড়ি গিয়েও সিগারেট খাবার কথা বলে এসেছিল। মারটার খাবার পর দু'পক্ষই পরস্পরকে মোটামুটি এড়িয়ে যাচ্ছিল।

ডিফেন্স পার্টিতে তার দলে অশোকরা না থাকলেই ভাল হত। বিনুর খুব অস্বস্তি হতে লাগল।

বিনুদের দলে সবসুদ্ধ বারটি ছেলে। তাদের কাজ হল, নদীর পাড়ে ঘুরে ঘুরে ধান চাল বোঝাই মহাজনী নৌকো খোঁজা। টর্চ নিয়ে তারা বেরিয়ে পড়ল।

প্রথম দিকে বিনু অশোকদের সঙ্গে কথা বলছিল না। অশোকরাও মুখ বুজেই ছিল। আড়চোখে তিন জন তিন জনকে দেখে যাচ্ছিল শুধু।

নদীর পাড়ে এসে অশোক আর পারল না। বিনুর কাছে নিবিড় হয়ে এসে বলল, 'সেই লোকটা সেদিন তোমাকে কান ধরে বাড়ি পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছিল?'

বিনু বুঝল, মজিদ মিঞার কথা বলছে অশোক। বিব্রতভাবে বলল, 'হ্যাঁ।'

'লোকটা এক নম্বরের ডাকাত।'

বিনু উত্তর দিল না।

অশোক আবার বলল, 'বাড়ি নিয়ে গিয়ে তোমাকে মেরেছিল?'

মুখ নীচু করে বিনু মাথা নাড়ল।

অশোক আবার বলল, 'খুব?'

'হ্যাঁ। মারের চোটে জ্বর এসে গিয়েছিল।'

গভীর সহানুভূতির গলায় অশোক বলল, 'ইস, এমন করে কেউ মারে!' খানিক নীরব থেকে আবার বলল, 'আমাকেও বাবা খুব মার দিয়েছিল।'

'তাই নাকি?'

'মারতে মারতে বাড়ির বাইরে বার করে দিয়েছিল। ঠাকুমা গিয়ে আমাকে ফিরিয়ে এনেছে।'

এতক্ষণ শ্যামল চুপ করে ছিল। এবার মুখ খুলল, 'তোমাদের শুধু মেরেই ছিল, আমার অবস্থা কী হয়েছিল জানো?'

pathagar.net

ধীরে ধীরে বিব্রত ভাবটা কেটে যাচ্ছিল বিনুর। উৎসুক সুরে সে জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছিল?'

শ্যামল বলতে লাগল, 'মার তো খেয়েছিলামই, তার ওপর দু'দিন কিছু খেতে দেয় নি।'

'আহা রে—'

দেখা গেল তিনজনেই তিনজনের দুঃখে দুঃখী, সমব্যথী। একটি রাত একসঙ্গে জাগবার আগেই তাদের বন্ধুত্ব আবার আগের মতো গাঢ় হয়ে গেল।

ওধারে লালমোরের গীর্জা আর এধারে সারি সারি মিষ্টির দোকানগুলোর সামনে ঘন হিজলবন। নদীর দীর্ঘ পাড় ধরে ডিফেন্স পার্টির ছেলেরা কতবার যে টহল দেয়। নদীর জলে সন্দেহজনক কিছু নড়তে দেখলেই তারা থমকে দাঁড়ায়, একসঙ্গে পাঁচটা টর্চ জ্বলে ওঠে।

সবে অঘ্রান পড়েছে। কিন্তু এরই ভেতর জল-বাংলার এই ছোট্ট নগণ্য শহরটিতে শীত নেমে গেছে।

নদীর দিক থেকে যে উলটোপালটা জলো হাওয়া ঘোড়া ছুটিয়ে যায় তা বরফের মতো ঠান্ডা। গুঁড়ো গুঁড়ো হিমে নদী, আকাশ, দূরের ঝাউবন, সারি সারি হিজলগাছ কিংবা রাজদিয়া শহরের বাড়িঘর, মিলিটারি ব্যারাক—সব কেমন যেন ঝাপসা।

সারা গা আলোয়ানে মুড়ে, কানে মাথায় কম্ফোর্টার জড়িয়েও শীত কাটে না।

একদিন ডিফেন্স পার্টির সঙ্গে ঘুরতে ঘুরতে মানিক বলল, 'আজ বড্ড ঠান্ডা, না?' মানিক নাহা বাড়ির ছেলে, মাসখানেক হল কলকাতা থেকে এসে এখানকার কলেজে বি.এ'তে ভর্তি হয়েছে। বিনুদের গ্রুপটার সে নেতা।

অন্য ছেলেরা হি হি কাঁপতে কাঁপতে বলল, 'হ্যাঁ মানিকদা—'

'একটা জিনিস খেলে শীতটা কিন্তু কেটে যেত।'

'কী?'

পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বার করে দেখাল মানিক।

আবার সিগারেট! বিনু চমকে উঠল। লক্ষ করল, অশোক শ্যামলও খুব একটা আরাম বোধ করছে না।

বিনু বলল, 'আমি তো সিগারেট খাই না।' মজিদ মিঞার মারের কথা ভেবে মনে আর সুখ নেই তার। অশোক শ্যামলও তাই বলল।

মানিক বলল, 'যা শীত! এক আধটা খেলে গা গরম হয়ে যাবে। হি হি করে কাঁপছ। কাঁপুনি বন্ধ হবে। নাও নাও, সবাই একটা করে নিয়ে ধরিয়ে ফেল।'

'কিন্তু—'

'কী?'

'কেউ যদি দেখে ফেলে?'

'এই শীতের রাত্তিরে তোমাদের সিগারেট খাওয়া দেখবার জন্যে লোকের বাইরে বেরুতে বয়ে গেছে। সবাই লেপ মুড়ি দিয়ে ঘুমোচ্ছে, দেখ গে। সিগারেট টেনে ভাল করে পেয়ারাপাতা চিবিয়ে বাড়ি যাবে, কেউ টেরও পাবে না।'

'কিন্তু—'

'আবার কী?'

'আপনি রয়েছেন।'

'আমার কাছে লজ্জা কী। আমরা সবাই বন্ধু—ফ্রেন্ড—'

কোনও অজুহাতই খাটল না, একটা করে সিগারেট নিতেই হল সবাইকে।

আবার সিগারেট খাওয়া শুরু হয়েছে। ডিফেন্স পার্টিতে রাত জাগতে এসে শুধু কি সিগারেট খাওয়া, আরও চমকপ্রদ সব ব্যাপার ঘটতে লাগল।

একদিন রাত্রিবেলা বিনু আর শ্যামলকে অন্য সবার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে অশোক বলল, 'আজ আর আমরা ওদের সঙ্গে সঙ্গে নদীর পাড়ে ঘুরব না।'

বিনু শুধোলো, 'তা হলে কী করবে?'

pathagar.net

'এক জায়গায় যাব।'

'কোথায়?'

চোখ টিপে রহস্যময় হেসে অশোক বলল, 'চল না। গেলেই বুঝতে পারবে। দারুণ মজা হবে।'

অশোক শ্যামল এবং বিনুকে নিয়ে মল্লিকদের ঝুপসি বাগান পেরিয়ে একটা ঘরের বন্ধ জানালার সামনে এসে দাঁড়াল।

বিনু বলল, 'এখানে কী?'

চাপা গলায় অশোক বলল, 'একদম চুপ। কথা না বলে জানালায় কান দিয়ে দাঁড়াও।'

দিন কয়েক আগে মল্লিকদের ছোট ছেলে সুখরঞ্জনের বিয়ে হয়েছে। এটা তাদেরই ঘর। বিনু তা জানে। খুব নীচু গলায় সে কথা অশোককে বললও।

বিরক্ত সুরে অশোক বলল, 'ছেলেটা তো খালি বক বক করে! মুখ বুজে জানালায় একটু কান পাতো ভাই—'

জানালায় কান রাখতেই সমস্ত শরীর ঝিমঝিম করতে লাগল। সুখরঞ্জন যা যা বলে তার বউকে আদর করছে, এমন সব সোহাগের ভাষা আগে কখনও শোনেনি বিনু।

অনেকক্ষণ পর সুখরঞ্জনদের গলা ঘুমে জড়িয়ে এল। তখন অশোক বলল, 'চল—'

বাগানের বাইরে বড় রাস্তায় এসে অশোক আবার বলল, 'কিরকম লাগল?'

শ্যামল শিস টানার মতো শব্দ করে বলল, 'সত্যি মজাদার।'

'কী বলেছিলাম?'

বিনু বলল, 'এখানকার খবর তুমি কি করে জানলে?'

মুরুব্বিআনা চালে হেসে অশোক বলল, 'অনেক কষ্ট করতে হয়েছে।' একটু থেমে আবার বলল, 'আরও অনেক জায়গার খবর আমি জানি।'

'বল না, বল না—'

'একদিনে সব শুনে ফেললে তারপর কী করবে? একটু ধৈর্য ধর।'

এরপর থেকে ডিফেন্স পার্টির সঙ্গে রাত জাগতে এসে তিনজন এক ফাঁকে সরে পড়ে। যুবতী স্ত্রীকে জড়িয়ে ধরে যুবকেরা যেখানে শুয়ে থাকে, বিনুরা গিয়ে তাদের ঘরের জানালায় কান পাতে।

তা ছাড়া, রাজদিয়ার রাস্তায় কত দৃশ্য চোখে পড়ে। হুস হুস করে যে মিলিটারি জিপগুলো ছুটে যায়। তার ভেতর দেখা যায়, আমেরিকান টমির গলা জড়িয়ে নারীদেহ ঝুলছে। ঝাউবনের মধ্যে নিগ্রো সৈন্যগুলো কোত্থেকে যেন মেয়েমানুষ জুটিয়ে এনে এই শীতের রাতে নরকের খেলা শুরু করে দেয়।

একদিন এক বাড়িতে কান পাততে গিয়ে বিশ্রী ব্যাপার ঘটে গেল।

বিনুরা দেখল, শীতের রাত্তিরে এরা জানালা খুলে শুয়েছে।

খুব চাপা গলায় অশোক বলল, 'ভালই হয়েছে। এতদিন খালি শুনেছি, এবার ভেতরকার মজা দেখতে পাব।'

পা টিপে টিপে তিনজন জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। অন্য সব বাড়ির জানালায় কান রেখে বিনুরা যা শুনেছে, এখানেও তা-ই শুনতে পেল। গাঢ় গলায় পুরুষটি তার সঙ্গিনীকে আদরের কথা বলছে, মাঝে মাঝে চুমু খাবার শব্দ।

উত্তেজনায় তিনজন মুখ বাড়াতে লাগল। কিন্তু ঘরের ভেতর আলো নেই, তা ছাড়া ওরা মশারি টাঙিয়ে শুয়েছে। চোখে শান দিয়েও কিছুই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না।

বাইরে হিমের ভেতর অস্থির হয়ে উঠল বিনুরা। হঠাৎ শ্যামল এক কান্ড করে বসল, বোতাম টিপে হাতের টর্চটা জ্বেলে ফেলল। মশারির গায়ে আলো পড়তেই দু'টি ঘনবদ্ধ যুবক যুবতী ছিটকে দু'ধারে সরে গেল। তারপরেই যুবকটি তীক্ষ্ণ গলায় চেঁচিয়ে উঠল, 'কে, কে রে, চোর—'

মেয়েটিও চেঁচাতে লাগল, 'চোর, চো—'

ততক্ষণে আলো নিবিয়ে ফেলেছে শ্যামল। একমুহূর্ত বিমূঢ়ের মতো দাঁড়িয়ে থাকল তারা। তারপর সারা বাড়ির দরজা জানালা খোলার আওয়াজ কানে আসতেই ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুট লাগাল এবং চোখের

পলকে এর ঢেঁকিঘরের পাশ দিয়ে, ওর বাগানের ভেতর দিয়ে, তার উঠোন ডিঙিয়ে নদীর পাড়ে এসে পড়ল।

নদীর পাড়ে স্টিমারঘাটের কাছে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে অশোক শ্যামলকে বলতে লাগল, 'তুমি কী ছেলে বল তো! ফস করে টর্চ জ্বেলে দিলে!'

কাজটা যে ভাল হয় নি, শ্যামল আগেই বুঝতে পেরেছিল। সে চুপ করে থাকল।

অশোক আবার বলল, 'টর্চটা জ্বেলেছিলে জ্বেলেছিলে, একটু পরে যদি জ্বালতে—'

শ্যামল বলল, 'পরে জ্বাললে কী হত?'

চোখের তারা নাচিয়ে অশোক বলল, 'আরও মজা দেখতে পেতে।'

একধারে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল বিনু। ভয়ে উত্তেজনায় তার বুকের ভেতরটা ভীষণ কাঁপছিল। আর সেই কাঁপুনির মধ্যে, কেন কে জানে, ঝুমার কথা খুব মনে পড়ে যাচ্ছিল তার।

রাজদিয়ায় আসার পর কিছুদিন বেশ ভালই ছিলেন সুরমা। কাগজের মতো সাদা ফ্যাকাসে শরীরে লালচে আভা দেখা দিয়েছিল। নিষ্প্রভ চোখে আলোর খেলা শুরু হয়েছিল, রুগ্‌ণ মুখে লাবণ্য ফুটি ফুটি করছিল। চোখের কোলে, শীর্ণ আঙুলের মাথায় রক্তের সঞ্চার চোখে পড়ছিল।

কিন্তু ক'দিন আর। তারপরই আবার অসুস্থ হয়ে পড়লেন সুরমা। টিপটিপে বৃষ্টির মতো একটানা অসুখ চলছিলই। তার মধ্যেই ভাত খেতেন, স্নান করতেন, হেঁটে চলে বেড়াতেন।

কিন্তু এ বছর শীত পড়তেই একেবারে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছেন সুরমা। লারমোর রোজ সকালবেলা একবার করে তাঁকে দেখে যান। সুরমার অসুখটা হার্টের, হৃৎপিন্ডটি খুবই দুর্বল। তার ওপর নানারকম স্নায়বিক উপসর্গ রয়েছে।

এবার শুয়ে পড়বার পর থেকেই কেমন যেন হয়ে গেছেন সুরমা। যত দিন যাচ্ছে, মৃত্যুভয় চারদিক থেকে তাঁকে যেন ঘিরে ধরতে শুরু করেছে। প্রায় সারাদিনই ক্ষীণ সুরে তিনি বলে যান, 'ওগো, সুধা সুনীতির বিয়ের ব্যবস্থা কর।'

অবনীমোহন বলেন, 'হবে হবে, আগে তুমি সেরে ওঠ।'

'এবার আমি আর উঠব না। মন বলছে, এই শোওয়াই আমার শেষ শোওয়া।'

'কী আজে বাজে বলছ! ঠিক সেরে উঠবে তুমি, আবার আগের মতো সুস্থ হবে।'

বিচিত্র হাসেন সুরমা, 'যতই ভোলাতে চাও না, এবার আর আমার রেহাই নেই। বেঁচে থাকতে থাকতে সুধা সুনীতির বিয়ে দাও। দেখে শান্তিতে চোখ বুজি।'

সুরমা কোনও কথাই যখন শুনবেন না তখন কী আর করা। সুধার জন্য হিরণকে একরকম ঠিক করাই আছে। শুধু হিরণের ঠাকুরদা আর জেঠাইমাকে কথাটা জানাতে হবে। হেমনাথ যখন আছেন তখন তাঁর কথার ওপর ওঁরা কিছু বলবেন না। হিরণ সম্বন্ধে তাঁর মতামতই চূড়ান্ত।

সুনীতির সঙ্গে আনন্দর বিয়ের ব্যাপারে অবনীমোহন আর হেমনাথ একদিন রামকেশবের বাড়ি গেলেন। তারপর রামকেশব শিশির এবং স্মৃতিরেখার সঙ্গে পরামর্শ করে মধুপুরে আনন্দর বাবাকে চিঠি লেখা হল। ইভাকুয়েশনের সময় ওঁরা ওখানে চলে গেছেন। শিশির স্মৃতিরেখা এবং রামকেশবও আনন্দর বাবাকে চিঠি লিখলেন।

দিন কয়েকের ভেতর উত্তর এসে গেল। ছেলে বড় হয়েছে, তাকে সংসারী করবার জন্য আনন্দর বাবা পাত্রীর খোঁজ করছিলেন। সুনীতিকে যদি ছেলের পছন্দ হয়ে থাকে, এ বিয়েতে তাঁর আপত্তি নেই। শিগ্‌গিরই তিনি রাজদিয়া আসছেন। সাক্ষাতে অন্য কথা হবে।

দিন পনেরর ভেতর মধুপুর থেকে আনন্দর বাবা-মা ভাই-বোনেরা এসে পড়ল। হেমনাথ এবং অবনীমোহনের সঙ্গে কথা বলে, সুনীতিকে দেখে আনন্দর বাবা এবং মা খুবই সন্তুষ্ট। এক কথায় বিয়ে ঠিক হয়ে গেল। স্থির হল, মাঘ মাসে ধান কাটার পর বিয়েটা হবে।

বিয়ের ক'দিন আগে এক দুপুরবেলায় মাঠের দিক থেকে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে ছুটতে কুমোরপাড়ার হাচাই পাল এসে হাজির। ভয়ে চোখের তারা ঠিকরে বেরিয়ে আসছে তার।

স্নেহলতা উঠোনের একধারে তুলসী মঞ্চের পরিচর্যা করছিলেন। সুধা-সুনীতি বিনু-ঝিনুক, বাড়ির সবাই দাঁড়িয়ে ছিল।

হাচাই পালের ওই রকম উদ্‌ভ্রান্ত চেহারা দেখে স্নেহলতা চমকে উঠলেন, 'কী হয়েছে রে হাচাই?'

হাঁপাতে হাঁপাতে হাচাই পাল বলল, 'সুন্দি কাউঠার খোজে মাঠে গেছিলাম। গিয়া দেখি বাঘ। দেইখাই লৌড় (দৌড়) দিলাম—'

'বাঘ!'

'হ বউ-ঠাইরেন—'

এই বাঘ নিয়ে দিন সাতেকের মধ্যে এক মজার ব্যাপার ঘটে গেল।

কুমোরপাড়ার হাচাই পালই শুধু না, ক'দিনের মধ্যে বাঘটাকে আরও অনেকে দেখল। যেমন মৃধাবাড়ির ছলিমুদ্দিন, গোঁসাইবাড়ির সহদেব, নিকুঞ্জ কবিরাজ, অধর সাহা, মনা ঘোষ—এমনি আরও অনেকে।

কেউ বলল, বাঘটা ছ'হাত লম্বা। কেউ বলল, আট হাত। কেউ বলল, দশ হাত। যত দিন যেতে লাগল লোকের মুখে মুখে বাঘটার দৈর্ঘ্য-প্রস্থ-উচ্চতা লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়তে লাগল।

নিজের অস্তিত্ব প্রমাণ করবার জন্য বাঘটাও যেন উঠে পড়ে লেগে গেছে। আজ এ বাড়ির ছাগল পাওয়া যাচ্ছে না, কাল ও বাড়ির গোরুর খোঁজ নেই, পরশু সে বাড়ির হালের বলদ নিরুদ্দেশ। একদিন তো যুগীপাড়ার একটা ছেলেই নিখোঁজ হয়ে গেল। মাঠের মাঝখানে নলখাগড়ার ঝোপে খানকয়েক হাড় ছাড়া ছেলেটার আর কোনও চিহ্নই পাওয়া গেল না।

এদিকে রাজদিয়াকে ঘিরে দশ বারওখানা গ্রামে সন্ত্রাসের রাজত্ব শুরু হয়ে গেছে। কনট্রোলের দোকান থেকে কেরোসিন উধাও হবার পর সন্ধে নামতে না-নামতেই চারদিক নিশুতি হয়ে যাচ্ছিল। আজকাল বিকেল থাকতেই বাঘের ভয়ে ঘরে খিল পড়ে যায়।

সব চাইতে অসুবিধে হয়েছে বিনু আর ঝিনুকের। তারা যে তেমন বড় হয়েছে, এ কথাটা স্নেহলতা বা বাড়ির আর কেউ মানতেই চায় না। এখন কিছুদিন স্কুলে ছুটি চলছে। বেলা বেড়ে রোদ বেশ চনচনে হয়ে উঠলে তবে তারা ঘরের বার হতে পারে, আবার বিকেলবেলা রাজদিয়ার সব লোক বাইরে থাকতে থাকতেই তাদের ঘরে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। বাড়ির চৌহদ্দির বাইরে যাবার উপায় নেই তাদের। স্নেহলতার ভয়, বাঘটা তাকে তাকে আছে। রাজদিয়ার কয়েক হাজার লোকের ভেতর থেকে বেছে বেছে তাঁর নাতি-নাতনি দু'টোকে টপ করে মুখে তুলে নিয়ে যাবে।

স্নেহলতা লক্ষ্মণের গন্ডি কেটে দিয়েছেন। পেছনে রান্নাঘর, সামনে উঠোন, দক্ষিণে মধুটুকুরি আমের গাছ ও উত্তরে ঢেঁকিঘর—এই চতুঃসীমার মধ্যে বন্দি হয়ে থাকতে কার আর ভাল লাগে! এমনকি বাগান এবং পুকুরেও একা একা যাওয়া বারণ।

অন্য কিছুর জন্য নয়, ঝুমার জন্যই খুব খারাপ লাগে বিনুর। সারাদিন ছটফট করে এ ঘর ও ঘর করে বেড়ায় সে। উঠোন জুড়ে চঞ্চল পায়ে ঘুরপাক খেতে থাকে।

ঝিনুক কিন্তু ভারি খুশি। পুবের ঘরের উঁচু পৈঠের ওপর বসে পা নাচাতে নাচাতে কৌতুকের চোখে সে বিনুর অস্থিরতা দেখতে থাকে। একসময় খুব আস্তে করে ডাকে, 'বিনুদা—

বিনু বলল, 'কী বলছ?'

'তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে, না?'

'কষ্ট কেন?'

ঝিনুকের চাপা ঠোঁটের মাঝখানে হাসির একটু আভা ফুটে উঠেই চকিতে মিলিয়ে যায়। সে বলে, 'সারাদিন বাড়িতে আটকে আছ বলে—'

চোখমুখ কুঁচকে বিরক্ত, রাগ-রাগ গলায় বিনু বলতে থাকে, 'সমস্ত দিন বাড়ি বসে থাকতে কারোর ভাল লাগে?'

'ঠিকই তো।'

'দিদার কী যে ভয়, রাস্তায় বেরুলে এত লোক থাকতে বাঘ এসে যেন আমাকেই গিলে ফেলবে।'

কয়েক পলক বিনুর দিকে তাকিয়ে থেকে গলার স্বর আরও নামিয়ে ফেলে ঝিনুক, 'একে বেরুতে পারছ না। তার ওপর—'

'তার ওপর কী?'

'ঝুমাদের বাড়ি যাওয়া হচ্ছে না। ঝুমাদের বাড়ি যেতে পারলে এত কষ্ট, এত রাগ হত না। তাই না বিনুদা?'

চোখের তারা স্থির করে ঝিনুকের দিকে তাকায় বিনু। বুঝতে চেষ্টা করে মেয়েটা কি কিছু আভাস পেয়েছে? বলে, 'তোমার কি মনে হয়, রাস্তায় বেরুলেই আমি ঝুমাদের বাড়ি যাই?' বিনুর গলা অল্প অল্প কাঁপে।

ঝিনুক হঠাৎ উদাস হয়ে যায়, 'কী জানি—'

আর বিনু এক মুহূর্তও সেখানে দাঁড়ায় না। বড় বড় পা ফেলে আবার এ ঘরে ও ঘরে এবং উঠোনে ঘুরতে থাকে। ঘুরতে ঘুরতে ভাবে, ঝুমাই শুধু না, এই ঝিনুক মেয়েটিই কি কম রহস্যময়ী!

বাঘের উৎপাত দিন দিন বেড়েই চলল। রক্তের স্বাদ যখন একবার সে পেয়েছে তখন কি সহজে থামবে?

এদিকে থানা থেকে ঢেঁড়া দিয়ে পনের কুড়ি মাইলের ভেতর যত গ্রাম-গঞ্জ আছে, সব জায়গার লোককে সাবধান করে দেওয়া হয়েছে। বাঘ মারবার জন্য মোটা টাকা পুরস্কারও ঘোষণা করা হয়েছে।

এত এত ব্যাপার যখন ঘটে গেল তখন কি আর আনন্দ চুপ করে বসে থাকতে পারে? বাঘ মারার দায়িত্ব সে নিজের কাঁধে তুলে নিল। একদিন দুপুরবেলা বিনুরা দেখতে পেল, পুকুরের ওধারে চারদিকের গ্রামগুলো থেকে কয়েক শ' যুবক এবং প্রৌঢ়কে জড়ো করে ফেলেছে সে। এই মুহূর্তে তার গায়ে পুরোপুরি শিকারির সাজ। কাঁধ থেকে বন্দুক ঝুলছে, গলায় টোটার মালা, কোমরে মস্ত ভোজালি।

মাঘের মাঝামাঝি এই সময়টায় মাঠে জল নেই, ধানও কাটা হয়ে গেছে। আনন্দকে ঘিরে বিরাট জনতা ধানকাটা মাঠের ওপর গোল হয়ে বসে পড়ল।

এত লোক যখন রয়েছে তখন ভয়ের কোনও কারণ নেই। স্নেহলতাকে বলে বিনু ধানখেতে ছুটল।

জনতার বেশির ভাগই চাষী শ্রেণীর মানুষ। দুর্ভিক্ষে হেজেমজে যাবার পর যারা কোনও রকমে টিকে আছে তারা ছুটে এসেছে। উৎকণ্ঠিতের মতো লোকগুলো আনন্দের দিকে তাকিয়ে ছিল।

আনন্দ বলছিল, 'বাঘটাকে তোমরা মারতে চাও, এই তো?'

সবাই সমস্বরে বলল, 'হ সাহেববাবু। শালার বাঘের লেইগা পরানে শান্তি নাই। কুনদিন কার বাড়িত্ গিয়া যে আকাম কইরা আইব।'

'সাহেববাবু' সম্ভাষণটা খুব সম্ভব আনন্দের হ্যাট-বুট-প্যান্ট এবং গুলি-বন্দুকের সম্মানে।

আনন্দ বলল, 'সে তো ঠিকই।'

বাঘ কার কী ক্ষতি করেছে, তাদের কতখানি দুর্দশার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে, এরপর লোকগুলো সে সব কাহিনী বলে যেতে লাগল।

সব শুনে আনন্দ বলল, 'বাঘ আমি মেরে দিতে পারি। তবে—'

'তয় কী?' জনতা উন্মুখ হল।

'আমার কথামতো তোমাদের চলতে হবে।'

'নিয্যস চলুম।'

এরপর উদ্দীপ্ত ভাষায় ছোটখাটো একখানা বক্তৃতা দিল আনন্দ। তার সারমর্ম এইরকম। প্রথমত,

সবাইকে লাঠি এবং সড়কি বানিয়ে নিতে হবে। ঘরে ঘরে শাঁখ, কাঁসর, নিদেন পক্ষে একটুকরো টিন মজুদ রাখতে হবে। কেউ যদি বাঘটাকে দেখতে পায়, সঙ্গে সঙ্গে নিজের গ্রামে গিয়ে খবর দেবে। আর খবর পেলেই যত শাঁখটাখ আছে, একসঙ্গে বাজাতে হবে। এক গ্রামের বাজনার আওয়াজ পেলে আরেক গ্রাম বাজাতে শুরু করবে। এই ভাবে চারদিকের গ্রামগুলো সর্তক হয়ে যাবে।

শুধু শাঁখ কাঁসর বা টিন বাজালেই চলবে না। চেঁচিয়ে ধ্বনিও দিতে হবে, 'বন্দে মাতরম্', 'কালী মাঈকি জয়' কিংবা 'আল্লা হো আকবর।' ধ্বনিটা কানে গেলে চুপ করে বসে থাকলে চলবে না। প্রতিধ্বনিও দিতে হবে। তারপর লাঠি সড়কি নিয়ে সব দিক থেকে বাঘটাকে ঘিরে পিটিয়ে মেরে ফেলা হবে। তাতেও যদি সুবিধে না হয়, আনন্দ এবং তার বন্দুক তো আছেই।

পরিকল্পনার কথাটা বলে ঘুরে ঘুরে সগর্বে জনতাকে একবার দেখে নিল আনন্দ। তারপর আবার শুরু করল, 'ফন্দিটা কেমন?'

সবাই চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে সায় দিল, 'চোমৎকার সাহেববাবু, চোমৎকার—'

'এবার বাঘের আর নিস্তার নেই, বুঝলে?'

'হ্।'

এরকম চমকপ্রদ একখানা পরিকল্পনার পর বাঘের আয়ু যে নেহাতই ফুরিয়ে এসেছে, সে সম্বন্ধে জনতার সন্দেহ থাকল না। উৎসাহে উদ্দীপনায় তাদের চোখ চক চক করতে লাগল।

আনন্দ বলল, 'তা হলে ওই কথাই রইল—'

'হ্।'

হঠাৎ এই সময় একজন বলে উঠল, 'বাঘেরে আমরা যহন ঘিরা ধরুম, আপনে আমাগো লগে থাকবেন তো?'

বাঁ হাতের তালুতে প্রচন্ড ঘুষি কষিয়ে আনন্দ বলল, 'নিশ্চয়ই। আমি না থাকলে তোমাদের চালাবে কে?'

লোকগুলো একেবারে নিশ্চিন্ত হয়ে গেল। নিজেদের মধ্যে তারা বলাবলি করতে লাগল, 'সাহেববাবু আমাগো লগে থাকব। শালার বাঘের এইবার যম আসছে।'

আনন্দ বলল, 'কথা হয়ে গেল। এখন তোমরা বাড়ি যাও। আর হ্যাঁ, যতদিন না বাঘটা মারা পড়ছে, প্রতি সপ্তাহে রবিবার করে এখানে মিটিং হবে। দুপুর বেলা তোমরা চলে আসবে। যদি বাঘ মারার অন্য কোনও ভাল ফন্দি মাথায় আসে, তোমাদের বলে দেব।'

'আইচ্ছা।'

বাঘের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে যে যার বাড়ি চলে গেল। হতভাগ্য প্রাণীটা জানতেও পারল না তার বিরুদ্ধে কী ভীষণ ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে।

মিটিং শেষ হলে আনন্দকে ধরে বাড়ি নিয়ে এল বিনু। সুধা সুনীতি উঠোনই ছিল। ঠোঁট টিপে হাসতে হাসতে সুধা বলল, 'বাবা, একেবারে বীরবেশে যে! দ্যাখ দিদি, দ্যাখ—'

সুনীতি চোরা চোখে আনন্দকে দেখে নিয়ে মুখ নীচু করল। তারপর নখ খুঁটতে লাগল। তার মুখে মৃদু কৌতুকের হাসি আলতোভাবে লেগে রইল।

সুধা এবার কাছে এসে চোখ বড় বড় করে বলল, 'বন্দুক, টোটার মালা, ভোজালি—যেভাবে সেজেছেন, তাতে বাঘটাকে না মারলেও চলবে।'

ভুরু কুঁচকে আনন্দ বলল, 'কেন?'

'এই বীরবেশ একবার যদি বাঘটাকে দেখিয়ে দিতে পারেন, রাজ্য ছেড়ে সে পালিয়ে যাবে।'

আনন্দ কী বলতে যাচ্ছিল, বলা হল না। স্নেহলতা কোথায় ছিলেন, আনন্দকে দেখতে পেয়ে ছুটে এলেন। বললেন, 'এস দাদা, এস—'

তারপর যতক্ষণ আনন্দ এ বাড়িতে রইল, সুধা তার পেছনে লেগে থাকল।

দু'চার দিনের ভেতর দেখা গেল, রাজদিয়া এবং চারপাশের গ্রামগুলোতে একটা সুপারি গাছ কিংবা বয়রা বাঁশও আর আস্ত নেই। সব লাঠি এবং সড়কি হয়ে গেছে।

pathagar.net

প্রথমে ঠিক হয়েছিল, রবিবার রবিবার ধানকাটা ফাঁকা মাঠে মিটিং বসবে। এক রবিবার পরই সিদ্ধান্তটা বাতিল করে দিল আনন্দ। নতুন করে স্থির হল, রোজ সবাইকে আসতে হবে । বাঘ বলে কথা।

দু'চারদিন যাতায়াতের পর হঠাৎ একদিন আনন্দ বলল, 'বাঘ মারা সহজ ব্যাপার না, বুঝলে?'

সবাই সমস্বরে বলে উঠল, 'হেয়া আর বুঝি না!'

'এর জন্য সকলকে এক মন, এক প্রাণ হতে হবে।'

'আইজ্ঞা হেয়া তো হইতেই হইব।'

'আমি ভাবছি—'

চারপাশের বিপুল জনতা দম বন্ধ করে উৎসুক চোখে তাকিয়ে রইল।

আনন্দ বলল, 'সৈন্যদের মতো তোমাদের প্যারেড করতে হবে। তাতে একসঙ্গে কাজ করার প্রেরণা পাবে।'

'পেরেট কী?'

'ওই লেফট রাইট করা।'

পরের দিন থেকেই প্যারেড শুরু হল। দেখা গেল, কেউ লুঙ্গি মালকোচা দিয়ে পরেছে। তার পাশেই হয়তো একজনের পরনে খাটো ধুতি এবং ফতুয়া, গলায় তিনলহর তুলসীর মালা। তার পরের লোকটি পাজামা পরে এসেছে।

নানারকম বেশভূষা আনন্দর পছন্দ নয়। দু'একদিন দেখে আনন্দ বলল, 'তোমরা এক কাজ কর।'

'কী?'

'সবাই একটা করে খাকি প্যান্ট আর সাদা হাফ শার্ট করিয়ে নাও। একরকম পোশাক পরলে দেখতে ভাল, কাজেরও সুবিধে।'

এইবার জনতা বিদ্রোহী হয়ে উঠল, 'কী যে ক'ন সাহেববাবু, তার ঠিক ঠিকানা নাই। এই আকালে খাইতে না পাইয়া মরতে বসছি। আপনে ক'ন পেন্টুল-জামা বানাইতে! এই কারবারে আমরা নাই।'

পাছে সেনাদল ভেঙে যায়, এই আশঙ্কায় আনন্দ বলল, 'আচ্ছা থাক, শার্ট টার্ট বানাতে হবে না।'

ধুতি-লুঙ্গি-পাজামার বিচিত্র সমন্বয়ের ভেতর বিপুল সমারোহে প্যারেড চলতে লাগল।

প্যারেড করতে করতে বাঁয়ের জায়গায় ডান পা তুললে রক্ষা নেই, অমনি আনন্দের হাতের বেত পায়ের গোছে এসে পড়ে। আনন্দের চোখকে ফাঁকি দেওয়া সহজ নয়।

প্যারেড শুরু হবার পর বেশ কিছুদিন বাঘটাকে আর দেখা গেল না। তার বিরুদ্ধে যে গভীর চক্রান্ত চলছে, এ খবর কি সে জেনে ফেলেছে? যাই হোক, মানুষ খানিকটা নিশ্চিন্ত হতে পেরেছে, তবে সর্তক আছে। সন্ধের আগে আগেই যথারীতি ঘরে ঢুকে খিল দিচ্ছে তারা। এইভাবেই চলতে লাগল।

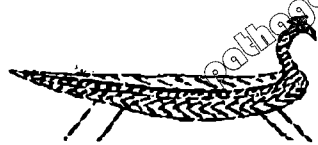

হঠাৎ একদিন সকালবেলা বারুইবাড়ির প্রাণবল্লভ মাঠের দিক থেকে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে ছুটতে এবং চেঁচাতে চেঁচাতে হেমনাথের বাড়ি এসে হাজির, 'খাইছে রে খাইছে, আমারে খাইয়া ফেলাইল রে—'

পুব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণ, চারদিকের ঘর থেকে সুধা-সুনীতি বিনু-ঝিনুক অবনীমোহন-হেমনাথ, সবাই ছোটাছুটি করে বেরিয়ে এলেন।

উদ্বিগ্ন মুখে হেমনাথ শুধোলেন, 'কী হয়েছে প্রাণবল্লভ, কী হয়েছে?'

প্রথমটা কথা বলতে পারল না প্রাণবল্লভ। হাত-পা-ঠোঁট, তার সারা শরীর ভয়ে থর থর কাঁপছে। হাত ধরে তাকে বারান্দায় বসালেন হেমনাথ। বললেন, 'আগে শান্ত হ। পরে বলবি।'

কাঁপা, ভাঙা ভাঙা গলায় প্রাণবল্লভ বলল, 'এট্টু জল বড়কত্তা—'

জল খেয়ে খানিকটা ধাতস্থ হল প্রাণবল্লভ। তারপর যা বলল, সংক্ষেপে এইরকম। ভোরবেলা মেটে আলুর সন্ধানে সে ধানকাটা মাঠে গিয়েছিল। আলের ধারে ঘুরে ঘুরে দু'চারটে জোগাড়ও করেছিল। ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ তার চোখে পড়ে, দক্ষিণের চকে মাঠের মাঝখানে গুটিসুটি মেরে বাঘটা শুয়ে আছে।

প্রাণবল্লভের কথা শেষ হলে অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে হেমনাথ বললেন, 'সুধাদিদি সুনীতিদিদি, শিগগির শাঁখ বাজা। বাঘের খবর পেলেই আনন্দ শাঁখ টাঁখ বাজাতে বলেছিল না?' সেদিনকার মিটিং-এর কথা কারোর জানতে আর বাকি নেই।

সুধা সুনীতি ছুটে গিয়ে ঘর থেকে শাঁখ বার করে আনল, তারপর দুই বোন গাল ফুলিয়ে জোরে জোরে ফুঁ দিতে লাগল।

প্রাণবল্লভের ভয় কেটে গিয়েছিল। লাফ দিয়ে উঠোনে নেমে আকাশে হাত ছুড়ে চেঁচিয়ে উঠল সে, 'বন্দে মাতরম্—'

'বন্দে মাতরম্'-এর এরকম প্রয়োগ আগে কখনও দেখে নি বিনু।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে এ পাড়া, সে পাড়া এবং দূর-দূরান্ত থেকে শাঁখ কাঁসর এবং টিন পেটাবার আওয়াজ ভেসে আসতে লাগল। সেই সঙ্গে মুহুর্মুহু শোনা যেতে লাগল, 'বন্দে মাতরম্—'

'কালী মাঈকী জয়—'

মুসলমান পাড়ার দিক থেকে আওয়াজ আসতে লাগল, 'আল্লা হো আকবর—'

তারপরেই হো হো চিৎকারে দিগ্‌দিগন্ত তোলপাড় করে অসংখ্য মানুষ বেরিয়ে পড়ল। সবার হাতে লাঠি আর সুপারি কাঠের সড়কি।

হেমনাথ প্রাণবল্লভকে বললেন, 'যা শিগগির, আনন্দকে বাঘের খবরটা দিয়ে আয়।'

স্নেহলতা বললেন, 'যা চেঁচামেচি আর কাঁসর ঘন্টার আওয়াজ, তাতে খবর পেতে কি তার বাকি আছে?'

'তবু যাক।'

প্রাণবল্লভ রামকেশবের বাড়ি ছুটল। কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে খবর দিল, সে একাই না, আরও অনেকে আনন্দকে বাঘের খবর দিতে গিয়েছিল। কিন্তু আনন্দকে পাওয়া যাচ্ছে না।

হেমনাথ বললেন, 'সে কী! কাজের সময় সেনাপতিই নিরুদ্দেশ!'

প্রাণবল্লভ কী বলতে গিয়ে থেমে গেল। হেমনাথের মুখের দিকে তাকিয়ে ইতস্তত করতে লাগল।

তার মনের কথাটা যেন পড়তে পারলেন হেমনাথ। বললেন, 'কিছু বলবি?'

'হ।'

'বল না—'

'অপরাধ যদি না ন্যান কথাহান কই—'বলে হাতজোড় করল প্রাণবল্লভ।

হেমনাথ অবাক, 'অপরাধ নেব কেন?'

হাতজোড় অবস্থাতেই প্রাণবল্লভ বলল, 'আমার মনে হইল সাহেববাবু বাড়িতেই আছে, ভিতরে তেনার গলাও য্যান পাইলাম। কিন্তুক মা-ঠাইরেনরা কইয়া দিল তেনি নাই—'

হেমনাথ ধমকের গলায় বললেন, 'কী যা-তা বলছিস!'

'বিশ্বাস যান না বড়কত্তা?'

'না।'

'বিশ্বাস না যাওনেরই কথা। কিন্তুক—'

'কিন্তু কী?'

'সাক্ষী আছে।'

'কে সাক্ষী?'

প্রাণবল্লভ একে একে নাম করে যেতে লাগল, 'গণকবাড়ির মহেন্দর, কামারবাড়ির নিমাই, সোনারুবাড়ির অনন্ত, কালিমুদ্দিন মাঝি, বরকাতুল্লা নিকারি—কত মাইনষের নাম কমু?'

'এত লোক আনন্দের খোঁজে গিয়েছিল!' হেমনাথের চোখেমুখে এবং কণ্ঠস্বরে বিস্ময়।

pathagar.net

'হ। বাঘ দেখলে তেনিই তো খপর দিতে কইছিল।'

একটু চুপ করে থেকে হেমনাথ বললেন, 'আচ্ছা, তুই যা এখন—'

প্রাণবল্লভ চলে গেল।

ওদিকে আরেক কান্ড চলছিল, লাঠি সড়কি নিয়ে রাজদিয়ার লোক তো মাঠের দিকে ছুটছিলই। দিগন্তের ওপারে কৃষাণ গ্রামগুলো থেকে শত শত মানুষ ছুটে আসছিল। তাদের হাতেও লাঠি সড়কি এবং নানারকম অস্ত্র।

শাঁখ কাঁসর এবং টিন পেটাবার আওয়াজ আসছিলই। সেই সঙ্গে মুহুর্মুহু শোনা যাচ্ছিল, 'বন্দে মাতরম্।'

'কালী মাঈকি জয়—'

'আল্লা হো আকাবর—'

ধান-কাটা শীতের মাঠ পানিপথ কি হলদিঘাটের যুদ্ধক্ষেত্রের চেহারা নিতে শুরু করেছে। বিনু হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠল, 'আমি মাঠে যাব দিদা—'

'মাঠে কেন রে দাদাভাই?' স্নেহলতা চমকে উঠলেন।

'বাঘ মারা দেখতে।'

'না না, ওখানে তোমাকে যেতে হবে না।' জোরে জোরে প্রবলবেগে হাত নাড়তে লাগলেন স্নেহলতা, চোখেমুখে তাঁর ভয়ের ছায়া পড়ল।

'আমি যাবই—' ঘাড় গোঁজ করে পা ছুড়তে লাগল বিনু। শাঁখ কাঁসরের শব্দ, অবিরল 'বন্দে মাতরম্' আর 'আল্লা হো আকবর' তার রক্ত চঞ্চল করে তুলেছে।

'ওখানে কী হবে, কেউ বলতে পারে! বাঘটা যদি কোনও রকমে ছিটকে তোর কাছে চলে আসে—'

'আমি ওই হিজলগাছের মাথায় চড়ে দেখব—' দূর মাঠের দিকে আঙুল বাড়িয়ে দিল বিনু।

স্নেহলতা বললেন, 'গাছে টাছে চড়তে হবে না। তুই ঘরে গিয়ে বোস। জানলা দিয়ে যেটুকু দেখা যায় তার বেশি দেখবার দরকার নেই।'

বিনু শুনল না, ঊর্ধ্বশ্বাসে মাঠের দিকে ছুটল। আজ আর তাকে বাড়িতে আটকে রাখা গেল না। মাঠজোড়া রণভূমি তাকে বিপুল আকর্ষণে টেনে নিয়ে গেল।

পেছনে স্নেহলতার ভীত, ব্যাকুল কণ্ঠস্বর শোনা যেতে লাগল, হেমনাথ আর অবনীমোহনকে তিনি বলছেন, 'তোমরা ছেলেটাকে আটকালে না? আজ কী যে হবে! যাও যাও, ওকে ফেরাও—'

হেমনাথরা কী উত্তর দিলেন, বিনু শুনতে পেল না। তার আগেই ছায়াচ্ছন্ন ঝুপসি বাগান পেরিয়ে, মাঘের নিস্তরঙ্গ পুকুর পেছনে ফেলে, ফসলশূন্য ফাঁকা মাঠে এসে পড়ল।

চারদিক থেকে জনতা গোল হয়ে বৃত্তাকারে ছুটছে। সম্মোহিতের মতো তাদের পিছু পিছু দৌড়তে লাগল বিনু।

দক্ষিণের চকে এসে দেখা গেল, সত্যি সত্যি মাঠের মাঝ-মধ্যিখানে বাঘটা শুয়ে আছে। চারধার থেকে গোল হয়ে জনতা ঝড়ের মতো নেমে আসছিল। বাঘটা যখন সিকি মাইলের মতো দূরে সেই সময় কেউ যেন মন্ত্র পড়ে হঠাৎ তাদের থামিয়ে দিল।

একধারে সারি সারি অনেকগুলো হিজল গাছ। বিনু আর দেরি করল না, সব চাইতে উঁচু গাছটার মগডালে চড়ে বসল। ভাটির দেশে শ্বশুরবাড়িতে চলে যাবার আগে বিনুকে গাছে চড়া শিখিয়ে দিয়েছিল যুগল।

শাঁখ কাসরের আওয়াজ থেমে গেছে। 'কালী মাঈকী জয়', কিংবা 'আল্লা হো আকবর'-ও আর শোনা যাচ্ছে না। জনতা যুদ্ধক্ষেত্রে এসে যেন বিমূঢ় হয়ে গেছে।

হঠাৎ কে যেন চেঁচিয়ে উঠল, 'সাহেববাবু কই?'

আট দশটা লোক চিৎকার করে বলল, 'বাড়িত্ নাই।'

'অহন কী করা?'

'সাহেববাবু তো কইছিল, বাঘ দেখলে তেনারে খপর দিতে। তেনি নাই, আমরা ফিরাই যাই।'

pathagar.net

'হগলেরে তাইলে ফিরনের কথা কইয়া দ্যাও। বাঘ মারণ বইলা কথা! সাহেববাবু না থাকলে আমাগো চালাইব কে?'

একটা লোক চিৎকার করে ফেরবার কথা বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই বাজিতপুরের জোয়ান ছেলে হালিম বলল, 'কিছুতেই না। অ্যাদ্দুর আইসা ফিরা যামু না। সুযুগ যহন পাইছি, শালার বাঘেরে নিকাশ করুম।' বলেই আকাশের দিকে হাতের লাঠিটা ছুঁড়ে চেঁচাল, 'আউগাও (এগোও) ভাই হগল—'

নিমেষে জনতার ভেতর সাড়া পড়ে গেল।

'আল্লা হো আকবর—'

'কালী মাঈকী জয়—'

তারপরেই বাঘটাকে ঘিরে মানুষের বৃত্ত ছোট হয়ে আসতে লাগল। কিন্তু জন্তুটা যখন তিনশ' গজের মতো দূরে, লোকগুলো আবার থেমে গেল।

আনন্দ নেই। সেনাপতিত্ব আজ হালিমের দখলে। প্রেরণা দেবার জন্য পেছন থেকে আবার সে চেঁচিয়ে লাগল, 'আউগাও ভাইরা, আউগাও—'

ঠেলে ঠেলে জনতাকে আরও অনেকখানি এগিয়ে নিয়ে গেল হালিম। কিন্তু বাঘটা যখন এক শ' গজ দূরত্বে তখন আর পারা গেল না।

এতদূর থেকে লাঠি সড়কি দিয়ে অন্তত বাঘ মারা যায় না। হালিম শূন্যে ঘুষি ছুড়তে ছুড়তে সমানে চেচাঁতে লাগল, 'আওগাও ভাইরা, আউগাও—'

কিন্তু এত অনুপ্রেরণাতেও কাজ হল না। লোকগুলো একেবারে অনড়, কেউ যেন পেরেক ঠুকে মাটিতে তাদের পা আটকে দিয়েছে।

ওদিকে আরেকটা ব্যাপার ঘটল। বাঘটা ঘুমিয়েছিল, হঠাৎ এত চেঁচামেচি শুনে গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াল।

হিজল গাছের মাথা থেকে বিনুর মনে হল, বাঘটা দশ হাতও না, বার হাতও না, ছ'সাত হাতের মতো লম্বা। হলুদ শরীরে তার কালো কালো ডোরা।

কাঁচা ঘুমটা ভেঙে যাবার জন্য খুব সম্ভব বাঘটা বিরক্ত হয়েছিল, এবং এত লোকজন দেখে কিছুটা বিস্মিত, কিছুটা হকচকিত। সে সামনের দিকে তাকাল। সঙ্গে সঙ্গে শ'খানেক লোক অস্ত্র টস্ত্র ফেলে প্রাণপণে ছুটল, এবং নিমেষে দিগন্তের ওপারে অদৃশ্য হয়ে গেল। এবার বাঘটা তাকাল ডানদিকে, তক্ষুনি দু'আড়াই শ লোক আর নেই। অনেকে মালকোঁচা দিয়ে লুঙ্গি পরে এসেছিল, ছুটবার সময় কাছা খুলে যাওয়ায় লুঙ্গিতে পা আটকে হুমড়ি খেয়ে পড়ছে। ধান কেটে নিয়ে যাবার পর যে গোড়াগুলো মাঠময় ছড়িয়ে আছে তাতে হোঁচট খেয়েও অনেকে পড়ে যাচ্ছে। পড়েই তক্ষুনি উঠে পড়ছে, এবং ধাঁ করে পেছনে একবার তাকিয়ে নিয়েই আবার ছুটছে।

সামনে পেছনে, যেদিকেই বাঘটা তাকাচ্ছে, এক অবস্থা। মুহূর্তে সব ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে। চারদিকে তাকাতে তাকাতে সেনাপতির সঙ্গে একবার তার শুভদৃষ্টি হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল একটা ডোরাকাটা লাল লুঙ্গি আর সবুজ জামা প্রায় উড়ে গিয়ে আধ মাইল দূরের একটা খালে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

কেউ যখন আর নেই, সেই সময় বাঘটা অলস পায়ে চকের এক প্রান্তে উলুখড়ের জঙ্গলে গিয়ে ঢুকল। তারপর হিজল গাছ থেকে নেমে ছুটতে ছুটতে বাড়ি ফিরে এল বিনু।

কিছুক্ষণের মধ্যে বাঘ শিকারের ব্যাপারটা দিকে দিকে রটে গেল।

হাসতে হাসতে হেমনাথ বললেন, 'যেমন আনন্দটা তেমনি তার প্যানজার বাহিনী।'

বিনু শুনতে পেল সবার কান বাঁচিয়ে সুধা সুনীতিকে বলছে, 'আচ্ছা বীরপুরুষের গলায় মালা দিবি দিদিভাই—'

সুনীতি মুখ তুলতে পারছিল না। মাটির সঙ্গে সে যেন মিশে যেতে চাইছে।

দিন চারেক পর খবর পাওয়া গেল, বাঘটা মারা পড়েছে। ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব লঞ্চে করে রাজাদিয়া আসছিলেন। নদীর বাঁকে বাঘটাকে দেখে গুলি করে মেরেছেন।

বাঘের ভয়ে আনন্দ যে বাড়ি থেকে বেরোয় নি, এই কথাটা কেমন করে যেন চারদিকের গ্রামগঞ্জগুলোতে রটে গিয়েছিল। খবরটা যে শুনেছে সে-ই হেসেছে।

এদিকে সেদিনকার সেই মজার ঘটনাটির পর আনন্দর আর দেখা নেই। আগে দিনে দু'বার করে হেমনাথের বাড়ি আসছিল, এখন রামকেশবের বাড়ির একটা ঘরে সে নাকি নির্বাসন বেছে নিয়েছে।

একদিন হেমনাথ গিয়ে আনন্দকে ধরে আনলেন। রগড়ের গলায় বললেন, 'আরে দাদা, তোমার এত লজ্জাটা কিসের?'

আনন্দ খুবই বিব্রত বোধ করছিল। উত্তর দিল না।

হেমনাথ আবার বললেন, 'লজ্জার কিছু নেই, বুঝলে ভাই। বড় বড় সেনাপতি যারা—যেমন ধর রোমেল, মন্টোগোমারি, দ্য গল—ফ্রন্টে হেঁজিপেঁজি সোলজারের গায়ের গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে কি তারা লড়ে? তারা দূরে দূরে বসে কলকাঠি নাড়ে। তুমি ঘরে বসে থেকে আদর্শ জেনারেলের মতো কাজ করেছ।' একটু থেমে আবার বললেন, 'ভয় নেই, এর জন্যে সুনীতিদিদি বর বদল করবে না। কী বলিস রে দিদিভাই?'

সুধা-সুনীতি-বিনু-ঝিনুকরা কাছেই ছিল। সুনীতি ছুটে পালিয়ে গেল।

সুধা চোখের তারায় আর ঠোঁটের প্রান্তে ধারাল হাসিটা হেসে বিঁধিয়ে বিঁধিয়ে বলল, 'কী বীরপুরুষ, বোঝা গেল। কাঁধে বন্দুক, কোমরে ভোজালি, গলায় টোটার মালা ঝোলানোই সার।'

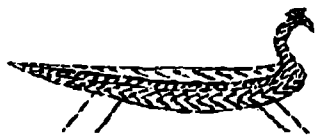

মাঘের শেষ তারিখে দিন পড়েছে। একই লগ্নে সুধা সুনীতির বিয়ে। রাত থাকতে থাকতে কাকপক্ষী জাগবার আগে দুই বোনকে বিছানা থেকে তোলা হল। শুরু হল 'অধিবাসের' কাজ।

সুধা সুনীতিকে নতুন কাপড় পরানো হল, গলায় দেওয়া হল তুলসী কাঠের মালা, কোমরে নতুন লাল ঘুনসি, কপালে চন্দন কুঙ্কুমের ফোঁটা, চোখে কাজলের টান, সারা গায়ে ঝকমকে নতুন গয়না, হাতে নতুন শাঁখা।

মেয়ে সাজাবার পর নতুন পিঁড়িতে তাদের পাশাপাশি বসিয়ে শ্বেত পাথরের থালায় খাবার খেতে দেওয়া হল—খই চিঁড়ে মুড়কি ক্ষীর দই চিনি-বাতাসা। বিনু ঝিনুকও ওদের সঙ্গে বসে গেল। এরপর সারাদিন বিয়ের কনেরা আর কিছু খাবে না। খাবে সেই রাত্রিবেলা—বিয়ের পর।

সুধা সুনীতিকে খেতে বসিয়ে তিরিশ চল্লিশজন এয়ো নিয়ে গান গাইতে গাইতে নদীর ঘাটে 'জলসই'তে গেলেন স্নেহলতা। সঙ্গে সঙ্গে সানদার (সানাইবাদক) আর ঢুলী বাজাতে বাজাতে চলল।

'জলে ঢেউ দিও না লো সখী
ঢেউ দিও না, ঢেউ দিও না,
আমরা জলের চাতকী।
জলের কালোরূপ নিরখি
জলে ঢেউ দিও না গো সখী।
আগে সখী, পাছে গো সখী।
মধ্যে রাধা চন্দ্রমুখী।'

স্নেহলতা যতক্ষণ না ফিরছেন, সুধা সুনীতি পাত ছেড়ে উঠবে না। এই হচ্ছে রীতি।

কিছুক্ষণ পর স্নেহলতারা নদী থেকে নতুন কলসিতে জল ভরে ফিরে এলেন। যে কলসিটায় জল আনা হয়েছে সেটার নাম মঙ্গলকলস। পাঁচজন এয়ো একসঙ্গে কলসিটা ধরে উলু দিতে দিতে মাটিতে স্থির করে বসাল। একজন তার তলায় আগেই ধানদূর্বা দিয়েছে। বাকিরা গান ধরল ঃ

ওগো মঙ্গলো আসিছে দুয়ারে।
মঙ্গলো অবনী আজ।
মঙ্গলো জলধর, মঙ্গলো কলসে

পাদ্য অর্ঘ্য নিয়ে এসো হরষে,
অতিথি, ভূপতি, দেবতা, স্বদেশে,
মঙ্গলো অবনী আজ।'

দেখতে দেখতে রোদ উঠে গেল, বেলা চড়তে লাগল। দুপুরের খানিক আগে পুরুত এল। অবনীমোহন মেয়ে সম্প্রদান করবেন। পুরুত তাঁকে নিয়ে 'বৃদ্ধি'তে বসে গেল। 'বৃদ্ধি'র সময়ও মেয়েরা গান ধরল ঃ

'ওগো বৃদ্ধির কার্যে কী কী লাগে?
ষোল মণ চাউল লাগে গো।
ওগো বৃদ্ধির কার্যে কী কী লাগে?
ষোল বিড়া পান লাগে গো।
ওগো বৃদ্ধির কার্যে কী কী লাগে?
ষোল মণ গুয়া লাগে গো।'

বৃদ্ধির পর এয়োরা শিলে কাঁচা হলুদ বেটে সুধা সুনীতিকে মাখাল। তারপর তাদের মাথায় ধানদূর্বা দিয়ে উলু দিতে দিতে স্নান করাতে লাগল। সেই সঙ্গে গান ঃ

'তোরা আয় লো সকলে
আমার সীতাকে স্নান করাব
সুশীতল জলে।
কস্তুরী মিশায়ে জল ঢেলে দাও গো
সীতার শিরে।
সখী, সকলে আন গো, মাজ কেটে আনো
কুর হরিদ্রা বেটে আনো—'

সুধা সুনীতির স্নান হয়ে গেলে, 'অধিবাসে'র তত্ত্ব নিয়ে হেমনাথ আর বিনু বেরিয়ে পড়ল। দু' বাড়িতে তত্ত্ব যাবে। মাছ, পান, তামার পরাতে পরাতে নানা রকমের মিষ্টি। এত জিনিস হাতে করে তো নিয়ে যাওয়া যায় না। তাই ভবতোষের ফিটনটা সকাল বেলাতেই আনিয়ে রেখেছিলেন হেমনাথ।

প্রথমে বিনুরা গেল হিরণদের বাড়ি। সেখানে বেশিক্ষণ বসল না; তত্ত্ব নামিয়ে দিয়ে সোজা রামকেশবের বাড়ি চলে এল।

এখানেও সানাই বাজছে, ঢাক বাজছে। মাঝে মাঝে শাঁখ এবং কল কল উলুর আওয়াজ আসছে।

বিনুরা বাড়ির ভেতর আসতেই সাড়া পড়ে গেল। ঝুমা কোথায় ছিল, ছুটতে ছুটতে সামনে এসে হাজির।

আজ দারুণ সেজেছে ঝুমা। অন্যদিন ফ্রক পরে থাকে। আজ হলুদ রঙের সিল্কের শাড়ি আর লাল টুকটুকে একটা জামা পরেছে। শাড়িটার গায়ে ছোট ছোট নীল ময়ূর। কপালে আগুনের কুঁড়ির মতো কুমকুমের একটি টিপ। টিপটাকে গোল করে ঘিরে চন্দনের বিন্দু। চোখে কাজলের টান। গালে এবং ঠোঁটে লালচে রং। আঙুলে পাথর-বসানো লম্বা আংটি, গলায় হার, হাতে সোনার চুড়ি, বাঁ হাতের সুডোল নরম কবজিটাকে ঘিরে সরু ফিতেতে বাঁধা চৌকো ঘড়ি।

ঝুমার সাজটাজ নিয়ে ঠাট্টা করতে যাচ্ছিল বিনু। তার আগেই ঘাড়খানা বাঁকিয়ে গালে একটি হাত রেখে ঝুমাই বলে উঠল, 'বাবা, কী সাজটাই না সেজেছে! একেবারে বরবেশ।'

চমকে নিজের দিকে তাকাল বিনু। তার পরনে ধবধবে পাটভাঙা ধুতি, দুধরং সিল্কের পাঞ্জাবি, পায়ে নতুন পাম্প-শু। সাজসজ্জা তারও কিছু কম নয়। বিব্রত হেসে বিনু বলল, 'না, মানে—'

চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ঝুমা বলতে লাগল, 'যা সেজেছ, এখন কারোর সঙ্গে মালাবদল করিয়ে দিলেই হয়—'

বিনুর আড়ষ্টতা কেটে গিয়েছিল। হাসতে হাসতে বলল, 'আমার আপত্তি নেই। একজন যদি রাজি থাকে আজই—' বলে চোখের তারায় ইঙ্গিত করল।

ইঙ্গিতটা বুঝেছে ঝুমা। ঝঙ্কার দিয়ে বলল, 'আহা-হা, আহ্লাদ কত—'

বিনু হাসতেই লাগল।

ঝুমা আবার বলল, 'ওবেলা তোমাদের বাড়ি যাচ্ছি।'

'বরযাত্রীদের সঙ্গে?'

'হ্যাঁ, বাসর জাগব। তোমাকেও জাগতে হবে।'

'নিশ্চয়ই।'

'বাসরে তোমার কী হাল করি, দেখো।'

'দেখব।'

একটু ভেবে ঝুমা বলল, 'বাসর তো সেই রাত্রিবেলায়। তখন যা হবার হবে। এখন একটু মজা করি।'

বিনু ভয়ে ভয়ে বলল, 'কী করবে?'

উত্তর না দিয়ে ছুটে কোথায় চলে গেল ঝুমা। পরক্ষণেই ফিরে এসে বিনু কিছু বুঝবার আগেই এক গাদা হলুদ তার নাকে-মুখে, ধুতি-পাঞ্জাবিতে মাখিয়ে দিল।

বিনু বলতে লাগল, 'কী করছ! কী করছ!'

ঝুমা বলল, 'একদিন তো মাখতেই হবে। মাখলে কেমন লাগে আগেই দেখে নাও—'

গোধূলি লগ্নে বিয়ে। বেলা থাকতে থাকতে দুই বর এসে পড়ল। বেশিক্ষণ তাদের বসতে হল না, প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বিয়ের আসরে নিয়ে যাওয়া হল। সানাই ঢোল কাঁসি আর শাঁখের বাজনা, ঘন ঘন উলুধ্বনি—এর মধ্যে পর পর দুই মেয়েকে সম্প্রদান করলেন অবনীমোহন। সাত পাক ঘোরাবার সময় এয়োরা গান ধরল ঃ

'আমতলায় ঝামুর ঝুমুর কলাতলায় বিয়া,
আইল গো সুন্দরীর জামাই মুকুট
মাথায় দিয়া।
মুকুটের তলে তলে চন্দনের ফোটা।
চল সখী সবাই মিলা জামাই বরি গিয়া।
ও রাধে ঠমকে ঠমকে হাটে
শ্যামচাদের পাছে য্যামন ময়ূরে প্যাখম ধরে।
আগে যায় গো শ্যাম রাজা।
পাছে যায় গো রাধা,
তারও পাছে যায় গো পুরুত
ভৃঙ্গার হাতে লইয়া।
এক পাক, দুই পাক, তিন পাকও যায়,
সাত পাক দিয়া রাধা নয়ন তুইলা চায়।'

বিয়ের আসর থেকে সোজা বাসর ঘরে। পাশাপাশি দুই বাসর ঘর সাজানো হয়েছে। সেখানে শুধু মেয়েদের ভিড়। ঠাট্টা, ঠিসারা, বিদ্যুৎচমকের মতো হাসাহাসি, ঠেলাঠেলি—এর মধ্যেই দুই ঘরে চাল খেলা, যো-খেলা হয়ে গেল। তারপর শুরু হল জামাই নাজেহাল-করা ধাঁধা। ধাঁধার পর স্নেহলতা রঙ্গিণী মূর্তি ধরলেন। দুই বাসরে ঘুরে ঘুরে মাথায় আড়-ঘোমটা টেনে মাজা বাঁকিয়ে গাইতে লাগলেন ঃ

'ওগো বর, এলাম তোমার বাসরে।
একটা গান গাও না শুনি,
গান যদি না গাও, আমার নাতনীর
ধর পাও,
নহিলে মিলবে না সোনার চাঁদবদনী।'

এত ভিড়ের ভেতর ছুঁচের পেছনে সুতোটির মতো বিনুর পেছনে ঝুমা লেগেই আছে। আর ঝিনুক?

জল খেলা, চাল খেলা, ধাঁধা, নাচ গান, ঠাট্টা, রগড়—কিছুই যেন বুঝতে পারছিল না সে। পলকহীন সুমা আর ঝিনুর দিকে তাকিয়ে ছিল সে।

এ বিয়ের আরও একটি দিক আছে। সেটা এরকম। হেমনাথ রাজ্যসুদ্ধ লোককে নেমন্তন্ন করে আসেছিলেন, বিয়ে দেখার নেমন্তন্ন। কিন্তু খাবার জন্য তাদেরই ডেকেছিলেন যারা দেশজোড়া আকালে আর মন্বন্তরে একটু ফ্যানের আশায় রাজদিয়ার রাস্তায় রাস্তায় প্রেতমূর্তির মতো ঘুরে বেড়ায়।

সন্ধে থেকে হেমনাথ তাদের সামনে দাঁড়িয়ে তদারক করে খাওয়াচ্ছিলেন।

সকাল থেকে লারমোর এ বাড়িতে আছেন। তিনি বলছেন, 'এ কী করছ হেম! না খেয়ে খেয়ে ওদের পেট মরে গেছে। তার ওপর ভালমন্দ পড়লে আর দেখতে হবে না। সটান যমরাজার দরবারে গিয়ে হাজির হবে।'

হেমনাথ বলেছেন, 'এমনি মরবে, অমনিও মরবে। না খেয়ে মরে কী হবে, খেয়েই মরুক।'

খাওয়া দাওয়া যখন শেষ হয়ে এসেছে সেই সময় গদু চক্কোত্তি এসে হাজির। যুগলের বউভাতে সে এসেছিল, তারপর এই দেখা গেল। চেহারা খুব খারাপ হয়ে গেছে গদুর। বুকের হাড়গুলো গুনে নেওয়া যায়, চোখ এক ইঞ্চি ভেতরে ঢুকে গেছে।

হেমনাথ বললেন, 'তোমার এ কী হাল হয়েছে চক্কোত্তি!'

গদু চক্কোত্তি বলল, 'আর কইয়েন না হ্যাম কত্তা, না খাইয়া খাইয়া শরীল গ্যাল। যা আকাল পড়ছে হেয়াতে (তাতে) কেও আর খাইতে দ্যায় না। আগে মাইন্‌ষে আনন্দ কইরা খাওয়াইত, অহন আমারে দেখলে মুখ ফিরাইয়া লয়। যা দুদ্দশা, তাগোই বা দুষ (দোষ) কী?'

'সে তো ঠিকই। অনেক রাত হয়ে গেছে, হাত মুখ ধুয়ে খেতে বসে যাও।'

যুগলের বিয়ের সময় গদু চক্কোত্তি যা খেয়েছিল সুধা সুনীতির বিয়েতে তার তিনগুণ খেল। কিন্তু কে জানত, এই খাওয়াই তার শেষ খাওয়া।

যাই হোক, খেয়ে টেয়ে চলে গেল গদু চক্কোত্তি। দিন দুই পর খবর এল, এখান থেকে মাইল তিনেক দূরের এক গ্রামে ভেদবমি করে সে মারা গেছে।

সুধা সুনীতির বিয়ের মাসখানেক পর একদিন দুপুরবেলা ভয়ানক শ্বাসকষ্ট শুরু হল সুরমার। তক্ষুনি লারমোরকে ডেকে আনার জন্য করিমকে পাঠানো হল। কিন্তু লারমোর পৌঁছবার আগেই সব শেষ।

এ বছর পুজোর পর থেকেই শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছিলেন সুরমা। চলাফেরা দূরের কথা, উঠে বসবার শক্তিটুকু পর্যন্ত তাঁর ছিল না। অদৃশ্য রক্তচোষা দেহের সব সার যেন শুষে নিয়ে একটা বাজে সাদা কাগজের মতো সুরমাকে ফেলে রেখে গিয়েছিল।

এবাড়ির লোকেরা মনে মনে অনেক আগে থেকেই তৈরি হয়ে ছিল। বুঝতে পারছিল, সুরমা খুব বেশিদিন বাঁচবেন না। দ্রুত আলো নিবে আসার মতো তাঁর আয়ু ফুরিয়ে আসছিল। যা অনিবার্য, অপেক্ষাস্থায়ী, আজ দুপুরবেলা তাই ঘটে গেল।

খবর পেয়ে সুধা-সুনীতি-হিরণ-আনন্দ ছুটে এল। শুধু কি ওরাই, কুমোরপাড়া-কামারপাড়া-মুদীপাড়া-তেলিপাড়া, সারা রাজদিয়াই বা কেন, মৃত্যু-সংবাদ কানে যেতে চারদিকের গ্রামগঞ্জগুলো থেকে অসংখ্য মানুষ মলিন মুখে হেমনাথের বাড়ির দিকে আসতে লাগল।

সমস্ত বাড়িখানা জুড়ে কান্না ছাড়া আর কোনও শব্দ নেই। সুধা সুনীতি সুরমার অসাড় বুকে মুখ গুঁজে অবোধ শিশুর মতো কাঁদছিল, 'তুমি আমাদের ফেলে কোথায় গেলে মা!'

সুরমার শিয়রের কাছে বসে ছিলেন স্নেহলতা আর শিবানী। সজল চোখে, ভাঙা ভাঙা গলায় তাঁরা বলছিলেন, 'আমাদের কাঁদাবি বলেই কি এতদিন পর রাজদিয়ায় এসেছিলি মা!'

একধারে বসে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল ঝিনুক। আরেক ধারে হেমনাথ এবং অবনীমোহন ঘন ঘন হাতের পিঠে চোখ মুছছিলেন। তাঁদের চোখ ফোলা ফোলা, আরক্ত, জলপূর্ণ।

এত কান্নার মাঝখানে বিনু কিন্তু একটুও কাঁদতে পারছিল না। বুকের ভেতর পাষাণভারের মতো কী যেন চেপে আছে। চোখ ফেটে যাচ্ছে, কিন্তু এক ফোঁটা জলও বেরুচ্ছে না। এত লোকজন, এত কান্না, শোকোচ্ছ্বাস—কিছুই যেন শুনতে পাচ্ছিল না সে। কিছুই দেখতে বা বুঝতে পারছিল না। বিনুর সমস্ত অনুভূতি বুঝিবা অসাড় হয়ে গেছে।

দেখতে দেখতে বিকেল হয়ে গেল।

ওদিকে কারা যেন কুড়োল দিয়ে বাগানের বুড়ো একটা আমগাছ কেটে ছোট ছোট খন্ড করে ফেলল। তারপর পুকুরের ওপারে উঁচুমতো জায়গাটায় চিতা সাজাল।

এদিকে স্নেহলতা সিঁদুরে-চন্দনে এবং রাশি রাশি ফুলে সুরমাকে সাজিয়ে দিলেন। তারপর কারা যেন হরিধ্বনি দিয়ে তাঁকে কাঁধে তুলে পুকুরপাড়ের দিকে নিয়ে গেল। হেমনাথ বিনুর একটা হাত শক্ত করে ধরে শবযাত্রীদের সঙ্গে সঙ্গে চললেন। সুধা-সুনীতি-স্নেহলতা-শিবানী-অবনীমোহন—কেউ বাড়িতে থাকল না। সবাই চলেছে আর অভিভূতের মতো বুক ফাটিয়ে কাঁদছে।

বিনুর মনে হল, সে যেন মাটির ওপর দিয়ে হাঁটছে না, হাওয়ার ভেতরে ভারহীন হালকা শরীর নিয়ে ভাসতে ভাসতে যাচ্ছে।

চিতায় তুলবার আগে সুরমাকে স্নান করিয়ে নতুন কাপড় পরানো হল, পুরুত জোরে জোরে মন্ত্র পড়ে যাচ্ছিল। শব্দগুলো কানে আসছিল ঠিকই, কিন্তু কিছুই বুঝতে পারছিল না বিনু।

একটু পর সুরমাকে চিতায় তোলা হল। এবার মুখাগ্নির পালা। বিনুকেই তা করতে হবে। কে যেন সাদা ধবধবে একগোছা পাটশোলার মাথায় আগুন ধরিয়ে তার হাতে দিল। হেমনাথ তাকে ধরে চিতার চারধারে প্রদক্ষিণ করাতে লাগলেন। পুরুতটা মন্ত্র পড়তে পড়তে আগে আগে চলতে লাগল। বিনুর মনে হতে লাগল, তার চারপাশে সমস্ত চরাচর যেন দুলছে।

চিতাটাকে ক'বার প্রদক্ষিণ করেছে, বিনু মনে করতে পারল না। একসময় পুরুতের কথায় মন্ত্রচালিতের মতো সুরমার মুখে পাট কাঠির আগুন ছোঁয়াল।

শবযাত্রীরা চারদিক থেকে চিৎকার করে বলতে লাগল, 'বল হরি—'

'হরি বোল—'

তারপরেই চিতার আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল।

কতক্ষণ আর? চৈত্র মাসের রাত গাঢ় হবার আগেই সুরমার রুগ্‌ণ শীর্ণ দেহ চিতাধূমে বিলীন হয়ে গেল।

আগুন নিবে গেলে চিতা ধুয়ে শবযাত্রীরা পুকুরঘাটে স্নান করল। বিনুকেও স্নান করানো হল, তারপর নতুন কোরা কাপড়ের তেউনি পরানো হল তাকে, গলায় লোহার চাবি-বাঁধা দড়া ঝুলিয়ে দেওয়া হল, হাতে দেওয়া হল একটুকরো কম্বলের আসন।

পরদিন থেকে শুরু হল হবিষ্যি। ঘরের এক কোণে নিজের হাতে নতুন মালসায় আলো চালের একসেদ্ধ ভাত রাঁধে বিনু। কাছে বসে সজল চোখে দেখিয়ে দেন স্নেহলতা। রাতে একটু দুধ আর ফলটল খেয়ে খালি মেঝেতে এক টুকরো নতুন কাপড় পেতে শুয়ে পড়ে।

রাজদিয়ার সব বাড়ি থেকে হবিষ্যির উপকরণ পাঠাচ্ছে—আলো চাল, কাঁচা দুধ, সর বাটা ঘি, আলু, কাঁচকলা ইত্যাদি।

দেখতে দেখতে শ্রাদ্ধ চুকে গেল। শ্রাদ্ধের পরদিন মৎস্যমুখী। রাজদিয়ার হেন মানুষ নেই যে সুরমার শ্রাদ্ধে না এসে পেরেছে।

বিনুদের সংসারে এই প্রথম মৃত্যু। একটি মৃত্যুই বিনুর চোখে জগতের রূপ একেবারে বদলে দিয়ে গেছে।

এখন, এই চৈত্র মাসে হিজলগাছগুলো ফুলে ফুলে ছেয়ে যেতে শুরু করেছে। কাউগাছের ডালে ডালে গুটি ধরেছে। মান্দার আর শিমুল গাছগুলো সারা গায়ে থোকা থোকা আগুনের মতো লাল টুকটুকে ফুল ফুটিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। বাগানের আমগাছগুলোতে গাঢ় সবুজ রঙের আম লম্বা বোঁটায় সারাদিন দোল খাচ্ছে। পরিষ্কার করে মুছে দেওয়া আয়নার মতো আকাশটা ঝকমকে। সকালে-দুপুরে-বিকেলে, পুকুরের ওপারে শূন্য মাঠের ওপর কত রকমের পাখি যে উড়তে থাকে—কানিবক, পানিকাউ,

BanglaBook.org

টিয়া, বুলবুলি, ধবধবে গো-বক।

যেদিকেই চোখ ফেরানো যাক, এখন শুধুই রঙের সমারোহ। লালে নীলে সবুজে অপরূপ এই বসুন্ধরা বিনুকে আজকাল আর আকুল করে না। যুগল চলে যাবার সময় ধানের খেত, শাপলা বন, জলসেঁচি শাকের ঘন জঙ্গল, উলু খড়ের বন, কেয়া ঝোপ, বেত ঝোপ, বনতুলসীর চাপ চাপ অরণ্য—জল-বাংলার সজল শ্যামল ভূখন্ডের সবটুকুর উত্তরাধিকার তার হাতে তুলে দিয়ে গিয়েছিল। এই সেদিনও একা একা শূন্য মাঠে আলপথ ধরে মোহাচ্ছন্নের মতো হেঁটে যেতে তার ভাল লাগত। আকাশ জুড়ে ফিনফিনে পাতলা ডানায় ফড়িংদের ওড়াওড়ি দেখতে দেখতে মুগ্ধ হয়ে যেত। চনচনে সোনালি রোদ, উলটোপালটা বাতাস, গাছপালা, বনানী, নরম তৃণদল—সব যেন জাদুকরের মতো তাকে সম্মোহিত করে ফেলত।

কিন্তু আজকাল সারা দিনই প্রায় পুবের ঘরের পৈঠেয় চুপচাপ বসে থাকে বিনু। পুকুরের ওপারে ধু ধু দক্ষিণের চক, অনেক দূরের দিগন্ত, আকাশ, বনভূমি—সব মিলিয়ে যেন এক অপরিচিত মহাদেশ। ওখানকার কোনও কিছুই সে জানে না, চেনে না। কোনওদিন ওখানে সে যেন যায় নি, যাবার আকর্ষণও বোধ করে না।

দিনের বেলায় একটা দৃশ্য প্রায়ই চোখে পড়ে বিনুর। সুরমাকে যেখানে পোড়ানো হয়েছে তার পাশেই উঁচু বাজে-পোড়া সুপারি গাছটার মাথায় সমস্ত দিন একটা শঙ্খচিল ডানা মুড়ে বসে থাকে, সন্ধে হলেই পাখিটা উড়ে যায়।

শুধু দিনের বেলাতেই না, রাত্তিরেও ওই পৈঠেটিতে বসে থাকে বিনু। তার চোখের সামনে একটি দু'টি করে তারা ফুটতে ফুটতে সমস্ত আকাশ ছেয়ে যায়। একসময় চাঁদও ওঠে।

রাজদিয়ায় আসায় পর হেমনাথ তাকে নক্ষত্র চিনিয়েছিলেন। ওই তারটা অরুন্ধতী, ওইটা লুব্ধক, ওইটা শতভিষা। ছেলেবেলায় মায়ের কছে বিনু শুনেছিল, মানুষ মরে গেলে নাকি আকাশের তারা হয়ে যায়। ওই সুদূর জ্যোতিষ্কলোকের কোন তারাটি তার মা, কে জানে।

প্রায় রোজই ঝিনুক তার পাশে এসে নিঃশব্দে বসে পড়ে। কখন যে মেয়েটা আসে, টেরও পাওয়া যায় না। হঠাৎ একসময় আধফোটা ঝাপসা গলায় সে ডেকে ওঠে, 'বিনুদা—'

বিনু মুখ ফেরায় না। উদাস গলায় বলে, 'কী বলছ?'

'পিসিমার জন্যে তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে, না?'

বিনু চুপ।

ঝিনুক আবার বলল, 'জানো বিনুদা, মায়ের জন্যে আমারও খুব কষ্ট হয়।'

হঠাৎ বিনু ভাবে, ঝিনুকের সঙ্গে এক জায়গায় তার ভারি মিল। মেয়েটাকে বড় আপনজন মনে হয়।

সুরমার মৃত্যুর কারণে অনেক দিন স্কুল কামাই হয়েছে। প্রায় মাসখানেক পর আজ স্কুলে গেল বিনু।

সেটেলমেন্ট অফিসের কাছে আসতে ঝুমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। আচমকা বিনুর মনে পড়ল, মায়ের মৃত্যুর পর রাজদিয়ার সব মানুষ তাদের বাড়ি গেছে। শুধু ঝুমা বাদ।

ঝুমা বলল, 'তুমি খুব রোগা হয়ে গেছ বিনুদা।'

অবছা কী উত্তর দিয়ে বিনু বলল, 'মা স্বর্গে গেল। তুমি তো আমাদের বাড়ি একদিনও এলে না?'

দুই হাত এবং মাথা জোরে জোরে নেড়ে ঝুমা বলল, 'তোমাদের বাড়ি গেলেই তো কান্নাকাটি, ও সব আমার ভাল লাগে না।'

পলকে মুখখান মলিন হয়ে গেল বিনুর। মনে হল, ঝুমা বড় দূরের মানুষ।

সুরমার মৃত্যুর মাস দুই পর সুনীতিকে নিয়ে আনন্দ কলকাতায় চলে গেল। তাদের সঙ্গে শিশিররাও গেলেন। কলকাতার অবস্থা নাকি এখন ভাল। জাপানি বোমার ভয়ে যারা পালিয়ে গিয়েছিল তারা সব ফিরে যেতে শুরু করেছে সেখানে।

যাবার আগের দিন সুনীতিরা দেখা করতে এসেছিল। ঝুমাও এসেছিল ওদের সঙ্গে।

আড়ালে ডেকে নিয়ে ঝুমা বিনুকে বলেছে, 'আমরা যাচ্ছি। কলকাতায় গিয়ে চিঠি দেব। **তুমিও** কিন্তু চিঠি লিখবে।'

আস্তে ঘাড় কাত করেছে বিনু।

সুনীতিরা চলে যাবার পর দু'টো সপ্তাহও কাটল না। একদিন **সকালবেলা হিরণ এসে হাজির।**

হেমনাথ বাড়িতেই ছিলেন। বললেন, 'কী ব্যাপার হিরণচন্দ্র?'

'একটা কথা ছিল দাদু—'

'নির্ভয়ে বলে ফেল।'

খানিক ইতস্তত করে ঘাড় চুলকোতে চুলকোতে হিরণ বলল, 'আমি কলকাতায় একটা ভাল চাকরি পাচ্ছি দাদু—'

হেমনাথের ভুরু কুঁচকে গেল, 'কিসের চাকরি?'

'ওয়ারের। অফিসার র‍্যাঙ্কের চাকরি। নেব?' হিরণের চোখ চকচক করতে লাগল।

হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠলেন হেমনাথ, 'ওয়ারের চাকরি নিবি বলেই কি তোকে লেখাপড়া শিখিয়েছিলাম? তুই চলে গেলে কলেজের কী হবে? ছি ছি, লোভটাই বড় হল!'

হিরণের মুখ কালো হয়ে গেল।

এর পর অনেকক্ষণ গুম হয়ে বসে থাকলেন হেমনাথ। বুঝলেন, হিরণকে আটকাবার চেষ্টা বৃথা। যুদ্ধের চাকরি তার অসীম শক্তি দিয়ে হিরণকে রাজদিয়া থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবেই। এক সময় গম্ভীর গলায় হেমনাথ বললেন, 'ইচ্ছা যখন হয়েছে, যাও। তবে এতে আমার ভীষণ আপত্তি—'হেমনাথকে খুবই ক্লান্ত দেখাচ্ছে। খুবই হতাশ আর করুণ।

দিনকয়েক পর সুধাকে নিয়ে কলকাতায় চলে গেল হিরণ।

দেখতে দেখতে আরও ক'মাস কেটে গেল।

সুরমা নেই। সুধা সুনীতি চলে গেছে। হেমনাথের বাড়িটা এখন নিঝুম। কিছুদিন আগেও হই চই, হুল্লোড় এবং জীবনের নানা প্রাণবন্ত খেলায় এ বাড়িতে সব সময় উৎসব লেগে থাকত। এখন বাড়িটা ঘিরে অপার শূন্যতা নেমে এসেছে যেন।

মাঝে মাঝে শিবানী আর স্নেহলতা সুরমার জন্য বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদেন। অবনীমোহন আর হেমনাথ উদাস চোখে আকাশের দিকে তাকিয়ে বসে থাকেন।

এখন বর্ষা।

মেঘ-বৃষ্টি-বাজ আর ঘন ঘন বিদ্যুৎচমক—চতুরঙ্গে আকাশ সারাদিন সেজেই আছে। ক'বছর ধরেই বিনু দেখেছে, বর্ষা নামলেই পুকুরের ওপারের মাঠ ভেসে যায়। তার মাঝখানে কৃষাণ-গ্রামগুলো দ্বীপের মতো কোনওরকমে মাথা তুলে থাকে। মাটির তলায় কোথায় যে শাপলা শালুক আর পদ্মের বীজ লুকিয়ে থাকে, কে বলবে। জল পড়লেই লাফ দিয়ে তারা বেরিয়ে আসে। সাদা সাদা শাপলা ফুলে, থালার মতো বড় বড় গোল পদ্মপাতায় আর লাল টুকটুকে শালুকে জলপূর্ণ চরাচর ছেয়ে যায়। গাঢ় সবুজ রঙের ধান আর পাটের চারাগুলো বর্ষার জলের ওপর দিয়ে মাথা তুলে থাকে। মাঝে মাঝে এক আধটা নিঃসঙ্গ বউন্যা গাছ, কোথাও বা হিজলের সারি।

এবারও তার ব্যতিক্রম নেই। উত্তরে-দক্ষিণে-পুবে-পশ্চিমে, যেদিকেই তাকানো যাক, চোখ জুড়ে বর্ষার সেই পরিচিত জলছবি।

সেদিন সন্ধেবেলা বিনু আর ঝিনুক পুবের ঘরে পড়তে বসেছিল। সামনে আড়াই-তলা পিলসুজে রেড়ির তেলের প্রদীপ জ্বলছে। অবনীমোহন এবং হেমনাথও এ ঘরেই ছিলেন। আজকের স্টিমারে যে খবরের কাগজখানা এসেছে, দু'জনে ভাগাভাগি করে পড়ছেন। সুরমার মৃত্যুর পর কাগজ নিয়ে

pathagar.net

আজকাল আর এ বাড়িতে আসর বসে না।

বাইরে অল্প অল্প বৃষ্টি পড়ছিল। হঠাৎ ঝুমঝুম আওয়াজে বিনুরা মুখ তুলে তাকাল।

চোখের সামনে থেকে কাগজ নামিয়ে হেমনাথ বললেন, 'এই বৃষ্টিতে আবার কে এল?'

ততক্ষণে বিনু দেখতে পেয়েছে। উঠোনের মাঝখানে ঝিনুকদের ফিটনটা এইমাত্র এসে থামল।

বিনু বলল, 'মনে হচ্ছে, ভবতোষ মামা এসেছেন—'

সত্যি, ভবতোষই। একটু পর তিনি ঘরের দরজায় এসে দাঁড়ালেন।

ভবতোষের দিকে তাকিয়ে সবাই চমকে উঠল। চুল এলোমেলো, চোখ দু'টো লাল টকটকে এবং ফুলে ফুলে অস্বাভাবিক বড় হয়ে গেছে। মনে হয়, যে কোনও সময় সে দু'টো ফেটে ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটবে। চোখের কোলে গাঢ় কালির ছাপ, কণ্ঠার হাড় ফুঁড়ে বেরিয়েছে। জামার বোতাম নেই, বুকটাও হাট করে খোলা, কোঁচার দিকটা অনেকখানি খুলে মাটিতে লুটোচ্ছে।

কেউ কিছু বলবার আগেই ভাঙা ভাঙা, ঝাপসা গলায় ভবতোষ বললেন, 'কাকাবাবু, আপনার বউমা সেই লোকটার সঙ্গে পালিয়ে গেছে—' তাঁর চোখ থেকে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়তে লাগল।

হেমনাথ চকিত হলেন, 'সে কী! বউমা তার বাপের বাড়ি ছিল না?'

'হ্যাঁ। ওখান থেকেই গেছে। আচ্ছা আমি যাই—' বলেই প্রায় ছুটতে ছুটতে ফিটনটায় গিয়ে উঠলেন।

হেমনাথ বিমূঢ়ের মতো একটুক্ষণ বসে থাকলেন। তারপর লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে ডাকতে লাগলেন, 'ভব—ভব—'

ভবতোষ সাড়া দিলেন না। ঝুমঝুম আওয়াজ কানে ভেসে এল। অর্থাৎ ফিটনটা চলতে শুরু করেছে।

কী করবেন, হেমনাথ যেন ভেবে পেলেন না। হঠাৎ তাঁর চোখ এসে পড়ল বিনুর ওপর। দ্রুত শ্বাসটানার মতো করে বললেন, 'যা তো দাদা, ভব'র সঙ্গে যা। ছেলেটা আবার ঝোঁকের মাথায় এক কান্ড না করে বসে! সব সময় ওর কাছে থাকবি। যদি তেমন বুঝিস, আজ রাত্তিরে আর ফিরতে হবে না।'

বিনু ছুটে গিয়ে যখন ফিটনটা ধরল, সেটা বাগান পেরিয়ে রাস্তার ওপর চলে এসেছে।

ভবতোষ বললেন, 'এই বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে তুমি আবার এলে কেন?'

বিনু ভয়ে ভয়ে বলল, 'দাদু পাঠিয়ে দিলেন।'

শব্দ করে অদ্ভুত হাসলেন ভবতোষ, 'কাকাবাবুর ভয়, আমি বুঝি আত্মহত্যা করব। তা বোধহয় করব না। আচ্ছা, এসেছ যখন, ওঠ—'

বিনু গাড়িতে উঠল।

তারপর চমকপ্রদ ব্যাপারটা ঘটল। পথে যত বাড়ি পড়ল সব জায়গায় গাড়ি থামিয়ে জড়িত ভাঙা গলায় স্ত্রীর চলে যাবার কথা বলতে লাগলেন ভবতোষ। মানুষের বেদনা প্রকাশের রূপ কী বিচিত্র!

সারা রাজদিয়ায় ঘুরে ভবতোষ যখন তাঁর বাড়ি ফিরলেন তখন অনেক রাত। বাকি রাতটুকু কেউ আর ঘুমলো না। বিনুকে সামনে বসিয়ে সমানে স্ত্রীর কথা বলে যেতে লাগলেন ভবতোষ। সমস্ত শুনে বিনু যা বুঝল, সংক্ষেপে এইরকম।

বিয়ের আগেই ঝিনুকের মায়ের সঙ্গে একজনের ভালবাসা ছিল। তা সত্ত্বেও তাঁর বাপ-মা একরকম জোর করেই ভবতোষের সঙ্গে তাঁর বিয়ে দিয়েছেন। এ বিয়ে মেনে নিতে পারেন নি ঝিনুকের মা, সংসারে নিয়ত ঝগড়াঝাঁটি, অশান্তি লেগেই ছিল। পরিণামে একদিন তিনি বাপের বাড়ি ফিরে গেলেন। আজ সকালে খবর এসেছে, ভালবাসার সেই লোকটির সঙ্গে তিনি চলে গেছেন।

সমস্ত রাত ভবতোষের কাছে কাটিয়ে সকালবেলা বাড়ি ফিরল বিনু। ফিরেই দেখল, একা একা বসে ঝিনুক কাঁদছে।

থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল বিনু। ঝিনুককে দেখতে দেখতে মমতায় তার মন ভরে যেতে লাগল। অনেকক্ষণ পর আস্তে আস্তে ঝিনুকের পাশে গিয়ে বসল সে। খুব কোমল গলায় বলল, 'কেঁদো না ঝিনুক, কেঁদো না—'

দু'হাতে মুখ ঢেকে ঝিনুক ফোঁপাতে লাগল, 'আমার মা চলে গেছে।'

বিনু বলল, 'আমার কথা একবার ভাবো তো, আমারও মা নেই।'

মুখ থেকে হাত সরিয়ে জলভরা গভীর চোখে বিনুর দিকে তাকাল ঝিনুক।

আরও একটা বছর ঘুরে গেল।

এর মধ্যে বিনু ম্যাট্রিক পাস করে রাজদিয়া কলেজে ভর্তি হয়ে গেছে। ঝিনুক ক্লাস নাইনে পড়ছে।

সুরমার মৃত্যুর পর অনেক দিন এই বাড়ির ওপর দিয়ে উদাস হাওয়া বয়ে যাচ্ছিল। তখন বিনুর মনে হত, পৃথিবীর আহ্নিক গতি, বার্ষিক গতি বুঝি চিরদিনের জন্য থেমে গেছে। মনে হত, চোখের সামনের দৃশ্যময় জগতের কোথাও উজ্জ্বল রং নেই। সব দীপ্তিহীন, ধূসর হয়ে গেছে।

ধীরে ধীরে দুঃখের তীব্রতা কমে এসেছে। শোকটা এখন আর অনুভূতিতে নেই, স্মৃতি হয়ে গেছে।।

সুধা নেই, সুনীতি নেই, সুরমা মৃত। একদিন এই বাড়িটা ঘিরে সব সময় যেন উৎসব লেগে থাকত। হিরণ আসত, আনন্দ আসত, রুমা-ঝুমারা আসত। জাপানি বোমার ভয়ে যারা দেশে পালিয়ে এসেছিল, তারা আসত। গান-বাজনা-নাটক এবং হুল্লোড়ে বাড়িটা গমগম করত।

ভরা কোটালের পর প্রবল ভাটার টানে সবাই অদৃশ্য হয়ে গেছে। বাড়িটা আজকাল আশ্চর্য নিঝুম। যেদিকেই চোখ ফেরানো যাক, শুধুই শূন্যতা।

সুধা সুনীতি সেই যে কলকাতায় চলে গিয়েছিল, তারপর আর রাজদিয়ায় আসে নি। মাঝে মাঝে এক আধখানা চিঠি লিখে সম্পর্কটা টিকিয়ে রাখছে শুধু।

সুধা সুনীতির কথা থাক, নতুন সংসার পেয়ে তারা বিভোর হয়ে আছে। এখান থেকে যাবার পর ঝুমাটা খুব চিঠি লিখত বিনুকে—সপ্তাহে দু'টো করে। কবে থেকে চিঠি আসা কমতে কমতে একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে, বিনু লক্ষ করে নি।

সময়টা জ্যৈষ্ঠের শেষাশেষি। বাগানের আমগাছগুলো কবেই নিঃস্ব হয়ে গেছে, ডালে ডালে পাতা ছাড়া আর কিছুই নেই। কালোজাম, গোলাপজাম, রোয়াইল আর লটকা ফলের গাছগুলোরও এক অবস্থা। শুধু আষাঢ়ে আমগাছগুলো সারা গায়ে কিছু কিছু ফল সাজিয়ে রেখেছে। তবে বেতঝোপের দিকে তাকালে চোখ জুড়িয়ে যায়, হালকা বাদামি রঙের গোল গোল থোকা থোকা বেতফলে ঝোপগুলো ছেয়ে আছে।

গরম শেষ হয়ে এল। এর মধ্যেই আকাশ জুড়ে কালো কালো ভবঘুরে মেঘেরা হানা দিতে শুরু করেছে। ক'দিন আর? আষাঢ় মাস পড়লেই মেঘের টুকরোগুলো ঘন হয়ে, জমাট বেঁধে, চরাচর ছেয়ে ফেলবে। তারপর শুরু হবে বর্ষা। আকাশ থেকে লক্ষ কোটি বৃষ্টির ধারা সারাদিন ধরে, সারারাত ধরে শুধু নামতেই থাকবে।

চৈত্র বৈশাখে যে মাঠ ফেটে চৌচির হয়ে গেছে, নতুন বর্ষা তাদের জুড়িয়ে দেবে। তপ্ত, তৃষিত বসুন্ধরা স্নিগ্ধ সরস হতে থাকবে। চারদিকে বর্ষা তার সজল ছায়া ফেলতে শুরু করেছে।

একদিন দুপুরে অবনীমোহন কোথায় যেন গিয়েছিলেন। সন্ধেবেলা ফিরে এসে হেমনাথকে বললেন, 'মামাবাবু একটা কথা বলছিলাম—'

হেমনাথ আর বিনু পুবের ঘরে বসে ছিল। স্নেহলতা এইমাত্র এ ঘরে আলো জ্বালিয়ে দিয়ে গেছেন।।

জিজ্ঞাসু চোখে তাকালেন হেমনাথ, 'কী কথা অবনী?'

কিছুক্ষণ ইতস্তত করে অবনীমোহন বললেন, 'আমি আসাম যাব।'

'হঠাৎ আসাম!' হেমনাথ অবাক।

হেমনাথ বলতে লাগলেন, 'ক'দিনের মধ্যে বৃষ্টি নেমে যাবে। জমিতে হাল-লাঙল নামাতে হবে। এ সময় তুমি আসাম যেতে চাইছ!'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, মানে—'

'কী?'
'এ বছর আমি চাষ করব না।'
'তবে জমির কী হবে?'
'ভাবছি বর্গাদারদের কাছে ভাগচাষে দিয়ে দেব।'
কিছুক্ষণ নীরবতা। তারপর হেমানথ বললেন, 'আসাম থেকে ফিরছ কবে?'
'কিছু ঠিক নেই।'
'ওখানে যাবার কী কারণ ঘটল, বুঝতে পারছি না তো!'
'আমি একটা কনট্রাক্ট পেয়েছি।'
'কিসের কনট্রাক্ট?'
'মিলিটারির।'
'মিলিটারির!'
'হ্যাঁ—'
'কই, আমাকে আগে কিছু বলনি তো—'
'আজই পেলাম, আগে বলব কী করে?' অবনীমোহন হাসলেন।
হেমনাথ বললেন, 'কনট্রাক্ট তো নিয়েছ। আসামে গিয়ে কী করতে হবে?'
'মিলিটারিদের জন্যে রাস্তাঘাট আর পাহাড়ের ওপর ব্যারাক ট্যারাক তৈরি করতে হবে।'
'তোমার ওসব কাজের অভিজ্ঞতা আছে?'
'বিন্দুমাত্র না।'
'তা হলে?'
'করতে করতেই অভিজ্ঞতা হয়ে যাবে।'
হেমনাথ বিমূঢ়ের মতো তাকিয়ে থাকলেন।
অবনীমোহন বলতে লাগলেন, 'রাজদিয়ায় আসবার আগে চাষ-আবাদের কিছু কি জানতাম? করতে করতেই শিখে গেলাম।'
হেমনাথ এবারও কী উত্তর দেবেন, ভেবে পেলেন না।
অবনীমোহনের দিকে পলকহীন তাকিয়ে ছিল বিনু। বাবাকে সে চেনে। তাঁর মধ্যে কোথায় যেন একটা চঞ্চল যাযাবরের বাস, দু'টো দিনও সেটা তাঁকে স্থির থাকতে দেয় না, নিয়ত ছুটিয়ে নিয়ে বেড়ায়।
যৌবনের শুরু থেকে কত কী-ই তো করছেন অবনীমোহন। অধ্যাপনা-ব্যবসা-চাকরি—একটা ধরেছেন, আরেকটা ছেড়েছেন। নির্ভর করার মতো কিছু হাতে পেলে মানুষ সেটা ঘিরেই জীবনকে সাজিয়ে তোলে। অবনীমোহনের স্বভাব আলাদা। অনিশ্চয়তার ভেতর ছুটে বেড়ানোতেই তাঁর যত আনন্দ।
এই প্রৌঢ় বয়সে বসুন্ধরার এক কোণে অনেকখানি ভূমি পেয়েছেন তিনি, চারদিক শস্যে-স্বর্ণে পরিপূর্ণ। কোথায় পা পেতে বসে বাকি জীবন কাটিয়ে দেবেন, তা নয়। রক্তের ভেতরে সেই যাবাবরটা তাঁকে চঞ্চল করে তুলেছে।
তিন চার বছরের মতো রাজদিয়া তাঁকে মুগ্ধ, সম্মোহিত করে রেখেছিল। জল-বাংলার এই সরস শ্যামল জায়গাটার আর সাধ্য নেই অবনীমোহনকে ধরে রাখে। তার সম্মোহনের শক্তি ব্যর্থ হয়ে যেতে শুরু করেছে।
দিনকয়েক পর অবনীমোহন আসাম চলে গেলেন।

অবনীমোহন চলে যাবার পর সময় যেন ঝড়ের গতিতে ছুটতে লাগল। যুদ্ধের প্রথম দিকে দুর্ধর্ষ জার্মান বাহিনী সমস্ত পৃথিবীকে পায়ের নীচে নামিয়ে এনেছিল। এখন তারা পিছু হটছে। দিকে দিকে শোনা যাচ্ছে মিত্রশক্তির জয়ধ্বনি।
একদিন খবর এল, লাল ফৌজ বার্লিনে ঢুকে পড়েছে এবং জার্মানি আত্মসমর্পণ করেছে। পূর্ব গোলার্ধে এখনও আসর জমজমাট। হঠাৎ আরেক দিন খবর এল, হিরোসিমা নাগাসাকিতে পরমাণু

বোমা পড়েছে। এবং এই দু'টি বোমাই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ওপর যবনিকা টেনে দিল।

অবনীমোহন সেই যে খবরের কাগজ আনার ব্যবস্থা করে গিয়েছিলেন, এখনও তা চলছে। তিন মাস পর পর হেমনাথ টাকা পাঠিয়ে দেন, ডাকে খবরের কাগজ চলে আসে।

একদিন বিনু দেখল, প্রথম পাতা জুড়ে বড় বড় অক্ষরে খবর বেরিয়েছে ঃ

'বিশ্বযুদ্ধের অবসান ঃ মিত্রপক্ষের নিকট জাপানের আত্ম-সমর্পণ ঃ জাপ সম্রাটের ঘোষণা।'

'পটাসডাম ঘোষণার সমস্ত শর্ত স্বীকার। মিকাডো কর্তৃক পারমাণবিক বোমার ধ্বংসলীলার কথা উল্লেখ।'

'প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান ও মিস্টার এটলির বিবৃতি। প্রশান্ত মহাসাগরীয় মিত্রপক্ষ বাহিনীর প্রতি যুদ্ধ বন্ধ করার আদেশ।'

'নিউইয়র্ক, ১৫ই আগষ্ট—সম্রাট হিরোহিতো অদ্য বেতারে সরাসরি জাপ জাতির উদ্দেশে এক বক্তৃতায় বলেন যে, পটাসডাম চরমপত্র গ্রহণ করা হইয়াছে। জাতির উদ্দেশে সম্রাটের সরাসরি বক্তৃতা এই প্রথম।'

একধারে ছোট হরফে আরেকটা খবর রয়েছে।

'পরাজিত জাপানের প্রতি মিত্রপক্ষের প্রথম আদেশ জারি। জেনারেল ম্যাক আর্থারের প্রতি দূত প্রেরণের নির্দেশ। সামরিক গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলি মিত্রবাহিনী কর্তৃক দখলের আয়োজন।'

তার তলায় আরেকটা খবর।

'জাপানি সমর সচিবের আত্মহত্যা। যুদ্ধে পরাজয়ের জের।'

'লন্ডন, ১৫ই আগষ্ট—জাপানি নিউজ এজেন্সির খবরে প্রকাশ যে, জাপানের সমর সচিব কোরেচিকা আনামি গতরাত্রে তাঁর সরকারি বাসভবনে আত্মহত্যা করেছেন।'

কোথায় গ্রেট ব্রিটেন, কোথায় আমেরিকা, কোথায় নরওয়ে, কোথায়ই বা ফ্রান্স আর রাশিয়া। মিত্রবাহিনী জেতার ফলে সে সব জায়গায় নাকি উৎসবের স্রোত বয়ে যাচ্ছে। যুদ্ধজয়ের ঢেউ অখ্যাত নগণ্য রাজদিয়াতেও এসে পড়ল।

মিলিটরি ব্যারাকগুলো আলোর মালা দিয়ে সাজানো হয়েছে। রঙিন কাগজ দিয়ে বড় বড় তোরণ তৈরি করা হয়েছে। সেগুলো থেকে লাল-নীল কাগজের ঠোঙায় অসংখ্য লণ্ঠন ঝুলছে। আর উড়ছে পতাকা—মিত্রশক্তির সবগুলো দেশের পতাকা রাজদিয়ার আকাশে সগর্বে মাথা তুলে আছে।

যুদ্ধজয়ের আনন্দে সারাদিনই ব্যারাকগুলোতে হুল্লোড় চলছে। নাচ গান আর অবিরাম জ্যাজ বাজনার শব্দে রাজদিয়ার স্নায়ু বুঝি ছিঁড়েই পড়বে। নারায়ণগঞ্জ-ঢাকা-মানিকগঞ্জ থেকে কত যুবতী মেয়ে যে আনা হয়েছে তার লেখাজোখা নেই। তা ছাড়া, মদের ঢল বয়ে যাচ্ছে। মিলিটারি ব্যারাকের একটি প্রাণীও এখন সুস্থ বা স্বাভাবিক নেই। দিবারাত্রি নেশার ঘোরে আচ্ছন্ন।

মাসখানেক প্রমত্ত উৎসব চলল। তারপর একদিন রাজদিয়াবাসীরা দেখতে পেল, ধূসর রঙের সেই বড় স্টিমারটা এসে জেটিঘাটে ভিড়েছে। বিশাল জলপোকার মতো এই স্টিমারে করেই নিগ্রো আর আমেরিকান টমিরা রাজদিয়ায় এসেছিল। তাদের লরি-ট্রাক-কামান-বন্দুক গোলাগুলি এবং অসংখ্য সাজ-সরঞ্জাম এসেছিল।

যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে। রাজদিয়াবাসীরা এবার দেখল, জিপ-ট্রাকের চাকাটাকা খুলে এবং বড় বড় লোহার পেটিতে অস্ত্রশস্ত্র বোঝাই করে স্টিমারে তোলা হচ্ছে। একদল টমিও স্টিমারে উঠল।

সকালের দিকে স্টিমারটা এসেছিল, বিকেলে চলে গেল।

এরপর থেকে একদিন পর পর সকালবেলা স্টিমারটা রাজদিয়ায় আসতে লাগল। এবং যুদ্ধের সরঞ্জাম আর একদল করে টমি নিয়ে চলে যেতে লাগল। দশ দিনের ভেতর চারদিক ফাঁকা হয়ে গেল। যুদ্ধের স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে প্রাগৈতিহাসিক যুগের অতিকায় প্রাণীর কঙ্কালের মতো রাজদিয়া জুড়ে পড়ে থাকল কতকগুলো শূন্য ব্যারাক এবং লম্বা পিচের রাস্তা।

যুদ্ধের মাঝামাঝি দু'তিনটে বছর রাজদিয়ার জীবন খুব চড়া তারে বাজছিল, আবার পুরনো স্তিমিত ঢিমে তালের দিনযাপনের মধ্যে ফিরে গেল সেটা।

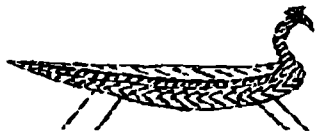

যুদ্ধের শেষ দিকে বিস্ময়কর একটা খবর এসেছিল—সুভাষচন্দ্রের খবর।

বিনুর মনে পড়ে, তারা রাজদিয়া আসার কিছুদিন পর সুভাষচন্দ্র কলকাতার বাড়িতে অন্তরীণ হয়ে ছিলেন। সেই অবস্থাতেই একদিন তাঁকে পাওয়া গেল না। সমস্ত দেশ স্তম্ভিত বিস্ময়ে শুনল, ইংরেজদের সতর্ক বিনিদ্র পাহারার মধ্যে দিয়ে তাঁর রহস্যময় অন্তর্ধান হয়েছে। কিভাবে, কোথায়, কোন দুর্গম দেশে তিনি অদৃশ্য হয়েছেন, কেউ জানতেও পারল না। সারা দেশের কাছে সুভাষচন্দ্র এক চমকপ্রদ লিজেন্ডের নায়ক হয়ে থাকলেন।

তার ক'বছর পর যুদ্ধের যখন শেষ অঙ্ক, শেষ দৃশ্য, সেই সময় উত্তর-পূর্ব সীমান্তের ওপার থেকে টুকরো টকরো যেসব খবর আসতে লাগল তাতে শৃঙ্খলিত দেশের হৃৎপিন্ড বিপুল আশায় দুলতে লাগল।

রূপকথার চাইতেও সে এক অবিশ্বাস্য ইতিহাস। কলকাতা থেকে অন্তর্হিত হয়ে প্রথমে আফগানিস্তান, সেখান থেকে বার্লিন, তারপর টোকিও গেলেন সুভাষচন্দ্র। পদানত দেশ তাঁকে যেন অস্থির উন্মাদ করে তুলেছে।

বীর নায়ক রাসবিহারী তখন 'আজাদ হিন্দ সঙ্ঘ' সৃষ্টি করেছেন। সুভাষচন্দ্র তাতে প্রাণসঞ্চার করে নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন। 'আজাদ হিন্দ সঙ্ঘ' হল আজাদ হিন্দ ফৌজ। ইতিহাসের সে এক পরম শুভক্ষণ। একই পতাকাতলে ধর্মবর্ণ নির্বিশেষে সকল প্রান্ত এসে হাত মেলাল। সুভাষচন্দ্র সেদিন থেকেই নেতাজী।

তারপর শুরু হল শৃঙ্খলমুক্তির অভিযান। জীবন-মৃত্যুকে পায়ের ভৃত্য করে ঊর্ধ্বশ্বাসে একাগ্র চিত্তে সে এক দুরূহ ব্রতপালন। দেখতে দেখতে সিঙ্গাপুরে জাতীয় পতাকা উড়ল। তারপর বর্মা পেরিয়ে ইম্ফল পেছনে ফেলে ঝড়ের গতিতে কোহিমা পর্যন্ত চলে এল আজাদ হিন্দ ফৌজ।

ওই কোহিমা পর্যন্তই। এদিকে জাপানের তখন করুণ অবস্থা। রসদ নেই, খাদ্য নেই। ফলে সুভাষচন্দ্রের বড় সাধের 'দিল্লি চল' স্বপ্ন হয়েই রইল।

আজাদ হিন্দ ফৌজের মরণপণ অভিযান পরাভূত, বিধ্বস্ত হয়ে যায়। 'জীবন-মৃত্যু'কে যাঁরা তুচ্ছ করেছিলেন সেই ভয়লেশহীন বীর সন্তানেরা বন্দি হয়ে একে একে দিল্লির লালকেল্লায় কারারুদ্ধ হয়েছেন। ধীলন শাহনওয়াজ সায়গল—পরাধীন জাতির ইতিহাসে নামগুলো সোনার অক্ষরে লিখে রাখবার মতো।

বিনুর মনে আছে, দিনকয়েক আগে খবরের কাগজে পড়েছিল, আজাদ হিন্দ ফৌজের অভিযুক্ত সেনানীদের বিচারের জন্য সামরিক ট্রাইবুনাল গঠন করা হয়েছে এবং বন্দিরা আপিল করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছেন।

ট্রাইবুনাল গঠনের পর তিন সপ্তাহ বিচার স্থগিত ছিল। আজ লালকেল্লায় তার প্রহসন শুরু হবে। একরকম আনায়াসেই এই বিচারের রায় আগে থাকতে বলে দেওয়া যায়।

সমস্ত দেশের প্রাণপুরুষ এই বীর সেনানায়কদের জন্য উদ্বেল হয়ে উঠেছে। আসমুদ্র হিমাচল বিশাল ভারতবর্ষের এমন কেউ নেই, মনে মনে লালকেল্লার সেই মানুষ ক'টির পাশে গিয়ে দাঁড়ায়নি। সামরিক ট্রাইবুনালের সমানে বীর সন্তানদের মুক্তির জন্য সওয়াল করতে ছুটে গেছেন ভুলাভাই দেশাই। দীর্ঘ দু'যুগ পর ব্যারিস্টার বেশে জহরলাল আজ ভুলাভাইর পাশে গিয়ে দাঁড়াবেন।

কোথায় কলকাতা, কোথায় বোম্বাই, কোথায় দিল্লি—সমস্ত ভারতবর্ষ আজ অস্থির, উদ্বেলিত। বিচারের আগের মুহূর্তে দেশের আত্মা যেন বজ্রকণ্ঠে দাবি জানাচ্ছে, স্বাধীনতার সৈনিকদের সসম্মানে মুক্তি চাই।

দূর সমুদ্রকল্লোল এই রাজদিয়ায় এসেও ধাক্কা দিল। বিনুরা কলেজে স্ট্রাইক করল। দশটা প্রাইমারি স্কুল, ছেলেদের হাইস্কুল এবং মেয়েদের হাইস্কুলেও স্ট্রাইক হয়ে গেল। তারপর ছাত্রছাত্রীরা ত্রিবর্ণ পতাকা হাতে নিয়ে মিছিল বার করল। সারা শহর ঘুরতে ঘুরতে তারা স্লোগান দিতে লাগল ঃ

'আজাদ হিন্দ ফৌজের বীর সৈনিকদের—'

'মুক্তি চাই, মুক্তি চাই।'
'জয় হিন্দ—'
'বন্দে মাতরম্—'
'নেতাজীকি—'
'জয়।'
'ভারত মাতাকি—'
'জয়।'
'শাহ্নওয়াজ-ধীলন-সায়গলকি—'
'জয়।'

একে একে এল রসিদ আলি ডে, বোম্বাইতে নৌবিদ্রোহ। সারা দেশ ঝড়ের দোলায় দুলতে লাগল।

আজাদ হিন্দ সৈনিকদের মুক্তির জন্য আন্দোলন, নৌবিদ্রোহ, রশিদ আলি ডে—বিদ্যুৎচমকের মতো দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল।

এদিকে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আর ঠেকিয়ে রাখা যাচ্ছিল না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে গ্রেট ব্রিটেনের শ্রমিক সরকার ঘোষণা করলেন, একটি ক্যাবিনেট মিশন এদেশে পাঠাবেন। উদ্দেশ্য, কিভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর করা যায় তার সূত্র উদ্ভাবন করা।

উনিশ শ' ছেচল্লিশের তেইশে মার্চ ক্যাবিনেট মিশন ভারতে এসে পৌঁছল। দলে তিনজন সদস্য—লর্ড পেথিক লরেন্স, স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস এবং মিস্টার এ. ভি. আলেকজান্ডার।

ক্যাবিনেট মিশন ভারতবর্ষে এসেই বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, বিশেষ করে কংগ্রেস আর মুসলিম লিগের সঙ্গে আলোচনা শুরু করল।

লাহোর প্রস্তাবের পর মুসলিম লিগ সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, ভারতবর্ষের দেহ ছিন্ন করে একটি সার্বভৌম মুসলিম রাষ্ট্র গড়তেই হবে। লিগ নেতাদের ভয়, দেশ স্বাধীন হলে সংখ্যালঘু মুসলমানদের নিরাপত্তা থাকবে না, 'হিন্দু রাজ' তাদের ধ্বংস করে দেবে।

কিন্তু ক্যাবিনেট মিশনের সদস্যরা পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দিলেন, দেশভাগে তাঁদের বিন্দুমাত্র সায় নেই। তখন মোটামুটি স্থির হয়, সংখ্যলঘুদের নিরাপত্তা এবং সুশাসনের জন্য ফেডারেল গভর্নমেন্ট তৈরি করা হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে থাকবে প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক নীতি এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার দায়িত্ব। এ, বি এবং সি—দেশকে তিনটি অংশে ভাগ করে যত বেশি বিষয়ে সম্ভব আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন দেওয়া হবে।

'বি' বিভাগে থাকবে পাঞ্জাব, সিন্ধু, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এবং ব্রিটিশ বেলুচিস্তান। এই অংশটিতে নিরঙ্কুশ মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতা। 'সি' বিভাগে থাকবে বাংলা ও আসাম। এখানেও মুসলমানরা সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়। আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন হাতে পেলে মুসলমানদের সন্দেহ ও উৎকণ্ঠা অন্তত থাকার কথা নয়। তবে জাতীয় ঐক্যের দিকে দৃষ্টি রাখতেই হবে।

মুসলিম লিগ শেষ পর্যন্ত এই প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেল। কংগ্রেসেরও এতে আপত্তি ছিল না। সফলকাম ক্যাবিনেট মিশন দেশে ফিরে গেল।

ক্যাবিনেট মিশন চলে যাবার পর ক'দিন আর। আবার পুরনো সংশয়, ঘৃণা এবং পারস্পরিক বিদ্বেষে আকাশ বিষাক্ত হয়ে উঠল। মুসলিম লিগ সিদ্ধান্ত নিল কনস্টিটিউয়েন্ট আসেমব্লিতে যোগ দেবে না বা অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রতিনিধিত্ব করবে না। জিন্না ছেচল্লিশের ষোলই আগস্ট 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম'-এর ডাক দিলেন।

ছেচল্লিশের ষোলই আগস্ট ইতিহাসের এক অন্ধকার দিন। সারা দেশ জুড়ে আত্মঘাতী দাঙ্গা শুরু হয়ে গেল। কোথায় কলকাতা, কোথায় বিহার, কোথায় নোয়াখালি—সমস্ত ভারতবর্ষ রক্তের সমুদ্র হয়ে দুলতে লাগল। কে বলবে মাত্র ক'দিন আগে নৌ-বিদ্রোহ ঘটে গেছে, কে বলবে রশিদ আলি ডে কিংবা আজাদ হিন্দ ফৌজের বীর সোনানীদের মুক্তির জন্য জাতিধর্মনির্বিশেষে মানুষ সেদিন পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আন্দোলন করেছিল।

খবরের কাগজ খুললে এখন শুধু আগুন-হত্যা-ধর্ষণ। ভারতবর্ষ যেন এক দুঃস্বপ্নের ঘোরে বর্বর যুগের কোনও আদিম অন্ধকারে ফিরে গেছে।

আসমুদ্র হিমাচল একখানা আগুনের চাকা যেন ঘুরে চলেছে। এই ছোট্ট রাজদিয়াতেও তার আঁচ এসে লাগল।

মিলিটারি ব্যারাকে সাপ্লাই দেবার জন্য রজবালি শিকদার মস্তাজ মিঞার যে বাড়িটা ভাড়া নিয়ে গুদাম করেছিল, এখন সেটাই মুসলিম লিগের অফিস। তার থেকে খানিকটা এগিয়ে গেলে হাইস্কুলের গা ঘেঁষে কংগ্রেসের অফিস।

আজকাল রোজই হয় মুসলিম লিগ, না হয় কংগ্রেস রাজদিয়ায় মিটিং করছে। মিটিংয়ের পর দু' দলই মিছিল বার করে।

সবুজ পতাকা উড়িয়ে লিগের সমর্থকরা শ্লোগান দেয় ঃ

'লড়কে লেঙ্গে—'

'পাকিস্থান।'

'কায়েদে আজম—'

'জিন্দাবাদ।'

কংগ্রেসের মিটিংয়ে মোতাহার হোসেন সাহেব আবেগপূর্ণ ভাষায় বক্তৃতা দেন, 'আমরা হিন্দু মুসলমান যুগ যুগ ধরে পাশাপাশি বাস করছি। বাস করবও। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে এ দেশকে কোনও দিনই ভাগ করতে দেওয়া হবে না। এক বছর, দু'বছর, দশ হাজার বছর পরও এ দেশ একই থাকবে।'

সারা দেশ যখন অস্থির উন্মাদ, তখন মোতাহার সাহেবের কথা কার কানে ঢুকবে? দেশজোড়া উন্মত্তরা জল-বাংলার এই স্নিগ্ধ শ্যামল ভুবনেও একদিন রক্তের সমুদ্রকে টেনে নিয়ে এল।

ঘটনাটা এইরকম।

সেদিন হেমনাথের সঙ্গে সুজনগঞ্জের হাটে গিয়েছিল বিনু। নৌকো থেকে নেমে ওপরে উঠতেই তারা শুনতে পেল, বিষহরিতলার ওধারে বিশাল মাঠখানায় মিটিং চলছে। হাটের বেশির ভাগ লোক ওখানে ভিড় জমিয়েছে।

কিছুটা আপন মনে হেমনাথ বললেন, 'আজকে আবার কিসের মিটিং?'

বিনু বলল, 'কী জানি—'

বেগুন ব্যাপারি গয়জদ্দি পাশ দিয়ে ছুটে যাচ্ছিল, হেমনাথ ডাকলেন। গয়জদ্দি দাঁড়িয়ে পড়ল। বলল, 'কী ক'ন হ্যামকত্তা?'

'অমন দৌড়চ্ছিস কেন?'

'মিটিনে যাই—'

'কিসের মিটিং রে?'

'ঢাকা থিকা বড় মাইনষেরা আইছে, তেনারা কী হগল কইব, যাই—' বলে আর দাঁড়াল না গয়জদ্দি, আবার ছুটল।

একটু চুপ করে থেকে হেমনাথ বিনুকে বললেন, 'মিটিংয়ে যাবি নাকি দাদাভাই?'

'চল। ঢাকার লোকেরা কী বলছে, শুনেই আসি।'

তামাকহাটা মরিচহাটা আনাজহাটা পেছনে রেখে বড় বড় পা ফেলে বিষহরিতলার কাছে এসে পড়ল বিনুরা।

আশ্চর্য, স্টারমোর চেয়ার টেবিল পেতে যথারীতি রোগী দেখতে বসেছেন। এক পাশে ওষুধের মস্ত বাক্স। আরেক পাশে সুজনগঞ্জ হাটের অনেকগুলো অসুস্থ রুগ্‌ণ মানুষ ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে আছে। সামনের বিশাল মাঠ জুড়ে যে অত বড় একটা মিটিং চলছে, অসংখ্য হাটুরে মানুষ যে ভিড় জমিয়েছে,

সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই লারমোরের। নিজের কাজের মধ্যে তিনি ধ্যানস্থ হয়ে আছেন। সমস্ত পৃথিবী জুড়ে যে এত অস্থিরতা, এত উত্তেজনা, কলকাতা-বিহার-নোয়াখালি রক্তের নদী হয়ে যে দুলছে—লারমোরের দিকে তাকালে সে কথা কে বিশ্বাস করবে!

পেট টিপে টিপে একটা রোগীকে পরীক্ষা করছিলেন লারমোর। হেমনাথ ডাকলেন, 'লালমোহন—'

লারমোর মুখ তুললেন। খুশি গলায় বললেন, 'আরে হেম যে, কখন এলে হাটে?'

'এই সবে। নৌকো থেকে নেমে সোজা আসছি।'

'বসবে তো? না হাট টাট সেরে আসবে?'

'বসবও না, হাটও সারব না—'

'তবে কী করবে?'

সামনের বিশাল জনতার দিকে আঙুল বাড়িয়ে হেমনাথ বললেন, 'ওখানে মিটিং হচ্ছে, দেখতে পাচ্ছ?'

'হ্যাঁ।' লারমোর ঈষৎ মাথা হেলিয়ে বললেন, 'অনেকক্ষণ থেকেই দেখছি। শুনলাম ঢাকা থেকে কারা এসে বক্তৃতা দিচ্ছে।'

'আমিও তাই শুনলাম। আর শুনেই এদিকে এলাম—'

'মিটিংয়ে যাবে নাকি?'

'হ্যাঁ। তুমিও চল—'

'আমার যাবার সময় কোথায়? দেখছ না, ওরা বসে আছে। এখন উঠে গেলে ওরা আমাকে খেয়ে ফেলবে।' লারমোর তাঁর রোগীদের দেখিয়ে দিলেন।

হেমনাথ বললেন, 'তুমি তা হলে যাবে না?'

'না। ওসব কচকচি আমার খুব খারাপ লাগে। নিজের কাজ আর এই সব রোগা, অসুস্থ মানুষ ছাড়া অন্য কিছু ভাল লাগে না। ঢাকার লোকেরা এসে কী-ই বা বলবে! তাতে এখানকার মানুষের উপকার কিছু হবে?'

হেমনাথ হাসতে লাগলেন, 'তার মানে এদের ছেড়ে কোথাও যেতে চাও না তুমি?'

'না।'

'তবে তুমি এদের নিয়েই থাকো। আমরা মিটিংয়ে যাই—'

'যাও। মিটিং শুনে এখানে আসবে তো?'

'আসব।'

হঠাৎ কী মনে পড়ে যেতে লারমোর বললেন, 'হাট থেকে তুমি কখন বাড়ি ফিরবে হেম?'

হেমনাথ বললেন, 'বিকেল নাগাদ—'

'আমিও তোমার সঙ্গে যাব।'

'সে কি, আজ এত তাড়াতাড়ি? তুমি তো হাট ভাঙবার পর সেই রাত্রিবেলা রাজদিয়ায় ফের।'

'আজ শরীরটা খুব ভাল লাগছে না।'

হেমনাথকে উদ্বিগ্ন দেখাল, 'কী হয়েছে?'

'তেমন কিছু না।' লারমোর হাসলেন, 'এই একটু জ্বর জ্বর মতো। আচ্ছা তোমরা মিটিংয়ে যাও। এরপর গেলে হয়তো কিছুই শুনতে পাবে না।'

শেষ পর্যন্ত সামনের ওই বিশাল মাঠে, বিপুল জনতা যেখানে উদ্‌গ্রীব হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, হেমনাথদের যাওয়া হল না। লারমোরের অস্থায়ী হাসপাতাল থেকে সবে দু'পা এগিয়েছেন, মিটিং ভেঙে গেল। তারপরেই জলোচ্ছ্বাসের দিশেহারা ঢলের মতো জনতা ছুটল হাটের দিকে।

মিটিং থেকে যারা ফিরছে তারা সবাই প্রচন্ড উত্তেজিত। সমানে তারা চিৎকার করছিল, 'মার কাফেরগো—'

'মার সুমুন্দির পুতেগো—'

মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছিল, 'লড়কে লেঙ্গে—'

'পাকিস্থান—'

pathagar.net

হেমনাথ আর বিনু দাঁড়িয়ে পড়েছিল।

আগে ওই মাঠে অনেক বার হাটুরে মানুষদের ভিড় করতে দেখেছে বিনু। হরিন্দ যখন দেশ-দেশান্তরের খবর এনে ওখানে ঢেঁড়া দিত, একটা মানুষও আর হাটের চালার তলায় থাকত না। যুদ্ধের সময় সেনাদলে রিক্রুমেন্টের জন্য এস.ডি.ও কি ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব কিংবা মিলিটারি অফিসাররা যখন আসতেন তখনও মরিচহাটা, তামাকহাটা ফাঁকা করে সবাই ওখানে ছুটে যেত। কিন্তু এমন উত্তেজনা নিয়ে উদ্‌ভ্রান্তের মতো কেউ ফিরত না।

জনতা উন্মত্তের মতো ছুটে যাচ্ছে। ঢাকার লোকগুলো তাদের কী বলেছে, কে জানে। বিনুরা বিমূঢ়ের মতো দাঁড়িয়ে থাকল।

কিছুক্ষণের ভেতর দেখা গেল, হাটের একটা চালাও আর আস্ত নেই। বাঁশের খুঁটিগুলো জনতার হাতে হাতে মারণাস্ত্র হয়ে ঘুরছে।

দেখতে দেখতে দাঙ্গা শুরু হয়ে গেল। সমস্ত সুজনগঞ্জের হাট জুড়ে কয়েক হাজার লাঠি আকাশের দিকে উঠেই নেমে যাচ্ছে। সেই সঙ্গে উঠছে চিৎকার, আর্তনাদ। লোকের পায়ে পায়ে হাটের ধুলো মাথার ওপর উঠে মেঘের মতো জমতে শুরু করেছে।

অনেকক্ষণ পর আপন মনে হেমনাথ বললেন, 'কী সর্বনাশ!'

বিনু খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিল। নিজের চোখে আগে আর কখনও দাঙ্গা দেখে নি সে। ভীরু গলায় ডাকল, 'দাদু—'

'কী বলছিস?' অন্যমনস্কের মতো সাড়া দিলেন হেমনাথ।

'আমরা কেমন করে বাড়ি যাব?'

হেমনাথ বুঝিবা তার কথা শুনতে পেলেন না। বলতে লাগলেন, 'অন্য অন্য জায়গায় দাঙ্গা হয়েছে। কিন্তু এ পাপ তো এখানে ছিল না—'

বিনু কী বলতে যাচ্ছিল, পেছন থেকে লারমোরের গলা ভেসে এল, 'হেম—হেম—'

হেমনাথ ঘুরে দাঁড়ালেন, বিনুও ঘুরল। চোখাচোখি হতেই লারমোর বললেন, 'এখানে এস—'

হেমনাথরা লারমোরের কাছে চলে এলেন।

উদ্বিগ্ন সুরে লারমোর বললেন, 'কান্ডটা দেখেছ!'

'হুঁ—'গম্ভীরভাবে মাথা নাড়লেন হেমনাথ।

এই সময় হাটের দিক থেকে ছুটতে ছুটতে মজিদ মিঞা এসে হাজির। তাকে পাগলের মতো দেখাচ্ছে। অস্থির গলায় সে বলতে লাগল, 'এ কী হইল ঠাউরভাই, এ কী হইল!'

হেমনাথ কী বলবেন, ঠিক করে উঠতে পারলেন না। অত্যন্ত বিচলিত আর চঞ্চল হয়ে উঠেছেন তিনি।

মজিদ মিঞা আবার বলল, 'এট্টা কিছু বিহিত করেন ঠাউরভাই। আপনের চৌখের সামনে অ্যামন খাওয়াখাওয়ি মারামারি হইব? কুনখানে কার দুষে (দোষে) দাঙ্গা হইছে হেয়াতে আমাগো কী? আমরা চিরকাল য্যামন একলগে আছি, ত্যামনই থাকতে চাই। আপনে অগো থামান ঠাউরভাই। তমস্ত জীবন যা দেখি নাই, এই শ্যাষ বস্যে (বয়সে) হেই খুনাখুনি দেখতে হইব? তার থিকা আমার মরণ ভাল।'

হেমনাথ কিছু বলবার আগেই লারমোর চেঁচিয়ে উঠলেন, 'এ দাঙ্গা চলতে পারে না। যেভাবেই হোক থামাতে হবে। চল—' বলেই হাটের মাঝখানে যেখানে তান্ডব চলছে, সেদিকে ছুটলেন।

মজিদ মিঞা বিনু এবং হেমনাথ লারমোর পিছু পিছু ছুটলেন। সব চাইতে প্রথমে পড়ে আনাজহাটা। সেখানে এসে দেখা গেল, অনেকগুলো লোকের হাত-পা ভেঙে গেছে, মাথা ফেটে ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটছে। রাশি রাশি ঝিঙে-পটল-বেগুন চারধারে ছত্রখান হয়ে আছে। আহত লোকগুলো যন্ত্রণায় ক্ষতস্থান চেপে ধরে কাঁদছিল, ককাচ্ছিল, গোঙানির মতো শব্দ করে চিৎকার করছিল।

ডান দিকে মরিচহাটা, বাঁ ধারে মাছের বাজার। দু'জায়গাতেই সমানে লাঠি চলছে আর বৃষ্টি ধারার মতো ঢিল পড়ছে। সেই সঙ্গে ক্রুদ্ধ, হিংস্র, মারমুখী জনতা চেঁচাচ্ছিল ঃ

'মার শালারে—'

'মার বউয়ার ভাইরে—'

'মাইরা মাইরা কাফেরের পুতেরে শ্যাষ কইরা দে—'

'লড়কে লেঙ্গে—'

'পাকিস্থান—'

'কালী মাঈকি জয়—'

হঠাৎ গলায় সবটুকু শক্তি ঢেলে সুজনগঞ্জের হাটটাকে চমকে দিয়ে চিৎকার করে উঠলেন লারমোর, 'থামা, থামা—তোরা মারামারি থামা—'

মজিদ মিঞাও চেঁচাচ্ছিল, 'আহাম্মকের ছাওরা, অ্যামন খুনাখুনি করিস না তরা। আল্লার কিরা।'

চিৎকার করতে করতে একবার মরিচহাটা, একবার মাছের বাজার, একবার গো-হাটার দিকে ছুটছিলেন লারমোর। তাঁর পেছনে ছিল বিনুরা।

উন্মত্ত জনতা মজিদ মিঞা বা লারমোরের কথা কানেই তুলছিল না। হিংস্র এক ডাকিনী তাদের যেন মন্ত্র পড়ে ছেড়ে দিয়েছে। তারা সমানে লাঠি চালিয়ে যাচ্ছিল, ঝাঁক ঝাঁক ঢিল ছুড়ছিল। তাদের চোখে হত্যা যেন ঝিলিক দিয়ে দিয়ে যাচ্ছে।

ছোটাছুটি করতে করতে তামাকহাটায় এসে হঠাৎ লারমোরের চোখে পড়ল, একটা রুগ্‌ণ লোকের মাথার ওপর তিন চারটে লাঠি উদ্যত হয়ে আছে, পলক পড়বার আগেই নেমে আসবে।

লারমোর লাফ দিয়ে সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। বললেন, 'মারিস না ওকে, মারিস না। ওই লাঠির একটা বাড়ি পড়লে ও মরে যাবে।'

যারা মারবার জন্য লাঠি তুলেছিল তাদের ভেতর থেকে একজন খ্যাল খ্যাল করে হেসে উঠল, 'ভালাই তো, বেশি কষ্ট করতে হইব না। এক বাড়িতে যমের দুয়ারে পাঠাইয়া দিতে পারুম। তুমি যাও সাহেব—'

'না, কিছুতেই না—' মা-পাখি যেমন করে তার বাচ্চাকে ডানা দিয়ে ঘিরে রাখে তেমনি করে দু'হাত দিয়ে রুগ্‌ণ লোকটাকে আগলে রাখলেন লারমোর।

সেই লোকটা আবার বলল, 'সর সাহেব, শালারে নিকাশ কইরা দেই—'

'না। ক'দিন আগে কালাজ্বরে ও মরতে বসেছিল। কত কষ্ট করে ওকে মরার হাত থেকে ফিরিয়েছি। আমার চোখের সামনে ওকে কিছুতেই মারতে দেব না।'

'ভালা চাও তো সইরা যাও সাহেব—'

'না।' লারমোর অনড় হয়ে রইলেন। তাঁর চোখে কঠিন প্রতিজ্ঞা জ্বলছে যেন।

সেই লোকটা উগ্র গলায় আবার বলল, 'শালা বিদ্যাশি, এইহানে আইসা মাদ্‌বরী (মাতব্বরী) ফলাও—'

লারমোর চমকে উঠলেন, 'আমি বিদেশি!'

'নিয্যস।'

কথাটা যেন বিশ্বাস করতে পারলেন না লারমোর। আবার প্রতিধ্বনি করলেন, 'আমি বিদেশি, আমি বিদেশি—'

'তয় কি তুমি এই দ্যাশের নাতিন জামাই? দেখছ নিজের গায়ের রংহান?'

সেই লোকটার সঙ্গীগুলো অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছিল। তাদের একজন বলল, 'প্যাচাল না পাইড়া সইরা যাও সাহেব—'

স্থির অগ্নিশিখার মতো দাঁড়িয়ে ছিলেন লারমোর। বললেন, 'না—'

'তয় মর শালা—'

কেউ কিছু বুঝবার আগেই একটা লাঠি এসে পড়ল লারমোরের মাথায়। চড়াৎ করে শব্দ হল একটা। তারপরেই রক্তের ফোয়ারা ছুটল। মাথায় হাত দিয়ে পলকে লুটিয়ে পড়লেন লারমোর।

বিনু চিৎকার করে উঠল, 'লালমোহন দাদুকে মেরে ফেলল, মেরে ফেলল—'

মজিদ মিঞা কপালে চাপড় মারতে মারতে আর্ত, আকুল গলায় বলতে লাগল, 'হায় হায়, এই কি সর্বনাশ করলি ডাকাইতরা।'

হেমনাথ কিছুই বললেন না। ধীরে ধীরে বসে লারমোরের রোগা, দুর্বল দেহখানা কোলে তুলে

pathagar.net

নিলেন। হেমনাথের শরীর আশ্চর্য কঠিন, শুধু ঠোঁট দু'টো থর থর করছে।

এই সময় ওদিক থেকে কারা যেন সন্ত্রস্ত গলায় চেঁচিয়ে উঠল, 'পুলিশ আসছে, পুলিশ আসছে —'

নিমেষে সামনের সেই হিংস্র, উত্তেজিত হত্যাকারীর দল অদৃশ্য হয়ে গেল। শুধু তারাই না, যারা দাঙ্গা করছিল, সুজনগঞ্জ হাটের সীমানার ভেতর তাদের কারোকেই আর দেখা গেল না।

আঘাত লাগার ফলে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলেন লারমোর। দিনের আলো থাকতে থাকতেই অজ্ঞান অবস্থায় তাঁকে নিয়ে হেমনাথরা রাজদিয়ায় ফিরলেন। সোজা গীর্জায় নিয়ে তুললেন।

লারমোর আজকের দাঙ্গায় শিকার হয়েছেন, এই খবরটা কেমন করে যেন দিগ্বিদিকে রটে গিয়েছিল। রাজদিয়ার কুমোরপাড়া কামারপাড়া যুগীপাড়া মৃধাপাড়া নিকারীপাড়া সর্দারপাড়া—শুধু কি রাজদিয়া, চারপাশের গ্রামগঞ্জগুলো শূন্য করে কত মানুষ যে লারমোরকে দেখতে এল! বিষণ্ণ, করুণ মুখে তারা আজকের এই নিদারুণ ঘটনাকে ধিক্কার দিতে লাগল, 'আ রে সব্বনাইশারা, তরা মারণের লেইগা মানুষ বিচরাইয়া (খুঁজে) পালি না? লালমোহন বাবায় যে আমাগো বাপের লাখান ভালবাসছে। হে যে আমাগো বাপ—'

কাদের আর বিধবা পরানের মা (দু'জনেই লারমোরের আশ্রিত) অবোধ শিশুর মতো কাঁদছে। কাঁদছে আর ভাঙা গলায় বলছে, 'সাহেববাবার যদিন ভালামোন্দ কিছু হয়, আমরা কই যামু? আমাগো কী হইব? কে দেখব আমাগো?' চোখের জলে তাদের বুক ভেসে যাচ্ছিল।

খবর পেয়ে স্নেহলতাও ছুটে এসেছেন। শিবানী আসতে চেয়েছিলেন। বাড়ি একেবারে ফাঁকা থাকবে বলে আসেন নি। এসেই লারমোরের শিয়রের কাছে বিষণ্ণ প্রতিমার মতো বসেছেন স্নেহলতা।

এদিকে এই বিপদের সময় হেমনাথ কিন্তু একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়েন নি। রাজদিয়ায় ফিরেই ডাক্তার আনতে মজিদ মিঞাকে কমলাঘাটে পাঠিয়ে দিয়েছেন। কমলাঘাটের বন্দরে বড় ডাক্তার আছে।

সন্ধের পর ডাক্তার নিয়ে তখনও মজিদ মিঞা ফেরে নি, লারমোরের জ্ঞান ফিরল। চোখ মেলে ক্ষীণ, দুর্বল স্বরে তিনি ডাকতে লাগলেন, 'হেম—হেম কোথায়?'

হেমনাথ লারমোরের পায়ের দিকে বসে ছিলেন। তাড়াতাড়ি উঠে এসে বললেন, 'এই যে ভাই, এই তো আমি—'

'আমি আর বাঁচব না—'

'ছি, ও কথা বলতে নেই। তোমার অনেক কাজ, বাঁচতে তোমাকে হবেই।' হেমনাথের কণ্ঠস্বর অসহ্য আবেগে কাঁপছিল।

লারমোর বিচিত্র হাসলেন, তারপর অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে উঠলেন, 'বাঁচতে আমি চাই না হেম, চাই না। ওরা আমাকে বিদেশি বলল! আমি বিদেশি! আমি বিদেশি।'

হেমনাথ বললেন, 'কে বললে তুমি বিদেশি?'

তাঁর কথা বোধ হয় শুনতে পেলেন না লারমোর। আপন মনে বলে যেতে লাগলেন, 'কবে এ দেশে এসেছিলাম, মনেও পড়েও না। জীবনের সবটুকুই এখানে কাটিয়ে দিলাম। এখানকার অন্ন-বস্ত্র-ভাষা সমস্ত মাথায় তুলে নিয়েছি। এখানকার মানুষকে বুকে জায়গা দিয়েছি। তবু আমি বিদেশি, আমি বিদেশি—'

হেমনাথ তাঁর বুকে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলতে লাগলেন, 'কেন তুমি কষ্ট পাচ্ছ লালমোহন? একটা উন্মাদ কী বলেছে, মনে করে রেখো না। তুমি যদি বিদেশিই হবে, এত লোক তোমাকে দেখতে এসেছে! ওই দিকে তাকাও—'লারমোরের খবর পেয়ে যারা ছুটে এসেছিল, উদ্বিগ্ন মুখে এখনও তারা গীর্জায় ভিড় করে আছে। হেমনাথ তাদের দিকে আঙুল বাড়িয়ে দিলেন।

লারমোরের দুরন্ত অভিমান একটুও শান্ত হল না। ক্লান্ত সুরে তিনি বলতে লাগলেন, 'একজন বললেও তো বিদেশি বলেছে—'বলতে বলতে শিশুর মতো ফুঁপিয়ে উঠলেন। তাঁর চোখের কোল বেয়ে মুক্তোর দানার মতো ফোঁটায় ফোঁটায় জল ঝরতে লাগল।

বিনু কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল। লারমোরের দিকে তাকিয়ে অপার বিস্ময়ে তার মন ভরে যাচ্ছিল। এমনিতে এই মানুষটি ধীর, স্থির, সংযত। জগতে ঈশ্বরের দূত হয়েই তিনি যেন নেমে এসেছেন। কিন্তু 'বিদেশি,' এই একটি মাত্র কথায় কী নিদারুণ অস্থিরই না হয়ে উঠেছেন। মানুষের হৃদয়ে কোথায় যে দুর্বল আবেগ

নিহিত থাকে!

হেমনাথ বলতে লাগলেন, 'কেঁদো না—শান্ত হও—'

একটুক্ষণ চুপ করে থাকার পর খুব ক্লান্ত সুরে লারমোর বললেন, 'আমার বড্ড ঘুম পাচ্ছে হেম—'

'বেশ তো, ঘুমোও না—'

'একটা কাজ করবে হেম?'

'কী?'

'হল-ঘরে যেশাসের পায়ের কাছে আমাকে নিয়ে যাবে? ওখানে গেলে আমি একটু শান্তি পেতাম।'

ধরাধরি করে হেমনাথরা খাটসুদ্ধ লারমোরকে হল-ঘরে নিয়ে এলেন। পুব দিকের দেওয়ালে যেখানে জোতির্ময় মানবপুত্রের বিশাল ছবিটা টাঙানো রয়েছে, তার তলায় তাঁকে রাখলেন।

লারমোর বললেন, 'এবার একটু ঘুমোই হেম।' ধীরে ধীরে তাঁর চোখ এবং কণ্ঠস্বর বুজে এল।

অনেক রাত্রে কমলাঘাট থেকে বড় ডাক্তার নিয়ে ফিরল মজিদ মিঞা। ডাক্তার লারমোরের গায়ে হাত দিয়েই চমকে উঠলেন। ভাল করে পরীক্ষা করে গম্ভীর গলায় জানালেন, লারমোরের চোখে চিরনিদ্রা নেমে এসেছে। মানুষের সাধ্য নেই এ ঘুম ভাঙায়।

একধারে দাঁড়িয়ে বিনু দেখল, ক্রুশবিদ্ধ যিশুমূর্তির তলায় এ কালের লাঞ্ছিত রক্তাক্ত অপমানিত আরেক ক্রাইস্ট।

খুব অল্পদিনের ভেতর পর পর দু'টো মৃত্যু দেখল বিনু। সুরমার এবং লারমোরের। সুরমার মৃত্যু বিনুর ব্যাক্তিগত ক্ষতি। কিন্তু এ মানুষটি কোত্থেকে এসে জল-বাংলার প্রতিটি বৃক্ষলতা, পশুপাখি, তৃণদল এবং মানুষের হৃদয়ে নিজের সিংহাসন পেতেছিলেন। সমস্ত শূন্য করে তিনি আজ চলে গেলেন।

গীর্জার একধারে লারমোরের সমাধি দেওয়া হল। সেই জায়গাটায় একটি বেদি তৈরি করে দিয়েছেন হেমনাথ। সেটার গায়ে শ্বেত পাথরের ফলক রয়েছে। তাতে লেখা ঃ

'ডেভিড লারমোর

জন্ম—১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দ, ১৯ শে মে।

মহাপ্রয়াণ—১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দ, ২২ শে ডিসেম্বর।

মানবতার প্রতীক, আর্তজনের বন্ধু, মহাপ্রাণ এই মানুষটি এখানে চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন।'

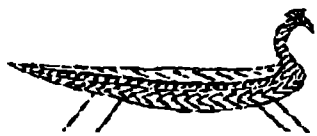

লারমোরের মৃত্যুর পর আশা করা গিয়েছিল, মানুষের মনে শুভবোধ জাগবে। কিন্তু কিছুই হল না। উত্তেজনা, অশান্তি, আতঙ্ক বেড়েই চলল। প্রায় রোজই খবর আসে মুসলিম লিগ এ গ্রামে ও গ্রামে এ গঞ্জে সে গঞ্জে এবং নদীর চরগুলোতে মিটিং করে বেড়াচ্ছে। চারদিকে দাঙ্গাও চলছে। হত্যা আর্তনাদ হল্লা আগুন, ইত্যাদি ছাপিয়ে বহুকণ্ঠের চিৎকার শোনা যায়, 'লড়কে লেঙ্গে—'

'পাকিস্থান—'

পালটা উত্তরও ভেসে আসে, 'বন্দে মাতরম্—'

তারপর ক'মাস আর। ভারতবর্ষের ভাগ্য একদিন স্থির হয়ে গেল। কত কালের সুপ্রাচীন এই দেশ। সাতচল্লিশের পনেরই আগস্ট তাকে কেটে দু'টুকরো করে ফেলা হবে। এক ভাগ হবে পাকিস্তান। আরেক ভাগ আবহমান কালের পুরনো নামটাই ধরে রাখবে—ভারত।

খবর পেয়ে মোতাহার হোসেন ছুটে এলেন। রাস্তা থেকে বাগানে পা দিয়েই চেঁচিয়ে ডাকতে লাগলেন, 'হেমদাদা—হেমদাদা—'

হেমনাথ বাড়িতেই ছিলেন। দেশভাগ নিয়ে বিনুর সঙ্গে আলোচনা করছিলেন। চমকে বাইরের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, 'কে, মোতাহার?'

'হ্যাঁ।'

BanglaBook.org

'আয়, আয়—'

মোতাহার সাহেব ঘরে এসে তক্তপোশে বসলেন। তাঁকে খুবই বিমর্ষ দেখাচ্ছে। বললেন, 'খবর শুনেছেন?'

কোন খবরের কথা তিনি বলছেন, হেমনাথ বুঝতে পারলেন। বললেন, 'শুনেছি। তোর ছাত্রের সঙ্গে তাই নিয়েই আলোচনা করছিলাম।'

মোতাহার সাহেব বললেন, 'শেষ পর্যন্ত মুসলিম লিগ আর জিন্নারই তা হলে জয় হল!'

আস্তে আস্তে মাথা নাড়লেন হেমনাথ, 'তাই তো দেখছি।'

'কিন্তু—'

জিজ্ঞাসু চোখে তাকালেন হেমনাথ, 'কী?'

প্রথমটা উত্তর দিলেন না মোতাহার সাহেব, অন্যমনস্কের মতো জানালার বাইরে ধু ধু ধানখেতের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। তারপর মুখ ফিরিয়ে হঠাৎ অত্যন্ত উত্তেজিত সুরে বলতে লাগলেন, 'এত মানুষ জেল খাটল, হাজার হাজার সোনার ছেলে প্রাণ দিল! না হেমদা, এ আমরা চাই নি, এ আমরা চাই নি।'

মোতাহার সাহেবের উত্তেজনা, অস্থিরতা ক্রমশ বাড়তেই লাগল। তিনি বলতে লাগলেন, 'কোন থিওরির ওপর দেশটা ভাগ হতে চলেছে, ভাবলে মাথা খারাপ হয়ে যায়।'

বুঝতে না পেরে হেমনাথ শুধোলেন, 'কোন থিওরির কথা বলছিস মোতাহার?'

'জিন্নার টু নেশন থিওরি।' প্রবল আক্ষেপের গলায় মোতাহার সাহেব বলতে লাগলেন, 'সারা জীবন একতার কথা বলে শেষে কিনা দ্বি-জাতি তত্ত্বের বিষ গিলতে হল!'

হেমনাথ চুপ।

মোতাহার সাহেব থামেন নি, 'দেশভাগই যদি মেনে নেওয়া হল, আগে মানলেই হত। এত রক্তারক্তি, এত দাঙ্গা, এত হত্যা-ধর্ষণ-আগুন, কোনওটাই ঘটত না।'

'তা ঠিক।'

'নেতারা খেয়ালের বশে যা করলেন তার পরিণাম ভাল হবে না। দেশভাগের পেছনে কী আছে, লক্ষ করেছেন হেমদাদা?'

'কী আছে?'

'ঘৃণা বিদ্বেষ অবিশ্বাস আর শত্রুতা।'

আস্তে মাথা নাড়লেন হেমনাথ।

মোতাহার সাহেব বলতে লাগলেন, 'দেশ যদি সত্যি সত্যিই ভাগ হয়, হিন্দু-মুসলমানকে চিরকাল ওই চারটে জিনিসের জের টেনে চলতে হবে। আর সব চাইতে ক্ষতি হবে বাঙালি জাতির। এ জাতি আর কোনও দিন মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না।'

কিছুক্ষণ নীরবতা।

তারপর মোতাহার সাহেবই আবার শুরু করলেন, 'আপনার কী মনে হয় হেমদাদা?'

'কী ব্যাপারে?'

'দেশভাগ কি শেষ পর্যন্ত হবে?'

'তার মানে—'হেমনাথ অবাক, 'সব স্থির হয়ে গেছে। একটা সেটেলড্ ফ্যাক্টকে আনসেটেলড্ করা যাবে কী করে?'

হেমনাথের কথা বুঝিবা শুনতে পেলেন না মোতাহার সাহেব। তাঁর বুকের ভেতর এই মুহূর্তে কোন হাওয়া বইছে, কে জানে। দূরমনস্কের মতো তিনি বললেন, 'আমার কী মনে হয় জানেন হেমদাদা?'

'কী?'

'পার্টিশান আটকে যাবে।'

'কে আটকাবে?'

'দেশের মানুষ নেতাদের এই হঠকারিতা কিছুতেই, কোনও মতেই মেনে নেবে না। আপনি দেখে নেবেন।' মোতাহার সাহেবের চোখ জ্বলতে লাগল। হাত মুষ্টিবদ্ধ, চোয়াল কঠিন।

pathagar.net

এমনিতেই মোতাহার সাহেব মানুষটি বেশ গম্ভীর। তাঁর চোখ এত উজ্জ্বল আর তীক্ষ্ণ যে, সেদিকে তাকিয়ে থাকা যায় না। দেখলেই ভয় লাগে, আবার ভক্তিও হয়।

কিন্তু খুব কাছাকাছি এলে টের পাওয়া যায়, গাম্ভীর্যটা তাঁর ছদ্মবেশ। কঠিন মাটির ঠিক তলাতেই সুশীতল জল রয়েছে, সামান্য খুঁড়লেই ফিনকি দিয়ে ফোয়ারা বেরিয়ে আসবে।

বাইরে কঠিন ভেতরে সরস, এই মানুষটি আজ কিন্তু বড়ই অস্থির, উদ্‌ভ্রান্ত, চঞ্চল। মাটি খুঁড়লে আজ আর ফোয়ারা বেরুবে না, পুঞ্জীভূত ক্ষোভ আগুনের হলকা হয়ে বেরিয়ে আসবে।

শেষ পর্যন্ত দেশজোড়া রক্তাক্ত সুতিকাগারে সেই দিনটি ভূমিষ্ঠ হল। পনেরই আগস্ট, উনিশ শ' সাতচল্লিশ। খন্ডিত দেশের ওপর দিয়ে স্বাধীনতার রথ এল ঘর্ঘরিয়ে।

মোতাহার সাহেব দেশবাসীর ওপর ভরসা রেখেছিলেন, তারা দেশভাগ বন্ধ করবে। জননীর মতো গরীয়সী এই জন্মভূমির দেহে ছুরি বসাতে দেবে না। কিন্তু সব বৃথা। হায় রে দুরাশা!

এই মুহূর্তে দেশের সব মানুষই প্রায় অন্ধ, আচ্ছন্ন। দু'হাত দুরের জিনিস দেখবার মতো দৃষ্টিটুকু পর্যন্ত তাদের নেই। জননীদেহ কেটে কুটে ভাগাভাগি করে নেওয়া ছাড়া তারা আর কিছু ভাবতেই পারছে না।

মোতাহার সাহেবের মতো যে দু' চারজন আছেন, যাঁদের দৃষ্টি আপন সময়ের সমস্ত অন্ধকার এবং কুয়াশা সরিয়ে অনেক দুর পর্যন্ত পৌঁছয়, তাঁরাই শুধু অসীম দুঃখে দুরন্ত অভিমানে মূক হয়ে গেছেন। এ তাঁরা চান নি।

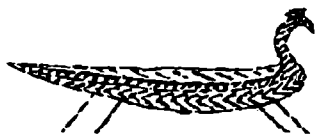

পনেরই আগস্ট ভোর হবার কয়েক ঘন্টা আগে 'পাকিস্তান ডে' ঘোষণা করা হয়েছিল।

চোদ্দই আগস্টের মাঝরাত থেকেই রাজদিয়ার চোখে আর ঘুম নেই। ঢাকা থেকে কত ব্যান্ড পার্টি যে আনা হয়েছে! এই নগণ্য শহরের সব রাস্তা ঘুরে ঘুরে তারা বাজিয়ে চলেছে।

রাজদিয়ার চোখ থেকে ঘুম তো গেছেই, ঘরে আর কেউ নেই। বাজনার শব্দে সবাই বেরিয়ে এসেছে। ঝিনুক আর বিনুকে নিয়ে হেমনাথও বাগান পেরিয়ে ক'বার যে রাস্তায় এলেন তার হিসেব নেই।

এক সময় ভোর হল।

এবার ব্যান্ড পার্টির সঙ্গে বেরুল মিছিল। মিছিল কি দু'চারটে ধবধবে পোশাক-পরা ছোট ছোট শিশুদের মিছিল, কিশোর-কিশোরীদের মিছিল, যুবক-যুবতীদের মিছিল। প্রতিটি মিছিল চাঁদ-তারা আঁকা সবুজ পতাকা আর জিন্নার ছবি দিয়ে সুসজ্জিত।

মিছিলগুলো রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে ঘুরে ধ্বনি দিচ্ছে ঃ

'কায়েদে আজম—'

'জিন্দাবাদ—'

'পাকিস্থান—'

'জিন্দাবাদ—'

যেভাবে আর যে মূল্যেই হোক, স্বাধীনতা এসেছে। পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা হয়েছে। যুবক-যুবতী, কিশোর-কিশোরীদের কণ্ঠস্বর আর ব্যান্ড পার্টির বাজনা আকাশে বাতাসে বিচিত্র উন্মাদনা ছড়িয়ে দিচ্ছিল। হেমনাথ আর বাড়ি বসে থাকতে পারলেন না। বিনুকে সঙ্গে নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লেন।

মিছিলের পর মিছিল পাশ দিয়ে বেরিয়ে যেতে লাগল। হাঁটতে হাঁটতে এবং শোভাযাত্রা দেখতে দেখতে এক সময় সারি সারি মিষ্টির দোকান, স্টিমারঘাট, বরফ কল পেরিয়ে হেমনাথরা স্কুলবাড়ির কাছে চলে এলেন।

মিষ্টির দোকান, স্টিমারঘাট, বরফ কল কিংবা রাজদিয়ার যত বাড়িঘর— সব কিছুর মাথায় চাঁদ

তারা মার্কা সবুজ পতাকা উড়ছে। স্টিমারঘাটটাকে ফুল-পাতা আর রঙিন কাগজ দিয়ে চমৎকার করে সাজানো হয়েছে। তা ছাড়া, রাস্তায় কুড়ি পঁচিশ হাত দূরে দূরে একটা করে তোরণ চোখে পড়ে। মাঝে মাঝে উঁচু উঁচু মঞ্চ বানিয়ে নহবত বসানো হয়েছে। সেখানে সানাই বাজছে।

আজকের এই দিনটা যে আর সব দিনের চাইতে আলাদা, রাস্তায় পা দিয়েই তা টের পাওয়া যায়। এই রাজদিয়ার ওপর দিয়ে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ দিন এসেছে, গেছে। কিন্তু এমন দিন আর কখনও আসেনি। উদাসীনভাবে অন্যমনস্কের মতো একে যেন হাত পেতে নেওয়া যায় না, বিপুল সমারোহে একে বরণ করে নিতে হয়।

স্কুলবাড়ির কাছাকাছি আসতেই হঠাৎ কে যেন ডেকে উঠল, 'হেমদাদা—হেমদাদা—'

বিনুরা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। এদিক ওদিক তাকাতেই ডান ধারে তারা মোতাহার হোসেন সাহেবকে দেখতে পেল।

স্কুলবাড়ির ঠিক গায়েই কংগ্রেস অফিস। তার দরজায় মোতাহার সাহেব দাঁড়িয়ে আছেন। চোখাচোখি হতেই হাতছানি দিলেন। মোতাহার সাহেব এবং তাঁর দু'একজন সঙ্গী ছাড়া কংগ্রেস অফিস এখন একেবারে ফাঁকা।

বিনুরা পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল।

মোতাহার সাহেব বললেন, 'আজ এত সকালে বেরিয়ে পড়েছেন হেমদাদা?'

হেমনাথ হাসলেন, 'ব্যান্ড পার্টির আওয়াজে আর মিছিলের চিৎকারে ঘরে থাকা গেল না যে।'

'আপনাকে যেন ভারি খুশি দেখাচ্ছে—'

উত্তরটা এড়িয়ে গিয়ে হেমনাথ বললেন, 'রাজদিয়ার সব লোক বেরিয়ে পড়েছে। আমি আর কী করে ঘরে বসে থাকি বল?'

অত্যন্ত ক্ষুব্ধ গলায় মোতাহার সাহেব বলতে লাগলেন, 'এত বড় একটা ট্র্যাজেডি ঘটে গেল, যার পরিণাম কী হবে কেউ বলতে পারে না, আর আপনি মিছিল দেখবার জন্যে, আনন্দ করবার জন্যে বেরিয়ে পড়েছেন! আপনার কাছে এ কিন্তু আশা করিনি হেমদাদা—'

একটু চুপ করে থেকে হেমনাথ বললেন, 'যা হবার তা তো হয়েই গেছে। তার জন্যে মনে দুঃখ রেখে কী লাভ? হয়তো এতে ভালই হবে। দেশ জুড়ে যে রক্তারক্তি আর হত্যা চলছিল তা চিরদিনের মতো বন্ধ হয়ে যাবে। যা এসেছে তাকে প্রসন্ন মনেই গ্রহণ কর মোতাহার।'

মোতাহার সাহেব খুব একটা সান্ত্বনা পেয়েছেন, এমন মনে হল না। ক্ষোভ বিষাদ দুঃখ, সব একাকার হয়ে তাঁর মুখখানাকে মলিন করে রাখল।

বিনু অবাক হয়ে হেমনাথকে দেখছিল। আজই শুধু নয়, রাজদিয়ায় আসার পর থেকেই দাদুকে দেখছে সে। ভালমন্দ শুভাশুভ, যা-ই সামনে এসে দাঁড়াক তাকে তিনি সানন্দে, পরম উদারতার সঙ্গে বুকে তুলে নিতে পারেন। তাঁর চরিত্রের মূলমন্ত্র এখানেই।

হেমনাথ বললেন, 'এখন চলি রে মোতাহার—'

মোতাহার হোসেন উত্তর দিলেন না।

হেমনাথ আবার বললেন, 'আমাদের সঙ্গে তুই যাবি?'

নীরস সুরে মোতাহার সাহেব জানালেন, যাবেন না।

আবার বড় রাস্তায় এসে পড়ল বিনুরা। পুব দিকে খানিকটা গেলেই সেটেলমেন্ট অফিসের পাশে মুসলিম লিগের অফিস। লিগের অফিসটাকে আজ আর চেনাই যায় না। ফুলে-পাতায়, রঙিন কাগজে আর অসংখ্য সবুজ পতাকায় তার চেহারা বদলে গেছে। কত মানুষ যে সেখানে ভিড় জমিয়েছে, লেখাজোখা নেই। লিগের অফিসটা ঘিরে এই মুহূর্তে বিরাট উৎসব চলছে।

হঠাৎ কংগ্রেস অফিসটার কথা মনে পড়ে গেল বিনুর। একটু আগেই সেখান থেকে তারা এসেছে। মুসলিম লিগের এই উৎসবমুখর জমকালো বাড়িটার তুলনায় সেটার দৃশ্য বড় করুণ এবং নিষ্প্রভ। অথচ ক'দিন আগেও কংগ্রেস অফিসে ভিড় লেগে থাকত। রাতারাতি সব বদলে গেছে।

লিগ অফিসের কাছে আসতেই রজবালি শিকদার ছুটে এল। তার দেখাদেখি আরও অনেকে। ইদানীং রজবালি এ অঞ্চলে লিগের বড় নেতা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এসেই রজবালি হেমনাথকে বুকে জড়িয়ে

pathagar.net

ধরে। সে বলল, 'আপনে আইছেন হ্যামকত্তা!' দেখেও সে যেন বিশ্বাস করতে পারছে না।

সহজ গলায় হেমনাথ বললেন, 'হ্যাঁ, এলাম। পার্টিশানের পর এ দেশ যদি পাকিস্তান হয়ে থাকে, আমরা তা হলে পাকিস্তানী। এমন দিনে আমরা আসব না?'

অভিভূত স্বরে রজবালি শিকদার বলল, 'নিয্যস নিয্যস—'

কে একজন চেঁচিয়ে উঠল, 'আরে কেউগা আছস, গুলাপ জল লইয়া আয়, হ্যামকত্তারে দে—'

একজন ছুটে গিয়ে রুপোর পিচকিরিতে গোলাপ জল এনে বিনুদের মাথায় ছিটিয়ে দিল। শুধু বিনুরাই নয়, হিন্দু-মুসলমান যারাই লিগ অফিসের কাছে আসছে তাদেরই বুকে জড়িয়ে ধরা হচ্ছে, গোলাপ জলে সিক্ত করে দেওয়া হচ্ছে।

লিগ অফিসের একজন বলল, 'পাকিস্থান হইয়া গ্যাছে। যা চাইছিলাম তা পাইছি। আইজ থিকা আপনাগো লগে আমাগো কাইজা বন্ধ।'

হেমনাথ হাসতে হাসতে বললেন, 'আমার সঙ্গে কিন্তু কখনও কারোর ঝগড়া নেই।'

তাড়াতাড়ি জিভ কেটে লোকটা বলল, 'আপনের কথা কই না হ্যামকত্তা—'

'তবে?'

'হিন্দুগো কথা কই।'

'আমি বুঝি হিন্দু না?'

রজবালি বলল, 'আপনের লগে কার তুলুনা! আপনে হিন্দুও না, মুসলমানও না। আপনে হগলের হ্যামকত্তা—'তার কণ্ঠস্বর আবেগে কাঁপতে লাগল।

আরও কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর হেমনাথ বললেন, 'এখন যাই রে রজবালি।'

'অহনই যাইবেন?'

সূর্য উঠে গিয়েছিল। সকালের নরম সোনালি রোদ নদীর ঢেউয়ে টলমল করছে। ঝাঁকে ঝাঁকে শঙ্খচিল উড়ছিল। মাসটা যদিও শ্রাবণ, আজকের আকাশ আশ্চর্য উজ্জ্বল, পালিশ-করা নীল আয়নার মতো তার গা থেকে দীপ্তি বেরুচ্ছে। আর আছে ভারহীন ভবঘুরে মেঘ। উলটোপালটা পুবের বাতাস তাদের তাড়িয়ে তাড়িয়ে একবার এদিকে, আবার ওদিকে নিয়ে যাচ্ছে।

হেমনাথ বললেন, 'সেই কখন বেরিয়েছি! কত বেলা হয়ে গেল।'

রজবালি বলল, 'অ্যামন দিনে হুদা মুখে যাইতে পারবেন না। আইজ এট্টু মেঠাই মুখে দিতে হইব।'

'এখন মিষ্টিটিষ্টি খেতে পারব না বাপু।'

'তয় বাইন্দা দেই, বাড়িত্ নিয়া যাইবেন।'

হেমনাথ হাসতে হাসতে বললেন, 'ছাড়বি না যখন, তখন দে। বাড়িই নিয়ে যাই।'

দেখা গেল, হেমনাথদের শুধু নয়, যারাই লিগ অফিসের কাছে আসছে মিষ্টিমুখ না করে কেউ ছাড়া পাচ্ছে না।

রজবালি নিজের হাতে মিষ্টির একটা হাঁড়ি এনে হেমনাথকে দিল। তারপর বলল, 'বিকালবেলা কোর্টের (কোর্টের) মাঠে আইসেন।'

রাজদিয়ায় ফৌজদারি আর দেওয়ানি আদালত দু'টো পাশাপাশি। তার সামনে মস্ত মাঠ। হেমনাথ শুধোলেন, 'সেখানে কী?'

'মিটিন হইব। ঢাকার থিকা বড় ন্যাতারা আইসা বক্তিতা করব। আইসেন কিলাম।'

'আসব।'

বাড়ি আসতেই স্নেহলতা জানালেন, মীরপাড়া-মৃধাপাড়া-সর্দারপাড়া, রাজদিয়ায় যত মুসলমান বাড়ি আছে, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে সব জায়গা থেকে মিষ্টি পাঠিয়েছে।

বিকেলবেলা আদালত পাড়ার মাঠে এসে দেখা গেল, লোকে লোকারণ্য। রাজদিয়ারই শুধু না, চারদিকের গ্রামগঞ্জ থেকে মানুষ ভেঙে পড়েছে।

রজবালি কোথায় ছিল, ছুটে এল। যেখানে শহরের গণ্যমান্য শ্রদ্ধেয় মানুষরা বসে আছেন, তাঁদের পাশে দু'টো চেয়ারে হেমনাথ আর বিনুকে নিয়ে বসাল।

ঢাকা থেকে লিগের নেতারা এসেছিলেন। তাঁরা পাকিস্তান দিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করলেন। তারপর স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কিছু বলতে অনুরোধ করা হল।

যদিও মুসলিম লিগ এই সভা আয়োজন করেছে, তবু হঠাৎ রজবালি শিকদার বক্তা হিসেবে হেমনাথের নাম প্রস্তাব করে বসল। অগত্যা হেমনাথকে পাকিস্তান সম্বন্ধে দু'চার কথা বলতে হল।

সভা শেষ হতে সন্ধে হয় গেল। তারপর শুরু হল আতসবাজির খেলা। কতরকম যে বাজি আনা হয়েছে হিসেব নেই। কোনওটা আকাশে গিয়ে আলোর ময়ূর হয়ে যাচ্ছে, কোনওটা চিল, কোনওটা বাঘ, কোনওটা আবার সিংহ। একেকটা হাউই উড়ে গিয়ে আগুনের ফুলকি দিয়ে লিখে দিচ্ছে 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' কিংবা 'কায়েদে আজম, জিন্দাবাদ।' তলায় হাজার কণ্ঠে উল্লসিত জয়ধ্বনি উঠছে ঃ

'পাকিস্তান—'

'জিন্দাবাদ।'

'কায়েদে আজম—'

'জিন্দাবাদ।'

বাজি পোড়ানো দেখে হেমনাথরা যখন বাড়ি ফিরলেন, মাঝ রাত পার হয়ে গেছে।

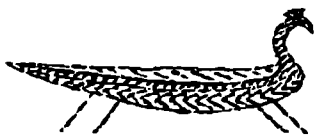

সাতচল্লিশে দেশভাগ হল। তারপর দেখতে দেখতে আরও দু'টো বছর কেটে গেল।

এর মধ্যে বি. এ পাস করেছে বিনু। ঝিনুক ম্যাট্রিক পাস করে রাজদিয়া কলেজে ভর্তি হয়ে গেছে।

ওদিকে যুদ্ধের সময় ঝোঁকের বশে যে অবনীমোহন কন্ট্রাক্টরি নিয়ে আসাম চলে গিয়েছিলেন, সেখানেও বেশিদিন থাকেন নি। যুদ্ধ থামবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর শখ মিটে গিয়েছিল। আসলে যুদ্ধ শেষ। ঠিকাদারেরও প্রয়োজন মিটে গেছে। কন্ট্রাক্টরি ছেড়েছুড়ে অবনীমোহন কলকাতায় চলে গিয়েছিলেন, সেখানে ব্যবসা শুরু করেছেন।

কলকাতায় গিয়েই বিনুকে পাঠিয়ে দেবার জন্য হেমনাথকে চিঠি দিয়েছিলেন অবনীমোহন। বিনু যায় নি। তারপর ছেচল্লিশের দাঙ্গার সময় কিংবা দেশভাগের সময়ও যাবার কথা লিখেছিলেন। তখনও বিনু যায় নি। দেশভাগের সময় অবশ্য জমিজমা বিক্রি করে হেমনাথকেও চলে যেতে লিখেছিলেন অবনীমোহন। সুধা সুনীতি কলকাতাতেই আছে। তারাও ওই একই কথা লিখত। এখনও নিয়মিত লিখে যাচ্ছে।

পাকিস্তান দিবসকে ঘিরে রাজদিয়ায় যে উদ্দীপনা দেখা দিয়েছিল, ভাটার টানের মতো ধীরে ধীরে তা স্তিমিত হয়ে গেছে। এখানকার জীবন আবার পুরনো ঢিমে তালে বাজতে শুরু করেছে।

তিন বছর আগের মতোই চৈত্র বৈশাখের রোদে মাটি ফেটে চৌচির হয়েছে, দিগন্তে আগুনের হলকা নেচে নেচে গেছে। গ্রীষ্মের পর শ্যামল বেশে এসেছে বর্ষা। মাঠ ভাসিয়ে, ধানখেত পাটখেত ডুবিয়ে চারদিক একাকার করে দিয়েছে। তারপর আকাশে মাটিতে পরিচিত ছবি এঁকে একে একে দেখা দিয়েছে শরৎ-হেমন্ত-শীত-বসন্ত। রাজদিয়ার মানুষ তিন বছর আগের মতো পাট বুনেছে, ধান কেটেছে, খেতে নিড়ান দিয়েছে, নৌকো বেয়েছে। মটর কলাইর খেতে 'ছেই' সেদ্ধ করে খেয়েছে,গলুয়ায় (মেলায়) গিয়ে বউর জন্য আলতা কিনেছে, ফুলেল তেল কিনেছে। মাঠ পাড়ি দিয়ে গেছে সুজনগঞ্জের হাটে, কিংবা ম্যালেরিয়ায় ভুগে ভুগে অস্থিসার হয়ে উঠেছে। তিন বছর আগের মতোই তারা ভাসান গান গেয়েছে, সারি জারি আর রয়ানিতে চারদিক মুখর করে তুলেছে।

তিন বছর আগের মতোই ডেসালের বাঁশে শঙ্খচিল বসেছে। ধানখেতের আলে আলে জলসেঁচি শাকের অরণ্য উদ্দাম হয়ে উঠেছে। বিলগুলো পানকলস আর জলসিঙাড়ায় ছেয়ে গেছে। পৌষ মাঘ মাসে শীতের দেশ থেকে এসেছে যাযাবর পাখিরা, গরম পড়তে না পড়তেই তারা ফিরে গেছে। কাচের মতো স্বচ্ছ জলের তলায় টাটকিনি আর ভাগনা, গজার আর বজুরা, কাচকি আর বাজালি মাছেরা ডিম পেড়ে রুপোলি ফসলে জল-বাংলাকে পরিপূর্ণ করে তুলেছে।

তিন বছর আগের মতো কাউফলের গাছগুলোতে ফুল ধরেছে, বউন্যাগাছের শরীর ফলে ভরে গেছে। কালো কালো মসৃণ মুক্তার মাথায় অসংখ্য সাদা ফুলের সুগন্ধে বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে। যেখানেই চোখ ফেরানো যাক— ধানের খেতে, শাপলাবনে, বেতঝোপে কি খাল-বিল-নদীতে—সব দিকেই জল-বাংলার এই অপরূপ বসুন্ধরা আগের মতোই রমণীয়। র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদের ছুরি ভারতবর্ষকে দু'খানা করে কেটে ফেলার পরও রাজদিয়ার কিন্তু তেমন কোনও পরিবর্তন নেই। তার আহ্নিক গতি, বার্ষিক গতি প্রায় একই নিয়মে চলেছে।

তবে দূর-দূরান্ত থেকে খবর আসছিল, পাকিস্তান হবার পরই এদেশে ভাঙন শুরু হয়ে গেছে। সাতপুরুষের ঘর-ভদ্রাসন ছেড়ে দলে দলে মানুষ আসাম আর আগরতলায় চলে যাচ্ছে। বেশির ভাগ যাচ্ছে কলকাতার দিকে। নোয়াখালি বরিশাল ফরিদপুর কুমিল্লা, এমনকি ঢাকা জেলার নানা গ্রাম-গঞ্জ থেকেও ওই একই খবর আসছিল।

মোতাহার হোসেন সাহেব মাঝে মাঝে আসেন। বিষণ্ণ সুরে বলেন, 'খবর পাচ্ছেন হেমনাথ দাদা?'

আস্তে আস্তে মাথা নাড়েন হেমনাথ। ঝাপসা গলায় বলেন, 'পাচ্ছি।'

'আপনি তো বলেছিলেন, পাকিস্তান হয়ে গেলেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। কিন্তু এ কী হচ্ছে?'

হেমনাথ উত্তর দেন না, বিমর্ষ মুখে চুপচাপ বসে থাকেন।

উত্তেজিতভাবে এবার মোতাহার সাহেব বলতে থাকেন, 'সমাধানই যদি হয়ে যাবে, হাজার হাজার মানুষ ইস্ট পাকিস্তান ছেড়ে চলে যাচ্ছে কেন?'

এবারও হেমনাথ নীরব।

এর ভেতর একটা ব্যাপার ঘটে গেল।

একদিন দুপুরবেলা বিনুরা সবে খেয়ে উঠেছে, বাগানের দিক থেকে খুব চেনা একটা গলা ভেসে এল 'বড়কত্তা, বড়কত্তা—'

হেমনাথ চেঁচিয়ে বললেন, 'কে রে?'

'আমি যুগইলা—'বলতে বলতে সত্যিসত্যিই যুগল সামনে এসে দাঁড়াল।

যুগলের গলা পেয়ে স্নেহলতা আর শিবানীও বেরিয়ে এসেছিলেন।

ন' বছর আগে নতুন বৌকে নিয়ে সেই যে ভাটির দেশে দ্বিরাগমনে গিয়েছিল যুগল, তারপর এই প্রথম তাকে দেখা গেল।

প্রায় তেমনই আছে যুগল, তেমনি হিলহিলে বেতের মতো পাতলা চেহারা, তেমনি খাড়া খাড়া চুল। তবে এই মুহূর্তে তাকে অত্যন্ত উদ্‌ভ্রান্ত আর অস্থির দেখাচ্ছে। রীতিমতো আতঙ্কগ্রস্ত সে।

এতকাল পর যুগলকে দেখে সবাই ভারি খুশি। স্নেহলতা শিবানী তো চেঁচামেচিই জুড়ে দিলেন, 'বোস যুগল, বোস—'

যুগল বসল না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই কথা বলতে লাগল, 'অহন বসুম না ঠাউরমা। আপনেগো লগে দেখা কইরাই যামু গা।'

'যাবি যাবি। কতকাল তোকে দেখি না। সেই যে শ্বশুরবাড়ি চলে গেলি, ভুলেও আর এদিক মাড়াস না। শ্বশুর-শাশুড়ি পেয়ে আমাদের একেবারে ভুলেই গেছিস। সে যাক গে, এখন এলি কোত্থেকে?'

'ভাটির দ্যাশ থিকা।'

'শ্বশুরবাড়ি থেকে?'

'হ।'

'ছেলেপুলে হয়েছে?'

'হ।'

'ক'টা?'

'দুই পোলা।'

'একা একা এলি যে, বউ ছেলেদের সঙ্গে আনলি না কেন?'

একটু চুপ করে থেকে আবছা গলায় যুগল বলল, 'অরা আসছে—'

স্নেহলতা শিবানী হেমনাথ, তিনজনেই একসঙ্গে বলে উঠলেন, 'কোথায় রে, কোথায়?'

'ইস্টিমারঘাটায়—'

'স্টিমারঘাটে বসিয়ে এসেছিস! তোরা আস্পর্ধা তো কম নয়! ঘরের বউকে রাজদিয়া পর্যন্ত এনে বাড়িতে তুললি না!'

মুখখানা কাঁচুমাচু করে যুগল বলতে লাগল, 'গুসা কইরেন না। তাগো আননের সোময় আছিল না, আনলেই দেরি হইয়া যাইত। আইজের ইস্টিমার ধরতে পারতাম না। দ্যাশ ছাইড়া জম্মের মতো যাওনের আগে আপনেগো লগে দেখা কইরা গ্যালাম।'

হেমনাথ উৎকণ্ঠিত হলেন, 'কোথায় চলছিস দেশ ছেড়ে?'

'কইলকাতা।'

'কলকাতায় কেন?'

'ভাটির দ্যাশে আর থাকন গেল না বড়কত্তা। আগুন দিয়া গেরামকে গেরাম পোড়াইয়া দিছে, চৌখের সুমুখ থিকা ফসল কাইটা লইয়া যায়। অ্যাত অত্যাচার সইয়া থাকন যায় না। হেইর লেইগা যাইতে আছি গো।'

একটু চুপ। পলকে সমস্ত আবহাওয়াটা বদলে গেল। চারদিক থেকে বিচিত্র এক বিষণ্ণতা সবাইকে ঘিরে ধরতে লাগল।

একসময় হেমনাথ বলে উঠলেন, 'কলকাতায় কোনও দিন যাস নি। অচেনা জায়গায় গিয়ে কী করবি, কোথায় থাকবি, কী খাবি—তার কি কিছু ঠিক আছে! বরং এক কাজ কর, বউ ছেলেদের নিয়ে এখানেই চলে আয়। রাজদিয়াতে কোনও গোলমাল নেই।'

খানিক ভেবে যুগল বলল, 'না বড়কত্তা, কইলকাতাতেই যামু। রাইজদাতে গন্ডগোল নাই বুঝলাম, কিন্তুক হইতে কতক্ষণ? কতহানে যে খুন জখম আরম্ভ হইয়া গ্যাছে! হেয়া ছাড়া—'

'কী?'

'আমার হউর (শ্বশুর), তিন খুড়া হউর, দুই পিসাতো ভায়রা আর তাগো গুষ্টি আমার লগে যাইতে আছে। তাগো ফেলাইয়া আমি ক্যামনে আসি? এত মাইনষের জাগা দ্যাওন তো সোজা না বড়কত্তা—'

মনে মনে হেমনাথ ভেবে দেখলেন, কথাটা ঠিকই বলেছে যুগল। শ্বশুরবাড়ির আত্মীয় স্বজনদের ফেলে একা একা সে এখানে আসতে পারে না। আবার সবাই এলে এতগুলো মানুষকে আশ্রয় দেওয়া তাঁর পক্ষে অসম্ভব।

হেমনাথ এবার অন্য প্রসঙ্গে চলে গেলেন, 'ভাটির দেশ থেকে কি অনেক লোক চলে যাচ্ছে?'

'মেলা বড়কত্তা, মেলা। যা দশ বিশ ঘর আছে, হেরাও থাকব না। দুই চাইর দিনের ভিতরে সাফ হইয়া যাইব।' একটু থেমে যুগল আবার বলল, 'যদিন পারেন আপনেরাও যাইয়েন গা।'

হেমনাথ উত্তর দিলেন না।

যুগল এবার বলল, 'আর খাড়ইতে পারুম না। ইস্টিমার ছাড়নের সোময় হইয়া আইল। যাই গা ঠাউরমা, যাই বড়কত্তা, চললাম ছুটোবাবু—' হেমনাথ শিবানী আর স্নেহলতাকে প্রণাম করে একটু পর চলে গেল যুগল।

যুগল চলে যাবার পর পুবের ঘরের তক্তপোশে শুয়ে শুয়ে তার কথাই ভাবছিল বিনু। ওরা কলকাতায় যাচ্ছে।

ন'বছর আগে বিনুরা যেদিন প্রথম রাজদিয়া এল সেদিনই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কলকাতার কত খবর নিয়েছিল যুগল। কলকাতা তখন তার কাছে স্বপ্ন, তার কল্পনায় কলকাতা রমণীয় স্বর্গ হয়ে ছিল।

কিন্তু চল্লিশের কলকাতা আর এখনকার কলকাতা কি এক? প্রতিদিন ডাকে যে খবরের কাগজ আসে তাতে কলকাতার ভয়াবহ ছবি থাকে। সুবিশাল ওই মহানগর নাকি উদ্বাস্তুতে ছেয়ে গেছে। কোথাও থাকবার জায়গা নেই। তাই ছিন্নমূল নরনারীর দল রেল স্টেশনে, ফুটপাথে, রাস্তায় ছড়িয়ে পড়েছে।

আজকের কলকাতা যুগলকে কোন স্বর্গে পৌঁছে দেবে, কে জানে।

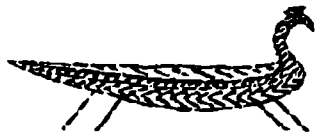

যুগল যা ভবিষ্যদ্বাণী করে গিয়েছিল, অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেল। একটা মাসও তারপর কাটে নি, রাজদিয়ার মাটি তেতে উঠল।

ঢাকা থেকে এসে কারা যেন সুজনগঞ্জে, মীরকাদিমে, ওদিকে আউটশাহী বেতকা আবদুলাপুরে প্রায় মিটিং করে যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে ঘরের চালে আগুন লাগছে, মাঠের পর মাঠ পাকা ধান কারা রাতের অন্ধকারে কেটে নিয়ে যাচ্ছে। শুধু কি তাই, সন্ধে হলেই ঘরের চালে চালে ঢিল পড়ে, দেশ ছেড়ে চলে যাবার জন্য বেনামা চিঠি আসে। এমন চিঠি খানকতক হেমনাথও পেয়েছেন।

ব্যাপারটা এতেই থেমে থাকল না। সুজনগঞ্জের হাট থেকে ফিরবার পথে সেদিন বারুইপাড়ার রাখাল আর যুগীপাড়ার রাধাবল্লভ সড়কির ঘা খেয়ে এল। তারপর যেদিন গণকপাড়ার কাপাসীকে খুঁজে পাওয়া গেল না সেদিন থেকে এই রাজদিয়াতেও ভাঙন শুরু হয়ে গেল। গণকপাড়া তো বটেই, কুমোরপাড়া কামারপাড়া বারুইপাড়া নাহাপাড়া, সব জায়গা থেকেই দলে দলে মানুষ ভিটেমাটি ফেলে স্টিমারে করে কলকাতার দিকে চলে যেতে লাগল। হেমনাথ আর মোতাহার সাহেব 'পিস কমিটি' করেও ভাঙন ঠেকাতে পারলেন না।

ইদানীং সব চাইতে আশ্চর্য ব্যবহার হয়েছে মজিদ মিঞার। আগে প্রায় প্রতি সপ্তাহেই হেমনাথের বাড়ি আসত সে, আজকাল হাজার ডাকাডাকি করলেও আসে না। দেখা হলে এড়িয়ে যায়। তার সম্বন্ধে নানারকম কথা কানে আসছে। লোকটা অদ্ভুতভাবে বদলে গেছে।

শোনা যায়, মজিদ মিঞা নাকি কেতুগঞ্জের দিকে লিগের পান্ডা হয়ে উঠেছে। আশ্চর্য, এই মানুষই ন' বছর আগে, বিনুরা প্রথম যেদিন রাজদিয়ায় এল, পনের মাইল জল ঠেলে তাদের দেখতে এসেছিল। এই মানুষই সিগারেট খাবার জন্য তাকে মেরেছিল, মারের চোটে জ্বর এলে সারারাত তার শিয়রে বসে কেঁদেছিল। সুজনগঞ্জের হাটে দাঙ্গা বাধলে এই মানুষই পাগলের মতো ছোটাছুটি করেছিল। রক্তাক্ত, আহত অবস্থায় লারমোরকে রাজদিয়ায় নিয়ে আসার পর সে কমলাঘাটে ছুটেছিল ডাক্তার আনতে। তার হৃদয়ের উত্তাপ, তার আত্মীয়তাবোধ, তার মমতা, মহত্ত্ব বিনুকে এতকাল মুগ্ধ করেছে। আশ্চর্য, সেই মানুষটা বদলে গেল!

রাজদিয়ায় ততটা না হলেও আশেপাশের গ্রামগঞ্জগুলো থেকে প্রায়ই খুন-জখম-আগুনের খবর আসছিল। রাত হলেই উন্মত্ত চিৎকার শোনা যায়, অন্ধকার চিরে চিরে মশালের আলো দপদপ করে জ্বলতে থাকে।

একদিন আরও নিদারুণ খবর এল। রাজদিয়া থেকে গোয়ালন্দ পর্যন্ত যে স্টিমার সারভিস ছিল তা বন্ধ হয়ে গেছে। সমস্ত পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে রাজদিয়া যেন অজানা দ্বীপের মতো জল-বাংলার এই প্রান্তে পড়ে রইল।

শুধু রাজদিয়া বা চারধারের গ্রামগুলোতেই নয়, ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ-মানিকগঞ্জ থেকেও গোলমালের খবর আসছিল।

যত শুনছিলেন, যত দেখছিলেন, ততই যেন স্তব্ধ হয়ে যাচ্ছিলেন হেমনাথ। সমস্ত জগৎ থেকে কিছুদিনের জন্য নিজেকে গুটিয়ে এনে চুপচাপ বসে রইলেন। ঠিক বসে রইলেন না, সেই বড় বড় লোহার বাক্সগুলো খুলে সারা জীবনের সঞ্চয় অসংখ্য ভাল ভাল জিনিস— ময়ূরের পালক, সুন্দর হস্তাক্ষর, চকচকে পাথর, চমৎকার ছবি—দেখে দেখে কাটালেন। মন খারাপ হলেই তিনি এগুলো নিয়ে বসেন। সারাদিন এসব দেখবার পর সন্ধেবেলা গীর্জায় লারমোরের সমাধিতে বাতি জ্বালিয়ে দিয়ে আসতে লাগলেন।

দিনকয়েক পর হঠাৎ বুঝিবা হেমনাথের মনে হল, এভাবে নিজেকে গুটিয়ে এনে ঘরে বসে থাকা

ঠিক হয়নি। আবার আগের মতো তিনি গ্রামে গ্রামে ঘুরতে লাগলেন। এই দুঃসময়ে তিনি পাশে থাকলে সবাই ভরসা পাবে।

চারদিক জুড়ে যখন আগুন জ্বলছে সেইসময় একদিন দুপুরবেলা ভবতোষ এলেন। চুল এলোমেলো, চোখের কোলে শ্যাওলার মতো কালচে দাগ, মুখময় তিন চার দিনের দাড়ি, চোখ আরক্ত। সমস্ত শরীর ঘিরে সীমাহীন বিষণ্ণতা।

ন' বছর ধরে ভবতোষের এই এক চেহারাই দেখে আসছে বিনু।

এসেই ভবতোষ বললেন, 'খুব খারাপ খবর কাকাবাবু—'

হেমনাথ বাড়িতেই ছিলেন। উদ্বিগ্ন স্বরে বললেন, 'কী ব্যাপার?'

'ঝিনুকের মা মৃত্যুশয্যায়। শেষ সময়ে ঝিনুক আর আমাকে একবার দেখতে চেয়েছে।'

'কে বললে?'

'সে-ই খবর পাঠিয়েছে।'

একটু ভেবে হেমনাথ বললেন, 'ঝিনুকের মা এখন কোথায়?'

'ঢাকায়।'

'তোর শ্বশুরবাড়ি?'

'না।'

'তবে?'

'যার সঙ্গে চলে গিয়েছিল তার কাছেই আছে।'

'কিন্তু—'

'কী?' জিজ্ঞাসু চোখে তাকালেন ভবতোষ।

হেমনাথ বললেন, 'স্টিমার বন্ধ। চারদিকে গোলমাল চলছে। এর ভেতরে ঢাকায় যাবি কী করে?'

'আমি একটা বিশ্বাসী মাঝি ঠিক করে রেখেছি, সে-ই নৌকোয় করে নিয়ে যাবে। ভয়ের কিছু নেই।'

'এ সময় ঝিনুককে পাঠানো উচিত না। ও বড় হয়েছে। তবু ওর মায়ের কথা ভেবে না পাঠিয়ে পারছি না। খুব সাবধানে যাবি কিন্তু—'

ভবতোষ মাথা নাড়লেন।

হেমনাথ আবার বললেন, 'কবে ফিরবি?'

'তিন চারদিনের মধ্যে।'

ঝিনুককে সঙ্গে নিয়ে ভবতোষ চলে গেলেন।

তিন চারদিনের জায়গায় ষোল সতের দিন কেটে গেল। তবু ঝিনুকরা ফিরছে না। তাদের কোনও বিপদ ঘটল কিনা, বোঝা যাচ্ছে না। স্নেহলতা শিবানী এবং হেমনাথ অস্থির হয়ে উঠলেন। আর বিনু?

কৈশোর আর যৌবনের প্রায় ন'টা বছর ঝিনুকের সঙ্গে একই বাড়িতে কাটিয়ে দিয়েছে সে। মাঝে মাঝে ভবতোষ ঝিনুককে নিয়ে গেছেন ঠিকই। কিন্তু দু'একদিন পরেই সে ফিরে এসেছে। একসঙ্গে ষোল সতের দিন তাকে ছেড়ে কখনও থাকে নি বিনু।

ঝিনুক যেন শ্বাসবায়ুর মতো সহজ। কাছে থাকলে টের পাওয়া যায় না। এই ন' বছরে ধীরে ধীরে জীবনের কতখানি জায়গা জুড়ে সে ব্যাপ্ত হয়ে আছে, এই প্রথম বুঝতে পারল বিনু। ঝিনুকের জন্য প্রতি মুহূর্তে তার শ্বাস যেন রুদ্ধ হয়ে আসতে লাগল।

শেষ পর্যন্ত ঠিক হল, হেমনাথ ভবতোষদের খোঁজে ঢাকায় যাবেন। বিনুও সঙ্গে যেতে চেয়েছিল, হেমনাথ নেন নি। বললেন, 'দু'জনে গেলে কী করে চলবে? বাড়িতে একজন পুরুষমানুষ থাকা দরকার।'

দিনতিনেক পর ঝিনুককে নিয়ে ঢাকা থেকে ফিরলেন হেমনাথ। কিন্তু এ কোন ঝিনুক? চুল আলুথালু। চোখের দৃষ্টি স্থির, উদ্‌ভ্রান্ত। গালে-ঠোঁটে-হাতে, সমস্ত শরীরে কত জায়গায় যে মাংস উঠে উঠে রক্তারক্তি হয়ে আছে। পরনের জামাটা, শাড়িটা নানা জায়গায় ছেঁড়া। কোনও রাক্ষস যেন তার শরীরের সার শুষে নিয়েছে।

ঝিনুককে দেখেই শিবানী স্নেহলতা কেঁদে ফেললেন, 'কী হয়েছে ঝিনুকের? কী হয়েছে? ভব কোথায়?'

হেমনাথকেও চেনা যাচ্ছিল না। শক্তিমান, ঋজু মানুষটা একেবারে ভেঙেচুরে গেছেন যেন। তাঁকে একটা ধ্বংসস্তূপ বলে মনে হচ্ছে।

আড়ষ্ট, ভাঙা গলায় হেমনাথ বললেন, 'ভব নেই।'

স্নেহলতা চিৎকার করে উঠলেন, 'কী হয়েছে ভব'র? বল—বল—'

হেমনাথ যা বললেন, সংক্ষেপে এই রকম। এখান থেকে ঢাকা পৌঁছবার পর ভবতোষ দাঙ্গার ভেতর পড়েছিলেন। ঘাতকের দল ভবতোষকে মেরে ফেলেছে। তারপর ঝিনুককে নিয়ে চলে গিয়েছিল। হেমনাথ ঢাকায় গিয়ে পুলিশ দিয়ে ঝিনুককে উদ্ধার করেছেন। কিন্তু ভাবতোষের মৃতদেহের সন্ধান পাওয়া যায় নি।

শ্বাপদেরা ষোল সতের দিন একটা বাড়িতে ঝিনুককে আটকে রেখেছিল। যে অবস্থায় তাকে উদ্ধার করা হয়েছে, তার চাইতে সে যদি মরে যেত!

স্নেহলতা কাঁদতে কাঁদতে বললেন, 'কেন মরবে, কেন? কী দোষ ওর?'

হেমনাথ ঝাপসা গলায় বলতে লাগলেন, 'কেন যে ওদের আমি ঢাকায় যেতে দিলাম! আমি যদি তখন শক্ত হতাম, কিছুতেই ওরা যেতে পারত না। ভবতোষ মরল। আর এই সোনার প্রতিমা নিজের হাতে আমি বিসর্জন দিলাম।'

একধারে দাঁড়িয়ে পলকহীন ঝিনুকের দিকে তাকিয়ে ছিল বিনু। একটা কথাও বলতে পারছিল না। বার বার তার মনে হচ্ছিল, তীক্ষ্ণমুখ অগণিত শেল তার হৃৎপিণ্ড বিদ্ধ করে যাচ্ছে।

ঢাকা থেকে আসবার পর দু'টো দিন কিছু খেল না ঝিনুক, ঘুমলো না, এমনকি একটা কথাও পর্যন্ত বলল না। দিনরাত শূন্য চোখে দূর ধানখেতের দিকে তাকিয়ে স্থির হয়ে বসে থাকল।

পুরো দু'দিন পর ঝিনুক ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল, 'আমাকে তোমরা মেরে ফেল, আমাকে মেরে ফেল।'

স্নেহলতা সান্ত্বনা দেবেন কি, নিজেই কাঁদতে লাগলেন। ঝিনুকের পিঠে হাত বোলাতে বোলাতে বললেন, 'কাঁদে না দিদি, কাঁদে না—'

'আমার যে আর কিছুই নেই দিদা! আমার বেঁচে থেকে কী লাভ?'

'ও সব ভুলে যা দিদিভাই—'

'ভুলতে যে পারছি না।'

উত্তর না দিয়ে স্নেহলতা তার পিঠে হাত বুলিয়ে যেতে লাগলেন।

ঝিনুক বলতে লাগল, 'আমি এখানে থাকব না দিদা, আমাকে আর কোথাও পাঠিয়ে দাও।'

'কোথায় যাবি দিদি?'

'যেখানে খুশি পাঠাও। আমার এখানে বড্ড ভয় করছে।'

'কিসের ভয়, আমরা তো আছি।'

'না না, তোমরা কিছু করতে পারবে না। ওরা আমাকে আবার ধরে নিয়ে যাবে।'

যত দিন যাচ্ছে, ঝিনুকের ভয় ততই বাড়তে লাগল। রাত্রিবেলা চারধারের গ্রামগুলো থেকে যখন বর্বর চিৎকার ভেসে আসে কিংবা মশালগুলো দপ দপ করে জ্বলতে থাকে, সেই সময় ঝিনুক অস্থির হয়ে ওঠে। স্নেহলতা শিবানী হেমনাথ বা বিনু—যে-ই কাছে থাকে তাকে জড়িয়ে ধরে কাঁপতে কাঁপতে বলে, 'আমি আর বাঁচব না, এখানে থাকলে নিশ্চয়ই মরে যাব।'

দেখেশুনে একদিন হেমনাথ বললেন, 'ওর মনের ভেতর ভয় বাসা বেঁধে ফেলেছে। এখানে রাখা আর ঠিক হবে না।'

স্নেহলতা বললেন, 'এখানে তো রাখবে না বলছ। কোথায় রাখবে তা হলে?'

'ভাবছি কলকাতায় অবনীমোহন কি সুধা সুনীতির কাছে পাঠিয়ে দেব।'

'কলকাতায়?'

'হ্যাঁ।'

'নিয়ে যাবে কে?'

'বিনু। এ ছাড়া সত্যিই ওকে বাঁচানো যাবে না।'

বিনু কাছেই ছিল। বলল, 'এক কাজ করা যাক বরং—'

হেমনাথ শুধোলেন, 'কী কাজ?'

'বাড়িঘর জমিজমা বেচে চল সবাই চলে যাই।'

দৃঢ় স্বরে হেমনাথ বললেন, 'না, কিছুতেই না। কোনও অন্যায় আমি করিনি। বিনা দোষে জন্মভূমি ছেড়ে কেন চলে যাব? দুর্দিন দেখে সবাই যদি পালিয়ে যাই সুদিন আনবে কে? মনে রেখো সব মানুষই পশু হয়ে যায়নি, যেতে পারে না। আগের মতো সময় আবার আসবেই। তা ছাড়া—'

'তা ছাড়া?'

'এখনও যারা রাজদিয়ায় আর আশপাশের গ্রামগুলোতে আছে, আমি চলে গেলে তারাও থাকবে না। তাদের জন্যও আমার রাজদিয়ায় থাকা দরকার।'

'কিন্তু—'

হেমনাথ হেসে ফেললেন, 'তুই কি বলতে চাস, বুঝতে পেরেছি। এর জন্যে যদি মরতেও হয়, আমি রাজি।'

শেষ পর্যন্ত স্থির হল, বিনু একলাই ঝিনুককে নিয়ে কলকাতায় চলে যাবে।

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়তে স্নেহলতা বলে উঠলেন, 'কিন্তু—'

'কী?'

'স্টিমার তো বন্ধ, যাবে কী করে?'

হেমনাথ বললেন, 'তারপাশা থেকে দিনে একটা কি দু'টো করে স্টিমার যাচ্ছে গোয়ালন্দে। এখান থেকে নৌকোয় ওরা তারপাশা যাবে। আমি রাজেক আর তমিজ মাঝিকে ঠিক করে রেখেছি। সে-ই বিনুদের তারপাশায় নিয়ে স্টিমারে তুলে দিয়ে আসবে।'

'কিন্তু—'

'আবার কী?'

'ঢাকায় গিয়ে ঝিনুকের যা হাল হয়েছে, তারপাশা যাবার পথে আবার কিছু হবে না তো?'

'ওদিকে কোনও গোলমাল হয় নি। তা ছাড়া রাজেকরা খুব বিশ্বাসী। তারপর অদৃষ্ট।'

দিন দুই পর সন্ধেবেলা পুকুরঘাট থেকেই রাজেক মাঝির নৌকোয় উঠল বিনুরা। বিনুরা বলতে বিনু আর ঝিনুক। সারারাত বাইলে ভোরবেলা তারা তারপাশা পৌঁছে যাবে। ঝিনুক বিনুর কোলের কাছে চিত্রার্পিতের মতো বসে আছে।

সবে কার্তিকের শুরু। এখনও মাঠে প্রচুর জল। ধানখেত আর শাপলাবন ঠেলে অনায়াসেই নৌকো নিয়ে বড় নদীতে চলে যাওয়া যাবে।

স্নেহলতা শিবানী আর হেমনাথ পুকুর পাড়ে দাঁড়িয়ে আছেন। শিবানী স্নেহলতা খুব কাঁদছিলেন। হেমনাথ রাজেক মাঝিকে সাবধান করে দিচ্ছেন। পাখি পড়ানোর মতো বার বার বলছেন, কিভাবে কেমন করে তারপাশায় নিয়ে যাবে।

রাজেক সমানে মাথা নাড়ছে আর বলছে, 'আপনে নিচ্চিন্ত থাকেন বড়কত্তা, জান থাকতে ছুটোবাবুগো গায়ে কেও হাত দিতে পারব না। আল্লার কিরা—'

বিনু একদৃষ্টে হেমনাথের দিকে তাকিয়ে ছিল। স্নেহলতা শিবানী—কাউকেই দেখতে পাচ্ছিল না সে। তার চোখের সামনের সব কিছু ঘিরে, সমস্ত চরাচর জুড়ে প্রসন্ন পুরুষটি যেন দাঁড়িয়ে আছেন।

হেমনাথকে দেখতে দেখতে অন্যমনস্ক হয়ে গেল বিনু। হঠাৎ ক'বছর আগের সেই দিনটির কথা মনে পড়ে গেল তার। জল বাংলার এই অখ্যাত নগণ্য জনপদে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে সারা রাজদিয়ায়

pathagar.net

যেন উৎসব শুরু হয়ে গিয়েছিল। আর আজ? রাতের অন্ধকারে, নিঃশব্দে, সবার চোখের আড়ালে চলে যেতে হচ্ছে। নিরানন্দ, নিরুৎসব এই বিদায় বিনুর বুক অসীম বিষাদে ভরে দিতে লাগল।

এই মুহূর্তে কত কথাই মনে পড়ছে তার। লারমোর, মজিদ মিঞা, রামকেশব, মনা ঘোষ, গয়জদ্দি ব্যাপারি, রজবালি শিকদার, পতিতপাবন, মোতাহার হোসেন সাহেব, ফসলকাটা মাঠে যে লোকটা ইঁদুরের গর্ত থেকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ধান বার করত সেই তালেব, চরের সেই ভূমিহীন কৃষাণের দল, এমনকি ধানের খেতে গা দুলিয়ে দুলিয়ে যে বুড়ো সোনালি গোসাপটা আলের ওপর দিয়ে বুকে হেঁটে যেত—সবাই চোখের সামনে ভিড় করে এল। আর মনে পড়ছে শরতের উজ্জ্বল নীলাকাশকে, সাদা সাদা ভবঘুরে মেঘদলকে, কার্তিকের ধূসর হিমকে। জলসেঁচি শাকের নিবিড় লাবণ্য, বেতঝোপ, মুত্রাবন, বড় বড় পদ্মপাতা, জলসিঙাড়া, কাউ আর হিজলবন, কইওকড়া আর হেলেঞ্চা লতার দাম, শঙ্খচিলের ঝাঁক, গোবক, কানিবক, পানিকাউ, শালিক, বুলবুলি, বাচা-ট্যাঙরা-বাজালি-বজুরি মাছেরা—কত কথা যে মনে পড়তে লাগল! এরাই তো তার হাত ধরে কৈশোর থেকে যৌবনে পৌঁছে দিয়েছে। হায়, কৈশোরের এই রম্যভূমি, যৌবনের এই স্বর্গে আর কোনও দিন ফেরা হবে কিনা, কে জানে।

জল-বাংলার মনোহর দৃশ্য, পশুপাখি, বৃক্ষলতা খুব বেশিক্ষণ বিনুকে বিভোর করে রাখতে পারল না। এবার তার চোখ এসে পড়ল খুব সামনে, একেবারে কোলের কাছে, ঝিনুকের ওপর। মেয়েটাকে দেখতে দেখতে অপার স্নেহে, অসীম করুণায় তার বুক ভরে যেতে লাগল। এই সময় হঠাৎ মনে পড়ল, তার বাবা অবনীমোহন পশ্চিম বাংলার মানুষ, মা পূর্ব বাংলার মেয়ে। তার বুকের একধারে পূর্ব বাংলা, আরেক ধারে পশ্চিম বাংলা। তার রক্তের এক স্রোত পদ্মা, আরেক স্রোত গঙ্গা। আর কোলের কাছে এই মেয়েটা—এই ঝিনুক? সে তো পূর্ব বাংলার লাঞ্ছিত, অপমানিত আত্মা। তাকে নিয়েই সে কলকাতায় চলেছে।

হঠাৎ প্রাণের ভেতর কী হয়ে গেল, কে বলবে। বড় মায়ায় ঝিনুককে সে বুকের কাছে নিবিড় করে টেনে আনল।

পুকুর পাড় থেকে একসময় হেমনাথের গলা ভেসে এল, 'আর দেরি করিস না রাজেক, নৌকো ছেড়ে দে—'

মাঝি বলল, 'এই ছাড়ি—'

একটু পর জলে বৈঠা পড়ল, **একটানা বাজনার মতো ছপছপ শব্দ কানে আসতে লাগল।**

নৌকো অকূলে ভাসল।

pathagar.net

॥ দ্বিতীয় পর্ব সমাপ্ত ॥

তৃতীয় পর্ব

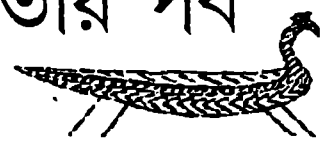

pathagar.net

আশ্বিনের মাঝামাঝি এ বছর পুজো শেষ হয়েছে। তখন থেকেই হিম পড়তে শুরু করেছিল। এই জলের দেশে হিমটা বেশ তাড়াতাড়ি নামে। এখন এই কার্তিকে কুয়াশাও হচ্ছে খুব। বিকেল হতে না হতেই মিহি সরের মতো কুয়াশায় আকাশ ঝাপসা হয়ে যায়। সূর্য পশ্চিম দিগন্তের দিকে যত হেলতে থাকে, কুয়াশার স্তরটা ক্রমশ পুরু হতে হতে সমস্ত চরাচর ঢেকে ফেলে।

সন্ধেবেলায় হেমনাথের বাড়ির পুকুরঘাট থেকে নৌকো ছেড়েছিল। সামনের দিকের গলুইতে বৈঠা হাতে বসেছে রাজেক। পেছনের গলুইতে তার চাচাতো ভাই তমিজ। তমিজের হাতেও বৈঠা।

নৌকোর মাঝখানে ছইয়ের ভেতর বিনু আর ঝিনুক। পাটাতনের একধারে রয়েছে শতরঞ্চি-জড়ানো মস্ত বিছানা এবং চামড়ার সুটকেস, যেটার মধ্যে দু'জনের জামাকাপড়, বিনুর বি.এ'র ডিগ্রি, ঝিনুকের ম্যাট্রিকুলেশনের সার্টিফিকেট আর টুকিটাকি নানা দরকারী জিনিস। আছে দক্ষিণা কালীর একটি ছোট ছবি। স্নেহলতা ওটা সঙ্গে দিয়েছেন। তাঁর বিশ্বাস, বিপদে আপদে মা কালী বিনুদের রক্ষা করবেন। সুটকেসের পাশে বেতের বড় ঝুড়ির ভেতর রাস্তায় খাওয়ার জন্য চিঁড়ে, মুছি গুড়, কদমা, একফানা পাকা মোহনবাঁশি কলা আর পাতক্ষীর। এত লটবহর সঙ্গে নিতে চায়নি বিনু। প্রথমত, ঝিনুকের ওপর দিয়ে যে মারাত্মক বিপর্যয় ঘটে গেছে তাতে তাকে সামলাবে, না মালপত্রের ওপর নজর রাখবে? তা ছাড়া রাস্তায় কী ঘটবে, না ঘটবে সে সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র ধারণা নেই। তবে এটা জানা আছে, এখন জলেস্থলে সর্বত্র মারাত্মক বিপদ ওত পেতে রয়েছে। হেমনাথ ভরসা দিয়েছেন, তারপাশার দিকে যেতে যে এলাকাগুলো পড়ে, সে সব জায়গায় বড় রকমের ঘটনা ঘটেনি। কিন্তু যেভাবে চারপাশে উন্মত্ততা ছড়িয়ে পড়েছে তাতে ঘটতে কতক্ষণ? নৌকো যত এগুচ্ছে, একটা তীব্র, চাপা আতঙ্ক সব দিক থেকে বিনুকে ঘিরে ধরছে।

রাজেক এবং তমিজ অত্যন্ত বিশ্বাসী, জান কবুল করে ওরা বিনুদের রক্ষা করতে চেষ্টা করবে। কিন্তু দলবদ্ধ হয়ে ঘাতকেরা হানা দিলে রাজেকদের পক্ষে কতটা বাধা দেওয়াই বা সম্ভব? বিনুদের বাঁচাতে গিয়ে ওদের প্রাণটাই হয়তো চলে যাবে।

প্রবল উৎকণ্ঠা নিয়ে বিনু অন্তহীন অনিশ্চয়তার মধ্যে ঝাঁপ দিয়েছে। শেষ পর্যন্ত যদি নির্বিঘ্নে তারপাশায় পৌঁছনোও যায়, সেখানে গিয়ে কী দেখা যাবে? বিনু শুনেছে, তারপাশা ভাগ্যকুল মুন্সিগঞ্জ নারায়ণগঞ্জ কি রাজাবাড়ির স্টিমারঘাটে দিনের পর দিন হাজার হাজার মানুষ প্রচণ্ড আশঙ্কা নিয়ে রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছে।

সারাদিনে একটাই মাত্র স্টিমার। কোনও কোনও দিন দুটোও দেয়। এদিকে ভয়ার্ত মানুষের সীমাসংখ্যা নেই। নারায়ণগঞ্জ থেকে ছেড়ে স্টিমার নানা ঘাট ছুঁয়ে ছুঁয়ে গোয়ালন্দে যায়। সেখানে থেকে ট্রেন ধরে বর্ডার পার হয়ে কলকাতা।

ছইয়ের পেছন দিকটা ক্যাঁচা বাঁশের ঝাঁপ ফেলে বন্ধ করে দিয়েছে তমিজরা। সামনের দিকের দু' পাল্লার ঝাঁপের একটা পুরোপুরি আটকানো। অন্যটা একটুখানি খোলা। তার ফাঁক দিয়ে যতদূর চোখ যায়, নদী এবং আকাশ নিবিড় কুয়াশায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে। ঠাণ্ডা, জলো হাওয়া বয়ে যাচ্ছে চরাচরের ওপর দিয়ে।

কোজাগরী লক্ষ্মীপুজোর পর এখন কৃষ্ণপক্ষ চলছে। কুয়াশা এবং হিমের সঙ্গে মিশে আছে অন্ধকার।

হেমন্তের শুরুতে নদী এখন অনেক শান্ত। বর্ষার সেই উথলপাথল খ্যাপামি আর নেই। স্রোত আছে ঠিকই, ঢেউও রয়েছে, কিন্তু দু' মাস আগে এই নদীই যে ফুলে ফেঁপে সর্বনাশা পাহাড়প্রমাণ চেহারা নিয়ে প্রবল আক্রোশে ছুটে যেত, তা যেন ভাবা যায় না। তখন তার শুধু খাই খাই, সামনের সমস্ত

কিছু গ্রাস করার জন্য আকাশপাতাল হাঁ মেলে থাকত। দু'পাড় ভেঙে, পরম মমতায় গড়ে তোলা মানুষের বসতি, তাদের জমিজমা তছনছ করে গাঁয়ের পর গাঁ গ্রাস করার পর তবে তার শান্তি।

কৃষ্ণপক্ষের এক ফালি ক্ষীণ চাঁদ হয়তো আছে, হয়তো রয়েছে অগুনতি নক্ষত্রও, কিন্তু কুয়াশার পর্দার আড়ালে সে সব ঢাকা পড়ে গেছে। দূরে দূরে রহস্যময় সংকেতের মতো কিছু আলোর ছোটাছুটি চোখে পড়ে। ওগুলো জেলে নৌকোর আলো। সারা বছরই, কী শীত কী গ্রীষ্ম, রাতভর জেলে ডিঙিগুলো নদীর বুকে ঘুরে বেড়ায়। জলের অতল স্তর থেকে মাছ তুলে আনতে না পারলে দু'বেলা পেটের ভাত জুটবে কোত্থেকে? গত দু'বছর ধরে মাঝে মাঝেই দাঙ্গা বাধছে, দেশভাগ হয়ে গেছে, চোদ্দ পুরুষের ঘর-ভদ্রাসন ছেড়ে হাজার হাজার মানুষ চলে যাচ্ছে সীমান্তের ওপারে। কিন্তু যা-ই ঘটুক, গরিবের চেয়েও গরিব মাছ-ধরাদের ডিঙি আর জাল নিয়ে সন্ধের পর নদীতে না বেরিয়ে উপায় নেই। মাছই তাদের সব, মাছের সঙ্গে তাদের বাঁচা-মরা জড়ানো।

নদীর গায়ে ছলাত ছলাত ঢেউয়ের শব্দ হচ্ছে, সেই সঙ্গে তমিজ এবং রাজেকের বৈঠা দিয়ে জল কাটার আওয়াজ। হেমন্তের ঝিরঝির হাওয়া নিঃশব্দে বয়ে যাচ্ছে। ফলে চারদিক একেবারে নিঝুম।

ভেতরে একধারে একটা হেরিকেন ছইয়ের গায়ে দড়ি দিয়ে বাঁধা। পাছে নৌকোর দুলুনিতে সেটা পড়ে যায়, সেই কারণে। হেরিকেনটার আলোর তেজ নেই। বাইরে থেকে যাতে নজরে না পড়ে সেজন্য নিবু নিবু করে রাখা হয়েছে। অর্থাৎ কারোকে কিছু বুঝতে না দিয়ে চুপিসারে রাজেকরা তাদের তারপাশা স্টিমারঘাটে পৌঁছে দিতে চায়। খোলা নদীর জলধারার তুলনায় স্টিমারঘাট অনেকটা নিরাপদ। সেখানে নাকি পুলিশ পাহারার কিছু ব্যবস্থা আছে।

ছইয়ের তলায় চাদর বিছিয়ে বিছানা পেতে দেওয়া হয়েছে। সেটার ওপর শুয়ে আছে ঝিনুক। মাথায় তেলহীন রুক্ষ চুল, চোখ দু'টো বোজা, তার তলায় গাঢ় কালি, হনু চামড়া ফুঁড়ে বেরিয়ে এসেছে। সমস্ত মুখে কালচে ছোপ। রোগা হাত দু'টোর নীল শিরা বেরিয়ে পড়েছে। কে বলবে, কয়েক মাস আগে এই মেয়েটার সারা শরীরে কী লাবণ্যই না মাখানো ছিল! চমৎকার স্বাস্থ্য ছিল ঝিনুকের। স্বভাবটা সামান্য চাপা ধরনের হলেও ভেতরে ভেতরে সে ছিল খুবই টগবগে। বাইরে তেমন একটা উচ্ছ্বাস নেই, ওর মায়ের কারণে মাঝে মাঝেই বিষণ্ণ এবং অন্যমনস্ক হয়ে থাকত। সেই কত কাল ধরে মেয়েটাকে দেখে আসছে বিনু। ওর তাকানো, কথা বলার মৃদু ভঙ্গি, পাতলা ফুরফুরে ঠোঁটের ফাঁকে হাসির চিকন রেখা, হাঁটার সময় নিঃশব্দে আলতো করে পা ফেলা—এ সবের মধ্যে তার মনের কোন প্রতিক্রিয়া ফুটে বেরোয়, মুহূর্তে বুঝে নেয় বিনু। বাইরে যেমনই হোক, বিনু এতদিন জেনে এসেছে ঝিনুকের মধ্যে গোপন এক জলপ্রপাত রয়েছে। সেটা বাইরে থেকে অন্য কেউ টের পায় না ঠিকই, কিন্তু বিনু, একমাত্র বিনুই তার খবর রাখে।

সেই ঝিনুককে এখন চেনাই যায় না। ভগ্নস্তূপের মতো সে বিছানায় পড়ে আছে। শ্বাসপ্রশ্বাসের তালে তালে খুব ধীরে তার বুক ওঠানামা করছে, আর ক্ষীণ গোঙানির মতো একটা আওয়াজ বেরিয়ে আসছে তার গলা থেকে। বুকের ওই উত্থানপতন আর গোঙানিটা না থাকলে মনে হত, সে বুঝি বেঁচে নেই।

বিনু ঝিনুকের মুখের ওপর ঝুঁকে খুব আস্তে ডাকল, 'ঝিনুক—ঝিনুক—'

সাড়া নেই।

অনেকক্ষণ ডাকাডাকির পর ঝিনুক ভীষণ ক্লান্তভাবে চোখের পাতা একটুখানি মেলল। চোখের মণিদু'টো ঘোলাটে, লালচে এবং নির্জীব। মনে হয়, কিছুই সে দেখতে পাচ্ছে না। দেখলেও বুঝতে পারছে না।

অসীম মমতায় ঝিনুকের রুক্ষ চুলে হাত বুলোতে বুলোতে বিনু জিজ্ঞেস করে, 'খুব কষ্ট হচ্ছে?'

আস্তে মাথা নাড়ে ঝিনুক—না।

এই এক অদ্ভুত মেয়ে। যত যন্ত্রণাই হোক, শতকষ্টে বুক ফেটে চৌচির হয়ে যাক, মুখ ফুটে কখনও তা বলবে না।

সেই দুপুর বেলায় জোর করে মেয়েটাকে দু'চার গ্রাস ভাত খাইয়ে দিয়েছিলেন স্নেহলতা। তারপর থেকে এখন পর্যন্ত ওর পেটে এক ফোঁটা জলও পড়েনি। সেই যে ঢাকা থেকে সব কিছু খুইয়ে ভেঙেচুরে

একটা ধ্বংসস্তূপের মতো ঝিনুক ফিরে এসেছিল, তখন থেকে বাঁচার কোনও ইচ্ছাই তার মধ্যে অবশিষ্ট নেই। খিদেতেষ্টার অনুভূতিটাই নষ্ট হয়ে গেছে। কেউ খাইয়ে দিলে একটু খেত। কারোর সঙ্গে কথা বলত না, কোথাও বেরুত না, সারাক্ষণ ঘরের কোণে মুখ বুজে অসাড় মূর্তির মতো পড়ে থাকত। জীবনের সব লক্ষণ তার মধ্যে থেকে যেন মুছে গেছে।

বিনু ফের বলে, 'খিদে পেয়েছে?'

আগের মতোই মাথা নেড়ে ঝিনুক জানায়—না।

বিনু বলে, 'পেয়েছে। তুমি বুঝতে পারছ না।'

ঝিনুক উত্তর দেয় না।

বিনু এবার বলে, 'সেই কখন দু'টি ভাত খেয়েছিলে। তারপর অনেকটা সময় পার হয়ে গেছে। একটু কিছু খাও। এতক্ষণ খালি পেটে থাকতে নেই।'

ঝিনুকের এক জবাব—না।

বিনু জানে, হাজার বার বললেও ঝিনুক খেতে চাইবে না। স্নেহলতা রাস্তায় খাওয়ার জন্য বেতের বড় ঝুড়ি বোঝাই করে যে খাবার দাবার দিয়েছিলেন তার থেকে খানিকটা চিঁড়ে, একটু পাতক্ষীর আর একটা কলা বার করে বাঁশের সাজিতে নিয়ে ঝিনুককে বলল, 'হাঁ কর—'

একটু কী ভাবল ঝিনুক। এবার কিন্তু সে আপত্তি করল না। মুখটা সামান্য ফাঁক করল।

বিনু অল্প অল্প করে চিঁড়ে, কলা, ক্ষীর ঝিনুকের মুখে দিতে দিতে বলতে লাগল, 'অনেক দূর যেতে হবে। তারপাশা থেকে স্টিমারে গোয়ালন্দ, সেখান থেকে ট্রেন ধরে কলকাতা। শরীর এমনিতেই তোমার দুর্বল। পেট ভরে না খেলে উঠে দাঁড়াবে কী করে? এতটা রাস্তার ধকল কিছুতেই সইতে পারবে না।'

বিনুর কথা কানে গেল কিনা, কে জানে। সামান্য দু'চার মুঠো চিঁড়ে টিঁড়ে খাওয়ার পর ঝিনুক বলল, 'আমি আর খেতে পারব না।'

বিনু বুঝতে পারে, জোরাজুরি করে কাজ হবে না। ভাবল, পরে আবার খাওয়াতে চেষ্টা করবে। বলল, 'চিঁড়ে খেয়ে নিশ্চয়ই গলা শুকিয়ে গেছে। জল খেয়ে নাও—'

স্নেহলতার সব দিকে নজর। পোড়ামাটির কলসিতে খাওয়ার জলও সঙ্গে দিয়েছিলেন। কাচের গেলাসে জল ভরে ঝিনুককে খাইয়ে দিল বিনু।

জল খাওয়ার পর চোখ আবার আপনা থেকে বুজে গেল ঝিনুকের। নদীর জল ছুঁয়ে ছুঁয়ে ঠান্ডা হাওয়া বয়ে যাচ্ছে। মুখখানা বাইরে রেখে চাদর দিয়ে ঝিনুকের সারা গা ঢেকে দিল বিনু। তারপাশা পৌঁছতে এখনও অনেক দেরি। যতক্ষণ পারে ঘুমিয়ে নিক ঝিনুক।

অনেকটা সময় ঝিনুকের মাথায় হাত বুলোবার পর ফের সামনের খোলা ঝাঁপটার ফাঁক দিয়ে নদীর দিকে তাকায় বিনু। ধু ধু দুনিরীক্ষ অন্ধকার এবং কুয়াশায় জেলেডিঙির নিষ্প্রভ আলোগুলো ছাড়া আর কিছুই নজরে পড়ছে না। কিন্তু হেমন্তের এই শান্ত নদী, ঝাপসা আকাশ, দু'পাড়ের গাঢ় কালির পোঁচের মতো গাছগাছালি, কৃষ্ণপক্ষের আকাশে অদৃশ্য তারাদের মেলা, ম্রিয়মাণ চাঁদ— এ সব নিয়ে কিছুই ভাবছিল না বিনু। মনে পড়ছে, কয়েকদিন আগে অবনীমোহন সুধা আর সুনীতিকে চিঠি লিখেছিল সে, কিন্তু তার উত্তর আসেনি।

অবনীমোহন যুদ্ধের সময় ঠিকাদারির কাজে আসাম চলে গিয়েছিলেন। মিলিটারি কনট্রাক্ট নিয়ে ল'য়ে ল'য়ে মজুর জোগাড় করে তিনি তখন মিত্রশক্তির সেনাবাহিনীর যাতায়াতের জন্য সড়ক আর থাকার জন্য ব্যারাক তৈরি করতেন। যুদ্ধ থেমে যাবার পর সে সব কাজ বন্ধ হয়ে যায়। অবশ্য যুদ্ধ যখন পুরোদমে চলছে তখন মাঝে মাঝে জরুরি কাজের ফাঁকে রাজদিয়ায় আসতেন অবনীমোহন। কয়েকদিন কাটিয়ে ফের আসাম। এরই মধ্যে সুধা সুনীতির বিয়ে হয়েছে, সুরমা মারা গেছেন।

যুদ্ধ থামলে অবনীমোহন রাজদিয়া হয়ে কলকাতায় চলে গেছেন। ইচ্ছা ছিল, বিনুকেও সঙ্গে নিয়ে যাবেন কিন্তু পড়াশোনার জন্য বিনুর যাওয়া হয়নি। তা ছাড়া, না যাওয়ার বড় একটা কারণ ঝিনুক। এই মেয়েটার প্রতি বড় মায়ায় তার জীবন তিল তিল করে কখন কিভাবে যে ওর সঙ্গে জড়িয়ে গেছে, নিজেই তা জানে না। সে রাজদিয়াতেই হেমনাথ এবং স্নেহলতার কাছে থেকে গিয়েছিল। ভবিষ্যতের কথা যে স্পষ্ট করে ভাবেনি তা নয়। বিনু জানত, ঝিনুক একদিন তার সারা জীবনের অবিচ্ছেদ্য

সঙ্গী হয়ে উঠবে। ঝিনুকের বাবা, হেমনাথ আর স্নেহলতা সেই স্বপ্নই দেখতেন। অবনীমোহন বা সুধা সুনীতির দিক থেকেও কোনও রকম আপত্তি হত না। বরং সবাই খুশিই হত। মুখ ফুটে কেউ কিছু বলেনি কিন্তু তাদের বিয়েটা অনিবার্য জাগতিক কোনও নিয়মের মতোই যেন স্থির হয়ে ছিল। যদিও ঝিনুকরা ব্রাহ্মণ, বিনুরা কায়স্থ, হেমনাথ এসব সামাজিক বাধা মানতেন না। হেমনাথের হয়তো ইচ্ছা ছিল, বিয়েটা রাজদিয়াতেই রীতিমতো ধুমধাম করে হোক। অনেকদিন তাঁর বাড়িতে বড় রকমের কোনও অনুষ্ঠান হয়নি। যুগলের বিয়ে অবশ্য হয়েছে। তাকে হেমনাথেরা নিজেদের পরিবারের একজন ভাবতেন, তবু তার সঙ্গে রক্তের সম্পর্ক তো নেই, সে নেহাতই ছিল কামলা। অবশ্য সুধা সুনীতির বিয়েও এ বাড়িতেই হয়েছে। কিন্তু তারপরও ক'বছর কেটে গেল। বিনুর বিয়ে হলে অবনীমোহন আসতেন, সুধা সুনীতিরা আসত, রাজদিয়াবাসীদের সবাইকে নেমন্তন্ন করা হত। বিয়েটাকে ঘিরে নগণ্য শহরটা জুড়ে বিরাট উৎসব লাগিয়ে দিতেন হেমনাথরা। তবে চিরকাল রাজদিয়ায় পড়ে থাকত না বিনু। ঝিনুককে নিয়ে একদিন না একদিন তাকে কলকাতায় চলে যেতে হত। আজ সেই যাওয়াই হচ্ছে, কিন্তু কোন ঝিনুককে সঙ্গে করে? কুয়াশাচ্ছন্ন আদিগন্ত নদীতে নৌকোর পাটাতনে ভাঙাচোরা নির্জীব মাংসপিণ্ডের মতো যে নারীটি চোখ বুজে পড়ে আছে, যার বুকের ভেতর কোনও রকমে হৃৎপিণ্ডটা ধুকপুক করছে— ঝিনুকের এমন ভয়ঙ্কর পরিণতি ঘটবে, কোনও দিন কি তা ভাবতে পেরেছিল বিনু? এই ঝিনুককে সুধা সুনীতি বা অবনীমোহনরা কিভাবে গ্রহণ করবেন, জানা নেই।

অবনীমোহন এবং সুধা সুনীতিকে যদিও চিঠি লিখে কলকাতায় যাবার কথা জানিয়ে দিয়েছে সে, কিন্তু সে সব চিঠি ওরা পেয়েছে কিনা, কে জানে। পাকিস্তান হবার পর দু'দেশের ভেতর ডাক চলাচল ঠিকমতো হচ্ছে না। সব কিছুই এখন অনিয়মিত, বিশৃঙ্খল। সীমান্তের এপার থেকে ওপারে চিঠি টিঠি পৌঁছতে কখনও পনের কুড়ি দিন লেগে যায়, কখনও আবার পৌঁছয়ই না। বিনু ভেবে রেখেছে, কলকাতায় গিয়ে বাবার কাছেই উঠবে। তার প্রথম কাজ হবে ঝিনুককে ডাক্তার দেখিয়ে সম্পূর্ণ সুস্থ করে তোলা। যে সর্বগ্রাসী ভয় এবং আতঙ্কে সে কুঁকড়ে আছে তার মন থেকে তা পুরোপুরি মুছে দেওয়া। তাকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার জন্য এটা একান্ত জরুরি।

বিনু জানে না, ঝিনুকের দুঃস্বপ্নের ঘোর কাটতে কত দিন, কত মাস বা কত বছর লেগে যাবে। সারা জীবনও যদি লাগে, মেয়েটাকে সারিয়ে তুলতেই হবে। ঝিনুকের যে শারীরিক ও মানসিক বিপর্যয় ঘটে গেছে তা থেকে বেরিয়ে আসা খুবই দুরূহ। বিনু জানে, এর জন্য অসীম ধৈর্য এবং যত্নের প্রয়োজন। সে জন্য নিজেকে সারাক্ষণ প্রস্তুত রাখতে হবে। কিন্তু সবার আগে যেটা দরকার তা হল কলকাতায় পৌঁছনো।

ঝাপসা নদীর দিকে তাকিয়ে এমন এক ভবিষ্যতের কথা বিনু ভাবছিল যা ঘোর অনিশ্চয়তায় ভরা। খুবই অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল সে, হঠাৎ অন্য কোনও নৌকোর জোরে জোরে বৈঠা টানার শব্দে চকিত হয়ে উঠল। হাত পঞ্চাশেক দূর দিয়ে একটা চারমাল্লাই নৌকো জল কেটে কেটে ঝড়ের গতিতে এগিয়ে চলেছে। ওই নৌকোটায় তাদের নৌকোর মতোই আলো দেখা যাচ্ছে না। হেরিকেন বা লণ্ঠন টণ্ঠন থাকলে নিশ্চয়ই ছইয়ের তলায় আলোর তেজ কমিয়ে রাখা হয়েছে। নৌকোটার দু'ধারে দু'জন করে যে চারজন মাঝি বৈঠা টানছে তাদের নাকমুখচোখ আলাদা করে দেখা যায় না। মনে হচ্ছে অস্পষ্ট চারটে ছায়ামূর্তি।

বিনু ভেতরে ভেতরে সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। রাত্তিরে নদী দিয়ে দেশ ছেড়ে চলে যাওয়াটা তুলনায় নিরাপদ, কিন্তু এমন খবরও পাওয়া গেছে, মাঝে মাঝে নদীতেও হামলা হয়। ঘাতকবাহিনী চারদিকে ছড়িয়ে আছে।

রুদ্ধ গলায় বিনু জিজ্ঞেস করে, 'ওরা কারা হতে পারে?'

সামনের দিকের গলুইতে বসেছে রাজেক। সে বলে, 'ডরের কিছু নাই ছুটোবাবু। যারা খুনখারাপি করে হেরা (তারা) বাত্তি নিবাইয়া চুপচাপ যায় না। মশাল জ্বালাইয়া, নদী তুলফাড় কইরা, চিল্লাইয়া আসমান জমিন ফাড়তে ফাড়তে আমাগো নায়ে ঝাপাইয়া পড়ত।' একটু থেমে বলল, 'আপনেগো লাখান উই নায়ের (নৌকোর) মানুষগুলান আওয়াজ না কইরা, আন্ধারে দ্যাশ ছাইড়া যাইতে আছে গিয়া। চিন্তা কইরেন না।'

বিনু নৌকো দেখে ভয় পেয়ে গিয়েছিল। রাজেকের কথায় তার দুশ্চিন্তা অনেকটাই কেটে যায়। সত্যিই তো, জল্লাদেরা এমন চুপিসারে নদী পাড়ি দিয়ে চলে যেত না। তাদের ওপর চড়াও হয়ে দা-সড়কি চালিয়ে, নৌকোয় আগুন ধরিয়ে সব ছারখার করে ফেলত।

বিনু আস্তে আস্তে মাথা নাড়ে, 'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ। ওরাও বোধহয় আমাদের মতো তারপাশা স্টিমারঘাটে চলেছে।'

রাজেক বলল, 'হেই মনে লয়।'

জোরে শ্বাস টেনে বিনু বলে, 'কোন গ্রাম ছেড়ে ওরা চলে যাচ্ছে, কে জানে—'

'হুগল গেরামেরই এক হাল ছুটোবাবু। চৈদ্দ পুরুষের ভিটামাটি ছাইড়া হিন্দুরা যাইতেই আছে, যাইতেই আছে।'

চারমাল্লাই নৌকোটা ক্রমশ দূরে চলে যেতে লাগল। কুয়াশায় অন্ধকারে কিছুক্ষণ পর সেটাকে আর দেখা গেল না।

বিনু একইভাবে ছইয়ের খোলা পাল্লার ভেতর দিয়ে নদীর দিকে তাকিয়ে বসে আছে। রাজেকরা বৈঠা বাইছে তো বাইছেই। একটানা, ক্লান্তিহীন। সময় যেন কাটতেই চায় না। সন্ধেবেলায় ঝিনুককে নিয়ে নৌকোয় উঠেছিল সে। মনে হয়, সময় যেন সেখানেই অনড় হয়ে আছে।

সেই যে চারমাল্লাই নৌকোটা দূরে কুয়াশাবিলীন দিগন্তে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল, তারপর সেইভাবেই আরো কয়েকটা নৌকো পাশ দিয়ে চলে গেছে।

একসময় হঠাৎ বিনুর খেয়াল হয়, সন্ধে থেকে রাজেক এবং তমিজ একনাগাড়ে বৈঠা টানছে। ওরা কখন খেয়ে এসেছে। নিশ্চয়ই ওদের খিদে পেয়েছে।

বিনু বলল, 'অনেকক্ষণ নৌকো বাইছ। রাতও হয়েছে। এবার তোমরা খেয়ে নাও।'

রাজেক বলল, 'সন্ধ্যার আগে ঠাউরমা ঠাইসা খাওয়াইয়া দিছে। ত্যামন খিদা পায় নাই। যাউক আর কিছু সোময়, হের (তার) পার খামু—'সে যে ঠাউরমার কথা বলল তিনি স্নেহলতা।

'খিদে পেলে আমাকে বোলো—'

'নিশ্চয়াস (নিশ্চয়ই) কমু।'

একটু চুপচাপ।

তারপর বিনু জিজ্ঞেস করল, 'আমরা এখন যেখান দিয়ে যাচ্ছি সে জায়গাটার নাম কী?'

রাজেক বলল, 'আন্ধারে আর খুয়ায় (কুয়াশায়) ঠাওর পাই না।' নদীর অস্পষ্ট পাড়ের দিকে তাকিয়ে বলতে থাকে, 'মনে লয় (হয়), চরকান্দার কাছাকাছি আইসা পড়ছি।'

একটু যেন হতাশই হয় বিনু। বলে, 'বাড়ি থেকে বেশিদূর তা হলে আসতে পারিনি।'

'কথা কি এট্টুখানি ছুটোবাবু? হেইর উপুর নদীতে নাও বাইয়া যাওন—'

'সকালে তারপাশায় পৌঁছতে পারব তো? দেরি হলে গোয়ালন্দের স্টিমার ছেড়ে যাবে। তখন ' ঝিনুককে দেখিয়ে বিনু বলতে লাগল, 'একে নিয়ে ভীষণ মুশকিলে পড়ে যাব। কোথায় থাকব, কী করব '

তাকে থামিয়ে দিয়ে রাজেক ভরসা দেবার সুরে বলে, 'ভাইবেন না ছুটোবাবু। ভুরের (ভোরের) আলো ফুটনের আগেই তারপাশার ইস্টিমার ধরাইয়া দিমু।'

বিনু কী বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই মাঝনদী থেকে তুমুল হল্লার শব্দ ভেসে আসে। চমকে সেদিকে তাকাতেই চোখে পড়ে, দু'টো ছইহীন লম্বা ধাঁচের খোলা নৌকোয় প্রচুর আলো জ্বলছে। মনে হয় একগাদা মশাল। আলো থাকায় বোঝা যাচ্ছে, নৌকো দু'টোয় অনেক লোকজন। তারাই হল্লা করছে। তারা কী বলছে, কোথায় কী উদ্দেশ্যে ওরা চলেছে, এত দূর থেকে বোঝা যাচ্ছে না।

পলকক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। কুয়াশা ঢাকা নদীতে সঞ্চরমান মশালের আলো দেখে এবার আন্দাজ করা যাচ্ছে, নৌকো দু'টো এদিকেই ধেয়ে আসছে।

বিনুদের নৌকোটা নদীর পাড় থেকে একশ' হাত তফাত দিয়ে যাচ্ছিল। দূরের নৌকো দু'টো যেভাবে আসছে, তাতে ভয়ঙ্কর একটা ইঙ্গিত রয়েছে। বিনুর হৃৎপিণ্ডের উত্থানপতন থমকে গেল যেন।

এদিকে ছইয়ের দু'ধারে রাজেক এবং তমিজের শিরদাঁড়াও টান টান হয়ে গেছে। নৌকো দু'টোয়

যে লোকগুলো উন্মাদের মতো চিৎকার করছে তাদের মতলব যে ভাল নয়, মারাত্মক কোনও অভিসন্ধি মাথায় নিয়ে তারা এধারে আসছে, সেটা স্পষ্ট হয়ে গেছে। একটা ব্যাপার রাজেকরা ভেবে পায় না, তাদের নৌকোয় বাইরের পাটাতনে আলো নেই, নিবন্ত একটা হেরিকেন রয়েছে ছইয়ের ভেতরে। দূর থেকে তা বোঝার উপায় নেই। তবু গাঢ় কুয়াশা এবং অন্ধকার ভেদ করে কিভাবে ওরা তাদের দেখতে পেয়েছে, কে জানে। ইবলিশের চোখ। বিনুর মতো রাজেকদের কাছেও একই সাঙ্ঘাতিক সংকেত পৌঁছে গেছে।

রাজেক চাপা গলায় বলল, 'ছুটোবাবু, গতিক ভালা বুঝি না।'

নদীতেও আজকাল ঘাতকেরা হানা দিচ্ছে, এটা আগেই কানে এসেছিল বিনুর। আশঙ্কা থাকলেও ভেবেছিল, নিরাপদেই তারপাশায় পৌঁছে যেতে পারবে, কিন্তু সেটা বোধহয় আর সম্ভব হল না। হেমন্তের এই ঠান্ডা, খোলা নদীতে নৌকোয় বসে থাকতে থাকতে তার সারা গা ঘামে ভিজে যেতে লাগল। কাঁপা গলায় হতবুদ্ধির মতো বিনু জিজ্ঞেস করে, 'এখন কী করা যায়?'

রাজেক দূরের নৌকা দু'টোর দিকে নজর রাখছিল। বলল, 'হুমুন্দির পুতেরা ঝামেলা পাকাইব মনে লয় (হয়)। এক কাম করি ছুটোবাবু—'

'কী?'

'নাও পারে ভিড়াইয়া হগলে (সবাই) উপুরে উইঠা গাছগাছালির আবডালে লুকাইয়া থাকি। অরা আইসা কী করে দেখি। হেইর পর অবোস্তা বুইঝা ব্যবোস্তা করন যাইব।'

'যা ভাল বোঝো, কর।' বিনু এতটাই আতঙ্কগ্রস্ত যে ভেবে চিন্তে নিজে থেকে কোনও রকম সিদ্ধান্ত নিতে পারছিল না। তার মাথার ভেতর সব কিছু তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছিল।

রাজেক চেঁচিয়ে ছইয়ের ওধারের গলুইতে বসা তমিজকে বলল, 'পারে নাও ভিড়ামু। তরাতরি বৈঠা চালা—'

নদীর ওপর দিয়ে নৌকোটাকে প্রায় উড়িয়ে কিনারে এনে কাছি দিয়ে একটা মোটা গাব গাছের গুঁড়িতে বেঁধে ফেলল রাজেক। ওদিকে সেই নৌকা দু'টো ঝড়ের গতিতে ধেয়ে আসছে। ত্রস্তভাবে সে বলল, 'ছুটোবাবু, ঝিনুক বইনেরে লইয়া উপুরে ওঠেন—'

ঝিনুক কাত হয়ে শুয়ে ছিল। তার হাত ধরে টেনে উঠিয়ে প্রায় পাঁজাকোলা করে পাড়ের মাটিতে তুলে আনল বিনু। নির্জীব গলায় ঝিনুক শুধু বলল, 'আমরা তো স্টিমারঘাটে যাব। এখানে নামলে কেন?'

বিনু বলল, 'পরে শুনো—'

ঝিনুক আর কোনও প্রশ্ন করল না।

বিনুরা নেমে যাবার পর রাজেক আর তমিজও পাড়ে উঠল। চারদিক ভাল করে তাকিয়ে খানিক দূরে ঘন বেতঝোপ আর আগাছার জঙ্গল দেখতে পেল রাজেক। বলল, 'ছুটোবাবু, আপনেগো এইহানে থাকন ঠিক অইব না। শালার পুতেগো চৌখে পড়লে কী করব কমুঠা (কে) জানে। উই ব্যাত ঝোপডার পিছে গিয়া বইয়া থাকেন। এক্কেরে মুখ বুইজা থাকবেন। অরা য্যান ট্যার না পায়।'

'আর তোমরা?'

'আমরাও আপনেগো কাছাকাছি থাকুম। খালি নাও দেইখা অরা (ওরা) হ্যাঙ্গাম (হাঙ্গামা) না কইরা চইলা যাইব। আমরা নায়ে থাকলে নিয্যাস জিগাইব নাও কুনহানের, কই থিকা (কোত্থেকে) আসতে আছি, সোয়ারি আছিল কিনা, থাকলে হেরা (তারা) কারা, এই হগল। কী কইতে কী কমু, শ্যাষে আমরা বিপদে পইড়া যামু। চাইর জনের জানই চইলা যাইব।'

ঝিনুককে নিয়ে বেতঝোপের পেছন দিকে গেল বিনু। রাজেক আর তমিজও ডান পাশে ঘন আগাছার জঙ্গলের ভেতর ঢুকল।

নদীর কিনার থেকে বেতঝোপ টোপগুলো প্রায় তিনশ' হাত তফাতে। একে ঝোপ জঙ্গলের আড়াল, তার ওপর কুয়াশা আর অন্ধকারের দুর্ভেদ্য পর্দা চারদিক ঢেকে রেখেছে। বিনুরা যেখানে রয়েছে সেখান থেকে তাদের নৌকোটা দেখতে পাবার কথা নয়। কিন্তু এতক্ষণে তুমুল হইচই করতে করতে সেই মশালওলা নৌকো দু'টো ওটার কাছে চলে এসেছে। মশালের আলোয় সব কিছু

পুরোপুরি স্পষ্ট না হলেও দেখা যাচ্ছে। মাঝনদী থেকে আসা নৌকো দু'টো হু'মাল্লাই, ছই নেই। দুই নৌকোয় কম করে পনের ষোলটা লোক। তারা সবাই সশস্ত্র, প্রত্যেকের হাতে দা সড়কি বল্লম বা মজবুত বাঁশের লাঠি।

দুর্বোধ্য গলায় উত্তেজিতভাবে কিছু বলতে বলতে মাঝে মাঝে কুয়াশাচ্ছন্ন চরাচর চৌচির করে তারা চিৎকার করে উঠছিল, 'আল্লা হো আকবর—'

তিন চারজন তাদের নৌকো থেকে লাফ দিয়ে রাজেকদের নৌকোয় চলে এল। ছইয়ের ভেতর ঢুকে গেল দু'জন। বাকি যারা চেঁচাচ্ছিল তাদের সবার ওপর দিয়ে গলা চড়িয়ে একজন বলল, 'আমাগো দেইখা এই নাওয়ের হুমুন্দির পুতেরা কিনারে আইসা নাও বান্ছে (বেঁধেছে)।'

যারা ছইয়ের তলায় ঢুকেছিল তারা খানিক পর হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এসে আরও শোরগোল বাধিয়ে দিল, 'এই নাওয়ে হিন্দু আছিল। অগো মালপত্তরের ভিত্‌রে কালীর ফুটো (ফোটো) রইছে।'

ওদিকে আরেক জন গলা অনেক উঁচুতে তুলে বলে, 'শালারা কাছাকাছিই আছে। বেশি দূর যাইতে পারে নাই। উপুরে উইঠা বিচরাইয়া (খুঁজে) দেখি—'

কথাগুলো পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে। বেতঝোপের আড়ালে বসে থাকতে থাকতে বুকের ভেতর হৃৎপিন্ডের উত্থানপতন মুহূর্তে থমকে গেল বিনুর। অথৈ নদীতে ভাসতে ভাসতে কলকাতার দিকে এই বিপজ্জনক যাত্রাপথে যে কালীর ছবিটাকে বড় ভরসা মনে হয়েছিল, সেটাই মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়াবে কিনা, কে বলবে।

ওধার থেকে রাজেক চাপা গলায় বলল, 'অরা (ওরা) গোন্ধ পাইছে। কী হইব ছুটোবাবু?'

কী হবে, বিনুর জানা নেই। তবে রাজেক যে ভয় পেয়েছে, সেটা তার গলার স্বর শুনে আন্দাজ করা যাচ্ছে। উত্তর না দিয়ে উদ্‌ভ্রান্তের মতো সেই উন্মত্ত, উত্তেজিত লোকগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকে সে।

একটু পর দু'তিনজন একসঙ্গে হেঁকে ওঠে, 'নাও কার? কার নাও?'

রাজেক সতর্ক করে দেয়, 'হুমৈর (সাড়া) দিয়েন না ছুটোবাবু।' তার গলা এবার আরও চাপা শোনায়।

বিনু বলে, 'জানি।'

ওধারে নৌকো থেকে সমানে হুমকি ভেসে আসছে, 'রাও (শব্দ) না কইরা বাচবি না হুমুন্দিরা। খাড়, দেখি কুন গাদে (কোন গর্তে) সাইন্ধা (ঢুকে) আছস—'

তারপরেই দেখা গেল, মশাল আর দা-বল্লম নিয়ে চার পাঁচ জন পাড়ের মাটিতে লাফিয়ে পড়ল। বাকি সবাই নৌকোর পাটাতনে দাঁড়িয়ে সমানে হল্লা করে চলেছে।

এদিকে যারা পাড়ে নেমেছিল, তারা গাছগাছালির ভেতর মশালের আলো ফেলে খোঁজাখুঁজি শুরু করেছে।

নিবিড় বেতঝোপের পেছনে বিনুকে প্রাণপণ আঁকড়ে ধরে ভয়ার্ত, বিহ্বল চোখে হিংস্র লোকগুলোকে দেখছিল ঝিনুক। কিছুকাল আগে ঢাকার সেই ভয়ঙ্কর দৃশ্যগুলি মনে পড়ে যাচ্ছিল তার। এমনই একটা হিংস্র বাহিনী সড়কি ল্যাজা নিয়ে শিকারের সন্ধানে বেরিয়ে পড়েছিল। ঘরের এক কোণে আলমারির আড়ালে নিজের শরীরটাকে যতটা সম্ভব গুটিয়ে নিয়ে লুকিয়ে রেখেছিল সে, আর তীব্র আতঙ্কে সমানে কাঁপছিল। কিন্তু এত করেও রেহাই পাওয়া যায়নি। জন্তুরা তাকে টেনে বার করতে করতে আদিম উল্লাসে ফেটে পড়েছিল।

দৃশ্যটা স্মৃতির স্তর ঠেলে চোখের সামনে ভেসে উঠতেই নিজের অজান্তে ঝিনুকের গলা থেকে কাতর, শীর্ণ একটা আওয়াজ বেরিয়ে এল। তার মনে হল, ঢাকার মারাত্মক ঘটনার মতো এখনই কিছু একটা ঘটে যাবে। সেদিনের মতোই তার পা থেকে মাথা পর্যন্ত থরথর কাঁপছে। চোখ দু'টো ঠেলে বেরিয়ে আসবে যেন।

লোকগুলো ঝিনুকের গলা শুনতে পেলে তার পরিণতি কী হতে পারে, ভাবতেই আতঙ্কগ্রস্তের মতো তার মুখটা চেপে ধরল বিনু। হেমন্তের হিমঝরা রাত্তিরে তার শরীর ঘামে ভিজে গেছে। মনে হচ্ছে, মেরুদন্ডের ভেতর দিয়ে ঠান্ডা কনকনে বরফের স্রোত বয়ে চলেছে। ঝিনুক তাকে প্রাণপণে জাপটে

ধরল। বিনু টের পাচ্ছে, জোরে জোরে বুক তোলপাড় করে শ্বাস ফেলছে ঝিনুক। তার রোগা শরীরটা ভয়ে দুমড়ে, বেঁকে যাচ্ছে।

মুখ চেপে ধরার জন্য ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল ঝিনুকের। হঠাৎ নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার জন্য মাথা ঝাঁকাতে থাকে সে। বিনু জানে, ঝিনুকের মুখ থেকে হাত সরে গেলেই চিৎকার করে উঠবে, কিন্তু কোনওভাবেই তা হতে দেওয়া যায় না।

একসময় ঝোপঝাড়ের পাশ দিয়ে চারদিকে মশালের আলো ফেলতে ফেলতে দূরে চলে গেল লোকগুলো। খানিকক্ষণ পর ফিরে এসে নিজেদের মধ্যে কথা বলতে বলতে নদীর দিকে ফিরে যেতে লাগল।

'কুত্তার পুতেরা কুনহানে যে পলাইল—'

'দিনের বেইল (বেলা) হইলে ঠিক বিচরাইয়া বাইর করতাম।' শিকার ফসকে যাওয়ায় লোকগুলোকে হতাশ মনে হল। ওরা চলে যাবার পর ঝিনুকের মুখ থেকে হাত সরাল বিনু। এতক্ষণ স্নায়ুমন্ডলী কষে-বাঁধা তারের মতো টান করে নিজেও শ্বাসরুদ্ধের মতো বসে ছিল সে। এখন ফুসফুস ভরে অনেকখানি বাতাস টেনে নিল। তাদের রাজদিয়ার আশেপাশে এর মধ্যে খুনখারাপি, রক্তপাত শুরু হয়েছে। ঘটেছে ধর্ষণ, বহু বাড়িতে আগুন লাগানোর ঘটনাও। কিন্তু রাজদিয়ায় তেমন কিছু ঘটেনি। তবে প্রবল উত্তেজনা রয়েছে। প্রচন্ড উৎকণ্ঠার মধ্যে দিন কাটালেও, আজ এই প্রথম বিনু জানলো, মৃত্যুভয় কাকে বলে। বেতঝোপের আড়াল থেকে প্রায় সামনাসামনি ঘাতকদের দেখে তার সারা গা বেয়ে ঘামের স্রোত তো বয়ে যাচ্ছিলই, হৃৎপিন্ড থেকে শুরু করে হাত-পা, স্নায়ু, চিন্তা করার শক্তি, সমস্ত কিছু অসাড় হয়ে যাচ্ছিল। পেটের ভেতরটা গুলিয়ে উঠছিল, কপালের দু'পাশের শিরা উপশিরা ছিঁড়ে ছিঁড়ে পড়ছিল। আপাতত মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পাওয়া গেছে। যে আতঙ্ক পাথরের চাঁইয়ের মতো তার ওপর চেপে বসেছিল, সেটা অনেকখানি সরে গেছে। কিছুটা হলেও স্বস্তি বোধ করছে বিনু।

ঝিনুক ভীষণ হাঁপাচ্ছিল। আতঙ্ক কেটে যাবার পর সে খুব কাহিল হয়ে পড়েছে। যে হাত দিয়ে বিনুকে জাপটে ধরেছিল, সে দু'টো আলগা হয়ে ঝুলছে। চোখ বুজে আসছে। দুই ঠোঁট সামান্য ফাঁক হয়ে আছে। তার গলা চিরে দুর্বল, কাতর কান্না বেরিয়ে আসছিল।

ওধারে বিনুর মতোই কাঠ হয়ে দমবন্ধ করে বসে ছিল রাজেকরা। ধীরে ধীরে লম্বা নিশ্বাস ফেলে রাজেক ডাকল, 'ছুটোবাবু—'

শরীর আর মনের ওপর দিয়ে তীব্র ঝড় বয়ে গেছে বিনুর। নিজেকে ক্লান্ত, বিধ্বস্ত লাগছিল। নির্জীব গলায় সে সাড়া দিল, 'বল—'

'তরাসে বুকের ভিত্‌রে উয়াস (শ্বাস) আটকাইয়া গেছিল।'

বিনু উত্তর দিল না। তারপাশায় পৌঁছনো পর্যন্ত রাজেক এবং তমিজের বাঁচা বা মরা তাদের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। সে জানে, এই বিশ্বাসী, নিরক্ষর মানুষ দু'টি প্রাণ গেলেও কোনও অবস্থাতেই তাদের ফেলে পালিয়ে যাবে না। তাদের দায়িত্ববোধই পালাতে দেবে না।

রাজেক বলল, 'ইবলিশগুলান গ্যাছে গিয়া। আর ডর নাই—'

হঠাৎ কী মনে পড়ায় বিনু বলল, 'কিন্তু—'

'কী ছুটোবাবু?'

ভয় কিছুটা কেটে গেলেও নতুন করে একটা দুর্ভাবনা বিনুকে অস্থির এবং চকিত করে তোলে। এই হানাদারেরা তাদের খুঁজে পায়নি ঠিকই, কিন্তু নদীতে ওরা টহলদারি থামিয়ে দেবে, এমন সম্ভাবনা খুবই কম। কেননা, শুধু বিনুরাই না, দেশ ছেড়ে হাজার হাজার মানুষ চলে যাচ্ছে। শিকার এখন খুবই সুলভ। নৌকোয় করেই বিনুদের তারপাশায় যেতে হবে। তখন যে ফের ওদের পাল্লায় পড়বে না, জোর দিয়ে তা বলা যায় না।

রাজেক আর তমিজ আগাছার জঙ্গল থেকে এর ভিতর বিনুদের কাছে চলে এসেছে। বিনুর দুশ্চিন্তার কারণ জানার পর আস্তে আস্তে মাথা নাড়ে রাজেক। ঘোর আশঙ্কা তাদের মধ্যেও চারিয়ে যেতে থাকে। কুয়াশায় অন্ধকারে রাজেকের মুখ ঝাপসা দেখাচ্ছে, তবু বোঝা যায়, সে ভীষণ চিন্তাগ্রস্ত।

রাজেক বলে, 'বিপদের কথা ছুটোবাবু। এই দিকটা আমি ভাইবা দেখি নাই। শালারা গাঙ (নদী)

ছাইড়া চইলা যাইব বইলা মনে লয় (হয়) না।'

সন্ত্রস্ত বিনু বলে, 'তা হলে কী করে তারপাশায় পৌঁছব?'

রাজেক একটু চুপ করে থাকে। তারপর বলে, 'এট্টা উপায় আছে ছুটোবাবু। গাঙের মইদ্যে (মধ্যে) বেশি দূর নাও লইয়া যামু না। কিনার ঘেইষা ঘেইষা যাইতে থাকুম। তভু যদিন—'

'যদি কী?'

'ইবলিশের ছাওগুলান দেইখা ফেলাইলে অহনকার লাখান পারে উইঠা ঝোপড়া কি জঙ্গলে লুকাইয়া থাকুম।'

রাজেক যত সহজে সম্ভাব্য ভয়ঙ্কর বিপদ থেকে রেহাই পাবার উপায় জলের মতো বুঝিয়ে দিল, বিনু জানে সমস্যাটা তত সরল নয়। খানিক আগে ঘাতকেরা নদীর দিকে চলে যাবার পর বুকের ভেতরটা অনেকখানি চাপমুক্ত মনে হয়েছিল। এখন সে টের পেল, নতুন করে অন্তহীন দুশ্চিন্তা ফিরে আসছে। উদ্বিগ্ন মুখে বলল, 'বার বার কি ওদের ফাঁকি দিতে পারব? একবার না একবার ঠিক ধরা পড়ে যাব। তখন?'

রাজেক কী উত্তর দিতে যাচ্ছিল, হঠাৎ তার চোখে পড়ল, গাব গাছের গা থেকে বাঁধন খুলে হানাদারেরা তাদের নৌকোটা নিয়ে চলে যাচ্ছে। তার গলা চিরে কাতর শব্দ বেরিয়ে এল, 'হা আল্লা—'

দৃশ্যটা বিনুর চোখেও পড়েছিল। বিহ্বলের মতো তাকিয়ে রইল সে। বোঝা যায়, সওয়ারির সন্ধান না পাওয়ায় ক্ষিপ্ত হয়ে ওরা নৌকোটা নিয়ে যাচ্ছে।

এদিকে প্রাথমিক ভীতি কাটিয়ে লাফ দিয়ে উঠে পড়েছে রাজেক। নৌকোটা হানাদারদের কাছ থেকে ছিনিয়ে আনার জন্য চিৎকার করতে করতে হিতাহিত জ্ঞানশূন্যের মতো সে নদীর দিকে ছুটতে যাবে, বিনুর আকস্মিক বিহ্বলতা কেটে গেল। দ্রুত উঠে দাঁড়িয়ে রাজেককে ধরে ফেলল সে। বলল, 'ওরা অনেক দূর চলে গেছে। ধরতে পারবে না। তা ছাড়া—'

রাজেক জোর করে তার হাত ছাড়িয়ে নিতে চাইল। উদ্‌ভ্রান্তের মতো বলল, 'আমারে আটকাইয়েন না ছুটোবাবু।' হানাদারদের উদ্দেশে কুৎসিত গালাগাল দিয়ে বলতে লাগল, 'ধরতে পারুম। গাঙ হাতইরা (সাঁতরে) ঠিকই শালাগো লাগুর (নাগাল) পামু—'

বিনু রাজেককে ছাড়ল না, তার হাত আরও শক্ত করে ধরে থাকল। বলল, 'সর্বনাশ ডেকে এনো না রাজেক। ওরা ষোল সতের জন, সবার হাতে দা লাঠি বর্শা রয়েছে। যদি ওদের কাছে পৌঁছতেও পার, ওরা জেনে যাবে তুমি হিন্দু সওয়ারি নিয়ে যাচ্ছিলে। তার ফল কী হবে, মাথা ঠাণ্ডা করে ভাবো।'

এদিকটা একেবারেই খেয়াল করে দেখেনি রাজেক। চোখের সামনে তার নৌকোটা নিয়ে যাচ্ছে দেখে মাথার ভেতর আগুন ধরে গিয়েছিল। কিভাবে ওটা ফিরিয়ে আনবে, সেটাই ছিল একমাত্র চিন্তা। বিনুর কথা শোনার পর তার মনে হল, ঠিকই বলেছে ছোটবাবু। সশস্ত্র ওই বাহিনীর হাত থেকে নৌকোটা উদ্ধার করে আনার চেষ্টা নেহাতই গোঁয়ার্তুমি। সে নদীতে ঝাঁপ দিলে তমিজও তার সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ত। কিন্তু দু'জন নিরস্ত্র মানুষের পক্ষে অতগুলো খুনীর সঙ্গে যুঝে ওঠা অসম্ভব। নিজেদের প্রাণ তো যেতই, হিংস্র শিকারি জন্তুর মতো গন্ধ শুঁকে শুঁকে ওরা বিনু এবং ঝিনুককেও নিশ্চয়ই খুঁজে বার করত।

রাগে এবং হতাশায় ধীরে ধীরে বসে পড়ে রাজেক। মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে দু'হাতে শব্দ করে কেঁদে ওঠে। বলে, 'চাইর বচ্ছর ধইরা এট্টা দুইটা কইরা ট্যাকা জমাইয়া নাওখান কিনছিলাম। অ্যামন দিনও গ্যাছে, বউ-পোলাপান লইয়া উপাস দিয়া থাকছি। তভু জমাইনা ট্যাকায় হাত দেই নাই। হেই নাও পুঙ্গির পুতেরা লইয়া গ্যাল! এক্কেরে শ্যাষ হইয়া গ্যালাম ছুটোবাবু। নাও নাই, অহন কী খামু, ক্যামনে সোংসার চলব!'

নৌকো খোয়া যাওয়ায় উন্মাদ হয়ে গেছে রাজেক। এটাই স্বাভাবিক। সওয়ারি নিয়ে শীতগ্রীষ্ম বার মাস যাদের পদ্মা মেঘনা ধলেশ্বরী পাড়ি দিয়ে পেটের ভাত জোটাতে হয়, নৌকোই তাদের সর্বস্ব। রাজেককে দেখতে দেখতে বুকের ভেতর চাপা কষ্ট অনুভব করতে থাকে বিনু। তীব্র অপরাধবোধে ভেতরে ভেতরে কুঁকড়ে যায়। রাজেকের এত বড় সর্বনাশটা যে হয়ে গেল সেজন্য নিজেও কি সে কম দায়ী? তারপাশার স্টিমারঘাটে যাবার জন্য ঝিনুককে নিয়ে রাজেকের নৌকোয় যদি না উঠত,

খুনী আর লুটেরারা তার নৌকোটা নিয়ে যেত না।

কিভাবে রাজেকের ক্ষতিপূরণ করা সম্ভব, ভেবে পাচ্ছিল না বিনু। হঠাৎ আলোর চিকন একটা রেখা যেন তার চোখে পড়ে। রাজেক অঝোরে কেঁদে যাচ্ছিল, তার কাঁধে একটা হাত রেখে বলে, 'কেঁদো না, কেঁদো না। আমার কথা শোন। রাজদিয়ায় ফিরে গিয়ে দাদুর সঙ্গে দেখা করে সব বোলো। তিনি নিশ্চয়ই কিছু একটা ব্যবস্থা করে দেবেন।'

দাদু অর্থাৎ হেমনাথ। রাজদিয়াবাসীদের তো বটেই, চারপাশের বিশ পঁচিশখানা গ্রামের লোকজনেরও তিনি হেমকত্তা বা হ্যামকত্তা। ওই অঞ্চলের সব চাইতে শ্রদ্ধেয়, সব চাইতে সম্মানিত ব্যক্তি। পাকিস্তান হয়ে গেছে, অনেক কিছুর পরিবর্তন ঘটেছে, তবু এখনও সকলে তাঁকে যথেষ্ট খাতির করে। মনে কারও যদি বিদ্বেষ কিংবা আক্রোশ থাকেও, সামনাসামনি কেউ এমন কিছু করে না বা বলে না, যাতে তিনি কষ্ট পান অথবা তাঁর মর্যাদার হানি হয়।

বিনুর কথায় হতাশার শেষ প্রান্ত থেকে যেন উঠে আসে রাজেক। চকিতে মুখ থেকে হাত সরায়। আশার সংকেত সেও পেয়ে গেছে। হেমনাথের কাছে কোনও আর্জি নিয়ে গিয়ে দাঁড়ালে তিনি পারতপক্ষে কাউকে ফেরান না, এটা সবাই জানে। রাজেক নিশ্চিত, বিহিত একটা হবেই। রাজেকের দুই গাল চোখের জলে মাখামাখি হয়ে গিয়েছিল। হাতের পিঠ দিয়ে গাল মুছতে মুছতে সে বলে, 'হ, রাইজদায় (রাজদিয়ায়) ফিরা আগে হ্যামকত্তার কাছে যামু।' পরক্ষণে কিছু খেয়াল হতে সচকিত হয়ে ওঠে, 'কিন্তুক ছুটোবাবু—'

'কী?'

'তারপাশায় আপনেগো পৌঁছাইয়া দিমু ক্যামনে?'

বিনু চমকে ওঠে। রাজেকের নৌকো খোয়া গেছে, হেমনাথ নিশ্চয়ই তার ব্যবস্থা করে দেবেন, কিন্তু এই মুহূর্তে যে সমস্যা বিশাল ভীতিকর আকার নিয়ে সমস্ত আকাশপাতাল জুড়ে তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে তা হল, নৌকো ছাড়া কিভাবে তারপাশার স্টিমারঘাটে পৌঁছবে? সে একা থাকলেও না হয় ঝুঁকি নিয়ে একটা চেষ্টা করতে পারত। কিন্তু সঙ্গে রয়েছে ঝিনুক। রুগ্‌ণ, কৃশ, অস্থিসার। জীবনীশক্তি তার প্রায় ফুরিয়ে গেছে। এক সঙ্গে দশ পা হাঁটলে সে হাঁপিয়ে পড়ে। এই ঝিনুককে নিয়ে তারপাশা পর্যন্ত নিরাপদে যাওয়া কি আদৌ সম্ভব হবে?

অন্ধকার এবং কুয়াশা ক্রমশ আরও ঘন হচ্ছে। নদীর পাড়ে ওই অঞ্চলটা যে ঠিক কোথায় এবং জায়গাটার কী নাম, কিছুই আন্দাজ করা যাচ্ছে না। এর মধ্যে এখানে আগুন লাগানো, খুনখারাপি, ধর্ষণের মতো বড় রকমের ঘটনা ঘটে গেছে কিনা, এখানকার মানুষজন কতটা বিদ্বেষ এবং আক্রোশ পুষে রেখেছে, সবই অজানা। একটা দমবন্ধ-করা সর্বগ্রাসী আতঙ্ক প্রকাণ্ড হাঁ মেলে বিনুকে যেন গিলে ফেলতে চাইছে। এখন কী করা উচিত, সে ভাবতে পারছে না। তার বোধ বুদ্ধি এবং চিন্তাশক্তি, সমস্ত কিছু লোপ পেয়ে যাচ্ছে। ঝাপসা গলায় বিনু শুধু বলতে পারল, 'এখন কী করা?'

রাজেকের মাথাতেও খুব সম্ভব একই চিন্তা ঘুরছিল। সে বলল, 'ছুটোবাবু, এই আন্ধারে আর খুয়ায় কিছুই করন যাইব না। বিহান (সকাল) হউক, রইদ (রোদ) ফুটুক। হেরপর (তারপর) চাইর দিকের গতিক বুইঝা ব্যবোস্তা করুম।'

নিঝুম নদীতীরে, কুয়াশামগ্ন আকাশের নীচে হেমন্তের এই রাতটা বেতঝোপের আড়ালে বসে কাটানো ছাড়া অন্য উপায় নেই। কাল ভোর হলে, আলো ফুটলে, কী ঘটবে তা আর ভাবা যাচ্ছে না। অনিবার্য, অজানা নিয়তির কাছে নিজেকে সঁপে দিল বিনু।

অনেকটা সময় তারপর কেটে গেছে।

চারপাশের ঝোপঝাড়ে ঝিঁঝিরা একটানা ডেকে যাচ্ছে। এই এক পতঙ্গ যাদের ক্লান্তি নেই। মাটির নীচে, নাকি গাছের পাতায় বা ডালে নিজেদের লুকিয়ে রেখে দিবারাত্রি ডেকে যায়। এধারে ওধারে অপার্থিব সবুজ আলো জ্বেলে ঝাঁকে ঝাঁকে জোনাকি উড়ছে। কাছে দূরে সর সর করে অদৃশ্য সরীসৃপেরা পেট টেনে টেনে ঘাসের ওপর দিয়ে চলে যাচ্ছে। হয়তো সাপ কিংবা গিরগিটি জাতীয় নিশাচর কোনও প্রাণী। কত যে পোকামাকড় আর মশা বিনুদের ছেঁকে ধরেছে তার হিসেব নেই। অনেক দূরে একপাল শিয়াল ডেকে উঠল, পরক্ষণে তাদের চিরশত্রু কুকুরেরা রাগে গজরাতে গজরাতে খুব সম্ভব ওদের

তাড়া করে কোন দিকে যেন দৌড়ে গেল।

হঠাৎ বিনুর মনে পড়ল, নৌকোটায় তাদের সুটকেস বিছানা খাবার দাবার এবং টুকিটাকি নানা দরকারী জিনিস ছিল। হানাদারেরা নৌকোর সঙ্গে সর্বস্ব নিয়ে গেছে। নিজের অজান্তে তার একটা হাত কোমরের কাছে চলে এল। সেখানে ধুতির নীচে, কাপড়ের সরু থলিতে হাজার খানেক টাকা পুরে ফিতে বেঁধে নিয়ে এসেছিল। টাকাগুলো জায়গামতোই রয়েছে। এখন এই নগদ টাকাটাই যা ভরসা। শেষ পর্যন্ত যদি বেঁচে থাকে, ওটা কাজে লাগবে।

বিনু ডাকল, 'রজেক—'

রাজেক সাড়া দিল, 'ক'ন ছুটোবাবু—'

'তোমাদের কিছুই খাওয়া হল না। কত খাবার সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলাম। সব গেল—'

'আপনেরাও তো খান নাই। এট্টা রাইত আমাগো নসিবে উপাস দেওয়া আছে। কী আর করুম? বিহান হইলে দেখি, যদিন চিড়া মুড়ি জুটাইতে পারি—'

বিনু আর কিছু বলল না।

মুখ থেকে হাত সরিয়ে নেবার পর ঝিনুক অনেকক্ষণ জোরে জোরে শ্বাস টেনেছিল। তারপর তার গলা থেকে ক্ষীণ, কাতর কান্নার মতো আওয়াজ বেরিয়ে আসছিল। এখন ঘাসের ওপর পা দু'টো অনেকখানি গুটিয়ে কাত হয়ে শুয়ে আছে। অসাড় ও নিস্পন্দ। তার কান্না কখন থেমে গেছে, খেয়াল করেনি বিনু। ঝাঁকে ঝাঁকে মশা এবং বুনো পোকামাকড় তার মুখে হাতে পায়ে এবং শরীরের খোলা জায়গাগুলোতে অনবরত হুল ফুটিয়ে চলেছে, কিন্তু কিছুই সে টের পাচ্ছে না। গাঢ় কুয়াশায় মনে হয়, একটা অনুভূতিহীন দেহের ঝাপসা কাঠামো।

বিনু ধুতির খুঁট জোরে জোরে নেড়ে ঝিনুকের গা থেকে মশা এবং পোকা তাড়াতে তাড়াতে ব্যগ্রভাবে ডাকতে লাগল, 'ঝিনুক—ঝিনুক—'

সাড়াশব্দ নেই।

বুকের ভেতরটা ধক করে ওঠে বিনুর, দম বন্ধ হয়ে আসে। মশা আর বুনো পোকা তাড়ানো থামিয়ে দ্রুত একটা হাত ঝিনুকের নাকের নিচে নিয়ে এল সে। না, বেঁচে আছে। তির তির করে নিশ্বাস পড়ছে। ফুসফুস থেকে ধীরে ধীরে আবদ্ধ বাতাস বেরিয়ে এল তার। অনেকখানি ঝুঁকে নরম গলায় ফের ডাকল, 'ঝিনুক—'

ঝিনুক উত্তর দেয় না। হানাদারেরা নদীর দিকে চলে যাবার পর কিছুক্ষণ ক্ষীণ শব্দ করে কেঁদেছিল। আতঙ্ক বা মৃত্যুভয় এমনই প্রবল, এতই পরাক্রান্ত যে তার সঙ্গে দুর্বল শরীরে যুঝতে যুঝতে অসীম ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়েছে সে।

বিনু আর ডাকাডাকি করল না। ঘাসের ওপর থেকে ঝিনুকের মাথাটা সযত্নে কোলে তুলে নিয়ে কাপড়ের খুঁট নেড়ে মুখচোখ হাত-পা থেকে আবার পোকামাকড় আর মশা তাড়াতে লাগল। বাকি রাতটা না ঘুমিয়ে এভাবেই তাকে কাটিয়ে দিতে হবে।

pathagar.net

বিনু ভেবেছিল, সারা রাত জেগে থাকবে। কিন্তু কখন সে নিজেও ঘুমিয়ে পড়েছে, জানে না।

ভোরের দিকে আবছাভাবে তার কানে পাখিদের কিচিরমিচির, ডানা ঝাপটানোর শব্দ আর নদীর একটানা কলকলানি ভেসে আসতে লাগল। আস্তে আস্তে চোখ মেলল বিনু। চারপাশে উঁচু উঁচু সব গাছ, বেতবন, ঝোপঝাড়। গাছপালার ফাঁক দিয়ে খানিক দূরে নদীর জলস্রোত দেখা যাচ্ছে। বিরাট বিরাট গাছগুলোর মাথায় ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি চঞ্চল ডানা মেলে উড়ছে আর সমানে চেঁচামেচি করে চলেছে।

কুয়াশার পাতলা একটা স্তর এখনও আকাশের গায়ে জড়িয়ে আছে। তবে বেশিক্ষণ থাকবে না। অনেক দূরে দিগন্তের তলা থেকে সূর্য একটুখানি মাথা তুলেছে। রোদ সেভাবে ওঠেনি। তবে নরম

আলো সমস্ত চরাচরের ওপর ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে। ঠাণ্ডা জলো হাওয়া উঠে আসছে নদীর দিক থেকে।

বিনু ভেবে পেল না, নদীর পাড়ে এমন একটা প্রায়-নিঝুম জংলা জায়গায় সে কিভাবে এসে পড়ল। ঘুমের মধ্যে কেউ কি তাকে এখানে ফেলে রেখে গেছে? পরক্ষণে স্মৃতির কোনও অনালোকিত পর্দায় টুকরো টুকরো, খাপছাড়া কিছু দৃশ্য আবছাভাবে ফুটে উঠতে লাগল। মশাল জ্বালিয়ে ঘাতকদের হানা, নৌকোয় সুটকেস, বেতের ডালা ইত্যাদি ফেলে ঝিনুককে কোলে করে রুদ্ধশ্বাসে নদীর পাড়ে উঠে আসা, ইত্যাদি। ক্রমশ স্পষ্টভাবে সব মনে পড়ে গেল।

ঘুম ভাঙার পর এই প্রথম বিনুর খেয়াল হল, সে প্রায় চিত হয়ে শুয়ে আছে, আর ডান উরুর ওপর ভারী কিছুর চাপ অনুভব করছে। আস্তে আস্তে উঠে বসল বিনু। কাল যেভাবে ঘুমন্ত ঝিনুকের মাথা কোলের ওপর রেখে শুইয়ে দিয়েছিল, ঠিক সেইভাবেই এখনও সে ঘুমোচ্ছে। পা দু'টো বুকের কাছে গুটনো, ঠাণ্ডা হাওয়ায় তার রোগা শরীর কেঁপে কেঁপে উঠছে।

ঝিনুকের দিকে ভাল করে তাকিয়ে চমকে উঠল বিনু। ওর গালে গলায় কপালে হাতে পায়ে, শরীরের খোলা জায়গাগুলোতে কোথাও এতটুকু ফাঁক নেই। চামড়ায় চাকা চাকা অসংখ্য লাল দাগ। সমস্ত রাত মেয়েটাকে মশা এবং বুনো পোকারা ছিঁড়ে খেয়েছে। রাজদিয়া থেকে আসার সময় স্নেহলতা খোঁপা বেঁধে দিয়েছিলেন। খোঁপা ভেঙে রুক্ষ চুল এখন উড়ছে।

খানিক দূরে রাজেক এবং তমিজকে দেখা গেল অসাড়ে ঘুমোচ্ছে। কাল তাদের ওপর দিয়েও কম ধকল যায় নি। তার ওপর একনাগাড়ে কয়েক ঘন্টা নৌকো বেয়েছে। সারা রাত এক ফোঁটা জলও পেটে পড়ে নি।

এইভাবে বেতবনের আড়ালে চুপচাপ হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকলে চলবে না। বাঁচার একটা মরিয়া চেষ্টা তো করতেই হবে। কাল মৃত্যুভয়ে সব অনুভূতি ভোঁতা হয়ে গিয়েছিল। ক্ষুধাতৃষ্ণার বোধ ছিল না। এখন পেটের ভেতর খিদে হাজারটা ছুঁচ বিঁধিয়ে চলেছে। কাছাকাছি হাটবাজার বা মানুষের বসতি আছে কিনা, কে জানে। থাকলে চিঁড়ে মুড়ি টুড়ি জোগাড় করা যেতে পারে।

পর মুহূর্তেই নিদারুণ ভয়ে শিরদাঁড়া বেয়ে বরফের মতো কনকনে স্রোত বয়ে গেল বিনুর। রাত্তিরে গাঢ় কুয়াশা এবং অন্ধকারের আড়াল ছিল। তারা লুকিয়ে থাকতে পেরেছে। কিন্তু সূর্যোদয় মানেই আতঙ্ক। দিনের আলোয় কারোর না কারোর চোখে পড়ে যাবার একশ' ভাগ সম্ভাবনা। তার পরিণতি কী হতে পারে, বিনুর পরিষ্কার ধারণা আছে। চারপাশের পরিস্থিতি না জেনে, না বুঝে, কোথাও পা বাড়ানো তার পক্ষে সম্ভব নয়। সেটা হবে চূড়ান্ত হঠকারিতা।

কুয়াশা ছিঁড়েখুঁড়ে এতক্ষণে রোদ উঠে গেছে। মাসখানেক আগেও রোদে গলানো গিনির মতো যে উজ্জ্বলতা ছিল, এখন আর তা নেই। সব কেমন যেন ম্লান, নিষ্প্রভ। হেমন্ত যত শীতের দিকে গড়াবে, সূর্যালোক ততই মলিন হতে থাকবে।

খুব আলগোছে, ঝিনুকের ঘুম যাতে ভেঙে না যায়, ওর মাথাটা নীচে ঘাসের ওপর নামিয়ে দিল বিনু। তারপর উঠে দাঁড়াতে গিয়ে দেখল, পারছে না। হাতের ভর দিয়ে শরীর সামান্য তোলার পর কাত হয়ে বসে পড়ল। পায়ে সাড় নেই। সারা রাত উরুর ওপর ঝিনুকের মাথা থাকায় তার চাপে রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে। বসে বসেই বেশ কয়েক বার দুই পা দ্রুত মুড়ে, ঝাড়া দিয়ে এবং টান টান করে রক্তের স্বাভাবিক গতি ফিরিয়ে আনল। অবশ ভাবটা প্রায় কেটে গেছে। এবার দাঁড়াতে পারল বিনু। এখান থেকেই গাছপালার ফাঁক দিয়ে এধারে ওধারে তাকাতে লাগল। কাল রাতেও সে চারপাশে কী আছে না-আছে দেখতে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু ঘন কুয়াশা এবং অন্ধকার ভেদ করে নজর দশ হাত দূরেও পৌঁছয়নি। ডাইনে বাঁয়ে সামনে, সমস্ত কিছুর ওপর কেউ গাঢ় কালি লেপে রেখেছিল। কাছাকাছি কোথাও গ্রাম আছে কিনা, আজও বোঝা যাচ্ছে না। মানুষজন চোখে পড়ছে না। পাখিদের চেঁচামেচি এবং নদীর অশ্রান্ত জলস্রোতের শব্দ ছাড়া যত দূরে চোখ যায়, শুধুই অপার স্তব্ধতা।

হঠাৎ বিনু দেখতে পায়, পঞ্চাশ ষাট হাত দূরে একটা পায়ে-চলা কাঁচা রাস্তা নদীর দিক থেকে এসে গাছগাছালির ফাঁক দিয়ে এঁকে বেঁকে, পাক খেয়ে খেয়ে ডান পাশে অদৃশ্য হয়েছে। অর্থাৎ খুব কাছে না হলেও এধারে কোথাও মানুষের বসতি আছে। সেখান থেকে লোকজন ওই পথ দিয়ে নদীর

দিকে যাতায়াত করে। রাস্তাটা দেখতে দেখতে আশা এবং তীব্র উৎকণ্ঠার মিশ্র একটা অনুভূতি তার শিরায়ায়ুতে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। আশা, কেননা এ অঞ্চলে মানুষ থাকলে তাদের সাহায্য পাওয়া যেতে পারে। উৎকণ্ঠার কারণ সেই মানুষগুলোর মতিগতি কেমন, জানা নেই। ওই কথাগুলোই কাল রাত্তিরে খাপাছাড়া ভাবে তার মনে হয়েছিল।

রাজেকের গলা কানে এল, 'ছুটোবাবু—'

মুখ ফিরিয়ে বিনু দেখতে পেল, রাজেক এবং তমিজ তার দিকে এগিয়ে আসছে। কখন ওদের ঘুম ভেঙেছে, টের পাওয়া যায় নি। একবার ঝিনুককেও দেখে নিল সে। মেয়েটা সেইভাবেই হাঁটু মুড়ে ঘাসের ওপর গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে আছে।

কাছে এসে রাজেক বলল, 'রাইত পুয়াইছে, রইদ উঠছে। অহন তো কিছু করন লাগে—'

বিনু লক্ষ করল, মশা আর পোকার কামড়ে রাজেক এবং তমিজের হাত পা মুখ ফুলে দাগড়া দাগড়া হয়ে আছে। সে আস্তে আস্তে মাথা নাড়ে, 'হ্যাঁ।'

কাঁচা রাস্তাটা রাজেকের চোখেও পড়েছিল। সেদিকে আঙুল দেখিয়ে সে বলে, 'পথ যহন আছে, মনে লয় খোজ করলে কাছেপিঠে গেরামও মিলব।'

'হ্যাঁ, আমিও তাই ভাবছিলাম।'

'লগে ট্যাকাপহা আছে, না বেবাক নায়ে চামের বাক্সে (সুটকেসে) থুইয়া আইছিলেন? তাইলে কিন্তুক বড় বিপদ—'

বিনু জানায়, না, টাকা তার সঙ্গেই রয়েছে।

রাজেকের দুশ্চিন্তা কিছুটা কাটে। বলে, 'যাউক, আল্লার দোয়ায় ট্যাকাটা বাইচা গ্যাছে। অহন আমাগো যা অবোস্তা, পহা ছাড়া এট্টা কাইকও (এক পাও) ফেলান যাইব না। দুইটা ট্যাকা দ্যান। দেখি খাওনের জিনিস কিছু মিলে কিনা। আর হেই লগে এই জায়গার মাইনষের ভাবগতিক বুইঝা আসি। আপনেরা এইহান থিকা অন্য কুনোহানে লইড়েন (নড়বেন) না।' তমিজকে বলল, 'তুই এইহানে থাক। ছুটোবাবুগো পরি (পাহারা) দিবি।'

বিনু কোমরের গোপন থলি থেকে দু'টো টাকা বার করে রাজেককে দিল। রাজেক দূরের রাস্তাটার দিকে পা বাড়াতে যাবে, মানুষজনের গলা ভেসে এল। চকিতে ঘুরে দাঁড়াতেই চোখে পড়ল, নদীর দিক থেকে নানা বয়সের দশ বারটি লোক নিজেদের মধ্যে কথা বলতে বলতে কাঁচা পথটা ধরে এগিয়ে আসছে। নদীর কিনার ঘেঁষে একটা বড় ছইওলা নৌকোও দেখা যাচ্ছে। খুব সম্ভব, ওই নৌকোয় গাঙ পাড়ি দিয়ে তারা এসেছে।

রাজেক এস্তভাবে বলে, 'বইসা পড়েন ছুটোবাবু, তরাতরি (তাড়াতাড়ি) বইসা পড়েন।' তার ভয়ের কারণ, বিনু দাঁড়িয়ে থাকলে ওই লোকগুলোর চোখে পড়ে যেতে পারে।

বিনুকে তাড়া দিতে দিতে নিজেও বসে পড়ে রাজেক, তার দেখাদেখি তমিজও।

বিনুর হাত পায়ের জোড় হঠাৎ আলগা হয়ে যায়। হুড়মুড় করে সে ঝিনুকের পাশে ভেঙে পড়ে। লোকগুলো ডাইনে বাঁয়ে, কোনও দিকে না তাকিয়ে রাস্তা ধরে দূরে উঁচু উঁচু গাছের জটলার আড়ালে মিলিয়ে যায়।

রাজেক তীক্ষ্ণ চোখে নজর রেখেছিল। সে বলল, 'আর ডর নাই ছুটোবাবু। অরা গ্যাছে গিয়া। এইবার—' কথাটা শেষ না করে সে থমকে যায়।

বিনুর সাহস কিছুটা ফিরে এসেছিল। সে বলে, 'এবার কী?'

চাপা গলায় রাজেক বলে, 'উই দ্যাখেন—'

নদীর ধার থেকে ওপাশের রাস্তা দিয়ে সবাই চলে যায়নি। আরও একজনকে আসতে দেখা যাচ্ছে।

লোকটা মধ্যবয়সী। খুব একটা লম্বা নয়, মাঝারি মাপের মজবুত চেহারা, মুখময় কাঁচাপাকা দাড়ি। মাথার মাঝখানে গোল জালি-কাটা টুপি, গায়ে চেক চেক দামী লুঙ্গি, আর বোতাম-ঘরগুলোর পাশে কাজ করা গোলাপি পাঞ্জাবি। পায়ে পাম্প শু। দেখে মনে হয়, পয়সাওলা সচ্ছল পরিবারের কর্তা।

রাজেক আগের মতোই গলার স্বর নীচু করে বলল, 'উই মিঞাছাব আগে যাউক গিয়া। হেরপর (তারপর) আমি যামু—'

লোকটার তাড়াহুড়ো নেই, ধীরেসুস্থে হেঁটে যাচ্ছিল। হঠাৎ কী ভেবে এধারে তাকাল। বেতঝোপের আড়াল থাকলেও সে আবছাভাবে বিনুদের দেখতে পেয়েছে। লোকটা থমকে দাঁড়িয়ে গেল, এবং তীক্ষ্ণ সন্দিগ্ধ চোখে লক্ষ করতে লাগল। তারপর পায়ে পায়ে এগিয়ে এল।

কাল রাতে নিবিড় কুয়াশা আর অন্ধকারে ঘাতক বাহিনীর নজর এড়ানো গিয়েছিল, কিন্তু হেমন্তের এই সকালে চারদিকে যখন রোদের ঢল নেমেছে, বিনুরা ধরা পড়ে গেল। কাল ঠিক এই আশঙ্কাই করেছিল সে।

লোকটা বিনুদের কাছে এসে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল। এদিকে ঝিনুকের ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। জেগে উঠেই সামনে লোকটাকে দেখে আতঙ্কে বিনুর একটা হাঁটু আঁকড়ে ধরে সে, এবং চোখ বুজে ফেলে।

বিনুর পরনে ধুতি। লোকটা নিশ্চয়ই তার পরিচয় জেনে গেছে। সে টের পেল, ভয়ে পেটের ভেতরটা পাক দিয়ে উঠছে, গলার কাছে খুব শক্ত কী যেন ডেলা পাকিয়ে যাচ্ছে। মনে হল, হেমন্তের স্নিগ্ধ সকালে নদীর পাড়ে এই অঞ্চলটা হঠাৎ বায়ুশূন্য হয়ে গেছে। শ্বাস টানতে ভীষণ কষ্ট হতে লাগল তার।

রাজেক লোকটার ডান পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। শঙ্কিত এবং ত্রস্ত। হাত কপালে ঠেকিয়ে করুণা ভিক্ষার সুরে বলতে লাগল, 'সালাম মিঞাছাব, এনি (ইনি) ছুটোবাবু, রাইজদার হ্যামকত্তার নাতি। বি.এ, এম. এ পাস। দুনিয়ায় হ্যামকত্তার লাখান (মতো) মানুষ হয় না। তেনার কাছে গ্যালে কেওইরে (কাউকে) বৈমুখ করে না। আমাগো বল-ভরসা হ্যামকত্তা। আর উই যে ঝিনুকদিদি, বড় দুঃখী মাইয়া। তেনার কথা শুনলে পাষাণেরও বুক ফাইটা যাইব। ছুটোবাবু আর ঝিনুকদিদি কইলকাতায় যাইতে আছিল। কিন্তুক কাইল রাইতে—'

গুছিয়ে ঠিকমতো বলতে পারছিল না রাজেক। তার কথাগুলো অসংলগ্ন, আগোছাল। তবে এটুকু বোঝা যায়, লোকটার মনে বিনু আর ঝিনুক সম্বন্ধে যাতে সহানুভূতির সৃষ্টি হয়, প্রাণপণে সেই চেষ্টাই করে চলেছে সে। তার হয়তো ধারণা, লোকটা ইচ্ছা করলে বিনুদের বাঁচাতেও পারে।

বিনু ভয়বিহ্বল চোখে লোকটাকে দেখছিল। চেহারায় একটা ব্যক্তিত্বের ছাপ আছে। মনে হয়, এই এলাকার মান্যগণ্য কেউ হবে। তাদের রক্ষা করার ক্ষমতা তার আছে কিনা, থাকলেও তেমন সদিচ্ছা বা মহানুভবতা তার কাছে আশা করা যায় কিনা, বোঝা যাচ্ছে না। কতখানি আক্রোশ সে নিজের মধ্যে ঠেসে রেখেছে, তা-ই বা কে জানে। সাহায্য করতে পারুক আর না-ই পারুক, মারাত্মক ক্ষতি করতেই পারে। চারপাশের গ্রাম ট্রামে বিনুদের খবর জানিয়ে দিলে ঝাঁকে ঝাঁকে হানাদার লাঠি বর্শা নিয়ে ছুটে আসবে।

রাজেক একনাগাড়ে লোকটার ভেতর মহত্ত্ব জাগিয়ে তুলতে চাইছিল, 'ছুটোবাবু বড় ভালা মানুষ। আমাগো রাইজদার চাইর দিকে রায়ট হইছে, কিন্তুক কুনোদিন তেনি কেওর (কারোর) গায়ে এট্টা টুকাও (টোকা) মারে নাই। হ্যামকত্তারে তো চিনেন, তেনার নাতি তো—'

লোকটা এতক্ষণ চুপচাপ দেখে যাচ্ছিল। এই প্রথম কথা বলল, 'হ্যামকত্তা নামে কেওইরে (কারোকে) চিনি না—' তার গলার স্বর রীতিমতো গম্ভীর এবং মোটা ধরনের।

রাজেক তাজ্জব হয়ে যায়। রাজদিয়ার হেমকর্তাকে চেনে না বা তার নাম শোনে নি, এই দুনিয়ার এমন কেউ থাকতে পারে, ভাবতেই পারে না সে। বলে, 'ক'ন কী মিঞাছাব, হ্যামকত্তা হইল আমাগো—'

হাত তুলে রাজেককে থামিয়ে দিয়ে লোকটা বিনুকে জিজ্ঞেস করে, 'আপনেরা কারা? কী নাম আপনের?' নদীর পাড়ে বেতঝোপের আড়ালে দূর থেকে বিনুদের আবছাভাবে দেখে সে কিছুটা ধন্দে পড়ে গিয়েছিল। ওইরকম জায়গায় ক'টি মানুষ, তারা পুরুষ না মেয়েলোক, বুঝতে পারছিল না। কী উদ্দেশ্যেই বা ওরা ওখানে লুকিয়ে আছে, বোধগম্য হয়নি। খানিকটা সংশয় আর খানিকটা কৌতূহল নিয়ে তাই এগিয়ে এসেছিল। বিনুদের সামনাসামনি দেখার পর সে স্তম্ভিত। ভাবতে পারেনি, একটি অচেনা হিন্দু যুবক এবং রুগ্‌ণ, কৃশ চেহারার একটি তরুণীর সঙ্গে অতি সাধারণ দু'জন আধাবয়সী মুসলমানকে দেখতে পাবে।

বিনু উত্তর দিতে চেষ্টা করল। কিন্তু প্রথমটা গলায় স্বর ফুটল না। তারপর কোনও রকমে নিজের নাম বলল।

লোকটা রাজেককে দেখিয়ে বলে, 'এই মিঞা তো কইল, আপনে রাইজদার হ্যামকত্তার নাতি। রাইজদায় তাইলে (তা হলে) আপনেগো বাড়ি?'

আস্তে মাথা নাড়ে বিনু।

লোকটা এবার জিজ্ঞেস করে, 'এইহানে আসলেন ক্যামনে?'

ভয়ে ভয়ে, মাঝে মাঝে থেমে, কাঁপা শুকনো গলায় কাল সন্ধেয় নৌকোয় ওঠার পর যা যা ঘটেছে, সমস্ত বলে গেল বিনু। রাজেক এবং তমিজের পরিচয়ও দিল।

অনেকক্ষণ চুপ করে রইল লোকটা। তাকে ভীষণ চিন্তাগ্রস্ত দেখাচ্ছে, কপালে গভীর ক'টা রেখা ফুটে বেরিয়েছে। একসময় সে বলল, 'এইহানে নাইমা (নেমে) ভালা করেন নাই।' পরক্ষণে কী মনে পড়ে যাওয়ায় বলে, 'তয় (তবে) না নাইমা উপায়ও আছিল না, জান চইলা যাইত।'

বিনু কী বলবে, ভেবে পেল না। নিজেকে দিশেহারা, বিপর্যস্ত লাগছিল। তারই ভেতর খুব সামান্য হলেও একটু ভরসা যেন সে পেয়েছে। লোকটাকে উগ্র, হিংস্র মনে হচ্ছে না। বরং ধৈর্য ধরে সে কাল রাতের যাবতীয় ঘটনার বিবরণ শুনেছে। হয়তো মানুষটা ভাল, সহৃদয়, তার মধ্যে মনুষ্যত্বের ছিটেফোঁটা অবশিষ্ট থাকলেও থাকতে পারে।

লোকটা ফের বলল, 'কিন্তুক এইহানে বিশহান গেরাম চৈদ্দ পনর দিন ধইরা জবর গরম হইয়া আছে। খুন হইছে, ঘরে আগুন লাগছে। মেলা (অনেক) মানুষ দ্যাশের ভিটামাটি ছাইড়া কইলকাতা না আসাম, কুন দিকে জানি চইলা গ্যাছে। এই অবোস্তায় (অবস্থায়)—' বলতে বলতে চুপ করে গেল।

ইঙ্গিতটা অত্যন্ত পরিষ্কার। এই অঞ্চলের আবহাওয়া ভীষণ উত্তেজক। এমন পরিস্থিতিতে বিনুদের যে কোনও মুহূর্তে প্রচণ্ড বিপদে পড়ার সম্ভাবনা।

লোকটা এধারে ওধারে তাকিয়ে সতর্ক ভঙ্গিতে ফের বলল, 'কেও (কেউ) আপনেগো দেইখা ফেলাইলে মুশকিল হইয়া যাইব। যত তরাতরি পারেন এইহান থিকা চইলা যান।'

লোকটাকে খড়কুটোর মতো আঁকড়ে ধরল বিনু। সে এখন নিশ্চিত, লোকটা তাদের আদৌ অনিষ্ট করতে চায় না। দু'টি নির্দোষ অসহায় যুবক যুবতী যাতে প্রাণে বেঁচে যায়, সে জন্য সঠিক পরামর্শই দিয়েছে। বিনু হাতজোড় করে ব্যাকুলভাবে বলে, 'যাব কী করে? দয়া করে আপনি তারপাশায় যাবার ব্যবস্থা করে দিন। আমার সঙ্গে কিছু টাকা আছে। নৌকো ভাড়া দিতে পারব।'

রাজেক ও তমিজ মিনতির সুরে একটানা বলে যায়, 'মেহেরবানি কইরা ছুটোবাবু আর ঝিনুকদিদিরে রক্ষা করেন মিঞাছাব। আল্লার দোয়ায় আপনের ভালা হইব।'

কিছুক্ষণ চিন্তা করে লোকটা বিনুকে বলল, 'আমি যদিন আপনেগো লেইগা কিছু করতে যাই, তাফালে (ঝামেলায়) পইড়া যামু। মানুষ আর অহন মানুষ নাই। হগল সোময় তাগো মাথায় খুন চইড়া থাকে। অগো গুসা (ওদের রাগ) আইসা পড়ব আমার উপুর।'

যে অবলম্বনটুকু ধরে বিনু এই দুঃসহ মৃত্যুপুরীর সীমানা পেরিয়ে যেতে চেয়েছিল সেটা হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে। টের পেল, পারাপারহীন হতাশা চারদিক থেকে তাকে জাপটে ধরছে। চোখের সামনে হেমন্তের এই সকাল ক্রমশ গাঢ় অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছে।

লোকটা নিজের সঙ্গে কিছুক্ষণ যুঝে হঠাৎ দ্বিধান্বিত ভাবটা কাটিয়ে নিল। তারপর মনস্থির করে ফেলল, 'যা হওনের হইব, আপনেগো লেইগা কিছু এট্টা না করলে মনে লয় গুনা (পাপ) লাগব। আল্লায় আমারে মাপ করব না। এক কাম করেন—'

ভেতরে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়ে যেতে যেতে বিনুর মধ্যে আবার ক্ষীণ একটু আশা জেগে ওঠে। কাল রাত থেকে এই একটা ব্যাপার ক্রমান্বয়ে চলছে—কখনও সামান্য আশার সংকেত, পরক্ষণে অপার হতাশা এবং আতঙ্ক। কলকাতা তো কম দূরের পথ নয়। সেখানে পৌঁছবার আগে, যদি আদৌ পৌঁছতে পারে, এইভাবেই তাদের চলবে। জীবন যে কত দুর্যোগের সমষ্টি, রাজদিয়া থেকে বেরুবার পর এই প্রথম জানতে পারছে বিনু। জোরে শ্বাস টেনে ব্যগ্র স্বরে সে বলে, 'কী করতে হবে বলুন—'

লোকটা বলল, 'দিনের বেইলে (বেলায়) কিছু করন যাইব না। রাইতে আন্ধার নামলে এট্টা চ্যাষ্টা

করুম। তমস্ত (সারা) দিন আপনেগো লুকাইয়া থাকতে হইব।' চারদিক খুঁটিয়ে দেখে নিয়ে আস্তে আস্তে মাথা নাড়ে, 'না, গাঙের এত কিনারে থাকন ঠিক না। কাছেই নৌকাঘাটা। বেইল চড়লে রাইজ্যের কেরায়া নাও, গয়নার নাও আইসা ওইহানে ভিড় জমাইব। সুমখের (সামনের) পথ দিয়া মাইনষের চলাচল বাইড়া যাইব। কেওইর না কেওইর (কারোর না কারোর) নজরে পইড়া যাইবেন। আসেন আমার লগে—'

লোকটা বিনুদের নিয়ে বাঁ ধারে বেশ খানিকটা দূরে গভীর জঙ্গলের ভেতর চলে গেল। এখানে অনেকখানি এলাকা জুড়ে বনতুলসী আর মুত্রার ঝাড় উদ্দাম হয়ে আছে। আর আছে উঁচু উঁচু সব গাছ, সেগুলোর ডালপালা ঘন পাতায় ছাওয়া। ফলে সূর্যালোক ভেতরে ঢুকতে পারে না। জায়গাটা দিনের বেলাতেও ছায়াচ্ছন্ন এবং স্যাঁতসেঁতে।

লোকটা জানালো, মানুষজন পারতপক্ষে এদিকে তেমন একটা আসে না। আপাতত বিনুরা এখানে থাক। তারপর গ্রামের ভাবগতিক বুঝে সে ওদের অন্য জায়গায় সরিয়ে নিয়ে যাবে। দিনের বেলাটা যে করেই হোক নিরাপত্তার কারণে মানুষের নজরের বাইরে ওদের থাকতেই হবে।

রাজেক ভয়ে ভয়ে চারপাশে লক্ষ করছিল। বলল, 'সাপখোপ নাই তো?'

লোকটা বলল, 'জঙ্গলে সাপ থাকব না, হেইটা কি হয় মিঞা? আছে, মেলাই আছে। হুইশার (হুঁশিয়ার) হইয়া এইহানে থাকতে হইব। তুমি আমার লগে আসো—'

রাজেক বিনুদের ফেলে যেতে চাইছিল না। না বললে লোকটা হয়তো চটে যাবে। এখন পর্যন্ত তার কথাবার্তা বা আচরণে সন্দেহজনক কিছু পাওয়া যায়নি, বরং তাকে হিতাকাঙ্ক্ষী বলেই মনে হয়েছে। তবু মানুষের মনে কী থাকে, সবসময় কি বাইরে থেকে বোঝা যায়? ঢোক গিলে রাজেক ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করে, 'কুনহানে যাইতে ক'ন?'

লোকটা ধমকে উঠল, 'গ্যালেই দেখতে পাইবা।'

রাজেকের আর কোনও প্রশ্ন করতে সাহস হয় না। সে তমিজকে বলে, 'গাছের একহান ডাইল (ডাল) ভাইঙ্গা চাইর দিকে নজর রাখিস।' তার মাথায় সাপের চিন্তাটা ঘুরছিল।

মুত্রাবনের পাশে ঘাসের জমি। রোদ না লাগায় এখানকার ঘাস সতেজ নয়, কেমন যেন মরা মরা, হলদেটে। ঝিনুককে হাত ধরে বসিয়ে নিজেও তার পাশে বসল বিনু। তমিজ ততক্ষণে গাছের মাঝারি একটা ডাল ভেঙে নিয়ে চনমনে চোখে চারপাশে লক্ষ রাখতে শুরু করেছে।

কাল রাতে যেমন শুনেছিল, এই দিনের বেলাতেও ঝিঁঝিদের একনাগাড়ে গলা সাধা চলছে। মাঝে মাঝে কোথায় যেন ডাহুক চেঁচিয়ে উঠছে, কাঠ ঠোকরারা শক্ত ধারাল ঠোঁট দিয়ে ঠোকর মেরে মেরে গাছের গুঁড়ি এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করে চলেছে। কাছাকাছি এক পাল শিয়াল ডেকে উঠল। মশা এবং পোকা মাকড়েরা চারদিকের ঝোপঝাড় থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে বেরিয়ে এসে বিনুদের ছেঁকে ধরতে লাগল।

মশা টশা তাড়াতে তাড়াতে এই নিঝুম বনভূমিতে বসে অদ্ভুত এক অনুভূতি হচ্ছিল বিনুর। মানুষের ভয়ে তারা এখানে লুকিয়ে আছে, কিন্তু এখানেও রয়েছে মৃত্যুভয়। বিষধর সাপেরা আচমকা কোন গর্ত থেকে বেরিয়ে এসে ছোবল হানবে, কে জানে।

রাজেক সেই লোকটির সঙ্গে চলে যাবার পর অনেকটা সময় কেটে গেছে। মাথার ওপর ডালপালার যে ঘন আচ্ছাদন, তার ফাঁক দিয়ে সরু সরু রোদের ফালি এসে পড়েছে নীচে। আন্দাজ করা যায়, বেশ বেলা হয়েছে।

সকালে ঘুম ভাঙার পর মুখ ধোওয়ার সময় পাওয়া যায়নি। সেই লোকটা নদীর দিক থেকে হঠাৎ কাছে চলে এসেছিল। বিনু টের পাচ্ছে, বাসি মুখ আর নিশ্বাস থেকে দুর্গন্ধ বেরিয়ে আসছে। গা গুলিয়ে উঠতে লাগল তার।

পাশ থেকে ঝিনুক বলল, 'মুখ একেবারে পচে গেছে। একটু যদি জল পাওয়া যেত—'

বিনু উত্তর দেবার আগেই তমিজ বলে ওঠে, 'বদনা কি ঘটি উটি থাকলে গাঙ থিকা পানি আইনা দিতাম। কিন্তুক শালার পুতেরা কাইল রাইতে নাও সুদ্ধা (নৌকো সুদ্ধ) বেবাক লইয়া গ্যাছে। দেখি যদিন এই জঙ্গলের ভিতরে খাল উল থাকে। তাইলে আপনেগো দুই জনারে হেইহানে মুখ ধোওনের (ধোওয়ার) লেইগা লইয়া যামু।'

অনেক জায়গায় নদী পাড় ভেঙে বিল বা খালের আকারে গ্রাম কি ঝোপজঙ্গল বা ধানখেতের ভেতর দিয়ে বহুদূর ছড়িয়ে পড়ে। তমিজ এধারে ওধারে বেশ খানিক দূরে গিয়ে তে·· কোনও জলের ধারা খোঁজ করে এল। কিন্তু না, এখানে খাল বিল কিছুই নেই।

এই সময় রাজেক আর সেই লোকটি ফিরে এল। রাজেকের এক হাতে টিনের জলভর্তি বড় বালতি, আরেক হাতে বেতের বড় ডালায় মুড়ি, মুছি গুড়, কদমা এবং এক ছড়া সবরি কলা। আর লোকটার হাতে কাগজে মোড়া মোটা একটা প্যাকেট।

লোকটা বিনুকে বলল, 'রাজেক মিঞারে খাওয়াইয়া আনছি। আপনেগো লেইগা পানি আর সবিরের (সকালের) খাওনেরটা (খাবার) লইয়া আইছি। মুখ ধুইয়া আগে খাইয়া লন। তমস্ত রাইত তো প্যাটে কিছু পড়ে নাই।'

লোকটার সব দিকে নজর। অসীম কৃতজ্ঞতায় মন ভরে যায় বিনুর। বুকের অতল স্তর থেকে দুরন্ত আবেগ উথলে উথলে এসে গলার কাছে জমা হতে থাকে। কিছুক্ষণ আগেও ওই লোকটা সম্পর্কে পুরোপুরি নিঃসন্দেহ ছিল না বিনু। আকাশের গায়ে পেঁজা পেঁজা কালো মেঘের টুকরোর মতো তার মনে সংশয় ভেসে বেড়াচ্ছিল। এ এমন এক নিদারুণ সময় যে কারোকে বিশ্বাস করা যায় না। ওই লোকটা তো সম্পূর্ণ অচেনা। তাকে অবিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ আছে। কিন্তু তাদের রাজদিয়া এবং তার চারপাশের বহু চেনা মানুষ এই ক'বছরে আগাগোড়া বদলে গেছে। তাদের কারোর ওপরেই ইদানীং আর আস্থা রাখা যাচ্ছিল না। সামনাসামনি তারা অবশ্য খারাপ ব্যবহার করেনি। কিন্তু টের পাওয়া যেত, ভেতরে ভেতরে তীব্র আক্রোশ এবং ঘৃণা পুষে রেখেছে।

সমস্ত আবহাওয়া যখন দূষিত এবং বিষাক্ত, উত্তেজনা আর বিদ্বেষ যখন বায়ুস্তরে ভেসে বেড়াচ্ছে, ওই লোকটাকে আশ্চর্য রকমের ব্যতিক্রম মনে হয়। তার কোনও রকম দুরভিসন্ধি থাকলে সকাল বেলা বিনুদের দেখামাত্র তুমুল হইচই বাধিয়ে লোকজন জড়ো করতে পারত। কিন্তু এ সব কিছুই করেনি সে। বরং ওদের বাঁচাবার জন্য গভীর জঙ্গলে এনে লুকিয়ে রেখেছে। এখন আবার জল আর খাবার নিয়ে এসেছে। পুরনো কথাটা ফের মনে হল বিনুর, পৃথিবীর সবাই খারাপ হয়ে যায়নি, কারোর কারোর ওপর ভরসা রাখা যায়।

মুখ ধোওয়া এবং খাওয়া শেষ হলে লোকটা বলল, 'তমস্ত দিন এই জঙ্গলে থাকন ঠিক হইব না। সাপখোপ আছে, বাঘডাসা আছে, বুনা (বুনো) শুয়োর আর বড় বড় বিছা আছে। কহন কী বিপদ ঘইটা যাইব! আসেন আমার লগে—'

কোথায় যেতে হবে, বিনু জানে না। তবে সে নিশ্চিত, ওই লোকটার সঙ্গে গেলে তাদের ক্ষতির আশঙ্কা নেই। সে কোনও প্রশ্ন করল না।

লোকটা এবার তার হাতে যে কাগজে-মোড়া প্যাকেট ছিল সেটা খুলে একটা লুঙ্গি এবং একটা বোরখা বার করে বিনুকে দিতে দিতে বলল, 'ধুতি ছাইড়া আপনে লুঙ্গিহান পরেন, আর বিবিসাবরে বুরখা পরতে ক'ন—'

বিবিসাব! বিনু চমকে উঠল। লোকটা ঝিনুককে নিশ্চয়ই তার স্ত্রী ভেবে নিয়েছে। অথচ তাদের যে এখনও বিয়ে হয়নি সেটা বলতে গিয়ে থমকে গেল। সে বললে নানারকম জবাবদিহি করতে হবে। ঝিনুক কে, কেন অনাত্মীয় একটি যুবতীকে সঙ্গে করে সে কলকাতায় চলেছে, ইত্যাদি। চোখের কোণ দিয়ে দ্রুত রাজেক আর তমিজের দিকে তাকিয়ে ইশারা করল বিনু। তারা যেন বিয়ের ব্যাপারে ফস করে কিছু বলে না বসে। তমিজরা ইঙ্গিতটা বুঝল। ওই লোকটাকে বুঝতে না দিয়ে আস্তে মাথা নাড়ল।

বিনু একটা মোটা গাছের আড়ালে গিয়ে লুঙ্গি পরে, ধুতিটা ভাঁজ করে নিয়ে ফিরে এল। তারপর বোরখাটা ঝিনুককে পরিয়ে দিল।

লোকটার হাতে প্যাকেটের কাগজ ছিল। সেটা বিনুকে দিয়ে সে বলল, 'ধুতিহান এইটা দিয়া জড়াইয়া লন।'

বিনু তাই করল। তার হাত থেকে রাজেক ধুতির পোঁটলাটা নিল। খালি জলের বালতি এবং বেতের ডালাটা নিল তমিজ।

লোকটা এবার বলল, 'ক্যান আপনেগো লুঙ্গি আর বুরখা পরতে কইলাম, বুঝতে পারছেন?'

হঠাৎ কারোর চোখে পড়লে তাদের পরিচয় জানাজানি হয়ে যাবে, তার পরিণতি মারাত্মক। নিরাপত্তার কারণে তাই লুঙ্গি আর বোরখার ব্যবস্থা। লোকটা কোনও রকম ঝুঁকি নিতে চায় না। বিনু আস্তে মাথা নাড়ল—বুঝতে পেরেছে।

লোকটা বিষণ্ণভাবে, খানিকটা আক্ষেপের সুরে বলল, 'কী দিনকাল যে পড়ছে!'

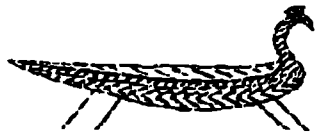

নদীর কিনার থেকে যে পায়ে-চলা কাঁচা রাস্তাটা পাক খেয়ে খেয়ে অজানা জনপদের দিকে চলে গেছে, লোকটা বিনুদের সঙ্গে করে সেদিকে গেল না। নিঝুম বনভূমির ভেতর দিয়ে দিয়ে ঘুরপথে এগিয়ে চলল।

লোকটা যেন রহস্যময় পথ-প্রদর্শক। কতদূরে সে বিনুদের নিয়ে যাবে, কে জানে।

লোকটার পাশাপশি হাঁটছে বিনু আর ঝিনুক। ঝিনুকের হাঁটতে কষ্ট হচ্ছিল। পা-মাথা টলছিল। সে যাতে পড়ে না যায়, তাই তার কাঁধে হাতের বেড় দিয়ে ধরে রেখেছে বিনু। তাদের পেছন পেছন চলেছে রাজেক এবং তমিজ।

মাথার ওপর নানা রঙের অজস্র পাখি এখনও উড়ছে। মনে হয়, হলুদ কালো সাদা সবুজ নীল, ইত্যাদি টুকরো টুকরো রঙিন কাগজ কেউ বাতাসে ছড়িয়ে দিয়েছে। পাখিদের অবিশ্রান্ত কিচিরমিচির, ডানা ঝাপটানি, থেকে থেকেই ডাহুকদের তীক্ষ্ণ চিৎকার, ঝিঁঝির ডাক জঙ্গলের জমাট স্তব্ধতাকে ছিঁড়ে খুঁড়ে দিচ্ছেল।

চলতে চলতে লোকটা নিজের থেকেই কথা বলছিল। জানা গেল, তার নাম আফজল হোসেন। এই জায়াগাটার নাম মামুদপুর। চারপাশে যে গ্রামগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে সেগুলো হল গাবতলি, চরচিকন্দি, সোনাদীঘি, এমনি অনেক। আফজল হোসেন বড় ধানী গৃহস্থ, প্রায় নব্বই কানি দোফসলা জমির মালিক। স্থানীয় ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট। স্ত্রী, দুই ছেলে, এক ছেলের বউ এবং তিন মেয়ে নিয়ে তার জমজমাট সংসার। মেয়েদের নাম-করা বংশে, শিক্ষিত সৎ পাত্রের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে। তিন মেয়ের ঘরে মোট এগারটি নাতি-নাতনী। তাদের কেউ না কেউ সারা বছরই বাপজানের বাড়িতে এসে থাকে। বড় ছেলের বিয়ে হলেও এখনও তার ছেলেপুলে হয়নি। ছোট ছেলে এ বছরই মুন্সিগঞ্জের হরগঙ্গা কলেজ থেকে বি.এ পাস করেছে। আফজলের ইচ্ছা, দু'চার মাসের মধ্যে তার বিয়ে দেয়, কিন্তু ছেলেটা একেবারেই রাজি নয়। ঘাড় টেড়া করে রয়েছে।

নিজের সংসার সম্বন্ধে সাতকাহন ফাঁদার সময় এটা নয়। তবু যে আফজল এত কথা বলছে তার কারণ আন্দাজ করা যায়। এখানকার আবহাওয়া তো সহজ, স্বাভাবিক নয়। কেমন দমবন্ধ-করা। খুব সম্ভব সেজন্য বিনুদের যতখানি পারা যায়, অন্যমনস্ক করে রাখতে চাইছে।

একসময় জঙ্গল পেরিয়ে আফজল বিনুদের যেখানে নিয়ে এল সেটা কোনও গ্রামের একটা অংশ। সেখানে ছাড়া ছাড়া ভাবে অনেক বাড়িঘর চোখে পড়ছে। এক একটা বাড়িতে ছ'সাত হাত উঁচু ভিতের ওপর তিন চার খানা করে ঘর। সেগুলোর কোনওটা পঁচিশের বন্দের, কোনওটা সাতাশের বন্দের। মাথায় ঢেউটিনের চাল, চারপাশে ক্যাঁচা বাঁশের দেওয়াল। বাড়িগুলোর সামনের দিকে অনেকখানি জায়গা জুড়ে ঢালাও উঠোন। এক ঘর থেকে আরেক ঘরে যাতায়াতের জন্য বাঁশের সাঁকো পাতা রয়েছে।

এখন অবশ্য টানের সময়। সব উঠোনই শুকনো, খটখটে। তবু যে সাঁকোগুলো রয়েছে তার কারণ বর্ষায় নদীতীরের এই নাবাল অঞ্চল নিশ্চয়ই ডুবে যায়। জ্যৈষ্ঠের শেষাশেষি থেকে আশ্বিনের মাঝামাঝি পর্যন্ত উঠোনগুলোতে এক মানুষ জল জমে থাকে। তাই ঘরগুলোর ভিত অত উঁচু, তাই সাঁকোর ব্যবস্থা। আশ্বিনের শেষাশেষি জল নেমে যাবার পরও সাঁকোগুলো ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে। কেননা, বছরের পর বছর বর্ষা আসে, কে আর ওগুলো খুলে ক'মাস বাদে আবার কষ্ট করে বানায়। পাঁচ সাত বছর পর জলে সাঁকোর খুঁটি হেজে পচে গেলে তখন অবশ্য না বানিয়ে উপায় কী। এই জলের দেশে যেখানে

জাম নীচু, সেখানেই প্রতিটি বাড়িতে সাঁকো চোখে পড়বে।

একটানা আফজল হোসেনই কথা বলে যাচ্ছিল, আর নিঃশব্দে শুনছিল বিনু। হঠাৎ তার খেয়াল হল, গ্রামের ভেতর চলে এলেও জায়গাটা অদ্ভুত রকমের স্তব্ধ আর নির্জন। কোথাও মানুষজন চোখে পড়ছে না।

চারদিক ভাল করে লক্ষ করে চমকে উঠল বিনু। কিছু কিছু বাড়ি অক্ষত আছে ঠিকই। কিন্তু বেশির ভাগেরই টিনের চাল আর জানালা কপাট খুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কোনওটা আধপোড়া, কোনওটা পুড়ে ঝুড়ে ছাই হয়ে গেছে। সব মিলিয়ে নিঝুম, পরিত্যক্ত, বিধ্বস্ত এক জনপদ। এখানকার বাসিন্দাদের ওপর যে অল্প কিছুদিন আগেই হামলা চালানো হয়েছিল তার ছাপ স্পষ্ট।

আফজল হোসেন বলল, 'এই জাগাখান (জায়গাটা) আমাগো মামুদপুর গেরামের পুব দিক। এইহানে যুগীরা, নাপিতরা, কুমার বামন আর সদগোপেরা থাকত। দ্যাশভাগের পর কেও কেও ভিটামাটি ছাইড়া চইলা গ্যাছিল। যেই কয় ঘর আছিল, দিন পনর বিশেক আগে হেরাও গ্যাছে গিয়া।' একটু থেমে, ভারী গলায় ফের বলল, 'কত কাল ধইরা, হেই বাপ-দাদা, দাদার বাপ, তাগো বাপের আমল থিকা এক লগে থাকছি। এই মানুষগুলানের লগে আর দেখা হইব না।'

হিন্দুরা মামুদপুর থেকে সাত পুরুষের ভদ্রাসন ছেড়ে চলে গেছে, সেজন্য আফজল হোসেনের আক্ষেপটা যথেষ্ট আন্তরিক মনে হল বিনুর। যখন পাকিস্তানের বেশির ভাগ লোকই চায়, হিন্দুরা দেশ ছাড়ুক, এই লোকটা সেদিক থেকে আশ্চর্য রকমের ব্যতিক্রম। বহু পুরুষ ধরে যারা সুখে দুঃখে পাশাপাশি বাস করে এসেছে, তাদের এভাবে চলে যাওয়াটা তার কাছে খুবই শোকাবহ ঘটনা।

বিনু উত্তর দিল না। আস্তে মাথা নাড়ল শুধু। নিঝুম জঙ্গলের ভেতর বনতুলসী এবং মুত্রা ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে থাকার সময় ভীষণ উৎকণ্ঠা হচ্ছিল তার। এখন মামুদপুর গ্রামের পরিত্যক্ত, জনশূন্য এলাকায় পা দিয়ে আরেক ধরনের উৎকণ্ঠা হচ্ছে। এখন কারোকে দেখা যাচ্ছে না ঠিকই, কিন্তু কেউ যে ঝট করে এধারে চলে আসবে না, তার কোনও নিশ্চয়তা নেই। বুকের ভেতর যে আশঙ্কাটা দ্রুত জমাট বাঁধছে তা মুখ ফুটে বলতে পারল না বিনু।

আফজল হোসেন শেষ পর্যন্ত একটা বাড়িতে ওদের নিয়ে এল। এখানে চৌকো মস্ত উঠোনের চারধারে চারখানা পঁচিশের বন্দের ঘর। চালের ঝকঝকে নতুন টিনগুলো দেখে মনে হয়, খুব বেশিদিন আগে ওগুলো লাগানো হয়নি। অন্য সব বাড়ির মতো এখানেও বর্ষায় এঘর থেকে ওঘরে যাবার জন্য সাঁকো পাতা আছে। উঠোনের এক কোণে বাঁধানো মঞ্চে অনেকগুলো সতেজ তুলসী গাছ। আর আছে ধান রাখার জন্য মস্ত মস্ত গোলাকার পাঁচটা বেতের ডোল। সেগুলোর গায়ে গাবের আঠা লাগিয়ে রীতিমতো শক্তপোক্ত করা হয়েছে। প্রতিটি ডোলে কম করে পনের ষোল মণ ধান রাখা যায়। ডোলগুলো যেখানে, তার উলটো দিকে বড় একটা বাতাবি লেবুর গাছ প্রচুর ডালপালা ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সেটার গুঁড়িতে কম করে আট দশটা লাঙল দাঁড় করানো। বাতাবি গাছটা থেকে খানিক দূরে ক'টা মোটা কাঠের খুঁটি পোঁতা। সেগুলোর গায়ে দশ বারটা বৈঠা পাটের দড়ি দিয়ে বেঁধে হেলান দিয়ে রাখা হয়েছে।

উঠোনটা মোটামুটি পরিষ্কার। ধুলোবালি তেমন জমেনি। হাওয়ায় হাওয়ায় খড়কুটো, বা গাছের শুকনো সরু ডাল বা মরা পাতা উড়ে এসে জমে নেই। বোঝা যায়, খুব অল্প দিন হল, এ বাড়ির বাসিন্দারা গ্রাম ছেড়ে চলে গেছে। আরও যা মনে হল, তারা ছিল বেশ সচ্ছল, ধানী গৃহস্থ।

আফজল হোসেন বলল, 'এই বাড়িহান আছিল ধনঞ্জয় বারইর। পঞ্চাশ কানি সরস জমিন, তালতালুটি, চৈদ্দ পনেরটা গাই আর বলদ, ছয়হান নাও (নৌকো), নগদ পহা। কুনো অভাব আছিল না। কিন্তুক কী যে হইয়া গ্যাল!'

কোনাকুনি উঠোন পেরিয়ে দক্ষিণদুয়ারী ঘরখানার সামনে চলে এল ওরা। ভিত উঁচু বলে উঠোন থেকে নারকেল গাছের গুঁড়ি কেটে দশ ধাপ সিঁড়ি বসানো রয়েছে।

আফজল হোসেন ফের বলে, 'ধনা বারই আছিল আমার পোলাপান কালের বন্দু। জিলা বোডের ইস্কুলে কয় বচ্ছর একলগে পড়ছি, এক লগে দুই জনে গাঙ হাতইরা (সাঁতরে) পারাপার করছি, বাইচ খেলছি। রাইতে পলাইয়া গিয়া গাবতলির গুঞ্জে যাত্রা শুনছি। একই বচ্ছর দুই জনের শাদি হইছিল।

হে যে কী আনন্দ আর মাতামাতি! পাকিস্থান হওনের পর পরই ধনারা কইলকাতায় চইলা যাইতে চাইছিল। আমি তারে বুঝাইয়া সুঝাইয়া আটকাইছি। কিন্তুক দিন বিশেক আগে এইহানে যা ঘটল, আর ভরসা পাইলাম না। ধনারা হগল (সব) ফেলাইয়া গ্যাল গিয়া। যাওনের সোময় বাড়িঘর জমিজেরাত আমারে দেখতে কইয়া গ্যাছে। যদিন সুদিন ফিরে, অরা আবার দ্যাশে আইব। কিন্তুক—'

নিজের অজান্তেই বিনু জিজ্ঞেস করল, 'কিন্তু কী?'

'সুদিন আর ফিরব কিনা, জানি না।'

একটু চুপচাপ।

তারপর আফজল হোসেন ফের বলল, 'ধনার ছাড়া-বাড়িতেই দিনের বেইলটা আপনেগো থাকতে হইব।'

গ্রামের জনহীন এলাকায় কেন তাদের নিয়ে আসা হয়েছে, এবার খানিকটা আঁচ করতে পারল বিনু। জঙ্গলে সাপখোপ, বিছে বা হিংস্র জন্তু-জানোয়ারের ভেতর বসে থাকার চেয়ে নির্জন বাড়িতে দিনটা কাটানো অনেক নিরাপদ। তা ছাড়া, গ্রামের এই অংশে অন্য এলাকার লোকজন খুব সম্ভব তেমন আসে না। যদি আসত, আফজল হোসেন নিশ্চয়ই তাদের এখানে টেনে আনত না।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আফজল কী যেন ভাবে। তারপর কিছুটা কুণ্ঠার সুরে বলে, 'আপনেগো আমার বাড়িত্ লইয়া যাইতে পারলে ভালা লাগত। কিন্তুক—' বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গেল সে।

উৎসুক চোখে আফজলের দিকে তাকাল বিনু, তবে কোনও প্রশ্ন করল না।

আগের কথার খেই ধরে আফজল এবার বাকিটা বলল, 'কিন্তুক আমার পোলা দুইটার মনের গতিক ভালা না। উই যে বাড়িহান দ্যাখেন—' আঙুল বাড়িয়ে বেশ খানিকটা দূরে একটা পোড়া বাড়ির ধ্বংসস্তূপ দেখাতে লাগল সে, 'উইটা আছিল গোসাইগো (গোস্বামীদের)। দ্যাশভাগের আগে কী যে দাপট আছিল তাগো, ভাবতে পারবেন না। হিন্দু হইলেও কুমার কুমার যুগী ঋষি (চর্মকার) জাউলাগো মানুষ বইলা মনে করত না। মুসলমানরা তাগো চৌখে পুকা-মাকড়ের থিকাও খারাপ। মুসলমানগো ছাওয়া (ছায়া) গায়ে লাগলে তাগো নিকি দোজখে (নরকে) যাইতে হইত। হেই বার, তহন যুজ্য চলতে আছে, আমার বড় পোলা কামাল মুন্সিগুঞ্জের হরগঙ্গা কলেজে আই.এ পড়ে, গরমের ছুটিতে গেরামে আইসা জুতা পায়ে গোসাইগো বাড়ির হাতায় ঢুকছিল। গোসাইগো কী গুসা (রাগ)! লোক দিয়া ধইরা খুটিতে বাইন্ধা ব্যাতের বাড়ি মারতে মারতে কামালরে বেহুশ কইরা ফেলাইছিল। হেই থিকা কামাল আর আমার ছুটো পোলা শোভান হিন্দুগো উপুর রাগ পুইষা রাখছে। আমি বুঝাই, হগল হিন্দু তো গোসাইগো লাখান না। তাগো কী দুষ? পোলারা বোঝে না। তাগো লাখান গেরামের আরও মেলা (অনেক) মানুষ আছে—জবর মাথাগরম। এইর লেইগা আপনেগো বাড়িত্ লইয়া গ্যালাম না। আসেন—'

নারকেল গুঁড়ির পইঠা ভেঙে আগে আগে ওপরে উঠতে লাগল আফজল হোসেন। তাদের পেছনে বিনুরা।

ঘরটা বাইরে থেকে শেকল তুলে বন্ধ করে রাখা ছিল। শেকল খুলে বিনুদের নিয়ে ভেতরে ঢুকল আফজল। ঘরটায় দু'টো বড় তক্তপোশ রয়েছে, আছে বেশ কিছু বাক্সপেটরা। দু'টো তক্তপোশেই লেপ কাঁথা তোষক বালিশ মশারি ডাঁই হয়ে আছে। বোঝা যায়, বহুদিন ধরে তিল তিল করে সযত্নে গড়ে তোলা সাজানো সংসার ফেলে ধনঞ্জয় বারুইরা চলে গেছে।

আফজল হোসেন বিনুকে বলল, 'আপনে বিবিজানরে লইয়া এই ঘরে জিরাইয়া (বিশ্রাম করুন)।' উঠোনের ওধারের একটা ঘর দেখিয়ে বলল, 'আপনেগো দুই মানি সুমখের (সামনের) উই ঘরে দিনের বেইলটা (বেলাটা) থাকব।' সে আগেই ধরে নিয়েছে বিনু এবং ঝিনুক স্বামী-স্ত্রী। তারা যখন বিশ্রাম করবে তখন একই ঘরে অন্য কারোর থাকা ঠিক নয়। তাই রাজেক এবং তমিজের জন্য আলাদা ব্যবস্থা করে দিল।

বিনু আস্তে মাথা নাড়ল।

আফজল এবার বলে, 'যতখানি সোময় এইহানে থাকবেন, সুমখের দিকের জানলা কপাট খুলবেন না। গেরামের হগলে জানে, ধনা বারুই হেগো (তাদের) জমিজেরাত আমার হাতে দিয়া গ্যাছে। কেও

এই বাড়িতে আসে না, তভু ধরেন আতথা (হঠাৎ) কইরা আইসা পড়ল। সাবধানে থাকন ভালা।' রাজেক এবং তমিজকেও একই পরামর্শ দিল সে। কেননা, এই অঞ্চলে কেউ তাদের চেনে না। দৈবাৎ কারোর চোখে পড়ে গেলে হয়তো জেরা করে করে বিনুদের খবর বার করে ফেলবে। ঝুঁকি নেওয়া কোনওভাবেই উচিত নয়।

বিনু এবং রাজেক জানায়, তারা দরজা জানালা খুলবে না।

একটু কী ভেবে আফজল বলল, 'এট্টা কথা জিগাই, কিছু মনে কইরেন না।'

বিনু বলল, 'না, মনে করব না। কী জানতে চান বলুন—'

'আপনেরা কি বামন?'

এমন একটা অদ্ভুত পরিবেশে, প্রাণ বাঁচানোর জন্য যখন তারা অজানা গ্রামের পরিত্যক্ত ঘরে আশ্রয় নিয়েছে, তাদের ঘিরে যখন শুধুই অনিশ্চয়তা এবং আতঙ্ক, সেই সময় জাতপাতের প্রশ্নটা কেন উঠল, বিনুর বোধগম্য হয় না। চমকে উঠে সে বলে, 'না—কায়স্থ। কেন?'

প্রশ্ন করার কারণটা এবার বুঝিয়ে দিল আফজল হোসেন। কাল কখন দু'টি ভাত খেয়ে তারা নৌকোয় উঠেছিল। আজ কিছুক্ষণ আগে সামান্য মুড়িটুড়ি খেয়েছে। এখন বাকি দিনটা বারুইদের ছাড়া বাড়িতে কাটাতে হবে। পেটে ভাত না পড়লে ভীষণ কাহিল হয়ে পড়বে বিনুরা। আফজল হোসেন জানে, হিন্দুরা, বিশেষ করে বামুনরা তাদের হাতের রান্না খায় না। ওদের জাতবিচার আর ছোঁয়াছুঁয়ির ব্যাপারে ভীষণ কড়াকড়ি।

আফজল জিজ্ঞেস করল, 'আমাগো ভাত কি আপনেরা খাইবেন?'

জাতপাত যে মানে না তা জানিয়ে বিনু বলল, 'আমার বাবার এক মসুলমান বন্দু আছেন কেতুগঞ্জে। তাঁর বাড়িতে আমরা অনেকবার খেয়েছি।'

'আপনেরা কুন খাইদ্য খান আর কুনটা খান না, আমি জানি। আপনেগো লেইগা দুফারে ভাত, ডাইল, ভাজাভুজি আর মাছের ঝোল লইয়া আসুম। গোস্ত আনুম না।'

গোস্ত বলতে আফজল কী ইঙ্গিত করল, বুঝতে অসুবিধা হয় না বিনুর। সে কিছু বলল না।

আফজল বলল, 'অহন যাই। বাইরে থিকা কপাটে শিকল তুইলা দিয়া যামু। ঘরে মানুষ আছে, কেও য্যান ট্যার না পায়।' রাজেক এবং তমিজকে সঙ্গে করে বেরিয়ে গেল সে।

একটু পর দরজায় শেকল লাগাবার আওয়াজ ভেসে এল।

আফজল হোসেনরা চলে যাবার পর বোরখা খুলে ফেলল ঝিনুক। তাকে ধরে আস্তে আস্তে একটা তক্তপোশে বসিয়ে দিল বিনু।

মানুষ বাস করলে বাড়িঘরে তরতাজা একটা ভাব থাকে। বেশ কিছুদিন বারুইদের এই বাড়িতে লোকজন নেই। তা ছাড়া, দরজা জানালাও বন্ধ রয়েছে। আলোবাতাস না খেললে যেমন হয়, ঘর জুড়ে অন্ধকার, চারপাশ থেকে ভ্যাপসা গন্ধ উঠে আসছে। কেমন যেন গা ছমছম করে।

ঝিনুক নির্জীব গলায় বলল, 'কিছু দেখতে পাচ্ছি না।' একটু থেমে বলল, 'দম বন্ধ হয়ে আসছে।'

আফজল হোসেনের নিষেধাজ্ঞাটা মাথায় রয়েছে বিনুর। নিরাপত্তার কারণে সামনের দিকের জানালাগুলো খোলা চলবে না। দরজা খোলার প্রশ্নই নেই। বাইরে থেকে সেটা বন্ধ রয়েছে। হঠাৎ তার মনে পড়ল, পেছন দিকের জানালাগুলো সম্বন্ধে আফজল কিছু বলে যায় নি। হয়তো ওগুলো খুললে তেমন ভয়ের কারণ নেই।

একটু ইতস্তত করল বিনু। তারপর পেছনের ক্যাঁচা বাঁশের দেওয়ালের কাছে চলে গেল। খুব সতর্কভাবে একটা জানালার ছিটকিনি খুলে পাল্লা সামান্য ফাঁক করে বাইরে তাকাল। বারুইদের বাড়ির চৌহদ্দি ঘিরে পোক্ত বাঁশের খুঁটি পুঁতে পুঁতে বুক সমান উঁচু বেড়া বসানো। তারের বাঁধন দিয়ে সেটা মজবুত করা হয়েছে। সীমানার পর নলখাগড়া জঙ্গলের ফাঁকে ফাঁকে অগুনতি পউনা আর হিজল

গাছ বিশৃঙ্খলভাবে দাঁড়িয়ে আছে। তারপর কচুরিপানায় বোঝাই একটা খাল। খালটার ওধার থেকে যতদূর চোখ যায়, ধানের খেত। কার্তিক মাস পড়তেই খেতগুলোতে আমন ধান পাকতে শুরু করেছে। এখনও পুরোটা সোনার রং ধরেনি। ধানের দানাগুলোর কিছুটা সবুজ, কিছুটা সোনালি।

বারুই বাড়ির এই পেছন দিকটা একেবারে নিস্তব্ধ। মানুষজন চোখে পড়ছে না। খুব সম্ভব এধারে কেউ আসে না। তাই হয়তো আফজল হোসেন এ পাশের জানালা খুলতে বারণ করে যায়নি।

বউন্যা আর হিজল গাছগুলোর মাথায় পাখপাখালি চোখে পড়ছে না। হয়তো দিনের আলো ফোটার পর তারা খাদ্যের খোঁজে দূরে কোথাও চলে গেছে। শুধু খালের ধার ঘেঁষে যে দু'চারটি হিজল গাছ ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে সেগুলোর ডালে ক'টা মাছরাঙা জলের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে বসে আছে। আর দেখা যাচ্ছে, খালে হাঁটু পর্যন্ত পা ডুবিয়ে বকেরা ধ্যানস্থ হয়ে রয়েছে।

অপার নৈঃশব্দ্যের ভেতর নলখাগড়ার জঙ্গল থেকে শুধু ঝিঁঝিদের অশ্রান্ত বিলাপ আর মাঝে মাঝে ডাহুকের ডাক ভেসে আসছে। এই জল-বাংলার যেখানেই জংলা জায়গা সেখানেই ডাহুক আর ঝিঁঝি। এই প্রাণী দু'টো কখনও চুপচাপ থাকতে পারে না, সারাক্ষণ জানান দিয়ে যায়, তারা আছে।

কিছুক্ষণ সতর্কভাবে বাইরে তাকিয়ে থাকার পর জানালার পাল্লা পুরোপুরি খুলে দেয় বিনু। হেমন্তের এক ঝলক স্নিগ্ধ বাতাস এবং রোদ ঘরের ভেতর ছড়িয়ে পড়ে।

হঠাৎ আধফোটা কাতর শব্দ কানে আসতে চমকে পেছন ফিরে তাকায় বিনু। তক্তপোশের ওপর ঝিনুকের রুগ্ণ শরীরটা ক্রমশ হেলে যাচ্ছে। সে আর সোজা হয়ে বসে থাকতে পারছে না।

উৎকণ্ঠিত বিনু দৌড়ে এসে ঝিনুককে ধরে ফেলে। জিজ্ঞেস করে, 'কী হয়েছে ঝিনক?'

ঝিনুক ক্ষীণ গলায় বলে, 'মাথায় ভীষণ যন্ত্রণা। আমি আর পারছি না।'

ভয়, আতঙ্ক, প্রচণ্ড অনিশ্চয়তা—ঝিনুকের দুর্বল স্নায়ু এ সবের চাপ আর নিতে পারছে না। তার চোখ বুজে আসছে। বিনু ধীরে ধীরে তাকে শুইয়ে দিতে দিতে বলল, 'সারা রাত ভাল করে ঘুমোতে পার নি। এখন কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নাও। ঘুমোলে শরীরটা ঝরঝরে হয়ে যাবে।'

ঝিনুকের ঠোঁটদু'টো সামান্য নড়ল। অস্ফুট গলায় সে বলল, 'তোমার কী মনে হয়?'

প্রশ্নটা ঠিকমতো বুঝতে না পেরে বিনু জিজ্ঞেস করে, 'কোন ব্যাপারে?'

ঝিনুক বলে, 'আমরা কি কোনওদিন বর্ডার পেরিয়ে ওপারে যেতে পারব?'

কাল থেকে যে সব ঘটনা ঘটে চলেছে, তাতে পাকিস্তান সীমান্তের ওপারে সুদূর কলকাতায় পৌঁছনো আদৌ সম্ভব হবে কিনা, সে সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে পড়েছে মেয়েটা। বিনুও যে পুরোপুরি নিশ্চিত তা কিন্তু নয়। আফজল হোসেন ভাল মানুষ, তার মহানুভবতার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া গেছে। অনেকখানি ঝুঁকি নিয়ে সে তাদের সাহায্য করতেও চেষ্টা করছে। একবার মনে হয়, সে নিরাপদে তাদের তারপাশায় নিয়ে যেতে পারবে। পরক্ষণে সংশয়ে মন ভরে যায় বিনুর। সমস্ত আবহাওয়া যেখানে ঘৃণায় বিদ্বেষে অবিশ্বাসে বিষাক্ত হয়ে আছে, শেষ পর্যন্ত সেখানে আফজল হোসেন কতটা কী করে উঠতে পারবে, কে জানে। ঝিনুককে ভরসা দেবার জন্য জোর দিয়ে বলল, 'নিশ্চয়ই কলকাতায় যেতে পারব। মিঞাসাহেবের ওপর আমার বিশ্বাস আছে। কিছু একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে।'

কাত হয়ে শুয়ে আছে ঝিনুক, চোখ এখন সম্পূর্ণ বোজা। খুব আস্তে আস্তে শ্বাস টানছে সে। একটু চুপচাপ।

তারপর ঝিনুক ফিস ফিস করে বলে, 'আমি তোমাকে ভীষণ বিপদে ফেলে দিয়েছি।'

বিনু চকিত হয়ে ওঠে, 'কী বলছ তুমি!'

'ঠিকই তো বলছি। আমার জন্যেই তোমার এত কষ্ট, এত ভোগান্তি। পুরুষমানুষ—একা থাকলে একটা না একটা উপায় করে চলে যেতে পারতে। আমি তোমার ওপর বোঝার মতো চেপে আছি। আমার জন্যে কখন যে তোমার কী ক্ষতি হয়ে যাবে!'

'এই সব বাজে চিন্তা ছাড়। এখন ঘুমোও।'

বিনু গভীর মমতায় ঝিনুকের রুক্ষ চুলে হাত বুলিয়ে দিতে থাকে। আর কোনও কথা বলে না ঝিনুক। গাঢ় ঘুমে ক্রমশ আচ্ছন্ন হয়ে যায়।

কতক্ষণ কেটে গেছে, বিনুর খেয়াল নেই। ঝিনুকের চুলে দূরমনস্কর মতো আঙুল বুলিয়ে যাচ্ছিল সে।

খোলা জানালাটার বাইরে রোদের তেজ বেশ বেড়েছে। সূর্যটাকে দেখা যাচ্ছে না, তবে বোঝা যায়, সেটা আকাশের অনেকটা উঁচুতে উঠে এসেছে। এতক্ষণ নলখাগড়ার বনে ডাহুক আর ঝিঁঝি ডাকছিল। এখন তাদের সঙ্গে ঘুঘুরা গলা মিলিয়েছে। এই সমবেত কণ্ঠস্বর চারপাশের স্তব্ধতাকে আরও নিবিড়, আরও ঘনীভূত করে তুলেছে যেন।

হঠাৎ পাখি এবং পতঙ্গের ডাকাডাকি ছাপিয়ে উঠোনের দিক থেকে মানুষের গলা ভেসে এল। আফজল হোসেনই কি ফিরে এসেছে? কিন্তু তার তো দুপুরের আগে ফেরার কথা নয়। সূর্যটাকে দেখা না গেলেও, বাইরের রোদের রং দেখে বোঝা যায়, এখনও সেটা খাড়া মাথার ওপর উঠে আসেনি।

বুকের ভেতরটা ধক করে ওঠে বিনুর। চকিতে ঝিনুকের শিয়রের কাছ থেকে উঠে গিয়ে খোলা জানালাটা বন্ধ করে দেয় সে। যারা উঠোনে কথা বলছে তাদের ভেতর যদি আফজল হোসেন না থাকে, আর কোনও কারণে ওরা বাড়ির পেছন দিকে চলে আসে তার পরিণতি কী হতে পারে, সেটা ভাবতেই শিরদাঁড়ার ভেতর দিয়ে হিমস্রোত বয়ে গেল বিনুর।

জানালার কাছ থেকে বিনু সামনের দরজার পাশে এসে কাঠের পাল্লায় কান রেখে, স্নায়ুমণ্ডলী টান টান করে দাঁড়িয়ে রইল। গলার স্বর এবার স্পষ্ট। বোঝা যাচ্ছে, দু'জন লোক উঠোনে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের কথাগুলো পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছে সে।

একজন বলল, 'ধনা বারইর ছাড়া-বাড়িটার উপুর আমার চৌখ আছিল। কী বাহারের ঘরগুলান! নয়া টিনের চাল, উচা ভিত।'

দ্বিতীয় জন বলল, 'ঘরদুয়ার লইয়া আমি ভাবি না। কানির পর কানি জমিন ধনা বারইর। বীজধান ফালাও, ফনফনাইয়া চারা বাইর হয়, সার দেওন লাগে না। এক এক কানিতে পচিশ তিরিশ মোণ ধান ফলবই। হেয়া ছাড়া, ধর গা (ধর গিয়ে), রবি ফসলের খন্দে তিল কলই সউরষা (সর্ষে) তো আছেই। দুই চাইর কানি যদিন পাইতাম—'

প্রথম জন বলল, 'হুদা (শুধু) তর আর আমারই না রে হাসমা, ধনা বারই আর গোসাইগো জমিজেরাত ভিটামাটির উপুর গেরামের মেলা মাইনষের নজর। গোসাইগো বাড়িঘর পুইড়া ছাই। তাগো দ্যাড় শ' কানি জমিনে খুটি কুইপা (পুঁতে) চিলবিলা কইরা বছির হালিম তালাতরা ভাগ কইরা নিছে। আমরা দূরে খাড়ইয়া বুইড়া আঙ্গুল চোষলাম। বছিররা যা ডাকাইত, কাছেই ঘেষতে দিল না।'

হাসমা, অর্থাৎ হাসেম নামের লোকটা বলল, 'ঠিকই কইছ মতিনচাচা, আমাগো নসিবে ঠনঠনাঠন। একহান কথা খালি ভাবতে আছি, গোসাইগো দুই পোলা কইলকাতায় থাকে। হেরা (তারা) যদিন গেরামে আইসা জমিন বুইঝা লইতে দারোগা পুলিশের কাছে যায়, তহন কী হইব?'

দেখতে না পেলেও আন্দাজ করা যাচ্ছে, মতিন যার নাম সে বয়স্ক লোক, আর হাসেম অল্পবয়সী।

মতিন বলল, 'পরে কী হইব, ক্যাঠা জানে। যুগীগো, বামনগো, কুমারগো কেওর কেওর (কারোর কারোর) জমিন বেদখল হইয়া গ্যাছে। আবার মেলা (অনেক) ছাড়া-বাড়ি আর জমিন অ্যামনেই পইড়া আছে। হেই দিকে অহন তরি (এখনও পর্যন্ত) কেও হাত বাড়ায় নাই।'

হাসেম বলল, 'আইজ বাড়ায় নাই। দুই চাইর মাস দেইখা হাত যে বাড়াইব না, ক্যাঠা কইব (কে বলবে)?'

মতিন এবং হাসেমের কথা শুনে মনে হচ্ছে, মামুদপুর গ্রামের যে বাসিন্দারা সীমান্তের ওপারে চলে গেছে তাদের অনেকেরই ছেড়ে-যাওয়া জমিজমা অন্যেরা দখল করে নিয়েছে। মামুদপুরেরই শুধু নয়, নানা জায়গায় এমন বেদখল হবার খবর আগেই শুনেছে বিনু।

মতিন বলল, 'ধনা বারইর বাড়িহান মাঝেমইদ্যে আইসা দেইখা যাই। কিন্তুক এইহানে হাত ছোয়ানের উপায় নাই।'

হাসেম বলে, 'হ, জানি। ধনা বারই জবর চতুর। দ্যাশ ছাড়নের আগে বিষয় আশয় বড় মিঞার হাতে দিয়া গ্যাছে। বড় মিঞা হইল এহানকার পিছিডাং (এখানকার প্রেসিডেন্ট)। তেনার হিপাজতে যে সোম্পত্তি আছে, কেওর খেটিতে (কারোর ঘাড়ে) এমুন মাথা নাই যে হের (তার) থিকা এক বিঘত জমিনও দখল করে। এইহানে আসি আর উয়াস (দীর্ঘশ্বাস) ফেলাইয়া চইলা যাই।'

বড় মিঞা অর্থাৎ আফজল হোসেন। তার দাপট এতটাই যে ধনঞ্জয় বারুইর বাড়িঘর জমিজমায় হাত ঠেকাতে কারোর সাহস হয়নি। ধনঞ্জয়ের বরাত ভাল।

মতিন বলল, 'এইহানে খাড়ইয়া থাইকা আর কী হইব?'

'লও যাই, রাজেন শীলের বাড়িত্ গিয়া দেখি। এই বচ্ছর জষ্টি মাসে অরাও নয়া টিন দিয়া ঘর ছাইছিল। আমারে দিয়াই ছাওয়াইছিল। যদিন চালের দুইহান টিন খুইলা লইয়া যাইতে পারি, গুঞ্জে (গঞ্জে) গিয়া বেচলে কয়টা ট্যাকা পামু। হাতে কামকাইজ (কাজকর্ম) নাই, পহার বড় আকাল।'

'হ। গেরামে ভাঙ্গন লাগনের পর কামকাইজ জবর কইমা গ্যাছে। আগে সারা বচ্ছর বামনগো কায়েতগো জমিনে হাল দিতাম, ধান পাট রুইতাম, ফসল পাকলে কাইটা আনতাম। বাড়ির কামও কম আচ্ছিল না। নয়া ঘর বানাও, পাটের রশি পাকাও, সুপারি নাইকল (নারকেল) পাড়, বাগ বাগিচায় ফলের গাছ রোও (বোনো)। কত যে কাম! অহন মাসে পাচ দিনও কেও ডাকে না।'

'হ। ক্যামনে যে সোংসার চলব, উপরআলাই জানে। অতগুলান প্যাট (এতগুলো পেট)!'

হাসেমদের কথা শুনে বিনুর মনে হচ্ছে, ওরা কামলা শ্রেণীর মানুষ, হদ্দ গরিব। গ্রামের বড় ধানী গৃহস্থদের, বিশেষ করে বামন কায়েতদের বাড়ি এবং জমিতে কাজ করে পেটের ভাত জোটাত। পয়সাওলা হিন্দুরা চলে যাওয়ায় তারা বিপাকে পড়ে গেছে।

কপাটে কান রেখে রুদ্ধশ্বাসে দাঁড়িয়ে ছিল বিনু। না, ওই লোকদু'টোর দিক থেকে দুশ্চিন্তার কোনও কারণ নেই। আফজল হোসেনের ভয়ে তারা অন্তত এই বাড়িতে আঙুল ছোঁয়াতে সাহস করবে না। শেকল খুলে এই ঘরে তাদের ঢোকারও সম্ভাবনা নেই। ধনঞ্জয় বারুইর পরিত্যক্ত বাস্তুভিটাতে দাঁড়িয়ে তারা শুধু আক্ষেপই করতে পারে। তার বেশি কিছু নয়।

কথা বলতে বলতে মতিন এবং হাসেম একসময় চলে যায়। তাদের গলার স্বর ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে আসতে থাকে। এই মুহূর্তে, অদ্ভুত এক পরিস্থিতিতে জীবনমৃত্যুর মাঝখানের সূক্ষ্ম সীমারেখায় যখন তারা দাঁড়িয়ে আছে, ওই দু'টো গরিবের চাইতেও গরিব মানুষের প্রতি সহানুভূতিই বোধ করে বিনু। ঘরের সব জানালা-কপাট বন্ধ। হাসেম আর মতিনকে দেখার উপায় ছিল না, তবু হতদরিদ্র লোকদু'টো তার মনে ছাপ রেখে যায়।

দরজার পাশ থেকে ঝিনুকের কাছে চলে আসে বিনু। মেয়েটা গভীর ঘুমে ডুবে আছে। শ্বাসপ্রশ্বাসের তালে তালে তার বুক খুব ধীরে ধীরে ওঠানামা করছে। কয়েক পলক ঝিনুকের দিকে তাকিয়ে থাকার পর ফের পেছনের সেই জানালাটার কাছে চলে আসে সে। যতক্ষণ পারে ঝিনুক ঘুমোক। ঘুম কিছুটা সময়ের জন্য হলেও মস্তিষ্ক থেকে দুর্ভাবনা ভয় আতঙ্ক মুছে দেয়।

সাবধানে জানালার পাল্লা খুলে নলখাগড়ার ঝোপ, খাল, খালের ওধারে আদিগন্ত ধানের খেতগুলের দিকে তাকাল বিনু। এই জানালাটাই এই মুহূর্তে বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে তার যোগাযোগের একমাত্র পথ।

কতকাল ধরে হেমন্ত ঋতুর জল-বাংলাকে দেখে আসছে বিনু। সোনালি-সবুজে ভরা ধানের খেত, ঠাণ্ডা নরম রোদ, আকাশের এ কোণে ও কোণে ছন্নছাড়া নিরীহ কিছু মেঘ, হালকা কুয়াশা, আকাশের নীল ছুঁয়ে ছুঁয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে ভাসমান শঙ্খচিল, বসুন্ধরার এই প্রান্তে প্রকৃতির সমস্ত কিছু আগের মতোই রয়েছে। কোথাও এতটুকু হেরফের নেই। কিন্তু মানুষ? আগাগোড়া প্রায় সবাই বদলে গেছে। কী প্রচণ্ড রিষ, কী তীব্র শত্রুতা তাদের মনে! চোখেমুখে কী ভয়ঙ্কর আক্রোশ! আবহমান কালের নিসর্গ ঋতুতে ঋতুতে একই নিয়মে পাক খেয়ে যায়। গ্রীষ্মের পর বর্ষা আসে, বর্ষার পর শরৎ হেমন্ত শীত বসন্ত। হাজার বছর আগে হেমন্ত যা ছিল, আজও তা-ই আছে। কিন্তু মাত্র কয়েক বছর আগের মানুষ আর তেমনটি নেই। মানুষের মতো অন্য কিছুই বুঝি বদলে যায় না।

যতক্ষণ না আফজল হোসেন তাদের তারপাশায় পৌঁছনোর ব্যবস্থা করে দিচ্ছে, এই ঘরে আটকে থাকতে হবে। অনবরত আতঙ্কের মধ্যে থাকলে তার উগ্রতা বোধহয় কমে আসে। অনুভূতিগুলো কেমন যেন ভোঁতা হয়ে যায়। ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তায় ভরা, কিন্তু তা নিয়ে এখন সেভাবে ভাবেছ না বিনু। দু'চোখে অপার শূন্যতা নিয়ে অনেক দূরে হেমন্তের শস্যক্ষেত্রগুলোর ওধারে ঝাপসা দিগন্তরেখার দিকে তাকিয়ে থাকে সে।

হঠাৎ একটানা তীক্ষ্ণ ধাতব আওয়াজ কানে আসে। বিনু চমকে ওঠে। চোখ দু'টো জানালার খুব কাছে নিয়ে বাইরের দিকটা ভাল করে দেখতে চেষ্টা করে। কিন্তু এধারে জঙ্গল টঙ্গল ছাড়া অন্য কিছু নেই। লোকজন বা বাড়িঘর চোখে পড়ছে না। মামুদপুর গ্রামের বাড়ি টাড়ি সবই সামনের দিকে।

কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকার পর উঠোনের দিকের একটা জানালার কাছে চলে এল বিনু। কান খাড়া করে বুঝবার চেষ্টা করল, শব্দটা ঠিক কোত্থেকে আসছে। মনে হল, খুব কাছে নয়, বেশ খানিকটা দূরে কেউ লোহা বা ওই জাতীয় কোনও ধাতুর ওপর শক্ত ভারী কিছু দিয়ে ক্রমাগত ঘা মারছে।

আফজল হোসেন সাবধান করে দিয়েছিল, তবু ভীষণ কৌতূহল হচ্ছে বিনুর। খুব সন্তর্পণে জানালাটা খুলে এক আঙুলের মতো ফাঁক করল সে। না, উঠোনে কেউ নেই। সাহস করে জানালাটা আরও একটু খুলল। উঠোনের ওধারে রাজেক এবং তমিজ যে ঘরটায় আছে, সেটার দরজা জানালা বন্ধ। অর্থাৎ আফজল হোসেনের নিষেধাজ্ঞা তারা অক্ষরে অক্ষরে পালন করে চলেছে।

জানালা খোলার সঙ্গে সঙ্গে ধাতব শব্দটা আরও স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। এবার হদিস পাওয়া গেল। এই ঘর থেকে কোনাকুনি প্রায় শ'পাঁচেক হাত দূরে দু'টো লোক একটা ঘরের চালে বসে আছে। একজন হাতুড়ি জাতীয় কিছু দিয়ে সমানে বাড়ি মারছে। আরেকজন অন্য কোনও যন্ত্র ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কী যেন খুলবার চেষ্টা করছে। খুব সম্ভব দুই টিনের জোড়ের মুখের স্ক্রু বা পেরেক।

চট করে সেই লোক দু'টোকে মনে পড়ে গেল। খানিকক্ষণ আগে এ বাড়ির উঠোনে দাঁড়িয়ে তারা কথা বলছিল। অবশ্য তখন বন্ধ দরজার এধার থেকে তাদের দেখা সম্ভব ছিল না। নিশ্চয়ই ওরা হাসেম এবং মতিন, আর দূরের ওই ঘরটা কোনও এক রাজেন শীলের। বিনু আগেই শুনেছিল, হাসেমরা রাজেন শীলের ঘরের টিন খুলে নিয়ে যাবে। এখন সেই কাজটাই চলছে।

একদৃষ্টে তাকিয়েই আছে বিনু। হাসেম এবং মতিনকে দেখতে দেখতে হঠাৎ রাজেন শীলের জন্য অদ্ভুত বিষাদে তার মন ভরে যায়। লোকটাকে সে দেখে নি, কোনওদিন দেখা হওয়ার সম্ভাবনাও নেই। পিতৃপুরুষের বাসস্থানে নতুন টিন দিয়ে ঘর ছেয়েছিল রাজেন। এই বাড়ির সঙ্গে কত মায়ায় জড়িয়ে ছিল সে। হয়তো ভেবেছিল, বাপ-ঠাকুরদার মতো সন্তানসন্ততি নিয়ে আজীবন এখানেই কাটিয়ে যাবে। ভেবেছিল, মামুদপুর গ্রামের ভিটেমাটির সঙ্গে তাদের বন্ধন অচ্ছেদ্য। গভীর মমতা দিয়ে পুরুষানুক্রমে যা তারা গড়ে তুলেছিল, কে ভাবতে পেরেছে, একদিন সেখান থেকে অস্তিত্বের সবগুলো শেকড় উপড়ে নিয়ে সীমান্ত পেরিয়ে ওপারে চলে যেতে হবে?

আধ ঘন্টাও লাগল না, বিনুর চোখের সামনে হাসেম এবং মতিন দু'খানা নতুন টিন খুলে মাথায় চাপিয়ে আরও দূরে ঘন গাছগাছালির আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল।

বিনু আন্দাজ করে নিল, দু'চারদিনের মধ্যে শুধু ওই ঘরটারই না, রাজেন শীলের বাড়ির অন্য ঘরগুলোর চালের টিন, দরজা জানালা খুলে নিয়ে যাবে মতিন, হাসেম বা গ্রামের আর কেউ। অন্য যারা সাত পুরুষের ভদ্রাসন ছেড়ে চলে গেছে, তাদের পরিত্যক্ত ঘরবাড়ির হালও ওইরকমই হবে। বিনুর মনে হল, যুগীরা কুমোররা বামুন কায়েতরা যে প্রজন্মের পর প্রজন্ম এখানে বাস করে গেছে, হয়তো একদিন তার সামান্য চিহ্নটুকুও অবশিষ্ট থাকবে না। হঠাৎ হেমনাথের কথা মনে পড়ল। তিনি প্রতিজ্ঞা করেছেন, জন্মভূমি ছেড়ে কোথাও যাবেন না। অসীম মনোবল তাঁর, দেশের প্রতি অফুরান আবেগ। কিন্তু তিনিও কি শেষ পর্যন্ত রাজদিয়ার মাটি আঁকড়ে পড়ে থাকতে পারবেন? কে জানে।

মতিনরা রাজেন শীলের ঘরের টিন খুলে নিয়ে যাবার পর একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে বিনু। এখন চারদিক একেবারে সুনসান। শুধু পাখির ডাক, ঝিঁঝির ডাক এবং গাছের গুঁড়িতে কাঠঠোকরাদের ঠোঁটের অবিরত ঠক ঠক ছাড়া যতদূর চোখ যায়, সব নিস্তব্ধ।

খুবই অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল বিনু। সূর্য যখন আকাশের ঠিক মাঝামাঝি থেকে পশ্চিম দিকে খানিকটা হেলে গেছে, সেই সময় ফের কাদের গলা শোনা গেল। বিনু ত্রস্তভাবে জানালার পাল্লা বন্ধ করতে যাচ্ছিল, দেখতে পেল, আফজল হোসেন এবং রাজেক সামনের কাঁচা রাস্তা দিয়ে এদিকে আসছে। আফজলের হাতে কলাপাতা ঢাকা দেওয়া একটা বড় ডেকচি। রাজেকের ডান হাতে ওই মাপেরই আরেকটা ডেকচি, সেটার ওপরও কলাপাতা। তার বাঁ হাতে জল ভর্তি টিনের বালতি। জানালা খোলা

দেখলে আফজল হোসেন হয়তো অসন্তুষ্ট হবে, তাই সেটা আস্তে টেনে বন্ধ করে দিল বিনু।

একটু পর সিঁড়ির ধাপে পায়ের আওয়াজ পাওয়া গেল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই রাজেক ডাকল, 'কপাট খোলেন ছুটোবাবু—'

বিনু দরজা খুলে দিতেই রাজেক আর আফজাল হোসেন ঘরে ঢুকে পড়ল। আফজল রাজেককে বলল, 'পানির বালতিহান এহানে নামাইয়া কান্ধের ডেচকি (ডেকচি) লইয়া উই ঘরে গিয়া দুইজনে খাইয়া লও—' বলে উঠোনের ওধারের ঘরটা দেখিয়ে দিল। বিনু জানত না, ধনা বারুইর ছাড়া-বাড়ির এই ঘরখানায় তাদের পৌঁছে দেবার পর রাজেককে সঙ্গে করে মামুদপুর গ্রামের ভেতর দিকে নিজের বাড়িতে চলে গিয়েছিল আফজল হোসেন। ভাত তরকারি জলটল বয়ে আনার জন্য। বাড়ির লোকজন বা গ্রামের কাউকে দিয়ে আনালে তাদের খবরটা মুহূর্তে চারদিকে চাউর হয়ে যেত। রাজেককেই শুধু নিয়ে গিয়েছিল আফজল। তমিজ নিশ্চয়ই উলটো দিকের ঘরে জানালা কপাট বন্ধ করে বসে আছে।

রাজেক দরজার দিকে পা বাড়াতে যাবে, আফজল হোসেন বলল, 'তরাতরি খাইয়া ডেচকি নিয়া আইসো। এনাগো খাওন হইলে খালি বালতি ডেচকি নিয়া আমার লগে আমাগো বাড়িত্ যাইবা।' বলতে বলতে নিজের হাতের ডেকচিটা মেঝেতে নামিয়ে রাখল।

'আইচ্ছা—' মাথা হেলিয়ে ঘরের বাইরে বেরিয়ে গেল রাজেক।

পেছনের খোলা জানালার দিকে এবার নজর পড়ল আফজল হোসেনের। সে জিজ্ঞেস করল, 'উইটা তো বন্ধ আছিল। ঘরে ঢুইকা বুঝিন খুইলা দিছিলেন?'

বিনু বেশ ঘাবড়ে যায়। জানালাটা খোলার কারণে আফজল হোসেন কতটা অসন্তুষ্ট হয়েছে, বুঝবার জন্য তার মুখের দিকে তাকায়। ভয়ে ভয়ে বলে, 'ঘরটা খুব অন্ধকার। তাই—'

'ঠিক আছে। উই দিকে মানুষজন বড় এট্টা আসে না।' বলতে বলতে তক্তপোশের দিকে তাকাল আফজল, 'বিবিসাবে ঘুমাইতে আছে। অহন জাগাইলে—' কথা শেষ না করে কুণ্ঠিতভাবে থেমে গেল।

পেছনের জানালা খোলার জন্য মারাত্মক অপরাধ যে হয়ে যায়নি, ব্যাপারটা হালকাভাবেই নিয়েছে আফজল হোসেন, এতে স্বস্তিবোধ করে বিনু। সে জানায়, শারীরিক এবং মানসিক দিক থেকে ঝিনুক এমনই বিপর্যস্ত যে বসে থাকতে পারছিল না। শুইয়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়েছে।

সহানুভূতির সুরে আফজল হোসেন বলে,'হ, শরীলের আর দোষ কী। অ্যামনেই বিবিসাব রোগা মাইয়া, গায়ে জোর-বল নাই। হের (তার) উপুর যা তাফাল যাইতে আছে। কিন্তুক—'

উৎসুক চোখে তাকাল বিনু, কোনও প্রশ্ন করল না।

আফজল হোসেন বলতে লাগল, 'মেলা বেইল (অনেক বেলা) হইয়া গ্যাছে। উনার ঘুম ভাঙ্গাইয়া খাইতে ক'ন। প্যাটে ভাত পড়লে শরীলে তাকত আইব।'

বিনু তক্তপোশের কাছে গিয়ে ডাকাডাকি করতে লাগল, 'ঝিনুক—ঝিনুক—'

ঘুমের ঘোরে বারকয়েক হুঁ হাঁ করার পর উঠে বসল ঝিনুক। চোখ আধখোলা, লালচে। মাথা অল্প অল্প দুলছে। কপালের দু'পাশের শিরা দপদপ করছে। জড়ানো গলায় সে বলল, 'ডাকছ কেন?'

বিনু উত্তর দেবার আগেই আফজল হোসেন বলল, 'আগে চৌখে পানি দ্যান। ঘুমের চটকা ছুইটা যাইব। হের পর দু'গা (দু'টি) খাইয়া লন।'

অন্য লোকের গলা শুনে পুরোপুরি চোখ মেলে তাকায় ঝিনুক। আফজল হোসেনের দিকে তাকিয়ে বলে, 'আমার খেতে ইচ্ছা করছে না।'

আফজল হোসেন ঝিনুককে বোঝায়, খেতে ইচ্ছা না করলেও খেতে হবে। এখান থেকে তারপাশা, তারপাশা থেকে গোয়ালন্দ, গোয়ালন্দ থেকে কলকাতা। পথ তো একটুখানি নয়। তা ছাড়া, দিনকাল আগের মতো সহজ, স্বাভাবিক নেই। এখন পদে পদে সংকট, সমস্ত কিছুই ঘোর অনিশ্চয়তায় ভরা। শরীরে শক্তি থাকলে তবু খানিকটা যোঝা যায়।

ঝিনুক আর আপত্তি করল না, তক্তপোশ থেকে নেমে পড়ল। জলের বালতির গায়ে একটা সিলভারের মগ আটকানো ছিল। সেটা খুলে নিয়ে বালতি থেকে জল তুলে বাধ্য মেয়ের মতো পেছনের জানালার কাছে গিয়ে কয়েক আঁজলা চোখেমুখে ছিটালো। তারপর কুলকুচি করে মুখের জল জানালার বাইরে ফোয়ারার মতো ছুঁড়ে দিল।

জলের স্পর্শে মুখটা এখন বেশ নরম লাগছে। কপালের শিরাগুলোর দপদপানি আর নেই। ঘুমটাও কেটে গেছে।

বিনুও মুখ ধুয়ে এল। ঘরের কোণে ক'টা কাঠের পিঁড়ি এবং জলচৌকি ডাঁই হয়ে পড়ে আছে। অফজল হোসেন একটা জলচৌকি টেনে বসতে বসতে বলল, 'তরাতরিতে বেশি কিছু আনতে পারি নাই। ন্যান (নিন), খান। ডেচকিতে থাল (থালা), গ্যালাস, চাইমচা (চামচ), হুগল আছে।'

অল্প সময়ের মধ্যে মোটামুটি ভালই ব্যবস্থা করেছে আফজল হোসেন। সরু চালের ধবধবে ভাত, বেগুন ভর্তা, নানারকম আনাজ দিয়ে পাঁচমেশালি তরকারি, টাটকিনি মাছের পাতুরি আর রসগোল্লা।

ডেকচির কোনা থেকে চিনা মাটির নকশা-করা থালা গেলাস ইত্যাদি বার করে ভাত তরকারি মাছ টাছ সাজিয়ে ঝিনুককে দিল বিনু। নিজেও নিল।

খেতে খেতে বিনুর মস্তিষ্কে অদ্ভুত একটা চিন্তা পাক খায়। যাদের প্রতি অপার বিদ্বেষ এবং ঘৃণা নিয়ে সে এ দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছে, তাদেরই একজন, যাকে সে আগে কোনও দিন দেখেনি পর্যন্ত, এমন এক পরিত্যক্ত নিঝুম বাড়িতে, কাছে বসে ঘনিষ্ঠ পরিজনের মতো তাকে আর ঝিনুককে খাওয়াচ্ছে—এটা যেন সত্যি নয়। খাপছাড়া স্বপ্নের মতো মনে হয়।

আফজল হোসেন হঠাৎ বলল, 'জানেন, আরেট্টু হইলে ধরা পইড়া যাইতাম। উপুরআলার দোয়ায় জবর বাইচা গ্যাছি।'

থালা থেকে ভাতের গ্রাস তুলতে গিয়ে থমকে যায় বিনু। ভীরু গলায় জিজ্ঞেস করে, 'কী হয়েছিল?'

আফজল হোসেন জানায়, লোকজনের চোখে যাতে না পড়ে সে জন্য গ্রামের বাইরে ধানখেতের ভেতর দিয়ে ঘুরে ঘুরে রাজেককে নিয়ে এখানে আসছিল সে। ঘুরপথে আসার কারণ, কেউ দেখে ফেললে, ডেকচি আর জলের বালতি নিয়ে কোথায় চলেছে, গ্রামের ভেতর সিধা রাস্তা থাকতে ধানখেতে কেন, এমনি হাজার গণ্ডা জবাবদিহি করতে হবে। খানিকটা আসার পর চোখে পড়ল, উলটো দিক থেকে আলপথ ধরে রহিম মাস্টার আসছে। নির্বিঘ্নে কিছু কি হবার যো আছে! সামান্য জেলে জোলা চাষী টাষী হলে ধমকধামক দিয়ে চুপ করিয়ে রাখা যায়। কিন্তু রহিম মাস্টার মান্যগণ্য লোক, স্থানীয় আপার প্রাইমারি স্কুলে পড়ায়। সে কোনও প্রশ্ন করলে জবাব দিতেই হয়। অগত্যা রাজেককে নিয়ে আল থেকে ধানখেতের অনেকখানি ভেতরে গিয়ে চুপচাপ লুকিয়ে ছিল আফজল হোসেন। রহিম মাস্টার ধানখেত পেরিয়ে গ্রামে ঢুকে যাবার পর তারা ফের আলপথে ফিরে আসে, তারপর সোজা এখানে। না, রহিম ছাড়া আর কারোর সঙ্গে তাদের দেখা হয়নি।

দমবন্ধ করে শুনে যাচ্ছিল বিনু। এবার তার বুকের ভেতর থেকে আবদ্ধ বাতাস ধীরে ধীরে বেরিয়ে এল। পরক্ষণে অন্য একটা দুশ্চিন্তা তার মাথায় ভর করে।

বিনু বলল, 'এত ভাত তরকারি মাছ কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন, আপনার বাড়ির লোকেরা জানতে চাননি?'

আফজল হোসেন বলল, 'চাইছিল। তাগো কইছি পরে জানামু। হের পর কেউ আর কিছু জিগায় নাই।'

বিনু আন্দাজ করে নিল, নিজের বাড়িতে লোকটার প্রচণ্ড দাপট। পরে জানাবে বলার পর কেউ দ্বিতীয় বার কৌতূহল প্রকাশ করতে সাহস পায়নি।

কিছুক্ষণ চুপচাপ। তারপর বিনু সঙ্কোচের সুরে বলে, 'আফজল সাহেব, সেই সকাল থেকে আমাদের জন্যে কী কষ্টই না করছেন! এত ছোটাছুটি! তা ছাড়া, লোকে আমাদের খবরটা পেয়ে গেলে আপনার বিপদও কম হবে না। কিন্তু যে অবস্থায় আমরা—'

হাত তুলে বিনুকে থামিয়ে দিয়ে আফজল হোসেন বলে, 'কষ্টের কথা কইতে আছেন! মাইনষের লেইগা মাইনষের এইটুক তো করতেই হয়। আর বিপদের কথা ক'ন? এই লইয়া ভাবি না। উপুরআলা আছে, তেনিই (তিনিই) ভরসা। অহন ভালায় ভালায় আপনেগো তারপাশায় পৌছাইয়া দিতে পারলে নিচ্চিন্ত হইতে পারি।'

এই মুহূর্তে তাদের জন্য আফজল হোসেন কী মারাত্মক ঝুঁকি নিয়েছে, সেটাই ভাবছিল বিনু। তারপাশায় পৌঁছনোর চিন্তাটা ফের তার মাথায় ফিরে এসে অসহ্য চাপ দিতে থাকে। উদ্বিগ্ন মুখে

pathagar.net

সে জিজ্ঞেস করে, 'স্টিমারঘাটে যাবার কিছু ব্যবস্থা হল?'

'না।' মাথা নাড়তে নাড়তে আফজল হোসেন বলে, 'এট্টু সোময় লাগব—'

সময়? আজ কি তা হলে এই মামুদপুর গ্রাম থেকে তাদের যাওয়া হচ্ছে না? ধনা বারুইর ছেড়ে-যাওয়া বাড়িতেই আটকে থাকতে হবে? বিনুর উৎকণ্ঠা লাফিয়ে লাফিয়ে অনেকখানি চড়ে যায়। শুকনো গলায় জিজ্ঞেস করে, 'কতটা সময় লাগবে?'

আফজল হোসেন বলে, 'ক্যামনে কই? গাঙ পাড়ি দিয়া তারপাশায় যাওনের নাও তো মেলাই (নৌকো তো অনেকই) আছে। কিন্তুক বিশ্বাসী মাঝি পাওন দরকার। কার মনে কী রিষ রইছে, বাইরে থিকা তো ট্যার পাওন যায় না। বুইঝা শুইনা বন্দবস্ত করতে হইব। দেখা যাউক।'

অর্থাৎ, যতক্ষণ না এমন মাঝি পাওয়া যাচ্ছে যে সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য, যে কোনও রকম ক্ষতি করবে না, বিনুদের পরিচয় জানতে পারলেও টুঁ শব্দটি করবে না, আফজল হোসেন খুব সম্ভব চুপচাপ থাকবে। বিনুদের ব্যাপারে সামান্য ঝুঁকিও সে নিতে চাইছে না।

বিনু অস্পষ্ট গলায় বলে, 'হ্যাঁ।'

বিপন্ন যুবকটির শঙ্কাতুর মুখের দিকে তাকিয়ে হয়তো মায়াই হয় আফজল হোসেনের। আশ্বাস দেবার সুরে বলে,'ডরাইয়েন না, য্যামন কইরা পারি আপনেগো তারপাশায় লইয়া যামুই।'

চরম বিপদে এই মানুষটাই একমাত্রা অবলম্বন। দৈবপ্রেরিতের মতো সে সকালবেলায় তাদের কাছে এসেছিল। তারপর নদীর পাড়ের জঙ্গল থেকে মামুদপুর গ্রামের এই ঘরে এনে আশ্রয় দিয়েছে। যখনই বিনুর মনোবল ধূলিসাৎ হতে থাকে, সাহস জুগিয়ে সে তার স্নায়ুগুলোকে চাঙ্গা করে রাখে। আশা নষ্ট হলে সবই গেল। সকাল থেকে এই কয়েক ঘন্টায় বিনু বুঝে গেছে, আফজল হোসেন এক কথার মানুষ। যখন বলেছে তারপাশায় পৌঁছে দেবে, নিশ্চয়ই দেবে।

ঝিনুক বরাবরই খুব স্বল্পাহারী। দু'চার গ্রাস খেয়ে জানালার কাছে গিয়ে আঁচিয়ে এল। বিনুরও খাওয়া শেষ। সেও মুখ ধুয়ে আসে। আফজল হোসেন ডাল ভাত মাছ তরকারি যা এনেছিল দু'জনে তার অর্ধেকও খেতে পারেনি। ওদিকে রাজেক খাওয়াদাওয়া চুকিয়ে তাদের খালি ডেকচি নিয়ে এ ঘরে এল। আফজল হোসেন তাকে বলল, 'এইহানের ডেচকি, পানির বালতি, বাসনকোসন লইয়া আমার লগে লও—'

সমস্ত কিছু গুছিয়ে নিতে লাগল রাজেক।

বিনুকে খুব সতর্ক হয়ে থাকতে বলে খানিক বাদে রাজেককে সঙ্গে করে চলে গেল আফজল হোসেন।

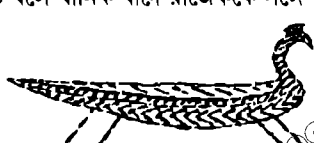

ঝিনুক আঁচিয়ে এসে ফের শুয়ে পড়েছিল। শোওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘুম। অপার ক্লান্তি, অসীম দুর্বলতা। চোখ মেলে বেশিক্ষণ থাকতে পারছে না সে। মেয়েটার জীবনীশক্তি প্রায় শূন্যে গিয়ে ঠেকেছে।

আফজল হোসেনরা চলে যাবার পর অনেকক্ষণ ঝিনুকের শিয়রের কাছে বসে রইল বিনু। মাথায় একবার হাত রাখল। সাড় নেই। রোগা, রক্তশূন্য, ফ্যাকাসে হাতটা তুলে নিল। ঝিনুক টেরই পেল না। তার সারা শরীর ঘিরে এমন এক আচ্ছন্নতা, যা মোটেই স্বস্তি দেয় না।

সামনের দিকের দরজা জানালা আগেই বন্ধ করে দিয়েছিল বিনু। আফজল হোসেন বাইরের শেকলও তুলে দিয়ে গেছে। একসময় বিনু ঝিনুকের তক্তপোশ থেকে উঠে এসে পেছনের খোলা জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

পশ্চিম দিকটা বোধহয় এধারে। দিন ফুরিয়ে এসেছে। খালের ওপারে ধানখেতগুলোর ওপর নিস্তেজ, মরা রোদ গুটিসুটি মেরে পড়ে আছে। সূর্যটাকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। ধানখেতের শেষ মাথায় যেখানে গাছপালার ধ্যাবড়া রেখা দিগন্তের গায়ে লেপটে আছে, সূর্য নিশ্চয়ই তার ওধারে নেমে গেছে।

বেলা হেলতেই কুয়াশা পড়তে শুরু করেছিল। প্রথমে ছিল মিহি। ক্রমশ গাঢ় হয়ে সমস্ত চরাচর ঢেকে দিচ্ছে। আগের মতোই ঝিঁঝি ডাকছে, কাঠঠোকরারা গাছের গুঁড়িতে সমানে তুরপুন চালিয়ে

যাচ্ছে। কোথায় যেন একটা তক্ষক অদ্ভুত শব্দ করে উঠল।

লম্বা পায়ে সন্ধে ধেয়ে আসছিল। দেখতে দেখতে হেমন্তের দিনটা শেষবেলার রোদটুকু গুটিয়ে নিয়ে উধাও হল। কুয়াশায় আর অন্ধকারে মেশামেশি হয়ে চারদিক ঝাপসা হয়ে যেতে লাগল। জোনাকিরা কোথায় যেন গা-ঢাকা দিয়ে ছিল, সন্ধে নামতেই বেরিয়ে পড়েছে। অন্ধকারে আলোর ফোঁড় তুলে তুলে নেচে বেড়াচ্ছে।

মশাদের হিংস্র একটা বাহিনী মানুষের রক্তের গন্ধ পেয়ে জানালা দিয়ে ঝড়ের গতিতে ঢুকে পড়ে। বিনুর ওপর তো বটেই, ঝিনুকের চোখেমুখেও তারা ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

ঘরে আলো নেই। বিনু সিগরেট খায় না যে পকেটে দেশলাই থাকবে। রাজেকের নৌকোয় বেতের ঝুড়িতে একটা পাঁচ ব্যাটারির টর্চ ছিল। হানাদারেরা নৌকোসুদ্ধ টর্চ ফর্চ সব নিয়ে চলে গেছে। রাত্তিরে যে বিনুদের এখানে থাকতে হতে পারে, আফজল হোসেন খেয়াল করেনি। করলে নিশ্চয়ই লণ্ঠন বা কুপি দিয়ে যেত।

ক্ষিপ্র হাতে জানালা বন্ধ করে ঝিনুকের কাছে চলে এল বিনু। মশারা মেয়েটার গালে কপালে সমানে ছুঁচ বিঁধিয়ে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে ঝিনুকের গলা থেকে ক্ষীণ, কাতর আওয়াজ বেরিয়ে আসছে, উঁ আঁ—। কাল রাত থেকে এখন পর্যন্ত মশারা মেয়েটার গা থেকে কতটা রক্ত শুষে নিয়েছে, কে জানে।

এই ঘরে ঢোকার পর বোরখা খুলে ফেলেছিল ঝিনুক। সেটা তুলে নিয়ে জোরে জোরে নাড়তে নাড়তে মশা তাড়াতে লাগল বিনু। কিন্তু মশাগুলো খুবই ধুরন্ধর, ফাঁক দিয়ে দিয়ে ঢুকে কামড় বসাতে লাগল।

কতক্ষণ মশা তাড়িয়েছিল, খেয়াল নেই। হঠাৎ বাইরে শেকল খোলার শব্দ শোনা গেল। তারপরই আফজল হোসেনের ত্রস্ত, চাপা গলা কানে আসে, 'তরাতরি কপাট খোলেন—'

রাজেকও একই সুরে ডাকাডাকি করছে, 'দেরি কইরেন না ছুটোবাবু, জবর বিপদ—'

দু'জনেরই কণ্ঠস্বরে যা আছে তা হল অস্বাভাবিক আতঙ্ক এবং কাঁপুনি। হঠাৎ রাজেকদের এত ভয়ের কারণ কী হতে পারে, বোঝা যাচ্ছে না। বিনু আন্দাজ করল, তাদের নিয়েই মারাত্মক কিছু ঘটেছে। পলকে ঠান্ডা, কনকনে ত্রাস তার মধ্যেও চারিয়ে গেল।

আফজল হোসেন শেকল খুলে দিলেও ভেতরে খিল আটকে রেখেছিল বিনু। তার হাত-পা ভীষণ থরথর করছে। সেই অবস্থাতেই খিল খুলল সে। সঙ্গে সঙ্গে আফজল হোসেন এবং রাজেক প্রায় ঝাঁপিয়ে ঢুকে পড়ে।

আফজলের হাতে বড় টর্চ ছিল, সেটা জ্বালতেই জোরালো আলোয় ঘর ভরে গেল। ব্যগ্র গলায় সে বলল, 'অহনই আপনেগো এইহান থিকা চইলা যাইতে হইব। এই কি, বিবিসাব ঘুমায় দেখি! ওনারে তোলেন। দেরি করনের সোময় নাই।'

খোলা দরজা দিয়ে বাইরের উঠোনে পাঁচজনকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যাচ্ছে। কুয়াশা মাখা অন্ধকারে পাঁচটি ঝাপসা ছায়ামূর্তি। শরীরের কাঠামো থেকে চেনা গেল, এদের একজন তমিজ। বাকি চারজন অচেনা। ওরা কারা, কে জানে। তবে আফজল হোসেন যখন সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে, ওদের দিক থেকে দুর্ভাবনার কিছু নেই।

বিনুর শ্বাস আটকে আসছিল। কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছে আফজল সাহেব?'

'পরে শুইনেন (শুনবেন)। দেরি করলে হগলটির জান চইলা যাইব। বিবিসাবরে আগে জাগান।'

আফজল হোসেনের বলার ভঙ্গিতে এমন এক কঠোরতা আর তাড়া ছিল যে এক টানে ঝিনুককে তুলে ফেলল বিনু। আচমকা ঘুম ভাঙানোয় হকচকিয়ে যায় ঝিনুক। ভয়ার্ত গলায় চেঁচিয়ে ওঠে, 'কী—কী?'

আফজল হোসেন বিনুকে বলল, 'বিবিসাবরে বুরখাখান পরাইয়া বাইরে লইয়া চলেন। আপনে লুঙ্গি পইরাই আসেন।'

ঝিনুককে তড়িঘড়িতে বোরখা পরাল বিনু। আফজল হোসেনের লুঙ্গিটা পরেই আছে সে। তার

ধুতিটা তক্তপোশের এক ধারে দলা পাকানো হয়ে পড়ে আছে। ধুতি তুলে নিয়ে ঝিনুকের একটা হাত ধরল বিনু। তারপর ঘর থেকে বাইরের উঠোনে। আফজল হোসেন এবং রাজেকও তাদের সঙ্গে বেরিয়ে এসেছে।

দূরে হইচই শোনা গেল। সচকিত বিনুর চোখে পড়ল, মশাল জ্বালিয়ে কারা যেন ডান দিক থেকে হল্লা করতে করতে এধারে ছুটে আসছে।

আফজল হোসেন হঠাৎ কেন ধনা বারুইর বাড়ি এসে তাদের ঘর থেকে বেরিয়ে আসার জন্য তাড়া দিয়েছে, এবার খানিকটা আন্দাজ করা যাচ্ছে।

রাজেক থর থর, নীচু গলায় জিজ্ঞেস করল, 'অহন উপায়? অরা এইদিকেই আসতে আছে—'

নিদারুণ সংকটের মধ্যেও আফজল হোসেনের মাথাটা খুব ঠাণ্ডা। দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে সে বলল, 'ডাইনে যাওন যাইব না। অগো সুমখে পইড়া যামু। বাও (বাঁ) দিকে লৌড়াও (দৌড়ও)—'

ডান দিকে গ্রামের রাস্তা। ধনা বারুইর বাড়ির হাতা ছাড়িয়ে বাঁ পাশে খানিকটা গেলে ঝোপঝাড়, জঙ্গল। সে সবের ভেতর দিয়ে ঊর্দ্ধশ্বাস দৌড় শুরু হল। আগে আগে টর্চ জ্বেলে পথ দেখিয়ে ছুটছে আফজল হোসেন। বাকিরা তার পেছনে। অপরিচিত সেই ছায়ামূর্তিগুলোও সঙ্গে রয়েছে। বিনু সেই যে ঝিনুকের হাত ধরেছিল, আর ছাড়েনি। প্রায় উড়িয়ে নিয়ে চলেছে।

আচমকা ঘুম থেকে তুলে এভাবে অন্ধকারে কুয়াশায় ঝোপ জঙ্গলের ভেতর দিয়ে দৌড় করানো হবে, ভাবতে পারেনি ঝিনুক। সে এতটাই বিহ্বল হয়ে পড়েছে যে মুখ থেকে একটি শব্দও বেরুচ্ছে না।

অনেকক্ষণ ছোটার পর সবাই নদীর পাড়ে এসে থামে। আফজল হোসেন বিনুদের যেখানে নিয়ে এসেছে, নৌকোঘাট সেখান থেকে বেশ খানিকটা দূরে। সমস্ত কিছু ঝাপসা, তবু বোঝা যায়, বার চোদ্দটা নৌকো ওখানে গা জড়াজড়ি করে রয়েছে। সেগুলোতে মিট মিট করে হেরিকেন কি কুপি জ্বলছে।

এতটা দৌড়ের ধকলে সবাই ভীষণ হাঁপাচ্ছিল। জোরে জোরে বারকয়েক শ্বাস টেনে আফজল হোসেন বলল, 'যাউক, আর ডরের কিছু নাই। অহন আমরা নিচ্চিন্ত।'

ক্রমে জানা গেল, দুপুরে বিনুদের খাইয়ে যাবার পর আফজল হোসেন মামুদপুরের পাশের গ্রাম সোনাদীঘিতে লোক পাঠিয়ে চারজন মাঝিকে ডাকিয়ে এনে বিনুদের তারপাশায় পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা পাকা করে ফেলে। অনেকদিন ধরে এই মাঝিদের চেনে সে। লোকগুলো খুবই বিশ্বাসযোগ্য এবং ইমানদার। ঠিক হয়েছিল, বেলা থাকতে থাকতে ওরা ওদের চারমাল্লাই নৌকো নৌকোঘাট থেকে দূরে মুক্তাবনের আড়ালে লুকিয়ে রেখে আফজল হোসেনের বাড়ি গিয়ে খবর দেবে। সন্ধের পর চরাচর জুড়ে কুয়াশা এবং অন্ধকার নামলে সে মাঝিদের সঙ্গে করে ধনা বারুইয়ের বাড়ি এসে বিনুদের নিয়ে নদীর পাড়ে গিয়ে নৌকোয় উঠবে। নদীর ধারের মুক্তাবনে নৌকো বেঁধে রেখে মাঝিরা আফজলের বাড়ি চলেও গিয়েছিল।

সবই ঠিকমতো চলছিল, কিন্তু সন্ধের মুখে মুখে কিভাবে যেন বিনুদের খবরটা মামুদপুরে ছড়িয়ে পড়ে। সারা গ্রাম মুহূর্তে গরম হয়ে ওঠে। হামলাবাজেরা যখন ধনা বারুইর বাড়িতে চড়াও হবার জন্য তৈরি হচ্ছে, আফজল মাঝিদের নিয়ে বিনুদের বাঁচাতে প্রচণ্ড ঝুঁকি নিয়ে ছুটে আসে।

এক দমে সমস্ত জানিয়ে সেই অচেনা চারটি লোককে দেখিয়ে আফজল হোসেন বিনুকে বলে, 'এয়ারাই হেই মাঝি। অগো নাওয়েই তারপাশা যাইবেন।'

অভিভূত, কৃতজ্ঞ বিনু কী বলবে, কী করবে, ভেবে পায় না। সে শুধু আফজল হোসেনের একটা হাত তুলে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে।

বিনুর স্পর্শে এমন কিছু রয়েছে যা আফজল হোসেনের বুকের ভেতর আলোড়ন তুলে যায়। গাঢ় গলায় সে বলে, 'আপনেরে তো কইছিই, মাইনষের লেইগা মাইনষে এইটুক করেই।'

বিনু উত্তর দেয় না।

একটা লম্বা, সাই জোয়ান মাঝিকে আফজল হোসেন এবার বলে, 'হামিদ, তোমার নাও কই?'

পাশেই অনেকখানি জায়গা জুড়ে মুক্তা ঝোপ। সেদিকে আঙুল বাড়িয়ে হামিদ বলে, 'উই ঝোপড়ার

আবডালে।'

'আর সোময় নষ্ট করনের কাম নাই। নাও লইয়া আসো। অহনই ছাড়তে হইব।'

নৌকো বার করে নিয়ে এলে আফজল হোসেন সবাইকে নিয়ে ওপরে উঠল। মাঝখানে বড়, উঁচু ছই। সামনে পেছনে গলুইয়ের পর থেকে ছই পর্যন্ত টানা, খোলা ডোরার ওপর কাঠের পোক্ত পাটাতন। দুই মাঝি বৈঠা নিয়ে পেছনে বসল। তাদের কাছাকাছি পাটাতনে বসল রাজেক আর তমিজ। সামনের গলুইতে বসেছে অন্য দুই মাঝি। বিনু এবং ঝিনুককে ছইয়ের ভেতর যেতে বলে নিজে সামনের দিকের পাটাতনে পা ভাঁজ করে বসল আফজল হোসেন।

বিনু অবাক হয়ে গিয়েছিল। জিজ্ঞেস করল, 'আপনি আমাদের সঙ্গে তারপাশা যাবেন?'

আফজল হোসেন বলল, 'হ। গাঙ দিয়া গ্যালেও বিপদ কম না। কাইল রাইতেই তো আল্লার দোয়ায় পরানে বাইচা গ্যাছেন। আমারে সামনের পাটাতনে বইসা থাকতে দেখলে কেও সন্দ করব না—'

অর্থাৎ এ নৌকোয় মুসলমান যাত্রী ছাড়া আর কেউ আছে, নদীর হানাদারেরা ঘুণাক্ষরেও টের পাবে না। এখন আকাশে বিষ, বায়ুস্তরে বিষ, চারদিকে মৃত্যুভয়ের পাশাপাশি ঘৃণা আর আক্রোশ। বিনু জানে, আফজল হোসেন এই যে তাদের তারপাশায় পৌঁছে দেবার ঝুঁকি নিয়েছে সেটা কতখানি বিপজ্জনক। ছইয়ের তলায় কারা লুকিয়ে আছে, জানাজানি হলে কী ঘটবে, সেটা খুবই স্পষ্ট। বিনুদের চাইতেও অনেক বেশি সঙ্কটে পড়বে আফজল হোসেন। এই দুঃসাহসী মানুষটি তাদের শেষ অবলম্বন। সে সঙ্গে থাকলে অনেকখানি ভরসা পাবে বিনুরা। সেই সকাল থেকে তাদের বাঁচাবার জন্য কতভাবেই না আগলে আগলে রেখেছে আফজল। তারপরও তাকে নতুন করে বিপন্ন করতে মন সায় দিচ্ছে না। কিন্তু মুখ ফুটে তা বলতে গিয়েও থেমে গেল বিনু। মানুষ বড় স্বার্থপর জীব। তার যা কিছু, সবই নিজেকে বাঁচিয়ে। রাতের অন্ধকারে নদী পাড়ি দিয়ে তারপাশায় যাবার সময় এই মানুষটা যদি ঢালের মতো সামনে থাকে, মনের জোর যথেষ্ট বেড়ে যাবে। আজ সকাল থেকে সন্ধে, মাত্র দশ এগার ঘণ্টার মতো আফজল হোসেনকে দেখছে বিনু। তার সাহস, বুদ্ধি, বিচক্ষণতা, বিপদ এড়াবার জন্য দ্রুত কৌশল সৃষ্টির ক্ষমতা, সব মিলিয়ে এমন একজন লোককে যাত্রাসঙ্গী হিসেবে যখন অযাচিতভাবেই পাওয়া যাচ্ছে, তখন তাকে ছাড়া ঠিক হবে না।

দিনের বেলা উত্তুরে হাওয়ায় তেমন তেজ ছিল না; ঢিমে চালে সেটা বয়ে যাচ্ছিল। সন্ধে নামার সঙ্গে সঙ্গে তার জোর অনেক বেড়েছে। হিমও পড়ছে নিবিড় হয়ে। সেই বিকেল থেকে আকাশের গায়ে কুয়াশা জমছিল। ক্রমশ তা ঘন হয়ে চারদিক ঢেকে ফেলছিল। কুয়াশার সঙ্গে আঁধার মিশে এখন বিশ হাত দূরেও নজর চলে না। ঠিক কালকের মতোই চোখের সামনের সমস্ত কিছু ঝাপসা।

আফজল হোসেন মাঝিদের বলল, 'নাও ছাইড়া দ্যাও। কেরায়া নাওয়েরা ঘাটের সুমুখ দিয়া যাইও না।' বলে আঙুল বাড়িয়ে কাছাকাছি নৌকোঘাটটা দেখিয়ে দিল।

হামিদ বেশ চালাকচতুর। নৌকোঘাটের পাশ দিয়ে না যাবার কারণটা চট করে ধরে ফেলে। বলে, 'হ, উই ধার দিয়া যাওনের কাম নাই। রাইতে আপনেরে নাওয়ে দেখলে হগলে জিগাইব, কই যান, ক্যান যান। মেলা ফৈজত।'

আফজল হোসেন এই অঞ্চলের একজন মান্যগণ্য মানুষ। সবাই তাকে চেনে। এত রাতে সে কোথায় চলেছে, পরিচিত লোকজনের তেমন কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক। সে বলল, 'নাও লইয়া সিধা মইদ্য গাঙে যাইবা। বাতাসের গতিক ভালা বুঝলে বাদাম খাটইয়া দিবা। কাইল সুরুয ওঠনের (ওঠার) আগে আগে তারপাশা পৌঁছাইয়া যামু—'

হামিদ বলল, 'অ্যেনডাই ভাইবা রাখছি।' বলে বরাবর মাঝনদীর দিকে নৌকার মুখ ঘুরিয়ে দিল।

'অবর ওস (কুয়াশা)। দেইখো, দিক য্যান ভুল না হইয়া যায়।' আফজল হুঁশিয়ার করে দিল।

হামিদের আত্মবিশ্বাসে সামান্য খোঁচা লাগে। গলায় ঈষৎ জোর দিয়ে সে বলে, 'বড় মিঞাছাব, মোচের র‍্যাখ (রেখা) যহন উঠে নাই হেই সোময় থিকা পদ্মা-ম্যাঘনা-ধলেশ্বরীতে নাও বাইতে আছি। ওসে তো খুয়া খুয়া (আবছা) দ্যাখন যায়। চৌখে কাপড় বাইন্ধা জাগার (জায়গার) নাম ক'ন। ঠিক পৌঁছাইয়া দিমু।'

'জানি তুমি উস্তাদ মাঝি, তবু মনে করাইয়া দিলাম।'

কালকের তুলনায় আজ বাতাস অনেক জোরালো তো বটেই, সমস্ত নদী জুড়ে উঁচু উঁচু ঢেউও উঠছে। জল থেকে ঠাণ্ডা বাষ্প বেরিয়ে এসে কুয়াশায় আর অন্ধকারে মিশে যাচ্ছে।

নদীর পাড় থেকে নৌকো বেশ খানিকটা দূরে চলে এসেছিল। ওধারের মাঝিঘাট এখন আরও অস্পষ্ট। শুধু পুরু কুয়াশার পর্দার ওধারে ওখানকার নৌকোগুলোর ডিবে কি লণ্ঠনের ক্ষীণ আলো কেমন যেন অলৌকিক মনে হয়।

রাজেকদের নৌকোর ছইয়ের দু'দিকেই ক্যাঁচা বাঁশের ঝাঁপ ছিল। এই নৌকোটার ছইয়ের দুই মুখই খোলা। হু হু করে হেমন্তের বাতাস সারা গায়ে হিম মেখে ভেতরে ঢুকে পড়ছে।

নৌকোয় উঠেই শুয়ে পড়েছিল ঝিনুক। হেরিকেন কি কুপি থাকলেও হামিদরা তা জ্বালিয়ে দেয়নি। রাজেকদের মতো তারাও রাতের আঁধারে আঁধারে হানাদারদের নজর এড়িয়ে নদী পাড়ি দিয়ে তারপাশায় যেতে চায়।

ঝিনুকের পাশে বসে আছে বিনু। স্পষ্ট দেখা না গেলেও বোঝা যায়, বোরখায় সারা শরীর ঢেকে মেয়েটা ঠাণ্ডায় কুঁকড়ে আছে। সে ডাকল, 'ঝিনুক—'

ঝিনুক ঘুমোয়নি। মৃদু গলায় সাড়া দিল, 'উঁ—'

'আফজল সাহেব আমাদের সঙ্গে আছে। এবার আর ভয় নেই।'

কাল রাজেকদের নৌকোয় ওঠার পর এমন অভয় কত বার যে বিনু দিয়েছে তার ঠিক নেই। ঝিনুক কতটা আশ্বস্ত হল, কে জানে। সে উত্তর দিল না।

বিনুর আর কিছু বলার ছিল না। কী-ই বা বলবে? ছইয়ের ফাঁক দিয়ে দুর্নিরীক্ষ নদীর দিকে তাকিয়ে থাকে সে। আফজল হোসেন তাদের সঙ্গে আছে। ঠিক। যেটুকু পরিচয় পাওয়া গেছে, তাতে মনে হয় লোকটা বিশ্বাসঘাতকতা করবে না। সেটাও ঠিক। তবু যতক্ষণ না তারপাশায় গিয়ে স্টিমারে উঠছে, দুর্ভাবনা পিছু ছাড়ছে না। কিভাবে, কোন অদৃশ্য ছিদ্র দিয়ে সেটা বার বার মাথায় ঢুকে পড়ে, হদিস পাওয়া যায় না।

নৌকোর এ-মাথায় ও-মাথায় অন্ধকারে জিনের মতো চার মাঝি একটানা বৈঠা টানছে। তার আওয়াজ তো রয়েছেই, সেই সঙ্গে নদীর বড় বড় ঢেউ নৌকোর গায়ে আছড়ে পড়ে অনবরত যে ধ্বনি সৃষ্টি করছে, এছাড়া সারা পৃথিবীতে আর কোনও শব্দ নেই। কালকের মতো আজও আকাশ চাঁদ বা নক্ষত্রের মেলা, কিছুই চোখে পড়ছে না। কুয়াশা আর অন্ধকার মিলে গিয়ে দিগন্তজোড়া ধূসরতায় সে সব পুরোপুরি মুছে গেছে।

বিনুরা অনেক দূর চলে এসেছিল। খুব সম্ভব মাঝনদীতে। মামুদপুরের নৌকোঘাটের আলোগুলো এখন আর দেখা যাচ্ছে না। আঁধারে কুয়াশায় নদীর ওপারটা বিলীন হয়ে গেছে।

হঠাৎ একটা কথা ভেবে নিজের কাছেই নিজে ভীষণ ছোট হয়ে গেল বিনু। শুধু ছোটই নয়, মনে হল, সে বড় বেশি স্বার্থপর, আত্মকেন্দ্রিক। ঝিনুকের আর নিজের নিরাপত্তা ছাড়া অন্য কোনও দিকে তার নজর নেই। মাত্র সাত হাত দূরে বসে হিমে ভিজে যাচ্ছে আফজল হোসেন। হেমন্তের ঠাণ্ডা হাওয়া তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে। আকাশের নীচে খোলা পাটাতনে সারা রাত এভাবে বসে থাকলে লোকটা শক্ত অসুখে পড়ে যাবে। ছইয়ের ভেতর তাকে এসে বসার কথা বলতে গিয়েও থেমে যায় বিনু। সে জানে, তারপাশা অব্দি লোকটা ঠায় ওখানে বসে থাকবে। কারণটাও তার অজানা নয়।

আফজল হোসেন হামিদকে জিজ্ঞেস করে, 'কি মাঝি, নাওয়ে বাদাম খাটাইবা?'

হামিদ বলল, 'না বড় মিঞাছাব, হাউরা (ঝড়ো) বাতাস ছাড়ছে। একবার এই মুখী লৌড়ায়, আবার উই মুখী। গাঙও উথাল্‌পাথাল। বাদাম খাটাইলে নাও সামাল দিতে পারুম না। হেইর থিকা বৈঠাই বাই।'

'যা ভালা মনে লয় হেই কর।'

অন্ধকারেও বোঝা যাচ্ছিল, আশপাশ দিয়ে বেশ কিছু নৌকো চলে যাচ্ছে। কোনওটায় আলো জ্বলছে, কোনওটায় জ্বলছে না। সবগুলো নৌকোর যাত্রীই যে সাতপুরুষের ভিটেমাটি ছেড়ে তারপাশায় স্টিমার ধরতে যাচ্ছে তা কিন্তু নয়। কত মানুষকে কত দরকারে রাত বিরেতে নদী পাড়ি দিতে হয় তার কি কিছু ঠিক আছে? যে নৌকোগুলো পাশ দিয়ে গেছে তাদের দিক থেকে বিপদের কারণ ঘটেনি।

মাঝরাতে বাতাস আর জলস্রোতের দাপট অনেকটা কমে যায়। বিনুর চোখে ঢুল লাগে। সেই সময় হঠাৎ জোরালো টর্চবাতির আলো এসে পড়ে তাদের নৌকোয়। একটা ভারী, কর্কশ গলা কানে আসে, 'কাগো নাও? যায় কই?'

কখন যে তাদের গা ঘেঁষে একটা লম্বা ধাঁচের নৌকো পাশাপাশি চলতে শুরু করেছে, খেয়াল করেনি বিনু। তার হৃৎপিণ্ডের ধকধকানি স্তব্ধ হয়ে যায় যেন। ঝাপসা অন্ধকারেও পাশের নৌকোয় কারা বসে আছে, তাদের কী অভিসন্ধি, বুঝতে অসুবিধা হয় না। মধ্যরাতেও ঘাতক বাহিনীর কী অফুরন্ত উদ্যম!

আফজল হোসেনও খুব সম্ভব বসে বসে ঢুলছিল। টর্চের তীব্র আলো চোখে লাগতে ধড়মড় করে ওঠে। ভুরুর ওপর হাতের আড়াল দিয়ে প্রবল ধমকানির সুরে বলে, 'দেখতে পাও না কাগো নাও? বাত্তি সরাও—'

টর্চের মুখ অন্য দিকে সামান্য সরে যায়। সেই লোকটা ফের জিজ্ঞেস করে, 'কুনহানে চললেন মিঞাছাব?'

'হেয়া (তা) দিয়া তোমার কুন কাম?' আফজল হোসেন রুখে ওঠে।

তার চোটপাট শুনে পাশের নৌকোর লোকটা সামান্য দমে যায়। বলে, 'ওসের (হিমের) মইদ্যে খুলা পাটাতনে বইসা আছেন ক্যান?'

আফজল হোসেন বলে, 'ওসের মইদ্যে বইসা যামু, না গাঙ হাতইরা (সাঁতরে) যামু, হেইটা আমার ইচ্ছা। ঝঞ্ঝট না কইরা তোমরা অহন যাও—'

টর্চের আলো বিনুদের নৌকোর ওপর আগাপাশতলা পাক খেয়ে চলেছে। ঝাঁপহীন ছইয়ের তলায় আলোটা হঠাৎ স্থির হয়ে যায়।

লোকটা জিজ্ঞেস করে, 'হেরা (ওরা) কারা?'

তার মনে কি কোনও রকম খটকা দেখা দিয়েছে? দমে গিয়ে মিন মিন করে জবাব দিলে লোকটা পেয়ে বসবে। তার সন্দেহ বহুগুণ বেড়ে যাবে। গলার স্বর অনেক উঁচুতে তুলে চড়া মেজাজে আফজল হোসেন বলে, 'হেই খবরে কী হইব?'

লোকটা শাসানির সুরে বলে, 'যা জিগাই তার জবাব দ্যান। বেশি তেড়িমেড়ি কইরেন না।'

বিনু কাঠ হয়ে বসে আছে। আফজল হোসেন কী উত্তর দেবে, কিভাবে এই নতুন সমস্যাটা সামাল দেবে, বোঝা যাচ্ছে না। তার সামান্য ভুলচুক হয়ে গেলে, পরিণতি কী হবে ভাবতে সাহস হয় না।

আফজল হোসেন গলার স্বর আগের জায়গাতেই রেখে বলে, 'তেড়িমেড়ি! জবানের লাগাম নাই দেখি। কার লগে ক্যামন কইরা কথা কইতে হয়, শিখ নাই! আমি মামুদপুরের ইউনান বোডের প্রেছিডাং (প্রেসিডেন্ট)। ছইয়ের তলে আমার পোলা আর হের (তার) বিবি রইছে। শুনলা তো? এইবার আমাগো ছাইড়া অন্যহানে যাও—'

লোকটা এবার অনেক নরম হয়। বলে, 'মিঞাছাব, আপনে কি জানেন, মেলা (বহু) হুমুন্দির পুতে রাইতের আন্ধারে হিন্দুগো লইয়া গিয়া গোয়ালন্দর ইস্টিমারে তুইলা দিতে আছে। পাছে কেও দেইখা ফালায়, হেইর লেইগা বাত্তি জ্বালে না।'

'কে কী করতে আছে, আমার জাননের কাম নাই।'

'একহান পরামশ্য দেই—'

'কী?'

'কুপি কি হেরিক্যান আঙ্গাইয়া (জ্বালিয়ে) রাখেন। আমাগো লাখান আরও মেলা নাও গাঙ্গে ঘুরতে আছে। বাত্তি দেখলে হেরা (তারা) সন্দ করব না।'

'তুমার পরামশ্যহান মনে রাখুম। অহন মেহেরবানি কইরা যাও—'

লম্বা নৌকোটা পাশ থেকে দূর কুয়াশায় আর অন্ধকারে মিলিয়ে যায়।

দাঁতে দাঁত ঘষে গজরাতে থাকে আফজল হোসেন, 'ইবলিশের ছাওরা—'

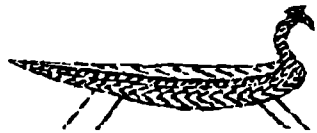

মোটামুটি ভাবা গিয়েছিল, ভোরে সূর্যোদয়ের আগে আগে তারপাশা পৌছনো যাবে। কিন্তু মামুদপুর থেকে নৌকো ছাড়ার পর খ্যাপা বাতাস আর নদীর উদ্দাম ঢেউয়ের বাধায় প্রথম দিকে গতি বাড়ানো যাচ্ছিল না। পরে অবশ্য হাওয়া এবং নদীর দাপট কমলে হামিদরা নৌকোটাকে নদীর ওপর দিয়ে প্রায় উড়িয়েই নিয়ে এসেছে। তবু তারপাশায় পৌছতে একটু বেলাই হয়ে গেল।

দিগন্তের তলা থেকে সূর্য এখন অনেকটা ওপরে উঠে এসেছে। হেমন্তের এই সকালে কুয়াশার লেশমাত্র নেই। মাথার ওপর মস্ত বড় নীলাকাশ। স্বচ্ছ। পরিষ্কার। কেউ যেন কাল রাতের সব কুয়াশা আর অন্ধকার ধুয়ে মুছে তকতকে করে রেখেছে। যতদূর চোখ যায়, নদীর জলে সোনালি রোদ টলমল করছে। মনে হয়, দিগন্ত জুড়ে অপার্থিব কোনও কলসি উপুড় করে স্বর্ণরেণু ঢেলে দেওয়া হয়েছে। কাল রাতের মতো না হলেও এই সকালবেলায় বাতাস বেশ ঠাণ্ডা; অদৃশ্য হালকা ঢেউ তুলে তুলে সামনের অন্তহীন জলধারার ওপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। নদী থেকে পঞ্চাশ ষাট হাত উঁচুতে ঝাঁকে ঝাঁকে চিল উড়ছে। ওদের পেটে রাহুর খিদে, সারাক্ষণ শুধু খাই খাই। পাখিগুলোর ধ্যানজ্ঞান জলের দিকে। মাছ নজরে পড়লেই নদীতে ছোঁ দিয়ে পড়ছে। ধারাল ঠোঁটে টাটকিনি কি গোলসা ট্যাংরা বা টাকি মাছ গেঁথে নিয়ে বাতাসে ডানার ঝাপটা মেরে ফের উঁচুতে উঠে যাচ্ছে।

নদীর কিনার ঘেঁষে স্টিমারঘাট। সেখানে মস্ত জেটি। গোয়ালন্দ কি নারায়ণগঞ্জের দিক থেকে যত স্টিমার আসে, সব জেটিটার গায়ে ভেড়ে। স্টিমারঘাট থেকে কিছুটা তফাতে নৌকোঘাট। একমাল্লাই, দু'মাল্লাই, চারমাল্লাই, ছইওলা, ছইছাড়া কত যে নৌকো কাতার দিয়ে লগি গেঁথে দাঁড়িয়ে রয়েছে তার হিসেব নেই। তা ছাড়া আছে অগুনতি কোষ, ভাউলে, মহাজনী ভড়।

যেমন নৌকোর ভিড়, তেমনি মানুষের। হামিদরা নৌকোঘাটের গায়ে ফাঁকামতো একটু জায়গায় নৌকো ভিড়িয়ে, লগি পুঁতে, কাছি দিয়ে বেঁধে ফেলল।

দূর থেকে নৌকোঘাটের কলরব শোনা গিয়েছিল। এখানে আসার পর তুমুল হইচই কানের পর্দা যেন ফাটিয়ে দিচ্ছে। সারা রাত চার মাঝি সমানে বৈঠা টেনেছে। ঘুম তো দূরের কথা, কেউ এতটুকু জিরোবারও ফুরসত পায়নি। পরিশ্রমে হাত-পায়ের জোড় যেন আলগা হয়ে যাচ্ছে। ক্লান্তিতে ঘুমে শরীর ভেঙে পড়ছে। চোখ আপনা থেকে বুজে আসছে। বৈঠা না টানলেও বাকি সকলের একইভাবে রাত কেটেছে। বিনিদ্র। আতঙ্কিত।

বিনুরা তারপাশায় পৌছবার পর একের পর এক নৌকো নদী পাড়ি দিয়ে নৌকোঘাটে এসে ভিড়তে লাগল। সেগুলো থেকে যারা নামছে তাদের শঙ্কাতুর মুখচোখ দেখে বোঝা যায়, দেশের ভিটেমাটি ফেলে চিরকালের মতো সীমান্তের ওপারে চলে যাবার জন্য ওরা স্টিমার ধরতে এসেছে।

আফজল হোসেন বলল, 'যাউক, উপুরআলার দোয়ায় শ্যাষ তরি (পর্যন্ত) তারপাশায় পৌছান গ্যাল।'

কাল হানাদারদের নৌকোটা চলে যাবার পর তেমন আর কিছু ঘটেনি। নির্বিঘ্নে বাকি নদীটুকু পেরিয়ে তারা এখানে আসতে পেরেছে।

আস্তে মাথা নাড়ে বিনু। ঈশ্বরের অপার করুণা ছাড়া যে তারপাশায় পৌছনো যেত না, সে ব্যাপারে আফজল হোসেনের সঙ্গে সে একমত।

আফজল বলল, 'এইহানে কুনো ডর নাই। পুলিশ আছে।' একটু থেমে জানালো, 'দ্যাশ ছাইড়া যারা যাইতে আছে তাগো উপুর পাকিস্থানে জুলুম হইতে আছে, এই লইয়া ইন্ডিয়ায় জবর শোরগোল উঠছে। হের (তার) লেইগা এহানকার গরমেন (গভর্নমেন্ট) কুনো কুনো জাগায় (জায়গায়) পুলিশ বসাইছে।'

এই খবরটা আগেও কানে এসেছে বিনুর। যারা জন্মভূমি থেকে উৎখাত হয়ে ওপারে যাচ্ছে, রাস্তায় তাদের ওপর যে হামলা চালানো হচ্ছে, সেটা আর চাপা নেই। যারা বর্ডারের ওপারে যেতে পেরেছে,

এ ধারের খুনখারাপি, লুটপাট, আগুন লাগানোর খবর সবিস্তার সেখানে পৌঁছে দিচ্ছে। ইন্ডিয়ায় সেই কারণে তীব্র উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে। ভারতের মানুষজন এটা ভাল চোখে দেখছে না। তাই পাকিস্তান সরকার মুখরক্ষা করতে রেল স্টেশন আর স্টিমারঘাটগুলোতে উদ্বাস্তুদের পাহারাদারির জন্য পুলিশ মোতায়েন করেছে। এই জায়গাগুলো মোটামুটি সুরক্ষিত।

আফজল হোসেন ফের বলল, 'বিবিসাবরে ক'ন, অহন আর বুরখা পইরা থাকনের দরকার নাই। আপনেও লুঙ্গি ছাইড়া ধুতিখান পইরা লন (নিন)। হের পর নাও থিকা লাইমা (নেমে) উপুরে চলেন। তমন্ত রাইত কেওর প্যাটে ভাত-পানি পড়ে নাই। আগে খাইয়া শরীলে জোর-বল আনেন। পরে আপনেগো ইস্টিমারঘাটায় পৌঁছাইয়া দিমু।'

লোকটার সব দিকে নজর। সময় যখন বেজায় উত্তপ্ত, বিষবাষ্পে আবহাওয়া আচ্ছন্ন, তখন আফজল হোসেন কিন্তু সম্পূর্ণ অবিচলিত। ক'বছর ধরে অবিশ্বাস, ঘৃণা আর বর্বরতায় বহুকালের স্থিতি, শান্তি ভেঙেচুরে শতখান হয়ে গেছে। কিন্তু মামুদপুর গ্রামের এই অখ্যাত মানুষটিকে সে সব কোনও ভাবেই টলাতে পারেনি। বুকের ভেতর ভালবাসা, মমতার এমন এক চেরাগ সে জ্বেলে রেখেছে যা কখনও, কোনও কারণেই নেবে না।

পোশাক পালটে বোরখা লুঙ্গি ভাঁজ করে ছইয়ের ভেতর একধারে রেখে দিল বিনু। তারপর ঝিনুককে নিয়ে আফজল হোসেনের সঙ্গে পাড়ের মাটিতে নামল। তাদের পিছু পিছু নৌকোর চার মাঝি এবং রাজেক আর তমিজও নেমে এসেছে।

সবাই নদীর জলে মুখ ধুয়ে নিল। ঢালু পাড় বেয়ে কয়েক হাত ওপরে উঠলে চওড়া মেটে সড়ক। সেটা একদিকে স্টিমারঘাটে গিয়ে ঠেকেছে। আরেক দিকে বাঁক ঘুরে ঘুরে দূরের গ্রামগুলোতে চলে গেছে।

একটু পর সড়কে উঠে আসতেই চোখে পড়ল, গ্রামের দিক থেকে কাতারে কাতারে মানুষ আসছে। পুরুষদের মাথায় টিনের বাক্স, পাটি কি শতরঞ্চি-জড়ানো বিছানা, হাতে গাঁটরি বোঁচকা। সধবা বউদের এক কাঁকালে বাচ্চা, কাঁধে পোঁটলা পুঁটলি। যে বাচ্চাগুলো একটু বড়, তারাও ছোটখাটো কিছু না কিছু হাতে ঝুলিয়ে আসছে।

মানুষের যে মহাযাত্রা স্টিমারঘাটের দিকে চলেছে তারা কারা, কী তাদের পরিচয়, বুঝতে অসুবিধা হয় না। এই সব নানা বয়সের মানুষ—বুড়ো আধবুড়ো কিশোর কিশোরী যুবক যুবতী বাচ্চাকাচ্চাদের চোখেমুখে অসীম ক্লান্তি আর আতঙ্কের ছাপ। মনে হয়, অনেক দূর থেকে হাঁটতে হাঁটতে তারা আসছে।

আফজল হোসেন আক্ষেপের সুরে বলল, 'দ্যাশ ছাইড়া যাইতে আছে গিয়া। আমাগো ঢাকার জিলা পেরায় শূইন্য হইয়া গ্যাল।'

পাশাপাশি হাঁটছিল বিনু আর ঝিনুক। বিনু জানে শুধু ঢাকা জেলাই নয়, সারা পূর্ব বাংলাই ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে। সে উত্তর দিল না।

রাস্তার একধারে টিনের চাল এবং ক্যাঁচা বাঁশের বেড়ায় সারিবদ্ধ দোকান। তার অনেকগুলোই মিঠাইয়ের। বড় বড় পেতলের গামলায় রসগোল্লা, ক্ষীরমোহন, পান্তুয়া, কাঠের পরাতে মাখা সন্দেশ, পাতক্ষীর। এ ছাড়া রয়েছে বেশ ক'টা চিঁড়ে মুড়ি বাতাসা তিলা কদমা এবং চিনির মঠের দোকান। চার পাঁচটা কলার দোকানও চোখে পড়ছে। কত রকমের কলা—সবরি, মোহনবাঁশি, চাঁপা, কবরি, অমর্তসাগর। এ ছাড়া আছে কাপড়ের দোকান, মনিহারি দোকান, বাসনকোসনের দোকান, চাল ডাল তেল নুন মশলাপাতির দোকান। দোকানের লেখাজোখা নেই। কয়েকটা ভাতের হোটেলও আছে।

মিঠাই আর চিঁড়ে মুড়ির দোকানগুলো হিন্দুদের। তারা এখনও দেশ ছেড়ে চলে যায় নি।

চিঁড়ে আর কলা কিনে সবাইকে নিয়ে একটা মিঠাইয়ের দোকানে ঢুকল আফজল হোসেন। দোকানদারের কাছ থেকে সবার জন্য একটা করে কাঁধা-উঁচু কাঁসার বগি থালা চেয়ে নিল সে। তারপর দই চিঁড়ে মেখে খাওয়া শুরু করল। চিঁড়ে দই কলার পর দু'টো করে ক্ষীরমোহন।

চিঁড়ে এবং কলার দাম দিতে চেয়েছিল বিনু। আফজল হোসেনের প্রবল আপত্তিতে দিতে পারেনি। লোকটা দই মিষ্টির দামও দিতে দিল না। বলল, 'দামের কথা মুখে আইনেন না। নিজের বাড়িত্ নিয়া ভাল কইরা দু'গা (দু'টি) খাওয়াইতে পারি নাই। বড় আপসোস। দিনকাল যে কী খারাপ হইয়া গ্যাছে।'

মামুদপুর গ্রামে নিয়ে যাবার পর বিনুদের লুকিয়ে রাখতে হয়েছে, অত কাছে গিয়েও নিজেদের বাড়িতে নিয়ে যত্ন করতে পারে নি, এই কথা আরও কয়েক বার শুনিয়েছে আফজল হোসেন। তারপাশায় দই চিঁড়ের ফলার খাইয়ে তার আক্ষেপ হয়তো কিছুটা মেটাতে চাইছে।

একটু নীরবতা।

তারপর আফজল হোসেন হামিদদের বলল, 'তোমরা নাওয়ে গিয়া বসো, আমি এনাগো (এঁদের) জেটিঘাটায় পৌছাইয়া দিয়া আসি। তোমাগো লগেই আমি গেরামে ফিরুম।' বলে বিনুদের দেখিয়ে দিল।

হামিদরা চলে গেল।

বিনু ব্যস্তভাবে বলল, 'ওদের নৌকো ভাড়াটা কিন্তু আমি দেব।'

আফজল হোসেন হাসল। বলল, 'ঠিক আছে, দিবেন।'

'কত দিতে হবে?'

'তিরিশ ট্যাকা—'

কোমরের থলি থেকে টাকা বার করে আফজল হোসেনকে দিল বিনু, 'ওদের দিয়ে দেবেন।' তারপর রাজেককে পঁচিশটা টাকা দিয়ে বলল, 'তোমাদের তো রাজদিয়া ফিরে যেতে হবে। কিভাবে যাবে?'

রাজেক বলল, 'এইহান থিকা 'গয়নার নাও' পামু। হেই ধইরা চইলা যামু।'

বিনু বলল, 'রাজদিয়ায় গিয়েই দাদুর সঙ্গে দেখা করে সব বোলো।'

'হে তো কমুই।'

আফজল হোসেন বিনুকে বলল, 'চলেন—'

বিনুরা জেটিঘাটের দিকে এগিয়ে গেল। তাদের সঙ্গে রাজেক আর তমিজও চলেছে। সামনে পেছনে এবং পাশে চলেছে শিকড় উপড়ে আসা মানুষের স্রোত। ম্রিয়মাণ, ভীত, সন্ত্রস্ত অসংখ্য মুখের মিছিল।

বিনু রাজেককে বলল, 'তোমরা আবার কষ্ট করে আসছ কেন? আফজল সাহেবই তো যাচ্ছেন।'

রাজেক জানায়, বিনুদের স্টিমারে ওঠার কী বন্দোবস্ত হয় তা না জেনে তারা ফিরবে না। রাজদিয়ায় গিয়ে হেমনাথকে সব জানাতে তো হবে।

এরপর আর বলার কিছু থাকে না। নিঃশব্দে হাঁটতে লাগল বিনু।

জেটির সামনে অনেকটা জায়গা জুড়ে আগুনতি মানুষ। ছেলেমেয়ে, বউ, বুড়ো মা-বাপ নিয়ে তারা বসে আছে। পাশে নানা লটবহর। টিনের বাক্স, পোঁটলাপুঁটলি, বেতের সাজি বা ধামা। পার্থিব সম্পত্তি বলতে যে যেটুকু পেরেছে নিয়ে এসেছে। নৌকোয় করে বা সড়ক ধরে হেঁটে, ধুঁকতে ধুঁকতে যারা আসছে তারাও আগে আসা লোকগুলোর পাশে বসে পড়ছে।

জেটির ভেতর ঢোকা প্রায় অসম্ভব। সেখানে এমন ঠাসা ভিড় যে পা ফেলার মতো ফাঁক নেই। আন্দাজ করা যায়, অনেক আগে থেকেই লোকজন এসে স্টিমার ধরার জন্য জেটিতে বসে আছে। এধারে ওধারে আট দশটা কনস্টেবলকে ঘোরাঘুরি করতে দেখা যাচ্ছে। তাদের হাতে বন্দুক।

একসঙ্গে বহু মানুষ জড়ো হলে যা হয়, চারদিকে হইচই চলছে।

আফজল হোসেন এধারে ওধারে তাকিয়ে কিছু বোঝার চেষ্টা করল। তারপর বিনুকে বলল, 'আপনেরা এইহানে এট্টু খাড়ন। আমি ইস্টিমারের খবর লইয়া আসি।' মুহূর্তে জনারণ্যে মিশে গেল সে।

তারপাশায় মোটামুটি নিরাপদে পৌছনো গেছে। সেদিক থেকে একটা মারাত্মক চিন্তা কেটেছে। কিন্তু জেটিঘাটের জনসমুদ্র দেখে নতুন একটা দুর্ভাবনা বিনুকে হতচকিত করে তোলে। যত মানুষ আগেই জমা হয়েছে এবং স্রোতের মতো আরও যারা আসছে, দিনে দশটা স্টিমার দিলেও তাদের জায়গা হবে না। রুগ্ণ, দুর্বল ঝিনুককে নিয়ে ভিড় ঠেলে কবে সে গোয়ালন্দের স্টিমারে উঠতে পারবে,

কে জানে।

একই সমস্যার কথা ভাবছিল ঝিনুক। পাশ থেকে সে বলল, 'এত মানুষ। আমরা কী করে কলকাতায় যাব?'

বিনু ঝিনুকের দিকে ফিরে ভরসা দেবার সুরে বলে, 'একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে। তারপাশায় যখন আসতে পেরেছি, কলকাতাতেও ঠিক চলে যাব।'

বেশ কিছুক্ষণ বাদে ফিরে আসে আফজল হোসেন। বলে, 'গতিক ভালা না—' তাকে বেশ চিন্তিত দেখাচ্ছে।

বিনুর বুকের ভেতরটা ধক করে ওঠে, 'কী হয়েছে মিঞাসাহেব?'

'কাইল তরি (পর্যন্ত) রোজ দুইহান ইস্টিমার দিত। আইজ থিকা একহান কইরা দিছে। ক্যামনে যে অ্যাত মানুষ গাঙ পারাইয়া (পার হয়ে) গোয়ালন্দ যাইব, খোদা জানে।'

বিনুর কাছে এটা পরিষ্কার, আজ আর ঝিনুককে নিয়ে স্টিমারে ওঠা হচ্ছে না। কবে যে উঠতে পারবে, তার ঠিক নেই। হয়তো দু'দিন, চারদিন, কি তারও বেশি তারপাশার স্টিমারঘাটে অপেক্ষা করতে হবে।

আফজল হোসেন এবার বলল, 'জেটিঘাটার ভিতরে একহান সুই (ছুঁচ) ফালানের জাগা (জায়গা) নাই—অ্যাত মানুষ। বিবিসাবরে লইয়া আপনেরে বাইরে খুলা (খোলা) আশমানের তলে থাকতে হইব।' একটু থেমে ফেরে বলে, 'জবর কষ্ট হইব আপনেগো।'

স্টিমারের সমস্যা তো আছেই, অদূর ভবিষ্যতের আরও একটা দুশ্চিন্তা বিনুকে ভেতরে ভেতরে চঞ্চল করে তোলে। দু'চারদিন পর না হয় তারা গোয়ালন্দ পৌঁছল, কিন্তু সেখানে গিয়েই যে শিয়ালদার ট্রেন ধরতে পারবে, তার কি কোনও নিশ্চয়তা আছে? সেখানেও কি হাজার হাজার মানুষ আকণ্ঠ উদ্বেগ নিয়ে অপেক্ষা করছে না? গোয়ালন্দ থেকে দিনে শিয়ালদার ক'টা ট্রেন ছাড়ে, বিনুর জানা নেই। হয়তো ওখানেও দিনকয়েক ট্রেনের আশায় বসে থাকতে হবে। দুশ্চিন্তাটা ঝাঁকি মেরে মাথা থেকে তাড়াতে চাইল বিনু। যতক্ষণ শ্বাসপ্রশ্বাস চলছে, আশা তো রাখতেই হয়। সে বলল, 'এত মানুষ কলকাতায় চলেছে। তাদের যা হবে, আমাদেরও তা-ই হবে। সারারাত ঘুমোতে পারেননি, নৌকোর পাটাতনে বসে হিমে ভিজেছেন। আমাদের জন্যে আপনি আর কষ্ট করে এখানে থাকবেন না। মামুদপুরে ফিরে যান।'

একটানা পুরো একটি রাত এবং একটি দিনের ধকলে শরীর ভেঙে আসছিল আফজল হোসেনের। রাত জাগার কারণে চোখ টকটকে লাল, কপালের দু'পাশের শিরা দপ দপ করছে। বয়স তো কম হয়নি।

আফজল হোসেন বিনুর দু'হাত জড়িয়ে ধরে বলল, 'আপনেগো ইস্টিমারে তুইলা দিয়া যাইতে পারলে শান্তি পাইতাম। কিন্তুক—'

সে কী বলতে চায়, বুঝতে পারছিল বিনু। তাদের স্টিমার ধরাতে হলে দু'চারদিন হয়তো তারপাশায় থেকে যেতে হবে আফজল হোসেনকে। কিন্তু সেটা তো সম্ভব নয়।

বিনু বলল, 'চিন্তা করবেন না, আমরা ঠিক স্টিমার ধরতে পারব। আপনি বাড়ি গিয়ে ভাল করে বিশ্রাম করুন।'

বিমর্ষ মুখে আফজল হোসেন বলল, 'কী আর করন, যাই তাইলে (তা হলে)।' ধীরে ধীরে মুঠো খুলে বিনুর হাত ছেড়ে দেয় সে। বলতে থাকে, 'যদিন পারেন কইলকাতায় গিয়া চিঠি লেইখা পৌঁছ সম্বাদটা দিয়েন। তাইলে নিচ্চিন্ত হমু। আমাগো গেরামের নাম তো জানেনই। মামুদপুর, বিক্রমপুর। জিলা ঢাকা। এই লেইখা দিলেই হইব।' একটু ভেবে ফের বলে, 'জানি না, বডারের (বর্ডারের) উই পার থিকা চিঠিপত্তর এই ধারে আসে কিনা—'

কে বলবে, আফজল হোসেন নামে এই লোকটার সঙ্গে মাত্র চব্বিশ ঘণ্টা আগে এক সংকটের মুহূর্তে তার আলাপ। আপ্লুত, অভিভূত বিনু বলে, 'নিশ্চয়ই লিখব।'

আফজল হোসেন আর দাঁড়ায় না, ভিড়ের ভেতর দিয়ে নৌকোঘাটের ওধারে যেখানে হামিদদের নৌকোটা বাঁধা আছে, ক্লান্ত পা ফেলে ফেলে সেদিকে চলে যায়।

pathagar.net

'আমরাও যাই ছুটোবাবু—' রাজেক আর তমিজও চলে যায়। তারা 'গয়নার নাও' ধরে রাজদিয়া ফিরে যাবে। কিন্তু কয়েক পা গিয়ে ফিরে আসে রাজেক। বলে, 'মামুদপুরের এই মিঞাছাবের লাখান মানুষ আমি আর দেখি নাই ছুটোবাবু। ফেরেশতা (দেবদূত), ফেরশতা—' বলেই ভিড়ের মধ্যে মিশে যায়।

ঠিক একই কথা ভাবছিল বিনু। রাজদিয়ার লারমোর সাহেবকে বাদ দিলে আফজল হোসেনের মতো আর কাউকে কখনও দেখেনি। আমৃত্যু এই মানুষটিকে মনে করে রাখবে সে।

জনসমুদ্রে যতক্ষণ না আফজল হোসেন বিলীন হয়ে যায়, তার দিকে তাকিয়ে থাকে বিনু।

পাশেই ছিল ঝিনুক। বলল, 'আমি আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছি না। কোমর থেকে পা পর্যন্ত ছিঁড়ে পড়ছে।'

দুর্বল শরীরে এতক্ষণ যে দাঁড়িয়ে আছে, সেটা ঝিনুকের পক্ষে ভীষণ কষ্টকর। ব্যস্তভাবে এধারে ওধারে তাকায় বিনু। একটু ফাঁকা জায়গা পেলে ঝিনুককে বসাবে, নিজেও বসবে।

হঠাৎ একটা গলা কানে এল, 'ছুটোবাবু না?'

কণ্ঠস্বর চেনা চেনা, কিন্তু কোথায় শুনেছে মনে করতে পারল না বিনু।

ফের শোনা গেল, 'এই যে, এইহানে—'

এবার চোখে পড়ল। সড়কের ডান পাশে ঘাসে-ভরা নাবাল জায়গায় আরও অনেকের সঙ্গে বসে আছে হরিন্দ। তার গা ঘেঁষে একটি পনের ষোল বছরের সদ্য যুবতী এবং দু'টো ছেলে। এক ছেলের বয়স এগার বার, অন্যটার সাত আট। আর রয়েছে কপাল পর্যন্ত ঘোমটা টানা আধবয়সী সধবা একটি মেয়েমানুষ—খুব সম্ভব হরিন্দর স্ত্রী। ওদের সঙ্গে কিছু লটবহরও রয়েছে। একটা ঢাক, পুরনো টিনের বাক্স, আধছেঁড়া পাটি দিয়ে জড়ানো বালিশ, কাঁথা, বিছানার চাদর আর ছোটখাটো দু'চারটে পুঁটলি।

হরিন্দকে বিনু প্রথম দেখেছিল সুজনগঞ্জের হাটে। কোন এক জমিদার সম্বন্ধে নাকি রটে গিয়েছিল, সে আপাদমস্তক স্ত্রৈণ, স্ত্রীর একান্তই বশীভূত যে স্ত্রী যদি বলে সূর্য পশ্চিম দিকে উঠে পুবে অস্ত যায়, লোকটা নাকি ঘাড় কাত করে তক্ষুনি তাতে সায় দেয়। রটনাটা যে আগাগোড়া মিথ্যে, তা প্রমাণ করার জন্য জমিদার হরিন্দকে সুজনগঞ্জে পাঠিয়েছিল। হরিন্দ ওখানকার বিষহরিতলার পাশের মাঠে ঢেঁড়া পিটিয়ে হাটের লোকজন জড়ো করে জানিয়ে দিয়েছিল, সেই জমিদারবাবুটি স্ত্রৈণ নয়।

এতদিন পর, অসীম উৎকণ্ঠায় যখন তার মন ভরে আছে, সুজনগঞ্জের হাটের সেই দৃশ্যটা চোখের সামনে ভেসে উঠতে হাসি পেল।

দ্বিতীয় বার হরিন্দকে ওই সুজনগঞ্জের হাটেই দেখা গিয়েছিল। তখন যুদ্ধ চলছে। কয়েকজন হোমরা চোমরা অফিসারকে নিয়ে এস ডি ও সাহেব, ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব ওয়ারের জন্য সোলজার রিক্রুট করতে এসেছিলেন। সেবারও লোক জোটাবার কাজে হরিন্দকে লাগানো হয়েছিল। ঢেঁড়া পিটিয়ে সারা হাটটা বিষহরিতলার পাশের মাঠে টেনে এনেছিল সে।

এরপর বারকয়েক হরিন্দর সঙ্গে দেখা হয়েছে। দু'চারবার তাদের রাজদিয়ার বাড়িতেও এসেছে সে। ভাটির দেশে না কোথায় তার বাড়ি, মনে পড়ছে না বিনুর। পালা পার্বণে ঢাক বাজানো ছাড়া, হাটে হাটে ঘুরে ঢেঁড়া দিয়ে বেড়াত সে।

বিনু লক্ষ করল, হরিন্দর চোখের নীচে কালি, গাল ভাঙা, একমুখ খাড়া খাড়া দাড়ি, কণ্ঠার হাড় চামড়া ফুঁড়ে বেরিয়ে এসেছে। ছেলেমেয়েগুলোর চেহারা শীর্ণ, চাউনি ভয়কাতর। একটা অদৃশ্য আতঙ্ক যেন তাদের তাড়া করছে।

চেনা লোক দেখে একটু ভরসা পায় বিনু। ঝিনুককে সঙ্গে করে হরিন্দদের কাছে চলে আসে। হরিন্দ বলে, 'কইলকাতায় চলছেন?'

'হ্যাঁ।' আস্তে মাথা নাড়ে বিনু। প্রশ্নটা অনাবশ্যক, তবু জিজ্ঞেস করে, 'তোমরাও যাচ্ছ?'

'হ—' বুক তোলপাড় করে দীর্ঘশ্বাস পড়ে হরিন্দর। সে বলে, 'দ্যাশের আর আশা নাই ছুটোবাবু। কইলকাতায় গ্যালে পরানটা যদিন বাচান যায়—' ঝিনুকের দিকে তাকিয়ে জানতে চায়, 'লগে কেঠা (কে)? বউঠাইন নিকি?'

আফজল হোসেনও ঝিনুককে তার স্ত্রী ভেবেছিল। ঝিনুক তার জীবনের সর্বস্ব, শ্বাসবায়ুর মতো অপরিহার্য। কিন্তু এটা তো ঠিক, তাদের বিয়ে হয়নি। একটি অনাত্মীয়, অবিবাহিত তরুণীকে এক যুবক সঙ্গে নিয়ে চলেছে, দেশজোড়া সন্ত্রাসের আবাহাওয়াতেও তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে, এসব আগে মাথায় আসে নি বিনুর।

বিনু আস্তে আস্তে মাথা নাড়ে, অস্পষ্টভাবে কিছু বলে। এতে যা বোঝার বুঝে নিক হরিন্দ। হরিন্দ আর কিছু জিজ্ঞেস করে না। বলে, 'খাড়ইয়া ক্যান? আপনেরা এইহানে আইসা বসেন।' তারপর কী খেয়াল হতে জিজ্ঞেস করে, 'লগে মালপত্তর কই?'

তাদের সমস্ত কিছু যে খোয়া গেছে, তা জানালে হাজারটা প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। বিনু বলল, 'কিছু আনিনি।'

হরিন্দ তাদের পাটির মোড়ক খুলে একটা পুরনো রং-জ্বলা সুজনি পেতে দিল। সঙ্গে সঙ্গে বিনু আর ঝিনুক বসে পড়ে। সমস্ত রাত না ঘুমিয়ে চোখ জ্বালা করছিল ঝিনুকের। সে বলে, 'আমি বসে থাকতে পারব না। মাথায় ভীষণ যন্ত্রণা হচ্ছে।'

বিনু বলল, 'শুয়ে পড়।'

তক্ষুনি সুজনির ওপর শরীর ছেড়ে দেয় ঝিনুক। সঙ্গে সঙ্গে তার চোখ বুজে আসে।

কিছুক্ষণ কৃশ, রুগ্‌ণ সঙ্গিনীর দিকে তাকিয়ে থাকে বিনু। বুকের ভেতরটা আবেগে মায়ায় উদ্বেল হয়ে ওঠে। পলকা, দুর্বল শরীর ঝিনুকের। পথের যাবতীয় ক্লেশ সয়ে শেষ পর্যন্ত কলকাতায় পৌঁছতে পারবে কি সে?

একসময় মুখ ফিরিয়ে হরিন্দর দিকে তাকায় বিনু। হরিন্দ জিজ্ঞেস করে, 'তারপাশায় কবে আসছেন ছুটোবাবু?'

বিনু বলে, 'এই খানিকক্ষণ আগে। তোমরা কবে এসেছ?'

'দুই দিন পার হইয়া গ্যাছে—'

'দু'দিনে স্টিমারে উঠতে পার নি?'

'ক্যামনে উঠুম! এক ইস্টিমারে চাইর পাচ শ' মানুষ ধরে। সুমখের দিকে তাকাইয়া দ্যাখেন, হাজারে হাজারে বইসা রইছে। তাগো ঠেইলা ইস্টিমারে ওঠন যায়!'

আস্তে আস্তে মাথা নাড়ে বিনু। তারপাশায় পা রাখার পর থেকে এই চিন্তাটাই তার মাথাতেও ভর করে আছে।

হঠাৎ বিনুর মনে পড়ল, হরিন্দদের বাড়ি ফরিদপুরে। সে এতদূরে তারপাশায় এল কী করে? তার তো অন্য দিক দিয়ে কলকাতায় চলে যাবার কথা। এসব জিজ্ঞেস করায় হরিন্দ বলল, তাদের ফরিদপুরে ভীষণ রায়ট চলছে। ভয়ে ক'দিন আগে রাজদিয়ার কাছাকাছি সিরাজদীঘায় এক দূর সম্পর্কের আত্মীয়র বাড়ি চলে এসেছিল। সেখানেও থাকা গেল না।

একটু চুপচাপ।

তারপর হরিন্দ ফের বলে, 'আপনেরা দুইজনে যাইতে আছেন। হ্যামকত্তা কইলকাতায় যাইব না?'

বিনু বলে, 'না। দেশ ছেড়ে দাদু কোথাও যাবেন না।'

হরিন্দ বলে, 'আইজ কইতে আছে দ্যাশ ছাড়ব না। তয় একহান কথা কই, পাকিস্থানে কেও থাকতে পারব না। যেবাকারে আসামে, নাইলে কইলকাতায় চইলা যাইতে হইব।' একটু থেমে বিষণ্ণ মুখে ফের বলে, 'আমাগোও কি বাপ-ঠাউরদার ভিটা ছাইড়া যাওনের ইচ্ছা আছিল? ফরিদপুরে, আমাগো উইহানে কী যে চলতে আছে, ভাবতে পারবেন না। আমার কথাই ধরেন, সাত কানি ধানী জমিন আছিল। দুই বচ্ছর বইরা ধান পাকলে কাইটা লইয়া যাইতে আছে। নিজেগো গাছের ফলপাকড়ে হাত ঠেকানের উপায় নাই। চৌখের সুমুখ দিয়া পাইড়া লইয়া যায়। ঘরে একদানা ধান নাই, তভু ভিটার টানে মুখ গুইজা পইড়া আছিলাম।' গলার স্বর নামিয়ে, অদূরে বসে থাকা যুবতীটিকে দেখিয়ে ভয়ার্ত সুরে বলে

যায়, 'কয়দিন আগে দুফার বেইলে আমার উই মাইয়াটার হাত ধইরা যহন টান দিল, ঠিক কইরা ফেলাইলাম, আর এই দ্যাশে না। কপালে যা হয় হউক, দ্যাশ ছাড়ুম। ·ইলে মাইয়াটারে কুন দিন কাইড়া লইয়া যাইব। হেরপর আইলাম সিরাজদীঘায়। অহন কইলকাতায় পাড়ি দিমু।'

বিনু লক্ষ করল, ভাঙাচোরা বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে হরিন্দকে। মনে হয়, দুঃস্বপ্নের ঘোরে রয়েছে লোকটা। তাকে কী বলবে, ভেবে পায় না সে।

হরিন্দ ফের বলে, 'আমাগো উইদিকে কত মানুষ যে খুন হইছে, কত যুবুতী মাইয়ারে যে জোর কইরা টাইনা লাইয়া গ্যাছে হের ল্যাখাজোখা নাই। এই অবোস্তায় কি থাকন যায়? কাগা বগারে মনে আছে ছুটোবাবু?'

হরিন্দর সঙ্গে হাটে হাটে ঢেঁড়া দিয়ে বেড়াত তার দুই সঙ্গী, অর্থাৎ কাগা আর বগা। কত বার তাদের দেখেছে বিনু। রাজদিয়ায় হেমনাথের বাড়িতে হরিন্দর সঙ্গে দু'একবার ওরাও এসেছে। এই তো সেদিনের কথা। বিনুর স্মৃতিশক্তি এত দুর্বল নয় যে ওদের ভুলে যাবে। বলল, 'নিশ্চয়ই আছে। কী হয়েছে তাদের?'

হরিন্দ জানায়, কাগা বাগা আপন মায়ের পেটের ভাই। ফরিদপুরে হরিন্দর বাড়ির প্রায় লাগোয়া ওদের বাড়ি। দুই ভাইয়ের কিছু জমিজমা ছিল। হরিন্দর মতো ওদেরও পাকা ধান জোর করে কেটে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে দু'বছর ধরে। এবার ওরা রুখে দাঁড়িয়েছিল। কোনও মতেই ধান দেবে না। তার ফলে ওদের কুপিয়ে মারা হয়।

বলতে বলতে অবরুদ্ধ কান্না বুকের ভেতর থেকে ঠেলে বেরিয়ে আসতে থাকে হরিন্দর। ঝাপসা গলায় সে বলে, 'কত কাল আমরা একলগে আছিলাম!'

হরিন্দর কষ্টটা বিনুর মধ্যেও যেন চারিয়ে যায়। কাগা বগা ছিল সরল, ভালমানুষ, কারোর সাতে পাঁচে থাকত না। এমন দু'জনের শোচনীয় মৃত্যু তাকে আমূল নাড়া দিয়ে যায়। বিনু বলে, 'ওদের স্ত্রী আর ছেলেমেয়েরা?'

হরিন্দ বলে 'হগলে জাওনার (জানোয়ার) হইয়া যায় নাই। আমাগো গেরামের শায়েদ মিঞা এট্টা সত্যকারের মানুষ। হে (সে) পরানের ঝুকি লইয়া কাগা বগার বউ আর পোলামাইয়াগো রাইতের আন্ধারে কয়দিন আগে তিপুরার (ত্রিপুরার) বডারে পৌছাইয়া দিয়া আসছে।'

বেলা আরেকটু চড়েছে। সূর্য আরও খানিকটা ওপরে উঠে এসেছে। যতদূর চোখ যায়, পরিষ্কার নীলাকাশ। একোণে ওকোণে দু'এক টুকরো সাদা মেঘ হেমন্তের বাতাসে দোল খেতে খেতে ভেসে চলেছে—মন্থর, লক্ষ্যহীন। অনেক উঁচুতে আকাশের নীল ছুঁয়ে ডানা মেলে স্থির হয়ে আছে আগুনতি শঙ্খচিল। তাদের কোথাও যাবার যেন তাড়া নেই, এমনই গা-এলানো ভঙ্গি। নীচে নদীর জলে রোদ সোনা ঢেলে দিচ্ছে।

বিনু জিজ্ঞেস করল, 'কলকাতায় তো যাচ্ছ। সেখানে তোমাদের আত্মীয়স্বজন কেউ আছে?'

কাগা বগার ভয়াবহ মৃত্যুর খবর দিতে গিয়ে শোকাতুর হয়ে পড়েছিল হরিন্দ। সেই ভাবটা খানিক কাটিয়ে বলল, 'না, কেও নাই।'

'সেখানে গিয়ে কোথায় উঠবে ঠিক করেছ?'

'না। আগে কি কুনোদিন কইলকাতায় গ্যাছি যে হেইহানের হগল জাগা (জায়গা) চিনুম? ফরিদপুর আর ঢাকার জিল'র বাইরে দুই চাইর বার খালি ঢেড়া দেওন আর পূজার ঢাক বাজানের বায়না লইয়া কুমিল্লা আর শিলটে গ্যাছিলাম।'

ফরিদপুর জেলার চৌহদ্দি পেরিয়ে ক্বচিৎ কখনও যার দৌড় জল-বাংলার অন্য কয়েকটা জেলা পর্যন্ত, সে ছেলেমেয়ে বউ নিয়ে কলকাতায় কোথায় গিয়ে মাথা গুঁজবে, কী করে পেটের ভাত জোটাবে, ভাবতেও দিশেহারা বোধ করল বিনু।

হরিন্দ ফের বলে, 'লাখে লাখে মানুষ দ্যাশ ছাইড়া ইন্ডিয়ায় যাইতে আছে গিয়া। হেগো (তাদের) হগলের কি বডারের উই পারে ভাই বন্দু আত্মজন আছে? খবর লইয়া দ্যাখেন, লাখে দশজনেরও নাই।'

হরিন্দ ঠিক কী বোঝাতে চাইছে, বিনু ধরতে পারে না। সে তাকিয়ে থাকে।

pathagar.net

হরিন্দ বলে, 'উই মানুষগুলানের যা হইব, আমাগোও হেয়াই (তা-ই) হইব। ভিটা ছাইড়া যহন আসছি, পিছের দিকে আর তাকামু না। দ্যাশের লগে সম্পক্ক চুইকা (চুকে) গ্যাছে ছুটোবাবু।' একটু থেমে ফের বলল, 'ইন্ডিয়ায় একবার যাইতে পারলে বাইচা থাকনের এট্টা না এট্টা বন্দবস্ত ঠিক হইয়া যাইব।'

লোকটা চূড়ান্ত আশাবাদী। তার ধারণা, সীমান্তের ওপারে একবার পৌঁছতে পারলে সব সমস্যার যাবতীয় সুরাহা হয়ে যাবে। সেখানে রোজগারের একটা ফিকির, মাথা গোঁজার একটুকরো জায়গা নিশ্চয়ই মিলবে। কিন্তু লোকটা পালা-পার্বণে ঢাক বাজানো আর হাটেগঞ্জে ঢেঁড়া দেওয়া ছাড়া অন্য কোনও কাজ শিখেছে বলে জানা নেই বিনুর। অবশ্য তার কয়েক কানি ধান জমি ছিল।

ভারত এক বিশাল দেশ। দু'চার শ' কি পাঁচ দশ হাজার মানুষ যদি পাকিস্তান থেকে সেখানে চলে যায় তাদের কোনও রকম একটা ব্যবস্থা হয়ে যেতে পারে। কিন্তু লক্ষ লক্ষ মানুষের ঢল যেখানে নেমেছে তাদের সবার জন্য কিছু করা, ভারতের মতো একটা বড় দেশের পক্ষেও কতটা সম্ভব, সে সম্বন্ধে বিনু যথেষ্ট সন্দিহান। বিশেষ করে হরিন্দর মতো লেখাপড়া না-জানা মানুষ, পুরুষানুক্রমে যে শুধু ঢাক বাজিয়ে আসছে, ইন্ডিয়ায় গিয়ে সে কী করবে, ছেলেমেয়ে বউ নিয়ে কোথায় থাকবে, কী খাবে, কে জানে। অবশ্য একটা কথা সে ঠিকই বলেছে, সীমান্তের ওপারে গিয়ে অগুনতি ছিন্নমূল মানুষের যা হবে, সেটাই মেনে নেবে সে।

হরিন্দ এবার বলে, 'ইন্ডিয়ায় গিয়া যদিন মরতেও হয়, তাও সই। দিন রাইত বুকের ভিতরে ডর লইয়া এইহানে থাকন যায় না।'

বিনু উত্তর দেয় না।

হরিন্দ কী ভেবে এবার বলে, 'কইলকাতায় গিয়া আপনেরা কই উঠবেন ছুটোবাবু? কিছু ঠিক করছেন?'

বিনু জানায়, ওই শহরে তার বাবা এবং দিদিরা আছে। ওদের সবাইকে চিঠি দেওয়া হয়েছে। জবাব অবশ্য পাওয়া যায়নি। এমনও হতে পারে, চিঠিগুলো ওদের কাছে পৌঁছয়নি। না-ও যদি পৌঁছয়, ঠিকানা জানা আছে। শিয়ালদায় নেমে ঠিক চলে যেতে পারবে।

হরিন্দ বলে, 'আপনের তাইলে কুনো চিন্তা নাই। খালি বডারখান পার হইলেই নিচ্চিন্তি।'

তারপাশা পর্যন্ত আসা গেছে। তার মধ্যে কত কী-ই তো ঘটে গেল। তারপাশা থেকে ইন্ডিয়ার বর্ডার পর্যন্ত কতখানি নিরাপদ, জানা নেই। হয়তো নির্বিঘ্নেই তারা সীমান্তে পৌঁছে যাবে, কিংবা অঘটনও কিছু ঘটতে পারে। যতক্ষণ না বর্ডার পেরিয়ে ওপারে পা রাখছে, উৎকণ্ঠা কাটবে না। তবে একটা আশার কথা, আফজল হোসেনদের মতো মানুষ এখনও রয়েছে। যদি খারাপ কিছু ঘটে, ত্রাণকর্তা হিসেবে তেমন কাউকে কি পাওয়া যাবে না?

অনেকক্ষণ ধরে একটা চাপা কান্নার আওয়াজ কানে আসছিল। একটানা খানিকটা চলার পর সেটা থামে, আবার নতুন করে শুরু হয়।

হরিন্দর সঙ্গে কথা বলতে বলতে আগে ততটা খেয়াল করেনি বিনু। এবার শব্দের উৎসটা খুঁজতে লাগল সে। নদীপাড়ের নাবাল জমিতে, খানিকটা দূরে, মধ্যবয়সী একটা লোক স্ত্রী এবং চার পাঁচটি ছেলেমেয়ে নিয়ে বসে আছে। শুষ্ক, দড়ি-পাকানো চেহারা লোকটার। পরনে খাটো ময়লা ধুতি আর আধছেঁড়া নিমা। মেয়েগুলোর গায়ে সস্তা, রং-জ্বলা, নোংরা ফ্রক বা শাড়ি। ছেলেরা পরেছে পুরনো হাফপ্যান্ট আর জামা। এই স্টিমারঘাটে দেশ ছেড়ে চলে যাওয়া মানুষগুলোর সকলেই ভয়ার্ত, উৎকণ্ঠিত। কিন্তু ওই পরিবারটার আতঙ্কের যেন সীমাপরিসীমা নেই।

আধবুড়ো লোকটার স্ত্রীর কপাল পর্যন্ত ঘোমটায় ঢাকা। মুখে শাড়ির আঁচল গোঁজা, শীর্ণ গাল বেয়ে অবিরল জল ঝরছে। সমানে কাঁদছে সে। মুখে কাপড় ঠেসে ধরে রাখায় শব্দটা ক্ষীণ হয়ে বেরিয়ে আসছে।

বিনু একদৃষ্টে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে। তারপর হরিন্দর দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করে, 'কী হয়েছে? অত কাঁদছে কেন?'

হরিন্দ বিনুর কানের কাছে মুখ এনে বিমর্ষ সুরে বলে, 'অগো (ওদের) সব্বনাশ হইয়া গ্যাছে।'

বিনু চমকে ওঠে, 'কিরকম?'

'আমরা ইস্টিমারঘাটায় আসনের আগে অরা এইহানে আসছে। তহন থিকাই মাইয়ামানুষটা কান্‌তে আছে (কাঁদছে)।'

'তুমি ওদের চেনো নাকি?'

'না। এইহানেই পেরথম দেখলাম। শুনাশুন যা কানে আইছে, আপনেরে কই।'

খুব নীচু গলায় হরিন্দ বলে যায়। যে মেয়েমানুষটি কাঁদছে তার স্বামীর নাম হরিদাস সাহা। ওদের বাড়ি নয়া চিকন্দি গ্রামে। দেশভাগের আগে এবং পরেও ওদের ওই এলাকাটা ছিল বেশ শান্ত। আবহমান কাল যেভাবে চলছিল, হুবহু সেইভাবেই দিন কেটে যাচ্ছিল। কোনও রকম বিঘ্ন দেখা দেয়নি। পাকিস্তানের আর যেখানে যা-ই ঘটুক, নয়া চিকন্দি ছিল শান্তির দ্বীপ। বাইরের আঁচ সেখানে এসে ভেঙে পড়ে নি।

কিন্তু কিছুদিন হল, হরিদাসদের এলাকাটা হঠাৎ তেতে উঠতে শুরু করেছে। উস্কানিটা কারা দিচ্ছিল, টের পাওয়া যায়নি। তবে স্থানীয় মানুষজনের একটা অংশের মুখচোখের চেহারা যাচ্ছিল বদলে। কুমোরদের কামারদের যুগীদের বামুনদের কায়েতদের জমিজেরাত, হালহালুটি, বাড়িঘর, বাগানপুকুরের দিকে তাদের নজর এসে পড়তে লাগল। আরম্ভ হল শাসানি— দেশ ছেড়ে চলে যাও।

হরিদাস সাহা হরিন্দর মতোই ইন্ডিয়ায় কখনও যায়নি। সেখানে গিয়ে কী খাবে, কিভাবে তাদের দিন চলবে, ভেবে পাচ্ছিল না। হুমকি সত্ত্বেও ঘাড় গুঁজে তারা গ্রামে পড়ে ছিল। কিন্তু পরশু মাঝরাতে মারাত্মক ঘটনা ঘটে যায়। মুখে কাপড় বেঁধে পাঁচ সাতজনের একটা দল ঘরের দরজা ভেঙে হরিদাসের যুবতী মেয়েকে তুলে নিয়ে যায়। সশস্ত্র হানাদারদের ঠেকাতে পারেনি সে। তারপর ভোর হতে না হতে গ্রামের মাতব্বরদের বাড়ি গিয়ে সবার হাতে পায়ে ধরেছে। কিন্তু সুরাহা হয়নি। মাতব্বরদের অনেকেই তাকে সহানুভূতি জানিয়েছে, কেউ কেউ যথেষ্ট ঝুঁকি নিয়ে আন্তরিকভাবে মেয়েটাকে খুঁজে বার করতে চেষ্টা করেছে। কিন্তু তাকে উদ্ধার করা যায়নি।

ভেতরে ভেতরে ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছিল হরিদাস। সেই অবস্থাতেই স্থির করে ফেলেছে, এদেশে আর নয়। যা হবার হবে, সীমান্তের ওপারেই চলে যাবে তারা। বাক্সপেঁটরা, হাঁড়িকুড়ি, জামাকাপড়, যে যেটুকু পেরেছে কাঁখে আর মাথায় করে ছেলেমেয়ে বউয়ের হাত ধরে হাঁটতে হাঁটতে তারপাশায় চলে এসেছে।

বুকের মধ্যে চাপা কষ্ট অনুভব করছিল বিনু। মনে হচ্ছিল, হৃৎপিণ্ড ফেটে চৌচির হয়ে যাবে।

ফের চারপাশ দেখে নিয়ে শ্বাস-চাপা গলায় হরিন্দ বলে, 'ছুটোবাবু, ইস্টিমারঘাটায় অ্যাত মানুষ যে দেখতে আছেন, তাগো কেওর কেওর (কারোর কারোর) যুবুতী বউ কি মাইয়া উঠাইয়া লইয়া গ্যাছে। হরিদাস সাহার বউয়ের লাখান দুই চাইরজন মুখে আচল গুইজা কান্দে, বাদবাকি হগলে এক্কেরে পাথর। বউ-মাইয়া খুয়াইয়া কী যন্তরণা নিয়া যে দ্যাশ ছাইড়া যাইতে আছে! মরণকাল তরি (পর্যন্ত) এই দুঃখু অগো ঘুচব না।'

কী উত্তর দেবে বিনু? সে চুপ করে থাকে।

হরিন্দ কিছু ভেবে আবার শুরু করে, 'ছুটোবাবু, আর কয়দিন যদিন গেরামে থাকতাম, আমার কপালেও অ্যামনটা যে ঘটত না, ক্যাঠা (কে) জানে। ঠিক সোময়ে রাধাগোবিন্দ আমারে দ্যাশ ছাড়নের সুবুদ্ধি দিছে।'

বেলা ক্রমশ চড়ছিল। সকালে হাওয়ায় যে ভেজা, ঠাণ্ডা ভাবটা ছিল, এখন আর তা নেই। রোদের তাপ বাড়ায় বাতাস বেশ শুকনো, ঝরঝরে।

নৌকোঘাটে ভিটেছাড়া মানুষ বোঝাই করে একের পর এক নৌকো আসছিলই। বেলা চড়ার সঙ্গে সঙ্গে নৌকোর সংখ্যা ক্রমশ বেড়ে চলেছে। নদীর মাঝখান দিয়ে রংবেরঙের পাল তুলে বড় বড় মহাজনী ভড় মন্থর গতিতে ভেসে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে দু'একটা লঞ্চ কি 'গয়নার নাও' হেমন্তের শান্ত জলস্রোতে তুফান তুলে কোথায় চলেছে, কে জানে।

নদীতে সেই একই একঘেয়ে ছবি। অফুরান জলরাশি, নৌকো, দু'চারটে লঞ্চ। মাথার ওপর পাখির ঝাঁক, স্বচ্ছ নীলাকাশ, কয়েক টুকরো ধবধবে ভেবঘুরে মেঘ।

pathagar.net

ডাঙাতেও সেই একই দৃশ্য, সকালে তারপাশায় এসে ঠিক যেমনটি দেখেছিল। উঁচু মাটির রাস্তা ধরে মানুষ আসছেই, আসছেই। বিরামহীন।

কিন্তু কাল নারায়ণগঞ্জ থেকে যে স্টিমার ছাড়ার কথা ছিল, আজ এখনও সেটার দেখা নেই। কখন আসবে, কবে আসবে, কেউ জানে না।

সূর্য যখন সোজাসুজি মাথার ওপর চলে এসেছে, বিনু উঠে পড়ল। ডান পাশে খানিক দূরে, কাতার দিয়ে ভাতের হোটেল। আফজল হোসেন সকালে দই চিঁড়ে টিড়ে খাইয়ে গিয়েছিল। তারপরও অনেকটা সময় কেটে গেছে। এ অঞ্চলের মানুষের ভাতের নাড়ি। দুপুরে পেটে দু'টি ভাত না পড়লেই নয়। আফজল হোসেন ঠিকই বলেছিল, ভরপেট ভাত না খেলে রাস্তার ধকল সইবার মতো শক্তি থাকবে না।

হরিন্দর পেতে-দেওয়া সুজনির ওপর কখন ঝিনুক ঘুমিয়ে পড়েছিল, বিনু লক্ষ করেনি। সে হরিন্দকে বলল, 'তুমি এর দিকে নজর রেখো। আমি একটু ঘুরে আসছি।' বলে ঝিনুককে দেখিয়ে দিল।

হরিন্দ বলে, 'আপনে নিচ্চিন্ত মনে যান ছুটোবাবু। বউঠাইনরে আমি দেখুম।'

ঢালু ঘাসের জমি থেকে উঁচু রাস্তায় উঠেই ফের নীচে নেমে আসে বিনু। হরিন্দদের খাওয়ার কী ব্যবস্থা হয়েছে তার জানা নেই। তারা পাশে বসে হোটেলের ভাত-তরকারি খাবে, আর ওরা খালি পেটে মুখ শুকনো করে থাকবে, তা হয় না।

বিনু জিজ্ঞেস করে, 'দুপুরে তোমরা কী খাবে?'

হরিন্দ জানায়, 'আমাগো লগে দুই দিনের মতো চিড়ামুড়ি, মুছি গুড় আর কদমা আছে। হেয়াই খামু।'

'চিঁড়ে গুড় থাক। আমি হোটেলে ভাত আনতে যাচ্ছি। তোমরা আমাদের সঙ্গে ভাত খাবে।'

'আমাগো লেইগা আবার অ্যাতগুলান পয়সা খরচা করবেন!'

বিনু একটু হাসল।

হরিন্দ কী ভেবে এবার বলে, 'আইচ্ছা, খাওয়াইতে যহন মন অইছে তহন খাওয়ান। কবে আবার প্যাটে দু'গা ভাত পড়ব হের (তার) তো দিশা নাই। আপনে অ্যাত মাইনষের ভাত ক্যামনে আনবেন? লন (চলুন), আমিও লগে যাই—'

ঝিনুকের দেখাশোনার দায়িত্ব নিজের স্ত্রী আর ছেলেমেয়েদের ওপর দিয়ে বিনুর সঙ্গে রাস্তায় উঠে আসে হরিন্দ।

চারপাশে ভয়কাতর মানুষের জটলা। তার ভেতর দিয়ে দু'জনে এগিয়ে চলে। যেখানে হোটেলগুলো সারিবদ্ধ দাঁড়িয়ে আছে, কাঁচা সড়কটা সেই জায়গায় বাঁক নিয়ে ডান পাশে ঘুরে অনেক দূর চলে গেছে।

বেশ কিছু হিন্দু হোটেল এখনও টিকে আছে এখানে। সেগুলোর কাছাকাছি মুসলমানদের ক'টা হোটেলও চোখে পড়ল।

বিনুরা একটা হোটেলে ঢুকতে যাবে, হঠাৎ ডান দিকের সড়কে হইচই শোনা গেল। বহু মানুষের মিশ্র কণ্ঠস্বর। আওয়াজটা স্টিমারঘাটের দিকে এগিয়ে আসছে।

যদিও এখানে পুলিশ মোতায়েন রয়েছে, গভর্নমেন্ট থেকে মোটামুটি সুরক্ষার একটা বন্দোবস্তও করেছে, তবু আবহাওয়া এমনই বিষময়, যে কোনও দিন, যে কোনও সময় চরম কিছু ঘটে যেতে পারে। হয়তো স্টিমারঘাটের পাহারাদারি ফুৎকারে উড়ে যাবে। এতগুলো নির্ভুম মানুষের ওপর যদি থানাদারেরা ঝাঁপিয়েই পড়ে, পুলিশ তাদের কতটা ঠেকাতে চেষ্টা করবে, সে সম্বন্ধে সংশয় আছে।

হোটেলে ঢোকা হল না, উৎকণ্ঠিত বিনু এবং হরিন্দ ডান পাশের সড়কের দিকে তাকিয়ে রইল। দেখা গেল, অনেকগুলো লোক লম্বা লম্বা পা ফেলে এদিকে আসছে। তাদের কারোর হাতে লাঠি, কারোর হাতের সড়কির ফলায় দুপুরের রোদ ঝলকাচ্ছে।

ভয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল হরিন্দ। কাঁপা কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করল, 'এই লোকগুলানের কী মতলব ছুটোবাবু? কিছু বিপদ হইব?'

রুদ্ধশ্বাসে বিনু বলল, 'কী জানি, বুঝতে পারছি না।'

'আমরা শ্যাষ। আর বুঝিন ইন্ডিয়ায় যাওন হইল না।'

হোটেলের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ছিল বিনুরা। ভেতরে কাঁচা মেঝেতে কাঠের পিঁড়িতে বসে অনেকে খাচ্ছে। একধারে নীচু তক্তপোশে টিনের ক্যাশবাক্স কোলের কাছে নিয়ে বসে আছে মাঝবয়সী থলথলে চেহারার একটা লোক। খুব সম্ভব হোটেলের মালিক। বিনুদের কথাগুলো তার কানে গিয়েছিল। সে বলল, 'ডরের কিছু নাই। গরমেন (গভর্নমেন্ট) ইস্টিমারঘাটায় ঝঞ্ঝট করতে দিব না। পুলিশ আছে।'

হরিন্দ বলল, 'মেলা (অনেক) মানুষ লাঠি সড়কি লইয়া এই দিকে আসতে আছে।'

হোটেলের মালিক বাইরে বেরিয়ে আসে। দূরের সশস্ত্র লোকগুলোকে দেখতে দেখতে তার কপালে ভাঁজ পড়ে। বলে, 'দ্যাশভাগের আগে বড় দাঙ্গার সোময় এইহানে কিছু হয় নাই, পরেও না। অরা সড়কি উড়কি লইয়া আসতে আছে ক্যান, গতিক বুইঝা লই।' একদৃষ্টে সে তাকিয়ে থাকে।

ডান ধারের যে সড়কটা ধরে বাহিনীটা আসছে, তার দু'ধারেও ভিটেমাটি খোয়ানো প্রচুর মানুষ স্টিমার ধরার জন্য অপেক্ষা করে আছে। সড়কের অনেকটা নীচে এখানে ধানখেত। অস্ত্রধারীদের দেখে ভয়ে আতঙ্কে তাদের অনেকে ঊর্ধ্বশ্বাসে ধানখেতের দিকে দৌড়ে যায়। কেউ কেউ দিশেহারার মতো এধারে ওধারে ছোটাছুটি করতে থাকে।

সশস্ত্র দলটা অনেক কাছাকাছি এসে পড়েছে। এখন তাদের আরও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। সড়কের এক পাশে দশ বারটি মুসলমান যুবকের একটা সারি, আরেক পাশেও তা-ই। এদের তিন চারজনের হাতে অস্ত্র তো আছেই, তা ছাড়া কাঁধে এবং মাথায় রয়েছে প্রচুর লটবহর।

যুবকদের দুই সারির মাঝখানে সত্তর বাহাত্তর বছরের একজন বৃদ্ধ। পরনে ধুতি আর পাঞ্জাবি। তাঁর সঙ্গে একজন বৃদ্ধা। মহিলার একটা চুলও কাঁচা নেই, সিঁথিতে চওড়া করে সিঁদুর লেপা, হাতে শাঁখা এবং রুপো-বাঁধানো লোহা। এঁরা ছাড়াও রয়েছে একটি মাঝবয়সী থান-পরা বিধবা এবং দু'টি অবিবাহিত তরুণী। সবারই হাতে-পায়ে-মুখে-মাথায় পুরু ধুলোর স্তর। বোঝা যায়, বহু দূর থেকে তারা হেঁটে আসছে।

এত বড় দলটার একেবারে সামনে একজন প্রৌঢ় মুসলমান। তাঁর দিকে তাকালে রীতিমতো সম্ভ্রম হয়। টকটকে ফর্সা রং, ধারাল নাক, একজোড়া উজ্জ্বল চোখ, চওড়া কপাল, মুখে কাঁচাপাকা দাড়ি। অভয় দেবার ভঙ্গিতে হাত তুলে যে সন্ত্রস্ত মানুষগুলো এদিকে সেদিকে ছোটাছুটি করছিল তাদের উদ্দেশে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে সমানে বলে যাচ্ছেন, 'ডরাইয়েন না, ডরাইয়েন না। আমরা খুনখারাপি লুটপাট করতে আসি নাই। যে যেইখানে আছিলেন সেইখানে ফিরা আসেন। পলাইয়েন না।'

যারা পালাচ্ছিল তারা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। কিছুক্ষণ প্রৌঢ় মুসলমান এবং তাঁর সঙ্গীদের লক্ষ করে যখন বুঝতে পারে ওঁদের দিক থেকে ক্ষতির সম্ভাবনা নেই, পায়ে পায়ে ফিরে আসতে থাকে।

সশস্ত্র দলটাকে দেখে বিনুর চোখেমুখে যে আতঙ্ক ফুটে বেরিয়েছিল, এখন সেটা বদলে গিয়ে শুধুই অপার বিস্ময়। সে আন্দাজ করে নিল, প্রৌঢ়টি কয়েকজন যুবককে নিয়ে পাহারা দিয়ে দিয়ে একটি হিন্দু পরিবারকে তারপাশায় নিয়ে এসেছে।

পাশ থেকে হোটেলের মালিক বলে ওঠে, 'কইছিলাম না, তরাসের কিছু নাই। আমাগো তারপাশায় কুনো গণ্ডগোল হয় না।' বলে ব্যস্তভাবে হোটেলের ভেতর ঢুকে গেল। লোকজন খেতে বসে গেছে। এখন তার দাঁড়িয়ে থাকার সময় নেই।

প্রৌঢ় মুসলমানটি চারদিক লক্ষ করতে লাগলেন। কোথাও এতটুকু ফাঁক নেই। সর্বত্র ঠাসা মানুষ। তিনি সঙ্গীদের নিয়ে বাঁ পাশে ঘুরে নৌকোঘাটের দিকে চলে গেলেন।

হরিন্দও কম অবাক হয়নি। সে কানের কাছে মুখ এনে ফিস ফিস করল, 'আমরা ডরে মরতে আছিলাম। কী ভাবছিলাম, আর কী দেখলাম! হগল মানুষ মোন্দ হইয়া যায় নাই।'

বিনু উত্তর দিল না। হোটেলে ঢুকে ভাত ডাল তরকারি মাছের পাতুরি কিনে হরিন্দ আর সে নৌকোঘাটের কাছাকাছি তাদের সেই জায়গাটায় ফিরে এল। হোটেলের লোকেরা সিলভারের নানা

পাত্রে খাদ্যবস্তুগুলো গুছিয়ে গাছিয়ে দিয়েছে। সঙ্গে দিয়েছে কলাপাতা আর মাটির গেলাস, একটা খাবার জলের কলসিও। খাওয়াদাওয়া চুকলে পাত্রগুলো নদীর জলে ধুয়ে পাখলে হোটেলে ফেরত দিয়ে যেতে হবে।

ফিরে এসে বিনু দেখতে পেল, ঝিনুক হরিন্দদের সুজনির ওপর বসে উদ্‌ভ্রান্তের মতো তাকিয়ে তাকিয়ে চতুর্দিকে কী খুঁজছে। ওর মুখচোখ দেখে টের পাওয়া যায়, সবেমাত্র ঘুম ভেঙেছে। জেগে উঠে বিনুকে দেখতে না পেয়ে ভীষণ ভয় পেয়ে গেছে।

ঝিনুক দম-আটকানো গলায় বলল, 'কোথায় গিয়েছিলে তুমি? কোথায়?' বলতে বলতে কেঁদে ফেলল।

হাতের পাত্রগুলো নামিয়ে রেখে বিনু ঝিনুকের পাশে বসে পড়ে। বলে, 'হোটেলে। দুপুরে খেতে হবে তো—'

সেই ঢাকা থেকে ফেরার পর সারাক্ষণ ত্রস্ত হয়ে থাকে ঝিনুক। কী এক আতঙ্ক যেন তাকে দিনরাত তাড়া করে চলেছে।

ঝিনুকের চোখ থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় জল ঝরে যাচ্ছে। কান্না-জড়ানো ঝাপসা গলায় সে বলে, 'আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাওনি কেন?'

'তুমি ঘুমোচ্ছিলে।'

'ডাকতে পার নি?'

'ঘুম ভাঙালে তোমার শরীর খারাপ হত। তাই—'

'হলে হত।' অবুঝ বালিকার মতো মাথা ঝাঁকাতে থাকে ঝিনুক, 'তুমি আমাকে ফেলে কক্ষনো আর কোথাও যাবে না।'

ঝিনুকের মাথায় হাত বুলিয়ে তাকে শান্ত করতে করতে বিনু বলে, 'ঠিক আছে, যাব না।'

কান্নার বেগ কমে আসে ঝিনুকের। হাতের পিঠে চোখ মুছে সে বলে, 'কী ভয় যে পেয়েছিলাম! ওই দেখ—' বলে ডান ধারে আঙুল বাড়িয়ে দেয়।

বিনু আগে লক্ষ করেনি। এবার চোখে পড়ল, খানিক দূরে সেই প্রৌঢ় মুসলমানটি এবং তাঁর সঙ্গীরা বসে আছে। বৃদ্ধ, বৃদ্ধা, দুই তরুণী আর বিধবাটিকেও দেখা গেল। ওদের পাশে স্তূপাকার মালপত্র। অর্থাৎ অন্য কোথাও ফাঁকা জায়গা না পেয়ে ওরা এখানে চলে এসেছে।

প্রৌঢ় মুসলমানটি অবশ্য চুপচাপ বসে নেই। আশেপাশে যারা আগে থেকে এসে বসে ছিল তাদের কী সব জিজ্ঞেস করছে। খানিকটা দূরে থাকায় বিনুরা অবশ্য কথাগুলো শুনতে পাচ্ছে না।

ঝিনুকের ভীতির কারণটা এবার স্পষ্ট হয়ে যায়। লাঠি সড়কি দেখে প্রচণ্ড ঘাবড়ে গেছে সে। ঢাকার অভিজ্ঞতা তার স্মৃতি থেকে কোনও দিনই মুছে যাবার নয়। বিনু বলল, 'ভয় পেও না, ওরা লোক ভাল।'

ঝিনুক বলে, 'তুমি কেমন করে জানলে?'

লোকগুলো সম্পর্কে কেন তার এমন ধারণা হয়েছে, বুঝিয়ে দেয় বিনু।

ঝিনুক আর কোনও প্রশ্ন করে না।

কথা বলতে বলতে হঠাৎ প্রৌঢ় মুসলমানটির নজর এসে পড়ে বিনুর ওপর। কী ভেবে তিনি উঠে আসেন। বলেন, 'আদাব। আমার নাম নাসের আলি।'

বিনু টের পেল, ঝিনুক তার কোমরের কাছটা প্রাণপণে খামচে ধরেছে। সে যতই নাসের আলিকে ভালমানুষ বলে তাঁর গুণগান করুক, ঝিনুকের সংশয় কাটছে না। লোকটা তাদের কাছে চলে আসায় সে ভীষণ অস্বস্তি বোধ করছে।

বিনু হাতজোড় করে নিজের নাম জানিয়ে উৎসুক চোখে তাকিয়ে থাকে।

নাসের আলি বলেন, 'আমি জামতলি হাই স্কুলের অ্যাসিস্টান্ট হেডমাস্টার। আপনেগো বাড়ি আছিল কই?'

বিনু বলল। জামতলি নামটা তার জানা, তবে সেটা কোথায় সে সম্বন্ধে তার পরিষ্কার ধারণা নেই।

pathagar.net

নাসের আলি বলেন, 'দ্যাশ ছাইড়া চইলা যাইতে আছেন?'

'হ্যাঁ।' আস্তে মাথা নাড়ে বিনু।

'দেইখা মনে হয়, আপনে একজন এডুকেটেড ইয়ং ম্যান। দয়া কইরা একটা উপকার করবেন?'

'কী উপকার?'

দূরে বৃদ্ধকে দেখিয়ে নাসের আলি বলেন, 'ওনার নাম রামরতন গাঙ্গুলি। এক কালে জামতলি হাই স্কুলের হেডমাস্টার আছিলেন। আমি ওনার ছাত্র। ঢাকা ইউনিভার্সিটির এম. এ'তে ফার্স্ট ক্লাস। হেই ব্রিটিশ আমলে ইচ্ছা করলে বড় অফিসার হইতে পারতেন। হন নাই।'

নাসের আলি বিস্তারিতভাবে আরও জানান, পঁয়তাল্লিশ বছর আগে ইউনিভার্সিটির শেষ ডিগ্রিটা পাওয়ার পর গ্রামে এসে থিতু হয়ে বসলেন রামরতন। জামতলি অঞ্চলে সে আমলে লেখাপড়া নিয়ে কেউ তেমন মাথা ঘামাত না। জায়গাটা ছিল অশিক্ষা আর কুশিক্ষার বিশাল আড়ত। রামরতন বিপুল উদ্যমে মানুষ গড়ার কাজে নামলেন। জামতলি এবং তার চারপাশের দশ বারটা গ্রামের প্রতিটি হিন্দু আর মুসলমানের বাড়ি বাড়ি ঘুরে তিনি ছাত্র জোগাড় করতে লাগলেন। রামরতনের তুলনা নেই। মানুষ এবং শিক্ষক হিসেবে তিনি সৎ, নির্লোভ, নিষ্ঠাবান। জামতলি এলাকায় তাঁর হাত ধরেই শিক্ষার আলো ঘরে ঘরে পৌঁছে গেছে। এখন ওখানকার প্রতি দশটা পরিবারে কম করে একজন গ্র্যাজুয়েট, প্রতি বিশটা পরিবারে একজন এম. এ।

শুনতে শুনতে রাজদিয়ার আশু দত্তর কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল বিনুর। হুবহু তাঁরই মতো একই ছাঁচে গড়া। নিজের কেরিয়ার, উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ, সব কিছু বিসর্জন দিয়ে জাতি গঠনের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন আশু দত্ত। সেই সময় এই ধরনের আদর্শবাদীদের পূর্ব বাংলার প্রায় সব অঞ্চলেই দেখা যেত।

নাসের আলি থামেননি, 'এই মানুষটারে আমাগো মাথায় কইরা রাখনের কথা। কিন্তুক দিনকাল আর আগের মতো নাই। কিছু মানুষ জানোয়ার হইয়া গ্যাছে। যারে বাপের মতো সম্মান দেওনের কথা, তারই সর্বনাশ করতে চায়। দ্যাশভাগের আগে থিকাই আমাগো জামতলি এরিয়াটা গরম হইয়া আছে। তবু আমরা অনেকেই রামরতন স্যারের ফ্যামিলি আগলইয়া রাখছিলাম। কিন্তু আর পারা যাইব না। ওনার ঘরে দুই অবিয়াত (অবিবাহিত) জুয়ান (যুবতী) মাইয়া। কুন দিন কী অঘটন ঘইটা যাইব। হেই লেইগা কয়জন ভাল সাহসী পোলা জুটাইয়া পাহারা দিয়া দিয়া তারপাশায় লইয়া আসছি। পথেও তো ভরসা নাই। কার মনে কী কুমতলব আছে, কে জানে। জুয়ান মাইয়া দেইখা কে কী কইরা বসব, হেইর লেইগা পাহারাদারির বন্দোবস্ত।'

বিনু জিজ্ঞেস করল, 'আমাকে কী করতে হবে বলুন—'

নাসের আলি জানালেন, তারপাশার স্টিমারঘাটে দেশ ছাড়ার জন্য যারা জড়ো হয়েছে তারা খুবই সামান্য মানুষ। অক্ষরপরিচয়হীন, অসীম ত্রাসে সবাই কুঁকড়ে আছে। নিজেদের নিয়ে তারা এতই উৎকণ্ঠিত যে অন্য কোনও দিকে তাকাবার সময় নেই। এদের কেউ কখনও কলকাতায় যায়নি। তাদের কারোর ভরসায় রামরতনকে সীমান্তের ওপারে পাঠাতে সাহস হয় না। বিনুকে দেখে মনে হয়েছে—শিক্ষিত, ভদ্র যুবক। সে তো কলকাতায় যাচ্ছেই, কষ্ট করে পৌঁছে যদি রামরতনদের একটু দেখাশোনা করে, নাসের আলি নিশ্চিন্ত হতে পারেন। তাঁরই উচিত ছিল শ্রদ্ধেয় মাস্টারমশাই এবং তাঁর পরিবারকে কলকাতায় পৌঁছে দিয়ে আসা। ওই মানুষটার প্রতি তাঁর ঋণের শেষ নেই। কিন্তু দিনকাল খারাপ, বিষবাষ্পে আবহাওয়া ছেয়ে গেছে। সীমান্তের ওপারে কী ঘটছে, তাঁর জানা নেই। কলকাতায় গেলে ফিরে আসা সম্ভব হবে কিনা, কে জানে। প্রতিহিংসা নেবার জন্য সেখানেও মানুষ হয়তো অস্ত্র শানিয়ে অপেক্ষা করছে।

নাসের আলি বিনুর হাত জড়িয়ে ধরে বললেন, 'না কইবেন না।' তাঁর গলার স্বরে অনুনয়।

বিনু একবার ঝিনুককে দেখে নিল। এই রুগ্‌ণ, লাঞ্ছিত, সদাত্রস্ত তরুণীটি তো রয়েছেই, তার ওপর রামরতনদের দায়িত্ব। ওঁদের সঙ্গে আবার দু'টি পূর্ণ যুবতী। এই দুঃসময়ে, ওই বয়সের মেয়েদের নিয়ে সীমান্ত পর্যন্ত পাওয়া যে কতখানি বিপজ্জনক, সে জানে। কিন্তু নাসের আলির মুখের ওপর সোজাসুজি না বলা গেল না।

বিনু বলল, 'রাস্তায় বিপদ ঘটতে পারে, ই বুঝে আপনি নিজেই লোকজন সঙ্গে করে পাহারা দিতে দিতে স্টিমারঘাটে এসেছেন। আমাগে ওঁদের নিয়ে যেতে হবে গোয়ালন্দ, সেখান থেকে কলকাতা। বুড়ো মানুষদের নিয়ে ততটা ভয় নেই। কিন্তু মাস্টারমশাইয়ের কম বয়েসের দুই মেয়ে রয়েছে।' ঝিনুককে দেখিয়ে বলে, 'আমার সঙ্গে এও চলেছে। পথে যদি হামলা হয়, আমি কী করে ঠেকাব?'

নাসের আলি বলেন, 'হ, ঠিকই কইছেন।'

'দেশ ছেড়ে যে হাজার হাজার মানুষ চলেছে তারাও সঙ্গে থাকবে। কিন্তু তাদের কেউ বাধা দেওয়া দূরের কথা, একটা আঙুলও তুলবে না।'

'জানি। মানুষের মনে এখন বড় ডর।'

অনেকক্ষণ ম্রিয়মাণ বসে থাকেন নাসের আলি। রামরতনের দুই যুবতী মেয়ের সম্ভাব্য বিপদের কথা ভেবে হয়তো ভেতরে ভেতরে বিচলিত হয়ে পড়েন। তারপর খানিকটা হতাশার সুরে বলেন, 'কিছু যদি হয়ই, হেইটা ওনাগো বরাত।' তারপাশা পর্যন্ত তিনি ঝুঁকি নিয়ে পৌঁছে দিয়েছেন। এরপর ভাগ্যের হাতে রামরতনদের সঁপে দেওয়া ছাড়া আর কোনও উপায় নেই।

বিনু বলে, 'আরেকটা কথা—'

'কন—'

'ধরুন, কলকাতা পর্যন্ত আমরা পৌঁছতে পারলাম। তারপর মাস্টারমশাইদের কী হবে?'

নাসের আলি বলেন, 'ওনার এক ভাইস্তা (ভাইপো) বিমল গাঙ্গুলি কইলকাতায় থাকে। হেরে চিঠি লেইখা জানান হইছে, মাস্টারমশাইরা যাইতে আছেন।'

বিনুর মনে পড়ে যায়, সেও তার দুই দিদি এবং বাবাকে চিঠি লিখে তাদের কলকাতায় যাবার কথা জানিয়েছে। কিন্তু উত্তর আসেনি। জিজ্ঞেস করল, 'মাস্টারমশাই কি তাঁর ভাইপোর জবাব পেয়েছেন?'

আস্তে আস্তে মাথা নাড়েন নাসের আলি, 'না। আইজ কাইল পোস্টাল ডিপার্টমেন্টে গণ্ডগোল চলতে আছে। ইণ্ডিয়া থিকা ঠিকমতো চিঠি আসে না। এইপার থিকা উই পারে যায় কিনা, হেও জানি না।'

রামরতন গাঙ্গুলির ব্যাপারটা অনেকখানি অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। তাঁর ভাইপো চিঠি না পেলে কী হবে? ওঁদের কি তার ঠিকানায় বিনুকেই পৌঁছে দিয়ে আসতে হবে? সে বলে, 'মাস্টারমশাইয়ের ভাইপো চিঠি না পেয়ে থাকলে তো শিয়ালদা স্টেশনে আসবে না।'

'কী কইরা আসব? জ্যাঠার যাওনের খবর জানব ক্যামনে?'

'মাস্টারমশাই কি কলকাতার রাস্তাঘাট চেনেন? ভাইপো না এলে শিয়ালদা থেকে তার বাড়ি চলে যেতে পারবেন?'

'কইলকাতা তেনার একেবারে অচিনা না। যদ্দুর জানি, অনেক কাল আগে বার দুই ওইখানে গ্যাছিলেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ যেইবার মারা যান সেইবার। আরেক বার গ্যাছিলেন ওনার বন্ধু জামতলির সেকেন্দর আলি সাহেবরে লইয়া ডাক্তার বিধান রায়েরে দেখাইতে। সেকেন্দর সাহেব রোগে রোগে মরতে বসছিলেন। বিধান ডাক্তার তেনারে বাচাইয়া দিছিলেন।'

একটা দুশ্চিন্তা মোটামুটি লাঘব হল বিনুর। শিয়ালদায় পৌঁছতে পারলে রামরতনরা ভাইপোর বাড়ি চলে যেতে পারবেন।

নাসের আলি বলল, 'আমি এখন যাই। যে পোলাগুলা মাস্টারমশাইগো পাহারা দিয়া আনছে তাগো হোটেলে খাওয়াইয়া বাড়িতে পাঠাইতে হইব।'

কী ভেবে বিনু জিজ্ঞেস করল, 'আপনি ফিরে যাবেন না?'

'না। যতক্ষণ না মাস্টারমশাইরা স্টিমারে উঠতে আছেন, আমি এইখানেই থাইকা যামু।'

গোয়ালন্দের স্টিমার আজ আসবে কিনা, সারোর জানা নাই। রামরতনদের স্টিমারে তুলে না দেওয়া পর্যন্ত তারপাশা ছেড়ে যাবেন না নাসের আলি। দু'চার দিন এখানে যদি থেকেও যেতে হয়, থাকবেন।

বিনু আর কোনও প্রশ্ন করল না। **নাসের আলিও আর** বসলেন না. রামরতনদের কাছে ফিরে গেলেন।

জামাকাপড়া, বিছানাপত্র, সবই খোয়া গেছে। হরিন্দ একখানা সুজনি পেতে দিয়েছিল, তাই তারা বসতে পেরেছে। কিন্তু সামনে লম্বা পাড়ি। ঠাণ্ডাটা প্রতিদিনই বেড়ে চলেছে। সূর্য ডোবার আগেই কুয়াশায় চরাচর ঢেকে যায়। সীমান্তের ওপারে পৌঁছবার জন্য আকণ্ঠ উদ্বেগ তো রয়েছেই, শীতের সঙ্গেও যোঝাযুঝিটা কম নয়।

দুপুরে খাওয়াদাওয়া চুকিয়ে কাপড়ের দোকান থেকে দু'খানা মোটা সুতির চাদর কিনে এনেছিল বিনু। তারই একটা গায়ে জড়িয়ে শুয়ে আছে ঝিনুক।

এখন বিকেল। সূর্য আকাশের গা বেয়ে পশ্চিমে অনেকখানি ঢলে পড়েছে। গাঢ় হয়ে ছায়া নামছে চারদিকে। রুপোর মিহি রেণুর মতো দিগন্তে কুয়াশা জমছে। শান্ত নদীর ভঙ্গুর ঢেউয়ে ঢেউয়ে হেমন্তের শেষ বেলা সোনা ঢেলে দিচ্ছে।

ঝিনুকের পাশে বসে ছিল বিনু। তার মুখ নদীর দিকে ফেরানো। সেখানে একই চলমান দৃশ্য। নৌকো আসছেই, আসছেই। ঝাঁকে ঝাঁকে, বিরতিহীন।

মাঝে মাঝে উঁচু সড়কের দিকে চোখ চলে যায় তার। সেখানেও একই চিত্র। পায়ে হেঁটে মানুষ আসছে—ক্লান্ত, ধূলিধূসর, ভয়ার্ত। বেশির ভাগই আসছে নিজের নিজের ছেলেমেয়ে বউ নিয়ে—আলাদা আলাদা, ছন্নছাড়া। মাঝে মাঝে চোখে পড়ছে একসঙ্গে জমাট-বাঁধা বহু মানুষ। বোঝা যায়, এক একটা গ্রাম দলবদ্ধ হয়ে চলে এসেছে। পুরুষদের অনেকের হাতেই লাঠি রামদা বা চোখা ফলাওলা বর্শা বা টেটা। অর্থাৎ এরা ভয়ঙ্কর রকমের মরিয়া। ঘরবাড়ি ভিটেমাটি খুইয়ে যখন চলেই যেতে হচ্ছে, তখন কিসের আর মৃত্যুভয়? হামলা হলে তারা ছাড়বে না, পালটা মার দেবে।

যারা শক্তসমর্থ, মেয়ে কি পুরুষ, তাদের সবারই মাথায় বা কাঁধে বাক্সপেটরা। সকাল থেকেই একই দৃশ্য দেখে আসছে বিনু। হঠাৎ নজরে পড়ল, অনেকে থুথুড়ে বুড়োবুড়ি বা অথর্ব পঙ্গুদের পিঠে চাপিয়ে নিয়ে আসছে। নিশ্চয়ই এই বুড়োবুড়িরা ওদের মা-বাপ, ঠাকুমা-ঠাকুরদা, কিংবা প্রিয় কোনও পরিজন। এদের কোথায় ফেলে রেখে যাবে?

অনন্ত প্রতীক্ষা ছাড়া আর কী-ই বা করার আছে? পরশু সন্ধেবেলায় হেমনাথের বাড়ির পুকুরঘাট থেকে রাজেকের নৌকোয় ওঠার পর অনিবার্য মৃত্যু যে কতবার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে তার লেখাজোখা নেই। আতঙ্কে স্নায়ুমণ্ডলী সারাক্ষণ ছিঁড়ে পড়েছে। প্রচণ্ড চাপ সামাল দেবার পর যা হয়, এখন শুধুই অবসাদ। শারীরিক বা মানসিক অনুভূতিগুলো কেমন যেন অসাড় লাগছে।

হয়তো অনেকটা অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল বিনু, হঠাৎ চারপাশ থেকে তুমুল শোরগোল উঠল।

'ইস্টিমার আসতে আছে, ইস্টিমার আসতে আছে—'

'লৌড়াও লৌড়াও (দৌড়াও দৌড়াও)—'

'বইসা থাকলে আর জাগা (জায়গা) পামু না।'

সচকিত বিনু দেখতে পেল, অনেক দূরে আকাশ যেখানে পিঠ ঝুঁকিয়ে নদীতে নেমে গেছে, একটা জলযানের চেহারা ফুটে উঠেছে। উঁচু চোঙা দেখে অনুমান করা যায়, ওটা সত্যিই স্টিমার।

প্রথমে ছিল হাত চারেক লম্বা কালচে একটা রেখা। ক্রমশ স্টিমারটা স্পষ্ট হতে লাগল। প্রকাণ্ড জলপোকার মতো জলযানটা ঢেউ কেটে কেটে তারপাশার দিকে এগিয়ে আসছে। সেটার চোঙা দিয়ে গল গল করে কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলী বেরিয়ে হেমন্তের বাতাসে মিশে যাচ্ছে।

এদিকে স্টিমারঘাটের সুবিশাল চত্বর জুড়ে হুলস্থুল বেধে গেছে। চেঁচামেচি, হুড়োহুড়ি, ধাক্কাধাক্কি, কুৎসিত গালিগালাজের আদানপ্রদান। সবাই আগে গিয়ে স্টিমারে জায়গা দখল করতে চায়। এই হননপুরী থেকে যত তাড়াতাড়ি পালানো যায়।

বিনুর চারপাশে যারা বসে ছিল তাদের মধ্যে প্রচণ্ড চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে। হরিন্দ মালপত্র গোছগাছ করতে করতে তাড়া লাগায়, 'উইঠা পড়েন ছুটোবাবু, তরাতরি করেন।'

ওধার থেকে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে নাসের আলি বিনুকে বলতে থাকেন, 'আর বইসা থাইকেন না। জেটির দিকে আউগাইয়া (এগিয়ে) যাইতে হইব।'

হরিন্দ বা নাসের আলির তাড়া দেবার কারণটা বুঝতে পারে বিনু। কিন্তু তাদের সঙ্গে দু'টো সুতি চাদর ছাড়া আর কোনও রকম লটবহর নেই। চাদর দু'টো দ্রুত ভাঁজ করে ঝিনুককে নিয়ে উঠে পড়ে সে। হরিন্দরাও তাদের বোঁচকাবুচকি, বাক্স বিছানা মাথায় তুলে নিয়েছে।

নাসের আলি যে জোয়ান ছেলেদের পাহারাদার নিয়ে এসেছিলেন, দুপুরে খাইয়ে তাদের গ্রামে ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছেন। হয়তো ভাবেননি, স্টিমার এত তাড়াতাড়ি এসে পড়বে। তিনি নিজে যতটা পেরেছেন রামরতনদের মালপত্র হাতে এবং কাঁধে চাপিয়েছেন, বাকিগুলো নিয়েছে রামরতনের মেয়েরা। শুধু তারাই নয়, চারপাশের সবাই যে যার লটবহর মাথায় চাপিয়ে বা হাতে ঝুলিয়ে জেটিঘাটের দিকে দৌড়বার চেষ্টা করছে। সেই দৌড়ের ভেতর ঢুকে গেল বিনুরা।

কিন্তু সামনের দিকে মানুষের নিরেট দেওয়াল। ঠাসবুনট ভিড় ঠেলে এগোয় কার সাধ্য।

ওদিকে স্টিমারটা কোনাকুনি নদী পেরিয়ে জেটিঘাটের কাছাকাছি চলে এসেছিল। সেটার বিরাট বিরাট চাকার ঘা লেগে জল তোলপাড় হয়ে যাচ্ছে। এক ঝাঁক শঙ্খচিল তক্কে তক্কে ছিল; কোত্থেকে বেরিয়ে এসে এখন জাহাজের মোটা গোলাকার চোঙটার চারপাশে চক্কর দিতে শুরু করেছে।

সামনে অগুনতি মানুষ। পেছনেও তাই। দু'দিকের চাপে মাঝখানের লোকজনের দম বন্ধ হয়ে আসছিল। বিশেষ করে ঝিনুকের। বিনু সবটুকু শক্তি দিয়ে প্রাণপণে তাকে আগলে রাখতে চাইছে, কিন্তু পেরে উঠছে না। মনে হচ্ছে, তার হাত-পা ঘাড়-মাথা ছিঁড়ে পড়বে। ওদিকে গলার শির ফুলে উঠেছে ঝিনুকের; দুই চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসছে।

ঝিনুক গোঙানির মতো আওয়াজ করে বলে, 'আমার বুক ফেটে যাচ্ছে। ভিড় থেকে বাইরে নিয়ে যাও।'

বিনু বলল, 'একটু কষ্ট কর ঝিনুক।'

হরিন্দ এবং নাসের আলিরা কাছাকাছিই আছেন।

হরিন্দ বলে, 'অহন বাইর হইয়া গ্যালে ইস্টিমারে ওঠন যাইব না বউ-ঠাইন।'

নাসের আলিও তা-ই বললেন।

ঝিনুক জোরে মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলল, 'আমি আর পারছি না, পারছি না, পারছি না।'

তাকে এই মুহূর্তে বাইরে বার করে নিয়ে যাওয়া কোনওভাবেই সম্ভব নয়। কেননা, শুধু সামনে আর পেছনেই না, দু'পাশেও অসংখ্য মানুষ।

বিনু বলল, 'এই স্টিমারটা ধরতে না পারলে এখানেই পড়ে থাকতে হবে। আবার কবে স্টিমার আসবে তার ঠিক নেই।' ঝিনুককে নিজের গায়ের সঙ্গে লেপটে দু'হাতে জড়িয়ে রেখে চারদিকের ধাক্কা সামলাতে থাকে সে।

ঝিনুক আর কিছু বলে না। তার নির্জীব রোগা শরীর নেতিয়ে পড়েছে। ঘাড় ভেঙে মাথাটা বিনুর বুকের ওপর যেন ঝুলছে।

গম্ভীর ভোঁ বাজিয়ে ওদিকে স্টিমারটা জেটির গায়ে এসে ভিড়েছে। নোয়াখালি কি সিলেট জেলার খালাসিরা স্টিমার থেকে মোটা মোটা লোহার শেকল জেটির দিকে ছুঁড়ে দিল। জেটিঘাটে আর একদল খালাসি তৈরিই ছিল। তারা শেকলগুলো লুফে মোটা মোটা লোহার থামে বেঁধে ফেলল।

বিনু জানে, স্টিমারটা নারায়ণগঞ্জ থেকে আসছে। জলযানটাতে ঠাসা ভিড়। অর্থাৎ নারায়ণগঞ্জ থেকেই মানুষ তুলতে তুলতে সেটা এখানে এসে পৌঁছেছে।

স্টিমারটা তেতলা। নীচের ডেক থেকে ওপর পর্যন্ত সর্বত্র ছন্নছাড়া উদ্বাস্তুরা দলা পাকিয়ে রয়েছে। কোথাও একটা কুটো ফেলার মতো ফাঁক আছে বলে মনে হয় না। এধারে তারপাশা স্টিমারঘাটে হাজার কয়েক লোক ওটায় ওঠার জন্য সমানে ধস্তাধস্তি করছে।

লোক শেকল দিয়ে বাঁধার পর খালাসিরা গ্যাংওয়ে পেতে জেটির সঙ্গে স্টিমারকে জুড়ে দিয়েছিল।

সঙ্গে সঙ্গে হুড়মুড় করে গ্যাংওয়ের সরু পথ ধরে পাড়ের লোকজন স্টিমারে ঢুকে পড়তে থাকে।

স্টিমার কানায় কানায় বোঝাই ছিল। তারপরও কী প্রক্রিয়ায় যে আরও দু'আড়াই শ' মানুষ ঠেসে ঠেসে ঢুকে পড়ল, নিজের চোখে দেখেও বিশ্বাস হচ্ছিল না বিনুর।

হুড়োহুড়ির কারণে জমাট-বাঁধা ভিড়টা একদিকে একটু আলগা হয়ে গিয়েছিল। সেই ফাঁক দিয়ে জেটির কাছাকাছি চলে এসেছে বিনুরা, কিন্তু স্টিমার পর্যন্ত পৌঁছনো গেল না। তার আগেই গ্যাংওয়ে তুলে ফেলেছে খালাসিরা; জেটির মোটা লোহার থামগুলো থেকে শেকল খুলে দিয়েছে। তবু মরিয়া হয়ে অনেকেই স্টিমারে ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইছিল। খালাসিরা দাঁত মুখ খিঁচিয়ে তাদের বাপান্ত করতে করতে চেঁচাচ্ছে, 'পুঙ্গির পুতেরা, গাঙ্গের পানিতে পইড়া মরতে চাও?'

'জানের মায়া নাই?'

'যা শালারা, জেটির ভিতরে সান্দ্ (ঢোক) গিয়া—'

ঠেলে, ধাক্কা মেরে জলের কিনার থেকে খালাসিরা উদ্‌ভ্রান্ত মানুষগুলোকে জেটির মাঝখানে ঢুকিয়ে দেয়।

সন্ধে নেমে গিয়েছিল বেশ খানিকক্ষণ আগে। জেটিঘাটে অসংখ্য আলো জ্বলে উঠেছে। গোয়ালন্দগামী স্টিমারটার একতলা থেকে তেতলা পর্যন্ত শুধু আলো আর আলো।

আকাশপাতাল কাঁপিয়ে বিকট শব্দ করে একসময় স্টিমারের ইঞ্জিন চালু হল। বিরাট বিরাট চাকাগুলো পাহাড়প্রমাণ ঢেউ তুলে দুরন্ত বেগে ঘুরতে শুরু করেছে। নদীতীরের বাঁধন ছিন্ন করে স্টিমারটা গুরুগম্ভীর ভোঁ দিতে দিতে ক্রমশ দূরে সরে যেতে লাগল।

এদিকে সমস্ত জেটিঘাট জুড়ে কান্নার রোল উঠেছে। যারা স্টিমারে উঠতে পারেনি, প্রবল হতাশায় তারা ভেঙে পড়েছে। কেউ কাঁদছে চাপা গলায়, কেউ হাউ হাউ করে। তাদের হয়তো ধারণা, গোয়ালন্দের এটাই শেষ স্টিমার। সীমান্ত পেরিয়ে ইন্ডিয়ায় যাওয়া বুঝি তাদের হল না।

বিনু আগেই বুঝে গিয়েছিল, আজকের স্টিমারে তাদের পক্ষে ওঠা কোনওভাবেই সম্ভব নয়। জেটির মুখ পর্যন্ত চলে আসতে পেরেছে। আশা করা যায়, এরপর যে স্টিমার আসবে সেটায় হয়তো জায়গা পেয়ে যাবে। তাও যদি না পারে, তার পরের স্টিমারে।

হরিন্দর গলা কানে এল, 'ছুটোবাবু, এইহানে আসেন। এই যে, এই দিকে—'

বিনুর চোখে পড়ল, জেটিঘাটের ভেতরে এক কোণে বউ ছেলেমেয়ে নিয়ে বসে আছে হরিন্দ। চোখাচোখি হতে সে হাত নাড়তে লাগল।

বিনুদের সামনে এখনও পঞ্চাশ ষাট জনের নিরেট পাঁচিল। সেটা ভেদ করে ঝিনুককে নিয়ে আর এগুনো যাচ্ছে না। কেউ এক বিঘত জায়গাও ছাড়তে রাজি নয়। জেটির ওধারের গেটের দিকে যতটা এগিয়ে থাকা যাবে, স্টিমার এলে আগে উঠে পড়ার তত বেশি সুযোগ।

বিনু আর পেরে উঠছিল না। পা এবং মাথা টলছে। টের পাচ্ছিল, শরীরের অবশিষ্ট শক্তিটুকু ক্ষয়ে আসছে। যত পলকা আর রোগাই হোক, একটি তরুণীর দেহের ভারে তার শিরদাঁড়া বেঁকে দুমড়ে যাচ্ছে।

হরিন্দ বিনুদের লক্ষ করছিল। লাফ দিয়ে উঠে পড়ে সে। সামনের লোকগুলোকে ঠেলে সরাতে সরাতে চেঁচাতে থাকে, 'উনাগো (ওঁদের) আসতে দ্যাও—সরো সরো—'

লোকগুলো রুখে ওঠে, 'ক্যান, পিছের মানুষ আগে যাইব ক্যান? কেওরে সুমখে যাইতে দিমু না।'

'আমরা এক লগে আইছি। গুতাগুতিতে ওনারা পিছাইয়া পড়ছিল। আটকাইও না, পথ ছাড়—'

'ক্যান ছাড়ুম? পিছাইয়া যহন পড়ছে, পিছাইয়াই থাকব।'

হরিন্দ আর কিছু বলে না। লোকটার অলৌকিক ক্ষমতা। হাতে পায়ে তার বিদ্যুৎ খেলতে থাকে। গায়ের জোরে ভিড়ের ভেতর দিয়ে পথ করে করে বিনু এবং ঝিনুককে তার বউ ছেলেমেয়েরা যেখানে বসে ছিল সেখানে নিয়ে আসে। সেই পুরনো সুজনিটা ক্ষিপ্র হাতে পেতে দিয়ে বলে, 'বউ-ঠাইনরে তরাতরি শোয়াইয়া দ্যান। বড় কাহিল হইয়া পড়ছে।'

নির্জীব, মৃতপ্রায় ঝিনুককে শুইয়ে দেয় বিনু। বাইরে আকাশ থেকে হিম নামছে, নদীর ওপর দিয়ে হেমন্তের ঠাণ্ডা বাতাস বয়ে যাচ্ছে। কিন্তু জেটির ভেতরটা বেশ গরম। চারদিকে থিকথিকে ভিড়। এত মানুষ এক জায়গায় ঠাসাঠাসি করে থাকলে যা হয়, তাদের গায়ের তাপে এবং উষ্ণ নিঃশ্বাসে এখানকার বায়ুমণ্ডল উত্তপ্ত হয়ে আছে।

অনেকক্ষণ ঝিনুককে জড়িয়ে ধরে রাখার কারণে বুক এবং ডান হাতটা যন্ত্রণায় ছিঁড়ে পড়ছে বিনুর। বাঁ হাত দিয়ে বুকটা ডলতে থাকে সে। চোখেমুখে তীব্র ক্লেশের ছাপ।

হরিন্দ সহৃদয় সুরে বলে, 'বউ-ঠাইনেরে অতহানি সোময় ধইরা রাখছিলেন। বুক আর ড্যানা (হাত) নি বিষাইতে (কষ্ট) আছে?'

আস্তে মাথা নাড়ে বিনু।

হরিন্দ নিরাশার সুরে এবার বলে, 'এক ইস্টিমার গ্যাল, উঠতে পারলাম না। কবে যে পরেরটা আসব, ক্যাঠা জানে। দুগ্‌গতির আর শ্যাষ নাই।' তার হা-হুতাশ চলতেই থাকে।

হঠাৎ বাঁ দিক থেকে পরিচিত গলা ভেসে আসে, 'বাবুসাহেব—বাবুসাহেব—'

মুখ ঘোরাতেই বিনু নাসের আলিকে দেখতে পায়। খানিক দূরে রামরতন গাঙ্গুলিদের আগলে তিনি বসে আছেন।

'আপনেগো জেটিতে না দেইখা চিন্তা হইতে আছিল। যাউক, ভিত্‌রে আসতে পারছেন।' বলতে বলতে উঠে এলেন নাসের আলি, 'আর কিছুক্ষণ দেইখা আপনেগো খোজ করতে বাইরে যাইতাম।'

স্টিমারে ওঠার জন্য যখন মরণপণ ধাক্কাধাক্কি শুরু হয়েছিল, ঝিনুককে নিয়ে বিনু তখন এতই ব্যতিব্যস্ত, এতই শঙ্কিত যে নাসের বা রামরতনদের কথা খেয়াল ছিল না। লক্ষ করেনি, কখন প্রাক্তন মাস্টারমশাই এবং তাঁর পরিবারকে নিয়ে নাসের আলি জেটিতে চলে এসেছেন।

বিনু বলল, 'বসুন—'

নাসের আলি কাছাকাছি বসে পড়েন।

বিনু বলে, 'তা হলে আজ আর আপনার গ্রামে ফেরা হল না?'

'কী কইরা ফিরুম? মাস্টারমশাইগো স্টিমারে না তোলন তরি জেটিঘাটেই থাইকা যামু—'

এই কথাটা বুঝিবা আগেও একবার বলেছিলেন নাসের আলি। বিনু একটু ভেবে জিজ্ঞেস করল, 'আবার কবে স্টিমার আসবে, বলতে পারেন?'

নাসের আলি বললেন, 'ক্যামনে কই? সরকারের মতিগতি বুঝি না। যারা দ্যাশ ছাইড়া যাইতে চায় তাগো তরাতরি যাওনের ব্যবস্থা কইরা দিলেই তো হয়। দিনে তিন চাইরটা কইরা স্টিমার দিলে মানুষের এত কষ্ট হইত না।'

বিনু ভাবে, এ দেশের সরকার যারা চালায়, তাদের কারোর যদি নাসের আলির মতো সহানুভূতি থাকত। মুখ ফুটে অবশ্য কিছু বলে না।

নাসের আলি থামেননি, 'এইটুক কইতে পারি, হগলেই বড় সাহেবগো মর্জি। স্টিমার যতক্ষণ না আসতে আছে, আশায় আশায় বইসা থাকতে হইব।'

মাথাটা সামান্য হেলিয়ে দেয় বিনু, 'হ্যাঁ।'

কথা বলতে বলতে নাসের আলির নজর এসে পড়ে ঝিনুকের ওপর। কয়েক পলক তাকিয়ে থাকেন। তারপর বলেন, 'বিবিসাহেব খুব কাহিল হইয়া পড়ছেন।'

'হ্যাঁ।'

'রোগা মাইয়া, সাবধানে রাখবেন।'

আরও কিছুক্ষণ কথা বলে নাসের আলি চলে যান।

এদিকে বেহুঁশের মতো শুয়ে আছে ঝিনুক। তার মুখের ওপর এক গোছা চুল এসে পড়েছে। সেগুলো সরিয়ে দিতে গিয়ে কপালে হাত ঠেকে যায় বিনুর। বেশ গরম। নিশ্চিত হবার জন্য ওর একটা হাত তুলে নেয়। সন্দেহ নেই, জ্বর। দু'দিন একটানা প্রচণ্ড দুশ্চিন্তা, আতঙ্ক, হেমন্তের হিম, মৃত্যুভয়, উদ্‌ভ্রান্তের মতো ছোটাছুটি, এ সবের চাপ ঝিনুকের দুর্বল শরীর সহ্য করতে পারেনি।

বিনু বিচলিত হয়ে পড়ে। রুগ্‌ণ, ভয়কাতর মেয়েটাকে আগলে আগলে দেশজোড়া বিষাক্ত আবহাওয়ায় রাস্তায় বেরুনোই মস্ত সমস্যা। তার ওপর এই জ্বর। সবে তারপাশা পর্যন্ত আসা গেছে। কলকাতা অনেক দূরের পথ। কিভাবে সেখানে পৌঁছনো যাবে? সমস্যাটা ক্রমাগত জটিল হয়ে যাচ্ছে।

বিনুর মুখ দেখে হরিন্দ কিছু আন্দাজ করে নিয়েছিল। জিজ্ঞেস করল, 'ছুটোবাবু, বউ-ঠাইনের শরীল কি খারাপ?'

বিনু বলে, 'হ্যাঁ। জ্বর হয়েছে। ডাক্তার দেখাতে পারলে ভাল হত। এখানে কি ডাক্তার পাওয়া যাবে?'

হরিন্দ সাত ঘাটের জল খাওয়া মানুষ। পূর্ব বাংলার নানা অঞ্চলে কত বছর চষে বেড়িয়েছে। কিন্তু সেও কোনও হদিস দিতে পারল না। খানিক চিন্তা করে বলল, 'উই মিঞাছাব কইতে পারে।' নাসের আলিকে দেখিয়ে দিল সে।

সঠিক পরামর্শই দিয়েছে হরিন্দ। নাসের আলি জামতলির বাসিন্দা। তারপাশা থেকে জামতলির দূরত্ব যদিও অনেকটাই, তবু তিনি জানলেও জানতে পারেন।

নাসের আলিকে ডেকে সব বলল বিনু।

নাসের আলি বললেন, 'শুনছি, এইখানে একজন ডাক্তারের চেম্বার আছে। তরাতরি ওষুধ পড়লে ভাল। নাইলে পথে বিপদে পড়বেন। চলেন দেখি কী করা যায়—'

দেশভাগের আগে বেশ কয়েক বার হেমনাথের সঙ্গে তারপাশায় এসেছে বিনু। স্টিমার আসার সময় এখানকার গোটা এলাকা জুড়ে চাঞ্চল্য দেখা দিত। সেটা চলে যাবার পর মনে হত, সমস্ত নিঝুম হয়ে গেছে। কিন্তু যেদিন পূর্ব বাংলা পাকিস্তান হল তখন থেকেই এই স্টিমারঘাটের চেহারা আগাগোড়া বদলে গেছে। এখন দিনরাত, অষ্টপ্রহর থিকথিকে ভিড়। আগে দিনে একবার কি দু'বারও স্টিমার আসত। ইদানীং আসাটা অনিয়মিত হয়ে পড়েছে। ক'দিন পর তার দেখা পাওয়া যাবে, বলা মুশকিল। যখনই আসুক, কয়েক শ' উদ্বাস্তু তুলে নিয়ে গোয়ালন্দ যায়। এদিকে ভিটেমাটি ছেড়ে হাজার হাজার মানুষ আসছেই, আসছেই। ভিড় ক্রমাগত বেড়েই চলেছে।

এত মানুষ থাকলে যা হয়, দোকান বাজার অনেক রাত পর্যন্ত খোলা থাকে। চারদিকে হেরিকেন, হ্যাজাক এবং ডেলাইটের আলো জ্বলছে।

বিনুকে নিয়ে জেটির বাইরে চলে এলেন নাসের আলি। এখানে ডাক্তারখানা আছে কিনা, তাঁরও স্পষ্ট ধারণা নেই। অনেক খোঁজাখুঁজি করে একটা ওষুধের দোকান পাওয়া গেল। একজন ডাক্তার সেখানে বসেন, কিন্তু সূর্য ডোবার আগেই সাইকেলে চেপে পাঁচ মাইল দূরে তাঁর গ্রামে ফিরে যান।

অগত্যা দোকানদারের কাছ থেকে সাধারণ জ্বরজারি কমানোর কিছু বড়ি কিনল বিনু। ইনফ্লুয়েঞ্জা বা গা ব্যথা করে জ্বরটর হলে ডাক্তাররা এ সবই দেয়। খুব চেনা ওষুধ।

নাসের আলি বললেন, 'আর এক কাম করেন। কাইল হউক, পরশু হউক, স্টিমার আসবই। পথে খাওনের লেইগা কিছু শুকনা জিনিস কিনা লন (নিন)।'

আগে গোয়ালন্দগামী স্টিমারে ভাত আর মুরগির মাংস পাওয়া যেত। বিনু শুনেছে, দেশভাগের পর সে সব বন্ধ হয়ে গেছে। নাসের আলি মানুষটা খুবই দূরদর্শী। সকল দিকে তাঁর নজর।

বিনু কিছু চিঁড়ে, মুড়ি, মুছি গুড় আর এক ফানা মোহনবাঁশি কলা কিনল। নাসের আলিও রামরতনদের জন্য চিঁড়ে টিড়ে কিনে নিলেন।

জেটিতে ফিরে ঝিনুকের ঘুম ভাঙিয়ে একটা বড়ি খাইয়ে দেওয়া হল, কিন্তু চিঁড়ে টিড়ে কিছুই খাওয়ানো গেল না।

ওষুধ খেয়ে ফের শুয়ে পড়েছিল ঝিনুক। সঙ্গে সঙ্গে ঘুম।

বিনুরও খেতে ইচ্ছা করছিল না। সে চুপচাপ ঝিনুকের শিয়রের কাছে বসে থাকে।

রাত বাড়ছিল। স্টিমারঘাটের কলরোল ক্রমশ ঝিমিয়ে আসে। স্টিমারের জন্য অপেক্ষা করতে করতে আরও একটা রাত কেটে যাবে বিনুদের।

পরদিন সকালে যা ঘটল তা প্রায় অভাবনীয়। অবিশ্বাস্যও বলা যায়।

সবে রোদ উঠেছে। কাল বিকেল থেকে সমস্ত চরাচরের ওপর পুরু হয়ে যে কুয়াশা জমে ছিল, তা দ্রুত বিলীন হয়ে যাচ্ছে। খানিক বাদে তার চিহ্নটুকুও থাকবে না। হেমন্তের কুয়াশামুক্ত নীলাকাশ এখন পরিষ্কার, তকতকে। নদীর অগুনতি পলকা ঢেউয়ের মাথায় রোদ সোনার কলস উপুড় করে দিয়েছে।

আকাশের নীল ছুঁয়ে ছুঁয়ে উড়ছে শঙ্খচিল। সারা রাত তারা কোথায় থাকে, কে জানে। জল-বাংলার যেখানেই যাওয়া যাক, ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতেই ওরা ঝাঁকে ঝাঁকে বেরিয়ে পড়ে।

ঠিক এই সময় দেখা গেল, দূর দিগন্ত পেরিয়ে স্টিমার আসছে। জেটিঘাটে বা বাইরে যারা দলা পাকিয়ে পড়ে ছিল, এখনও তাদের অনেকেরই ঘুম ভাঙেনি। যারা জেগে গিয়েছিল তাদের চোখেও রয়েছে ঢুলুনি।

হঠাৎ কারা যেন চেঁচিয়ে ওঠে, 'ইস্টিমার আসে, ইস্টিমার আসে—'

কালকের মতোই স্টিমারঘাটে তীব্র ঝাঁকানি লাগে। যারা ঘুমোচ্ছিল, ধড়মড় করে উঠে বসে। যারা ঢুলছিল তাদের চটকা ভেঙে যায়। সবার শরীরে তড়িৎপ্রবাহ খেলতে থাকে।

কালকের মতোই ঠেলাঠেলি, ধাক্কাধাক্কি শুরু হয়ে যায়। স্টিমারে ওঠার জন্য মরণপণ প্রতিযোগিতা।

জেটিঘাটার ভেতরেও তুমুল শোরগোল চলছে। সকলেই নদীর দিকের গেটে পৌঁছতে চায়।

দেখতে দেখতে কালো ধোঁয়া ছেড়ে, গম্ভীর ভোঁ বাজিয়ে স্টিমার জেটিঘাটে এসে ভিড়ল। কাল যেটা গোয়ালন্দে গিয়েছিল এটা সেই স্টিমার নয়। সেটার পক্ষে রাতারাতি গোয়ালন্দে লোক নামিয়ে নারায়ণগঞ্জে ফিরে গিয়ে আবার তারপাশায় আসা অসম্ভব। সরকারের সুবুদ্ধির উদয় হয়েছে। তারা হয়তো ভেবেছে, যারা দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছে তাদের কষ্টটা যাতে লাঘব হয়, সেজন্য গোয়ালন্দ ঘাটে বেশি করে স্টিমার চালানো উচিত।

কাল বিনুরা যে যার মতো আলাদা আলাদা স্টিমারে ওঠার চেষ্টা করেছিল। আজ নাসের আলি পুরো দায়িত্বটা নিজের হাতে তুলে নিলেন। বিনুকে বললেন, 'আসেন আমার লগে—'

রামরতন এবং বিনুদের নিয়ে এগুতে লাগলেন নাসের আলি। হরিন্দরাও তাঁদের গায়ে লেপটে রয়েছে। সামনে চাপ-বাঁধা মানুষ। গলা চড়িয়ে কর্তৃত্বের সুরে নাসের আলি বললেন, 'অ্যাই, পথ দাও। দ্যাখো না, আমার লগে বুড়া মানুষ, রুগী মানুষরা রইছে।'

একজন মাঝবয়সী, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মুসলমানকে দেখে কেউ আর বাধা দিতে বা হইচই করতে সাহস পায় না। সামনের ভিড়টা ভয়ে ভয়ে পথ করে দেয়।

গ্যাংওয়ে পেতে দেওয়া হয়েছিল। নাসের আলি সঙ্গীদের নিয়ে স্টিমারে চলে এলেন।

কালকের স্টিমারটার মতোই এটাও কানায় কানায় ঠাসা। একতলায় পা ফেলার জায়গা নেই। নাসের আলি বললেন, 'এইখানে হইব না, উপুরে চলেন—'

দোতলার ডেকেও যথেষ্ট ভিড়। তবু সামান্য কিছু ফাঁকফোকর বার করে রামরতনদের সঙ্গে বিনু এবং হরিন্দরদেরও বসিয়ে দিলেন নাসের আলি।

অবাক বিস্ময়ে লোকটাকে দেখছিল বিনু। নাসের আলি প্রায় অসাধ্য সাধন করেছেন। তিনি না থাকলে আজও স্টিমারে ওঠা যেত না।

নাসের আলি রামরতনকে বলছিলেন, 'স্টিমার এইখানে বেশিক্ষণ খাড়াইব না। বিশ পচিশ মিনিটের মইদ্যে ছাইড়া দিব। সাবধানে যাইয়েন।' বিনুকে দেখিয়ে বললেন, 'বাবুসাহেব আছেন, যা দরকার ওনারে কইয়েন। কইলকাতায় গিয়া পৌঁছ সম্বাদটা দিয়েন। খুব চিন্তায় থাকুম।'

রামরতন বললেন, 'ঠ, দিমু। তবে উইপারের চিঠি এইখানে আসব কিনা, জানি না।' একটু চুপ করে থেকে ভাঙা ভাঙা, ঝাপসা গলায় বলতে লাগলেন, 'তুই যা করলি, নিজের পোলাও তা করে

না।'

'এই কথা কইয়েন না স্যার। এইটা আমার কর্তব্য।'

'কর্তব্য তো অনেকেরই থাকে। পালন করে কয়জন?'

একটু নীরবতা।

তারপর রামরতন বললেন, 'দ্যাশের লগে সম্পক্ক চুইকা গেল। এই জীবনে তগো লগে আর দেখা হইব না।' তাঁর ভারী কণ্ঠস্বর হাহাকারের মতো শোনায়।

নাসের আলি কিছু বলতে চেষ্টা করলেন, পারলেন না। তাঁর গলার কাছে কী যেন ক্রমাগত ডেলা পাকিয়ে যাচ্ছে। ঢোক গিলে গিলে প্রবল আবেগকে তিনি সামলাতে চেষ্টা করছেন।

রামরতন বললেন, 'জমিজমা বাড়িঘরের দলিলপত্র তর কাছেই রইল যত তরাতরি পারস, ব্যাচনের (বিক্রির) ব্যবস্থা করিস। খালি হাতে দ্যাশ ছাড়তে আছি। অর্থবল একটা বড় শক্তি। টাকা থাকলে মনের জোর বাড়ে।'

নাসের আলি তাঁর কণ্ঠস্বর ফিরে পেলেন। ধরা গলায় বললেন, 'হ, ঠিকই কইছেন স্যার। তবে এখনই কিছু করতে গ্যালে হিতে বিপরীত হইয়া যাইব।' সংক্ষেপে বুঝিয়ে দিলেন, মানুষ ক্ষিপ্ত হয়ে আছে, পূর্ব পাকিস্তানের সর্বত্র তুমুল উত্তেজনা। রামরতনদের জমিজমা বিক্রি করতে গেলে নাসের আলি বিপদে পড়বেন। পরিস্থিতি একটু শান্ত হোক, মানুষের মাথায় যে খ্যাপামি ভর করে আছে সেটা কাটুক, তারপর ধীরেসুস্থে সুযোগ বুঝে ঠিকই বন্দোবস্ত করা যাবে।

নাসের আলির কথায় আরও জানা যায়, প্রায় তিরিশ কানির মতো দোফসলা উত্তম জমি রামরতনদের। তা ছাড়া পঁচিশের বন্দের পাঁচখানা ঘরওলা বাড়ি, পুকুর, গোটা তিরিশেক ফলন্ত নারকেল গাছ, সুপারি বাগিচা, আম জাম বাতাবি কাউ আর ডউয়া ফলের বাগান।

রামরতনদের বাড়িঘরের দিকে অনেকেরই নজর। কেনার জন্য তারা মুখিয়ে আছে। কিন্তু বেশ কিছু লোকের ধারণা, উদ্বাস্তুদের সম্পত্তি কেনার দরকার নেই। এমনিই দখল করে নেওয়া যাবে। কেউ যদি নগদ টাকা বার করে কিনতে যায়, তাকে ঝামেলায় পড়তে হবে। এখন বুদ্ধিমানের কাজ হল, অপেক্ষা করে থাকা এবং সময় সুযোগ এলে কাজে লাগানো।

রামরতন উদ্বিগ্ন মুখে বললেন, 'বাড়ি জমিন বেদখল হইয়া যাইব না তো?'

নাসের আলি বললেন, 'যতদিন বাইচা আছি, আপনের এক টুকরা জমিন কেও কাইড়া নিতে পারব না। তবে মইরা গ্যালে কী হইব, জানি না।'

'এই কি তর মরণের বয়স! আশীর্বাদ করি দীর্ঘায়ু হ। তুই যে জমিজমা অন্যেরে দখল করতে দিবি না, এইতেই আমি নিশ্চিন্ত।'

'যদি খরিদ্দার পাই, রেজিস্ট্রি কইরা দেওনের লেইগা আপনেরে কিন্তুক জামতলিতে আসতে লাগব।'

'বাইচা থাকলে আসুম। যা করনের তরাতরি করিস।'

স্টিমার ঘন ঘন ভোঁ দিচ্ছিল। চমকে নাসের আলি দেখলেন, জেটির মোটা মোটা থাম থেকে লোহার শেকল খুলে ফেলা হচ্ছে। বন্ধন মুক্তির পরই গ্যাংওয়ে তুলে নেওয়া হবে। তিনি চঞ্চল হয়ে উঠলেন। বললেন, 'স্যার, এখনই স্টিমার ছাইড়া দিব। আর থাকন যাইব না।'

রামরতন ব্যস্ত হয়ে পড়লেন, 'হ হ, নাইমা যা—'

প্রাক্তন মাস্টারমশাইকে প্রণাম করে দ্রুত বিনুর দিকে তাকিয়ে নাসের আলি বললেন, 'পথে স্যারেগো দেইখেন—'

এই অনুরোধটা আগেও করেছেন। ফের বিনুকে মনে করিয়ে দিয়ে বড় বড় পা ফেলে সিঁড়ির দিকে চলে গেলেন নাসের আলি। একটু পর চোখে পড়ল, একতলায় নেমে গ্যাংওয়ে পেরিয়ে জেটির এধারের গেটের মুখে গিয়ে তিনি দাঁড়িয়েছেন। বোঝা যাচ্ছে, যতক্ষণ না স্টিমার তারপাশা ছেড়ে চলে যায়, ওখানেই দাঁড়িয়ে থাকবেন।

শেকল খোলা হয়ে গিয়েছিল। সিলেট জেলার খালাসিরা অদ্ভুত সুর করে দুর্বোধ্য ভাষায় কী যেন বলতে বলতে গ্যাংওয়ে তুলে ফেলল। ভোঁ বাজছিলই। হঠাৎ সেটার জোর দশগুণ বেড়ে

pathagar.net

যায়। সমস্ত চরাচরে কাঁপন তুলে স্টিমার শেষ ভোঁ দিল। সঙ্গে সঙ্গে বিকট শব্দ করে জলযানের ইঞ্জিনও চালু হয়ে গেল।

নাসের আলি নেমে যাবার পর বিনু খোলা ডেকের রেলিংয়ের কাছে এসে দাঁড়িয়ে ছিল। তার পাশে রামরতন।

হেমন্তের নদীতে বিশাল বিশাল ঢেউ তুলে স্টিমারের দু'ধারের চাকা ঘুরে চলেছে। ধীরে ধীরে তারপাশা দূরে সরে যাচ্ছে।

নাসের আলি জেটির মুখে দাঁড়িয়ে হাত নাড়ছিলেন। তাঁর পাশে এবং পেছনে বাস্তুহারা, বিষণ্ণ, হতাশ মানুষদের ভিড়। পরের বা তার পরের কিংবা তারও পরের স্টিমারে ওঠার জন্য তাদের কতদিন তারপাশায় পড়ে থাকতে হবে, কে জানে।

বিনু এবং রামরতনও হাত নাড়ছিলেন। বিনু লক্ষ করল, চশমার পুরু কাচের ভেতর রামরতনের ঘোলাটে চোখ ক্রমশ জলে ভরে যাচ্ছে।

রাজদিয়া থেকে বেরুবার পর দু'টি মানুষকে দেখেছে বিনু—আফজল হোসেন এবং নাসের আলি। এদের সঙ্গে এ জীবনে আর দেখা হবে না। বিনু ভাবে, যদি সে বেঁচে থাকে, শেষ পর্যন্ত কলকাতায় পৌঁছতে পারে, সময়ের পলি পড়ে পড়ে একদিন এই চরম দুঃসময়ের অনেক কিছুই ঢেকে যাবে, কিন্তু এই দু'টো মানুষকে কোনও দিনই ভোলা যাবে না।

স্টিমারের গতি বেড়ে যাচ্ছে। তারপাশার স্টিমারঘাট ছোট হতে হতে একসময় বিন্দুবৎ মিলিয়ে গেল।

এক ঝাঁক নাছোড়বান্দা শঙ্খচিল মাথার ওপর চক্কর দিতে দিতে আসছিল। স্টিমারটাকে গোয়ালন্দর দিকে খানিকটা এগিয়ে দিয়ে এখন তারা ফিরে যাচ্ছে। বিনু জানে, এই জল-বাংলায় যেখানে যে স্টিমারই আসুক, আর যেদিকে যাক, শঙ্খচিলেরা সেগুলোকে কিছুক্ষণ সঙ্গ দেয়।

কার্যকারণ নেই, অসংলগ্নভাবে হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ল বিনুর। মুন্সিগঞ্জ, ভাগ্যকুল কি তারপাশা, আগে যেখানেই সে গেছে, দেখেছে স্টিমার এলেই ঝাঁকে ঝাঁকে মিঠাইয়ের নৌকো সেটাকে ছেঁকে ধরত। কত রকমের মিষ্টি—রসগোল্লা, রাজভোগ, পান্তুয়া, ক্ষীরমোহন। এসব ছাড়াও মাঠা, কলপাতায় চিনি ছড়ানো ধবধবে মাখনের দলা, পাতক্ষীর। কিন্তু এখন এসব খাওয়ার লোক নেই। যারা সর্বস্ব খুইয়ে চলে যাচ্ছে, তাদের পয়সা কোথায় যে কিনবে। কাজেই মিঠাইয়ের নৌকোও আসে না।

সূর্য অনেকখানি ওপরে উঠে এসেছে। রোদের তাপ বাড়ছে। চাকার অবিরত ঘূর্ণনের শব্দ আর ইঞ্জিনের একটানা গজরানি ছাড়া তেমন কোনও আওয়াজ নেই। নদীর জল উথলপাথল করে, সফেন ঢেউ তুলে স্টিমার ছুটে চলেছে।

বিনুরা রেলিং ধরে দাঁড়িয়েই ছিল। রামরতন বললেন, 'বহুক্ষণ খাড়াইয়া আছি, পা ধইরা গ্যাছে। চল, বসি গিয়া। তুমি কইরা কইলাম কিন্তুক। তুমি আমার নাতির বয়সী।'

বিনু বলল, 'তুমি করেই তো বলবেন। চলুন—'

জোরে ছোটার জন্য স্টিমার বেশ দুলছিল। টাল সামলে রামরতনের পক্ষে ডেকের ওপর দিয়ে হেঁটে যেতে অসুবিধা হচ্ছিল। বৃদ্ধ মানুষটির হাত ধরে নিজেদের জায়গায় ফিরে এল বিনু। রামরতনকে তাঁর স্ত্রী এবং মেয়েদের কাছে বসিয়ে ঝিনুকের কাছে চলে এল।

ঝিনুক বসে ছিল। তাকে অনেকটা সুস্থ মনে হচ্ছে। কপালে হাত দিয়ে বিনু বুঝতে পারল, জ্বর নেই। ওষুধে কাজ হয়েছে। জিজ্ঞেস করল, 'এখন ভাল লাগছে?'

'হ্যাঁ—' আস্তে মাথা হেলিয়ে দিল ঝিনুক।

যাক, একটা ব্যাপারে দুশ্চিন্তা কাটল বিনুর। এমনিতেই মানসিক দিক থেকে বিপর্যস্ত ঝিনুক সারাক্ষণ ভয়ে ভয়ে থাকে। তার ওপর জ্বরটা বাড়লে কলকাতা পর্যন্ত তাকে টেনে নিয়ে যেতে কী সমস্যা যে হত, ভাবা যায় না।

ঝিনুক বলল, 'স্টিমারে জল পাওয়া যাবে? মুখটুখ ধোয়া হয়নি—'

সকালে স্টিমার আসতে দেখে এমন হইচই আর ধাক্কাধাক্কি শুরু হয়ে গিয়েছিল যে অন্য কোনও

দিকে লক্ষ্য ছিল না। বিনু নিজেও চোখেমুখে জল দিয়ে আসতে পারেনি।

দোতলার ডেকে ওঠার পর খানিক দূরে যে জায়গাটা থেকে স্টিমারের মোটা চোঙা ওপরে উঠে গেছে তার গা ঘেঁষে পর পর তিনটে স্নানের ঘর। বিনু ঝিনুককে নিয়ে সেখানে গেল।

গামছা বা তোয়ালে কি দাঁতের মাজন কিছুই সঙ্গে নেই। তারপাশার স্টিমারঘাটে বাজার থেকে কাল যখন একজোড়া চাদর কিনেছিল বিনু, তখন খেয়াল করে গামছা টামছাও কেনা উচিত ছিল। এখন কী আর করা। গোয়ালন্দেও বাজার আছে। সেখান থেকে দরকারী জিনিসগুলো কিনে নেবে।

আঙুলে দাঁত ঘষে মুখ ধুয়ে ঝিনুক তার শাড়ির আঁচলে আর বিনু তার কোঁচার খুঁটে জল মুছতে মুছতে ফিরে এল। ঝিনুক বলল, 'আমার খিদে পেয়েছে।'

পরশু হেমনাথের বাড়ির পুকুরঘাটে রাজেকের নৌকোয় ওঠার পর এই প্রথম নিজের থেকে খেতে চাইল ঝিনুক। তাকে অনেকটা স্বাভাবিক দেখাচ্ছে। বিনুর খুব ভাল লাগল।

নাসের আলির পরামর্শে ভাগ্যিস কিছু চিঁড়ে মুড়ি কিনেছিল। দোকানদার কাগজের ঠোঙায় ভরে পাটের সুতো দিয়ে ভাল করে বেঁধে দিয়েছে। বাঁধন খুলে মুড়ি আর মুছি গুড় বার করে ঝিনুককে দিল বিনু, নিজেও খানিকটা নিল।

খেতে খেতে ঝিনুক বলল, 'আর ভয় নেই, কী বল? মনে হচ্ছে, এবার শান্তিতে আমরা কলকাতায় যেতে পারব।'

মেয়েটা ত্রাস কাটিয়ে উঠছে, সাহস ফিরে পাচ্ছে। বিনুও আশা করছে, এবার হয়তো নির্বিঘ্নে সীমান্তের ওপারে যাওয়া যাবে।

সূর্য এখন সোজাসুজি মাথার ওপর উঠে এসেছে। হেমন্তের রোদ নদীর ঢেউয়ে ঢেউয়ে ঝলকে যাচ্ছে।

মাঝনদী দিয়ে একঘেয়ে আওয়াজ করতে করতে ছুটে চলেছে স্টিমার। দু'পাড় ধুধু। গাছপালা, গ্রাম, কিছুই স্পষ্ট নয়। মনে হয়, এপাড়ে ওপাড়ে দিগন্ত ঘেঁষে কেউ ধূসর রঙের মোটা লাইন টেনে রেখেছে। নদী জুড়ে অসংখ্য নৌকো। কোনওটায় বাদাম খাটানো। কোনওটায় পাল নেই, মাঝিরা বৈঠা টেনে চলেছে। যে নৌকোগুলো স্টিমারের কাছাকাছি, উত্তাল ঢেউয়ে সেগুলো মোচার খোলার মতো ওঠানামা করছে।

তখন খাওয়ার পর ঝিনুককে ওষুধ খাইয়ে দিয়েছিল বিনু। কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে অলস দৃষ্টিতে চারপাশের দৃশ্য দেখল ঝিনুক। তারপর বলল, 'আমি একটু ঘুমোব।' বলেই শুয়ে পড়ল।

যখন তখন ঘুমোতে পারে না বিনু। বিশেষ করে দিবানিদ্রার অভ্যাস নেই তার।

অনেকক্ষণ নদীর দিকে তাকিয়ে থাকার পর দৃষ্টিটাকে ডেকে ফিরিয়ে আনল বিনু। থোকায় থোকায় চার পাঁচ ছয় বা সাতজনের এক একটা পরিবার গা ঘেঁষাঘেঁষি করে রয়েছে। সকলের সঙ্গেই কম বেশি লটবহর। বোঁচকা বুচকি, টিনের বাক্স, এসব তো আছেই। কেউ কেউ ফলন্ত লাউগাছ, নারকেল পাতার শলা দিয়ে তৈরি ঝাঁটা, ছোবড়াসুদ্ধ নারকেল, পাকা সুপারির ছড়া, ডাঁটা শাক, মাটির পাতিল— অর্থাৎ পার্থিব সম্পত্তি বলতে যেটুকু পেরেছে নিয়ে এসেছে।

স্টিমারের একটানা দোলানিতে চারপাশের মানুষজন সমানে দুলছে। কেউ কেউ শুয়েও পড়েছে।

হঠাৎ চাপা কান্নার পরিচিত শব্দ কানে ভেসে আসে বিনুর। এধারে ওধারে তাকাতে হরিদাস সাহাদের দেখতে পায় সে। তাদের ডান পাশে বসেছে হরিন্দরা, তারপর রামরতনরা, তাঁদের ঠিক পরেই হরিদাস এবং তার বউ ছেলেমেয়ে।

তারপাশা স্টিমারঘাটে, নদীর কিনারে বসে বিনুরা যখন গোয়ালন্দের স্টিমারের জন্য অসীম উৎকণ্ঠায় অপেক্ষা করছে সেই সময় হরিদাস সাহার বউকে কাঁদতে দেখেছিল। তেমনই মুখে আঁচল চাপা দিয়ে, একই রকম ক্ষীণ শব্দ করে এখনও কাঁদছে। কোন এক নয়া চিকন্দি গ্রামে যুবতী মেয়েকে

খুইয়ে এসেছে তারা। মা তো, বাকি জীবনটা কেঁদে কেঁদেই তার কেটে যাবে।

শোকাতুর মহিলার জন্য পুরনো কষ্টটা ফের নতুন করে অনুভব করতে থাকে বিনু। কিছুক্ষণ বিষণ্ণ চোখে তাকে দেখার পর নদীর দিকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

বাঁ ধারে কোনাকুনি, ডেকের রেলিং পর্যন্ত, যারা বসে বা শুয়ে আছে তাদের মধ্যে একজন অনেকক্ষণ বিনুকে লক্ষ করছিল। লোকটার বয়স পঞ্চাশ বাহান্ন। রোগা, হাড় বার-করা চেহারা। লম্বা শীর্ণ মুখে কয়েকদিনের কাঁচাপাকা দাড়ি, পাটের ফেঁসোর মতো চুল, চোখা থুতনি, চোখ গর্তে বসা। কণ্ঠমণি ঠেলে বেরিয়ে এসেছে। পরনে খাটো ময়লা ধুতি আর ফতুয়া। লোকটার বাঁ পায়ে উরুর মাঝামাঝি থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত পুরনো কাপড় ছিঁড়ে পুরু করে ব্যান্ডেজ বাঁধা।

বিনুর সঙ্গে আলাপ করার খুব ইচ্ছা লোকটার। কিন্তু তার কাছে আসবে কি আসবে না, ঠিক করতে পারছিল না। শেষ পর্যন্ত দ্বিধা কাটিয়ে পা টেনে টেনে উঠে এল। হাতজোড় করে বিনীতভাবে বলল, 'পন্নাম হই বাবুমশয়।'

চমকে নদীর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে বিনু বলল, 'নমস্কার—'

'আমার নাম অধর ভুইমালী।' লোকটা বলতে লাগল, 'আপনার কাছে এট্টু বসুম?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, বসুন না—'

অধর একটু দূরে বাঁ পা'টা ছড়িয়ে বেশ কষ্ট করে বসল। চাপা গলায় বলল, 'আপনের লগে দুই একহান কথা আছে।'

একটা অচেনা লোক আচমকা উঠে এসে কী বলতে চায় তাকে? বেশ অবাকই হল বিনু।

অধর ভুঁইমালী বলল, 'আমাগো চৈদ্দ পুরুষের ভিটা আছিল তালসোনাপুরে। নাম শুনছেন নি জাগাহানের (জায়গাটার)?'

বিনু বলে, নামটা তার জানা। তবে সেখানে কখনও তার যাওয়া হয়নি।

অধর গলা আরও নামিয়ে এবার বলল, 'আমাগো উইদিকে জবর খুনাখুনি হইছে। দ্যাশে আর থাকন গ্যাল না। বাড়িঘর ছাইড়া কইলকাতায় যাইতে আছি।'

এসব নতুন কিছু নয়। এই স্টিমারে যারা যাচ্ছে, কিংবা পূর্ব পাকিস্তান জুড়ে আরও অসংখ্য মানুষ যারা যাবার জন্য পা বাড়িয়ে আছে, তাদের সবারই দেশ ছাড়ার ওই একটাই কারণ।

এদিকে কোনও কার্যকারণ সম্পর্ক নেই, রাজদিয়ায় অধর সাহার কথা মনে পড়ে গেল বিনুর। যে কিনা বেঁচে থাকতেই নিজের দানসাগর শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা করে রেখেছে। হয়তো দু'জনের নামের মিলের জন্যই এই মনে পড়া। অধর সাহা অবশ্য দেশেই আছে। ইন্ডিয়ায় যাবার কথা ভাবে নি।

অধর তার বাঁ পায়ের প্রকান্ড ব্যান্ডেজ দেখিয়ে বলল, 'এই দ্যাখেন, সড়কি ফেইকা (ছুড়ে) পাও এ-ফোড় ও-ফোড় কইরা ফেলাইছিল। এইর পর ঘেটি থেইকা মাথা লামাইয়া দিত। ভিটায় পইড়া থাকতে আর ভরসা হইল না।'

বোঝা যাচ্ছে, লোকটার বক্তব্য অন্য। সেটা শুরু করার আগে ভণিতা করে নিচ্ছে। বিনু চুপ করে থাকে।

অধর আর অযথা প্যাচাল না পেড়ে আসল কথায় চলে এল। রামরতনকে দেখিয়ে বলল, 'আপনের সুমখে তারপাশার হেই মিঞাছাব ওনারে কইতে আছিল, অবোস্তা এট্টু শান্ত হইলে দ্যাশের ভিটামাটি ব্যাচন (বিক্রি করা) যাইব।'

বিনু বুঝতে পারে, নাসের আলির কথা বলছে অধর। হ্যাঁ, তার সামনেই নাসের সাহেব রামরতনকে এরকম ভরসা দিয়েছিলেন।

বিনু উত্তর দেবার আগেই অধর ফের বলে ওঠে, 'আপনেরে মনে লয়, পণ্ডিত মানুষ।' আবার রামরতনকে দেখিয়ে বলল, 'মিঞাছাব পথে উনাগো দেখাশুনার ভার আপনেরে দিয়া গ্যাছে। আপনে যে সে মানুষ না।'

দেখা যাচ্ছে, বিনুর ওপর আগাগোড়া লক্ষ্য রেখে গেছে অধর। হয়তো স্টিমারঘাটে বসে থাকার সময় থেকেই। যেহেতু নাসের আলির মতো একজন বয়স্ক, শিক্ষিত ভদ্রলোক তাকে রামরতনদের দায়িত্ব দিয়ে গেছেন, অধরের চোখে তার গুরুত্ব অনেক বেড়ে গেছে।

pathagar.net

আগের কথার খেই ধরে অধর বলল, 'আপনের কী মনে লয়, পাকিস্থানে আর কি সুদিন ফিরা আসব? কাটাকাটি খুনাখুনি কি থামব?'

বিনুও জানে না, এখানে যেভাবে ভয় আতঙ্ক আর মত্ততা ছড়িয়ে আছে, সেসব কাটিয়ে আদৌ সুস্থিতি ফিরে আসবে কিনা। এখন যা পরিস্থিতি, কবে যে সব কিছু স্বাভাবিক হবে, মানুষের মধ্যে পারস্পরিক অবিশ্বাস আর ঘৃণা ঘুচে যাবে, সে সম্বন্ধে পরিষ্কার কোনও ধারণা নেই তার। হয়তো অধর ভুঁইমালীর মনে উৎসাহ জাগাবার জন্য বিনু বলল, 'এমন অবস্থা তো চিরকাল চলতে পারে না।' বলেছে ঠিকই, নিজের কানেই কথাগুলো বেখাপ্পা শোনাল তার।

অধরের ভাঙাচোরা মুখ আলো হয়ে ওঠে। কেউ তার আশাকে জিইয়ে রাখুক, এটাই খুব সম্ভব সে চায়। বলল, 'ঠিকই কইছেন বাবুমশয়। ইন্ডিয়ায় গিয়াও বডারের এই পারে তাকাইয়া থাকুম। যদ্দিন শ্বাস তদ্দিন আশ।' একটু থেমে বলল, 'বাপ ঠাউরদার জমিজের ত হগলই তো দ্যাশে পইড়া রইল।'

বিনু জিজ্ঞেস করল, 'দিনকাল ভাল হলে জমি বাড়ি বেচতে আসবেন; রেজিস্ট্রির সময় দলিলপত্র কিন্তু লাগবে।'

অধর বলল, 'হেয়া (তা) জানি।'

রামরতনের দিকে আঙুল বাড়িয়ে বিনু বলল, 'উনি ওঁদের দলিল টলিল নাসের সাহেবের কাছে রেখে যাচ্ছেন। আপনি নিশ্চয়ই বিশ্বাসী কারোর হাতে দিয়ে এসেছেন?'

অধর অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। এধারে ওধারে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে আরও কাছে ঘন হয়ে বসল। বলল, 'দলিলগুলার পাকা ব্যবোস্তা করছি। হারাইব না, নষ্টও হইব না।'

অধর ভুঁইমালী লেখাপড়া জানে বলে মনে হয় না। নিরক্ষরই হবে। তবে বেশ চালাক চতুর। তার বিষয়বুদ্ধিও প্রখর। বিনু আর কোনও প্রশ্ন করল না।

অধর বলল, 'বাবুমশয়, গোয়ালন্দে গিয়া একলগে রেলগাড়িতে চাইপা (চেপে) কইলকাতায় যামু কিলাম—'

রামরতন, হরিন্দদের মতো এই লোকটাও কলকাতা পর্যন্ত গায়ের সঙ্গে জুড়ে থাকবে। কিন্তু কী আর করা যাবে। বিনু বলল, 'ঠিক আছে, যাবেন—'

'এই পেরথম কইলকাতায় যাইতে আছি। শুনছি জবর শহর, কুনহানে আগা কুনহানে শ্যাষ, দিশা পাওন যায় না। আপনের লাখান (মতো) একজন বিদ্বান মানুষ লগে থাকলে ভরসা পাওন যায়। আইচ্ছা, অহন উঠি। পরে আবার আসুম।'

অধর ভুঁইমালী চলে গেল।

বেলা হেলে গেছে। সূর্যটা গড়াতে গড়াতে পশ্চিম দিকে অনেকখানি নেমে গিয়ে থমকে আছে। রোদে এখন গলানো গিনির রং। উত্তর দিকে আকাশের গায়ে হেলান দিয়ে রয়েছে কয়েক টুকরো মেঘ। হেমন্তের মেঘ বর্ষায় না, নীলাকাশের শোভা খানিক বাড়িয়ে দেয়।

স্টিমারের একঘেয়ে গজরানি শুনতে শুনতে কানে তালা লেগে যাচ্ছে। মাথা ঝিম ঝিম। নদীতে সেই একই দৃশ্য। একমাল্লাই, দু'মাল্লাই, চারমাল্লাই, বাদামহীন বা পাল-খাটানো নৌকোর মেলা। যতক্ষণ না তারা গোয়ালন্দ পৌঁছচ্ছে, এর হেরফের হবে না।

ওধার থেকে স্টিমারের দোলানিতে টলতে টলতে রামরতন উঠে এসে বিনুর পাশে বসে পড়লেন। বললেন, 'শুইয়া আছিলাম, কিন্তুক ঘুম আসে নাই। মাথায় বড় দুশ্চিন্তা। তাই চইলা আসলাম।'

ঝিনুক অসাড়ে ঘুমোচ্ছে। চেনাজানা মানুষজনের মধ্যে হরিন্দরাও শুয়ে আছে। অধর ভুঁইমালী অবশ্য নিজে থেকে এসে আলাপ পরিচয় করে গেছে। তাও বেশ খানিকক্ষণ হল। চুপচাপ, একটানা নদী আকাশ নৌকা দেখতে দেখতে ক্লান্তি বোধ করছিল বিনু। রামরতনকে দেখে বলল, 'ভাল করেছেন এসে—'

রামরতন বললেন, 'তোমার সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানি না। কোনখানে বাড়ি আছিল?'

খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বিনুর ব্যাপারে সব জেনে নিলেন রামরতন। এমনকি কলকাতায় গিয়ে সে কোথায় উঠবে, তা ও। তবে ঝিনুক সম্পর্কে কোনও প্রশ্ন করলেন না। অন্য সবার মতো তিনিও ধরে নিয়েছেন,

বিনুক তার স্ত্রী।

রামরতন বললেন, 'কইলকাতায় তোমার বাবা আছেন, বইনেরা আছে। তোমার চিন্তা নাই।'

বিনু বলল, 'আপনারও তো ভাইপো আছে।'

'তা আছে। বিমল পোলা হিসাবে চমৎকার। আমারে শ্রদ্ধা করে, ভালবাসে। ওর মা-বাপ মারা গেছিল অল্প বয়েসে। আমিই ওরে মানুষ করছি। সগলই ঠিক। কিন্তুক কইলকাতায় ভাড়া বাড়িতে থাকে। নিজের সংসার, বউ, পোলা-মাইয়া আছে। তার উপুর আমরা এতজন গিয়া যদি তার কান্ধে চাপি, কী কইরা যে চালাইব!' চিন্তাকুল মুখে রামরতন বলতে লাগলেন, 'দ্যাশ থিকা শ' চাইরেক টাকা, কিছু জামাকাপড়, বাসনকোসন ছাড়া আর কিছুই লগে আনতে পারি নাই। যথাসর্বস্ব ফেলাইয়া যাইতে আছি। কী যে করুম, ভাইবা কূল পাই না।'

কী উত্তর দেবে, ঠিক করে উঠতে পারে না বিনু। এই যে স্টিমার বোঝাই মানুষ সীমান্তের ওপারে চলেছে, কিংবা আরও হাজার হাজার দেশ ছাড়ার জন্য পা বাড়িয়ে আছে, তাদের সবারই তো অবিকল এক সমস্যা।

রামরতন একই সুরে বলতে থাকেন, 'আমার আর আমার স্ত্রীর তিন কাল গেছে। কিন্তুক তিন মাইয়া তো এখনও অনেক দিন বাচব। একটা বিধবা, দুইটার বিয়া দিতে পারি নাই। কী যে ওগো (ওদের) ভবিষ্যৎ, জানি না। ওগো চিন্তায় মইরাও আমি শান্তি পামু না।'

খোলা নদীতে হেমন্তের অফুরান আলো, অপর্যাপ্ত বাতাস, তবু আবহাওয়া কেমন যেন ভারী আর ম্লান মনে হয় বিনুর। অস্পষ্টভাবে সে কিছু একটা উত্তর দেয়, নিজের কাছেই তা পরিষ্কার নয়।

রামরতন বলেন, 'গত আষাঢ় মাসে তিয়াত্তর বৎসরে পড়ছি। শরীরে শক্তি নাই, উৎসাহ নাই। তবে এম. এ'র ডিগ্রিখান আছে। শুনছি, ইস্ট পাকিস্তান থিকা উৎখাত হইয়া যারা ওই পারে যাইতে আছে, ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট তাগো চাকরি বাকরির ব্যবস্থা কইরা দিতে আছে। আমি কি একটা কিছু কাজকর্ম পামু না?'

বিনুর মনে হল, তাকে সামনে বসিয়ে রামরতন যেন নিজের সঙ্গেই কথা বলছেন, নিজেকেই প্রশ্ন করছেন। তাঁকে ভরসা দেবার জন্য সে বলে, 'নিশ্চয়ই পাবেন। পণ্ডিত মানুষ আপনি, এত বছরের পড়ানোর অভিজ্ঞতা। আপনার মতো একজনকে পাওয়া তো যে কোনও স্কুলের পক্ষে ভাগ্যের কথা।'

'কিন্তু আমার এই বয়সে কি স্কুলে নিব?'

'নেওয়া তো উচিত।'

সংশয়ের সুরে রামরতন বলেন, 'কী জানি!' ভবিষ্যতের চিন্তায় তিনি ব্যাকুল হয়ে পড়েন। একটু চুপচাপ।

তারপর রামরতন হঠাৎ গলার স্বর উঁচুতে তুলে আবার বলে ওঠেন, 'যুবক বয়সে একটা মহা ভুল কইরা ফেলাইছিলাম। অখন সেই কথা ভাইবা অনুশোচনার শ্যাষ নাই—'

ঠিক কী বলতে চান রামরতন, ধরতে না পেরে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকে বিনু।

রামরতন থামেননি, 'এম. এ পাস করার পর সিদ্ধান্ত নিছিলাম, নেশান বিল্ডিংয়ের কামে লাগুম। গ্রামে গিয়া জ্ঞানের আলো বিতরণ করুম। আইডিয়ালিয়াজিমের দানব কান্ধে চাপছিল। স্বপ্ন দেখতাম, আমার হাত দিয়া হাজার হাজার ছাত্র বাইর হইব। তারা দ্যাশরে নানান দিক দিয়া আগাইয়া নিয়া যাইব। কত বড় বড় চাকরির অফার আইছিল কইলকাতা থিকা। তখন যদি চইলা যাইতাম, শ্যাষ জীবনে এই দুর্গতি হইত না।'

তাঁর আক্ষেপের কারণ এবার স্পষ্ট হয়ে যায়। আস্তে মাথা নাড়ে বিনু।

রামরতন অদ্ভুত এক ঝোঁকে একটানা বলে যান, 'কী নেশান বিল্ড করছি একবার ভাবো। জমিজমা ভিটামাটি ছাইড়া মাথার উপুর দুই আনম্যারেড যুবতী মাইয়া আর এক বিধবা মাইয়া লইয়া চইলা যাইতে আছি। শিক্ষারতী হইয়া কী লাভটা হইল? স্বার্থপর হওয়া উচিত ছিল আমার, সেলফ-সেন্টারড

হওয়া উচিত ছিল, নিজের বুঝ বুইঝা নেওয়া উচিত ছিল। বৃদ্ধ বয়সে পথের ভিখারি হইয়া গেলাম।'

রামরতনের কথা শেষ হতে না হতেই আচমকা স্টিমারের ইঞ্জিন থেকে বিকট ঘড় ঘড় আওয়াজ আসতে লাগল। দু'পাশের চাকাগুলো এখন আর আগের মতো জোরে জোরে ঘুরছে না। বিশাল জলযানের গতি কমে আসছে। সেটা মাঝনদী থেকে ক্রমশ ডান ধারে পাড়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

দোতলার ডেক জুড়ে যারা ঢুলছিল বা ঘুমিয়ে ছিল, তারা ধড়মড় করে উঠে বসে। বিনুরা যেখানে বসে আছে সেখান থেকে একতলা এবং তেতলার ডেকের অনেকটা অংশ চোখে পড়ে। ওই দুই ডেকের যাত্রীদের একই অবস্থা। সবাইকে বেশ উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে।

নানা দিক থেকে শোরগোল ভেসে আসছিল।

'কী হইল? কী হইল?'

'ইস্টিমার কিনারে যায় ক্যান? সিধা মইদ্য গাঙ দিয়া যাওনের কথা—'

কে একজন বলে ওঠে, 'শুনছি আইজকাইল গোয়ালন্দের দিকে অনেক কালের পুরানা ঝঝ্ইরা ইস্টিমার দিতে আছে। কিছুদূর গিয়া হেইগুলা থাইমা যায়, সারাইয়া সুরাইয়া আবার কিছু সোময় চলে। এইভাবে গোয়ালন্দে পৌঁছায়—'

আরেক জন বলল, 'দ্যাশ ছাইড়া যারা যাইতে আছে তাগো উপুর মায়া দয়া নাই।'

'ইস্টিমার কিনারে নিয়া যাইতে আছে ক্যান, বুঝি না—'

রামরতন আর বিনু সবার কথা শুনতে পাচ্ছিল। চিন্তাগ্রস্তের মতো রামরতন বললেন, 'আমাগো যা অদৃষ্ট, সহজে কিছু হওনের উপায় নাই। কী হইছে, খবর নিয়া আসতে পার?'

সবাই জেগে গেলেও ঝিনুকের ঘুম ভাঙেনি। রামরতনকে তার পাশে বসে থাকতে বলে বিনু উঠে পড়ল।

যাত্রীদের জিজ্ঞেস করে সদুত্তর পাওয়া যাবে না। তারা জানেই বা কী? খুঁজে খুঁজে একতলায় গিয়ে সারেঙকে ধরল বিনু। লোকটা ভদ্র। মোটামুটি স্বীকার করে নিল, স্টিমারটা মান্ধাতার আমলের। ইঞ্জিনে গোলযোগ দেখা দিয়েছে। তবে দুশ্চিন্তার কারণ নেই। মেরামত করে দু'চার ঘন্টার ভেতর ছেড়ে দেওয়া হবে। তীরের কাছে নিয়ে যাবার কারণ এইভাবে ব্যাখ্যা করলেন। কলকব্জার ব্যাপার তো, সারাই করতে যদি দেরি হয়ে যায় অসুবিধা দেখা দেবে। স্টিমারে রসদ ফুরিয়ে এসেছে; পাড়ের কাছে থাকলে গ্রাম থেকে জোগাড় করে আনা যাবে।

বিনু ফিরে এসে রামরতনকে সব জানিয়ে দেয়।

রামরতন উদ্বিগ্ন মুখে বললেন, 'দ্যাশ ছাইড়া যারা যাইতে আছে, শুনছি নদীতে তাগো উপর হামলা হয়।'

বিনু নিজেই যে ভুক্তভোগী, সেটা আর জানালো না।

রামরতন আবার বললেন, 'স্টিমারে তেমন কিছু হইছে বইলা শুনি নাই। নদীর কিনারের কাছে অনেকক্ষণ খাড়ইয়া থাকলে কী হইব জানি না।'

অর্থাৎ পাড়ের কাছাকাছি স্টিমার কয়েক ঘন্টা দাঁড়িয়ে থাকলে, হানাদারদের চড়াও হবার সম্ভাবনা আছে। এমনই আশঙ্কা রামরতনের। দেশের যা অবস্থা তাতে বৃদ্ধের মনোবল বিশেষ কিছু অবশিষ্ট নেই। সবসময় তিনি উতলা হয়ে থাকেন।

বিনু বলল, 'আমরা এত লোক রয়েছি। মনে হয়, তেমন কিছু হবে না।'

রামরতন বললেন, 'না হইলেই মঙ্গল।'

স্টিমার নদীর পাড় থেকে তিনশ' সাড়ে তিনশ' হাত দূরে থেমে গেল। দু'ধারের চাকা এখন ঘুরছে না। ইঞ্জিনের ঘড়ঘড়ানি বন্ধ হয়ে গেছে।

রামরতন এবার বললেন, 'আর বইসা থাকতে পারতে আছি না। যাই, কিছুক্ষণ শুইয়া থাকি গিয়া—'

বিনু রামরতনের হাত ধরে তাঁর স্ত্রী এবং মেয়েদের কাছে পৌঁছে দিয়ে এল।

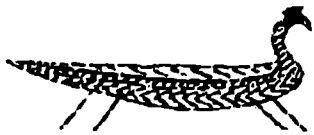

সন্ধের পর খালাসিরা তিনটে ডেকে টিমটিমে আলো জ্বেলে দিয়েছিল। তারপর শুরু হয়েছিল ইঞ্জিন মেরামতির কাজ। ঠুকঠাক, খটখট, ঘটাং ঘটাং—কত রকমের যে আওয়াজ।

তারই মধ্যে একসময় চিঁড়ে গুড় খেয়ে শুয়ে পড়েছিল বিনু আর ঝিনুক। সারা শরীর জুড়ে ক্লান্তি ছড়িয়ে ছিল। শোবার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়েছে বিনু। তারা যখন শোয়, স্টিমারের যাত্রীদের অনেকেই জেগে বসে ছিল।

কার ডাকাডাকিতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। চোখ মেলে বিনু দেখতে পায়, সাদা থান পরা কেউ একজন কাছে দাঁড়িয়ে আছে। ঘুমের ঘোর পুরোপুরি কাটেনি। ডেকের নিস্তেজ আলোয় প্রথমটা চিনতে পারল না সে। জিজ্ঞেস করল, 'কে?'

মেয়েটি বলল, 'আমি বাসন্তী। বাবার শরীর খারাপ হইছে। মা আপনেরে ডাইকা নিয়া যাইতে কইল।' তার গলায় গভীর উৎকণ্ঠা।

এবার চেনা গেল। রামরতনের সেই মাঝবয়সী বিধবা মেয়ে। হাতের ভর দিয়ে দ্রুত উঠে পড়ে বিনু।

ঝিনুক চাদর মুড়ি দিয়ে ঘুমোচ্ছে। তিনটে ডেকের একজন যাত্রীও জেগে আছে বলে মনে হল না।

স্টিমার জল তোলপাড় করে এখন ছুটে চলেছে। বিনু যখন ঘুমোচ্ছিল সেই সময় ইঞ্জিন সারাই হয়ে গিয়েছে। তখন সেটা চলতে শুরু করেছে, টের পাওয়া যায়নি। নদী, আকাশ, দুই তীর, কিছুই দেখা যাচ্ছে না। গাঢ় কুয়াশায় এবং অন্ধকারে সব ঢেকে আছে। এখন কত রাত, কে জানে।

বিনু গিয়ে দেখল, বুক দু'হাতে খামচে ধরে ছটফট করছেন রামরতন। তাঁর গলা থেকে ক্ষীণ, কাতর শব্দ বেরিয়ে আসছে। তাঁকে ঘিরে বসে আছে তাঁর স্ত্রী এবং দুই অবিবাহিত তরুণী মেয়ে। কেউ মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে, কেউ হাত-পা টিপছে। সবাই ভীষণ দিশেহারা। কিভাবে শুশ্রূষা করলে রামরতনের কষ্ট লাঘব হবে, তারা ভেবে পাচ্ছিল না।

বিনু জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছে ওঁর?'

রামরতনের স্ত্রী বললেন, 'বুঝতে পারতে আছি না। ঘুমাইয়া আছিল। খানিকক্ষণ আগে আতখা (হঠাৎ) চিৎকার কইরা আমাগো ডাইকা তুলল। কইল ভীষণ বেদনা। কয় আর ছটফট করে। আমরা ডরাইয়া গেলাম। এত রাইতে কী করুম, দিশা করতে না পাইরা বড় মাইয়ারে তোমার কাছে পাঠাইছি।'

'ভাল করেছেন। কিন্তু বিকেলেও তো উনি সুস্থ ছিলেন। আমার সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা বললেন।'

'হ। তোমার লগে কথা কইয়া আইসা সন্ধ্যা তরি (পর্যন্ত) শুইয়া আছিল। হেরপর উইঠা খাইল। খাইয়া আবার শুইল। তহনও তো ভালই আছিল—'

রামরতনের পাশে বসে পড়ল বিনু। ডাকতে লাগল 'স্যার, স্যার—'

প্রথমটা সাড়া পাওয়া গেল না। বেশ কয়েক বার ডাকার পর চোখ আধাআধি মেললেন রামরতন।

বিনু অনেকখানি ঝুঁকে জিজ্ঞেস করল, 'কী কষ্ট হচ্ছে?'

রামরতন নিজের বুক থেকে হাত সরাননি। আগের চেয়েও জোরে খামচে ধরেছেন। তাঁর নখ জামার ওপর দিয়ে চামড়ার মাংসে গেঁথে যাচ্ছে। গোঙানির মতো শব্দ করে কোনও রকমে বোঝালেন, ভীষণ যন্ত্রণা হচ্ছে।

রামরতনের স্ত্রী বললেন, 'যদি ডাক্তার পাওন যাইত—'

বিনুও ঠিক তা-ই ভাবছিল। কিন্তু যে ছিন্নমূল মানুষের দল সর্বস্ব খুইয়ে দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছে তাদের জন্য স্টিমারে ডাক্তার থাকবে, সেটা নেহাতই দুরাশা। তবু একটা বৃদ্ধ মানুষ চোখের সামনে এত ক্লেশ ভোগ করবেন, আর সে চুপচাপ বসে থাকবে, তা হতে পারে না।

বিনু উঠে পড়ল। বলল, 'দেখি কী করা যায়—'

সারেঙ লোকটাকে ভাল লেগেছিল বিনুর। তাঁর সঙ্গে কিন্তু এবার দেখা করা গেল না। তিনি ইঞ্জিন ঘরে রয়েছেন। দু'জন খালাসিকে অবশ্য পাওয়া গেল। যা ভাবা গিয়েছিল তা-ই। খালাসিরা জানায়, স্টিমারে ডাক্তার নেই।

হতাশ বিনু ফিরে আসে। রামরতনের স্ত্রী এবং মেয়েরা উদ্বিগ্ন মুখে বসে ছিল। সে তাদের বলল, 'না, পাওয়া গেল না—'

বিহ্বলের মতো রামরতনের স্ত্রী বললেন, 'অখন তা হইলে কী করা? ওষুধ বিষুধ না পড়লে—' বলতে বলতে থেমে গেলেন।

বিনু উত্তর দিল না। রামরতনের যন্ত্রণার উৎস যে বুকে সেটা আগেই জানা গিয়েছিল, কিন্তু কারণটা অজানা। এই পরিস্থিতিতে কী করা উচিত, সে প্রথমটা ভেবে পাচ্ছিল না। তারপর মরিয়া হয়ে রামরতনের হাত সরিয়ে জামার ভেতর নিজের হাত ঢুকিয়ে বুকটা ডলতে থাকে। কার কাছে সে যেন শুনেছিল, অতিরিক্ত মানসিক চাপে এবং উৎকণ্ঠায় নাকি এরকম বুকের ব্যথা হয়।

বেশ কিছুক্ষণ ডলার পর রামরতনের ছটফটানি কমে আসে। এখন তিনি অনেকটা শান্ত। কাতরানিও বন্ধ। চোখ বুজে গেছে। বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছেন। মনে হচ্ছে, কষ্টের উপশম হয়েছে।

বুকে মালিশ করাটা ঠিক হয়েছে কিনা, সে সম্বন্ধে যথেষ্ট সংশয় আছে বিনুর। রামরতনের ক্ষতি হল কিনা, বোঝা যাচ্ছে না।

তারপাশায় ঝিনুকের জ্বর হয়েছিল। ডাক্তার পাওয়া যায়নি। তবে ওষুধের দোকানে গিয়ে বলতে যে ওষুধ দিয়েছিল তাতে কাজ হয়েছে। যাদের ওষুধের কারবার তাদের প্রচুর অভিজ্ঞতা। কোন রোগে কী ওষুধ খেতে হয়, মোটামুটি ওরা জানে। রামরতনের যন্ত্রণাটা যদি তারপাশায় হত, লক্ষণ জানিয়ে ওষুধ নিয়ে আসা যেত।

বিনু জিজ্ঞেস করে, 'এরকম কষ্ট কি স্যারের আগেও হয়েছে?'

রামরতনের স্ত্রী বললেন, 'না।'

'আমি এখন যাই। আবার যদি যন্ত্রণা হয়, আমাকে ডাকবেন।'

'ডাকুম।'

বিনু নিজের জায়গায় ফিরে এসে ফের শুয়ে পড়ে।

কুয়াশা আর অন্ধকার যেভাবে নদীর ওপর জমাট বেঁধে আছে, রাত ফুরোতে এখনও অনেক দেরি।

বেশ কিছুক্ষণ ধরে অস্পষ্ট শোরগোল কানে আসছিল। ঘুমের ঘোরে মনে হচ্ছিল, বহু দূরের অলীক কোনও শব্দ। স্বপ্নে যেমন শোনা যায়। কিন্তু আওয়াজটা ক্রমশ বাড়ছে। বেড়েই চলেছে।

ঘুমটা হঠাৎ ছিঁড়ে খুঁড়ে গেল বিনুর। রাতের আঁধার আর নেই। আকাশ যেখানে নদীর সঙ্গে দিগন্তে একাকার হয়ে আছে, রক্তবর্ণ সূর্য সেখান থেকে উঠে আসছে। কুয়াশা কেটে যাচ্ছে দ্রুত। আলোয় ভরে যাচ্ছে চরাচর।

হাতের ভর দিয়ে উঠে বসল বিনু। যে হইচইটা ঘুমের ভেতর আবছাভাবে শুনেছিল, স্টিমারের তিনটে ডেক জুড়ে সেটা চলছে। যেদিকে তাকানো যায়, তুমুল ব্যস্ততা। সবাই তাদের পোঁটলা পুঁটলি ডালাকুলো বাক্সবিছানা গুছিয়ে নিচ্ছে।

স্টিমার গজরাতে গজরাতে জল কেটে চলেছে। ইঞ্জিনের ধকধকানিও শোনা যাচ্ছে।

হরিন্দর গলা কানে এল, 'ছুটোবাবু, বউ-ঠাইনরে জাগান। গোয়ালন্দ আইসা গেল। উই দ্যাখেন—' পাড়ের দিকে আঙুল বাড়িয়ে দিল সে।

দূরে, নদীর কোনাকুনি স্টিমারঘাট দেখা যাচ্ছে। এত চাঞ্চল্য এবং শোরগোলের কারণ এতক্ষণে

বোঝা গেল। স্টিমার থেকে নেমেই ট্রেন ধরতে হবে। তারই প্রস্তুতি চলছে।

বিনুকের ঘুম ভাঙেনি। বিনু তাকে জাগিয়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি কল-ঘরে নিয়ে গেল। তাদের লটবহর নেই বললেই হয়। দু'টো মোটে চাদর। দু'জনে মুখটুখ ধুয়ে ফিরে এসে চাদর ভাঁজ করে নিল। ত্রিদিবরা শোবার জন্য সেই সুজনিটা দিয়েছিল। সেটা ফেরত দিতে গিয়ে রামরতনদের দিকে বিনুর চোখ চলে যায়। অসুস্থ মাস্টারমশাইয়ের খোঁজ নেওয়া দরকার। তা ছাড়া, ওঁদের মালপত্র গোছগাছ করে দিতে হবে। অশক্ত, অপটু বৃদ্ধের পক্ষে সব কিছু সামলে নামানো সম্ভব নয়। তাঁর স্ত্রীকে বিনু যেটুকু দেখেছে, মনে হয়েছে বৃদ্ধার স্বাস্থ্য খুব নড়বড়ে। বাকি রইল তিন মেয়ে। লটবহর টানাহ্যাঁচড়া করে ভিড় ঠেলে স্টিমারঘাটে নামানো, তারপর ধাক্কাধাক্কি করে ট্রেনে ওঠা—এ সব কি মেয়েদের কাজ? যা করার বিনুকেই করতে হবে। এই অসহায় পরিবারটার ওপর কেমন এক দায়িত্ববোধ এসে গেছে তার। তা ছাড়া, কাল রাতে বুক মালিশ করে দেবার পর রামরতন কেমন আছেন সে সম্বন্ধে যথেষ্ট উৎকণ্ঠাও রয়েছে।

বিনু রামরতনদের কাছে চলে আসে। সকাল হলেও রামরতন এখনও শুয়ে আছেন। চোখ বোজা, খুব সম্ভব ঘুমোচ্ছেন। তাঁর স্ত্রী এবং মেয়েরা বৃদ্ধকে ঘিরে বসে আছে। মুখচোখ দেখে মনে হচ্ছে, সারা রাত ওরা ঘুমোয়নি।

বিনু বলে, 'কাল রাতে আপনাদের এখান থেকে যাবার পর ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। তাই খবর নিতে পারিনি। স্যারের বুকের কষ্টটা আর হয়নি তো?'

রামরতনের বিধবা মেয়ে অর্থাৎ বাসন্তী বলল, 'না।'

দুর্ভাবনা কাটে বিনুর। জিজ্ঞেস করে, 'সেই থেকেই ঘুমোচ্ছেন?'

'হু।'

'এবার ওঁকে জাগাতে হবে। গোয়ালন্দ এসে গেছে।'

বাসন্তী বেশ কয়েক বার ডাকার পর চোখ মেলে তাকালেন রামরতন। আস্তে আস্তে উঠে বসে শিয়রের কাছে রাখা নিকেল ফ্রেমের চশমাটা পরে নিলেন।

বিনু জিজ্ঞেস করল, 'এখন কেমন লাগছে স্যার?'

রামরতন বললেন, 'কাইল রাইতের থনে অনেক ভাল। তবে বুকের বেদনাটা পুরাপুরি যায় নাই।'

'আরও কিছুক্ষণ ঘুমোতে পারলে বাকি কষ্টটুকু থাকত না। কিন্তু তার উপায় নেই। আমাদের নামার সময় হয়েছে। তাই আপনাকে জাগাতে হল।'

'গোয়ালন্দ আইসা গেল নিকি?'

'হ্যাঁ। স্টিমার থেকে নেমে খোঁজ করে দেখব, যদি ডাক্তার পাওয়া যায়—'

রামরতন বললেন, 'অখন আর দরকার নাই। একেবারে কইলকাতায় গিয়া চিকিৎসা করামু—'

বিনু বলল, 'আপনি বিছানা থেকে নেমে বসুন। মালপত্র গোছাতে হবে—'

'হ হ, ঠিকই। আমার আর আমার স্ত্রীর বয়স হইছে। শরীরে শক্তি নাই। মাইয়ারাও এই সব পারব না।' রামরতন বলতে লাগলেন, 'তোমার লগে দেখা না হইলে কী বিপদে যে পড়তাম!'

কিন্তু উঠে দাঁড়াতে গিয়ে মাথা টলে গেল রামরতনের। মুখ থুবড়ে হুড়মুড় করে পড়েই যেতেন, বিনু আর বাসন্তী ধরাধরি করে বিছানা থেকে নামিয়ে ডেকের পাটাতনে তাঁকে বসিয়ে দিল। বোঝাই যাচ্ছে, কাল রাতের ধাক্কাটা সম্পূর্ণ কাটিয়ে উঠতে পারেননি বৃদ্ধ। সুস্থ, স্বাভাবিক হয়ে উঠতে তাঁর সময় লাগবে।

বিনু জিজ্ঞেস করল, 'শরীরটা আবার কি খুব খারাপ লাগছে?'

মাথাটা এলিয়ে পড়েছিল রামরতনের। চোখের পাতা বুজে গেছে। ক্ষীণ স্বরে বললেন, 'খাড়ইতে গিয়া মাথা ঘুইরা গেল। চাইর দিক অন্ধকার।'

'কিছুক্ষণ শুয়ে নেবেন স্যার?'

'না না, অখন শুইলে স্টিমারঘাটায় নাইমা আইজ আর ট্রেন ধরতে পারুম না। তুমি গোছগাছ কইরা ফেলাও। বাসন্তী আমারে ধইরা থাকুক।'

শুধু বাসন্তীই নয়, রামরতনের অন্য দুই মেয়েও তাঁকে তিন দিক থেকে ধরে থাকে। বুড়ো মানুষটি ভারসাম্য হারিয়ে পড়ে গেলে নতুন বিপদ।

বিনু হরিন্দকে ডেকে দু'জনে ক্ষিপ্র হাতে বাঁধাছাঁদা শেষ করে ফেলে। ততক্ষণে স্টিমার গোয়ালন্দের জেটিঘাটে পৌঁছে গেছে।

তারপাশায় স্টিমারে ওঠার জন্য যেমন মরণপণ গুঁতোগুঁতি ধাক্কাধাক্কি আর খিস্তিখেউড় চলেছিল, এখানেও গ্যাংওয়ে দিয়ে নামার জন্য সেই একই দৃশ্য। সবার ধারণা, আগে নামতে পারলে কলকাতার ট্রেনে আগে উঠতে পারবে।

অধর ভুঁইমালী আর হরিন্দর প্রচুর লটবহর, তাছাড়া বউ ছেলেমেয়ে। তবু বিনুর ডাকে তারা সাড়া দিল। নিজেদের মালপত্রের সঙ্গে রামরতনদের বাক্স বিছানা টিছানা কাঁধে এবং মাথায় তুলে বৃদ্ধকে ধরাধরি করে স্টিমার থেকে নামিয়ে আনল।

একটা ব্যাপারে বিনু কিছুটা হলেও দুশ্চিন্তামুক্ত। ঝিনুকের সেই আতঙ্কগ্রস্ত ভাবটা অনেকখানিই কেটে গেছে। গোয়ালন্দে পৌঁছবার পর তার হয়তো ধারণা হয়েছে, এবার নির্বিঘ্নে কলকাতায় চলে যেতে পারবে। তা ছাড়া, আন্দাজে ওষুধ দিলেও তার জ্বর ছেড়ে গিয়েছিল, নতুন করে সেটা আর আসেনি।

জেটিঘাটের বাইরে খানিকটা গেলে বিশাল ফাঁকা জায়গা। তার একধারে টিনের চালের সারি সারি হোটেল, নানা ধরনের দোকানপাট। একটু দূরে রেল লাইন। সেখানে কলকাতার ট্রেনের চিহ্নমাত্র নেই।

ফাঁকা জায়গাটায় আগে থেকে অগুনতি ভিটেমাটি খোয়ানো মানুষ বসে আছে। তারপাশার স্টিমারঘাটে যেমনটা দেখা গিয়েছিল, অবিকল সেই দৃশ্য। কলকাতার ট্রেনের জন্য তারা অপেক্ষা করছে।

বিনু শুনেছে, দিনে একটাই ট্রেন কলকাতায় যায়। এত লোক আগে থেকে জমা হয়েছে, তার ওপর তারা এসে সংখ্যাটা অনেক বাড়িয়ে দিল। আজ আদৌ ট্রেনে ওঠা যাবে কিনা, কে জানে।

একসময় বিনুরা থিকথিকে ভিড়ের ভেতরে একটু জায়গা করে বসে পড়ে। মাটির ওপরেই দ্রুত বিছানা পেতে রামরতনকে শুইয়ে দেওয়া হল। উর্দি-পরা রেলের কিছু কর্মচারী এবং কয়েকজন পুলিশ কনস্টেবলকে ঘোরাঘুরি করতে দেখা যাচ্ছে।

বিনুদের ডান পাশে রয়েছে রামরতনরা, তারপর হরিন্দ এবং অধর ভুঁইমালীর পরিবার।

স্টিমারে রামরতনের যে উপসর্গ দেখা দিয়েছিল সেটা এখনও কাটেনি। চোখ বুজে, নির্জীবের মতো তিনি শুয়ে আছেন। এই অসুস্থ বুড়ো মানুষটাকে কিভাবে ট্রেনে তোলা সম্ভব হবে, কিভাবেই বা ধকল সয়ে তিনি কলকাতায় পৌঁছতে পারবেন, কে জানে।

অন্য যারা আগে থেকেই বসে ছিল তাদের চোখেমুখে দুশ্চিন্তার ছাপ। ট্রেন কখন আসবে, এই নিয়ে তারা নানা মন্তব্য করছিল। একসঙ্গে বহু লোক কথা বললে যা হয়, সারা এলাকা জুড়ে ভনভনে গুঞ্জন চলছে।

হেমন্তের বেলা অনেকটা চড়েছে। রোদের তেজও পাল্লা দিয়ে বাড়ছে। তবে নদীর ওপর দিয়ে ঠাণ্ডা উত্তুরে হাওয়া ছুটে আসায় রোদের আঁচ তেমন গায়ে লাগে না। বেশ আরামদায়ক মনে হয়।

এর আগে হেমনাথের সঙ্গে দু'চার বার গোয়ালন্দে এসেছে বিনু। এখানকার হোটেলগুলো তেমনই রয়েছে। মালিকরা কেউ ইন্ডিয়ায় চলে যায়নি। হাজারে হাজারে মানুষ দেশ ছেড়ে চলে যাওয়ায় তাদের ব্যবসা বরং ফুলে ফেঁপে উঠেছে।

পুরনো দিনের মতোই হোটেলের টাউটরা ভিড়ের ভেতর ঘোরাঘুরি করছে। খদ্দের টেনে নিয়ে যাবার কতরকম কসরত তাদের।

এক দালাল তাদের হোটেলের অজস্র মহিমা কীর্তন করে জানায়, 'পাবদা মাছ, রুইত মাছ, বোয়াল মাছ, খাসির মাংসে—যা চাইবেন হেয়াই (তাই) পাইবেন। প্যাটচুক্তি পাচ সিকা। আমাগো পাকা পাইখানাও আছে।' অর্থাৎ সুখাদ্যের অতিরিক্ত ইট সিমেন্ট বাঁধানো পায়খানার আরামও পাওয়া যাবে।

pathagar.net

পেটে যত ভাত-মাছ-তরকারি আঁটে তার জন্য মূল্য মাত্র পাঁচ সিকে বা এক টাকা চার আনা।

অন্য টাউটরাও একই সুরে বলে যায়। তাদের ব্যবস্থাও অতি উত্তম। কারোর হোটেলে পাওয়া যাবে শিলং মাছ, বাচা মাছ, কারোর হোটেলে চিতলের পেটি, বড় গোলসা ট্যাংরা ও টাটকিনি মাছ। সেই সঙ্গে পাকা পায়খানার ব্যবস্থা তো আছেই।

কেউ কেউ বলছে, 'টেরেনে (ট্রেনে) ওঠনের আগে প্যাট ভইরা খাইয়া লন। এইর পর কবে ভাত পাইবেন ঠিক নাই।'

এই লোকগুলোর খদ্দের টানার কৌশল, কথা বলার চমৎকারিত্বে মুগ্ধ হয়ে যায় বিনু। ভূ-ভারতে এমন করে কেউ লোক ভজাতে পারে কিনা, তার জানা নেই। দুশ্চিন্তার চাপ থাকা সত্ত্বেও সে বেশ মজাই পায়।

যে মানুষগুলো ভিটেমাটি ফেলে প্রায় খালি হাতে দেশ ছাড়ছে তাদের বেশির ভাগেরই মাথাপিছু পাঁচ সিকে খরচ করে উৎকৃষ্ট আহার করার মতো শৌখিনতা নেই। যারা কিছু পয়সা নিয়ে আসতে পেরেছে তাদের কেউ কেউ অবশ্য টাউটদের সঙ্গে হোটেলে যাচ্ছে।

অধর ভুঁইমালী বা হরিন্দরা টাউটদের ফিরিয়ে দিল। হাতে যদি কিছু সম্বল থাকেও, ভালমন্দ খেয়ে উড়িয়ে দেবে না, দুর্দিনের জন্য রেখে দেবে। রামরতনের শরীরের যা হাল তাতে তাঁর মেয়েরা বা স্ত্রী খেতে যাবেন না। বাসন্তীর অবশ্য হোটেলে খাওয়ার প্রশ্নই নেই। সে ব্রাহ্মণের ঘরের বিধবা, নিশ্চয়ই নিরামিষ খায়।

পরিচিত মানুষগুলোকে ফেলে হোটেলে যাবার ইচ্ছে নেই বিনুর। তবু ঝিনুককে জিজ্ঞেস করল, 'ভাত খেয়ে নেবে?'

রামরতন হরিন্দদের দেখিয়ে ঝিনুক বলল, 'ওরা খাবে না। আমাদের খেতে যাওয়া কি উচিত হবে?'

বিনুও তা-ই ভেবেছে। বলল, 'তা হলে থাক। সঙ্গে যা চিঁড়ে মুড়ি আছে, একটা দিন ঠিক চলে যাবে। তারপর সবার যা হবে, আমাদেরও তাই হবে।'

তাদের ঠিক বাঁ পাশে রয়েছে জন ছয়েকের একটি পরিবার। পঞ্চাশ ছুঁই ছুঁই একটা ঢ্যাঙা, রোগাটে চেহারার লোক পরিবারটির কর্তা। তার লম্বা মুখ, থ্যাবড়া থুতনি, চওড়া কপালের চামড়ায় জালি জালি কালচে দাগ, গর্তে বসা চোখ, চামড়া ঘেঁষে ছোট ছোট করে ছাঁটা চুল। পরনে ফতুয়া আর খাটো ধুতি। গলায় তুলসীর মালা, হাতে রুপোর তাবিজ।

লোকটা মাথা ঝুঁকিয়ে হাতজোড় করে বলল, 'পরণাম (প্রণাম)।'

বিনুকে দেখলে বড় ঘরের শিক্ষিত যুবক মনে হয়। অক্ষরপরিচয়হীন চাষাভুষো ধরনের গেঁয়ো লোকেরা তাকে যথেষ্ট সম্মান দিয়ে কথা বলে।

বিনু বলল, 'নমস্কার।'

লোকটা বলে, 'আমার নাম ভোবন দাস। কিছুক্ষণ আগে ইস্টিমার থিকা আপনাগো লাইমা আসতে দেখলাম। ভিটামাটি আছিল কোন গেরামে?'

ভোবন অর্থাৎ ভুবন দাস। বিনু বলল, 'রাজদিয়া। আপনারা কোত্থেকে আসছেন?'

'তাহেরগঞ্জ।' ভুবন দাস নদীর ওপারে, বহুদূর দিগন্তের দিকে আঙুল বাড়িয়ে দিয়ে বলে, 'লৌহজং পার হইয়া চাল্লিশ মাইল গ্যালে আমাগো গেরাম।' গলা নামিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আপনেগো রাইজদার খবর কী? বড়সড় গণ্ডগোল হইছে নিকি?'

বিনু জানায়, রাজদিয়াতে তেমন কিছু ঘটেনি, তবে সেখানকার আবহাওয়া খুবই উত্তপ্ত।

ভুবন দাস বলল, 'আমাগো উই দিকেও কিছু হয় নাই। জিগাইতে পারেন, তয় (তবে) দ্যাশ ছাইড়া যাইতে আছি ক্যান? তরাসে—তরাসে। গেরামের মেলা (বহু) মানুষ গ্যাছে গিয়া। কার ভরসায় থাকুম?' একটু থেমে বলল, 'আইজ কিছু হয় নাই। কাইল যে হইব না, ক্যাঠা (কে) কইব?'

বিনু অন্যমনস্কর মতো ভাবল, এত মানুষ যে পালিয়ে যাচ্ছে তার বড় কারণ সর্বগ্রাসী ভয়। তাদের সাহস আর আত্মবিশ্বাসের ভিত ধসে পড়েছে। বলল, 'গ্রাম থেকে কবে এখানে এসেছেন?'

'পরশু বিকালে।'

pathagar.net

'এখনও ট্রেন ধরতে পারেননি?'

ভুবন হাসল, 'পারলে কি বউ পোলাপান লইয়া খুলা জাগায় (জায়গায়) পইড়া থাকি? পরশু একহান টেরেন দিছিল। মাইনষের গুতাগুতিতে উঠতে পারি নাই। কাইল গাড়ি দ্যায় নাই। আইজ দিব কিনা, ভগমান জানে—'

স্টিমারের মতো ট্রেনও তা হলে অনিশ্চিত। নিয়মিত কলকাতায় যাতায়াত করছে না। কিন্তু কী আর করা যাবে? অপেক্ষা করা ছাড়া গতি নেই।

ভুবন বলল, 'একহান কথা জিগাই—'

'কী?'

'ইণ্ডিয়ায় তো আগে কুনোকালে যাই নাই। শুনতে আছি সোনার দ্যাশ। এইপার থিকা যারা যাইতে আছে হেগো (তাদের) নিকি মেলা জমিন আর ট্যাকাপয়সা দিতে আছে?'

বিনু এ সম্বন্ধে স্পষ্ট কিছুই জানে না। তবে এপারের মানুষজনের অনেকেরই ধারণা, উদ্বাস্তু হয়ে যারা সীমান্তের ওপারে যাচ্ছে তাদের প্রচুর সুযোগ সুবিধা দেওয়া হচ্ছে। সে বলল, 'কে বলল আপনাকে?'

ভুবন বলল, 'শুনাশুন কানে আইছে।'

'আমার জানা নেই।' আস্তে আস্তে মাথা নাড়ে বিনু।

আশায় ভুবনের চোখ চকচকে করে। সে বলে, 'অ্যাতখানি বয়স তরি চাষবাস ক্ষেতি উতি ছাড়া তো কিছু বুঝি নাই। জমিন পাইলে বাইচা যামু—'

বিনু আর বসল না। ট্রেনের ব্যাপারে শত চেষ্টা করেও নিজেকে নিস্পৃহ রাখা যাচ্ছে না। খোঁজখবর নেওয়া দরকার। ঝিনুককে বলল, 'তুমি একটু বোসো, আমি আসছি।'

ঝিনুক জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় যাচ্ছ?' তার চোখেমুখে দুশ্চিন্তার ছাপ। আসলে এক মুহূর্ত বিনুকে সে কাছছাড়া করতে চায় না।

কোথায় যাচ্ছে, জানালো বিনু। তারপর দূরে যেখানে রেলের চার পাঁচজন কর্মচারী জটলা করছে, পায়ে পায়ে সেখানে চলে আসে। জিজ্ঞেস করে, 'আজ কি কলকাতার ট্রেন পাওয়া যাবে?'

একজন বয়স্ক কর্মচারী, মুখভর্তি কাঁচাপাকা দাড়ি, বলল, 'পাওয়ার তো কথা। হেরপর (তারপর) বড় সাহেবগো মর্জি।'

একটি কম বয়সের কর্মচারীর এই সব জিজ্ঞাসাবাদ পছন্দ হচ্ছিল না। তার চোখ কুঁচকে গিয়েছিল। বিরক্ত, কর্কশ গলায় বলল, 'যহন আইব, দেখতেই পাইবেন। ভ্যাজর ভ্যাজর না কইরা বইসা থাকেন গিয়া—'

বয়স্ক কর্মচারীটি তার যুবক সহকর্মীকে ধমকে দিলেন, 'দ্যাশ ছাইড়া এনারা চইলা যাইতে আছে। ভালভাবে কথা ক' সিরাজ।' বিনুর দিকে ফিরে সহানুভূতির সুরে বলে, 'অর কথায় মনে কিছু কইরেন না। কাইল কইলকাতার ট্রেন দ্যায় নাই, আইজ নিচ্চয় দিব। মনে লয়, দ্যাড় দুই ঘণ্টার মইদ্যে লাইনে ট্রেন আইসা যাইব।'

যুবক কর্মচারীটির কথায় মন তিক্ত হয়ে গিয়েছিল বিনুর। এর উপযুক্ত জবাব দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু এখন যা পরিস্থিতি, সেটা করতে গেলে আগুন ধরে যাবে। মুখ বুজে তাকে মেনে নিতে হল। তবে পরিবেশ যতই অগ্নিগর্ভ হোক, পৃথিবীতে ভাল মানুষ থাকেই। বয়স্ক কর্মচারীটি অনেক বিবেচক এবং বিচক্ষণ। তার সহৃদয় ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে গেল সে।

ট্রেন সম্পর্কে যা জানার ছিল, জেনে নিয়েছে বিনু। সে ফিরে আসছিল। হঠাৎ চোখে পড়ল, জনতিনেক সাদা চামড়ার সাহেব এবং দুই মেম কী যেন করছে। তাদের ঘিরে মোটামুটি একটা ভিড়।

গোয়ালন্দের স্টিমারঘাটের বাইরে ভিটেমাটি ফেলে আসা উদ্বাস্তুদের ভেতর সাহেব-মেম দেখা যাবে, ভাবতে পারেনি বিনু। তার কৌতূহল হচ্ছিল। নিজের অজান্তেই ওদের দিকে এগিয়ে গেল।

সাহেব-মেমদের বয়স খুব বেশি নয়। তিরিশের নিচেই হবে। পুরুষদের পরনে হাঁটুঝুল হাফপ্যান্ট, শার্ট এবং মোটা কটনের জ্যাকেট। মাথায় শোলার হ্যাট। মেমসাহেবরা পরেছে চাপা ট্রাউজার্স, ঢোলা

pathagar.net

শার্ট, মাথায় হেলানো ফেল্ট হ্যাট। সব'রই পায়ে পুরু সোলের মজবুত জুতো। কারোর কারোর চোখে সান-গ্লাস। এরা কোন দেশের মানুষ—ব্রিটিশ, ফ্রেঞ্চ না জার্মান—বোঝা যাচ্ছে না।

দূর থেকে চোখে পড়ে নি, কাছে এসে দেখা গেল, এই দলটার একজন হাঁটু গেড়ে মুভি ক্যামেরা চালিয়ে উদ্বাস্তুদের ছবি তুলছে। অন্য একজন তাকে সাহায্য করছে। আগে কী একটা বইতে মুভি ক্যামেরার ছবি দেখেছে বিনু, এই প্রথম স্বচক্ষে দেখল।

অন্য একটি সাহেব এবং দুই মেম টেপ রেকর্ডার নিয়ে উদ্বাস্তুদের প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে চলেছে। তাদের বাড়ি কোন গ্রামে, কেন তারা দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছে, কলকাতায় গিয়ে তারা কোথায় উঠবে, কী করবে, ইত্যাদি।

উদ্বাস্তুরা ইংরেজি জানে না। সাহেব-মেমরা বাংলা বোঝে না, বিশেষ করে পূর্ববঙ্গের আঞ্চলিক বাংলা তাদের কাছে একেবারেই দুর্বোধ্য। তাই সাহায্য করার জন্য তিনজন শিক্ষিত বাঙালি যুবককে সঙ্গে নিয়েছে। তারা দোভাষীর কাজ করছে। সাহেব-মেমদের প্রশ্নগুলো বাংলা করে উদ্বাস্তুদের জানিয়ে দিচ্ছে, আর উদ্বাস্তুদের জবাব ইংরেজি করে সাহেব-মেমদের বলছে। কিন্তু এই যুবকেরা ইংরেজি বলায় তেমন সড়গড় নয়। মাঝে মাঝে গোলমাল করে ফেলছে।

নানা জনের দেশছাড়ার কারণ টেপ রেকর্ডারে ধরে রাখতে রাখতে এক বিদেশি তরুণী বিনুর সামনে চলে আসে। তার দলামোচড়া ময়লা পোশাক, উস্কখুস্ক চুল, চোখের তলায় কালির পোঁচ, ইত্যাদি দেখতে দেখতে বিদেশিনীর মনে হয়েছে সে-ও ছিন্নমূল জনতার একজন। অন্য অনেকের মতো তারও ধারণা, বিনু শিক্ষিত যুবক। মেয়েটি ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করে, 'আপনি কি ইংরেজি জানেন?'

মাথা সামান্য হেলিয়ে দেয় বিনু, 'জানি।'

অন্তত বিনুর ব্যাপারে যে ইন্টারপ্রেটারের সাহায্য নিতে হবে না, সরাসরি কথা বলা যাবে, এতে মেয়েটি যথেষ্ট স্বস্তিবোধ করে। বলে, 'আপনি নিশ্চয়ই দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছেন?'

'উত্তর দেবার আগে আমার কিছু বলার আছে।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, বলুন—'

'আপনারা এই যে ছবি তুলছেন, লোকজনের কথা রেকর্ড করছেন—এসব কী জন্যে?'

তরুণীটি জানায়, তারা ব্রিটিশার। লণ্ডনের একটা বড় ফিল্ম কোম্পানির সঙ্গে যুক্ত। এই কোম্পানি পৃথিবীর ছবি করা ছাড়া ডকুমেন্টারি ছবিও করে থাকে। এই শতাব্দীতে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মতো মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে গেছে, প্রাণহানি হয়েছে লক্ষ লক্ষ মানুষের। কিন্তু ভারতবর্ষের বিভাজন তার চেয়ে এতটুকু কম ভয়াবহ নয়। পৃথিবীর এই গোলার্ধে জাতি-দাঙ্গায় কত জনের মৃত্যু হয়েছে, সীমান্তের এপার থেকে ওপারে, ওপার থেকে এপারে কত লক্ষ মানুষ চলে গেছে, তার হিসেব নেই। এই শতকের এমন ব্যাপক 'হিউম্যান ট্র্যাজেডি'র প্রামাণ্য চিত্র ভবিষ্যতের জন্য তুলে রাখা অত্যন্ত জরুরি।

এই ইংরেজ তরুণ-তরুণীরা মানবিক দায়িত্ববোধে বিশাল কাজে হাত দিয়েছে। পূর্ব পাকিস্তানে আসার আগে তারা পশ্চিম পাকিস্তানের সিন্ধু ও পাঞ্জাবে গিয়েছিল দেশভাগের ঠিক পরে পরেই। পাঞ্জাবের সম্পূর্ণ জন-বিনিময়ের ছবি তারা যতটা পেরেছে তুলে রেখেছে। এই সেঞ্চুরিতে এমন টোটাল ট্রান্সফার অফ পপুলেশন আর কোনও দেশে হয়েছে কিনা, তাদের জানা নেই।

কোথায়, কত হাজার মাইল দূরে, ভূমণ্ডলের দূর প্রান্তে এই তরুণ-তরুণীদের বাড়ি, আর কোথায় এই খণ্ডিত উপ-মহাদেশ! ভারত-ভাগের শোচনীয় ঐতিহাসিক ঘটনাকে চিরস্থায়ী করে রাখার জন্য তারা গোয়ালন্দের স্টিমারঘাটে ছুটে এসেছে, এ যেন ভাবা যায় না। অভিভূতের মতো তাকিয়ে থাকে বিনু।

মেয়েটি বলে, 'এবার তা হলে পুরনো প্রশ্নটায় ফিরে যাওয়া যাক। ইস্ট পাকিস্তান ছেড়ে চলে যাচ্ছেন?'

বিনু বলল, 'হ্যাঁ।'

'কেন যাচ্ছেন?'

যে যুবকেরা ইন্টারপ্রেটারের কাজ করছে তাদের সামনে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে ঠিক সাহস

হচ্ছিল না। যদি বিনু বলে, এখানে নির্ভয়ে থাকা যাচ্ছে না, ওরা হয়তো ক্ষিপ্ত হয়ে উঠবে। দ্বিধান্বিতভাবে সে বলল, 'এই—ঠিক—'

একটি দোভাষী যুবক বিনুকে বলল, 'যা সত্য হেই ক'ন। আমরা কিছু মনে করুম না।'

ছেলেটিকে ভাল লাগল বিনুর। ইতিহাস অবিকৃত থাক, প্রকৃত সত্য যেন গোপন করা না হোক, এটাই হয়তো ওরা চাইছে। বিনু প্রায় মরিয়া হয়ে বলল, 'ভয়ে চলে যাচ্ছি—'

মেয়েটি বলল, 'কলকাতায় কোথায় উঠবেন?'

বিনু জানায়, তার বাবা এবং দুই দিদি সেখানে আছে। বাবার কাছেই যাবে সে।

'তা হলে বর্ডারের ওপারে আপনার একটা শেলটার অন্তত আছে। অন্যদের মতো আপনার অবস্থা ততটা দুর্ভাগ্যজনক নয়।'

'তা বলতে পারেন।'

'সহযোগিতার জন্য অনেক ধন্যবাদ।'

বিনু আর দাঁড়াল না।

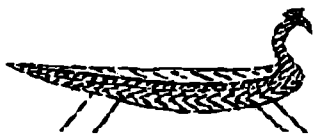

রেলের বয়স্ক কর্মচারীটি ঠিক খবরই দিয়েছিল। ঘণ্টাদেড়েকের মধ্যে লাইনে ফাঁকা ট্রেন এসে দাঁড়াল।

স্টিমারে ওঠা বা নামার সময় যা ঘটেছিল, ট্রেনের বেলাতেও তার হেরফের কিছু হল না। একই রকম ঠেলাঠেলি, একই রকম ধুন্ধুমার কাণ্ড।

লটবহরের ঝঞ্ঝাট নেই। বিনু প্রায় ঝাড়া হাত-পা। ঝিনুকও ভয় ডর অনেকখানি কাটিয়ে ক্রমশ স্বাভাবিক হয়ে উঠছে। তাকে ট্রেনের কামরায় ঠেলেঠুলে একবার তুলে দিতে পারলে আর চিন্তা নেই। বিনু যেভাবে হোক, ঠিক উঠে পড়তে পারবে।

কিন্তু সমস্যা হচ্ছে রামরতনকে নিয়ে। গোয়ালন্দে নামার পর সেই যে তিনি শুয়ে পড়েছিলেন আর উঠতে পারেননি। বুকের কষ্টটা ফের প্রচণ্ড বেড়ে গেছে। ওঁদের ফেলে যাওয়াও যাচ্ছে না। যা করার খুব তাড়াতাড়ি করে ফেলতে হবে। পাঁচ সাত মিনিট দেরি হলে ট্রেনে আর জায়গা পাওয়া যাবে না।

অধর ভুঁইমালী, হরিন্দ আর ভুবন দাসকে ডেকে সমস্যার কথা বলতে তারা একেবারে ভেলকি দেখিয়ে ছাড়ল। হরিন্দ, বিনু আর ভুবন রামরতনকে কাঁধে তুলে ভিড়ের ভেতর দিয়ে প্রথমে সামনের একটা কামরায় নিয়ে শুইয়ে দিল। তারপর সবার লটবহর তো তুললই, বাচ্চাকাচ্চা এবং মেয়েদেরও তুলে ফেলল। অধর ভুঁইমালীও কম যায় না। পায়ে পুরু ব্যাণ্ডেজ। খোঁড়াতে খোঁড়াতে বিনুদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে সে-ও বিস্তর টানাহ্যাঁচড়া করল।

কামরার একটা দিক বিনুরা দখল করে ফেলেছে। তারা ওঠার আগেই কিছু লোক উঠে পড়েছিল। বাকিরা পরে ঝাঁক বেঁধে উঠতে লাগল। চোখের পলকে মেঝে বাঙ্ক বেঞ্চ তো বটেই, দরজার সামনের প্যাসেজ বোঝাই হয়ে গেল। বাইরে এখনও অগুনতি মানুষ। যারা কামরাগুলোতে ঢুকতে পারেনি, তাদের অনেকেই বেয়ে বেয়ে ট্রেনের ছাদে উঠে পড়েছে।

বাইরে তুমুল হট্টগোল। কামরার ভেতর দম-আটকানো ভিড়। বুকের যন্ত্রণাটা ক্রমশ তীব্র হচ্ছে রামরতনের। জোরে জোরে মাথা নাড়তে নাড়তে তিনি সমানে বলতে লাগলেন,'শ্বাস নিতে পারতে আছি না। বাতাস কর, বাতাস কর—'

কামরায় ফ্যান নেই, হাত-পাখাও কেউ সঙ্গে করে আনেনি। রামরতনের মেয়েরা, তাঁর স্ত্রী এবং ঝিনুক শাড়ির আঁচল নেড়ে নেড়ে হাওয়া করতে লাগল।

বাইরে রেলের সেই কর্মচারীদের দেখা গেল। বয়স্ক কর্মচারীটির হাতে একটা লম্বা মুলি বাঁশের লাঠি। কামরাগুলোর ছাদের দিকে লাঠিটা বাড়িয়ে মৃদু খোঁচা দিতে দিতে এবং চিৎকার করতে করতে

এগিয়ে আসছে, 'ছাত থিকা নাইমা আসো। নাইলে মহা বিপদ হইয়া যাইব। নামো— নামো—'

কারোর নামার লক্ষণ দেখা যায় না। যারা ওপরে উঠেছিল, ছাদ আঁকড়ে তারা বসে থাকে।

কর্মচারীটি বোঝাবার চেষ্টা করে, 'পথে মেলা নীচা নীচা (নীচু নীচু) ব্রিজ পড়ব। মাথায় বাড়ি খাইয়া পইড়া যাইবা, লগে লগে শ্যাষ। মরণের ওষুধ কানে বাইন্ধো না। যা কই কর। নাইমা আসো—'

ওপর থেকে অনেকে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলে, 'আবার কবে টেরেন দিব তার ঠিক নাই।'

অর্থাৎ ওরা অনিশ্চয়তার মধ্যে থাকতে চায় না। ট্রেন যখন একটা পাওয়া গেছে, চরম বিপদের ঝুঁকি নিয়েই তারা কলকাতায় যাবে।

কর্মচারীটি বলে, 'আরে বাপু, মাঝে মইদ্যে ইট্টু আধটু গণ্ডগোল হইতে আছে ঠিকই, তয় (তবে) তোমাগো লেইগা গাড়ি নিচ্চয় দেওন হইব। এক আধদিন এইহানে সবুর কর, হের পর (তারপর) কইলকাতায় যাইও। ভাল কথা কই, নীচে নামো—'

তার পরামর্শে কেউ কর্ণপাত করে না। কামরার মাথায় লোকগুলো অনড় বসে থাকে। তাদের হয়তো ধারণা, এটাই কলকাতার শেষ ট্রেন।

ট্রেনের জানালা দিয়ে বয়স্ক কর্মচারীটির পাশাপাশি সেই কম বয়সের কর্মচারীটিকেও দেখতে পাচ্ছিল বিনু। ছোকরার চোখেমুখে চরম বিরক্তি আর বিদ্বেষ। রুক্ষ গলায় সে বলে, 'কাফেরগুলা যদি মরে মরুক। তুমি ক্যান চিল্লাইয়া চিল্লাইয়া গলার নলী ফাইড়া ফেলাইতে আছ চাচা?'

বয়স্ক কর্মচারীটি ভীষণ রেগে যায়, 'অগো উপুর তর এত গুসা ক্যান? এই দ্যাশটা তর আমার ন্যামন, অগোও ত্যামন আছিল। এক লগে কত কাল ধইরা কাছাকাছি থাকছি। পরস্পর ভাই-দাদা-চাচা কইছি। দ্যাশ ভাগ না হইলে অরা কি যাইত? যহন জানি রেলের মাথায় বইসা গ্যালে বিপদ হইব, সাবধান কইরা দিমু না?'

যুবকটি উত্তর দেয় না। বর্ষীয়ান সহকর্মীর কথায় সে খুব একটা খুশি হয়েছে বলে মনে হল না।

কেউ শুনুক না-শুনুক, বয়স্ক কর্মচারীটি হুঁশিয়ারি দিতে দিতে বিনুদের কামরার পাশ দিয়ে চলে যায়।

ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে তো দাঁড়িয়েই আছে। কখন ছাড়বে, কে জানে।

জানালার বাইরে থেকে মুখ ফিরিয়ে কামরার ভেতরে তাকায় বিনু। সেই সকাল থেকে যন্ত্রণায় ছটফট করেই চলেছেন রামরতন। একটু থেমে থেমে কাতর শব্দ করে উঠছেন। তাঁর মেয়েরা অনবরত শাড়ির আঁচল নেড়ে নেড়ে হাওয়া করে যাচ্ছে। ঝিনুকও তাই করছিল। এখন ক্লান্ত হয়ে কামরার দেওয়ালে হেলান দিয়ে বসে আছে।

সকাল থেকে পেটে কিছু পড়েনি বিনু বা ঝিনুকের। ভীষণ খিদে পেয়েছে। তারপাশায় প্রচুর চিঁড়ে গুড়টুড় কিনেছিল। তার অর্ধেকটা এখনও রয়েছে। কিন্তু রামরতনের বুকের কষ্টটা বেড়ে যাওয়ায় তাঁর স্ত্রী এবং মেয়েরা এমনই উদ্বিগ্ন যে খাওয়ার কথা তাদের খেয়াল নেই। এই অবস্থায় পাশে বসে খাওয়াও যায় না। আসলে ওরা না খেলে বিনুরাই বা খায় কী করে? রামরতনদের সঙ্গে কাল তারপাশায় দেখা। এইটুকু সময়ের মধ্যে কতভাবেই না ওঁদের সঙ্গে বিনুরা জড়িয়ে গেছে।

তারা না খেলেও কামরার বাকি সবাই পোঁটলা পুঁটলি খুলে মুড়ি বাতাসা বা চিনির মঠ বার করে খাচ্ছে।

রামরতনের কাতরানিটা চলছেই। তাঁর স্ত্রী ব্যাকুলভাবে বিনুকে বলল, 'বুড়া মানুষটারে লইয়া কী করি কও তো বাবা? কইলকাতা তরি ওনারে লইয়া যাইতে পারুম তো?'

অসহায় বৃদ্ধাকে দেখতে দেখতে বুকের ভেতরটা কেঁপে যায় বিনুর। সে বলে, 'খারাপ কথা চিন্তা করবেন না মাসিমা। নিশ্চয়ই স্যারকে নিয়ে যেতে পারবেন।'

রামরতনের শিয়রের কাছে বসেছে বিনু। কাল রাতে জোরে জোরে বুক ডলে দেওয়ায় তাঁর যন্ত্রণা কমে গিয়েছিল। কিন্তু বার বার একই পদ্ধতিতে কাজ হবে কিনা, কে জানে। বিনু ঝুঁকি নিল

না। জামার ওপর দিয়ে আস্তে আস্তে বুকে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। অনেকক্ষণ পর রামরতনের গোঙানি ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে এল।

বেশ কয়েক ঘন্টা পর, বিকেলের সূর্য যখন পশ্চিম দিকে নদীর ওপর ঢলে পড়েছে, সেই সময় গার্ডের হুইসিল শোনা গেল। পরক্ষণে ট্রেন চলতে শুরু করল।

রামরতন অনেকক্ষণ আগে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। কষ্টটা নিশ্চয়ই আর নেই। বিনু তাড়া দিয়ে দিয়ে তাঁর স্ত্রী এবং মেয়েদের চিঁড়ে টিড়ে খাইয়েছে। ঝিনুক আর সেও খেয়েছে। রামরতনের জন্য যে উৎকণ্ঠা ছিল সেটা অনেকখানি কেটে গেছে।

জানালার বাইরে মুখ ফিরিয়ে আকাশ নদী গাছপালা ধানখেত দেখছিল বিনু। পূর্ব বাংলায় এটাই তার জীবনের শেষ সূর্যাস্ত। পৃথিবীর এই ভূখণ্ডে আর কখনও তার ফেরা হবে না।

এখানে কমগুলো বছর তো কাটল না। এই বাংলার খাল বিল নদী, ঘন সবুজ বৃক্ষলতা, আকাশ বাতাস, সোনালি লাবণ্যে ভরা অবারিত ফসলের খেত, ফুল, পাখি, মাছ, ঋতুচক্রের মোহিনীমায়া— সব তার নিশ্বাসে প্রশ্বাসে জড়িয়ে আছে। এসব ফেলে চলে যেতে আশ্চর্য এক বেদনা বিনুকে কাতর করে তুলছিল। সেই সঙ্গে রয়েছে সন্দেহ, অবিশ্বাস, আতঙ্কের দমবন্ধ-করা ফাঁদ থেকে বেরিয়ে যাবার অগাধ স্বস্তি। মিশ্র অনুভূতির টানাপোড়েন চলছে দুই বিপরীত দিকে।

দেখতে দেখতে সূর্য ডুবে যায়। হেমন্তের সন্ধ্যা নামে। বাতাসে দ্রুত হিম মিশতে থাকে। কুয়াশায় অন্ধকারে চারদিক ঢেকে যায়।

বিনু জানালার পাল্লা টেনে বন্ধ করে। কামরার ভেতর টিমটিমে আলো জ্বলছে। তাতে কোনও কিছুই স্পষ্ট নয়। চারপাশের মানুষগুলোকে ধোঁয়ার মূর্তির মতো মনে হচ্ছে।

ট্রেন কিন্তু একটানা চলছে না। মাঝে মাঝে মাঠের মাঝখানে কিংবা নগণ্য কোনও স্টেশনে থামছে। দু'এক ঘন্টা নড়ন চড়ন নেই। তারপর আবার দৌড়। এভাবে থেমে থেমে চললে কাল আদৌ কলকাতায় পৌঁছনো যাবে কিনা, কে জানে।

কখন চোখে ঢুল নেমেছিল আর কখন ঘুমিয়ে পড়েছে, বিনুর খেয়াল নেই। হঠাৎ কান্নার আওয়াজে ঘুম ভেঙে যায়।

ধড়মড় করে খাড়া হয়ে বসে বিনু। ট্রেন উর্ধ্বশ্বাসে ছুটছিল। কামরার জানালাগুলো এখন খোলা। বাইরে অনেক দূরে সূর্যোদয় হচ্ছে। সকালের প্রথম আলো এসে পড়ছে কামরার ভেতরে। সেই সঙ্গে ঢুকছে হেমন্তের শীতল বাতাস।

কিন্তু কোনও দিকেই লক্ষ্য নেই বিনুর। হতচকিত হয়ে সে দেখতে পায়, রামরতনের তিন মেয়ে এবং স্ত্রী অঝোরে কাঁদছেন। কামরার অন্য সবার এখনও ঘুম ভাঙেনি। যারা জেগে উঠেছে, বিষণ্ণ দৃষ্টিতে তারা তাকিয়ে আছে। ঝিনুকও জেগে গিয়েছিল। তার চোখে মুখে অদ্ভুত বিহ্বলতা।

হঠাৎ কী হতে পারে যাতে রামরতনের স্ত্রী আর মেয়েরা এমন ব্যাকুলভাবে কেঁদে চলেছে!

কয়েক পলক তাকিয়ে থাকে বিনু। এই কান্নাকাটি কিসের এক অশুভ সংকেত যেন দিয়ে যাচ্ছে। হকচকানো ভাবটা খানিক কাটিয়ে রামরতনের স্ত্রীর দিকে ঝুঁকে সে জিজ্ঞেস করে, 'কী হয়েছে মাসিমা?'

বৃদ্ধা কান্নাজড়ানো গলায় বললেন, 'সকাল হইছে দেইখা তোমার মেসোমশাইরে জাগাইতে চেষ্টা করলাম। কাইল পুরা দিন প্যাটে কিছু পড়ে নাই। ভাবলাম উঠাইয়া দু'গা চিড়ামুড়ি খাওয়ামু। না খাইলে শরীল আরও কাহিল হইয়া পড়ব। ডাকি, ঠেলা দেই, সাড়া নাই। চৌখও মেলে না। গাও (গা) ক্যামন য্যান ঠাণ্ডা। আমার মন বড় কু ডাকতে আছে—'

বিনু বলল, 'আমাকে ডাকেননি কেন?'

'আমাগো লেইগা কম তো কর নাই।' রামরতনের স্ত্রী বললেন, 'অঘোরে ঘুমাইতে আছিলা। তাই আর জাগাই নাই—'

বিনু উত্তর দিল না। দ্রুত রামরতনের জামার ভেতর দিয়ে বুকে হাত রাখল। বরফের মতো শীতল। হাত বার করে তাঁর একটা হাত তুলে নাড়ি টিপে ধরল। স্পন্দন নেই। গতি খুব সম্ভব চিরকালের মতো স্তব্ধ হয়ে গেছে।

বিনুর হৃৎপিণ্ডের ভেতর হিমস্রোত বয়ে গেল। শ্বাস আটকে আসছে তার। যা ঘটেছে সেটা পরিষ্কার। তবু রামরতনের কাঁধে মাথায় উদ্‌ভ্রান্তের মতো ঠেলা দিতে দিতে ডাকতে লাগল, 'স্যার—স্যার—'

রামরতন নিশ্চল শুয়ে রইলেন। বিনু জানে, পৃথিবীর কোনও শব্দই তাঁর কানে পৌঁছবে না, তবু বার বার ডাকতে ডাকতে একসময় থেমে গেল সে। রামরতনের বন্ধ চোখের কোণ বেয়ে কয়েক ফোঁটা জল বার হয়ে এল।

এই বৃদ্ধের সঙ্গে পরশু তারপাশার স্টিমারঘাটে প্রথম আলাপ। রক্তের কোনও সম্পর্ক নেই। তবু বুকের অতল স্তর থেকে কুণ্ডলী পাকিয়ে পাকিয়ে উঠে এসে গলার কাছে কী যেন আটকে আছে। শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে বিনুর।

ভয়তাড়িত রামরতন দেশ ছাড়ার জন্য বেরিয়ে পড়েছিলেন, কিন্তু ভারতে আর পৌঁছনো হল না। কাল রাতে ঘুমের ঘোরে যাবতীয় দুর্ভাবনা এবং ত্রাস এই ভূমণ্ডলে ফেলে রেখে তিনি চলে গেছেন।

কান্নাটা সাময়িক থেমে গেছে। রামরতনের স্ত্রী আর মেয়েরা আগেই জেনে গিয়েছিল। তবু অসম্ভব ঘুমেও ক্ষীণ একটু আশা জাগিয়ে তুলে রুদ্ধশ্বাসে বিনুর দিকে তাকিয়ে আছে।

রামরতনের স্ত্রী ঝাপসা গলায় জিজ্ঞেস করলেন, 'কী বুঝলা বাবা?'

দুঃসংবাদটা বিনুর পক্ষে নতুন করে জানানো সম্ভব নয়। বিব্রতভাবে সে বলে, 'এখন উনি যেমন আছেন তেমনি শুয়ে থাকুন। ডাকাডাকি করার দরকার নেই। কলকাতায় পৌঁছবার পর ডাক্তার দেখানো যাবে।'

বিনু কী বলতে চায়, না বোঝার কারণ নেই। চারটি নানা বয়সের মহিলা ফের কান্নায় ভেঙে পড়ে।

হেমন্তের সূর্য মাথার ওপর উঠে আসার অনেক আগেই ট্রেন দর্শনা পৌঁছে যায়।

পাকিস্তানের বর্ডার পুলিশ আর কাস্টমসের লোকজনে স্টেশনটা থিকথিক করছে। ট্রেন থামতেই তারা ঝাঁপিয়ে পড়ল। প্রতিটি কামরার জানালায় জানালায় মুখ বাড়িয়ে আর্মড কনস্টেবল আর কাস্টমসের অফিসাররা কড়া গলায় হুকুম দিতে লাগল, 'মালপত্র লইয়া সগলে নাইমা আসো। সার্চ হইব—'

বর্ডারে তল্লাশির কথা আগেই শুনেছিল বিনু। পূর্ব পাকিস্তান থেকে মূল্যবান কোনও জিনিস—সোনাদানা, গয়নাগাটি, বাসনকোসন, প্রচুর নগদ টাকা—নিয়ে যেতে দেওয়া হচ্ছে না। সার্চ করে যদি দেখা যায় তেমন কিছু কেউ লুকিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তক্ষুনি কেড়ে নেওয়া হচ্ছে।

হুকুম জারি হবার সঙ্গে সঙ্গে বিনুদেরই শুধু নয়, সবগুলো কামরা খালি করে ভয়ার্ত উদ্বাস্তুর দল হুড়মুড় করে লটবহর নিয়ে প্ল্যাটফর্মে নেমে পড়ে।

রামরতনের স্ত্রী বিহ্বলের মতো বিনুকে বললেন, 'আমাগোও তো নামতে হইব।' স্বামীকে দেখিয়ে বললেন, 'কিন্তু এই মানুষটারে ফেলাইয়া—'

বিনু বলল, 'আপনাদের এখন নামতে হবে না। আমি গিয়ে ওদের বুঝিয়ে বলব। তারপরও যদি না শুনতে চায় তখন দেখা যাবে—' ঝিনুককে রামরতনের স্ত্রী আর মেয়েদের কাছে রেখে কামরা থেকে নেমে পড়ল বিনু।

প্ল্যাটফর্মে প্রচণ্ড ভিড়। কামরাগুলো থেকে লোক তো নেমেছেই, বিনুর চোখে পড়ল গাড়ির ছাদ থেকেও নামছে। হুকুমনামা অগ্রাহ্য করার মতো বুকের পাটা কারোর নেই।

বিনুর মনে হল, গোয়ালন্দে যারা ট্রেনের মাথায় চড়েছিল তাদের কেউ মারা যায়নি। খুব সম্ভব ব্রিজ দেখলে তারা টান টান হয়ে ছাদে শুয়ে পড়েছে।

প্ল্যাটফর্মের এক মাথায় টেবল চেয়ার পেতে লম্বা লম্বা বাঁধানো খাতা আর পেন নিয়ে অফিসারেরা বসে আছে। লাঠি, বা বন্দুকের কুঁদোর গুঁতো দিয়ে পুলিশের লোকেরা অনেকগুলো লাইন করে উদ্বাস্তুদের দাঁড় করিয়ে দিল। প্রতিটি লাইনের জন্য একজন করে অফিসার।

pathagar.net

তল্লাশি শুরু হল। লাইনের প্রথম দিকে যারা আছে তাদের আগে সার্চ হয়ে যাচ্ছে। মালপত্র ঘাঁটাঘাঁটি তো হচ্ছেই, প্রত্যেকের সারা শরীরও হাতড়ানো হচ্ছে। এমনকি মেয়েরাও রেহাই পাচ্ছে না।

বেশির ভাগেরই লটবহরে রয়েছে শস্তা পুরনো জামাকাপড়, কাঁথাবালিশ, তামা কাঁসার দু'চারটে বাসন, তা ছাড়া টুকিটাকি কিছু জিনিস।

যাদের কাছে দামি কিছুই নেই তারা সহজেই পার পেয়ে যাচ্ছে। কিন্তু দু'একজনের কাছ থেকে দু'চারটে সোনার গয়না, জমির দলিল এবং বেশ কিছু নগদ টাকা পাওয়া গেল। তক্ষুনি সে সব কেড়ে নেওয়া হল।

লোকগুলো অফিসারদের পা জড়িয়ে ধরে আকুল কান্নায় ভেঙে পড়ে, 'সব্বস্ব খুয়াইয়া দ্যাশ ছাড়তে আছি। ওইটুকই শ্যাষ সম্বল। দয়া করেন গরিবের উপুর—'

কিন্তু শুধুমাত্র কান্নায় অফিসারদের মন গলানো সহজ নয়। পা ঝাড়া দিয়ে তারা নিজেদের ছাড়িয়ে নেয়। কিন্তু এই উদ্বাস্তুরা নাছোড়বান্দা, ওরা ফের পা জাপটে ধরে। অগত্যা অফিসাররা আর্মড পুলিশ ডাকে। তারা ঘাড় ধরে টানতে টানতে এবং অকথ্য খিস্তি দিতে দিতে ওদের দূরে আছড়ে ফেলে। কারোর হাত-পা থেঁতলে যায়, কারোর বা বাঁধানো প্ল্যাটফর্মে মাথা ঠুকে রক্তারক্তি কাণ্ড।

সাত পুরুষের ভিটেমাটি খুইয়ে চিরকালের মতো যারা পূর্ব বাংলা ছেড়ে চলে যাচ্ছে তাদের প্রতি কেন এই অমানুষিক নিষ্ঠুরতা? আর একটু সদয় ব্যবহার কি করা যায় না? পাশের লাইন থেকে বিনু চেঁচিয়ে উঠতে যাচ্ছিল, কিন্তু কেউ যেন ভেতর থেকে তার গলা চেপে ধরে। প্রতিবাদ করতে গেলে তার পরিণতি মারাত্মক হবে। এই পরিস্থিতিতে বোবা হয়ে থাকাই একমাত্র বুদ্ধিমানের কাজ।

সমান্তরাল রেখায় পর পর ছ'টা লাইন এগিয়ে চলেছে। যাদের কাছে তেমন কিছু পাওয়া যাচ্ছে, কেড়েকুড়ে তো নেওয়া হচ্ছেই, তার ওপর চলছে হেনস্থা। তবে তল্লাশির নামে মেয়েদের, বিশেষ করে তরুণীদের নিয়ে যা চলছে, তা মেনে নেওয়া যায় না। মেয়েগুলো লজ্জায় ভয়ে কুঁকড়ে যাচ্ছে। কিন্তু অন্ধ আর বধির হয়ে থাকা ছাড়া উপায় নেই।

তবে কম বয়সের যে অফিসারটির সামনে বিনু লাইন দিয়েছে সে খুবই ভদ্র এবং দেশ ছেড়ে যাওয়া মানুষগুলোর প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতিশীল। উদ্বাস্তুদের মালপত্র একটু আধটু দেখেই ছেড়ে দিচ্ছে। মেয়েদের কোনও কিছু জিজ্ঞেস করছে না, গায়ে হাত দিয়ে সার্চের তো প্রশ্নই নেই। নরম গলায় তাদের বলছে, 'আপনেরা যান—'

বিনু অফিসারটির কাছাকাছি চলে এসেছিল। তার সামনে আর মাত্র চার পাঁচটি লোক। তারপর এই দুর্ভোগ শেষ হবে।

হঠাৎ একটা বিশ্রী ব্যাপার ঘটে গেল। বিনুদের বাঁ পাশের লাইনে আরও অনেকের সঙ্গে ছিল একটি রোগা, ক্ষয়াটে চেহারার চাষাভুষো ধরনের প্রৌঢ়, তার স্ত্রী, একটি তরুণী এবং অল্প বয়সের দু'টি ছেলে। ওই লাইনের শেষ মাথায় যে অফিসারটি বসে আছে তার বয়স চল্লিশ বেয়াল্লিশ। লম্বা চওড়া মজবুত চেহারা, চৌকো মুখ, পাকানো গোঁফ। ভাঙা ভাঙা বাংলার সঙ্গে উর্দু মিশিয়ে কথা বলছিল। বাঙালি যে নয়, পরিষ্কার বোঝা যায়। অবশ্যই পশ্চিম পাকিস্তানের লোক।

বিনু অনেকক্ষণ ধরে লক্ষ করছিল, এই অবাঙালি অফিসারটি সবচেয়ে বেশি উৎপাত করে চলেছে। সে ওই প্রৌঢ়টির লটবহর খুলে আতিপাতি করে তো খুঁজলই, তারপর প্রৌঢ়, তার স্ত্রী এবং কম বয়সের ছেলে দু'টোর শরীর হাতড়ে তল্লাশি চালাল। সবার শেষে এল যুবতী মেয়েটির পালা। সার্চের নামে তার গায়ে যেখানে সেখানে হাত চালিয়ে দিচ্ছে। মেয়েটি লজ্জায় উৎকণ্ঠায় আতঙ্কে এমনই দিশেহারা যে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিল না। এত টলছিল যে জ্ঞান হারিয়ে যে কোনও মুহূর্তে লুটিয়ে পড়বে। তার বাপ হাতজোড় করে আর্ত, করুণ স্বরে সমানে বলে যাচ্ছিল, 'দয়া করেন ছার (স্যার), দয়া করেন। মাইয়াটারে ছাইড়া দ্যান—' তার স্ত্রী এবং দুই ছেলে আকুল হয়ে একটানা কেঁদে চলেছে।

অবাঙালি অফিসারটি তার কথায় কর্ণপাত করছিল না।

অসহ্য ক্রোধে মাথার ভেতরটা যেন ফেটে যাবে বিনুর। মনে হল, জন্তুটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, কিন্তু নিরুপায় কাপুরুষের মতো হাত কামড়ানো ছাড়া উপায়ই বা কী।

বিনু পারেনি, কিন্তু তার সামনের তরুণ বাঙালি অফিসারটি বসে থাকতে পারল না। সহ্যশক্তির শেষ সীমায় সে পৌঁছে গিয়েছিল। অবাঙালি অফিসারটির সার্চের নামে নোংরা ক্রিয়াকলাপ তাকে ক্ষিপ্ত করে তুলেছে। হঠাৎ হিতাহিত জ্ঞানশূন্যের মতো লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বাংলা, উর্দু এবং ইংরেজি মিশিয়ে চিৎকার করে ওঠে, 'স্টপ ইট, স্টপ ইট। ছাড়েন—ছাড়েন, ছোড়িয়ে উনকো—'

অবাঙালি অফিসারটিও ততক্ষণে উঠে পড়েছে। বাধা দেওয়ায় তার মুখচোখ যেন রাগে ফেটে পড়বে। শরীরের সব রক্ত মাথায় চড়ে গেছে। গলার শির ছিঁড়ে সে চেঁচিয়ে ওঠে, 'কিপ ইওর ব্লাডি মাউথ শাট। নিজের চরকায় তেল দাও। সিট ডাউন—'

অবাঙালি অফিসারটি খুব সম্ভব বাঙালি তরুণটির সিনিয়র। তরুণটি কিন্তু তার রক্তবর্ণ চোখ এবং দাবড়ানি গ্রাহ্য করে না। সে এতটাই ক্রুদ্ধ আর উত্তেজিত যে গলার স্বর আরও কয়েক পর্দা চড়িয়ে যা বলল তা এইরকম। সিনিয়র অফিসারটির ইতরামো, অসভ্যতা কোনও মতেই বরদাস্ত করা যায় না। উদ্বাস্তু যুবতীরা তাদের মতো লোকের কাছে যে ব্যবহার পাচ্ছে, ওপারে গিয়ে যখন জানাবে, তার মারাত্মক প্রতিক্রিয়া হবে। সবসময় মনে রাখা দরকার, সীমান্তের ওধারেও মাইনোরিটি কমিউনিটির লক্ষ লক্ষ মানুষ রয়েছে। তাদের ওপর জনরোষ গিয়ে পড়লে অবস্থাটা কেমন দাঁড়াবে?

তরুণ অফিসারের দু'চারজন বাঙালি সহকর্মী তার সঙ্গে গলা মিলিয়ে অবাঙালিটির আচরণের প্রতিবাদ জানাতে থাকে।

অনেকক্ষণ তুমুল বচসার পর গজ গজ করতে করতে বসে বড়ে অবাঙালি অফিসারটি। তবে নতুন করে বাড়াবাড়ি করতে তার সাহস হয় না। সে ভেবে পায় না, কাফের মেয়েদের গায়ে হাত দেওয়ায় বাঙালি ছোকরারা এত খেপে গেল কেন?

অবাক চোখে তরুণটির দিকে তাকিয়ে আছে বিনু। তাকে যত দেখছে ততই শ্রদ্ধা বেড়ে যাচ্ছে। আফজল হোসেনকে আগেই দেখেছে সে, নাসের আলিকে দেখেছে, এখন এই যুবক অফিসারটিকে দেখল। এদের সংখ্যাটা যদি আরেকটু বেশি হত!

লাইনের সামনে যে ক'জন ছিল, তাদের তল্লাশি হয়ে গেছে। বিনু এখন তরুণ অফিসারটির মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে।

অফিসারটি জিজ্ঞেস করল,'আপনের মালপত্র?'

বিনু বলল, 'দু'খানা চাদর ছাড়া আর কিছু নেই। সে দু'টো রেলের কামরায় রেখে এসেছি।'

'ঠিক আছে।'

'অবশ্য—'

'কী?'

'আমার সঙ্গে কিছু টাকা আছে।'

'কত?'

টাকা বার করে দেখায় বিনু। রাস্তায় খরচখরচা বাদ দিয়ে আট শ' পাঁচ টাকা বার আনা।'

অফিসারটি বলল, 'টাকাটা নিজের কাছে রাইখা দ্যান।'

টাকা রেখে বিনু দু'হাত মাথার ওপর তুলে বলল, 'আমাকে সার্চ করে দেখতে পারেন।'

'দরকার নাই। কে সত্য কয় আর কে মিছা, মুখ দেখলে বুঝা যায়। আপনে যাইতে পারেন।'

'আমার আরও কিছু বলার আছে।'

অফিসার উৎসুক চোখে তাকায়।

গলা নামিয়ে বিনু জানায়, তার সঙ্গে কয়েকজন রয়েছে। তাদের পক্ষে কামরা থেকে নেমে এসে তল্লাশির জন্য লাইনে দাঁড়ানো সম্ভব হয়নি।

অফিসারের কপাল কুঁচকে যায়, 'ক্যান সম্ভব হয় নাই?'

রামরতনদের সঙ্গে কোথায় তার আলাপ, কিভাবে ঘুমন্ত অবস্থায় তাঁর মৃত্যু ঘটেছে, সব জানিয়ে

pathagar.net

বিনু বলে, 'সবাই ওঁর বডি ঘিরে বসে আছে। এই অবস্থায় তো ওঁদের নামিয়ে আনা যায় না।'

'ঠিকই।'

বিনু ফের বলে, 'আপনি কি কষ্ট করে আমাদের কম্পার্টমেন্টে যাবেন?'

কী ভেবে অফিসারটি বলে, 'আইচ্ছা চলেন—' অন্য এক বাঙালি অফিসারকে তার জায়গায় বসিয়ে বিনুর সঙ্গে ওদের কামরায় যায় সে।

রামরতনকে ঘিরে বসে তাঁর স্ত্রী এবং মেয়েরা কেঁদেই চলেছে। চিৎকার করে নয়, একটানা চাপা, করুণ সুরে। তাদের পাশে বসে আছে ঝিনুক। নীরব, বিষণ্ণ। কামরার অন্য যাত্রীরা তল্লাশির জন্য নেমে গিয়েছিল। তারা এখনও ফিরে আসেনি।

দৃশ্যটা তরুণ অফিসারকে হয়তো বিচলিত করে তোলে। আন্দাজ করা যায়, খুব বেশিদিন চাকরিতে ঢোকেনি। এখনও নতুন। তাই ততটা কঠোর আর যান্ত্রিক হয়ে উঠতে পারেনি।

রামরতনদের ডাঁই-করা মালপত্র দেখিয়ে বিনু বলে, 'ওগুলো ওঁদের। সার্চ করে দেখতে পারেন।'

নানা বয়সের চার শোকাতুরা নারীকে দেখতে দেখতে অফিসারটির মনে হয়, এই পরিস্থিতিতে তল্লাশি করাটা চরম নিষ্ঠুরতা। ভারী গলায় জানায়, 'না, থাউক।' একটু থেমে বলে, 'যদি আইনে আটকায় অ্যামন কিছু ওনারা নিয়াও যান, বাধা দিমু না। নিজেগো জিনিসই তো নিয়া যাইতে আছেন।' বলতে বলতে কামরা থেকে প্ল্যাটফর্মে নেমে যায়।

বিনুও তার সঙ্গে নেমে পড়েছিল। তরুণ অফিসারটির সহৃদয়তায় সে আপ্লুত। গভীর গলায় বলল, 'আপনাকে কী বলে যে কৃতজ্ঞতা জানাব!'

অফিসারটি বলল, 'কৃতজ্ঞতা আবার কিসের? ওনাগো এত বড় একটা সর্বনাশ হইয়া গ্যাছে। তার উপুর ডিসটার্ব করুম, অ্যামন অমানুষ আমি না। আইচ্ছা, চলি—'

বিনু আর এগুলো না, হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে রইল।

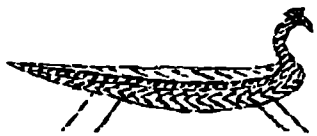

তল্লাশি শেষ হতে আড়াই তিন ঘন্টা লেগে গেল। লটবহর নিয়ে যারা নেমে গিয়েছিল, প্রতিটি কামরায় তারা ফিরে এসেছে। যারা ট্রেনের মাথায় চড়ে গোয়ালন্দ থেকে রওনা হয়েছিল, তারা ফের ছাদে উঠে পড়েছে।

কিছুক্ষণের মধ্যে ট্রেন সীমান্ত পেরিয়ে ইন্ডিয়ায় পৌঁছে যাবে। দেশ-হারানো ছিন্নমূল মানুষগুলোর চোখমুখ থেকে প্রচণ্ড উৎকণ্ঠা অনেকটাই কেটে গেছে। তাদের আশা, পাকিস্তান বর্ডারে তল্লাশির পর নতুন করে আর কোনও হানাদারি হবে না। বাকি যাত্রাপথ বিঘ্নহীন এবং নিরাপদ।

বেশির ভাগ উদ্বাস্তুই সামান্য কাঁথাকানি, কাপড়চোপড়, পুরনো বাসনকোসন ছাড়া পার্থিব অন্য কিছুই সঙ্গে আনতে পারেনি। যারা লুকিয়ে চুরিয়ে একটু আধটু সোনার গয়না বা জমির দলিল পরচা নিয়ে এসেছিল, সেগুলো ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে। পাকিস্তানি অফিসারদের চোখে ধুলো ছিটিয়ে শেষরক্ষা করা যায়নি। এরা হতাশ হয়ে পড়লেও বড় রকমের একটা সান্ত্বনা তাদের আছে। সেই সঙ্গে স্বস্তিও। শেষ পর্যন্ত ইন্ডিয়ায় তারা পৌঁছতে পারবে।

বিনুদের কামরাটাও আগের মতোই ভিড়ে বোঝাই হয়ে গেছে। একটা সর্ষের দানা ফেলার মতো ফাঁকও নেই।

ওদিকে রামরতনের স্ত্রী আর মেয়েদের কান্নার বিরাম নেই। সবার চোখ টকটকে লাল, যেন রক্তজবা। চোখের জল গাল বেয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় অবিরল ঝরে যাচ্ছে।

কামরার মানুষগুলোর বহুদিনের পুঞ্জীভূত আতঙ্ক প্রায় কেটে গেলেও তারা খুবই ম্রিয়মাণ। রামরতনের মৃত্যু এবং তাঁর পরিজনদের কান্না পরিবেশটাকে আচ্ছন্ন করে তুলেছে। কেউ একটা কথাও বলছে না। কামরাটা আশ্চর্য রকমের চুপচাপ, বিহ্বল, গাঢ় বিষাদে ডুবে আছে।

একসময় ট্রেন চলতে শুরু করল।

বেশিক্ষণ লাগল না। পাকিস্তানের সীমানা পার হয়ে গাড়ি ইন্ডিয়ায় ঢুকে পড়ে। পূর্ব বাংলার সঙ্গে চিরকালের মতো সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেল বিনুর। একধারে রামরতনের মৃতদেহ, তাঁকে ঘিরে শোককাতর চার মহিলা। সব মিলিয়ে বুকের ভেতর দুরন্ত ঘূর্ণির মতো কী যেন পাক খেতে লাগল তার।

ট্রেন ইন্ডিয়ায় ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে বিনুদের কম্পার্টমেন্টটা বাদ দিয়ে অন্য সব কামরা এবং ছাদের ওপর থেকে দেড় দু'হাজারের মতো মানুষ চিৎকার করে কী বলতে লাগল। ট্রেনের আওয়াজ ছাপিয়ে তার কিছুই বোধগম্য হচ্ছে না। তবে আন্দাজ করা যাচ্ছে, ইন্ডিয়ায় পৌঁছতে পেরে তারা ভীষণ উত্তেজিত। হইচই সেই কারণে।

বিনু ঝিনুকের দিকে একবার তাকাল। এখন পর্যন্ত তাকে মোটামুটি সুস্থ এবং স্বাভাবিক দেখাচ্ছে। কলকাতায় পৌঁছবার পর কী হবে, কে জানে। কিন্তু ঝিনুকের চিন্তা ছাপিয়ে রামরতনদের সমস্যা তাকে ক্রমশ অস্থির করে তুলতে থাকে।

কলকাতায় সপরিবারে রামরতনের যাওয়ার খবর তাঁর ভাইপো বিমল পেয়েছে কিনা, নাসের আলি বা স্বয়ং রামরতন কেউ বলতে পারেননি। যদি না পেয়ে থাকে? শিয়ালদা স্টেশনে পৌঁছে যদি দেখা যায় বিমল ওঁদের নিতে আসেনি, তখন কী করবে বিনু? একটা মৃতদেহ, একজন বৃদ্ধা, একজন মাঝবয়সী বিধবা আর দু'টি তরুণীকে বিশাল জনারণ্যে ফেলে রেখে সে কি চলে যাবে?

অবনীমোহন সুধা এবং সুনীতিকে সে অনেক আগেই চিঠি দিয়ে জানিয়েছিল, কলকাতায় যাচ্ছে। হেমনাথও লিখেছেন। ওরা যদি তাদের চিঠি না পেয়ে থাকে, স্টেশনে আসার প্রশ্নই নেই। তবু বিনুর খুব একটা অসুবিধা হবে না। ওদের সবার ঠিকানা তার জানা। আর কলকাতা শহরটা তার একেবারে অচেনাও নয়। খুঁজে খুঁজে কারোর না কারোর বাড়ি পৌঁছে যেতে পারবে। রামরতন যদি বেঁচে থাকতেন, ওঁদের সবাইকে নিয়ে অবনীমোহন বা দিদিদের কারোর বাড়িতে চলে যাওয়া যেত। কেউ আপত্তি করত না। ট্রেনের ধকল কাটাবার পর ধীরে সুস্থে বিমলের কাছে রামরতনদের পাঠিয়ে দেওয়া যেত। কিন্তু মৃতদেহ নিয়ে তো কারোর বাড়ি যাওয়া যায় না।

পাশ থেকে অধর ভুঁইমালীর ফিসফিসানি কানে এল, 'বাবুমশয়—'

চমকে বাঁ পাশে তাকাতেই বিনুর চোখে পড়ল, অধর তার পুরু ফেট্টি বাঁধা পা তেরছা করে একটা রংচটা তোবড়ানো টিনের বাক্সের ওপর রেখে তার দিকে শরীরটা কাত করে দিয়েছে। চোখাচোখি হতে সে বলল, 'মাস্টারমশয় আতখা (হঠাৎ) মইরা গেল। ইন্ডিয়ায় আইল তেনার মরা শরীল। পথের আলাপ, তভু জবর কষ্ট হইতে আছে।' একটু থেমে বলল, 'কিন্তুক এইর মইদ্যে একখান কাণ্ড ঘটছে।'

বিনু জিজ্ঞেস করল, 'কী কাণ্ড?'

অধর বলল, 'উই শালারা তো আমারে চিনে না। অরা যায় ডাইলে ডাইলে, আমি যাই পাতায় পাতায়।' দুই হাতের বুড়ো আঙুল নাচিয়ে নাচিয়ে বলতে লাগল, 'দিছি উই শালোগো এই আইঠা (বিচে) কলা চুষাইয়া।'

'উই শালাগো—' বলতে কোন শালাদের বুড়ো আঙুল বা বিচে কলা চুষিয়েছে অধর ভুঁইমালী, বুঝতে পারল না বিনু। জানতে চাইল, 'কাদের কথা বলছ?'

বিনুর কানে মুখটা প্রায় গুঁজে দিয়ে অধর বলল, 'উই পাকিস্থানি পুলিশ আর অগো (ওদের) অপসারগো।'

ব্যাপারটা পরিষ্কার হল না। বিনুর চোখমুখ দেখে সেটা আঁচ করে নিয়ে অধর বলল, 'বোঝতে নি পারলেন বাবুমশয়?'

'না।'

'আমি আগেই শুনছিলাম, বডারে (বর্ডারে) আইলে পাকিস্থানি পুলিশেরা মালপত্তর ঘাইটা ঘুইটা (ঘেঁটে) তল্লাশি তো করেই, মাইয়া মরদ কেওরে (কাউকে) বাদ দ্যায় না। শরীলে হাত হান্দাইয়া বিচরায় (হাত ঢুকিয়ে খোঁজে)।'

অধর ভুঁইমালী যা বলল, খানিক আগে দর্শনায় স্বচক্ষে তা দেখে এসেছে বিনু। নারীপুরুষ কেউ

রেহাই পায়নি।

অধর বলতে লাগল, 'পুঙ্গির পুতেগো চৌখে ধূলা দিয়া আমি সাত ভরি সোনার গয়না আর জমিজমা বাড়িঘরের বেবাক দলিল লইয়া আইছি।'

বলে কি লোকটা? খানিকক্ষণ হাঁ হয়ে থাকে বিনু। তারপর জিজ্ঞেস করে, 'তোমার জিনিসপত্র খুঁজে দেখে নি?'

'দ্যাখে আবার নাই? পিন্দনের (পরনের) কাপড়ের ভিত্‌রে তরি হাত হান্দাইয়া খাবলাইয়া দেখছে। তভু উদ্দিশ পায় নাই।'

'দলিল টলিল রেখেছিলে কোথায়?'

'ইণ্ডিয়ায় ঢুইকা গ্যাছি। অহন আর ডরের কিছু নাই। পাকিস্থানের পুলিশ এইহানে আইসা আর তেড়িমেড়ি করতে পারব না। বডারের এই পারে আইলে ইন্ডিয়া অগো ঘেটি থিকা মাথা নামাইয়া দিব। হঃ।' পায়ের মোটা ফেট্টিটা দেখিয়ে বলল, 'আসল মালগুলা রাখছি এইর ভিত্‌রে। ল্যাংড়াইয়া ল্যাংড়াইয়া হাটছি বইলা হুমুন্দির পুতেরা ট্যারই পায় নাই।'

বিনুর তাক লেগে গেল। এই অক্ষরপরিচয়হীন গেঁয়ো লোকটা কী ধুরন্ধর, কতখানি কূট বুদ্ধি সে ধরে এবং কী বিপুল তার অভিনয় প্রতিভা, ভাবা যায় না। সেই তারপাশা স্টিমারঘাট থেকে যে প্রক্রিয়ায় নিখুঁতভাবে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে সে মারাত্মক ধরনের নিষ্ঠুর আর সজাগ পাকিস্তানি অফিসার আর পুলিশবাহিনীকে ধোঁকা দিয়েছে, নিজের চোখে দেখেও বিশ্বাস হচ্ছে না বিনুর। নিশ্ছিদ্র পাহারদারি করেও সোনাদানা দলিলপত্র নিয়ে সীমান্তের এপারে তার চলে আসা পাকিস্তানিরা আটকাতে পারেনি। যন্ত্রণায় ভীষণ কষ্ট পাচ্ছে, এমন মুখভঙ্গি করে প্রায় দু'টো দিন কাটিয়ে দিয়েছে সে। বিনু ঘুণাক্ষরেও টের পায়নি, তার পায়ের ব্যাণ্ডেজের ভাঁজে ভাঁজে কী লুকনো আছে। হঠাৎ ত্রৈলোক্য সেনের কথা মনে পড়ল। তিনিও হুবহু এই প্রক্রিয়ায় যুদ্ধের আমলে বর্মা থেকে অনেক টাকা নিয়ে এসেছিলেন।

বিনু বলল, 'তা হলে তোমার পায়ে চোট টোট কিছুই লাগে নি!'

অধর বলল, 'না বাবুমশয়, না। একহান খোচা (খোঁচা) তরি না। আসল কথাহান কী জানেন?'

'কী?'

'দিনকাল আর আগের লাখান নাই। দাঙ্গা হইল, দ্যাশভাগ হইল, লাখ লাখ মানুষ ইণ্ডিয়ায় চইলা যাইতে আছে। অহন যদিন বুদ্ধি খাটাইয়া না চলেন, টিকতে পারবেন না। শ্যাষ হইয়া যাইবেন।'

অধর ভুঁইমালীর মুখ দিয়ে যেন দৈববাণী বেরুচ্ছে। সার সত্যিটা সে বুঝে নিয়েছে। এই দুঃসময়ে পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে হলে কৌশল দরকার। বিনু নিশ্চিত, লোকটা যে ধরনের চতুর এবং ফন্দিবাজ, ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ হয়ে গেলেও সে শেষ হয়ে যাবে না। নিজের বউ ছেলে মেয়ের জন্য ইন্ডিয়ায় কিছু একটা ব্যবস্থা নিশ্চয়ই করে ফেলবে।

অধর গলা আরও নামিয়ে দিল, 'বিশ্বাস কইরা আপনেরে কথাগুলা কইলাম বাবুমশয়। দেইখেন কেউ (কেউ) য্যান ট্যার না পায়।'

'না না, আমি কাউকে জানাব না। তা ছাড়া, কলকাতায় পৌঁছবার পর আমরা কে কোথায় চলে যাব, হয়তো আর দেখাই হবে না।'

একসময় ট্রেন বেনাপোল পৌঁছে যায়।

বর্ডারের ওধারের মতো এখানেও প্রচুর ইন্ডিয়ান পুলিশ এবং অফিসার রয়েছেন। আর আছে অনেকগুলো সরকারি আর বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের লোকজনেরা।

এখানে অবশ্য ট্রেনটাকে বেশিক্ষণ আটকানো হল না। সরকারি তরফ থেকে তো বটেই, স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানগুলোর লোকজনেরাও উদ্বাস্তুদের শুকনো খাবার অর্থাৎ চিঁড়ে গুড় দরবেশ, ইত্যাদি খেতে দিল। ক্লান্ত, ক্ষুধার্ত মানুষগুলো গোগ্রাসে খেতে লাগল।

এরই মধ্যে অফিসাররা উদ্বাস্তুদের কে কোত্থেকে এসেছে, তাদের নাম, পরিবারে কতজন মানুষ, ইন্ডিয়ায় তাদের আত্মীয়স্বজন কেউ আছে কিনা, থাকলে সেখানে আশ্রয় পাওয়ার কতখানি সম্ভাবনা, ইত্যাদি টুকে নিয়ে প্রত্যেককে বর্ডার স্লিপ লিখে দিতে লাগলেন। ইন্ডিয়ার সরকারি নথিপত্রে শরণার্থী হিসেবে তাদের নামগুলো পাকা জায়গা পেয়ে গেল।

pathagar.net

গোয়ালন্দের মতো বেনাপোলেও একদল সিনেমার লোক মুভি ক্যামেরা নিয়ে উদ্বাস্তুদের ছবি তুলছিল। সবার বয়স তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশের মধ্যে। দলের কেউ কেউ ওপার থেকে আসা মানুষগুলোর সঙ্গে কথা বলে দেশছাড়ার কারণ রেকর্ড করে নিচ্ছে। গোয়ালন্দে সেভাবে মুখ খোলে নি উদ্বাস্তুরা। কিন্তু এপারে এসে নির্ভয়ে জানিয়ে দিচ্ছে, পাকিস্তানে কী আতঙ্কের ভেতর তাদের দিন কেটেছে এবং ইন্ডিয়ায় না এসে কেন তাদের উপায় ছিল না, ইত্যাদি।

বিনু লক্ষ করল, সিনেমার এই কলাকুশলীরা গোয়ালন্দের সেই দলটার মতো সাত সমুদ্র তের নদী পেরিয়ে আসেনি। তারা এই উপ-মহাদেশেরই লোক। ওদের চেহারা দেখে, কথা শুনে মনে হয়, নিঃসন্দেহে বাঙালি। বিশ শতকের মাঝামাঝি লক্ষ লক্ষ মানুষের দেশত্যাগের মর্মান্তিক ইতিহাস তারা ছবিতে ধরে রাখছে।

অনেককে বর্ডার স্লিপ দেবার পর একজন অফিসার বিনুকে ডাকলেন। বাঁধা নিয়মে তার নাম টাম জেনে নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'সঙ্গে আর কেউ আছে?'

বিনু ঝিনুকের কথা বলল।

'আপনার স্ত্রী?' অফিসার জানতে চাইলেন।

বিব্রত বোধ করে বিনু। একটু ভেবে বলে, 'না। আমার আত্মীয়। দাঙ্গায় ওর মা-বাবা মারা গেছেন।'

ঝিনুক সম্পর্কে আর কোনও প্রশ্ন না করে অফিসার বললেন, 'কলকাতায় আপনাদের কেউ আছেন?'

'আছেন। আমার দুই দিদি আর বাবা।'

'তা হলে আপনাদের রিলিফ কাম্পে ওঠার দরকার নেই।'

'রিলিফ ক্যাম্প?'

অফিসার বিশদভাবে বুঝিয়ে দিলেন। যারা সর্বস্ব খুইয়ে সীমান্তের ওপার থেকে পশ্চিম বাংলায় চলে আসছে, তাদের আশ্রয় দেবার মতো আত্মীয়পরিজন যদি এখানে না থাকে, এই ধরনের মানুষজনকে কলকাতার আশেপাশে বা বিভিন্ন জেলায় ত্রাণ-শিবিরে পাঠানো হচ্ছে। যতদিন না সরকার পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করছে, বা এরা নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারছে, শিবিরেই তাদের থাকতে হবে। সরকারই এদের যাবতীয় দায়িত্ব পালন করবে।

অফিসার বললেন, 'আপনার তো সে সমস্যা নেই। বাবা আর দিদিরা যখন আছেন, তাঁদের কারোর কাছে উঠতে পারবেন। ক্যাম্পে যাবার দরকার হবে না।'

আস্তে মাথা নাড়ে বিনু, 'না।'

'এই বর্ডার স্লিপ দু'টো রাখুন—'বিনু আর ঝিনুকের নাম লিখে দু'টো ছাপানো কাগজ দিলেন অফিসার।

বিনু বলল, 'আমরা তো রিলিফ ক্যাম্পে উঠছি না। এ দু'টো দিয়ে কী হবে?'

'আপনারা যে জেনুইন রিফিউজি, বর্ডারের ওপার থেকে ইন্ডিয়ায় এসেছেন, এই স্লিপ তার ডকুমেন্ট। একটা খবর কি আপনি জানেন?'

'কী?'

'সরকারি চাকরিবাকরির ব্যাপারে রিফিউজিদের অনেক প্রেফারেন্স দেওয়া হচ্ছে। ভবিষ্যতে সারভিস করতে চাইলে এ দু'টো কাজে লাগবে। যত্ন করে রাখবেন।'

সীমান্তের ওধারে একজন সহৃদয় তরুণ বাঙালি অফিসারকে দেখে এসেছে বিনু। এ পারেও তেমন একজনকে পাওয়া গেল। সহানুভূতিশীল, শুভাকাঙ্ক্ষী। তবে এধারের অফিসারটি ওপারের অফিসারের মতো যুবক নন। মধ্যবয়সী।

বিনুর সঙ্গে কথা শেষ হয়ে গিয়েছিল। অফিসারটি অন্য একজন উদ্বাস্তুকে ডাকতে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ রামরতনদের কথা মনে পড়ে গেল তার। ব্যস্তভাবে বলল, 'স্যার, একটা ফ্যামিলি আমাদের সঙ্গে এসেছে। তাদের নাম গভর্নমেন্ট রেকর্ডে থাকা দরকার।'

'নিশ্চয়ই। তারা কোথায়?'

'ট্রেনের কম্পার্টমেন্টে রয়েছে।'

pathagar.net

'ওদের তাড়াতাড়ি পাঠিয়ে দিন।'

'ওরা আসতে পারবে না।'

'কেন?'

রামরতনদের তারপাশা স্টিমারঘাটে পরিচয় হবার পর একসঙ্গে গোয়ালন্দে আসা, তারপর ট্রেনে তাঁর মৃত্যু, সংক্ষেপে সব জানিয়ে দিয়ে বিনু বলল, 'ওঁর স্ত্রী আর মেয়েরা ডেডবডি আগলে কান্নাকাটি করছে। কী করে নেমে আসবে?'

অফিসার কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে থাকেন। তারপর বিষণ্ণ গলায় বলেন, 'না না, ওঁদের আসার দরকার নেই। আমি আপনার সঙ্গে একজনকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। সে ওঁদের নাম টাম রেকর্ড করে বর্ডার স্লিপ দিয়ে আসবে। কিন্তু—'

'কী?'

'ডেডবডিটা নিয়ে তো ভীষণ সমস্যা হল।'

'হ্যাঁ। শিয়ালদায় গিয়ে যদি দেখি রামরতনবাবুর ভাইপো আসেননি, খুব বিপদে পড়ে যাব। ওঁদের ফেলেও চলে যেতে পারব না, অথচ কী করব বুঝে উঠতে পারছি না। স্যার, আপনি কি আমাকে এ ব্যাপারে সাহায্য করতে পারেন?'

একটু চিন্তা করে অফিসার বললেন, 'ডেডবডি বেশিক্ষণ ফেলে রাখা যাবে না। পচন শুরু হয়ে যাবে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, বার্নিং ঘাটে নিয়ে যাওয়া দরকার। কিন্তু এখানে সেরকম কোনও ব্যবস্থা নেই। শিয়ালদায় আমাদের ডিপার্টমেন্টের একজন অফিসারকে চিঠি লিখে দিচ্ছি। যদি রামরতনবাবুর ভাইপো না আসেন, তাঁর সঙ্গে দেখা করবেন। ওঁর হেল্প নিশ্চয়ই পাবেন।' দ্রুত চিঠি লিখে একটা খামে পুরে বিনুকে দিতে দিতে বললেন, 'খুব ভালমানুষ। ভেরি মাচ সিমপ্যাথেটিক টু দা রিফিউজিস। অনেক সময় নিজের এক্তিয়ারের বাইরে গিয়েও সাহায্য করেন।'

খামের ওপর অফিসারের নাম লেখা আছে। অলোকপ্রসাদ সেন। বিনু জিজ্ঞেস করল, 'অলোকপ্রসাদবাবুকে যদি কোনও কারণে না পাওয়া যায়?'

জোর দিয়ে অফিসারটি বললেন, 'নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। আপনাদের ট্রেনটা যে যাচ্ছে, ওঁকে সে খবর পাঠানো হয়েছে। রিফিউজিদের রিসিভ করার জন্যে উনি শিয়ালদায় থাকবেন। তবে ধরুন হঠাৎ শরীর খারাপ হল, কি অন্য কোনও জরুরি কাজে অথরিটি ডেকে পাঠালেন, তা হলে ওঁর অ্যাসিস্টান্ট শুকদেব মালাকারের সঙ্গে দেখা করে আলোকপ্রসাদবাবুর চিঠিটা দেবেন, আমার কথাও বলবেন। আশা করি, কাজ হবে।' অফিসার তাঁর এক সহকারীকে বিনুর সঙ্গে পাঠিয়ে দিলেন। সে রামরতনের স্ত্রী এবং মেয়েদের নাম টাম লিখে, বর্ডার স্লিপ দিয়ে চলে গেল। আরও কিছুক্ষণ বাদে ট্রেন চলতে শুরু করল।

উদ্বাস্তুদের নিয়ে স্পেশাল ট্রেনটা একটানা ছুটতে পারছে না। মাঝে মাঝেই সিগনাল না পেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ছে। এইভাবে থেমে থেমে যখন শিয়ালদায় পৌঁছল, সন্ধে পার হয়ে গেছে।

গোটা স্টেশন জুড়ে প্রচুর আলো জ্বলছে। রয়েছে বন্দুক হাতে বিরাট এক পুলিশ বাহিনী। প্যান্ট শার্ট পরা কিছু লোকজনও রয়েছে। তাঁদের ব্যস্ততা দেখে আন্দাজ করা যাচ্ছে, ওঁরা সরকারি কর্মচারী। দু'চারজন নিশ্চয়ই অফিসার, বাদবাকি তাঁদের সহকারী।

মাইকে ঘোষণা করা হচ্ছিল, যে সব উদ্বাস্তু এই ট্রেনে এসেছে, তাদের আশ্রয় দেবার মতো কোনও আত্মীয়স্বজন যদি কলকাতায় বা পশ্চিমবঙ্গে না থাকে, তারা যেন আপাতত শিয়ালদা স্টেশনেই থেকে যায়। গভর্নমেন্ট থেকে পরে তাদের ব্যবস্থা করা হবে।

ট্রেনের জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বাইরে তাকিয়ে ছিল বিনু। যাতায়াতের জন্য প্ল্যাটফর্মের সিকিভাগ ছেড়ে বাকি অংশটায় কত যে মানুষ বসে আছে তার লেখাজোখা নেই। সাত আট ফুটের

মতো জায়গা ইট পেতে সীমানা ঠিক করে নিয়েছে এক একটা ফ্যামিলি। তার ভেতর গাদাগাদি করে আছে বাচ্চাকাচ্চা, স্বামী-স্ত্রী এবং উঁই-করা লটবহর। এইরকম অসংখ্য খোপ, অগুনতি পরিবার। দেখামাত্র টের পাওয়া যায়, ওরাও ভিটেমাটি খুইয়ে বিনুদের আগেই এখানে চলে এসেছে। শিয়ালদা স্টেশনের প্ল্যাটফর্মই এখন তাদের ঠিকানা।

বিনুর চকিতে মনে হল, আজ যারা তার সঙ্গে এই ট্রেনে এসেছে তাদের নিরানব্বই ভাগই এই স্টেশনে থেকে যাবে। কালও ট্রেন বোঝাই হয়ে আসবে, আসবে পরশুও। আসতে থাকবে দিনের পর দিন। হাজারে হাজারে। এই স্টেশনের চত্বরে কত মানুষের জায়গা হবে?

কিন্তু এসব ভাবনা ছাপিয়ে যে প্রশ্নগুলো মাথার ওপর পাষাণভারের মতো চেপে আছে তা হল, অবনীমোহন আর সুধা সুনীতিরা কি তাকে নিয়ে যাবার জন্য স্টেশনে এসেছে? তার চেয়েও দুশ্চিন্তার ব্যাপার, রামরতনের ভাইপো বিমল এসেছে কিনা।

মাইকে অনবরত একই ঘোষণা চলছিল। এই ট্রেনে যে উদ্বাস্তুরা এসেছে, তাদের যদি—

পাশ থেকে হরিন্দ উদ্বেগের সুরে বলল, 'ছুটোবাবু, শুনলেন নি, কী কইতে আছে? আপনের দুই বইন আর বাবায় কইলকাতায় আছে। আপনের চিন্তা নাই। আমাগো এই ইস্টিশান পইড়া থাকতে হইব।'

ভুবন দাসও এই কামরায় ছিল। সে বলল, 'কপালে কী যে আছে!' তার অটুট বিশ্বাস ছিল, ইন্ডিয়ায় সবাই তাদের জন্য হাত বাড়িয়ে রেখেছে। সেখানে জমিজমা, ডোল-ভরা ধান, বাড়িঘর, ফলবাগিচা, সমস্ত সাজানো রয়েছে। তারা ভারতে এলে তাদের হাতে সেসব তুলে দেওয়া হবে। কিন্তু শিয়ালদা স্টেশনে ট্রেন থেকে নামার আগেই স্বপ্নভঙ্গ ঘটে গেল। চরম হতাশাগ্রস্ত ভুবন দাস জোরে জোরে মাথা নাড়তে থাকে।

এখন হা-হুতাশ শোনার সময় নেই। আগে যা দরকার তা হল বিমলের খোঁজ নেওয়া, নইলে অলোকপ্রসাদ সেনের সঙ্গে দেখা করা। একবার বাঁ দিকে তাকাল বিনু। রামরতনের মৃতদেহ ঘিরে একইভাবে বসে আছেন তাঁর স্ত্রী এবং মেয়েরা। কেউ আর কাঁদছে না। যেন চার পাথরপ্রতিমা। তাদের পাশে ঠায় বসে আছে ঝিনুক। নীরব, বিহ্বল।

বিনু উঠে দাঁড়ায়। রামরতনের স্ত্রীকে বলে, 'বিমলবাবু এলেন কিনা, খোঁজখবর নিয়ে আসি। আপনারা একটু অপেক্ষা করুন।'

বৃদ্ধা উত্তর দিলেন না। আচ্ছন্নের মতো স্বামীর মৃতদেহের দিকে তাকিয়ে বসে রইলেন।

বিনু কম্পার্টমেন্ট থেকে নেমে পড়ে। চারদিকে তুমুল শোরগোল চলছে। আগে যে উদ্বাস্তুরা এসে প্ল্যাটফর্ম জুড়ে বসে ছিল তারা হইচই বাধিয়ে দিয়েছে। যারা নতুন এল, তাদের কেউ ট্রেন থেকে নামেনি। কী করবে বুঝতে না পেরে অধীর হয়ে উঠেছে। প্ল্যাটফর্মে যাকেই দেখছে, পুলিশ কনস্টেবল থেকে অফিসার এবং সাধারণ স্তরের সরকারি কর্মচারী, সবাইকে ডেকে ডেকে জিজ্ঞেস করছে, 'বাবুরা, অহন আমরা কী করুম? আর কতক্ষণ গাড়ির ভিতরে বইসা থাকুম? শরীলে আর দিতে আছে না।'

অফিসাররা যেখানে রয়েছেন সেদিকে যেতে যেতে হঠাৎ চোখে পড়ল, একটি লোক, চল্লিশ বেয়াল্লিশের মতো বয়স, পরনে ধুতি শার্ট, প্রতিটি কামরার জানালায় মুখ বাড়িয়ে ডাকাডাকি করতে করতে আসছে।

প্রথমটা বোঝা যাচ্ছিল না, কাছাকাছি আসতে পরিষ্কার শোনা গেল, 'জেঠু জেঠু, বাসন্তীদিদি, মায়া—ছায়া।'

বাসন্তী রামরতনের বিধবা মেয়ে। তার নাম বিনু আগেই জেনেছে। নিঃসন্দেহে এই লোকটা বিমল। রামরতনের চিঠি পেয়ে সে তাদের নিতে এসেছে।

বিনু একরকম দৌড়েই লোকটার কাছে চলে আসে। যদিও সংশয় নেই, তবু পুরোপুরি নিশ্চিত হবার জন্য জিজ্ঞেস করে, 'আপনি কি বিমলবাবু?'

লোকটা অবাক দৃষ্টিতে কয়েক পলক তাকিয়ে থাকে। তারপর বলে, 'হ্যাঁ। কিন্তু আপনাকে তো চিনতে পারলাম না।'

'চেনার কথা নয়। আমি ইস্ট পাকিস্তান থেকে এই ট্রেনটায় এসেছি। রামরতন গাঙ্গুলি নিশ্চয়ই আপনার জেঠামশাই?'

'আপনি জানলেন কী করে?'

কিভাবে রামরতনের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে এবং তাঁর মুখেই বিমলের কথা শুনেছে, ইত্যাদি জানিয়ে বিনু বলল, 'আপনাকে একটা খবর দেবার আছে, কিন্তু কেমন করে দেব বুঝতে পারছি না।'

বিমল অধীরভাবে বলল, 'পরে আপনার খবর শোনা যাবে। জেঠামশাইরা যে কম্পার্টমেন্টে আছেন, আমাকে সেখানে নিয়ে চলুন।'

'না।'

'মানে?'

'আগে আমার খরবটা আপনার শোনা দরকার।'

বিমূঢ়ের মতো অচেনা যুবকটির দিকে তাকিয়ে থাকে বিমল।

বিনু বিমলের চোখের দিকে তাকাতে পারছিল না। নতমুখে বলল, 'খুব দুঃসংবাদ। ট্রেনে আসতে আসতে আপনার জেঠামশাইয়ের মৃত্যু হয়েছে। ডেডবডি কম্পার্টমেন্টে রয়েছে। আপনি ওঁদের নিতে আসতে পারেন, তাই ট্রেন থেকে নেমে আপনার খোঁজ করছিলাম। বাসন্তীদেবীর নাম করে ডাকতেই বুঝতে পারলাম, আপনি বিমলবাবু।'

বিনুর শেষ কথাগুলো যেন শুনতে পাচ্ছিল না বিমল। আকস্মিক আঘাতে শিয়ালদা স্টেশনের অজস্র আলো, অসংখ্য মানুষের শোরগোল মুহূর্তে ঝাপসা হয়ে যায়। টলতে টলতে পড়েই যেত, বিনু তাকে ধরে ফেলল। বলল, 'বিমলবাবু, ভেঙে পড়বেন না। নিজেকে শক্ত রাখুন। আপনার জেঠাইমা আর বোনেরা ডেডবডি নিয়ে বসে আছে। আপনি বিচলিত হয়ে পড়লে ওদের কে সান্ত্বনা দেবে?'

বিমল জবাব দিল না। বালকের মতো আকুল হয়ে কিছুক্ষণ কাঁদল। তারপর চোখ মুছে ধরা গলায় বলল, 'চলুন—'

যে চারটি নারী নিষ্প্রাণ মূর্তি হয়ে বসে ছিল, বিমলকে দেখে তারা ফের উচ্চরোল কান্নায় ভেঙে পড়ে। সবার চোখ থেকে অবিরল জল ঝরে যায়।

কেঁদে কেঁদে গলা ভেঙে গিয়েছিল রামরতনের স্ত্রীর। বিকৃত স্বরে বৃদ্ধা বলতে লাগলেন, 'সব শ্যাষ হইয়া গ্যাল রে বিমল। তর জ্যাঠার শরীলটাই আসল, পরানটা রাইখা আসল উই পারে।'

তিন বোন কেঁদেই চলেছে। দুর্বোধ্য, জড়ানো গলায় যা বলছে সেই হাহাকারের একটি বর্ণও বোঝা যাচ্ছে না।

বৃদ্ধাকে জড়িয়ে ধরে খানিকক্ষণ বসে থাকে বিমল। সমানে বলতে থাকে, 'তুমি যদি এত অস্থির হও, আমাদের কে দেখবে? শান্ত হও জেঠিমা, শান্ত হও—'

এদিকে মাইকে মুহুর্মুহু ঘোষণা হচ্ছিল, যে ছিন্নমূল মানুষদের এপারে আত্মীয়পরিজন নেই তারা ধীরে ধীরে সুশৃঙ্খলভাবে যেন ট্রেন থেকে নেমে আসে।

অধর ভুঁইমালী আর হরিন্দ বিনুকে বলল, 'আমাগো ডাক আসছে ছুটোবাবু। এই জনমে আর বুঝিন আপনের লগে দেখা হইব না।'

বিনু বলল, 'নিশ্চয়ই হবে। তোমরা তো এখন শিয়ালদা স্টেশনেই থাকছ। দু'চারদিন পর এসে তোমাদের দেখে যাব।'

লটবহর এবং বউ-বাচ্চা নিয়ে লোকজন নেমে যেতে থাকে। ক্রমশ কামরা ফাঁকা হয়ে যায়।

হঠাৎ বিনুর খেয়াল হল, তাদের নিয়ে যাবার জন্য কেউ আসেনি। না সুধা, না সুনীতি, না অবনীমোহন। ওঁরা এলে নিশ্চয়ই কামরায় কামরায় হাঁক দিয়ে যেতেন। রাত বাড়ছে। এই বিশাল মহানগর বিনুর প্রায় অচেনা। সেই কতকাল আগে, ছেলেবেলার কয়েকটা বছর এখানে কাটিয়েছে সে। তারপর এই আসা। সেদিনের সেই শহর এতকাল বাদে কি আর তেমনটাই আছে? ঝিনুককে নিয়ে এই রাত্রিবেলা তাকে বাবা কি বোনেদের কারোর ঠিকানা খুঁজে বার করতে হবে।

বিমল স্টেশনে আসায় একটা বিরাট দুর্ভাবনা মাথা থেকে নেমে গেছে। রামরতনদের সব দায়িত্ব

এখন বিমলের। এবার বিনুর মুক্তি। যা করার বিমলই করবে। তবু এই শোকবিহ্বল মানুষগুলোকে ফেলে রেখে চট করে কামরা থেকে নেমে যাওয়া সম্ভব হল না।

বিনু বিমলের পিঠে হাত রাখল। সে ঘুরে তাকাতেই নীচু গলায় বলল, 'আমার সঙ্গে একটু আসুন। দরকার আছে।' চোখের ইশারায় ঝিনুককে তারপাশায় কেনা নতুন চাদর দু'টো নিয়ে উঠে আসতে বলল।

প্ল্যাটফর্মে নেমে বিমল বলল, 'বলুন কী দরকার?'

বিনু জানায়, গত দু'তিনটে দিন চরম আতঙ্কের মধ্যে কেটে গেছে তাদের। স্নান নেই, ঘুম নেই, ভাল করে খাওয়া নেই। তার ওপর রামরতনদের দায়। শরীর ভেঙেচুরে আসছে। কলকাতায় পৌঁছেও তার উৎকণ্ঠা শেষ হয়নি। চিঠি দেওয়া সত্ত্বেও কেউ তাদের নিতে আসেনি। এই রাত্রিবেলা তাকে একটা আশ্রয় খুঁজে বার করতে হবে। কিন্তু রামরতনের মৃতদেহের ব্যবস্থা করা এখনই প্রয়োজন। চলে যাবার আগে অলোকপ্রসাদ সেনের সঙ্গে সে বিমলের পরিচয় করিয়ে দিতে চায়। অফিসারটি নিশ্চয়ই বিমলকে সাহায্য করবেন।

বিমল বলল, 'তা হলে তো খুব ভাল হয়। এই অবস্থায় কী করব, ভেবে পাচ্ছিলাম না।

সরকারি কর্মচারীদের জিজ্ঞেস করে করে অলোকপ্রসাদের খোঁজ পাওয়া গেল। তিনি প্ল্যাটফর্মেই ছিলেন। মাঝবয়সী, মাঝারি হাইট, সৌম্য চেহারা। বিনু সীমান্তের সেই অফিসারটির চিঠি তাঁকে দিয়ে নিজের এবং বিমলের পরিচয় দিল।

চিঠিটা পড়ার পর ভীষণ ব্যস্ত হয়ে পড়লেন অলোকপ্রসাদ। জিজ্ঞেস করলেন, 'ডেডবডি কি এখনও কম্পার্টমেন্টে রয়েছে?'

বিনু এবং বিমল জানায়, 'হ্যাঁ।'

'আমি এখনই সব অ্যারেঞ্জমেন্ট করছি।'

বিনু কুণ্ঠিত মুখে বিমলকে বলল, 'এ সময় আপনার পাশে থাকতে পারলে ভাল হত। কিন্তু আমার সমস্যার কথা তো শুনেছেন।'

বিমল আস্তে মাথা নাড়ে, 'হ্যাঁ। আপনাকে আর আটকে রাখব না।'

'আপনার ঠিকানা আমি জানি। জেঠাইমা আর বোনেদের বলবেন, পরে একদিন গিয়ে ওঁদের সঙ্গে দেখা করে আসব।'

'নিশ্চয়ই আসবেন। আমাদের যা উপকার আপনি করেছেন—'

তাকে থামিয়ে দিয়ে বিনু বলল, 'একসঙ্গে দেশ ছেড়ে এসেছি। এটুকু তো করতেই হয়। আচ্ছা চলি।' বলে আর দাঁড়াল না। ঝিনুক সঙ্গে এসেছিল। তাকে নিয়ে ভিড় ঠেলে ঠেলে সামনে এগিয়ে যেতে লাগল। অন্যমনস্কের মতো একবার ভাবল, রামরতনের মৃতদেহ দাহ করে কখন ওরা বাড়ি ফিরবে, কে জানে।

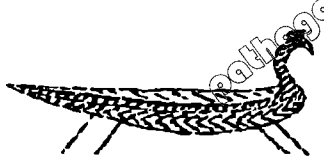

প্ল্যাটফর্মের বাইরে আসতে দেখা গেল, একই দৃশ্য। বিশাল চত্বর জুড়ে থিকথিকে ভিড়। ইটের সীমানা ঘেরা আট দশ ফুট জায়গায় এক একটা পরিবার। অগুনতি ফেস্টুন চারদিকে টাঙানো। সেগুলোতে নানা সেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের নাম। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, শরণার্থীদের জন্য যে সরকারি ত্রাণব্যবস্থা করা হয়েছে তা যথেষ্ট নয়। বেসরকারি অর্গানাইজেশনগুলোকেও তাদের সঙ্গে হাত মেলাতে হয়েছে।

যেদিকে তাকানো যায়, শুধু মানুষ আর মানুষ। এত মানুষ ঠাসাঠাসি করে থাকলে যা হয়, তুমুল হট্টগোল, ধাক্কাধাক্কি, কুৎসিত খিস্তিখেউড়।

সমস্ত এলাকাটা নরককুণ্ড। যত্রতত্র গু মুত, দলা দলা কফ, উঁই-করা এঁটো শালপাতা। এখানকার বাতাসে ঘাম ধরা স্থায়ী দুর্গন্ধ। পেট একেবারে গুলিয়ে ওঠে।

দম আটকানো আবহাওয়ার ভেতর দিয়ে পথ করে করে এগিয়ে যাচ্ছিল বিনু আর ঝিনুক। পশ্চিম

দিকের শেষ মাথায় কাতার দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে রিকশা আর ঘোড়ার গাড়ি। বিনু ঠিক করে ফেলেছে, একটা ঘোড়ার গাড়ি নিয়ে ভবানীপুরে অবনীমোহনের কাছে যাবে।

হঠাৎ দেখা গেল, খানিক দূরে তিন চারটে লোক এক নাগাড়ে চেঁচিয়ে যাচ্ছে, 'পাকিস্থানি টাকা পালটাবেন, পাকিস্থানি টাকা পালটাবেন—'

বিনুর মনে পড়ল, তার কাছে ভারতীয় টাকা নেই। যা আছে তা হল শ'আটেক টাকার মতো পাকিস্তানি নোট আর কিছু খুচরো। এখানে সেগুলো অচল। রাজদিয়ায় থাকতেই সে শুনেছিল, শিয়ালদায় কিছু দালাল চড়া বাট্টা দিলে পাকিস্তানি টাকার বদলে ইন্ডিয়ান টাকা দেয়। ভাগ্য ভাল, দালালগুলোর চেঁচানি কানে এসেছিল। নইলে পরে ঘোড়ার গাড়ির ভাড়া মেটাতে মুশকিল হত।

আটশ' টাকা বদলে সাড়ে ছ'শ ভারতীয় টাকা পাওয়া গেল। পাকিস্তানি টাকার দাম কম। কত কম, বিনুর ধারণা নেই। দালালটা যে ঠকাল, মোটামুটি টের পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু এখন আর কিছু করার নেই।

টাকা পকেটে পুরে কাপা এগিয়েছে, কে যেন নাম ধরে ব্যগ্রভাবে ডেকে উঠল, 'বিনু—বিনু—এই যে, এই দিকে—'

এই প্রায়-অচেনা শহরের রেল স্টেশনে কে তাকে ডাকতে পারে? চমকে এধারে ওধারে তাকাতে চোখে পড়ল, ইটের বাউন্ডারি দেওয়া চৌকো একটা খোপের ভেতর থেকে একজন হাত নাড়ছে।

দেখামাত্র চিনতে পারল বিনু। পতিতপাবন। ওদের বাড়ি ছিল রাজদিয়ার লাগোয়া গ্রাম তাজহাটিতে। রাজদিয়া স্কুলে তার সঙ্গে পড়ত। বয়সে কম করে দশ বছরের বড়। একবারে সে কখনও প্রমোশন পায়নি। দু'তিন বছর ফেল করে তবে পরের ক্লাসে উঠত। স্কুলে পড়তে পড়তেই তার বিয়ে হয়ে গিয়েছিল। মনে আছে, প্রথম যেদিন বিনু রাজদিয়া হাইস্কুলে ক্লাস করতে যায়, টিফিনের সময় পতিতপাবন বলেছিল, তাকে চালাক বানিয়ে দেবে। অর্থাৎ পাকিয়ে ছাড়বে। অবশ্য কড়া অ্যাসিস্টান্ট হেডমাস্টার আশু দত্তর জন্য তার মনস্কামনা পূর্ণ হয়নি।

সেই পতিতপাবনের সঙ্গে শিয়ালদায় দেখা হয়ে যাবে, কে ভাবতে পেরেছিল! বিনু পায়ে পায়ে এগিয়ে যায়। ততক্ষণে পতিতপাবনও উঠে দাঁড়িয়েছে। বিনু লক্ষ করল, তিনটে নানা বয়সের বাচ্চা, একটি সদ্য যুবতী আর আধ ঘোমটা দেওয়া একটি বউ বসে আছে। নিশ্চয়ই পতিতপাবনের স্ত্রী এবং ছেলেমেয়ে।

পতিতপাবন জিজ্ঞেস করল, 'আইজের ট্রেনে আসলা বুঝিন?'

মাথা সামান্য কাত করে বিনু, 'হ্যাঁ। তোমরা কবে এসেছ?'

'মাস দুই।'

'সেই থেকে এখানেই আছ?'

'হ। আর কই যামু? এই দ্যাশের কিছুই তো চিনি না। মাঝে মইদ্যে অপিসাররা আইসা কয়, রিফুজি কেম্পে নিয়া যাইব।'

'কবে নেবে?'

'হেরাই (তারাই) জানে।'

ষাট কানি দোফসলা সরেস ধানজমি ছিল পতিতপাবনদের। ছিল ঢেউ টিনের ছাউনি দেওয়া সাতাশের বন্দের বড় বড় ঘর, সাত আটটা দুধেল গাই, বাগবাগিচা, তিন চারটে দীঘির মতো পুকুর। অজস্র ধান, প্রচুর মাছ, অঢেল দুধ। তারা কিনা এই স্টেশন চত্বরে নরকের মধ্যে বসে আছে।

কথা বলতে বলতে দু'একবার ঝিনুকের দিকে তাকাচ্ছিল পতিতপাবন। কৌতূহল থাকলেও কোনও প্রশ্ন করল না।

পতিতপাবন বলল, 'আমাগো তাজহাটি ছাড়াও চাইর পাশের গেরামগুলা থিকা মেলা মানুষ এই পারে আসছে। তাগো অনেকেই শিয়ালদা ইস্টিশানে আছে।'

বিনু বলল, 'তাই নাকি?'

'হ। টেরেনে হয়রান হইয়া আসছ। তোমারে আর আটকামু না। তোমার বাবায় আর বইনেরা তো কইলকাতায় থাকে। কার কাছে উঠবা?'

pathagar.net

রাজদিয়া এবং তার চারপাশের গ্রামগুলোর সবাই সবার নাড়িনক্ষত্রের খবর রাখত। পতিতপাবনও ঝিনুদের কথা জানে। দেশভাগের পর ওই অঞ্চলের মানুষজন ভিটেমাটি ফেলে শত দিকে ছিটকে পড়ছে। কেউ যাচ্ছে আগরতলায়, কেউ আসামে, বেশির ভাগই অবশ্য পশ্চিম বাংলায়। একজনের সঙ্গে অন্যজনের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। আর কিছুদিন বাদে কেউ কাউকে মনেও রাখবে না। যারা পাশাপাশি পুরুষানুক্রমে বাস করে এসেছে তাদের মুখগুলি বিস্মৃতির আঁধারে ক্রমশ বিলীন হয়ে যাবে।

বিনু বলল, 'বাবার কাছে উঠব।'

পতিতপাবন বলে, 'তভু তো তোমার এইহানে একহান জাগা (জায়গা) আছে। পোলামাইয়া বউ লইয়া আমি এক্কেরে সমুন্দুরে পড়ছি। শিয়ালদার ইস্টিশানে কুত্তা বিলাইর (বেড়াল) লাখান বাকি জনম কাইটা যাইব কিনা, ক্যাঠা জানে। কুনো আশা-ভরসা দেখি না।'

একই আক্ষেপ, একই রকম শঙ্কা ভুবন দাস আর হরিন্দর। ওদের দু'জনেরই বা কেন, যারা পূর্ব পাকিস্তান থেকে সর্বস্ব খুইয়ে এপারে চলে এসেছে, ইন্ডিয়ায় যাদের আপনজন কেউ নেই, তাদের সবার একই সমস্যা।

পতিতপাবন ফের বলল, 'রাইত হইছে মেলা (অনেক)। যাও গা। বাবারে কইও যদিন আমার লেইগা কিছু কইরা দিতে পারেন, যাতে মাইনষের লাখান বাচতে পারি।'

বিনু বলল, 'নিশ্চয়ই বলব।' সে আর দাঁড়াল না। ঝিনুককে সঙ্গে করে যেখানে ঘোড়ার গাড়িগুলো দাঁড়িয়ে আছে সেখানে চলে এল। তারা যাবে ভবানীপুরে, পূর্ণ সিনেমার কাছে প্রিয়নাথ মল্লিক রোডে। একটা কোচোয়ানকে সে কথা জানাতে ভাড়া হাঁকল বিশ টাকা।

বিনু বুঝতে পারছে, লোকটা অনেক বেশি চাইছে। কিন্তু খিদেয়, তেষ্টায়, রাস্তার ধকলে জীবনীশক্তি ক্ষয়ে ক্ষয়ে শেষ হয়ে এসেছে। স্নায়ুগুলো যেন ছিঁড়ে পড়বে। মাথার ভেতর হাজার ঝিঁঝি ডাকছে। লক্ষ করল, ঝিনুকও দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না। সব কিছুর ওপর রামরতনের মৃত্যু দু'জনকে প্রচণ্ড ঝাঁকানি দিয়ে গেছে। একটি শ্রদ্ধেয় মানুষের জীবনের অবসান কী মর্মান্তিকভাবেই না ঘটল!

ভাড়া কমানোর জন্য দর কষাকষি করল না বিনু। ঝিনুককে আগে গাড়িতে তুলে দিয়ে নিজে উঠতে উঠতে কোচোয়ানকে বলল, 'চালাও। যত তাড়াতাড়ি পার পৌঁছে দেবে।'

অবাঙালি মুসলমান কোচোয়ান বলল, 'জি, সাব—' বলেই চাবুক হাঁকিয়ে গাড়ি ছোটাল।

মুহূর্তে স্টেশন চত্বর পেরিয়ে বাইরের ট্রাম রাস্তায় এল বিনুরা। ঘোড়া দুরন্ত গতিতে দৌড়চ্ছে। শক্ত পিচের রাস্তা থেকে উঠে আসছে অশ্বক্ষুরের একটানা ধ্বনি।

রাস্তার দু'ধারে উঁচু উঁচু সব বাড়ি। সারি সারি দোকানপাট। আলোয় ঝলমল করছে শহর। মাঝে মাঝে গ্যাসবাতিও চোখে পড়ছে।

এই হেমন্তে কলকাতাতেও হিম পড়ছে। নামছে কুয়াশাও। তবে পূর্ব বাংলার মতো অত ঘন হয়ে নয়। পাতলা ধবধবে রেশমের মতো। রাস্তার আলোগুলো ঘিরে ঝাঁকে ঝাঁকে শামাপোকা পাক খাচ্ছে। বৃত্তাকারে। ঠাণ্ডাটাও এখানে অনেক কম। সামান্য শীত শীত লাগছে।

দূরে একটা বড় টাওয়ার ক্লকে আটটা বেজে চল্লিশ। এত রাতেও রাস্তায় জনারণ্য। গাড়ির স্রোত। নানারকম শব্দ। ধাবমান ট্রাম বাসের, রিকশার, ঘোড়ার গাড়ির, প্রাইভেট কারের। তা ছাড়া রয়েছে মানুষের কোলাহল। সব মিলিয়ে অদ্ভুত এক চালচিত্র।

জানালার বাইরে অন্যমনস্কর মতো তাকিয়ে ছিল বিনু। তাদের ঘোড়াটা জোর কদমে ছুটছে। গাড়ির মাথায় বসে কোচোয়ানটা মাঝে মাঝে টাকরায় জিভ ঠেকিয়ে টর-র-র-র, টর-র-র-র আওয়াজ করে হাওয়ায় সাঁই সাঁই চাবুক চালিয়ে ঘোড়াটাকে হুঁশিয়ার করে দিচ্ছে। দৌড়টা একই তালে চালিয়ে যেতে হবে। গতি কমালেই চাবুক।

হঠাৎ কান্নার সরু শব্দ কানে আসে বিনুর। চকিতে বাইরে থেকে মুখ ফেরাতেই সে দেখতে পায়, জানালায় মাথা রেখে ঝিনুক কাঁদছে। কান্নার হেতুটা বুঝতে না পেরে প্রথমটা হতভম্ব হয়ে যায় সে। তারপর ভীষণ ব্যস্ত হয়ে পড়ে। উলটো দিকে মুখোমুখি বসে ছিল, দ্রুত উঠে এসে পাশে বসল। ঝিনুকের পিঠে হাত রেখে জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছে? কাঁদছ কেন?'

ঝিনুক ধীরে ধীরে মাথা তুলে সোজা হয়ে বসে। শিথিল গলায় বলে, 'আমার খুব ভয় করছে।'

'কিসের ভয়?'

ঝিনুক উত্তর দেয় না।

বিনু নরম গলায় বলে, 'কোনও ভয় নেই। আমরা তো কলকাতায় চলে এসেছি।' সে জানাতে চায়, নিরাপদ দূরত্বে আসার পর ভীতি বা শঙ্কার কোনও কারণই থাকতে পারে না।

অনেকক্ষণ বোঝানোর পর কান্না থামে ঝিনুকের। কিন্তু ভয়টা কেটেছে কিনা, বোঝা যায় না। উদাস মুখে, নীরবে বসে থাকে সে।

ট্রাম রাস্তা থেকে ডাইনে বাঁয়ে নানা অলিগলি, ফের অন্য একটা ট্রাম রাস্তা, এইভাবে পাক খেতে খেতে ঘোড়ার গাড়ি একসময় প্রিয়নাথ মল্লিক রোডে পৌঁছে গেল।

খুব ছেলেবেলার ক'টা বছর এখানেই কেটেছে বিনুর। রাস্তায় গ্যাসের বাতি জ্বলছে। দু'ধারে বাড়িগুলোতেও প্রচুর আলো। পাড়াটা যতখানি চেনা লাগছে, তার চেয়ে ঢের বেশি অচেনা। মনে পড়ছে, অনেক ফাঁকা জায়গা ছিল এখানে। এখন শুধুই বাড়ি। পাঁচ ফুট খোলা জায়গাও কোথাও পড়ে নেই।

জাতিস্মরের মতো খুঁজে খুঁজে তাদের তেতলা বাড়িটা বার করে ফেলল বিনু। সঙ্গে সঙ্গে বুকের ভেতরটা ছাঁত করে উঠল।

পুরো বাড়িটা অন্ধকার, ভূতের মতো দাঁড়িয়ে আছে। কোথাও এক ফোঁটা আলো নেই। দরজা জানালা বন্ধ। সদর দরজায় তিনটে প্রকাণ্ড তালা ঝুলছে। অর্থাৎ আজ এ বাড়ির অধিবাসীটির সঙ্গে দেখা হওয়ার আদৌ কোনও সম্ভাবনা নেই।

হতশ্রান্ত বিনুর মাথা ঝিমঝিম করছিল। তবু শরীরের অবশিষ্ট শক্তিটুকু জড়ো করে পাশের বাড়িতে জিজ্ঞেস করে জানতে পারল, অবনীমোহন সপ্তাহ তিনেক আগে হরিদ্বার না উত্তরকাশী কোথায় যেন গেছেন। ফিরবেন তিন চার সপ্তাহ পর।

সুধারা থাকে টালিগঞ্জে। সুনীতিরা বিডন স্ট্রিটে। টালিগঞ্জে আগে কখনও যায় নি বিনু। অচেনা জায়গা। তুলনায় বিডন স্ট্রিট পরিচিত। একবার সেখানে গেছে। এলাকাটা তার মোটামুটি মনে আছে।

বিধ্বস্ত বিনু কোচোয়ানকে বিডন স্ট্রিট যাবার কথা বলতে সে জানালো, শিয়ালদা থেকে এতটা রাস্তা দৌড়ে এসে ঘোড়াটা বহুত থকে গেছে। তাকে খানিকক্ষণ জিরোতে দিতে হবে। তারপর দানাপানি খেয়ে চাঙ্গা হলে ফের সওয়ারি নিয়ে ছুটবার মতো তাকত পাবে। এত রাতে নিরীহ জানোয়ারটাকে কষ্ট দেবার ইচ্ছা ছিল না তার। নেহাত বাবুসাহেব আর বিবিজি মুশকিলে পড়েছেন, তাই তখলিফ হলেও নিয়ে যাবে। তবে এবার কেরায়া দিতে হবে তিরিশ টাকা। অর্থাৎ বিশ আর তিরিশ মিলিয়ে পঞ্চাশটা টাকা কোচোয়ানকে গুনে দিতে হবে।

না দিয়ে উপায়ই বা কী। আধ ঘণ্টা বিশ্রামের পর ঘোড়াকে শুকনো ছোলা, ভেলিগুড় আর প্রচুর জল খাইয়ে আবার দৌড় শুরু হল।

pathagar.net

বিডন স্ট্রিটে বিনুরা যখন সুনীতিদের বাড়ি পৌঁছল, এগারটা বেজে গেছে।

গাড়ি-বারান্দাওলা বেশ বড় বাড়ি সুনীতিদের। সামনে পেছনে বাগান। রাস্তার দিকে নীচু লোহার গেট। ঘরে ঘরে আলো দেখা যাচ্ছে। বাইরেও জোরালো আলো জ্বলছে। নিশ্চিন্ত হওয়া গেল, রাত হলেও এখনও সবাই জেগে আছে, ঘুমিয়ে পড়লে ডেকে তুলতে হত।

এ বাড়িতে আগে একবারই এসেছে বিনু। বিয়ের পর হেমনাথ আর অবনীমোহনের সঙ্গে এসে সুনীতিদের এখানে পৌঁছে দিয়ে গিয়েছিল। কয়েকদিন থেকেও গেছে।

ভাড়া মিটিয়ে ঝিনুককে নিয়ে গেট খুলে ভেতরে ঢুকে পড়ল বিনু। বাগানের পাশ দিয়ে সুরকির রাস্তা ধরে গাড়ি-বারান্দার তলায় চলে এল। এখানে শ্বেত পাথরের সাতটা সিঁড়ি। ওপরে উঠলে থামওলা চৌকোমতো বিরাট চত্বর। সেটার ডান পাশে কারুকাজ-করা মস্ত দরজা।

দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ ছিল। বিনু কড়া নাড়তে পাল্লা খুলে একটা বছর তিরিশের কাজের

লোক, যুবকই বলা যায়, কয়েক পলক অবাক তাকিয়ে থাকে। প্রায় মধ্যরাতের এই আগন্তুকদের সে নিশ্চয়ই আশা করেনি। জিজ্ঞেস করে, 'কাকে চাইছেন বাবু?'

বিনু বলল, 'আনন্দময়বাবু আর ওঁর স্ত্রী আছেন?'

লোকটা ঘাড় কাত করে, 'আছেন।'

অনেকখানি স্বস্তি। আনন্দদের না পাওয়া গেলে এত রাতে হয়তো টালিগঞ্জে সুধাদের বাড়ি ছুটতে হত। বিনু বলল, 'ওঁদের খবর দাও। বলবে, রাজদিয়া থেকে বিনুবাবুরা এসেছে।'

লোকটা কী ভেবে বলল, 'আপনারা ভেতরে এসে বসুন—'

পুরু গদিওলা ভারী ভারী, পুরনো ডিজাইনের সোফা দিয়ে সাজানো একটা বড় বসার ঘরে বিনুদের নিয়ে এল লোকটা। তাদের বসিয়ে ওধারের সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে গেল।

খানিক পরে সিঁড়িতে অনেকগুলো পায়ের আওয়াজ পাওয়া গেল। চোখের পলক পড়তে না পড়তেই ঘরে এসে ঢুকল সুনীতি, আনন্দ, আনন্দর ভাই দীপক, কমবয়সী একটা বউ এবং দু'তিনটে বাচ্চা। বিনু জানে, আনন্দর দুই দাদা সরকারি অফিসার। তাঁদের একজন থাকেন দিল্লিতে, অন্যজন মিরাটে। বোনেদের বিয়ে হয়ে গেছে। তারা যে যার শ্বশুরবাড়িতে।

দীপককে চেনে বিনু। সুনীতির বিয়ের সময় বরযাত্রী হয়ে আনন্দর সঙ্গে রাজদিয়া গিয়েছিল সে। এ বাড়িতে সুনীতির বউ-ভাতেও দেখা হয়েছে। তখনও তার বিয়ে হয়নি। পরে যখন হল, নেমন্তন্নের চিঠি পাঠানো হয়েছিল। হেমনাথ ঠিক করেছিলেন, বিনুকে নিয়ে কলকাতায় আসবেন। কিন্তু হঠাৎ স্নেহলতা ধুম জ্বরে শয্যাশায়ী হয়ে পড়লেন। অগত্যা কলকাতা যাত্রা বন্ধ করে দিতে হল। বউটিকে আগে না দেখলেও বিনু আন্দাজ করল, নিশ্চয়ই দীপকের স্ত্রী। সে জানে, সুনীতির একটাই ছেলে। তার জন্মের সঙ্গে সঙ্গে চিঠি লিখে রাজদিয়ায় সুখবরটা দিয়েছিল আনন্দ। বাকি বাচ্চা দু'টো দীপকেরই হবে।

সবাই বিনু আর ঝিনুককে ঘিরে বসল। প্রত্যেকের চোখে মুখে অপার বিস্ময়। সুনীতি জিজ্ঞেস করল, 'এত রাত্তিরে তোরা কোত্থেকে এলি!'

বিনু বলল, 'রাজদিয়া থেকে। আগে ভবানীপুরে গিয়েছিলাম। বাবা নেই। পাশের বাড়ির লোকেরা বলল, হরিদ্বার না কোথায় যেন গেছে।'

'বাবা আজকাল বছরের সাত আট মাস হয় হরিদ্বার, নইলে হৃষিকেশ, কি কনখল বা কন্যাকুমারী করে বেড়াচ্ছে।'

'কেন রে?'

'কোনও এক গুরুর কাছে দীক্ষা নিয়েছে। কলকাতায় মন বসে না। শুধু তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়ায়।'

বিনু স্তম্ভিত। তার বাবা এক অদ্ভুত মানুষ। পৃথিবীর অন্য সবার থেকে আলাদা। তাঁর স্বভাবে কোনও দিনই স্থিত হয়ে বসার লক্ষণ নেই। সারা জীবন শুধু ছুটছেনই। এটা ধরছেন, সেটা ছাড়ছেন। একসময় কলেজে পড়াতেন, হঠাৎ পড়ানো ছেড়ে দিয়ে স্টক মার্কেটে যাতায়াত শুরু করলেন। তারপর ঝোঁকের মাথায় চলে গেলেন রাজদিয়ায়। প্রচুর জমিজমা কিনে চাষবাসে মনপ্রাণ ঢেলে দিলেন। স্ত্রীর মৃত্যুর পর হঠাৎ কী খেয়াল হল, সব ফেলে কনট্রাক্টরি করতে ছুটলেন আসামে। তখন যুদ্ধের আমল। মিলিটারিদের জন্য ব্রিজ, সড়ক, হাসপাতাল বানিয়ে দেদার পয়সা করলেন। যুদ্ধ থামলে সোজা কলকাতায়।

সুধা সুনীতি দু'জনেই চিঠি লিখে বছরখানেক আগে জানিয়েছিল, অবনীমোহনের ধর্মের দিকে খুব ঝোঁক দেখা যাচ্ছে। তাই বলে তিনি দীক্ষা নেবেন, তীর্থে তীর্থে পর্যটন করে বেড়াবেন, এতটা ভাবা যায়নি।

আনন্দ বলল, 'তোমরা আসবে, আগে জানাওনি কেন?'

বিনু বলল, 'আপনাকে, হিরণদাকে আর বাবাকে দু'টো করে চিঠি দিয়েছি। শিয়ালদায় আপনাদের কাউকে দেখতে না পেয়ে ভীষণ চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলাম।'

'আজকাল পাকিস্তানের চিঠি পেতে তিন চার সপ্তাহ লেগে যায়। অনেক সময় পাওয়াও যায় না।'

বিনু কী উত্তর দিতে যাচ্ছিল, কোনও বয়স্ক মহিলার ভারী গলা শোনা গেল, 'কথাবার্তা পরে হবে। ওরা ক্লান্ত হয়ে এসেছে। আগে হাতমুখ ধুক, খেয়ে দেয়ে সুস্থ হোক—'

বিনু দেখতে পেল, দরজার কাছে হেমনলিনী দাঁড়িয়ে আছেন। আনন্দর মা। বিধবা মহিলাটির চেহারায়, কণ্ঠস্বরে ব্যক্তিত্ব এবং বনেদিআনার ছাপ। সুনীতির বিয়ের সময় আনন্দর বাবা বেঁচে ছিলেন। বিয়ের বছরখানেকের মধ্যে তিনি মারা যান।

হেমনলিনীকে আগে দু'বার দেখেছে বিনু। আনন্দর বিয়ের সময় তিনিও রাজদিয়া গিয়েছিলেন। পরে সুনীতির বউ-ভাতে কলকাতায়। সে উঠে দাঁড়াল। বললে, 'দু'টো দিন স্নান হয়নি মাউইমা। সারা শরীর শুকনো কাঠ হয়ে আছে। গায়ে মাথায় জল ঢালতে না পারলে ঘুমোতে পারব না।' বলতে বলতে সে হেমনলিনীর দিকে এগিয়ে যায়। নীচু হয়ে তাঁর পা ছুঁয়ে প্রণাম করে।

হেমনলিনী আশীর্বাদের ভঙ্গিতে হাত তুলে সস্নেহে বলেন, 'বেঁচে থাক বাবা, একশ' বছর পরমায়ু হোক।'

ঝিনুকও সোফা থেকে উঠে এসেছিল। রাজদিয়ায় সে হেমনলিনীকে দেখেছে। কলকাতায় সুনীতির বউ-ভাতের সময়ও বিনুদের সঙ্গে এসেছিল। তাঁকে পরিষ্কার মনে আছে। তাঁর পায়ের দিকে ঝিনুক ঝুঁকতে যাবে, হেমনলিনী দু'পা পিছিয়ে গেলেন। বললেন, 'থাক থাক, তুমি সোফায় গিয়ে বোসো—'

ঝিনুক ফ্যাল ফ্যাল তাকিয়ে থাকে। বিমূঢ়, বিহ্বল। ঘরের অন্য সবাই কম হতভম্ব হয়নি। বিনুর প্রণাম নিলেও ঝিনুকেরটা কেন নিলেন না, বরং দৃষ্টিকটুভাবে কেন পিছিয়ে গেলেন, বোঝা যাচ্ছে না।

মুখটা করুণ হয়ে গিয়েছিল ঝিনুকের। কয়েক পলক দাঁড়িয়ে থেকে নতচোখে ফিরে এসে বসে পড়ে।

এদিকে হেমনলিনী গলা উঁচুতে তুলে ডাকতে লাগলেন, 'অনাথ, যতীন—শিগগির বাইরের ঘরে আয়।'

একজন চল্লিশ বেয়াল্লিশ বছরের বেঁটেখাটো, গোলগাল প্রৌঢ় এবং একটি লম্বা, পাতলা চেহারার যুবক বাড়ির ভেতর দিক থেকে প্রায় ছুটতে ছুটতে চলে এল। হেমনলিনী মাঝবয়সীকে বললেন, 'অনাথ, পাকিস্তান থেকে বড় বউমার ভাই আর ওদের ওই আত্মীয় মেয়েটি এসেছে। উনুন আর কেরাসিনের স্টোভ জ্বেলে দু'টোতেই রান্না চড়িয়ে দে। এক ঘন্টার ভেতর যেন সব হয়ে যায়। তাড়াতাড়ি খেয়ে ওরা শুয়ে পড়বে। দই মিষ্টি আছে?'

প্রৌঢ়টি অর্থাৎ অনাথ বলল, 'আছে মা—'

'যা—'

অনাথকে আগে না দেখলেও যতীনকে দেখেছে বিনুরা। সদর দরজা সে-ই খুলে দিয়েছিল।

অনাথ চলে গেলে হেমনলিনী যুবকটিকে বললেন, 'যতীন, ওরা চান করবে। কিন্তু কার্তিক মাসের হিম পড়তে শুরু করেছে। ঠাণ্ডা জল রাত্তিরে মাথায় ঢাললে অসুখ করবে। রান্না চাপাবার আগে অনাথকে দিয়ে দু'বালতি গরম জল করিয়ে নীচের চান-ঘর দু'টোয় দিবি।'

'আচ্ছা মা—' যতীন আর দাঁড়াল না।

বিনু টের পাচ্ছে, এ বাড়ির বল্গা শক্ত মুঠোয় ধরে রেখেছেন হেমনলিনী, এবং প্রবল প্রতাপে সংসারটিকে তিনি চালিয়ে থাকেন। নিমেষে সুচারুভাবে তাদের জন্য সব ব্যবস্থা তিনি করে দিলেন। তবু মাথার ভেতরে কোথায় যেন একটা কাঁটা ফুটছে বিনুর। ঝিনুকের প্রণাম কেন নিলেন না তিনি? অসুস্থ, রোগা মেয়েটাকে কেন ওভাবে কষ্ট দিলেন? কিন্তু এখন এত সব ভাবাভাবির মতো মনের অবস্থা নয়। স্নায়ু ছিঁড়ে পড়ছে। স্নান খাওয়া সেরে শুয়ে পড়তে পারলে তারা বেঁচে যায়।

বিনুর হঠাৎ খেয়াল হল, একেবারে খালি হাত-পায়ে তারা চলে এসেছে। পরনের জামাকাপড় এবং তারপাশায় কেনা সেই চাদর দু'টো ছাড়া আর কিছুই নেই। সুনীতিকে বলল, 'বড়দি, আসার সময় পথে আমাদের সব লুট হয়ে গেছে। গায়ে তিনদিনের বাসি নোংরা জামাকাপড়। সারা শরীর ঘিনঘিন করছে। ঝিনুকের জন্যে শাড়িটাড়ি আর আমার জন্যে আনন্দদার ধুতি কি পাজামা নিয়ে

আয়। স্নান করার পর পরব।'

'এক্ষুনি নিয়ে আসছি—' সুনীতি উঠে পড়ল।

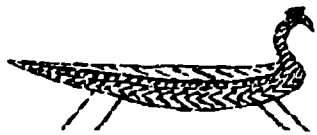

সুনীতির শ্বশুরবাড়িতে ডাইনিং টেবল নেই। খাওয়াদাওয়া পুরোপুরি সাবেক চালে, সুতোর নকশা-করা বড় বড় আসন পেতে, কাঁসার থালায়।

বসার ঘরের লাগোয়া একটা ঘরে বিনু আর ঝিনুককে খেতে বসানো হয়েছিল। পরিবেশন করছিল সুনীতি আর দীপকের বউ মাধুরী। একটা মোড়ায় বসে তদারক করছিলেন হেমনলিনী। আনন্দ আর দীপক কাছাকাছি মেঝেতে বসে আছে। বাচ্চাগুলো অবশ্য নেই, তাদের শুতে পাঠানো হয়েছে।

সবারই পূর্ব পাকিস্তান সম্পর্কে অনেক প্রশ্ন, তীব্র কৌতূহল এবং প্রবল উৎকণ্ঠা। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সেখানকার হালচাল জেনে নিচ্ছিল আনন্দরা। তাদের প্রশ্নেরই শুধু জবাব দিল না বিনু, ঝিনুককে নিয়ে কোন পরিস্থিতিতে তাকে রাজদিয়া থেকে চলে আসতে হয়েছে, পথে দু'আড়াই দিন কী কী মারাত্মক ঘটনা ঘটেছে, হাজার হাজার মানুষ ভিটেমাটি ছেড়ে ইন্ডিয়ায় চলে আসার জন্য স্টিমারঘাটগুলোয় আর গোয়ালন্দে স্টিমার কি ট্রেনের আশায় কিভাবে অসীম আতঙ্ক নিয়ে পড়ে আছে, তার যাবতীয় বিবরণও দিতে লাগল।

শুনতে শুনতে কখনও শিউরে উঠছে আনন্দরা, কখনও তাদের চোখেমুখে গভীর শঙ্কা ফুটে বেরুচ্ছে, কখনও বা গলার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে অস্ফুট, কাতর শব্দ।

আনন্দ বিষাদের সুরে বলল, 'পার্টিশান সমস্ত কিছু শেষ করে দিল। মনে হচ্ছে, ওপার থেকে উদ্বাস্তু আসা থামবে না, দিনকে দিন বেড়েই যাবে।'

বিনু বলল, 'আমার সেই রকমই ধারণা। যা দেখে এলাম, অল্প দিনের মধ্যে ইস্ট পাকিস্তান ফাঁকা হয়ে যাবে।'

হেমনলিনী জিজ্ঞেস করলেন, 'ওখানকার অবস্থা যখন এইরকম, হেমনাথবাবু থেকে গেলেন কেন?'

বিনু বলল, 'অনেক বুঝিয়েছি। কিন্তু কোনও কথাই শোনেননি। বলেছেন, জন্মভূমি ছেড়ে তিনি ইন্ডিয়ায় আসবেন না। এতে যা হবার হোক।'

খাওয়া হয়ে গেলে বিনু আর ঝিনুককে নিয়ে ফের বসার ঘরে এলেন হেমনলিনী। আনন্দরাও সঙ্গে সঙ্গে এসেছিল।

হেমনলিনী দীপক আর মাধুরীকে বললেন, 'দীপু, ছোট বউমা, তোমরা যতীনকে দিয়ে একতলার পুব দিকের ঘরে ঝিনুকের জন্যে বিছানা করে দেবে। আর বিনুর বিছানা হবে দোতলার দক্ষিণ দিকের ঘরে। নতুন চাদর পেতে দিতে বলবে। কার্তিক মাস পড়তেই মশা আসতে শুরু করেছে। মশারি যেন টাঙানো হয়। বিনুদের সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে। তোমরা এখন আর এখানে এস না।'

মাধুরী আর দীপক চলে যায়।

বিনু হেমনলিনীর দিকে তাকিয়ে আছে। পলকহীন। মহিলার আদর আপ্যায়ন এবং যত্নে কোনও রকম ত্রুটি নেই। কিন্তু ঝিনুকের ব্যাপারে কোথায় যেন খিঁচ থেকে যাচ্ছে। এত বড় বাড়িতে দোতলায় কি আলাদা ঘরের অভাব নেই। তবু ঝিনুকের বিছানা নীচে করা হবে কেন?

হেমনলিনী বিনুকে বললেন, 'অবনীমোহনবাবু যতদিন তীর্থ সেরে ফিরে না আসছেন, তোমরা আমাদের এখানেই থাকো। তবে—'

বিনু জিজ্ঞেস করল, 'তবে কী?'

তার প্রশ্নটা যেন শুনতেই পাননি হেমনলিনী। ঝিনুকের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'দেখ মা, তোমাকে এমন একটা কথা বলব যাতে দুঃখ পাবে, কিন্তু না বলেও পারছি না। শুনেছি ঢাকায় গিয়ে তুমি হাঙ্গামার মধ্যে পড়েছিলে, গুণ্ডারা কদিন তোমাকে আটকে রেখেছিল। খবরটা শোনার পর খুব মুষড়ে পড়েছিল। জানি তোমার কোনও অপরাধ নেই, তুমি নির্দোষ। কিন্তু আমি পুরনো দিনের মানুষ।

নানা সংস্কারে আটকে আছি। এই বয়েসে সে সব কাটানো সম্ভব নয়।' একটু থেমে বললেন, 'যে ক'দিন আছ, একতলাতেই থাকবে। দোতলায় আমাদের ঠাকুর ঘর। তুমি ওপরে না উঠলেই ভাল হয়।'

লাঞ্ছিত ঝিনুকের ধর্ষণের খবর তা হলে কলকাতাতেও পৌঁছে গেছে? হতচকিত বিনু গলার শিরা ছিঁড়ে চেঁচিয়ে উঠতে চাইল, কিন্তু কেউ যেন লোহার আঙুল দিয়ে তার কণ্ঠনালী টিপে ধরেছে। গোঙানির মতো একটা ক্ষীণ আওয়াজ বেরিয়ে এল শুধু।

বিনুর মাথার ভেতর হঠাৎ অবিরাম একটা আগুনের চাকা ঘুরে যেতে লাগল। কেন হেমনলিনী ঝিনুককে পা ছুঁতে দেননি, কেন তার নীচে থাকার ব্যবস্থা, এবার স্পষ্ট হয়ে গেছে। প্রতি মুহূর্তে নিদারুণ মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়ে কী আতঙ্কের মধ্যে ঝিনুককে সঙ্গে করে পূর্ব পাকিস্তান থেকে সীমান্তের এপারে এসেছে, শুধু সে-ই জানে। ভেবেছিল, সব উৎকণ্ঠা সব ত্রাসের অবসান ঘটে গেছে। ভেবেছিল, এখানে এলেই অফুরান সহানুভূতিতে ঝিনুককে সবাই কাছে টেনে নেবে, ভুলিয়ে দেবে তার জীবনের চরম দুর্ঘটনার স্মৃতি। কিন্তু কলকাতায় পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিজনের কাছ থেকে মর্মান্তিক আঘাতটা এল। হয়তো অবনীমোহনও ঝিনুককে গ্রহণ করবেন না, সুধারাও মুখ ফিরিয়ে থাকবে। অন্য আত্মীয়স্বজনেরাও ধারে কাছে ঘেঁষবে না। কিন্তু কে কী করল, কে কী করবে, তা নিয়ে ভাববে না বিনু। শত হাতে ঝিনুককে আগলে রাখবে। আজ থেকেই তার অন্য এক মহাযুদ্ধের প্রস্তুতি।

কখন হেমনলিনী ঘর ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন, খেয়াল করেনি বিনু। সে দেখল, ডান পাশের বড় সোফায় নতমুখে বসে আছে সুনীতি আর আনন্দ। ছাইবর্ণ মুখ। বিনুর চোখ বাঁ দিকে ঘুরে গেল। সেখানে প্রিয় নারীটি অঝোরে কেঁদে চলেছে।

ঝিনুককে দেখতে দেখতে বুকের ভেতরটা উথলপাথল হয়ে যায়। বড় মায়ায় বিনু তার কাঁধে একটা হাত রাখে।

হেমনলিনী যে অত্যন্ত কড়া ধাতের মহিলা, প্রবল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, সুনীতিদের সংসারের লাগামটি শক্ত মুঠোয় ধরে আছেন, তা আগেই টের পাওয়া গিয়েছিল। তাঁর কথাই এ বাড়িতে শেষ কথা। তাঁর মুখের ওপর টুঁ শব্দটি করার দুঃসাহস এই প্রাচীন, বনেদি পরিবারের কারোর নেই। তিনি যে সিদ্ধান্ত নেন, মুখ বুজে সবাইকে তা মেনে নিতে হয়।

হেমনলিনী বলেছেন, বিনু রাতে দোতলায় শোবে, কিন্তু ঝিনুক থাকবে একতলার এক কোণে, যতটা সম্ভব এখানকার সমস্ত কিছুর স্পর্শ বাঁচিয়ে। বিনু পুরুষমানুষ, তার ওপর ঘনিষ্ঠ কুটুম। তার কথা আলাদা। কিন্তু অনাত্মীয়, ধর্ষিতা একটি তরুণীকে কোনওভাবেই দোতলায় নিয়ে যাওয়া যায় না, কেননা সেখানে রয়েছে ঠাকুর ঘর। ঝিনুক গেলে ওখানকার পবিত্রতা নষ্ট হবে, এই বংশের মুখে চুনকালি লাগবে।

হেমনলিনীর হুকুমমতো যতীনকে দিয়ে বিছানা পাতিয়ে মাধুরী বাইরের ঘরে এল। নীচু, বিষাদমাখা গলায় বলল, 'অনেক রাত হল। মা সবাইকে শুয়ে পড়তে বলেছেন।' বলতে বলতে তার চোখ ঝিনুকের দিকে চলে যাচ্ছিল। মেয়েটাকে অচ্ছুতদের মতো আলাদা করে দূরে সরিয়ে রাখা হচ্ছে। সে জন্য ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল মাধুরীর।

অনেকক্ষণ অঝোরে কান্নার পর চুপ করে গিয়েছিল ঝিনুক। বসে আছে নতচোখে। অসাড় এবং নিস্পন্দ। রক্তিম দুই চোখ টস টস করছে। শুধু গাল বেয়ে ফোঁটা ফোঁটা জল ঝরে যাচ্ছে অবিরল।

সুনীতি বিনু আর আনন্দ, সকলেই স্তব্ধ হয়ে বসে ছিল। বিনুর একটা হাত আলগাভাবে ঝিনুকের কাঁধের ওপর পড়ে আছে। তার ছোঁয়ায় ঝিনুক কতটা ভরসা পেয়েছে, পেয়েছে নতুন করে নিদারুণ আঘাত সইবার মতো কতখানি শক্তি, সে জানে না। এ বাড়িতে আদরযত্নের তিলমাত্র ত্রুটি হয় নি। হেমনলিনী কাছে বসে কোমল সুরে কথা বলতে বলতে ঝিনুককে খাইয়েছেন। তাঁর কণ্ঠস্বর

ছিল অপার সহানুভূতিতে আর্দ্র। কিন্তু স্পষ্ট বুঝিয়ে দিয়েছেন, ঝিনুকের মতো মেয়েদের জন্য দুঃখ বা সমবেদনা প্রকাশ করা যায়, কিন্তু সবই দূর থেকে। হেমনলিনী তার আর এ বাড়ির মাঝখানে তুলে দিয়েছেন অদৃশ্য একটা দেওয়াল—অনেক উঁচু, প্রায় আকাশস্পর্শী। সেটা ভেদ করে আনন্দ সুনীতি বা অন্য কেউ গভীর মমতায় ঝিনুককে কাছে টেনে নেবে, সাধ্য কী। নেহাত কুটুমের সঙ্গে মেয়েটা চলে এসেছে, তাই খাতির করা হচ্ছে, নইলে ঝিনুক এখানে সম্পূর্ণ অবাঞ্ছিত।

আস্তে আস্তে, ক্লান্তভাবে সোফা থেকে নিজেদের টেনে তোলে আনন্দরা। খানিক আগে যা ঘটে গেছে, যেভাবে চাঁছাছোলা ভাষায় হেমনলিনী ঝিনুককে এখানে থাকার মূল শর্তগুলো জানিয়ে দিয়েছেন, তাতে লজ্জায় সবার মাথা কাটা যাচ্ছিল। আনন্দর মনে হয়েছে, ওভাবে দুঃখী মেয়েটাকে আঘাত দেওয়া চরম নিষ্ঠুরতা।

সুনীতি ভয়ে ভয়ে মাধুরীকে জিজ্ঞেস করে, 'নতুন জায়গা। ঝিনুক কি একা শোবে? মা কী বললেন?'

অর্থাৎ এ বাড়িতে কে কী করবে, কে কিভাবে চলবে, সব ঠিক করে দেবেন হেমনলিনী। পরিবারের সকলের জন্য তিনি যে কঠোর নিয়ম শৃঙ্খলার বেড়াজাল তৈরি করে দিয়েছেন, তার বাইরে পা বাড়াবার কথা কেউ ভাবতে পারে না। রাতে ঝিনুকের কাছে কেউ থাকবে কিনা, সেটাও তাঁর বিবেচনার ওপর নির্ভর করছে।

মাধুরী বলল, 'একা থাকবে কেন? মা দুলালীকে ঝিনুকের ঘরে থাকতে বলেছেন।'

হেমনলিনীর সব দিকে নজর। ঝিনুক যখন এসেই পড়েছে, তার যাতে এতটুকু অযত্ন না হয়, কেউ যেন মনে না করে তাকে হেলাফেলা করে একধারে ফেলে রাখা হয়েছে, সে সম্পর্কে তিনি খুবই সচেতন। ঝিনুক যাতে অচেনা জায়গায় একা একা শুতে ভয় না পায়, তাই একজনকে তার কাছে থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।

আনন্দ বলল, 'চল—'

বাইরের ঘর থেকে বেরিয়ে একতলার কোণের দিকের ঘরটিতে ঝিনুককে নিয়ে চলে এল সবাই। দু'টো বিছানা পাতা রয়েছে এখানে। একটা মেহগনি কাঠের মকরমুখি খাটে, অন্যটা মেঝেতে। খাটের বিছানাটা ধবধবে, নিভাঁজ। ছত্রিতে নেটের নীলচে মশারি খাটিয়ে বিছানার চারধারে পরিপাটি করে গুঁজে দেওয়া রয়েছে। শিয়রের কাছে নীচু সাইড টেবলে ঢাকা-দেওয়া কাচের গেলাসভর্তি জল।

নীচের সাদামাঠা বিছানায় একটি মেয়েমানুষ বসে ছিল। চল্লিশের কাছাকাছি বয়স। শক্তপোক্ত, নিরেট চেহারা। পরনে লাল তাঁতের খাপী ডুরে শাড়ি আর ক্যাটকেটে নীল ব্লাউজ। নাকে সবুজ পাথর-বসানো নাকফুল আর হাতে রুপোর মোটা রুলি, গলায় রুপোরই বিছে হার। বোঝা যায়, সে দুলালী এবং এ বাড়ির কাজের মেয়ে।

আনন্দদের দেখে শশব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়ায় দুলালী। ঝিনুককে দেখিয়ে সুনীতি তাকে বলে, 'এই দিদি রইল। মড়ার মতো ঘুমিয়ে থেকো না। ওর কখন কী দরকার হয়, একটু খেয়াল রেখো।'

'রাখব বউদিদি। মা আমারে সমস্ত বলে দেছে।' দুলালী বলতে লাগল, 'আপনি নিশ্চিন্তি থাকুন।'

এ বাড়ির কাজের লোকেরা হেমনলিনীকে 'মা' বলে। সুনীতি দুলালীকে আর কিছু বলল না। ঝিনুকের একটা হাত ধরে বিছানার কাছে নিয়ে এসে, মশারির সামনের দিকটা একটুখানি তুলে বলল, 'ওঠ—'

ঝিনুক উত্তর দেয় না। একদৃষ্টে কয়েক পলক বিনুর দিকে তাকিয়ে থাকে। তার দু'চোখে কী যে কষ্ট, কত যে যাতনা, লজ্জা আর সুতীব্র অভিমান! বুকের ভেতরটা দুমড়ে মুচড়ে সেসব যেন উঠে এসেছে।

ঝিনুকের চোখের দিকে তাকাতে পারছিল না বিনু। বোনের শ্বশুর বাড়িতে এসে মেয়েটার যে চূড়ান্ত অসম্মান আর লাঞ্ছনা হল তার সবটুকু দায় যেন বিনুর। কিন্তু সে ঘুণাক্ষরেও ভাবতে পারে নি, আদরযত্নের আড়ালে এ বাড়িতে ঝিনুকের জন্য অপেক্ষা করছে কী নিদারুণ নির্যাতন। অসহ্য এবং বেদনাময়। কত প্রত্যাশা আর ব্যাকুলতা নিয়ে এখানে ছুটে এসেছিল। তার বিশ্বাস ছিল, ঘনিষ্ঠ পরিজনেরা দু'হাত বাড়িয়ে ঝিনুককে বুকে জড়িয়ে নেবে, জীবনের দগদগে ক্ষতে স্নিগ্ধ প্রলেপ লাগিয়ে জুড়িয়ে দেবে যাবতীয় যন্ত্রণা, ভুলিয়ে দেবে এই সেদিনের যত মর্মান্তিক স্মৃতি। কিন্তু কী ভেবেছিল

বিনু আর কী ঘটে গেল। কলকাতায় পা দিয়ে অভ্যর্থনাটা ভালই হল ঝিনুকের। এর জন্য শতভাগের একভাগও দায়ী নয় বিনু, তবু সীমাহীন অপরাধবোধ তার সর্বাঙ্গে অবিরত শেল বিঁধিয়ে চলেছে।

সুনীতি মশারি তুলে ধরায় যে ফোকরটুকু হয়েছিল, তার ভেতর দিয়ে নিঃশব্দে বিছানায় ঢুকে ওপাশ ফিরে শুয়ে পড়ে ঝিনুক। এদিক থেকে তার মুখ আর দেখা যায় না।

মশারিটা ফের সযত্নে তোষকের তলায় গুঁজে দিয়ে, দুলালীকে ঝিনুক সম্পর্কে আরও একবার সতর্ক করে সুনীতি ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। সঙ্গে মাধুরী বিনু আর আনন্দ।

টানা বারান্দার শেষ মাথায় এসে সিঁড়ি ভেঙে দোতলায় উঠে এল সবাই। এখানেও নীচের তলার মতোই লম্বা বারান্দা, উত্তর থেকে দক্ষিণে চলে গেছে। সেটার একপাশে পর পর শোবার ঘর। মোট ছ'খানা। আরেক দিকে কোমর-সমান উঁচু নকশা-করা লোহার রেলিং, যার মাথায় পাঁচ ইঞ্চি পুরু বর্মা টিকের ছাউনি। ব্রহ্মদেশের এই দুর্লভ কাঠ এতই চকচকে যেন আলো ঠিকরে পড়ছে।

এ বাড়ির লোকজনদের শোবার ঘরগুলো দোতলাতেই। মাধুরীকে তার ঘরে পাঠিয়ে আনন্দ এবং বিনুকে নিয়ে দক্ষিণ দিকের শেষ বেডরুমটায় এল সুনীতি।

দেওয়ালে ল্যাম্প শেডের ভেতর আলো জ্বলছিল। স্নিগ্ধ ছটা ছড়িয়ে পড়েছে বিশাল ঘরখানায়। শ্বেত পাথরের ধবধবে মেঝে। দুই দেওয়ালে বিরাট জোড়া জানালায় খড়খড়ি আর রঙিন কাচ-বসানো পাল্লা।

ঘরের মাঝখানে কারুকাজ-করা প্রকান্ড খাটে বিছানা পেতে মশারি খটিয়ে রাখা হয়েছে। এ ছাড়া রয়েছে সেকেলে দামি দামি আসবাব। আলমারি, দেরাজওলা চেয়ার টেবল, কুশন, ড্রেসিং টেবল। একধারে উঁচু স্ট্যান্ডের মাথায় জি ই সি কোম্পানির মস্ত রেডিও।

আনন্দ ভারী গলায় ডাকল, 'বিনু—'

বিনু অন্যমনস্ক ছিল। ঝিনুকের মুখটা বার বার তার চোখের সামনে ফুটে উঠছে। এ বাড়িতেই মাত্র কয়েক ফুট নীচে সে আছে। তবু মনে হয়, ধরাছোঁয়ার বাইরে সহস্র যোজন দূরে তাকে নির্বাসনে পাঠিয়েছেন হেমনলিনী।

আনন্দর ডাকে চমকে উঠে বিনু সাড়া দিল, 'কিছু বলবেন?'

পৃথিবীর সব অপরাধের গুরুভার নিজের মাথায় চাপিয়ে কুণ্ঠিতভাবে আনন্দ বলে, 'মায়ের ওপর রাগ করে থেকো না। সেকেলে মানুষ—'

বিনু চুপ করে রইল।

আনন্দ কুণ্ঠিতভাবে এবার বলে, 'ঝিনুকের ওপর ভীষণ অন্যায় হল। কিন্তু মাকে—' কথা অসমাপ্ত রেখে থেমে গেল সে।

হঠাৎ মাথায় আগুন ধরে যায় বিনুর। বিষবাষ্পে-ভরা এক নিদারুণ ভূখন্ড পেরিয়ে কী নিদারুণ আতঙ্কে আর উৎকণ্ঠায় ঝিনুককে আগলে আগলে সীমান্তের এপারে নিয়ে এসেছে, শুধু সে-ই জানে। সবই বলেছে বিনু, কিছুই গোপন করে নি। সেই মর্মান্তিক বিবরণ শোনার পরও হেমনলিনী যা করলেন তার বিরুদ্ধে কেউ একটা আঙুল পর্যন্ত তুলল না। বিনুর রাবিতীয় ক্ষোভ আনন্দর ওপর। পুতুলের মতো সে বসে রইল। একবারও বলল না, 'মা, তুমি যা করছ সেটা ঠিক নয়।' একেবারে মেরুদন্ডহীন। ভীরু। কাপুরুষ।

অসহ্য রাগ শিরাস্নায়ু চুরমার করে ফেটে পড়তে চাইছিল। 'সেকেলে মানুষ' বলে মা'র সম্বন্ধে সাফাই গাইছে আনন্দ। ছিঃ! মনে মনে হাজার বার আনন্দকে ধিক্কার দিয়ে, অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে রাখল বিনু। চোয়াল শক্ত হয়ে গিয়েছিল তার। ঠাণ্ডা গলায় শুধু বলল, 'ঠিক আছে।'

বিনুর একটা হাত ধরে বিমর্ষ মুখে সুনীতি বলে, 'ভেবেছিলাম, রাত্তিরে ঝিনুকের কাছে শোব। কিন্তু—'

সুনীতি যা বলল না তা খুবই স্পষ্ট। হেমনলিনীর জন্য স্বাধীনভাবে, নিজের বিবেকের নির্দেশে তার পক্ষে কিছু করা সম্ভব নয়। বিশেষ করে এ বাড়িতে। একটি ধর্ষিতা মেয়ের পাশে এক বিছানায় বনেদি পরিবারের কুলবধূ রাত কাটাবে, হেমনলিনী প্রাণ থাকতে তা হতে দেবেন না।

দিদির ওপরও কম রাগ হচ্ছিল না বিনুর। পরক্ষণে খেয়াল হল, ছেলেই যেখানে মায়ের সামনে

কুঁকড়ে থাকে, পুত্রবধূ কতটুকু আর কী করতে পারে? দিদির কথার সে উত্তর ছিল না।

সুনীতি বলল, 'নে, এবার শুয়ে পড়—'

বিনু বলল, 'তোরা যা, আমি একটু পরে শুচ্ছি—'

'ক'দিন রাস্তায় খুব ধকল গেছে। বেশি রাত অব্দি জেগে থাকিস না।' সুনীতিরা ঘরের দরজা বাইরে থেকে টেনে দিয়ে চলে গেল।

কপালের দু'পাশের রগগুলো সমানে দপ দপ করছে। ঝিনুকের কথা যত ভাবছিল, পা থেকে মাথা পর্যন্ত সমস্ত শরীরে তীব্র অস্থিরতা ছড়িয়ে পড়ছিল।

একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে বিনু। তারপর পায়ে পায়ে দক্ষিণ দিকের জোড়া জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। খড়খড়ি এবং কাচের পাল্লা, দু'টোই খোলা রয়েছে।

এখন প্রায় মাঝরাত। চারদিক নিঝুম হয়ে গেছে। রাস্তায় লোক চোখে পড়ে না বললেই হয়। ক্বচিৎ দু'একটা রিকশা ঠুন ঠুন আওয়াজ তুলে টিমে চালে চলে যাচ্ছে। সিটে সাওয়ারিরা হেলে, ত্রিভঙ্গ হয়ে বসে আছে। ওরা সবাই নেশায় চুর। তাদের জড়ানো কণ্ঠস্বর থেকে অস্পষ্ট প্রলাপ, কিংবা দু'চার কলি অশ্লীল গান ভেসে আসছে। তিনটে ঘোড়ার গাড়িও পিচের রাস্তায় খট খট আওয়াজ তুলে চলে গেল। এই তিন যানের আরোহীরাও কেউ স্বাভাবিক নয়। কলকাতা যে মধ্যরাতে মাতালদের দখলে চলে যায়, বিনু জানত না।

রাস্তায় অনেকখানি দূরে দূরে গ্যাসের বাতিগুলো এক পায়ে দাঁড়িয়ে ম্যাড়মেড়ে, ঘোলাটে আলো বিতরণ করে চলেছে। সেগুলোকে ঘিরে ঝাঁক বেঁধে ঘুরছে শামা পোকারা। চক্রাকারে, ক্লান্তিহীন।

কাল পরশু, দু'দিন পারাপারহীন নদীতে ভাসতে ভাসতে মাথার ওপর দিগ্‌দিগন্ত জুড়ে যে বিশাল আকাশ ব্যাপ্ত হয়ে ছিল, কলকাতার এক প্রাচীন বাড়ির জানালা দিয়ে সেটা এখন কত ছোট দেখাচ্ছে। ছোট এবং চৌকো। ওপার বাংলায় গভীর কুয়াশা মহাবিশ্বকে মুড়ে রেখেছিল। এখানেও কুয়াশা আছে, কিন্তু অত গাঢ় নয়। ফলে আবছাভাবে কৃষ্ণপক্ষের ক্ষীণ চাঁদটিকে দেখা যাচ্ছে। আকাশময় ছড়িয়ে আছে নিষ্প্রভ তারার মেলা।

চোখের সামনে এত কিছু—চওড়া রাস্তা, চারদিকের বাগানঘেরা বড় বড় বাড়ি, সেগুলোর জমকালো স্থাপত্য, আকাশ, চাঁদ, গ্যাসলাইটের রহস্যময় আলো, কিন্তু সমস্ত আড়াল করে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়ে একটি করুণ, কাতর মুখ স্থির হয়ে আছে। ঝিনুক।

হেমনলিনী যখন খাওয়াদাওয়ার পর ঝিনুকের ব্যাপারে হুকুমনামা জারি করলেন, মনে মনে বিনু প্রতিজ্ঞা করেছিল, ঝিনুককে দু'হাতে আগলে রাখবে। যতক্ষণ শ্বাসবায়ু বইছে, চিরদুঃখী এই মেয়েটার জন্য যুদ্ধ চালিয়ে যাবে। কিন্তু হেমন্তের এই বিজন মধ্যরাতে, চারদিক যখন অপার নৈঃশব্দ্যে ছেয়ে আছে, তার শপথের ভিত ক্রমশ টলে যেতে থাকে।

দিদির শ্বশুরবাড়িতে, দম-আটকানো আবহাওয়ায় বিনুর আর একটি মুহূর্তও থাকতে ইচ্ছা করছে না। সে নিশ্চিত, ঝিনুকও এত অসম্মান আর গ্লানি মাথায় নিয়ে এখানে থাকতে চাইবে না। কিন্তু কোথায় নিয়ে যাবে তাকে? অবনীমোহন কলকাতায় থাকলেও না হয় কথা ছিল। ঝিনুককে দেখলে তিনি কী করতেন, কী বলতেন, অসীম মমতায় তাকে কাছে টেনে নিতেন, নাকি তীব্র ঘৃণায় আবর্জনার মতো দূরে ছুড়ে ফেলতেন, কিছুই অনুমান করতে পারে না বিনু। তবে তার ধারণা, হেমনলিনীর মতো এতটা নির্দয় তিনি কোনওভাবেই হতেন না।

রাজদিয়ায় থাকার সময় ক'টা বছর অবনীমোহন ঝিনুককে খুব কাছে থেকে দেখেছেন। তিনি জানেন, জন্মের পর থেকেই জগৎ সংসারের শত কোটি দুঃখ এই মেয়েটার পায়ে পায়ে ঘুরছে। অসহায় ঝিনুকের প্রতি তাঁর আর সুরমার ছিল কত যে মায়া!

অবনীমোহন কলকাতায় থাকলে ঝিনুকের ব্যাপারে হয়তো কিছু একটা ব্যবস্থা হয়ে যেত। কিন্তু তীর্থস্থানে গুরুর সান্নিধ্যে আরও কতদিন থাকবেন তার ঠিক নেই। কবে ফিরবেন, কে জানে।

বিনু আর ভাবতে পারছিল না। নিবিড় হতাশা চারপাশ থেকে তাকে গ্রাস করে ফেলছিল।

জানালা দিয়ে হেমন্তের হিমবাতাস ঘরে ঢুকছিল হু হু করে। দুশ্চিন্তায় এতটাই মগ্ন ছিল বিনু, টের পায় নি। আসলে শরীরের অনুভূতিগুলো কেমন অসাড় হয়ে গিয়েছিল। এখন মনে হল, ঠাণ্ডায়

গায়ে কাঁটা দিচ্ছে। জানালার পাল্লা টেনে দিয়ে বিছানায় এসে শুয়ে পড়ল সে। সঙ্গে সঙ্গে চোখ বুজে এল। গাঢ় ঘুম অঝোরে তার শিরায় স্নায়ুতে ঝরে পড়তে লাগল।

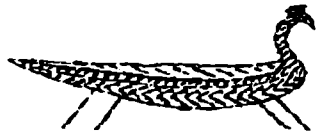

অনেকক্ষণ ধরে আবছাভাবে রিকশার ঠুন ঠুন এবং অন্যান্য গাড়িঘোড়ার ছোটাছুটির আওয়াজ কানে আসছিল। তারই ভেতর কে যেন তার নাম ধরে ডেকে যাচ্ছে, 'বিনু-বিনু-বিনু—'

ঘুমঘোরে প্রথমটা বুঝতে পারছিল না বিনু। পরে কণ্ঠস্বরটি আরেকটু স্পষ্ট হলে ধড়মড় করে উঠে বসল। চোখে পড়ল, খাটের পাশে দাঁড়িয়ে আছে সুনীতি।

মশারি তুলে বাইরে বেরিয়ে এল বিনু। সুনীতি বলল, 'অনেক বেলা হয়ে গেছে। মুখ টুখ ধুয়ে নে—'

কাল রাতে একদিকের জানালা বন্ধ করে দিয়েছিল বিনু। অন্যটার পাল্লা আটকাবার কথা খেয়াল ছিল না। খোলা জানালাটা দিয়ে হেমন্তের টলটলে মায়াবী রোদ এসে পড়েছে ঘরে। রাস্তায় এখন প্রচুর লোকজন। হুস হাস ছুটে যাচ্ছে বাস, প্রাইভেট কার, খবরের কাগজের ভ্যান, ঘোড়ার গাড়ি। কর্পোরেশনের লোকেরা কখন এসে হোস পাইপ দিয়ে জল ছিটিয়ে রাস্তা ধুয়ে দিয়ে গেছে, কখন নিবিয়েছে গ্যাসের আলো, জানতে পারে নি বিনু।

সুনীতি বলল, 'চানঘরে তোর আনন্দদার কাচানো পাজামা পাঞ্জাবি, তোয়ালে, দাঁতের মাজন, নতুন ব্লেড, সব রেখে এসেছি। তাড়াতাড়ি দাড়ি কামিয়ে, মুখ ধুয়ে আয়। বাসি জামাকাপড় ওখানেই একধারে রেখে দিস।'

কাল রাতেও সুনীতি আনন্দর এক প্রস্থ পাজামা পাঞ্জাবি দিয়েছিল। সেগুলোই এখন বিনুর পরনে। পরশু রাতে আদিঅন্তহীন নদীর ওপর দিয়ে রাজেকের নৌকোয় আসার সময় হানাদারেরা তাদের সর্বস্ব লুট করে নিয়ে গিয়েছিল। এক জামাকাপড়ে তারা কলকাতায় চলে এসেছে। আনন্দ আর সুনীতির পাজামা শাড়ি টাড়ি দিয়ে আপাতত তাদের কাজ চালিয়ে নিতে হচ্ছে।

সুনীতি ফের বলল, 'তোর আনন্দদা আজ আর অফিসে যাবে না। বেলায় দোকান খুললে তোকে নিয়ে তোর আর ঝিনুকের শাড়ি ধুতিটুতি কিনতে বেরুবে।'

আনন্দর বাবার অ্যাডভোকেট হিসেবে ছিল প্রচুর নামডাক, বিপুল পশার। তাঁর ইচ্ছা ছিল, বেঁচে থাকতে থাকতে ছেলেকে দাঁড় করিয়ে দিয়ে যাবেন। তাঁর বড় বড় ক্লায়েন্টগুলো আনন্দ পাবে। কিন্তু ওকালতি করতে হলে যে প্যাঁচোয়া বুদ্ধি দরকার তা আনন্দর নেই। কালো কোট পরে বাবার পেছন পেছন কিছুদিন সে কোর্টে যাতায়াত করেছে। বাবার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ওকালতির ইতি। কালো কোট খুলে রেখে একটা বিরাট ব্রিটিশ মার্কেন্টাইল ফার্মে ভাল চাকরি নিয়েছে। বিনুদের জন্য আজ তাকে অফিস কামাই করতে হবে।

মালপত্র খোয়া গেলেও বেশ কিছু টাকা এখনও বিনুর কাছে আছে। কাল শিয়ালদায় পাকিস্তানি নোটগুলো পালটে সে ভারতীয় টাকা করে নিয়েছিল। ক'টা জামাকাপড় সে অবশ্যই কিনে নিতে পারে, কিন্তু তা বললে আনন্দরা খুবই অসন্তুষ্ট হবে। বিনু আপত্তি করল না। নতুন পোশাক আশাকের ভাবনা নয়, তার মস্তিষ্কের গোপন কুঠুরি থেকে হঠাৎ ঝিনুকের চিন্তাটা লাফ দিয়ে বেরিয়ে এল। ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে কেন যে তার কথা মনে পড়ে নি! সে নিজে তো গাঢ় ঘুমে কালকের রাতটা কাবার করে দিয়েছে, কিন্তু ঝিনুকের কেমন কেটেছে? কাল নিঃশব্দে বিছানায় ওঠার আগে যেভাবে সে তার দিকে তাকিয়েছিল তার মধ্যে ছিল যাবতীয় ক্ষোভ, দুঃখ আর অসম্মানের গ্লানি। বুকের ভেতরটা নতুন করে দুলে ওঠে বিনুর। একরাশ উদ্বেগ মাথায় নিয়ে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করে, 'ঝিনুক উঠেছে?'

সুনীতি মাথা নাড়ে, 'হ্যাঁ।'

'ও এখন কোথায়?'

'নীচের সেই ঘরেই আছে। আর দেরি করিস না। যা—' ভাইকে তাড়া দিয়ে ডান পাশের দেওয়ালে অ্যাটাচড বাথরুমের দরজা দেখিয়ে দেয় সুনীতি।

মিনিট পনের কুড়ি বাদে চানঘর থেকে বেরিয়ে বিনু দেখতে পেল, সুনীতি চলে যায় নি। বিছানা এখন ফিটফাট, মশারির চারধার ছত্রির মাথায় চাঁদোয়ার ওপর তুলে দেওয়া হয়েছে। মনে হল, কাজের লোকদের দিয়ে নয়, নিজের হাতেই সব গুছিয়ে গাছিয়ে তার জন্য অপেক্ষা করছে সুনীতি।

বিনু একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে, 'তুই এখনও যাস নি?'

এক পলক ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে চোখ সরিয়ে নেয় সুনীতি। ফের তাকায়। খুবই কুণ্ঠিত। কেমন একটা ইতস্তত ভাব। দ্বিধা কাটিয়ে, থেমে থেমে একসময় বলল, 'তোর সঙ্গে কথা আছে।'

সুনীতির বলার ধরনে কিসের যেন অনুরণন। চাপা ভয়ের কী? নাকি দুশ্চিন্তার? সতর্ক হল বিনু, 'কী কথা?'

হাত তুলে ইশারায় বিনুকে চুপ থাকতে বলে সুনীতি। চট করে খোলা দরজা অব্দি গিয়ে মুখ বাড়িয়ে ভেতর দিকে ঢালা বারান্দার এপাশ ওপাশ খুঁটিয়ে দেখে ফিরে আসে। গলা নামিয়ে বলে, 'আমার শাশুড়ি কেমন মানুষ, কাল নিশ্চয়ই টের পেয়েছিস। নেহাত তোর সঙ্গে এসেছে, তাই ঝিনুককে বাড়িতে ঢুকতে দিয়েছিল। আজ সকালে ঘুম ভাঙার পর থেকে সমানে গজ গজ করে চলেছে।'

বুকের ভেতরটা আচমকা হিম হয়ে যায় বিনুর। জিজ্ঞেস করে, 'কী বলছেন উনি?'

সোজাসুজি ভাইয়ের চোখের দিকে তাকায় সুনীতি, 'বুঝতে পারছিস না?'

না বোঝার কারণ নেই। বিনু বলে, 'উনিই তো কাল বললেন, যতদিন বাবা না ফিরে আসছে, আমরা যেন এ বাড়িতে থেকে যাই।'

'ওটা না বললে খারাপ দেখায় তাই বলেছে। আসলে মোটেও চাইছে না, ঝিনুক এখানে থাকুক। কত কষ্ট পেয়েছে মেয়েটা, ওর ওপর এতটুকু করুণা নেই।'

'কিন্তু—'

'কী?'

'বাবা না ফেরা পর্যন্ত ঝিনুককে নিয়ে আমি কোথায় যাব?'

'সেটা ভেবেছি। তোর আনন্দদার সঙ্গে এই নিয়ে কাল রাত্তিরে কথাও হয়েছে। আজই তুই সুধা আর হিরণের সঙ্গে দেখা করবি। হিরণ জন্ম থেকে ঝিনুককে দেখে আসছে। নিশ্চয়ই ওরা তোকে ফেরাবে না।'

রাজদিয়ায় থাকতে হিরণকে দাদা বলত সুনীতি। সুধার সঙ্গে বিয়ের পর নাম ধরে ডাকে। সম্পর্কে সে বড় শালী, গুরুজন। নাম ধরে ডাকার অধিকার তার নিশ্চয়ই আছে। সেটা প্রতিষ্ঠাও সে করেছে। হিরণ নতমস্তকে তা মেনেও নিয়েছে।

বিনু বলল, 'শুনেছিলাম হিরণদা পাকিস্তান থেকে তার ঠাকুরদা আর জেঠিমাকে নিজেদের কাছে নিয়ে এসেছে। ছোটদির দাদাশ্বশুর দ্বারিক দত্ত আর জেঠি শাশুড়ি যদি তোর শাশুড়ির মতো করে?'

একটু থতিয়ে গেল সুনীতি। তারপর বলল, 'সবাই কি একরকম হয়? তা ছাড়া, ওঁরা এখন কলকাতায় নেই। ক'দিন আগে সুধা আর হিরণ এসেছিল। তারা বলল, হিরণের এক দূর সম্পর্কের কাকা পাটনা থেকে এসে দুই বুড়োবুড়িকে নিয়ে গেছেন। মাসখানেক ওঁরা তাঁর কাছে থাকবেন।'

সবাই এক ধাঁচের হয় না বলেও খানিক সংশয় থেকেই গেছে সুনীতির। বেশির ভাগ বয়স্ক মানুষের উদারতা কম। সেকেলে হাজারটা পচা-গলা সংস্কারের ঘেরাটোপে তারা নিজেদের গুটিয়ে রাখে। সে সব ভেঙেচুরে বেরিয়ে আসতে পারে না, এমনই অদৃশ্য শেকলে তারা আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। হিরণের ঠাকুরদা আর জেঠিমা নেই, সুনীতির কাছে সেটা বড় রকমের স্বস্তি। ওঁরা থাকলে হয়তো এমন কাণ্ড বাধিয়ে বসতেন যাতে নতুন করে ঝিনুকের লাঞ্ছনার সীমা-পরিসীমা থাকত না। সুনীতির বিশ্বাস, অন্তত একটা মাস মেয়েটাকে তার এই শ্বশুরবাড়ির মতো কুঁকড়ে এক কোণে পড়ে থাকতে হবে না। অনেক সহজভাবে সে শ্বাস নিতে পারবে।

সুনীতি এবার বলে, 'যে ক'দিন বুড়োবুড়ি পাটনা থেকে ফিরে না আসছে তোরা সুধাদের কাছে গিয়ে থাক। তার ভেতর বাবা নিশ্চয়ই চলে আসবে।'

মাত্রাছাড়া রাগে ব্রহ্মরন্ধ্র জ্বলে যায় বিনুর। হঠাৎ তার মনে হয়, হেমনলিনী শুধু একাই নন, সুনীতি আর আনন্দও হয়তো চায়, ঘাড় থেকে তারা নেমে যাক, আর এক মুহূর্তও এখানে না থাক। ওপরে সহানুভূতির ভান, তলে তলে সুনীতিরা কৌশলে তাদের সুধা আর হিরণের কাছে পাঠাবার ফন্দি এঁটেছে।

আগে থেকে না জানিয়ে (যদিও বিনু রাজদিয়া থেকে চিঠি লিখেছিল) হুট করে চলে আসায় এখানে উটকো সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। বিনুদের বিদায় করতে পারলে এ বাড়ির সবাই ভাল করে নিশ্বাস ফেলতে পারবে। তখন পরিপূর্ণ মুক্তি।

রাগ হলে মানুষ স্বাভাবিক থাকে না। তার বোধবুদ্ধি লোপ পেয়ে যায়। তপ্ত মস্তিষ্ক একটু ঠাণ্ডা হলে পরিতাপে নিজের গালে চড় কষাতে ইচ্ছা হল বিনুর। কী আবোল তাবোল ভাবছে সে? নিমেষে পুরনো চিন্তা ফিরে এল মাথায়। কী করতে পারে সুনীতি আর আনন্দ? এ বাড়িতে হেমনলিনী যতদিন মাথার ওপর অধিষ্ঠান করছেন, কারোর কিছু করার নেই।

বিনু বলল, 'বুঝেছি। বাবা যতদিন না ফিরছে, এর বাড়ি ওর বাড়ি ঝিনুককে নিয়ে চোরের মতো থাকতে হবে।'

ক্রোধ না থাকলেও ক্ষোভ এবং অভিমান যথেষ্টই থেকে গেছে। তার বলার ভঙ্গিতে যে শ্লেষ রয়েছে তা যথাস্থানেই বিঁধল। মুখটা সঙ্গে সঙ্গে চুন হয়ে গেল সুনীতির। ভাইয়ের একটা হাত আঁকড়ে ধরে সে বলে, 'আমাকে ভুল বুঝিস না। আমার কি ইচ্ছে তোদের তাড়িয়ে দিই?' একটু থেমে হাঁফ-ধরা গলায় বলল, 'আমার ইচ্ছের কোনও দামই এখানে নেই।'

বিনু চোখ তুলে সুনীতিকে দেখে। ম্লান মুখচ্ছবি। দিদির ওপর হঠাৎ বড় মায়া হয় তার। ধীরে ধীরে হাত ছাড়িয়ে নিতে নিতে নরম গলায় বলে, 'চল, নীচে যাই—'

একতলায় আসতে চোখে পড়ল, কোণের দিকের ঘরটার খোলা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন হেমনলিনী। পাশে আনন্দ। ওরা ছাড়া বাড়ির অন্য কাউকে দেখা গেল না।

পায়ের আওয়াজে হেমনলিনী মুখ ফিরিয়ে তাকালেন। বললেন, 'তোমরা এসে গেছ? ওই দেখ ঝিনুক এখনও বিছানা থেকে নামে নি। এত করে বলছি, মুখ ধুচ্ছে না, বাসি কাপড়ে বসে আছে। কত বেলা হয়ে গেল—'

দরজার কাছে চলে এল বিনুরা। ঘরের ভেতর শুধু ঝিনুক আর দুলালী। মশারির চারপাশ ছত্রির ওপর তোলা। উলটো দিকে মুখ করে খাটের মাঝখানে বসে রয়েছে ঝিনুক। নিশ্চল। দুলালী ঝুঁকে নীচু গলায় তাকে কী বোঝাচ্ছে। ঝিনুক চুপ। দুলালীর কোনও কথার উত্তর দিচ্ছে না।

হেমনলিনী বললেন, 'বুঝিয়ে সুঝিয়ে তোমরা ওকে বাথরুমে পাঠাও। ওদিকে লুচি জুড়িয়ে কাঠ হয়ে যাচ্ছে।'

বিনু বলল, 'মাউইমা, আপনারা যান। আমি ওর সঙ্গে কথা বলি।' ঘরে ঢুকে দুলালীকেও যেতে বলল।

সবাই চলে যায়, কিন্তু সুনীতি দরজার মুখে দাঁড়িয়ে থাকে।

খাটের পাশ দিয়ে ঘুরে ঝিনুকের সামনে গিয়ে দাঁড়ায় বিনু। ঝিনুকের তেলহীন রুখু চুল উড়ে উড়ে পড়ছে সারা মুখে। চোখ দু'টো রক্তের ডেলা, চোখের তলায় পুরু কালির পোঁচ। গাল বসে গেছে। ঠেলে-ওঠা কণ্ঠার হাড় বড় বেশি প্রকট। সর্বাঙ্গে রাত জাগার অবসাদ।

কোমল স্বরে বিনু বলে, 'কাল রাতে ঘুম হয় নি—না?' সব বুঝেও প্রশ্নটা করল।

এক পলক বিনুকে দেখে চোখ সরিয়ে নেয় ঝিনুক।

বিনু ফের বলে, 'চেহারার কী হাল হয়েছে! একবার গিয়ে আয়নায় দেখ—'

ঝিনুক বোবা হয়ে বসে থাকে।

বিনু বলে, 'রাতের পর রাত না ঘুমোলে শক্ত অসুখে পড়ে যাবে।'

ঝিনুক জবাব দেয় না। একদৃষ্টে দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে থাকে।

বিনু থামে নি, 'এভাবে নিজেকে শেষ করতে নেই। বাথরুমে যাও—'

দরজার ওধার থেকে সুনীতি বলল, 'কাল দুলালীকে ঝিনুকের জন্যে পাট ভাঙা শাড়ি আর ব্লাউজ

boiRboi.blogspot.com

দিয়েছিলাম। ও চানঘরে রেখে দিয়েছে।'

ঝিনুক সুনীতির দিকে ফিরেও তাকায় না। আচমকা দু'হাতে মুখ ঢেকে প্রবল বেগে মাথা ঝাঁকাতে থাকে। গলার শিরা ছিঁড়ে, চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলে, 'না না না, চানঘরে যাব না। কিছুতেই না। কেন তুমি আমাকে এ বাড়িতে নিয়ে এসেছিলে? কেন-কেন-কেন?'

রায়টের সময় ঢাকা থেকে উদ্ধার করে যেদিন ঝিনুককে আনা হল, তখন সে প্রায় বদ্ধ পাগল। স্নেহলতা আর শিবানী সারাক্ষণ ঘিরে থেকে অনেক যত্নে, দিবারাত্রি শুশ্রূষায় তাকে অনেকখানি সুস্থ করে তুলেছিলেন। মেয়েটা সেই সেদিনের মতো ফের উথলপাথল হয়ে যাচ্ছে। তেমনই অস্থির, তেমনই উন্মত্ত। বিনু ভয় পেয়ে গেল। ঝিনুকের মাথায় হাত রেখে, মিনতির সুরে বলতে লাগল, 'এমন করে না ঝিনুক। থামো—থামো—'

ঝিনুক থামে না। চিৎকার করতে করতে গলা চিরে যায়। সেই সঙ্গে উতরোল কান্না। মুখ থেকে হাত সরিয়ে হঠাৎ সে ঝাঁপিয়ে পড়ল বিনুর ওপর। বিনুর গলাটা খামচে ধরে বুকে মুখ ঘষতে ঘষতে বলে যায়, 'আমি আর এক মুহূর্ত এখানে থাকব না।'

রাজদিয়া থেকে তারপাশা, তারপাশা থেকে গোয়ালন্দ হয়ে কলকাতা। সারা পথে পদে পদে ছিল বিপদ, আতঙ্ক আর মৃত্যুভয়। ঝিনুককে বুকের ভেতর সাপটে নিয়ে সে সব পেরিয়ে আসার পর আজ আরেক মহা সংকট সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। বিপর্যস্ত, দিশেহারা বিনু বলে, 'এমন করে না। শান্ত হও ঝিনুক, শান্ত হও—'

ঝিনুক কিছুই শুনতে পাচ্ছে না। একেবারে বধির। 'আমি এখানে থাকব না, থাকব না, থাকব না—' গলার স্বর আরও উঁচুতে তুলে হিস্টিরিয়ার ঘোরে সে বলে যায়। একটানা, বিরতিহীন।

বিনু টের পায়, তার বুক ঝিনুকের চোখের জলে ভেসে যাচ্ছে, চামড়ায় নখ বসে যাওয়ায় গলার কাছটা জ্বালা জ্বালা করছে। আস্তে আস্তে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে সে বলে, 'এখানে তোমাকে থাকতে হবে না।'

এবার কথাগুলো ঝিনুকের কানে প্রবেশ করে। কান্নার বেগ কমে আসে। জলে ভরা দুই চোখ বিনুর দিকে মেলে ধরে বলে, 'সত্যি বলছ?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, সত্যি।'

'এখানে থাকলে আমি মরে যাব।'

হেমনলিনীর আচরণে ঝিনুক কতটা আঘাত পেয়েছে, কী নিদারুণ কষ্ট, অবিরাম তীক্ষ্ণ শূল বিঁধিয়ে বিঁধিয়ে তার বুকের ভেতরটা কতখানি রক্তাক্ত করে দিয়েছে, কালই টের পেয়েছিল বিনু। এ বাড়ির শুচিতা বজায় রাখতে যেভাবে তাকে এক কোণে ফেলে রাখা হয়েছে তাতে মেয়েটা বাঁচবে না, দম আটকে শেষ হয়ে যাবে। বা এমন কিছু করে বসবে যা খুবই মর্মান্তিক। আত্মহত্যার চিন্তাটা পলকের জন্য বিনুর মাথায় ঝিলিক দিয়ে যায়।

ভারী গলায় বিনু বলে, 'যাও, চানঘরে গিয়ে পরিষ্কার হয়ে এস। চোখের যা অবস্থা, ভাল করে জল ছিটিয়ে ছিটিয়ে ধোবে।'

ঝিনুক বলল, 'আগে বল, কবে আমাকে এ বাড়ি থেকে নিয়ে যাচ্ছ?'

'আজই। এখন বাথরুমে যাও।'

ঝিনুকের রাতজাগা শীর্ণ মলিন মুখ সামান্য উজ্জ্বল হল। তারপর বাধ্য মেয়ের মতো বিছানা থেকে নেমে চানঘরে ঢুকে যায়।

দরজার কাছে এখনও ঠায় দাঁড়িয়ে আছে সুনীতি। পাংশু মুখ।

খাটের কোণে বসতে বসতে বিনু সুনীতিকে বলে, 'বড়দি, তুই ঝিনুকের আর আমার খাবার এখানে দিয়ে যা। আনন্দদাকে বলবি খাওয়া চুকিয়ে যেন তৈরি হয়ে নেয়। ন'টা বাজতে চলল। জামাকাপড়ের দোকানগুলো নিশ্চয়ই কিছুক্ষণের মধ্যে খুলে যাবে।'

মাথাটা একটুখানি হেলিয়ে সুনীতি বলে, 'হ্যাঁ—'

বিনু বলল, 'আমি যতক্ষণ না ফিরে আসি, তুই ঝিনুকের দিকে নজর রাখিস।'

আরেক বার মাথা হেলায় সুনীতি। তারপর চলে যায়।

pathagar.net

অনেকক্ষণ বাদে, প্রায় আধ ঘন্টা হবে, চানঘর থেকে বেরিয়ে আসে ঝিনুক। দুপুরের আগে কোনও দিনই স্নান করে না সে, কিন্তু আজ এর মধ্যেই সেটা সেরে ফেলেছে। শাড়ি পালটে চুলটুল আঁচড়েছে। চোখ আর আগের মতো টকটকে লাল নেই। স্বাভাবিক রং কিছুটা ফিরে এসেছে। জলের একটা জাদুস্পর্শ আছে। স্নান করার ফলে রাতজাগার ক্লান্তি, মলিনতা, চোখের তলার কালির ছোপ এখন অনেকটাই উধাও। খ্যাপা খ্যাপা, উদ্‌ভ্রান্ত ভাবটা প্রায় কেটে এসেছে। ঝিনুককে বেশ স্নিগ্ধ আর তাজা লাগছে। এ বাড়িতে থাকতে হবে না, তাই কি এই পরিবর্তন?

সুনীতি এর ভেতর একবার এসে খাটের পাশের দু'টো সাইড টেবলে প্রচুর লুচি, বেগুনভাজা, আলুর তরকারি আর মিষ্টি খুঞ্চিপোষে ঢাকা দিয়ে রেখে গিয়েছিল। কাচের প্লেট চাপা দিয়ে দু'গেলাস জলও। বলে গেছে, পরে চা নিয়ে আসবে।

ঝিনুক খাটের আরেক কোনায় বসল। জিজ্ঞেস করল, 'তখন থেকে বসে আছ?'

বিনু বলল, 'হ্যাঁ, তোমার জন্যে। ঢের বেলা হয়েছে। খেয়ে নাও—' ঢাকনা তুলে সাইড টেবল থেকে লুচির প্লেট তুলে ঝিনুকের হাতে দিয়ে নিজের জন্য অন্য প্লেটটা তুলে নিল।

ঝিনুক কপাল কুঁচকে বলল, 'এখানকার কিচ্ছু ছুঁতে ইচ্ছে করে না। আমি খাব না।'

বিনু বলল, 'খুব বেশি হলে বিকেল পর্যন্ত আমরা থাকছি। তারপর তো চলেই যাব। না খেলে আরও দুর্বল হয়ে পড়বে। খাও—' হিরণদের বাড়িতে অভ্যর্থনা কেমন হবে, জানা নেই। হয়তো ভালই হবে। নইলে ঝিনুককে নিয়ে অন্ধকারে ঝাঁপ দিতে হবে। পথ ছাড়া তখন গতি নেই। অবশ্য কাল সীমান্ত পেরিয়ে আসার সময় বর্ডার স্লিপ দিয়েছিল। তারা যে 'বোনাফাইড রিফিউজি' অর্থাৎ খাঁটি শরণার্থী, তার নিশানা। সেটা সঙ্গেই আছে। হিরণরা ফিরিয়ে দিলে শেষ পর্যন্ত শিয়ালদা স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম তো আছেই। ওই পরিচয়-পত্রের জোরে যতদিন অবনীমোহন ফিরে না আসছেন, হাজার হাজার ছিন্নমূল মানুষের পাশে বয়েক ফুট জায়গা নিশ্চয়ই তারা পেয়ে যাবে।

পেটে খিদে ছিল। ঝিনুক আর আপত্তি করল না। লুচির কোনা ছিঁড়ে মুখে পুরে চিবুতে লাগল। বিনুও খাচ্ছে। খেতে খেতে বলল, 'আমি আনন্দদার সঙ্গে একটু বেরুব।'

ঝিনুকের কপালে ভাঁজ পড়ে, 'কখন ফিরবে?'

সুধারা থাকে টালিগঞ্জে। আগে কখনও ওখানে যায় নি বিনু। সুধার বিয়ের পর যখন একবার কলকাতায় এসেছিল তখন ওরা অন্য একটা বাড়িতে থাকত।

সুধাদের নতুন বাড়ির ঠিকানা বিনু জানে। জামাকাপড় কেনাকাটার পর টালিগঞ্জে গিয়ে সুধাদের বাড়িটা খুঁজে বার করতে হবে। তারপর ওদের সঙ্গে কথাবার্তা সারতে কতক্ষণ লাগবে, কে জানে।

সুধাদের সঙ্গে দেখা করার কথাটা এখনই জানাতে চায় না বিনু। হিরণদাদের মতিগতি বুঝে পরে বলবে। মোটামুটি কতটা সময় লাগতে পারে, আন্দাজ করে নিয়ে বলল, 'মনে হচ্ছে, দেড়টা দু'টো বেজে যাবে।'

রায়টের সময় ঢাকা থেকে ফেরার পর অনন্ত নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে ঝিনুক। এক লহমাও সে বিনুকে চোখের আড়াল করতে চায় না। বিশেষ করে রাজদিয়ায় রাজেকের নৌকোয় ওঠার পর থেকে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জোড়া বিপুল এক আতঙ্ক সর্বক্ষণ তাকে যেন হা হা করে তাড়া করে চলেছে। বিনুই তার একমাত্র অবলম্বন। এখনও যে বেঁচে আছে, শ্বাসবায়ু সচল রয়েছে, সবই বিনুর জন্য। বিনু পাশে না থাকলে কবেই সে মরে ঝরে শেষ হয়ে যেত।

ঝিনুকের খাওয়া বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'এত দেরি হবে কেন?'

কাপড়চোপড় কেনার কথা বলল বিনু।

'ক'টা শাড়ি ধুতি কিনতে চার পাঁচ ঘন্টা লাগবে?' সন্দিগ্ধ সুরে জানতে চায় ঝিনুক।

বিনু বলল, 'তারপর এক জায়গায় যেতে হবে।'

সুনীতি চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে ঘরে ঢুকছিল। ঝিনুকদের কথা সে শুনতে পেয়েছে। বিনু কোথায় যেতে পারে, আঁচ করে নিয়ে কী বলতে যাচ্ছিল, চোখের ইশারায় তাকে থামিয়ে দিল বিনু।

ঝিনুক বিনুর দিক থেকে চোখ সরায় নি। বলল, 'কোথায় যাবে তুমি?'

বিনু বলল, 'বেশি দূরে না। ফিরে এসে বলব। তোমার কিছু দরকার হলে বড়দিকে বোলো।'

বিনুর ভয় ছিল, সে কোথায় যাচ্ছে জানার জন্য জেদ ধরবে ঝিনুক, কিন্তু তেমন কিছুই করল না। বলল, 'আমার কিছু দরকার নেই। এই ঘর থেকে আমি বেরুবও না। শুধু—'

'শুধু কী?'

'কাল রাত্তিরে যে মেয়েমানুষটা মেঝেতে শুয়েছিল সে যেন এ ঘরে না আসে।'

দুলালীর কথা বলছে ঝিনুক। উদ্বেগের সুরে বিনু জিজ্ঞেস করল, 'কী করেছে সে?'

অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে তীব্র গলায় ঝিনুক বলল, 'খুব পাজি। শয়তান—' রাগে তার মুখ গন গন করতে থাকে।

বিনু চমকে ওঠে। ত্রস্তভাবে বলে, 'সে না হয় বুঝলাম। কিন্তু কী করেছে বলবে তো?'

কিছুতেই মুখ খুলতে চায় না ঝিনুক। অনেক করে বলার পর সে জানায়, রায়টের সময় ঢাকায় যে সশস্ত্র হননকারীর দলটা তাকে তুলে নিয়ে গিয়েছিল, তারা কোথায় কতদিন তাকে আটকে রেখেছে, ওদের সঙ্গে ঝিনুকের সময় কিভাবে কেটেছে, সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করছিল দুলালী। মেয়েমানুষটার মন ভীষণ নোংরা, জঘন্য রুচি।

ধর্ষণের খবরটা এ বাড়ির নীচের মহলেও কিভাবে যেন ছড়িয়ে পড়েছে। অন্তত দুলালী তা জেনে ফেলেছে। ঝিনুক স্পষ্ট করে বলল না, আভাসে বুঝিয়ে দিল, তার সম্ভ্রমহানির অর্থাৎ ধর্ষণের অনুপুঙ্খ বিবরণ শুনতে চাইছিল মেয়েমানুষটা। কোনও ঘটনা বাদ না দিয়ে, বিশদভাবে।

শুনতে শুনতে অসহ্য ক্রোধে কাঁপছিল সুনীতি। মুখ রক্তবর্ণ। দাঁতে দাঁত চেপে বলল, 'বজ্জাত মেয়েছেলে! এত বড় সাহস! মাকে বলে আজই এ বাড়ি থেকে ওকে তাড়াব—'

সুনীতি দুলালীর ধড়মুন্ডু আলাদা করার জন্য ছুটে বেরিয়ে যাচ্ছিল। তাকে থামিয়ে দিল বিনু। আজই তারা এখান থেকে চলে যাবে। কাজের মেয়ের সঙ্গে ঝিনুকের ব্যাপারটা নিয়ে নোংরা ঘাঁটাঘাঁটির পরিণতি ভাল হবে না। দুলালীকে তাড়িয়ে দিলে এখনও যা চাপাচুপি আছে তা আর থাকবে না। ঢাকে কাঠি দিয়ে মেয়েমানুষটা চারদিকে চাউর করে বেড়াবে।

বিনু বলল, 'মাথা গরম করিস না বড়দি। আমরা তো এখানে থাকছি না। অশান্তি করে লাভ নেই।'

সুনীতি কী বুঝল, সে-ই জানে। চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল।

একসময় খাওয়া চুকিয়ে সুনীতির হাতে ঝিনুককে সঁপে দিয়ে আনন্দর সঙ্গে বেরিয়ে পড়ল বিনু।

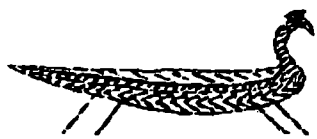

সুনীতির শ্বশুরবাড়ি থেকে হাতিবাগান মার্কেট হাঁটা পথের দূরত্বে। মিনিট সাত আটেকের মধ্যে বিনুরা সেখানে পৌঁছে গেল।

মার্কেটটা বিশাল, অনেকখানি জায়গা জুড়ে। সামনে চওড়া ট্রাম রাস্তা। আনন্দ জানিয়ে দিল, রাস্তাটার নাম কর্নওয়ালিস স্ট্রিট। ট্রাম লাইন উত্তর দিকে সোজা চলে গেছে গ্যালিফ স্ট্রিটে। শ্যামবাজারে ওটার গা থেকে আরেকটা লাইন বেরিয়ে বেলগাছিয়ায়। দক্ষিণ দিকে লাইনটা গিয়ে থেমেছে ধর্মতলায়। ধর্মতলা আর গ্রে স্ট্রিটের মুখে আরও দু'টো লাইন এর সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। খানিকটা ঘুরপথে ওই দুই রুট দিয়ে ডালহৌসি যাওয়া যায়।

খুব ছেলেবেলায় বাবার সঙ্গে দু'একবার উত্তর কলকাতার এই অঞ্চলে এসেছিল বিনু। তার খুব আপসা স্মৃতি এখনও থেকে গেছে। পারা-ওঠা, ঘষা আয়নায় ছায়া পড়লে যেমন দেখায় অনেকটা সেইরকম।

আনন্দ ট্রাম লাইনের যে জটিল ভৌগোলিক বর্ণনা দিল তার সামান্যই মাথায় ঢুকল বিনুর। সে ভাবল, এখন কলকাতাই তার স্থায়ী ঠিকানা। ক্রমশ এই শহরের রাস্তাঘাট, ট্রামরুট, বাসরুট সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠবে।

মার্কেটের নীচের তলায় রাস্তার দিকে সারিবদ্ধ দোকান। জামাকাপড়ের, বাসনকোসনের, রেডিমেড

পোশাকের, গয়নার, মিষ্টির। বেশ ক'টা দোকান ঘুরে বিনুর জন্য চার প্রস্থ ধুতি শার্ট পাজামা আন্ডারওয়ার গেঞ্জি, ঝিনুকের জন্য খান পাঁচেক শাড়ি ব্লাউজ সায়া কিনল আনন্দ। অনেকগুলো ব্রাউন পেপারের প্যাকেট হয়েছে। দু'টো বড় চটের ব্যাগ কিনে প্যাকেটগুলো তার ভেতর পুরে নিল ওরা।

কেনাকাটা সারতে ঘন্টাখানেক লেগে গেল। রাস্তায় প্রচন্ড ভিড়। ট্রাম বাস রিকশা মোটর ঘোড়ার গাড়ি আর মানুষের দঙ্গল। যেদিকেই তাকানো যাক, তুমুল ব্যস্ততা। কেউ কোথাও দাঁড়িয়ে নেই। সবাই ছুটছে, ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটেই চলেছে।

আনন্দরা রাস্তায় নেমে এসেছিল। বিনুর হাতে জাপানকাপড়ের ব্যাগ ছিল। আনন্দকে সেটা দিয়ে সে বলল, 'আপনি বাড়ি চলে যান। আমি হিরণদা আর ছোটদির সঙ্গে দেখা করে আসি। কিভাবে ওদের বাড়ি যেতে হবে বলে দিন।'

আনন্দ অস্বস্তি বোধ করল। সুধাদের কাছে বিনুর যাওয়ার কারণ তার অজানা নয়। তাদের বাড়ির যা পরিবেশ সেখানে আর এক লহমাও থাকা বিনুদের, বিশেষ করে ঝিনুকের পক্ষে আদৌ সম্মানজনক নয়। কী নিদারুণ কষ্টভোগ করে ওরা পাকিস্তান থেকে একটু আশ্রয়ের খোঁজে কাল মধ্যরাতে তাদের বাড়ি ছুটে এসেছিল, কিন্তু কিছুই করা গেল না। নিজের অক্ষমতা আনন্দকে ভীষণ ক্লেশ দিচ্ছে। ভেতরে ভেতরে পীড়নটা চলছে কাল রাত থেকে। বিব্রত মুখে সে বলল, 'তুমি তো কলকাতার কিছুই চেনো না। একা কি যেতে পারবে?' বলেই থমকে গেল। বিনু তাকে পৌঁছে দিতে বললে, সুধাদের বাড়ি গিয়ে চূড়ান্ত অপ্রস্তুত হতে হবে। আনন্দ জানে, সুধারা কোনও প্রশ্ন করবে না, জানতে চাইবে না কেন ঝিনুককে ঘাড় থেকে নামিয়ে তাদের কাছে গছাতে এসেছে। কিন্তু ওদের জানতে না চাওয়ার মধ্যে অনেক নীরব প্রশ্ন মাথা উঁচিয়ে থাকবে। সুধাদের চোখের দিকে তাকানো যাবে না। লজ্জার একশেষ। মরমে একেবারে মরে যেতে হবে।

বিনু বলল, 'ঠিকানা যখন জানি, ঠিক চলে যেতে পারব। কাল রাত্তিরেও কারোর সাহায্য ছাড়াই তো ঝিনুককে নিয়ে আপনাদের বাড়ি এসেছিলাম।'

যাক, ছেলেটা তাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। সঙ্গে যাবার জন্য জোর করে নি। অস্বাচ্ছন্দ্য অনেকটাই কেটে গেল আনন্দর। ধীরে সুস্থে বিশদভাবে টালিগঞ্জ যাবার রুটটা জলের মতো বিনুকে বুঝিয়ে দিল সে। হাতিবাগান থেকে ট্রামে এসপ্ল্যানেডের কার্জন পার্ক। সেখান থেকে ফের ট্রাম ধরে টালিগঞ্জ রেল ব্রিজের পর সেকেন্ড স্টপেজ। কন্ডাক্টরকে আগে বলে রাখলে ঠিকমতো নামিয়ে দেবে। তারপর রাস্তা পেরিয়ে বাঁ দিকে খানিকটা ঢুকলেই জাফর শা রোডে সুধাদের বাড়ি।

আনন্দ বলতে লাগল, 'যদি মনে হয় রাস্তা গুলিয়ে যাচ্ছে, লোকজনকে জিজ্ঞেস করে নিও।'

বিনু আস্তে মাথা হেলিয়ে দেয়, 'আচ্ছা—'

এসপ্ল্যানেড রুটের একটা ট্রামের ফার্স্ট ক্লাসে বিনুকে তুলে দিল আনন্দ। অফিস টাইমের ঠাসাঠাসি ভিড় এখন নেই। তবু ট্রামে প্রচুর প্যাসেঞ্জার। তার মধ্যে এক কোণে দাঁড়াবার একটু জায়গা পেয়ে গেল বিনু। চার পাঁচটা স্টপেজ পেরুবার পর জানালার পাশে একটা সিটও।

বাইরে রাস্তার দু'ধারে লাইন দিয়ে উঁচু উঁচু বাড়ি, মানুষজন, সিনেমা হল, পার্ক, ধাবমান গাড়ি ঘোড়া।

সেই কোন ছেলেবেলায় এখান থেকে রাজদিয়ায় চলে গিয়েছিল বিনু। কলকাতা ক্রমশ ঝাপসা হতে হতে তার কাছে হয়ে উঠেছিল ধূসর স্মৃতির শহর। এত কাল বাদে ফিরে এসে সতত চঞ্চল এই মহানগরের বিশালতা আর চোখ-ধাঁধানো জলুসে তার রোমাঞ্চিত হবার কথা। কিন্তু চারপাশের দৃশ্যাবলী, হইচই এবং যানবাহনের পাঁচমিশালি চড়া আওয়াজ তার মাথায় কোনও ছাপই ফেলছে না। সব কিছু ছাপিয়ে বার বার তারপাশা গোয়ালন্দ আর শিয়ালদা স্টেশনের চিত্র চোখের সামনে ফুটে উঠছে। সর্বস্ব খুইয়ে আতঙ্কতাড়িত মানুষ উদ্‌ভ্রান্তের মতো ছুটে আসছে। হাজারে হাজারে। সীমাসংখ্যাহীন। এ শহরে তাদের কেউ নেই। কিন্তু বিনুর অনেকেই আছে। আছে তার ঘনিষ্ঠ পরিজনেরা। তবু লক্ষ লক্ষ উৎখাত শরণার্থীর মতো তাকেও শহরের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়তে হচ্ছে। একই উদ্দেশ্যে। প্রয়োজন সামান্য একটু আশ্রয়, যেখানে ঝিনুক আর সে সহজভাবে নিশ্বাস ফেলতে পারবে।

কাজন পার্কে এসে টালিগঞ্জের ট্রাম ধরল বিনু। এদিকের ট্রামে ভিড় নেই। অল্প ক'টি যাত্রী কামরার এখানে ওখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে আছে।

একসময় ট্রাম ছাড়ল। বাঁয়ে চকচকে, মসৃণ চৌরঙ্গি। তার ওধারে পর পর মেট্রো সিনেমা, রোয়াইটওয়ে লেডলোর বিশাল বিল্ডিং, নিউ মার্কেট, মিউজিয়াম ইত্যাদি পেরিয়ে এগিয়ে চলল বিনুরা। পার্ক স্ট্রিট পর্যন্ত ঢিলেঢালা মেজাজে চলার পর হঠাৎ গতি বেড়ে গেল ট্রামটার। রাস্তার ওপাশে এখনও বাড়ির পর বাড়ি। আর্মি অ্যান্ড নেভি বিল্ডিং, দ্বারভাঙ্গা মহারাজের ম্যানসন যার উঁচু মিনারে বিশাল ঘড়ি আটকানো, বিশপস হাউস, ইত্যাদি। আরেক পাশে যতদূর চোখ যায়, নিবিড় ঘাসে-ঢাকা গড়ের মাঠ। দুপুরের রোদে সারা ময়দান জুড়ে তীব্র সবুজ আলোর ঝলক। অনেক দূরে মাঠ চিরে যে রাস্তাটা উত্তর-দক্ষিণে কোনাকুনি চলে গেছে সেটার ওপর দিয়ে অগুনতি প্রাইভেট কারের ছোটাছুটি। ট্রামের জানালা দিয়ে মনে হয়, ছোট ছোট খেলনা-গাড়ি। আরও দূরে রেসকোর্সের গ্যালারিগুলো দিগন্তের তলায় সাদা রেখা হয়ে আছে। মাঠের দক্ষিণ দিকে রাজকীয় মহিমায় ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, সেটার চূড়োয় পরী নেচে চলেছে। ক্লান্তিহীন। এই দুপুরবেলায় আগের রাতের কুয়াশার লেশটুকুও নেই, নেই ছিটেফোঁটা লঘু মেঘও। মাথার ওপর অফুরান নীলাকাশ। হালকা মেজাজে ঝলমলে হাওয়া বয়ে যাচ্ছে।

চৌরঙ্গির বড় বড় ম্যানসন, গড়ের মাঠ, কোনও কিছুই অচেনা নয়। স্মৃতির ঝাঁপি খুলে সব বেরিয়ে এসে চোখের সামনে সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু কণামাত্র আগ্রহ বোধ করছে না বিনু। ট্রাম টালিগঞ্জের দিকে যত এগুচ্ছে, ঝিনুকের চিন্তাটা চারদিক থেকে আরও বেশি করে তাকে সাপটে ধরছে।

কন্ডাক্টরটির দায়িত্ববোধ আছে। রেল ব্রিজ পেরুবার পর সঠিক স্টপেজেই বিনুকে নামিয়ে দিল।

শহরের এদিকটা আনন্দদের এলাকার মতো জমকালো নয়। ইটের দেওয়াল আর টিন বা অ্যাসবেস্টসের ছাউনিওলা বাড়িই বেশি। ফাঁকে ফাঁকে দু'চারটে দোতলা তেতলা। উলটো দিকে চাপ-বাঁধা বস্তি। সেগুলোর মাথায় খাপরার চাল। সব মিলিয়ে দীন, মলিন।

ট্রাম রাস্তা পেরিয়ে বাঁদিকে একটা রাস্তায় ঢুকে খানিক এগুতেই ডান পাশে জাফর শা রোড। বড় রাস্তার তুলনায় এদিকটা ঢের বেশি জমজমাট। পুরনো বাড়ির পাশাপাশি নতুন নতুন বহু বাড়ি উঠেছে। অনেকগুলোর কাজ চলছে। তবে চারদিকে প্রচুর ফাঁকা জায়গা। ডোবা, পানাপুকুর, বাঁশঝাড়, তালগাছ। বেশ কিছু উঁচুনীচু মাঠও চোখে পড়ছে। সেখানে ডাঁই হয়ে আছে আবর্জনা।

একটা চায়ের দোকানে খোঁজ করতেই দোকানদার হিরণদের বাড়িটা দেখিয়ে দিল। ছিমছাম দোতলা। নীচু বাউন্ডারি ওয়াল দিয়ে ঘেরা। সামনের দিকে কাঠের গেট, এক ফালি ফুলের বাগান। গেট খুলে বাগানের ভেতর দিয়ে ক'পা গেলেই সিমেন্টের তিনটে উঁচু ধাপ। ওপরে উঠে বন্ধ দরজার কড়া নাড়ল বিনু। মায়ের পেটের বোনের কাছে এসেছে। তবু বুকের ভেতরটা ভীষণ কাঁপছে। থরথর।

কিছুক্ষণ পর দরজা খুলে গেল। সামনে সুধা। অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল সে। পলক পড়ছে না। স্বচক্ষে বিনুকে দেখেও যেন তার বিশ্বাস হচ্ছিল না।

বিস্ময়টা থিতোতে কয়েক লহমা লাগল। তারপরই খুশিতে চেঁচিয়ে উঠল, 'ও মা, তুই! এ আমি ভাবতেও পারি নি। আয় আয়—' বিনুর দু'হাত ধরে টানতে টানতে দোতলার একটা ঘরে নিয়ে এল সে। নিশ্চয়ই বসার ঘর। ফিটফাট, সাজানো গোছানো। একটা বেতের সোফায় ভাইকে বসিয়ে পা গুঁটিয়ে বসল। বিনুর হাতটা তার নরম মুঠিতে ধরা রয়েছে।

ভাইয়ের দিক থেকে পলকের জন্য চোখ সরায় নি সুধা। গভীর গলায় বলল, 'কত বছর পর দেখা হল। কত বড় হয়ে গেছিস বিনু!'

বৃদ্ধ শেষ হবার মুখে মুখে রাজদিয়ায় সুধা সুনীতির বিয়ে হয়েছিল একই দিনে। একই লগ্নে। সুধার বউ ভাত হয়েছিল রাজদিয়াতেই, কেননা হিরণের ঠাকুরদা আর জেঠিমা তখনও পূর্ব বাংলার ওই শহরেই থাকতেন। সুনীতির বউ-ভাত হয়েছিল বেশ কয়েকদিন পরে, কলকাতায়।

সুধার বউ ভাতের পর সুনীতি আনন্দ সুধা হিরণ হেমনাথ অবনীমোহন ঝিনুক স্নেহলতা বিনু, সবাই একসঙ্গে কলকাতায় এসে চইছই করে ক'দিন কাটিয়ে গিয়েছিল।

বেয়াল্লিশের শেষাশেষি মহাযুদ্ধ যখন পুরোদমে চলছে, ডিফেন্সে চাকরি নিয়ে কলকাতায় চলে এসেছিল হিরণ। তখন সে থাকত মির্জাপুরের এক মেসে। বিয়ের পর পার্ক সার্কাসের এক পাঁচমিশালি পাড়ায় বাড়িভাড়া নিয়েছিল।

সুনীতির বউ-ভাতে এসে সেই বাড়িতে গেছে বিনুরা। সুধা আর হিরণের সঙ্গে তার সেটাই শেষ দেখা।

যুদ্ধের পর একটা বছর কাটতে না কাটতেই সারা ভারতবর্ষ উথালপাতাল হয়ে গেল। রাজদিয়ায় খবর পৌঁছেছিল, ছেচল্লিশের ষোলই আগস্ট জিন্নার ডাইরেক্ট অ্যাকশনের ডাকে সারা কলকাতা বধ্যভূমি হয়ে উঠেছে। চারদিকে শুধু আগুন, নির্বিচার হত্যা আর ধর্ষণ। নরকের লক্ষ দরজা হাট করে খুলে দেওয়া হয়েছে। পৃথিবীতে আলো নেই, বাতাস নেই। সারা কলকাতা সেদিন হননপুরী।

সেই সময় পার্ক সার্কাসের বাড়িতে ভয়ে আতঙ্কে বুকের ভেতরটা হিম হয়ে যাচ্ছিল সুধাদের। উন্মাদ হত্যাকারীর দঙ্গল বাড়ি বাড়ি হানা দিয়ে শিকার খুঁজে বেড়াচ্ছে। মৃত্যু যখন প্রায় অবধারিত, হঠাৎ দৈবপ্রেরিতের মতো মিলিটারি পুলিশ এসে তাদের উদ্ধার করে ভবানীপুরের এক গুরদোয়ারার রিলিফ ক্যাম্পে পৌঁছে দেয়। সেখানে মাসখানেক কাটিয়ে, দাঙ্গার তান্ডব কমে এলে টালিগঞ্জের এই নিরাপদ এলাকায় বাড়ি ভাড়া করে চলে আসে ওরা। রাজদিয়ায় চিঠি লিখে হিরণ এ বাড়ির ঠিকানা জানিয়ে দিয়েছিল।

অনেকদিন বাদে সুধাকে দেখল বিনু। নিরবধি কালের মাপে মাঝখানের ক'টা বছর কী আর এমন! নেহাতই বিন্দুবৎ। তবু মহাযুদ্ধ, দাঙ্গা, দেশভাগ, লক্ষ লক্ষ শরণার্থীর সীমান্তের এপারে চলে আসা—সব মিলিয়ে মনে হয় হাজার আলোকবর্ষ পার হয়ে গেছে।

সুধাকে দেখে কম খুশি হয় নি বিনু। দুই বোনের মধ্যে ছোটদিই তার বেশি প্রিয়। তারা পিঠোপিঠি, বয়সের তফাতও কম। সুধার বিয়ের আগে পর্যন্ত পরস্পর ছায়ার মতো লেপটে থেকেছে। সারাক্ষণ হিহি হাসি, নইলে মারদাঙ্গা। অতি তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে অবিরাম খুনসুটি। এই উদ্দাম ভাব। পরক্ষণে তুলকালাম ঝগড়া। মহাসংগ্রামের পর মহাশান্তি। কেউ কাউকে এক লহমা ছেড়ে থাকতে পারত না। একজন দূরে কোথাও গেলে আরেকজন গন্ধ শুঁকে শুঁকে ঠিক হাজির হয়ে যেত।

এত বছর পর সুধা তার পাশে বসে আছে। বুকের ভেতর আবেগের বলক ওঠার কথা। কিন্তু সেই চিন্তাটা অবিরল দংশন করে চলেছে মস্তিষ্কে—ঝিনুক।

সুধার প্রথম দিকের উচ্ছ্বাস থিতিয়ে এসেছিল। ভারী গলায় বলল, 'তোকে ফের দেখতে পাব, ভাবতে পারি নি। কী দুশ্চিন্তায় যে দিন কাটছিল!' হঠাৎ উঠে দাঁড়াল সে, 'তুই একটু বোস, আমি আসছি—' বলেই ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। পরক্ষণেই ফিরে আসে, সঙ্গে হিরণ।

হিরণের গায়ে চাদর জড়ানো। চোখমুখ টস টস করছে। মনে হয় অসুস্থ। সুধার মতো অপার বিস্ময়ে বিনুকে দেখতে দেখতে তার কাছে বসে পড়ে। ব্যগ্র সুরে জিজ্ঞেস করে, 'রাজদিয়া থেকে কবে এলে বিনু?'

বিনু বলল, 'কাল। ঢাকা মেলে—'

'একমাস ধরে রোজ অফিস ছুটির পর শিয়ালদা যাচ্ছি। রিফিউজি বোঝাই হয়ে যে ট্রেন আসে, সেটার প্রত্যেকটা কামরায় গিয়ে খোঁজ করি। রোজই ভাবি, তোমরা আসবে। পরশু রাতে হিম লেগে জ্বর হল। তাই কাল আর স্টেশনে যাওয়া হয় নি। গেলে দেখা হত। শ্বশুর মশাই তীর্থে গেছেন। ভবানীপুরের বাড়ি তালাবন্ধ। কাল রাতে কোথায় ছিলে?'

হিরণ কথা বলছিল ঠিকই, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বিনুকে লক্ষও করছিল। উদ্বাস্তুদের তো রোজই দেখছে সে। পাকিস্তান থেকে রিফিউজি স্পেশালগুলো শিয়ালদা স্টেশনে ফি সন্ধ্যায় এসে যাদের নামিয়ে দিচ্ছে তাদের চোখেমুখে শুধুই আতঙ্ক, শুধুই উৎকণ্ঠা। একটা নিদারুণ হত্যাপুরী যে তারা পেরিয়ে এসেছে, সর্বাঙ্গে তার ছাপ। তেলহীন রুক্ষ চুলে সাত পুরু ধুলো, ঘোলাটে চোখ এক কড় গর্তে ঢোকানো। ভাঙা গালে কাঁটার মতো খাড়া খাড়া দাড়ি। পরনে ময়লা চিটচিটে জামাকাপড়। শীর্ণ, সতত ত্রস্ত। সারাক্ষণ ওরা কুঁকড়ে আছে।

বিনু যে ঢাকা মেল থেকে নেমেই এখানে আসে নি, বলে না দিলেও চলে। চুল মোটামুটি

pathagar.net

আঁচড়ানো, পরিষ্কার কামানো মুখ। পরনে বেখাপ্পা হলেও ইস্তিরি-করা পাজামা পাঞ্জাবি। চোখের কোলে অবশ্য পুরু কালির পোঁচ। একটা রাত যে নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পেরেছে তা বোঝা যায়।

বিনু বলল, 'বড়দির বাড়ি।'

হিরণ জিজ্ঞেস করে, 'হেমদাদু, দুই দিদা, ওঁরা কি ওখানেই আছেন?'

'না। দেশ থেকে কেউ আসেন নি। দাদু রাজদিয়া ছেড়ে আসবেন না। মরতে হলে ওখানেই মরবেন।'

'বুঝিয়ে সুঝিয়ে নিয়ে আসতে পারলে না?'

'ওঁর মতো মানুষকে বোঝানো যায়? একবার যেটা ঠিক করেছেন সেখান থেকে এক চুলও নড়ানো যাবে না।'

'এ পাগলামির মানে হয়?' ভীষণ উদ্বিগ্ন দেখায় হিরণকে, 'দেশ কি আগের মতো আছে? মানুষ উন্মাদ জন্তু হয়ে গেছে।'

বিনু উত্তর দেয় না। হেমনাথ স্নেহলতা আর শিবানীকে ছাপিয়ে ঝিনুকের ভাবনাটাই তাকে ক্রমাগত উতলা করে তুলছে। হিরণ বাড়িতে থাকায় একরকম ভালই হয়েছে। ঝিনুককে এ বাড়িতে নিয়ে আসার বিষয়ে দু'জনের সঙ্গে কথা বলে নেওয়া যাবে। সুধার হয়তো আপত্তি হবে না, কিন্তু হিরণের মতামতই আসল। ঝিনুকের কথা কিভাবে বলবে, সব শোনার পর ওদের প্রতিক্রিয়া কী হবে, ভেবে তল পাওয়া যাচ্ছে না। বলতে গিয়েও বাধা আসছে নিজের ভেতর থেকে। বিনুর ভয়, সুনীতিদের বাড়িতে যা হয়েছে, এখানেও যদি তাই ঘটে? একই অপমানের পুনরাবৃত্তি?

হিরণ বলে যাচ্ছিল, 'খবরের কাগজ খুললেই ইস্ট পাকিস্তান জুড়ে শুধু খুন, আগুন, লুটপাট, মেয়েদের ওপর অকথ্য অত্যাচার। ট্রেন বোঝাই হয়ে হাজার হাজার মানুষ পালিয়ে আসছে, রোজ ছবি বেরোয়। রেডিওতেও একই খবর। সারাক্ষণ আতঙ্কে থেকেছি। অফিস ছুটি হলে দিনের পর দিন শিয়ালদায় গিয়ে খোঁজ নিয়েছি, তোমরা এলে কিনা। যদি রাজদিয়া কি তার চারপাশের গ্রামগঞ্জ থেকে কেউ এসে থাকে, চেনাজানা তাদেরও খুঁজে বার করার চেষ্টা করেছি। ওদের কাছ থেকে হয়তো তোমাদের খবর পাব। ক'দিন আগে স্টেশনের বাইরের চত্বরে পতিতপাবনকে দেখলাম। ফ্যামিলি নিয়ে কী কষ্টে যে আছে—'

বিনু বলল, 'পতিতপাবনের সঙ্গে কাল আমারও দেখা হয়েছে।'

'সে বলল, রাজদিয়ার অবস্থা ভাল না। চারদিক গরম হয়ে আছে। দেশ ছেড়ে যখন আসে তখনও কিছু হয় নি, তবে যে কোনও সময় সাঙ্ঘাতিক কিছু ঘটে যাবে। তোমাদের কোনও খবর দিতে পারল না। আমাদের মানসিক অবস্থাটা বোঝো। রোজ শিয়ালদা যাই, আর দু'দিন চারদিন পর পর তোমাদের চিঠি লিখি, কিন্তু উত্তর নেই।'

'আমরাও তো আপনাকে, বাবাকে আর আনন্দদাকে কত চিঠি লিখেছি। নিশ্চয়ই পান নি?'

'না, একখানাও না।'

'পোস্টাল ডিপার্টমেন্ট কোনও কাজ করছে না।'

একটু চুপচাপ।

তারপর গভীর উদ্বেগের সুরে সুধা বলল, 'শুনেছি, কলকাতায় আসার সময় নদীতে খুনিরা দল বেঁধে হামলা চালাচ্ছে। দাদু দিদারা তোকে একা একা আসতে দিল?'

বিনু বলল, 'না এসে উপায় ছিল না। একাও আমি আসিনি। সঙ্গে ঝিনুক ছিল।'

দু'পাশের দুই সোফায় বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো চমকে উঠল সুধা আর হিরণ। শ্বাস-আটকানো গলায় সুধা বলল, 'ঝিনুক, মানে ঢাকায় গিয়ে যার—' কথাটা শেষ না করে থেমে যায়।

দর্শনের খবরটা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কারোর আর জানতে বাকি নেই। আস্তে মাথা নাড়ে বিনু, 'হ্যাঁ। ঢাকা থেকে উদ্ধার করে নিয়ে আসার পর উন্মাদ হয়ে গিয়েছিল ঝিনুক। ঘর থেকে বেরুত না, দরজা জানালা বন্ধ করে অন্ধকারে এক কোণে বসে দিনরাত কাঁদত। সারাক্ষণ ওর ভয়, এই বুঝি রাজাকারেরা তাড়া করে আসছে, ফের তাকে জোর করে তুলে নিয়ে যাবে। পাকিস্তান ওর কাছে আতঙ্কপুরী। ওখানে থাকলে ঝিনুক বাঁচত না।'

pathagar.net

'কিন্তু—'

'কী?'

'ওই বয়েসের একটা মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে এলি। পথে বিপদে পড়িস নি?'

'এক-আধবার? সব শুনলে বুঝতে পারবি।'

রাজদিয়ায় হেমনাথদের পুকুরঘাটে রাজেকের নৌকোয় ওঠার পর থেকে বর্ডার পর্যন্ত যা যা ঘটে গেছে তার বর্ণনা দিয়ে গেল বিনু। খুঁটিনাটি কিছুই বাদ দিল না। কাল রাত্তিরেও হেমনলিনীদের কাছেও একই বিবরণ দিয়েছে। আরও কতজনকে দিতে হবে, কে জানে।

সীমান্ত পর্যন্ত দীর্ঘ পথে জলেস্থলে সর্বক্ষণ মরণভয়। কতবার মৃত্যু সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, হিসেব নেই। ঝিনুকের জন্য চরম ঝুঁকিটা বিনুকে নিতেই হয়েছিল।

যত শুনছে, চোখের তারা স্থির হয়ে যাচ্ছে সুধার। পলক পড়ে না। বুকের ভেতর বাতাস আটকে যায়। চাপা আতঙ্কে শিউরে শিউরে ওঠে সে। জোরে শ্বাস ফেলে একসময় বলে, 'এভাবে ঝিনুককে তোর সঙ্গে পাঠানো উচিত হয় নি দাদুর। সাঙ্ঘাতিক কিছু যদি ঘটে যেত? উঃ, আমি ভাবতেই পারছি না।'

সুধা চিরকালের ভীতু। অতি তুচ্ছ কারণেও তার ভয়। কিন্তু পাকিস্তান থেকে আসার পথে আজকাল যা ঘটছে তা শুনলে পৃথিবীর সবচেয়ে সাহসী মানুষেরও ত্রাসে বুকের ভেতর হিম হয়ে যাবে।

বিনু মলিন হাসে। বলে, 'কিছুই তো হয় নি। শেষ পর্যন্ত প্রাণ নিয়ে ইণ্ডিয়ায় চলেও আসতে পেরেছি।'

হিরণ জিজ্ঞেস করে, 'ঝিনুক কি আনন্দদাদের ওখানে রয়েছে?'

মাথাটা সামান্য হেলিয়ে দেয় বিনু, 'হ্যাঁ।' কিছুক্ষণ ভেবে হঠাৎ ব্যাকুলভাবে বলে ওঠে, 'হিরণদা, কলকাতায় এসে আমি ভীষণ বিপদে পড়ে গেছি। সবে কালই এসেছি। দু'চার দিন পরে আপনাদের সঙ্গে দেখা করতাম। কিন্তু আজই ছুটে আসতে হল।'

উৎকণ্ঠিত সুধা বিনুর দিকে অনেকখানি ঝুঁকে জিজ্ঞেস করে, 'কী হয়েছে রে?'

হিরণ নিষ্পলক তাকিয়ে ছিল। চকিতে কিছু আঁচ করে নিয়ে জানতে চায়, 'বিপদটা কি ঝিনুককে নিয়ে?'

'হ্যাঁ।' বিনু বলল, 'সবটা বলছি, শুনুন—'

হঠাৎ হিরণের খেয়াল হয়, মৃত্যুযাতনা ভোগ করতে করতে কলকাতায় পা দিয়েই আজ এখানে চলে এসেছে বিনু। আর সেই থেকেই কথা বলে চলেছে। বিরামহীন। নিশ্চয়ই ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। ওর বিশ্রাম দরকার। সারা মাথায় আতঙ্ক নিয়ে পাকিস্তানের ভেতর দিয়ে দীর্ঘ পথ পাড়ি দেবার কাহিনী শুনতে শুনতে তারা এতটাই বিহ্বল হয়ে পড়েছিল যে অন্য কোনও দিকে নজর ছিল না।

হিরণ বলল, 'পরে শুনব।' বলে সুধার দিকে ফিরল, 'ওকে নিয়ে বাথরুম দেখিয়ে দাও। চান-খাওয়া সেরে দুপুরটা ঘুমোক। বিকেলে সব শোনা যাবে।'

ভাইটার সঙ্গে এত বছর বাদে দেখা। তাকে জলটুকু পর্যন্ত দেওয়া হয়নি। ক্রমাগত প্রশ্ন করে করে বকিয়ে মেরেছে। অপরাধী মুখ করে দ্রুত উঠে পড়ে সুধা। বলে, 'আয় বিনু—'

বিনু কিন্তু বসেই থাকে। বলে, 'বড়দির বাড়িতে চান করে সকালের খাবার খেয়ে এসেছি। এখন আর কিছু খাব না। বেশিক্ষণ থাকতেও পারব না। তোদের সঙ্গে দরকারী কথাটা সেরেই ফিরে যাব। তুই বোস ছোটদি—'

তবু হাত ধরে টানাটানি করতে থাকে সুধা। বলে, 'এখনই যাবার এত তাড়া কিসের? তুই এখানে এসেছিস, দিদি কি আনন্দদা জানে না?'

'জানে।'

'তা হলে আর কী। ওরা নিশ্চয়ই বুঝবে, আমরা তোকে যেতে দিই নি।'

বিনু বলল, 'আমি ওদের কথা ভাবছি না। ঝিনুকের জন্যেই ফিরে যেতে হবে।'

সুধা বলল, 'ও বাড়িতে দিদি আছে, আনন্দদা আছে, মাউইমা আছেন। গণ্ডা গণ্ডা কাজের লোক। ঝিনুকের আদরযত্নের ত্রুটি হবে না।'

বিনু বলে, 'তোদের বললাম তো, যে ঝিনুককে দেখে এসেছিস, ঢাকা থেকে ফেরার পর সে আর তা নেই। কী কষ্ট করে ওকে আমরা খানিকটা সুস্থ করে তুলেছি, চিন্তা করতে পারবি না। এখানে দাদু নেই, দিদারা নেই, আমাকে বেশিক্ষণ না দেখলে খাবে না, চান করবে না, এমন পাগলামো শুরু করবে যে আর কারোর পক্ষে সামলানো মুশকিল। আমাকে আটকে রাখিস না ছোটদি।'

অভিমানের সুরে সুধা কী বলতে যাচ্ছিল, ইশারায় তাকে থামিয়ে সোফা দেখিয়ে দিল হিরণ। সুধা ধীরে ধীরে ফের বসে পড়ে।

হিরণ বিনুর চোখের দিকে তাকায়, 'ঠিক আছে, ফিরেই যেও। এখন তোমার দরকারী কথাটা বল।'

কাল শিয়ালদা স্টেশনে নেমে ঘোড়ার গাড়িতে ভবানীপুর গিয়ে অবনীমোহনকে না পেয়ে আনন্দদের বাড়ি যেতে হয়েছিল। রাতটা সেখানে কাটিয়েছে। সুধাদের মাত্র এটুকুই বলেছিল বিনু। কিন্তু দিদির শ্বশুরবাড়িতে ক'টা দিন থাকতে গিয়ে কী জুটল? অপমান। গ্লানি। চরম মানসিক নির্যাতন। ঝিনুকের সঙ্গে হেমনলিনী কী নিষ্ঠুর আচরণ করেছেন আর বাড়ির প্রতিটি মানুষ নীরবে, বিনা প্রতিবাদে তা সয়ে গেছে, সবিস্তার জানাল বিনু। একটুও রাখঢাক না করে। ঝিনুকের অপরাধ, সে ধর্ষিত। তাই সে অচ্ছুৎ। কৃমিকীটের মতো নোংরা। তার নিশ্বাসে পৃথিবী অশুচি হয়ে যায়।

বলতে বলতে রাগে, আক্রোশে, তীব্র কষ্টে বিনুর মুখ রক্তবর্ণ হয়ে ওঠে। চোখ দু'টো ফেটে পড়বে। আনন্দদের বাড়িতে মাথা নুইয়ে চুপ করে ছিল। নিরুদ্ধ ক্রোধ আগুনের হলকা হয়ে এখন বেরিয়ে আসছে।

বিনু বলতে লাগল, 'আগে যদি জানতাম, ওদের বাড়ি কিছুতেই যেতাম না। শিয়ালদা স্টেশনে রিফিউজিদের ভেতর পড়ে থাকতাম।'

হিরণ বিনুর পিঠে নরম করে একখানা হাত রাখে। বলে, 'ভবানীপুর পর্যন্ত এসেছিলে। সেখান থেকে আমাদের বাড়ি তো খুব দূরে নয়। চলে এলে না কেন?'

বিনু বলল, 'ঠিকানাটা জানি। কিন্তু এদিকে আগে কখনও আসি নি। তার ওপর অনেক রাত হয়ে গিয়েছিল। খিদেয় তেষ্টায় ধকলে আমরা তখন ধুঁকছি। আনন্দদাদের বাড়িতে আগে গেছি। আবছাভাবে মনেও ছিল। তাই ওখানে চলে গিয়েছিলাম। তখন কি জানতাম—'

বিষণ্ণ হিরণ আস্তে মাথা নাড়ে। বিনুর ক্ষোভের দুঃখের অভিযোগের সহস্র কারণ রয়েছে। হেমনলিনী অতটা কঠোর না হলেই পারতেন। সেই ছেলেবেলা থেকে ঝিনুককে চেনে সে। মেয়েটার জন্য বুকের ভেতর চিনচিনে একটা ব্যথা গোপন স্রোতের মতো ছড়িয়ে পড়ে।

যে ফুটন্ত উত্তেজনা বিনুর মাথায় টগবগ করছিল, হঠাৎ সেটা জুড়িয়ে যায়। হিরণের একটা হাত আঁকড়ে ধরে সে। ব্যাকুলভাবে বলে, 'এক মুহূর্তও আর আনন্দদাদের বাড়ি থাকতে চাইছে না ঝিনুক। জোর করে ওখানে রাখলে মেয়েটা মরে যাবে। বাবা যে ক'দিন না ফিরছে আপনাদের বাড়িতে আমাদের থাকতে দেবেন?'

হিরণ হকচকিয়ে যায়। বলে, 'এ তুমি কী বলছ বিনু, ক'দিন কেন, যতদিন ইচ্ছে আমাদের কাছে থাকবে। তোমার ছোটদির বাড়ি তোমার বাড়ি।' আবেগে তার গলা কাঁপতে থাকে। জিজ্ঞেস করে, 'ঝিনুককে কবে নিয়ে আসতে চাইছ?'

কতকাল পর ফুসফুস বোঝাই করে সহজভাবে বাতাস টানতে পারল, নিজেই জানে না বিনু। টালিগঞ্জের দিকে পা বাড়ানোর সময় যে দ্বিধা আর সংশয়টুকু ছিল, সব উধাও। বলল, 'আজই।' কৃতজ্ঞতায় তার স্বর বুজে আসে। চোখের কোণদু'টো সির সির করছে।

হিরণ বলল, 'চল, আমি তোমার সঙ্গে যাচ্ছি।'

সুধা ব্যস্তভাবে বলল, 'জ্বর গায়ে তোমাকে বেরুতে হবে না। ঝিনুককে আনতে আমি ওর সঙ্গে যাব।'

কয়েক পলক কী ভেবে নিল বিনু। সুধাকে বলল, 'না, কারোরই যাবার দরকার নেই। তোরা গেলে মনে করবে, আমি নালিশ করতে এসেছিলাম। তাই ঝিনুককে নিয়ে যেতে এসেছিস। এতে ওরা ভীষণ অপমানিত বোধ করবে।'

এক ঘনিষ্ঠ আত্মজনের কাছে যে মেয়ে অবাঞ্ছিত, আরেক আত্মীয় তাকে আশ্রয় দেবার জন্য পড়ি মড়ি করে বাড়ি অব্দি দৌড়ে এসেছে, হেমনলিনী তা ভাল চোখে দেখবেন না। তাঁর অহংবোধে ঘা লাগবে।

বিনু বলতে থাকে, 'মাঝখান থেকে তোদের সঙ্গে বড়দির শ্বশুরবাড়ির সম্পর্কটা খারাপ হয়ে যাবে।'

সুধা বলল, 'তোরা এখানে এসে থাকবি। সেটা কি ওরা জানতে পারবে না?'

'জানুক। ভাববে, আমিই ঝিনুককে তোদের কাছে নিয়ে এসেছি। তোরা নিতে আসিস নি।'

আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে কত রকম জটিলতা, কত রকম টানাপোড়েন! সামান্য এদিক ওদিক হলে সম্পর্কের সুতোগুলো কখন পট পট ছিঁড়ে যাবে, কেউ জানে না। কলকাতায় পা দিয়ে এসব বুঝতে শিখেছে বিনু। এক লহমায় তার বয়স আচমকা অনেকটা বেড়ে গেছে যেন।

হিরণ একদৃষ্টে লক্ষ করছিল। ক'বছর আগে রাজদিয়ায় যে চঞ্চল কিশোরটিকে দেখে এসেছে, কী নিষ্পাপই না ছিল সে। মুখে জগতের সবটুকু সারল্য মাখানো। দু'চোখে অগাধ বিস্ময় নিয়ে এই পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে থাকত। সে কি এই বিনু যে তার আর সুধার মাঝখানে এখন বসে আছে। কত অল্প সময়ে কত পরিণত হয়ে উঠেছে সে। কত অভিজ্ঞ। সংসারের নানা খুঁটিনাটির দিকে তার এখন তীক্ষ্ণ নজর।

হিরণ বলল, 'বিনু ঠিকই বলেছে। ও নিজেই ঝিনুককে নিয়ে আসুক।'

কত কাল পর কী ভাল যে লাগছে বিনুর! হালকা। ভারমুক্ত। কিন্তু কতক্ষণ? পুরনো সেই দুশ্চিন্তাটা ফের ডালপালা মেলে তার মাথায় চেপে বসে। ভয়ে ভয়ে বলে, 'কিন্তু হিরণদা—'

বিনুর দিক থেকে চোখ সরায় নি হিরণ। জিজ্ঞেস করল, 'কী বলছ?'

'বড়দিরা বলছিল, আপনার ঠাকুরদা আর জেঠিমা দেশ থেকে এসে এখানেই থাকেন। এখন পাটনায় বেড়াতে গেছেন। হঠাৎ যদি ওঁরা ফিরে আসেন—'

ইঙ্গিতটা স্পষ্ট। হিরণের মুখে চকিতে ছায়া পড়ে। ঝিনুকের লাঞ্ছনার অনুপুঙ্খ বর্ণনা শুনতে শুনতে সে এতটাই অভিভূত হয়ে গিয়েছিল যে ঠাকুরদা আর জেঠিমার কথা মনে পড়ে নি। ক'বছরে কত কী ঘটল—মহাযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা, গণহত্যা, হাজার হাজার নারী ধর্ষণ, সীমান্তের ওপার থেকে শরণার্থীর ঢল। বিশ্বসংসার তোলপাড় হয়ে গেল, পুরনো জীবনযাত্রা ছিন্নভিন্ন। কিছুই আগের মতো এক জায়গায় দাঁড়িয়ে নেই। সময় কত পালটে গেছে, কিন্তু এতটুকু বদলাননি ঠাকুরদা আর জেঠিমা। হেমনলিনীর মতো ওঁরাও একই ছাঁচে ফেলা। দুই বুড়োবুড়ি কি ঝিনুককে সহজভাবে মেনে নেবেন? মনে হয় না। কিন্তু বিনুকে কথা দেওয়া হয়ে গেছে। এখন আর ফেরানো যাবে না। দ্বিধা কাটিয়ে সপ্রতিভ হওয়ার চেষ্টা করল হিরণ, 'মাসখানেকের ভেতর ওঁদের আসার সম্ভাবনা নেই। এলে দেখা যাবে।'

বিনু বলল, 'আরেকটা অনুরোধ হিরণদা—'

'বল।'

'কেউ ঝিনুকের সামনে ঢাকার কথা, পাকিস্তানের কথা তুলবেন না। ওর পুরনো স্মৃতি একেবারে ভুলিয়ে দিতে হবে।'

যে কারণে ঊর্ধ্বশ্বাসে টালিগঞ্জে ছুটে আসা, সেটা চুকে যাবার পরও খুব সহজে বেরুনো গেল না। ডাই এতকাল বাদে এসেছে। প্রথম দিন সে কিছুই মুখে না দিয়ে চলে যাবে, সুধা কি তাই যেতে দিতে পারে? শেষ মুহূর্তে কেঁদে কেটে বিনুকে জোর করে হিরণের কাছে বসিয়ে রান্নাঘরে চলে গিয়েছিল। ঘরে ভাল মিষ্টি আছে। অল্পবয়সী কাজের মেয়েটিকে সঙ্গে নিয়ে ক্ষিপ্র হাতে লুচি

ভেজে থালা বোঝাই করে নিয়ে এল।

এই ভরদুপুরে এত লুচিমিষ্টি খাওয়া যায়? কিন্তু সুধা যা জেদী আর অভিমানী, কোনও কথাই শুনবে না। আপত্তি করলে সময় নষ্ট।

সামনের দেওয়াল ঘড়িতে একটা বেজে সাতাশ। এখান থেকে সুনীতিদের বাড়ি ফিরে যেতে যেতে আড়াইটা বেজে যাবে। এতক্ষণ তাকে না দেখে ঝিনুক কী কান্ড বাধিয়ে বসে আছে, কে জানে। গোগ্রাসে খেতে লাগল বিনু।

খাওয়া যখন প্রায় শেষ, বাইরের বাগানের দিক থেকে কেউ চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ডাকতে লাগল, 'ছুটোদিদি, ছুটোদিদি, আমি আইসা গ্যাছি। তলে দুয়ার বন্ধ রইছে।'

'একটু দাঁড়াও—' কণ্ঠস্বর উঁচুতে তুলল সুধা। তাদের বাড়ির কাজের মেয়েটির নাম উমা। তাকে ডেকে, একতলায় গিয়ে সদর দরজা খুলে দিতে বলল।

নীচে থেকে যে ডাকছিল তার গলা চেনা চেনা লাগছিল বিনুর। জিজ্ঞেস করল, 'লোকটা কে রে ছোটদি?'

সুধা জবাব দেবার আগেই হিরণ বলে উঠল, 'তোমার খুব জানাশোনা। এলেই দেখতে পাবে। একটু অপেক্ষা কর।' তার মুখে মৃদু হাসি। হাসিটা হালকা রহস্যের আবরণে মোড়া।

খানিক পর উমা যাকে সঙ্গে করে নিয়ে এল, তার সঙ্গে এ জীবনে আর কখনও দেখা হবে, তাও টালিগঞ্জের এই বাড়িতে, কে ভাবতে পেরেছিল! যুগল সামনে দাঁড়িয়ে।

দেশভাগের ঠিক পরে ফের দাঙ্গা বাধলে ভাটির দেশ থেকে শ্বশুরবাড়ির লোকজনদের নিয়ে রাজদিয়ায় এসে এক লহমা বিনুদের সঙ্গে দেখা করেই ইন্ডিয়ায় পালিয়ে এসেছিল যুগল। তারপর নতুন করে পাকিস্তান জুড়ে শুধুই আতঙ্ক। অন্তহীন। নিরবচ্ছিন্ন। যুগলের স্মৃতি কবেই ঝাপসা হয়ে গেছে। কিন্তু জীবন এক আশ্চর্য জাদুকর। কখন যে গোপন ঝুলি থেকে কী চমক বার করে আনবে, আগেভাগে টেরও পাওয়া মুশকিল। সময়ের পলি পড়ে পড়ে মন থেকে যে মুছে গিয়েছিল, পৃথিবীর আরেক প্রান্তে সহসাই হয়তো তার সঙ্গে একদিন দেখা হয়ে যায়।

রাজদিয়ায় হেমনাথের বাড়ি যেদিন প্রথম যুগলকে কামলা খাটতে দেখেছিল বিনু, কী চমৎকারই না ছিল সে। কষ্টিপাথরে কাটা চেহারা। পেটানো সতেজ স্বাস্থ্য, চওড়া বুকের ছাতি। সর্বক্ষণ টগবগ করে ফুটছে।

শক্তপোক্ত কাঠামোটা অটুটই আছে যুগলের। কিন্তু স্বাস্থ্যের অনেকটাই খোয়া গেছে। গাল ভাঙা, মুখে খাপচা খাপচা দাড়ি, কণ্ঠার হাড় গজালের মতো ঠেলে বেরিয়ে এসেছে। চোখ গর্তে ঢোকানো। চুল উঠে উঠে কপালটা মাঠ। পরনে আধময়লা পাজামা আর ডোরাকাটা সবুজ হাফ শার্ট। পায়ে তালিমারা স্যান্ডেল।

পরস্পরের দিকে অপার বিস্ময়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে দু'জনে। বিনুকে দেখতে দেখতে যুগলের পা থেকে মাথা পর্যন্ত বিদ্যুৎ খেলে যায়। আনন্দে, উত্তেজনায় সে চেঁচিয়ে ওঠে, 'আমাগো ছুটোবাবু না!'

বিনুও খুব খুশি, খানিক আগে যেমনটা হয়েছিল সুধাকে দেখে। বলল, 'হ্যাঁ। তোমাকে ছোটদির বাড়ি দেখব, ভাবতেই পারি নি। কাছেই থাকো নাকি?'

কথাগুলো কানেই যায় না যুগলের। গভীর আবেগ তার ওপর ভর করে বসেছে। শিশুর মতো দুই হাত ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে ঝড়ের গতিতে বলে যায়, 'কত বচ্ছর পর দেখলাম। কী ভালা যে লাগতে আছে। গত বিষ্যুদবারও এই বাড়িত্ আসছিলাম। ছুটোদিদিরা তো কয় নাই, আপনে পাকিস্থান থিকা ইন্ডিয়ায় চইলা আসছেন—'

সুধা বলল, 'বিনু সবে কালই এসেছে। রাজদিয়া থেকে চিঠি লিখে জানিয়েছিল, আসছে। সে সব চিঠি আমরা পাই নি। তোমাকে খবর দেব কী করে?'

যুগল মাথা নাড়ে, 'হেয়া (তা) ঠিকই।' বিনুকে বলে, 'উই পার থিকা আসনের আগে রাইজদা গিয়া সেই দিন আপনেগো লগে দেখা করলাম তহনই কইছিলাম, পাকিস্থানে থাকন যাইব না। হয় খুন করব, নাইলে বাড়িঘরে আগুন লাগাইয়া বসোর মাইয়া (যুবতী) উঠাইয়া লইয়া খেদাইয়া দিব।

pathagar.net

মনে আছে?'

যুগল লেখাপড়া শেখে নি, অক্ষরপরিচয়হীন। কিন্তু দূরদর্শী। পাকিস্তানে কী ঘটতে পারে, ভবিষ্যতের সেই চেহারাটা তার কাছে বহুকাল আগেই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

রাজদিয়া থেকে শিয়ালদা পর্যন্ত স্টিমারে আর ট্রেনে গাদাগাদি করে আসার সময় হাজার হাজার ভিটেমাটি খোয়ানো মানুষেব মুখে একই কথা শুনেছে বিনু। হুবহু একই অভিযোগ। একই আক্ষেপ। একই সর্বনাশের কাহিনী।

অন্যের কথা শুনতে হবে কেন? ঝিনুককে নিয়ে তার নিদারুণ আতঙ্ক আর অভিজ্ঞতা কি আলাদা কিছু? বিমর্ষ মুখে বিনু বলে, 'সবই মনে আছে।'

যুগল বলল, 'অনেক আগেই আপনেগো চইলা আসন উচিত আছিল ছুটোবাবু।'

বিনু চুপ করে থাকে।

যুগল উৎসুক সুরে এবার বলে, 'বড়কত্তা, দুই ঠাউরমা—তেনারা কই? ছুটোদিদি, উনাগো ডাইকা আনেন। কত কাল পর দেখা হইব। স্যাবা দিতে (প্রণাম করতে) পারুম। আমারে কী ভালাটাই না বাসতেন!'

বিনু বলল, 'দাদুরা আসেন নি।'

যুগল চমকে ওঠে, 'ক্যান?'

হেমনাথদের রাজদিয়া ছেড়ে না আসার কারণটা সংক্ষেপে জানিয়ে দেয় বিনু।

যুগলকে বিচলিত দেখায়। ভীষণ চিন্তাগ্রস্ত। অধীরভাবে মাথা ঝাঁকিয়ে বলে, 'এইটা কিলাম (কিন্তু) ঠিক হয় নাই ছুটোবাবু। বড়কত্তায় এত জ্ঞেয়ানী, প্যাটে কত বিদ্যা। অত বুঝমান হইয়াও বোঝলেন না, দিনকাল আর আগের লাখান নাই! দশ বিশজন বাদ দিলে পাকিস্থানের মানুষ অন্য কিসিমের হইয়া গ্যাছে। অহনও সোময় আছে ছুটোবাবু। য্যামন কইরা পারেন, বড়কত্তারে লইয়া আসেন। কুনদিন কী বিপদ যে ঘইটা যাইব! বাকি জমন কাইন্দা কূল পাইবেন না।'

হেমনাথ যে কী জেদী, কতখানি একরোখা, বিনুর চেয়ে কে আর ভাল জানে। অনেক বুঝিয়েছে তাঁকে, কিন্তু অবুঝ গোঁ থেকে তাঁকে নড়ানো যায় নি। জন্মভূমির মায়া কাটিয়ে তিনি কিছুতেই আসবেন না। রাজদিয়ার মাটি আঁকড়ে পড়ে থাকবেন। এতে যা ঘটার ঘটুক। যে কোনও পরিস্থিতির জন্য তিনি প্রস্তুত।

কিন্তু এসব আদৌ বুঝতে চাইবে না যুগল। তার কাছে পাকিস্তান হল নৃশংস এক বধ্যভূমি। কসাইখানা। সেখানে তিলমাত্র নিরাপত্তা নেই। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, যে কোনও উপায়ে সীমান্তের এপারে চলে আসা দরকার। বিনু বলল, 'দেখি কী করা যায়—' হঠাৎ খেয়াল হল, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এক নাগাড়ে কথা বলে যাচ্ছে যুগল। ব্যস্তভাবে তাকে বসতে বলল।

যুগল বাঁ হাঁটু দুমড়ে, ডান পা'টা অনেকখানি ছড়িয়ে, খুব কষ্টেসৃষ্টে মেঝেতে বসে পড়ল। দাঁতে দাঁত চেপে কী এক যন্ত্রণা সামলাতে চাইছে।

বিনু যুগলের চোখমুখ লক্ষ করে নি। বলল, 'এ কী, নীচে কেন? সোফায় উঠে বোসো।'

যুগল বলল, 'বড়কত্তায় হইল আমার পুরান মুনিব। তেনার নাতি, নাতিন, নাতিন জামাইয়ের সুমখে কি চ্যারে (চেয়ারে) বইতে পারি?'

হিরণ চুপচাপ বসে ছিল। এবার বলল, 'আমিও কত দিন বলেছি, নীচে বোসো না। কিন্তু কে কার কথা শোনে। ওর মাথায় কী যে ঢুকে আছে! চেয়ারে কি সোফায় বসলে আমাদের সম্মান নাকি নষ্ট হবে!'

এ নিয়ে কথা বাড়ানো বৃথা। হঠাৎ বিনুর চোখে পড়ল, ডান পা টান করার জন্য যুগলের পাজামা উরুর ওপর উঠে গেছে। গোড়ালি থেকে উরুর আধাআধি অব্দি মস্ত ব্যান্ডেজ। চমকে ওঠে সে, 'কী হয়েছে তোমার পায়ে?'

নিশ্চয়ই মারাত্মক চোট পেয়েছে। যুগল কিন্তু আমলই ছিল না। ব্যথাটা একটু সইয়ে নিয়ে বলল, 'ত্যামন কিছু না। সমুন্দির পুতেরা সড়কি চালাইয়া পাওখানেরে এফোড় ওফোড় কইরা ফালাইছিল।'

উৎকণ্ঠিত বিনু জিজ্ঞেস করে, 'কারা? কাদের কথা বলছ?'

যুগল জানায়, দেশভাগের পর এপারে এসে বেশ কয়েক মাস তারা শিয়ালদা স্টেশনে ঘাড় গুঁজে পড়ে ছিল। তারপর তাদের নিয়ে যাওয়া হয় রিফিউজি ক্যাম্পে। খুব মোলায়েম করে সেগুলোর নাম দেওয়া হয়েছে শরণার্থী শিবির। কিন্তু ক্যাম্পগুলোর এমন হাল, মানুষ দূরের কথা, পোকামাকড়ও থাকতে পারে না।

যুগল বলতে লাগল, 'শুনাশুন কানে আসতে লাগল, আমাগো চাইর পাশের কেম্পগুলান থিকা মেলা 'রিফুজ' ফাকা জমিন বিচরাইয়া (খুঁজে) বাইর কইরা বইসা পড়ছে। তমস্ত (সমস্ত) জনম কি কুত্তা বিলাইয়ের (বেড়ালের) লাখান কেম্পে পইড়া পইড়া মরুম? জান থাকতে না। আমাগো কেম্পের মানুষগুলাও হাত-পাও কোলে কইরা শুইয়া রইল না। ভোরে উইঠা চাউরগা (চাট্টি) মুখে দিয়া বাইর হই, ফিরি সন্ধ্যায় আন্ধার নামলে। ঘুইরা ঘুইরা শ্যাষম্যাষ একখান জমিন পাইয়া গেলাম। লগে লগে দখল কইরা ঘর তুললাম।'

কিন্তু নিশ্চিন্ত হবার কি যো আছে? উদ্বাস্তুদের জীবনে নিরঙ্কুশ সুখভোগ বলে কিছু নেই। জমির মালিক তার মালিকানা ছাড়বে কেন? প্রথমে ভালয় ভালয় উঠে যেতে বলল। কাজ না হওয়ায় শুরু হল শাসানি। নিরন্তর হুমকি। কিন্তু যুগলরা অনড়।

জমিদারের হাতে অঢেল টাকা, প্রচুর গুন্ডা, রকমারি মারণাস্ত্র। এবার তারা পাঠাতে লাগল হানাদারের দঙ্গল। রাতের আঁধারে আততায়ীরা মশাল জ্বালিয়ে, রে রে করে দিগ্‌দিগন্ত কাঁপিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগল। আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে ঝুড়িয়ে, খুন করে, যুগলদের উৎখাত করে দেবে। পাকিস্তানে যেমনটা চলছে, অবিকল তাই। কিন্তু যুগলরা চায় না আবার ক্যাম্পে ফিরতে, চায় না নতুন করে উদ্বাস্তু হতে। ততদিনে তারা আশেপাশের বাঁশ ঝাড় আর সুপারি বন কেটে বানিয়ে নিয়েছে টেটা সড়কি ল্যাজা লাঠি এবং নানা আদিম অস্ত্রশস্ত্র। গড়ে তুলেছে প্রতিরোধ বাহিনী। হানাদারদের বিরুদ্ধে তারা রুখে দাঁড়াতে লাগল। তেমনই এক নৈশ যুদ্ধে সড়কির ফলা আমূল তার উরু থেকে পায়ের গোছ পর্যন্ত ঢুকে যায়।

এক রোমাঞ্চকর কাহিনী শুনছিল বিনু। শিহরন জাগানো। তাদের সেই যুগল, যে একদিন রাজদিয়ায় হেমনাথের বাড়ি কামলা খাটতে এসেছিল, পূর্ব বাংলার খাল বিল নদী এমনি অজস্র জলধারা, জলতলের অপার রহস্য, মাছ পাখি শাপলা শালুক, পাট খেত, ধানবন, ভুবনজোড়া বিপুল আকাশ যাকে সারাক্ষণ আচ্ছন্ন করে রাখত, সে কিনা সীমান্তের এপারে এসে এমন তুমুল, দুঃসাহসিক কান্ড বাধিয়ে বসেছে!

দেওয়াল ঘড়িতে সুরেলা আওয়াজ করে দু'টো বাজল। চকিত হয়ে উঠল বিনু। যুগল সম্পর্কে আরও কত কী যে জানতে ইচ্ছা করছিল, কত অফুরান কৌতূহল যে সে উসকে দিয়েছে! কিন্তু এখন আর হাতে সময় নেই, যথেষ্ট দেরি হয়ে গেছে। উঠে পড়ার আগে সেই পুরনো প্রশ্নটা একটু ঘুরিয়ে ফের করল, 'তোমাদের সেই জবরদখল জায়গাটা কি খুব কাছে?'

যুগল মাথা ঝাঁকায়, 'না ছুটোবাবু। মেলা (অনেক) দূরে। আগরপাড়ার নাম নি শুনছেন?'

বিনু ভাবতে চেষ্টা করে। নামটা অজানা। বলল, 'না। কোথায় সেটা?'

যুগল বুঝিয়ে দিল, 'শিয়ালদা থিকা রেলে কইরা যাইতে হয়। ইস্টিশানে লাইমা খাড়াখাড়ি মাইল দুই পুব দিকে হাটলে আমাগো জাগাখান (জায়গাটা)। নাম হইল মুকুন্দপুর।'

বিনু অবাক, 'অত দূরে থাকো! ছোটদিদের এই বাড়ি চিনলে কী করে?'

এই প্রশ্নটার জবাব দেয় হিরণ। ক্যাম্পবেল হাসপাতালে কিছুদিন আগে তার এক কলিগ ভীষণ অসুস্থ হয়ে ভর্তি হয়েছিল। প্রায়ই সে ভিজিটিং আওয়ার্সে সহকর্মীটিকে দেখতে যেত। হাসপাতালের গেটের কাছে আচমকা যুগলের সঙ্গে দেখা। পায়ের চোট নিয়ে ক'দিন ধরেই সে ক্যাম্পবেলে আসছে, ডাক্তার নার্স ঝাড়ুদার থেকে ওয়ার্ড বয় পর্যন্ত সবার হাতে পায়ে ধরছে, কাকুতি মিনতি করছে, কিন্তু কেউ পাত্তা দিচ্ছে না। এদিকে ক্ষতস্থানটা পেকে দুনিয়ে উঠেছে। পা ফুলে তিন গুণ। যন্ত্রণায়, টাটানিতে প্রাণ বেরিয়ে যাবার জোগাড়।

ডাকুরিয়া লেকের ধারে মিলিটারি হাসপাতালে হিরণের এক বন্ধু ডাক্তার। সে যুগলকে তার কাছে নিয়ে আসে। বন্ধুটি খুব যত্ন করে যুগলের চিকিৎসা শুরু করে। ফি বেস্পতিবার মুকুন্দপুর থেকে এসে পা দেখিয়ে ড্রেস করায় যুগল। হিরণদের ঠিকানা আগেই জেনে নিয়েছিল। ড্রেসিংয়ের পর

সোজা এখানে চলে আসে। সারাটা দুপুর কাটিয়ে বেলা পড়লে ফিরে যায়।

যুগল বলল, 'এইবার বোঝলেন তো ক্যামন কইরা এই বাড়ির দিশা পাইছি। ছুটো জামাইবাবুর লগে হেইদিন কেমবেলে (ক্যাম্পবেল) দেখা না হইলে নিয্যস (নিশ্চয়ই) মইরা যাইতাম।' তার গলার স্বর ভারী হয়ে ওঠে।

ক্ষণিক নীরবতা।

তারপর যুগল জিজ্ঞেস করে, 'অহন ছুটোদিদির বাড়িতেই তো থাকবেন?'

বিনু বলে, 'কিছুদিন তো আছিই। তারপর দেখা যাক—' তার মাথায় অবনীমোহনের চিন্তাটা ঘুরে গেল। তীর্থস্থান থেকে ফিরে এলে ঝিনুককে নিয়ে তাঁর কাছে চলে যাবে সে। যুগলকে আপাতত বাবার কথাটা বলল না।

যুগল উৎসাহের সুরে বলে, 'একদিন আপনেরে আমাগো মুকুন্দপুরে লইয়া যামু। যাইবেন তো ছুটোবাবু?'

যুগলদের দখল-করা ভূখন্ডটি দেখার জন্য ভীষণ আগ্রহ বোধ করছিল বিনু। বলল, 'নিশ্চয়ই যাব।'

'হেইহানে গ্যালে চিনাজানা মেলা মাইনষের লগে দেখা হইব। আমাগো রাইজদারই দশ ঘর পাইবেন। হেয়া (তা) ছাড়া, রসুইনা তাজপুর গিরিগুঞ্জ ইনামগুঞ্জের মানুষও আছে।'

'এরা কারা? কী নাম?'

যুগল রহস্য করে বলে, 'অহন কিচ্ছু কমু না। মুকুন্দপুরে গ্যালে নিজের চৌখে দেখতে পাইবেন।'

বিনু হাসল। এই নিয়ে আর পীড়াপীড়ি করল না।

যুগল এবার বলে, 'আমিই খালি ব্যাজর ব্যাজর কইরা যাইতে আছি। আপনের কথা কিছুই তো শুনা হইল না। দ্যাশ থিকা একাই নি আইছেন? নিকি রাইজদার আরও কেও কেও লগে আছিল?'

খানিক দ্বিধা হল বিনুর। ঝিনুকের কথা বলা কি ঠিক হবে? তার সেই খবরটা কি যুগল পেয়ে গেছে? সুধাদের বাড়ি যখন তার নিয়মিত যাতায়াত, পেলেও পেতে পারে। যদি নাও পায়, বিশ্বব্রহ্মান্ডের সবাই যখন জেনে গেছে, তখন বাড়তি একজন জানলে সর্বনাশের মাত্রা নতুন করে কতটা আর বাড়বে?

ঝিনুকের লাঞ্ছনার জন্য বিনু সর্বক্ষণ কুঁকড়ে থাকে। সেটা গোপন রাখতে তার অবিরত প্রয়াস। সহসা বিনুর মনে হয়, এসবের কি প্রয়োজন আছে? তার চেয়ে সারা পৃথিবীর মুখোমুখি দাঁড়ানো দরকার। নিজেকে শক্ত করে নিল সে, 'ঝিনুক আমার সঙ্গে এসেছে।'

'কই ঝিনুক বইনে? তেনারে লইয়া আসেন। কত বচ্ছর দেখি নাই—' যুগলের রুক্ষ মুখ ঝলমলিয়ে ওঠে।

বিনু বলে, 'ঝিনুক এখানে নেই। কাল বড়দির বাড়ি এসেছিলাম, সেখানেই আছে।'

যুগলের কপাল কুঁচকে যায়, 'বড়দিদি আর বড় জামাইবাবু বড় ভালা। কিন্তুক দিদির শাউড়ির সাই (প্রচন্ড) দেমাক। রোখাচোখা। একবার ছুটোদিদির কাছ থিক... ঠিকানা লইয়া হেইহানে গ্যাছিলাম। রিফুজ বইলা বাড়ির ভিত্‌রে ঢুকতেই দিল না, দুয়ার থিকাই খেদাইয়া দিল। বড়দিদি আর বড় জামাইবাবু মুখ কালা কইরা খাড়ইয়া রইল।' সে বলতে থাকে, 'ঝিনুক বইনেরে উইহানে রাইখেন না। পোলাপান কাল থিকা তো দেখছি, জবর অভিমান—'

দুঃসংবাদটা যুগল পেয়েছে কিনা, সঠিক বোঝা গেল না। বিনু বলে 'আজই ওকে এখানে নিয়ে আসব।' বলতে বলতে সে উঠে পড়ে।

'খুব ভালা। পরের বিষ্যুদবার যহন আসুম, ঝিনুক বইনের লগে দেখা হইব।' যুগলের চোখে ফের আলোর ছটা।

আস্তে মাথা হেলিয়ে এগিয়ে যায় বিনু। তার পেছন পেছন সুধা হিরণ আর যুগল।

সুধা বলল, 'বেশি দেরি করিস না।'

বিনু বলে, 'না না, সন্ধের আগেই চলে আসব।'

যুগল বলল, 'আপনেগো পরের বিষ্যুদবারে কিন্তুম আমাগো মুকুন্দপুরে নিয়া যামু।'

বিনু উত্তর দিল না।

একতলার সদর দরজা পর্যন্ত এসে সুধা আর যুগল দাঁড়িয়ে পড়ে। হিরণ কিন্তু বিনুর সঙ্গ ছাড়ে না।

হিরণের উদ্দেশ্যটা আঁচ করে নিয়েছিল বিনু। কুণ্ঠিতভাবে বলে, 'আপনি কোথায় যাচ্ছেন?'

হিরণ হাসিমুখে বলে, 'চলই না—'

'জ্বর গায়ে আমার সঙ্গে যেতে হবে না। বাড়ি গিয়ে শুয়ে থাকুন।'

জবাব না দিয়ে পাশাপাশি হাঁটতে থাকে হিরণ। বাড়ি থেকে খানিকটা যাবার পর হঠাৎই একতাড়া নোট বার করে বিনুর পকেটে ঠেসে ঠেসে ভরতে থাকে।

বিনু চমকে ওঠে, 'না না, দেবেন না। আমার কাছে এখনও সাড়ে ছ শ'র বেশি টাকা আছে।'

'থাক। এটাও রাখো—'

'দরকার হলে পরে চেয়ে নেব।'

টাকাগুলো ফিরিয়ে দিতে যাচ্ছিল বিনু। তার হাত চেপে ধরে হিরণ। স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আস্তে আস্তে বলে, 'বড়রা কিছু দিলে না বলতে নেই।'

তার দৃষ্টিতে কত কীই না মেশানো! স্নেহ, আবেগ, চাপা ভর্ৎসনা। বিনুর আর আপত্তি করতে সাহস হয় না। মাথা নীচু করে সে হাঁটতে লাগল।

বড় রাস্তায় এসে বিনুকে ধর্মতলার ট্রামে তুলে দিল হিরণ।

ধর্মতলায় ট্রাম বদলে আনন্দদের বাড়ির কাছাকাছি এসে বিনু যখন নামল, হেমন্তের দিনটা বিকেলের দিকে ঢলতে শুরু করেছে। খানিক আগেও রোদে বেশ ঝাঁঝ ছিল। তপ্ত শহর দ্রুত জুড়িয়ে যাচ্ছে। ঝিরঝিরে হাওয়া এখনও তেমন ঠান্ডা হয় নি, তবু আরামে গা জুড়িয়ে যায়।

চারদিকে যথারীতি ভিড়। প্রচুর মানুষ। প্রচুর গাড়িঘোড়া। নানা ধরনের মিশ্র আওয়াজ। কোনও দিকে দৃকপাত না করে জোরে জোরে পা চালাচ্ছে বিনু। ঢের আগেই ফিরে আসতে পারত। আসা উচিতও ছিল। কিন্তু যুগলের সঙ্গে এত বছর বাদে দেখা। সহজে কি ছাড়ান পাওয়া যায়? কথায় কথায় কত দেরি হয়ে গেল!

ট্রাম স্টপেজ থেকে বাঁ দিকে একটা চওড়া রাস্তা চলে গেছে। সেটা ধরে মিনিট তিনেক হাঁটলেই আনন্দদের বাড়ি।

ভেতরে ঢুকতেই একতলায় ঝিনুকের ঘরের সামনে জটলাটা চোখে পড়ল। হেমনলিনী আনন্দ এবং আরও দু'তিনটি কাজের মেয়ে। দুলালী ধারে কাছে নেই। সবার চোখেমুখে দুশ্চিন্তার ছাপ। কিছুটা উদ্বেগ। আনেকখানি বিরক্তি।

কী হতে পারে? বিনুর বুকের ধকধকটা শতগুণ বেড়ে যায়।

তাকে দেখতে পেয়ে হেমনলিনী হাঁফ ছাড়লেন, মনে হল। এক নিশ্বাসে তাঁর হাজারটা প্রশ্ন। আনন্দর কাছে শুনেছেন, কী দরকারে বিনু একজনের সঙ্গে দেখা করতে গেছে। একটা, সোয়া একটায় ফিরে আসবে। এখন সাড়ে তিনটে বাজে। কোথায় গিয়েছিল সে? কার কাছে গিয়েছিল? এত দেরি হল কেন?

বোঝা গেল, আনন্দ এবং সুনীতি সুধাদের ব্যাপারটা গোপন রেখেছে। ভালই করেছে।

হেমনলিনীর ঝাঁক ঝাঁক প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে অযথা সময় নষ্ট। উঠে আসবে নানা অস্বস্তিকর প্রসঙ্গ। সব শুনলে তিনি আদৌ খুশি হবেন না।

উৎকণ্ঠায় দমাদ্দম হৃৎপিণ্ডে হাতুড়ির ঘা পড়ছে। বিনু এগিয়ে গিয়ে কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছে মাউইমা?'

ক্ষণেক আগে হেমনলিনী যা জানতে চাইছিলেন, এখন আর সে সব নিয়ে কৌতূহল নেই। বললেন,

pathagar.net

'তোমার দেরি দেখে সেই দেড়টা থেকে ঝিনুক পাগলের মতো কেঁদে চলেছে। বিছানা থেকে নামছে না। কিছু মুখে তুলছে না। আমরা বাড়িসুদ্ধু সবাই কত করে বলছি, শুনছেই না। তুমি একটু বোঝাও বাবা।'

বিনু বলল, 'আমি দেখছি।'

'অনেকক্ষণ ঠায় দাঁড়িয়ে আছি। পা ধরে গেছে। এখন যাই?'

'আসুন—'

দরজার বাইরে ঝিনুকের ছোঁয়া বাঁচিয়ে কর্তব্য পালন করছিলেন হেমনলিনী। দায়িত্ব হস্তান্তর করে তিনি চলে গেলেন। যে কাজের মেয়েগুলো দূরে দাঁড়িয়ে ছিল, ধমকে তাদের তাড়ালেন। শুধু আনন্দই দরজার মুখে দাঁড়িয়ে রইল।

বিনু ঘরের ভেতর চলে আসে। আনন্দও। দুই হাঁটুর ফাঁকে মাথা গুঁজে ঝিনুক খাটে বসে আছে। তার পাশে সুনীতি। ম্লান মুখে, নিঃশব্দে ঝিনুকের মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে।

নিবিড় খোলা চুল কাঁধের ওপর দিয়ে সামনে ছড়িয়ে পড়েছে। পিঠ কেঁপে কেঁপে উঠছে ঝিনুকের। অবিরল কান্নার দমকে। অবিকল সকাল বেলার সেই দৃশ্য।

বিনু নীচু গলায় ডাকল, 'ঝিনুক—'

সাড়া নেই। কেঁদেই চলেছে মেয়েটা।

আরও বারকয়েক ডাকাডাকির পর মুখ তোলে ঝিনুক। চোখ রক্তের ডেলা।

কান্নাটা লহমায় উতরোল হয়ে ওঠে। গলা চিরে চিরে ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে আসে অপার্থিব কোনও ক্রন্দনের ধ্বনি। করুণ। কাতর। একটানা। তারই মধ্যে জড়িয়ে জড়িয়ে ঝিনুক বলে, 'দেড়টায় আসবে বলছিলে। কেন তিনটে বাজিয়ে ফিরলে?'

বিনু নরম গলায় বলল, 'শহরের আরেক মাথায় গিয়েছিলাম। এখান থেকে অনেক দূর। ট্রামে বাসে যেতে হয়। আগে থেকে কি বোঝা যায়, সেখানে কতক্ষণ লাগবে? ভেবেছিলাম তাড়াতাড়ি ফিরতে পারব। কথা বলতে বলতে দেরি হয়ে গেল।'

'আমার ভীষণ ভয় করছিল।'

'বড়দি আছে, আনন্দদা আছে। কিসের ভয়?'

জবাব নেই।

ঝিনুক ধীরে ধীরে শান্ত হচ্ছে। কান্নাটা ক্রমশ স্তিমিত হয়ে আসে।

বিনু জিজ্ঞেস করে, 'সবাই এত করে বলেছে, খাও নি কেন?'

ঝিনুক সজল চোখে তাকায়, 'তুমি ফিরছিলে না, তাই—'

'কোথাও গিয়ে যদি আটকে যাই, তুমি না খেয়ে এমন কান্নাকাটি করবে? কোনও মানে হয়? জানো, তোমার জন্যে এখনও এ বাড়ির কারোর খাওয়া হয় নি।'

ঝিনুক লজ্জা পেয়ে মুখ নামায়। হয়তো তার মনে হয়, নিজেকে নিয়েই সে বড় বেশি উতলা হয়ে পড়েছিল। অন্যদের কথা একবারও ভাবে নি।

বিনু বলল, 'যাও, বাথরুমে গিয়ে চোখেমুখে জল দিয়ে এস।' সকালের জলখাবারের মতো এ ঘরেই ঝিনুকের ভাত পাঠিয়ে দিতে বলল সুনীতিকে।

সুনীতি খাট থেকে নেমে বেরিয়ে গেল। ঝিনুক গেল বাথরুমে।

খানিক পরে খেতে খেতে ঝিনুক মনে করিয়ে দেয়, 'আমরা কিন্তু আজই এখান থেকে চলে যাব—'

বিনু বলে, 'সেই ব্যবস্থাই তো করতে গিয়েছিলাম। খেয়ে কিছুক্ষণ জিরিয়ে নাও। সন্ধের আগে বেরিয়ে পড়ব।'

বিনু যখন কথা দিয়েছে, অগাধ স্বস্তি। সমস্ত দুর্ভাবনার অবসান ঝিনুকের। কোথায় নিয়ে যাওয়া হবে, একবারও জানতে চাইল না।

বিনু ঝিনুকের দিকে তাকিয়ে ছিল। তার ওপর কী গভীর বিশ্বাস মেয়েটার। কী অসীম নির্ভরতা। বুকের ভেতর পুরনো মায়া নতুন করে উথলাতে থাকে।

ঝিনুকের খাওয়া হলে সুনীতি ঝিনু আর আনন্দকে খাওয়ার ঘরে নিয়ে গেল। এ বাড়িতে চিরকালের প্রথা, পুরুষেরা আগে খাবে, তারপর মেয়েরা। সবার শেষে কাজের লোকজন।

আনন্দর ভাই দীপক সাড়ে ন'টায় অফিসে চলে গেছে। পুরুষ বলতে আপাতত দু'জন। আনন্দ আর ঝিনু। ফুলতোলা আসন পেতে তাদের খেতে বসিয়ে দিল সুনীতি।

রান্নার ঠাকুর মাঝে মাঝে এসে দরকারমতো ভাত ডাল তরকারি মাছ মাংসটাংস দিয়ে যাচ্ছে। কত যে বাটি ঝকঝকে প্রকাণ্ড কাঁসার থালার চারপাশে!

টালিগঞ্জ থেকে আসার সময় এক গাদা লুচিমিষ্টি খাইয়ে দিয়েছিল সুধা। গলা পর্যন্ত ঠাসা। অবেলায় ভাত খেলে সহ্য হয় না ঝিনুর, সারা শরীর ঢিস ঢিস করতে থাকে। কাল মাঝরাতে আচমকা এসে পড়ায় সেভাবে খাওয়ানো যায় নি। তাই আজ রান্নাবান্নার বিপুল আয়োজন। শুধু তাদেরই জন্য। না বললে সুনীতি ছাড়বে না, ভীষণ কষ্ট পাবে। হেমনলিনীর কানে গেলে ছুটে আসবেন। আপ্যায়নের এতটুকু ত্রুটি হতে দেবেন না। ঝিনু খুঁটে খুঁটে একটু আধটু মুখে তুলতে লাগল।

হেমনলিনীদের সামনে কিছুই জিজ্ঞেস করা যায় নি। এমনকি ঝিনুক যখন তার ঘরে একা ছিল তখনও নয়। সুধাদের সঙ্গে কী কথাবার্তা হল, না জানা পর্যন্ত অন্যের সামনে মুখ খোলা ঠিক নয়। ভীষণ কৌতূহল হচ্ছিল সুনীতি আর আনন্দর। সেই সঙ্গে যথেষ্ট উৎকণ্ঠাও।

রাধুনি ঠাকুর রান্নাঘরে ফিরে গেছে। না ডাকলে আপাতত সে আসবে না। সতর্ক চোখে খাওয়ার ঘরের বাইরেটা এক লহমা দেখে নিয়ে সুনীতি ভাইয়ের দিকে ফিরে খুব নীচু গলায় জিজ্ঞেস করল, 'ওখানে কী হল রে? হিরণের সঙ্গে দেখা হয়েছে?'

আস্তে মাথা নাড়ে বিনু, 'হয়েছে।'

'কী বললে ওরা? রাজি?'

'হ্যাঁ।'

এত সংক্ষিপ্ত উত্তরে তুষ্ট নয় সুনীতি। সবিস্তার বর্ণনা চায় সে। বলল, 'কী কী কথা হল বলবি তো।'

সেই সাড়ে ন'টায় বেরিয়েছে। হাতিবাগান বাজার ঘুরে টালিগঞ্জ পর্যন্ত ছোটা, ফিরে আসা। সমস্ত দিন প্রায় দৌড়ের মধ্যেই কেটেছে। সারা শরীর জুড়ে অবসাদ। ক্লান্তি। খানিক পরে ফের বেরুতে হবে। কথা বলার মতো যথেষ্ট উদ্যম বা শক্তি তেমন আর অবশিষ্ট নেই। তবু সব জানাতে হল।

নতমুখে ম্রিয়মাণ বসে থাকে সুনীতি। আনন্দর খাওয়া থেমে গিয়েছিল। সেও নিশ্চুপ। অনেকক্ষণ পর বিষাদমাখা গলায় সুনীতি বলল, 'আমরা তো পারলাম না। সুধাদের কাছে গিয়েই থাক।'

সুনীতিরা কতটা দুঃখ পেয়েছে, কী নিদারুণ লজ্জা, আবার তা টের পাওয়া যাচ্ছে। গুমোট, ভারী আবহাওয়া হালকা করার জন্য কণ্ঠস্বরে উত্তেজনা মিশিয়ে বিনু বলল, 'আজ হিরণদাদের বাড়িতে কার সঙ্গে দেখা হয়েছে জানিস বড়দি?'

সুনীতি জিজ্ঞেস করল, 'কার সঙ্গে?'

'বল না—'

'কী করে বলব? আমরা কি ওখানে ছিলাম? না এখান থেকে সুধাদের বাড়ির ভেতর পর্যন্ত দেখা যায়?'

ঝিনু বলল, 'আমাদের সেই রাজদিয়ার যুগল এসেছিল। কত বছর পর দেখা—'

সুনীতি নীচু গলায় বলল, 'শুনেছি, যুগল সুধাদের বাড়ি মাঝে মাঝে আসে।'

'ওরা মুকুন্দপুর বলে একটা জায়গায় ফাঁকা জমি দখল করে বাড়িঘর তুলেছে। এই নিয়ে জমি-মালিকের গুন্ডাদের সঙ্গে রোজ হাঙ্গামা লেগে আছে। সেই সব বলছিল।'

'জানি। আমাদের এখানেও একদিন যুগল এসেছিল। কিন্তু—'

সুনীতি হঠাৎ চুপ করে গেল। তার মুখে মলিন ছায়া পড়েছে।

দিদিকে লক্ষ করছিল ঝিনু। সুধাদের বাড়িতে যুগলের সেই কথাগুলো মনে পড়ে গেল। হেমনলিনী তাকে বাড়ির ভেতর ঢুকতে দেন নি, দরজা থেকেই পোকামাকড়ের মতো হাঁকিয়ে দিয়েছেন। যুগলের গলার মধ্যে তীব্র অনুযোগ ছিল। ছিল প্রবল আক্ষেপ। হতাশা। রাগ। হেমনলিনীর রূঢ় আচরণের

pathagar.net

কথা ভেবেই হয়তো থেমে গেছে সুনীতি। যুগল সুধাদের কাছে আসে, অথচ এ বাড়ির দরজা তার কাছে বন্ধ, এটাই সুনীতিকে নতুন করে পীড়া দিচ্ছে। যুগল আর কখনও আসবে না, বিনুরাও চলে যাবে। প্রিয়জনদের সঙ্গে সম্পর্কের সুতোগুলো একে একে ছিঁড়ে যাচ্ছে।

বিনু ভাবে, তাদের এ বাড়িতে থাকতে দেওয়া গেল না, তাই সুনীতির মন ভীষণ খারাপ। তার ওপর যুগলের প্রসঙ্গটা না তুললেই ভাল হত।

একসময় নিয়মরক্ষার খাওয়া চুকিয়ে উঠে পড়ল বিনু। সঙ্গে আনন্দও। এ ঘরেরই এক কোণে হাতমুখ ধোয়ার ব্যবস্থা। জলের কল, বেসিন। আঁচানো হলে সুনীতি বলল, 'তোর আনন্দদার সঙ্গে ওপরে যা। ঘন্টাখানেক ঘুমিয়ে নে। আমি পরে আসছি।'

দোতলায় উঠে দক্ষিণের সেই ঘরখানার দিকে যেতে যেতে বিনু বলল, 'আনন্দদা, আমরা বেশি দেরি করব না। পাঁচটা, সোয়া পাঁচটায় বেরিয়ে পড়ব। ঘোড়ার গাড়ি কিভাবে পাওয়া যাবে?'

আনন্দ বলে, 'এ নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না। যতীনকে দিয়ে ডাকিয়ে আনব।' ঘরের দরজা পর্যন্ত এল সে। ভেতরে ঢুকল না। 'যাও, শুয়ে পড়। আমি থাকলে তোমার বিশ্রাম হবে না।'

আনন্দ চলে গেলে ঘরে এসে বিছানায় শরীর ঢেলে দেয় বিনু। কিন্তু ঘুম আসে না।

বাইরে হেমন্তের বিকেল নিস্তেজ হয়ে আসছে। জানালা দিয়ে আকাশের যে আয়তক্ষেত্র চোখে পড়ে সেখানে মহাশূন্যে ক'টা চিল অলস ডানায় ভেসে বেড়াচ্ছে। রোদে দুপুরের সেই ঝলমলে ভাবটা নেই। যতদূর নজর যায়, হালকা কালচে ছায়া দ্রুত ছড়িয়ে যাচ্ছে।

মস্তিষ্কের গোপন কুঠুরি থেকে সেই চিন্তাটা ফের বেরিয়ে আসে। আপাতত কয়েকটা দিন সে চাপমুক্ত। ঝিনুককে নিয়ে সুধাদের বাড়িতে অন্তত লজ্জায়, গ্লানিতে কুঁকড়ে থাকতে হবে না।

কিন্তু এ তো সাময়িক বিরতি। রুদ্ধশ্বাসে ছুটতে ছুটতে ফুসফুসে বাতাস টেনে নেবার সামান্য অবকাশ। অনন্ত দুর্ভাবনার চিরতরে অবসান তাতে ঘটবে না।

সুধাদের বাড়িতে ক'দিন আর থাকতে পারবে? এক সপ্তাহ, দু'সপ্তাহ। তারপরও রয়েছে শতসহস্র দিন। পারাপারহীন, দীর্ঘ ভবিষ্যৎ কোথায় কতদূরে গিয়ে ঠেকেছে, কে জানে। ঝিনুকের মতো একটি ধর্ষিত মেয়েকে নিয়ে কিভাবে বাকি জীবন কাটবে, ভাবতে ভরসা হয় না বিনুর। মাঝে মাঝে বেপরোয়া হয়ে উঠতে ইচ্ছা করে। যা ঘটার ঘটুক, যে কোনও পরিস্থিতির মুখোমুখি বুক চিতিয়ে দাঁড়াবে। কাউকে তোয়াক্কা করবে না। কিন্তু এই পর্যন্তই। পরক্ষণে তার প্রতিজ্ঞা, তার আত্মবিশ্বাসে চিড় ধরে যায়। সামনে হাজারটা বাধা। কত রকম প্রতিবন্ধকতা মাথা উঁচিয়ে আছে। সে সব পেরিয়ে যাওয়া কী যে কঠিন!

হঠাৎ সূক্ষ্মভাবে একটা আক্ষেপ বিনুকে ভেতর থেকে ঝাঁকানি দিতে থাকে। ঝিনুককে পাকিস্তান থেকে না আনলেই বোধহয় ভাল হত। একা, ঝাড়া হাত-পায়ে এলে তার কোনও সমস্যাই থাকত না। জীবন হত ভারশূন্য, মুক্ত। সুধা সুনীতি বা অবনীমোহনের কাছে থেকে ধীরেসুস্থে নিজের ভবিষ্যৎ সে তৈরি করে নিতে পারত।

ভাবনার বৃত্তটা পূর্ণ হবার আগেই চাবুকের ঘা পড়ে মুখের ওপর। একের পর এক। অবিরাম।

এ কী ভাবছিল সে! যে মেয়েটা সেই কোন ছেলেবেলা থেকে তার সঙ্গে লক্ষ পাকে জড়িয়ে আছে, মিশে আছে তার শ্বাসবায়ুতে, তাকে ফেলে আসার চিন্তা কেমন করে তার মাথায় এল? নিজেকে ধিক্কার দেয় বিনু। আত্মগ্লানিতে মন ভরে ওঠে।

আচমকা কার কলকলানি কানে ভেসে আসে। কোনও মেয়ের কণ্ঠস্বর। গলাটা চেনা চেনা। তবে সুনীতি নয়, মাধুরী নয়। হেমনলিনীও নন। দুলালী বা বাড়ির অন্য কাজের মেয়েও না। কাজের মেয়েদের সাধ্য কী, এমন হইচই বাধায়।

কয়েক জোড়া পায়ের শব্দ সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে আসছে। সারা বাড়ি এখন মুখর।

একাই কথা বলছে মেয়েটি। অবিরল। গলার স্বর সতেজ, সুরেলা, তার সঙ্গে ঝংকার মেশানো। মনে হয় কোনও তরুণী। তার সঙ্গীরা মৃদু গলায় কী জবাব দিচ্ছে।

কলধ্বনি এবং পায়ের আওয়াজ অনেক কাছে চলে এসেছে। এবার ডাকটা শোনা গেল, 'বিনুদা — বিনুদা —'

pathagar.net

ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসে বিনু। দরজার ঠিক বাইরে দাঁড়িয়ে আছে সুনীতি মাধুরী এবং ঝুমা।

আদলটা একই রয়েছে। তবু কত বদলে গেছে ঝুমা। সে এখন পরমাশ্চর্য যুবতী। ভরাট, লম্বাটে মুখ। সুছাঁদ নাক। ডানা-মেলা সরু ভুরু। মসৃণ, স্বর্ণাভ ত্বক। জোড়া বেলের মতো পুষ্ট বুক। ঘন চুল একবেণী করে পিঠের ওপর ঝোলানো। সুগোল হাত সটান কাঁধ থেকে নেমে এসেছে। পেছন দিকটা অনেক ভারী হয়েছে। দু'চোখে কী এক গাঢ় মাদকতা। পরনে সিল্কের শাড়ি আর ব্লাউজ। বাঁ হাতে সোনার ব্যান্ডে ছোট্ট ঘড়ি, ডান হাতে রুলি। গলায় লকেটওলা হালকা সোনার চেন। সর্বাঙ্গ জুড়ে যৌবনের ইন্দ্রজাল। এমন নারী সেকালে জন্মালে তাকে নিয়ে রাজারাজড়াদের মধ্যে ধুন্ধুমার বেধে যেত। কিংবা দশ দিগন্ত তোলপাড় করে বসত স্বয়ম্বর সভা।

ঝুমার কাঁধ থেকে একটা নকশা-করা চামড়ার ব্যাগ ঝুলছে। বাইরে থেকে মনে হয়, বইখাতায় বোঝাই।

চোখের পাতা পড়ছিল না বিনুর। সারা শরীরে শিহরন খেলে যাচ্ছে। পা থেকে মাথা অব্দি তীব্র তড়িৎস্পর্শে কেঁপে কেঁপে উঠছে যেন।

সেই যুদ্ধের সময় রাজদিয়ায় এক বিজন দুপুরে কিশোরী ঝুমা তার ভেজা ভেজা রক্তাভ ঠোঁট দিয়ে বিনুর ঠোঁট শুষে নিয়েছিল। একটি চুম্বন নরনারীর সম্পর্কের অপার রহস্যের প্রথম দরজা বিনুর সামনে খুলে দিয়েছিল। শিরাস্নায়ু সেদিন অবশ হয়ে গেছে। মাথা ঝিমঝিম। কিন্তু তারই মধ্যে টের পাচ্ছিল, বুকের ভেতর ভরা বর্ষার পদ্মা আর মেঘনা যেন সমস্ত কিছু ভেঙে চুরে উথালপাতাল করে দিচ্ছে।

যুদ্ধ থামলে ঝুমা আনন্দদের সঙ্গে কলকাতায় চলে এসেছিল। সুনীতির বউ-ভাতে তার সঙ্গে শেষ দেখা। তারপরও মাঝে মাঝে সে চিঠি লিখত। বিনুও উত্তর দিয়েছে। স্বাভাবিক নিয়মেই একদিন চিঠি লেখালিখি বন্ধ হয়েছে। চোখের আড়াল হলে অনেক কিছুই তো হারিয়ে যায়।

সেই যে ঝুমার সঙ্গে যোগাযোগের সুতোটা ছিঁড়ে গেল তারপর কত কী-ই না ঘটে গেছে। দাঙ্গা। আগুন। ধর্ষণ। নারীহরণ। ব্যাপক হত্যা। দেশভাগ। সীমান্ত পেরিয়ে লক্ষ লক্ষ শরণার্থীর এপারে চলে আসা।

অগ্নিগর্ভ সময়ের উলটোপালটা হাওয়া ঝুমাকে অনেক দূরে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু কে জানত, তার বুকের ভেতর কোনও অদৃশ্য প্রান্তে পদ্মা মেঘনা হয়ে লুকিয়ে ছিল মেয়েটা। সঙ্গোপনে। তাকে দেখামাত্র দুই নদী বান ডাকিয়ে পারকূল ভাঙতে ভাঙতে বেরিয়ে এসেছে।

ঝিনুকও যথেষ্ট সুন্দরী। তরুণী। ঝুমারই বয়সী। ঢাকা থেকে উদ্ধার করে আনার পর পাগলামির ঘোরে দু'হাতে মাঝে মাঝেই বিনুকে আঁকড়ে ধরত। রাজদিয়া থেকে বর্ডার পর্যন্ত দু'টো দিন তাকে বুকের ভেতর সাপটে নিয়ে আসতে হয়েছে। ঝিনুকের কাঁধ গাল ঠোঁট স্তন পেট উরু তার গায়ে লেপটে থেকেছে। কখনও মনে হয় নি, রক্তে আগুনের ঝিলিক হেনে বিদ্যুৎ খেলে যাচ্ছে। অথচ ঝুমাকে দেখে অস্থির অস্থির লাগছে কেন? কিশোর বয়সের সেই প্রথম চুমুটির তীব্র মধুর অনুভূতি এখনও বুঝিবা তার ঠোঁটে মাখানো রয়েছে।

ঝুমার দু'চোখ থেকে খুশি আর উত্তেজনা উপচে পড়ছিল। গলার স্বর উঁচুতে তুলে বলে, 'কী দেখছ অমন করে? চিনতে পারছ না? আমি ঝুমা—'

নেশাগ্রস্ত, আচ্ছন্ন ভাবটা কেটে যায় বিনুর। লজ্জা পেয়ে বলল, 'চিনব না কেন? নিশ্চয়ই চিনেছি।'

ঝুমা বলে, 'দরজার বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখবে নাকি?'

বিব্রত বিনু ভীষণ ব্যস্ত হয়ে পড়ে, 'আরে না না। এস—'

ঝুমা ঘরে ঢুকে বিনুর খাটের একধারে ঝুপ করে বসে পড়ে। কাঁধের ব্যাগটা নামিয়ে পাশে রাখে।

সুনীতি আর মাধুরীও ঝুমার সঙ্গে ভেতরে এসেছিল। দু'টো চেয়ার টেনে তারাও কাছাকাছি বসে।

ঝুমা বলছিল, 'আজ সকালে খবর পেলাম তুমি পাকিস্তান থেকে চলে এসেছ। কী ভাল যে লাগছে। ওবেলাই দেখা করতে আসতাম। সাড়ে দশটা থেকে দু'টো অনার্স ক্লাস ছিল। তারপর পর পর পাসের। ফাঁকি মারার উপায় নেই। তাই ছুটি হতেই সোজা চলে এসেছি।'

বিনু জিজ্ঞেস করে, 'আমার খবর কে দিল?'

'দিদা কী দরকারে যতীনদাকে মায়ের কাছে পাঠিয়েছিল। সে-ই বললে—'

ঝুমা হেমনলিনীর নাতনী, আনন্দর দিদির মেয়ে। বিনু বলল, 'কোন কলেজে পড়?'

'স্কটিশ চার্চ।'

'কিসে অনার্স?'

'হিস্ট্রি।'

'কোন ইয়ার চলছে?'

'ফার্স্ট ইয়ার।'

ঝিনুকের মুখ চকিতে বিনুর চোখের সামনে ভেসে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে মন ভারী হয়ে যায়। অল্প বয়সে মা-বাবার গৃহযুদ্ধের কারণে স্কুলে তিনটে বছর নষ্ট হয়েছিল ঝিনুকের। নইলে এতদিনে তারও বি.এ পড়ার কথা। ম্যাট্রিক পাস করার পর ঢাকায় সেই যে বিপর্যয়টা ঘটে গেল, তারপর ওর পড়াশোনার কথা কেউ আর ভাবে নি। ঝিনুক নিজেও না। ভাবার মতো মনের অবস্থা তখন কি ছিল? না, এখনও আছে?

ঝুমা বলল, 'কলকাতায় যখন চলে এসেছ, আমার সম্বন্ধে সব জানতে পারবে। হেমদাদু আর দুই দিদিমার কথা বল—'

কলকাতায় পৌঁছবার পর আত্মীয়পরিজন যার সঙ্গেই দেখা হচ্ছে, হেমনাথদের সম্পর্কে বলতে হচ্ছে। ঝুমাকেও না বলে পারা গেল না। তবে অনেক কাটছাঁট করে। সংক্ষেপে। বিশদ করে বলার মতো উদ্যম তার আর অবশিষ্ট নেই।

ঝুমার গোড়ার দিকের উন্মাদনা হঠাৎ ঝিমিয়ে আসে। ঝপ করে গলা নামিয়ে মলিন মুখে বলে, 'যতীনদা বলছিল, ঝিনুকও তোমার সঙ্গে এসেছে। একতলায় তাকে দেখেও এলাম। ভীষণ খারাপ লাগছিল। ওর সম্বন্ধে আগেই অনেক খবর কানে এসেছিল। অনেক কষ্ট—' শেষ না করে থেমে যায় সে।

কোন খবরের ইঙ্গিত ঝুমা দিয়েছে, বুঝতে বাকি থাকে না। এত বছর বাদে তাকে দেখে বিনুর স্নায়ুমন্ডলীতে যে ঝড় উঠেছিল, মুহূর্তে তা উধাও। সে উত্তর দিল না। ঘন বিষাদে ছেয়ে যায় মন।

দুঃখ, ক্লেশ, মানসিক যাতনা ইত্যাদি ব্যাপারগুলো নিয়ে বেশিক্ষণ নাড়াচাড়া করতে ইচ্ছা করে না ঝুমার। শ্বাস আটকে আসে। সে সবের বেড়াজাল কেটে বেরিয়ে আসার জন্য একেবারে অন্য প্রসঙ্গে চলে যায়, 'এখন তো তোমরা এখানেই থাকছ। আমাদের বাড়ি খুব কাছে। হেদুয়ার সুইমিং পুলের ওধারে। কবে যাবে বল—'

একটি যুবককে এমন অসঙ্কোচে আর কোনও মেয়ে কি নিজেদের বাড়ি যাবার কথা বলতে পারত? বিশ্বব্রহ্মান্ডে একমাত্র ঝুমার পক্ষে বুঝিবা কিছুই অসম্ভব নয়।

বিনু বলল, 'কবে যেতে পারব, জানি না।'

'মানে?'

'আমরা এখানে থাকছি না।'

ঝুমার বিশ্বাস হচ্ছিল না। আবার অবিশ্বাসও করতে পারছিল না। কয়েক পলক হতবাক তাকিয়ে থাকে সে। তারপর বলে, 'সত্যি?'

আস্তে মাথা নাড়ে বিনু। সুনীতির দিকে আঙুলে বাড়িয়ে বলে, 'তোমার এই মামীকেই জিজ্ঞেস কর না—'

ধরা গলায় সুনীতি জানায়, 'হ্যাঁ। ওরা চলে যাবে।'

ঝুমা বিনুকে জিজ্ঞেস করল, 'কবে যাচ্ছ?'

'আজই। একটু পরেই বেরুব।'

এ বাড়িটা যেন ঝুমার খাস সম্পত্তি। বিনুর সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারছিল না সে। বলল, 'সবে তো কাল এলে। আজই চলে যাবার কী হল? না না, এখন তোমাদের কোনওভাবেই যাওয়া হবে না। ক'দিন থেকে যাও।'

pathagar.net

বিনু চাপা গলায় বলে, 'থাকার উপায় নেই।'

ঝুমা অধীর হয়ে ওঠে, 'কেন নেই? তোমাকে কি কেউ তাড়িয়ে দিচ্ছে?'

'না।'

'তা হলে যাবার জন্যে খেপে উঠেছ কেন?'

বিনু চুপ। কী বলবে সে? এ বাড়িতে না থাকার মূল কারণটা আর যাকেই হোক, হেমনলিনীর মাতৃনীকে কোনওভাবেই জানানো সম্ভব নয়।

ঝুমা ত্বরিত পায়ে উঠে দাঁড়ায়, 'আনন্দমামা, দিদা সবাই বাড়িতে আছে। তাদের ডেকে আনছি। মামীরাও এখানে রয়েছে। কী করে তোমাদের যাওয়া হয় দেখছি—'

বিনু হতচকিত। ঝুমা যা মেয়ে, ত্রিভুবন কাঁপিয়ে তুমুল কিছু বাধিয়ে বসার অলৌকিক ক্ষমতা তার আছে। আনন্দদের ডেকে এনে তাদের এখানে রাখার জন্য যদি ঝুমা জেদ ধরে বসে, লজ্জায় মাথা কাটা যাবে। মুহূর্তে নিজেকে সামলে গম্ভীর মুখে বিনু বলে, 'বোসো।'

বিনুর স্বরে এমন এক ঋজুতা রয়েছে যা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। নীরবে বসে পড়ে ঝুমা। বিনু বাধা দেওয়ায় মনে ক্ষোভ জমছে। ফর্সা মুখে তা ফুটেও উঠছে। আসলে সে যা চায় সেটি হওয়া চাই। এবং তৎক্ষণাৎ। তার কোনও কাজে, কোনও আচরণে আপত্তি করা চলবে না। তার মর্জিমাফিক চলতে হবে সবাইকে। নতমস্তকে। ঝুমার কাছে এটাই জাগতিক নিয়ম। রাজদিয়ায় থাকতে এ সব লক্ষ করেছে বিনু। বড্ড বেশি অধিকার-বোধ মেয়েটার।

কিছুক্ষণ থুম হয়ে বসে থাকে ঝুমা। তারপর জিজ্ঞেস করে, 'তোমরা কোথায় যাবে? ভবানীপুরে তোমাদের সেই বাড়িতে?'

'না।'

'তবে?'

সুধাদের কাছে যাওয়ার ব্যাপারটা সুনীতি আর আনন্দ ছাড়া অন্য কেউ জানে না। আপাতত সেটা গোপন রাখতেই হবে। বিনু বলল, 'যাব এক জায়গায়। তুমি তাদের চেনো না।' হাজার গন্ডা জলাবদিহি এড়াবার জন্য মিথ্যেই বলতে হল।

হেমনলিনী ছুটতে ছুটতে ঘরে ঢুকলেন। চোখেমুখে শঙ্কা, উত্তেজনা, উদ্বেগ। শ্বাসটানা ত্রস্ত সুরে বিনুকে বললেন, 'তুমি একবার নীচে যাও বাবা। সন্ধ্যা এসে বললে, ঝিনুক ফের কান্নাকাটি শুরু করেছে। কাজের মেয়েরা সামলাতে পারছে না।' দুলালীকে বাদ দিয়ে সন্ধ্যাকে আজ ঝিনুকের দেখাশোনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

নতুন করে ঝিনুকের কান্নার হেতুটা মোটামুটি আঁচ করে নিল বিনু। লাফ দিয়ে খাট থেকে নেমে পড়ে সে। ঝুমারা সঙ্গে আসতে চেয়েছিল, হাতের ইশারায় তাদের থামিয়ে দৌড়ে বারান্দা পেরিয়ে সিঁড়ির দিকে চলে গেল। একতলায় ঝিনুকের ঘরে ঢুকতেই চোখে পড়ল, উতরোল কান্নায় খান খান হয়ে যাচ্ছে ঝিনুক। মুখটা বিকৃত। দু'চোখ থেকে অবিরল জলের ধারা বইছে।

সন্ধ্যা এবং আরও দু'টি কাজের মেয়ে শান্ত করতে চেষ্টা করছে, কিন্তু পার্থিব কোনও শব্দই কানে যাচ্ছে না ঝিনুকের। একেবারে বধির।

সন্ধ্যাদের চলে যেতে বলে ঘর ফাঁকা করল বিনু। ঝিনুকের পাশে বসে নরম গলায় বলল, 'আবার কী হল? শুধু শুধু কাঁদছ কেন?'

কান্নাজড়ানো, ভাঙাচোরা গলায় ঝিনুক বলল, 'শুধু শুধু? ওই মেয়েটা এসেছে না?'

যা অনুমান করা গিয়েছিল, হুবহু তা-ই। হুলটা হৃদয়ের কোন অন্তঃপুরে গিয়ে বিঁধেছে, টের পাওয়া যাচ্ছে। ঝুমার প্রতি ঝিনুকের হিংসেটা অনেক কালের পুরনো। রাজদিয়ায় থাকতেই সূত্রপাত। এত লাঞ্ছনা, এত বিপর্যয় ঘটে গেছে জীবনে, কিন্তু সেটা স্মৃতির গোপন কক্ষে লুকনোই ছিল। সব দেওয়াল ভেদ করে আবার বেরিয়ে এসেছে।

বিনু বলল, 'কী আশ্চর্য, এটা ওর মামাবাড়ি। আসবে না?'

'আসার আর সময় পেল না? আমরা চলে গেলেই তো আসতে পারত।'

'অবুঝের মতো কথা বলো না। নিজের মামাবাড়িতে কখন আসবে, কেন আসবে, সেটা সে বুঝবে।

তোমার আমার সেখানে কিছু করারও নেই, বলারও নেই। তা ছাড়া—'

'তা ছাড়া কী?'

'সে আসায় তোমার আমার কী অসুবিধে হয়েছে?'

কান্না থেমে গিয়েছিল ঝিনুকের। শ্লেষে তার গলা রন রন করে ওঠে, 'ও ও! আমার যা-ই হোক, তোমার সুবিধে তো ষোল আনার জায়গায় আঠার আনা। আমাকে ঝি'দের হাতে তুলে দিয়ে দোতলায় বসে ঝুমার সঙ্গে কত গল্প, কত হাসাহাসি! হা হা, হি হি—'

রাজদিয়া থেকে বেরুবার পর এই প্রথম একটু কঠোর হল বিনু, 'কী অদ্ভুত কথা! হা হা, হি হি, গল্প! এসব কী বলছ তুমি।'

ঝিনুক নিজের ঝোঁকেই বলে যায়, 'মনে করেছ, আমি নীচে আছি বলে কিছুই টের পাই নি। তুমি কী কর, না কর, সব বুঝতে পারি।'

বিনু হাল ছেড়ে দেয়। যে প্রতিজ্ঞা করেছে, যুক্তির ধার ধারবে না, তাকে বোঝাতে যাওয়া নেহাতই বৃথা। বলল, 'এতদিন পর ঝুমার সঙ্গে দেখা। পাকিস্তানের কথা জানতে চাইছিল, দাদু-দিদাদের কথা জিজ্ঞেস করছিল। সে সব বলছিলাম। একে কি গল্প করা বলে? হা হা, হিহি বলে? বড়দি, মাধুরীদি সামনেই বসে ছিল। বিশ্বাস না হলে তাদের জিজ্ঞেস করতে পার।'

ঝিনুকের মাথায় অবুঝপনা ভর করেই থাকে। বলে, 'কোনও সাক্ষীর দরকার নেই। আমাদের যাবার কী হল? এক মিনিটও আমি আর এখানে থাকব না।'

ঝুমাকে দেখে খ্যাপামিটা মাত্রাছাড়া হয়ে উঠেছে। আর বেশিক্ষণ এ বাড়িতে থাকলে ঝিনুক কী কান্ড যে বাধিয়ে বসবে, কে জানে। বিনু বলল, 'চোখমুখ ধুয়ে রেডি হয়ে নাও। আমি ওপর থেকে আসছি।'

ঝিনুক বলল, 'মোটেও দেরি করবে না।' কথায় স্পষ্ট ইঙ্গিত, তার চোখের আড়ালে বিনু ঝুমার সংস্পর্শে এক লহমাও থাকুক, আদৌ সে তা চায় না।

এতদিন ঝিনুক ছিল সদাত্রস্ত। আতঙ্ক লজ্জা সঙ্কোচ ছিল তার সর্বক্ষণের সঙ্গী। সে সবের সঙ্গে নতুন উপসর্গ যোগ হল—ঈর্ষা। জট ক্রমশ বাড়ছে। একই শহরে যখন ঝুমা রয়েছে, সেগুলো আরও বাড়বে। এই মেয়েকে কিভাবে সামলাবে বিনু?

দোতলার সেই দক্ষিণের ঘরে এসে আনন্দকে দেখতে পেল বিনু। হেমনলিনীরা তো ছিলেনই। সে যখন একতলায়, খুব সম্ভব সেই সময় আনন্দ এখানে এসেছে।

সবাই উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে। হেমনলিনী জিজ্ঞেস করলেন, 'ঝিনুক শান্ত হয়েছে?'

মাথা সামান্য হেলিয়ে দেয় বিনু, 'হ্যাঁ—'

হেমনলিনী এবার জানতে চাইলেন, 'কী হয়েছিল?'

আসল কারণ কোনওভাবেই বলা যাবে না। এমনকি, ইঙ্গিতেও নয়। বিষয়টা লঘু করার জন্য বিনু বলল, 'অনেকক্ষণ আমাকে দেখেনি, তাই অস্থির হয়ে পড়েছিল।'

হেমনলিনী ভবিষ্যদ্বাণীর সুরে বললেন, 'এই মেয়েকে নিয়ে তোমার অনেক ভোগান্তি আছে বিনু—'

'মানসিক দিক থেকে মেয়েটা ভীষণ ধাক্কা খেয়েছে। কলকাতায় কাউকেই চেনে না। বড়দিকেও রাজদিয়ায় অল্প বয়েসে দেখেছে। আমি বেশিক্ষণ কাছে না থাকলে ভীষণ ভয় পেয়ে যায়।'

হেমনলিনীর হয়তো আরও কিছু বলার ছিল। কী ভেবে বললেন না।

বিনুও অনেকক্ষণ চুপ করে থাকে। তারপর বলে, 'মাউইমা, আপনাকে একটা কথা বলার ছিল—'

হেমনলিনী সামান্য উৎসুক হলেন, 'কী কথা বাবা?'

'আমরা আজ এখান থেকে চলে যাব।'

খবরটা হেমনলিনী হয়তো আগেই পেয়েছেন। অবাক হবার ভান করে বললেন, 'সে কী!' একটি আধো-অপ্রকৃতিস্থ পূর্ণ যুবতীকে নিয়ে কোথায় যাবে বিনু, প্রায়-অচেনা এই শহরের কোন প্রান্তে, তা নিয়ে কিন্তু আগ্রহ দেখালেন না।

boiRboi.net

বেশ জোর দিয়ে বিনু বলল, 'হ্যাঁ মাউইমা—'

হেমনলিনী বললেন, 'আমি তো বলেছিলাম, তোমার বাবা যতদিন না ফিরে আসছেন, এখানেই থাকো।' তাঁরা কণ্ঠস্বরে আবেগ নেই। আন্তরিকতা নেই। কেমন যেমন শুষ্ক। নেহাত ভদ্রতার খাতিরে বলতে হয়, তাই বলা।

'না মাউইমা, আমাদের যেতেই হবে।'

নিতান্ত নিরুপায় হয়েই যেন হেমনলিনী বললেন, 'তা হলে আর কী করে আটকাব?'

মুখ দেখে বোঝার যো নেই। কিন্তু বিনু টের পায়, বড়দির এই শাশুড়িটি ভেতরে ভেতরে হাঁফ ছেড়ে বাঁচছেন। এখন তাঁর অপার স্বস্তি।

বিনু সুনীতির দিকে ফেরে, 'দিদি, ওবেলা আনন্দদা যে নতুন জামাকাপড়গুলো কিনে দিল—'

সুনীতি পাথরপ্রতিমা হয়ে বসে ছিল। শিথিল পায়ে উঠে দাঁড়ায়, 'সব গুছিয়ে রেখেছি। নিয়ে আসছি।' সে চলে যায়।

বিনু এবার আনন্দর দিকে তাকায়, 'আমাদের ঘোড়ার গাড়ির ব্যবস্থা করে দেবেন বলেছিলেন—'

'হ্যাঁ। যতীনকে পাঠাচ্ছি।' আনন্দও বেরিয়ে যায়।

ঘরের ভেতর অন্তহীন নৈঃশব্দ্য। যে ঝুমার মুখে সারাক্ষণ খই ফোটে, অন্য কাউকে মুখ খোলার সুযোগই দেয় না, তার কলকলানি পর্যন্ত থেমে গেছে।

দু'তিন মিনিট আগে পরে সুনীতি আর আনন্দ ফিরে এল। সুনীতির হাতে একটা চামড়ার বড় সুটকেস। বলল, 'এটার ভেতর তোদের ধুতি শাড়িটাড়ি আছে—'

আনন্দ জানায়, যতীন ঘোড়ার গাড়ি ডেকে এনেছে। রাস্তায় সেটা দাঁড়িয়ে আছে।

খাট থেকে নেমে হেমনলিনীকে প্রণাম করে বিনু বলল, 'চলি মাউইমা—' সুনীতির হাত থেকে সুটকেসটা নিতে যাচ্ছিল, আনন্দ নিতে দিল না। নিজের হাতেই ঝুলিয়ে নিল।

বিনু ঘরের বাইরে এসে বারান্দা ধরে সিঁড়ির দিকে এগোয়। তার পেছনে বাকি সবাই। নিষ্প্রাণ ক'টি পাথরের পুতুল তাকে অনুসরণ করছে।

এই বাড়িতে বিনুর শেষ আসা সুনীতির বউ-ভাতে। সারা বাড়ি জুড়ে সেদিন উৎসবের মাতন। অজস্র আলো শতধারায় ছড়িয়ে পড়ছিল। অবিরাম বাজছিল সানাই। কত যে ফুল! গোলাপ। রজনীগন্ধা। জুঁই। রুপোর পিচকিরিতে অতিথিদের গায়ে ছিটনো হচ্ছিল সুগন্ধি গোলাপজল। চারদিক মুখর। হাসি। আনন্দ। কলরব। কিশোরীরা তরুণীরা জলপ্রপাত হয়ে একবার উঠে যাচ্ছিল দোতলায়, যেখানে রানীর মতো সাজিয়ে ভেলভেটের সিংহাসনে বসিয়ে রাখা হয়েছে সুনীতিকে। পরক্ষণে নীচে নেমে সামনের লনের মস্ত শামিয়ানারা তলায়, সেখানে নিমন্ত্রিতরা হাসি-পরিহাসে মাতোয়ারা। আনন্দদের এই বাড়ি সেদিন এক স্বপ্নপুরী।

সেদিন কী আদরযত্ন বিনুদের! কত খাতির! হেমনলিনী মুহুর্মুহু খোঁজ নিচ্ছিলেন, আপ্যায়নে কোনও রকম ত্রুটি ঘটছে কিনা। বউ-ভাতের পর আরও ক'টা দিন থেকে যাবার জন্য কী সনির্বন্ধ অনুরোধ তাঁর। হেমনাথের হাত ধরে কত কাকুতি মিনতি।

আর আজ? ঝিনুককে সঙ্গে না নিয়ে এলে নিশ্চয়ই সব অন্যরকম হত। হেমনলিনী কিছুতেই তাকে এভাবে চলে যেতে দিতেন না। বিষাদময় আবহাওয়ায় এই নিরানন্দ বিদায় বিনুকে ভীষণ পীড়া দিচ্ছে কি? কোনও রকম আক্ষেপ? উত্তরটা সারাক্ষণ নিজের মধ্যেই প্রস্তুত থাকে। না, তিলমাত্রও না। প্রিয় নারীটিকে চূড়ান্ত ঝুঁকি নিয়ে হননকারীদের কাছ থেকে আড়াল করে করে এতদূরে নিয়ে এসেছে। তার জন্য যে কোনও কষ্টভোগ করতে সে তৈরি। যে কোনও পরিস্থিতির সামনে দাঁড়াতেও। ঝিনুকের জন্য বুকের ভেতরটা আবেগে, মায়ায় নতুন করে ফের উতরোল হয়ে ওঠে।

ঝিনুক শাড়ি ঠিকঠাক করে, চুল আঁচড়ে বসে ছিল। তাকে ডেকে নিয়ে এল সুনীতি। কোনও দিকে দৃকপাত না করে, কারও সঙ্গে একটি কথাও না বলে বিনুর পাশে পাশে হাঁটতে হাঁটতে রাস্তায় এসে গাড়িতে উঠে বসে। উলটো দিকের জানালার বাইরে মুখ ফিরিয়ে থাকে। বিনুও উঠে পড়ে।

আনন্দরা সঙ্গে এসেছিল। সে সুটকেসটা গাড়িতে তুলে দিয়ে কাঠের পলকা দরজা বন্ধ করে দেয়।

হেমনলিনী বললেন, 'সময় পেলেই চলে এস বিনু।' আমন্ত্রণটা শুধু বিনুকেই। মাত্র কয়েক হাত দূরে ঝিনুককে তিনি দেখতেই পাননি।

ঝুমা বুঝে উঠতে পারছিল না, এভাবে বিনুদের চলে যাবার কী অর্থ? কোথাও বুঝি একটা গোলমাল আছে। যেমনটা হওয়ার কথা তেমনটা ঠিক হচ্ছে না। সব কেমন অস্বাভাবিক। আত্মীয়স্বজন এলে খুশির হাওয়া বয়ে যাবার কথা। তা নয়, পরিবেশটা কেমন দম-চাপা, গুমোট গুমোট। চুলবুলে যে তরুণী সারাক্ষণ বাতাসে উড়তে থাকে, কলরোলে মুখর করে রাখে চতুর্দিক, আচমকা সে হতভম্ব হয়ে গেছে। ঈষৎ ভারী গলায় ঝুমা বলল, 'তোমার সঙ্গে আর দেখা হবে না বিনুদা?'

হেমনলিনী নাতনীর দিকে তাকিয়ে ভ্রূকুটি করলেন। তবে কিছু বললেন না।

ঝুমাকে দেখার পর যে তড়িৎপ্রবাহের সৃষ্টি হয়েছিল, পুরোপুরি তা স্তিমিত হয়ে যায় নি। অল্প হেসে বিনু বলল, 'একই শহরে থাকব। হয়তো কখনও দেখা হয়ে যাবে।'

গোল টুপি-পরা মুসলমান কোচোয়ান গাড়ির মাথায় চাবুক হাতে বসে ছিল। আনন্দ তাকে বলল, 'বাবুদের ঠিকমতো পৌঁছে দিও।'

'জি, সাব—' কোচোয়ান ঘাড় কাত করে।

ঘোড়ার গাড়ির বাহন অধৈর্য হয়ে পা ঠুকছিল। পিঠে চাবুকের ঘা পড়তে দৌড় শুরু করল।

হেমনলিনীর কাছে আগেই বিদায় নিয়েছিল বিনু। সামান্য হাত নেড়ে বাকিদের বলল, 'বড়দি আনন্দদা ঝুমা মাধুরীদি, আমরা চললাম—'

পিচের রাস্তায় অশ্বক্ষুরের ধ্বনি ক্রমশ দূরে সরে যেতে থাকে।

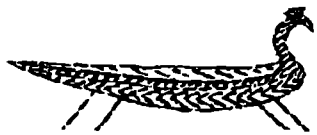

ট্রাম রাস্তা ধরলে অনেকখানি ঘুরপথ হয়। সময় লাগে ঢের বেশি। কোচোয়ান সেদিকটায় না গিয়ে সেন্ট্রাল অ্যাভেনিউ দিয়ে গাড়ি ছোটাচ্ছিল।

হেমন্তের ভরদুপুরে সূর্য যখন সোজা মাথার ওপর, রোদ থাকে তেজীয়ান। বেলা যত ঢলতে থাকে, তার গনগনে কী খাই কী খাই ভাবটা দ্রুত ঝিমিয়ে আসে।

এখন পড়ন্ত বেলায় সূর্যটাকে দেখা যাচ্ছে না। পশ্চিম দিকে কোথায় যেন নেমে গেছে। দু'ধারের উঁচু উঁচু বাড়িগুলোর মাথায় যে মরা মরা, হলদে সূর্যরশ্মিটুকু লেপটে আছে, সেটা যেন পা বাড়িয়েই রয়েছে। কিছুক্ষণের ভেতর উধাও হয়ে যাবে।

শহরের তাপাঙ্ক নামছে হু হু করে। বাতাসে মিশে যাচ্ছে সূক্ষ্ম হিমের রেণু।

মধ্যরাত থেকে ভোর, এই সময়টা বাদ দিলে কলকাতা মানেই কোলাহল। একটানা। নিরবচ্ছিন্ন। সমস্ত শহর জুড়ে একটা চড়া সুরের অর্কেস্ট্রা অবিরল ঝাঁপতালে বেজে যায়।

জানালার বাইরে অন্যমনস্কর মতো তাকিয়ে আছে বিনু। চারপাশে কত রকম শব্দ, কত যানবাহন, মানুষজন। সে সব আবছাভাবে বিনুকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছিল। স্পষ্ট করে কিছুই সে দেখতে বা শুনতে পাচ্ছিল না।

পাশ থেকে পরিচিত ডাক কানে আসে, 'এই—'

চমকে মুখ ফিরিয়ে তাকায় বিনু। কখন যেন ওধারের জানালা থেকে সরে এসে তার গা ঘেঁষে ঘন হয়ে বসেছে ঝিনুক।

বিনু জিজ্ঞেস করে, 'কিছু বলবে?'

'হুঁ।'

বিনু অপেক্ষা করে থাকে। তার চোখে চোখ স্থির করে ঝিনুক বলে, 'একটা ঠিক ঠিক জবাব দেবে?'

'কী?' বিনু সতর্ক হল।

'তখন ঝুমার সঙ্গে কি শুধু পাকিস্তান আর হেমদাদুদের গল্পই করেছিলে?'

'তোমাকে তো সবই বলেছি। তারপরও এমন অদ্ভুত প্রশ্ন।'

'এমনি। কৌতূহল।'

'কৌতূহল কি মেটে নি?'

'মিটল আর কই?'

ঝুমাকে দেখার পর থেকে অদৃশ্য একটা পোকা মাথায় ঢুকে গেছে ঝিনুকের। যার নাম সন্দেহ। যার নাম সংশয়। বিনু আঁচ করতে পারে, পোকাটা ক্রমাগত হুল ফোটাচ্ছে।

রাজদিয়ায় ক'বছর আগে তাকে নিয়ে দুই কিশোরীর মধ্যে এক অঘোষিত মহাযুদ্ধ শুরু হয়েছিল। কখনও প্রকাশ্যে। কখনও গোপনে। বিনুকে দখল করার জন্য কত অস্ত্রই না তারা শানিয়েছে। উদ্ভাবন করেছে নতুন নতুন রণকৌশল।

এক নির্জন দুপুরে ঝুমা অথৈ জলে তাকে নিয়ে শাপলা আর জলপদ্ম তুলতে গিয়েছিল। তারপর কাউফল পাড়তে গিয়ে গাছের ডাল ভেঙে জলে পড়ে যায়। কিন্তু ঝিনুকের চোখে ধুলো দেওয়া যায় নি। এই নিয়ে কম হুজ্জৎ করে নি মেয়েটা। বিনুকে নাকালের একশেষ করে ছেড়েছে।

একদিন রাত্রে বিনুকে নিয়ে দুঃসাহসী ঝুমা লুকিয়ে লুকিয়ে যুগলের সঙ্গে নদী পেরিয়ে সুজনগঞ্জের হাটে যাত্রা শুনতে যাবার নিখুঁত ছক কষে ফেলেছিল। কিন্তু প্রখর অনুমানশক্তি ঝিনুকের। বিনুর দিকে তাকালে লহমায় তার মনের যাবতীয় অন্ধিসন্ধির খোঁজ পায় সে। সেদিনও পেয়েছিল। নৌকোয় উঠতে গিয়ে বিনুদের চক্ষু চড়কগাছ। আগে থেকেই ছইয়ের তলায় বসে আছে ঝিনুক।

এতেই কি নিস্তার ছিল! স্কুল ছুটির পর, কিংবা কোনও কোনও দিন ক্লাস কামাই করে নিশি-পাওয়া মানুষের মতো নদীর ধারে ঝুমাদের বাড়ি চলে যেত বিনু। আনন্দদার ভাগনীর মধ্যে চুম্বকের মতো কিছু একটা ছিল। কী তীব্র তার আকর্ষণ! কতদিন বিনু ভেবেছে, যাবে না। কিন্তু প্রতিজ্ঞাটা বজায় রাখা যেত কি? স্কুলে যাবার পরই সেটা খান খান হয়ে যেত। নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলত বিনু। আর একটা অদৃশ্য আঁকশি টানতে টানতে তাকে ঝুমার কাছে নিয়ে যেত। ঝিনুকের আড়ালে লুকোচুরি খেলাটা চিরদিন চালিয়ে যাবে, সাধ্য কী। কিভাবে কিভাবে বাতাসে গন্ধ পেয়ে সেও স্কুল ছুটির পর ঝুমাদের বাড়ি হাজির হত। নিজে আগলে আগলে বিনুকে ফিরিয়ে আনত। এমনই কত ঘটনা।

ক'বছর বাদে স্থানকাল পুরোপুরি বদলে গেছে। সেদিনের দুই কিশোরী এখন পূর্ণ যুবতী। পূর্ব বাংলার এক নগণ্য শহর থেকে যুদ্ধক্ষেত্র সরে এসেছে বিশাল মহানগরীতে।

খানিক আগে হেমনলিনী বলেছিলেন, ঝুমাকে নিয়ে ভোগান্তির শেষ থাকবে না বিনুর। ভবিষ্যদ্বাণীটা কি ফলে যাবে? যে মেয়ের মাথায় সন্দেহের কীট ঢুকে গেছে, পরে যদি সেটা নিরন্তর বাতিকে দাঁড়িয়ে যায়, তাকে কিভাবে সামাল দেবে বিনু? পাকিস্তানে থাকতে একরকম সমস্যা ছিল। সীমান্তের এপারে এসে উৎকণ্ঠার মাত্রাটা আরেক দিক থেকে বেড়ে গেল তার।

বিনুর রাগ হচ্ছিল। তবু শান্ত গলায় বলল, 'তোমাকে তখনই তো বললাম, মাধুরীদিকে আর জয়দিকে জিজ্ঞেস করে দেখ—'

ঝিনুক বলল, 'মাধুরীদিরা সারাক্ষণ তোমাদের পাহারা দিয়েছে, এটা কি সম্ভব?'

পাহারা শব্দটা বিনুর মাথায় তীক্ষ্ণ শলা বিঁধিয়ে দেয়। তবু ক্রোধটাকে সে ফেটে বেরিয়ে পড়তে দেয় না। ভুরু কুঁচকে, রুক্ষ চোখে শুধু তাকিয়ে থাকে।

ঝিনুক নিজের ঝোঁকে বলে যায়, 'কোনও দরকারে ওরা কি ঘর থেকে দু'একবারও বেরিয়ে যায় নি?'

ইঙ্গিতটা পরিষ্কার। ধৈর্য ভেঙেচুরে যাচ্ছে বিনুর। অসহিষ্ণু গলায় বলল, 'হ্যাঁ। আমাদের দু'জনকে ঘরে রেখে দু'একবার কেন, পঁচিশ তিরিশ বার বেরিয়ে গেছে। খুশি তো?'

ঝিনুকের ঠোঁট থরথর কাঁপতে থাকে। দু'চোখ বাষ্পে ভরে যায়।

নিজের রূঢ়তায় লজ্জা পেয়ে যায় বিনু। দুঃখী মেয়েটাকে এভাবে আঘাত না করলেই পারত।

ঝিনুকের কাঁধে একটা হাত রেখে খুব নরম গলায় বলল, 'বোঝো না, তোমার কষ্ট হয়, এমন কিছু কি আমি করতে পারি?'

ঝিনুক উত্তর দেয় না। চোখ ফিরিয়ে, জানালার পাশে সরে যায়।

ধর্মতলার ট্রাম লাইন পেরিয়ে কার্জন পার্ক, হোয়াইটওয়ে লেডলো, গ্র্যান্ড হোটেল, ফারপো, লিন্ডসে স্ট্রিটের ফোকর দিয়ে সামান্য দূরে নিউ মার্কেট ইত্যাদি পেছনে ফেলে ঘোড়ার গাড়ি পার্ক স্ট্রিটের মোড় পেরুতে না পেরুতে সন্ধে নেমে এল লম্বা পায়ে। সেন্ট্রাল অ্যাভেনিউতে যে রোদ গুটিসুটি মেরে পড়ে ছিল, এখন তার লেশটুকু নেই। শহর এখন অনেক শীতল। হিমমাখানো বাতাস বয়ে যাচ্ছে ঢেউ তুলে তুলে। কুয়াশা পড়তে শুরু করেছিল অনেক আগেই। ময়দানের দিকটা পুরোপুরি ঝাপসা। সূর্য নেই। চাঁদ কিন্তু উঠে গেছে। কুয়াশার মায়াবরণের ওপারে হেমন্তের চাঁদ বড় বেশি পাণ্ডুর। কৃশ। আকাশ জুড়ে লক্ষ তারা ফুটেছে। চাঁদের মতো সেগুলোও নিষ্প্রভ।

চৌরঙ্গি জুড়ে এখন আলোর ঢল। রাস্তায় কর্পোরেশনের আলো, অফিস আর ডিপার্টমেন্টাল স্টোরগুলোর আলো। সবচেয়ে উঁচু উঁচু বাড়িগুলোর মাথায় রঙিন নিওন। সব মিলিয়ে অবিরাম বর্ণচ্ছটা। চোখধাঁধানো। স্বপ্নের মতো।

পাশ থেকে আবার সেই গলা, 'কী অত ভাবছ?'

ফের মুখ ফেরাতে হয় বিনুকে, 'কী ভাবব?'

'কিছুই না?'

'না।'

'চুপ করে বাইরে তাকিয়ে বসে আছ আর কিছু ভাবছ না, তাই কখনও হয়?'

সেই পোকাটা ঝিনুকের মস্তিষ্কে কামড় বসিয়েই চলেছে। এখনই এটা থামানো দরকার। ধমকের সুরে বিনু বলল, 'আমার কথা বিশ্বাস হচ্ছে না?'

ঝিনুক থমকে রইল এক মুহূর্ত। পরক্ষণে আরও ঘন হয়ে বসে বলল, 'ঠিক আছে, বিশ্বাস করছি।'

একটু নীরবতা।

তারপর ঝিনুকই আবার শুরু করে, 'আমরা গাড়িতে ওঠার পর ঝুমা তোমাকে কী বলেছিল, মনে আছে?'

বিনু উত্তর দেয় না। বিরক্তিতে তার ভুরু কুঁচকে যায়। ঝিনুক তাকে লক্ষ করছিল। তার চোখে চোখ রেখে আদুরে গলায় বলল, 'রাগ কোরো না। আগে আমার কথাটা শুনে নাও।'

'কী?'

'ঝুমা তোমার সঙ্গে দেখা করতে চাইছিল।'

বিনু উত্তর দিল না। ঝিনুকের চিন্তা কোন সূক্ষ্ম, দুর্গম পথ ধরে চলছিল, সেটা আঁচ করতে চাইছে।

ঝিনুক বলতে লাগল, 'তুমি অবশ্য নিজের থেকে দেখা করবে না। ওই যে বলছিলে, রাস্তাঘাটে হঠাৎ দেখা হয়েও যেতে পারে—'

বিনু বলল, 'তুমিই বল, হতে পারে কিনা—'

মাথা হেলিয়ে সায় দেয় দিল ঝিনুক, 'পুরুষ মানুষ। দিনরাত তো বাড়িতে বসে থাকতে পারবে না। বাইরে বেরুতেই হবে। তখন কোথাও না কোথাও—' শেষ না করে চুপ করে গেল সে।

বিনু নিঃশব্দে ঝিনুককে লক্ষ করতে থাকে।

ঝিনুক নতুন উদ্যমে ফের শুরু করে, 'ধর যদি দেখা হয়েই যায় তখন কী করবে?'

'তুমি আমাকে কী করতে বল, মুখ ফিরিয়ে চলে যাব?'

এবার ধন্দে পড়ে গেল ঝিনুক। কিছুক্ষণ আনমনা হয়ে রইল। চৌরঙ্গির নানা ধরনের মিশ্র শব্দপুঞ্জ ছাপিয়ে তাদের ঘোড়াটা একনাগাড়ে খট খট আওয়াজ তুলে যাচ্ছে।

একসময় ঝিনুক বলল, 'সেটা খারাপ দেখাবে। ওরা তোমাদের কুটুম্ব। কথা না বললে ঝুমা চারদিকে রটিয়ে বেড়াবে। তোমার নিন্দে হবে।' একটু ভেবে বলে, 'কথা বলতে পার। তবে—'

একটা শর্ত জুড়ে দিয়ে চাইছে ঝিনুক। সে জন্য অপেক্ষা করতে লাগল বিনু। সহজভাবে ঝুমার সঙ্গে যে মিশবে, গল্প করবে, তার উপায় নেই।

pathagar.net

ঝিনুক বলল, 'ও বলল, আর তুমি নাচতে নাচতে ওদের বাড়ি চলে গেলে, সেটা কিন্তু চলবে না।'

'আমি কি ওদের বাড়ি কখনও গেছি?'

'কলকাতায় তো সবে এলে। যাবার সময়টা পেলে কোথায়? ঝুমা যা মেয়ে, ঠিক টেনে নিয়ে যেতে চাইবে।'

'চাইলেই তো আর হল না।'

'রাজদিয়ায় থাকতে ঝুমা চাইত, আর তুমি লুকিয়ে লুকিয়ে ক্লাস ফাঁকি দিয়ে ওদের বাড়ি চলে যেতে। কি, যাও নি?'

বিনু কোণঠাসা হয়ে পড়ে। কাঁচুমাচু মুখে বলে, 'দু'একবার গেছি।'

'দু'একবার।' স্বর উঁচুতে তুলে গলা থেকে শ্লেষ ঢেলে দিল ঝিনুক, 'আমি কতদিন ওদের বাড়ি থেকে তোমাকে ধরে এনেছি। ভুলে গেছ?'

প্রসঙ্গটা স্বস্তিকর নয়। ঝিনুক যেভাবে বাঁকা পথে চলেছে, একটু পরেই তুমুল কান্ড বাধিয়ে দেবে। দুই কিশোরীর মাঝখানে সেই টানাপোড়েনের ব্যাপারটা বিনু প্রাণপণে এড়াতে চাইল, 'কলকাতায় আমি ঝুমাদের বাড়ি যাব না, যাব না, যাব না। হল তো?'

ঝিনুকের চোখেমুখে খুশির ঝলক খেলে গেল কি? হয়তো সে খানিক পরিতৃপ্তও। বিনুর কাছ থেকে নতুন করে একটা অঙ্গীকার আদায় করে নিতে পেরেছে। লম্বা বাক্সমতো গাড়ির ভেতর তাকে ঘিরে আলোছায়ার খেলা।

ঘোড়ার গাড়ি ভবানীপুর, হাজরা পেছনে ফেলে এখন রাসবিহারী ক্রসিংয়ের কাছাকাছি চলে এসেছে। এদিকটায় চৌরঙ্গির মতো চাকচিক্য নেই। নেই সহস্র আলোর স্বপ্নমায়া। সব কেমন যেন ম্যাড়মেড়ে। রাস্তার দু'ধারে উঁচু উঁচু ল্যাম্পপোস্টগুলোর মাথায় মিটমিট করে নির্জীব বাল্ব জ্বলছে। ট্রামরাস্তার গা থেকে ভেতরে ভেতরে যে গলিগুলো চলে গেছে, সেখানে বেশির ভাগই গ্যাসবাতি, ক্বচিৎ বিদ্যুতের আলো।

ঝিনুক হঠাৎ বলল, 'আমরা কোথায় যাচ্ছি বল তো?' সুনীতিদের বাড়ি থেকে চলে যেতে পারবে, এতেই ছিল তার অনন্ত স্বস্তি। বিনু তাকে কোথায় নিয়ে যাবে, আগে একবারও জিজ্ঞেস করে নি। ঘোড়ার গাড়িতে ওঠার পরও জানতে চায় নি, তাদের যাত্রাপথ কোথায় গিয়ে শেষ হচ্ছে।

অল্পক্ষণের মধ্যে হিরণদের বাড়ি পৌঁছে যাবে ঘোড়ার গাড়ি। আগে জানালে ঝিনুকের কী প্রতিক্রিয়া হত, তার জানা নেই। এক দিদির বাড়ি থেকে আরেক দিদির বাড়ি গিয়ে ফের লাঞ্ছনার মাত্রাটা বাড়ত কিনা, এক অগ্নিকুন্ড থেকে আরেক বেড়া আগুনে গিয়ে পড়তে হত কিনা, স্বাভাবিকভাবেই এই সব প্রশ্ন তুলে ঝিনুক চেঁচামেচি জুড়ে দিত।

কিন্তু এখন আর লুকোছাপা করে কী হবে? ক'মিনিট আগে পরে জানলে কী এমন ক্ষতি বৃদ্ধি? বিনু মনস্থির করে ফেলে, 'আমরা ছোটদির বাড়ি যাচ্ছি।'

বুকে শ্বাস আটকে যায় ঝিনুকের। সচকিত হয়ে বলে, 'তোমার এক দিদির বাড়িতে আমার কী হাল হয়েছে, জানো না? তারপরও আরেক দিদির কাছে নিয়ে যাচ্ছ?'

বিনু ঝিনুকের চুলে হাত বুলোতে বুলোতে নরম গলায় বলে, 'কোনও ভয় নেই। ওখানে তোমার একটুও অসুবিধে হবে না।'

ঝিনুক অবুঝ হয়ে ওঠে, 'এই আশা দিয়ে তুমি আমাকে সুনীতিদির ওখানে নিয়ে গিয়েছিলে। ফের ওরকম হলে আমি কিন্তু আর বাঁচব না।'

'কিছুই হবে না। আমি ওবেলা এসে ছোটদি আর হিরণদার সঙ্গে কথা বলে গেছি।'

'তাই তোমার ফিরতে দেরি হয়েছিল?'

'হ্যাঁ। তুমি তো কেঁদে কেটে একশা।'

'তুমি সুধাদিদের সঙ্গে দেখা করবে, আমি বুঝব কী করে? বলে আসো নি কেন?'

'তোমার সম্বন্ধে ওরা কী ভাবে, সেটা আগে বুঝে নিতে হবে না? দেখলাম কোনও সমস্যা নেই। তাই তোমাকে নিয়ে যাচ্ছি।'

আর কোনও প্রশ্ন করল না ঝিনুক। এখন পরম আশ্বস্ত। ধীরে ধীরে বিনুর একটা হাত তুলে নিয়ে নিজের দুই মুঠির ভেতর জড়িয়ে নিল।

সন্ধের পরে পরে সুধাদের বাড়ি পৌঁছে গেল বিনুরা। দাঙ্গার সময় ঝিনুকের চূড়ান্ত সর্বনাশ হয়ে গেছে, এ নিয়ে একটি শব্দও কেউ উচ্চারণ করল না। তারা যে সমস্ত জানে, ঘুণাক্ষরেও টের পেতে দিল না। বরং ঝিনুক আসায় তারা কী পরিমাণ খুশি, শতমুখে হইচই করে সেটা বুঝিয়ে দিচ্ছিল। ঝিনুককে নিয়ে তারা কী করবে, কোথায় বসাবে, তাকে কী খাওয়াবে, এই নিয়ে সারাক্ষণ সুধারা শশব্যস্ত।

ঝিনুকের রুক্ষ চুল এলোমেলো হয়ে উড়ছিল। কতক লেপটে আছে কপালে, কতক গালে। সারা মুখে ধুলোর স্তর। নিজের একখানা সিল্কের শাড়ি, ব্লাউজ আর তোয়ালে ঝিনুককে দিয়ে স্নানঘরে পাঠিয়ে দিল সুধা। পোশাক পালটে ঝিনুক ফিরে এলে তার ভেজা মুখ মুছে দিয়ে খুব যত্ন করে ক্রিম মাখিয়ে দিল। দুই ভুরুর মাঝখানে পরাল গাঢ় মেরুন রঙের বড় টিপ। চোখে সরু রেখায় টেনে দিল কাজল।

তারপর বাইরের ঘরে ঝিনুককে মাঝখানে বসিয়ে পরোটা আলুর দম মিষ্টি খেতে খেতে কলকল করে শুরু হল কত যে গল্প! বেশির ভাগই রাজদিয়ার। স্মৃতির ঝাঁপি খুলে বেরিয়ে আসে সেখানকার খাল বিল নদী, ধানের খেত, পাটের খেত, যাত্রাগান, ঢপের গান, সারি গান, পুজোর সময় সারা রাজদিয়ায় টহল দিয়ে সাতখানা প্রতিমা বার বার দেখা, নবমী নিশিতে 'বিজয়া' কি 'মেবার পতন' নাটক, দশমীর পরদিন নদীতে নৌকো বাইচ, কোজাগরী লক্ষ্মীপুজোয় বাড়ি বাড়ি প্রসাদ খেয়ে বেড়ানো, বাস্তুপুজোয়, চৈত্রসংক্রান্তির মেলায় ঘুরে ঘুরে তিলা কদমা চিনির রঙিন মঠ কেনা, ফানা ফানা সোনার বরণ সবরি কলা কেনা, মাটির হাঁড়ি বোঝাই করে মোহনভোগ কি রসগোল্লা কেনা, বায়োস্কোপের বাক্সে চোখ রেখে দিল্লি দেখা, বম্বে দেখা, বিলাত দেখা। কতবার যে হেমনাথ স্নেহলতা শিবানী আর অগুনতি রাজদিয়াবাসীর নাম উঠল! কিন্তু হিরণ বা সুধা দাঙ্গার কথা, দেশভাগের কথা কিংবা লক্ষ লক্ষ শরণার্থীর সীমান্তের এপারে চলে আসার প্রসঙ্গ একবারও তুলল না। যা কিছু মনোরম, মায়াময় এবং স্বপ্নবৎ, তার বাইরে আর কিছু যেন কখনও রাজদিয়ায় ছিল না, বা কোনও দিন ঘটে নি। রাজদিয়ায় সময় যেন দাঙ্গার আগে পর্যন্ত থমকে গেছে। তারপর আর এগোয় নি।

রাত আরেকটু বাড়লে ঝিনুককে সঙ্গে নিয়ে রান্নাঘরে চলে গেল সুধা। রান্নার লোক আছে তাদের। আজ তাকে ছুটি দিয়ে ঝিনুককে কাছাকাছি একটা মোড়ায় বসিয়ে, গল্প করতে করতে নিজের হাতে একের পর এক তেল-কই, বড়ি-বেগুন দিয়ে পাবদা, সোনা মুগের ডাল রাঁধল। বেগুন ভাজল, ঝিরি ঝিরি করে কেটে আলু ভাজল। সব শেষে বসালো সরু চালের ভাত।

সুনীতিদের বাড়িতেও দু'দিন সুখাদ্যের আয়োজন কম ছিল না। কিন্তু কাল রাতে খাওয়াদাওয়া চুকবার পরই ঝিনুককে একতলার এককোণে নির্বাসনে পাঠানো হয়েছিল। আজ বিকেল পর্যন্ত সেখানে মুখ গুঁজে পড়ে থেকেছে সে। কাল সঙ্গী ছিল দুলালী। ভারি নোংরা মেয়েমানুষ। জঘন্য। মাছির মতো পচা পুঁজরক্ত চেটে খাওয়ার স্বভাব।

খাওয়াদাওয়ার পর সুধা এক ঘরে হিরণ এবং বিনুর শোবার ব্যবস্থা করে দিল। আরেক ঘরে মস্ত খাটে বিছানা পেতে সুধাকে নিয়ে শুল।

ঝিনুক এবাড়িতে আসার পরও এত আন্তরিকতা, এত মায়া, এত যত্নের মধ্যেও নিজেকে শামুকের মতো গুটিয়ে রেখেছিল। সবার কথায় একটু আধটু হুঁ হাঁ করেছে শুধু। কখনও মৃদু, নির্জীব হাসি ফুটে উঠেছে ঠোঁটে।

কিন্তু সুধা যখন তার পাশে শুল, ভালবাসার উত্তাপ ঝিনুককে যেন তোলপাড় করে দিচ্ছিল।

সুধারা তাকে অচ্ছুতের মতো দূরে সরিয়ে রাখে নি। আবেগে গলার কাছটায় লোহার ডেলার মতো শক্ত কিছু আটকে যাচ্ছিল তার। বুকের ভেতর কিসের যেন একটা চাপ। হঠাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল সে। ভাঙা ভাঙা, জড়ানো গলায় বলল, 'সুধাদি তোমার কাছে এসে বেঁচে গেলাম। তুমি নিশ্চয়ই জানো, সুনীতিদির শাশুড়ি কী খারাপ ব্যবহার করেছে। আমার যে সর্বনাশ হয়েছে, বল তাতে আমার কী দোষ!'

সুধা চমকে ওঠে। পাছে তার লাঞ্ছনার কথা ওঠে, সে জন্য দাঙ্গার প্রসঙ্গই কেউ মুখে আনে নি। ওঠে নি সুনীতিদের বাড়ির প্রসঙ্গও। গল্পে গল্পে দমবন্ধ-করা, মর্মান্তিক ব্যাপারটা তারা আড়াল করে রাখতে চেয়েছিল। মহাবিশ্বের সবার কাছে তার ধর্ষণের বার্তা পৌঁছে গেছে, আর সুধারাই শুধু জানে না, এটা কি বিশ্বাসযোগ্য? ঝিনুক জানে, দাঙ্গার পর থেকে সুনীতিদের বাড়িতে একটা দিন কাটানো পর্যন্ত কোনও ঘটনাই সুধাদের অজানা নেই।

সমানে কেঁদে যাচ্ছিল ঝিনুক। তাকে বুকের ভেতর জড়িয়ে নিয়ে আচ্ছন্নের মতো সুধা বলল, 'ওসব মনে করে রেখো না। এ নিয়ে যত ভাববে, শুধু কষ্টই পাবে—'

রাজদিয়ায় রাজেকের নৌকোয় ওঠার পর থেকে কেঁদেই চলেছে ঝিনুক। ত্রাসে। আতঙ্কে। অকারণ গ্লানিবোধে। আজ রাতের কান্নাটা অন্যরকম। বিনু তো পাশে আছেই। কলকাতায় পা রাখার পর এই প্রথম সে জানলো, নির্ভর করার মতো আরও কেউ কেউ রয়েছে। সুধার গায়ে নিজেকে মিশিয়ে দিতে দিতে তার কান্না উতরোল হয়ে উঠতে লাগল।

পুরো দু'টো দিন ভুগিয়ে ধুম জ্বরটা ভোরের দিকে ছেড়ে গিয়েছিল হিরণের। আজ সকালে শরীর বেশ ঝরঝরে লাগছে। মাথার টিপটিপ, কপালের দু'পাশের রগগুলোর দপদপানি কি হাত পায়ের জোড়গুলোর চিবনো ভাব এখন আর নেই।

যুদ্ধের সময় অবনীমোহন রাজদিয়ায় হেমনাথের বাড়িতে সেই যে চা খাওয়া চালু করেছিলেন সেই অভ্যাস বিনুরা ছাড়তে পারে নি।

আজ সকালে জমাট মজলিশ বসেছিল। বিনু, হিরণ, সুধা, ঝিনুক। হিরণ বলছিল, 'দু'দিন জ্বরের জন্যে অফিসে যাই নি। ঝিনুকের অনারে আরও দু'দিন যাব না। রবিবার এমনিতেই ছুটি। অফিসে যেতে যেতে সেই সোমবার।'

কাল পর্যন্ত যে মেয়ে কুঁকড়ে ছিল, সেই ঝিনুককে এখন প্রায় চেনাই যায় না। ভয় লজ্জা অনিশ্চয়তা তার কাছ থেকে অনেক কিছু হরণ করে নিয়েছিল। ফের সেগুলো ফিরে আসতে শুরু করেছে। কঠিন খোলা ভেঙে সে বেরিয়ে আসছে। বেশ হাসিখুশি দেখাচ্ছে তাকে।

ঝিনুক বলল, 'খুব ভাল হয় তা হলে। এ ক'দিন আমরা অনেক গল্প করব।' সে ভীষণ চাপা ধরনের মেয়ে। সেই কোন ছেলেবেলায় মা-বাবার সম্পর্কটা যখন থেকে বিষিয়ে উঠল, কেমন শুকিয়ে গিয়েছিল। সারাক্ষণ চুপচাপ। জড়সড়। ভয়কাতর। স্নেহলতা, শিবানী, হেমনাথ এবং পরে সুরমা সুধা সুনীতি, এবং বিনু ছাড়া অন্য কারোর সঙ্গে সহজে কথা বলত না। তারপর দাঙ্গার সময় তার জীবন একেবারে তছনছ হয়ে গেল। তখন ঘরের কোণে কখনও আচ্ছন্নের মতো বসে থাকত। কখনও অফুরান কান্না।

একদৃষ্টে লক্ষ করছিল বিনু। বহুকাল পর ঝিনুককে কী ভালই না লাগছে! এমন উচ্ছ্বসিত শেষ কবে তাকে দেখা গেছে! মনে পড়ে না।

হিরণ বলছিল, 'শুধু ঘরে বসে বসে গল্পই করব নাকি? একেক দিন একেক জায়গায় তোমাদের বেড়াতে নিয়ে যাব। আজ বিকেলে যাব লেকের ধারে।'

ঝিনুক জিজ্ঞেস করে, 'লেক কী?'

'বাংলায় যাকে হ্রদ বলে। বেশ কয়েক বছর আগে মাটি কেটে কেটে ওটা করা হয়েছিল। চমৎকার

বেড়াবার জায়গা।'

হিরণ ধারাবাহিক ভ্রমণসূচি জানাতে থাকে। কাল সবাইকে নিয়ে সন্ধেবেলায় গানের জলসায় যাবে। পরশু যাদুঘর আর ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল। আপাতত এই তিন দিনের কথা ভেবে রেখেছে। তারপর হাওড়ায় বোটানিক্যাল গার্ডেন আছে। আছে দক্ষিণেশ্বর। বেলুড় মঠ। সার্কাস। সিনেমা। থিয়েটার। এই শহর হাজার দিকে হাজার মজা সাজিয়ে রেখেছে। যাও, ঢুকে পড়। দু'হাত ভরে আনন্দ তুলে নাও।

যত শুনছিল, চোখমুখ আলো হয়ে উঠছিল ঝিনুকের। তার জন্য এত আয়োজন, ভাবাই যায় না। মাথা থেকে স্থায়ী আতঙ্কটা ক্রমশ সরে যাচ্ছে। ত্রাসমুক্ত, ভারমুক্ত ঝিনুক ভেতরে ভেতরে যেন উচ্ছল বালিকা হয়ে উঠছিল।

বিনু তাকিয়েই ছিল। হিরণ আর সুধা ঝিনুককে অন্ধকার পাতাল থেকে আলোয় তুলে এনেছে। ছোটদি আর ছোট জামাইবাবুটির জন্য কৃতজ্ঞতায় তার বুক ভরে যাচ্ছিল। তারা সুনীতিদের বাড়ি না গিয়ে কাল রাতে একটু কষ্ট করে, খুঁজে পেতে যদি সুধাদের কাছে চলে আসত! পরক্ষণে হালকা একটা ভাবনা বিনুর মাথায় ছায়া ফেলে যায়। হেমনলিনীর মতো সুধারাও যদি আবর্জনার মতো ঝিনুককে একধারে ফেলে রাখত! না, সে সব চিন্তা করার এখন আর কোনও মানে হয় না।

দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর খানিকক্ষণ গড়িয়ে নিল হিরণরা। তারপর বেলা পড়ে এলে বেরিয়ে পড়ল। লেক এখান থেকে বেশি দূরে নয়। পায়ে হাঁটা দূরত্বে। হেঁটেই তারা চলে যাবে।

বড় রাস্তায় এসে ওরা ডানদিকের ফুটপাথ ধরল। কাল আর আজ, মোট চার বার এখানে যাতায়াত করেছে বিনু। এখন ভাল করে লক্ষ করল, কলকাতার এদিকটায় তুলনায় মানুষজন কম। জমজমাট হয়ে উঠতে সময় লাগবে। ছাড়া ছাড়া বাড়িঘর, দোকানপাট, মাঝে মাঝে ফাঁকা জমি। উলটো দিকে খোলার চালের চাপ-বাঁধা বস্তি। অনেকটা এলাকা জুড়ে।

রাস্তাটা কিন্তু খুব পরিষ্কার। আবর্জনাশূন্য। মধ্যিখান দিয়ে ধাতব গুঞ্জন তুলে ট্রাম চলে যাচ্ছে। কোনওটা উত্তরে। কোনওটা দক্ষিণে। সেগুলোর গা ঘেঁষাঘেঁষি করে পাল্লা দিচ্ছে প্রাইভেট কার, ঘোড়ার গাড়ি আর পাবলিক বাস। ক্বচিৎ দু'চারটে ট্যাক্সি। সেগুলোর স্টিয়ারিং ধরে বসে আছে দাড়িপাগড়িওলা শিখ ড্রাইভার। বাস কন্ডাক্টররা সরু, মোটা আর খ্যাসখেসে গলায় যান্ত্রিক সুর টেনে টেনে হেঁকে যাচ্ছে, 'খালি গাড়ি। আসেন আসেন। কালীঘাট, ভবানীপুর, ধরমতল্লা—' কিংবা 'টালিগঞ্জ, রানীকুঠি, গড়িয়া—'

এলোমেলো কথা বলতে বলতে ওরা রেলব্রিজের তলায় চলে এল। মাথার ওপর রেল লাইন, তলায় মানুষজন এবং গাড়িঘোড়া চলার পথ।

এই মুহূর্তে একটা ট্রেন কয়লার ধোঁয়ায় আকাশ কালো করে, সিটি বাজাতে বাজাতে পশ্চিম দিকে ছুটে যাচ্ছিল।

ঝিনুক জিজ্ঞেস করল, 'ট্রেনটা কোথায় যাচ্ছে হিরণদা?'

হিরণ বলল, 'বজবজ।'

'অনেক দূর?'

'না, কাছেই। এখান থেকে সাত আট মাইল।'

'কী আছে সেখানে?'

'ওটা ছোট শহর। চারদিকে অবশ্য প্রচুর কলকারখানা—'

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে উলটো দিক থেকে আরেকটা ট্রেন এসে পড়ল। আগের ট্রেনটার পাশ দিয়ে হুস হুস ছুটে গেল পুব দিকে।

ঝিনুক জানতে চাইল, 'আর এই ট্রেনটা?'

'এটা যাবে শিয়ালদায়—'

'পরশু গোয়ালন্দ থেকে যেখানে এসে আমরা নেমেছিলাম?'

'হ্যাঁ।'

pathagar.net

দাঙ্গার সময় ঢাকা থেকে উদ্ধার করে আনার পর জগতের কোনও বিষয়ে লেশমাত্র আগ্রহ ছিল না ঝিনুকের। পৃথিবী নামে এই গ্রহের অস্তিত্ব একেবারে লোপ পেয়ে গিয়েছিল তার কাছে। ঘরের কোণে পড়ে থাকত অসাড় স্নায়ু নিয়ে। সারাক্ষণ মুহ্যমান। কখনও বুক নিঙড়ে বেরিয়ে আসত সকরুণ কান্নার ধ্বনি। সেই ঝিনুকই অপার কৌতূহলে জানতে চাইছে কোন ট্রেনের গন্তব্য কোথায়। হয়তো এই সব ট্রেনে কোনও দিনই তার চড়া হবে না।

কাল সন্ধে থেকে আজ বিকেল। মাত্র কুড়ি একুশ ঘন্টার মধ্যে ঝিনুককে আগাগোড়া বদলে দিয়েছে সুধারা। অবাক চোখে ঝিনুককে লক্ষ করছিল বিনু।

রেল ব্রিজের তলা দিয়ে ডান ধারে খানিক গেলেই চিলড্রেন্স পার্ক। রং-করা লোহার রেলিং দিয়ে ঘেরা। ভেতরে কয়েক ডজন দোলনা। উঁচু থেকে গড়গড়িয়ে নামার জন্য বেশ ক'টা স্লিপ। পার্কটার কোণে কোণে সাজানো রয়েছে সিমেন্টের হাতি, ঘোড়া, হরিণ, এমনি নানা জীবজন্তু। একধারে ডিমের আকারে ছোট সুইমিং পুল।

রঙিন পোশাক-পরা বাচ্চারা ঝাঁক বেঁধে উদ্দাম ছোটাছুটি করছে। একটা দোলনাও ফাঁকা নেই। সেগুলো দখল করে দোল খাচ্ছে আরেকটা দল। দুঃসাহসী যারা, সিঁড়ি ভেঙে তেতলা সমান উঁচুতে উঠে স্লিপ কেটে তরতরিয়ে নেমে আসছে চোখের পলকে। তাদের ওপর নজরদারি করার জন্য রয়েছে মায়েরা কিংবা আয়ার দল। যে মেয়েদের বয়স একটু বেশি, সুইমিং পুল তোলপাড় করে তারা সাঁতার কাটছে। স্বপ্নের ক'টি জলপরী। কলরবে সারা পার্ক মুখর।

ঝিনুক বলল, 'কী সুন্দর বাগানটা—'

সুধা বলল, 'হ্যাঁ। এটা শুধু বাচ্চাদের জন্যে।'

পার্ক পেছনে ফেলে একটা নীচু লোহার গেট খুলে হিরণ যেখানে সবাইকে নিয়ে ঢুকে পড়ল, সেখানে বিরাট বিরাট সব গাছ। আকাশে ডালপালা মেলে কত কাল ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। পায়ের তলায় নরম ঘাসে-ছাওয়া মাঠ। মাঠের পাশ দিয়ে সুবিশাল জলাশয়। হেমন্তেও প্রায় কানায় কানায় ভরা। সেটার কিনার ঘেঁষে বেড়ানোর জন্য ইট বাঁধানো রাস্তা। রাস্তার ধারে ধারে গ্যাস লাইটের সারি সারি পোস্ট।

হিরণ বলল, 'এই হল লেক—'

ঝিনুক অনন্ত বিস্ময়ে বিপুল জলরাশির দিকে চোখ রেখে জিজ্ঞেস করে, 'মাটি কেটে কেটে মানুষ এটা করেছে!'

হিরণ হাসল, 'মানুষের অসাধ্য কিছু নেই ঝিনুক। ইচ্ছা করলে সে সব করতে পারে।'

বিনুরাই শুধু নয়, চারপাশেরা ভ্রমণবিলাসীরাও চলে এসেছে এখানে। স্বাস্থ্য নিয়ে যাদের বাতিক, ফুসফুসে নির্মল বাতাস টানার জন্য তারাও হাজির। নানা বয়সের নারীপুরুষ। বড় বড় গাছের পেছনে জোড়ায় জোড়ায় তরুণ তরুণী। ওদের খুব সম্ভব একটু আড়াল দরকার।

আরও খানিকটা যাবার পর গাছপালা কমে এল। এখানে টানা ব্যারাকের ধাঁচে পর পর অনেকগুলো বাড়ি। কয়েকটা আস্ত রয়েছে। বাকিগুলো আধভাঙা।

ঝিনুক আঙুল বাড়িয়ে বলে, 'এগুলো কিসের বাড়ি?'

হিরণ জানায়, বাড়িগুলো মিলিটারি ব্যারাক। যুদ্ধে গোড়ার দিকে সারা লেক জুড়ে টমিদের জন্য অগুনতি সেনাশিবির তৈরি হয়েছিল। যুদ্ধশেষে টমিরা চলে যায়। ব্যারাকগুলোর প্রয়োজনও ফুরোয়। এই ক'বছরে প্রায় সব ব্যারাকই ভেঙে ফেলা হয়েছে। যে ক'টা রয়েছে, সেগুলোর আয়ুও ফুরিয়ে এল বলে। লেকের পাড় থেকে মহাযুদ্ধের একটা স্মৃতি চিরতরে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

ব্যারাকগুলো পেরিয়ে খোলামেলা বড় একটা জায়গায় এসে পড়ল সবাই। এখানে গাছপালা নেই, শুধু সবুজ ঘাসের গালিচা। একধারে লাইন দিয়ে বাদামওলা, ফুচকাওলা, আইসক্রিমওলা, ঝালমুড়িওলারা খদ্দের সামলাতে হিমসিম। এছাড়া রয়েছে গরম চা, গুলাবি রেউড়ি, ক্যান্ডি ফ্লস, কুড়মুড় ভাজা, এমনি রকমারি খাবার। হিরণ ঝিনুককে বলল, 'তোমাকে এমন একটা জিনিস খাওয়াব, জীবনে কখনও খাও নি। এমনকি চোখেও দেখ নি।'

ঝিনুক উৎসুক সুরে জিজ্ঞেস করে, 'কী জিনিস?'

'চলই না—'

একটা ফুচকাওলার কাছে এসে সবাইকে ফুচকা দিতে বলল হিরণ। হাতে হাতে শালপাতার ঠোঙা ধরিয়ে, পরমাশ্চর্য দক্ষতায় ছোট ছোট লুচির সাইজের কড়কড়ে গোলকগুলো ফুটো করে, সেদ্ধ আলু মটর আর তেঁতুলগোলা জল ভেতরে ভরে, একের পর এক দিয়ে যেতে লাগল লোকটা।

এমন খাদ্যবস্তু সত্যিই আগে কখনও দেখে নি ঝিনুক। সে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে লক্ষ করতে লাগল।

হিরণ তাড়া দেয়, 'কী হল, খাও—'

ফুচকা তুলে মুখে পোরে ঝিনুক। সম-পরিমাণ টক ঝাল আর নুনের মিশ্রণে ভারি উপাদেয়। মুখের ভেতরটা অচেনা, অপূর্ব স্বাদে ভরে যায়। ঝিনুকের মনে হল, কলকাতায় কত কিছুই না পাওয়া যায়।

মাথাপিছু আটটা করে ফুচকা। সব মিলিয়ে চারজনে বত্রিশটা, মোট দাম ছ'আনা।

পয়সা মিটিয়ে দিয়ে হিরণ জিজ্ঞেস করে, 'ফুচকা কেমন লাগল?'

মাথা অনেকখানি হেলিয়ে দেয় ঝিনুক, 'খুব ভাল—'

ফুচকার পর হিমশীতল আইসক্রিম। চকোলটের পুরু কোটিং লাগানো। একেকটা দু'আনা। আইসক্রিমের পর চার ঠোঙা ঝালমুড়ি কিনল হিরণ।

ফুচকা এবং আইসক্রিম খেয়ে পেট বোঝাই হয়ে গিয়েছিল। ঝিনুক সুধা বিনু, সবাই প্রবল আপত্তি জানায়; এখন আর কিচ্ছু খাওয়া সম্ভব নয়।

হিরণ বলল, 'এগুলো আমাদের জন্যে নয়। মাছেরা খাবে।'

ঝিনুক অবাক, 'এখানে মাছ কোথায়?'

'আছে আছে। চল—'

ফুচকাওলা আইসক্রিমওলাদের পেছনে ফেলে কোনাকুনি বাঁ দিকের সরু রাস্তা ধরে একটা পুলের কাছে চলে এল ওরা। কাঠের পাটাতন-বসানো ঝুলন্ত সাঁকোটা এত সরু, তিনজনের বেশি পাশাপাশি চলতে পারে না। লেকের মাঝখানে একটা ছোট্ট দ্বীপে গিয়ে ওটা নেমেছে। দ্বীপটার এক ধারে ছোট্ট মসজিদ। সাদা ধবধবে।

পুলের ওপর বেশ কিছু লোকজন। দু'ধারের রেলিংয়ের ওপর ঝুঁকে জলে মুড়ি ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিচ্ছে।

হিরণরা সাঁকোর মধ্যিখানে এসে ভিড়ের ভেতর জায়গা করে নেয়। নীচে আঙুল বাড়িয়ে সে বলে, 'ওই দেখ—'

মুড়ি ফেললেই ঝাঁকে ঝাঁকে মাছ জলে ঘাই মেরে মেরে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। বেশির ভাগই বিরাট বিরাট আকারের বয়স্ক রুই, কাতলা আর মৃগেল। বেশ ক'টা কালবোসও। সেগুলোর গায়ে পুরু শ্যাওলা। ছোট মাছগুলোকে তারা কাছেই ঘেঁষতে দিচ্ছে না।

এই সব বড় মাছের কয়েকটার দক্ষতার তুলনা নেই। মুড়ি জলে পড়ার আগেই জল থেকে দু'তিন হাত উঁচুতে লাফিয়ে উঠে হাঁ করে মুখের ভেতর পুরে ফেলছে।

হিরণ ঝিনুককে বলে, 'কিরকম প্র্যাকটিস করেছে, দেখেছ! দাও দাও, ওদের মুড়ি দাও—'

ওপর থেকে মুড়ি ছড়াতে ছড়াতে একেবারে বালিকা হয়ে যায় ঝিনুক। তার দু'চোখে খুশি চলকাতে থাকে, 'উঃ, কত মাছ হিরণদা!'

ঝিনুককে যত দেখছে, বিস্ময়টা ধাপে ধাপে বেড়েই চলেছে বিনুর। কত কাল পর তাকে এমন উচ্ছ্বসিত, এমন খুশি হতে দেখছে সে।

হিরণ বলল, 'সারা লেকটাই মাছে বোঝাই। মাঝে মাঝে ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট টিকেট বেচে বড়শি দিয়ে ধরতে দেয়। গেল বছর কী হয়েছিল, জানো?'

'কী?'

'একটা সাড়ে চার সের ওয়েটের কালবোস ধরে নিয়ে গিয়েছিলাম—'

সুধা ঠোঁট বাঁকিয়ে ভ্রূকুটি হানে, 'কাঁচকলা—'

ঝিনুক জিজ্ঞেস করে, 'মানে?'

'মাছ ধরেছে না, ছাই। লেক মার্কেট থেকে কিনে নিয়ে গিয়েছিল। তিন দিন ধরে চার তৈরি করা, বন্ধুদের সঙ্গে দিনরাত হইহই করে পরামর্শ। তার রেজাল্ট কী হল?' কপাল কুঁচকে বুড়ো আঙুল নাচাতে লাগল সুধা। পরক্ষণে বলল, 'খালি হাতে কী করে বাড়িতে ঢোকে! মুখরক্ষার জন্যে বাজারে ছুটেছিল।'

হিরণ কপট রাগে ঝাঁঝিয়ে ওঠে, 'এই, একদম বাজে কথা বলবে না। আমার সঙ্গে যারা মাছ ধরতে গিয়েছিল তারা তোমাকে বলে নি?'

সুধা একটুও দমে না, 'চোরের সাক্ষী গ্রন্থিছেদক—' বি. এ'তে তার সংস্কৃত ছিল। গ্রন্থিছেদক তারই নমুনা।

হিরণ এবং সুধার এই খুনসুটিটা বড়ই মনোরম। ভীষণ মজা পাচ্ছিল বিনু আর ঝিনুক। বিনু খুঁচিয়ে দেবার জন্য বলে, 'ছোটদি যা বলল তা কি সত্যি?'

হিরণ বলল, 'তুমিও পেছনে লাগলে? ঠিক আছে, আসছে মাসে ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট আবার মাছ ধরতে দেবে। তোমাকে সঙ্গে নিয়ে আসব। সেবার সাড়ে চার সের ওজনের কালবোস ধরেছিলাম। এবার মিনিমাম দশ সেরের কাতলা তুলব। নিজের চোখে দেখলে বিশ্বাস হবে তো?'

'নিশ্চয়ই। ছোটদির ট্যাঁ ফোঁ তখন আর চলবে না। কিন্তু—'

'আবার কী হল?'

'রাজদিয়ায় থাকতে কোনও দিন তো আপনাকে মাছ ধরতে দেখিনি।'

'কলকাতায় এসে বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে এই নতুন নেশাটা ধরেছি। নিষ্পাপ নেশা কিন্তু—' বলতে বলতে হিরণের নজর গিয়ে পড়ল ঝিনুকদের হাতের দিকে, 'আরে, ঠোঙা এখনও অর্ধেক খালি হয় নি। মাছেদের দাও—'

আবার মুড়ি ছিটনো শুরু হয়। একেকটা ঘাঘী মাছ চতুর খেলোয়াড়দের মতো মুড়ি লুফে নিচ্ছে আর মাথা ঝাঁকিয়ে মাকিয়ে হেসে কুটিপাটি হচ্ছে ঝিনুক।

মৎস্য ভোজন শেষ হলে হিরণ বলল, 'অনেকক্ষণ হাঁটাহাঁটি হয়েছে। চল, ওধারে গিয়ে একটু বসি—'

সবারই তাই ইচ্ছা। হাঁটাহাঁটিই শুধু নয়, বেশ খানিকটা সময় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মাছেদের খাওয়ানো হয়েছে। পা ধরে গেছে। এখন জিরানো দরকার।

পুল পেরিয়ে দ্বীপে এল হিরণরা। একধারে মসজিদ। আরেক দিকে জলের পাড় ঘেঁষে বাসার জন্য লম্বা, সাদা ক'টা বেঞ্চ। সেগুলোর পায়া সিমেন্টে গাঁথা।

সবাই ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে পড়ে। দ্বীপের দু'ধারে যতদূর চোখ যায়, দিগন্ত অব্দি অথৈ জলের বিস্তার। শেষ বিকেলের সোনালি আলো লেকের স্বচ্ছ জলে টলমল করছে। এখনও কুয়াশা পড়তে শুরু করে নি। মেঘলেশহীন আকাশের নীল ছুঁয়ে ছুঁয়ে ডানা মেলে ভাসছে ক'টা পাখি। শঙ্খচিল? নীচের পৃথিবী থেকে চেনা যায় না। বাতাস বয়ে যাচ্ছে উত্তর থেকে। স্নিগ্ধ। ঝিরঝিরে। মালিন্যহীন। লেকের দক্ষিণ দিক দিয়ে একটা ট্রেন ধোঁয়ায় আকাশ মলিন করে ঝকর ঝকর ছুটে গেল। বেশিক্ষণ নয়, হেমন্তের হাওয়া কয়েক লহমায় সব ময়লা মুছে দিল। আকাশ ফের যেমনকে তেমন।

চারদিকের গাছপালার মাথায়, নিবিড় সবুজ ঘাসে, সামনের পুলটার গায়ে হেমন্তের অপার্থিব মায়া যেন মাখানো।

ঝিনুকের পুরনো কৌতূহলগুলো ফের ফিরে আসে, 'আচ্ছা হিরণদা, আসার সময় যে রেল লাইন দেখেছিলাম, সেটাই কি ওখান দিয়ে গেছে?'

হিরণ মাথা নাড়ে, 'হ্যাঁ—'

'এই লেকটা কোথায় গিয়ে শেষ হয়েছে?'

'একধারে সেই চিলড্রেন্স পার্ক—' কোনাকুনি হাত বাড়িয়ে হিরণ বলল, 'আর ওধারে ঢাকুরিয়া পর্যন্ত।'

হঠাৎ চোখে পড়ল, পশ্চিম দিকে একজোড়া সরু লম্বা বোট ঝুলন্ত সাঁকোর তলা দিয়ে বিদ্যুৎ গতিতে বেরিয়ে এল। একেকটা বোটে চারজন। সবার একই রকম পোশাক। দুধসাদা হাফ প্যান্ট

আর হাফ-হাতা গেঞ্জি। হাতে একই মাপের লম্বা লম্বা দাঁড়। দাঁড়গুলো একসঙ্গে জলে পড়ছে। একই ছন্দে। জল তোলপাড় হয়ে ঢেউ উঠছে উঁচু উঁচু। সাঁই সাঁই ছুটে যাচ্ছে বোট। হেমন্তের রোদ শতখান হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে সারা লেকে।

মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে ছিল ঝিনুক। পলকে দুই বোট অনেক দূরে চলে যায়। সে জিজ্ঞেস করল, 'এখানেও আমাদের দেশের মতো বাইচ খেলা হয়?'

হিরণ মাথা সামান্য হেলিয়ে দেয়, 'হুঁ। ইংরেজিতে বলে রোয়িং।' ওপারে গোলাপি রঙের একতলা একটা বাড়ি দেখিয়ে বলল, 'ওটা রোয়িং ক্লাব। ওখানে বোট চালাতে শেখানো হয়।' সে আরও জানায়, মাসখানেক পর এখানে রোয়িং কমপিটিশন হবে। ভারতবর্ষের নানা অঞ্চল থেকে কমপিটিটররা এসে প্রতিযোগিতায় অংশ নেবে।

ঝিনুক দেখতে পেল, ওখানে জলের ধার ঘেঁষে লাইন দিয়ে অনেকগুলো ফাঁকা ছিপ নৌকো। বেশ কিছু লোকজন রোয়িং ক্লাবের সামনের প্রশস্ত লনে বেতের চেয়ারে বসে আছে। অনেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলছে। তাদের হাতে লম্বা দাঁড়। খুব সম্ভব বোটে ওঠার তোড়জোড় চলছে।

রোদ আরেকটু মরে এলে হিরণ সবাইকে নিয়ে উঠে পড়ে। 'চল, সাদার্ন অ্যাভেনিউর দিকটা দেখিয়ে আনি।'

সেতু পেরিয়ে গল্প করতে করতে সবাই খুব চওড়া একটা রাস্তায় চলে আসে। দু'ধারে ছড়ানো ফুটপাথ। কোথাও ধুলোময়লা জমে নেই। পরিচ্ছন্ন। ছিমছাম।

রাস্তাটার দু'পাশে গাড়ি চলাচলের জন্য মসৃণ পথ। মাঝখানে বড় বড়, চতুষ্কোণ আইল্যান্ডগুলো ঘন সবুজ ঘাসে ঢাকা। কোনও কোনওটায় আঁকাবাঁকা, গভীর গর্ত খুঁড়ে রাখা হয়েছে। যেখানে যেখানে ঘাসের জমি, গর্ত নেই, সেখানে বাঁশের গোলপোস্ট পুঁতে ছেলেরা ফুটবল খেলছে।

যে আইল্যান্ডগুলোতে গর্ত, সেগুলো দেখিয়ে ঝিনুক বলে, 'এত সুন্দর জায়গায় এমন বিশ্রী খোঁড়াখুঁড়ি করে রেখেছে কেন?'

হিরণ বলল, 'ওগুলো ট্রেঞ্চ। যুদ্ধের সময় জাপানি বোমার হাত থেকে বাঁচার জন্যে সাইরেন বাজলেই লোকজন গর্তগুলোর ভেতর ঢুকে পড়ত।' সে বলতে লাগল, 'সাদার্ন অ্যাভেনিউর মাঝখানে যত আইল্যান্ড দেখছ, সবগুলোতে ট্রেঞ্চ কাটা হয়েছিল। যুদ্ধের পর বেশির ভাগ বুজিয়ে ফেলা হয়েছে। সেগুলোতে এখন ছেলেরা ফুটবল কি ক্রিকেট খেলে। বাকি গর্তগুলোও কর্পোরেশন শিগগিরই বুজিয়ে দেবে।'

কিছুক্ষণ আগে লেকে ঢুকে ভাঙাচোরা সেনাশিবির দেখেছিল ঝিনুকরা, এখন দেখল ট্রেঞ্চ। মনে হল, মহাযুদ্ধের এমন স্মৃতি এখনও হয়তো এ শহরে আরও কিছু কিছু থেকে গেছে।

যে ফুটপাথ দিয়ে ওরা হাঁটছিল তার উলটো দিকে সারি সারি মস্ত মস্ত বাড়ি। বেশির ভাগেরই সামনের দিকে অনেকটা জায়গা জুড়ে বাগান।

রাস্তা পার হয়ে হিরণরা হাঁটতে হাঁটতে যেখানে চলে এল তার পাশে বিশাল এলাকা জুড়ে সাদা রঙের অগুনতি ব্যারাক। সেগুলোর মাথায় অ্যাসবেস্টসের ছাউনি। রাস্তার দিকে বিরাট গেট।

ঝিনুক জিজ্ঞেস করে, 'এখানে কারা থাকে? মিলিটারিরা?' খানিক আগে লেকের ও-প্রান্তে যে আধভাঙা ব্যারাক দেখেছিল সেগুলোর কথা তার মনে পড়ে গেছে। এই প্রশ্নটাই হয়তো তার মাথায় এসেছে, ওধারের ব্যারাক ভেঙেচুরে ফেললেও, এগুলো এখনও অটুট কেন? শুধু তাই নয়, বেশ সাজানো গোছানো। সব সেনা কি তা হলে চলে যায় নি?

হিরণ জানায়, যুদ্ধের আমলে এখানে তড়িঘড়ি মিলিটারি হাসপাতাল তৈরি করা হয়েছিল। মালয় সিঙ্গাপুর বর্মা, কি দূর প্রাচ্যের রণাঙ্গনে যে সব ব্রিটিশ বা আমেরিকান সোলজাররা মারাত্মক জখম হয়ে পড়ত, তাদের চিকিৎসার জন্য এই হাসপাতালে উড়িয়ে আনা হত।

যুদ্ধশেষে মিত্রপক্ষের সেনাবাহিনী কবেই দেশে ফিরে গেছে। কিন্তু হাসপাতালটা বন্ধ করা হয় নি। এর দরজা সাধারণ মানুষের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে।

হিরণ প্রায় বলতে যাচ্ছিল, ফি বেস্পতিবার যুগল এই হাসপাতালে আসে। পায়ের ঘা ড্রেস করিয়ে তাদের টালিগঞ্জের বাড়িতে চলে যায়। বলতে গিয়েও থমকে গেল।

যুগলের নাম শুনলে ঝিনুকের কী প্রতিক্রিয়া হবে, কে জানে। হিরণ শুনেছে, চেনাজানা কারোর সামনেই বেরুতে চায় না মেয়েটা। তার আতঙ্ক, পরিচিতেরা যেন তার দিকে আঙুল উঁচিয়ে জানিয়ে দেবে, ঢাকায় তোমার কী হয়েছে, আমরা সব জানি, সব জানি। তখন লজ্জায় গ্লানিতে দম বন্ধ হয়ে আসবে ঝিনুকের।

সামনের বেস্পতিবার অবধারিত নিয়মে যুগল তাদের বাড়ি আসবে। ঝিনুকের সঙ্গে তার দেখাও হবে। তখন কী হতে পারে, পরিষ্কার আঁচ করে নেওয়া যায়। চিন্তাটাকে এতটুকু আমল দিল না হিরণ। ভাবল, যা হবার হবে। বহুকাল বাদে যে ঝিনুক খুশিতে ঝলমল করছে, তার এই ক্ষণিক আনন্দটুকু এই মুহূর্তে যুগলের কথা তুলে কেড়ে নেওয়া যায় না।

আরও কিছুক্ষণ পর পশ্চিম দিকের উঁচু উঁচু বাড়ি আর গাছপালার পরপারে সূর্য ডুবে যায়। মিহি হিম পড়তে শুরু করে। ধীর পায়ে নেমে আসে হেমন্তের সন্ধে। চারদিকে অজস্র আলো জ্বলে ওঠে।

এই সময় হিরণরা বাড়ি ফিরে যাচ্ছিল। পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে বার বার বিনুর চোখ চলে যাচ্ছে ঝিনুকের দিকে। মাত্র একটা দিনের ভেতর কত বদলে গেছে মেয়েটা। কত উজ্জ্বল, কত জীবন্ত।

সুধা আর হিরণের সঙ্গে সমানে কল কল করছে ঝিনুক। হেসে উঠছে কথায় কথায়। মাঝখানের ক'টা বছর তার ভেতর যে জলপ্রপাতটা চাপা পড়ে ছিল, হঠাৎ সেটা বেরিয়ে পড়েছে।

হিরণ আর সুধার পরিকল্পনাটা অনেক আগেই ধরে ফেলেছিল বিনু। এই যে লেকে বেড়াতে নিয়ে আসা, ফুচকা আর আইসক্রিম খাওয়া, মাছেদের মুড়ি খাওয়ানো, জলের কিনারে বসে বাইচের নৌকোর ছোটাছুটি দেখা, সাদার্ন অ্যাভেনিউর ফুটপাথ ধরে উদ্দেশ্যহীনের মতো ঘোরাঘুরি—অতি সামান্য, অতি তুচ্ছ এই ঘটনাগুলোর মধ্যে রয়েছে সুধাদের একটাই লক্ষ্য। দুঃস্বপ্নের মতো ঢাকার সেই ক'টা দিন তার স্মৃতি থেকে যাতে মুছে যায় সেজন্য সর্বক্ষণ, শতভাবে তাকে অন্যমনস্ক রাখা।

হিরণ বলছিল, 'আজ লেকে বেড়ানো হল। কাল তোমাদের কোথায় নিয়ে যাব, মনে আছে তো?'

ঝিনুক ভুলে গিয়েছিল। উৎসুক সুরে জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় হিরণদা?'

হিরণ বলল, 'জলসায়।'

'জলসা কী?'

'কাল গেলেই দেখতে পাবে।'

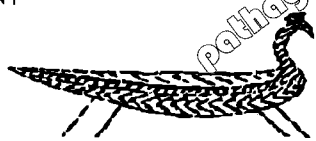

pathagar.net

পরদিন সকালে চায়ের পর্ব চুকিয়ে হিরণ বলল, 'চল বিনু, বাজারটা সেরে আসি।'

কাছেই দু'টো বেতের মোড়ায় বসে ছিল ঝিনুক আর সুধা। বিনুর চোখ ঝিনুকের দিকে ঘুরে গেল। হয়তো নিজের অজান্তে, কিংবা স্বয়ংক্রিয় কোনও অভ্যাসে। সামান্য ইতস্তত ভাব। জিজ্ঞেস করল, 'হিরণদার সঙ্গে ঘুরেই আসি, কী বল?'

রাজদিয়ায় হেমনাথের পুকুরঘাটে রাজেকের নৌকোয় ওঠার পর থেকে এক লহমাও বিনুকে চোখের আড়াল করতে চাইত না ঝিনুক। সবসময় তাকে আঁকড়ে থাকত। কোনও জরুরি কাজে কোথাও গেলে ভীষণ উতলা হয়ে উঠত। কেঁদেকেটে পৃথিবী উথালপাতাল করে ফেলত। তখন দিবারাত্রি তার আতঙ্ক, বিনু কোথাও গিয়ে যদি ফিরে না আসে, কে তাকে দেখবে? চারপাশের সহস্র বিপদ থেকে কে তাকে

রক্ষা করবে? এই বিপুল পৃথিবীতে সে হয়ে পড়বে সম্পূর্ণ একা, একেবারে অসহায়। ঢাকার সেই ধর্ষক বাহিনীর মতো অগুনতি হানাদার জগৎ জুড়ে থিক থিক করছে। বিনু আগলে না রাখলে জন্তুগুলো তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাবে তার শরীরটা।

সেই ঝিনুকই হেসে বলল, 'আমাকে জিজ্ঞেস করার কী আছে? যাও না—'

হিরণ নিষ্পলক তাকিয়ে থাকে কিছুক্ষণ। কাল থেকে ঝিনুককে যত দেখছে, বিস্ময়ের মাত্রাটা ক্রমশ বেড়েই চলেছে। যে মেয়েটা অসীম ত্রাসে আর উৎকণ্ঠায় নিজেকে শক্ত আবরণের মধ্যে গুটিয়ে নিয়েছিল, খোলা ভেঙে একদিনেই সে বেরিয়ে এসেছে। ভালবাসার উত্তাপ কি সব শঙ্কা হরণ করে নেয়?

সুধার কাছ থেকে মাছ এবং আনাজপাতির জন্য আলাদা দু'টো চটের ব্যাগ নিয়ে বিনুকে সঙ্গে করে বেরিয়ে পড়ল হিরণ।

রাস্তায় এসে পানের দোকান থেকে ছ'আনায় এক প্যাকেট ক্যাপস্টান নেভি কাট সিগারেট কিনে, একটা স্টিক বার করে ধরিয়ে নিল।

বিনু হাঁ হয়ে গিয়েছিল। রাজদিয়ায় থাকতে হিরণ ছিল নিপাট ভাল ছেলে। ছোট ছোট করে মাথায় কদমফুল ছাঁট দিত। বিলাসিতা বলতে কিছু ছিল না। নেশাভাঙের ধারেকাছে ঘেঁষত না। এমনকি দাঁতে সুপুরি পর্যন্ত কাটত না। মুখশুদ্ধি বলতে শুধু যোয়ান কি লবঙ্গ। সেই হিরণ কিনা সিগারেট ধরেছে!

মজা করতে ইচ্ছা হল বিনুর, 'কলকাতায় এসে আপনার কিন্তু বেশ উন্নতি হয়েছে হিরণদা—'

ইঙ্গিতটা ধরতে পেরেছিল হিরণ। তার মুখে অপ্রতিভ হাসি ফোটে। মাথা চুলকে বলে, 'ডিফেন্সের চাকরিতে ঢুকে বন্ধুদের পালায় পড়ে বদভ্যাসটা হয়ে গেছে। হেমদাদু জানতে পারলে ঘাড় থেকে মুন্ডুটা ঘচাং করে নামিয়ে দেবেন। কতবার ভেবেছি, সিগারেটটা ছেড়ে দেব। কিন্তু হ্যাবিট একবার কাঁধে চেপে বসলে ছাড়ানো মুশকিল। কামড়ে ধরে থাকে।'

বিনু উত্তর দিল না। হাসতে লাগল। নানা অচেনা অলিগলি দিয়ে তাকে নিয়ে ট্রামরাস্তায় চলে এল হিরণ। সেটা পেরিয়ে আরেকটা রাস্তা ধরে চওড়া একটা খালের ধারে পৌঁছতেই মস্ত বাজার। লম্বা, টানা টানা টিনের চালার তলায় দোকানের সারি। মাছের। মাংসের। ফলের। সবজির। কাঁসা এবং পেতলের বাসনের। এ ছাড়া মুদিখানা। দশকর্মা ভান্ডার।

চালাগুলোর বাইরেও খালের কিনার ঘেঁষে অনেকখানি ফাঁকা জায়গা জুড়ে বিরাট বিরাট ঝাঁকা বোঝাই করে নানা ধরনের আনাজ নিয়ে বসেছে দোকানিরা। দেখেই বোঝা যায়, এরা চাষী শ্রেণীর মানুষ। নিজেরাই সবজি ফলিয়ে বেচতে এসেছে।

খালে এখন ভরা জোয়ার। দু'কূল ছাপিয়ে ঘোলা জল খলবল করতে করতে ছুটে চলেছে।

হিরণ বলল, 'এটা হল আদিগঙ্গা।' উত্তর দিকে আঙুল বাড়িয়ে জানায়, জলের এই ধারাটা কালীঘাটের পাশ দিয়ে চলে গেছে। ওপারে নিউ আলিপুর। যুদ্ধের পর ওখানে নতুন টাউনশিপ গড়ে উঠেছে। কলকাতার পয়সাওলা লোকেরা চমৎকার সব বাড়ি বানিয়ে ওখানে থাকে।

চাষীদের কাছে ঘুরে ঘুরে প্রচুর আনাজ কিনল হিরণ। আলু, মোচা, পালং, ধনে পাতা, লাউশাক, সোনালি কুমড়োর ফালি। হেমন্তের শুরুতেই ফুলকপি উঠতে শুরু করেছে। তাও চারটে কিনল। সতেজ, টাটকা সবজি। সেগুলোর গায়ে ভোরের শিশির আর মাটি এখনও লেগে আছে।

সবজির পর মাছ। তিন রকম মাছ কিনল হিরণ। পাকা রুইয়ের পেটি। আড়াই টাকা সের। সঙ্গে মুড়োটা ফাউ। বড় পার্শে, সের দু'টাকা। আর মৌরলা। মৌরলাটা অবশ্য সের দরে নয়। ভাগা দিয়ে রাখা ছিল। একেক ভাগায় পোয়া দেড়েকের মতো। দাম এক আনা।

বিনু অবাক হয়ে যাচ্ছিল। সুজনগঞ্জের হাটে কিংবা রাজদিয়া বা তালতলির বাজারে হেমনাথ আর যুগলের সঙ্গে কতবার সে গেছে। কিন্তু কোনও দিন দাঁড়িপাল্লায় ওজন করে মাছ বেচতে দেখেনি। মাছ কেটে বিক্রির রেওয়াজই সেখানে নেই। আস্ত আস্ত রুই কাতলা গরমা বোয়াল কি কোড়াল ব্যাপারিরা বাঁশের কি বেতের বড় বড় চাঙারিতে সাজিয়ে রাখত। দরদাম করে তারা কিনত।

বিনু বলল, 'সের দরে মাছ বিক্রি হয়, এই প্রথম দেখলাম।'

হিরণ বলে, 'কলকাতায় অনেকদিন এই নিয়ম চালু আছে। বড় মাছ কেটে ওজন করে বিক্রি হয়। চুনো মাছ খাউকো।'

খুব ছেলেবেলায় কয়েক বছর বিনু কলকাতায় ছিল। তখন এখানকার বাজারে কখনও যায় নি। মাছ কিভাবে বিক্রি হত, তার ধারণাই নেই। ভাল করে জ্ঞান হবার পর থেকেই তো সে রাজদিয়ায়।

বিনু বলল, 'দু'টাকা দিয়ে যে রুই মাছের টুকরোটা কিনলেন, ওই টাকায় সুজনগঞ্জের হাটে বিরাট একটা রুই কি কালবাউস পাওয়া যেত। কম করে সেটার ওজন চার থেকে পাঁচ সের।'

হিরণ বলল, 'এটা কলকাতা শহর। এখানে সব জিনিসের দাম ইস্ট বেঙ্গলের চাইতে কয়েক গুণ বেশি।'

নিজের চোখেই তা দেখেছে বিনু। সে আস্তে মাথা নাড়ে।

হিরণ থামে নি, 'যুদ্ধের সময় যখন চাকরি নিয়ে কলকাতায় আসি, কাটা পোনা বার আনায় এক সের পাওয়া যেত। ক'বছরে দাম কত বেড়ে গেছে। এই যে বাড়া শুরু হয়েছে, আর কোনও দিন নামবে না।'

বিনু উত্তর দিল না।

বাজার সেরে মিষ্টির দোকান থেকে হাঁড়িবোঝাই রাজভোগ আর সাদা ধবধবে চিনিপাতা দই কিনল হিরণ। দই-মিষ্টির হাঁড়ি বিনুকে দিয়ে মাছ আর আনাজের ব্যাগ নিজের হাতে ঝুলিয়ে নিয়েছে সে। বলল, 'এক্ষুনি আমরা কিন্তু বাড়ি ফিরছি না।'

বিনু বলল, 'কখন ফিরবেন?'

হিরণ বলল, 'তোমাকে এক জায়গায় নিয়ে যাব। সেখান থেকে বাড়ি ফিরতে হয়তো মিনিট পনের সময় বেশি লাগবে।'

বিনু অবাক হচ্ছিল। থলে বোঝাই আনাজপাতি মাছটাছ নিয়ে কার সঙ্গে দেখা করতে চলেছে হিরণ? কৌতূহল হলেও কোনও প্রশ্ন করল না।

মুখ দেখে বিনুর মনোভাব আন্দাজ করে নিয়েছে হিরণ। একটু হেসে বলল, 'আমরা কারোর কাছেই যাচ্ছি না। তোমাকে একটা জিনিস দেখাব। সেই জন্যেই যাওয়া—'

'কী দেখাবেন?'

'অত অধৈর্য কেন? চলই না—'

ফের তারা ট্রামরাস্তায় চলে আসে। যে অলিগলি দিয়ে খানিক আগে বাজারে এসেছিল, সেদিকে গেল না হিরণ। অন্যদিকের আঁকাবাঁকা রাস্তা ধরে চলতে লাগল।

এখানে ঝোপঝাড়ে ভরা কিছু কিছু ফাঁকা মাঠ, পানা পুকুর, ডোবা যেমন চোখে পড়ে, তেমনি রয়েছে খাপরা কি টিনে ছাওয়া চাপ-বাঁধা বস্তি। পুরনো একতলা দোতলা তেতলাও রয়েছে অনেকগুলো। দূরে একটা মাজারও দেখা যাচ্ছে।

বস্তির পাশ দিয়ে যেতে যেতে টের পাওয়া যায়, এগুলোতে গরিব মুসলমানেরা থাকে। দিন-আনা, দিন-খাওয়া সব মানুষ। সামনের দিকে প্রচুর বাচ্চাকাচ্চা ছোটাছুটি করছে। মেয়েদের গায়ে সস্তা ময়লা ফ্রক। ছেলেদের দড়ি-লাগানো ছেঁড়াফাটা ইজের, জামা কি গেঞ্জি। এক পাল মুরগি তাদের সঙ্গে সমানে পাল্লা দিচ্ছে।

নানা বয়সের কিছু পুরুষ আর মেয়েমানুষও রয়েছে। পর্দার তেমন কড়াকড়ি নেই। সবাই একদৃষ্টে বিনুদের লক্ষ করছে। চোখে মুখে অস্বাচ্ছন্দ্য। নাকি ভয়? কিংবা শঙ্কা? ইন্ডিয়ায় নিরাপত্তার অভাবে কি তারা ভুগছে?

বাস্তিটা পেরিয়ে এসে হিরণ বলল, 'ফর্টি সিক্সের ডাইরেক্ট অ্যাকশানের দিন এখান থেকে মিছিল বেরিয়ে গড়ের মাঠের দিকে গিয়েছিল।'

বিনু চকিত হয়ে ওঠে। কলকাতার ডাইরেক্ট অ্যাকশান বা প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ইতিহাস তার খুব ভাল করেই জানা। এই তো সেদিনের কথা। লোকের মুখে তো শুনেছেই, এখান থেকে ডাক এডিশনের যে খবরের কাগজ রাজদিয়ায় যেত সেগুলোতে শুধু দাঙ্গার ভয়াবহ বিবরণ। আগুনে-পোড়া বাড়িঘর

আর রাস্তায় রাস্তায় সারি সারি মৃতদেহের ছবি। পাতার পর পাতা জুড়ে।

হিরণ বলছিল, 'পার্টিশানের পর এখান থেকে অনেকে চলে গেছে। কেউ ইস্ট পাকিস্তানে, কেউ ওয়েস্ট পাকিস্তানে। যাদের যাবার উপায় নেই, তারা পড়ে আছে।'

বিনু নিজের চোখে দেখে নি, তবে শুনেছে, ইন্ডিয়া থেকে বর্ডার পেরিয়ে বহু মুসলমান ওপারে চলে গেছে। তাদের বেশির ভাগই উঠেছে ঢাকায়, খুলনায় কিংবা চট্টগ্রামে।

মুসলমানদের ওপারে যাওয়া নিয়ে আর কোনও কথা হল না। আরও মিনিট তিনেক হাঁটার পর একটা বেশ চওড়া রাস্তায় সাবেক ধাঁচের তেতলা বাড়ির সামনে এনে বিনুকে দাঁড় করাল হিরণ। বাড়িটার চারপাশ ঘিরে বেশ খানিকটা করে ফাঁকা জায়গা। এককালে হয়তো ফুলের বাগান ছিল। ফুল শুকিয়ে, পাতা ঝরে গাছগুলো এখন কাঠিসার। উঁচু বাউন্ডারি ওয়াল কোথাও কোথাও ভাঙাচোরা। রাস্তার দিকের লোহার গেটে মস্ত তালা ঝুলছে। দরজা জানালা সব বন্ধ। বোঝা যায়, অনেকদিন ফাঁকা পড়ে আছে।

আশেপাশে এমন জনমানবহীন, তালাবন্ধ বাড়ি আরও ক'টা চোখে পড়ল। তবে কাছে দূরে অন্য বাড়িগুলোতে অবশ্য লোকজন আছে। দরজা বা জানালা দিয়ে কৌতূহলী কিছু মুখ উঁকি দিচ্ছে। চোখাচোখি হলেই আড়ালে সরে যাচ্ছে।

যে বাড়িটার সামনে বিনুরা দাঁড়িয়ে আছে সেটার গেটের গায়ে পাথরের ফলকে ইংরেজি হরফে লেখা ঃ খান মঞ্জিল। প্রতিষ্ঠা ঃ ১৮৮০। একেবারে নীচে ঃ রহমত আলি খান, এম.এ, বি.এল।

একটা নিঝুম প্রাচীন ইমারতের সামনে কেন হিরণ তাকে টেনে এনেছে, কে জানে। চারদিক দেখেশুনে মনে হল, শিক্ষিত, ভদ্র মুসলমানদের এলাকা।

হিরণ জিজ্ঞেস করল, 'বাড়িটা কেমন দেখছ বিনু?'

সমস্ত ব্যাপারটা হেঁয়ালির মতো। হিরণের উদ্দেশ্য বোঝা যাচ্ছে না। বিনু কী উত্তর দিতে যাচ্ছিল, হিরণ ফের বলল, 'প্রায় সত্তর বছর বয়েস হতে চলল বাড়িটার, কিন্তু এখনও বেশ মজবুত। চার তলার ভিত, দেওয়ালগুলো বিশ ইঞ্চি চওড়া, শ্বেত পাথরের মেঝে। ভেতরে বর্মা টিকের আসবাব। একটু সারিয়ে সুরিয়ে রং করে নিলে আরও পঞ্চাশ ষাট বছর নিশ্চিন্তে কেটে যাবে। তা ছাড়া, ছ'কাঠার ওপর জায়গা।'

কোনও মুসলিম পরিবারের আদ্যিকালের সাদামাঠা এক বাড়ির গুণকীর্তন বিনুর ধন্দ শতগুণ বাড়িয়ে দেয়। সে বলে, 'এই বাড়িটা নিয়ে এত মাথা ঘামাচ্ছেন কেন?'

হিরণ বলে, 'কারণ আছে। জানো, পার্টিশানের পর কলকাতার জমি-বাড়ির দাম কী সাঙ্ঘাতিক বেড়ে গেছে! এই এলাকায় এক কাঠা জমি এখন তিরিশ হাজার টাকা। দু'চার বছরের মধ্যে ষাট সত্তরে উঠে যাবে। চল, বাড়ি যাওয়া যাক। যেতে যেতে সব বলছি।'

ওরা যে পথে এসেছিল সেই পথেই ফিরে চলেছে। ধীরে ধীরে রহস্যের আবরণ উন্মোচন করতে থাকে হিরণ। 'খান মঞ্জিল'-এর পাথরের ফলকে যাঁর নাম লেখা আছে সেই রহমত আলি খান ছিলেন আলিপুর কোর্টের বাঘা উকিল। বিরাট পশার ছিল তাঁর। বিপুল আয়।

রহমত আলিদের আদি বাড়ি বিহারের হাজারিবাগ ডিস্ট্রিক্টে। কয়েক পুরুষ কলকাতায় থেকে প্রায় বাঙালি হয়ে গিয়েছিলেন। রহমতের মৃত্যুর পর তাঁর ছেলে শওকত আলি 'খান মঞ্জিল'-এর মালিক হন। বাবার মতো তিনি কৃতী নন। লেখাপড়ায় মনোযোগ ছিল না। কোনও রকমে ম্যাট্রিকুলেট। টেরিটি বাজারে কী সব যন্ত্রপাতির মাঝারি একটা দোকান আছে।

দাঙ্গার সময় টালিগঞ্জের বাড়িতে তালা লাগিয়ে শওকত বিবি আর ছেলেমেয়ে নিয়ে পার্ক সার্কাসে চলে যান। সেখানে ভাড়া বাড়িতে থাকেন। 'খান মঞ্জিল'-এ আর ফিরে আসেন নি। তিনি মনস্থির করে ফেলেছেন, ইন্ডিয়ায় থাকবেন না। টেরিটি বাজারের দোকান এক বন্ধুকে দিয়ে 'খান মঞ্জিল' এক্সচেঞ্জ করে ইস্ট বেঙ্গলে চলে যাবেন।

হিরণের সঙ্গে হঠাৎই তাঁর যোগাযোগ ঘটে গিয়েছিল। তিনি রাজদিয়ায় হিরণদের বাড়ি এবং জমিজমার সঙ্গে টালিগঞ্জের এই বাড়িটা এক্সচেঞ্জ করতে চান।

পূর্ব পাকিস্তানে আবহাওয়া যেভাবে বিষময় হয়ে উঠেছে, সেখানে গিয়ে জমিজমা ঘরবাড়ি বেচে

টাকা নিয়ে আসা অসম্ভব। হিরণের কানে এসেছে, হিন্দুদের ফেলে আসা বাড়ি টাড়ি এনিমি প্রপার্টি বা শত্রু সম্পত্তি হিসেবে খুব শিগগিরই ঘোষণা করা হবে।

দেশের ভিটেমাটি সম্পর্কে সব আশা যখন প্রায় শেষ, অযাচিতভাবে শওকত আলি খানের প্রস্তাবটা এসেছে। হিরণ ভীষণ উত্তেজিত। সম্ভব হলে আজকালের মধ্যে সে এক্সচেঞ্জটা করে ফেলতে চায়। তার ঠাকুরদা দ্বারিক দত্তও রাজি। কিন্তু জেঠিমা আর সুধার খুবই আপত্তি। একমাত্র হেতু, 'খান মঞ্জিল' মুসলমানদের বাড়ি।

হিরণ বলছিল, 'তুমিই বল বিনু, এত বড় একটা সুযোগ হাতছাড়া করার কোনও মানে হয়? ইস্ট বেঙ্গল থেকে যে হিন্দুরা এপারে চলে এসেছে তাদের অনেকে প্রপার্টি এক্সচেঞ্জ করার জন্যে হন্যে হয়ে ঘুরছে। আমাদের দেরি হলে অন্য কারোর সঙ্গে হয়তো শওকত সাহেব এক্সচেঞ্জের ব্যবস্থা করে ফেলবেন। তখন আপসোসে হাত কামড়ানো ছাড়া আর কিছু করার থাকবে না।'

রাজদিয়ায় থাকতে হিরণ ছিল আলাভোলা ধরনের। নিজের পড়াশোনা ছাড়া পার্থিব অন্য কোনও দিকেই তার বিশেষ নজর ছিল না। কিন্তু কলকাতায় এ কোন হিরণকে দেখছে বিনু? মাত্র ক'বছরে যেন অনেক বয়স্ক হয়ে উঠেছে। অত্যন্ত অভিজ্ঞ। এখন তার প্রখর বিষয়বুদ্ধি। প্রবল বাস্তব বোধ। চতুর্দিকে তার সজাগ দৃষ্টি।

হিরণ ফের বলে, 'আরে বাবা, এক্সচেঞ্জ হবার সঙ্গে সঙ্গেই কি আমরা 'খান মঞ্জিল'-এ ঢুকে পড়ছি? আগে বাড়িটা রিপেয়ার করে রং করাব। ভেতরকার অনেক কিছু বদলাতে হবে। তারপর তো এখানে বাস করতে আসা। 'খান মঞ্জিল' তখন আর 'খান মঞ্জিল' থাকবে না।'

হিরণ বুঝিয়ে দিল, দু'তিন পুরুষ যারা এখানে থেকেছে তাদের বসবাসের যাবতীয় চিহ্ন মুছে দেবে সে। অতীতের সমস্ত স্মৃতি নির্মূল না করে এ বাড়িতে ঢুকবে না।

দ্বিজাতি তত্ত্বের বিষবৃক্ষ অনেকদিন আগেই বিনুর রক্তের ভেতর কখন নিঃসাড়ে ডালপালা মেলে দিয়েছিল। সে দ্বিধার সুরে বলল, 'কিন্তু—'

হিরণ চলতে চলতে একটু থমকে বিনুর চোখের দিকে তাকায়। জিজ্ঞাসু সুরে বলে, 'কিন্তু কী?'

বিনু বলল, 'বাড়িটা যে এলাকায় সেখানে কিন্তু হিন্দুরা থাকে না।'

হিরণ সামনের দিকে পা বাড়িয়ে বলে, 'কে বলল, থাকে না? ওটা মিক্সড লোকালিটি। প্রচুর হিন্দুও ওখানে আছে। বেশ কিছু মুসলিম ফ্যামিলি পার্টিশানের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুদের কাছে বাড়ি বেচে পাকিস্তানে চলে গেছে। বাকি অনেকেই এখন এক্সচেঞ্জ করছে। সেই সব বাড়িতে ওপারের হিন্দুরা আসছে।' একটু ভেবে বলল, 'এর মধ্যেই এখানে সেভেনটি পারসেন্ট হিন্দু হয়ে গেছে। কোনও রকম দুশ্চিন্তার কারণ নেই।'

বিনু উত্তর দিল না।

হিরণ বলল, 'যাতে কোনও খিঁচ না থাকে, বাড়ির নামও পালটে দেবে। মালিকানাই যখন বদলে যাবে, আগের নামই বা থাকবে কেন?'

বিনু এবারও চুপ।

হিরণ থামে নি, 'তোমার ছোটদিকে ভাল করে বোঝাও। এক্সচেঞ্জ না করতে পারলে, এ জীবনে কলকাতায় আমাদের নিজস্ব বাড়ি কোনও দিনই হবে না। ভাড়া বাড়িতেই লাইফ কাটিয়ে দিতে হবে।'

হিরণ যা বলল তা উড়িয়ে দেবার মতো নয়। যথেষ্ট সারবত্তা আছে তাতে। ইতস্তত ভাবটা পুরোপুরি না কাটলেও বিনু বলল, 'ঠিক আছে, ছোটদিকে বোঝাব।'

একসময় দু'জনে বাড়ি পৌঁছে যায়।

লক্ষ্মীপুজোর পর থেকেই সারা কলকাতা জুড়ে জলসায় ধুম পড়ে যায়। চলে সেই ফাল্গুনের

শেষ অব্দি। একটানা। কখনও এপাড়ায়, কখনও ওপাড়ায়। কোথাও সন্ধেবেলায় শুরু হয়ে মাঝরাতে শেষ হয়। কোথাও সমস্ত রাত চলে। বড় অনুষ্ঠানগুলোর মেয়াদ পুরো দু'রাত। একদিন লাইট মিউজিক, কমিক, ম্যাজিক, এমনি রকমারি মনোরঞ্জনের ব্যবস্থা। আরেকদিন শুধুই উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত।

দেশভাগ হয়ে গেছে। হাজার হাজার শরণার্থীর ঢল নেমেছে কলকাতায়। শিয়ালদা স্টেশনে, রিফিউজি ক্যাম্পগুলোতে কত যে মানুষ পচে গলে মরে ঝরে যাচ্ছে! না খেতে পেয়ে। বিনা চিকিৎসায়।

পার্টিশানের জের এখনও কাটে নি। কবে কাটবে, কেউ জানে না। কিছুদিন চুপচাপ। মনে হয়, সব বুঝি স্বাভাবিক হয়ে এল। বিষবাষ্প সরে গিয়ে এবার নির্মল বাতাস বইবে।

কিন্তু মানুষের মনে ক'বছর ধরে যে গরল জমা হয়েছে তা কি সহজে নিশ্চিহ্ন হয়? এত তাড়াতাড়ি দুরারোগ্য ব্যাধির উপশম কি সম্ভব?

দু'দশ দিন কি মাসখানেক পর পর আচমকা মানুষের গনগনে আক্রোশ ফেটে বেরোয়। তখন দেশের কোথাও দাঙ্গা। কোথাও আগুন। কোথাও হত্যা।

কিন্তু কলকাতার বিশেষ তাপ-উত্তাপ নেই। উদাসীন এই শহরের খাঁটি নাগরিকেরা নিজেদের আমোদ ফূর্তি নিয়েই মজে আছে।

হিরণের অফিসের এক বন্ধু থাকে ভবানীপুরে। হরিশ মুখার্জি রোডে। ওখানকারই হরিশ পার্কে মস্ত প্যান্ডেল বানিয়ে জলসার আয়োজন করা হয়েছে। বন্ধুটি অনুষ্ঠানের বড় পান্ডা। সে হিরণকে চারখানা কার্ড দিয়েছিল।

হিরণ ঠিক করে রেখেছিল, সুধাকে নিয়ে জলসায় যাবে। বিনুরা আসায় ভালই হয়েছে। সবগুলো কার্ডই কাজে লাগানো যাবে। নইলে দু'টো নষ্ট হত।

সন্ধে সাতটায় অনুষ্ঠান শুরু হবার কথা। আজকাল দিন ছোট হয়ে এসেছে। সাড়ে পাঁচটা বাজতে না বাজতেই সন্ধে নামে, বাতাসে হালকা সরের মতো কুয়াশা ভাসতে থাকে।

বেলা পড়ে এলে ঝিনুককে সাজাতে বসল সুধা। এখন টানের সময়। শুকনো হাওয়ায় গা চড়চড় করে। মুখের চামড়া খসখসে হয়ে যায়।

ভেজা তোয়ালে চেপে চেপে ঝিনুকের মুখটা পরিষ্কার করে মুছে, সযত্নে ক্রিম মেখে দিল সুধা। বিনুনি করে লম্বা ঘন চুল বাঁধল। কপালের মাঝখানে বড় গোলাপি টিপ আঁকল পরিপাটি করে। আলমারি থেকে নিজের দামি সিল্কের শাড়ি, কোট আর ব্লাউজ বার করে দিয়ে বলল, 'পরে ফেল—'

মাত্র দু'দিন এ বাড়িতে আছে ঝিনুক। মনে হচ্ছিল, জন্মাবধি সুধারা তাকে নিবিড় মমতায় জড়িয়ে রেখেছে। গাঢ় আবেগ কান্না হয়ে গলার কাছে জমাট বেঁধে যাচ্ছে। বেরিয়ে আসতে পারছে না। ঢোক গিলতে কষ্ট হচ্ছে, তবু কত যে সুখ!

শাড়ি ব্লাউজ কোটটোট বুকে আঁকড়ে রাখে ঝিনুক। ঠোঁট দু'টো থরথর কাঁপছে। অজান্তেই বুঝি চোখ থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় জল ঝরে যাচ্ছে।

ঝিনুকের আবেগ সুধার মধ্যেও চারিয়ে যায়। ধরা গলায় সে বলে, 'এই মেয়ে, চোখের জল মোছ—'

সম্বিত ফিরে আসে ঝিনুকের। ত্বরিত হাতে চোখ মুছে মৃদু হাসে সে, 'তোমার কাছে এসে বেঁচে গেছি ছোটদি—'

'বোকা মেয়ে। ওসব কী কথা!' সুধার ধমকে স্নেহ মাখানো, 'আমি তোমার দিদি হই না? এমন কথা আর কখনও বলবে না। অনেক দূর যেতে হবে। শাড়িটা পরে নাও—'

ঝিনুক শাড়িটা পরল ঠিকই। কিন্তু কেমন যেন অগোছাল, জবরজং। গেঁয়ো ভাব ফুটে বেরিয়েছে।

পাশে দাঁড়িয়ে লক্ষ করছিল সুধা। তার মোটেও পছন্দ হয় নি। কপালে সামান্য ভাঁজ পড়ল। 'উঁহু উঁহু, এটা রাজদিয়া নয়। এভাবে কলকাতার মেয়েরা শাড়ি পরে না।' নিপুণ হাতে নিজেই ঝিনুককে শাড়িটা পরিয়ে দিল সে।

শাড়ি পরার ধরন পালটে দিতেই অনেকখানি বদলে গেছে ঝিনুক। গেঁয়ো ভাবটা উধাও। এখন তাকে বেশ সপ্রতিভ দেখাচ্ছে। রীতিমতো আধুনিকা।

ঝিনুককে সাজিয়ে নিজের সাজসজ্জা চুকিয়ে ফেলল সুধা। সাজতে ভীষণ ভালবাসে সে। এরই ফাঁকে ফাঁকে অনবরত হিরণ আর বিনুকে তাড়া দিয়ে যাচ্ছিল। অগত্যা ওদেরও পোশাক টোশাক বদলে নিতে হল।

উমার হাতে বাড়ির দায়িত্ব সঁপে ওরা যখন বেরুল, ছ'টাও বাজে নি। তবে কুয়াশা আরও একটু ঘন হয়েছে। হেমন্তের শেষ আলোটুকু অনেক আগে একটানে কেউ যেন গুটিয়ে নিয়েছিল। সারা শহর মুড়ে দিয়ে হালকা অন্ধকার নেমে এসেছে। অবশ্য রাস্তায় রাস্তায় কর্পোরেশনের টিমটিমে আলোগুলো জ্বলে উঠেছে। দু'ধারের বাড়িঘরে জ্বলছে বেশি পাওয়ারের বিজলি বাতি।

হিরণ বিনুকে বলল, 'তোমার ছোটদির সমস্ত ব্যাপারে তাড়াহুড়ো। কোথাও যাবার হলে সবার আগে পৌঁছনো চাই। জলসা শুরু হবে সাতটায়। এখান থেকে হরিশ পার্ক ট্যাক্সিতে মাত্র পনের মিনিট। এত তাড়াতাড়ি যাওয়ার মানে হয়?'

সুধা ভেবেছিল, বাস কি ট্রামে যাওয়া হবে। ট্যাক্সির কথা আগে জানায় নি হিরণ। সুধা খুবই উৎফুল্ল। 'কি আশ্চর্য, ট্যাক্সি করে নিয়ে যাবে, বল নি তো?'

হিরণ উত্তর দিল না।

সুধা বলতে লাগল, 'ফাংশানে আগে আগে যাওয়া ভাল। স্টেজের সামনের দিকের চেয়ারে বসা যায়। আমার বাপু, কাছে থেকে দেখতে না পেলে ভীষণ খারাপ লাগে।'

বড় রাস্তায় এসে ট্যাক্সি ধরল হিরণ। সামনের সিটে শিখ ড্রাইভারের পাশে বসেছে বিনু। পেছনে সুধা ঝিনুক আর হিরণ।

বিনু কাত হয়ে বসে হিরণদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে চোরা দৃষ্টিতে ঝিনুককে দেখছিল। অবশ্য বাড়ি থেকে বেরুবার আগেই তার চোখ মেয়েটার ওপর আটকে ছিল। কালকের চেয়ে ঝিনুক আজ আরও ঝলমলে। খুশিতে আরও ভরপুর। ভাবল, সুধাদের কাছেই যদি বাকি জীবনটা থাকা যেত! পরমুহূর্তে মনে পড়ল, দিন কয়েকের মধ্যে অবনীমোহন কলকাতায় ফিরে আসবেন। তখন কি আর পরের বাড়িতে পড়ে থাকা ঠিক হবে? বিষাদে, দুশ্চিন্তায় মাথার ভেতরটা হঠাৎ ভারী হয়ে ওঠে।

হিরণ বলছিল, 'পঙ্কজ মল্লিকের নাম শুনেছ ঝিনুক?'

তার বাবা ভবতোষের মার্ফি কোম্পানির বড় একটা রেডিও ছিল। ব্যাটারিতে চলত। সেই রেডিওতে পঙ্কজ মল্লিকের প্রচুর গান শুনেছে ঝিনুক। সবই অবশ্য রবি ঠাকুরের গান। কার কাছে যেন শুনেছিল, 'ডাক্তার' বলে একটা সিনেমায় এই পঙ্কজ মল্লিকই নাকি অভিনয়ও করেছেন। তবে সে ছবি তার দেখা হয়নি।

ঝিনুক বলল, 'শুনব না কেন? রাজদিয়ায় থাকতাম বলে এতটা গেঁয়ো ভাববেন না। রেডিওতে ওঁর কত গান শুনেছি।'

'শচীনদেব বর্মন?'

'বিরাট গায়ক। তাঁর নাম কে না জানে। দু'একদিন পরপরই রেডিওতে তাঁর গান বাজায়।'

একে একে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, জগন্ময় মিত্র, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, সত্য চৌধুরি, রবীন মজুমদার, আলপনা বন্দ্যোপাধ্যায়, উৎপলা সেন, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, এমনি আরও অনেকের নাম করে গেল হিরণ।

ভবতোষের শুধু রেডিওই না, বড় চোঙাওলা গ্রামোফোন কোম্পানির একটা কলের গানও ছিল। সেটার গায়ে লেখা : হিজ মাস্টার্স ভয়েস। একটা মুগ্ধ কুকুরের ছবিও ছিল তাতে। একাগ্র চিত্তে সে গান শুনছে।

হিরণ যাঁদের কথা বলল, ভবতোষ মাঝে মাঝেই কলের গানে তাঁদের রেকর্ড বাজাতেন। বাবার কাছে যখন ঝিনুক থাকত, এঁদের অনেকেরই গান শুনেছে। তবে বেশ কয়েকজন তার অচেনা। সুদূর কোনও গ্রহের মতো পূর্ব বাংলার নগণ্য শহর রাজদিয়ায় তখনও তাঁদের নাম পৌঁছয় নি।

ঝিনুক বলল, 'এই সব সিঙ্গারদের নাম করছেন কেন হিরণদা?'

pathagar.net

উত্তর না দিয়ে হিরণ জিজ্ঞেস করে, 'এঁদের কখনও নিজের চোখে দেখেছ?'

'কী করে দেখব? এঁরা কি কোনও দিন রাজদিয়ায় গেছেন?'

'আজ এঁদের সবাইকে দেখতে পাবে। কাছে বসে ওঁদের গানও শুনতে পাবে।'

হিরণ জানিয়েছিল, জলসা ব্যাপারটা পরে বুঝিয়ে দেবে। কিন্তু ঝিনুক এর মধ্যেই মোটামুটি আন্দাজ করে নিয়েছে, জলসা হল গান বাজনার মজলিশ। সারা শরীরে শিহরন খেলে যাচ্ছিল তার, চোখেমুখে প্রবল উত্তেজনা। হিরণের মুখে শোনার পরও যেন বিশ্বাস হচ্ছিল না। পুরোপুরি নিশ্চিত হবার জন্য বলল, 'সত্যি বলছেন, ওঁরা আসবেন!'

হিরণ বলে, 'না এলে ওঁদের দেখবেই বা কী করে? কাছে বসে গান শোনার সুযোগই বা পাবে কিভাবে?'

হাতের মুঠোয় অযাচিত স্বপ্ন যেন নেমে এসেছে। নিমেষে সময়ের সীমানা পেরিয়ে অনেক কাল আগের এক বালিকা হয়ে যায় ঝিনুক। উচ্ছল। ভারমুক্ত। কারণে অকারণে যে রোমাঞ্চিত হতে ভালবাসে। প্রবলবেগে মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে ঝিনুক কলকলিয়ে ওঠে, 'উঃ, এ আমি ভাবতেও পারি না হিরণদা—'

ঝিনুকের ছেলেমানুষি, তার উচ্ছ্বাস দেখতে দেখতে হিরণ হাসে। মেয়েটা যে দ্রুত স্বাভাবিক হয়ে উঠছে, এতে খুব ভাল লাগছে তার।

হরিশ পার্কে এসে দেখা গেল, গোটা পার্কটা জুড়ে ত্রিপল টিন বাঁশ ইত্যাদি দিয়ে ঘেরা বিশাল মন্ডপ। রাস্তার দিকে অস্থায়ী কোলাপসিবল গেট, ফুললতাপাতা দিয়ে সাজানো। মাইকে সানাইয়ের রেকর্ড বাজানো হচ্ছে। বাতাসের কাঁধে চেপে মধুর সুর ছড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ছে নানা দিকে। মাঝে মাঝে সানাই থামিয়ে ঘোষণা করা হচ্ছে, 'যারা প্যান্ডেলে এসেছেন, অনুগ্রহ করে শান্ত হয়ে বসুন—' কিংবা 'ঠিক সাতটায় আমাদের অনুষ্ঠান শুরু হবে। শিল্পীরা কিছুক্ষণের মধ্যে এসে যাবেন।' ক্রমান্বয়ে সানাই। তারপর ঘোষণা। আবার সানাই। আবার ঘোষণা।

চারদিকে উৎসব উৎসব আবহাওয়া। স্বপ্নের পরিবেশ। অপলক তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল ঝিনুক।

গেটের মুখে মাঝারি ভিড়। সুধাই শুধু নয়, তার মতো দূরদর্শী আরও অনেকেই রয়েছে। মঞ্চের কাছাকাছি ভাল জায়গা দখল করার জন্য আগেভাগেই তারা হাজির।

হিরণের বন্ধুটির নাম আদিত্য। তেমন লম্বা না হলেও বেশ সুপুরুষ। ধারাল, সপ্রতিভ চেহারা। ধুতি আর কাজ-করা পাঞ্জাবিতে চমৎকার দেখাচ্ছে।

গেটের কাছে দাঁড়িয়ে ভিড় সামলাচ্ছিল আদিত্য। হিরণদের দেখে হাসিমুখে এগিয়ে এল, 'একটু আগে এসে ভাল করেছিস। পরে এলে পেছন দিকে বসতে হত।'

চোখ সামান্য ছোট করে স্বামীর দিকে তীর হানল সুধা। ইঙ্গিতটা স্পষ্ট। কেন তাড়া দিয়েছিলাম, এবার বুঝতে পারছ?

মুখে বোকাটে হাসি ফুটিয়ে ঘাড় চুলকোয় হিরণ। সুধা মেয়েদের বেশি বুদ্ধি ধরে তা মেনে নিতেই হয়।

ঝিনুকদের দেখিয়ে আদিত্য জিজ্ঞেস করে, 'এদের তো ঠিক চিনতে পারলাম না।'

সুধা আদিত্যর সঙ্গে বিনুদের পরিচয় করিয়ে দেয়। ঝিনুক সম্বন্ধে বলে, 'ও সম্পর্কে আমার বোন হয়। পাকিস্তান থেকে ক'দিন হল ওরা এসেছে। বাড়িতে বসে থেকে কী করবে! বাড়তি কার্ডও ছিল। ফাংশানে নিয়ে এলাম।' বলেই ভয় হল, আদিত্য যদি পাকিস্তানের পরিস্থিতি জানতে চায় এবং কথায় কথায় এমন প্রসঙ্গ উঠে পড়ে যাতে ঝিনুক ফের নিজেকে গুটিয়ে নেয়? তার ঝলমলে ভাবটা লহমায় উধাও হয়?

কিন্তু আদিত্য এ সবের ধারকাছ দিয়েও গেল না। এখন তার ভীষণ ব্যস্ততা। বলল, 'ওদের নিয়ে এসে খুব ভাল করেছেন বউদি। চলুন, আপনাদের বসিয়ে দিই।'

হিরণ বলল, 'তোর বউ এসেছে?'

'দুপুর থেকে বাবার জ্বর। ডাক্তারকে কল দিয়ে এসেছি। এদিকে ফাংশান নিয়ে এখানে এমন আটকে গেছি যে বাড়িতে থাকতে পারলাম না। ডাক্তার এলে ওষুধ টোষুধের ব্যবস্থা করে সবিতা

pathagar.net

পরে আসবে। আমরা যতক্ষণ না ফিরছি, পিসি বাবাকে দেখবে। আশা করি, দু'এক ডোজ ওষুধ পড়লে জ্বরটা নেমে যাবে।'

হিরণরা জানে, আদিত্যদের বাড়ি খুব কাছেই। পার্কের ঠিক উলটো দিকে। ওর মা নেই। মাস ছয়েক হল বিয়ে হয়েছে। এখনও ছেলেপুলে হয় নি। বাড়িতে চারজন মানুষ। আদিত্য, সবিতা, আদিত্যর বাবা আর এক বিধবা পিসি। একজন আধাবয়সী রান্নার লোকও আছে। আদিত্যদের কাছেই থাকে। বাড়িরই একজন হয়ে গেছে।

আদিত্যর সঙ্গে প্যান্ডেলে চলে এল সুধারা। ভেতরটা চমৎকার সাজানো। মনোরম আলোয় ভরে আছে চারপাশ। একধারে উঁচু মঞ্চে বড় বড় পেতলের ফুলদানিতে অজস্র টাটকা রজনীগন্ধার ঝাড়। দু'টো মাইকও রয়েছে। পেছনে মস্ত সোনালি ফেস্টুনে বড় বড় নীল হরফে লেখা ঃ তরুণ সঙ্ঘের উদ্যোগে বিচিত্রানুষ্ঠান। দু'পাশে উইংস দিয়ে মঞ্চে যাতায়াতের পথও রয়েছে। সামনের দিকে শ্রোতাদের জন্য চেয়ারের সারি।

থোকায় থোকায় বেশ কিছু লোকজন এধারে ওধারে বসে আছে। আরও অনেকে আসছে।

মঞ্চের সামনের প্রথমটা বাদ দিয়ে দ্বিতীয় সারিতে হিরণদের বসিয়ে আদিত্য বলল, 'তোদের পাশের একটা চেয়ারে কাউকে বসতে দিবি না। বলবি লোক আছে। সবিতা এলে বসবে।'

হিরণ বলল, 'ঠিক আছে।'

'আর শোন, প্রচুর আর্টিস্ট আসবেন। ফাংশান শেষ হতে হতে ভোর হয়ে যাবে। রাত্তিরে তোরা এখানেই খাবি।'

'সে কী! মেসোমশায়ের জ্বর। এর ভেতর ওসব ঝামেলা করতে গেলি কেন? আমরা ভোর অব্দি থাকব না। সাড়ে দশটা, এগারটায় ট্যাক্সি নিয়ে চলে যাব।'

আদিত্য বলল, 'অত তাড়াতাড়ি চলে যাবি মানে! বড় বড় আর্টিস্টরা আসবেন দশটার পর থেকে। তাঁদের গান না শুনে কে তোদের যেতে দিচ্ছে?'

সুধাও বেঁকে বসল, 'ঠিক বলেছেন আদিত্যদা। ফাংশান শেষ না হওয়া পর্যন্ত ঝিনুক, বিনু আর আমি এখান থেকে এক পা-ও নড়ছি না। যার ইচ্ছে সে ফিরে যেতে পারে।'

এরপর ফেরার কথা মুখে আনা বৃথা। হাত উলটে নিরুপায় একটা ভঙ্গি করল হিরণ।

আদিত্য মজার সুরে টিপ্পনি কাটে, 'ক্ষমতা থাকলে চলে যাস।' একটু থেমে জানায়, নিজেদের বাড়িতে তারা রান্নাবান্নার ঝঞ্ঝাট করে নি। রাতে ঢালাও ভূরিভোজের ব্যবস্থা করা হয়েছে ক্লাবের তরফে। শিল্পীদের তো আপ্যায়ন করা হবেই, সপরিবারে অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তারা এবং তাদের গেস্টরাও খাবে। অতএব হিরণদের সঙ্কোচের কারণ নেই।

চকিতে গেটের দিকটা এক পলক দেখে নিয়ে আদিত্য চঞ্চল হয়ে ওঠে, 'তোরা বোস। গেটে ভিড় বাড়তে শুরু করেছে। যাই।' সে চলে গেল।

এমন সুসজ্জিত মন্ডপে এত মানুষ গান শুনতে আসছে, রাজদিয়ায় থাকলে তা ভাবাই যেত না। দ্রুত ফাঁকা চেয়ারগুলো ভরে যাচ্ছে। চারপাশে টুকরো টুকরো কথা। হাসির শব্দ। গোটা প্যান্ডেল জুড়ে অদ্ভুত এক গুঞ্জন। অবাক দৃষ্টিতে মাথা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সব দেখছিল ঝিনুক। কী ভাল যে তার লাগছে।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। সবিতা এল।

সুধা জিজ্ঞেস করে, 'মেসোমশাই এখন কেমন আছেন?'

সবিতা বলল, 'কার্তিকের হিম লেগে জ্বর। ডাক্তার দেখে গেছেন। বললেন, চিন্তার কিছু নেই। এক দাগ মিক্সচার খাইয়ে এসেছি।'

সুধা ঝিনুক আর বিনুর সঙ্গে সবিতার আলাপ করিয়ে দিল।

শ্যামবর্ণ, কিন্তু ভারি মিষ্টি চেহারা সবিতার। মুখে প্রতিমার আদল। স্বভাবটা মধুর। তার কথাবার্তা এবং হাসিতে এমন এক আপন করা ভাব আছে যা মুহূর্তে ঝিনুক আর বিনুকে জয় করে নিল। পাকিস্তান থেকে এসেছে শুনে প্রথমটা শিউরে উঠল সবিতা, 'উঃ, ওখানে যা চলছে, খবরের কাগজে পড়তে পড়তে ভয়ে দম আটকে যায়। তোমরা যে চলে আসতে পেরেছ, সেটা ভগবানের অসীম

কৃপা।' বোঝা যায়, সে ঈশ্বরবিশ্বাসী।

বিনু বা ঝিনুক উত্তর দিল না। নীরবে মাথা নাড়ল শুধু।

যেখানে আনন্দের এমন ব্যাপক আয়োজন, সমস্ত পরিবেশ খুশির প্লাবনে ভাসার জন্য উন্মুখ, সেখানে পাকিস্তানের প্রসঙ্গ হঠাৎ যেন তাল কেটে দিয়েছে।

সবিতা আর কিছু জানতে চাইবে কিনা, কে জানে। হিরণরা ত্রস্ত হয়ে ওঠে। পাকিস্তানের স্মৃতি যতই তারা আড়াল করে রাখতে চাক না, বিষবাষ্পে-ভরা এই ভূখন্ড ঝিনুকের পিছু ছাড়ে না। যেন অনিবার্য নিয়তি।

খুব সরল মনেই কথাগুলো বলেছে সবিতা। তা ছাড়া, সে জানেও না ঝিনুকের জীবন কিভাবে, কতখানি ধ্বংস হয়ে গেছে। আর হিরণ সুধা এবং বিনু তিল তিল করে কিভাবে তাকে বাঁচিয়ে তুলতে চাইছে।

সবিতা ঝিনুককে বলল, 'পাকিস্তানে আবার ফিরে যাবে নাকি?'

সুধা প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ল, 'না না, যাবার প্রশ্নই নেই।'

সবিতা বলল, 'যা ভয়ঙ্কর অবস্থা, ওখানে কক্ষনো যাবে না। দেশের কথা একদম ভুলে যাও।'

এবারও সুধাই বলল, 'ওরা চিরকালের মতো ইন্ডিয়ায় চলে এসেছে।'

'খুব ভাল করেছে।'

একটু চুপচাপ।

তারপর একেবারে অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল সবিতা। সুধাকে জিজ্ঞেস করল, 'কে তোমার সবচেয়ে ফেভারিট আর্টিস্ট?'

পাকিস্তানের প্রসঙ্গ ওঠায় হিরণদের শ্বাস আটকে গিয়েছিল। এবার তারা হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। আস্তে আস্তে বুকের ভেতরকার আটকানো বাতাস বার করে দিল।

ফেভারিট এবং আর্টিস্ট, দু'টো শব্দেরই মানে ঝিনুকের জানা। কে তার প্রিয় শিল্পী, কখনও তা ভেবে দেখে নি। জানালো, অনেকের গানই তার ভাল লাগে।

সবিতা নিরপেক্ষভাবে জানায়, 'আমার ভাই সবাই প্রিয়। পঙ্কজ হেমন্ত ধনঞ্জয় শচীনদেব, কাকে বাদ দিয়ে কার কথা বলব!' কয়েকজন গায়কের বিখ্যাত ক'টি গানের নাম করে জিজ্ঞেস করল, 'এগুলো শুনেছ?'

দাঙ্গার সময় সেই যে ঢাকা থেকে তাকে উদ্ধার করে আনা হয়েছিল, তারপর আর গানবাজনার কথা ভাবে নি ঝিনুক। ভাবার সময়ও নয় সেটা। সারা পৃথিবী তার কাছে শ্বাসরোধী অন্ধকার এক কুঠুরি। ঘরের কোণে নিজেকে লুকিয়ে রাখত সে। অসাড়, ম্রিয়মাণ। চারদিকে যা কিছু সুন্দর, মধুর, স্বপ্নমাখানো, সে সবের সঙ্গে তার যাবতীয় সম্পর্ক ছিঁড়ে গিয়েছিল।

ঝিনুক আস্তে মাথা নাড়ে, 'না—'

সবিতা বলল, 'আজ ওঁদের দিয়ে এই গানগুলো গাওয়াব।'

ঝিনুকের কৌতূহল হচ্ছিল। সে শুনেছে, শিল্পীরা নিজেদের খেয়ালে তাঁদের পছন্দমতো গানই গেয়ে থাকেন। শ্রোতাদের বেছে দেওয়া গান কি ওঁরা গাইবেন? জিজ্ঞেস করতে গিয়েও করল না সে।

বাঙালির সময়জ্ঞান বলতে কিছু নেই। দশটায় কিছু করবে বললে গড়াতে গড়াতে বারটায় টেনে নিয়ে যায়। কিন্তু তরুণ সঙ্ঘের বিচিত্রানুষ্ঠান কাঁটায় কাঁটায় সাতটাতেই শুরু হল।

গেট বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। প্যান্ডেলের কোনও চেয়ারই এখন খালি নেই। যারা বসার জায়গা পায় নি, বিশাল মন্ডপের দু'ধার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে। ক্লাবের দায়িত্বশীল মেম্বাররা মঞ্চের কাছাকাছি থেকে সব দিকে লক্ষ রাখছে। তাদের মধ্যে আদিত্যকেও দেখা গেল।

মঞ্চের একধারে মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে সুন্দরী ঘোষিকা বলছিল, 'আমাদের প্রথম শিল্পী অনুরাধা শেঠ। তিনি নতুন হলেও যথেষ্ট প্রতিভাময়ী। আশা করি, তাঁর গান আপনাদের ভাল লাগবে।'

মঞ্চের ঠিক মধ্যিখানে লাল গালিচা পাতা। শিল্পীদের বসার জন্য। উইংসের ভেতর দিয়ে একটি অল্পবয়সী তরুণী সেখানে এসে বসল। বেশ দেখনদার চেহারা। প্রচুর সেজেছে। খোঁপায় জুঁইয়ের

মালা জড়ানো।

একটি তবলচিও সঙ্গে এসেছে। হারমোনিয়াম নিয়ে অন্য একজন।

মেয়েটি একটি আধুনিক গাইল। সুরেলা কণ্ঠস্বর। প্যান্ডেলের একোণ সেকোণ থেকে কিছু হাততালির শব্দ উঠল।

এরপর গায়ক গায়িকারা ঘোষণা অনুযায়ী মঞ্চে আসতে লাগল। একের পর এক। সবাই প্রায় নতুন। আধ-চেনা দু'চারজন। মাথাপিছু একটি করে গান বাঁধা। কেউ গাইল আধুনিক। কেউ পল্লীগীতি। কেউ রবীন্দ্রসঙ্গীত। কয়েকজনের বেশ রেওয়াজ-করা গলা। বেশির ভাগই মাঝারি। তবে একজনও ফেলনা নয়।

আদিত্য বলেছিল, দশটা সাড়ে-দশটার আগে বড় আর্টিস্টরা আসবেন না। কিন্তু অনেক আগেই তাঁরা এসে পড়লেন। সঙ্গে সঙ্গে আসর জমে গেল।

নামীদের ভেতর প্রথম মঞ্চে উঠলেন জগন্ময় মিত্র। শুরু করলেন তাঁর সেই বিখ্যাত গানটি দিয়ে, 'তুমি আজ কত দূরে, আঁখির আড়ালে চলে গেছ, তবু রয়েছ হৃদয় জুড়ে—' লহমায় গোটা প্যান্ডেল জুড়ে বিদ্যুৎপ্রবাহ খেলে গেল।

জগন্ময়ের নামটা ঝিনুকের খুব ভাল করেই জানা। পনের কুড়ি হাত দূরে বসে তিনি গান শোনাচ্ছেন। স্বচক্ষে দেখেও অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে তার। নিশ্বাস পড়ছে না। চোখের দৃষ্টি স্থির। আচ্ছন্নের মতো মঞ্চের দিকে তাকিয়ে আছে সে।

বিনুরা ঝিনুককে লক্ষ করছিল। কেউ তাকে কিছু বলল না।

গানটা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে প্যান্ডেল হাততালিতে ফেটে পড়ল। চারপাশ থেকে চিৎকার উঠছে। সবার এক দাবি, 'আরেকটা— আরেকটা—'

নতুনদের জন্য একটা করে গান। বড় আর্টিস্টদের বেলায় সে নিয়ম খাটে না। একখানা গান গেয়ে তাঁদের রেহাই নেই। শ্রোতাদের আবদারের কি শেষ আছে? পর পর ছ'খানা গাইতে হল জগন্ময়কে।

এর ফাঁকে চিরকুটে খস খস করে একটা গানের দু'লাইন লিখে ফেলল সবিতা। আদিত্যকে ডেকে বলল, 'এই গানটা গাইতে বল—'

চিরকুট হাতে হাতে ঘুরে মঞ্চে পৌঁছে গেল। এক পলক সেটা দেখে একটু হাসলেন জগন্ময়। অনুরাগী শ্রোতার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করতে হারমোনিয়ামে সুরের ঢেউ তুলে গানটা ধরলেন, 'আমি দুরন্ত বৈশাখী ঝড়, তুমি যে বহ্নিশিখা। মরণের ভালে এঁকে দিয়ে যাই জীবনের জয়টিকা—'

জগন্ময়ের পর একে একে রবীন মজুমদার, উৎপলা সেন, গৌরীকেদার ভট্টাচার্য, আলপনা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদের নাম-করা গানগুলি গাইতে লাগলেন। এঁদের কাছেও চিরকুট পাঠাতে লাগল সবিতা। সে একাই শুধু নয়, শ্রোতাদের ভেতর থেকে আরও অনেকেই। শিল্পীরা কাউকেই নিরাশ করলেন না। পরম উদারতায় সবার অনুরোধ শিরোধার্য করলেন।

দশটা বাজলে আদিত্য এসে বলল, 'চল, এখন খেয়ে নেবে।'

সুধা একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'এত তাড়াতাড়ি!'

কারণটা বুঝিয়ে দিল আদিত্য। আজ কলকাতায় কম করে পনের কুড়িটা ফাংশান হচ্ছে। বিখ্যাত আর্টিস্টদের বিরাট চাহিদা। এখানে যাঁদের গাওয়া শেষ হয়েছে তাঁরা অন্য ফাংশানে গাইতে ছুটবেন। আর আগে ওঁদের খাইয়ে দিতে হবে। উদ্যোক্তাদের বাড়ির লোকজন এবং তাদের গেস্টদের যে ক'জনকে পারা যায়, একসঙ্গে বসিয়ে দেওয়া হবে। এইভাবে রাত একটা দেড়টা পর্যন্ত খেপে খেপে খাওয়ার পর্ব চলবে। লোক তো কম নয়।

সুধাদের একেবারেই নড়ার ইচ্ছা নেই। সে বলল, 'আরও কত ভাল আর্টিস্ট গাইবেন। খেতে গেলে তাঁদের গান শুনব কী করে?'

আদিত্য জানালো, আপাতত গানের অনুষ্ঠান হচ্ছে না। এখন চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ মিনিট শুধুই বাজনা। একজন মাউথ অর্গান বাজাবেন। একজন বাঁশি। একজন জলতরঙ্গ। একজন স্প্যানিশ গিটারে রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুর। খেতে খেতে সব শোনা যাবে।

খাওয়ার ব্যবস্থা কাছেই। পার্কের পেছন দিকে একটা প্রকান্ড সেকেলে বনেদি বাড়ির মস্ত হল-ঘরে। লম্বা লম্বা উঁচু বেঞ্চ আর চেয়ার পাতা রয়েছে সারি সারি।

আদিত্যই শুধু সুধাদের আনে নি, তরুণ সঙ্ঘের অন্য ক'জন মেম্বারও তাদের স্ত্রী ছেলেমেয়ে এবং অতিথিদের নিয়ে এসেছে। একধারে দেওয়ালের ধার ঘেঁষে বার চোদ্দটা চেয়ার ফাঁকা রেখে বাকিগুলোতে সবাইকে বসিয়ে দেওয়া হল।

এরপর আদিত্য এবং তাদের ক্লাবের কয়েকজন হল-ঘরের বিরাট দরজা দিয়ে বাড়ির ভেতর দিকে চলে গেল। ফিরে এল মিনিট দুয়েক পরেই। সঙ্গে রবীন মজুমদার, উৎপলা সেন, জগন্ময় মিত্র, এমনি অনেকে। খুব সম্ভব বাড়ির অন্দরমহলের কোনও ঘরে তাঁরা বিশ্রাম করছিলেন। ওঁদের সমাদর করে ফাঁকা চেয়ারগুলোতে বসানো হল।

ভোজের এলাহি আয়োজন। লুচি, পোলাও, আলুর দম, ভেটকি মাছের ফ্রাই, মুরগির মাংস, চাটনি এবং নলেন গুড়ের সন্দেশ।

ঝিনুক খাবে কী, উৎপলা সেন, রবীন মজুমদার, জগন্ময় মিত্রদের দিকে তাকিয়েই আছে, তাকিয়েই আছে। পলকহীন। অভিভূত। এতকাল এঁরা ছিলেন দূর আকাশের নক্ষত্র। ধরাছোঁয়ার বাইরে। আজ কিনা সামনাসামনি বসে তাঁদের গান শুনেছে সে। একই হল-ঘরে একসঙ্গে খেতেও বসেছে। সব যেন অলৌকিক স্বপ্নের মধ্যে ঘটে যাচ্ছে।

একটা মাইকের মুখ এধারে ঘোরানো। তাই মাউথ অর্গান, বাঁশি কি জলতরঙ্গের সুর হেমন্তের বাতাসে ভেসে আসছে।

সুধা আর সবিতা মাঝে মাঝে তাড়া দিচ্ছে, 'তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও। একটু পরেই কিন্তু ফের গান শুরু হয়ে যাবে।'

ব্যস্তভাবে লুচির একটা কোনা ভেঙে নিয়ে কিংবা একমুঠো পোলাও মুখে পুরে চিবোতে চিবোতে অন্যমনস্ক হয়ে যায় ঝিনুক। চোখ কিন্তু শিল্পীদের দিকেই স্থির।

খাওয়ার পালা চুকিয়ে ফের প্যাণ্ডেলে ফিরে আসে সুধারা।

যন্ত্রসঙ্গীতের অনুষ্ঠান শেষ হয় গেল। এবার যে শিল্পীটি মঞ্চে এলেন তিনি শচীনদেব বর্মন। শরীর ভাল নেই। দু'খানা গানই শুধু গাইলেন। 'নিশীথে যাইও ফুল বনে রে ভ্রমরা—' আর 'প্রেমের সমাধি তীরে নেমে এল শুভ্র মেঘের দল, তাজমহলের মর্মরে গাঁথা কবির অশ্রুজল—'

শ্রোতাদের দাবি অফুরান। তারা সহজে ছাড়তে চায় না, আরও শুনতে চায়। হাতজোড় করে ক্ষমা চেয়ে নিলেন শচীনদেব।

সবিতা প্রচুর খবর রাখে। ঝিনুকের কানে মুখ ঠেকিয়ে নীচু গলায় বলল, 'শচীন কর্তা এখন কলকাতায় থাকেন না। যুদ্ধের সময় বম্বে চলে গিয়েছিলেন। বিরাট বিরাট সব হিন্দি বইয়ের মিউজিক ডিরেক্টর। সারা ইণ্ডিয়ায় ওঁর কত নাম। কত সম্মান। তোমার আদিত্যদাকে ভীষণ ভালবাসেন। ও আবদার করলে না বলতে পারেন না। শরীর খারাপ নিয়েও তাই বম্বে থেকে আজকের ফাংশানে গাইতে এসেছেন।'

শচীনদেবের পর পঙ্কজ মল্লিক। তাঁরও ভারতজোড়া খ্যাতি। কণ্ঠস্বর গম্ভীর। উদাত্ত। বার খানা রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইলেন। তের নম্বর গানটা হল 'ডাক্তার' ছবির 'চৈত্রদিনের ঝরাপাতার পথে দিনগুলি মোর কোথায় গেল—'

একের পর এক চমক। পঙ্কজের পর এলেন ধনঞ্জয়। তাঁকেও দশ এগারখানা গাইতে হল। শেষ গানটি হল 'শহর থেকে দূরে' ছবির 'রাধে, ভুল করে তুই চিনলি না তোর প্রেমের শ্যাম রায়, ঝাঁপ দিলি তুই মরণ যমুনায়—'

একটানা দু'ঘন্টা গানের পর কমিক। সেটি পরিবেশন করলেন অজিত চট্টোপাধ্যায়।

কৌতুক-নকশাটি এইরকম। অল ইণ্ডিয়া রেডিও'র পাক্ষিক ম্যাগাজিন 'বেতার জগৎ'-এ তারিখ, সময় এবং শিল্পীদের নাম সমেত প্রতিদিনের প্রোগ্রামের আগাম তালিকা প্রকাশ করা হয়। ভুল করে একবার ছাপা হল, রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইবেন শচীনদেব বর্মন আর পঙ্কজ মল্লিক পল্লীগীতি।

দুই শিল্পী মহা ফাঁপরে পড়ে গেলেন। রেডিও'র কর্মকর্তাদের ভুলটা ধরিয়ে হাজার কাকুতি মিনতিতেও ফল হল না। ছাপা যখন হয়ে গেছে, দু'জনকে সেইমতোই গাইতে হবে। তা ছাড়া, শ্রোতাদের এই নিয়ে তুমুল উৎসাহ। মুহুর্মুহু অল ইণ্ডিয়া রেডিও'র দপ্তরে ফোন করে তারা নাকি জানাচ্ছে, শচীনদেবের রবীন্দ্রসঙ্গীত আর পঙ্কজ মল্লিকের পল্লীগীতি শোনার জন্য সবাই উন্মুখ হয়ে আছে।

অগত্যা নিরুপায় শচীনদেব পঙ্কজের কাছে রবীন্দ্রসঙ্গীতের তালিম নিতে ছুটলেন। পঙ্কজ যতই শেখান, তিনি কিছুতেই কায়দা করতে পারছেন না। পল্লীগীতির সুরে বার বার গেয়ে উঠছেন রবি ঠাকুরের গান। ওদিকে পঙ্কজও দৌড়চ্ছেন শচীনদেবের বাড়ি। গলদঘর্ম হয়ে শিখছেন পল্লীগীতি। তাঁর হালও তথৈবচ। ভারী, ভরাট গলায় রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুরে তিনি গাইছেন ভাটিয়ালি। ভুল ধরিয়ে দিয়েও কেউ কাউকে শোধরাতে পারছেন না।

দুই নাজেহাল শিল্পী পরস্পরের কাছে কিভাবে তালিম নিচ্ছেন, সুরের গোলমাল করে কিভাবে তালগোল পাকিয়ে ফেলছেন, হুবহু নকল করে গেয়ে গেয়ে শোনালেন অজিত চট্টোপাধ্যায়। সঙ্গে নানা মজাদার অঙ্গভঙ্গি।

সারা প্যাণ্ডেলে ঝড় বয়ে গেল। দশ মিনিট ধরে হাসির আতসবাজি ফাটতে লাগল। অবিরল।

বিনু লক্ষ করল, পেটে হাত চেপে সমানে হেসে চলেছে ঝিনুক। হেসেই চলেছে। মুখ লাল হয়ে উঠেছে তার। চেয়ারে বসে থাকতে পারছিল না। ঠিকরে নীচে পড়ে যাবে যেন। কোনও রকমে নিজেকে সামলে সামলে রাখছে।

কত কাল বাদে ঝিনুককে এমন প্রাণ খুলে হাসতে দেখলে বিনু? এমন স্বচ্ছ? এমন নির্মল? হাসিটা যেন সহস্র ধারায় ছড়িয়ে পড়ছে। ঝিনুককে যত দেখছে তত ভাল লাগছে তার।

কমিকের পর আবার গান। একে একে মঞ্চে আসতে লাগলেন সুপ্রভা সরকার, সত্য চৌধুরি, অখিলবন্ধু ঘোষ, পান্নালাল ভট্টাচার্য, দিলীপ সরকার, শ্যামল মিত্র। সবার শেষে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। তিনি আরও কয়েকটা ফাংশানে গেয়ে এসেছেন। তাই এখানে পৌঁছতে দেরি হয়ে গেছে। আধুনিক এবং রবীন্দ্রসঙ্গীত মিলিয়ে তাঁকে গাইতে হল মোট পনের খানা। শেষ গান, 'কোনও এক গাঁয়ের বধূর কথা তোমায় শোনাই শোন, রূপকথা নয় সে নয়। জীবনের মধু মাসের কুসুম ছিঁড়ে—'

হেমন্তের গানের পর ফাংশান যখন শেষ হল, ভোর হতে বেশি দেরি নেই। এবার বাড়ি ফেরার পালা। আদিত্য আর সবিতা হিরণদের সঙ্গে রাস্তা পর্যন্ত চলে এল।

সবিতা ঝিনুককে জিজ্ঞেস করল, 'কেমন লাগল ফাংশান?'

ঝিনুকের চোখেমুখে ঘোর লেগে আছে। বিহ্বলের মতো বলল, 'কী ভাল যে লেগেছে, বলে বোঝাতে পারব না।'

'তোমার সঙ্গে সেভাবে তো কথাই হল না। একদিন অনেক গল্প করব।'

কতটুকু সময় আর সবিতাকে দেখেছে! কিন্তু এর মধ্যে তাকে খুব পছন্দ হয়েছে ঝিনুকের। আস্তে মাথা নাড়ল সে। অর্থাৎ সবিতার সঙ্গে গল্প করার ইচ্ছা তারও।

সবিতা সুধাকে বলল, 'কবে বিনু আর ঝিনুককে আমাদের বাড়ি নিয়ে আসছ?'

সুধা মুহূর্তে সতর্ক হল। সবিতাদের বাড়ি যখন ইচ্ছে যাওয়া যেতেই পারে। কিন্তু আদিত্যর পিসির ভীষণ নাক-গলানো স্বভাব। জাগতিক সমস্ত ব্যাপারেই অনন্ত কৌতূহল। নতুন কাউকে দেখলে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে তার পেটের ভেতর থেকে যতক্ষণ না সব খবর টেনে বার করছে, শান্তি নেই। মহিলা লেখাপড়া শিখে ওকলতি করলে জেরায় জেরায় সাক্ষীদের জেরবার করে দিতে পারতেন। কথার মারপ্যাঁচে ঢাকার প্রসঙ্গ চলে আসবে কিনা, কে জানে।

সুধা নির্দিষ্টভাবে কোনও তারিখের কথা বলল না। ভাসা ভাসা ভাবে জানালো, 'সবে তো ওরা এসেছে। ক'দিন যাক। পরে নিয়ে যাব।'

মিনিট পাঁচেক দাঁড়াতেই একটা ফাঁকা ট্যাক্সি পেয়ে উঠে পড়ল হিরণরা।

ফাংশান চলার সময় প্রতিটি লহমায় ছিল চমক। তীব্র উত্তেজনা। ঘুমের কথা কারোর খেয়াল ছিল না। কষে-বাঁধা তারের মতো টান টান স্নায়ুগুলো এখন আলগা হয়ে আসছে। ঘুমে জড়িয়ে

যাচ্ছে চোখ।

বাড়ি ফিরে ঝটিতি পোশাক পালটে হাত পায়ে জল দিয়ে সবাই শুয়ে পড়ল।

প্রায় সারারাত জাগার কারণে পরদিন ঘুম ভাঙতে ঢের বেলা হয়ে গেল। এর মধ্যে আকাশের গা বেয়ে সূর্য অনেকখানি ওপরে উঠে এসেছে। যদিও ঋতুটা হেমন্ত, বেলা চড়লে রোদ এখনও বেশ কড়া হয়ে ওঠে।

বাথরুমের কাজ চুকিয়ে চা খেতে খেতে কালকের ফাংশানের সবিস্তার আলোচনা চলছিল। জগন্ময় হেমন্ত উৎপলা পঙ্কজ শচীনদেব — ঘুরে ফিরে এই সব নাম উঠে আসছে। প্যাণ্ডেলে ওঁদের দেখার পর থেকে ঝিনুক এতটাই বিহ্বল হয়ে পড়েছিল যে তার রেশ এখনও কাটে নি। সে শুধু বলছে, 'ছোটদি, তোমাদের জন্যে এই শিল্পীদের দেখতে পেলাম। আবার কোথাও ফাংশান হলে আমাকে নিয়ে যেতে হবে কিন্তু—'

সুধা বলল, 'নিশ্চয়ই।'

আজ ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, মিউজিয়াম এবং সময় পেলে দক্ষিণেশ্বরে বেড়াতে যাবার কথা ছিল। কিন্তু ঘুমের অনেকটাই দু'চোখ জুড়ে লেগে আছে। ক্লান্তি এখনও পুরোপুরি কাটে নি।

ঠিক হল, আজ আর এক পা-ও বাড়ি থেকে বেরুনো নয়। আপাতত ঝিনুকরা তো এখানেই আছে। অন্য একদিন তাদের ভিক্টোরিয়া, যাদুঘরটর দেখিয়ে আনবে। দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর আরেক প্রস্থ না ঘুমোতে পারলে শরীর ঝরঝরে লাগবে না।

হঠাৎ একতলায় কড়া নাড়ার শব্দ। কেউ একজন ডাকাডাকি করছে, 'হিরণভাই আছেন নিকি? অ হিরণভাই—'

গলাটা অপরিচিত। কিন্তু ডাকটার মধ্যে একটা অন্তরঙ্গ সুর আছে। কথায় পদ্মাপাড়ের টান। লোকটা নিশ্চয়ই হিরণকে চেনে।

হিরণ উমাকে ডেকে বলল, 'দেখ তো, কে এসেছে—'

উমা বলল, 'লোকটাকে কি ওপরে নিয়ে আসব?'

কী ভেবে হিরণ বলল, 'না। আগে নামটা জেনে এস—'

উমা তর তর করে সিঁড়ি ভেঙে নিচে নেমে গেল। পরক্ষণে ফিরে এসে বলল, 'রাজদিয়ার নিত্য দাস এসেছে।'

সবাই চকিত হয়ে ওঠে। বিশেষ করে বিনু আর ঝিনুক। রাজদিয়া থেকে সাত মাইল উজানে সুজনগঞ্জের হাট। সেখানে মস্ত দোকান ছিল নিত্য দাসের। নদীর ধার ঘেঁষে ছোটখাটো একটা আড়তও। রাজদিয়ার বাজারেও ছিল তার আরেকটা দোকান। চাল ডাল তেল নুন আর নানাবিধ মশলাপাতির খুচরো এবং পাইকারি কারবার করত।

যে দুশ্চিন্তাটা ত্বরিত গতিতে বিনুর মাথায় ভর করে তা হল, নিত্য দাস কি ঝিনুকের চরম সর্বনাশের খবরটা জানে? জানাই সম্ভব। কেননা, রায়টের সময় নিত্য দাস রাজদিয়াতেই ছিল। তা ছাড়া, ঝিনুক যে আপাতত এ বাড়িতে আছে, সেটাও কি তার কানে পৌঁছে গেছে?

উদ্বিগ্ন মুখে বিনু জিজ্ঞেস করে, 'নিত্য দাস কি আগে কখনও এখানে এসেছে?'

হিরণ বলল, 'না। এই প্রথম।'

'মতলব কী লোকটার? কী চায় সে?'

'তা কেমন করে বলব?'

ঝিনুককে নিয়ে বিনুর উৎকণ্ঠাটা হিরণের মধ্যেও চারিয়ে গিয়েছিল। নিত্য দাস ঝিনুককে দেখলে কী বলতে কী বলে বসবে, কে জানে। মেয়েটা ভয়, আতঙ্ক কাটিয়ে সবে স্বাভাবিক হতে শুরু করেছে। হিরণরা সবাই মিলে তার যে দুঃস্বপ্নের স্মৃতিটাকে মুছে দিতে চাইছে, নিত্য দাসকে দেখে ফের

সেটাই যদি তাকে গ্রাস করে ফেলে? তাদের এত চেষ্টা সব ব্যর্থ হয়ে যাবে।

হিরণ পলকে কর্তব্য স্থির করে ফেলে। সুধাকে বলে, 'তুমি ঝিনুককে নিয়ে ভেতরের ঘরে চলে যাও।' ইঙ্গিতটা স্পষ্ট। সে চায় না, নিত্য দাস ওপরে এসে ঝিনুককে দেখুক।

সুধা লক্ষ করেছিল, ঝিনুকের ঝলমলে ভাবটা উধাও হয়ে গেছে। নিত্য দাসের নাম শোনামাত্র সে ত্রস্ত হয়ে উঠেছে। অস্থির। শঙ্কাতুর।

ঝিনুকের কাঁধে হাতের বেড় দিয়ে ভেতরে নিয়ে গেল সুধা। বিনু চুপচাপ বাইরের ঘরে বসে থাকে।

হিরণ ফের উমাকে নীচে পাঠাল। একটু পর নিত্য দাসকে সঙ্গে করে ফিরে এল সে।

বিনু তাকে সতর্ক চোখে দেখছিল। চেহারা প্রায় একই রকম আছে। ছোটখাটো। শক্তপোক্ত। নিরেট। পোশাক আশাক বলতে তেমনই খাটো ধুতি। রাজদিয়ায় থাকতে নিমা (ফতুয়া জাতীয় জামা) পরত। কলকাতায় এসে একটু উন্নতি হয়েছে। নিমার বদলে হাফ-হাতা পাঞ্জাবি। পায়ে সস্তা স্যাণ্ডেল।

আগে যতবার দেখা হয়েছে, বিনয়ে সর্বক্ষণ নুয়ে থাকত নিত্য দাস। মুখে বিগলিত হাসি। লোকটা বাইরের দিকে একটুও বদলায় নি। অবিকল তেমনই হাসি। সেই বিনীত ভঙ্গি।

হাতজোড় করে, ঘাড় ঝুঁকিয়ে নিত্য দাস বিনুকে বলল, 'কত কাল পর দেখা। কী ভালা যে লাগতে আছে ছুটোবাবু, মুখে কইয়া বুঝাইতে পারুম না।' হিরণকে বলল, 'নমস্কার হিরণভাই— আপনেরে দেইখাও বড় আনন্দ—'

তাকে থামিয়ে দিয়ে হিরণ বলল, 'আগে বসুন নিত্যবাবু—'

একটা চেয়ারে জড়সড় হয়ে বসল নিত্য দাস। হিরণ বসল বিনুর পাশে। বলল, 'আপনার সঙ্গে আবার দেখা হবে, ভাবতে পারি নি। আমাদের বাড়ির খোঁজ পেলেন কী করে?'

নিত্য দাস বলতে লাগল, 'কত কষ্ট কইরা যে আপনেগো বিচরাইয়া বাইর করছি, তার ঠিক ঠিকানা নাই। তয় (তবে) পরানের টান থাকলে কী না করন যায়!' এরপর সে যা বলতে লাগল তা এক ব্যাপক অভিযানের কাহিনী। পাকিস্তানের হালচাল, মানুষের মতিগতি ভাল নয় বুঝে বছরখানেক আগে বউ ছেলেমেয়ে নিয়ে ইণ্ডিয়ায় চলে আসে। বুদ্ধি করে কিছু টাকাপয়সা আনতে পেরেছিল। না, শিয়ালদা স্টেশনে হাজার হাজার শরণার্থীর ভিড়ে মুখ গুঁজে পড়ে থাকে নি। রিফিউজি ক্যাম্পেও ওঠে নি। মাসকয়েক চেতলায় এক ভাড়া বাড়িতে কাটিয়েছে। সেটা অ্যাসবেস্টসের ছাউনি দেওয়া টানা ব্যারাক ধরনের বাড়ি। সারি সারি ঘর। গুচ্ছের ভাড়াটে। পরিবেশ দমবন্ধ-করা। চল্লিশ পঞ্চাশ জন মানুষের জন্য দু'টো মোটে পায়খানা। ঘরের বাইরে পা ফেলার মতো এক ফোঁটা জায়গা নেই। পোকামাকড়ের মতো মানুষ থিক থিক করছে।

নিত্য বলল, 'আমরা কি অ্যামন জাগায় থাকতে পারি? আমাগো বাড়ির উঠানহানই আছিল আধা-কানি। পিছনে আলিসান পুকৈর (পুকুর), ফলফলারির বাগান। হেই সব ফেলাইয়া ফুলাইয়া য্যান নরকে আসলাম। উয়াস আটকাইয়া আসতে লাগল। আমার পরিবারে (স্ত্রী) আর পোলমাইয়ায় (ছেলেমেয়ে) দিনরাইত ঘ্যানঘ্যানায় আর কান্দে, কয় উইহানে থাকব না।'

সুতরাং হাত-পা ছড়িয়ে থাকা যায়, মোটামুটি এমন একটা খোলামেলা বাড়ির খোঁজে হন্যে হয়ে ঘুরতে লাগল নিত্য দাস। ভাড়ায় পেলে ভাল, নইলে কিনেই নেবে।

বালিগঞ্জ ভবানীপুর শ্যামবাজার ঢাকুরিয়ায় জমিবাড়ির দাম আগুন। ভাড়াও মারাত্মক। কিন্তু কসবার দিকটা ফাঁকা ফাঁকা। ওধারে লোকের নজর এখনও তেমন পড়ে নি।

পাকিস্তান থেকে যা টাকাপয়সা নিয়ে এসেছিল, তাই দিয়ে কসবায় তিন কামরার একটা সাবেক কালের আধভাঙা একতলা বাড়ি কিনে সারিয়ে সুরিয়ে নিল নিত্য। জায়গাও বেশ খানিকটা। সাড়ে চার কাঠার মতো।

কলকাতার মতো শহরে মাথা গোঁজার পাকা বন্দোবস্ত হয়েছে। বাড়ি কেনার পর যা বেঁচেছে, বসে খেলে আর ক'দিন? সামনে লম্বা ভবিষ্যৎ। ইণ্ডিয়ায় আসার পর থেকে সে শুনতে পাচ্ছিল, উদ্বাস্তুদের ব্যবসাপত্র করে নিজেদের পায়ে দাঁড়াবার জন্য থোক কিছু টাকা গভর্নমেণ্ট থেকে দেওয়া হচ্ছে। তা ছাড়া কিসের ব্যবসা, কোথায় ব্যবসা, এসব ঠিকঠাক দেখাতে পারলে ব্যাঙ্ক থেকেও লোন

পাওয়া যায়।

মাস দুয়েক আহার নিদ্রা ভুলে, চারদিকে দৌড়ঝাঁপ করে, একে ধরে তাকে ধরে সরকারি টাকা আর ব্যাঙ্ক লোন বার করেছে নিত্য দাস। সেই মূলধন খাটিয়ে গড়িয়াহাটে রেডিমেড জামা প্যান্টের ছোটখাটো দোকান খুলে বসেছে। কলকাতা এমন এক শহর যা নিয়েই বসা যাক, খদ্দের ঠিক জুটে যায়। বাতাসে টাকা উড়ছে। কারবার ভালই চলছে নিত্য দাসের।

এক বছরে সব দিক সুচারুভাবে গুছিয়ে নেবার পর তার মনে হল, দেশের মানুষজনের খোঁজখবর নেওয়া দরকার। ফি সপ্তাহে দোকান একদিন বন্ধ থাকে। সেই ছুটির দিনটা তো বটেই, অন্য দিনও কাজের ফাঁকে সময় বার করে সে শিয়ালদা স্টেশনে কিংবা কাছে পিঠের রিফিউজি ক্যাম্পগুলোতে যায়।

রাজদিয়া এবং তার চারপাশের গিরিগঞ্জ হাবিবপুর আমতলি তাজহাটি মাইনকার চর কমলাঘাট, এমনি পঁচিশ ত্রিশটা গ্রাম উজাড় করে মানুষ চলে আসছে এপারে। প্রতিদিন। বিরতিহীন।

কতকাল ওদের পাশাপাশি বাস করেছে নিত্য দাসেরা। পুরুষানুক্রমে। এই ছিন্নমূল মানুষগুলোর মধ্যে হাজারে একজনও সঙ্গে এক কুচি সোনা বা বিশ পঞ্চাশটা টাকা সঙ্গে আনতে পারে নি। নিত্য দাসের একান্ত ইচ্ছা, ওদের পাশে দাঁড়ানো। সাধ্যে কুলোলে সাহায্য করা। কী করলে, কোন উপায়ে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে, তার সন্ধান দেওয়া। রক্তের সম্পর্ক না থাকলেও এই মানুষগুলো তার আপনজনই তো।

রাজদিয়ায় থাকতে নিত্য দাসকে তেমন পছন্দ করত না বিনু। ভীষণ ধূর্ত। ধড়িবাজ। বাইরে বিনয়ের মুখোশ সাঁটা। কিন্তু ভেতরে ভেতরে সারাক্ষণ নানা ফন্দি আঁটছে।

বিনুর মনে আছে, সেই যুদ্ধের সময় এস. ডি. ও'র বাংলোয় দিনরাত ধরনা দিয়ে, তাঁকে ঘুষ খাইয়ে, পারমিট বার করে কনট্রোলের দোকান খুলেছিল নিত্য দাস। চাল, চিনি, কেরোসিন তেল, কাপড় তখন খোলা বাজারে মেলে না। কনট্রোলের দরে সামান্য কিছু লোকজনকে বিলি করে, বাকিটা দশ গুণ দামে কালোবাজারে বেচে দিত। শুধু তাই না, আমেরিকান টমিতে টমিতে যখন রাজদিয়া ছেয়ে গেল, চারদিকে রাতারাতি মিলিটারি ব্যারাক উঠছে, সরকারি লাইসেন্স নিয়ে একটা মদের দোকানও দিয়েছিল। হেমনাথ বাড়িতে ডাকিয়ে এনে কতবার নিষেধ করেছেন, কিন্তু তাঁর কথা নিত্য দাসের এক কান দিয়ে ঢুকে অন্য কান দিয়ে বেরিয়ে যেত। সেই লোক সীমান্তের এপারে এসে মহানুভব হয়ে উঠেছে, ভাবা যায় না।

ভোঁতা, খসখসে গলায় একনাগাড়ে কথা বলে যাচ্ছে নিত্য দাস। ক্লান্তি বোধ করছিল বিনু। কান মাথা ঝিমঝিম। কিভাবে তাকে থামানো যায়, কে জানে।

হিরণ হঠাৎ বলে ওঠে, 'আমাদের ঠিকানা কী করে পেলেন তা কিন্তু এখনও বলেন নি।'

নিত্য দাস হেসে হেসে বলে, 'এইবার হেইটা কমু। য্যামন মাঝে মইদ্যে যাই, ত্যামন পরশু সন্ধ্যাবেলা শিয়ালদায় গ্যাছিলাম। দেখি, ঢাকা মেইল থিকা রিফুজিগো লগে তৈলক্য স্যানরা (ত্রৈলোক্য সেনরা) লাইমা আসল। ওনারা দ্যাশ ছাইড়া বরাবরের লেইগা চইলা আসছে।' একটু নেমে বলল, 'হুগলে যহন ভিটামাটি ফেলাইয়া আসতে আছে, ওনারা কুন ভরসায় দ্যাশের মাটিতে থাকব?'

বিনুর স্নায়ুতে তীব্র ঝাঁকুনি লাগে। এতক্ষণে সে রীতিমতো উৎসুক হয়ে ওঠে।

বহুকাল আগে প্রথম মহাযুদ্ধের ঠিক পরে পরে ঢাকা জেলার নগণ্য শহর রাজদিয়া ছেড়ে রেঙ্গুনে পাড়ি দিয়েছিলেন ত্রৈলোক্য সেন। সঙ্গে স্ত্রী এবং একটি ছেলে। সেখানে ব্যবসা ট্যবসা করে অঢেল পয়সা করেন। সংসারও বড় হতে থাকে। রেঙ্গুনে আরও দু'টি ছেলে হয়েছে তাঁর। তাদের লেখাপড়া শিখিয়ে নিজের কারবারে বসিয়েছেন। তাদের বিয়ে দিয়েছেন। তিন ছেলে, তিন পুত্রবধূ, নাতিনাতনী নিয়ে তাঁর জমজমাট সংসার। রেঙ্গুন থেকে দেশে ফেরার কোনও সম্ভাবনাই ছিল না। বর্মা তখন তাঁদের নতুন স্বদেশ। রাজদিয়ার স্মৃতি ধূসর হতে হতে প্রায় বিলীন হয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মাঝামাঝি পূর্ব রণাঙ্গনে যখন তোজোর ঝটিকা বাহিনী দুরন্ত গতিতে ধেয়ে আসছে, দিবারাত্রি মেশিন গান আর কামানের কানফাটানো গর্জন, আকাশ ঢেকে দিয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে বোমারু বিমানের অবিরল হানাদারি, অ্যান্টি-এয়ারক্রাফটের পাল্টা আক্রমণ, ক্রমাগত পিছু

হটে হটে মিত্রবাহিনীর পিঠ যখন দেওয়ালে প্রায় ঠেকে গেছে, সেই সময় রেঙ্গুন পেগু মান্দালয়, অর্থাৎ গোটা বর্মা মুল্লুক থেকে পালানোর হিড়িক পড়ে যায়।

সারা জীবন বিপুল পরিশ্রমে, তিল তিল করে ত্রৈলোক্য সেন যা যা করেছিলেন — টাকাপয়সা, বিষয়আশয়, বিশাল বাড়ি, অফুরান ঐশ্বর্য — সব ফেলে, প্রায় খালি হাতে চলে আসতে হয়েছিল তাঁদের।

গোটা রাজদিয়া জুড়ে তখন সে কী তুমুল চাঞ্চল্য! প্রথম মহাযুদ্ধের শুরুতে যে ত্রৈলোক্য সেন দেশ ছেড়েছিলেন, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মাঝামাঝি বর্মা মুল্লুক থেকে তাঁর ফিরে আসাটাই এক চমকপ্রদ ঘটনা। রাজদিয়ার মানুষ এক দুঃসাহসী যুবককে চলে যেতে দেখেছে। যিনি ফিরলেন তিনি এক সর্বস্বান্ত বৃদ্ধ। তার ওপর দুর্গম পাহাড় এবং জঙ্গলের ভেতর দিয়ে দিনের পর দিন পায়ে হেঁটে, বর্মী দস্যুদের নজর এড়িয়ে নিদারুণ আতঙ্কে কয়েক শ'মাইল পাড়ি দেবার পর ভারতবর্ষের নিরাপদ ভূখণ্ডে যখন তাঁরা পা রাখলেন, দাঁড়িয়ে থাকার শক্তি নেই। মৃতপ্রায়। বুকের খাঁচায় প্রাণটা কোনও রকমে ধুকধুক করছে।

ত্রৈলোক্য সেনের মুখে এই বর্ণনা শুনতে শুনতে রাজদিয়াবাসীদের রক্তে শিহরন জাগত। তখন ত্রৈলোক্যদের চারপাশে চাপ-বাঁধা ভিড়। একই বিবরণ শতবার শুনেও তৃপ্তি নেই।

ত্রৈলোক্য সেনের বড় নাতি শ্যামল রাজদিয়া হাইস্কুলে বিনুদের ক্লাসে ভর্তি হয়েছিল। কিন্তু যুদ্ধের শেষাশেষি অক্ষশক্তির হার যখন অনিবার্য হয়ে উঠেছে, ত্রৈলোক্যর তিন ছেলে তাদের স্ত্রী এবং ছেলেমেয়েদের নিয়ে কলকাতায় চলে এসেছিল। রাজদিয়ায় পড়ে থেকে কী হবে? যুদ্ধে যা ধ্বংস হয়ে গেছে, নতুন করে ফের তা গড়ে তুলতে হবে। কলকাতা ছাড়া গতি নেই।

বাড়ির সবাই চলে এলেও ত্রৈলোক্য সেন এবং তাঁর স্ত্রী রাজেশ্বরী কিন্তু আসেন নি। বহুকাল বাদে বর্মা মুলুক থেকে রাজদিয়ায় ফিরে এসে দেশের মায়ায় জড়িয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁদেরও থাকা সম্ভব হল না। লক্ষ লক্ষ উৎখাত মানুষের মতো জন্মভূমি থেকে শিকড় তুলে তাঁদেরও চলে আসতে হয়েছে। আর কখনও তাঁদের দেশে ফেরা হবে না।

নিত্য দাস বলতে লাগল, 'তৈলক্য স্যানের মুখে শুনলাম, ছুটোবাবু কয়দিন আগে কইলকাতায় চইলা আসছে। তেনার তিনহানে (তিন জায়গায়) ওঠনের কথা। ভবানীপুরে তেনার বাপের কাছে। নাইলে সুনীতি বইন কি সুধা বইনের বাড়িত্। তৈলক্য স্যান হ্যামকত্তার কাছ থিকা তিন জাগারই ঠিকানা নিয়া আসছে।'

নিত্য দাস আরও জানায়, সে ত্রৈলোক্য সেনের কাছ থেকে এই তিনটি ঠিকানা লিখে নেয়। কাল সে ভবানীপুরে গিয়েছিল। সেখানে কেউ নেই। বাড়ি তালাবন্ধ দেখে ছুটেছিল সুনীতিদের বাড়ি। ওখানেই জানতে পারে, বিনু সুধা আর হিরণের কাছে চলে এসেছে। কালু আর সময় করে উঠতে পারে নি। আজ তাই সকাল হতে না হতেই বিনুদের খোঁজে বেরিয়ে পড়েছে।

নিত্য দাস থামে না। বিনুর দিকে ফিরে একটানা বলে যায়, রাজেক মাঝির নায়ে (নৌকোয়) তারপাশায় আইসা গোয়ালন্দের ইস্টিমার ধরছেন, এই তরি খবর পাইছেন হ্যামকত্তায়। পথের গতিক জবর খারাপ। খুনিরা চাইর দিকে রাম দাও (রাম দা), সড়কি, বন্দুক লইয়া ঘুরতে আছে। হেইর (তার) মইদ্যে পরান বাচাইয়া কইলকাতায় আসতে পারলেন কিনা, তেনি (তিনি) জানেন না। বড় দুচ্চিন্তায় আছেন হ্যামকত্তায়। পৌঁছ সম্বাদ নি তেনারে দিছেন?'

বিনু জানে, হেমনাথরা তাদের জন্য পূর্ব বাংলার সুদূর প্রান্তের এক নগণ্য শহরে ভীষণ উদ্বিগ্ন হয়ে আছেন। সারাক্ষণ ছটফট করছেন। তাঁকে চিঠি লেখার কথা বেশ কয়েক বার ভেবেছে সে। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হয়েছে, ওপারের চিঠি এপারে আসছে না, এপারের চিঠি ওপারে যাচ্ছে না। হেমনাথের সঙ্গে যোগাযোগের কোনও রাস্তাই খোলা নেই।

বিনু বলল, 'পৌঁছনে খবর কী করে দেব? চিঠি লিখলে দাদু পাবেন না।' সে জানায়, দুই দেশের ডাক বিভাগ এই নিয়ে কোনও কাজই করছে না।

নিত্য দাস বলে, 'চিন্তা কইরেন না ছুটোবাবু। একখান চিঠি লেইখা আমারে দিয়েন। আমি রাইজদায় হ্যামকত্তার কাছে পাঠাইয়া দিমু। আপনেগো সম্বাদ তেনি পাইয়া যাইবেন।'

লোকটা কি ভেলকি জানে! বিনু আর হিরণ কিছুক্ষণ হতবাক নিত্য দাসের দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর বিনু বলে, 'পোস্ট অফিস যেখানে কিছু করতে পারছে না, আপনি কী করে চিঠি পাঠাবেন?'

নিত্য দাসের সারা মুখ জুড়ে রহস্যময় হাসি ছড়িয়ে পড়ে। বলে, 'হেই বন্দবস্ত আছে ছুটোবাবু।'

'কী বন্দোবস্ত?'

'বুঝাইয়া কই। আমার হাতে অ্যামন মেলা (অনেক) লোক আছে যারা হপ্তায় একবার বডারের উই পারে যায়। তাগো হাতে চিঠিপত্তর পাঠাই। হেরা (তারা) পাকিস্থানের চিঠি কি দরকারী খবর লইয়া ইণ্ডিয়ায় পৌছাইয়া দ্যায়।'

বিনু থ হয়ে যায়। দেশভাগের পর যে বহু লোক নিয়মিত সীমান্তের এপারে ওপারে যাতায়াত করছে, তার ধারণা ছিল না। জিজ্ঞেস করে, 'কী জন্যে পাকিস্তানে যায় এই সব লোকজন?'

পরিষ্কার করে ভাঙল না নিত্য দাস। বলল, 'নানান কামে যাইতে হয়। লাখ লাখ মানুষ অহনও তো উই ধারে পইড়া আছে। ধরেন, এক বংশের দশ জন আসতে পারছে। পাচজন পারে নাই। হেরা ভালা আছে না মোন্দ আছে, নিকি খুন হইয়া গ্যাছে, কেউ না গ্যালে তাগো খবর আনব ক্যাঠা?'

বিনু তাকিয়েই থাকে।

নিত্য দাস থামে নি, 'অবশ্য এইর মইদ্যে একহান কথা আছে ছুটোবাবু।'

'কী কথা?'

'যে লোকগুলা যায় তাগো কিছু ট্যাকাপয়সা দিতে হয়। পাকিস্থানের অবস্থা হগলই জানেন। নিজের চৌখে দেইখা আসছেন। হেইহানে পরানের ঝুকি লইয়া যাইতে হয় তো।'

হিরণ জিজ্ঞেস করে, 'আপনার লোকজনেরা কি শুধু রাজদিয়া তার তার চারপাশের গ্রামগুলোতেই যায়?'

নিত্য দাস বলল, 'তা ক্যান? ফরিদপুর নুয়াখালি বরিশাল সিলট—কুনহানে না যায়? আপনে যেইহানের খবর জানতে চাইবেন, ঠিক আইনা দিব।'

বলে কি লোকটা? হিরণ জানে, খুব বেশি লেখাপড়া করে নি নিত্য দাস। অল্প বয়সে রাজদিয়ার ইউনিয়ন বোর্ডের স্কুলে দু'চার বছর যাতায়াত করেছিল। কিন্তু খুবই তুখোড়। ক্ষুরধার বুদ্ধি। সামান্য বিদ্যের পুঁজি নিয়ে দেশভাগের আগে কী না করেছে সে? সুনামগঞ্জের হাটে আর রাজদিয়ার বাজারে দোকান, আড়ত। যুদ্ধের আমলে কনট্রোল শপ, মদের দোকান। পার্টিশানের পর কত মানুষ — দেশে যাদের বিশ পঞ্চাশ কানি ধানজমি ছিল, ছিল পাঁচ সাতটা দীঘির মতো পুকুর, মস্ত বাড়ি, ফলের বাগান — শিয়ালদা স্টেশনে কি রিফিউজি ক্যাম্পগুলোতে তারা ক্ষয়ে ক্ষয়ে শেষ হয়ে যাচ্ছে। ভেবেছে এটাই নিয়তি। নিত্য দাস কিন্তু আকণ্ঠ হতাশায় ডুবে ভাগ্যের কাছে নিজেকে সঁপে দেয় নি। এপারে এসে সুচারুভাবে আখের গুছিয়ে নিয়েছে। দেশ থেকে কোনও কূট কৌশলে টাকা এনেছিল। সরকারের কাছ থেকে অনুদান বার করেছে, ব্যাঙ্ক থেকে লোন নিয়েছে। ব্যবসা ফেঁদেছে। বাড়ি কিনেছে। শুধু তাই না, পাকিস্তানের সঙ্গে সুচতুর, গোপন যোগাযোগের একটা ব্যবস্থাও করে ফেলেছে। যার লোক এই মারাত্মক সময়ে সুদূর বরিশাল নোয়াখালি সিলেট পর্যন্ত চলে যায়, সে যে কতখানি ধুরন্ধর, মোটামুটি আন্দাজ করা যেতে পারে। শুধু এপারের লোক দিয়ে এসব হয় না। নিশ্চয়ই পাকিস্তানের লোকজনও এর সঙ্গে জড়িত। তাদের সঙ্গে যোগাসাজশ না থাকলে এ ধরনের দুঃসাহসিক কাজ অসম্ভব। কলকাতায় বসে কিভাবে একটা প্রায়-অশিক্ষিত লোক পাকিস্তানিদের সঙ্গে হাত মেলাল, কে জানে।

সুধা প্লেটে মিষ্টি আর চা নিয়ে এল। চা সবার জন্য। মিষ্টি নিত্য দাসের। রাজদিয়ার চেনাজানা মানুষ বাড়িতে এসেছে। তাকে আপ্যায়ন না করলে নিন্দা হয়।

বিগলিত হাসে নিত্য দাস, 'উঃ, কত বচ্ছর পর দেখা হইল সুধা বইন। আপনের আর সুনীতি বইনের বিয়ায় হ্যামকত্তার বাড়িত্ কী আনন্দ যে করছিলাম। হ্যামকত্তায় তিন দিন ধইরা কী আদরযত্ন না করছিল। যদ্দিন বাচুম, মনে থাকব।'

সুধা আড়ষ্টভাবে একটু হাসে। তার ভয়, লোকটা হুট করে ঝিনুকের কথা না জিজ্ঞেস করে

বসে।

নিত্য দাস অফুরান উদ্যমে ফের শুরু করে, 'পার্টিশানের পর ফির দেখা হইব, ভাবি নাই। ভাইগ্য ভালা, তৈলক্য স্যানেরে পরশু শিয়ালদায় পাইয়া গ্যালাম। নাইলে আপনেগো ঠিকানাই জানতে পারতাম না। আপনেরা হ্যামকত্তার নাতি, নাতিন আর নাতিন জামাই। আমাগো বড় আপনজন। অহনই কইয়া রাখি, মাঝে মইদ্যে আপনেগো বাড়িত্ আসুম কিলাম—'

সুধা কাপ প্লেট আগেই টেবলে সাজিয়ে দিয়েছিল। বলল, 'আসবেন। আপনারা কথা বলুন। ভেতরে আমার অনেক কাজ পড়ে আছে। যাচ্ছি—'

নিত্য দাস ব্যস্তভাবে বলল, 'হ হ, যান। একদিন আমাগো কসবার বাড়িত্ আপনেগো লইয়া যামু। না কইতে পারবেন না।'

'আচ্ছা—' সুধা চলে গেল।

নিত্য দাস চোখের পলকে মিষ্টিগুলো সাবাড় করে চায়ের কাপ তুলে নেয়। সুড়ুক সুড়ুক আওয়াজ করে চা খেতে খেতে বলল, 'ছুটোবাবু, হিরণভাই, এতকাল পর আপনেগো যহন পাইয়াই গ্যাছি, একহান কামের কথা কই। মন দিয়া শোনেন—'

লোকটা যে সারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড চক্কর মেরে শুধুমাত্র প্রাণের টানে দেশের পরিচিত জনদের দেখতে টালিগঞ্জে এসে হাজির হয়নি, তা আগেই আঁচ করা গিয়েছিল। তার আসার পেছনে অভিসন্ধি না থাক, গভীর কোনও উদ্দেশ্য রয়েছে।

নিত্য দাস সম্বন্ধে বিনুদের ধারণা খুব পরিষ্কার। স্বার্থ ছাড়া একটি পাও সে ফেলবে না। ভেতরে ভেতরে দু'জনে সতর্ক হয়ে যায়।

বিনু জিজ্ঞেস করে, 'কী কথা?'

নিত্য দাস প্রথমে হিরণকে বলল, 'বোঝেনই তো পাকিস্থানের যা হাল, হেইহানে আর কুনো কালে ফিরন যাইব না। দ্যাশ জন্মের মতো গ্যাছে। তা রাইজদায় আপনেগো জমিজেরাত, বাড়ি, পুকের, নাইকল (নারকেল) সুপারির বাগিচা — এই হগলের কী ব্যবোস্তা করছেন?'

লোকটাকে বাজিয়ে নেবার জন্য হিরণ বলল, 'আমরা আছি কলকাতায়। জমি বাড়ি সব রইল পাকিস্তানে। এখানে বসে কী-ই বা করতে পারি?'

চা আধাআধি খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। বাকিটা লম্বা চুমুকে শেষ করে নিত্য দাস বলল, 'হের (তার) ফিকির আছে হিরণভাই। যদিন আপনেগো মত থাকে, এইহানে থাইকাই হগল বন্দবস্ত হইয়া যাইব।'

'আপনার কথাটা ঠিক বুঝলাম না।'

'খবর পাইছি রাজাকাররা রাইজদায় হিন্দুগো জমিন জুমিন দখল কইরা লওনের লেইগা উইঠা পইড়া লাগছে। বাপ-দাদার সোম্পত্তি তো আর ভোগ করতে পারবেন না। অহনও সোময় আছে। দ্যাশের বাড়িঘরের বদলে যদিন কইলকাতায় কিছু করতে চান তো আমারে ক'ন—'

ইঙ্গিতটা ধরতে পেরেছে হিরণ। তবু জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কী করবেন?'

নিত্য দাস সবিস্তার ব্যাখ্যা করল। এপার থেকে বহু মুসলমান পাকিস্তানে চলে যাচ্ছে। তাদের লাড়িচাড়ির সঙ্গে ওপার থেকে আসা হিন্দুদের সম্পত্তি তারা বদলাবদলি করে নিচ্ছে। কোনও রকম ঝামেলা নেই। পাকিস্তানেও যেতে হবে না। এখানেই হস্তান্তরটা নির্বিঘ্নে চুকিয়ে দেবে নিত্য দাস। ওপারের বিষয় আশয়ের বিনিময়ে এপারের বিষয় আশয়।

হিরণরা আন্দাজ করে নিল, এই যে নিত্য দাস দেশের মানুষের খোঁজে শিয়ালদা স্টেশনে বা রিফিউজি ক্যাম্পে ক্যাম্পে হানা দিচ্ছে, কিংবা তাদের বাড়িতেও ছুটে এসেছে তার উদ্দেশ্য একটাই। সম্পত্তি বিনিময় করানো। লোকটাকে যত দেখছে, তার গতিবিধির কথা যত শুনছে, বিস্ময়ে ততই হতবাক হয়ে যাচ্ছে হিরণ আর বিনু।

নিত্য দাস বলল, 'এমারে (একে) এংরাজিতে কয় 'এচ্চেঞ্জ' (এক্সচেঞ্জ)। মেলা মাইনষের সোম্পত্তি 'এচ্চেঞ্জে'র বন্দবস্ত আমি কইরা দিছি।'

এর মধ্যেই যে তাদের বাড়ি এবং জমিজমা এক্সচেঞ্জের ব্যাপারে এই অঞ্চলের শওকত আলির

সঙ্গে কথাবার্তা মোটামুটি পাকা করে ফেলেছে সেটা আর ভাঙল না হিরণ। জিজ্ঞেস করল, 'এই যে আপনি এত কষ্ট করে, নিজের দোকান ফেলে, এত লোকের কাছে যাচ্ছেন, এক্সচেঞ্জের বন্দোবস্ত করে দিচ্ছেন, এতে আপনার কী লাভ?'

'বোঝেনই তো হিরণ ভাই—' নিত্য দাস সামান্য বিব্রত হয়। কাঁচুমাচু মুখে বলে, 'আমি হইলাম ব্যবসায়ীত্ মানুষ। দুই চাইর পহা পাওনের আশা না থাকলে এই বয়্যে (বয়সে) অ্যামন খাটাখাটি করুম ক্যান? যাগো সম্পত্তি 'এচ্চেঞ্জ' করি হেরা দুই পক্ষই আমারে কিছু কিছু দ্যায়।'

অর্থাৎ লোকটা বড় ধরনের দালাল। ইণ্ডিয়া এবং পাকিস্তান, দুই দেশেই বিরাট করে জাল বিছিয়েছে। নিপুণভাবে। এপারে ওপারে বিনিময় করিয়ে টাকা লুটছে। পার্টিশান কত মানুষকে শেষ করে দিয়েছে, আবার নিত্য দাসের মতো লোকেদের সামনে টাকা করার কী সুবর্ণ সুযোগই না এনে দিয়েছে!

হিরণ জিজ্ঞেস করে, 'কিরকম টাকা পয়সা নিয়ে থাকেন?'

'ধরাবান্ধা কিছু নাই। হগলই বাড়ি জমিনের মাপ বুইঝা। সোম্পত্তি বড় হইলে বেশি ট্যাকা, ছোট হইলে কম ট্যাকা।' বলে একটু থেমে ফের শুরু করে নিত্য দাস, 'আসল কথাহান তো জিগাই নাই।'

'কী?'

'দ্যাশের বাড়ির দলিলগুলান কি মনে কইরা আনছেন, না রাইজদায় ফেলাইয়া আসছেন?'

'দাদু আর জেঠিমা নিয়ে এসেছে।'

'জবর বুদ্ধির কাম করছে। 'এচ্চেঞ্জে'র সোময় দলিল, দাখিলা, পরচা কি খাজনার রসিদ দরকার। এট্টা কিছু সরকারি কাগজ না দেখাইলে গাহেকে (খদ্দের) বুঝব ক্যামনে রাইজদার উই সম্পত্তি সত্য সত্যই আপনেগো কিনা।'

'তা তো ঠিকই।'

তাড়া দেবার সুরে নিত্য দাস এবার বলে, 'দেরি কইরেন না হিরণ ভাই। রাজাকার একবার আপনেগো জমিনে বইসা গ্যালে আর উঠান যাইব না কিলাম। আমার হাতে মেলা গাহেক (অনেক খদ্দের) আছে। আপনেরা রাজি হইলে পনর বিশ দিনের মইদ্যে সব কাম হইয়া যাইব।' খানিক চিন্তা করে ফের বলল, 'আমার পাওনাগন্ডার লেইগা ভাইবেন না। আপনেরা আমার নিজের জন। অন্যেরা যা দ্যায়, আপনেগো কাছ থিকা হের (তার) অনেক কম নিমু। ধরেন আদ্ধেক। পাকা কথা দিলাম।'

হিরণ দ্রুত ভেবে নিল, শওকত আলির সঙ্গে যদি কোনও কারণে কাজটা শেষ পর্যন্ত না হয়, নিত্য দাসকে হাতে রাখা ভাল। বলল, 'দাদু আর জেঠিমা তো কলকাতায় নেই। ওঁদের জিজ্ঞেস না করে কিছু করা যাবে না। ওঁরা ফিরে আসুন, দেখি কী বলেন—'

'ওনারা কবে ফেরবেন?'

'কুড়ি বাইশ দিন পর।'

'দেরি হইয়া যাইব হিরণভাই। মেলা (অনেক) মুসলমান পাকিস্থানে যাওনের লেইগা ছটফট করতে আছে। আইজ পারলে আইজই চইলা যায়। কাইলের লেইগা বইসা থাকব না। এই দিকে আমার লাখান (মতো) আরও অনেকে 'এচ্চেঞ্জে'র কারবারে লাইমা (নেমে) পড়ছে। যত দেরি হইব, আমার গাহেকেরা তাগো কাছে চাইলা যাইব। তহন আর কিছু করনের থাকব না। এক কাম করেন—'

'কী?'

'যত তরাতরি পারেন, দাদু আর জেঠিমারে কইলকাতায় লইয়া আসনের চ্যাষ্টা করেন—'

'দেখি—'

নিত্য দাস এবার বিনু সম্পর্কে মনোযোগী হয়ে ওঠে। তার দিকে ঘুরে বলে, 'একহান মোন্দ সম্বাদ আছে ছুটোবাবু। আমার যে লোকেরা বডারের উইপারে যায়, শুনাশুন তাগো কানে আইছে, হামকত্তার নিকি বড় বিপদ—'

বুকের ধকধকানি পলকে শতগুণ বেড়ে যায় বিনুর। এস্ত হয়ে সে জিজ্ঞেস করে, 'কিসের বিপদ?'

pathagar.net

'পাকিস্থান গবরমেন্ট (গভর্নমেন্ট) হিন্দুগো বড় বড় সোম্পত্তি জোর কইরা কাইড়া নিব। হামকত্তার জমিজেরাতের দিকেও নিকি তাগো নজর পড়ছে।'

বিনুও কার কাছে যেন এই একই কথা শুনেছে। পাকিস্তান সরকারের অভিসন্ধি, শত্রুসম্পত্তি ঘোষণা করে হিন্দুদের প্রপার্টি দখল। হিরণ বলেছিল কি? নাকি দেশ থেকে আসার সময় স্টিমার কিংবা কলকাতাগামী ট্রেনে অন্য কেউ?

এই সেদিন দেশ থেকে এপারে এসেছে বিনু। পার্টিশানের পর থেকেই রাজদিয়া এবং চারপাশের গ্রামগুলোতে ভাঙন ধরেছিল। ভিটেমাটি ফেলে কাতারে কাতারে মানুষ চলে যাচ্ছিল আসামে, ত্রিপুরায়, তবে বেশির ভাগই এপার বাংলায়।

বিনু দেখে এসেছে, আবহাওয়া খুবই উত্তপ্ত। চারদিকে প্রবল উত্তেজনা। ভয়। আতঙ্ক। কিন্তু হেমনাথের গায়ে এতটুকু আঁচড় পড়ে নি। কেউ তাকে হুমকি দেয়নি, দেশ ছেড়ে চলে যান। সরকার থেকে তাঁর বিষয় সম্পত্তি গ্রাস করার চক্রান্ত ঘুণাক্ষরেও টের পাওয়া যায় নি।

মাত্র এই ক'দিনে হঠাৎ অবস্থার কি এমনই অবনতি ঘটে গেছে? রাজদিয়াকে ঘিরে তিরিশ চল্লিশ মাইলের মধ্যে হেমনাথ সবচেয়ে জনপ্রিয়, সবচেয়ে শ্রদ্ধেয় মানুষ। তাঁরও কি তা হলে এবার নিস্তার নেই?

সন্ত্রস্ত বিনু জিজ্ঞেস করে, 'গভর্নমেন্ট থেকে দাদুর বাড়ি টাড়িগুলো শত্রু সম্পত্তি বলা হচ্ছে?'

'অহনও হয় নাই। কিন্তু হইতে কতক্ষণ? বিপদ ঘটনের আগে কাম সাইরা ফেলাইতে হইব।'

'আপনি কী করতে বলেন?'

নিত্য দাস জানায়, তার হাতে একজন মস্ত বড় খদ্দের আছে। শাজাহান সাহেব। হুগলি জেলায় তাঁর একশ' বিঘের ওপর জমিজমা। হাওড়া শহরে বিরাট দু'মহল বাড়ি। পুরনো আমলের একখানা মোটর গাড়িও আছে। ধান ওঠে বছরে দুশ' মণেরও বেশি। তা ছাড়া তিল, তিসি, সর্ষে। কিছু আখ আর ডালও। তিরিশ চল্লিশটা গরুর গাড়ি। মোটামুটি মাঝারি ধরনের জমিদারই বলা যায়।

শাজাহান সাহেব পাকিস্তানে চলে যাবেন। তিনি চাইছেন প্রচুর জমিজমা সমেত বাড়ি। যেমনটি এ বাংলায় আছে, সীমান্তের ওপারে প্রায় তেমনই চাইছেন। ঢাকা শহরে চাষের খেত কোথায় পাওয়া যাবে? তিনি ঢাকার চল্লিশ পঞ্চাশ মাইলের মধ্যে কোনও মফস্বল শহরে বাড়ি এবং তার কাছাকাছি জমির খোঁজ করছেন। হেমনাথরা চাইলে একমাসের ভেতর এক্সচেঞ্জ হয়ে যাবে।

নিত্য দাস বলল, 'অ্যামন সুযুগ হারান উচিত হইব না ছুটোবাবু। আপনে হ্যামকত্তারে শাজাহান সাহেবের কথা জানাইয়া এচ্চেঞ্জের ব্যাপারে চিঠি ল্যাখেন।'

বিনু যখন এপারে চলে আসে, হেমনাথ তখনও তাঁর সিদ্ধান্তে অবিচল। কোনও কারণেই দেশ ছাড়বেন না। এর মধ্যে যদি খবর পেয়ে থাকেন, পাকিস্তান সরকার শত্রুসম্পত্তির আইন জারি করতে চলেছে, তাঁর মত পালটাতেও পারে। অযাচিত যে সুযোগ নিত্য দাস নিয়ে এসেছে, হেলায় সেটা নষ্ট করা ঠিক হবে না।

হিরণ নীরবে শুনে যাচ্ছিল। এবার সায় দিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, লিখেই দাও।' উঠে গিয়ে ভেতরের ঘর থেকে কাগজ, কলম, সাদা বড় খাম আর আঠার শিশি এনে দিল।

বসার ঘরের একধারে চেয়ার টেবল রয়েছে। সেখানে গিয়ে চিঠিটা লিখেই ফেলল বিনু। রাজদিয়া থেকে এপারে আসার সময় ঝিনুককে নিয়ে প্রতি মুহূর্তে কী নিদারুণ সংকটের মুখে পড়তে হয়েছে, তার আনুপূর্বিক বিবরণ তো দিয়েছেই। আরও জানিয়েছে, কলকাতায় পৌঁছে অবনীমোহনকে না পেয়ে সুনীতিদেবের বাড়ি গিয়েছিল। সেখান থেকে আপাতত সুধাদের কাছে এসে আছে। হেমনাথ কষ্ট পাবেন, তাই হেমাঙ্গিনীর নির্দয় আচরণের কথা জানায় নি।

চিঠির শেষ দিকে এক্সচেঞ্জের ওপর জোর দিয়ে বিনু লিখেছে, দেশের যা হাল, অবিলম্বে খুব সাবধানে সম্পত্তির দলিলগুলো নিয়ে ক'দিনের জন্য যদি হেমনাথ কলকাতায় আসতে পারেন, ভাল হয়। বিনিময়ের ব্যবস্থা এখানেই হয়ে যাবে। আপাতত তিনি একাই আসুন। স্নেহলতারা রাজদিয়ায় থেকে যাবেন। হেমনাথের আসার খবরটা ঘুণাক্ষরেও যেন কেউ টের না পায়। কাজ চুকে যাবার পর স্নেহলতাদের দেশ থেকে নিয়ে আসা হবে।

চিঠিটা খামের ভেতর পুরে আঠা দিয়ে মুখ আটকে ফের হিরণদের কাছে এসে বসল বিনু।

হঠাৎ তার মনে সংশয় দেখা দেয়। বলে, এই চিঠি যদি অন্যের হাতে পড়ে, দাদুর ভীষণ বিপদ হয়ে যাবে। খুব সাবধানে, গোপনে এটা যেন তাঁর হাতে পৌঁছয়। আর হেমনাথও যেন তাঁর মতামত লিখে খামের ভেতর পুরে পত্রবাহককে দেন। তাঁর উত্তরের জন্য বিনু অপেক্ষা করে থাকবে।

জিভ কেটে নিত্য দাস বলল, 'হ্যামকত্তায় আমার বাপের লাখান। তেনারে কত সোম্মান করি। তেনার ক্ষতি হউক, এইটা আমি চিন্তাও করতে পারি না।' একটু থেমে ফের বলে, 'বিশ্বাসী লোকের হাত দিয়া আপনের পত্তরখান পাঠামু। পরান থাকতে এইটা হেয় (সে) হাতছাড়া করব না।'

খামটা নিত্য দাসকে দেয় বিনু। সেটা সযত্নে পকেটে পুরে সে বলে, 'অনেকখানি সোময় আপনেগো কাছে কাটাইয়া গ্যালাম। বড় ভালা লাগল। হ্যামকত্তার চিঠির জবাব লইয়া দশ পনর দিনের ভিত্‌রে আবার আসুম। আইজ চলি—'

নিত্য দাসের সঙ্গে একতলায় নেমে এল বিনু আর হিরণ।

হঠাৎ নিত্য একটু কুণ্ঠিতভাবে বলল, 'একহান কথা জিগামু ছুটোবাবু?'

বিনু বলল, 'কী?'

'শুনাশুন কানে আসছে, ঝিনুক বইনে নিকি আপনের লগে পাকিস্থান থিকা চইলা আসছে?'

এতক্ষণ কত কথাই না বলেছে নিত্য দাস। কাজের কথা, অকাজের কথা। কিন্তু ঝিনুক সম্পর্কে একটি শব্দও মুখে আনে নি। কিন্তু যাবার সময় আচমকা একটা শেল হেনে বসল।

হৃৎস্পন্দন পলকের জন্য থমকে যায় বিনুর। চিরদুঃখী মেয়েটাকে কতভাবেই না আড়াল করে রাখতে চাইছে সে, কিন্তু পারছে কই? ঝিনুকের চলে আসার খবর যখন পেয়েছে, ঢাকায় তার লাঞ্ছনার কথা কি নিত্য দাসের এখনও অজানা?

লোকটার হয়তো খারাপ কোনও অভিসন্ধি নেই। নেহাতই কৌতূহলের বশে ঝিনুকের কথাটা তুলেছে। কিন্তু হঠাৎ মাথার ভেতরটা তপ্ত হয়ে ওঠে বিনুর। পৃথিবীতে কত কত বিষয় তো রয়েছে। সে সব ফেলে ঝিনুককে নিয়ে টানাটানি কেন? রূঢ় গলায় সে বলে, 'ঝিনুকের কথা জানতে চাইছেন যে? কোনও দরকার আছে?'

বিনুর মারমুখী চেহারা দেখে ঘাবড়ে যায় নিত্য দাস। দূরে সরে গিয়ে বলে, 'না না, অ্যামনেই জিগাইতে আছিলাম। দ্যাশের মাইয়া। জম্মাইতে দেখছি। আইচ্ছা, যাই—'

বিনু মনস্থির করে ফেলে। ঝিনুককে কতদিন আর পরিচিত মানুষজনের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখবে? রাজদিয়া এবং তার চারপাশের গ্রামগুলো উজাড় করে লোক চলে আসছে এপারে। তাদের অনেকেই ঝিনুকের খবর জানে। যারা জানে না, তারাও জেনে ফেলবে। এবং বিশ্ময় চাউর করে দেবে।

আগেও বিনু ভেবেছিল, কিন্তু সাহসে কুলোয় নি। যাই ঘটুক, এবার আর কুঁকড়ে থাকা নয়, সমস্ত কিছুর মুখোমুখি দাঁড়াবে সে। অবশ্য যুগলকে ঝিনুককে নিয়ে আসার খবরটা দিয়েছে। কিন্তু নিত্য দাসের সঙ্গে যুগলের অনেক তফাত।

নিত্য দাস চলে যাচ্ছিল, তাকে ডেকে বিনু বলল, 'শুনুন, ঝিনুক আমার সঙ্গে এসেছে। এ বাড়িতেই আছে।'

pathagar.net

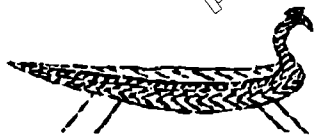

যুদ্ধের আমলে ডিফেন্সের প্রচার বিভাগে চাকরি নিয়ে এসেছিল হিরণ। মিত্রশক্তি তখন সিঙ্গাপুরে মালয়ে বর্মায় জাপানিদের হাতে কচুকাটা হচ্ছে। যারা বেঁচে আছে তারা বর্মা বর্ডার পেরিয়ে প্রাণভয়ে পালাচ্ছে কলকাতার দিকে। যে ব্রিটিশ সিংহ একদা সারা দুনিয়া দাপিয়ে বেড়াত, তোজোর ঝটিকা বাহিনী তার নাক কান এবং লেজ ছেঁটে দিচ্ছে। কিন্তু যাদের রাজত্বে সূর্যাস্ত হয় না তাদের এই চরম হেনস্থার খবর রটে গেলে, গালে চুনকালি লেগে যাবে। কাজেই মুখরক্ষার জন্য পালটা প্রচার দরকার। যখন অ্যালায়েড ফোর্স ল্যাজ গুটিয়ে পঞ্চাশ মাইল পিছিয়ে এসেছে তখন জানানো হচ্ছে, মিত্রবাহিনী আশি মাইল এগিয়ে গেছে। যখন বিশটা ট্যাঙ্ক আর তিরিশটা বোমারু বিমান ধ্বংস

হয়েছে, তারস্বরে উলটোটাই প্রচার করা হচ্ছে। কখনও কখনও অবশ্য বলা হচ্ছে, 'সাকসেসফুল রিট্রিট' অর্থাৎ মিত্রশক্তি সাফল্যের সঙ্গে পশ্চাদপসরণ করেছে।

প্রচার দপ্তর থেকে ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যে বোঝাই এই জাতীয় প্রেসনোট তৈরি করতে হত হিরণকে। সেগুলো ছাপার জন্য পাঠানো হত খবরের কাগজের অফিসে।

যুদ্ধের পর প্রচার দপ্তরের কাজ নেই। ইংরেজ তখন পালাই পালাই করছে। জার্মান বোমায় লন্ডনের অর্ধেক মাটিতে মিশে গেছে। আর্থিক দিক থেকে একেবারে হাড়ির হাল। এই অবস্থায় কয়েক হাজার মাইল দূরে অন্য গোলার্ধে কলোনি আগলে রাখা অসম্ভব।

প্রচার দপ্তর গুটিয়ে ফেলা হল। যুদ্ধের দু'আড়াই বছরের মাথায় রেশনিং চালু হয়ে গিয়েছিল। প্রচার দপ্তর থেকে ফুড কনট্রোলে পাঠানো হল হিরণকে। এখন সেই ডিপার্টমেন্টেরই সে অফিসার।

জ্বরের জন্য ক'দিন অফিসে যেতে পারেনি হিরণ। বিনুরা আসার পর আরও দিন কয়েক ছুটি নিয়েছিল।

এখনও প্রচুর মেডিক্যাল আর আর্নড লিভ জমা হয়ে আছে। হিরণ ছুটিটা আরেক সপ্তাহ বাড়িয়ে নিল।

নিত্য দাস সেই যে এসেছিল, তারপর ক'টা দিন বিনু আর ঝিনুককে নিয়ে সারা কলকাতায় চরকির মতো ঘুরে বেড়াল হিরণ আর সুধা। গঙ্গার ধার। ইডেন গার্ডেন। হাওড়া ব্রিজ। বোটানিক্যাল গার্ডেন। দক্ষিণেশ্বর। কালীঘাট। মার্বেল প্যালেস। মনুমেন্ট। দু'দিন নাইট শো'য়ে সিনেমাও দেখল। 'দেবী চৌধুরানী' আর 'কবি'।

যার জন্য এত ছোটাছুটি সেই ঝিনুকের দিনগুলো যেন ঘোরের মধ্যে কেটে যাচ্ছে। কলকাতার চারদিকে কত যে ইন্দ্রজাল! ঝিনুকের মনে হয়, কোনও স্বপ্নদৃশ্যে সে ডানা মেলে ভাসছে। সুধাদের কাছে এসে বড় ভাল লাগছে তার।

আজ বেস্পতিবার।

ক'দিন সারা কলকাতায় অবিরল পাক খাওয়ার পর আজ শরীর একেবারে ছেড়ে দিয়েছে। বাড়ি থেকে কারোরই বেরুতে ইচ্ছা করছে না।

তা ছাড়া, ফি বেস্পতিবার যুগল আসে। যুদ্ধের আমলের মিলিটারি হাসপাতালে পা ড্রেস করিয়ে এ বাড়িতে দুপুরটা কাটিয়ে যায়। অতদূর থেকে এসে হিরণদের কাউকে না পেলে জখম পা নিয়ে এতটা ছোটাছুটিই সার। খুবই কষ্ট হবে যুগলের।

সকালে এক দফা চা হয়ে গেছে। এখন সাড়ে দশটার মতো বাজে। বাইরের ঘরে আরও একবার চা নিয়ে বসেছে বিনু আর হিরণ।

ভেতরে রান্নার তোড়জোড় চলছে। সেখান থেকে ঝিনুক আর সুধার অস্পষ্ট কথাবার্তা ভেসে আসছে। মাঝে মাঝে কোনও মজার কথায় দু'জনে হেসে লুটিপাটি হচ্ছে।

বিনু খুব একটা চা খেত না। সকালে এক কাপ, বিকেলে এক কাপ। কিন্তু হিরণদের কাছে এসে সঙ্গগুণে চায়ের মাত্রাটা অনেক বেড়ে গেছে।

জানালার বাইরে পরিষ্কার নীলাকাশ। সকালের দিকে যে কুয়াশা ছিল, এখন তার লেশমাত্র নেই। ঝলমলে রোদ ছড়িয়ে আছে চারদিকে, তবে আগের মতো ঝাঁঝ নেই। উত্তুরে বাতাস ক্রমশ শীতল হচ্ছে। শীতঋতু যে লম্বা পায়ে এগিয়ে আসছে, টের পাওয়া যায়।

এ ক'দিন যেখানে যেখানে ঘোরা হয়েছে, যে ক'টা সিনেমা দেখা হয়েছে, সে সব নিয়ে লঘু মেজাজে গল্প হচ্ছিল। হঠাৎ হিরণ বলল, 'কলকাতায় চলে এসেছ। আর কখনও রাজদিয়ায় ফেরার প্রশ্নই নেই। কী করবে, কিছু ঠিক করেছ?'

হিরণ কী জানতে চাইছে, বুঝতে না পেরে বিনু বলল, 'কী করব বলতে?'

'তুমি তো বি. এ পাস করেছ।'

'হ্যাঁ।'

'কিসে অনার্স ছিল?'

pathagar.net

'ইংরেজিতে।'

হিরণ জিজ্ঞেস করল, 'পড়াশোনা কি চালিয়ে যাবে? তা হলে ইউনিভার্সিটিতে গিয়ে ফর্ম টর্ম এনে অ্যাডমিশানের ব্যবস্থা করতে হয়।' একটু ভেবে বলল, 'এ বছরের ক্লাস অবশ্য অনেক আগেই শুরু হয়ে গেছে। শুনেছি, উদ্বাস্তু ছাত্রদের ব্যাপারে ইউনিভার্সিটি খুব সিমপ্যাথেটিক। দেরিতে হলেও ভর্তি করে নিতে পারে।'

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকে বিনু। ছেচল্লিশের দাঙ্গার পর থেকে পূর্ব বাংলার আবহাওয়া বিষবাষ্পে ভরে যাচ্ছিল। সারাক্ষণ উৎকণ্ঠা। সারাক্ষণ মৃত্যুভয়। সবচেয়ে বড় সংকট তখন ঝিনুককে নিয়ে। প্রায় বদ্ধ উন্মাদ হয়ে গিয়েছিল সে। কী করে তাকে সুস্থ, স্বাভাবিক করে তুলবে সেটাই ছিল বিনু হেমনাথ স্নেহলতা এবং শিবানীর একমাত্র চিন্তা। তারপর তো বিরাট ঝুঁকি নিয়ে প্রবল আতঙ্কের মধ্যে ঝিনুককে নিয়ে এপারে চলে এল বিনু। এর ভেতর অন্য কিছু ভাবার সময় পায় নি সে।

কিন্তু এটা তো ঠিক, সামনে বিপুল ভবিষ্যৎ। একটি যুবকের পক্ষে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকা তো সম্ভব নয়। সুধাদের কাছে আসার পর ক'টা দিন হইচই আর অফুরান আনন্দে যেন আকাশে উড়ছিল বিনু। সেখান থেকে একটানে হিরণ তাকে বাস্তবের কঠিন জমিতে নামিয়ে এনেছে।

বিনু বলল, 'বাবা ফিরে আসুন। তিনি কী বলেন, শুনি—'

হিরণ সায় দেয়, 'তা তো বটেই।' হঠাৎ কী মনে পড়ায় দ্বিধান্বিতভাবে বলে, 'তবে—'

'কী?'

'তোমার ছোটদিকে কিছু বোলো না। আমি যতদূর জানি, শ্বশুরমশাইর আর্থিক অবস্থা খুব খারাপ।'

বিনু চমকে ওঠে। যে অবনীমোহন যুদ্ধের আমলে দাপটে আসামে গিয়ে কনট্রাক্টরি করেছেন, তিনি যে আর্থিক দিক থেকে দুরবস্থায় পড়েছেন, রাজদিয়ায় থাকতে এমন খবর তাদের কাছে পৌঁছয় নি। ইদানীং না হয় চিঠিপত্র পাওয়া যাচ্ছে না। কিন্তু ছ'মাস আগেও ডাক চলাচলে কোনও গোলমাল ছিল না। সুধারা, সুনীতিরা নিয়মিত চিঠি লিখত। কিন্তু তারাও কেউ ঘুণাক্ষরে কিছু জানায় নি।

হিরণ বলছিল, 'চিন্তা কোরো না, তোমার পড়ার ব্যাপারটা আমি দেখব।'

বিনুর আত্মসম্মানে বাধছিল। ভগ্নিপতির পয়সায় পড়াশোনা চালাতে তার মন মোটেও সায় দিচ্ছে না। সে বলল, 'দেখুন হিরণদা, এটা হয় না।'

হিরণ বুঝতে পারছিল, বিনুর কোথায় আটকাচ্ছে। সে জোর করল না। শুধু বলল, 'আর দেরি করলে ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হতে মুশকিল হবে।'

বিনু উত্তর দিল না।

কিছুক্ষণ চুপচাপ।

তারপর হিরণ বলল, 'তোমার আপত্তিটা কোথায়, আন্দাজ করতে পারছি। ঠিক আছে, ইচ্ছে যখন নেই, আমার সাহায্য না-ই নিলে। আমার অন্য একটা কথা ভেবে দেখতে পার।'

হিরণ যে তার সত্যিকারের শুভাকাঙ্ক্ষী, বিনু তা জানে। উৎসুক সুরে জিজ্ঞেস করল, 'কী কথা?'

'একটা চাকরি বাকরি করলে। ফাঁকে ফাঁকে পড়ে প্রাইভেট এম.এ'টা দিলে।'

এই পরামর্শটা মনে ধরল বিনুর। অবনীমোহন সম্পর্কে যে খবরটা পাওয়া গেল, তাতে তাঁর বোঝা বাড়ানো ঠিক হবে না। ঝিনুক আর সে গিয়ে থাকবে। দু'টো মানুষের দায়িত্ব তো কম নয়। তার ওপর পড়াশোনার খরচ। না, রোজগারের একটা ব্যবস্থা তাকে করতেই হবে।

বিনু ব্যগ্রভাবে বলল, 'আমি তো এখানকার কিছুই চিনি না। চাকরি পেতে হলে কী করতে হবে?'

'আমাদের ফুড ডিপার্টমেন্টে মাস দুয়েকের ভেতর কিছু লোক নেওয়া হচ্ছে। রিফিউজিদের প্রায়োরিটি দেওয়া হবে। তুমি গ্র্যাজুয়েট, তার ওপর অনার্স। তোমার চাকরি আশা করি হয়ে যাবে। বর্ডার স্লিপটা আছে তো?'

'আছে।'

'ইন্টারভিউর সময় ওটা দেখতে চাইবে।'

ভেতরে ভেতরে উদীপ্ত হয়ে উঠেছে বিনু। সে হাসল, 'আমি যে ওপার থেকে এসেছি তার

প্রমাণ চাই, এই তো?'

'হ্যাঁ।' হিরণ আস্তে মাথা নাড়ে, 'ও, আসল ব্যাপারটাই তো বলা হয় নি। তোমার ম্যাট্রিকুলেশন, আই.এ, বি.এ'র সার্টিফিকেট আর ডিগ্রি নিয়ে এসেছ তো?'

'আমি তো সেদিনই আপনাকে বললাম, 'তারপাশায় আসার সময় দাঙ্গাবাজরা নৌকো থেকে সব জিনিসপত্র লুট করে নিয়ে গিয়েছিল। তার ভেতর আমার ডিগ্রিটিগ্রিও ছিল।'

হঠাৎ ভীষণ হতাশ হয়ে পড়ে হিরণ। মনে পড়ল, ডিগ্রিগুলো খোয়া যাবার কথা বিনু তাকে জানিয়েছিল। তার খেয়াল ছিল না। বলল, 'সর্বনাশ। ওগুলো ছাড়া চাকরি হবে কী করে?'

সব উৎসাহ নিমেষে বিলীন। পাংশু মুখে বসে থাকে বিনু।

খানিক ভেবে হিরণ বলে, 'একটা উপায় অবশ্য আছে। রাজদিয়া কলেজের প্রিন্সিপ্যাল যদি লিখে দেন তুমি ওখান থেকে বি. এ পাস করেছ, কাজ হতে পারে। ইস, নিত্য দাস হেমদাদুর চিঠি লিখিয়ে নিয়ে গেল। তখন আমার একেবারেই খেয়াল হয় নি। চিঠিতে এই সমস্যার কথাটা লিখে দিলে হেমদাদু প্রিন্সিপ্যালের সঙ্গে দেখা করে ব্যবস্থা করতে পারতেন। ভীষণ ভুল হয়ে গেছে।'

বিনু উত্তর দিল না।

কী যেন চিন্তা করে হিরণ। চকিতে আলোর একটা সংকেত চোখের সামনে ঝিলিক দিয়ে যায়। 'ইন্টারভিউতে ডাকতে অনেক দেরি। তুমি একটা দরখাস্ত তো করে দাও। তার মধ্যে নিত্য দাস হেমদাদুর জবাব নিয়ে আসবে। তখন তাঁকে আরেকখানা চিঠি লিখে দেওয়া যাবে। প্রিন্সিপালের সঙ্গে দেখা করে তিনি যেন সব ব্যবস্থা করেন।'

নীচের বাগান থেকে যুগলের গলা ভেসে এল, 'ছুটোদিদি, ছুটো জামাইবাবু, দরজা খুইলা দ্যান—' সেই সঙ্গে কড়া নাড়ার খটখটানি।

হিরণ বলল, 'যুগল এসে গেছে।' উমাকে ডেকে একতলায় পাঠিয়ে দিল সে।

খানিক পরে উমার সঙ্গে দোতলায় উঠে এল যুগল। মেঝেতে ঝুপ করে বসে বিনুকে দেখে খুশিতে সারা মুখ জুড়ে হাসল, 'আপনের কথাই ভাবতে ভাবতে আসতে আছিলাম ছুটোবাবু।'

বিনু লক্ষ করেছে, বসার জন্য সেদিনের মতো কষ্ট করতে হয় নি যুগলকে। উরুর ব্যান্ডেজটাও বেশ ছোট। ব্যাথাটাও মনে হচ্ছে, অনেক কমে গেছে।

বিনু বলল, 'আমরাও তোমার জন্যে অপেক্ষা করছি। ছোটদি আর হিরণদার মুখে শুনেছি, তুমি অন্য বেস্পতিবার দুপুরের আগে আসো না। আজ এত তাড়াতাড়ি যে?'

'হাসপাতালে আইজ তরাতরি হইয়া গেল। ঘাওখান (ঘা'টা) শুকাইয়া আসছে। ডাক্তারে কইছে আর দুই বিষ্যুদবার দেইখা পায়ের পট্টি (ব্যান্ডেজ) খুইলা দিব।'

'খুব ভাল খবর। তোমাদের মুকুন্দপুরের কী অবস্থা?'

'একই। জমিনের দখল কি এত সহজে মিলে? জমিন্দারের লগে কতকাল লইড়া যাইতে হইব, ক্যাঠা জানে।' যুগল বলতে লাগল, 'উই হগল কথা থাউক। আইজ মনে মেলা আশা নিয়া আসছি। একে একে কই। বড়দিদির বাড়িত্ থিকা ঝিনুক বইনেরে নিয়া আসছেন?'

বিনু বলল, 'হ্যাঁ। নিয়ে আসব যে, সেদিনই তো তোমাকে বলেছি।'

যুগল প্রায় চেঁচিয়ে ওঠে, 'কই হেয় (সে)?'

'রান্নাঘরে, ছোটদির সঙ্গে কী যেন করছে—'

'অহনই ডাইকা আনেন। দুই জনেরেই।'

বিনু ভেতরে চলে গেল। ঝিনুক কিছুতেই আসবে না। যুগলের কাছে সঙ্কোচের কারণ নেই। প্রাণ গেলেও সে কোনও রকম ক্ষতি করবে না। অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে তাকে বাইরের ঘরে নিয়ে এল বিনু। সঙ্গে সুধাও এসেছে।

আনন্দে দু'চোখ চিক চিক করতে থাকে যুগলের। বলে, 'উঃ, কত ডাঙ্গর (বড়) হইয়া গ্যাছ ঝিনুক বইন। বসো, বসো—'

ঝিনুকের জন্য সারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যে কোনও পরিস্থিতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেছে বিনু। কিন্তু ঝিনুকের মধ্যে তেমন সাহস নেই। চেনাজানা মানুষের সামনে সে ভীষণ

ওটিয়ে যায়। আড়ষ্টের মতো একটা সোফায় নিঃশব্দে বসে পড়ল। নতমুখ। যুগলের দিকে সে তাকাতে পারছিল না।

যুগল পলকহীন ঝিনুককে দেখছিল। বলল, 'আমারে দেইখা অ্যামন লাজ (লজ্জা) ক্যান? আমি তোমাগো যুগইলা না? হেই ছুটোকালে তোমারে কতহানে লইয়া গ্যাছি, কত কী দেখাইছি, মনে পড়ে?'

এক টানে স্মৃতির ঝাঁপি খুলে ফেলল যুগল। রাজদিয়ায় থাকতে তার কাছে ঝিনুক কত না আবদার করেছে! কত যে তার বায়না! আকাশ-উঁচু গাছের মাথা থেকে তাকে পেড়ে এনে দিতে হয়েছে পাকা কাউফল। কখনও বিলিতি গাব। কখনও গহীন বেতঝোপের ভেতর থেকে থোকা থোকা বেথুন (বেতফল)। কখনও হলুদ-বর্ণ রোয়াইল, পাকা বরই, ডেউয়া, কামরাঙা। কখনও বা অথৈ জল থেকে তুলে আনতে হয়েছে শাপলা শালুক কি জলপদ্ম। ভাসানের পরদিন হেমনাথের সঙ্গে বাইচ দেখতে ঝিনুক যখন বড় গাঙে যেত, সেই নৌকো বেয়ে নিয়ে যেত কে? যুগল। চৈত্র সংক্রান্তির মেলায় যখন কাঠের পুতুল, জ্যান্ত টিয়াপাখি বা তিলা কদমা চিনির মঠ কিনতে যেত, সঙ্গে থাকত কে? যুগল।

ছোট ছোট কত ঘটনা। টুকরো টুকরো কত আনন্দের স্মৃতি। যুগল যেন লহমায় ঝিনুককে সারি সারি স্বপ্নদৃশ্যের ভেতর টেনে নিয়ে গেল। সরল, অকপট, ম্যারপ্যাঁচহীন এই যুবকটির স্বভাবে কোথায় যেন একটা ঝড়ো হাওয়া আছে। এক ঝাপটায় ঝিনুকের সব আড়ষ্টতা উধাও। শক্ত খোলার ভেতর থেকে ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসে সে। পুরনো দিনের সুখস্মৃতি তাকে যেন শতদিকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। যে সব ঘটনা যুগলের মনে পড়ে নি, সেগুলো মনে করিয়ে দেয়। মজার মজার কথায় হেসে কুটিপাটি হতে থাকে। ঢাকায় তার চরম লাঞ্ছনার খবরটা যুগল জানে কিনা, সে সম্বন্ধে আর খেয়াল থাকে না ঝিনুকের।

যুগল মাথা ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে বলে, 'ঝিনুক বইন, অহন কী ভালা যে লাগতে আছে! এই হাসন আছিল কই? এই বস্যে (বয়সে) শোকাতাপা (শোকগ্রস্ত) মাইনষের লাখান মাটিতে চৌখ নামাইয়া বইসা থাকলে আমার মন খারাপ হইয়া যায়।'

ঝিনুকই শুধু নয়, হিরণ আর সুধাও হাসছিল। তারা হাসতেই থাকে।

যুগল বলল, 'ঝিনুক বইনের লগে দেখা হইয়া গ্যাল। এইবার পরের কথাহান কই ছুটোবাবু—'

বিনু জিজ্ঞেস করল, 'কী কথা?'

'আমার লগে আইজ আপনেরে আর ঝিনুক বইনেরে মুকুন্দপুরে লইয়া যামু।' উদ্দীপ্ত মুখে যুগল বলতে লাগল, 'আমাগো উইহানের মানুষজন আপনেগো দ্যাখনের লেইগা পথের দিকে তাকাইয়া আছে।'

বিনুর মনে পড়ল, আগের বেস্পতিবার তাকে মুকুন্দপুরে নিয়ে যাবার কথা বলেছিল যুগল। কিন্তু সেটা যে আজই, ভাবতে পারে নি। বলল, 'এত তাড়াহুড়ো কেন? এখন তো আমরা কলকাতায় থাকছিই। অন্য একদিন যাব।'

যুগল ব্যগ্রভাবে বলল, 'অন্য দিন না। আইজই যাইবেন। পাখি মাথার কিরা (দিব্যি) দিয়া কইয়া দিছে, আপনেগো দুইজনেরে লইয়া যাইতে হইব। আপনেরা না গ্যালে আমার ঘেটিতে (ঘাড়ে) মাথাহান থাকব না।'

পাখি যুগলের বউ। ওদের বিয়েতে কী ধুমধামই না হয়েছিল! রাজদিয়াবাসীরা, হিন্দুই হোক কি মুসলমান, সবাই তিনদিন হেমনাথের বাড়িতে নেমন্তন্ন খেয়েছে। সকাল দুপুর বিকেল রাত্রি, চারবেলা করে।

যুগল থামে নি,'হেয়া (তা) ছাড়া, আমাগো রাইজদা আর চাইরপাশের গেরামগুলান থিকা কত মানুষ মুকুন্দপুরে গিয়া উঠছে। তাগো নৈরাশ কইরেন না ছুটোবাবু—' একটু ভেবে তক্ষুনি আবার শুরু করে, 'নিশিকান্ত আচায্যির কথা মনে আছে? তাজপুরে তেনাগো বাড়ি আছিল।'

রাজদিয়ার দক্ষিণ দিকে তিনখানা গ্রামের পর তাজপুর। নিশিকান্ত আচার্যকে বেশ কয়েক বার

হেমনাথের কাছে যাতায়াত করতে দেখেছে বিনু। যখন আসত তার সঙ্গে সামান্য দু'একটা কথা বলত। ব্যস, এই পর্যন্ত। তার সম্বন্ধে এর বেশি কিছু মনে নেই।

হঠাৎ এত মানুষ থাকতে আলাদা করে নিশিকান্ত আচার্যর কথা কেন তুলল, জিজ্ঞেস করায় যুগল বলে, 'পাখি আপনেগো দুইজনের খাওনের লেইগা চাউল তরিতরকারি মাছ ডাইল তেনাগো কাছে দিয়া আসছে। ওনারা বামন (ব্রাহ্মণ)। আপনেগো লেইগা রাইন্ধা (বেঁধে) দিব।'

পাছে তাদের হাতে না খায় সেজন্য ব্রাহ্মণদের দিয়ে রান্নার ব্যবস্থা করেছে যুগলরা। শুনেই মাথার ভেতরটা তপ্ত হয়ে ওঠে বিনুর। গলার স্বর চড়িয়ে বলে, 'তোমার কী করে মনে হল, তোমরা রেঁধে দিলে আমরা খাব না?'

'উচা জাইতের মাইনষে আমাগো ছুয়া খায় না। হেইর লেইগা—' বলতে বলতে যুগলের সারা মুখে হাজার বাতি জ্বলে উঠল, 'খাইবেন আমাগো হাতে ছুটোবাবু! সত্যই খাইবেন!'

'খাব, খাব, খাব। আমি তোমাদের হেমকর্তার নাতি। তিনি সবার বাড়িতে খেতেন। জাতপাত মানতেন না। আমিও মানি না। কিন্তু আজ আমাদের মুকুন্দপুরে না গেলেই ভাল হয়।'

যুগল সব আপত্তি খারিজ করে দিল। তার মধ্যে এমন এক ব্যগ্রতা, সারল্য আর আন্তরিকতা রয়েছে যে শেষ পর্যন্ত বিনুকে রাজি হতেই হল। যুগলের বিশ্বাস, তার এই ছোটবাবুটির ওপর সে জোর খাটাতেই পারে। যাকে একদিন পূর্ব বাংলার খালে বিলে নদীতে এবং নানা ভূখণ্ডে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ফুল ফল এবং নানা ধরনের বৃক্ষলতা চিনিয়েছে, দিয়েছে জলতলের অপার রহস্যের সন্ধান তার ওপর যুগলের দাবি অফুরান।

তবে ঝিনুককে কোনও মতেই রাজি করানো গেল না। যুগলের কাছে তার যাবতীয় আড়ষ্টতা আর সঙ্কোচ কেটে গিয়েছিল। কিন্তু সে জেনে গেছে, মুকুন্দপুরে রাজদিয়া এবং তার চারপাশের অনেকে জমি দখল করে বসেছে। এরা সবাই তার চেনা। এই লোকগুলো কি আর ঢাকার সেই ঘটনার খবর পায় নি? তাকে দেখলে ওরা কী করবে বা কী বলে বসবে, কে জানে। পরিচিত মানুষজনের কাছে সে আদৌ স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে না।

যুগল বলল, 'আমার আশাহান আধাআধি পূরণ হইল। তয় (তবে) ঝিনুক বইন, একদিন না একদিন আমি তোমারে মুকুন্দপুরে লইয়া যামুই।'

ঝিনুক হাসল, উত্তর দিল না।

যুগল সুধাকে বলল, 'এট্টু তরাতরি বাইর হমু ছুটোদিদি। আপনের রান্ধন (রান্নার) কত দূর?'

সুধা বলল, 'হয়ে এসেছে। কেন?'

'যা হইছে হেই দিয়া দ্যান। মুকুন্দপুর কাছে পিঠে না। যাইতে সোময় লাগে। হেয়া (তা) ছাড়া পথে একহান কাম সারতে হইব।'

খাওয়াদাওয়া চুকিয়ে কাপড়ের ঝোলায় বাড়তি দু'একটা জামাকাপড় এবং টুকিটাকি জিনিস ভরে যুগলের সঙ্গে বেরিয়ে পড়ল বিনু।

হিরণ বলল, 'তোমাদের ছোটবাবুকে বেশি দিন আটকে রেখো না কিন্তু।'

যুগল সবেগে মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'না না, বড় জোর চাইর পাচদিন। হের (তার) পর আমি নিজে লগে কইরা দিয়া যামু।'

হিরণের মাথায় পর পর নানা চিন্তা উঁকিঝুঁকি দিতে থাকে। চাকরির ব্যাপারে বিনুর দরখাস্ত লেখা হয় নি। সেটা তাড়াতাড়ি লিখে জমা দেওয়া দরকার। অবনীমোহনের ফেরার সময় হয়ে এসেছে। বিনুকে সঙ্গে করে ভবানীপুরে গিয়ে একবার তাঁর খোঁজ নিয়ে আসতে হবে। তাছাড়া, এ ক'দিন সারা কলকাতায় প্রচুর ঘোরাঘুরি করা হয়েছে। অঢেল আনন্দ। প্রচণ্ড হই হই। এবার তাকে দিয়ে একটা কাজ করিয়ে নিতে হবে। দেশের বাড়ির সঙ্গে শওকত আলিদের এক্সচেঞ্জ করার ব্যাপারে সুধার এখনও প্রবল আপত্তি। সে একেবারে ঘাড় বাঁকিয়ে রেখেছে। যে পরিবেশে, যে আবহাওয়ায় সুধা বড় হয়ে উঠেছে, তার মধ্যে কোনও রকম সংস্কার থাকার কথা নয়। কিন্তু কার ভেতর কী যে থেকে যায়! হিরণের ইচ্ছা, বিনুকে দিয়ে বুঝিয়ে সুঝিয়ে এক্সচেঞ্জের ব্যাপারে সুধাকে রাজি করাবে। সেটা যত তাড়াতাড়ি হয় ততই ভাল।

pathagar.net

হিরণ বলল, 'চার পাঁচদিন নয়, আজ যাচ্ছে। কালকের দিনটা থেকে পরশু বিনু চলে আসবে। ওকে আর আটকে রাখবে না। ওর এখানে অনেক কাজ।'

যুগল বলল, 'আইচ্ছা আইচ্ছা, আগে তো ছুটোবাবু যাউক। হের (তার) পর দেখা যাইব।'

বিনু লক্ষ করল, মুকুন্দপুরে গিয়ে তার দু'একদিন থেকে আসার ব্যাপারে এতটুকু আপত্তি করে নি ঝিনুক। রাজদিয়ায় রাজেকের নৌকোয় ওঠার পর থেকে এক লহমাও তাকে কাছছাড়া করতে চাইত না সে। কিছুক্ষণের জন্য বিনু কোথাও গেলে কেঁদেকেটে জগৎ সংসার তোলপাড় করে ফেলত। বিনুই তখন তার একমাত্র ভরসা। একমাত্র অবলম্বন। তাকে বাদ দিয়ে বেঁচে থাকার কথা ভাবতে পারত না মেয়েটা। মনে হত, দিকদিশাহীন, অথৈ সমুদ্রে ভেসে যাবে।

কিন্তু সুধাদের কাছে এসে পায়ের তলায় শক্ত জমির স্পর্শ পেয়েছে ঝিনুক। এখানে সে নিরাপদ। বিঘ্নহীন। সমস্ত দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত। দু'তিন দিন কেন, বিনু যদি পুরো একটি সপ্তাহও মুকুন্দপুরে কাটিয়ে আসে, সে বাধা দেবে না। বিনুকে ছাড়াও দুই ডানায় তাকে ঘিরে রাখার মতো আরও দু'জনকে সে পেয়ে গেছে। সুধা আর হিরণ।

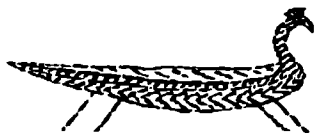

দু'আড়াই বছর কলকাতায় এবং তার আশেপাশে থেকে এই বিশাল শহরের রাস্তাঘাট সম্পর্কে যথেষ্ট সড়গড় হয়ে উঠেছে যুগল। কত নম্বর বাস বা ট্রাম কোন কোন রুটে চলে, সব তার মুখস্থ।

এখন ভরদুপুর। বাসে ভিড় ছিল না। ছড়িয়ে ছিটিয়ে কিছু প্যাসেঞ্জার এধারে ওধারে বসে আছে।

বিনু জানালার ধার ঘেঁষে বসেছিল। যে মনিবের বাড়িতে কামলা খেটেছে, তার নাতির পাশে গা ঠেকিয়ে বসতে ভীষণ কুণ্ঠা হচ্ছিল যুগলের। প্রায় ধমক দিয়ে বসিয়ে দিয়েছে বিনু।

ঢিকিস ঢিকিস করে বাস চলেছে। সারা গায়ে আলস্য জড়ানো। যেন কোথাও সেটার যাবার তাড়া নেই।

একেকটা স্টপেজ আসে, পাদানিতে দাঁড়িয়ে খসখসে, চেরা গলায় কনডাক্টর চেঁচিয়ে যায়, 'মুদিয়ালি, কালীঘাট, হাজরা, ভবানীপুর, ধর্মোতলা—খালি গাড়ি, খালি গাড়ি—'

যতখানি সম্ভব স্পর্শ বাঁচিয়ে জড়সড় হয়ে বসে আছে যুগল।

বিনু জিজ্ঞেস করল, 'বেশ কিছুদিন তো এখানে কাটালে। কেমন লাগছে?'

যুগল বলে, 'ভালা না ছুটোবাবু। পদ্মা নাই, ম্যাঘনা নাই, ধলেশ্বরী নাই, কালাবদর নাই, আইড়ল খা নাই — এইটা এট্টা দ্যাশ হইল! রুখাশুখা মাটি। কইলকাতার কিনার দিয়া বড় একহান খাল চইলা গ্যাছে। হেইটার নাম গঙ্গা। এই নিকি নদী! শুইন্না আমি আটাস (অবাক)। ইচ্ছা হয়, এই পারের মানুষগুলারে ঘেটি ধইরা উইপারে লইয়া গিয়া দেখাই নদী কারে কয়। পদ্মা-ম্যাঘনা দেখলে সুমুন্দির পুতেরা ভিরমি খাইব।'

বিনু হাসে।

যুগল থামে নি, 'জবর জবর নদী না থাকলে কি সুখ হয় ছুটোবাবু?'

বিনু জানে, বিশাল বিশাল খাল, বিল, নদী ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে পারে না যুগল। পূর্ব বাংলার শতদিকে ছড়িয়ে পড়া শত জলধারা তার রক্তের ভেতর মিশে আছে। আজন্ম।

যুগলের অভিযোগের তালিকা অফুরন্ত। সে একনাগাড়ে বলে যায়, 'হের (তার) পর মাছের কথাই ধরেন। ভাগনা টাটকিনি সুবন্ন খউরকা (সুবর্ণ খড়কে), খল্লা বইচা কাচকি বজুরি ট্যাংরা, ভাল জাতের চাইপলা (চাপিলা), বড় বড় বাইন। এইহানের মাইনষে বাপের জন্মে এই হগল মাছের নামও শোনে নাই। চৌখেও দ্যাখে নাই। থাকনের মইদ্যে রুইত, মিরগ্যাল (মৃগেল), কাতলা, ইচা (চিংড়ি), ভ্যাকট (ভেটকি), পাইশ্যা (পার্শে), আর লোনা জলের মাছ।'

বিনু হাসতে থাকে।

যুগল বলে যায়, 'নানা কিসিমের মাছ থাকব, জলে জবর নদী থাকব, হাওর থাকব। তয় না একহান দ্যাশ।'

বোঝা যায়, দেশভাগের পর সীমান্তের এপারে এসে যুগলের আক্ষেপের শেষ নেই।

ধর্মতলায় পৌঁছে গেল বিনুরা। সেখানে নেমে অন্য একটা বাস ধরে শিয়ালদায় তাকে নিয়ে এল যুগল। এখান থেকে ট্রেনে আগরপাড়া যেতে হবে। তারপর পায়ে হেঁটে কিংবা সাইকেল রিকশায় মুকুন্দপুর।

শিয়ালদায় পৌঁছতেই যুগলের সেই কথাটা মনে পড়ে গেল বিনুর। জিজ্ঞেস করল, 'তখন বললে, রাস্তায় তোমার কী কাজ আছে। ভুলে গেছ নাকি?'

যুগল বলে, 'ভুলি নাই। কামটা আমার এই শিয়ালদার ইস্টিশনে।' কী কাজ সেটা বিস্তারিত বুঝিয়ে দিল। আগে প্রায় রোজই মুকুন্দপুর থেকে শিয়ালদায় টহল দিয়ে যেত। পায়ে চোট খাওয়ার পর এখন সপ্তাহে একদিনই আসতে পারে। ফি বেস্পতিবার হাসপাতালে পা ড্রেস করাতে তাকে ছুটতে হয় বহু দূরে লেকের ধারে। সকালের দিকে ভীষণ তাড়াহুড়ো থাকে। সাড়ে ন'টার ভেতর না পৌঁছলে ডাক্তারের দেখা পাওয়া যাবে না। মুকুন্দপুর থেকে এতটা ছোটাছুটিই সার। তবে পা ড্রেস করিয়ে ফেরার সময় তার হাতে অঢেল সময়। তখন সে আতিপাতি করে শিয়ালদা সাউথ আর মেনের সব প্ল্যাটফর্ম এবং বাইরের চত্বরে অগুনতি উদ্বাস্তুর ভিড়ে রাজদিয়া এলাকার এবং তার শ্বশুরবাড়ি ভাটির দেশের চেনাজানা মানুষজন খুঁজে বেড়ায়। তাদের কাউকে পেলে মুকুন্দপুরে টেনে নিয়ে যায়।

যুগল বলল, 'চিনাজানা আত্মজন একলগে থাকলে মনের বল বাড়ে। আমার পরানে একহান সাধ আছে ছুটোবাবু।'

বিনু উৎসুক চোখে তাকায়, 'কী সাধ?'

যুগল বলে, 'মুকুন্দপুররে একহান রাইজদা কি ভাটির দ্যাশ বানামু। ততখানি বাহারের হইব না। তভু যতখানি পারন যায়।'

অভিভূতের মতো তাকিয়েই থাকে বিনু। অক্ষরপরিচয়হীন এই যুবক কী আশ্চর্য রকমের স্বপ্নদর্শী! পূর্ব বাংলার এক রমণীয় ভূখণ্ডকে সে সীমান্তের এপারে নতুন করে নির্মাণ করতে চায়।

ক'দিন আগে ঢাকা মেল থেকে বিনুরা যখন নামে, শিয়ালদা স্টেশনের চেহারা যেমন ছিল, আজও তার হেরফের নেই। তবে মানুষ আরও বেড়েছে। সীমান্তের ওধার থেকে যারা আসছে তাদের রিলিফ ক্যাম্পগুলোতে দ্রুত পাঠাবার ব্যবস্থা করা যাচ্ছে না। আসলে রোজ ঢাকা বরিশাল খুলনা ফরিদপুর, অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তানের নানা প্রান্ত থেকে রিফিউজি স্পেশালগুলো যত উদ্বাস্তু এনে শিয়ালদায় ঢেলে দিচ্ছে তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তত ত্রাণশিবির খোলা সম্ভব হচ্ছে না। ফলে শিয়ালদা স্টেশনেই তাদের গাদাগাদি করে থেকে যেতে হচ্ছে। এই ভিড় সরাতে কত কাল লাগবে, কে জানে।

স্টেশনের ভেতরে এবং বাইরে লোক গিজ গিজ করছে। ইটের দশ বার ইঞ্চি উঁচু বাউণ্ডারি ওয়াল তুলে পনের কুড়ি স্কোয়ার ফিটের মধ্যে একেকটা উদ্বাস্তু ফ্যামিলি। ওই জায়গাটুকুর মধ্যে পাঁচ ছ' কি সাতজনের অস্থায়ী বাসস্থান।

চারপাশের ভিড়ে যেদিকে তাকানো যাক, শুধুই ধুন্ধুমার কাণ্ড, তুমুল চিৎকার, হইচই, কদর্য খিস্তিখেউড়, কুৎসিত ঝগড়াঝাঁটি।

এধারে ওধারে নানা স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের ফেস্টুন টাঙানো। তারা আলাদা আলাদা ভাবে তিনশ' কি চারশ'জন উদ্বাস্তুর খাওয়াবার দায়িত্ব নিয়েছে। চত্বরের নানা এলাকায় কাঠ কি কয়লার উনুনে খিচুড়ি ফুটছিল। বেশ ক'টা বিশাল সরকারি লঙ্গরখানাও খোলা হয়েছে। যে লঙ্গরখানাগুলোতে রান্না শেষ, সেখানে সেখানে উদ্বাস্তুদের লম্বা লাইন। সবার হাতে সিলভার কি কাঁসার থালা, বাটি কি সরা। যার যা আছে তাই নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে। লাইনে দাঁড়িয়েও কি শান্তি আছে? পাছে খিচুড়ি ফুরিয়ে যায় তাই সবাই চাইছে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে। কিন্তু আগে যে রয়েছে সে জায়গা দেবে কেন? এই নিয়ে ধাক্কাধাক্কি, এমনকি হাতাহাতি পর্যন্ত শুরু হয়ে গেছে।

ভিড় ঠেলে এগুতে এগুতে যুগল চেঁচাতে থাকে, 'রাইজদা, ইনামগঞ্জ, গিরিগঞ্জ, দেলভোগ,

BanglaBook.org

তাজপুর, রসুইনা, কমলাঘাট থিকা কেও আসছেন? আইসা থাকলে সুমের (সাড়া) দ্যান—' একই কথা সে সমানে বলে যেতে থাকে। ছেদহীন। একটানা।

কেউ সাড়া দিচ্ছে না। সবার লক্ষ্য এখন লঙ্গরখানার খিচুড়ি। বিশ্ব সংসারের অন্য কোনও শব্দ তাদের কানে ঢুকছে না।

যুগলের উদ্যমের শেষ নেই। শিয়ালদা স্টেশনের বিশাল এলাকায় চক্কর দিতে দিতে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পরিচিত মানুষজনকে খুঁজে বেড়াতে লাগল সে।

হঠাৎ পতিতপাবনের কথা মনে পড়ে যায় বিনুর। হাঁটা থামিয়ে ব্যস্তভাবে সে বলে, 'আমাদের রাজদিয়া এলাকার একটা ফ্যামিলি এখানে আছে। যেদিন দেশ থেকে এলাম, ওদের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। যদি রিফিউজি ক্যাম্পে না গিয়ে থাকে, তাদের নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে।'

যুগল জিজ্ঞেস করে, 'কাগো কথা ক'ন ছুটোবাবু?'

'পতিতপাবনদের। আমার সঙ্গে ও রাজদিয়া স্কুলে পড়ত।'

'আমি হেরে (তাকে) চিনি। চলেন, ওনাগো বিচরাইয়া বাইর করি।'

উদ্দীপনায় চোখমুখ জ্বল জ্বল করতে থাকে যুগলের। এই বিপুল জনসমুদ্রের মধ্যে আজ একজন অন্তত চেনা মানুষের খবর পাওয়া গেছে। একজনই বা কম কী।

সেদিন পতিতপাবনের সঙ্গে যখন দেখা হয়, সবে ঢাকা মেল থেকে শিয়ালদায় নেমেছে বিনুরা। ক্লান্ত, বিধ্বস্ত, ক্ষুধার্ত, এবং দিশেহারাও। তখন এই প্রায়-অচেনা শহরে অবনীমোহনের ঠিকানা খুঁজে বার করার জন্য প্রবল উৎকণ্ঠা ছিল। স্টেশন চত্বরের কোন প্রান্তে পতিতপাবনদের সেদিন দেখেছে, ভাবতে চেষ্টা করল বিনু।

এদিকে যুগলের তর সইছিল না। সে তাড়া লাগায়, 'কী হইল ছুটোবাবু, খাড়াইয়া রইলেন ক্যান?'

স্মৃতি হাতড়াতে হাতড়াতে বিনুর মনে পড়ে যায়। খোলা চত্বরের যেদিকটায় সওয়ারির আশায় ঘোড়ার গাড়িগুলো সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, তারই কাছাকাছি ছিল ইট দিয়ে ঘেরা পতিতপাবনদের আস্তানা।

বিনু বলল, 'না না, চল—'

ঘোড়ার গাড়ির স্ট্যাণ্ডটার কাছে এসে চমকে উঠল বিনু। শিয়ালদার হট্টগোল এবং ধুন্ধুমার ছাপিয়ে এখানে কী এক তুলকালাম কাণ্ড চলছে।

পতিতপাবনদের সঙ্গে সেদিন যেখানে দেখা হয়েছিল সেই জায়গাটা ঘিরে এখন চাপ-বাঁধা ভিড়। বৃত্তাকারে ঠাসাঠাসি করে প্রচুর লোক দাঁড়িয়ে কী যেন দেখছে। বৃত্তের ভেতর গলার শিরা ছিঁড়ে কেউ সমানে চিৎকার করিছল। সেই সঙ্গে তার মুখ থেকে ঢলের মতো বেরিয়ে আসছে কদর্য খিস্তি। বাছা বাছা, নোংরা সব গালাগাল। তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আরও অনেকে চেঁচাচ্ছে।

ভিড়ের বাইরে থেকে কী হচ্ছে, দেখা না গেলেও সবচেয়ে চড়া গলাটা চেনা গেল। পতিতপাবন।

বুকের ভেতরটা ধক করে ওঠে বিনুর। ধারেকাছে লঙ্গরখানার লাইন নেই যে আগে গিয়ে দাঁড়াবার জন্য মহাযুদ্ধ বেধে যাবে। তা হলে কী হতে পারে? বিনু জানে, পতিতপাবন ভীষণ রগচটা। হঠাৎ সে এমন খেপে উঠেছে কেন?

বিনু ধাক্কা দিতে দিতে ভিড় সরিয়ে তড়িৎগতিতে ভেতরে ঢুকে পড়ে।

'কই যান ছুটোবাবু, কই যান?' অবাক যুগল হইচই করতে করতে বিনুর পেছন পেছন চলে আসে।

যে দৃশ্যটি এবার চোখে পড়ল তাতে কয়েক লহমা হতবাক হয়ে থাকে বিনু। পতিতপাবন শরীরের সবটুকু জোর দিয়ে একটা লোকের টুঁটি টিপে ধরে আছে। প্রচণ্ড রাগে উন্মাদ। সমস্ত রক্ত মাথায় গিয়ে চড়েছে তার। কয়েকদিনের না কামানো মুখ কী হিংস্রই না দেখাচ্ছে। রুক্ষ, জটপাকানো চুল উড়ছে হাওয়ায়। চোয়াল শক্ত। চোখ দু'টো জ্বলছে। সমানে গজরাচ্ছে সে, 'খানকির বাচ্চা, পুঙ্গির পুত, তরে আমি আইজ যমের দুয়ার দেখাইয়া ছাড়ুম। ঘরে তর মা নাই, বইন নাই? লুচ্চা, বাইনচোত, তরে শ্যাষ কইরা যদি জেল হয় ফাসি হয়, হউক—'

কাছেই দাঁড়িয়ে আছে এক সদ্য যুবতী। পতিতপাবনের মেয়ে। ভয়ে আতঙ্কে থরথর কাঁপছিল

সে। পাশে আধঘোমটা দেওয়া তার মা এবং তিনটে ছেলেমেয়ে। পাঁচ থেকে দশের মধ্যে তাদের বয়স। মা এবং বাচ্চাগুলো একটানা কেঁদে চলেছে।

পতিতপাবন যে লোকটার গলা সাঁড়াশির মতো চেপে ধরেছে তার বয়স চল্লিশের আশেপাশে। পোকায়-কাটা চেহারা। চোখের তলায় কালির পোঁচ। সর্বাঙ্গে লুচ্চামির চিরস্থায়ী ছাপ।

লোকটার জিভ বেরিয়ে এসেছে। চোখ কোটর থেকে ঠিকরে পড়বে যেন। হাতদু'টো লতপত করছে। গলা থেকে গোঙানির মতো ক্ষীণ একটু আওয়াজ চুঁইয়ে চুঁইয়ে বেরুচ্ছে।

চারপাশের লোকজন চেঁচামেচি করতে করতে দু'জনকে ছাড়াবার চেষ্টা করছে, 'ছাইড়া দ্যাও, ছাইড়া দ্যাও। মইরা যাইব যে। মরলে মেলা তাফাল (অনেক ঝঞ্ঝাট)।'

কিন্তু কে কার কথা শোনে। পতিতপাবনের মাথায় দানো ভর করেছে যেন। তার মোটা মোটা, কড়া-পড়া আঙুলগুলো লোকটার গলায় আরও চেপে বসে যাচ্ছে।

হতচকিত ভাবটা কেটে গেলে লাফ দিয়ে দু'জনের মাঝখানে গিয়ে পড়ল বিনু। পতিতপাবনের হাত ধরে টানতে টানতে শ্বাস-আটকানো গলায় বলল, 'এ কী করছ পতিত! গলা ছেড়ে দাও। সর্বনাশ হয়ে যাবে—'

বিনুকে দেখে সম্বিত ফিরে আসে পতিতপাবনের। সহজে কি লোকটাকে ছাড়তে চায়? অনেক বোঝানোর পর হাতের ফাঁস আলগা করে। মাথা থেকে প্রচণ্ড ক্রোধটা নামতে শুরু করেছে। দু'হাতে মুখ ঢেকে বসে পড়ে সে। বালকের মতো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে।

পতিতপাবনের পাশে বসে তার কাঁধে হাত রেখে উৎকণ্ঠিত বিনু জিজ্ঞেস করে, 'কী হয়েছে পতিত? এই লোকটার গলা টিপে ধরেছিলে কেন?'

চারপাশের জনতা একসঙ্গে গলা মিলিয়ে কিছু বলতে চাইছিল। ফলে কান-ফাটানো শোরগোলই শুধু হচ্ছে। তার একটি বর্ণও বোঝা যাচ্ছে না। ওদিকে যাকে খুন করার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েছিল সেই লোকটা পিচ বাঁধানো চত্বরে কেতরে পড়ে আছে। হাত দু'টো এলিয়ে রয়েছে। একটা হাঁটু বুকের কাছে দোমড়ানো। ডান পা থেকে চটি ঠিকরে পড়েছে অনেকটা দূরে। গালের কষ বেয়ে রক্ত গড়িয়ে আসছে। লোকটা পুরোপুরি বেহুঁশ।

হঠাৎ কারা যেন চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে সব চেয়ে জরুরি খবরটা জানিয়ে দেয়, 'লাইন পড়ছে, লাইন পড়ছে। খিচোড়ি দিতে আছে—'

অর্থাৎ যে স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান এধারের উদ্বাস্তুদের দায়িত্ব নিয়েছে তাদের খাদ্য প্রস্তুত। লঙ্গরখানা খুলে দেওয়া হয়েছে।

লহমায় ভিড়টা ফাঁকা হয়ে গেল। যে যার থালাবাটি জোগাড় করে উর্ধ্বশ্বাসে লাইন দিতে ছুটল।

পতিতপাবন ঘাড় গুঁজে একইভাবে বসে আছে। অনেক বলার পর সে মুখ তোলে। চোখ দু'টো টকটকে লাল। যেন জমাট রক্তপিণ্ড। সেই চোখ থেকে জল ঝরেই চলেছে। কান্নাজড়ানো গলায়, পাগলের মতো মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে, সে তার সদ্য যুবতী মেয়েটাকে দেখিয়ে বলে, 'এই মাইয়াটার সোম্মান বাচানের লেইগা পাকিস্থান ছাইড়া ইণ্ডিয়ায় আসলাম। কিন্তু এইহানেও শকুনের পাল অরে ছিড়া খাওনের লেইগা জিভ্যা মেইলা রইছে। উই যে শুওরের ছাও ক্যাতরাইয়া (কেতরে) পইড়া রইছে—' আঙুল বাড়িয়ে সেই লোকটাকে দেখিয়ে দিল সে। তারপর একটানা সে যা বলে যায় তা এইরকম।

ক'দিন ধরে লোকটার নজর এসে পড়েছে পতিতপাবনের মেয়ে শান্তির ওপর। দূরে দাঁড়িয়ে সে চোখের ইশারা করে। আড়ালে পেলে ফিস ফিস করে বলে, তার সঙ্গে গেলে রানীর হালে থাকতে পারবে। টাকাপয়সা গয়না আরাম, কোনও কিছুর অভাব থাকবে না।

লোকটা যখন যা বলেছে, তক্ষুনি শান্তি বাবাকে জানিয়ে দিয়েছে। পতিতপাবন তক্কে তক্কে ছিল। আজ লোকটা শান্তিকে যখন পকেট থেকে একগোছা নোট বার করে দেখাচ্ছে, সে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

পতিতপাবন বলতে লাগল, 'দ্যাশ থিকা একহান ঘষা পছা লইয়া এইপারে আসতে পারি নাই। কা। ল'ট্যাকা, ইট্টু সোনারূপা লুকাইয়া চুরাইয়া আননের ব্যাবোস্তা করছিলাম। পাকিস্থানের পুলিশ

বডারে বেবাক কাইড়া নিছে। হাত এক্কেরে খালি। দুই ব্যালা (বেলা) এইহানে খিচোড়ি দ্যায়। হের পর যদিন খিদা পায় কিছু যে কিন্যা খামু, উপায় নাই। এক কাপড়ে পলাইয়া আসছি। পিন্ধনের (পরনের) শাড়ি উড়ি কিন্যা দিতে পারি না। এই দিকে শয়তানের ছাওরা বস্যের মাইয়াগো (যুবতীদের) ফুসলানের লেইগা চাইর দিকে ঘুরতে আছে। কয়দিন আমি তাগো ঠেকাইয়া রাখতে পারুম? একদিন না একদিন অরা শান্তিরে ঠিক তুইলা লইয়া যাইব।'

পতিতপাবন আরও জানায়, তারা মাত্র কয়েকদিন হল এখানে এসেছে। এর মধ্যেই ক'টি যুবতী মেয়েকে পাওয়া যাচ্ছে না। হাওয়ায় হাওয়ায় একটা খবর ভেসে বেড়াচ্ছে। যারা মেয়েদের নিয়ে ব্যবসা করে তাদের আড়কাঠিরা আণ্ডিল আণ্ডিল টাকা নিয়ে এখানে অষ্টপ্রহর ঘোরাঘুরি করছে। সুযোগ পেলেই একটা দু'টো করে মেয়ে তুলে নিয়ে যাচ্ছে।

পতিতপাবন থামে না, 'ডরে আমার বুক থরথরাইয়া কাপে। রাইতে ঘুমাইতে পারি না। কিন্তুক কয়দিন শান্তিরে আমি পরি (পাহারা) দিয়া রাখুম? শিয়ালদার ইস্টিশানে থাকলে মইরাই যামু বিনুভাই—' সে একেবারে ভেঙে পড়ে। ভয়ে, আতঙ্কে, তীব্র হতাশায়।

যুগল এতক্ষণ নীরবে শুনে যাচ্ছিল। এবার বলল, 'পতিতদাদা, আপনেরে এইহানে থাকতে হইব না। আমাগো লগে চলেন।'

বিহ্বলের মতো পতিতপাবন জিজ্ঞেস করে, 'কুনহানে যামু তোগো লগে?'

'যেইহানে থাকি। মুকুন্দপুরে। হেইহানে কুনো সুমুন্দির পুতের আপনের মাইয়ার দিকে নজর দিতে সাহস হইব না।'

'মুকুন্দপুরটা কুন জাগায়?'

সংক্ষেপে সব বলল যুগল। সেখানে গেলে চেনাজানা মানুষজনের সঙ্গে যে দেখা হবে, তাও জানালো। আরও জানায়, রাজদিয়া অঞ্চলের লোকেদের খোঁজে প্রায়ই সে শিয়ালদায় আসে। আজও সেই উদ্দেশ্যেই এসেছিল। পতিতপাবনের খবরটা বিনুর কাছেই সে পেয়েছে।

পতিতপাবন বিনুকে জিজ্ঞেস করে, 'যুগইলার লগে তোমার ক্যামনে দেখা হইল?'

বিনু বলল।

'তুমি তাইলে মুকুন্দপুর দেখতে যাইতে আছ?'

'হ্যাঁ।'

পতিতপাবন আবার যুগলের দিকে মুখ ফেরায়, 'যুগইলা, তুই তো আমারে লইয়া যাইতে চাস। হেইহানে গ্যালে খামু কী? শিয়ালদায় তভু দুই ব্যালা খিচোড়ি দ্যায়—'

যুগল বলল, 'হে এট্টা বন্দবস্ত হইয়া যাইব। আগে চলেন তো। আমাগো যদিন দুই গরাস জোটে, আপনেগোও জুটব। এইহানে পইচা গইলা মরণের থিকা ভালা কইরা বাচনের এট্টা চ্যাষ্টা কইরা দ্যাখেন না—'

কী একটু ভাবে পতিতপাবন। হেমনাথের বাড়ির কামলা যুগলকে রাজদিয়ায় কত বার দেখেছে। কিন্তু এই যুগল তার একেবারেই অচেনা। মহাকাশের ওপার থেকে সে এক দুর্লভ আশার বার্তা নিয়ে যেন হাজির হয়েছে। নৈরাশ্যের অতল গহ্বরে যখন পতিতপাবন ডুবে যাচ্ছে, সদয় একখানা হাত বাড়িয়ে দিয়েছে যুগল। এ ছিল তার প্রত্যাশার বাইরে। একেবারেই অভাবনীয়।

পতিতপাবন ভীষণ উদ্দীপ্ত। তার চোখে মুখে হাতে পায়ে বিদ্যুৎ খেলে যায়। বলে, 'যুগইলা, তর লগেই যামু। বিনুভাই, তোমরা ইট্টু খাড়ও। জবর ক্ষুদা (ক্ষুধা) পাইছে। শ্যাষবারের লাখান শিয়ালদার খিচোড়িটা খাইয়া যাই।' লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে ছেলে মেয়ে বউকে টানতে টানতে লঙ্গরখানার লাইনে গিয়ে দাঁড়ায় সে।

এদিকে যে লোকটা ঘাড় গুঁজে পড়ে ছিল, কখন হুঁশ ফেরার পর সে উধাও হয়ে গেছে, বিনুরা কেউ লক্ষ করে নি।

আধ ঘন্টাও লাগল না, খাওয়াদাওয়া চুকিয়ে সামান্য যা বাসনকোসন ছিল, কাপড়ে বেঁধে পতিতপাবন বলল, 'যারা আমাগো খাওয়ানের ভার নিছে তাগো কইয়া আসছি, খাতা থিকা আমাগো নাম কাইটা দ্যান।' অর্থাৎ যে স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান পতিতপাবনদের দায়িত্ব নিয়েছিল তাদের ভারমুক্ত

করে এসেছে সে।

যুগল বলল, 'ভালাই করছেন পতিতদাদা—'

'তর ভরসায় শিয়ালদার লগে বেবাক সম্পক্ক চুকাইয়া দিলাম যুগইলা—'

যুগল হাসে, 'ঠিক আছে। অহন লন (চলুন) যাই—'

বাইরের বিস্তৃত চত্বর থেকে হাজার হাজার মানুষের বেড়াজাল ভেদ করে স্টেশনের ভেতর চলে এল ওরা। বিনু বলল, 'একটু দাঁড়াও, টিকিট কেটে নিই—'

যুগল বলল, 'কিসের টিকট ছুটোবাবু? কিছুই কাটতে হইব না।'

'বিনা টিকিটে যেতে বলছ!'

'আমাগো দ্যাশ গ্যাছে, ভিটা গ্যাছে, বেবাক খুয়াইয়া আসছি। দ্যাশখান কি আমরা ভাগ করছি? বডারের উই পারে যা ফেলাইয়া আসছি, আমাগো আইনা দেউক। তহন একহানের জাগায় (জায়গায়) দুইহান টিকট কাটুম। আসেন তো—'

ওরা আগরপাড়ার ট্রেন ধরার জন্য তিন নম্বর প্ল্যাটফর্মের দিকে যাচ্ছিল, হঠাৎ গজরাতে গজরাতে হুড়মুড় করে এক নম্বর প্ল্যাটফর্মে গোয়ালন্দ থেকে রিফিউজি স্পেশাল এসে থামল। পাকিস্তানের ট্রেন কখন আসবে তার ঠিকঠিকানা নেই। সকালে যে ট্রেনের আসার কথা সেটা হয়তো শিয়ালদায় পৌঁছল বিকেলে, কিংবা মধ্যরাতে। আসলে গোয়ালন্দ থেকে নির্দিষ্ট সময়ে যে ট্রেন ছাড়বে, জোর দিয়ে তা বলা যায় না। বর্ডারের ওপারের সমস্ত কিছুই চলে পাকিস্তানের মর্জিমাফিক। বিশেষ করে রিফিউজি স্পেশালগুলোর বেলায়। পুরোটাই দায়সারা ভাব। তার সঙ্গে মিশে আছে উপেক্ষা, বিরক্তি, ঘৃণা। যদিও ঠিক সময়ে ট্রেনটা ছাড়ল, রাস্তায় হানাদারদের উৎপাত, বর্ডারে অবিরল হয়রানি, এসব পোহানোর পর তবে তো শিয়ালদায় পৌঁছবে।

যুগল থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। দেখাদেখি বাকি সবাই। বিনু জিজ্ঞেস করে, 'কী হল?'

যুগলের চোখে মুখে প্রবল উত্তেজনা। সে বলে, 'ছুটোবাবু, চলেন আমার লগে। পতিতদাদা, আপনেরা এইহানে খাড়াইয়া থাকেন। একেবারে লইড়েন (নড়বেন) না। মাইনষের ভিড়ে মিশ্যা গ্যালে বিচরাইয়া বাইর করতে পারুম না—'

বিনু অবাক। জিজ্ঞেস করে, 'আমাকে কোথায় নিয়ে যাবে?'

'গোয়ালন্দ থিকা গাড়ি আসছে। দেখি চিনাজানা কারোরে পাই কিনা।' বিনুর একটা হাত ধরে প্রায় টানতে টানতে তাকে এক নম্বর প্ল্যাটফর্মে নিয়ে গেল যুগল। মুকুন্দপুরকে আরেকটা রাজদিয়া বা ডাটির দেশ বানানোর স্বপ্নটা সর্বক্ষণ তাকে অনন্ত উদ্দীপনায় ভরে রাখে।

রিফিউজি স্পেশালের প্রতিটি কামরার ভেতর এবং ছাদ থেকে হুড়হুড় করে মানুষ নেমে আসছে। শীর্ণ। ক্ষুধার্ত। সর্বস্ব খোয়ানো। চারদিকে হইচই, প্রচণ্ড শোরগোল। সরকারি কর্মচারী এবং অফিসারদের চূড়ান্ত ব্যস্ততা আর ছোটাছুটি। মাইকে মুহুর্মুহু ঘোষণা। সদ্য আসা শরণার্থীদের শান্ত থাকতে বলা হচ্ছে। সবার থাকা এবং খাওয়ার ব্যবস্থা করা হবে। দুশ্চিন্তার কারণ নেই। কেউ যেন অধীর হয়ে না পড়ে। ইত্যাদি ইত্যাদি। বিনুরা যেদিন এসেছিল, অবিকল সেই দৃশ্য। কোথাও এতটুকু হেরফের নেই।

যুগলের সেই একই পদ্ধতি। খানিকটা আগে বাইরের চত্বরে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে যেভাবে দেশের লোকজনের খোঁজ করছিল, হুবহু তেমনই কামরায় কামরায় মুখ বাড়িয়ে গলার স্বর উঁচুতে তুলে একনাগাড়ে বলে যাচ্ছিল, 'রাইজদা রসুইনা দেলভোগ গিরিগুঞ্জ সেরেজদীঘা তালতলি ডাকাইতা পাড়া থিকা কেও আসছেন? আইসা থাকলে হুমের (সাড়া) দ্যান—'

কারোর সাড়া পাওয়া গেল না। যুগল বেশ নিরাশই হল, 'নাঃ, এই গাড়িতে আমাগো উই দিকের একজনও আসে নাই। আর সোময় নষ্ট কইরা কী হইব। চলেন ছুটোবাবু, যাই গা—'

শেষ কামরাটা দেখে প্ল্যাটফর্মের মাঝামাঝি যখন ওরা চলে এসেছে, আচমকা ডান দিক থেকে চেনা গলার ডাক বিনুর কানে ভেসে আসে, 'ছুটোবাবু, ছুটোবাবু—'

মুখ ফেরাতে বিনু দেখতে পায়, ইটের আল দিয়ে ঘেরা কুড়ি পঁচিশ স্কোয়ার ফিট এলাকার ভেতর গরিন্দ তার বউ ছেলেমেয়েদের নিয়ে বসে আছে। প্ল্যাটফর্মের এই জায়গাটুকুই তা হলে তার

জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে।

সেদিন একসঙ্গে তারা তারপাশা থেকে স্টিমারে এবং পরে গোয়ালন্দ থেকে ট্রেনে কলকাতায় এসে নেমেছিল। তখন অন্য কোনও দিকে লক্ষ্য ছিল না বিনুর। একমাত্র চিন্তা, কিভাবে অবনীমোহনকে খুঁজে বার করবে।

তারপর মাঝখানের ক'টা দিন তাকে আর ঝিনুককে ঘিরে এত এত সব কাণ্ড ঘটে গেছে, দু'জনকে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে হয়েছে শহরের এক মাথা থেকে অন্য প্রান্তে, যে অন্য কারোর কথা চিন্তা করার সময় পাওয়া যায় নি। অবশ্য সুধাদের কাছে আসার পর দুর্ভাবনা এবং উদ্বেগের সাময়িক অবসান ঘটেছে।

হরিন্দ উঠে এসেছিল। বিনু জিজ্ঞেস করল, 'সেই থেকে নিশ্চয়ই এখানে আছ?' পরক্ষণে মনে হল, প্রশ্নটা একেবারে নির্বোধের মতো হয়ে গেছে। এই বিশাল অচেনা মহানগরে অন্য কোথায়ই বা যেতে পারে ওরা!

বিনু যা ভেবেছে তারই যেন প্রতিধ্বনি শুনতে পেল হরিন্দর কথায়, 'কই আর যামু? শুনাশুন শুনতে আছি, আমাগো রানাঘাটের কাছে কুন এক কেম্পে পাঠাইয়া দিব। কানে আসছে, কেম্পের অবোস্তা এইহানের থিকাও খারাপ।'

বিনু কী বলতে যাচ্ছিল, তার আগে হরিন্দ ব্যাকুলভাবে তার দুই হাত জড়িয়ে ধরে বলল, 'এই জাগাটা এক্কেবারে নরক। শ'য়ে শ'য়ে মানুষ, চাইরটা মোটে পাইখানা। গু মুতে চাইর দিক থিকথিকা। দুই বেলা দুই দলা কইরা খিচোড়ি খাইতে দ্যায়। ইস্টিশানে ছয় সাত হাত জাগার (জায়গার) মইদ্যে আমাগো পাচজন মাইনষের শোওন-বসন। কী যে করুম, কপালে কী যে লিখা আছে, ভাইবা দিশা পাই না। হের উপুর শয়তানের গুষ্টি যুবুতী মাইয়াগো ভাগাইয়া লইয়া যাইতে আছে। ট্যার পাই, আমার মাইয়াটার উপুর শকুনের দিষ্টি আইসা পড়ছে।'

পতিতপাবনের মতো হরিন্দরও মেয়ে নিয়ে একই সমস্যা। সে থামে নি, 'আমারে বাচান ছুটোবাবু। এই নরককুণ্ড থিকা অন্য কুনোহানে লইয়া গিয়া থাকনের ব্যবোস্তা কইরা দ্যান। খাওন জুটুক চাই না-জুটুক, মাইয়াটার সব্বনাশ য্যান না হয়—'

বিনু জিজ্ঞাসু চোখে যুগলের দিকে তাকায়। বুঝে নিতে চায়, হরিন্দরা মুকুন্দপুরে গেলে তার আপত্তি বা অসুবিধা হবে কিনা।

মুকুন্দপুরে পরিচিত মানুষের সংখ্যা বাড়বে। বাড়বে জনবল। প্রবল উৎসাহের সুরে যুগল হরিন্দকে বলে, 'অহনই আমাগো লগে চল হরিন্দদাদা। একহান ভালা জাগা আছে। শান্তিতে থাকতে পারবা। কুনো কুত্তার পুতের সাইদ্য নাই হেইহানে গিয়া তুমার মাইয়ার দিকে নজর দেয়! যদিন কেও যায়, হের কইলজা (কলিজা) ফাইড়া রক্ত খামু। আসো—আসো—'

ভূমণ্ডলের কোনও প্রান্তে তাদের জন্য নিরাপদ স্থান আছে কিনা, কে জানে। হতভম্বের মতো হরিন্দ বিনুর দিকে তাকায়। যুগলের কথায় কতটা ভরসা করা যায়, সে ভেবে পাচ্ছে না। সংশয়ের সুরে বলে, 'যুগইলা কী কয়, শুনছেন ছুটোবাবু? যামু?'

বিনু বলে, 'নিশ্চয়ই যাবে।'

হেমকর্তার নাতির ওপর রাজদিয়া অঞ্চলের মানুষজনের অগাধ বিশ্বাস। কোথায় কতদূরে যেতে হবে, সেখানে বাসস্থানের কী ব্যবস্থা, কিছুই জানতে চায় না হরিন্দ। চোখের পলকে পোঁটলাপুঁটলি বেঁধে ছেঁদে ছেলেমেয়ে বউকে নিয়ে বিনুদের পিছু পিছু হাঁটতে থাকে।

স্টেশনে আগেই ভিড় ছিল। এইমাত্র রিফিউজি স্পেশাল আসায় সেটা কয়েক গুণ বেড়ে গেল। হাজার হাজার মানুষের জটলা, হট্টগোল, কান্নাকাটি, সরকারি কর্মচারী আর স্বেচ্ছাসেবীদের অনবরত ছোটাছুটি, মাইকে মুহুর্মুহু নানা ধরনের ঘোষণা। সব মিলিয়ে তুমুল বিশৃঙ্খলা। তার মধ্য দিয়ে পথ করে যেতে যেতে অনেকের কথা মনে পড়তে লাগল বিনুর। তালসোনাপুরের সেই ধুরন্ধর অধর ভুঁইমালী, পায়ের ব্যাণ্ডেজের ভেতর জমি বাড়ির দলিল, টাকা আর গয়না লুকিয়ে খোঁড়া সেজে যে পাকিস্তানি অফিসারদের ধোঁকা দিয়েছিল, কিংবা নয়া চিকন্দি গ্রামের হরিদাস সাহা যার মেয়েকে দাঙ্গাবাজরা রাত্তিরে তুলে নিয়ে যায়, বা তাহেরগঞ্জের নিরীহ ভুবন দাস, এমনি আরও অনেকে।

pathagar.net

এদের সঙ্গে তারপাশা থেকে স্টিমারে এবং গোয়ালন্দ থেকে ট্রেনে চেপে এই তো সেদিন শিয়ালদায় এসে নামল বিনু। কিছুক্ষণ আগে স্টেশনের বাইরের বিশাল চত্বরে যুগল যখন রাজদিয়া এলাকার লোকজন খুঁজে বেড়াচ্ছিল, তখনও তাদের দেখা যায় নি। এক নম্বর প্ল্যাটফর্মে যারা ইটের আল তুলে বসে আছে, তাদের মধ্যেও ওরা নেই। ওদের কি রিফিউজি ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হয়েছে? কিছুই জানার উপায় নেই। হয়তো ওই লোকগুলোর সঙ্গে জীবনে আর কখনও দেখা হবে না। বুকের ভেতরটা ভারী হয়ে ওঠে বিনুর।

হঠাৎ এদের পেছনে সরিয়ে দিয়ে রামরতন গাঙ্গুলিদের মুখগুলো চোখের সামনে ফুটে ওঠে। আশ্চর্য, এঁদের কথাই সবার আগে মনে পড়া উচিত ছিল। জামতলির সৎ, আদর্শবাদী মাস্টারমশাইটি একদা স্বপ্ন দেখতেন, স্বাধীন ভারতের জন্য সত্যিকারের মানুষ তৈরি করতে হবে। শিক্ষাকে পৌঁছে দিতে হবে সর্বত্র, দেশের সুদূর কোণে কোণে। জাতি যদি সুশিক্ষিত না হয়, দেশের ভিতটাই নড়বড়ে হয়ে যায়।

সেই ইংরেজ আমলে শত প্রলোভন উপেক্ষা করেছেন রামরতন। বর্জন করেছেন যাবতীয় পার্থিব উচ্চাকাঙ্ক্ষা। পূর্ব বাংলার তুচ্ছ এক গ্রামে গিয়ে হেডমাস্টারির দায়িত্ব তুলে নিয়েছিলেন। সারাটা জীবন যিনি মানুষ গড়ার কাজে ক্ষয় করে দিলেন, শেষ বয়সে তার কী মূল্য পেলেন তিনি? মেয়েদের সম্মান বাঁচানোর জন্য তাঁকে দেশ ছাড়তে হল।

জীবন্ত রামরতন শেষ পর্যন্ত সীমান্তের এপারে পৌঁছতে পারেন নি। রিফিউজি স্পেশালে এসেছিল তাঁর শব। নিথর, অসাড়। তাঁকে ঘিরে চারটি শোকাতুরা মহিলার চিত্রটি যেন দেখতে পাচ্ছে বিনু।

রামরতনের ভাইপো বিমলের বাড়িতেই আছেন তাঁর স্ত্রী এবং তিন মেয়ে। মেয়েদের মধ্যে দু'জনের বিয়ে হয় নি। কেমন আছে ওরা?

বিমল তার ঠিকানা লিখে দিয়েছিল। বিনু বলেছিল, খুব শিগগিরই একদিন সেখানে যাবে। কিন্তু যাওয়া হয় নি। নিজের নানা সমস্যায় এতটাই ব্যতিব্যস্ত ছিল যে ওদের কথা মনেও পড়ে নি। মুকুন্দপুর থেকে ফিরে এসে খুব শিগগিরই একদিন বিমলের বাসায় যেতে হবে।

এক নম্বর প্ল্যাটফর্ম যেখানে শুরু, তার মুখটায় দাঁড়িয়ে ছিল পতিতপাবনরা। হরিন্দদের দেখে ওরা বেশ খুশি হল। এবং অবাকও।

পতিতপাবন জিজ্ঞেস করে, 'দ্যাশ থিকা কবে আসলা হরিন্দ?'

হরিন্দ বলে, 'এই তা দিন সাতেক। ছুটোবাবুর লগে তারপাশায় দেখা। হেইহান থিকা একলগে আসছি।'

'আছিলা কই?'

এ ক'দিন তাদের কোথায় কেটেছে, জানিয়ে দিল হরিন্দ।

পতিতপাবন সামান্য আক্ষেপের সুরে বলে, 'আমরা আসছি দুই মাসের উপুর। এই ইস্টিশানের আরেক মুড়ায় (প্রান্তে) আছিলাম। কান্ড দেখ, একহানে থাকছি, অথচ কারোর লগে কারোর দেখা হয় নাই।'

স্টেশনের বড় গোল ঘড়ির দিকে তাকিয়ে চঞ্চল হয়ে ওঠে যুগল, 'আগরপাড়ার গাড়ি ছাড়নের সোময় হইয়া আইল। তরাতরি চলেন। এই টেরেন ধরতে না পারলে পরের গাড়ির লেইগা আধা খণ্টা বইসা থাকতে হইব।'

তিন নম্বর প্ল্যাটফর্মের দিকে জোরে জোরে পা চালাতে চালাতে হরিন্দ পতিতপাবনকে বলে, 'আপনেরাও কি যুগইলাগো কাছে থাকনের লেইগা চললেন?'

পতিতপাবন মাথা নাড়ে, 'হ।'

'আমরাও। ছুটোবাবু ভরসা দিছে। হের উপুর আর কথা নাই।'

আগরপাড়ায় এসে বিনুরা যখন নামল, হেমন্তের বেলা অনেকটা হেলে গেছে। রোদ জুড়িয়ে যাচ্ছে দ্রুত।

স্টেশনের দু'ধারেই নানা ধরনের দোকানপাট। লোকজনও বেশ চোখে পড়ছে। সব মিলিয়ে জায়গাটা মোটামুটি জমজমাট।

যুগল সবাইকে নিয়ে রেল লাইনের ওপারে চলে এল। এদিকটা বেশ ঘিঞ্জি। দোকানও তুলনায় অনেক বেশি। একধারে গাছতলায় কাতার দিয়ে ক'টা সাইকেল রিকশা দাঁড়িয়ে আছে।

বিনু বলল, 'রিকশা নেওয়া যাক—কী বল যুগল?'

যুগল বলল, 'মোটে দুই মাইল পথ। হেয়া ছাড়া আমাগো উই দিকের রাস্তাও ভালা না। রিশকা যাইতে চায় না। গ্যালে মেলা (অনেক) ভাড়া চাইব। কম কইরা পাচখান রিশকা এতগুলান মাইনষরে লইয়া যাইতে লাগব। হুদাহুদি (শুধু শুধু) এত ট্যাকা খরচ করবেন ক্যান?' সে জানে রিকশা নিলে ভাড়াটা বিনুই দেবে।

যুগল বলতে লাগল, 'কথা কইতে কইতে চইলা যামু। আধা ঘন্টাও লাগব না।'

বিনু হাসল, 'ঠিক আছে। তাই চল—'সে বুঝতে পারে, অনাবশ্যক তার কিছু টাকা খরচ হোক, যুগল তা চাইছে না। স্টেশন এলাকাটা পেরুলে নতুন পুরনো মিলিয়ে বেশ কিছু ঘরবাড়ি। তবে সব কেমন যেন ছাড়া ছাড়া। শহর সেভাবে এখনও দানা বাঁধে নি।

এধারে ওধারে অনেকগুলো পাকা রাস্তা চোখে পড়ল। এখানে যে একটা মিউনিসিপ্যালিটি আছে তার প্রমাণস্বরূপ রাস্তাগুলোর ধারে ধারে নতমস্তকে স্ট্রিট লাইটের পোস্ট দাঁড়িয়ে আছে। আলোগুলো অবশ্য এই দিনের বেলায় জ্বলছে না। দু'ধারে বাঁধানো খোলা নর্দমাও দেখা যাচ্ছে।

মিনিট দশেক হাঁটার পর শহরের চৌহদ্দি শেষ। দু'চারটে বাড়ি যে এদিকে নেই তা নয়। তবে অনেকটা দূরে দূরে।

পথ প্রর্দশকের মতো আগে আগে চলেছে যুগল। তার পাশে বিনু। পেছনে বাকি সবাই।

যে রাস্তা দিয়ে বরাবর পুব-দক্ষিণে বিনুরা হাঁটছে সেটার খানিকটা পিচ দিয়ে মোড়া, কিছুটা খোয়ায় ঢাকা। তারপর কাঁচা গেঁয়ো পথ যেমন হয় হুবহু তা-ই।

পিচ এবং খোয়ার এলাকা পেরুতেই দু'ধারে ধানের খেত। এখনও ফসল কাটা হয় নি। সোনালি শস্যে আদিগন্ত মাঠের ঝাঁপি ভরে আছে। মাঝে মাঝে খাল, সাঁকো. সাঁকোর মাথায় মাছরাঙা। অনেক দূরে, আকাশ যেখানে পিঠ ঝুঁকিয়ে দিগন্তে নেমেছে, আবছা ক'টা গ্রাম। বাতাস চিরে চিরে মহাশূন্যে সাদা রেখা টেনে বকের ঝাঁক কোথায় উড়ে চলেছে, কে জানে।

রোদের জলুস যত মরে আসছে, হেমন্তের আকাশ ততই মলিন হচ্ছে। বিকেল ফুরোতে না ফুরোতেই মিহি সরের মতো কুয়াশা নামতে শুরু করেছে।

যুগল বলেছিল, মুকুন্দপুর স্টেশন থেকে মাত্র দু'মাইল। বিনুর ধারণা, কম করে তিন সাড়ে তিন মাইল হাঁটা হয়ে গেছে। জিজ্ঞেস করল, 'আর কতদূর যুগল?'

'আইসা গেছি ছুটোবাবু—'সামনের দিকে আঙুল বাড়িয়ে যুগল বলল, 'উই যে তালগাছগুলা খাড়াইয়া রইছে হের পরেই মুকুন্দপুর।'

তিন চার শ' হাত তফাতে তালগাছের একটা জটলা। সংখ্যায় পনের ষোলটা হবে। আকাশের দিকে সেগুলো মাথা তুলে আছে।

তালগাছের দঙ্গলটা পেরুতেই চোখে পড়ল বাঁ দিকে বিশাল এক বিল। বহু দূরে, ওধারের সেই দিগন্ত পর্যন্ত সেটার বিস্তার। বিলের ডান দিকে ষাট সত্তরটার মতো ঘর। ভেবে চিন্তে, রীতিমতো পরিকল্পনা করে সেগুলো বানানো হয় নি। তাড়াহুড়ো করে যত্রতত্র তোলা হয়েছে। পূর্ব বাংলার ধাঁচে প্রতিটি ঘরেরই ঝাঁচা বাঁশের বেড়া, মাথায় টিন কি টালির ছাউনি। দরজা জানালা কাঁচা আমকাঠ

চিরে তৈরি। তবে সব ক'টা ঘরেরই চারপাশ ঘিরে অনেকটা করে খোলামেলা জায়গা।

যুগল বলল, 'এই হইল আমাগো মুকুন্দপুর।'

উত্তর না দিয়ে চতুর্দিক লক্ষ করতে করতে এগিয়ে চলেছে বিনু।

যুগল থামে নি। সমানে বলে যাচ্ছে, 'এই যে বাড়িঘর দেখতে আছেন, এইহানে কয় মাস আগে কী আছিল জানেন?'

'কী?'

'ঠাসা জঙ্গল। আছিল শ'য়ে শ'য়ে জাইত সাপ (বিষাক্ত সাপ), বাঘডাসা, ভাম, বড় বড় বিছা। দ্যাশের মানুষজন জুটাইয়া জঙ্গল সাফা কইরা, সাপ খোপ মাইরা এই গেরাম বসাইছি ছুটোবাবু। হুগলই তো পাকিস্থানে ফেলাইয়া আসছি। সাহস কইরা রিফুজ কেম্পে থিকা বাইর হইয়া পড়ছিলাম বইলাই না এই ঘর তুলতে পারছি। নাইলে কেম্পে পইচাই মরতাম। য্যামনই হউক, নিজেগো ঘর তো—' তৃপ্তিতে, আত্মপ্রসাদে যুগলের চোখমুখ ঝলমল করতে থাকে।

অপার বিস্ময়ে যুগলের দিকে তাকায় বিনু। তাকে যত দেখছে ততই মুগ্ধ হচ্ছে। দূর গাঁ থেকে যুগল যখন হেমনাথের বাড়িতে কামলা খাটতে এসেছিল, খাল বিল নদী আর জলতলের রুপোলি ফসল অর্থাৎ মাছ ছাড়া পার্থিব অন্য কোনও দিকে তার নজর ছিল না। সেই যুগল সর্বস্ব খুইয়ে আত্মীয় পরিজনের সঙ্গে একদিন চলে এল এখানে। শূন্য হাতে একক প্রচেষ্টায় সৃষ্টি করেছে ছিন্নমূল মানুষের এই উপনিবেশ। এ কি সামান্য ঘটনা! বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যে কোনও বড় শিল্পীর চেয়েও তার এই বিপুল কর্মকান্ড অনেক বেশি মহান।

যুগল বলতে লাগল, 'ছুটোদিদিগো বাড়ির কাছে হেই যাদবপুর বাশধানির (বাঁশদ্রোণী) চাইর ধারে জবর দখল কুলোনি হইছে। ইচ্ছা করলে হেই হগল জাগায় জমিন পাইয়া যাইতাম। কিন্তুক লই নাই---'

'কলকাতার অত কাছে। সেখানে কত সুযোগ সুবিধা। যাদবপুরের ওধারের জমি না নিয়ে কিন্তু ভুল করেছ।'

'এক্কেবারেই না ছুটোবাবু।' যুগল হেসে হেসে বলে, 'আপনে তো জানেন, যুগাইলা নদী আর মাছ ছাড়া বাচব না। যাদবপুর বাশধানীতে নদী কই? মাছ কই? তামাম পিরথিমী ঘুইরা ঘুইরা শ্যাষ তরি এই বিলের খোজ পাইলাম। নদী না জুটুক, একহান আলিসান বিল তো জুটছে। আমাগো দ্যাশের লাখান অত না হইলেও এই বিলে মেলা মাছ। রুইত কাতল শৌল বোয়াল গোলসা ট্যাংরা পরমা টাকি। ঠিক কইরা ফেলাইলাম, এইহানেই ঘর বান্ধুম।'

অফুরান উদ্যমে এই বসতি তৈরি করেছে ঠিকই। কিন্তু যুগলের কাছে বাসস্থানই শেষ কথা নয়। এর সঙ্গে জল আর মাছও তার চাই। যুগলের রক্তমাংসে আজন্ম ওই দুটো জড়িয়ে আছে। নইলে কলকাতার কাছে জমি পেয়েও সে হেলায় হাতছাড়া করে!

দূরে আঙুল বাড়িয়ে যুগল এবার জিজ্ঞেস করে, 'উইহানে কী দ্যাখেন ছুটোবাবু?'

বসতি যেখানে শেষ, তারপর থেকে একটানা বনভূমি। বিনু বলল, 'জঙ্গল। কেন বল তো?'

যুগল জানায়, এখানে পুরো অঞ্চলটা জুড়েই ছিল জঙ্গল। সামনের দিকের যৎসামান্য অংশ নির্মূল করে গ্রাম বসানো হয়েছে। বাকিটা সাফ করলে প্রচুর জমি বেরুবে। কম করে ওদিকটায় আরও হাজার পাঁচেক মানুষের বসবাসের ব্যবস্থা হয়ে যাবে। যুগলের একান্ত ইচ্ছা, রাজদিয়া অঞ্চলের লোকজন এসে বাড়িঘর তুলে থিতু হয়ে বসুক। সেই জন্যই তো শিয়ালদা স্টেশনে ঘুরে ঘুরে সে তাদের খুঁজে বেড়ায়। তার ধারণা, পূর্ব বাংলার অন্য এলাকার অচেনা মানুষ এলে হয়তো বনিবনা হবে না। তখন দিনরাত অশান্তি, ঝগড়াঝাঁটি, ধুন্ধুমার কান্ড।

কথায় কথায় ওরা বসতির ভেতর চলে এসেছিল। ঘরগুলোর চৌহদ্দির বাইরে, সামনের দিকে অনেকখানি খোলা জায়গা। ওখানে ধুলোমাটি মেখে প্রচুর বাচ্চাকাচ্চা হুটোপুটি করছে। ক'টি কিশোরী, যুবতী এবং মাঝবয়সী সধবা মেয়েমানুষকেও দেখা গেল। এধারে ওধারে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে নানা বয়সের ক'টা পুরুষ। যুবক, আধবুড়ো, বৃদ্ধ। নতুন মানুষজন দেখে সবাই থমকে গিয়েছিল। এমনকি বাচ্চাগুলোও হইচই থামিয়ে অবাক বিস্ময়ে বিনুদের দিকে তাকিয়ে থাকে।

হঠাৎ গলার স্বর অনেক উঁচুতে তুলে উত্তেজিত ভঙ্গিতে চিৎকার করতে থাকে যুগল, 'কে কই আছ, তরাতরি এইহানে চইলা আসো। দ্যাখো কারে নিয়া আসছি।'

চারদিকে সাড়া পড়ে যায়। সবগুলো ঘর থেকে একজন দু'জন করে ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে আসে।

যুগল একই সুরে চেঁচিয়ে যায়, 'আমাগো ছুটোবাবু, হ্যামকত্তার নাতি আসছে। কেও একহান চ্যার (চেয়ার) কি জলচকি নিয়া আসো। পতিতপাবন দাদা আর হরিন্দভাইও বউ পোলা মাইয়া নিয়া আসছে। তাগো বসনের ব্যবোস্তা কর।'

লহমায় একটা পুরনো জং-ধরা টিনের চেয়ার এবং একটা আধ-ছেঁড়া শতরঞ্চি এনে কারা যেন পেতে দেয়। বিনুকে বসানো হয় চেয়ারে, পতিতপাবনদের শতরঞ্চিতে।

মুকুন্দপুর বসতির মানুষগুলো সামনের দিকটা ঘিরে দাঁড়িয়েছে। যুগলের উত্তেজনাটা তাদের মধ্যেও যেন চারিয়ে গেছে।

যুগল বলল, 'অ্যাতখানি হাইটা আসছে। তিয়াস লাগছে। জল আনো—'

বিনু ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সার সার মানুষগুলোকে দেখছিল। সবই প্রায় পরিচিত মুখ। রাজদিয়ার কুমোরপাড়ার দুই ভাই বুধাই পাল আর হাচাই পাল, তালতলির নগা পাল, বিনোদ সাহা, যুগলের শ্বশুর গোপাল দাস, তার ভগ্নিপতি ধনঞ্জয়, বারুই বাড়ির প্রাণবল্লভ, মাছের আড়তদার নকুল কুণ্ডু, সুজনগঞ্জের মিঠাইয়ের দোকানদার হারান ঘোষ, পোস্ট অফিসের পিওন নিবারণ, তাজপুরের নিশিকান্ত আচার্য, এমনি অনেকে। তাদের ছেলেমেয়ে বউরাও রয়েছে।

ভিড়ের শেষ মাথায় যুগলের পিসতুতো বোন টুনি আর তার বউ পাখি। সুজনগঞ্জের হাটে যাবার পথে টুনিকে প্রথম দেখেছিল বিনু। অদ্ভুত বাড়ি ছিল টুনিদের। আশ্বিন মাসে, দুর্গাপুজোর আগে আগে ওদের উঠোনটা ছিল এক মানুষ জলের তলায়। চারপাশে অনেক উঁচু ভিতের ওপর চারখানা টিনের চালের ঘর। এক ঘর থেকে আরেক ঘরে যাবার জন্য ধনুকের আকারে সাঁকো। একটা সাঁকোর মাথায় দাঁড়িয়ে তাদের সঙ্গে কথা বলছিল টুনি। আর চার পাঁচ বছরের বাচ্চা দু'টো তার লাউয়ের মতো ঝুলন্ত স্তন চুষছিল চোঁ চোঁ। বিরক্ত টুনি ঝাড়া দিয়ে তাদের উঠোনের জলে ফেলে দিচ্ছিল, আর বাচ্চাদু'টো হাত পা ছুড়ে সাঁতরাতে সাঁতরাতে উঠে এসে আবার টুনির মাই টানছিল। দৃশ্যটা মনে পড়তেই অতি কষ্টে হাসি চাপল বিনু। সেই টুনির স্বাস্থ্য ভেঙে গেছে। একসময় ছিল বেশ মোটাসোটা, ভারী শরীর। দু'তিনটে ছেলেমেয়ের মা হলেও আলগা একটা জেল্লা ছিল চেহারায়। এখন চামড়া খসখসে, চোখ বসে গেছে, হাড় ঠেলে বেরিয়ে এসেছে। সেই বড় দাঙ্গার সময় থেকে একের পর এক যা চলেছে, তাতে টিকে যে আছে, এই না কত!

পাখিও আর আগের মতো নেই। তার শরীরেও প্রচুর ভাঙচুর হয়ে গেছে। ওকে দেখামাত্র এখনও সেই চিত্রটা পলকে চোখের সামনে ফুটে উঠল। পারাপারহীন অথৈ জলে অলৌকিক জলপরীর মতো শাপলাবন শালুকবনের ভেতর দিয়ে সাঁতার কেটে কেটে সে তার আর যুগলের নৌকোয় এসে উঠেছিল। তারপর ওদের দু'জনের বিয়েতে কত ঘটা, কত হইচই, কত বাদ্যিবাজনা।

চোখাচোখি হতে লাজুক হাসে পাখি।

এদিকে সামনের জটলাটার মধ্যে সবাই নীচু গলায় কথা বলছিল, 'হ্যামকত্তার নাতি আমাগো এইহানে আসছেন! আমাগো কী সুভাইগ্য!' হেমনাথ এদের স্মৃতিতে এখনও সজীব। দেশভাগ হয়ে গেছে, সীমান্তের এপারে তারা চলে এসেছে, জীবনে আর কোনও দিনই হয়তো তাঁর সঙ্গে এদের দেখা হবে না, তবু রাজদিয়ার সেই মানুষটির প্রতি এই লোকগুলোর অনন্ত শ্রদ্ধা, অফুরান ভালবাসা। কতকাল ধরে এই লোকগুলোর সুখেদুঃখে শোকে কি আনন্দে বড় মায়ায় তিনি জড়িয়ে থেকেছেন। এত তাড়াতাড়ি কি তাঁকে ভোলা যায়! বিনু জানে, তার যে এমন সমাদর, সে শুধু হেমনাথের নাতি বলেই।

টুনি বলে, 'অ বাবুগো বাড়ির পোলা, যুগাইলা কইছিল আপনেরে লইয়া আসব। বিশ্বাস যাই নাই—'

বাকি সবাই তার কথায় সায় দেয়।

বিনু হাসে, 'এখন বিশ্বাস হয়েছে তো?'

টুনির মধ্যে অদ্ভুত এক সারল্য রয়েছে। হেসে হেসে মাথা হেলিয়ে দেয় সে, 'হইছে।'

সবাই শতমুখে দেশের কথা জানতে চায়। তারা পাকিস্তান থেকে এসেছে অনেকদিন আগে। বিনু এসেছে সদ্য। এখন সেখানে কী চলছে, বিনুদের সঙ্গে আর কারা কারা এপারে এল, হিন্দুদের পক্ষে আর সেখানে থাকা সম্ভব হবে কিনা, ইত্যাদি হাজারো প্রশ্ন।

যুগল অধৈর্য হয়ে উঠেছিল। ব্যস্তভাবে বলল, 'এহন উই হগল প্যাচাল থাউক। কতখানি পথ ছুটোবাবুগো হাটাইয়া নিয়া আসছি। ঘাইমা চুইমা গ্যাছে। পাখি, তুই গিয়া বিল থিকা বালতি ভইরা জল আইনা দে। ছুটোবাবু হাতমুখ ধুইয়া জিরাইয়া লউক।'

বিনুর মনে পড়ল, বিয়ের আগে দ্বীপের মতো টুনিদের সেই বাড়ি থেকে সাঁতরে পাখি যখন তাদের নৌকোয় এসে ওঠে, যুগল তাকে তুমি করে বলেছিল। এখন বলছে তুই। ভালবাসাটা নতুন কোন খাত দিয়ে বইছে, কে জানে।

যুগল বিলের দিকে হাত বাড়িয়ে পতিতপাবনদের বলে, 'উইহানে ঘাটলা আছে। আপনেরা হাত পাও ধুইয়া আসেন।'

বিনুর এবং পতিতপাবনদের জন্য আলাদা আলাদা বন্দোবস্ত। বিনু লজ্জা পেয়ে যায়। তার জন্য জল আনতে পাখি দৌড় লাগাতে যাচ্ছিল, তাকে থামিয়ে সে বলে, 'আমি নিজেই বিলে যাচ্ছি। জল এনে দিতে হবে না।'

যুগল বলে, 'আপনেগো কত নুন খাইছি ছুটোবাবু। এই স্যাবাটুক (সেবাটুকু) করতে দ্যান—'

বিনু ধমকে ওঠে, 'এ নিয়ে আর একটা কথাও বলবে না। আমি এখনও অথর্ব হয়ে পড়িনি।'

যুগল চুপ করে থাকে। আর মুখ খুলতে সাহস হয় না।

বিনু তার কাপড়ের ঝোলা থেকে সাবান আর তোয়ালে বার করে পতিতপাবনদের সঙ্গে নিয়ে বিলে চলে যায়।

নারকেল গুঁড়ি কেটে পোক্ত ঘাট বানানো হয়েছে। এই হেমন্তে বিলের জল বড় শান্ত। নিস্তরঙ্গ।

স্টেশন থেকে এতটা পথ হেঁটে বেশ ক্লান্তি লাগছিল। সারা শরীরে ধুলোর পুরু স্তর জমেছে। বিনু খুব ভাল করে অনেকক্ষণ চোখেমুখে জল ছিটালো। তারপর সাবান ঘষে হাত-পা মুখটুখ ধুয়ে তোয়ালে দিয়ে মুছে ফেলল।

কার্তিক মাস শেষ হতে চলল। এর মধ্যে জল ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। আরামে গা যেন জুড়িয়ে যাচ্ছে।

বিল থেকে ফিরে ফের সেই টিনের চেয়ারে বসে পড়ল বিনু, পতিতপাবনেরা শতরঞ্চিতে। এর ভেতর চায়ের ব্যবস্থা করে ফেলেছে যুগলরা। টুনি বড় একখানা ভরনের থালায় কলাই-করা গেলাসে গেলাসে চা আর মোটা মোটা সুজির বিস্কুট সাজিয়ে নিয়ে এল।

একটা গেলাস তুলে চুমুক দিল বিনু। সস্তা, তিতকুটে চা। তবে আগুন আগুন। এতটা হাঁটাহাঁটির পর এই চা-ই স্নায়ুগুলোকে চাঙ্গা করে দিল।

মুকুন্দপুরের বাসিন্দারা এখনও সামনে অনড় দাঁড়িয়ে আছে। একজনও চলে যায় নি।

বিনু বুধাই পালকে বলে, 'আপনারা যে এখানে আছেন, চলে কী করে? সরকারি সাহায্য কিছু পান?'

বুধাই বলে, 'একহান ফুটা আধলাও না। কষ্টে দিন কাটতে আছে ছুটোবাবু। ভুরে (ভোরে), আন্ধার থাকতে উইঠা হাচাই, নগা আর আমি বেলঘইরা (বেলঘরিয়া) চইলা যাই। পাইকারগো কাছ থিকা সস্তায় আনাজপাতি কিনা উইহানের বাজারে বইসা খইদ্দারগো বেশি দরে বেচি। যা দুই চাইর পহা (পয়সা) লাভ হয়, হেই দিয়া কুনো গতিকে সোংসার চইলা যায়। তয় (তবে) এই মুকুন্দপুরে আমাগো বেবাকের একহান কইরা ঘর হইছে। এইটুকই যা শান্তি।'

বিনুর মনে পড়ে, রাজদিয়ায় থাকতে সেই বৈশাখ থেকে পুজোর আগে পর্যন্ত রাশি রাশি মাটির হাঁড়ি পাতিল কলসি ইত্যাদি বানিয়ে 'পুইনে' পুড়িয়ে স্তূপাকার করে রাখত বুধাই আর হাচাই দুই ভাই। কোজাগরী লক্ষ্মীপুজোর পর দেড়শ' কি দুশ' মণী নৌকোয় সেগুলো বোঝাই করে চলে যেত বহুদূরে। পদ্মা মেঘনা কি ধলেশ্বরীর চরে চরে, 'গাওয়াল' করতে। হাঁড়ি পাতিলের বদলে নৌকো

ভরে ধান নিয়ে ফিরত সেই হিমঋতুতে। পৌষের শেষাশেষি বা মাঘের শুরুতে। এই ছিল তাদের জাত-ব্যবসা।

নগাকে অবশ্য কোথাও যেতে হত না। বছর জুড়েই পূর্ব বাংলায় হাজার পার্বণ। দুর্গাপুজো, লক্ষ্মীপুজো, সরস্বতীপুজো, কার্তিক পুজো, শীতলাপুজো। নগা বাড়িতে বসেই বছরভর প্রতিমা বানাত। কাজের শেষ নেই। দূরদুরান্ত থেকে লোকজন এসে নৌকোয় করে তার প্রতিমা কিনে নিয়ে যেত।

সেই বুধাই পাল, হাচাই পাল আর নগা পাল কৌলিক ব্যবসা ছেড়ে এখন আনাজ বেচছে। মনটা খারাপ হয়ে গেল বিনুর। তিনজনকে লক্ষ করে বলল, 'এই পশ্চিম বাংলাতেও তো লোকে মাটির বাসনকোসন কেনে। প্রচুর লক্ষ্মীপুজো, দুর্গাপুজো, কালীপুজো হয়। প্রতিমারও চাহিদা আছে। দেশের মতো আপনারা সে সব বানান না কেন?'

বুধাই পাল বুঝিয়ে বলল, হাঁড়ি কলসি বা প্রতিমা তৈরির জন্য বিশেষ বিশেষ মাটি দরকার। সেই মাটি কোথায় পাওয়া যায়, তারা জানে না। তবে খোঁজখবর নিচ্ছে। তা ছাড়া, বাসনকোসন বা দেবদেবীর মূর্তি গড়লেই তো হল না। তার খদ্দের চাই। নতুন জায়গায় তারা জিনিস বেচবে কার কাছে? দেশে সাত পুরুষ ধরে এক কাজ করে এসেছে। সেখানে বাঁধা ক্রেতা ছিল। এই বয়সে এক কাপড়ে নতুন দেশে এসেছে। পাঁচ পয়সার সম্বল নেই। এখানকার বাজারের হালচাল জানা নেই। ফের ব্যবসা ফাঁদবে কিসের ভরসায়?

কথায় কথায় জানা গেল, রাজদিয়া থেকে মাইল দশেক দূরের গ্রাম গিরিগঞ্জ থেকে দু'ঘর কর্মকার এসেছে। দেশে তারা নেহাইয়ে গরম লোহা পিটিয়ে শাবল কোদাল খন্তা ইত্যাদি বানাত। বুধাই পালদের মতো তাদেরও এখানে নিজেদের কাজ করার সুযোগ নেই। যারা চাষবাস করত বা বরজে পান ফলাত, তাদেরও পৈতৃক কাজকর্ম বন্ধ হয়ে গেছে। চাষ যে করবে, এখানে সেই জমি কোথায়?

মুকুন্দপুরের বেশির ভাগ মানুষই দু'মুঠো ভাতের জন্য ট্রেনে ট্রেনে আজকাল নানা জিনিস ফেরি করে বেড়ায়। ধূপকাঠি, বিস্কুট, লজেন্স, রকমারি পুতুল, লক্ষ্মীর পাঁচালি, গোপাল ভাঁড়ের মজাদার গল্প, সাড়ে বত্রিশ ভাজা। কেউ কেউ কলকাতায় গিয়ে বাড়ি বাড়ি ঘুরে বড়ি, আচার, পাঁপড় বেচে। অনেকে কলকাতারই ফুটপাথে সস্তা রুমাল, বালিশের ওয়াড়, সায়া, ব্লাউজ, বাচ্চাদের জামাপ্যান্ট ইত্যাদি নিয়ে বসে। কয়েকজন সোদপুর নৈহাটি আর বেলঘরিয়ার বাজারে ছোটখাটো দোকানও দিয়েছে। কুমোর, কামার, তাঁতি, বারুই, আপাতত এখানকার সবাই হয় ফেরিওলা, নয়তো দোকানদার।

যুগল এবং আরও ক'জন ফেরি করে না, বা কোথাও দোকান দেয় নি। তারা এই বিলের মাছ ধরে নানা বাজারে পাইকারদের কাছে বিক্রি করে আসে। এইভাবেই চলছে।

যুগল বলল, 'মুকুন্দপুরের হগলের দেখা অহন পাইবেন না ছুটোবাবু। হেরা বাইর হইয়া গ্যাছে সকালে। ঘুইরা ঘুইরা মাল বেইচা রাইতে ফিরব। কইয়া গ্যাছে, ফিরাই আপনের লগে দেখা করব।'

একটু চুপচাপ।

তারপর যুগল আবার বলে, 'আমাগো বেবাকটির (সবার) দিন আনি দিন খাই অবোস্তা। তয় এইহানে দুইজন লিখাপড়া জানা মানুষ আছে। তাগো প্যাটের চিন্তা নাই।'

বিনু জিজ্ঞেস করে, 'কাদের কথা বলছ?'

নিশিকান্ত আচার্যকে দেখিয়ে যুগল বলে, 'একজন হইল উই আচায্যি মশই, আরেক জন হরনাথ কুণ্ডু। দুই জনে পণ্ডিত মানুষ। আচায্যি মশাই নয় কেলাস তরি (ক্লাস নাইন পর্যন্ত) পড়ছে। হরনাথ কুণ্ডু মেট্রিক পাশ। ওনারা গরমেনের (গভর্নমেন্টের) চাকরি পাইছে।'

নিশিকান্তকে বহুবার দেখেছে বিনু। কিন্তু হরনাথ কুণ্ডর কথা মনে পড়ল না। সে বলল, 'ওই নামে রাজদিয়ায় কেউ কি ছিল?'

যুগল বলল, 'না। উনাগো গেরাম হাজিপুর। রাইজদা থিকা সাত আট মাইল পুবে।'

'উনি কোথায়? ডেকে নিয়ে এস। আলাপ করব।'

'আপিসে গ্যাছে। কইলকাতায়। ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যা পার হইয়া যাইব।'

মুকুন্দপুরের বাসিন্দাদের অনেকেই এখন নানা কাজে বাইরে রয়েছে। রাতের আগে তাদের সঙ্গে দেখা হওয়ার সম্ভাবনা নেই।

বিনু ভাবছিল, একজন ম্যাট্রিক পাশ। আরেকজন ক্লাস নাইন পর্যন্ত পড়েছে। এই বিদ্যায় কী ধরনের সরকারি কাজ পাওয়া সম্ভব? খুব কৌতূহল হচ্ছিল তার। নিশিকান্তর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কোথায় চাকরি করেন?'

নিশিকান্ত শুধু নিজেরই না, হরনাথ কুণ্ডুর চাকরি সম্বন্ধেও সবিস্তার সব জানালো। উদ্বাস্তুদের জন্য সরকারি একটা কোটা আছে। অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে তাদের কাজকর্ম দেওয়া হয়। নিশিকান্ত চাকরি পেয়েছে ফুড ডিপার্টমেন্টে। দমদম স্টেশনের কাছে একটা রেশনের দোকানে সে ক্যাশ মেমো লেখে। নাইন ক্লাসের বিদ্যায় এমন কাজ জোটে না। উদ্বাস্তু বলে নিয়মটা শিথিল করা হয়েছে। হরনাথ কুণ্ডুর বেলাতেও তা-ই। চল্লিশের ওপর বয়স। এই বয়সে সরকারি কাজ মেলে না। এখানেও সেই সহানুভূতি বা করুণা। তার চাকরি হয়েছে ল্যাণ্ড রেভেনিউ ডিপার্টমেন্টে।

নিশিকান্তর ডিউটি ন'টা থেকে পাঁচটা। সে বলল, 'তুমি আমাগো হ্যামকত্তার নাতি। তুমি আসবা বইলা আইজ আর র‍্যাশনের দোকানে যাই নাই। দ্যাশ ছাইড়া চইলা আসছ। এইটা একহান কামের কাম করছ। তা হ্যামকত্তারে রাইজদায় রাইখা আসলা ক্যান?'

পরিচিত লোকজনদের সবারই হেমনাথ সম্পর্কে এক প্রশ্ন। তিনি কেন দেশে পড়ে আছেন? অন্যদের যা বলেছে, নিশিকান্তকে সেই একই উত্তর দিল বিনু। জন্মভূমি ছেড়ে তিনি কোথাও যাবেন না।

জোরে জোরে মাথা নাড়ে নিশিকান্ত। বোঝাতে চায়, হেমনাথের সিদ্ধান্তটা ঠিক নয়। মস্ত ভুল করছেন তিনি। একটু কী ভেবে সে বলে, 'যুগইলা তোমার খাওনের লেইগা চাউল ডাইল তরিতরকারি মাছ আমাগো ঘরে দিয়া গ্যাছে। রাইতে খাইতে খাইতে দ্যাশের কথা ভালা কইরা শুনুম। অহন যাই। তোমার মাসিমারে গিয়া রান্ধন বসাইতে কই।'

খাওয়ার ব্যাপারে মুকুন্দপুরে আসার সময় বিনু কী কড়ার করিয়ে নিয়েছিল, হঠাৎ যুগলের মনে পড়ে যায়। হাতজোড় করে শশব্যস্তে সে নিশিকান্তকে বলে, 'আচায্যি মশই, আপনের পায়ে ধরি, আমার অপরাধ নিয়েন না। ছুটোবাবু আমাগো রান্ধনই খাইব। তেনি জাতপাত মানেন না। এইর পর উনি তো মুকুন্দপুরে আরও আসব। তহন একদিন খাওয়াইয়া দিয়েন।'

নিশিকান্ত বেশ নিরাশ হল, 'ঠিক আছে। হ্যামকত্তার নাতির যহন হেই ইচ্ছা, কী আর করন! তাইলে চাউল ডাইল যা দিছস, লইয়া যা—'

যুগল পাখিকে বলল, 'যা, আচায্যি মশয়ের ঘর থিকা হগল লইয়া আয়। হাত-পাও ভালা কইরা ধুইয়া, কাচা কাপড় পিন্ধা (পরে) রানবি (রাঁধবি)।'

বিনু তার হাতের রান্না খাবে। খুশিতে হাওয়ার আগে উড়তে উড়তে চলে গেল পাখি।

শুধু বিনুর খাওয়াদাওয়া নিয়ে ভাবলেই তো চলবে না। যুগলের সমস্ত দিকে নজর। পতিতপাবনরা রয়েছে, হরিন্দরা রয়েছে। আজ রাতের জন্য তাদের খাওয়ানোর দায়িত্ব নিল বুধাই পাল, নগা পাল, প্রাণবল্লভ আর হাচাই পাল। কাল থেকে অন্য ব্যবস্থা করা হবে। কারোর একার পক্ষে দুই পরিবারের এতগুলো লোকের খাদ্য জোটানো অসম্ভব। যতদিন না পতিতপাবন আর হরিন্দর রুজি রোজগারের কোনও বন্দোবস্ত হচ্ছে, পালা করে করে তারা এর ওর বাড়ি খাবে। দুই পরিবারে ছেলেমেয়ে নিয়ে মোট দশজন। মুকুন্দপুরবাসীদের কারোর এমন অবস্থা নয় যে একসঙ্গে এতগুলো লোককে খাওয়ায়। ঠিক হল, একেক বাড়িতে দু'জন দু'জন করে খাবে। তাতে কারোর একার ওপর ততটা চাপ পড়বে না।

বেলা আরও হেলে গেছে। পশ্চিম দিকের গাছপালার আড়ালে সূর্যটা কখন নেমে গিয়েছিল, বিনুরা লক্ষ করে নি। সূর্যটাকে দেখা না গেলেও দিনের শেষ বিলীয়মান আলোটুকু এখনও আকাশের গায়ে অবছাভাবে লেগে আছে।

কলকাতা থেকে বেশ খানিকটা দূরে এই মুকুন্দপুর। এর একধারে আদিগন্ত ফসলের মাঠ। আরেক দিকে অজস্র গাছপালা, ঝোপঝাড়, বনজঙ্গল এবং অফুরান বিল। পায়ের তলার মাটি ভিজে ভিজে। বিদ্যুৎ আসে নি। কলকাতার তুলনায় ঠাণ্ডাটা এখানে অনেক বেশি। হেমন্তের এই বেলাশেষে মাটি থেকে হিম উঠে আসছে। দূরে, বিলের ওধারে, গাছপালার মাথায় কুয়াশা জমতে শুরু করেছে। বেশ শীত শীত লাগছে বিনুর। বোঝা যাচ্ছে, দিনের আয়ু ফুরিয়ে এসেছে। দেখতে দেখতে ঝপ করে

সন্ধে নেমে যাবে।

যুগল বলল, 'ওস পড়তে আছে ছুটোবাবু। বাইরে বইসা থাকলে ঠাণ্ডা লাইগা জ্বরজারি হইতে পারে। ঘরে চলেন—' বুধাই পালদের বলল, 'পতিতদাদা আর হরিন্দদাদাগো তোমাগো ঘরে লইয়া যাও।'

ভিড়টা আস্তে আস্তে পাতলা হতে থাকে। পতিতপাবনদের নিয়ে বুধাই পালরা চলে যায়।

যুগলের বাড়িটা একেবারে বিলের কিনারা ঘেঁষে। বাড়ি আর আর কী। দু'খানা ঘর। মেঝে মাটির। চারপাশে ক্যাঁচা বাঁশের বেড়া। মাথায় টালির ছাউনি। জানালাগুলোতে পাল্লার বদলে বাখারির ঝাঁপ। সামনের দিকে উঠোনের একধারে মাটির উঁচু বেদির ওপর তুলসীর ঝাড়। আরেক পাশে রান্নাঘর।

যুগল বিনুকে সঙ্গে করে তার বাড়িতে নিয়ে এল। উঠোন পেরিয়ে যেতে যেতে দেখা গেল, রান্নাঘরে পাখি রান্নার তোড়জোড় করছে। যুগলের কথা অক্ষরে অক্ষরে মেনে এখন তার পরনে পরিষ্কার একখানা শাড়ি আর জামা। দু'টো বাচ্চা তার কাছে বসে খেলছে। নিশ্চয়ই যুগলের ছেলে।

কাজ করতে করতে পায়ের শব্দে চোখ তুলে একবার বিনুদের দিকে তাকাল পাখি। তার মুখে লাজুক হাসি ফোটে। পরক্ষণে নতচোখে ফের সে নিজের কাজে মন ঢেলে দেয়।

যুগলের পিছু পিছু ডানপাশের বড় ঘরখানায় চলে এল বিনু। একধারে বেড়ার গায়ে লাগানো তক্তপোশে ফিটফাট বিছানা। পরিপাটি করে সবুজ ডোরাদার চাদর পেতে রাখা হয়েছে। বালিশে কাচা ওয়াড় পরানো। পায়ের দিকে গায়ে দেবার জন্য ভাঁজ-করা চাদর। বিনু বুঝতে পারে, এসব তারই জন্য।

পাখি যে সুগৃহিণী তার ছাপ ঘরের সর্বত্র। বিছানার উলটো দিকের বেড়া ঘেঁষে ক'টা টিনের বাক্স, আয়না, চিরুনি, আলনায় সামান্য ক'টা জামাকাপড়। কোথাও অগোছালো ভাব নেই।

যুগল বলল, 'বিছনায় বসেন ছুটোবাবু—' সে নিজে ঘরের কোনা থেকে একটা বেতের মোড়া টেনে এনে কাছাকাছি বসল।

বাঁ ধারের জানালা দিয়ে তাকালে পর পর অনেকগুলো ঘর চোখে পড়ে। বিনু জিজ্ঞেস করল, 'ওগুলো কাদের?'

যুগল জানায়, প্রথমটা টুনিদের, তারপর থেকে তার শ্বশুর গোপাল দাস, খুড়শ্বশুর কানাই দাস, পিসশ্বশুর নবীন দাস, মাসশ্বশুর দয়াল দাস ইত্যাদিদের। দেশভাগের পর যখন ভাটির দেশে একতরফা খুনজখম লুটপাট ধর্ষণ শুরু হয়, সেই সময় কলকাতায় চলে এসেছিল যুগল। নিজের বউ বাচ্চাদের নিয়েই শুধু না, তার শ্বশুরদের গোষ্ঠীটাকেই সঙ্গে করে এনেছে। এবং এই মুকুন্দপুরে তারই কাছে ওদের পাকাপাকি থাকার বন্দোবস্ত করেছে।

যুগল বলতে লাগল, 'আত্মবান্ধব পাশে থাকন ভালা। বিপদে আপদে হেরাই বল ভরসা। তাই না ছুটোবাবু?'

বিনু গলার স্বরে জোর দিয়ে বলে, 'একশ' বার—'

ডানদিকের জানালার বাইরে হাত পনের দূর থেকে বিল। দিন যত ফুরিয়ে আসছে, বিলের চেহারাও ততই বদলে যাচ্ছে। জলের রং ক্রমশ কালো হচ্ছে।

মুখ ফিরিয়ে এবার বিলের দিকে তাকাল বিনু। হেমন্তের স্থির নিস্তরঙ্গ জল উথালপাতাল করে মাছেরা ঘাই দিয়ে চলেছে অনবরত।

মাছগুলো অদৃশ্য রয়েছে জলের তলায়। বিলের ওপর দিকের আলোড়ন দেখেই যুগল বলে দিচ্ছে, কোনটা কোন মাছের ঘাই। বিনু জানে, জলতলের অন্তহীন রহস্য যুগলের নখদর্পণে। সে যা বলছে, ষোল আনা নির্ভুল। রাজদিয়ায় থাকতে এমন প্রমাণ বহুবার পেয়েছে বিনু। খাল-বিল-নদীর রুপোলি ফসলেরা কে কী করে বেড়াচ্ছে, জলস্তর ভেদ করে সে যেন তা দেখতে পায়।

যুগল বলে, 'বিলের এই মাছই মুকুন্দপুরের আমাগো কয় ঘর মাইনষের একমাত্তর ভরসা।'

'কিন্তু—'

'কী?'

'বিলের মালিক নিশ্চয়ই কেউ আছে। তারা তোমাদের মাছ ধরতে দিচ্ছে?'

যুগল বলল, বিলের মালিক অবশ্যই একজন ছিল কিন্তু সে মারা যাওয়ায় ছেলেদের মধ্যে বাপের বিষয় আশয় নিয়ে ধুন্ধুমার চলছে। যতদিন না তার একটা নিষ্পত্তি হচ্ছে, বিলের দিকে কারোর নজর নেই। আপাতত তাই নির্বিঘ্নে মাছ মারতে পারছে যুগলরা।

বিনু বলল, 'তবে যে বলেছিলে, মালিকের গুণ্ডাদের সঙ্গে লড়াই করে তোমরা এখানে বেঁচে আছ?'

যুগল জানায়, 'বিলের মালিক সরকারেরা। আর পারের যত জমিন আর জঙ্গল হের মালিক পালচধরিরা (চৌধুরিরা)। আমাগো যুজ্যু পালচধরিগো লগে। উই দ্যাখেন ছুটোবাবু—' ঘরের একটা কোণের দিকে আঙুল বাড়িয়ে দিল সে।

আগে লক্ষ করেনি বিনু, ওই কোণটায় খাড়া করে রাখা হয়েছে সাত ফলাওলা টেটা, তেল পাকানো লাঠি, সড়কি, ইত্যাদি নানা ধরনের মারণাস্ত্র।

যুগল বলতে লাগল, 'এইগুলা দিয়াই পুঙ্গির পুতেগো লগে যুজ্যু চালাইয়া যাইতে আছি। অ্যামন লাঠি সড়কি মুকুন্দপুরের বেবাক মাইনষের ঘরে ঘরে।'

জবরদখল কায়েম রাখতে লড়াইয়ের কথা আগেই জানিয়েছিল যুগল। এই লড়াই তো আছেই। কিন্তু তার ভবিষ্যতের কথা ভেবে ভীষণ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে বিনু। বলে, 'সরকারদের ঝগড়াঝাঁটি চিরকাল থাকবে না। সে সব মিটে গেলে ওরা নিশ্চয়ই বিল নিয়ে পড়বে। তখন কি তোমাদের জলের ধারে ঘেঁষতে দেবে?'

যুগলকে এবার একটু বিচলিত দেখায়. 'ছুটোবাবু, এই কথাহান যে আমি ভাবি নাই তা না। তয় অহন তো চইলা যাইতে আছে। পরে যদিন সরকাররা ফ্যাসাদ বাধায়, লাঠি সড়কি লইয়া নাইমা পড়ুম।'

'এটা কোনও কাজের কথা নয়। কত দিকে কতজনের সঙ্গে লড়াই করবে?' বিনু বোঝায়, যুগলের সংসার আছে, ছেলেমেয়ে বউ তার মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। অন্যের বিলের ওপর নির্ভর করে চিরদিন তো চলতে পারে না। ভবিষ্যতের কথা ভেবে রুজি-রোজগারের স্থায়ী একটা ব্যবস্থা করা দরকার।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে যুগল। তাকে চিন্তাগ্রস্ত দেখায়। একসময় ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে বলে, 'আপনে ঠিকই কইছেন ছুটোবাবু। লিখাপড়া তো শিখি নাই। আচায্যি মশয়ের লাখান নয় কেলাস তরিও যদিন পড়তাম, নিয্যস একহান চাকরি বাকরি জুইটা যাইত।' একটু থেমে বলে, 'লিখাপড়ার শক্তিই অন্যরকম। প্যাটে যদিন কালির অক্ষর থাকে, পিরথিমীর যেইহানেই যাও, না খাইয়া মরতে হইব না। পাকাপাকি একহান ব্যবোস্তা হইবই। হে যাউক, আমার কী করন দরকার হের (তার) বুদ্ধি পরমাশ্য দ্যান—'

একটি অক্ষরপরিচয়হীন মানুষের পক্ষে নতুন জায়গায় এসে কতটা কী করা সম্ভব? এখানকার অন্য সবাই যা করছে বেঁচে থাকার তা-ই একমাত্র পথ। অর্থাৎ মালপত্র ফেরি করা, নইলে বাজারে দোকান খুলে বসা। বিনু দোকানের কথাটাই বলল।

বিমর্ষ মুখে যুগল বলে, 'দোকান যে দিমু ট্যাকা কই? পুজি (মূলধন) না থাকলে কি ব্যবসা করন যায়?'

'তোমাদের মুকুন্দপুরের এত লোক যে দোকানদারি করছে তারা টাকা পেল কোথায়?'

'দ্যাশ থিকা হেরা কিছু আনতে পারছিল। হেই দিয়া মহাজনের কাছ থিকা মাল কিনা (কিনে) দোকানে বেচে।'

'তুমি কিছু আনতে পার নি? তোমরা যখন ইণ্ডিয়ায় এলে তখনও তো অবস্থা এখনকার মতো খারাপ হয় নি। অনেকে অনেক কিছু আনতে পেরেছে।'

'আনছিলাম ছুটোবাবু। হগল খরচ হইয়া গ্যাছে। হাত এক্কেবারে শূন্যি।'

নিত্য দাসের কথা মনে পড়ল বিনুর। তার মুখে শুনেছিল, গভর্নমেণ্ট ছোটখাটো ব্যবসার জন্য উদ্বাস্তুদের কিছু অনুদান আর কিছু লোন দিচ্ছে। অবশ্য তার জন্য প্রচুর তদ্বির করতে হয়, বহুজনের কাছে নানা ডিপার্টমেণ্টে ধরনা দিতে হয়। যুগল নিত্য দাসের মতো চতুর নয়। সে কি দিনের পর

দিন লেগে থেকে পারবে সে সব আদায় করতে? তবু ঋণ এবং অনুদানের কথাটা ওকে জানানো দরকার। বিনু জানালোও।

যুগল বলল, 'গরমেন (গভর্নমেন্ট) যে অ্যামন সুযুগ সুবিধা দিতে আছে, শুনি নাই তো। এইর লেইগা কাগো ধরতে হইব?'

বিনুরও তা জানা নেই। নিত্য দাসের সঙ্গে খুব শিগগিরই দেখা হবে। যদি সে কথা রাখে, হেমনাথের চিঠি নিয়ে নিশ্চয়ই সুধাদের বাড়ি আসবে। তখন তাকে জিজ্ঞেস করে সব জেনে নেবে।

বিনু বলল, 'খবর নিয়ে তোমাকে জানাবো। তুমি একাই না, ইচ্ছা করলে এখানকার আরও অনেকেই ঋণ টিন পেতে পারে।'

যুগলের চোখমুখ উদ্দীপনায় ঝকমক করতে থাকে, 'কাইলই হগলরে ডাইকা জানাইয়া দিমু—'

'না না, এখন কিছু বোলো না। আগে আমি নিজে সমস্ত ব্যাপারটা বুঝে নিই।'

একটু চুপচাপ।

তারপর বিনু ফের বলে, 'ঋণ পেতে অনেক সময় লাগে। তার আগে এক কাজ কর—'

যুগল জিজ্ঞেস করে, 'কী কাম ছুটোবাবু?'

বিনু এর মধ্যে মনে মনে হিসেব করে নিয়েছে। রাজদিয়া থেকে আসার সময় বেশ কিছু টাকা সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল। তা ছাড়া, হিরণও তাকে দিয়েছে। খরচ টরচ করার পর কয়েক শ' টাকা এখনও হাতে আছে।

বিনু বলল, 'আমি তোমাকে আপাতত শ'চারেক টাকা দিতে পারি। তাই দিয়ে ছোটখাটো কোনও দোকান খুলতে পারবে?'

এমনটা ভাবতেই পারে নি যুগল। অযাচিত ভাবে বিনু সাহায্য করতে চাইছে। খুশিতে, কৃতজ্ঞতার তার মনে ভরে যায়। বলে, 'পারুম ছুটোবাবু, পারুম। এইর থিকা কত কম পুজিতে অন্যেরা দোকান দিছে। কিন্তুক—'

'কী?'

'আপনে হপায় (সবে) দ্যাশ থিকা আসছেন। আছেন সুধা বইনের বাড়িত্। অত ট্যাকা কই থিকা দিবেন?'

বিনু বলল, 'সে তোমাকে ভাবতে হবে না। আসছে বেস্পতিবার হাসপাতালে পা দেখিয়ে হিরণদাদের বাড়িতে তো যাচ্ছই। তখন টাকাটা পেয়ে যাবে।'

যুগল বলল, 'ট্যাকা নিমু। তয় একহান কথা ছুটোবাবু।'

বিনু উৎসুক দৃষ্টিতে তাকায়, 'কী কথা?'

'যেইদিন পারুম ট্যাকাটা কিন্তুক আপনেরে ফিরত দিমু। না কইতে পারবেন না।'

বিনু জানে, যুগলের আত্মসম্মান বোধ প্রখর। সে ঋণী থাকতে চায় না। বলল, 'ঠিক আছে, দিও—'

বাইরের মলিন আলোটুকু কে যেন কোন ফাঁকে এক টানে সরিয়ে নিয়ে গেছে। বিলের জল এবং ওধারের নিবিড় গাছপালা এখন ঘন কুয়াশায় আর অন্ধকারে একাকার। কখন সন্ধে নেমে গিয়েছিল, বিনুরা খেয়াল করে নি।

সমস্ত চরাচর জুড়ে সবুজ আলো জ্বেলে লক্ষ কোটি জোনাকি উড়ছে। দূরের জঙ্গল থেকে পেঁচা এবং নাম না-জানা পাখিরা কর্কশ গলায় চেঁচিয়ে উঠছে। আঁধার খান খান করে ভৌতিক শব্দ করে চিৎকার করছে খটাশেরা। কোথায় যেন শিয়ালদের মজলিশ বসেছে। তারা একটানা ডেকে চলেছে। মুকুন্দপুরের কুকুরগুলো সমঝদার শ্রোতা হয়ে নীরবে বসে নেই। চড়া গলায় গজরাতে গজরাতে অদৃশ্য শিয়ালদের হাঁকাহাঁকি লক্ষ করে তাড়া করে যাচ্ছে। এছাড়া চারপাশ একেবারে নিঝুম।

বিনুর মনে হল, মহাপৃথিবীর বাইরে কোনও অচেনা, অলৌকিক ভূখণ্ডে সে চলে এসেছে।

জানালা দিয়ে শীতল হাওয়া বিলের জল ছুঁয়ে ছুঁয়ে হু হু করে ঘরে ঢুকছিল। হঠাৎ সম্বিত ফিরে পাওয়া মানুষের মতো যুগল বলে ওঠে, 'ইস, আন্ধার হইয়া গ্যাছে। বাতাস জবর টালকি (ঠাণ্ডা) লাগতে আছে।' শশব্যস্তে উঠে গিয়ে ঘরের জানালাগুলো বন্ধ করতে করতে স্বর উঁচুতে তুলে সে

ডাকাডাকি করতে লাগল, 'পাখি—পাখি—'

রান্নাঘর থেকে পাখির গলা ভেসে এল, 'কী কও?'

'ছুটোবাবু আন্ধারে বইসা আছে। তর হুশ নাই। অহনই বাত্তি আঙ্গাইয়া (জ্বালিয়ে) গণশার হাতে পাঠাইয়া দে—'

একটু পরে বছর পাঁচেকের একটা ছেলে জ্বলন্ত হেরিকেন ঘরের মাঝখানে নামিয়ে রেখে চলে গেল। মুহূর্তে ঘরটা আলোয় ভরে যায়।

উঠোন পেরিয়ে খানিক আগে এখানে আসার সময় রান্নাঘরে দু'টো ছেলেকে দেখেছিল বিনু। তাদের মধ্যে এও ছিল। বলল, 'এই বুঝি গণেশ?'

যুগল ঘাড় হেলিয়ে দেয়, 'হ। আমার বড় পোলা। ছুটোটার নাম কাত্তিক। হেয় (সে) পাকের ঘরে তার মায়ের কাছে রইছে।'

একটু ভেবে বিনু জিজ্ঞেস করে, 'ছেলেদের কী ব্যবস্থা করেছ?'

'কুন ব্যবোস্তার কথা ক'ন ছুটোবাবু?'

'একটু আগে লেখাপড়ার কথা বলছিলে না? ছেলেদের স্কুলে ভর্তি করেছ?'

হঠাৎ আলো নিবে গেল যেমন হয়, মুখটা তেমনি কালো হয়ে গেল যুগলের। চুপচাপ কিছুক্ষণ বসে থাকে সে। মুহ্যমান। বিমর্ষ। তারপরে বলে, 'না ছুটোবাবু। ইস্কুল আছে হেই আগরপাড়ায়। ভত্তি করুম ক্যামনে? দুই আড়াই মাইল হাইটা পোলা দুইটারে লইয়া ক্যাঠা (কে) হেইহানে যাইব, ক্যাঠাই বা ফিরাইয়া আনব?' পাখির তো সোংসারের কাম থাকে। হেয় (সে) বাড়ি ছাইড়া বাইর হইতে পারব না। আমারও সোময় নাই। ভুরে উইঠা মাছ মাইরা পাইকারগো কাছে দৌড়াইতে হয়। পোলাগো নিয়া ইস্কুলে যামু ক্যামনে?'

এ এক গভীর সমস্যা। আগে তো অন্নচিন্তা। তারপর ছেলেদের পড়াশোনার ভাবনা। কী উত্তর দেবে, ভেবে পেল না বিনু।

যুগল থামে নি, 'অনেকদিন ভাবছি, আমাগো মুকুন্দপুরে একহান ইস্কুল খোলন দরকার। হুদা (শুধু) কাত্তিক গণশার লেইগা না, এইহানের অন্য পোলামাইয়াগো লেইগাও। তাগো বাপ-মায়েরাও ইস্কুলের কথা কয়। আমিও খোজে আছি ছুটোবাবু।'

বিনু জিজ্ঞেস করে, 'কিসের খোজে?'

'মাস্টরের। রাইজদা তাজপুর দেলভোগ গিরিগুঞ্জ, এই হগল জাগা থিকা মেলা মাস্টর দ্যাশ ছাইড়া চইলা আসছে। তাগো কেওরে (কাউকে) কেম্পে কি শিয়ালদার ইস্টিশনে পাইয়া গ্যালে মুকুন্দপুরে লইয়া আসুম। তেনারে দিয়া ইস্কুল বসানের ইচ্ছা। হে ছাড়া—'

'তা ছাড়া কী?'

'একজন ডাক্তর কি কবিরাজেরও দরকার। রোগ ব্যারাম হইলে রুগীরে মাচানে শুয়াইয়া কান্ধে তুইলা হেই আগরপাড়ায় যাইতে হয়। কী যে কষ্ট!'

পলকহীন যুগলের দিকে তাকিয়ে থাকে বিনু। মুগ্ধ। অভিভূত। রাজদিয়ায় যে নিরক্ষর যুবকটি হেমনাথের বাড়িতে কামলা খাটত, পাট জাগ দিত, ধানবোনা এবং ধানকাটার তাদারক করত, অথৈ জলধারায় নৌকো বাইতে বাইতে ভাটিয়ালি গাইত আর মনের সুখে মাছ মেরে বেড়াত সেই মানুষ বিল এবং জঙ্গলে ঘেরা মুকুন্দপুরের এই বিজন ভূখণ্ডে একটি পরিপূর্ণ জনপদ গড়ার স্বপ্ন দেখছে। এখানে স্কুল বসাবে, চিকিৎসার ব্যবস্থা করবে। লেখাপড়া বা রোগ সারাবার জন্য দূরে কোথাও ছুটতে হবে না।

বিনু কী বলতে যাচ্ছিল, হঠাৎ সামনের বিশাল খোলা চত্বরের ওধারের কোনও ঘর থেকে বয়স্ক মেয়েমানুষের কাতর, করুণ কান্নার ধ্বনি হেমন্তের অন্ধকার এবং কুয়াশা চিরে চিরে চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে থাকে।

সচকিত বিনু জিজ্ঞেস করে, 'কে কাঁদছে যুগল?'

হেরিকেনের আলোয় চোখে পড়ে, যুগলের সারা মুখ বিষাদে ছেয়ে গেছে। সে বলে, 'গৌরাঙ্গ বিশ্বাসের বউ।'

pathagar.net

'গৌরাঙ্গ বিশ্বাস কে?'

'আপনে কি চিনবেন? দেলভোগে ওনাগো বাড়ি আছিল।'

বিনু জানায় গৌরাঙ্গ বিশ্বাসকে সে চেনে না। জিজ্ঞেস করল, 'কাঁদছে কেন?'

'পাকিস্থানে উনাগো বয়্যের মাইয়ারে (যুবতী মেয়েকে) কাইড়া লইয়া গ্যাছে। হেই দুঃখে কান্দে। যতদিন বাচব, ততদিন কাইন্দাই যাইব।'

হরিদাস সাহার কথা মনে পড়ল বিনুর। নয়া চিকন্দি গ্রামে ছিল তাদের বাড়ি। ওদের প্রথম দেখে তারপাশার স্টিমারঘাটে। সেখানে হরিদাস সাহার স্ত্রী মুখে কাপড় গুঁজে অঝোরে কেঁদে যাচ্ছিল। সে কি বুকফাটা, আর্ত কান্নার আওয়াজ! কারণটাও জেনেছিল বিনু। ওদের যুবতী মেয়েকেও হানাদারেরা তুলে নিয়ে গেছে।

যুগল বলছিল, 'আমাগো এই মুকুন্দপুরে আরও কয় ঘর আছে। পাকিস্থানে হেরাও মাইয়া খুয়াইয়া আসছে। হেরা কান্দে না ছুটোবাবু, শোকে এক্কেবারে পাথর হইয়া গ্যাছে।'

বুকের ভেতর শ্বাসকষ্টের মতো একটা যাতনা অনুভব করছিল বিনু।

যুগল থামে নি, 'এইহানে পাচ সাত জন যুবুতী মাইয়া মা-বাপের লগে আসছে। পাকিস্থানে তাগো ইজ্জৎ নাশ হইয়া গ্যাছে। পেরথম পেরথম ঘর থিকা বাইর হইত না। আমরাই বুঝাইয়া সুঝাইয়া বাইরে টাইনা আনছি। কইছি, বইনেরা যা হইছে তার লেইগা তোমাগো তো কুনো দুষ নাই। উই হগল লইয়া আর মাথা ঘামাইও না। সুমখে জীবন পইড়া আছে। বাচতে তো হইব ভালা কইরা। হগলের লগে মিলো, মিশো (মেলামেশা কর), আনন্দ কর। দেখবা বেবাক ঠিক হইয়া যাইব।'

বিদ্যুৎচমকের মতো ঝিনুকের মুখটা চোখের সামনে ভেসে ওঠে। অসীম উদারতায় মুকুন্দপুরের লাঞ্ছিত মেয়েগুলোকে যুগলেরা কাছে টেনে নিয়েছে। হেমনলিনীরা কি যুগলদের মতো মহানুভব হতে পারতেন না? তা হলে ঝিনুককে নিয়ে তার কি কোনও সমস্যা থাকত?

হঠাৎ খেয়াল হল, কয়েক দিনের মধ্যে তীর্থ সেরে অবনীমোহন কলকাতায় ফিরবেন। ঝিনুককে দেখলে তিনি কী বলবেন, তাঁর কী প্রতিক্রিয়া হবে? নতুন করে ভাবতে গিয়ে বুকের ভেতরটা কেঁপে যায় বিনুর।

রাত একটু বাড়লে একে একে অনেকে এসে দেখা করে গেল। এরা সকালে চান সেরে, নাকেমুখে গুঁজে ফেরি কি দোকানদারি করতে বেরিয়েছিল। এইমাত্র ফিরেছে। বিনু যখন পড়ন্ত বেলায় যুগলের সঙ্গে আসে, ওরা কেউ মুকুন্দপুরে ছিল না।

হেমকর্তার নাতিকে দেখে সবাই ভীষণ খুশি। বিনু যে সত্যিসত্যিই মুকুন্দপুরে আসবে, এ ছিল তাদের পক্ষে সম্পূর্ণ আশাতীত। সকলেই জানালো, কালকের দিনটা কেউ আর বেরুবে না। বিনুর সঙ্গে কাটিয়ে দেবে।

সবার শেষে এল হরনাথ। চল্লিশের ওপরে বয়স। রোগা, পাতলা চেহারা। লম্বাটে মুখ। চুল উঠে উঠে কপালটা মাঠ হয়ে গেছে। পরনে ধুতি আর হাতা-গুটনো, শ্যাওলা রঙের ফুলশার্ট।

রাজদিয়া থেকে সাত আট মাইল পুবে হাজিপুরে ছিল হরনাথদের বাড়ি। কিন্তু দেশে থাকতে তার সঙ্গে কখনও দেখা হয় নি বিনুর। কিংবা দেখা হলেও মনে নেই।

হরনাথ বলল, 'মুকুন্দপুরের বেবাক মাইনষের মুখে আপনের কথা এত শুনছি যে দ্যাখনের বড় ইচ্ছা আছিল। আইজ আপিসে আর্জেন্ট কাম আছিল, তাই যাইতে হইছে। কাইল ছুটি নিছি।' সে জানায়, এই নয়া বসতের বাসিন্দাদের মতো তারও ইচ্ছা, কালকের দিনটা বিনুর সঙ্গে কাটিয়ে দেয়।

কিছুক্ষণ গল্প করে হরনাথ চলে গেল।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই গণেশ এসে হাজির। যুগলকে বলল, 'মায়ের রান্ধন হইয়া গ্যাছে। জিগাইল বাবুগো পোলায় কি অহন খাইব?'

হঠাৎ যেন খেয়াল হল যুগলের। সেই দুপুরের আগে আগে সুধাদের বাড়ি থেকে খেয়ে বেরিয়েছে বিনু। শিয়ালদা স্টেশনে রাজদিয়া অঞ্চলের মানুষজনের খোঁজ করা, পতিতপাবনদের নিয়ে আগরপাড়ায় এসে তিন সাড়ে-তিন মাইল হেঁটে মুকুন্দপুরে আসা, ধকল তো কম যায় নি। এখানে এসে দু'খানা বিস্কুট আর এক কাপ চা ছাড়া পেটে কিছুই পড়ে নি। নিশ্চয়ই বিনুর খুব খিদে পেয়েছে।

শশব্যস্ত যুগল বলে, 'হ হ, অহনই খাইব। তর মায়েরে এই ঘরেই খাওনের বন্দবস্ত করতে ক'।'

লহমায় সব ব্যবস্থা হয়ে গেল। চটের ওপর সুতোর নকশা-করা মস্ত আসন পেতে, ঝকঝকে ভরনের গেলাসে জল এনে রাখল পাখি। তারপর কাঁসার থালায় ভাত এবং ছোট বড় বাটিতে বোঝাই করে খাদ্যবস্তু আসতে লাগল।

যুগল কৃতার্থ ভঙ্গিতে বলল, 'আপনে যে কুনোদিন আমাগো বাড়িত্ দু'গা ভাত খাইবেন, হপনেও (স্বপ্নেও) ভাবি নাই। কী যে সুভাগ্যি!' তার গলা আবেগে বুজে এল।

বিনু বিব্রত মুখে বলে, 'এই সব বলে আমাকে লজ্জা দিও না যুগল।'

যুগল বলল, 'ঠিক আছে, কমু না। খাইতে বসেন ছুটোবাবু—'

বিনু লক্ষ করেছে, শুধু একখানা আসনই পাতা হয়েছে। একটু অবাক হয়ে বলল, 'এ কী! তোমরা খাবে না?'

'আপনে আগে খাইয়া লন। আমরা পরে খামু—'

'উঁহু, তা হবে না। তোমরাও বোসো—'

অনেক বলা সত্ত্বেও কিছুতেই যুগলকে বসানো গেল না। তবে কার্তিক গণেশের জন্য আসন পেতে দিল পাখি। একসঙ্গে খেতে বসে তারা বিনুকে সঙ্গ দেবে।

প্রচুর পদ রেঁধেছে পাখি। তিন রকম মাছ। কাতলা, বোয়াল, মৌরলা। ভাজা, ঝোল এবং সর্ষে-বাটা দিয়ে ঝাল। তা ছাড়া মসুর ডাল। মাছের মাথা দিয়ে কচুর শাক।

বিনু আঁতকে ওঠে, 'কী করেছ তোমরা! মানুষে কি এত খেতে পারে!'

'অ্যাত আর কই! রাইজদায় হ্যামকত্তার বাড়িত্ কী খাওনটাই না খাইতাম। হেই তুলনায় কী-ই বা আপনের সুমখে ধইরা দিতে পারছি!'

'এত খরচ করার মানে হয়?'

যুগল বলে, 'খরচ কই করলাম? চাউল আর ডাইল ছাড়া কিছুই কিনি নাই। মাছ যা দেখতে আছেন, হগলই আমাগো বিলের। কচুও এইহানকারই।'

বিপুল পরিমাণ খাদ্যবস্তু সাজিয়ে দিয়ে সামান্য দূরে নতচোখে বসে আছে পাখি। মাথায় ছোট করে ঘোমটা টানা। কপালে মস্ত সিঁদুরের ফোঁটা, সিঁথিতেও চওড়া করে সিঁদুরের টান। দুই ছেলের মা। তবু মনে হয়, নতুন যুবতী। দেশভাগের পর এত যে ঝড় ঝাপটা গেছে, তবু তার চেহারায় এখনও লাবণ্য আর সরলতা মাখানো। শালিকের মতো টানা কালো চোখে আর ঠোঁটে লাজুক হাসি।

বিনু বলল, 'ভাত ডাল মাছ যা দিয়েছ, অর্ধেক তুলে নাও—'

পাখি যুগলের দিকে তাকায়। যুগল চেঁচামেচি জুড়ে দেয়, 'না না, কিছুতেই না। ওইটুক না খাইলে আমাগো শান্তি হইব না—'

বিনু একরকম জোর করেই বেশ খানিকটা ভাত মাছ টাছ তুলিয়ে ছাড়ল। তারপর খেতে শুরু করল।

খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গল্প। এলোমেলো, অসংলগ্ন। হেমনাথের বাড়িতে পালাপার্বণে কী ধরনের ভোজ হত, সীমান্তের এপারে জিনিসপত্র এমনই অগ্নিমূল্য যে কোনও কিছুতে হাত ঠেকানো যায় না, ইত্যাদি ইত্যাদি। এরই ফাঁকে বহুকাল আগে সুজনগঞ্জের হাটে যাওয়ার পথে অথৈ জল সাঁতরে বিনুদের নৌকোয় পাখির উঠে আসার কথাও উঠল।

বিনু খেতে খেতে লক্ষ করল, লজ্জায় পাখির মুখ প্রায় মাটিতে গিয়ে ঠেকেছে। হেরিকেনের উজ্জ্বল আলোর ছটা পড়েছে তার মুখটায়। সেদিনের জলপরীর মতো আজও তাকে অলৌকিক মনে হচ্ছে।

একসময় বিনু হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, 'তোমাদের মুকুন্দপুরে সব মিলিয়ে কত জন আছে?'

বিনু বলল, 'ক্যান ক'ন তো?'

'বলোই না—'

মনে মনে হিসেব কষে যুগল বলল, 'পোলাপান মিলাইয়া তা একশ' ষাইট সত্তর হইব।'

বিনু জানালো, তার খুব ইচ্ছা কাল দুপুরে একসঙ্গে মুকুন্দপুরবাসীদের পাশাপাশি বসে খাবে। কারোর বাড়িতে আলাদা করে রান্না হবে না। এখানকার মেয়েরা সবাই মিলে রান্নাবান্না করবে। সমস্ত খরচ বিনুর।

কিছুক্ষণ হতবাক তাকিয়ে থাকে যুগল। তারপর বলে, 'অ্যাত মাইনষেরে খাওয়াইবেন ক্যান?'

বিনু বলে, 'অনেকদিন বাদে দেশের লোকজনের সঙ্গে দেখা হল। একসঙ্গে একটু আনন্দ করব। এই আর কি।'

'মেলা ট্যাকা খরচ হইব ছুটোবাবু—'

'কত আর? একশ' টাকায় হবে না?'

যুগল বলল, 'মাছ তো আর কিনন (কেনা) লাগব না। বিল থিকা ধইরা লইলেই হইব। কিননের মইদ্যে চাউল ডাইল আর আনাজপাতি। একশ' ট্যাকায় ভাইসা যাইব। আপনে খাইতে থাকেন। আমি অহনই বেবাকরে জানাইয়া আসি।' তার আর তর সইছিল না। খুশিতে, উত্তেজনায় ঘর থেকে বেরিয়ে ছুটতে ছুটতে বাইরের অন্ধকারে এবং কুয়াশায় মিলিয়ে গেল সে।

বেশ কিছুক্ষণ পর যুগল যখন ফিরে এল, বিনু আর কার্তিক গণেশের খাওয়া হয়ে গেছে। বাইরের উঠোনে আঁচিয়ে এসে বিনু বিছানায় বসে ছিল। পাখি এঁটো বাসনকোসন তুলে নিয়ে মাটির মেঝে পরিপাটি করে নিকিয়ে দিয়ে গেছে। একধারে সেই হেরিকেনটা জ্বলছে।

ঘরে বিনু ছাড়া এখন আর কেউ নেই। কার্তিক গণেশ পাখির সঙ্গে চলে গেছে পাশের ঘরে।

যুগলকে দেখে একটু হেসে বিনু বলে, 'খবর দেওয়া হল?'

যুগলের চোখেমুখে আনন্দ আর উত্তেজনার রেশ এখনও থেকেই গেছে। সে বলে, 'হ, দিয়া আসলাম। এইহানকার মানুষজন কত যে খুশি হইছে, বুঝাইয়া কইতে পারুম না। হেরা কী কয় জানেন ছুটোবাবু?'

'কী?'

'হ্যামকত্তায় রাইজদায় তেনার বাড়িত্ যে যাইত হেরে (তাকে) ঠাইসা খাওয়াইত। না খাইলে ছাড়ন ছুড়ন নাই। তেনার নাতি দাদুর ম্যাজাজখান পুরা পাইছে।'

বিনু হাসতে লাগল।

যুগল একটু গম্ভীর হয়ে এবার বলল, 'তয় একহান কথা—'

বিনু তার মুখের দিকে তাকায়। যুগলের বলার ভঙ্গিটা এবার কানে সামান্য বেসুরো লাগে। সে জিজ্ঞেস করে, 'কী কথা?'

'আমাগো এইহানে দুই ঘর বামন আছে। তেনারা আর হগলের লগে বইসা খাইতে চায় না। ভাবতে আছি, চাউল ডাইল মাছ তাগো ঘরে পাঠাইয়া দিমু। নিজেগোরটা (নিজেদেরটা) নিজেরা রাইন্ধা খাউক।' যুগল বলতে লাগল, 'দ্যাশ থিকা আইসা শিয়ালদা ইস্টিশানে পইড়া আছিল বচ্ছরখানেক। লঙ্গরখানায় কুন জাইতের (জাতের) না কুন জাইতের রান্ধা খিচোড়ি খাইছে। মুকুন্দপুরে আইসা হেগো (তাদের) মাথায় জাইত চাড়া দিয়ে উঠছে!'

যুগলের স্বরে ক্ষোভ, ধিক্কার এবং চাপা ক্রোধও। বিনু উত্তর দিল না। দেশভাগের পর লক্ষ লক্ষ মানুষ সর্বস্ব খুইয়ে কে কোথায় ছিটকে পড়ল, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড উথালপাতাল, কোনও কিছুই আর আগের জায়গায় নেই। তবু মুকুন্দপুরের দু'ঘর বামুন সুযোগ পাওয়ামাত্র জাতপাতের সেই পুরনো গোঁড়ামিতে ফিরে গেছে। মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল বিনুর।

একটু নীরবতা।

তারপর যুগল বলল, 'ঘুম নি পাইছে ছুটোবাবু? তমন্ত দিন কম তাফাল তো যায় নাই।'

সত্যিই ঘুম পাচ্ছিল। সেই দুপুর থেকে নানা জায়গায় ছোটাছুটির পর গা এখন ছেড়ে দিয়েছে।

pathagar.net

দু'চোখ জড়িয়ে আসছে। আস্তে মাথা নাড়ল বিনু, 'হ্যাঁ।'

যুগল ব্যস্তভাবে ঘর থেকে বেরিয়ে পাখিকে ডেকে নিয়ে এল। বিনুর বিছানায় মশারি খাটিয়ে তোষকের চারধারে নিখুঁত করে গুঁজে দিয়ে বলল, 'ঘরে হেরিকেন বাত্তি রইল। আপনে দরজায় খিল দিয়া শুইয়া পড়েন।' বেরিয়ে যেতে যেতে বলল, 'একহান কথা কই ছুটোবাবু—'

উৎসুক চোখে তাকাল বিনু।

যুগল বলে, 'রাইতে বাইরে যাওনের দরকার হইলে আতখা (হঠাৎ) বিছনা থিকা লাইমা পইড়েন না। হেরিকেন বাত্তি তো আঙ্গাইনা (জ্বালানো) থাকব। দেইখা শুইনা নীচে পা-ও রাখবেন। আমরা পাশের ঘরে থাকুম। আমাগো বরম (বরং) ডাইকেন—'

বিনু অবাক। বলে, 'কেন বল তো?'

ঘরের চারদিকের ক্যাঁচা বাঁশের বেড়াগুলোর দিকে আঙুল বাড়িয়ে যুগল বলে, 'ভালা কইরা দ্যাখেন—'

বিনু লক্ষ করল, বেড়াগুলো সব জায়গায় মেঝের মাটিতে গাঁথা নেই। কোথাও কোথাও চার পাঁচ আঙুল ফাঁক রয়েছে।

যুগল বলতে লাগল, 'ফাকগুলা দেখছেন তো? ওইর ভিতর দিয়ে রাইতে সাপ হান্দে (ঢোকে)। বিলান (বিল অঞ্চলের) জাগা। চাইর দিকে মেলা সাপ—'

বিনু শিউরে ওঠে, 'এর ভেতর তোমরা আছ কী করে?'

যুগল ভরসা দেবার সুরে বলে, 'এইর মইদ্যেই থাকতে হইব। আমাগো দ্যাশে সাপ আছিল না? যেইহানেই খাল বিল নদী জঙ্গল, হেইহানেই সাপ। তয় (তবে) রোজ কিন্তুক ঘরে সাপ হান্দে (ঢোকে) না। কুনো কুনো দিন আইসা পড়ে।'

'তোমরা বেড়ার ওই ফাঁকগুলো বুজিয়ে দিতে পার না?'

'দেই তো। কিন্তুক ইন্দুরে কাইটা দেয়। আবার বুজাই, আবার কাটে। উই ফুটাগুলা সাপের যাওন আসনের পথ। দুই চাইর দিনের ভিত্‌রে উইগুলান ফির বুজাইয়া ফালামু—'

বিনু আতঙ্কগ্রস্ত হলে কী হবে, যুগলের কিন্তু ঘরে সাপের আনাগোনা নিয়ে কোনও রকম দুশ্চিন্তাই নেই। একেবারে নির্বিকার। রাতে জমি-মালিকের সশস্ত্র বাহিনী উৎখাত করার জন্য আচমকা আচমকা হানা দেয়। চারপাশের জলায় জঙ্গলে সাপের ছড়াছড়ি। এমন এক ভয়ঙ্কর পরিবেশের সঙ্গে কী আশ্চর্য ভাবেই না ওরা মানিয়ে নিয়েছে। সব কিছুই যেন শ্বাসবায়ুর মতো সহজ আর স্বাভাবিক।

যুগল চলে যাবার পর দরজায় খিল দিয়ে শুয়ে পড়ল বিনু। নিমেষে নিবিড় ঘুমে তার চারপাশের পৃথিবী লুপ্ত হয়ে গেল।

'কালী মাঈকি—'

'জয়।'

'কালী মাঈকি—'

'জয়।'

হঠাৎ তুমুল শেরগোলে ঘুম ভেঙে গেল বিনুর। সঙ্গে সঙ্গে দরজায় অনবরত ধাক্কা, 'কপাট খোলেন ছুটোবাবু। তরাতরি—তরাতরি—'

যুগলের গলা। ঘুমচোখে প্রথমটা বিনু খেয়াল করতে পারল না, কোথায় আছে। পরক্ষণে সমস্ত মনে পড়ে গেল। যুগলের ডাকাডাকির মধ্যে এমন তীব্র ব্যগ্রতা রয়েছে যে বিনু চকিত হয়ে ওঠে। মশারি তুলে লাফ দিয়ে নীচে নেমে দরজা খুলে দেয়।

যুগল ঝড়ের গতিতে ঘরে ঢুকে কোনা থেকে একটা লাঠি আর টেটা নিয়ে মুহূর্তে বেরিয়ে যায়।

পেছন থেকে বিনু জিজ্ঞেস করে, 'কী হয়েছে যুগল? কী হয়েছে?'

দূর থেকে যুগলের গলা ভেসে আসে, 'পুঙ্গির পুতেরা আগুন লাগাইতে আসছে। আইজ হালাগো যমের দক্ষিণ দুয়ার দেখাইয়া ছাড়ুম। আপনে ঘর থিকা বাইর হইবেন না ছুটোবাবু—'

যমের দক্ষিণ দুয়ারের শাসানিটা আগে আরও একবার কি দিয়েছিল যুগল? মনে পড়ল না। বিনু পলকে আন্দাজ করে নেয়, জমি-মালিকের ঘাতকবাহিনী নির্ঘাত হানা দিয়েছে। শিরদাঁড়ার ভেতর দিয়ে শিহরন খেলে যায় তার।

ঘর থেকে বেরুতে বারণ করেছে যুগল। কিন্তু প্রবল উত্তেজনা বিনুকে এক ধাক্কায় বাইরে টেনে নিয়ে আসে।

গোটা মুকুন্দপুর জুড়ে প্রতিটি কোনা থেকে একই ধ্বনি উঠছে, 'কালী মাঈকি জয়, কালী মাঈকি জয়'। আওয়াজটা হেমন্তের কুয়াশাচ্ছন্ন আকাশ চিরে চিরে দিগ্‌দিগন্তে ছড়িয়ে পড়ছে। পুরুষমানুষরা কেউ ঘরে নেই। সকলের হাতেই মারণাস্ত্র। লাঠি, বল্লম, ল্যাজা। অনেকের হাতে মশাল। গলার শিরা ছিঁড়ে চিৎকার করতে করতে তারা মুকুন্দপুরের শেষ মাথায় কাতার দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে। মশালের আলো তাদের ক্রুদ্ধ, হিংস্র, উত্তেজিত মুখগুলোর ওপর ঝলকে যাচ্ছে।

অনেকটা দূরে, পশ্চিম দিকে ধানখেত যেখানে শুরু, সেখানে দাঁড়িয়ে আছে আরেকটা দল। তাদের হাতেও রকমারি অস্ত্র এবং মশাল। তবে ওরা পনের বিশ জনের বেশি হবে না। মুকুন্দপুরের বিশাল প্রতিরোধ-বাহিনী দেখে তারা এগুতে ভরসা পাচ্ছে না। দু'পক্ষই নিজের নিজের জায়গায় অনড় দাঁড়িয়ে একটানা অকথ্য খিস্তিখেউড় করে চলেছে। এ যেন এক আদিম রণভূমি।

'হুমুন্দির পুতেরা, এক কাইক যদিন আউগাস (এগোস), মায়ের প্যাটে ফির হান্দাইয়া দিমু—'

ও পক্ষও নীরব নেই। ওরা কী জবাব দিচ্ছে, এতদূর থেকে বোঝা যায় না। তবে সেগুলো নিশ্চয়ই শাস্ত্রবাক্য নয়।

বড় চত্বরে সব ঘর থেকে বউ ঝি বুড়োবুড়ি এবং বাচ্চাকাচ্চারা বেরিয়ে এসেছিল। তারা উদ্‌ভ্রান্তের মতো ছোটাছুটি করছে। কেউ কেউ সমানে কাঁদছে।

হতবুদ্ধি বিনু পলকহীন তাকিয়ে থাকে। কী করবে, ভেবে পায় না। হঠাৎ তার চোখে পড়ে, যুগলদের উঠোনের এক কোণে দুই ছেলেকে জড়িয়ে ধরে দাঁড়িয়ে আছে পাখি। জড়সড়, সন্ত্রস্ত।

পাখিও বিনুকে দেখতে পেয়েছিল। কাঁপা গলায় বলল, 'আপনে বাইর হইছেন ক্যান? কাত্তিক গণশার বাপে আমারে নজর রাখতে কইয়া গ্যাছে। আপনে য্যান ঘরের ভিত্‌রে থাকেন। যে কুনো সোময় খুনাখুনি বাইধা যাইতে পারে।'

বিনু বলল, 'আমার জন্যে তোমাকে চিন্তা করতে হবে না। ছেলেদের নিয়ে ঘরে যাও।'

বিনুর কণ্ঠস্বরে হুকুমের মতো কিছু ছিল, পাখির আর কিছু বলতে সাহস হয় না। নিঃশব্দে দুই ছেলের হাত ধরে তাদের ঘরে চলে যায়। বিনু উঠোনেই দাঁড়িয়ে থাকে।

ওদিকে নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে দু'পক্ষের মধ্যে বাংলা ভাষার বাছা বাছা কিছু গালাগালির আদান প্রদান চলে। যে শব্দপুঞ্জের সৃষ্টি হয় তা হেমন্তের বাতাসকে বিষিয়ে তোলে। তবে নৈশ যুদ্ধটা শেষ পর্যন্ত হতে হতেও হয় না। বেগতিক বুঝে হানাদারেরা ধানখেত পেরিয়ে উধাও হয়ে যায়।

মুকুন্দপুরের পদাতিক বাহিনী ফিরে এসে মশাল নিবিয়ে যে যার ঘরে চলে যায়। বিশাল চত্বরটা ফাঁকা হয়ে গেছে। বুড়োবুড়ি, অল্প বয়সের ছেলেমেয়ে, বউ-ঝি, এখন আর কেউ নেই।

উঠোনেই দাঁড়িয়ে ছিল বিনু। যুগল ফিরে এল, 'আমি জানতাম, চিল্লামিল্লি শুইনা ছুটোবাবু কিছুতেই ঘরে বইসা থাকব না। পাখি আপনেরে বাইর হইতে না করে নাই? আমি যে অরে অত কইরা কইয়া গ্যালাম।'

বিনু জানায়, অবশ্যই পাখি তাকে ঘরে থাকতে বলেছিল। সে তার বারণ শোনে নি। হইচই শুনে ওরাও বেরিয়ে পড়েছিল। বিনুই বরং ওদের জোর করে ঘরে পাঠিয়ে দিয়েছে।

যুগল বলল, 'আর ওসে খাড়াইয়া থাইকেন না। ভিত্‌রে চলেন।' দু'জনে বিনুর ঘরে আসে। যুগল বলে, 'নিজের চৌখে দেখলেন তো, আমরা ক্যামন কইরা বাইচা আছি।'

বিনু বিছানায় বসতে বসতে বলে, 'কাল রাতে এখানকার সবাই ঘুমিয়ে পড়েছিল। জমিদারের গুণ্ডারা যে এসেছে, টের পেলে কী করে?'

'আপনেরে কইছিলাম না, পালা কইরা রাইত জাইগা আমরা নজর রাখি। কাইল যাগো পালা আছিল হেরা শুয়োরের পুতেগো দেইখা 'কালী মাঈকি জয়' ধ্বনি দিয়া বেবাকেরে সজাগ কইরা দিছে। হেরপর মা কালীর নাম লইয়া লাঠি সড়কি হাতে আমরা চাইর দিক থিকা বাইর হইয়া পড়লাম।'

বিনুর মনে পড়ে গেল, গত বেস্পতিবার সুধাদের বাড়িতে যুগল এই ধরনের নজরদারির কথা বলেছিল বটে।

যুগল বলল, 'আপনে আসছেন। আর শালারা আইজই আতখা (আচমকা) আগুন ধরাইতে আসল। আপনের কাচা ঘুমটা ভাইঙ্গা গ্যাছে। আর জাইগা থাকবেন না। শরীল খারাপ হইব। দুয়ার বন্ধ কইরা শোন—'

যুগল চলে যাবার পর দরজায় খিল আটকে ফের শুয়ে পড়ে বিনু।

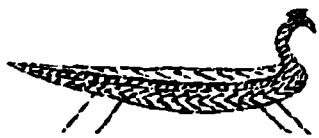

ঘুম ভাঙতে আজ অনেক বেলা হয়ে গেল। দূর থেকে পাখপাখালির অবিরল কিচিরমিচির ভেসে আসছিল। মানুষজনের গলাও শোনা যাচ্ছে।

চোখ মেলে বিনু দেখতে পেল, ক্যাঁচা বাঁশের বেড়ার ফাঁক দিয়ে সোনালি ফিতের মতো রোদের অজস্র ফালি ঘরের ভেতর এসে পড়েছে।

ধড়মড় করে উঠে বসল সে। ক'টা হাই তুলে বিছানা থেকে দ্রুত নেমে দরজা খুলল। বাইরের উঠোনে যুগলরা তো রয়েছেই, মুকুন্দপুরের আরও ক'জন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলছে। দূরের চত্বরে প্রচুর লোকজন চোখে পড়ছে।

চকিতে বিনুর মনে পড়ে গেল, আজ এখানকার কেউ কাজে বেরুবে না। সে তাদের খাওয়াবে। যাবতীয় খরচ তার। কালই টাকাটা দিয়ে দেওয়া উচিত ছিল। খেয়াল ছিল না।

বিব্রত বিনু ডাকতে লাগল, 'যুগল—যুগল—'

যুগল দৌড়ে এল, 'ঘুম ভাঙল ছুটোবাবু?'

'এত বেলা হয়েছে। আমাকে ডাকো নি কেন?'

'কাইল রাইতে অ্যামন তাফাল গেল। ঘুমাইছেন দেরিতে। হেইর লেইগা আর জাগাই নাই।'

'এস, টাকা নিয়ে যাও। এতগুলো লোক খাবে। জিনিসপত্র কেনার ব্যবস্থা করতে হবে। কখন কী করবে?'

ঘরের ভেতর চলে এসেছিল দু'জনে। যুগল হেসে বলল, 'চিন্তা কইরেন না ছুটোবাবু। মাছের বন্দবস্ত হইয়া গ্যাছে। কাইল রাইতে কইয়া রাখছিলাম, আইজ ভোরে উইঠা বারইগো পানবল্লভ (প্রাণবল্লভ), আমার বইনের জামাই ধনঞ্জয়, অ্যামন চাইর পাঁচ জনে জাল নিয়া বিলে নামছিল। চাইরটা আলিসান কাতল আর ছয়টা বোয়াল মারছে।' সে আরও জানায়, এদিকের তোড়জোড় পুরোদমে চলছে। বিনুর টাকাটা পাওয়া গেলেই কয়েকজনকে আগরপাড়ার বাজারে পাঠানো হবে। তারা চাল ডাল আনাজ তেল মশলাপাতি কিনে আনবে। কতক্ষণ আর লাগবে? বড় জোর আড়াই তিন ঘণ্টা।

এ ঘরের বিলের দিকের জানালাটা কাল রাতে বন্ধ করে রাখা হয়েছিল। সেটার পাশে দু'টো আংটায় বিনুর কাপড়ের ঝোলা এবং জামা ঝোলানো রয়েছে। জামার পকেটে আছে তার মানি-ব্যাগ।

বিনু জামাটা আনতে যাচ্ছিল, হঠাৎ তার হাতটা ধরে টেনে রাখে যুগল। ত্রস্ত সুরে চেঁচিয়ে ওঠে, 'যাইয়েন না, যাইয়েন না। উই দ্যাখেন—' বলে আঙুল বাড়িয়ে দেয় সে।

আংটার পাশে যে দড়ি দিয়ে মশারিটা বিলের দিকের বেড়ার গায়ে বাঁধা রয়েছে সেটা পেঁচিয়ে রয়েছে গায়ে হলুদ হলুদ রেখা-ওলা কালো রঙের একটা সাপ। বিনু চমকে ওঠে।

যুগল বলে, 'আপনেরে কইছিলাম না, শালার পুতেরা রাইতের আন্ধারে ঘরে হান্দে (ঢোকে)।' বলে

অস্ত্র টস্ত্র যে কোণটায় থাকে সেখান থেকে একটা লাঠি এনে দড়িতে জোরে জোরে ক'টা ঝাঁকি মারল। সাপটা মাটিতে পড়ে প্রচণ্ড আক্রোশে লেজে ভর দিয়ে, বিশাল ফণা তুলে দাঁড়িয়ে পড়ে। ছোবল মারার জন্য অল্প অল্প ফণাটা দুলছে। সেটার চোখদু'টো চুনির মতো জ্বলছে।

যুগল সাপটাকে এতটুকু সুযোগ দিল না। বিদ্যুৎগতিতে লাঠির এক বাড়িতে প্রথমে ওটার কোমর ভেঙে ফেলল। তারপর ঘায়ের পর ঘা। সাপের ইহলীলা লহমায় শেষ।

বিলের দিকের জানালা খুলে, মরা সাপটাকে লাঠির ডগায় তুলে বাইরে ফেলে দিতে দিতে বলল, 'ঘরে য্যামন হান্দছিলি (ঢুকেছিলি), তরে নিপাত করলাম।' লাঠিটা জায়গামতো রেখে এসে বলে, 'পাখি উঠানে আপনের মুখ ধোওনের লেইগা বালতিতে জল আইনা রাখছে। মুখ ধুইয়া চা চু খাইয়া লন। কাইল আমাগো এই জাগাখান দেখাইতে পারি নাই। আইজ ঘুরাইয়া দেখামু।'

অবাক বিস্ময়ে যুগলের কাণ্ডকারখানা দেখছিল বিনু। এমন একটা বিষধর সাপ মারার পরও পুরোপুরি নির্বিকার। এ সব যেন তার কাছে জলভাত। অদ্ভুত এক ঘোরের মধ্যে মানি-ব্যাগ বার করে যুগলকে টাকা দিল সে।

যুগল চলে গেল।

মুখটুখ ধুয়ে এসে বাসি জামাকাপড় ছেড়ে পাজামা পাঞ্জাবি পরে নিল বিনু। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে পাখি চা আর বেতের সাজিতে সকালের খাবার নিয়ে এল। চিঁড়েভাজা, নারকেল কোরা আর এখো গুড়।

খাওয়া যখন শেষ, যুগল আবার ফিরে এসে তাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

উঠোন পেরিয়ে বিশাল চত্বরটায় এসে বিনুর চোখে পড়ল, সারা মুকুন্দপুর ওখানে ভেঙে পড়েছে। চারদিকে তুমুল ব্যস্ততা। পৌনে দু শ'র মতো মানুষ খাবে, তারই তোড়জোড় চলছে। বয়স্ক ক'জন মেয়েমানুষ চত্বরের এক কিনারে গর্ত খুঁড়ে, ইট পেতে বিরাট বিরাট আখা বানাচ্ছে। সেগুলোর পাশে স্তূপাকার শুকনো লকড়ি। লকড়িগুলো জ্বালিয়ে রান্নাবান্না হবে। আরেক দিকে অন্য একটা দল বড় বড় বঁটি পেতে বসেছে। তাদের সামনে বিশাল বিশাল পাহাড়প্রমাণ কাতলা আর বোয়াল কাতার দিয়ে শোয়ানো রয়েছে। ভোজের জন্য এগুলোই ভোরবেলা বিল থেকে ধরা হয়েছে। এবার তাদের কাটা হবে।

পুরুষরা অনেকেই বিল থেকে বালতি বালতি জল এনে রাখছে। রান্নার কাজে লাগবে। কেউ কেউ কোত্থেকে যেন নিয়ে আসছে গোছা গোছা কলাপাতা। বেশির ভাগই উদ্দেশ্যহীনের মতো এধারে ওধারে ঘোরাঘুরি করছে। নানা জায়গায় ছোট ছোট জটলা। তারা জোর আড্ডা জমিয়েছে।

এখানকার যত কাচ্চাবাচ্চা, সব পুরো চত্বর তোলপাড় করে বেড়াচ্ছে। তাদের সঙ্গে জুটেছে একপাল কুকুর। সেগুলোও বাচ্চাদের পেছন পেছন ছুটছে।

সমস্ত এলাকা জুড়ে উৎসব উৎসব ব্যাপার। কে বলবে, কাল হানাদারেরা যখন নতুন বসতিতে আগুন ধরিয়ে এখানকার মানুষজনকে উৎখাত করতে আসে, আতঙ্কে উত্তেজনায় সব থমথম করছিল। পুরুষেরা অবশ্য জমি-মালিকের ভাড়াটে বাহিনীর সঙ্গে লড়ার জন্য ছুটে গিয়েছিল। মেয়েরাও বেরিয়ে পড়েছিল।

রাতারাতি অলৌকিক কোনও ভোজবাজিতে সব কিছু পালটে গেছে।

যেখানে বড় বড় মাছগুলো ফেলে রাখা হয়েছে, বিনুকে নিয়ে প্রথমে সেখানে চলে এল যুগল। 'দ্যাখেন ছুটোবাবু, মাছ দ্যাখেন। একেকটার ওজন আট দশ স্যারের (সেরের) কম হইব না। অ্যামন মাছ আপনে বডারের এই পারে আর কুনোহানে পাইবেন না।'

যুগলের উচ্ছ্বাস দেখে সামান্য হাসে বিনু। কিছু বলে না। তার চোখে পড়ল, মাছ কাটুনিদের মধ্যে পতিতপাবন আর হরিন্দর বউরাও রয়েছে। একটা রাত পেরুতে না-পেরুতেই তারা এখানকার মানুষজনের সঙ্গে মিশে গেছে। খুব ভাল লাগল বিনুর।

মাছ দেখানো হলে যুগল বলল, 'চলেন, এইবার অন্যহানে যাই—'

ওরা বিলের দিকে হাঁটতে শুরু করে। এর মধ্যে অনেকেই তাদের সঙ্গ নিয়েছে। সবার মুখেই এক কথা।

pathagar.net

'দ্যাশভাগের পর অ্যামন আনন্দ আর কুনোদিন পাই নাই। হগলই হ্যামকত্তার নাতির লেইগা—'

চারপাশের মেয়েরা কেউ অবশ্য কিছু বলছিল না। শুধু লাজুক মুখে হাসছিল। তাদের চোখে অপার খুশির ঝলক।

বিলের পাড় ধরে পুব দিকে, বসতির শেষ মাথায় চলে আসে বিনুরা।

এরপর একদিকে বিল, বিলের ধার ঘেঁষে উদ্দাম কচুবন। পানিকচু, শোলাকচু, খারকন। তা ছাড়া আছে প্রায় মাইলখানেক জুড়ে বেতঝোপ। কালো কালো মুক্তাবন। চাপ-বাঁধা হোগলা বন। তারপর থেকে নিবিড় জঙ্গল। কত রকমের যে গাছ! নিম নিশিন্দা বট অর্জুন শিশু পাকুড় পিটক্ষিরা ডেউয়া বুনো কলা—এমনি অজস্র। গাছগুলোকে আষ্টেপৃষ্ঠে পেঁচিয়ে রয়েছে হাজার ধরনের লতা। অনেকগুলো গাছের ডালপালা থেকে নোলকের মতো ঝুলছে বুনো ধুঁদুল আর লাল টুকটুকে তেলাকুচ।

জঙ্গলের ভেতরটা অন্ধকার। গাছপালা ঝোপঝাড় এত ঘন যে রোদ ঢোকে না। সেখান থেকে কত রকমের আওয়াজ যে ভেসে আসছে! ঝিঁঝির ডাক। তক্ষকের ডাক। ঘুঘুর ডাক। ডাহুকের কর্কশ চিৎকার। অগুনতি পাখির ডানা ঝাপটানোর শব্দ, শুকনো পাতার ওপর দিয়ে সরীসৃপদের বুক টেনে চলার শব্দ, নাম না-জানা জন্তুদের ছুটে যাওয়ার শব্দ—সব মিলিয়ে বনভূমি জুড়ে বিচিত্র পাঁচমেশালি ধ্বনি। হঠাৎ মামুদপুরের কথা মনে পড়ে গেল বিনুর। ঘাতক বাহিনীর ভয়ে নদীর ধারে জঙ্গলের ভেতর তাদের রাত কাটাতে হয়েছিল। সেখানেও অবিকল এই ধরনের সব শব্দ তার কানে এসেছে।

যুগল কচুর ঝাড়গুলো দেখিয়ে বলল, 'কত কিসিমের কচু দেখছেন ছুটোবাবু! মুকুন্দপুরের মাইনষে এক বচ্ছর খাইয়াও শ্যাষ করতে পারব না।'

বিনুর মনে পড়ল, কাল রাত্তিরে মাছের মাথা দিয়ে কচুর ঘন্ট রেঁধেছিল পাখি। নিশ্চয়ই এই বিলের পাড়ের কচু। সে একটু হাসল। আর তখনই চোখে পড়ল, কচুবন আর বেতঝোপের গা ঘেঁষে কত যে গর্ত তার লেখাজোখা নেই।

বিনু জিজ্ঞেস করল, 'ওগুলো কিসের গর্ত?'

'ইন্দুরের। তয় থাকে সাপেরা।'

'বুঝলাম না।'

যুগল বুঝিয়ে দিল। ইঁদুরের খোঁজে সাপ গর্তে ঢুকে তাদের খেয়ে নিজেরা সেখানে আস্তানা গাড়ে।

ভয়ে ভয়ে গর্তগুলো দেখতে থাকে বিনু।

যুগল এবার জঙ্গলের দিকে আঙুল বাড়ায়, 'এই যে বনহান দেখতে আছেন, এইটা মাইল তিনেক জাগা জুইড়া। বছর দুইয়ের মইদ্যে এইর এট্টা গাছও আর থাকব না। বেবাক সাফ হইয়া যাইব।'

'কেন?'

যুগল জানায়, কাল পতিতপাবন আর হরিন্দরা এসেছে। পরে শিয়ালদা স্টেশন এবং রিফিউজি ক্যাম্পগুলো ঘুরে ঘুরে সে রাজদিয়া অঞ্চলের আরও অনেককে খুঁজে খুঁজে নিয়ে আসবে। এত মানুষের থাকার ব্যবস্থা করতে হবে না? সে জন্য জমি চাই। প্রচুর জমি। জঙ্গল নির্মূল না করলে সেই জমি কোথায় পাওয়া যাবে? গাছপালা কেটে, সাপখোপ মেরে, হিংস্র বুনো জন্তু তাড়িয়ে মুকুন্দপুরের সীমানা অবিরাম প্রসারিত করে যেতে হবে। গড়ে তুলতে হবে অসংখ্য বাসস্থান। ছিন্নমূল মানুষের জন্য এই আদিম, বিজন বনভূমিতে পরিপূর্ণ এক বসুন্ধরা।

এই জবরদখল বসতি ক্রমাগত বাড়িয়ে চলার কথা বলতে বলতে হঠাৎ কী ভেবে উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে যুগল, 'ছুটোবাবু, আমার একহান কথা রাখতেই হইব।'

বিনু জিজ্ঞেস করে, 'কী কথা?'

'জঙ্গল সাফ করনের পর যে জমিন বাইর হইব, হেইর থিকা আপনেরে কয়েক কাঠা লইতে হইব।'

অন্য যারা বিনুদের সঙ্গে জঙ্গলের এই প্রান্তে চলে এসেছে, এতক্ষণ তারা চুপচাপ ছিল। তাদের ভেতর থেকে কে যেন বলে ওঠে, 'না কইরেন না বিনুবাবু—'

মুখটা ডান পাশে ফেরাতেই বিনুর চোখে পড়ল, ভিড়ের ভেতর হরনাথ কুণ্ডু। কাল রাতে যুগলদের

ঘরে এসে আলাপ করে গিয়েছিল, তারপর এখন তাকে ফের দেখা গেল।

বাকি সবাই যুগল এবং হরনাথের কথায় সায় দেয়। বিনুকে জমি নিতেই হবে।

কয়েক পলক অবাক তাকিয়ে থাকে বিনু। যুগল এবং মুকুন্দপুরের অন্য সব বাসিন্দা আচমকা এমন একটা অনুরোধ করে বসবে, ভাবা যায় নি। সে একেবারেই প্রস্তুত ছিল না। বিস্ময়ের ধাক্কাটা সামলে নিয়ে বলল, 'আমি থাকব কলকাতায়। সেখানে আমার দিদিরা আছে, বাবা আছে। চাকরি বাকরিও ওখানেই করতে হবে। এতদূরে জমি নিয়ে কী করব?'

যুগল বোঝায়, পাকিস্তান থেকে লাখ লাখ মানুষ চলে আসছে। দু'পাঁচ বছরের মধ্যে সীমান্তের এপারে দশ হাত জায়গাও ফাঁকা থাকবে না। অযাচিতভাবে মুকুন্দপুরের জমিটা যখন পাওয়াই যাচ্ছে, যার জন্য একটা পয়সাও দাম দিতে হবে না, ভবিষ্যতের কথা ভেবে সেটা নেওয়াই হবে বুদ্ধিমানের কাজ।

যুগল বলতে থাকে, 'আপনেরে কিছুই করতে হইব না ছুটোবাবু। জঙ্গল সাফ হইলে আপনের নামে সাত কাঠা জমিন মাইপা, খুটি কুইপা (পুঁতে) সীমানা ঠিক কইরা দিমু।'

বিব্রত বিনু বলে, 'কোনও দিন আমার পক্ষে এখানে এসে বাড়ি তৈরি করে থাকা সম্ভব নয়। শুধু শুধু কেন জমি দিতে চাইছ? আমাদের একটা বাড়ি তো কলকাতায় আছে। যাদের অনেক বেশি দরকার, বর্ডারের এপারে মাথা গোঁজার জায়গা নেই, তাদের বরং জমিটা দিও। সেটাই সত্যিকারের ভাল কাজ হবে।'

যুগল জেদের সুরে বলে, 'ঘর তোলেন না-তোলেন, উই জমিন আপনেরই থাকব। অন্য কেওরে (কাউকে) দিমু না।'

বিনু ধরেই নেয়, যুগলের মাথায় যে গোঁ চেপেছে সেটা থেকে তাকে টলানো যাবে না। চিরকালই সে আবেগের ঝোঁকে চলে। কোনও ওজর, কোনও যুক্তিই সে কানে তোলে না।

অসহায়ের মতো বিনু বলল, 'এর কোনও মানে হয়?'

ওধার থেকে হরনাথ বলল, 'চলেন, আপনের নামহান লেইখা রাখি।'

বিনু বিমূঢ়ের মতো জিজ্ঞেস করে, 'কোথায় যাব? নাম লেখাবার কারণটা কী?'

'গ্যালেই বুঝতে পারবেন।'

জঙ্গল পেছনে ফেলে, বসতির ভেতর এক কোণে একটা টালির ছাউনিওলা দোচালা ঘরে বিনুকে নিয়ে আসে হরনাথেরা। দরজার মাথায় টিনের পাতের ওপর লেখা ঃ 'মুকুন্দপুর বাস্তুহারা কল্যাণ সমিতি'।

হরনাথ বলল, 'এইটা হইল আমাগো কুলোনির অফিস।'

ঘরের ভেতর মাঝারি সাইজের সস্তা একটা টেবল, দু'তিনটে নড়বড়ে কাঠের চেয়ার। একধারে আধভাঙা পুরনো আলমারি, ক্যাঁচা বাঁশের বেড়ার গায়ে এ বছরের ক্যালেণ্ডার ঝোলানো। ক্যালেণ্ডারটা যেদিকে, তার উলটো দিকের বেড়ায় কয়েক জন বরেণ্য দেশনেতার ছবি। দেশবন্ধু গান্ধীজি সুভাষচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথ।

বিনু যুগল আর হরনাথ ঘরের ভেতর চলে এসেছিল। বাকিরা সব দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আছে।

বিনুকে একটা চেয়ারে বসিয়ে আলমারি থেকে একখানা মোটা, লম্বা, বাঁধানো খাতা বার করে টেবলে রেখে নিজেও বসল হরনাথ। বলল, 'কারা কারা কোন কোন তারিখে মুকুন্দপুর কুলোনিতে আইসা ঘর তুলছে, তাগো ফেমিলিতে কতজন কইরা মেম্বার, দ্যাশভাগের আগে বর্ডারের উই পারে কুন কুন গেরামে হেরা থাকত, কারে কতটুক জমিন দেওয়া হইছে, এই হগল খাতায় লেইখা রাখছি। একটা রেকর্ড থাকন ভাল, না কি ক'ন?'

আস্তে মাথা নাড়ে বিনু।

হরনাথ বলতে লাগল, 'গভর্নমেন্ট রিফুজিগো লেইগা নানারকম প্ল্যান করতে আছে। এই রেকর্ড দেখাইলে পরে হয়তো সুযুগ সুবিধা মিলতে পারে।'

লোকটা দূরদর্শী। ভবিষ্যতের কথা ভেবে নিখুঁতভাবে এখানকার উদ্বাস্তুদের সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্য লিখে রাখছে। হরনাথকে বেশ ভাল লাগল বিনুর।

হরনাথ খাতা এবং কলম খুলে একটা ফাঁকা পাতা বার করে এবার বলল, 'আপনের নাম, কইলকাতার ঠিকানা, বাবার নাম, দ্যাশ থিকা কবে আসছেন কইয়া যান—'

'মুকুন্দপুর বাস্তুহারা কল্যাণ সমিতি'র অফিসে টেনে আনার উদ্দেশ্য এবার পরিষ্কার হয়ে যায়। যুগল হরনাথ এবং এখানকার অন্য সকলে আন্তরিকভাবেই চাইছে, সে তাদেরই একজন হয়ে যাক। আত্মসমর্পণ ছাড়া উপায় নেই। হরনাথের প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যায় বিনু।

প্রশ্নোত্তর পালা শেষ হলে একটা ফাঁকা ঘরে হরনাথ লিখল, 'পুব দিকের জঙ্গল সাফ হইবার পর শ্রী বিনয়কুমার বসুকে সাত কাঠা জমি দেওয়া হইবে।'

লেখালিখির পালা চুকলে খাতা বন্ধ করল হরনাথ। বলল, 'আপনের লাখান বিদ্বান মাইনষের নাম রেকর্ডে থাকলে গভর্নমেণ্টের কাছে আমাগো জোর বাড়ব।'

বিনু সামান্য হাসল।

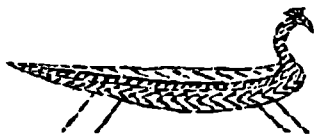

রান্নাবান্না শেষ হতে বেলা হেলে গেল। এবার খাওয়াদাওয়ার পালা।

সামনের বিশাল চত্বরটায় মুকুন্দপুরের পুরুষ আর বাচ্চাদের কাতার দিয়ে বসিয়ে দেওয়া হল। মাটিতে বসে কলাপাতায় খাওয়ার ব্যবস্থা। একমাত্র বিনুর জন্যই পাখি কালকের সেই ফলতোলা আসনটা এনে দিয়েছে।

মেয়েরা নিপুণ হাতে পরিবেশন করছে। পুরুষদের খাওয়া শেষ হলে তারা খাবে।

পদ খুব বেশি নয়। মসুর ডাল, নানারকম আনাজ দিয়ে পাঁচমেশালি একটা তরকারি, কাতলা মাছের ঝোল এবং বোয়াল মাছের পাতুরি।

হই হই করে সবাই খাচ্ছে। সেই সঙ্গে নানা গল্প। ঠাট্টা। মজার মজার কথায় ভোজসভার এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত হাসির লহর উঠছে ক্ষণে ক্ষণে। আর শতমুখে শুধু বিনুর নাম। হেমকর্তার নাতি হেমকর্তার মনই পেয়েছে। পাঁচ শ' হাত চওড়া একটা মন।

মাত্র এক শ'টা টাকা খরচ হয়েছে বিনুর। আর তাতেই মুকুন্দপুরবাসীদের মুখে প্রাণখোলা হাসি ফোটাতে পেরেছে। অম্লান, অফুরান হাসি।

চারপাশের হাস্যোজ্জ্বল মুখগুলো দেখতে দেখতে বিচিত্র আবেগে বুকের ভেতরটা তোলপাড় হতে থাকে বিনুর।

পুরুষদের পর মেয়েরা। তাদের খাওয়া যখন শেষ হল, সূর্য পশ্চিম আকাশে অনেকখানি ঢলে পড়েছে। হেমন্তের মরা রোদ দ্রুত জুড়িয়ে যাচ্ছে।

হঠাৎ ঝিনুককে মনে পড়ল বিনুর। কাল এখানে আসার পর রাজদিয়া অঞ্চলের পরিচিত মানুষজনকে কাছে পেয়ে আবেগে, আনন্দে ভেসে গিয়েছিল। ঝিনুকের কথা ভাবতেই সীমাহীন ব্যাকুলতা বোধ করে সে। মনে মনে ঠিক করে ফেলে, আজই কলকাতায় ফিরে যাবে। যুগলকে তা জানাতেই সে হুলস্থূল বাধিয়ে দেয়, 'এই কথা তো আছিল না ছুটোবাবু। আইজের (আজকের) দিন থাইকা কাইল যাইবেন। কিছুতেই আইজ আপনেরে ছাড়ুম না।'

মুকুন্দপুরের অন্য বাসিন্দারা যুগলের সঙ্গে সুর মেলায়। আজ কোনওভাবেই বিনুকে যেতে দেবে না।

কাল সুধাদের বাড়িতে একরকম জেদই ধরেছিল যুগল। বিনুকে মুকুন্দপুরে নিয়ে সাত আটদিন নিজেদের কাছে রাখবে। বিনু অতদিন থাকবে না। শেষ পর্যন্ত হিরণ রফা করে দিয়েছিল, আজকের দিনটা থেকে কাল চলে যাবে বিনু। কিন্তু আজই সে ফিরে যেতে চাইছে।

যুগল অবুঝ, একগুঁয়ে বালকের মতো হাত-পা ছুড়ে, মাথা ঝাঁকিয়ে বলতে থাকে, 'কত বচ্ছর পর আপনেরে কাছে পাইছি। আইসাই চইলা যাইবেন, হেয়া হইব না, হইব না, হইব না।'

কেন বিনু আজই ফিরে যাবে, যুগলকে তা বলা যায় না। সেই ছেলেবেলা থেকে সে দেখে

আসছে, ঝিনুক চিরদুঃখী। মা-বাবার তিক্ত সম্পর্ক তাকে আচ্ছন্ন করে রাখত। যেন এক নিষ্প্রাণ প্রতিমা। সারাক্ষণই প্রায় চুপচাপ।

অন্য সবার সামনে যেমনই হোক, যত নিঝুম বা জড়সড়, হেমনাথ স্নেহলতা আর বিনুর কাছে সে একেবারেই অন্য মানুষ। তার মধ্যে যে একটা গোপন জলপ্রপাত আছে, এই তিনজনই শুধু সেটা বার করে আনতে পারত। তাদের সঙ্গে ওর যত হাসি, কল কল করে যত কথা, তাদের কাছে তার যত আবদার। বড় হবার পর থেকে মেয়েটাকে অপার মায়ায়, অফুরান সহানুভূতিতে ঘিরে রেখেছে বিনু। আর বিনুকে, একমাত্র বিনুকেই শত হাতে আঁকড়ে ধরেছে ঝিনুক।

সবই ঠিক ছিল। মসৃণ নিয়মে প্রিয় নারীটিকে আরও নিবিড় করে পেয়ে যেত বিনু। ঝিনুকের যাবতীয় ক্লেশেরও হয়তো অবসান ঘটত। কিন্তু এই সেদিন ঢাকা থেকে যখন তাকে উদ্ধার করে আনা হল, ঝিনুক যেন এক ভগ্নস্তূপ। শারীরিক সর্বনাশ যতটুকু হয়েছে তার সহস্র গুণ ক্ষতি হয়েছে মনের দিক থেকে। ঝিনুক তখন প্রায়-উন্মাদ। বিধ্বস্ত। তাকে কত যত্নে কত শুশ্রূষায় যে খানিকটা স্বাভাবিক করে তোলা হয়েছে, বিনুর চাইতে কে আর তা বেশি জানে!

তারপর তো কলকাতায় পাড়ি। কিন্তু সুনীতিদের বাড়ি এসে মেয়েটাকে কী লাঞ্ছনাই না ভোগ করতে হয়েছে! সুধারা অবশ্য গভীর মমতায় তাকে কাছে টেনে নিয়েছে। হাসিখুশি, স্বাভাবিক, শঙ্কাহীন ঝিনুককে ওদের কাছে রেখে মুকুন্দপুরে এসেছে বিনু। সুধাদের দিক থেকে দুর্ভাবনা নেই। কিন্তু এই যে প্রায় দেড়টা দিন সে ঝিনুকের কাছে নেই, এর ভেতর রাজদিয়া এলাকার কেউ যদি সুধাদের বাড়ি গিয়ে থাকে? সুধারা তো জানে না, কার কোন কথায়, সামান্য কোন ইঙ্গিতে ফের কুঁকড়ে যাবে ঝিনুক, শক্ত খোলার ভেতর নিজেকে গুটিয়ে নেবে, ফিরে যাবে ঢাকার সেই ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্নের দিনগুলোতে। তাকে পুরোপুরি সুস্থ এবং স্বাভাবিক করে তোলার এত যত্ন, এত প্রয়াস, সব ব্যর্থ হয়ে যাবে। না, ঝিনুকের কাছ থেকে বেশিক্ষণ দূরে থাকা ঠিক নয়।

যুগল তো বটেই, মুকুন্দপুরের বাসিন্দারা প্রচুর কাকুতি মিনতি করল, হাতে পায়ে ধরল, কিন্তু বিনুকে কিছুতেই আটকানো গেল না।

হরনাথ বলল, 'দিন তো ফুরাইয়াই আসছে। আর একহান রাইত থাইকা গ্যালে আমরা বড় আনন্দ পাইতাম।'

বিনু বলল, 'কলকাতায় আমার খুব দরকারী কাজ আছে। না গেলেই নয়।' মিথ্যেই বলেছে সে। না বলে উপায়ই বা কী। চলে যাবার একটা ওজর তো চাই।

যুগল আর একটা কথাও বলল না। একেবারে গুম মেরে গেছে। ছোটবাবুর ওপর তার বড় অভিমান। আরেকটা রাত থেকে গেলে মহাভারত অশুদ্ধ হত না, আকাশ মাথার ওপর খান খান হয়ে ভেঙে পড়ত না। কলকাতায় কী এমন দরকার যে আজকের রাতটা থেকে যেতে পারবে না?

বিনু আর দেরি করল না। পাখি তার বাসি জামাকাপড় ধুয়ে, শুকিয়ে পাট করে রেখেছিল। সেগুলো কাপড়ের ব্যাগে পুরে বেরিয়ে পড়ল।

শেষ পর্যন্ত অভিমান করে থাকা গেল না। থমথমে মুখে যুগল বলল, 'যাইবেনই যহন, চলেন আপনেরে কইলকাতায় পৌছাইয়া দিয়া আসি।'

বিনু যুগলের কাঁধে একখানা হাত রেখে হেসে হেসে খুব নরম গলায় বলল, 'রাগ কোরো না। সত্যিই আমার জরুরি কাজ আছে। নইলে থেকে যেতাম।'

'আর কি মুকুন্দপুরে আপনেরে আনা যাইব?'

'কী বলছ তুমি! দেশের এত মানুষ এখানে রয়েছে। আরও অনেকে আসবে। না এসে কি পারি?'

যুগল একটুতেই খুশি হয়ে যায়। তার মুখ আলো হয়ে ওঠে। 'না আসলে আমরা বেবাকে গিয়া কইলকাতা থিকা আপনেরে ধইরা আনুম।'

কথা বলতে বলতে বিরাট চত্বর পেরিয়ে, নতুন বসতির অন্য প্রান্তে পৌঁছে যায় সবাই। এখান থেকে আগরপাড়া পর্যন্ত ধানখেত, খাল ইত্যাদি।

মুকুন্দপুরের লোকজন বিনুদের পেছন পেছন চলে এসেছিল। বিনু বলল, 'আপনারা আর কষ্ট করে আসবেন না। ফিরে যান।'

pathagar.net

সবাই দাঁড়িয়ে পড়ে। সারি সারি ম্লান মুখ। তারা বলে, 'আপনের আশায় আমরা পথ চাইয়া থাকুম কিলাম—'

ওদের দেখতে দেখতে বিনুর বুকের ভেতরটা ভারী হয়ে ওঠে, 'বলেছি তো আসব। নিশ্চয়ই আসব।'

দু'জনে ধানখেতে নেমে পড়ে। আলের ওপর দিয়ে ওপর দিয়ে খানিকটা গেলে মেঠো পথ পাওয়া যাবে।

চলতে চলতে বিনু বলল, 'তোমাকে ছোটদির বাড়ি পর্যন্ত যেতে হবে না। আগরপাড়ায় গিয়ে কলকাতার ট্রেনে তুলে দিলেই চলবে।'

যুগল বলল, 'শিয়ালদায় লাইমা টালিগুঞ্জে যাইতে পারবেন তো?' তাকে বেশ চিন্তিত দেখায়।

বিনু বলল, 'কেন পারব না? শিয়ালদা থেকে ধর্মতলা। সেখান থেকে বাস পালটে কি ট্রামে টালিগঞ্জ।'

ঠিকই বলেছে বিনু। তবু যেন পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হতে পারে না যুগল, 'কুন কুন নম্বরের বাস ধরবেন ক'ন দেখি—'

বিনু বলল। যুগলের ভাবভঙ্গি স্নেহপ্রবণ অভিভাবকের মতো। বিনুর খুব হাসি পাচ্ছিল।

আগরপাড়া স্টেশনে পৌঁছতে পৌঁছতে সন্ধে হয়ে গেল। অনেক আগেই কুয়াশা আর হিম পড়তে শুরু করেছে ঘন হয়ে। নেমে এসেছে আঁধারও।

টিকিট কেটে এনে প্ল্যাটফর্মের একধারে দাঁড়াল বিনু। পাশে যুগল।

এই সময়টা কলকাতার দিকের প্যাসেঞ্জার কম থাকে। প্ল্যাটফর্মটা প্রায় ফাঁকা। দূরে দূরে মিটমিটে আলো জ্বলছে। কুয়াশা এবং অন্ধকার সেগুলোর টুঁটি টিপে ধরে আছে।

টুকরো টুকরো নানা কথা বলতে বলতে যুগল হঠাৎ দ্বিধার সুরে জিজ্ঞেস করে, 'ছুটোবাবু, যদিন গুসা না করেন, একখান কথা জিগামু?'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।'

'ঝিনুক বইনের দুঃখুর কথা শুনাশুন আমাগো কানে আসছে।'

সুধাদের বাড়িতে দু'বার যুগলের সঙ্গে দেখা হয়েছে। মুকুন্দপুরেও এতটা সময় একসঙ্গে কাটিয়ে এল। কত গল্প হয়েছে, কিন্তু ঘুণাক্ষরেও যুগল বুঝতে দেয় নি, ঝিনুকের লাঞ্ছনার কাহিনী সে জেনে গেছে। কিন্তু হঠাৎ এই প্রসঙ্গটা তুলল কেন? তার দিকে অবাক তাকিয়ে থাকে বিনু।

যুগল বিমর্ষ সুরে বলল, 'যহন ঝিনুক বইনের কথাহান শুনলাম, বুক আমার ফাইটা গেছিল।'

যুগলের কষ্টটা যে যথেষ্ট আন্তরিক তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। বিনু উত্তর দিল না।

যুগল এবার জিজ্ঞেস করে, 'ঝিনুক বইনেরে লইয়া এক রাইত এক দিন সুনীতিদিদির বাড়িত্ আছিলেন। ওনার শাউড়ি যা একহান মানুষ! ঝঞ্ঝট করে নাই?'

বিনু চমকে উঠল। হেমনলিনী ঝিনুকের সঙ্গে যে ভাল ব্যবহার করতে পারেন না, সেটা আন্দাজ করে নিয়েছে যুগল। আত্মীস্বজনদের সম্বন্ধে অপ্রিয় আলোচনা করতে রুচিতে বাধে বিনুর। ভীষণ অস্বস্তি হয়। সে চুপ করে রইল।

কী ভেবে যুগল ফের বলে, 'সুধাদিদি আর ছুটো জামাইবাবু, দুইজনেই ভালা মানুষ। কিন্তুক কয়দিন পর ছুটো জামাইবাবুর ঠাউরদা আর জেঠিমা ফিরা আসব। হেয়া ছাড়া আপনের বাবায়ও তীর্থধম্ম সাইরা ফেরবেন। তেনারা পুরানা কালের মানুষ। ঝিনুক বইনেরে কি মাইনা নিবেন?'

যে তিনজনের কথা যুগল বলল তাঁদের সম্বন্ধে যথেষ্ট দুশ্চিন্তা রয়েছে বিনুর। রয়েছে গভীর শঙ্কা। লাঞ্ছিত ঝিনুককে তাঁরা যদি সসম্মানে কাছে টেনে না নেন? হেমনলিনী যা করেছেন, হুবহু সেইভাবেই নোংরা আবর্জনার মতো তাকে আঁস্তাকুড়ে ছুঁড়ে ফেলেন?

বিনু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। যুগল ফের বলে, 'ছুটোবাবু, ছুটো মুখে একহান কথা কই। ঝিনুক বইনেরে লইয়া যদিন বিপদে পড়েন, সিধা মুকুন্দপুরে চইলা আসবেন। আমরা সোম্মান দিয়া তেনারে মাথায় কইরা রাখুম।'

বিহ্বল বিনু যুগলের দিকে তাকিয়েই থাকে। অক্ষরপরিচয়হীন এই যুবকটি সর্বস্ব খুইয়ে সীমান্তের এপারে চলে এসেছে। শুধুমাত্র বেঁচে থাকার জন্য প্রতি মুহূর্তে তার নিদারুণ যুদ্ধ। অপরিসীম ক্লেশ। তার মধ্যেই অন্যের কথা চিন্তা করে, অপরের দুঃখে কাতর হয়। লাঞ্ছিত ঝিনুকের জন্য সে যে এতটা ভেবে রেখেছে, কে জানত! যুগলের উদারতা, যুগলের সমবেদনার লেশমাত্রও যদি নিজের পরিজনদের মধ্যে থাকত।

কৃতজ্ঞতায় বুক ভরে যায় বিনুর। যুগলের একটা হাত ধরে ভারী গলায় বলে, 'তোমার কথা আমার মনে থাকবে।' পরক্ষণে অন্য একটা চিন্তা তাকে ভীষণ দমিয়ে দেয়, 'কিন্তু—'

'কী হইল ছুটোবাবু?'

'তোমরা না হয় মাথায় করে রাখলে। কিন্তু মুকুন্দপুরের অন্য সবাই?'

'এই কথা!' যুগল হাসে, 'মুকুন্দপুরের তিন ফেমিলির বস্যের মাইয়া পাকিস্থানে টাইনা লইয়া গ্যাছে। পাচ সাতটা মাইয়া আছে, এইপারে আসনের আগে তাগো মান-ইজ্জৎ নষ্ট হইছে। হগলেরই তো একই দুঃখু। একই কষ্টে বুক টাটায়। ঝিনুক বইনেরে ক্যাঠা কী কইব! চিত হইয়া ছ্যাপ (থুতু) ফেলাইলে নিজের বুকেই তো আইসা পড়ে। আপনে ভাইবেন না ছুটোবাবু—'

একসময় দিগ্‌দিগন্ত কাঁপিয়ে কলকাতার ট্রেন এসে পড়ে।

সুধাদের বাড়ি বিনু যখন পৌছল, আটটাও বাজে নি। সদর দরজায় কড়া নাড়তে উমা নেমে এসে খুলে দিয়েছিল। দোতলায় এসে বিনু দেখল, সুধা ঝিনুক আর হিরণ ভেতরে শোবার ঘরে বসে গল্প করতে করতে রেডিও সিলোনের গান শুনছিল। বিখ্যাত সব গান। নাম-করা সব শিল্পী। নুরজাহান, রাজকুমারী, রফি, হেমন্তকুমার, জগমোহন, গীতা রায়, লতা মঙ্গেশকর, মুকেশ, তালাত মামুদ, এমনি অনেকে।

বিনুকে দেখে প্রথমটা সবাই অবাক। তারপর হইহই করে উঠল।

সুধা বলল, 'কি রে, তোর না কালকে আসার কথা ছিল!'

কাঁধের ব্যাগটা মেঝেতে নামিয়ে একটা বেতের মোড়ায় বসতে বসতে বিনু বলল, 'চলে এলাম—'

রেডিও বন্ধ করে হিরণ জিজ্ঞেস করল, 'যুগলরা তোমাকে আসতে দিল?'

'একেবারেই না। শুধু যুগল নাকি, সারা মুকুন্দপুরের লোকজন ঘিরে ধরেছিল। কিছুতেই আসতে দেবে না।'

হঠাৎ ঝিনুক বলে ওঠে, 'যুগলদা তোমাকে এত ভালবাসে। তোমার ওপর কী টান! দু'চারটে দিন ওদের কাছে থেকে আসা উচিত ছিল।'

বিনু পূর্ণ দৃষ্টিতে ঝিনুকের দিকে তাকায়। এই কি সেই ঝিনুক, রাজদিয়া থেকে আসার পর তাকে এক দণ্ড না দেখলে যে কেঁদে কেটে পৃথিবী ভাসিয়ে ফেলত! সে-ই কিনা তাকে যুগলদের কাছে শুধু আজকের দিনটাই না, আরও ক'টা দিন কাটিয়ে আসার কথা বলছে! শুনেও বিশ্বাস হতে চায় না।

ঘরে ঢুকে ঝিনুককে যখন রেডিও সিলোন শুনতে দেখেছিল তখনই বিনু বুঝেছে, বেশ আনন্দেই আছে মেয়েটা। মুকুন্দপুরে যে সংশয়টা তার মস্তিষ্কে হুল ফোটাচ্ছিল, দেখা যাচ্ছে, সেটার কোনও কারণ নেই। এর ভেতর নিশ্চয়ই সুধাদের বাড়িতে এমন কিছু ঘটে নি বা বাইরের কেউ এসে এমন কিছু বলে নি যাতে ঝিনুক ফের কুঁকড়ে যায়, ফিরে আসে তার সেই দুঃস্বপ্নের স্মৃতি।

ঝিনুককে 'দেখে খুব ভাল লাগছিল বিনুর। বলল, 'এমনিই চলে এলাম।' আসল হেতুটা তো আর জানানো যায় না।

গভীর আগ্রহে হিরণ জিজ্ঞেস করল, 'কেমন দেখলে জায়গাটা?'

বিনু সবিস্তার সব জানালো।

হিরণ বলে, 'খুঁজে খুঁজে অমন একটা জায়গা বার করেছে। জঙ্গল কেটে কলোনি বসিয়েছে। সাপখোপ আর জমিদারের গুণ্ডাবাহিনীর সঙ্গে ফাইট করে নিজেদের এস্টাব্লিশ করতে চেষ্টা করছে। সবই আমাকে জানিয়েছে যুগল। কিন্তু তুমি যা ডেসক্রিপশন দিলে, এতটা ভাবতে পারি নি। ইস্ট পাকিস্তান থেকে এসে যারা রিফিউজি ক্যাম্পে আর রেল স্টেশনে ধুঁকে ধুঁকে মরছে তাদের যদি যুগলদের মতো সাহস, মনের জোর আর অ্যাডভেঞ্চারাস স্পিরিট থাকত।'

মাথা নেড়ে সায় দেয় বিনু।

হিরণ বলতে লাগল, 'যুগল অনেক বার যেতে বলেছে। নানা কারণে যাওয়া হয় নি। এবার একদিন যেতে হবে।'

'নিশ্চয়ই যাবেন। গেলে ওরা কী খুশি যে হবে!'

শুনতে শুনতে সুধা এবং ঝিনুকের ভীষণ কৌতূহল হচ্ছিল। ঝিনুক জিজ্ঞেস করল, 'কিভাবে মুকুন্দপুরে যেতে হয়?'

বিনু মজার গলায় বলল, 'তুমি ওখানে যাবে নাকি?'

প্রশ্নটার উত্তর না দিয়ে ঝিনুক বলল, 'যুগলদা বলেছিল, আমাদের রাজদিয়ার অনেক মানুষ ওখানে গিয়ে ঘরবাড়ি তুলেছে। কারা কারা গেছে?'

সকলের নাম বলল বিনু। আরও জানালো শুধু রাজদিয়ারই না, গিরিগঞ্জ সিরাজদীঘা দেলভোগ রসুনিয়া, এমনি নানা জায়গার লোকজন ওখানে আছে। সবই পরিচিত মুখ। মুকুন্দপুরে গেলে মনে হবে আরেক রাজদিয়া। যুগলরা পূর্ব বাংলার সেই জনপদটিকে অসীম মায়ায় সীমান্তের এপারে জঙ্গল নির্মূল করে নতুন করে সৃষ্টি করছে।

ঝিনুক উত্তর দিল না। ভেতরে ভেতরে নিজেকে খানিকটা গুটিয়ে নিয়েছে সে।

মুখচোখের সামান্য পরিবর্তন লক্ষ করে ঝিনুকের মনোভাবটা আঁচ করে নেয় বিনু। রাজদিয়াবাসী যারা মুকুন্দপুরে এসে উঠেছে তারা কি আর রায়টের সময় তার লাঞ্ছনার খবরটা পায় নি? ওদের কাছে যাওয়া ঠিক হবে কিনা, সেই সংশয় তাকে হয়তো বিচলিত করে তুলেছে। বিনু আর কোনও প্রশ্ন করল না।

রাতে খাওয়াদাওয়ার পর বিনুকে একলা পেয়ে ঝিনুক নতচোখে কুণ্ঠিতভাবে জিজ্ঞেস করে, 'যুগলদের ওখানে সবাই কি আমার কথা জানে?'

ঝিনুকের মাথায় কোন চিন্তাটা অবিরল ঘুরপাক খাচ্ছে, বুঝতে পারছিল বিনু। সে মনস্থির করে ফেলে। বলে, 'হ্যাঁ, জানে। কিন্তু ওখানে গেলে তোমার কোনও ভয় নেই।'

বিমূঢ়ের মতো ঝিনুক বলে, 'মানে?'

বিনু বুঝিয়ে দেয়, মুকুন্দপুরে তার মতো ধর্ষিত মেয়ে আরও অনেকে আছে। এমনকি পাকিস্তানে বেশ ক'টি যুবতী মেয়েকে জল্লাদেরা কেড়ে নিয়ে যাবার পর তাদের শোকাতুর মা-বাবারা ওখানে এসে উঠেছে।

যে মেয়েরা পাকিস্তানে সম্ভ্রম খুইয়ে, অশেষ নির্যাতন ভোগ করে মুকুন্দপুরে এসেছে, কেউ তাদের ঘেন্না করে না। গায়ে থুতু দেয় না। অচ্ছুতের মতো দূরে সরিয়ে রাখে না। এইরকম মেয়ে তো একটা দু'টো নয়। কে কাকে দেখে মুখ ফিরিয়ে নেবে? বরং মুকুন্দপুরবাসীরা নিবিড় সহানুভূতিতে, গভীর মমতায় নিজেদের কাছে এদের টেনে নিয়েছে। পাছে ওরা কষ্ট পায়, পুরনো দুঃস্বপ্নের স্মৃতি ফের ওদের আতঙ্কগ্রস্ত করে তোলে, তাই চরম ইজ্জৎহানির কথা কেউ মুখেও আনে না।

শুনতে শুনতে মুখ আলোয় ভরে যায় ঝিনুকের। বলে, 'ওরা তো খুব ভাল—'

'হ্যাঁ। এবার যেতে আপত্তি নেই তো?'

'না।'

মুকুন্দপুর থেকে ফেরার পর দু'দিন কেটে গেল। এর মধ্যে একটা বড় কাজ সেরে ফেলেছে বিনু। শওকত আলিদের 'খান মঞ্জিল'-এর সঙ্গে তাদের রাজদিয়ার বাড়ি এক্সচেঞ্জ করার কথাবার্তা আগেই মোটামুটি পাকা করে ফেলেছিল হিরণ। কিন্তু সুধা ঘাড় বাঁকিয়ে রেখেছিল, কিছুতেই ও বাড়িতে যাবে না। অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে তাকে রাজি করিয়েছে বিনু। তবে আরও একটা মস্ত বাধা

আছে। হিরণের জেঠিমা। তাঁকে রাজি করানোর দায়িত্ব বিনুর নয়, হিরণের। সুধারও।

এখন বিকেল।

হিমঋতু লম্বা পা ফেলে এগিয়ে আসছে। আজকাল দুপুরের পর সূর্য পশ্চিম দিকে একটু ঢলে পড়লেই উত্তুরে হাওয়া দ্রুত জুড়িয়ে যায়। রোদের রং ক্রমশ মলিন হতে থাকে।

বাড়িতে এখন বিনু আর উমা ছাড়া অন্য কেউ নেই। হিরণের ছুটি ফুরিয়ে গেছে। সে অফিসে। সন্ধের আগে ফিরবে না। সুধা ঝিনুককে নিয়ে দুপুরে ভবানীপুরে গেছে। কী সব কোনাকাটা করবে। তারপর ওদিক সেদিক বেড়িয়ে তাদেরও ফিরে আসতে আসতে সন্ধে পেরিয়ে যাবে।

বিনু কাল একটা অ্যাপ্লিকেশন লিখে হিরণকে দিয়েছিল। দরখাস্তের খসড়াটা করে দিয়েছে হিরণ। সে তাদের ফুড ডিপার্টমেন্টে ওটা কালই জমা করেছে। আজ অফিসে বেরুবার সময় আরও তিনটে দরখাস্ত লিখে রাখতে বলে গেছে। একটা দেওয়া হবে ইরিগেশন ডিপার্টমেন্টে, একটা পি ডব্লু ডি'তে, আর একটা এক্সাইজে। কোথায় চাকরি হবে তা তো বলা যায় না। চেষ্টা করতেই হবে। পাকিস্তান থেকে উৎখাত হয়ে এসেছে বিনু। বর্ডার স্লিপও পেয়েছে। চাকরি বাকরি একটা কিছু জুটেও যাবে। সমস্যা অবশ্য আছে। তার ডিগ্রি টিগ্রিগুলো খোয়া গেছে। নিত্য দাসও এর ভেতর আসে নি। সে না এলে হেমনাথকে খবর পাঠিয়ে ডিগ্রিগুলোর ব্যবস্থা করা যাবে না। তবে অ্যাপ্লিকেশন দেবার সঙ্গে সঙ্গেই তো ইন্টারভিউর জন্য ডাক আসবে না। আশা করা যায়, তার মধ্যে কিছু একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে। হিরণ সেইরকম আশার কথা শুনিয়েছে। তারপর দেখা যাক।

বাইরের ঘরের এক কোনায় টেবল চেয়ার রয়েছে। সেখানে বসে হিরণের কথামতো অ্যাপ্লিকেশনগুলো লিখছিল বিনু। ভেতরের কোনও একটা ঘরে খুটখাট করে কী যেন করছে উমা।

নীচে থেকে কড়া নাড়ার আওয়াজ ভেসে এল। লিখতে লিখতেই বিনু উমাকে বলল, 'দেখ তো উমা, কে এসেছে—' এখন হিরণদের কারও ফেরার কথা নয়। তা হলে কে আসতে পারে?

'যাই মামাবাবু—'

উমা ব্যস্তভাবে একতলায় চলে গেল। একটু পরে কলকল করতে করতে তার সঙ্গে যে উঠে এল, এই মুহূর্তে কেন, আট দশ দিনের ভেতর তার কথা একবারও ভাবে নি বিনু। দরজার বাইরে ঝুমা। তার পেছনে আনন্দ।

ঝুমাকে দেখামাত্র সারা শরীরে পুরনো সেই শিহরন খেলে যায় বিনুর। টেবল থেকে ত্বরিত পায়ে উঠে সে এগিয়ে আসে, 'আসুন আনন্দদা, এস ঝুমা—'

দু'জনে ঘরে ঢুকে সোফায় বসে পড়ে। বিনুও ওদের মুখোমুখি বসে।

আনন্দ বলে, 'বাড়ি এত নিঝুম কেন? হিরণ নিশ্চয়ই অফিসে? সুধা আর ঝিনুক কোথায়? ওদের ডাকো—'

'আমি ডেকে আনছি—'

ঝুমা উঠতে যাচ্ছিল। তাকে থামিয়ে দিয়ে বিনু বলে, 'ওরা বাড়ি নেই।' কোথায় গেছে, কখন ফিরবে, তাও জানিয়ে দিল।

বলতে বলতে বিনু লক্ষ করল, ঝুমার চোখে ঝিলিক খেলে যাচ্ছে। দুই ঠোঁটে রহস্যময় সংকেতের মতো চিকন একটু হাসি ফুটে উঠেই মিলিয়ে যায়। মনে হল, ঝিনুকরা না থাকায় সে খুশিই হয়েছে।

সেদিন কলেজ থেকে সোজা আনন্দদের বাড়ি চলে গিয়েছিল ঝুমা। পরনে সিল্কের শাড়িটাড়ি থাকলেও তেমন একটা সাজে নি। আজ কিন্তু তার শতগুণ সেজে এসেছে। পাঁচ হাত দূরে বসে আছে এক পরমাশ্চর্য স্বপ্নের পরী। নাকি এক কুহকময়ী নারী? ঝুমার শাড়িটাড়ি থেকে সেন্টের তীব্র মিষ্টি গন্ধ উঠে এসে বিনুর স্নায়ুগুলোকে আচ্ছন্ন করে দিচ্ছিল।

বিনু বলল, 'আপনারা এলেন, বড়দিকে আনলেন না কেন?'

আনন্দ বিব্রত বোধ করে, 'জানোই তো, ওর এখানে আসার অসুবিধা আছে। তাই—'

ইঙ্গিতটা স্পষ্ট। হেমনলিনী চান না, ঝিনুক যতদিন সুধাদের কাছে আছে, তাঁদের বাড়ির মেয়েরা এখানে আসুক। বিনুর মনটা খারাপ হয়ে যায়।

pathagar.net

আনন্দ এবার বলল, 'তোমার জন্যে আজ অফিস ছুটি নিয়েছি।'

বিনু অবাক হল, 'কেন বলুন তো?'

'বলতেই তো এসেছি। একটু ধৈর্য ধর।' আনন্দ বলতে লাগল, 'বাড়ি থেকে বেরিয়ে একটা দরকারে ঝুমাদের ওখানে গিয়েছিলাম। ওর কলেজ আজ ছুটি। আমাকে ছাড়ল না। জোর করে সঙ্গে চলে এল।'

বিনু উত্তর দিল না। কী কারণে হঠাৎ আনন্দ এসেছে সেটা জানার জন্য সে উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকে।

ঝুমা ভীষণ চঞ্চল, ছটফটে। এক জায়গায় চুপচাপ স্থির হয়ে কিছুক্ষণ বসা তার ধাতে নেই। হুট করে উঠে পড়ল সে। 'তোমরা গল্প কর। এ বাড়িতে অনেক দিন আগে সুনীতি মামীর সঙ্গে একবার মাত্র এসেছিলাম। সব মনেও নেই। ঘুরে ঘুরে একটু দেখি। চা খাবে তো?'

ঝুমার স্বভাবে অবাধ জলস্রোতের মতো কিছু আছে। সঙ্কোচ, জড়তা বা বাধো বাধো ভাবের লেশমাত্র নেই। যেখানেই যাক, মনে হয়, অনেকদিন ধরে রয়েছে। এ বাড়িতে সুধারা যখন নেই, আনন্দদের আপ্যায়নের দায়িত্ব যেন তারই।

আনন্দ বলল, 'নিশ্চয়ই খাব। কিন্তু—'

ঝুমা বিনুকে জিজ্ঞেস করল, 'হিরণমামাদের কাজের মেয়েটার নাম যেন কী?'

বিনু বলল 'উমা—'

'উমাকে চা করতে বলছি—' ঝুমা টুক করে বাইরে বেরিয়ে গেল।

আনন্দ এবার বলল, 'যেভাবে আমাদের বাড়ি থেকে তোমাদের চলে আসতে হয়েছে, সে জন্যে আমার লজ্জার শেষ নেই। তোমার বড়দি দু'দিন খুব কেঁদেছে। আমারও কী খারাপ যে লেগেছে, বলে বোঝাতে পারব না।'

আনন্দর দুঃখ বা অনুতাপ যে যথেষ্ট আন্তরিক, বুঝতে অসুবিধে হচ্ছিল না বিনুর। প্রসঙ্গটা অপ্রিয়, অস্বস্তিকর। সেটা এড়ানোর জন্য বলল, 'ওসব কথা থাক আনন্দদা—'

আনন্দ আস্তে মাথা নাড়ে, 'হ্যাঁ, সেই ভাল। এখানে কেমন আছে ঝিনুক?'

'আগের থেকে অনেক নর্মাল। বেশ হাসিখুশি। পুরনো শকটা প্রায় কাটিয়ে উঠেছে।'

পাংশু মুখে খানিকক্ষণ বসে থাকে আনন্দ। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, 'আমরা পারি নি। হিরণ আর সুধা যে মেয়েটার মুখে হাসি ফোটাতে পেরেছে, শুনে খুব ভাল লাগছে।'

বিনু উত্তর দিল না।

আনন্দ জিজ্ঞেস করে, 'শেষ পর্যন্ত কী ঠিক করলে?'

বুঝতে না পেরে বিনু বলে, 'কী ব্যাপারে?'

'রাজদিয়া থেকে বি.এ পাস করে এসেছ। পড়াশোনাটা চালিয়ে গেলে ইউনিভার্সিটিতে এখনই ভর্তি হতে হয়। আর যদি চাকরি টাকরি কর—'

এই কথাটা হিরণও তাকে বলেছে। সে জানালো, 'চাকরির কথাই ভাবছি আনন্দদা। শুনেছি রিফিউজিদের এ ব্যাপারে গভর্নমেন্ট থেকে বেশ কিছু সুযোগ সুবিধা দিচ্ছে। সেটা নেওয়া উচিত। হিরণদাও তাই বলছিল।'

'চেষ্টা টেষ্টা করছ?'

'হিরণদাদের অফিসে অ্যাপ্লাই করেছি। হিরণদা নিজে অ্যাপ্লিকেশনটা নিয়ে গিয়ে জমা দিয়েছে। অন্য অন্য অফিসে পাঠাবার জন্য আরও তিনটে দরখাস্ত লিখতে বসেছিলাম, আপনি আর ঝুমা এসে গেলেন।'

'হিরণ কী বলছে, ওদের ওখানে হয়ে যাবে?'

'সবে তো দরখাস্ত জমা পড়েছে। যাতে কাজটা হয়, হিরণদা সেজন্যে লেগে আছে। আমার ইচ্ছে, চাকরি পেলে প্রাইভেটে এম.এ'টা দিয়ে দেব।'

'গুড আইডিয়া।'

একটু চুপ।

তারপর আনন্দ বলে, 'আমি একটা চাকরির খবর নিয়ে এসেছি। যদি রাজি হও, এখনই হয়ে

যেতে পারে।'

অফিস ছুটি নিয়ে এ বাড়িতে আনন্দর আসার উদ্দেশ্যটা এতক্ষণে জানা গেল। বিনুর সর্বাঙ্গে তড়িৎপ্রবাহ বয়ে যায়। হিরণের অফিসে সবে দরখাস্ত জমা পড়েছে। কবে সেখান থেকে ডাক আসবে তার নিশ্চয়তা নেই। কিন্তু আনন্দর কাজটা পাওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি। উৎসুক সুরে বিনু জিজ্ঞেস করল, 'কী ধরনের চাকরি?'

আনন্দ বিশদভাবে জানায়। তার বাবা যখন হাইকোর্টে প্র্যাকটিস করতেন, একজন বড় বিজনেসম্যান ছিলেন তাঁর ক্লায়েন্ট। কয়েকটা ইণ্ডাস্ট্রি তাঁর ছিল। ভদ্রলোক অত্যন্ত বুদ্ধিমান এবং দূরদর্শী। দেশ চিরকাল পরাধীন থাকবে না, ইংরেজকে সুদূর ভারতবর্ষের কলোনি থেকে পাততাড়ি গুটিয়ে পালাতে হবে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সূর্য পৃথিবীর এই ভূখণ্ডে চিরদিনের মতো অস্তাচলে যাবে— বহুকাল আগেই তিনি তার আঁচ পেয়েছিলেন। তখন থেকেই স্বাধীনতা সংগ্রামীদের, সশস্ত্রই হোক বা অহিংস, গোপনে গোপনে অর্থ দিয়ে সাহায্য করে যাচ্ছিলেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ইংরেজদের সংকট যখন দ্রুত ঘনিয়ে আসছে, সাহায্যের মাত্রাটা বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। তিনি জানতেন, দেশের রাজ্যপাট একদিন এদের হাতেই আসবে। ব্যবসা বাণিজ্য কলকারখানা চালাতে গেলে নতুন শাসকদের অনুগ্রহ দরকার। অর্জুনের সেই মাছের চোখের মতো লক্ষ্যটা এরকম হলেও, দেশপ্রেম বা আদর্শবাদ তাঁর একেবারেই যে ছিল না তা নয়।

এই বিজনেসম্যান ভদ্রলোক, জগদীশ গুহঠাকুরতা, স্থির করেছেন, একখানা বাংলা দৈনিক কাগজ বার করবেন। অনেক দূর এগিয়েও গেছেন। সেন্ট্রাল অ্যাভেনিউতে তাঁদের একটা বড় তেতলা বাড়ি আছে। সেখানে অফিস খোলা হয়েছে। প্রেস, লাইনো মেশিন এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতি কেনা হয়ে গেছে। সাংবাদিক থেকে শুরু করে নানা ডিপার্টমেন্টে কিছু কিছু লোকও নেওয়া হয়েছে। খুব শিগগির আরও নেওয়া হবে।

খবরটা কানে আসামাত্র বালিগঞ্জে জগদীশবাবুর বাড়ি ছুটেছিল আনন্দ। বাবার জুনিয়র হিসেবে একসময় কিছুদিন হাইকোর্টে আনাগোনা করেছিল সে। তখন থেকেই জগদীশের সঙ্গে আলাপ। মাঝে মাঝে ভদ্রলোক তাদের বাড়িতে আসতেন। এখনও আসেন। আনন্দরাও বিয়ে, অন্নপ্রাশন, শ্রাদ্ধ, লক্ষ্মীপুজো, কালীপুজো, এমনি নানা অনুষ্ঠানে ওঁদের বাড়ি যেত। এখনও যায়। ঘনিষ্ঠ পারিবারিক সম্পর্কের মতো দাঁড়িয়ে গেছে ব্যাপারটা। আনন্দর বাবার মৃত্যু হয়েছে, হাইকোর্টে যাওয়া কবেই ছেড়ে দিয়েছে সে, তবু জগদীশ গুহঠাকুরতার সঙ্গে যোগাযোগটা থেকেই গেছে।

বিনুর কথা জানানো মাত্র জগদীশ তাকে আজকালের মধ্যে নিয়ে যেতে বলেছেন। আনন্দ জিজ্ঞেস করল, 'কবে যাবে বল—'

বিনু বলল, 'খবরের কাগজের কাজ তো আমি কিছুই জানি না। এ সম্পর্কে আমার কোনও ধারণাই নেই।'

আনন্দ হাসল, 'ধর হিরণদের ফুড ডিপার্টমেন্টে কি অন্য কোনও অফিসে তোমার চাকরি হল। সে সব জায়গার কাজকর্ম সম্বন্ধে তোমার ধারণা আছে?'

'তা নেই।'

'কাজ করতে করতেই সবাই শিখে নেয়। সুযোগটা যখন এসে গেছে, ছেড়ো না। পরে ভাল চাকরি পেলে এটা ছাড়তে কতক্ষণ?'

একটু চিন্তা করে বিনু বলল, 'ঠিক আছে। কবে যেতে বলছেন?'

'আজ যেতে পারবে?'

'বাড়িতে কেউ নেই। ছোটদিদের না জানিয়ে বেরুনো ঠিক হবে না।'

'তা হলে কালই যাওয়া যাবে।'

বিনু আস্তে ঘাড় হেলাল।

আনন্দ বলল, 'জগদীশবাবু সন্ধেবেলা ওঁদের খবরের কাগজের অফিসে আসেন। তুমি বিকেলে আমাদের বাড়ি চলে এস। আমি আমার অফিস থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে বাড়ি থেকে তোমাকে নিয়ে জগদীশবাবুর কাছে চলে যাব।'

মুখটা পলকের জন্য থমথমে হয়ে গেল বিনুর। ধীরে ধীরে বলল, 'আপনার অফিসের ঠিকানাটা দিন। আমি বরং সেখানে চলে যাব। আপনি ওখান থেকে আমাকে নিয়ে যাবেন।'

বিনু কেন তাদের বাড়ি যেতে চাইছে না, তার দ্বিধা এবং ক্ষোভটা কী কারণে, সবই বুঝতে পারছে আনন্দ। এ নিয়ে সে কোনও প্রশ্ন করল না। বলল, 'বেশ। অফিসের ঠিকানাটা লিখে নাও—'

কোণের টেবল থেকে কাগজ কলম এনে লিখে নিল বিনু।

উমা একটা ট্রে'তে চা এবং প্রচুর মিষ্টি টিস্টি দিয়ে গেল। আনন্দর সঙ্গে এ বাড়ির সম্পর্কটা তার খুব ভাল করেই জানা আছে। সুধারা নেই। তাদের ঘনিষ্ঠ পরিজনদের আদরযত্নে বিন্দুমাত্র ত্রুটি হতে দেয় না সে। তা ছাড়া, ঝুমাও নিশ্চয়ই তাকে চায়ের কথা বলেছে।

বিনু শুধু চায়ের কাপটাই তুলে নিয়েছে। দু'এক চুমুক দেবার পর বলল, 'আমার একটা কৌতূহল হচ্ছে আনন্দদা—'

'কী কৌতূহল?'

'জগদীশবাবু তো বললেন কী সব বিজনেস করেন, কলকারখানাও বসিয়েছেন। তিনি হঠাৎ খবরের কাগজ বার করতে চলেছেন কেন?'

আনন্দ হাসল, 'স্বাধীনতার পর খবরের কাগজও তো বিগ বিজনেস হয়ে উঠছে। তবে এর পেছনে ওঁর অন্য কোনও উদ্দেশ্য আছে কিনা, আমার জানা নেই।' একটু থেমে ফের বলে, 'জলে ফেলার জন্যে কেউ লাখ লাখ টাকা ঢালে না।'

কথা বলতে বলতে হঠাৎ বিনুর চোখে পড়ল, দরজার বাইরে দেওয়াল ঘেঁষে নিজেকে যতটা সম্ভব আড়ালে রেখে হাতের ইশারায় তাকে ডাকছে ঝুমা। আনন্দ যেখানে বসেছে সেখান থেকে ঝুমাকে দেখা যায় না।

রাজদিয়ায় পুজোর ছুটিতে গিয়ে সেই যে ঝুমা বিনুর নাকে একটা অদৃশ্য বড়শি আটকে দিয়েছিল সেটা এখনও বিঁধেই আছে। কী যে দুরন্ত, অদম্য আকর্ষণ এই তরুণীর! রক্তস্রোতে চমক খেলে যেতে লাগল বিনুর। জাদুকরীর মতো ক্রমাগত ইঙ্গিতে টেনেই চলেছে সে।

নিজের অজান্তেই যেন উঠে দাঁড়ায় বিনু। 'আনন্দদা, আপনি চা'টা খান। আমি একটু ভেতর থেকে আসছি—'

বাইরে আসতেই ঝুমা বিনুকে পেছন দিকের একটা চওড়া ব্যালকনিতে নিয়ে গেল। এখান থেকে ট্রাম রাস্তার দিকের অনেকখানি অংশ দেখা যায়।

বেলা প্রায় ফুরিয়ে এসেছে। বিবর্ণ, নিস্তেজ সূর্য পশ্চিম দিকের উঁচু উঁচু গাছগুলোর মাথায় এখনও আলগাভাবে আটকে আছে। কিছুক্ষণের মধ্যে ওটা টুপ করে গাছপালার আড়ালে খসে পড়বে।

বাতাসে হিম আর কুয়াশা মিশে যাচ্ছে। যেদিকে, যতদূর চোখ যায়, সন্ধে নামার তোড়জোড় চলছে।

বিনুর গা ঘেঁষে ব্যালকনির রেলিংয়ে কনুইয়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ঝুমা। তার গা থেকে সেন্টের সেই উগ্র গন্ধটা বিনুর নাকের ভেতর দিয়ে হাড়মজ্জায় ঢুকে যাচ্ছে। মাথা ঝিম ঝিম করছে তার।

ঝুমা বলল, 'মামা আনতে চাইছিল না। তবু আমি জোর করে চলে এসেছি। কেন জানো?'

ঝুমার উত্তরটা মোটামুটি আন্দাজ করে নিয়েছে বিনু। তবু জিজ্ঞেস করল, 'কেন?'

'হাঁদারাম, বুঝতে পার না? তোমার জন্যে।'

গায়ে কাঁটা দিল বিনুর। এই মেয়েটা যখন সদ্য কিশোরী, একটি চুম্বনে নরনারীর সম্পর্কের অপার রহস্যময় পৃথিবীর দরজা তার সামনে খুলে দিয়েছিল। কোন গহন অভিসন্ধি নিয়ে সে আজ এখানে হাজির হয়েছে, কে জানে।

ঝুমা এবার বলল, 'ঝিনুক আর সুধা মাসি নেই। ভালই হয়েছে। তোমাকে একলা পাওয়া গেছে। ঝিনুক থাকলে তোমার সঙ্গে কথাই বলা যেত না।'

বিনু উত্তর দিল না।

ঝুমা বলতে লাগল, 'রোজই আশা করে থাকি, আমাদের বাড়ি আসবে। কিন্তু একদিনও এলে

না।'

বিনু ঝুমার দিকে এক পলক তাকিয়েই চোখ নামিয়ে নেয়। বলে, 'এখানে এসে এত ব্যস্ত হয়ে পড়েছি, এত জায়গায় ছোটাছুটি করতে হচ্ছে যে অন্য কোনও দিকে মন দেবার সময় পাচ্ছি না।' সত্যি মিথ্যে মিলিয়ে না-যাবার কারণটা খাড়া করল সে, 'তা ছাড়া—'

'কী?'

'সেদিনই তো বলেছি, কলকাতায় যখন এসেছি, কোথাও না কোথাও তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে।'

'সে তো ঝিনুক তোমার পাশে বসে ছিল বলে। একটা সত্যি কথা বলবে?'

'কী?'

ঝুমা সোজা বিনুর দিকে তাকায়। তাকিয়েই থাকে। পলকহীন। তার দু'চোখে সম্মোহনের মতো কী যেন ঘন হয়ে আসে। বলে, 'আমার সঙ্গে দেখা করতে তোমার ইচ্ছা হয় না?'

বিনু চুপ করে থাকে।

ঝুমা চোখ সরায় নি। বিনুর মুখের ওপর দৃষ্টি স্থির রেখে বলল, 'করে। বলতে লজ্জা হচ্ছে, তাই না?' তার গলার স্বর চাপা শোনায়।

বিনু এবারও নীরব।

ঝুমা আরেকটু নিবিড় হয়ে আসে। বলে, 'ঝিনুককে তুমি খুব ভয় পাও। ওর জন্যে আমাদের বাড়ি যাও না। কি, ঠিক বলছি?'

বিনু চোখ নামিয়ে নেয়। ঝুমার দিকে তাকিয়ে থাকতে পারছিল না সে।

ঝুমা হঠাৎ তীক্ষ্ণ গলায় জিজ্ঞেস করে, 'ঝিনুককে তুমি কলকাতায় নিয়ে এলে কেন?'

বিনু হতচকিত। এমন একটা প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিল না। একটু চুপ করে থেকে, আস্তে আস্তে বলল, 'তুমি জানো না, ওর কত বড় ক্ষতি হয়েছে! পুরোপুরি অ্যাবনর্মাল হয়ে গিয়েছিল। পাকিস্তানে একেবারেই থাকতে চাইছিল না। সারাক্ষণ কান্না আর কান্না। দেশে থাকলে ও মরে যেত। চোখের সামনে একটা মেয়ে ভয়ে আতঙ্কে কেঁদে কেঁদে মারা যাবে, সহ্য করতে পারছিলাম না।' কিছুক্ষণ থেমে, গভীর গলায় বলে, 'মেয়েটা বড় দুঃখী।'

ঝুমার মুখচোখ কোমল হয়ে এল। সামান্য অনুতপ্ত কি? ভারী গলায় বলল, 'জানি ঝিনুক খুব দুঃখী। ওর জন্যে আমারও যথেষ্ট সিমপ্যাথি আছে। কিন্তু—'

'কী?'

'অন্য সমস্যাগুলো তুমি বোধ হয় আগে ভেবে দেখ নি?'

'কোন কোন সমস্যার কথা বলছ?'

ঝুমা বুঝিয়ে দিল। একটি ধর্ষিত মেয়ের পক্ষে এই সমাজে টিকে থাকা প্রায় অসম্ভব। মানুষ এখনও হাজারটা সংস্কারের কুয়োয় আটকে আছে। তার মনের প্রসার কবে ঘটবে, আদৌ ঘটবে কিনা, কেউ জানে না। উদারতা, মহত্ত্ব, এই সব দামি দামি শব্দ বইয়ের পাতাতেই শুধু সাজানো থাকে।

ঝুমা বলতে লাগল, 'আমার মামাবাড়িতে তো ঝিনুককে নিয়ে গিয়েছিলে। থাকতে পারলে? আমার দিদা কী নিষ্ঠুর ব্যবহার করেছে, সব শুনেছি। সুধামাসিরা শেলটার দিয়েছে, কিন্তু সে আর ক'দিন? হিরণ মেসোর দাদু আর জেঠিমা শিগগির পাটনা থেকে চলে আসবেন। তোমার বাবারও ফিরে আসার সময় হয়েছে। আমার মনে হয় না, ঝিনুকের মতো একটা মেয়েকে ওঁরা কেউ মর্যাদা দিয়ে বাড়িতে থাকতে দেবেন।'

এগুলো নতুন কথা নয়। বিনু নিজেও সহস্র বার ভেবেছে। যেটা তাকে অবাক করল, ঝিনুককে নিয়ে সে কোন সংকটে পড়েছে, এবং ভবিষ্যতে তার সমস্যা আরও কতটা ঘোরালো হয়ে উঠবে, সে সম্বন্ধে ঝুমার ধারণা আছে। তার চিন্তাশক্তি খুবই স্বচ্ছ। মেয়েটাকে যতটা চটুল মনে হোক, আদপে সে কিন্তু তা নয়।

বিনু বলল, 'পাকিস্তানে এমন একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে যে ওকে না এনে উপায় ছিল

না। দাদু আর দিদারাও নিয়ে আসতে বলল। তখন অন্য কিছু ভাবার মতো সময় বা মানসিক অবস্থা কারোর ছিল না।'

ঝুমা বলল, 'সবই বুঝলাম। কিন্তু ঝিনুককে কেউ যখন নিজেদের কাছে থাকতে দেবে না, ওই মেয়েকে নিয়ে কী করবে তুমি? কোথায় যাবে? তা ছাড়া—'

এই সব চিন্তা ক'দিন আগেও অবিরল বিনুকে অস্থির করে রেখেছিল। সুধাদের কাছে এসে কিংবা মুকুন্দপুরে গিয়ে রাজদিয়া এলাকার পরিচিত মানুষজনের মধ্যে একটা দিন একটা রাত কাটিয়ে, তাদের আন্তরিকতায় সে এতই অভিভূত হয়ে পড়েছিল যে ঝিনুককে নিয়ে সংকটের কথা ভাবে নি। কয়েক দিনের জন্য দুশ্চিন্তাটা উধাও হয়ে গিয়েছিল। ঝুমা মনে করিয়ে দিতে মস্তিষ্কের কোনও গোপন কুঠুরি থেকে দঙ্গল বেঁধে সমস্যাগুলো বেরিয়ে এল।

বুকের ভেতর কেমন যেন একটা চাপা অস্বস্তি হচ্ছে। ঝুমা তার পুরনো দুর্ভাবনা এবং ত্রাস ফিরিয়ে এনেছে। মলিন মুখে সে জিজ্ঞেস করে, 'তা ছাড়া কী?'

'সারাক্ষণ তুমি ঝিনুককে আগলে আগলে রাখতে পারবে না। মামা তোমার জন্যে চাকরির ব্যবস্থা করেছে। খবরের কাগজেই হোক, বা অন্য কোথাও, কাজ তোমাকে করতেই হবে। অফিসে তো আর ঝিনুককে নিয়ে যেতে পারবে না। তখন সে কোথায় থাকবে?'

ঝুমা যা বলল তার এক বর্ণও মিথ্যে নয়। বিনু যেন চোখের সামনে দেখতে পেল, এই সমস্যাগুলো ক্রমশ বিশাল আকার নিয়ে বেড়াজালের মতো তাকে ঘিরে ফেলছে। জোরে জোরে মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'জানি না, জানি না—'

অনেকক্ষণ চুপচাপ।

হেমন্তের বিকেল ফুরিয়ে যাচ্ছে দ্রুত। মিহি কুয়াশা নামছে, সেই সঙ্গে হিমও। চারদিক ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে। মনে হয়, মহানগর যেন সারা গায়ে উলঙ্গবাহার শাড়ি জড়াতে শুরু করেছে।

অনেকক্ষণ চুপচাপ।

তারপর একেবারে অন্য কথায় চলে গেল ঝুমা। গাঢ় গলায় বলল, 'আমার একটা কথা রাখবে?'

অন্যমনস্কর মতো বিনু জিজ্ঞেস করে, 'কী?'

'আমাদের বাড়ি তোমাকে যেতে হবে না।'

তাদের বাড়িতে যাবার জন্য সেদিনও কত জোরাজুরি করেছে ঝুমা। কত অভিমান। হঠাৎ মতটা পালটে গেল কোন জাদুমন্ত্রে? বিমূঢ়ের মতো তাকিয়ে থাকে সে।

ঝুমা থামে নি, 'আমাদের বাড়ি গেলে সবাই ঝিনুকের কথা জিজ্ঞেস করবে। তোমার ভীষণ অস্বস্তি হবে। তার চেয়ে এক কাজ কোরো—'

'কী?'

'আমার কলেজের নামটা মনে আছে তো?'

'আছে। স্কটিশ চার্চ। কেন?'

'তুমি ওখানেই চলে যেও। আমার হিস্ট্রি অনার্স, ফার্স্ট ইয়ার। ভাল নাম শতরূপা। হিস্ট্রি ক্লাসে খোঁজ করলেই আমাকে পেয়ে যাবে।'

ইঙ্গিতটা পরিষ্কার। গোপনে তার সঙ্গে দেখা করতে চাইছে ঝুমা। সেই পুরনো শিহরনটা নতুন করে বিনুর রক্তস্রোতে চমক দিয়ে যায়।

ঝুমা ব্যগ্র সুরে বলতেই থাকে, 'যাবে তো বিনুদা? আমি কিন্তু তোমার আশায় অপেক্ষা করে থাকব। কেউ কিছু জানতেও পারবে না।'

হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন হঠাৎ সহস্র গুণ বেড়ে যায় বিনুর। ঝুমা যে সংকেতটা দিয়েছে তাতে মাথা ঝিম ঝিম করছে। তার শরীর থেকে সেই তীব্র সুঘ্রাণ, তার কথা বলার ভঙ্গি, তার তাকানো বিনুর স্নায়ুগুলোকে ফের বিবশ করে ফেলে।

বিনু কী বলতে যাচ্ছিল, হঠাৎ চোখে পড়ল, সামনের রাস্তা দিয়ে সুধা আর ঝিনুক আসছে। তাদের দু'জনের হাতেই মোটাসোটা সুদৃশ্য কাপড়ের ব্যাগ। বোঝা যায়, প্রচুর কেনাকাটা করেছে।

বিনু লহমায় ঘোরের ভেতর থেকে উঠে আসে। ভীষণ ব্যস্তভাবে বলে, 'চল চল, ওরা এসে

pathagar.net

গেছে—' সে আর দাঁড়ায় না। ত্রস্তভাবে ব্যালকনি থেকে বাড়ির ভেতর দিকে চলে যায়। ঝুমার সঙ্গে এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলে ঝিনুক তুলকালাম বাধিয়ে দেবে।

ঝুমা কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকে। মুখটা ক্রমশ শক্ত হয়ে ওঠে। চোখে ক্ষণিকের জন্য ঝিলিক খেলে যায়। তারপর ধীরে ধীরে সেও ভেতরে চলে আসে।

উমা ঘরে ঘরে আলো জ্বালিয়ে দিয়েছিল। বিনু ব্যালকনি থেকে সোজা বাইরের ঘরে চলে আসে। সুধারা দু'টো কাগজ রাখে। একটা বাংলা, একটা ইংরেজি। 'যুগান্তর' এবং 'হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড'। সঙ্গী টঙ্গী নেই। অগত্যা একা একা বাইরের ঘরে বসে আনন্দ মর্নিং এডিশনের কাগজগুলো এই সন্ধেবেলাতেও উলটে পালটে দেখছিল। বিনুকে দেখে জিজ্ঞেস করল, 'কী ব্যাপার, কোথায় ছিলে?'

একটা সোফায় বসতে বসতে বিনু বলল, 'ওধারের ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে ঝুমার সঙ্গে কথা বলছিলাম।'

ঝুমা এসে অন্য একটা সোফায় বসে। বলে, 'আমাদের কলেজের গল্প করছিলাম মামা। কোন প্রফেসর কিরকম পড়ান, কে দারুণ ফাঁকিবাজ, কোন স্টুডেন্ট ক্লাস পালিয়ে চৌরঙ্গিতে ইংলিশ পিকচার দেখতে যায়, কে মেয়েদের জ্বালাতন করে, এই সব।'

বিনু হাঁ হয়ে যায়। কেউ যে বানিয়ে বানিয়ে এত মসৃণভাবে ডাহা মিথ্যে বলতে পারে, কে জানত! ঝুমার মুখ দেখে তা বোঝার উপায় নেই। মনে হয়, যুধিষ্ঠিরের পর এমন সত্যবাদী পৃথিবীতে দ্বিতীয়টি জন্মায় নি।

আনন্দ এ নিয়ে আর কিছু জানতে চাইল না। নীচের দরজা খোলা ছিল। একটু পরেই সুধা আর ঝিনুক বাইরের ঘরে এসে ঢুকল। আনন্দদের দেখে সুধা খুব খুশি। বলল, 'ঝুমা, আনন্দদা, আপনারা কখন এসেছেন?' হাতের ব্যাগ মেঝেতে নামিয়ে সে বসে পড়ল।

আনন্দ বলল, 'প্রায় ঘন্টা দেড়েক।'

'ইস। আসবেন, আগে জানান নি কেন? ঝিনুককে গিয়ে ভবানীপুরে গিয়েছিলাম। আজ না হয় না-ই যেতাম।'

'ভবানীপুরের খবরটা বিনুর কাছে পেয়েছি। হঠাৎ একটা দরকারে আসতে হল। জানাবার সময় পাই নি।'

'দরকারের কথা পরে হবে। চা খেয়েছেন?'

শশব্যস্তে সুধা উঠতে যাচ্ছিল। বড় ভগ্নিপতি এবং তার ভাগনীকে আপ্যায়ন করাটা অত্যন্ত জরুরি। কিন্তু হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিয়ে আনন্দ বলল, 'চা মিষ্টি, সব খাওয়া হয়েছে। তুমি ছিলে না। হোস্টের ভূমিকাটা সুন্দরভাবে পালন করেছে ঝুমা। উমাকে দিয়ে চা করিয়ে খাইয়েছে।' হঠাৎ তার চোখে পড়ল ঝিনুক এখনও দাঁড়িয়ে আছে।

আনন্দ ঝিনুককে বলল, 'বোসো—'

একটু দূরে দু'টো মোড়া খালি পড়ে আছে। তার একটায় নিঃশব্দে বসল ঝিনুক।

বাইরের ঘরে ঢোকার পর থেকেই ঝিনুকের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে বিনু। পলকের জন্য নজর সরায় নি।

ঝিনুকের মুখে পর পর কত কিছুই যে ফুটে উঠছে। এই হয়তো ভয়, পরক্ষণে সংশয়, তারপরেই উত্তেজনা বা বিতৃষ্ণা। এই সে তাকাচ্ছে বিনুর দিকে। পরমুহূর্তে তার চোখ চলে যাচ্ছে ঝুমার মুখের ওপর। একবার বিনু। একবার ঝুমা। দু'জনকে দেখতে দেখতে সূক্ষ্মভাবে কিছু একটা বুঝতে চেষ্টা করছে।

আনন্দ সুধা আর ঝুমা এলোমেলো গল্প করে যাচ্ছিল। বিনুকে কিছু বললে খুব সংক্ষেপে সে উত্তর দিচ্ছে। ঝিনুক প্রায় চুপচাপ। তার চোখ অনবরত দু'টি মুখের ওপর পাক খাচ্ছে। আনন্দরা তাকে আড্ডার মধ্যে টেনে আনতে কম চেষ্টা করছে না। ঝিনুক শুধু অন্যমনস্কর মতো হুঁ হাঁ করে যাচ্ছে।

কিছুক্ষণের মধ্যে হিরণ অফিস থেকে ফিরে এল। আড্ডা নতুন করে জমে ওঠে। ফের চা আসে,

ফের খাবার।

রাত একটু বাড়লে ঝুমা বলল, 'মামা, এবার বাড়ি ফিরতে হবে। কাল সাড়ে দশটা থেকে আমার ক্লাস—'

আনন্দ ব্যস্ত হয়ে পড়ে, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, এখুনি বেরুব।' হিরণ এবং সুধাকে বলল, 'বিনুর একটা চাকরির ব্যাপারে কথা বলতে এসেছিলাম। ওকে সব জানিয়েছি। তোমরাও শোন।'

সবিস্তার সব বলল আনন্দ। খুঁটিনাটি কিছুই বাদ দিল না। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'বিনু রাজি আছে। তোমরা কী বল?'

সুধা বলল, 'খবরের কাগজের চাকরি। বিনু তো এ ধরনের কাজ আগে করে নি। পারবে কি?'

আনন্দ বলল, 'বিনুও সেই কথাই বলছিল। এত লোক পারছে, ও-ই বা পারবে না কেন? কাজ করতে করতে শিখে নেবে।' একটু ভেবে বলল, 'জার্নালিস্টই যে হতে হবে, তার কোনও মানে নেই। নিউজ পেপারে কত ডিপার্টমেন্ট আছে। যেখানে সুটেবল মনে হবে সেখানেই জগদীশবাবু ওঁকে প্লেস করে দেবেন।'

সুধা বলল, 'গভর্নমেন্ট সারভিস হলে ভাল হত।'

আনন্দ বলল, 'শুনলাম হিরণ ওদের ডিপার্টমেন্টে চেষ্টা করছে। সেটা—'

তাকে থামিয়ে দিয়ে হিরণ বলল, 'সরকারি চাকরি তো বললেই হয়ে যায় না। যদ্দিন না হচ্ছে, বসে থাকবে কেন? যেটা হাতে এসেছে, নিয়ে নেওয়াই ভাল।'

সুধা আর আপত্তি করে না।

আনন্দ উঠে পড়তে পড়তে বলে, 'বিনু, কাল ঠিক সময়ে আমার অফিসে চলে যেও।'

বিনু মাথা নাড়ে, 'আচ্ছা—'

রাতে খাওয়াদাওয়ার পর বিনুকে একা পেয়ে চাপা গলায় ঝিনুক বলে, 'ঝুমা এসেছিল কেন?'

বিনু বলল, 'এতক্ষণ ছিল। ওকে জিজ্ঞেস করলেই পারতে।'

'তোমাকে করছি। তুমি উত্তর দাও।'

'ওর মামা ওকে নিয়ে এসেছে, তাই এসেছে। এখানে আমার কিছু করার নেই।'

কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকে ঝিনুক। নিষ্পলকে। তারপর বলে, 'বাড়িতে কেউ নেই, দু'জনে খুব মজা করলে, তাই না?'

বুকের ভেতরটা ধক করে ওঠে বিনুর। ঝিনুকের কথায় কোন সংকেত রয়েছে, নিমেষে টের পেয়ে যায় সে। এর মধ্যেই বুঝে গেছে, এই মেয়েটিকে সুস্থ স্বাভাবিক রাখতে অনেকখানি কৌশল প্রয়োজন। দরকার কিছুটা কপটতার। গম্ভীর মুখ করে বিনু বলে, 'বাড়িতে উমা আর আনন্দদা ছিল। মজা করবার সময় পাওয়া যায় নি। চাকরির খবর নিয়ে আনন্দদা এসেছিল। তার সঙ্গে কথা বলতে বলতে তোমরা এসে গেলে।'

'সারাক্ষণ চাকরির কথাই বলছিলে?' ঝিনুক বলতে লাগল, 'একবারও আলাদা করে ঝুমা তোমার সঙ্গে গল্প করে নি?'

সুনীতিদের বাড়িতে প্রায় এমনটাই ঘটেছিল। ঝিনুক তখন একতলায়। দোতলায় ছিল বিনু সুনীতি মাধুরী আর ঝুমা। ঝিনুক ধরেই নিয়েছিল, ঝুমা সুযোগ করে নিয়ে তাকে কাছে পেতে চেষ্টা করেছে। ঝুমা সম্পর্কে সন্দেহটা কোনও দিনই বুঝিবা ঘুচবে না ঝিনুকের।

বিনু বলল, 'আনন্দদাকে তো এখন পাচ্ছ না। উমা আছে। তাকেই জিজ্ঞেস করে দেখ।' বলেই ত্রস্ত হয়ে ওঠে। ঝোঁকের মাথায় বিরাট ঝুঁকি নেওয়া হল। পরক্ষণে ভাবে, কাজের মেয়ের কাছে এমন একটা ব্যাপারে কি খোঁজ নিতে যাবে ঝিনুক? কিন্তু সন্দেহের কীট যার মাথায় অবিরত বিষ ঢালছে তার পক্ষে কোনও কিছুই কি অসম্ভব?

আপাতত ক'টা দিন সহজভাবে শ্বাস নিতে পারবে না বিনু।

ডালহৌসি স্কোয়ারে আনন্দদের অফিস। সেখানে কিভাবে, কোন রুটের ট্রাম বা বাস ধরে যেতে হবে, জলের মতো বুঝিয়ে দিয়েছিল সে।

সুধাদের বাড়ি থেকে তিনটে নাগাদ বেরিয়ে ট্রামই ধরল বিনু। চল্লিশ মিনিটের ভেতর ডালহৌসি পৌঁছে গেল। যেদিকেই তাকানো যাক, একটা প্রকাণ্ড দীঘি ঘিরে বিশাল বিশাল সব বিল্ডিং।

আনন্দদের অফিসটা ক্লাইভ স্ট্রিটে। মস্ত ঘড়িওলা জি.পি.ও'র পাশ দিয়ে উত্তর দিকে মিনিট তিনেক হাঁটলেই বাঁ ধারের ফুটপাথে 'ক্রফোর্ড ম্যানসন'। আনন্দ বলে দিয়েছিল, এই বাড়ির তেতলায় সে বসে।

রাস্তার লোককে জিজ্ঞেস করে করে 'ক্রফোর্ড ম্যানসন'-এ চলে এল বিনু। ব্রিটিশ আমলের বিরাট বাড়ি। গেটে উর্দি-পরা শিখ দারোয়ান। ছ'ফিটের ওপর হাইট। মাথায় পাগড়ি। জবরদস্ত চেহারা। ভয়ে ভয়ে তার পাশ দিয়ে বিল্ডিংয়ে ঢুকলেই রিসেপশন। কাচের দেওয়াল দিয়ে ঘেরা সাজানো গোছানো, এয়ার-কণ্ডিশনড চেম্বারে একটি ঝকঝকে অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান তরুণীকে দেখা গেল। তাকে এড়িয়ে ভেতরে যাবার উপায় নেই। কী করবে, বুঝে উঠতে পারছিল না বিনু। রাজদিয়ায় যার জীবনের বেশির ভাগটাই কেটে গেছে তার পক্ষে এই ধরনের অফিসের কায়দা কানুন জানার কথা নয়।

রিসেপশানিস্ট মেয়েটি বিনুকে দেখতে পেয়েছিল। হাতের ইশারায় চেম্বারে ডেকে বলল, 'ইয়েস, হোয়াট ক্যান আই ডু ফর ইউ?'

সারা শরীরে অঢেল, উগ্র যৌবন। নখে ঠোঁটে গালে চড়া রং। বাদামি চুল কাঁধ পর্যন্ত ছাঁটা। পরনে টাইট স্কার্ট আর চাপা শার্ট। তার গা থেকে পারফিউমের ঝাঁঝাল গন্ধ উঠে আসছিল।

মেয়েটা সাত আট ফুট দূরে বসে আছে। বিনু আর তার মাঝখানে ওভাল শেপের গ্লাস-টপ টেবল, তিন চারটে টেলিফোন, পেন হোল্ডারে নানারকম কলম, টেবল ক্যালেণ্ডার, ভিজিটরস স্লিপের ক'টা প্যাড, ইত্যাদি।

এ ধরনের মেয়ের এত কাছাকাছি আসা তো দূরের কথা, আগে কখনও চোখে দেখে নি বিনু। হেমন্তের এই শীতল বেলাশেষে ঘামতে লাগল সে। নাকমুখ ঝাঁ ঝাঁ করছে।

ঢোক গিলে গেঁয়ো উচ্চারণে, ইংরেজিতেই বিনু তার আসার উদ্দেশ্যটা জানিয়ে দিল।

রিসেপশনের একধারে অনেকগুলো সোফা আর সেন্টার টেবল রয়েছে। আছে ক'টা রঙিন ইংরেজি ম্যাগাজিন। মেয়েটি সোফাগুলো দেখিয়ে বলল, 'প্লিজ সিট দেয়ার—' একটা ফোন তুলে কার সঙ্গে যেন কথা বলে সেটা নামিয়ে রাখতে রাখতে বিনুর দিকে তাকাল, 'একটু অপেক্ষা করুন—'

মিনিট পাঁচেকও বসতে হল না। আনন্দ এসে হাজির। মেয়েটা তা হলে আনন্দকেই ফোনে তার আসার খবরটা দিচ্ছিল।

সোফার কোণে সিটিয়ে বসে ছিল বিনু। এক পলক তাকে দেখল আনন্দ। পরক্ষণে তার চোখ চলে গেল রিসেপশানিস্ট মেয়েটির দিকে। বিনুর আড়ষ্টতার কারণটা আঁচ করে নিল সে। বলল, 'চল, বেরুনো যাক।'

আনন্দকে দেখে হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে বিনু। বলল, 'আপনার ছুটি পাঁচটায়। এখন সবে চারটে পাঁচ। এক্ষুনি বেরুবেন?'

'নো প্রবলেম। আমার ডিপার্টমেন্টের আমিই টপ ম্যান। কখন বেরুব না-বেরুব, সে জন্যে কাউকে কৈফিয়ৎ দিতে হবে না। তা ছাড়া, জগদীশবাবুর সঙ্গে আজ সকালে আমার কথা হয়েছে। তোমাকে

সোয়া পাঁচটা নাগাদ মিয়ে যেতে বলেছেন। সেন্ট্রাল অ্যাভেনিউতে যেতেও তো খানিকটা সময় লাগবে।'

বিনু কিছু বলল না।

অফিসের বাইরে এসে আনন্দর একটু মজা করতে ইচ্ছা হল, 'লিজার সামনে অমন কাঠ হয়ে বসে ছিলে কেন?'

জানা গেল রিসেপশানিস্ট মেয়েটির নাম লিজা। মুখ লাল হয়ে ওঠে বিনুর। বলে, 'না, মানে—'

'কলকাতায় এসেছ। এরকম কত মেয়ের সঙ্গে আলাপ হবে। ট্রাই টু বি স্মার্ট। গা থেকে রাজদিয়ার গন্ধটা যত তাড়াতাড়ি পার, ঝেড়ে ফেল। নইলে এখানে টিকতে পারবে না।'

'আচ্ছা আনন্দদা—'

'বল—'

'আপনাদের অফিসে বুঝি সোজাসুজি ভেতরে যাওয়া যায় না?'

আনন্দ আন্দাজ করে নিল, বিনুর মাথায় লিজা এখনও ভর করে আছে। বলল, 'ব্রিটিশ কোম্পানির অফিস তো। তাদের কিছু কায়দাকানুন আছে। রিসেপশানিস্টের থ্রু দিয়েই ভেতরে যেতে হয়। আচ্ছা—'

বিনু উৎসুক দৃষ্টিতে তাকায়।

আনন্দর চোখ থেকে কৌতুক উপচে পড়ছিল। বিনুকে আরেকটু খোঁচাতে চাইছিল সে। বলল, 'লিজার সামনে কয়েক মিনিট তো বসে ছিলে। রিয়ালি বিউটিফুল, সাঙ্ঘাতিক ফিগার। কি, ঠিক বলছি?'

আরেক বার মুখটা আরক্ত হল বিনুর। তবে সে লিজার ধার কাছ দিয়েও গেল না। বলল, 'ইণ্ডিয়া তো স্বাধীন হয়ে গেছে। এখনও এদেশে ব্রিটিশ কোম্পানি আছে?'

'প্রচুর। তবে বেশিদিন থাকবে না। পাঁচ সাত বছরের ভেতর ইণ্ডিয়ানদের হাতে কারবার টারবার বেচে দিয়ে দেশে ফিরে যাবে।'

ফুটপাথ ধরে ওরা খানিকটা এগিয়ে এসেছিল।

আনন্দ এবার জিজ্ঞেস করল, 'কিভাবে যাবে বল?'

বুঝতে না পেরে বিনু বলল, 'কিভাবে বলতে?'

'ট্যাক্সি নিলে মিনিট পনের কুড়ির ভেতর পৌঁছে যাব। তবে ওখানে গিয়ে জগদীশবাবুর জন্যে ওয়েট করতে হবে। আমার ইচ্ছে হেঁটেই যাই। তা হলে এই অফিস পাড়াটা মোটামুটি তোমাকে চিনিয়ে দিতে পারব। তাই একটু আগে আগে অফিস থেকে বেরুলাম।'

'সোয়া পাঁচটার মধ্যে পৌঁছতে পারব তো?'

'নিশ্চয়ই। ওখানে যাওয়াটাই তো আসল ব্যাপার।'

বিনু বলল, 'হেঁটেই চলুন। কলকাতাটা ভাল করে চেনা দরকার।'

রাইটার্স বিল্ডিং, স্টক এক্সচেঞ্জ, ব্র্যাবোর্ন রোড, বৌবাজার স্ট্রিট, চিৎপুর রোড, নাখোদা মসজিদ, ইত্যাদি দেখাতে দেখাতে ওরা হ্যারিসন রোডের ক্রসিংয়ে চলে এল। সেখান থেকে ডান দিকে ঘুরে সেন্ট্রাল অ্যাভেনিউ।

জগদীশ গুহঠাকুরতাদের কাগজের অফিসটা বিবেকানন্দ রোডের কাছাকাছি। বিনুরা যখন সেখানে এল, পাঁচটা বেজে দশ। পাঁচ মিনিট আগেই তারা পৌঁছে গেছে।

তেতলা বাড়িটা পুরনো হলেও বেশ মজবুত। ভিত এত শক্তপোক্ত যে অনায়াসে আরও তিরিশ চল্লিশ বছর টিকে যাবে। দেখতে আহামরি কিছু নয়। খুবই সাদামাঠা। কারুকার্যহীন।

ভেতরে ঢুকতেই বিনুর চোখে পড়ল, বিশাল একটা হল-ঘর। সেটার একদিকে ছাপাখানা। বেশ কিছু লোকজন সেখানে রয়েছে। একটা লম্বা ধরনের মস্ত যন্ত্রে ঝড় তুলে কী যেন ছাপা হচ্ছে। আনন্দ বলল, 'ওটা রোটারি মেশিন। জগদীশবাবুরা যে কাগজ বার করবেন, সেটা এই মেশিনেই ছাপা হবে। এখন তার ট্রায়াল চলছে।'

হল-ঘরের আরেক দিকে তিনটে লাইনো মেশিনের সামনে বসে তিনটে লোক বোতাম টিপে টিপে কম্পোজ করে চলেছে। মেশিনগুলো বিনুকে চিনিয়ে দিল আনন্দ। এ দিকেই এক কোণে বিরাট বিরাট গোলাকার চাকার মতো বিদেশি নিউজপ্রিন্টের রিল ডাঁই হয়ে পড়ে আছে।

হল-ঘরের শেষ প্রান্তে চওড়া চওড়া সিঁড়ি। আনন্দরা দোতলায় এল। এখানেও মস্ত হল-ঘরে কাঠ আর কাচ দিয়ে তৈরি ছোট বড় অনেকগুলো ছোট বড় খুপরি। সেগুলোর ভেতর কিছু লোকজন দেখা গেল।

আনন্দ বিনুকে সঙ্গে করে এবার সোজা তেতলায় উঠে এল। নিচের ফ্লোর দু'টোর মতো এখানেও একই মাপের হল-ঘর। সেটার আধাআধি জুড়ে প্রচুর চেয়ার টেবল পাতা রয়েছে। বাকি অর্ধেকটায় কাচ দিয়ে ঘেরা অনেকগুলো চেম্বার। কয়েকটা চেম্বারে কিছু লোকজন দেখা গেল। বাকিগুলো ফাঁকা।

একটা টেলিপ্রিন্টার মেশিন অবিরল খটখট আওয়াজ তুলে হিল্লিদিল্লির খবর নিয়ে আসছে। ওটার মুখ থেকে লম্বা কাগজে সেই সব সংবাদ বেরুচ্ছে একটানা। ছেদহীন।

টেলিপ্রিন্টারের কার্যকারিতা বুঝিয়ে দিয়ে হল-ঘরের শেষ প্রান্তে সবচেয়ে বড় চেম্বারটার সামনে চলে এল আনন্দরা।

চেম্বারের দরজার সামনে উঁচু টুলে বসে ছিল একটি অল্প বয়সের বেয়ারা। ত্বরিত পায়ে উঠে দাঁড়িয়ে সে বলল, 'সাহেব আপনাদের জন্যে অপেক্ষা করছেন—'

বিনু আন্দাজ করে নিল, এখানে আনন্দর যাতায়াত আছে। বেয়ারাটা তাকে চেনে।

চেম্বারের ভেতরে যেতেই বিনু দেখতে পেল, বিশাল সেক্রেটারিয়েট টেবলের ওধারে রিভলভিং চেয়ারে যিনি বসে আছেন তাঁর বয়স পঁয়ষট্টি ছেষট্টি। মাঝারি হাইট। টকটকে ফর্সা রং। লম্বা ধাঁচের মুখ। শরীরে কিছু মেদ জমেছে, এই বয়সে যেমনটা হয়। চওড়া কপাল। এই বয়সেও প্রচুর চুল। তবে বেশির ভাগই সাদা। চোখে পুরু ফ্রেমের চশমা। পরনে ঢোলা ট্রাউজার্স, শার্ট এবং কোট। তাঁর সমস্ত চেহারায় শান্ত গাম্ভীর্য। তিনিই যে জগদীশ গুহঠাকুরতা, না বলে দিলেও চলে।

জগদীশ বললেন, 'এস আনন্দ। বোসো—'

পুরো চেম্বারটার মেঝে জুট কার্পেট দিয়ে মোড়া। এক পাশের দেওয়াল ঘেঁষে ঝকঝকে নতুন দু'টো আলমারি।

জগদীশের টেবলে তিনটে টেলিফোন। সাত আটটা পেন্ড অজস্র ফাইল। এধারে দর্শনপ্রার্থীদের জন্য গদিমোড়া, আরামদায়ক আট দশটা চেয়ার।

জগদীশ চেয়ারগুলোর দিকে আঙুল বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। আনন্দরা বসে পড়ল।

অদ্ভুত একটা অনুভূতি হচ্ছিল বিনুর। সেটা কি ভয়? নার্ভাসনেস? মৃদু উত্তেজনা? না কি সব কিছুর মিশ্রণ? আনন্দ যদিও শতকরা একশ' ভাগ আশ্বাস দিয়েছে, তবু সে জানে, টেবলের উলটো প্রান্তে বসে-থাকা রাশভারী মানুষটির ইচ্ছা বা মর্জির ওপর তার চাকরি নির্ভর করছে।

বিনুকে দেখিয়ে জগদীশ আনন্দকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এর কথাই তো বলেছিলে?'

'হ্যাঁ।' আনন্দ মাথা হেলায়।

জগদীশ ধীর, স্থির, তীক্ষ্ণবুদ্ধি মানুষ। কোনও রকম তাড়াহুড়ো নেই। ছোট ছোট ক'টি প্রশ্ন করে বিনুর শিক্ষাগত যোগ্যতা, পাকিস্তান থেকে সে কবে এসেছে, সেখানকার পরিস্থিতি কতটা আতঙ্কজনক, কলকাতায় আসার সময় বিপদে পড়তে হয়েছিল কিনা, ইত্যাদি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেনে নিলেন।

ঝিনুকের প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে বাকিটা ঠিক ঠিক বলে গেল বিনু। এমনকি জগদীশ জানতে না চাইলেও

pathagar.net

তার সার্টিফিকেট এবং ডিগ্রি কিভাবে খোয়া গেছে তাও শোনাল।

ডিগ্রি টিগ্রিগুলোর ব্যাপারে আপাতত খুব একটা গুরুত্ব দিলেন না জগদীশ। ওগুলো পরে আনিয়ে দিলেও চলবে। কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললেন, 'আনন্দকে কথা দিয়েছি, আমার কাগজে তোমাকে নিশ্চয়ই নেব। কাগজে অনেক ডিপার্টমেন্ট থাকে। সার্কুলেশন, অ্যাকাউন্টস, রিপোর্টিং, প্রুফ রিডিং, সাব-এডিটিং—এমনি কত কী। কোথায় কাজ করতে চাও?'

বিনুর সারা শরীরে শিহরন খেলে গেল। এখন সে নিশ্চিত, এখানে চাকরি তার হচ্ছেই। আনন্দ অলীক আশ্বাস দেয় নি। কাঁপা গলায় বলল, 'আমি আগে কোথাও কাজ করি নি। চাকরির কোনও অভিজ্ঞতা নেই। আপনি যেখানে বলবেন—'

জগদীশ বিনুর সঙ্গে কথা বলে মনস্থির করে ফেলেছিলেন। বললেন, 'ইয়াং ম্যান, তোমাকে এমন একটা কাজ দিতে চাই, যার মধ্যে চ্যালেঞ্জ আছে।' বলেই বেল বাজালেন।

শশব্যস্ত সেই বেয়ারাটা দৌড়ে চেম্বারে চলে আসে। জগদীশ বললেন, 'তারাপদবাবুকে আমার চেম্বারে আসতে বল। এখুনি যেন চলে আসেন।'

কিছুক্ষণ পর মাঝবয়সী তারাপদ এলেন। পাতলা চুল, গোল মুখ। শ্যামবর্ণ। একহারা মেদহীন চেহারা। পুরু লেন্সের আড়ালে ঝকঝকে, বুদ্ধিদীপ্ত চোখ। পরনে ধবধবে ধুতি পাঞ্জাবি। পায়ে মোটা সোলের চপ্পল।

জগদীশ বিনুর সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দিলেন, 'এ হল বিনু, মানে বিনয়। আর উনি তারাপদ ভৌমিক, আমাদের কাগজের নিউজ এডিটর।' তারাপদকে বললেন, 'এই ছেলেটি দিন কয়েক আগে পাকিস্তান থেকে এসেছে। ওকে আমাদের কাগজে নিচ্ছি। বিনয় পাকিস্তানে যা চলছে তার ভিভিড ডেসক্রিপশন দিচ্ছিল। রিফিউজি প্রবলেম তো এখন ইণ্ডিয়ার একটা জ্বলন্ত সমস্যা। কবে যে তা মিটবে, কেউ জানে না। অন্য সব কাগজে রিফিউজিদের নিয়ে লেখালিখি নিশ্চয়ই হচ্ছে। কিন্তু আমরা এই বিষয়টার ওপর বিশেষভাবে জোর দিতে চাই।' একটু থেমে বললেন, 'বিনয় যা বলল সেটা কাগজে বেরুলে সেনসেশন হবে। তবে ও কিরকম লিখতে পারবে, জানি না। আপনার সঙ্গে ওকে নিয়ে যান। একটা ছোট কিছু লিখতে দিয়ে দেখুন, কতটা কী পারে। আধ ঘণ্টা পর ওকে নিয়ে আমার কাছে আসবেন।'

তারাপদ ভৌমিকের কামরাটা হল-ঘরের অন্য প্রান্তে। মানুষটি সহৃদয়, স্নেহপ্রবণ। নতুন করে পাকিস্তানে তার নানা অভিজ্ঞতার কথা তাঁকে বলতে হল। গভীর মনোযোগে সব শুনে তিনি বিনুকে রামরতন গাঙ্গুলির শোচনীয় মৃত্যুর ঘটনাটা লিখতে বললেন।

বিনুর চোখের সামনে দৃশ্যটা ভাসছে। কুড়ি বাইশ মিনিটের ভেতর সেটা লিখে ফেলল সে। মাত্র আড়াইটা পাতা। এক নিশ্বাসে পড়ে ফেললেন তারাপদ। দু'চারটে সংস্কৃত-ঘেঁষা খটমট শব্দ বাদ দিলে লেখার স্টাইলটা ভাল। নির্ভুল, ঝরঝরে বাংলা।

তারাপদ খুঁত শুধরে দিয়ে বললেন, 'খবরের কাগজ কলেজ ইউনিভার্সিটির পণ্ডিত মাস্টারমশাইরাই শুধু পড়ে না। নাইন্টি পারসেন্ট হল সাধারণ আধা-শিক্ষিত পাঠক। শক্ত শক্ত শব্দ লিখলে তারা বুঝতে পারবে না। ভাষাটা সহজ না হলে তাদের সঙ্গে কমিউনিকেট করা যাবে না। কথাটা মনে থাকবে?'

'থাকবে।' ঘাড় হেলিয়ে দেয় বিনু। ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করে, 'লেখাটা ঠিক হয়েছে?'

উত্তর না দিয়ে তারাপদ বললেন, 'চল আমার সঙ্গে।' বিনুকে সঙ্গে করে জগদীশের চেম্বারে আবার এলেন তিনি।

জগদীশ উৎসুক চোখে তাকালেন।

তারাপদ বললেন, 'ল্যাংগুয়েজের ওপর দখল আছে। লেখার স্টাইল ভাল। ছোট একটা পিস লিখতে দিয়েছিলাম। রিয়ালি গুড। মনেই হয় না আনকোরা, ইন-এক্সপিরিয়েন্সড একটা ছেলে লিখেছে।'

BanglaBook.org

একজন পাকা বার্তা-সম্পাদক এমন ঢালাও প্রশংসা করবেন, ভাবতে পারে নি বিনু। ভেতরে ভেতরে প্রবল উদ্দীপনা বোধ করছিল সে। সেই সঙ্গে বিহ্বলও হয়ে পড়েছিল।

জগদীশ জিজ্ঞেস করলেন, 'কী হিসেবে ওকে নিলে ভাল হয়? সাব-এডিটর, না রিপোর্টার?'

তারাপদ বললেন, 'আমার তো মনে হয়, রিপোর্টিংয়ে দিলে যথেষ্ট ভাল করবে।'

'ঠিক আছে। আপনাকে আর আটকে রাখব না।'

তারাপদ চলে গেলেন।

জগদীশের আগের সেই গাম্ভীর্য এখন অনেকখানি উধাও। তারাপদর সুপারিশ তাঁকে খুশি করেছে। হাসিমুখে বিনুকে বললেন, 'এ মাস তো শেষ হয়ে এল। আমার ইচ্ছা, নেক্সট মাছের এক তারিখ থেকে জয়েন কর। অসুবিধে নেই তো?'

আজই চাকরিটা হয়ে যাবে, কল্পনাও করে নি বিনু। মনে মনে ডানা মেলে মহাকাশে উড়তে ইচ্ছা হচ্ছিল তার। বলল, 'না না, কোনও অসুবিধে নেই।'

জগদীশ বললেন, 'গুড। তবে একটা কথা প্রথমেই বলে রাখি—'

জিজ্ঞাসু চোখে বিনু তাকায়।

জগদীশ বলেন, 'আমাদের নতুন কাগজ। এখনও পাবলিকেশন শুরু হয় নি। খুব বেশি কিছু এক্সপেক্ট করো না। আপাতত ট্র্যাভেল এক্সপেন্স মিলিয়ে দেড়শ'র মতো পাবে।'

বিনু চুপ করে থাকে।

আনন্দ তার হয়েই জবাবটা দেয়, 'ঠিক আছে। আসছে মাস থেকে ও কাজ শুরু করে দেবে।'

জগদীশ বললেন, 'নিউজপেপারের প্রসপেক্ট যথেষ্ট ভাল। স্বাধীনতার পর থেকে লোকে নানা খবর জানতে চায়। রিডারশিপ বাড়ছে। আমাদের কাগজ দাঁড়িয়ে গেলে এমপ্লয়ীরা বঞ্চিত হবে না।'

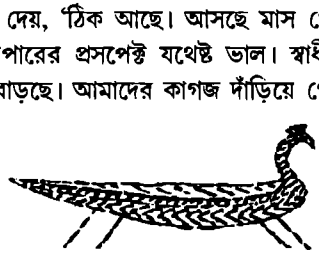

নিত্য দাস কথা রেখেছে। ঠিক তের দিনের মাথায় হেমনাথের চিঠি নিয়ে হাজির হল। লোকটা যে করিৎকর্মা, তাতে আর বিন্দুমাত্র সংশয় নেই।

যথারীতি সুধাদের দোতলার ড্রইং রুমে নিত্যকে বসানো হয়েছে। তার মুখোমুখি বসেছে হিরণ, বিনু এবং সুধাও। হেমনাথ বিনুর চিঠির কী উত্তর দিয়েছেন তা জানতে বিনুদের মতো সুধাও ভীষণ উদ্‌গ্রীব। ঝিনুক অবশ্য আসে নি। সে ভেতর দিকের একটা ঘরে রয়েছে। নিত্যকে সে পছন্দ করে না। তবে তার সমস্ত ইন্দ্রিয় টান টান। বাইরের ঘরে কী কথা হয়, শোনার জন্য তার শ্বাসপ্রশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে গেছে।

পকেট থেকে মুখবন্ধ একটা মোটা খাম বার করে বিনুর হাতে দিতে দিতে নিত্য দাস বলল, 'এই ন্যান (নিন) হ্যামকত্তার জবাব—'

খামটা নিয়ে বিনু জিজ্ঞেস করল, 'কী লিখেছে দাদু?'

নিত্য দাস হাসল, 'হেয়া (তা) আমি ক্যামনে জানুম? জবাবহান তো খামের ভিত্‌রে। পইড়্‌ দ্যাখেন—'

বিনু বুঝল, প্রশ্নটা আহাম্মকের মতো হয়ে গেছে। খামের মুখ ছিঁড়ে চিঠি বার করল সে। হেমনাথের হাতের লেখা একটু টানা হলেও খুবই পরিচ্ছন্ন। কাটাকুটি নেই। সাধু বাংলায় তিনি চিঠিপত্র লেখেন।

বিনু পড়তে লাগল ঃ

'কল্যাণীয় বিনু,

'তোমরা রাজদিয়া হইতে চলিয়া যাইবার পর কী উৎকণ্ঠার ভিতর আমাদের দিন কাটিয়াছে,

বুঝাইয়া বলিতে পারিব না। রাজেকের মুখে শুনিয়াছি, মহা বিপদের মধ্যে তোমরা তারপাশার স্টিমারঘাটে পৌঁছাইয়াছিলে। যে কোনও মুহূর্তে মৃত্যু ঘটিতে পারিত। তারপাশায় যাইবার পর কী হইয়াছে, জানিতে পারি নাই।

'যাহা হউক, তোমরা শেষ পর্যন্ত শত বিপত্তির মধ্যেও যে কলিকাতায় যাইতে পারিয়াছ, ইহা ঈশ্বরের অশেষ করুণা।

'লিখিয়াছ, বর্তমানে সুধা এবং হিরণের বাড়িতে নিরাপদে আছ। অবনীমোহন তীর্থধর্ম সারিয়া কলিকাতায় ফিরিলে তাহার নিকট চলিয়া যাইবে। সুনীতিদের সম্পর্কে কিছু জানাও নাই। উহাদের সঙ্গে কি তোমার দেখাসাক্ষাৎ হয় নাই?

'বর্তমানে রাজদিয়া সম্পর্কে তোমাকে কিছু সংবাদ দিতেছি। এখানকার অবস্থা আগের তুলনায় অনেক বেশি উত্তেজনাপূর্ণ। চারিদিকের গ্রামগঞ্জে হঠাৎ রাজাকারদের উৎপাত বাড়িয়া গিয়াছে। তবে রাজদিয়ায় এখনও তাহারা হানা দেয় নাই। তোমরা চলিয়া যাইবার পর কিছু বিহারী মুসলমান ইণ্ডিয়া হইতে আসিয়া এখানে প্রচণ্ড উৎপাত করিতেছে। আমাকে না হইলেও অন্যদের প্রকাশ্যেই শাসাইতেছে। উদ্দেশ্য, হিন্দুরা চলিয়া গেলে তাহাদের জমিজমা বাড়িঘর দখল করিয়া বসা।

'মানুষের মনোবল প্রায় ধসিয়া পড়িয়াছে। প্রতিদিন দলে দলে তাহারা দেশ ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছে। এই ভাঙন রোধ করিবার উপায় নাই।

'সাধারণ অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত, নিরীহ মানুষজনকে দোষ দিয়া কী হইবে? গান্ধীজি একবার স্থির করিয়াছিলেন, পূর্ব পাকিস্তানে আসিয়া থাকিবেন। হয়তো আসিতেন, কিন্তু তাহার পূর্বেই নিহত হইলেন। তিনি আসিলে পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি হয়তো বদলাইয়া যাইত।

'তোমার খুব সম্ভব মনে নাই, সাতচল্লিশের অক্টোবরে এক প্রার্থনাসভায় গান্ধীজি পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহারা যেন দেশত্যাগ না করে। ঈশ্বর ছাড়া অন্য কাহাকেও ভয় পাওয়ার কারণ নাই। যাহারা প্রকৃত সাহসী শাসানির ভয়ে তাহারা কেহ পিতৃপুরুষের ঘরবাড়ি ছাড়িয়া আসে না। আত্মসম্মান নষ্ট হওয়ার চেয়ে মৃত্যুও শ্রেয়।

'পরবর্তী কালে বহু ভারতীয় নেতার মুখেও প্রায় একই উপদেশ শোনা গিয়াছে। দূর হইতে উপদেশবর্ষণ করা অনেক সহজ। তাঁহাদের নিকট আমার বিশেষ আর্জি, ছদ্মবেশে, প্রহরীহীন অবস্থায় একবার আসিয়া পূর্ব পাকিস্তানের অবস্থা স্বচক্ষে দেখিয়া যান।

'তুমি তো জানো, দেশভাগের সঙ্গে সঙ্গে এই বঙ্গের শিক্ষিত সম্প্রদায় বলিতে যাহাদের বুঝি— উকিল, অধ্যাপক, স্কুলশিক্ষক, সরকারি বেসরকারি কর্মকর্তা, এমনকি রাজনৈতিক দলের নেতা— তাহাদের শতকরা নব্বই ভাগ ইণ্ডিয়ায় পলায়ন করিয়াছে। সাধারণ মানুষ কাহার ভরসায়, কাহার মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিবে? পুলিশের নিকট অভিযোগ জানাইতে গেলে লাঞ্ছিত হইতে হয়। প্রশাসন সংখ্যালঘুদের সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন। ভারত সরকার পাকিস্তানের উপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি না করিলে দেশত্যাগ বন্ধ হইবে না।'

'তুমি সম্পত্তি বিনিময়ের যে কথা লিখিয়াছ তাহা যথেষ্ট উৎসাহজনক। শাজাহান সাহেবের জমিজমা এবং বাড়ির মূল্য আমাদের বিষয় আশয়ের সমান সমানই হইবে। সেদিক হইতে কোনও লোকসান নাই। তবু এই মুহূর্তে আমি সিদ্ধান্ত লইতে পারিতেছি না। তাহার কারণও জানাইতেছি।

'তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে, পাকিস্তানকে ইসলামিক স্টেট বা মুসলিম রাষ্ট্র হিসাবে ঘোষণা করা হইয়াছে। কিছুকাল আগে কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলিতে বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের সরকারি ভাষা করার দাবি নাকচ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। যদিও বাংলা অধিকাংশ পাকিস্তানির মাতৃভাষা।

'লিয়াকৎ আলির যুক্তি, যেহেতু পাকিস্তান একটি মুসলিম রাষ্ট্র, সুতরাং ইহার উপযোগী একটি ভাষা প্রয়োজন। সেক্ষেত্রে উর্দুই সর্বোত্তম। খাজা নাজিমুদ্দিন, সিন্ধু প্রদেশের প্রতিনিধি এন এইচ গজদার প্রমুখ অনেকেই উর্দুর পক্ষে সওয়াল করেন।

'পূর্ব পাকিস্তানের ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত এবং কংগ্রেসের এস সি চট্টোপাধ্যায় বাংলার পক্ষে বলেন। তাঁহাদের যুক্তি, পাকিস্তানের প্রায় সাত কোটি মানুষের মধ্যে সাড়ে চার কোটি বাংলাভাষী। কাজেই তাহা উপেক্ষা করা উচিত নয়। কিন্তু তাঁহাদের কথায় পশ্চিম পাকিস্তানের অন্য কেহ কর্ণপাত করিতে চাহেন নাই। তবে পূর্ব পাকিস্তানের তমিজদ্দিন খান বলিয়াছিলেন, ধীরেনবাবু এবং এস সি চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

'যাহা হউক, সম্প্রতি বাংলাভাষার প্রতি উপেক্ষায় পূর্ব পাকিস্তানে প্রচণ্ড ক্ষোভের সঞ্চার হইয়াছে। ঢাকায় এবং অন্যান্য ক'টি শহরে তীব্র প্রতিবাদ চলিতেছে। এই প্রতিবাদ শুধু মুসলমানরাই করিতেছে না। হিন্দুদেরও তাহাদের পাশে টানিয়া লইতেছে। আমার বিশ্বাস, খুব শীঘ্রই পূর্ববঙ্গে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির ঊর্ধ্বে বাঙালি জাতীয়তাবাদের স্ফুরণ ঘটিবে। আমি সেই লক্ষণ দেখিতে পাইতেছি।

'শত্রু সম্পত্তি ঘোষণার কথা আমিও শুনিয়াছি। তবে এখনও তাহা কার্যকরী হয় নাই। আমি অন্তত তেমন কিছু জানি না।

'ভাষা লইয়া যে আন্দোলন শুরু হইয়াছে তাহাতে এই তমসাচ্ছন্ন সময়ে আলোর রেখা দেখা যাইতেছে। আমি তাই আরও কিছুকাল অপেক্ষা করিতে চাই।

'যে লোকটি তোমার পত্র লইয়া আসিয়াছে তাহার নাম জয়নাল। সে পাকিস্তানি, ফরিদপুরে বাড়ি। তোমার চিঠি কিভাবে পাইল, জিজ্ঞাসা করায় জানাইল, নিত্য দাস তাহাকে দিয়াছে। নিত্য নাকি জয়নালের মতো আরও বহু পাকিস্তানি মারফত সম্পত্তি বিনিময়ের কারবার করিতেছে। লোকটা যে অত্যন্ত ধুরন্ধর তাহা অনেক দিন ধরিয়াই জানি। অবশ্য একটা বিশেষ উপকার সে করিয়াছে। তোমার পত্র কৌশলে আমার নিকট পৌঁছাইয়া দিয়া দুর্ভাবনার অবসান ঘটাইয়াছে।

'জয়নালকে আমি কিছু টাকা দিয়াছি। সে বলিয়াছে, তুমি চিঠি লিখিলে সে নিত্য দাসের নিকট হইতে লইয়া আসিবে। আপাতত উহাদের মাধ্যমে তোমার সহিত যোগাযোগ রাখিতে হইবে।

'তোমার দুই দিদা এবং আমি ভাল আছি। সুধাদের কাছে ঝিনুক আনন্দে আছে, তাহার অপ্রকৃতিস্থ ভাবটা কাটিয়া গিয়াছে, ইহাতে নিশ্চিন্ত বোধ করিলাম।

'তোমাদের সকলের কুশল কামনা করি। আমাদের আশীর্বাদ এবং স্নেহ লইও। তোমার পত্রের আশায় রহিলাম।

ইতি

আশীর্বাদক দাদু'

চিঠিটা এক নিশ্বাসে পড়ে মুখ তুলল বিনু। সবাই অসীম আগ্রহে তার দিকে তাকিয়ে আছে।

নিত্য দাস বলল, 'জয়নাল আমারে খবর পাঠাইছে, হ্যামকত্তা বাড়ি জমিন অহন এচ্চেঞ্জ করতে চান না। চিঠিতে কি হেই কথাই লেখছেন ছুটোবাবু?'

বিনু আস্তে মাথা নাড়ে, 'হ্যাঁ।'

'আপনে তেনারে বুঝাইয়া আবার চিঠি দ্যান। লেখবেন, পাকিস্থানে হিন্দুরা থাকতে পারব না। দ্যাশের মায়ায় হেইহানে পইড়া থাইকা তেনি য্যান নিজের সব্বনাশ ডাইকা না আনেন। শাজাহান সাহেবরে কমু আর কয়দিন অপেক্ষা করেন। হুড়পার কইরা অন্যের জমিন জুমিনের লগে এচ্চেঞ্জ (এক্সচেঞ্জ) কইরা য্যান না ফেলান।'

বিনু দ্রুত ভেবে নিল, হেমনাথকে তার খোয়ানো সার্টিফিকেট আর ডিগ্রির জন্য চিঠি তো লিখতেই হবে। তা ছাড়া, সম্পত্তি বিনিময়ের ব্যাপারে যাতে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেন সেটার ওপর বিশেষ ভাবে জোর দেবে। হেমনাথ বড় বেশি আবেগপ্রবণ। বাঙালি জাতীয়তাবাদ নিয়ে তিনি যা ভাবছেন সেটা হয়তো অলীক স্বপ্নমাত্র। বাংলা ভাষার ব্যাপারে পূর্ব বাংলা যে খুবই ক্ষুব্ধ, পাকিস্তানের কাগজগুলোতেও তার কিছু কিছু রিপোর্ট বেরিয়েছে। কিন্তু পাকিস্তানের ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু হল করাচি। অবাঙালি মুসলমানদের হাতেই সর্বস্ব। অর্থ, রাজনৈতিক শক্তি, সেনাবাহিনী। বাঙালি মুসলমানেরা

pathagar.net

সংখ্যায় বেশি হতে পারে কিন্তু অবাঙালিদের বিরুদ্ধে কতটা কী করতে পারবে, তাদের ক্ষোভ আদৌ বিস্ফোরণে ফেটে পড়বে কিনা, সে সম্বন্ধে যথেষ্ট সংশয় আছে। এই তো সেদিন দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে দেশভাগ হল। এর মধ্যেই পূর্বপাকিস্তানে হিন্দু-মুসলমান মিলিতভাবে বাঙালি জাতীয়তাবাদের নব জাগরণ ঘটাবে, এতখানি আশাবাদী বিনু অন্তত নয়। সে হেমনাথকে লিখবে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তিনি যেন কলকাতায় চলে আসার ব্যবস্থা করেন। অবশ্যই সম্পত্তি বিনিময় করে।

নিত্য দাস বলল, 'আমার অন্যহানে এট্টা জরুরি কাম আছে ছুটোবাবু। অহনই উঠতে হইব। আপনে ভালা কইরা গুছাইয়া চিঠি লেইখা রাইখেন। দুই এক দিনের মইদ্যে আইসা আমি লইয়া যামু।'

নিত্য চলে যাবার পর ঝিনুকরা ছুটে বাইরের ঘরে চলে আসে। তিনজনেরই এক প্রশ্ন, হেমনাথ কী লিখেছেন?

চিঠিটা তাদের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বিনু বলল, 'পড়ে দেখ—'

একে একে সবাই পড়ে ফেলল। প্রথমে ঝিনুক। তারপর সুধা। শেষে হিরণ।

আরও সপ্তাহখানেক বাদে সন্ধেবেলায়, ভীষণ ব্যস্তভাবে অফিস থেকে ফিরে এল হিরণ।

অন্য সব দিন তাকে লঘু মেজাজে দেখা গেছে। হাসিখুশি, আমুদে। ফিরেই সুধা আর ঝিনুককে নিয়ে চা খেতে খেতে জমজমাট আসর বসিয়ে দিত। অনেক রাত পর্যন্ত আড্ডা, হইচই, মজার মজার গল্প। ছুটির দিনে কোথায় বেড়াতে যাবে তার পরিকল্পনা।

আজ হিরণকে অন্যরকম দেখাচ্ছে। কেমন যেন চিন্তাগ্রস্ত, চোখে মুখে অস্থিরতার ছাপ।

বিনুরা তার পরিবর্তনটা লক্ষ করেছিল। সুধা জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছে? তোমাকে আজ এরকম দেখাচ্ছে কেন?'

হিরণ জানায়, মাঝে মাঝে সে যেমন অফিস ছুটির পর ভবানীপুরে যায়, তেমনি আজও গিয়েছিল। অবনীমোহন উত্তরকাশী, আলমোড়া, হরিদ্বার, নানা তীর্থস্থান ঘুরে কাল কলকাতায় ফিরে এসেছেন। ধর্মের দিকে ঝোঁকার পর গুরুর কাছে দীক্ষা নিয়েছিলেন। তখন থেকেই সংসারের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক আলগা হয়ে গিয়েছিল। এবার যেন পার্থিব সমস্ত ব্যাপারে তাঁকে আরও বেশি উদাসীন মনে হয়েছে হিরণের। ঝিনুক আর বিনুর কথা জানাতে তাদের ভবানীপুরে পাঠিয়ে দিতে বলেছেন। কিন্তু সেই বলার মধ্যে উচ্ছ্বাস নেই। বেশ ক'বছর বাদে ছেলের সঙ্গে দেখা হবে, অথচ তাঁকে কেমন যেন অবেগশূন্য মনে হল। এটাই হিরণকে ভাবিয়ে তুলেছে।

হিরণ জিজ্ঞেস করল, 'কবে ভবানীপুরে যেতে চাও?'

বিনু ভেতরে ভেতরে ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। বলল, 'এখনই যাব।'

হিরণ এবং সুধা বুঝতে পারছে, অবনীমোহনের কাছে যাওয়াটা বিনুদের পক্ষে কতটা জরুরি। কেউ বাধা দিল না।

সুধা বলল, 'তা হলে চল। আমরা তোদের পৌঁছে দিয়ে আসি। বাবার সঙ্গেও অনেক দিন বাদে দেখা হবে।'

অবনীমোহনের সঙ্গে ঝিনুককে নিয়ে একাই দেখা করতে চায় বিনু। বাবা কতখানি বদলে গেছেন, ঝিনুকের সঙ্গে কী ধরনের আচরণ করবেন, কিছুই অনুমান করা যাচ্ছে না। অবনীমোহন হয়তো সরাসরি ঝিনুক সম্পর্কে কিছু বলবেন। তারও কিছু বলার থাকবে। সুধা এবং হিরণ তার অত্যন্ত আপনজন, তবু আজ তাদের সঙ্গে আর কেউ থাকুক, সেটা মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়।

বিনু বলল, 'তোরা কাল যাস। আমি ঝিনুককে নিয়ে গিয়ে আগে বাবার সঙ্গে কথা বলি—'

তার মনোভাবটা আঁচ করে নিয়েছিল হিরণ। সুধা কী বলতে যাচ্ছিল, তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, 'ওরাই যাক—'

স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে সুধা কী অনুমান করে নিল। আর কিছু বলল না।

দ্রুত পোশাক পালটে, ব্যাগে জামাকাপড় গুছিয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল বিনু আর ঝিনুক। হিরণ বড় রাস্তা পর্যন্ত এসে ওদের ট্রামে তুলে দিয়ে গেল।

জোড়া সিটে পাশাপাশি বসে ছিল বিনুরা। প্রায় ফাঁকা ট্রাম চাকায় ধাতব আওয়াজ তুলে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলেছে। বাইরে রাতের কলকাতার নানা দৃশ্য। আলো। ভিড়। বড় বড় বাড়ি। উঁচু উঁচু গাছ। পাশ দিয়ে সাঁই সাঁই ছুটে যাওয়া অজস্র গাড়ি ঘোড়া।

ঝিনুক কথা বলছিল না। বিনু লক্ষ করল, তার চোখে মুখে ফিরে এসেছে পুরনো উৎকণ্ঠা, ভয়, অস্থিরতা। বলল, 'অত ভেবো না। সব ঠিক হয়ে যাবে।'

এমন ভরসা বিনু আগেও বহুবার দিয়েছে। ঝিনুক উত্তর দিল না।

আধ ঘন্টার মধ্যে ভবানীপুরে প্রিয়নাথ মল্লিক রোডে সেই তেতলা বাড়িটায় পৌঁছে গেল বিনুরা।

কুড়ি বাইশ দিন আগে ঘোড়ার গাড়িতে চেপে শিয়ালদা স্টেশন থেকে অনেক রাতে এখানে এসেছিল তারা। ক্লান্ত, ক্ষুধার্ত, দিশেহারা। সেদিন বাড়িটা অন্ধকারে ডুবে ছিল। দরজা-জানালা সব বন্ধ। অদ্ভুত নিঝুম। মনে হচ্ছিল ভুতে-পাওয়া। আজ কিন্তু প্রতিটি ঘরে আলো জ্বলছে। জানালাগুলো খোলা।

সদর দরজা বন্ধ রয়েছে। এটা তাদেরই বাড়ি। তার বাবার তৈরি। তবু দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বিনু অনুভব করল, হৃৎস্পন্দন পলকের জন্য থমকে গেছে। পরক্ষণে প্রায় মরিয়া হয়ে জোরে কড়া নাড়ল সে।

কিছুক্ষণ পর দরজা খুলে দিল মাঝবয়সী একটা কাজের লোক। পরনে খাটো ধুতি আর আধময়লা ফতুয়া। খুব ছেলেবেলায় একে দেখেছে কি? বিনুর মনে পড়ল না। খুব সম্ভব অবনীমোহন পরে ওকে রেখেছেন।

লোকটা জিজ্ঞেস করল, 'কাকে চাইছেন?'

বিনু বলল, 'বাবা বাড়ি আছেন?'

লোকটা ধন্দে পড়ে গেল, 'আপনার বাবা! কে তিনি?'

বিনু অবনীমোহনের নাম করল।

লোকটা এবার ব্যস্ত হয়ে পড়ে, 'আসুন আসুন। বাবুর মুখে আপনার কথা শুনিচি। পাকিস্থানে থাকতেন তো?'

'হ্যাঁ—'

লোকটা দরজা বন্ধ করে বিনুদের সঙ্গে নিয়ে একটা লম্বা প্যাসেজ পেরিয়ে ওপরে যাবার সিঁড়ির কাছে চলে এল।

বিনু জিজ্ঞেস করল, 'বাবা কোথায় আছেন?'

'তিনতলায়—'

সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে চারদিকে তাকাচ্ছিল বিনু। জাতিস্মরের মতো সব কিছু মনে পড়ে যাচ্ছিল তার। কে কোন ঘরে থাকত, কোনটা ড্রইংরুম, কোনটা রান্নাঘর, কোনটা ভাঁড়ার ঘর, কোথায় বসে খাওয়া হত, ইত্যাদি।

লোকটা তাদের প্রকাণ্ড একখানা ঘরে নিয়ে এল। এটা ছিল সুরমা আর অবনীমোহনের ঘর। মা নেই, রাজদিয়ায় চিতাভস্মে কবেই তিনি বিলীন হয়ে গেছেন।

pathagar.net

অবনীমোহন দক্ষিণ দিকের দেওয়ালের ধারে একটা বিশাল মেহগনি কাঠের খাটে বসে আছেন। পরনে লুঙ্গির মতো করে পরা থান এবং গেরুয়া পাঞ্জাবি। তার ওপর পাতলা চাদর জড়ানো।

বিনু লক্ষ করল, বাবার চেহারা আগের মতো পাতলা ছিপছিপে নেই। যথেষ্ট মেদ জমেছে। কাঁধ পর্যন্ত লম্বা চুল। মুখ কাঁচাপাকা দাড়িতে ঢাকা। চোখে মুখে শান্ত, সমাহিত একটা ভাব। মনে হয়, অলৌকিক কোনও কিছুর মধ্যে মগ্ন হয়ে আছেন। তাঁর খাটের পাশে উঁচু টেবলে অর্ধোলঙ্গ, বিরাট বিরাট জটাওলা এক সাধুর বড় ফোটো। ফোটোটা ঘিরে ফুলের মালা। সামনে অনেকগুলো ধূপকাঠি জ্বলছে। ধূপের ধোঁয়ায়, ফুলের সুগন্ধে ঘর ভরে আছে।

অন্য দিকের দেওয়ালগুলোর পাশে ভারী ভারী আলমারি, একটা মাঝারি লোহার সিন্দুক, ড্রেসিং টেবল, ক'টা চেয়ারও রয়েছে।

কয়েক পলক বিনুর দিকে তাকিয়ে রইলেন অবনীমোহন। কৈশোরে যে ছেলেকে শেষ দেখেছেন, সে এখন পূর্ণ যুবক। তবু চিনতে অসুবিধা হল না। মৃদু হাসি ফুটল তাঁর মুখে। নির্লিপ্ত সুরে বললেন, 'এস—' দূরের চেয়ারগুলো দেখালেন, 'ওখান থেকে দু'টো নিয়ে এসে কাছে বসো—'

বিনু আর ঝিনুক অবনীমোহনকে প্রণাম করে চেয়ার টেনে এনে বসল। বিনু লক্ষ করেছে, হেমনলিনীর মতো পা সরিয়ে নেন নি অবনীমোহন। অর্থাৎ ঝিনুক তাঁর কাছে অচ্ছুৎ নয়। আশান্বিত হয়ে ওঠে বিনু।

অবনীমোহন বললেন, 'সন্ধের একটু আগে হিরণ এসেছিল। তার মুখে তোমাদের সম্বন্ধে সব শুনলাম। ভেবেছিলাম, দু'একদিন পরে আসবে।' হঠাৎ কী খেয়াল হতে জোরে জোরে ডাকতে লাগলেন, 'খগেন—খগেন—'

সেই মাঝবয়সী লোকটা তেতলায় বিনুদের পৌঁছে দিয়ে চলে গিয়েছিল। আবার ফিরে এল। অবনীমোহন তাকে বললেন, 'ওরা রাত্তিরে খাবে। তার ব্যবস্থা কোরো—'

'আচ্ছা—' খগেন চলে গেল।

অবনীমোহন এবার বিনুর দিকে তাকালেন, 'খবরের কাগজে পড়ি পাকিস্তানের অবস্থা খুব খারাপ। দলে দলে রিফিউজি চলে আসছে। তোমরা এসে ভাল করেছ। তোমার হেমদাদু আর দিদাদের নিয়ে এলে না কেন?'

'ওঁরা এলেন না।' বলে না আসার কারণ জানিয়ে দিল বিনু।

কিছুক্ষণ নীরবতা।

তারপর অবনীমোহন বললেন, 'তুমি নিশ্চয়ই অনেক আশা নিয়ে আমার কাছে চলে এসেছ। কিন্তু আমি কী অবস্থায় আছি, সেটা কি জানো?'

বিনু বলল, 'কিছু কিছু শুনেছি।'

'কিছু কিছু নয়, সবটাই তোমার জানা দরকার।'

pathagar.net

অবনীমোহন শুরু করলেন। রাজদিয়া থেকে আসামে গিয়ে কনট্রাক্টরি করে দু'হাতে অঢেল টাকা রোজগার করেছিলেন। যুদ্ধ শেষ হলে কলকাতায় চলে আসেন। তখন ব্যাঙের ছাতার মতো অসংখ্য ব্যাঙ্ক গজিয়েছে। তার একটায় তাঁর সমস্ত টাকা জমা রেখেছিলেন। সেই ব্যাঙ্কের মালিকরা রাতারাতি লাল বাতি জ্বালিয়ে সব টাকা নিয়ে উধাও হয়ে যায়। আরও অনেকের মতো সর্বস্বান্ত হয়ে পড়েন অবনীমোহন। তবু নতুন করে ঘুরে দাঁড়াবার চেষ্টা করেছেন। বাড়ি মর্টগেজ দিয়ে এবং নানা জায়গা থেকে কিছু টাকা জোগাড় করে ফের অন্য ব্যবসা আরম্ভ করেছিলেন। কিন্তু সেখানেও ডাহা ফেল। তাঁর মাথায় এখন বিপুল ঋণের বোঝা।

নতুন ব্যবসাটা নষ্ট হয়ে যাওয়ায় তাঁর সমস্ত উদ্যম, মনের জোর একেবারে ধ্বংস হয়ে গেছে। মেরুদণ্ড ভেঙে চুরমার। আশাহীন, বিপর্যস্ত অবনীমোহন তখন উদ্‌ভ্রান্তের মতো এখানে ওখানে ছুটছেন, কী করবেন বুঝতে পারছেন না। সেই সময় অপার শান্তির সন্ধান পেলেন।

জটাধারী সেই সাধুর ফোটোটার দিকে আঙুল বাড়িয়ে অবনীমোহন বললেন, 'হঠাৎ একজন এঁর খোঁজ দিল। যোশিমঠে গিয়ে দর্শন পেলাম। এঁর কাছে দীক্ষা নিয়েছি। আর কোনও দুঃখ নেই। টাকাপয়সা দু'দিনের মোহ মাত্র। সে সব নিয়ে এখন আর ভাবি না। জীবনে কোনটা লাভ, কোনটা লোকসান, গুরুদেব চোখে আঙুল দিয়ে তা বুঝিয়ে দিয়েছেন।'

অনন্ত বিস্ময়ে বাবাকে দেখছিল বিনু। এই কি তার আজন্মের চেনা অবনীমোহন! কখনও এক জায়গায় স্থিত হন নি। কত কী-ই না করে বেড়িয়েছেন! ব্যবসা, অধ্যাপনা, সুদূর পূর্ব বাংলায় জমিজমা কিনে চাষবাস। যুদ্ধের আমলে আসামে গিয়ে কনট্রাক্টরি। ফের ব্যবসা। ঝুঁকির পর ঝুঁকি। অ্যাডভেঞ্চারের পর অ্যাডভেঞ্চার। নির্বিঘ্ন, ঝঞ্ঝাটহীন, এমন কোনও কিছুর প্রতি বিন্দুমাত্র আকর্ষণ ছিল না। সেই অবনীমোহন কিনা শেষ জীবনে শান্তির সন্ধানে গুরুদেবের পদতলে আশ্রয় নিয়েছেন!

অবনীমোহন বলতে লাগলেন, 'আমি একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি বিনু—'

'কী সিদ্ধান্ত?'

'আমার ঋণ সুদে আসলে বিরাট হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমাদের এই বাড়িটা বিক্রি করলে সেই ঋণ শোধ হয়ে হাতে কিছু টাকা থাকবে। ভেবেছিলাম, আমি তাই নিয়ে গুরুদেবের আশ্রমে চলে যাব। কিন্তু তুমি এসে পড়েছ। নিশ্চয়ই ওপার থেকে কিছু আনতে পার নি। সেই টাকার অর্ধেকটা তোমাকে দেব।'

বিনুর মাথায় সমস্ত সৌরলোক খান খান হয়ে ভেঙে পড়ে। এই বাড়ি বেচে দিলে ঝিনুককে নিয়ে কোথায় থাকবে সে? রুদ্ধশ্বাসে বলল, 'বাড়িটা কি কোনওভাবেই বাঁচানো যায় না বাবা?'

'অসম্ভব। অঋণী থেকেই আমি মরতে চাই।'

ঘরের ভেতর হঠাৎ অন্তহীন নৈঃশব্দ্য নেমে আসে।

একসময় অবনীমোহন বলেন, 'হিরণের মুখে শুনলাম, তুমি একটা চাকরি পেয়েছ।'

বিনু বলল, 'হ্যাঁ। আনন্দদা কাজটা জোগাড় করে দিয়েছেন। আসছে মাসে জয়েন করব।'

'এটা ভাল খবর।' একটু চিন্তা করে অবনীমোহন বললেন, 'তোমার সঙ্গে আমার একটা দরকারী কথা আছে। সেটা তোমাকেই শুধু বলতে চাই। ঝিনুক, তুমি পাশের ঘরে যাও। ওখানে খাট বিছানা চেয়ার টেয়ার সবই আছে।'

নতমুখে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল ঝিনুক।

অবনীমোহন সোজাসুজি ছেলের চোখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ঝিনুকের খবরটা অনেক আগেই আমি পেয়েছি। ভীষণ দুঃখজনক ঘটনা। শুনে খুব কষ্ট হয়েছিল। কিন্তু—'

নীরবে বাবাকে লক্ষ করতে থাকে বিনু।

অবনীমোহন থামেন নি, 'ঝিনুককে যে পাকিস্তান থেকে আনলে, ওকে নিয়ে কী করবে ভেবেছ?'

ঠিক এই ধরনের প্রশ্ন সেদিন ঝুমাও করেছিল। বিনুর বুকের ভেতরটা আমূল কেঁপে যায়। সে উত্তর দেয় না।

অবনীমোহন সমানে বলে যান, 'কোনও আত্মীয়স্বজন এমন মেয়েকে শেলটার দেবে কিনা সন্দেহ। তুমি যদি আলাদা বাড়ি ভাড়া করে ওকে নিজের কাছে রাখতে চাও, হাজারটা প্রশ্ন উঠবে। লোকে জানতে চাইবে মেয়েটা কে। তোমার সঙ্গে তার কী সম্পর্ক। কী জবাব দেবে তখন? শুধু একটা পথ খোলা আছে—'

আবছা গলায় বিনু জিজ্ঞেস করল, 'কী?'

'যদি তুমি ওকে বিয়ে কর, সমস্যাটা মিটতে পারে। কিন্তু আত্মীয়রা তোমাদের ত্যাগ করবে। তা ছাড়া, এমন একটা মেয়েকে বিয়ে করার সাহস কি তোমার আছে?'

বিনুর মনে হল, তার চারপাশের সমস্ত পৃথিবী ধসে পড়ছে। বিষবাষ্পে-ভরা পূর্ব বাংলা থেকে কী নিদারুণ আতঙ্কের মধ্যে ঝিনুককে সীমান্তের এপারে নিয়ে এসেছে, শুধু সে-ই জানে। কিন্তু

অবনীমোহন তাকে জীবনের সবচেয়ে কঠিন, সবচেয়ে দুঃসহ সংকটের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। বিপন্ন দ্বিধাগ্রস্ত, শ্বাসরুদ্ধ বিনু কী জবাব দেবে, ভেবে পেল না।

অবনীমোহন বললেন, 'একটা কথা ভেবে দেখতে পার। এ জাতীয় মেয়েদের জন্যে গভর্নমেন্টের 'হোম' আছে। সেখানে আপাতত ঝিনুককে রাখা যেতে পারে।'

বিনু এবারও চুপ।

অবনীমোহন বলতে লাগলেন, 'তুমি ঝিনুকের কাছে যাও। এক্ষুনি নয়, সময় নিয়ে বুঝিয়ে সুঝিয়ে 'হোম'-এর ব্যাপারটা বোলো।'

শরীর এবং মন কঠিন আঘাতে অসাড় হয়ে গেছে। নিজেকে ধীরে ধীরে টেনে তুলল বিনু। পাশের ঘরে এসে দেখল, সেটা একেবারে ফাঁকা। সে ডাকতে লাগল, 'ঝিনুক—ঝিনুক—'

সাড়া নেই।

তেতলার অন্য ঘরগুলো আতিপাতি করে খুঁজল বিনু। কোথাও ঝিনুককে পাওয়া গেল না। সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে দোতলায়, তারপর একতলায় নেমে এল সে। ঝিনুক কোথাও নেই।

একতলার কিচেনে রান্না করছিল খগেন। তাকে জিজ্ঞেস করল, ঝিনুককে দেখেছে কিনা। খগেন জানালো, রান্নাবান্না নিয়ে সে ব্যস্ত ছিল। দিদিমণিকে লক্ষ করে নি।

অবনীমোহন ঝিনুককে পাশের ঘরে যেতে বলেছিলেন। নিশ্চয়ই সে সেখানে যায় নি। দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে অবনীমোহনের কথাগুলো শুনেছে। বিনুর শ্বাসক্রিয়া বন্ধ হয়ে এসেছে। সে সদর দরজার দিকে দৌড়ল। সেটা হাট করে খোলা। বাইরে বেরিয়ে উদ্‌ভ্রান্তের মতো ঝিনুককে ডাকতে ডাকতে প্রিয়নাথ মল্লিক রোডের এক মাথা থেকে অন্য প্রান্তে ছুটতে লাগল। তারপর চলে এল ট্রাম রাস্তায়। নেই, নেই, নেই। যেদিকে যতদূর নজর যায়, অবিরল গাড়ির স্রোত। ভিড়, ভিড় আর ভিড়। তার মধ্যে চিরদুঃখী মেয়েটাকে কোথাও দেখা গেল না।

অঘ্রান মাস পড়ে গেছে। কুয়াশায় চারদিক ঝাপসা। উত্তুরে বাতাসে গাঢ় হয়ে হিম মিশে যাচ্ছে।

কুহেলিবিলীন আকাশের নীচে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে বিনু।

pathagar.net

॥ তৃতীয় ও শেষ পর্ব সমাপ্ত ॥